বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প

গল্পকার

শ্রীভূদেব চৌধুরী

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অবিস্মরণীয়েষু

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' দ্বিতীয় সংস্করণে পদার্পণ করছে। গ্রন্থের মূল পরিকল্পনা ও আদর্শ 'প্রথম সংস্করণের প্রাক্‌কথন'-এ বিস্তারিত বিবৃত হয়েছে। তা ছাড়া এই সংস্করণে দুটি নূতন প্রসঙ্গ সংযোজিত হয়েছে,—(১) রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' (২) মনোজ বসুর 'গল্পশিল্প'। 'লিপিকা'র কাবিতাগুণ এবং প্রচ্ছন্ন গদ্য-কবিতারূপ নিয়ে নানা বিশ্লেষণ হয়েছে ; তার অপরূপ গদ্য-রচনাশৈলী ও কথিকাবলীর কথাও বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু 'লিপিকা'র কিছু কিছু লেখা যে অপরূপ গল্প-কলারও প্রতিনিধি, সেই রহস্য নূতন করে অনুধাবনের চেষ্টা করা গেছে। প্রথম সংস্করণে 'মনোজ বসু'র গল্পশিল্পের মূল্যানুসন্ধান পরিহার করা গিয়েছিল যে যুক্তিবশে, শিল্পী নিজেই সস্নেহে সে সম্পর্কে দ্বিতীয় চিন্তার সম্ভাবনা নির্দেশ করেছিলেন। তারই ফল বর্তমান গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে।

তাছাড়া পূর্বালোচিত বিভিন্ন প্রসঙ্গে নূতন তথ্য ও ভাবনার যোজনা করা হয়েছে সব কিছু মিলিয়ে এই দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থটি নূতন কলেবর নয় কেবল অনেকটা পরিমাণে নূতন উপাদানও অধিগত করেছে।

প্রথম সংস্করণ গ্রন্থ রচনার পূর্বে ও পরে অনেকেই অযাচিত স্নেহানুকূল্য প্রকাশ করে কৃতার্থ করেছিলেন। পূর্বে তাঁদের অনেকের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা গেছে। যাঁদের কথা তখন বলা হয় নি, তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশীর দাক্ষিণ্য অবিস্মরণীয়।

নতুন সংস্করণের নির্মাণে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, শ্রীযুক্ত মনোজ বসু, শ্রীযুক্ত শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন এবং শ্রীযুক্ত দীপক চন্দ্র।

প্রকাশনার প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত সাহায্য পেয়েছি বোলপুর পুস্তকালয়ের শ্রীঅচীন্দ্র নায়ক মহাশয়ের কাছে।

আর এই সর্বমুখী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁদের দুঃসাহস এই বৃহৎ গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ সম্ভব করল, তাঁদের কাছে,—মডার্ণ বুক এজেন্সীর দুই কর্ণধার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের কাছেও লেখকের কৃতজ্ঞতা অশেষ।

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।
নববর্ষ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

শ্রীভূদেব চৌধুরী

প্রথম সংস্করণের প্রাক্‌কথন

স্বল্প পরিসরে 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার'-গ্রন্থের পরিচায়ন সহজসাধ্য নয়। যে উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা নিয়ে এই রচনার পথে অগ্রসর হতে হয়েছে, তার কোনো পূর্বসূত্র নিজের জানাশোনার মধ্যে দেশে-বিদেশে খুঁজে পাই নি। এক কথায়, প্রথম দুটি পর্ব জুড়ে বাংলা ছোটগল্প-সাহিত্যের ঐতিহাসিক অগ্রগতির পথ-রেখাটুকুর সন্ধান করতে চেয়েছি। এই হিশাব-নিকাশে সন-তারিখের নির্ভুল খতিয়ান দেওয়া সম্ভব নয়। বাংলা সাহিত্যে প্রথম ছোটগল্পের স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করা গেছে শ্রীপূঃ-রচিত 'মধুমতী' গল্পে ;—'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় গল্পটির প্রকাশকাল ১২৮০ বাংলা সাল। অন্যপক্ষে, এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে আলোচিত অন্তিম পর্বের রবীন্দ্র-গল্পধারার রচনা সমাপ্ত হয়েছিল ১৩৪৮ বাংলা সালের শ্রাবণ মাসের আগে। তা'হলেও, বর্তমান গ্রন্থ ১২৮০ থেকে ১৩৪৮ সাল, তথা ১৮৭৩ থেকে ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্প-সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ তথ্য-চিত্র নয়। বস্তুত এই সময়-সীমারই শেষ প্রান্তে, বাংলা ছোটগল্পে দ্বিতীয় পর্বের চলমানতার কালেই, সমান্তরাল ধারায় তৃতীয় পর্বেরও সূচনাপর্যায় অগ্রসর হয়ে চলেছিল। আসল কথা, ইতিহাস সন-তারিখের নির্ভুল হিশাব হাতে করে চলে না,—সাহিত্যের ইতিহাস তো কখনোই নয়। তার নব-অভ্যুদয়ের বেদী যুগমানসের পদ্মাসনে। বাইরের জগতে বিপরীত এবং বিচিত্রের সংঘাত-সমন্বয়-লীলার মধ্য দিয়ে পুরাতনের অপ্রয়োজনীয় অংশকে কেবলই ভেঙে-চুরে ইতিহাস এগিয়ে চলে মনের জগতে,—যুগ-মানুষের উপলব্ধিতে নূতনের স্বাদ ও অনুভবকে অনিবার্য করে তোলাই তার প্রধান উদ্দেশ্য। আর সাহিত্য যেখানে বিশুদ্ধ সৃজন-প্রক্রিয়া, সেখানে স্রষ্টার জ্যোতির্ময় উপলব্ধি-লোকেই তো তার আলোকোদ্ভাসী প্রতিফলন! এই অর্থেই বলেছি, বিশেষ করে সাহিত্যের ইতিহাসের নিরিখ সন-তারিখের পাঁজি-পুথিতে দুর্লভ্য,—বহির্জগতের মালমশলা নিয়ে যুগ-চিত্তের অন্তঃপুরেই তার স্বত-উৎসার।

এদিক্ থেকে, বাংলা ছোটগল্পের প্রথমপর্ব রবীন্দ্রনাথের পদ্মা-প্রকৃতি-বিধৌত শিল্পি-মানসেই নবজন্ম লাভ করেছিল বলে বিশ্বাস করি। তার কারণ নির্দেশিত আছে গ্রন্থমধ্যের আলোচনায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিশ শতকীয় অভিঘাতে যুগ-মানস উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত কালের গল্পসৃষ্টির ধারাকে প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত

করেছি। এই হিসেবে 'হিতবাদী' থেকে শুরু করে 'সবুজপত্রে'র কাল পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্পের প্রথমপর্ব। এই উপলক্ষে জন্ম-পূর্ব প্রস্তুতির অপেক্ষাকৃত অস্ফুট সাধনাকেও অনুধাবন করতে হয়েছে,—প্রথমপর্বে ছোটগল্প-জন্মের পূর্ববর্তী প্রস্তুতি-প্রয়াসে নিমগ্ন ছিলেন মুখ্যত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় পর্বের সময়কাল হিসাব করেছি 'কল্লোলে'র সময় থেকে। অর্থাৎ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পশ্চাৎভূমিতে পৃথিবীব্যাপী দিশাহারা উদ্‌ভ্রান্তির আঘাত যখন পৌঁচেছে বাংলার যৌবন-জীবনের স্রোতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতর ঘূর্ণাচক্রতলে নিষ্পিষ্ট নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের সাহিত্যের আকাশবাতাসে 'কল্লোলে'র কালের উত্তেজনা এবং অবসাদ, আলোকতৃষ্ণা এবং নীরন্ধ্র অন্ধকার, উগ্রতম আত্মবিশ্বাস এবং অন্ধতর অসহায়তাবোধ,—ভেঙে চুরমার করে ফেলার নেশা, অথচ নূতন নীড় সংগ্রহের গোপন লোভ এই সবকিছু সাহিত্যের অপরাপর ধারার মত বাংলা ছোটগল্পেও সৃষ্টির অসংখ্য আধারে বিচিত্র রূপান্বিত হয়ে দেখা দিয়েছে। এই তাৎপর্যেই অন্তিম পর্যায়ের রবীন্দ্র-গল্পও দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্গত।

কিন্তু ইতিহাসের গতিপথ ভৌগোলিক মানচিত্রের সীমারেখা মেনে চলে না,—অথবা, এক পর্বের কালকক্ষ থেকে আর এক পর্বের কোঠায় লাফিয়েও আসে না কখনো; অতীত থেকে অনাগতের অভ্যন্তরে ইতিহাসের গতিপ্রবাহ নিরবচ্ছিন্নতার সূত্রে বাঁধা। তাই, এক যুগের দুর্মর জীবনবাসনার মর্ম-ভূমিতে বসেই আর এক যুগের নিভৃত প্রস্তুতি চলতেই থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বজোড়া যে ঝড়ের হাওয়া বাংলাদেশেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিকের সকল পুরাতন মূল্য-মোহকে নিশ্চিহ্ন করে দিল, তার পূর্বসংকেত 'সবুজপত্রে'র কালের ঘরেই যেন শোনা গেছে;—যুদ্ধ যখন চলছে, অন্তত তখনকার রবীন্দ্রগল্পে। সে-সব আলোচনা এই গ্রন্থের অভ্যন্তরে যথাস্থানে বিন্যস্ত রয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বের প্রসঙ্গেও একই কথা বলা চলে। 'কল্লোল' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ১৩৩৬ বাংলা সালের পরে,—ইংরেজির সেটি ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ। বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত অবসাদ এবং বিধ্বস্ততার একটা পর্যায়কে পেছনে রেখে বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস তখন নেহরু কংগ্রেসের (১৯৩০) হাত ধরে এক নূতন পথে যাত্রা করেছে। অব্যবহিত পূর্ববর্তী কালের পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্মীয়, সকল-প্রকার স্থায়ী মূল্যবোধের নিরন্তর বিধ্বস্ততার প্রলয়-ঝঞ্ঝার সঙ্গে এসেছিল 'কল্লোলে'র কাল,—তার সঙ্গে ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উপায়হীন আর্থিক বিনষ্টির

বিভীষিকা। সেই ব্যর্থতা এবং অবসাদবোধের মূলভূমি থেকে যেন সদ্য উঠে এল আত্মসংরক্ষণের,—আত্মবিসর্জনের এক নিরবধি প্রেরণা। 'কল্লোলে'র কালের পরবর্তী ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি এই রাজনৈতিক আত্মোৎসর্জনের নবীন প্রয়াস। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই নবীন ভাবনাকে সচেতনভাবে আমন্ত্রণ করে আনার প্রথম গৌরব হয়ত 'পরিচয়'-আশ্রিত ভারতের কম্যুনিস্ট দলের, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে' অথবা শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী-র' মত বিখ্যাত রচনা-প্রসঙ্গ স্মরণে রেখেও একথা বলা অন্যায় হবে না।

'কল্লোল'-উত্তর নবীন যুগের বার্তাবহনের দায়িত্ব নিয়ে সুধীন দত্তের সম্পাদনায় 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৩৩৭ বাংলা সালের শ্রাবণ মাসে। উদ্দেশ্য ছিল তরঙ্গকম্পিত বিশ্বাবর্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে নতুন যুগের আভিজাত্য আরোপ। আদর্শের সমসূত্র দাবি করে 'কল্লোল'-দলের কেউ কেউ এসে জুটেছিলেন 'পরিচয়ে'র পতাকাতলে। তাছাড়া আরো এসেছিলেন সেকালের সংস্কৃতিমান তরুণ, আমাদের কালের বিদগ্ধতম প্রবীণদেরও অনেকেই। তারপরে ক্রমশ নানা পৃথক্ দৃক্‌কোণ থেকে সমাগত তারুণ্য-সাধকদের মধ্যে উদ্দেশ্যের খুঁটিনাটি নিয়ে যে বিভেদ ক্রমশ বিচ্ছেদে পরিণত হল,—বাংলা গল্পের তৃতীয় পর্ব প্রসঙ্গেই কেবল তা আলোচনা-যোগ্য। কিন্তু তারই ফলশ্রুতিতে 'পরিচয়' পত্রিকা ক্রমশ রূপান্তরিত হয়ে গেল ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সাহিত্য-ভাবনার হাতিয়ারে। সুধীন দত্ত তখন কেন্দ্রভূমি থেকে অপসৃত হয়েছেন। ভালোমন্দের প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। কিন্তু যুগের মর্মলীন এই রাজনীতি-চেতনা সাহিত্যের মূলেও দিনে দিনে অদৃশ্য পদসঞ্চারে অধিষ্ঠিত হয়ে পড়তে লাগলো,—যার দুই সাময়িক হলেও সুনির্দিষ্ট স্মরণস্তম্ভ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন প্রগতি সাহিত্যসংঘ এবং '৪২-উত্তর কংগ্রেস সাহিত্যসংঘ। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এসব প্রশ্ন দলীয় রাজনীতির। কিন্তু দল-নিরপেক্ষভাবে 'কল্লোল' যুগের সমাজ, পরিবার, চারিত্রনীতি, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি ভাবনার পূর্বপ্রসঙ্গের সঙ্গেই নূতন পর্বে এই রাজনৈতিক ঐতিহ্য-চেতনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিল্প-সাহিত্যের মর্মলীন হয়ে পড়লো। রবীন্দ্র-মানস ছিল তাঁর কালের সকল পর্যায়ের ইতিহাস-দর্শনের দর্পণ;—'প্রশ্ন', 'বক্সাদুর্গের রাজবন্দীদের প্রতি' ইত্যাদি কবিতায় সেই নূতন হওয়ার আন্দোলন লক্ষ্য করি রবীন্দ্র-কবিতাতেও। 'কল্লোলে'র কালের সকল জীবন-উপকরণের উগ্রতামুক্ত সঞ্চয়ের সঙ্গে এই নূতনতর রাজনীতি-অর্থনীতিগত সচেতন মূল্য-চেতনার সংযোগে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত ছোটগল্পেও আধুনিকতার তৃতীয় পর্বের সূত্রপাত। বর্তমান গ্রন্থের রচনা-সময় এবং লেখকের কালের পক্ষে সেই ইতিহাস এখনো

আলোচনা-যোগ্য দূরত্বে অধিষ্ঠিত হতে পারে নি। কেবল এই কারণেই দ্বিতীয় পর্বের অন্তিম-সংলগ্ন তৃতীয় পর্বের সূচনান্তর সম্পর্কে আপাতত নীরব থাকতে হয়েছে। তারপরেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তথা স্বাধীনতা এবং দেশবিভাগোত্তর চতুর্থ পর্ব তো রয়েইছে।

যাই হোক্, পরিকল্পিত পদ্ধতিতে আলোচনা-পরিধি সীমিত করতে গিয়ে কিছু কিছু সংশয়েরও অবকাশ যে দেখা দিয়েছে, সে কথাই এখানে বিবেচনা করবার মতো। আগেই বলেছি, ছোটগল্পের শিল্প-শরীরে জীবন-ধর্মের পদ-সম্পাতের ইতিহাস সন্ধানে লেখা অথবা লেখকের বয়সের সন-তারিখের হিশাব করি নি,—খোঁজ করেছি শিল্পীর মন ও শিল্পকর্মের ভাবরূপের আভ্যন্তরীণ কাল-পরিচয়। এই তাৎপর্যেই 'বিচিত্রা'-'পরিচয়ে'র কালের লেখক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে প্রমথ চৌধুরীর অনুব্রতীদলের অন্তর্ভুক্ত করেছি। বইয়ের হিশাবে সাহিত্যের জগতে যাঁর আবির্ভাব 'সবুজপত্রে'র পরবর্তী দ্বিতীয় ধাপে,—অর্থাৎ 'কল্লোলে'র পরবর্তী কালের সিঁড়িতে। ঠিক একই কারণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'কল্লোল'-সমকালীনদের অভিন্ন পর্যায়ে রেখে শিল্পধর্মের পরিচয় সন্ধান করেছি। বুদ্ধদেব বসু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন 'a belated Kollolean'; ধূর্জটি-অনুজ বলেই কেবল নয়, আরো নানা কারণেই শিল্প-স্বভাবে বিমলাপ্রসাদ পরাগত প্রমথানুবর্তী।

আবার ঐ একই নিরিখে মানিকের চেয়ে প্রবীণতর 'ল্যাণ্ড্‌মার্ক' গোপাল হালদারকে (১৯০২) আলোচনা-সীমার বাইরে রেখেছি। বাংলা কথাসাহিত্যে দলীয় রাজনৈতিক মতবাদপুষ্ট রচনার প্রায় দিগ্‌দর্শক হিশেবে আমাদের অনালোচিত তৃতীয় পর্বের তিনি এক মুখ্য স্তম্ভ।

ব্যক্তিমুখ্য এই আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান গ্রন্থের মূল্যায়নে আমাদের ইতিহাস-ভাবনার পরিচয় হয়ত অল্পবিস্তর আভাসিত করা গেল। বাকীটুকু বিস্তীর্ণ হয়ে রইল অভ্যন্তরবর্তী মূল আলোচনায়। তাহলেও এই প্রসঙ্গে অক্ষমতার অপরাধ স্বীকার করে রাখার আবশ্যিকতা রয়েছে। এই গ্রন্থে আলোচিত কাল ও ভাবপরিধির মধ্যে ছোটগল্প রচনা করেছেন, এমন লেখকের কেবল নাম পরিচয় গ্রহণ করতে গেলেও তালিকায় তিন সংখ্যার মাত্রা ছাড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করে রাখা ভাল, ছোটগল্প না হোক্, ছোট ছোট আকারের গল্প আমাদের ভাষাতেও 'দিগ্‌

দর্শনে'র যুগ থেকেই বহুল লভ্য।[১] যাই হোক, পরিমাণ অথবা উৎকর্ষের বিচারে এই শিল্পিগোষ্ঠীর কারো সৃষ্টিই পরিহার্য নয়। বাংলা গীতি-কবিতার বিশ্বমনোহর ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথের প্রায় একক সিদ্ধির অপরূপ ফলশ্রুতি। কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে বাংলা ছোটগল্প বাংলা লিরিক্-এর চেয়েও যদি ব্যাপকতর প্রতিষ্ঠা দাবি করে থাকে, তা এই সকল উল্লিখিত-অনুল্লিখিত সকল স্রষ্টার সমবেত সাধনার ঐতিহাসিক ফল-পরিণাম। এদিক থেকে অনুরাগী মনের উপলব্ধির গভীরে এঁদের প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক্ স্মরণীয়তার অধিকারী। কিন্তু একটি গ্রন্থে, একজন লেখকের প্রচেষ্টায় সেই অসাধ্য সাধন অসম্ভব। তাছাড়া, সে প্রয়াস পরিকল্পিত পদ্ধতিরও অনুকূল নয়। বাংলা ছোটগল্প ও গাল্পিকদের সম্পর্কে তথ্যগত উপকরণ যোগ্য সংগ্রাহকের চেষ্টায় একদিন পূর্ণতা লাভ করবে,—এই উজ্জ্বল প্রত্যাশা নিয়েই এ পথে প্রথম পদক্ষেপ করার স্পর্ধা করা গেল।

কিন্তু একই কারণে নিজের সাধ ও সাধ্যের অনুমত করে নিজস্ব পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হয়েছে। সেই চেষ্টায় নিজের অনুভবের অনুসারে প্রতি যুগে প্রতি পর্যায়ের একটি করে সংক্ষিপ্ত সাধারণ নক্সা প্রথমে এঁকে নিয়ে তাকে চিহ্নিত করার আকাঙ্ক্ষায় যুগন্ধর শিল্পীর রচনা-প্রসঙ্গকে পথ-বর্তিকা-রূপে গ্রহণ করেছি। প্রত্যেক পর্ব কিংবা উপপর্যায়েই বহু শিল্পী অনালোচিত থেকে গেছেন,—তাঁদের উল্লেখ-আলোচনা তথ্যগত পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের পক্ষে অপরিহার্য। বর্তমান পরিকল্পনার পক্ষে একান্ত প্রাসঙ্গিক নয় বলেই পূর্ণ আলোচনা সম্ভব হল না, লেখক এ জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

এসব সত্ত্বেও আলোচ্য পর্বের ইতিহাসের ইমারতটুকু মোটা চৌহদ্দিসহ চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছি। সৃষ্টির, তথা জীবনেরও কোনো পর্যায়েই ইতিহাসের গতি সরলরেখা অনুসরণ করে চলে না। জীবন যেমন, জীবনাশ্রয়ী সাহিত্যও তেমনি বিচিত্র এবং বিপরীতের সমন্বয়-সংঘাতের খেলা। প্রতি পর্বের সৃষ্টি-ধারাতেই কত বিচিত্র উপপর্যায়, উপধারার যোগবিয়োগের খেলা দেখা দিয়েছে,—সজীব ইতিহাস-সন্ধানের আনন্দ তো তাকেই খুঁজে পাবার মধ্যে। বর্তমান গ্রন্থে প্রতি পর্বের প্রতিটি উল্লেখ্য ধারা-প্রতিধারাকে (cross currents) পূর্ণায়ত মূল্যে অবিষ্কার করার প্রয়াস করেছি। তাতে গল্পের রূপ ও ভাব-বৈশিষ্ট্যের অভিন্ন সূত্রে গল্পকারের সৃজনী-মানসকেও অবিষ্কার করে দেখার চেষ্টা করতে হয়েছে। আরো একবার অনুভব করি,

১। দ্রষ্টব্য—'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকার 'হস্তীর বিবরণ' (৬-১১১) 'বৃদ্ধ ও তাহার পুত্র, তাহার গাধার কথা' (৬-১১৭) ইত্যাদি।

এ ধরনের গ্রন্থ পূর্বে রচিত হয়েছে বলে জানা নেই। দ্বিধা এবং কুণ্ঠা নিয়েও তাই নিজের মূল্যমান নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়েছে। এই গ্রন্থে প্রতিপর্বে একাধিক উপপর্যায়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। পরিচ্ছেদ-সংখ্যানুসারে আদিপর্বের মোটা উপপর্যায়ও অন্তত পাঁচটি। দ্বিতীয় পর্বের সংগঠনেও ঐ পাঁচটি পর্যায়ের কথাই আবার স্মরণ করেছি। এই পর্যায়গুলি প্রতি পর্ব-নিবদ্ধ পূর্ণাবয়ব ইতিহাসের যেন বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-সমষ্টি। বিভিন্ন অঙ্গের সামঞ্জস্য এবং সমন্বয়ে যেমন সম্পূর্ণ অস্তিত্বের দ্যোতনা,—তেমনি কয়েকটি পর্যায়ের আঙ্গিককে ধরেই এক এক পর্বের ইতিহাস-শরীর সম্পূর্ণ হয়েছে। আবার অঙ্গের যেমন প্রত্যঙ্গ,—এক এক পর্যায়ের প্রসঙ্গে পর্যায়ভুক্ত শিল্পি-গোষ্ঠীর ভূমিকাও তেমনি। ফলকথা, একটা গোটা পর্বে সাধারণভাবে এক অখণ্ড কালাশ্রিত জীবন-চেতনাই সৃষ্টির বৃহত্তর প্রেরণা হিশেবে কাজ করেছে। কিন্তু নদীর গতিপথে একই স্রোত যেমন বাঁকে বাঁকে মোড় ফেরে, নতুন চমকের ইশারা নিয়ে নতুন ভঙ্গীতে, এখানেও তাই। এক এক গুচ্ছ শিল্পীর মধ্যে সামগ্রিক যুগ-মানসের এক-একটি পৃথক্ দৃক্‌কোণাশ্রয়ী দীপ্তি যেন সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আবার, এক-একটি বাঁকে যেমন বিচিত্র বীচিবিভঙ্গ, তেমনি প্রতি শিল্পি-গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত ভাব-রূপ-চিন্তনের মহিমা। এই প্রসঙ্গেই গল্পের ইতিহাসে গল্পকারের শিল্পি-ব্যক্তিত্ব সবিশেষ নিরীক্ষার উপাদান হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানীর নিরীক্ষা যেমন বিজ্ঞানের পরীক্ষাশালায়, সৃষ্টির সার্থকতম পরীক্ষাও তেমনি স্রষ্টার অন্তর্নিহিত নির্মাণশালাতেই একমাত্র সম্ভব। শিল্পীর সৃজনী-ব্যক্তিত্ব-পরিস্রুত রসমূর্তিকেই আস্বাদন করতে চেয়েছি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে।

আর সেই প্রচেষ্টায় গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করেছি,—গল্পের আলোচনায় গল্পের আংশিক অথবা পূর্ণাঙ্গ উদ্ধার করেছি ব্যাপকভাবে। ছোটগল্পের আস্বাদনীয়তার মধ্যে এমন এক অপরিচ্ছেদ্য সামগ্রিকতা রয়েছে যে, তার বিন্যাসের প্রতিটি খুঁটিনাটি, প্রত্যেকটি তাৎপর্যময় বাণীকণিকা এবং বাক্‌শৈলীকে পৃথক্ এবং সামগ্রিক ভাবে এক সঙ্গে উপলব্ধিগত করতে না পারলে, রসস্বাদুতা অনেকখানিই হাত গলিয়ে তলিয়ে যায়। এই কারণেই গল্প-স্বভাবের মূলগত ইতিহাস-ধর্মকে আয়ত্ত করবার জন্য যেমন গল্পকারের মনঃপ্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করতে হয়েছে, তেমনি গল্পরসের পূর্ণ স্বাদুতা আহরণের জন্য গল্পের সংকলন ও সংগ্রহ করতে হয়েছে তার বক্তব্য ও প্রকরণের খুঁটিনাটির সঙ্গে। ছোটগল্প-আস্বাদনে প্রমাণহীন মন্তব্যের মত নিখুঁত উদ্ধার-বর্জিত সারাংশ-সংকলনও সমান নিরর্থক বলে বিশ্বাস করেছি। গ্রন্থের পরিধি তাতে বেড়েছে, অন্য কোনো মূল্য যদি নাও থাকে, তবু এই বাহুল্য সর্বাংশে

নিরর্থক হয় নি। গাল্পিকতার পরিবেশেই তো গল্প আস্বাদনের শ্রেষ্ঠ পরিমণ্ডল লেখকের সাধ্যে না হোক, শিল্পিদের সাধনা-সাফল্যে সেই পরিবেশ যতটুকু গড়ে উঠেছে, ততটুকু অন্তত এই গ্রন্থ উপভোগ্য হবে, এ-ও এক মস্ত ভরসা!

সব ক্ষেত্রেই যে বিভিন্ন শিল্পীর সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পের উদ্ধার এবং বিচার করেছি, তা কিছুতেই নয়। বস্তুত বাংলা ছোটগল্পের গঠনে কোন্ শিল্পী কত বড় বা ভাল, সেই প্রতিযোগিতামূলক মূল্যায়নের চেষ্টা করি নি,—তাতে বিশ্বাসও নেই। বাংলা ছোটগল্পের বিশ্ববরণীয় যে ইতিহাস বহু সাধকের বহু সাধনার ধারায় আজ পূর্ণ উচ্ছ্বসিত, ইতিহাসের সেই রহস্যময় বিচিত্র-সমন্বিত রূপটিকেই প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছি। ফলে, ইতিহাসের মণিভাণ্ডারের এক-একটি আলোক-রহস্যাকীর্ণ প্রকোষ্ঠ এক-একজন শিল্পী উদ্‌ঘাটিত করেছেন নিজস্ব শিল্পধর্মের যে চাবিকাঠি দিয়ে, তার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং বহিরঙ্গ রূপের দ্যোতনা যে সব রচনায় আভাসিত হয়েছে, তারই একটি-দুটি করে পরিচয় সংগ্রহ করেছি। অনেক সময়ে উষারুণরাগেই দিবালোকের পরিচয় পাওয়া গেলে প্রাথমিক রচনাবলীর স্বরূপ সন্ধান করেই নিরস্ত হয়েছি। সৃষ্টির চেয়ে স্রষ্টার অন্তর্নিহিত রহস্য-শক্তিকে সন্ধান করেছি, যার সমবেত ফলশ্রুতি আমাদের ছোটগল্প-সাহিত্যের বিরাট ঐতিহ্য।

বলাবাহুল্য, আলোচ্য মূল্যমানের পরিকল্পনা ও মূল্যায়নের প্রয়াস বহুলাংশেই বর্তমান লেখকের ব্যক্তিক অনুভব ও চিন্তার ফল। তার সাফল্য-অসাফল্য যোগ্য আস্বাদয়িতারা বিচার করবেন। কিন্তু তার আগে বর্তমান লেখককে আলোচ্য সৃষ্টির ভালোমন্দ দুই-ই বিচার করতে হয়েছে। বিধাতার সৃষ্টিতেও সব নিখুঁত হয় না,—মানব-রসস্রষ্টার পক্ষেও এ-কথা সমান সত্য। এমনকি রবীন্দ্রনাথের সকল গল্পই সমান সফল নয়। তাহলেও আমাদের গল্পসাহিত্যের রথ ভালোমন্দের দুই চাকার ওপরে ভর করেই এগিয়ে চলেছে,—আর যোগ-বিয়োগের হিসাব করে যোগের ঘরে যে অনেক অঙ্ক জমেছে, সে তো সর্বজনবিদিত। তবু বিয়োগের অংশ বাদ দিলে যোগের ঘরের উজ্জ্বলতাও স্পষ্ট অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। নিজের জ্ঞান-বিশ্বাস মত যোগ-বিয়োগের নিক্তিতে যথাযোগ্য মাপের ওজন ব্যবহার করে ব্যক্তিক শিল্পকর্ম ও কালগত ইতিহাসের মূল্যায়ন-প্রচেষ্টা করেছি। কিন্তু যেখানে প্রথমাবধি শ্রদ্ধা করতে পারি নি, সেখানে মূল্য রচনার স্পর্ধাও করি নি কখনো! নিজের পক্ষে এইটুকুই শ্রেষ্ঠ ভরসার কথা। ভ্রান্তি এবং অসংগতি যদি কিছু ঘটে থাকে সে কেবল অসাধ্য-জনিত, ইচ্ছাকৃত নয় কখনোই।

সবশেষে বর্তমান আলোচনার সূত্রেই আরো একটি কথা বলা প্রয়োজন। বাংলা ছোটগল্পের জন্ম-ইতিহাসের সন্ধান উপলক্ষে প্রতীচ্য গাল্পিকতার পূর্ব-সূত্র রূপ-রেখার আকারে হলেও অনুসরণ করতে হয়েছে। ভারতীয় আর্য সাহিত্যে গল্পের অঙ্কুর ঋগ্‌ বেদের অন্তর্ভুক্ত 'ঐতরেয় আরণ্যকে'ও পাওয়া যায়,—তার একটি নিদর্শন বর্তমান গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে অনুভব করতে হয় যে, বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের মত ছোটগল্পেরও প্রাণ এবং শারীর সংগঠন দুইই মূলগতভাবে বাঙালির প্রতীচ্য মানস-চারণের ফল। আমাদের দেশে জাতকের যুগে, এমন কি আরণ্যকের যুগেও ভাল ভাল গল্প ছিল। হয়ত তার আগে-পরে আরো অনেক ছিল। সে সমস্ত লুপ্ত সম্পদের উদ্ধার ও মূল্যায়নের প্রয়াস অবশ্য কর্তব্য। তার জন্যে বহুজনসাধ্য স্বতন্ত্র গবেষণা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া আবশ্যিক। কিন্তু আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন উপলক্ষে আরণ্যক, জাতক, পুরাণ কিংবা কোনো ভারতীয় গল্প-সাহিত্যের পুরাকথানুসরণ অপরিহার্য বলে মনে হয় না। বর্তমান গ্রন্থে তাই সেসব প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ত এবং অনেকাংশে পরিবর্জিত হয়েছে। পরিশেষে গ্রন্থের সকল আলোচনার ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্পর্কে বিদগ্ধজনের নির্দেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে অপেক্ষিত হয়ে থাকবে।

এবারে ঋণ স্বীকারের পালা। ১৯৫৭ খ্রীস্ট সালের ডিসেম্বর মাসে সূচিত হয়ে ১৯৬২-তে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হতে পারল। একটানা লিখে যাবার সুযোগ কখনোই হয় নি।—বছরের তিনমাস অবিরাম লিখে যাবার পরে বাকী ন' মাস প্রায় স্তব্ধ হয়ে থেকেছে এ-বিষয়ের সকল চিন্তা-ভাবনা। পুরো ১৯৬১ সালব্যাপী প্রায় একছত্রও লেখা হয় নি। এই দীর্ঘকালের রচনা ও বিরতিপর্বে তথ্য-সংগ্রহের উপলক্ষে বহুজনের কাছে মনে মনে ঋণী হয়ে আছি। লেখকের ক্ষমতার সীমায়তি এবং দাবির অসংগতির কথা না ভেবেও যাঁরা অকুণ্ঠচিত্তে এই গ্রন্থ রচনায় নানা উপকরণ সরবরাহ করেছেন,—তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতাবোধ নিরবধি হয়ে থাকবে। গ্রন্থ-প্রকাশের এই পুরোলগ্নে অপার শ্রদ্ধা, প্রীতি ও স্নেহের সঙ্গে তা একান্ত স্মরণীয়:—

সকলের আগে উল্লেখ্য কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষের কর্তব্যনিরত কর্মীদের সহৃদয়তার কথা। এই বইয়ের অন্তত ৬০০-৬৫০ পৃষ্ঠা ঐ পাঠকক্ষেই বসে লেখা হয়েছে,—এই উপলক্ষে প্রতিপদে যে সমর্পণ সহানুভূতির স্পর্শ পেয়েছি প্রায় সকলের কাছে, তার জন্য কৃতজ্ঞতার অবধি নেই।

তাছাড়া আলোচিত শিল্পীদের অনেকে তাঁদের রচনা সম্পর্কিত বিভিন্ন কৌতূহল চরিতার্থ করে অশেষ অনুগৃহীত করেছেন ; তাদের মধ্যে আছেন :—

৺উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৺সজনীকান্ত দাস
শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য সেনগুপ্ত
„ অন্নদাশংকর রায়
„ পরিমল গোস্বামী
„ প্রবোধকুমার সান্যাল
„ প্রেমেন্দ্র মিত্র
„ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)
„ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
„ বিশ্বপতি চৌধুরী
„ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
„ সরোজকুমার রায়চৌধুরী
শ্রীযুক্তা শান্তাদেবী
„ সীতাদেবী ।

৺সজনীকান্ত এবং শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ নিজেদের বিষয় ছাড়াও আরো বহু জ্ঞাতব্যের উত্তর দিয়ে উপকৃত করেছেন। শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের লেখা দুটি ব্যক্তিগত পত্র স্বাধীন ব্যবহারের অধিকার দিয়ে আরো চরিতার্থ করেছেন।

আরো নানা সূত্র থেকে তথ্য এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি সংগৃহীত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দাক্ষিণ্য প্রকাশে বাধিত করেছেন :—

শ্রীযুক্ত অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় (দার্জিলিং)
অধ্যাপক „ অশোকবিজয় রাহা (বিশ্বভারতী)
অধ্যক্ষ „ অসীমকুমার দত্ত (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
অধ্যাপক „ কনক বন্দ্যোপাধ্যায় (স্কটিশ-চার্চ কলেজ)
শ্রীযুক্তা করবী বন্দ্যোপাধ্যায় (বনফুল-কন্যা)
শ্রীমান্ করুণাময় মজুমদার (কলকাতা)
শ্রীযুক্তা কেয়া বন্দ্যোপাধ্যায় (বনফু-কন্যা

অধ্যাপক শ্রীমান্ জীবনকৃষ্ণ চৌধুরী (বিশ্বভারতী)
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন (কলকাতা)
অধ্যাপক শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী (দার্জিলিং)
" শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার ঘোষ (দার্জিলিং)
শ্রীমান্ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (কলকাতা)
শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ঘটক (")
" সতীন্দ্রনাথ সান্যাল (দার্জিলিং)
" সনৎ গুপ্ত (কলকাতা)
শ্রীমান সুবীর রায়চৌধুরী (হাওড়া)
হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (")

এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত প্রবোধ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু গুহ প্রভৃতি।

পুস্তক ব্যবসায়ের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এবং বেঙ্গল পাব্লিশার্স-এর নিকটেও লেখকের ঋণ অপরিসীম।

এঁদের সকলের উদ্দেশ্যে আমার চরিতার্থ মনের বিনম্র স্বীকৃতি জ্ঞাপন করি।

সবশেষে উল্লেখ করতে হয়, এই গ্রন্থ রচনায় একান্ত আগ্রহে প্রবর্তিত করেছিলেন মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেডের কর্ণধারযুগল শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র বসু এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য। দীর্ঘদিন ধরে এই অপরিমাণ লেখার বোঝা তাঁদের বইতে হয়েছে। মধ্যপথে লেখকের ব্যক্তিগত অক্ষমতায় এক বছর ধরে ছাপা বন্ধ হয়ে থাকার ক্ষতিও নীরবে না হোক্, সহ্য করেছেন। এঁদের উদ্দেশ্য বিন্দুমাত্রও যদি সফল হয়ে থাকে, তবেই লেখকের শ্রম সার্থক হবে।

বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির পাঠকদের সামান্যতম অনুরক্তি লাভও যদি সম্ভব হয়, সে উপরি পাওনা হবে লেখকের জীবনে অমূল্য সম্পদ।

সূচীপত্র

বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার

প্রথম অধ্যায়

ছোটগল্প, গল্প

[১]

সব গল্পই ছোটগল্প নয়; এমন কি আকারে ছোট হলেও গল্প সব সময়ে ছোটগল্প হয়ে ওঠে না। সাহিত্য-সমাজের সে এক স্বয়ম্পূর্ণ, স্ব-তন্ত্র সামাজিক। তাহলেও ছোটগল্প-ও মূলতঃ গল্প-ই,—এই বিশেষ ধরণের 'নির্মিত'-কেও জন্মসূত্রে গল্প-সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে হয়।

গল্প বলার ইতিহাস মানুষের ইতিহাসের মতই সুপ্রাচীন। যাযাবর মানুষের মনে প্রথম যেদিন কথার অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল,—সেই কথাকে যেদিন তারা প্রথম রূপ দিতে পেরেছিল ভাষার মধ্যে,—মানুষের গল্প বলার আকাঙ্ক্ষা সেই আদিম দিনের।[১] তারপরে মানুষের নন্দন-সাধনায় গল্প রচনা ও গল্পের বাসনা দিনে দিনে একাগ্র হয়েছে। আজও গল্প-সাহিত্যের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি ও ব্যাপক।

কিন্তু গল্প-প্রীতির একমেবাদ্বিতীয় এই প্রাধান্য আর চিরন্তনতা অকারণ নয়: গল্প-সাহিত্য মানব-জীবনের উজ্জ্বলতম দর্পণ। আদিম কাল থেকেই মানুষের ইতিহাস অতন্দ্র আকাঙ্ক্ষায় একটিমাত্র সাধনা করে আসছে; সে আকাঙ্ক্ষা নিজেকে উপলব্ধি করবার,—নিজের সম্পূর্ণ পরিচয় আবিষ্কারের। 'আত্মাকে উপলব্ধি করো'; 'নিজেকেই জানো';—পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্ত্রের এটি মৌল নির্দেশ। তাহলেও মানুষের আত্মপরিচয় আজও তার জ্ঞান-গোচর হয়নি। বিশ শতকের বুদ্ধিদীপ্ত কবি-মন পরিণত প্রৌঢ়াতে পৌঁছেও বিশ্বজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞানের দীনতার জন্য আক্ষেপ করেছে।[২] জ্ঞান দিয়ে নিজের নিঃশেষ পরিচয় জানা যায় না। আত্ম-সন্ধিৎসু মানুষ তাই দ্রষ্টার আসন ছেড়ে স্রষ্টার ভূমিকা দখল করেছে। নিজেকে যতটুকু জানা যায়, এবং আরো যতটুকু জানা যায়নি,—এই উভয়কে কল্পনার অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গেঁথে খণ্ড জীবনের অখণ্ড রূপ রচনা করেন মানব-শিল্পী। বস্তুতঃ নিজের মধ্যেকার অপূর্ণজ্ঞাত 'খণ্ড'কে অখণ্ড-সম্পূর্ণ

১। দ্রষ্টব্য:—'Masterpiece Library of Short Stories'. Vol. I.—'The Early Story-Tellers'.

২। দ্রষ্টব্য—রবীন্দ্রনাথ—'ঐকতান' (কবিতা)।

করে দেখবার সদাব্রত নিয়েই আবহমান কালে এগিয়ে চলেছে আমাদের শিল্প-সভ্যতা-সাহিত্যের,—এবং এমন কি, দর্শন-বিজ্ঞানেরও ইতিহাস।

সন্দেহ নেই, নিজেকে খুঁজে-ফেরা জীবন-সন্ধানী মানুষের এই নিরবধি সৃজন-ধারার সবটুকুই বাস্তব নয়; তবু 'আপন মনের মাধুরি মিশায়ে' যে আত্মপরিচয় সে সৃষ্টি করে, ঐটুকুই তার সবচেয়ে মনের মত। আর মনের চরিতার্থতার মধ্যেই তো আনন্দের উৎস। অন্যপক্ষে আনন্দের অনিবার্য আকাঙ্ক্ষাই নন্দন-শিল্পকে চিরপ্রবহমান করে রেখেছে। অতএব সাধারণভাবে একথা বলতে বাধা নেই যে, সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে পূর্ণ-বিধৃত করে দেখবার আনন্দ-বাসনা থেকেই স্রষ্টার মনে শিল্প-শৈলীর জন্ম।

এদিক থেকে সাহিত্য-কর্ম মাত্রই মানব-আত্মার নিজেকে দেখার আয়না। তাহলেও আগেই বলেছি, জীবন-বিম্ব বাঁধায় সাহিত্য-সমাজে গল্পের দর্পণই উজ্জ্বলতম,—নিজের পুরো প্রতিচ্ছবিকে মানুষ মনের মত করে পেতে পারে গল্পের আধারেই। সাধারণ দর্পণের কাছে মানুষের দুটি প্রধান দাবি:— ১। যত বিচিত্র, আর নিত্য-নব সাজেই এসে ধরি না কেন নিজেকে, আয়না যেন প্রতিটি পলকে নূতন রূপকে পর্যায়ক্রমে প্রতি-চিত্রিত করতে পারে। ২। তাছাড়া আয়নার বুকে প্রতিটি বিম্ব যেন হতে পারে যথাযথ,—বাস্তব। নিজের সে-রূপকে নিজের চোখে দেখতে পাই না, তাকে আয়নার মধ্যে প্রতিফলিত করে নিজেকে দেখি,—নিজেকে জানার অমিশ্র শুদ্ধ আনন্দটুকু যেন পাই। সাহিত্যের জগতে গল্প-সাহিত্য সবচেয়ে অনায়াসে, হয়ত সবচেয়ে বেশি পরিমাণেও মানুষের এই দাবিকে পূরণ করতে পেরেছে। প্রধানত এই কারণেই গল্প বলা ও শোনার আকাঙ্ক্ষা মানুষের স্বভাবে এমন আদিম এবং আমূল। সোমারসেট মম বলেছেন: "......The desire to listen to stories appears to be as deeply rooted in the human animal as the sense of property."[১]

মানব-মনে গল্পের আদরের প্রধান উৎস হল, জীবনের বিচিত্র রূপ যত ব্যাপক ও সম্পূর্ণভাবে এতে বিম্বিত হতে পারে,—আর কোনো সাহিত্যিক রূপায়ণে তা প্রায় অসম্ভব। জীবনের স্থূলতম কামনা থেকে অস্ফুট বেদনা, দীপ্ত বীরগাথা থেকে কল্পনা-মথিত লোক-কথা, নির্জীব বর্ণনা থেকে নাটকীয় জীবন সংঘাত-চিত্র,—গল্প-সাহিত্যের আধারে সব কিছুই সমান দক্ষতার সঙ্গে গড়ে তোলা সম্ভব। বিশেষজ্ঞের ভাষায়— "......it is a form of literature which includes all the other forms: poetry, drama, history, biography, science, sociology, politics,

১। W. Somerset Maugham—'Ten Novels and their authors'—'The Art of Fiction'.

adventure, religion and art".[১]—একথা কেবল আধুনিক কথাসাহিত্য সম্বন্ধেই সত্য নয়, সকল কালের গল্প-শিল্প সম্বন্ধেও প্রায় সমান সত্য।

তাছাড়া আগে দেখেছি, গল্পের মুকুরে মানব-মনের প্রতিবিম্বন সুগভীর না হলেও প্রাঞ্জলতম হতে পারে। কবিতার মত ভাব-ঘন রচনায় জীবন-রহস্যের একটি নিবিড় ব্যঞ্জনা নিঃসন্দেহে আভাসিত হয়। কিন্তু প্রতিদিনের চোখে-দেখা আটপৌরে মানুষটি তার দেহ-মন আত্মার অনায়াস-বেদ্য রূপ নিয়ে প্রতিভাসিত হতে পারে কেবল গল্পেরই মধ্যে। Edgar Allen Poe গল্পের এই বিশেষ স্বভাবকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন: "We have said that the tale has a point of superiority over the poem. In fact while the rhythm of this latter is an essential aid in the development of the poem's highest idea,—the idea of the 'Beautiful',—the artificialities of this rhythm are an inseparable bar to the development of all points of thought or expression, which have their basis in 'Truth'. But truth is often, and in a very great degree, the aim of the tale. Some of the finest tales are the tales of ratiocination. Thus the field of this species of composition, if not in so elevated a region on the mountain of Mind, is a table-land of far vaster extent than the domain of the mere poem."[২]

'সুন্দর'কে না হলেও মানুষের 'সত্য' রূপকে প্রতিবিম্বিত করেছে,—এখানেই গল্পের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। 'সুন্দরে'র জন্যে মানুষের আকাঙ্ক্ষা সুপ্রাচীন, কিন্তু 'সত্যে'র প্রতি তার পিপাসা আদিমতর,—অন্তরে আমূল। আসলে, 'সত্য'-চেতনা থেকেই মানুষের ইতিহাসে 'সুন্দর'-চেতনার জন্ম। যাযাবর মানুষ দুর্গম বনে পথ চলতে গিয়ে স্ফটিক-স্বচ্ছ জলাশয় দেখে বিস্মিত হয়েছে। অজ্ঞাত-পূর্ব এই রহস্যের সন্ধানে যখনই কাছে ছুটে গেছে, তখন স্বচ্ছ জলের মুকুরে আদিম নর-নারীর যুগলরূপ যুগল কমলের মত ফুটে উঠেছে। প্রথম মুহূর্তের নির্বাক পুলকে নিশ্চয়ই তারা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখনই সেই অ-পূর্বদৃষ্ট যুগল মুখে নিজেদের যুগ্ম-রূপের প্রতিবিম্বকে খুঁজে পেয়েছে, তখনই প্রথম আত্মপরিচয়ের অপার আনন্দে হেসে হয়েছে কুটিকুটি। আদিম নর আবিষ্কার করেছে,—নারীর হাসি কত অপরূপ—কত সুন্দর, নারী জেনেছে পৌরুষের আনন্দিত দীপ্তি কত উৎসাহে উজ্জ্বল। নিজেদের সত্যরূপকে আবিষ্কার করতে পারার সঙ্গে সঙ্গে 'সুন্দর'-এর অনুভবকেও তারা খুঁজে পেয়েছিল সেদিন। মানুষের ইতিহাসে 'সুন্দর' 'সত্যের' অনুগামী।

১। H. Thomas and D. L. Thomas—'Living Biographies of Famous Novelists' Introduction

২। E. A. Poe—'Nathaniel Hawthorne'.—'Works of E. A. Poe.', Vol. III.

তাহলেও সত্যের সবটুকুই কেবল সুন্দর নয়। স্বচ্ছ জলের মুকুরে, —এবং আরো পরে নিজ নিজ মনের গহনে আদিম নারী-পুরুষ যেদিন পরস্পরকে প্রথম আবিষ্কার করেছিল, সেদিনকার জীবন-পরিবেশে অনপনেয় হয়েছিল বন্যতা আর স্থূলতা, আত্ম-আবিষ্কারের পদে পদে সেদিন তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে পর্যায়বদ্ধ অভিঘাতের বিরোধিতা। শুধু সেকালেই নয়,—আঘাতের তরঙ্গসংকুলতাকে পেরিয়েই চিরদিন পৌঁছুতে হয় নিশ্চিত প্রত্যয়ের আলোক-লোকে। কিন্তু জীবনের স্থূল ঘাত-প্রতিঘাত থেকে কবিতা কেবল সৌন্দর্য-সারটুকু আহরণ করে নেয়; জীবনের অনুভব তাতে গভীর হলেও পূর্ণ-বিচিত্র নয়। বেদে অগ্নিমন্ত্র উচ্চারিত হতে দেখি :

"আমি অগ্নিকে বন্দনা করি, যজ্ঞের মহাপুরোহিত, মন্ত্রণাদাতা দেবতা, হোতা, রত্ন-ধাতা [অগ্নিকে বন্দনা করি]।"

"অগ্নির মাধ্যমে লোকে সম্পদ লাভ করে থাকে, দিনে দিনে তা বৃদ্ধি পায় [তিনি] যশোস্বরূপ; বীরবত্তম।"

"হে রাত্রিনাশক দেবতা, অগ্নি, আমরা প্রতিদিন সভক্তি প্রার্থনা নিয়ে তোমার কাছে উপনীত হই।"

"যজ্ঞের অধিদেবতা, শাশ্বত নীতির রক্ষক, দ্যুতি-স্বরূপ, তোমার স্বমণ্ডলে পরিবর্ধিত হয়ে চলেছ।"

"পুত্রের নিকট পিতা যেমন, হে অগ্নি, তেমনি তুমি আমাদের পক্ষে সহজগম্য হও,—আমাদেরই স্বস্তির জন্য।"[৬]

অগ্নির মধ্যে অপরাজেয় শক্তির অংশ খুঁজে পেয়েছিলেন আর্য-পিতামহরা। অগ্নি স্ব-প্রকাশ, অগ্নি পাবক,—অগ্নির এই শুদ্ধ স্বভাবকে ওপরের মন্ত্র-কবিতাগুচ্ছে তাঁরা বন্দনা করেছেন 'সুন্দরে'র ভাষায়। কিন্তু অগ্নির এই মহাশক্তিধর স্বভাবকে কোনো একদিনেই মানুষ অধিগত করে উঠতে পারেনি। বহু দুঃখে,—অপার বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে দিনের পর দিনের অভিজ্ঞতায় অগ্নির ভীষণ-সুন্দর রূপ ধীরে ধীরে তাদের আয়ত্ত হয়েছে। আর্য মানবকের জীবনে অগ্নির বিচিত্র-সর্পিল পরিচয় আবিষ্কারের ইতিহাস ঋগ্‌বেদের এক অদ্ভুত গল্পে 'সত্য'রূপ পেয়েছে :

"সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি ছিলেন একক। তিনি ভাবলেন,—'কি করে আমি

৬। ঋগ্‌বেদ—প্রথম মণ্ডল (১, ৩, ৭-৯ সংখ্যক শ্লোক; লেখক-কৃত অনুবাদ)

নিজেকে পুনঃ-সৃষ্ট করব,—অর্থাৎ, আমারই মধ্য থেকে নিত্য-নূতন আরো সৃষ্টি হবে কী করে ?'

"তিনি স-শ্রম যজ্ঞানুষ্ঠান করলেন, তিনি নিজ মুখ থেকে অগ্নিকে জন্মদান করলেন। প্রজাপতির মুখে অগ্নির জন্ম,—তাই তিনি অন্ন-বুভুক্ষু।"

"সকলের আগে। 'অগ্রে'। তার সৃষ্টি, তাই তিনি অগ্নি।"

* * * *

"প্রজাপতি ভাবলেন, 'অগ্নির মধ্যে আমি এক অপার বুভুক্ষার সৃষ্টি করেছি; কিন্তু আমি ছাড়া খাদ্য তো কিছু উপস্থিত নেই।' [এই পৃথিবী তখনো ছিল তৃণ-গুল্ম-বৃক্ষহীন রুক্ষতায় আচ্ছন্ন]। প্রজাপতি ভাবলেন,—'অগ্নি তো আর আমায় খেতে পারে না!' "

"এমন সময়ে মুখব্যাদান করে প্রজাপতির প্রতি ফিরে তাকালেন অগ্নি। প্রজাপতি তখন ভয়ে আত্ম-সংবিৎ হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি অগ্নির উদ্দেশ্যে স্ব-সম্ভূত আহুতি রচনা করতে চাইলেন। দুটি হাতের চেটো জোরে ঘষতে লাগলেন,—উভয় হস্ত থেকেই উদ্ভূত হল ঘৃত নয়,—কেবল দুগ্ধ।"

"সেই দুগ্ধ ছিল হস্ত-লোমাচ্ছন্ন; প্রজাপতি তাই তৃপ্ত হতে পারলেন না। তবু বললেন, 'অগ্নি, জ্বলতে জ্বলতে এই আহুতি পান করো ['ওষম্ ধায়']।' সেই আহুতির ফলে অগ্নি থেকে জন্ম নিল ওষধি,—আর জীবের হস্ততল হল নির্লোম। প্রজাপতি দ্বিতীয়বার হাত দুটি ঘষলেন; এবার আর লোম নেই;—কিন্তু দুটি হাত থেকেই প্রবাহিত হল ঘি নয়,—দুধ।

"এবার প্রজাপতি পরিতৃপ্ত হলেন। তিনি ভাবলেন,—'দেবো কী এই দুধ আহুতি ?' তার 'স্ব'-চেতনা তখন আবার উদ্বোধিত হয়েছে,—তিনি 'স্বাহা' বলে এবারে আহুতি দিলেন। এই কারণেই আহুতি দানের মন্ত্র হয়েছে 'স্বাহা'। এই দ্বিতীয় আহুতি প্রদানের পরে জাজ্বল্যমান সূর্য এবং বহমান পবন উদ্ভূত হলেন,—তাঁদের প্রভাবে অগ্নি এবারে [প্রজাপতির প্রতি] বিমুখ হলেন।

"এইরূপে আহুতি দিয়ে প্রজাপতি নিজেকে পুনঃ সৃষ্ট করলেন।—মৃত্যুময় লেলিহান অগ্নি-শিখা থেকেও করলেন আত্মরক্ষা। এইরূপে, এই তত্ত্ব জেনে, যিনি অগ্নিহোত্র দান করেন, তিনি প্রজাপতির মতই লেলিহান অগ্নি-শিখার হাতে মৃত্যুলাভ করেন না, আর প্রজাপতির মতই [নবজাতকের মধ্যে] পুনর্জাত হতে পারেন।"

······"এবারে ত্রি-বিক্রম,--অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য জাত হলেন। যে-কেউ এই বীর-ত্রয়কে উপলব্ধি করতে পারেন,—তাঁরই বংশে [এদের মত] বীর জন্মগ্রহণ করে থাকে।

"এই বীরত্রয় বললেন, 'আমরা প্রজাপতির পরাগত,—তাঁর পুত্র। এবারে আমাদের পরে আরো কিছু সৃষ্টি করব আমরা।'—তাঁরা গায়ত্রীমন্ত্রে প্রজাপতির বন্দনা করে পূর্বাভিমুখে যাত্রা করলেন।"

"পথে একটি গরু'র সামনে এসে পড়লেন তারা। 'হিন' —এই সাম ধ্বনির দ্বারা সে তাদের সম্ভাষণ করলে। ···"

"তারা বললেন,- 'এখানে আমরা যা সৃষ্টি করেছি, আর যারা গরু সৃষ্টি করেছেন, —পুণ্যবান তাঁরা। গরু যজ্ঞরূপা,---গরু ছাড়া আহুতি হতে পারে না যজ্ঞে। খাদ্যরূপা এই গরু, -বস্তুতঃ গরুই ত রয়েছে সকল খাদ্যে'।"

*

"এখন অগ্নি গরুর সঙ্গে মিলিত হলেন, গরুর মধ্যে তার বীজ দুগ্ধ-রূপে ক্ষরিত হতে লাগল। সদ্য-দোহিত দুগ্ধ তপ্ত; কারণ সে যে অগ্নি-বীজ। আর এই কারণেই, লাল বা কালো যে-কোনো রঙেরই গরু হোক না কেন,—দুধ সর্বদাই আলোক-সন্নিভ শ্বেত বর্ণ।"৭

আদি-অন্তে যোগহীন প্রায় নিরর্থক অদ্ভুত এই গল্প। প্রতীচ্য পণ্ডিতদের কেউ কেউ একে 'নির্বোধের যথেচ্ছ-কথন' বলতেও কুণ্ঠিত হননি। অথচ কিম্ভূত এই গল্পের আধারেই নিভৃতে বিম্বিত হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক আর্য-জীবনের যথার্থ 'সত্য'-রূপ। মানব সভ্যতার আদিমতম পর্যায় প্রস্তরযুগ নামে পরিচিত। সেদিক থেকে আর্য ইতিহাসের একেবারে গোড়ার স্তবকে বলা যেতে পারে অগ্নি-যুগ। বৈদিক আর্যেরা সাগ্নিক ছিলেন। অগ্নিকে সহযাত্রী করে তারা পথ চলতেন; গৃহ-কোটরকে আলোক-পবিত্র করে নিতেন অগ্নি-শুদ্ধ করে। অগ্নিতে সিদ্ধ হয়ে তাদের খাদ্যাদি সহজপাচ্য স্বাদুতা লাভ করত,—আর্য-পিতামহদের কর্ম ও ধর্ম সাধনার বেদীপীঠ রচিত হয়েছিল অগ্নিকুণ্ডে।

এদিক থেকে অগ্নির অধিকার আয়ত্ত করে প্রাগৈতিহাসিক আর্যগণ নূতন মূল্যের আলোকে জীবনকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। তাতে দৈনন্দিন জীবযাত্রাই কেবল সুগম আর সুখকর হয়েছিল না,—নূতন জ্ঞানের আলোকও হয়েছিল সম্পাতিত। তাহলেও স্মরণ রাখতে হবে, অগ্নির আবিষ্কার ও তাকে আয়ত্ত করার এই ইতিহাস আর্যগণের পক্ষে একেবারেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। অকস্মাৎ যেদিন প্রথম অগ্নি-সাক্ষাৎকার ঘটেছিল, সেদিনকার প্রায় একমাত্র প্রবল জিজ্ঞাসা ছিল,—এই মারিস্বরূপ লেলিহ-শিখাকে

৭। 'ঐতরেয় (ঋক্) ব্রাহ্মণ'- চতুর্থ কাণ্ড (লেখক-কৃত অনুবাদ)।

নির্বাপিত করা চলবে কী করে! বনে-প্রান্তরে,—গৃহবাসে বা পথ-সংবাহনে জ্বালাময় দাহ্যতার বিভীষিকা নিয়েই অগ্নির মৃত্যুরূপী প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল।

আর্য-মনীষা সেই মহামৃত্যুকে নবজীবনে পুনরুজ্জীবিত করেছিল। প্রজাপতির কাহিনীকে কেন্দ্র করে আর্য-শিল্পী জাতির অন্তর্নিহিত সেই প্রাজাপত্য শক্তির বিস্ময়স্মিত প্রকাশকেই সংবর্ধিত করেছেন ওপরের গল্পে। অগ্নির দাহিকা শক্তিকে প্রতিরুদ্ধ করতে বায়ুর নির্বাপণ-ক্ষমতাকে তাঁরা আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন,—সূর্যের দাহহীন তাপ ও আলোক-ধারায় নিষ্ণাত হয়ে অগ্নির অনিবার্যতাকে করতে পেরেছিলেন অস্বীকার,—সূর্য আর অগ্নিকে উপলক্ষ্য করে তাঁরা অনুভব করেছিলেন পাবনী-শক্তির বিচিত্র রূপাবলীকেও।

সেই সঙ্গে, অগ্নিযুগের জ্ঞান প্রকাশের কোনো এক পর্যায়ে, পশু-ঘাতনের বদলে পশু-পালনের কলা-কর্মও তাঁরা ক্রমশঃ আয়ত্ত করে নিয়েছেন। তখন অনায়াসে বোঝা গেছে,—গো-মাংসের তুলনায় গো-দুগ্ধ আরো কত অমৃতস্বাদ!

প্রস্তর যুগের রুচ্ছ্রতাময় কঠিন জীবনযাত্রার পরে অগ্নি-স্নাত এই আর্য সভ্যতা ঋগ্-বেদের যুগেই ক্রমশঃ স্নিগ্ধ, শান্ত, সৌম্য রূপ লাভ করতে আরম্ভ করেছিল। বহু প্রকারের ক্লেশ-বরণ, আর সকল দুঃখের মুক্তিদাতা সেই পরমা-সিদ্ধিলাভের আনন্দ-ইতিহাসকে সেকালের কথাসাহিত্যিক অখণ্ড রূপ দিয়েছেন ওপরের গল্পে। প্রথমে উদ্ধৃত স্তোত্র-কবিতাবলী অগ্নিপূত মানব-সভ্যতার চরিতার্থ কৃতজ্ঞতার বাণীকে উদ্গীত করেছে গম্ভীর-'সুন্দর' স্বরে। কিন্তু পরের গল্পটি বিশ্ব-মানবের অগ্নিলাভের 'সত্য' ইতিহাসকে, অপেক্ষাকৃত ভার-ভাবে ও ভাষায় হলেও,—আদি-অন্তে সম্পূর্ণ চিত্রিত করেছে। এই অর্থেই বলেছি,—গল্প-সাহিত্য মানব-জীবনের অখণ্ডপূর্ণ প্রতিবিম্ব।

[১]

এবারে প্রশ্ন হতে পারে,—এই ধরনের অদ্ভুত আদিম গল্প ছোটগল্পের কলা-কর্মকে মোটেই প্রভাবিত করতে পারে কী? রূপ-প্রকরণের বিচারে গল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে ছোটগল্প সর্বকনিষ্ঠ। কেবল আধুনিক কালের সৃষ্টি বলেই ছোটগল্পের দেহ-মনে নিতান্ত তথ্য-জ বাস্তবতাও অপরিহার্য উপাদানের মত ছড়িয়ে আছে। অথচ আমাদের সদ্য আলোচিত গল্পটি কেবল অবাস্তব নয়,—অসম্ভব এবং আজগুবি-ও।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই স্মরণ করি,—বাস্তবতার অনুভব ও উপাদান সব সময়েই নিতান্ত আপেক্ষিক। দেশ-কাল-পাত্রের বিবর্তনের সঙ্গে বাস্তবতার ধারণারও পরিবর্তন ঘটে।

বাস্তব জ্ঞানের প্রত্যক্ষ অবলম্বন বস্তুগত অভিজ্ঞতা। অন্যপক্ষে ইতিহাসের প্রত্যেক পর্যায়েই জীবনের বস্তুময় পটভূমি দেশে এবং কালে কেবলই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। ওপরের বৈদিক গল্পে আর্য পিতামহদের বাস্তবিক জীবন-সমস্যারই একটি আভাস ব্যঞ্জিত হতে দেখেছি। অথচ একালের দৃষ্টিতে এমন জীবন-পটভূমির কল্পনা করাও বাতুলতা। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে জীবন-স্বভাবের এই আমূল পরিবর্তন নিতান্ত স্বাভাবিক। অত দূরের কথা ছেড়ে দিয়ে অতি কাছের 'পথের দাবী' উপন্যাসের কথাই ধরা যাক। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের এই দীপ্ত কাহিনী অ-পূর্ব উত্তাপের সৃষ্টি করেছিল। অধুনাতন কালে কোনো বিদগ্ধ রস-বিচারক মন্তব্য করেছেন: আজ এ উপন্যাস পড়লে বিগত-প্রাণ জীবনের শ্মশান-শায়িত রূপটিকেই প্রত্যক্ষ করা চলে,—এবং বাস্তব জীবনের স্বাদে নয়,—ইতিহাসের কুক্ষিগত অতীত চর্বণ করতে পারার আনন্দই তার একমাত্র মূল্য। এ-ধরনের মতবাদ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, স্বাধীনতা-পূর্ব সংগ্রামের দিনে 'পথের দাবী'-র যে জীবনমূল্য ছিল,—আজ তা অনেকটা স্তিমিত এবং দূরগত হয়ে পড়েছে। সেদিনকার আবেগ ও বিশ্বাস, উদ্দীপনা ও বেদনায় ভরা চরিত্রগুলি একালের পাঠকের মনে কেবল কৌতুক আর বিস্ময়ই রচনা করতে পারে। এমন অবস্থায় গল্প-সাহিত্যের চিরন্তন রসরূপ লাভের পক্ষে সাধারণ বাধা দেখা দেয়। কারণ সমকালীন জীবনের বস্তুভূমির সঙ্গে গল্পের যোগ অন্তরঙ্গতম,—তথা অপরিচ্ছেদ্য।

সন্দেহ নেই, সকল সাহিত্যই জীবন-সম্ভব, সৃষ্টি-সমকালীন অব্যবহিত জীবনের সঙ্গে স্রষ্টার মানস-সংযোগের পরিচয় সকল সার্থক রচনাতেই কিছু-না-কিছু রূপ পায়। তাহলেও বিশেষ দেশ-কালের জীবন-ভূমিতে ভর করে সকল দেশ-কালের নির্বিশেষ রস-লোকে উত্তরণ করতে পারাতেই শিল্পের সার্থকতা। শেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যপ্রবাহ রেনেসাঁস-যুগের ইংলণ্ডের মর্ম-প্রেরণাকে আশ্রয় করে যেখানে সবকালের মানবিক সংবেদনাকে জয় করে নিয়েছে, সেখানেই তার সার্থক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথের অনেক বিখ্যাত গান ও কবিতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে উপলক্ষ্য করে রচিত হয়েছিল, আজও তাদের সাহিত্যিক স্বাদ ও দ্যুতি অম্লান। কারণ ঐ সব গীতি-কবিতা তাদের জন্মলগ্নের প্রেরণাকে অতিক্রম করে সর্ব-দেশ-কালের সঙ্গে অন্বিত হয়েছে দূরপ্রসারী ব্যঞ্জনায়। কিন্তু গল্প-সাহিত্যের পক্ষে এই উৎক্রমণ ও দূরাগতি দুঃসাধ্য হয়,—'পথের দাবী' নিজ সূতিকাগারের বন্ধন-পাশ ছিন্ন করতে পারে না।

এতে সুবিধা এবং অসুবিধা দুই-ই আছে। একদিকে দেখি,—গল্প-সাহিত্যিক সবচেয়ে অনায়াসে তাঁর নিজের দেশ-কালে জন-প্রীতির শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে থাকেন।

অথচ এমন ঘটনাও বিরল নয়, যখন যৌবনে সর্বাধিক খ্যাত গল্প-শিল্পীও পরিণত প্রৌঢ়ীতে পৌঁছে জনপ্রিয়তার জগতে অপাংক্তেয় হয়ে পড়েন। এমনটা যে ঘটে তার প্রধান কারণ, সমকালীন জীবনের বস্তু রূপটিকেই গল্প একান্তরূপে বিম্বিত করে থাকে। আর গল্প-দেহের মুকুরে যে-জীবনের ছায়া ধরা পড়ে, তার মূল কায়ারূপ দর্শকের মন থেকে তিরোহিত হয়ে গেলে ছায়াকে স্বভাবতই অর্থহীন, অসম্ভব বলে মনে হয়। কিন্তু গল্প-পাঠক যদি আপন বসদৃষ্টি নিয়ে সেই দূরগত জীবনের পরিচয়কে মুকুরবিম্ব থেকে উদ্ধার করতে পারেন, তাহলে অসম্ভব গল্প-ও নবীন জীবনার্থের ব্যঞ্জনায় মধুময় হয়ে ওঠে। এ-বিষয়ে একালের ছোটগল্প-পাঠকেরও দায়িত্ব কম নয়। কারণ গল্প বলেই ছোটগল্পেরও প্রধান আকাঙ্ক্ষা,—নিজ দেহ-সীমায় সমকালীন বস্তু-জীবনের সফলপূর্ণ বিম্ব-রচনা। সকল গল্পই তার নিজের কালের জীবনকে ছায়ারূপে বক্ষে ধারণ করে আছে,—গল্প-শৈলীর ঐটুকুই প্রকরণগত স্বাতন্ত্র্য। এই কারণেই অসার্থক প্রাচীন গল্পে সাহিত্যিক রস দুর্লভ যদি হয়ও,—তবু জীবনের ঐতিহাসিক রূপ-পরিচয়ের স্বাদ থাকে একান্ত হয়ে। আবার যথার্থ সাহিত্য-স্বাদী গল্পেরও রস-উৎস নিহিত থাকে ঐতিহাসিক জীবন-চিত্রের বিম্ব-রচনায়। এই অব্যবহিত জীবন-সংযোগের মৌল ধর্মেই আধুনিক ছোটগল্প-ও আদিম গল্পের সমশ্রেণীভুক্ত। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সূত্র বেয়েই সেকালের গল্প একালের সাহিত্যেও স্থান পেয়েছে; কেবল বিশ্বাসযোগ্যতার মান ও পরিমাণ অনুযায়ী সেকালের বড়দের গল্প একালের শিশুদের উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "The imagination of the savage and the child are partly of the same power and quality. They float in a world of wonder in which the wildest wishes become realities and the most impossible fancies wear the look of truth, especially when they are given form and substance by the art of story-teller. But what is only a charming entertainment to our children, was often a solemn belief to our barbaric forefathers, two thousand years ago." ৮ গল্প-শৈলীর উৎকর্ষের স্বতন্ত্র স্বভাব নির্ণয়ের জন্য পাঠকের বিশ্বাস-প্রবণতা ['solemn belief'] এবং শিল্পীর কলা-কৌশল ['art of the story-teller']-এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের একটি পূর্ণ পরিচয় আবিষ্কার করা প্রয়োজন।

এক অর্থে গল্পমাত্রই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার শিল্পকর্ম। সকল গল্পই নিঃসন্দেহে বস্তুনির্ভর, কিন্তু কোনো গল্পই একেবারে বস্তুমাত্র-সর্বস্ব নয়। অন্যান্য সকল কলা-রূপের মত গল্প-সাহিত্যও মানুষের অভিজ্ঞতা ও আশা-কল্পনার বিমিশ্রতায় রচিত। একেবারে

৮। 'Masterpiece of Short Stories' Vol. I.—'The Early Story Tellers'.

শুরুতেই দেখেছি—জীবনের পূর্ণ পরিচয় মানুষের জ্ঞানগম্য নয়; আর সেই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করবার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই মানুষ স্রষ্টার আসন গ্রহণ করেছে। বস্তুতঃ কেবল শিল্পে-সাহিত্যেই নয়, বাস্তব জগতেও মানব-জীবনের সূচনা অজ্ঞাত রহস্যময় কোনো এক শিল্পীর হাতের দান,—কিন্তু তার বিকাশ ও পরিণাম মানুষের নিজের হাতের রচনা। সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে মানব-শিশুকে তার স্রষ্টা এক অপার বিরুদ্ধতায়-ভরা বিশ্বের সামনে এনে উপস্থিত করেছিলেন। প্রথম মানবককে তাই জন্মলগ্ন থেকে বিরুদ্ধ প্রকৃতি ও শ্বাপদ-শক্তির প্রতিপক্ষে লড়ে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে। ওপারের বৈদিক গল্পে আদিম মানুষের সেই মৃত্যু-বিজয়ের কাহিনী আভাসে ব্যক্ত হয়েছে। তারপরে সভ্যতার ইতিহাস ধাপে ধাপে যত ব্যাপ্ত আর পরিণত হয়েছে, আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারের জন্য জীবন-যুদ্ধের পদ্ধতি ততই হয়ে উঠেছে জটিল। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জীবন-পিপাসু মানুষকে আজ আর কেবল প্রকৃতি আর পশু-জগতের সঙ্গে নয়, মানুষ-পশুর সঙ্গেও লড়তে হচ্ছে সমানে। ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা-দুর্ভিক্ষ-ভূকম্পন ত রয়েইছে, সেই সঙ্গে নিজেরই রচিত সমাজ ও রাষ্ট্র-সংগঠনের অমিতাচার বিক্ষেপ থেকেও তাকে আত্মরক্ষা করতে হচ্ছে,—এরই মধ্যে চলেছে তার আত্ম-প্রসার। জীবনের দুর্ভেদ্য এই দ্বন্দ্ব-ভূমিতে কখনো মানুষ জয়ী হচ্ছে,—কখনো ঘটছে তার পরাভব। জয়-পরাজয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-অধিকার মানুষের হাতে নেই। নিজের সম্বন্ধে এমন ত্রিশঙ্কুর মতো অনিশ্চয়তা মানুষের পক্ষে অসহ্য। আপন দ্বান্দ্বিক জীবনের ভবিষ্যৎকে সে অখণ্ড সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করতে চায়। এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই মানব-ইতিহাসের হাতে এসেছে গল্পের দর্পণ. তার সামনে দাঁড়িয়ে গল্পকার নিজের এবং নিজের কালের মানুষের জীবনকে ভাঙেন এবং গড়েন;—ভেঙে-গড়ে নিজের মনের মত করে করেন প্রতিফলিত। জীবনের অনিশ্চিত রূপকে নিশ্চিত করে দেখা,—অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারাই সকল কালের গল্পকারের শ্রেষ্ঠ ব্রত। রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে' গল্পকার শরৎবাবুকে আহ্বান করেছে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার মহা শিল্প-সাধনে! —

"বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রির অন্ধকারে
দেবতার কাছে যে অসম্ভব বর মাগি
সে বর আমি পাব না,
কিন্তু পায় যেন তোমার নায়িকা।"

অসম্ভবকে এমনি নিশ্চিত-সম্ভব করে রচনা করতে পারার ক্ষমতাতেই 'story-tellers' art'-এর যথার্থ সফলতা।

কিন্তু সম্ভব-অসম্ভবের মাত্রাজ্ঞান চিরকাল সমান নয়,—বস্তু-জীবনের ধারণার

পরিধি ও গভীরতার দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত। গল্পের মুকুরে নিজের কালের জীবনের প্রতিবিম্ব রচনা করেন গল্পকার ;—সে কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর হাতের হাতিয়ার। আর নিরবধি জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই অভিজ্ঞতা নিত্য-নূতন হয়ে সঞ্চিত হচ্ছে মানুষের দেহ-মন-বুদ্ধির আধারে। দেহের সঙ্গে মনের শক্তি ও বুদ্ধির দীপ্তি যত বাড়বে, গল্প-শিল্পীর হাতে হাতিয়ারের সঞ্চয়ও হতে পারে ততই বিচিত্র এবং সুদৃঢ়। সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষের মন-বুদ্ধির শক্তি ছিল অল্প। তাই লৌকিক জীবন-ক্ষমতার প্রকাশ হ্রস্ব ছিল বলেই সেদিনকার গল্প-লেখককে অলৌকিক জীবন-বিশ্বাসের হাতিয়ার ব্যবহার করতে হয়েছে এমন অবিরাম। কিন্তু জীবনের রূপ প্রকর্ষ শিল্পীর হাতিয়ারের গুণাগুণে নয় ;—মানব-ইতিহাসের মর্মোৎসারী সংগ্রামের তীব্রতা ও যথার্থতায়। সেই যথার্থ জীবন,—Edger Allen Poe-র ভাষায় 'Truth', —যেখানে গল্পের মুকুরে প্রতিফলিত হতে পেরেছে, অলৌকিক অতি-বাস্তবতা সত্ত্বেও গল্প সেখানে চিরন্তন শিল্পের মর্যাদা পেয়েছে। পৃথিবীর সুপ্রাচীন সাহিত্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত', 'Iliad' এবং 'Odyssey' এইরূপ চারখানি শাশ্বতি-ঋদ্ধ গল্প-গ্রন্থ। এ ছাড়া আরো অসংখ্য প্রাচীন গল্প রয়েছে, যারা কালোত্তীর্ণ রসের অধিকার দাবি করতে পারে না। তাহলেও সমকালীন বস্তু-জীবনকে আপন দেহ-মুকুরে যথার্থ বিম্বিত করার আকাঙ্ক্ষা এই সকল গল্পেই অল্প-বিস্তর আত্মগোপন করে আছে। পৃথিবীর আদিতম গল্প বলে পরিচিত রচনাটির মধ্যেও এই স্বভাবধর্ম সুস্পষ্ট।

গল্পটির রচনা-ইতিহাস সম্বন্ধে জানা যায়: "About 6800 years ago,—according to one method of reckoning—Khufu, or Cheops, the greatest of the pyramid-builders, was the lord of Egypt. Egypt was then a land with a high civilisation, a great school of builders and sculptors, and lovers of literature. It was Khufu's custom to call his sons round his throne and to bid them tell him tales of the old magicians. The stories were recorded in their present shape by a scribe who lived about 3459 B. C. ; but he attributes the first tale to King Khafri—the successor of Cheops and the second of the Pyramid-builders. Khafri may have reigned 1500 years before the scribe. Thus the modern short-story-teller may claim one of the most ancient King in the world as the father of his art,—one who lived long before Homer or any known poet."[৯]

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা উচিত,—এ পর্যন্ত যত গল্পের লিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে,

৯। তদেব।

তাদের মধ্যে প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপির গল্পকারও ছিলেন ইজিপ্‌ট্‌বাসী। এঁর নাম ছিল Annana ; প্রায় ৩২০০ বছর আগে এই গল্পটি লিখিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। মূল পাণ্ডুলিপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।[১০] কিন্তু Annana-র চেয়েও প্রাচীন, তথা পৃথিবীর প্রাচীনতম গল্প বলে কেবল Khafri-র গল্পেরই সার সংকলন করব :

রাজা খুফুর বাবা ছিলেন নেবুকা। দলবল নিয়ে নেবুকা একদিন তাহ্‌-এর মন্দিরে গিয়ে উপনীত হন। সেখানে রাজ-লিপিকার ও যাদুকরশ্রেষ্ঠ উবাউআনের তাঁর মন্দির দর্শনে সহায়তা করেছিলেন। যাদুকর-পত্নী দূর থেকে রাজ-পারিষদদের প্রতি লক্ষ্য করছিলেন,—প্রথম দর্শনেই একটি পারিষদের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। পরে পরিচারিকার হাতে মনোহর পরিচ্ছদের পসরা পাঠিয়ে তিনি ঐ পারিষদকে বরণ-সংকেত জানালেন। ক্রমে হ্রদের উপবনের নিভৃত জলগৃহে চলতে লাগল দুজনের অবিরাম অভিসার-মিলন। সারাদিন নবীন-প্রিয়ার সান্নিধ্য-চারণ করে রাজ-পারিষদ্ প্রতি সন্ধ্যায় তপ্ত দেহ শীতল করতেন হ্রদের জলে অবগাহন করে, আবার চল্‌তো উভয়ের নৈশ সংগম। জলগৃহের রক্ষক একদিন এই খবর জানিয়ে দিলে তার প্রভু যাদুকরের কাছে। উবাউ-আনের তখন মোমের একটি ছোট কুমীর গড়ে তুলে দিলেন পরিচারকের হাতে, বললেন : 'আজ সন্ধ্যায় রাজ-পারিষদ্ যখন স্নান করতে নাম্‌বে, তখন হ্রদের জলে ছেড়ে দিয়ো এই মোমের কুমীরকে।'

পরিচারক যথাসময়ে প্রভুর আদেশ পালন করল ; আর জলে পড়েই মোমের কুমীর জীবন্ত কুমীর হয়ে পারিষদ্‌কে নিয়ে জলের তলায় ডুবে গেল।

যাদুকর তারপরে আরো সাতদিন মন্দিরেই থেকে গেল রাজা নেবুকার সাহচর্যে। সাতদিন পরে রাজাকে সে ডেকে আনলো হ্রদের তীরে। উবাউআনের-এর আহ্বানে কুমীর এবার রাজ-পারিষদকে নিয়ে জলের তলা থেকে উঠে এল। যাদুকর তাকে স্পর্শ করতেই জীবন্ত কুমীর আবার মোমের ছোট্ট কুমীরটি হয়ে গেল। এবার যাদুকর পারিষদের বিরুদ্ধে নালিশ জানালো রাজার কাছে,—পারিষদ্ তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে। সব শুনে রাজা কুমীরকে আদেশ করলেন,—'তোমার জিনিস তুমি নিয়ে যাও।' অম্‌নি মোমের কুমীর জীবন্ত কুমীর হয়ে পারিষদ্‌কে নিয়ে আবার জলের তলায় ডুবে গেল।

এবার রাজ-আদেশে ডাক পড়লো যাদুকর-পত্নীর। বিচার-শেষে প্রাসাদের উত্তর দিকে তাকে নিয়ে গিয়ে দগ্ধ করা হল।

১০। বিস্তৃত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য :—'International Library of Famous Literature' Vol. I

এ' আর এক অর্থহীন অদ্ভুত গল্প। কিন্তু, এই গল্পেরও গহনে লুকানো আছে আদিম মিশরের জীবন-বিম্ব। বলা হয়েছে,[১১]—প্রাচীন মিশরে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে নারীর ছিল একচ্ছত্র সামাজিক প্রাধান্য। নারীই ছিল বিষয়ের অধিকারিণী ;—বিয়ের পরে পুরুষকে তার স্বোপার্জিত সম্পত্তিও স্ত্রীর হাতে সমর্পণ করে দিতে হত। অনুমান করা হয়েছে,—পশুমাংস-ভুক্ বর্বর যুগের অবসানে নারীই প্রথমে কৃষি-কলা আয়ত্ত করেছিল। সেই কৌশল গোপন রেখে পুরুষকে সে প্রলুব্ধ করে আনত ফল-শস্য-শ্যাম গার্হস্থ্য জীবনের বাতায়নে। ফলে বিবাহিতা নারী বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন না করেও বহুচারিণী হতে পারতো। প্রকাশ্যে বস্ত্র-সম্ভার পাঠিয়ে পর-পুরুষের প্রতি সে অনুরাগ প্রকাশ করতো। কৃষি-জীবনের ছত্রাতপ-মুগ্ধ মিশরীয় স্বামী সেদিন পত্নীর এরূপ ব্যভিচারকে বাধ্য হয়ে মেনে নিত। পুরুষের পক্ষে এই দুঃসহ অবস্থার অবসান হয় মিশরীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে। ঐ সময় থেকেই সেখানকার সমাজে পুরুষ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। রাজশক্তির সহযোগিতা ও দাক্ষিণ্যে অতদিন পরে মিশরীয় স্বামী পত্নীর বহু-চারণের প্রতিবিধান করবার স্বপ্ন দেখেছিল। রাজ-শিল্পী খাফ্‌রি সেই জীবন-স্বপ্নেরই প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন ওপরের গল্প-মুকুরে। মোমের কুমীর জীবন্ত হয়ে ওঠে কোন্ মন্ত্রবলে,—আলোচ্য গল্পের সেটি মূল কথা নয়। আদিম মিশরীয় পুরুষ একদিন যে-কোনো মন্ত্রবলেই হোক, নারীর স্বৈরাচরণের প্রতিবিধান করতে চেয়েছিল ; এই আকাঙ্ক্ষার প্রাণ-তপ্ত তীব্রতাতেই গল্পটির জীবন-মূল্য। খাফ্‌রি তাঁর গল্পের মূলীভূত জীবন-বাসনাকে সমকালীনতার গণ্ডী ভেদ করে সর্বকালের শিল্প-ভূমিতে পৌঁছে দিতে পারেননি,—এ-কথা সত্য। তাহলেও সমকালীন জীবনমুক্তির মৌল প্রেরণা থেকেই এই প্রাচীনতম গল্পটিরও জন্ম।

[৩]

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে গল্প-রচনার এই মৌল আকাঙ্ক্ষা প্রথম দেশ-কালোত্তীর্ণ রূপ পেয়েছিল আরো পরে;—প্রাচ্যে 'রামায়ণে', 'মহাভারতে', প্রতীচ্যে 'Iliad' এবং 'Odyssey'-তে। ঐসব গল্পেও অসম্ভাব্যতা সীমাহীন, অলৌকিকতার অবতারণা প্রায় নিরবধি। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের ত্রিভুবনে এই মহাকাব্য চতুষ্টয়ের গল্প স্বেচ্ছা-বিচরণ করে ফিরেছে। তবু সমকালীন জীবনের পূর্ণাঙ্গ ছবিটিকে এরা নিত্যকালের দরবারে পৌঁছে দিতেও পেরেছে। 'রামায়ণে'র গল্প আজও আমাদের মনকে অভিভূত করে। যাগযজ্ঞ, মন্ত্র-তন্ত্রের ছড়াছড়ি

১১। দ্রষ্টব্য :—'Masterpiece of Short Stories' Vol. I—The Early Story-Tellers

রয়েছে সে গল্পে। তাছাড়া তাড়কা রাক্ষসীকে রামচন্দ্র বধ করেছিলেন কিশোর বয়সে; হরধনু ভঙ্গ করে তবে তাঁর বিয়ে হল; সীতাকে তিনি গৃহলক্ষ্মী করে নিতে পেরেছিলেন পরশুরামকে পরাভূত করে তবেই। সব শেষে রাম বানর কটক নিয়ে জয় করতে গিয়েছিলেন সাগরপারের দশাননকে। রাবণের এক কাঁধে দশটা মাথা কি কৌশলে আটকেছিল, সমুদ্রে পাথর-পাহাড় ভেসেছিল, কোন্ মন্ত্রে বানরেরা গাছ-পাথর-পর্বত নিয়ে কেমন যুদ্ধ করেছিল, এসব জিজ্ঞাসার কৌতূহলকরতা একালের পাঠকের কাছে অনপনেয়। তা হলেও গল্প রসের চিরন্তনতা এতে ব্যাহত হয় না। রামের সঙ্গি-সহকারীদের ছাপিয়ে তার একক জীবনের অবিরাম অভিযান চিরন্তন মানুষের জীবনবিম্বকে প্রতিফলিত করেছে ক্ষণে ক্ষণে।

রাজার দুলাল কিশোর রাজপুত্রকে প্রাসাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে সুদূরে যাত্রা করতে হয়, রাক্ষস-বধের উদ্দেশ্যে। রাক্ষস কোন্ শ্রেণীর জীব, সুগভীর রসচেতনার পক্ষে তার বিবৃতি অপরিহার্য নয়। রামায়ণের কবি প্রথমেই পাঠকের মর্মে বিদ্ধ করেছেন ভয়-চকিত এই সংবাদ,—তারা ছিল মানুষের ভয়ানক শত্রু,—রামের মৃত্যুও ঘটতে পারত তার হাতে। এই ঘটনার পরে রামের জীবনে একের পর এক এসেছে মরণান্তিক অভিঘাত,—একের পর এক চলেছে তার সংগ্রাম। এমনি করে আজীবন অধরাকে ধরবার, দুর্জয়কে জয় করবার অতন্দ্র সাধনার শক্তিতে সংগ্রামী মানুষের ইতিহাসে রামচন্দ্র একচ্ছত্রতা লাভ করেছেন, তার জীবন-মুকুরে নিত্যকালের মানুষ নিজ নিজ জীবন-দ্বন্দ্বের প্রতিবিম্বটিকে প্রত্যক্ষ করেছে। 'রামায়ণের গল্প বাল্মীকির যুগের জীবন-বিশ্বাসের ফলকে নিত্যকালের যুযুধান জীবনকে প্রতিফলিত করেছে—এখানেই তার গল্প-তা; আর রসগত চিরন্তনতাও।

এ দেশের 'মহাভারত', এবং প্রতীচ্যের 'Iliad' আর 'Odyssey'-র শিল্প-স্বভাবও অভিন্ন। 'Odyssey'-র গল্প শুরু হয়েছে Ithaca-র রাজা Odysseus-কে নিয়ে। Ithaca গ্রীসে দূরতম প্রত্যন্তের দেশ। ট্রয়ের যুদ্ধে যত গ্রীক্ যোগদান করেছিল 'Odysseus-এর চেয়ে দূর দেশ থেকে আর কাউকে আসতে হয়নি। বেচারা Odysseus!—দেশ ছেড়ে আসবার সময়ে তার স্ত্রী Penelope ছিল অপরূপ সুন্দরী যুবতী,—একমাত্র ছেলে Telemacus ছিল নিতান্ত শিশু।

দীর্ঘ দশ বছরের পরে ট্রয়ের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। ট্রয়ের পতনের পরে Odysseus নিজের দলবল নিয়ে Ismarus দ্বীপ দখল করে;—লুটতরাজের ফলে সেখানে অনেক ধন-সম্পদ সঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে হঠাৎ Odysseus বিতাড়িত হল Ismarus থেকে। জাহাজে চড়তেই উত্তর বায়ু প্রখর হয়ে উঠলো;—Odysseus সদলে ছিটকে পড়ল Males দ্বীপে। সেখান থেকে উত্তরের পথে আরো ততটুকু এগিয়ে যেতে পারলে

Odysseus অনায়াসে পৌঁছে যেত Penelope আর Telemacus-এর কাছে। এবারে ঝড় উঠলো সব কিছু এলোমেলো করে। দশদিন ঝড়ের মুখে ছুটে জাহাজ এসে ভিড়লো Lotus-eater-এর দেশে। সে Lotus-এর বীজ একটিও খেয়ে ফেললে মানুষ তার অতীতকে বিস্মৃত হয়ে পড়ে। সেখান থেকে আত্মরক্ষা করে Odysseus-এর জাহাজ এবারে পৌঁছালো Cyclopes দ্বীপে। সেখানে স্বজন-ভুক্ দানব Polyphemus মারমুখী হয়ে ওঠে; Odysseus তাকে পরাজিত করে, একটা চোখও তার দেয় কানা করে।

Polyphemus ছিল সমুদ্র দেবতা Poseidon-এর ছেলে। রুষ্ট দেবতা দশ বছর ধরে সমুদ্রের ওপর গোলক ধাঁধায় ঘুরিয়ে মারেন বেচারা Odysseus-কে। আসলে Cyclopes থেকে Odysseus গিয়ে পৌঁছেছিল Aeolus-এ। সেখানকার সহৃদয় রাজা Ithaca-র অভিমুখী হাওয়াকে খুলে রেখে আর সকল দিকের বায়ুকে একটি ব্যাগ-এর ভেতর পুরে Odysseus-এর হাতে দেন। এবার দলবল নিয়ে সে নিরাপদে ফিরে চলল বাড়ির পথে। ক্রমে Ithaca-র পুণ্যভূমি অদূরে দেখা যেতে লাগল—দেশের মাটি এবার হাতের মুঠোয় এসে গেল বলে। এমন সময়ে অধীর উল্লাসে Odysseus-এর সঙ্গীরা বায়ুবদ্ধ ব্যাগের মুখ দিলে খুলে। বিপরীত বায়ু তৎক্ষণাৎ ঝড়ের বেগে জাহাজকে উড়িয়ে নিল নিরুদ্দেশের পথে। তারপরে দশবর্ষব্যাপী চলতে থাকে 'Odyssey' কাব্যের দুর্গমাভিসার।

"Iliad' কাব্যে গল্পের জীবন-বিস্তার, নাটকের তীব্র অভিঘাত, এবং কবিতার স্ফূর্তি একত্র হয়ে আছে। বিশুদ্ধ গল্পের আবেদন 'Odyssey'তেই বেশি, যেমন 'রামায়ণ' বেশি গল্প-রসঘন 'মহাভারতে'র তুলনায়। 'রামায়ণে'র মতো 'Odyssey-'তেও আদিম মানুষের অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস, হিংসা-বিজিগীষা, লালসা-বাসনা উদগ্র হয়ে আছে। তবু Odysseus-এর জীবনকেন্দ্রে সংগ্রামী মানুষের আশা ও ব্যর্থতা, বাসনা ও তিতিক্ষা, উৎসাহ ও অবসাদ সুতীব্র প্রতিফলিত হয়ে গল্পরসকে অখণ্ড সম্ভাবনা প্রেরণা দিয়েছে।

'রামায়ণ' ও 'Odyssey'র যুগে মানুষের জীবন-চেতনা সবেমাত্র অঙ্কুরিত হচ্ছিল। মানবিক শক্তির ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সেকালের লোকের স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। ফলে ঐসব গল্পের জীবন-ভূমিকে প্লাবিত করে রয়েছে অলৌকিক শক্তির অতি-বিস্তার। জীবনের সীমারেখা ও স্বভাবধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞানের অভাব ছিল বলেই আদিম মহাকাব্যের শিল্পি-সমাজকে অনেক অবান্তর ও অতিরিক্ত উপাদান ও সংগ্রহ করতে হয়েছে। ঐসব আখ্যায়িকাকাব্যে জীবনের পূর্ণবিম্বন ঘটেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু পরিধির অতিশয়তা ও বিন্যাসের বিস্রস্ততার ফলে সেই জীবনবিম্ব যত ব্যাপক তত উজ্জ্বল বা দীপ্ত নয়। জীবনের

স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের চেতনা সভ্যতার প্রগতির পথে যত আকৃতিপূর্ণ হয়েছে, গল্পের মুকুর জীবন-বিম্বনে ততই হয়েছে হ্রস্ব-অথচ-গভীর। ক্রমে 'রামায়ণ'-'মহাভারত', 'Iliad-'Odyssey'-র একটি-দুটি উপাখ্যান নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে গড়ে উঠেছে জীবনের সংহত-কেন্দ্রিত রূপের তির্যক দ্যুতি। 'রামায়ণে'র জীবন-রূপ এমনি করে ঘনীভূত হয়েছে কালিদাস-ভবভূতির কাব্য-নাটকে, 'Iliad'-'Odysscy' নবরূপ পেয়েছে গ্রীসের নাটকে এবং ইটালির কাব্যে। এমনি করে মহাকাব্যের আকৃতি ক্রমশঃ ভেঙে ভেঙে নবীন অঙ্গ পেয়েছে নাটকে, উপাখ্যান-কাব্যে,—আরো পরে গদ্য গল্পে, উপন্যাসে; সবশেষে ছোটগল্পে। বারে বারে বলেছি, ছোটগল্প এই ধারার সর্বকনিষ্ঠ উত্তর-সূরী। এর রূপাঙ্গিকে তাই গল্প-সাহিত্যের মৌল স্বভাব অতলস্পর্শ গভীরতায় ঘনতম নিবদ্ধ হয়েছে, এমন ভরসা করা যেতে পারে।

ছোটগল্প প্রথমে গল্প; অর্থাৎ, মানুষের বস্তু-ঘন জীবনের পূর্ণবিম্বকে নিত্যকালের আকাশে প্রতিফলিত করার আকাঙ্ক্ষা তার স্বভাবধর্ম। দ্বিতীয়তঃ, ছোটগল্প গল্পাকৃতিতে ছোট; অর্থাৎ ছোটগল্পের আধারে নিত্যকালের বস্তুময় জীবন-বিম্ব সীমা-সংহত সুগভীরতায় প্রতিফলিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গল্পের বিবর্তন

আঠারোর শতকের শেষপাদে Sir Walter Scott নাকি এককালে গদ্য গল্পের [উপন্যাস] লেখক বলে পরিচিত হতে কুণ্ঠিত হয়েছিলেন,—নিজের কবি-কীর্তিকে পরিপুষ্ট করার দিকেই নাকি তাঁর ঝোঁক পড়েছিল দীর্ঘদিন।[১] উনিশ শতকের লেখক Henry James 'উপন্যাসের ভবিষ্যৎ' কল্পনা করতে গিয়ে তার 'বর্তমান' সম্বন্ধে নৈরাশ্য প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে উপন্যাস, তথা গল্প-সাহিত্যের পাঠকের সংখ্যা অন্য সব রকমের সাহিত্যপাঠকের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। আর গল্প-সাহিত্যের এই তুলনাহীন জনপ্রীতির অধিকাংশই, তিনি বলেন,—বালক-বালিকাদের ('boys and girls') রচনা। 'বালিকা' বলতে Henry James অবশ্য বয়স্কা কুমারীদের কথাও ভেবেছেন,—যারা বাইরে নানারকম কাজকর্মে যুক্ত থেকে সব বাঁধবার অবকাশ পান না। তিনি বলেছেন,—ওঁরা নিজেদের জীবন গড়বার অক্ষমতাকে ভুলে থাকেন উপন্যাসের জীবনে বাস করে।[২]

বিশ শতকের Somerset Maugham বলেছেন—একালের কোনো কোনো উপন্যাস-বিচারক "consider the telling of a story for its own sake as a debased form of fiction."[৩]

অথচ পূর্বের অধ্যায়ে দেখেছি,—গল্প বলার প্রবণতা মানুষের আদিম বৃত্তিগুলির মধ্যে একটি, যা অনিরোধ্য শক্তিতে আজও মানবমনে সজীব হয়ে আছে। শুধু তাই নয়,—সকল সাহিত্য-রূপের মধ্যে কেবল গল্পের আধারেই চলমান জীবনের প্রতিবিম্বন সর্বাপেক্ষা প্রাঞ্জল হতে পারে,—এ'কথাও জেনেছি। তবু যে সাহিত্য-কলার জগতে গল্প-শৈলী মাঝে মাঝে আভিজাত্যহীনতার জন্যে উপেক্ষিত হয়, তার প্রধান কারণ দুটি। প্রথমতঃ, আগেই বলেছি, উৎকৃষ্ট সাহিত্য না হয়েও গল্প বহুলোকের মনোহরণ করতে পারে। সাহিত্যে উৎকর্ষের বিচার তার শাশ্বতির মানদণ্ডে। কিন্তু সমকালীন জীবনের প্রতিচ্ছবি

১। দ্রষ্টব্য: H Thomas & D. L. Thomas—'Living Biographies of Famous Novelists'—Introduction.

২। দ্রষ্টব্য: 'International Library of Famous Literature'—Vol. XIV.—'The Future of Novels'.

৩। W. Somerset Maugham—'Ten Novels and their authors.'—'The Art of Fiction'.

রচনার মাধ্যমে গল্পের দর্পণ অপরিণত-মনস্ক মানুষের সামনে অনেক সময়ে জীবন-সত্যের মরীচিকা রচনা করে,—শিল্পের সত্যরূপকে করে আচ্ছন্ন। তাই চিন্তাশীল রসিকেরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর রচনার পাশ কাটিয়ে চলেন। কারণ মিথ্যা এখানে সত্যের প্রতিভাস রচনা করে,—সত্য-মিথ্যার মান নির্ণয় করা হয় সুকঠিন।

তাছাড়া গল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে জন-রঞ্জন অনায়াসে সম্ভব বলে গল্প-লেখকদের অনেকেই উৎকৃষ্ট শিল্প-রচনার কথা ভাবতেও পারেন না। অর্থাৎ গল্প-শিল্পের বহিরঙ্গে সহজ-সিদ্ধির একটি আপাত-সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে এই শ্রেণীর কলা-কর্মে যথার্থ-সিদ্ধির উপযোগী প্রয়াস বা উদ্দীপনা অনেক সময়ে মন্দগতি হয়ে থাকে। এই কারণেই মননশীল রসবিশারদেরা লঘুতা ও অগভীরতার আশঙ্কায় গল্পের পথ প্রথম থেকেই এড়িয়ে চলেছেন।

কিন্তু গল্পের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মজ্জাগত। তাই অন্যান্য শিল্প-অবয়বের আধারে গল্প-রসের পরোক্ষ আস্বাদন আজও চলেছে অবিরাম। Homer-কে প্রতীচ্য গল্প-সাহিত্যের পথ-নির্দেশক বলা হয়েছে। হোমারের রচনা পদ্যের আধারে প্রতিফলিত; তাহলেও তার মূল রস গল্পেরই রস। কিন্তু সে আদিম গল্পে জীবনের পূর্ণ-রূপ ধৃত হলেও জীবনের আকৃতি সেখানে স্ব-সীম নয়। অনেক অবান্তরতা ও অর্ধপ্রাসঙ্গিকতার ফাঁকে জীবনের দ্যুতি সেখানে মাঝে মাঝে হঠাৎ ঠিকরে পড়েছে; কোনো একটি আলোক-বিন্দুতে জীবনের পূর্ণরূপ প্রতিবিম্বিত হয়নি। এ ত্রুটি হোমারের নয়। আদিম জীবনবোধের অপূর্ণতা আর অসংগতি এই অসংবদ্ধতার জন্যে দায়ী। ফলে কেবল 'Iliad' এবং 'Odyssey' নয়,—'রামায়ণ' এবং 'মহাভারতে'ও অসংসক্ত অতিব্যাপ্তি রচনা-শৈলীর স্বভাব-বৈশিষ্ট্য হয়ে আছে। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞান মানুষের কাছে যত স্পষ্ট আর পূর্ণ হয়েছে, গল্পের ফলকে তাকে সংহত করে পাবার আকাঙ্ক্ষাও হয়েছে তত তীব্র। ফলে প্রাচীন মহাকাব্য-সমষ্টির বিচিত্র গল্পাংশকে কেন্দ্র করে ক্রমে সাহিত্যের নূতন রূপ-কল্প গড়ে উঠতে লাগল। এই সব রচনাগুচ্ছের মধ্যে উল্লেখ্য,—নাটক এবং নূতন ধরণের আখ্যায়িকাব্য,—পরবর্তিকালে যাদের মধ্যে কয়েকটি 'সাহিত্যিক মহাকাব্য' নামে পরিচিত হয়েছে।

বলা হয়েছে,—Homer-এর কাব্যে অভিঘাত (action) এবং বর্ণনা (narration), এই দু'রকম উপাদানই সুপ্রচুর ছিল। প্রথম উপাদানকে সংহত করে নাট্যকলা জন্ম নিয়েছে,—আর পরবর্তিকালের গল্প-শৈলীর বিকাশ ঘটেছে দ্বিতীয়টি থেকে। অর্থাৎ আদিম মহাকাব্যগুলি যেন এক একটি সীমাহীন প্রান্তর,—জীবনের ধারা তার ওপরে যত এসে পড়েছে, গল্প ততই অনন্ত বিস্তারে পড়েছে ছড়িয়ে। নাটক এবং আখ্যায়িকাকাব্য

নূতন আঙ্গিকের বাঁধ বেঁধে শিল্প-প্রান্তরের এক-একটি সীমিত কেন্দ্রে জীবন-স্রোতকে গভীর তরঙ্গায়িত করে ধরেছে।

Homer-এর পরে Æschylus এসে গ্রীস্-এ নাটক লিখলেন। তাঁর একটি নাটিকা 'Agamemnon'। Agamemnon চরিত্র, 'Iliad' মহাকাব্যের কেন্দ্রশক্তি,—গ্রীস-এর একচ্ছত্র সম্রাট্ তিনি। ট্রয়-যুদ্ধের প্রান্তরে তাঁর প্রচণ্ড নির্ঘোষ বারে বারে শোনা গেছে। মহাকাব্যের অসংখ্য ঘটনার জট তিনি পাকিয়েছেন এবং খুলেছেন। 'Iliad'-এর মহাজীবনের একটি প্রধান প্রত্যঙ্গ এই Agamemnon। মহাকাব্যে এর বেশি সম্পূর্ণতা তাঁর নেই। কোনো মানুষের মধ্যেই স্বয়ম্পূর্ণতা সেখানে অনুপস্থিত,—বহুমানুষের সংঘাত ভূমিতে সমবেত মানব-জীবনের অখণ্ডতাকে কেবলমাত্র আভাসিত করেছেন Homer। Æschylus-এর যুগ রক্তমাংসের মানুষের দেহ-সীমায় তার আশা ও আকাঙ্ক্ষা, প্রয়াস ও ব্যর্থতাকে কেন্দ্রিত করতে চেয়েছে। তাই নবযুগের জীবন-শিল্পী তাঁর নাট্যকথার পটভূমি রচনা করলেন ট্রয়ের যুদ্ধ-প্রান্তরে নয়,—Agamemnon-এর নিভৃত গৃহে :—

Atreus নামে Myccnoe-র রাজা ছিলেন। তাঁর ভাই Thyestes রানীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। পরে Atreus-এর হাতে ধরা পড়বার ভয়ে সে পালিয়ে যায় রাজ্য ছেড়ে। বহুদিন পর Atreus তাকে ধরতে পেরে হত্যা করেন। মৃত্যুকালে Atreus-কে Thyestes অভিশাপ দিয়ে যায়, ভ্রাতৃ রক্তে তিনি যে পাপ সঞ্চয় করলেন,—তার পরে আরো তিনপুরুষ পর্যন্ত স্বজন-রক্তপাত করে তাঁর উত্তরসূরীরা এর প্রায়শ্চিত্ত করবে।

Atreus-এরই পুত্র Agamemnon ,—Clytemnestra ছিলেন তাঁর রানী। তাঁদের কন্যা ছিল Iphigenia। ট্রয়-যুদ্ধে যাবার পথে Agamemnon দেবী Artemis-এর ক্রোধে পতিত হন, এবং Aulis-দ্বীপ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে দৈববাণীর নির্দেশে কন্যা Iphigenia-কে দেবার উদ্দেশ্যে বলিদান করেন। রানী Clytemnestra এতে স্বামীর ওপরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাই Agamemnon-এর প্রবাস-বাসের সময়ে Thyestes-এর পুত্র Æghisthus-এর সঙ্গে তিনি ব্যভিচারে লিপ্ত হন; Agamemnon-এর হত্যার জন্যেও ষড়যন্ত্র করেন রানীই। দীর্ঘ যুগান্তের রক্তস্রাবী যুদ্ধের শেষে ট্রয়-প্রান্তরের মহানায়ক নিজের গৃহে এসে পত্নীর হাতে প্রাণ হারালেন।

Agamemnon মহারাজ,—বীরোত্তম তিনি! স্বদেশ ও জাতির মর্যাদা রক্ষার মহাহবে নিজের কন্যাকে হত্যা করতেও তাঁর বাধেনি। শুধু তা নয়, Agamemnon মানুষ-ও। তারও সংসার আছে,—আছে পরিবার-পরিজন। সকল যুদ্ধে শত্রু নিপাতিত

করে তিনিও প্রবল উৎসাহে গৃহে ফিরে যান ; কিন্তু সে কেবল নিজের স্ত্রীর হাতে মৃত্যু বরণ করবার জন্যে ! মানুষের জীবনের এ কী ভয়াবহ পরিণতি ? কেবল Agamemnon-এর নয়,—রানী Clytemnestra-রও। স্বভাবতঃ পিশাচী নন তিনি। হত্যা-শেষে তাঁর প্রবল উত্তেজনা ও অবসাদের মধ্যে মানবতার ক্লান্ত শ্বাস যেন তপ্ত হয়ে আছে।

এই সঙ্গে ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে' বাল্মীকির রামের নবপরিণতির কথাও মনে পড়ে। 'রামায়ণে'র রামচন্দ্র অনেকটা পরিমাণে ব্যক্তিগত দুঃখে অনুদ্বিগ্ন-মন, সুখে বিগত-স্পৃহ। মহাকাব্যের নায়কোচিত 'ধীরোদাত্ততা'র গুণ হয়ত তাই। মুমূর্ষু পিতার আর্ত চীৎকারের মধ্যে তিনি যৌবরাজ্যের আসক্তি ছেড়ে বনে যাত্রা করেন বল্কলধারী যোগীর বেশে। রামচন্দ্র সত্য-সন্ধ ! রাবণকে হত্যা করেও সীতাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন ; কারণ সীতার সতীত্ব তখনো অগ্নি-পরীক্ষিত হয়নি। রামচন্দ্র রঘুর কুল-দীপক ! সীতাকে পরিশুদ্ধ, এবং তারই সন্তান-সম্ভবা জেনেও অনায়াসে তিনি বনবাস-দণ্ড দিতে পারেন। রামচন্দ্র প্রজারঞ্জক। কিন্তু মানুষ রামচন্দ্র,—পঞ্চবটির বনেও সীতাকে নিয়ে নীড় রচনার আকাঙ্ক্ষা যাঁর,—চতুর্দশ বর্ষ পরে অযোধ্যার প্রাসাদে ফিরে এসে যিনি সন্তান-বুভুক্ষু,—সেই রামচন্দ্রের কথা বাল্মীকি বলেননি। 'রামায়ণে'র জীবন-স্রোত উত্তর-দক্ষিণে বহু ব্যাপ্ত ভারত-প্রান্তরে অতিবিস্তারিত হয়ে পড়েছে।

ভবভূতি এলেন ব্যক্তি-চরিত্রের সসীম আধারে সেই জীবন-স্রোতকে সংহত-গভীরতায় তরঙ্গায়িত করতে। বাল্মীকি যে কথা কিছুতেই বলেননি,—ভবভূতির একমাত্র বক্তব্য তা-ই ! 'রামায়ণে' রামচন্দ্রের অবিচল উদাসীনতার মধ্যে সন্তানের জন্মদান করে সীতা পৃথিবীর অতলে আশ্রয় নিয়েছেন। ভবভূতি মাটির তলা'থেকে আবার সীতাকে টেনে তুলেছেন রামচন্দ্রের প্রেমের বেদনায়। শূদ্ররাজ শম্বুকের ব্রহ্ম-তপস্যা-জনিত পাপ-আচরণের প্রতিবিধান করতে 'রাজা' রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেছিলেন। সে কর্তব্য সম্পাদিত হবার সঙ্গে সঙ্গে 'রাজা'র মধ্যে হঠাৎ জেগে ওঠে নিভৃত 'মানুষ'। এই দণ্ডকারণ্যে কৃচ্ছ্রসাধ্য বনবাস একদা গৃহ-সুখ-বাস হয়ে উঠেছিল সীতার ঘন সান্নিধ্যে : রামের চোখে দণ্ডকবন সীতাময় ! 'উত্তরচরিতে'র রাম-চরিত হাহাকার করে ওঠে সীতা নাম উচ্চারণ করে ; মানুষের মর্মযাতনার মূল্য দিতে পৃথিবীর মর্মভেদ করে উঠে আসেন ছায়া-সীতা।

তাই বলছিলাম,—নাটকের রূপাধারে মহাকাব্যের জীবন ঘন-নিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু গল্প-রস সেখানেও নিবিড় নয়।—জীবনের যথাস্থিত রূপকে পূর্ণ-বিম্বিত করতে চায় না নাটক ; —সংগ্রামী জীবনের সংঘাতকেই কেবল তীব্র-ক্ষিপ্ত করে চিত্রিত করে। নাটকে জীবনের গল্প বর্ণনা নেই, আছে জীবন-সংগ্রামের অভিঘাত (action)। 'Agamem-

non'-এ তাই Clytemnestra-র ক্ষোভের উত্তাপকেই কেবল তপ্ত করে চরম দুর্ঘটনার অভিমুখী করে তোলা হয়েছে। সুখে এবং দুঃখে, এই দম্পতির জীবনের আনন্দ-বিষাদের পরিণতি নাটকের ভেতরে ধীরে ধীরে চিত্রিত হয়নি। 'উত্তররামচরিতে' সীতার জন্য রামচন্দ্রের একটানা আক্ষেপ এবং রামের শুশ্রূষার প্রয়াসে ছায়ারূপিণী সীতার সীমায়তির শান্তি তার অভিঘাতে কেবলই উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের শান্ত-নিবিড় রূপটাও তার সংসূত্রে ধরা পড়েনি। কাব্য হিশেবে 'উত্তরচরিতে'র কারুণ্য-সর্বস্বতা 'অতিশয়' বলে অভিহিত হয়েছে,—কাব্যের পক্ষে যা অতিশয়, নাটকের পক্ষে অনেক সময় তা রূপবিহীন এক-কেন্দ্রিকতা।

নাটকে গল্প-রস সম্পূর্ণ নয়,—গল্পের মত তাতে আমূল জীবন স্পষ্ট-বিম্বিত হয় না। গল্প বলার সেই ধারা আদিম মহাকাব্যের পরেও প্রবাহিত হয়েছে,—অভিনব-তর আখ্যায়িকা কাব্যে। Virgil-এর (৭০-১৯ খ্রীঃ পূঃ) 'Æneid',—কালিদাসের 'রঘুবংশ' নূতন যুগের নবীন জীবন-কাব্য,- সাহিত্যিক মহাকাব্য নামে পরিচিত এরা। 'রঘুবংশ'-কে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চিত্রশালা' বলেছেন,[8] —'রঘুবংশ'কে একটি গল্প-ভাণ্ডার বল্‌তেও আপত্তি নেই। রঘুর বংশের দীর্ঘ আখ্যান এই বৃহৎ কাব্যের আধারে ধৃত রয়েছে। কিন্তু ব্যাপ্তির জন্যে সংসক্তিকে হারাতে রাজি নন কালিদাস;—অখণ্ডতার আকাঙ্ক্ষায় খণ্ডকে তিনি উপেক্ষা করেননি; দিলীপ, রঘু, অজ প্রভৃতির প্রত্যেককে নিয়ে এক একটি সম্পূর্ণ গল্প,—একটি করে সফল-সম্পূর্ণ জীবন-চিত্র রচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তকে নিয়ে কালিদাস এক একটি অখণ্ড উপাখ্যান গড়ে তুলেছেন। দৃষ্টান্ত হিশেবে 'রঘুবংশ' দ্বিতীয় সর্গের কথা বলা যেতে পারে:—রাজা দিলীপের সন্তান হয় না। রাজগুরু বশিষ্ঠ উপদেশ দিলেন, তাঁর হোমধেনু নন্দিনীর সেবা-সন্তোষ বিধান করতে হবে;—নন্দিনীর বরে রাজার পুত্র লাভ ঘট্‌বে। রানী সুদক্ষিণাকে নিয়ে রাজা আশ্রম-জীবনের কাঠিন্য বরণ করলেন। আশ্রমকুটীরে তপস্বীর জীবন যাপন করেন রাজ-দম্পতি;—প্রভাতে উঠে দিলীপ নন্দিনীর সঙ্গে গোচারণে পদে পদে অনুগমন করেন,—সারাদিন তার আহার-বিহারের নিরাপত্তা বিধান করেন অপার ঔৎসুক্যে। সন্ধ্যায় রানী সুদক্ষিণা তাকে বরণ করে নেন সহৃদয় মঙ্গল-অনুষ্ঠানের মধ্যে। রাজা-রানীর সেবায় তৃপ্ত নন্দিনী অবশেষে তাদের পুত্র-বর দান করে। অবশ্য নন্দিনী-রচিত কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই রাজা বর লাভের অধিকার অর্জন করতে পেরেছিলেন।

৪। দ্রষ্টব্য: বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী' (সাহিত্য পরিষৎ সং)—'কালিদাসের চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা'।

গল্প ছোট,—নিতান্ত সামান্য তার বিষয়বস্তু। কিন্তু ঐটুকু দিয়েই কালিদাস একটি সর্গ জুড়ে জীবন-ছবির মালা গেঁথেছেন। কালিদাসের শ্লোকের মুকুরে নন্দিনী-চারক দিলীপের দুটিমাত্র প্রতিরূপ উদ্ধার করি :—

"স্থিতঃ স্থিতমুচ্চলিতঃ প্রয়াতাং
নিষেদুষীমাসনবন্ধধীরঃ।
জলাভিলাষী জলমাদদানাং
ছায়েব তাং ভূপতিরন্বগচ্ছৎ ॥ ৬ ॥"

—'নন্দিনী দাঁড়ালে রাজা দাঁড়িয়ে থাকতেন, সে চললে তিনিও চলতে আরম্ভ করতেন ; নন্দিনী বসে পড়লে রাজাও স্থির হয়ে বসতেন। নন্দিনী জলপান করলে রাজাও জল পানে অভিলাষী হতেন,—এমনি করে রাজা দিলীপ ছায়ার মত নন্দিনীর অনুগমন করছিলেন।'

আবার,—

"লতাপ্রতানোদ্‌গ্রথিতৈঃ স কেশৈঃ
অধিজ্যধন্বা বিচচার দাবম্।
রক্ষাপদেশান্মুনি-হোম ধেনোঃ
বন্যান্ বিনেষ্যন্নিব দুষ্ট সত্ত্বান্ ॥ ৮ ॥"

—'মহারাজ দিলীপ লতার সুতো দিয়ে চুলের চূড়া বেঁধে, আরোপিত-জ্যা ধনু হাতে নিয়ে, বশিষ্ঠের হোমধেনু রক্ষা করতে বনে বনে বিচরণ করছিলেন,—যেন দুষ্ট বন্য জন্তুদের দমন করবার জন্যে।'

সত্যিই ছবি,—আশ্রম-কর্মরত দিলীপের জীবনের একটি মুহূর্তের ছবি যেন নিত্যকালের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে,—গল্পের মুকুরে জীবনের ক্ষুদ্রতম মুহূর্ত দীপ্রবিম্বিত হয়ে উঠেছে। 'রঘুবংশ' কেবল গল্পমন্দির নয়,—রঘুবংশের দ্বিতীয় সর্গ একটি 'ছোটগল্প'ও।

তেমনি প্রতীচ্যে হোমারের উত্তরাধিকার নিয়ে Virgil সাহিত্যিক মহাকাব্য লিখলেন 'Æneid'। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সাহিত্যিক মহাকাব্যের সংখ্যা খুব কম নয়। আমাদের বর্তমান প্রয়োজনে একটি-দুটি শ্রেষ্ঠ রচনার আলোচনাই যথেষ্ট। 'Æneid'-এর নায়ক Æneas, হোমারের কাব্যের একটি অপ্রধান চরিত্র। ট্রয় রাজবংশের এই উত্তরসূরী মহাযুদ্ধের বিনষ্টির পরে সদলে ইটালিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন ;—এই ধরণের অর্ধ-ঐতিহাসিক একটি রোমীয় কাহিনীকে কেন্দ্র করে Virgil তাঁর কাব্যের কাঠামো রচনা করেছেন। হোমারের কলাশৈলী অনুসরণ করলে,—বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন,—

Æneid দ্বিতীয় 'Iliad' কিংবা 'Odyssey' হতে পারত।[৫] কিন্তু Virgil-এর যুগ তা চায়নি; গল্প শোনার আকাঙ্ক্ষা তখন নবায়িত হয়ে উঠেছে। তাই রোমের জাতীয় ভাগ্য এবং সমকালীন আশা-বিশ্বাসকে Æneid-এর গল্পের সূত্রে গেঁথে উপস্থিত করলেন Virgil। Homer-এর তুলনায় Virgil-এর আখ্যায়িকা সংহৃত হয়েছে,—মানবতার মহাপ্রান্তর ছেড়ে রেনেসাঁস-পূর্ব ইটালির জীবন-ভূমিতে হয়েছে সীমিত।

তবু মানুষের গল্প-বাসনার তৃপ্তি নেই। 'Æneid'-এর 'মানবিক আবেদন কম'। তার কারণও দুঃসন্ধেয় নয়। রেনেসাঁস-পূর্ব ইটালিতে ধর্মাধিকারের অতিস্ফীতি মানুষের শক্তিকে অস্বীকার করতে চেয়েছে; ধর্মযাজকের বিধান মানব-ধর্মের অভ্যুত্থানকে করতে চেয়েছে নিষ্পিষ্ট। 'Æneid"-এ মানুষের গল্প আছে, কিন্তু তার গভীরে অতলান্ত 'মানুষ'টি নেই।

সেই 'মানুষ'কে খোঁজার গভীর ধ্যানে আখ্যায়িকা ছেড়ে ইটালি খণ্ড-কাব্যের পথ ধরেছে; পুরো মানুষকে খুঁজে না পেয়ে মানুষের মনের গভীরে সে ডুব দিয়েছে। অন্যান্যদের মধ্যে ইটালির 'সনেট্'-এ তার ঐতিহাসিক প্রমাণ। দান্তে এবং পেত্রার্কা ইটালিতে সনেটের প্রাণ-দাতা। আবার দান্তে-ই মানুষের কথা নূতন সুরে জাগিয়ে তুললেন তাঁর 'The Divina Commedia'-তে। ইটালিতে তখন রেনেসাঁসের আলোড়ন জেগেছে,- জীবনাদর্শ এবং রাজনৈতিক কর্ম দিয়ে দান্তে তাতে চরম রসদ যুগিয়েছেন। ধর্মান্ধতার কারাভূমি থেকে তাঁকে নির্বাসিত হতে হয়েছে। এই নির্বাসনেই দান্তের শিল্পি-আত্মার মহামুক্তি। মানুষের,—ভালো-মন্দে, সুখে-দুঃখে, পাপে-পুণ্যে গড়া রক্তমাংসের মানব-প্রাণের প্রথম মুক্তি ঘটল দান্তের 'Vitanuova' এবং অন্যান্য গ্রন্থে। সেই মুক্তিপথের মহাপরিণাম,—মহত্তম তীর্থ 'Divina Commedia'। মানবতার ইতিহাসে এই কাব্যের পরিচয় ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে,—"The Commedia, though often classed for want of a better description among epic poems, is totally different in method and construction from all other poems of that kind. Its 'hero' is the narrator himself, the incidents do not modify the course of the story;······the world through which the poet takes his readers is peopled, not with characters of heroic story, but with men and women known personally or by repute to him and those for whom he wrote."[৬]

৫। দ্রষ্টব্য: 'Chambers's Encyclopaedia'.—'Virgil'.

৬। 'Encyclopaedia Britannica.'—'Dante'.

মানুষকে,—চেনা-মানুষকে দান্তে 'মনের মাধুরী' দিয়ে নব-বিম্বিত করলেন 'Commedia'-র গল্পে।—আর তাঁর সে মনের মাধুরী রচনা করেছিল Biatrece-র প্রতি তাঁর আ-যৌবনের তপ্ত অনুরাগ।

চেনা-মানুষের রক্তমাংসের জীবন শিল্পীর অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে এবার গল্পের মুকুরে প্রতিবিম্বিত হতে লাগল;—গল্প-সাহিত্যের যথার্থ মুক্তির ভিত্তি রচিত হল এইখানে। তার পরেই নব-জীবনের ইমারত রচনা করতে এলেন দান্তের-ই ভাবশিষ্য Giovanni Boccaccio। দান্তের সাধনা বিপ্লবের অগ্নিদাহের কেন্দ্রভূমিতে (১২৬১—১৩২১ খ্রীঃ);—Boccaccio এলেন রেনেসাঁস-এর সিদ্ধি লগ্নে (১৩১৩—১৩৭৫ খ্রীঃ)। তাঁর শিল্প-সিদ্ধির মূলেও রয়েছে প্রেমের আসক্তি-ও-বিভ্রান্তির মানবিক প্রেরণা। প্রেমে এবং ভুলে মিশ্রিত অখণ্ড মানুষের চরম মুক্তি ঘটল তাঁর 'Decameron' মহাগ্রন্থে। বিশ্বের প্রথম সার্থক 'Novel' এই 'Decameron,'—'Decameron'-এ স্বয়ম্ভু মানুষের প্রথম পূর্ণায়ত রূপ,—জীবন-অনুরাগী শিল্পীর বক্ষ-রক্তের অক্ষরে লেখা।

একটি বিশেষ শিল্প-কর্মের প্রতিবাচক হিশেবে 'Novel' কথাটির ব্যবহার প্রথম হয়ত চালু করেছিলেন Voltaire।[৭] তারপরে নানা দেশে নানা রচনার প্রসঙ্গে সংগত বা অসংগতভাবে শব্দটি পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হয়েছে। যাই হোক, আধুনিক য়ুরোপীয় উপন্যাসের সূতিকাগৃহ ইটালিতে, Boccaccio-র আগে সেখানে আরো একজন ঔপন্যাসিকের নাম পাওয়া গেছে,—তিনি Francesco da Braberino (১২৬৪—১৩৪৮), আরো ক'জন আদি-লেখক অজ্ঞাত-পরিচয় থেকে গেছেন। কিন্তু Boccaccio-কেই বিশ্বের প্রথম উল্লেখ্য ঔপন্যাসিক বলে গণ্য করা হয়। কারণ,—"Boccaccio proclaims a new gospel—the gospel of human love. Love is no longer a sin, but a joy."[৮]

Boccaccio-র সিদ্ধির পথ বেয়ে সভ্য পৃথিবীর দিকে দিকে উপন্যাস-শিল্পের অভিযান ক্রমশঃ ব্যাপ্ত, গভীর এবং পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। কিন্তু উপন্যাস রচনার এই আদিম উদ্ভবের কথা মেনে নিয়েও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, "The history of the novel is short", উপন্যাস সাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাস বিবৃত করে 'Encyclopaedia Britannica' বলেছেন—"It was not until the 18th century that it began to be a prominent factor in the literary life, and not until

৭। দ্রষ্টব্য: ভল্তেয়র—'Novel'.

৮। H. Thomas & D. L. Thomas—'Living Biographies of Famous Novelists'. —'Boccaccio'.

the 19th, that it took a place in it which was absolutely predominant."

সাহিত্য,—তথা শিল্প-মাত্রই জীবন-সম্ভব ; আর প্রতিকূলতার পটভূমিতে মানুষের আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারের চেষ্টাতেই জীবনের বিকাশ এবং পরিণতি :—"Our lives are lives of endeavour and struggle, in which we are, of necessity, involved in order that we may achieve the ends which we consciously or unconsciously desire"।[৯] মানুষের চেতন বা অবচেতন এই আকাঙ্ক্ষার আলোকে শিল্পি-সাহিত্যিক নিজ নিজ সৃষ্টির মধ্যে সমসাময়িক জীবন-সংগ্রামের পরিণাম-ব্যঞ্জনা রচনা করেন। অতএব জীবন-চেতনা, তথা জীবন-সংগ্রামের পট-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর জীবন-সৃষ্টির প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়। নূতন সংগ্রামের পরিচয় দিয়ে নূতন রূপ-সৃষ্টি করবার প্রেরণা থেকে জন্ম নেয় সাহিত্যের বিচিত্র কলাঙ্গিক (technique)। হোমারের যুগে আদিম মানুষের মৌল জীবন-সংগ্রাম শিল্প-রূপ পেয়েছে প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির (process of 'Natural expression') মাধ্যমে। রূপ-রচনার সেই সহজাত দক্ষতা সমকালের জীবনের পূর্ণাঙ্গ ছবিই প্রতিবিম্বিত করেছিল। তবু দেখেছি, পরবর্তী যুগে জীবন-সংগ্রামে সংঘাতময়তা যখন উত্তুঙ্গ হয়েছে, তখনই তাকে চিত্রিত করবার জন্যে নূতন যুগের শিল্পী নাটকের নবীন আধারকে আবিষ্কার করেছেন। তারপরে আখ্যায়িকাকাব্য-গীতিকাব্যের বিচিত্ররূপের মধ্যে বিবর্তিত হয়েছে জীবন-রচনার নব নব যুগাকাঙ্ক্ষা। সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাব এবং রূপ, 'অ-পৃথক্ যত্ন-নিবর্ত্য।' শিল্পীর পরিচিত জীবন তাঁর সৃষ্টির বীজ,—সেই জীবনকে তিনি নিজের অনুভবের মধ্যে ধারণ করে পূর্ণাঙ্গ মহীরুহ-রূপ দান করেন। সাহিত্যের শরীর সেই জীবনরূপকে ধারণ করবার আধার মাত্র। প্রত্যেক 'যথার্থ শিল্পী'র-ই চেষ্টা হয়,—আধেয়ের উপযোগী করে আধার রচনা।—ভাল চাষী বীজের জাত ও স্বভাব জেনে তার বিকাশের উপযোগী করে জমি তৈরী করে থাকে। শিল্পের জগতেও চলমান জীবন ও সে-সম্বন্ধে শিল্পীর অনুভবের সহজ অনুবর্তন করে থাকে শিল্পের রূপাঙ্গিক। ভাবের প্রেরণা থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে শিল্পীর মনে জেগে ওঠে রূপের প্রকরণ। অতএব যুগ-প্রেরণা থেকেই শিল্পে নবীন রূপাঙ্গিকের জন্ম।

উপন্যাসের বিশেষ কলাপ্রকৃতির মূলগত জীবন-প্রেরণা বিশদ করে বলা হয়েছে—"The novel is not merely a fictional prose, it is the prose of man's life, the first art to take the whole man and give him expression".[১০]

৯। C. E. M. Joad—'Guide to Modern Thought'.

১০। Ralph Fox—'The Novel and the People'.

স্বয়ম্পূর্ণতার প্রথম লক্ষণ অন্য-নিরপেক্ষতা। আদিম যুগের মানুষের আত্মবিশ্বাস ছিল কম,—তাই পরের ওপরে নির্ভর ছিল তার সব চেয়ে বেশি। দুর্বল মনের আশ্রয় খুঁজবার জন্যেই সে নিত্য-নূতন দেব-দেবীর কল্পনা করেছে। তাতেও প্রাণের স্বস্তি সম্পূর্ণ হয়নি; তাই চলেছে 'উপ' এবং 'অপ'-দেবতার আজগুবি রূপরচনা। মানুষ সেদিন অতিমানবিকতার অতলে ডুবেছিল মনুষ্যত্বের অপূর্ণতাকে ভুলে থাকবার জন্যে। ইটালির রেনেসাঁস-এর রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রতীচ্য পৃথিবী প্রথম আবিষ্কার করেছে মানুষের সম্পূর্ণতা। Dante এবং তারপরে Boccaccio তাঁদের জীবনের অপার সুখ এবং অনতিক্রম্য বেদনার মূল্য দিয়ে আবিষ্কার করেছিলেন,—মানুষ সম্পূর্ণ; সে কেবল মানুষের অতুল্য মহত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠতার জন্যেই নয়: ভালো এবং মন্দ, পাপ এবং পুণ্য, উত্থান এবং স্খলন,—সব কিছু জড়িয়েই মানুষের পূর্ণতা। একই মানুষের মধ্যে কি করে এমন বিচিত্র এবং পরস্পর-বিপরীত বৃত্তি পাশাপাশি টিকে থাকে, Boccaccio-র দৃষ্টিতে সে ছিল এক অদ্ভুত রহস্য। মানুষের অন্তস্থলবর্তী এই রহস্যের অপারতাই মানুষকে শিল্পীর চোখে 'অনন্ত' করে তুলেছিল। Boccaccio-র 'Decameron' সেই অনন্ত মানুষের জীবন-কথা; তাই ১০০টি গল্পেও সেকথা যেন শেষ হতে চায়নি। এদিক থেকে স্বয়ম্পূর্ণতার রহস্যে অন্তহীন মানুষের জীবন-রূপকে গল্পায়িত করবার বিশেষিত প্রকরণই আসলে উপন্যাস।

কিন্তু মানুষের পূর্ণতা কেবল জীবনের অনন্ত বিস্তার-বৈচিত্র্যেই নয়,—তার মর্মস্থিত চেতনার অতল-স্পর্শতার মধ্যেও। জীবন-রহস্যের মরমী রূপটিকে শিল্পীর অনুভব দিয়ে Boccaccio প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন প্রেমের মুকুরে; Maria d' Aquino নামে একটি বিবাহিতা মহিলার প্রতি আকর্ষণে প্রেম-তপস্বী হয়েছিলেন তিনি। মহিলাটি তাঁর জীবনকে চরিতার্থও করেছিলেন; সেই প্রাপ্তির আনন্দেই জীবনের কথা তাঁর লেখনীর মুখে অজস্র মুখর হয়েছিল। প্রেমের জগতে Boccaccio পরিণামে বঞ্চিত হয়েছিলেন; প্রেমিকা তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন! কিন্তু প্রেমের তপস্যা তাঁর জীবনে ছিল অকম্পিত। 'Decameron' ছাড়া আর সকল রচনাতেই তাঁর মানবী প্রিয়া মানসীর মহিমায় চিরন্তনতা লাভ করেছেন। 'Decameron'-এ মানবীর রক্তমাংস শিল্পের পরিস্রুতিতে (aesthetic sublimation) অনন্ত রূপময় হয়ে উঠেছে। প্রেমে এবং অপ্রেমে, উৎসাহে এবং যন্ত্রণায় জীবনের অপূর্ব স্বাদ Boccaccio পেয়েছিলেন, তারই বিস্তারিত আখ্যান 'Decameron'।

কিন্তু মানুষের আরো একটি পরিচয় Boccaccio আবিষ্কার করতে পারেননি,—সে লুকিয়ে ছিল তাঁর নিজেরই মনের গহনে। যে মানুষ প্রেমে উদ্দীপ্ত হয়েছিল,—অপ্রেমের

আঘাতে সে হয়েছে অপ্রমেয় ;—বাইরের আঘাতকে মনের গভীরে সংহরণ করে বেদনার বৃন্তে সে রচনা করেছে অপরাজেয় মানুষের অমৃত-রূপ। মানবীর প্রেমাকর্ষণ একদিন Boccaccio-র শিল্পি-চিত্তকে সৃষ্টির পথে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেই প্রেমে চরম বঞ্চনা যেদিন পৌঁচেছে, সেদিন সৃষ্টির পথ সঙ্কুচিত হয়নি,—বরং স্নিগ্ধ-প্রশান্তিতে চিরায়ত হয়েছে। 'Decameron'-এ মানুষের অনন্ত পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে ;—তার দুর্বলতা-ব্যর্থতার প্রতি স্রষ্টার কৌতুক-প্রসন্ন হাসি হয়েছে বিচ্ছুরিত। ব্যঙ্গের জ্বালা কোথাও উদ্যত-খড়্গ হয়ে ওঠেনি। মানুষের সফলতার প্রতি সেখানে আছে সুস্থির আশাবাদের শান্ত প্রেরণা, কোথাও সংশয়ের কণ্টক-জ্বালা নেই। কোথায় সেই ব্যক্তি-মানুষের নিভৃত পরিচয়ের উৎস,—জীবনের পরম প্রাপ্তিতে যে চরিতার্থ হয়েছে,—কিন্তু চরম বঞ্চনায় রিক্ত হয়নি! মানব-রহস্যের সেই অতলান্ত পরিচয় 'সীমাব মধ্যে অসীম' হয়েছিল Boccaccio-রই ব্যক্তি-চেতনার মধ্যে। কিন্তু তাকে তিনি খুঁজে পান নি, তাই 'বাহির বিশ্বে' তাঁর জীবনাভিসার।

জীবন-চেতনা সম্বন্ধে এই সংহতি যত পূর্ণায়ত হয়েছে, উপন্যাসের কলারূপও হয়েছে তত সুসীম,—সুষমাময়। কিন্তু একের মধ্যে,—ব্যক্তির মধ্যে অদ্বিতীয় মানুষকে খুঁজে পাবার প্রয়োজনে মানবতার ইতিহাসে তীব্রতর সংগ্রামের অভিঘাত আবশ্যিক ছিল। রানী এলিজাবেথ-এর যুগে ইংলণ্ডের রেনেসাঁস এবং রানী অ্যান্‌-এর যুগে তার ফল-পরিণতি রসদ নিয়ে প্রতীচ্য পৃথিবীতে প্রতিকূলতাহত মানবতার ইতিহাস এক নূতন প্রেক্ষাপটে পদক্ষেপ করেছে। এই পর্যায়ে মানবতার অভ্যুদয় পথে একক-মানুষ তার চরম মূল্য খুঁজে পেয়েছে ; ইংলণ্ডের রেনেসাঁস ব্যক্তি মানুষ, (individual)-কে মানব-ইতিহাসের রাজ-সিংহাসনে বসিয়েছে। অষ্টাদশ শতকে ফরাসি বিপ্লবের নব-অভিঘাতে ব্যক্তি-মানুষের এই রাজশক্তির অগ্নি-পরীক্ষা হয়েছে। আর একক মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের সংগ্রামী পরিচয় সম্পূর্ণ আবিষ্কার করতে পারার বিস্ময় উপন্যাসের কলা-রূপকে এক মহৎ পরিণতি এবং পূর্ণাঙ্গ সংসক্তি দিয়েছে। তাই অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডে নব-রূপায়িত উপন্যাস-কলার প্রথম অভিব্যক্তি ;—উনিশ শতকের ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে তার দৃঢ়-পিনদ্ধ রস-সিদ্ধি। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি উপন্যাসের জীবন-প্রেরণার কথা বিবৃত করে সমালোচক বলেছেন,—সেই সময়ে…"there developed a keener sense of the value of the individual, of the sanctity of the 'ego', a faint prelude to the note that was to become so resonant in the 19th century, standing through all the activities of man."[১১]

১১। **Richard Burton—'Masters of the English Novel'.**

—মানুষের ব্যক্তি-স্বরূপ-(ego)-এর এই সর্বমুখী সর্বাতিগ ব্যাপ্তি ও পবিত্র পূর্ণতা-বুদ্ধির মধ্যেই উপন্যাস-কলার সার্থক সিদ্ধি। অতল গভীর অনন্ত-সম্পূর্ণ মানবতা সেখানে রূপ পেয়েছে একটি মানবজীবনের জটিল বিচিত্র দুরবগাহতার গহনে।

ছোটগল্পের জীবন-ভূমি আরো এক ধাপ প্রাগ্রসর। উপন্যাস একটি আদ্যন্ত জীবনের মধ্যে অতলান্ত অন্তহীন জীবনকে প্রতিফলিত করেছে,—ছোটগল্প একটি মানবজীবনের যে-কোনো একটিমাত্র মুহূর্তের অভিভবতার গহনে অখণ্ড সম্পূর্ণ জীবনকে করে বিম্বিত। ছোটগল্পের রূপাবয়বের প্রতি লক্ষ্য করে একালের গল্প-শিল্পী অনায়াসে বলতে পারেন—

"আমার মাঝে অসীম তুমি,
বাজাও আপন সুর।
তোমার মধ্যে আমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।"

তৃতীয় অধ্যায়

ছোটগল্প

ছোটগল্পের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞার্থনির্দেশ কঠিন। শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং সমালোচকেরা এ-বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র কথা বলেছেন। কিন্তু তাতে নানা মুনির নানা মত; কখনো বা একে-অপরের ঠিক বিপরীত কথাটি বলে বসে আছেন! প্রত্যেকের ধারণাই কিছু-না-কিছু সংখ্যক গল্প সম্পর্কে আংশিক সত্য। তাহলেও সব ছোটগল্প সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রযোজ্য কোনো সু-সীম স্পষ্ট সংজ্ঞা আজও লিখিত হতে পারেনি।[১] এ-কালের ইংলণ্ডের ছোটগল্প-লেখক ও সমালোচক H. E. Bates তাঁর ছোটগল্প সম্পর্কিত সংজ্ঞায় এই অব্যাপ্তির কারণ উল্লেখ করেছেন। ছোটগল্পের সর্বত্র ব্যবহার্য স্পষ্ট-পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা রচনা সম্ভব হয়নি; সংজ্ঞা-কারদের চিন্তার অস্বচ্ছতা এর কারণ নয়; ছোটগল্পাঙ্গিকের স্বভাব-মূলেই রয়েছে অপরিমেয়তার এক অতুল্য উৎস,—"......the short story can be anything the author decides it shall be ; it can be anything from the death of a horse to a young girl's first love affair, from the static sketch

১। দ্রষ্টব্য: H. E. Bates—'The Modern Short Story', Chapter I

without plot to the swiftly moving machine of bold action and climax, from the prose poem, painted rather than written, to the piece of straight reportage in which style, colour and elaboration have no place, from the piece which catches like a cobweb the light subtle iridescence of emotions that can never be really captured or measured to the solid tale in which all emotion, all action, all re-action is measured, fixed, pullied, glazed, and finished like a well-built house, with three coats of shining and enduring point. In that infinite flexibility, indeed, lies the reason why the short story has never been adequately defined.[২]

অর্থাৎ, যে-কোনো কিছুকে নিয়েই ছোটগল্প লেখা যেতে পারে, জগতের সব কিছুই ছোটগল্পের 'বিষয়'। আর সব-কিছুরই ছোটগল্প হয়ে উঠতে পারার পক্ষে একমাত্র অপরিহার্য উপাদান হল স্রষ্টার তীব্র ইচ্ছার একক শক্তি-প্রেরণা। জীবনের ধারাস্রোতে পলে পলে ছোটগল্পের উপাদান ভেসে চলেছে,—স্রষ্টাকে তাঁর চৈতন্যের আ-মূলে ধরে তুলতে হবে এদের যে-কোনো একটিকে।—শিল্পীর চেতনা ও অবধারণার আলোক-কলকেই বহমান জীবনধারা মুহূর্তের জন্য ছোটগল্পের রূপ ধারণ করে। Dante ও Boccaccio-র যুগ থেকেই নিজের স্বয়ম্পূর্ণতা সম্বন্ধে মানুষের প্রত্যয় অবিচল হয়েছে। তারপরে মনের ভেতরে এবং বাইরে সেই সম্পূর্ণ মানুষের সত্য পরিচয় সন্ধানে কেবলই ছুটে চলেছে পৃথিবীর শিল্প-সাহিত্য। সেখানে কত সুখ-দুঃখের অভিঘাত;—সুখে কত অতৃপ্তি, সু-তপ্ত দুঃখ-বহনের কী অপরূপ চরিতার্থতা!

রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পে বৃন্দাবনের বাপ যজ্ঞনাথ কুণ্ডু অর্থপিশাচ! যক্ষের মত আজীবন সে কড়া-ক্রান্তি-পাই হিশেব করে সঞ্চয় করেছে,—সেই পরিমাণে নিজের দেহ-মনকে বঞ্চিত করেছে আজীবন। একমাত্র ছেলেকে সে কোনোদিন পেট ভরে খেতে দেয়নি; পরতে দেয়নি কখনো পিঠ ভরে। নিজের বেলাতেও তার অন্যথা ছিল না। অর্থের লোভে প্রয়োজনকে খর্ব করে করে যে-কোনো কিছুর প্রয়োজনই তার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। বহুব্যয়সাধ্যতার ভয়ে একমাত্র পুত্রবধূকে সে বিনা চিকিৎসায় মরতে দিয়েছিল; শোকান্ধ বৃন্দাবনকে উপদেশ দিয়েছিল:—"ঔষধ খাইয়া কেহ মরে না? দামি ঔষধ খাইলেই যদি বাঁচিত তবে রাজাবাদ্‌শারা মরে কোন দুঃখে? যেমন করিয়া তোর মা মরিয়াছে, তোর দিদিমা মরিয়াছে, তোর স্ত্রী তাহার চেয়ে কি বেশি ধুম করিয়া মরিবে?"

পত্নীশোকে বৃন্দাবন যখন চার বছরের ছেলে গোকুলকে নিয়ে চলে গেল, এ-হেন

২। তদেব।

যজ্ঞনাথ তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। বধূ মৃতা,—পুত্র দূরগত; অতএব টাকার লোভে খাদ্যের সঙ্গে তাকে বিষ মিশিয়ে দেবার মত আর কেউ রইল না। চার বছরের পৌত্রের অভাবে "অকৃত্রিম শোকের মধ্যেও যজ্ঞনাথের মনে মুহূর্তের জন্য একটা জমা-খরচের হিশাব উদয় হইয়াছিল—উভয়ে চলিয়া গেলে মাসে কতটা খরচ কমে এবং বৎসরে কতটা দাঁড়ায়, এবং যে টাকাটা সাশ্রয় হয় তাহার কতটাকা সুদ।

"কিন্তু তবু শূন্যগৃহে গোকুলচন্দ্রের উপদ্রব না থাকাতে গৃহে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিল। আজকাল যজ্ঞনাথের এমনি মুশ্‌কিল হইয়াছে, পূজার সময় কেহ ব্যাঘাত করে না, খাওয়ার সময় কেহ কাড়িয়া খায় না, হিসাব লিখিবার সময় দোয়াত লইয়া পালায় এমন উপযুক্ত লোক কেহ নাই। নিরুপদ্রবে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত।"

আজীবন হিশেবি যজ্ঞনাথের জীবনে হিশেব-কষা সুখের পথে ছাপিয়ে উঠ্‌ল বে-হিশেবি দুঃখের বোঝা! আবার শরৎচন্দ্রের 'পথ-নির্দেশ' গল্পে 'গুনিদার' জন্যে আজীবন দুঃখের ভার বয়ে হেমনলিনীর চরিতার্থতার সীমা নেই। একদিন গুণীন্দ্রকে বিয়ে করবার জন্যে তার উদ্দীপ্ত প্রেম প্রগল্‌ভ উৎসাহে রূপান্তরিত হয়েছিল। জীবনে বহু দুঃখ-দুর্গতির শেষে গুণীর ব্যাকুল কণ্ঠে সেই আহ্বান যখন ধ্বনিত হয়েছে, হেম সেদিন নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছে স্বেচ্ছায়!

(মানুষের মন কেবল অতলান্ত বিস্ময়ের আকর নয়,—তার গোটা জীবন পরস্পর-বিরোধী প্রবণতার অভিঘাতে অপার জটিল। এই বিস্ময়-জটিলতার বিস্তার ও বৈচিত্র্য মানুষের গতিশীল চেতনার অতলে কেবলই গভীর-ব্যাপ্ত ছায়া ফেলেছে। ফলে মানুষকে নিয়ে মানুষের ভাবনা ও চিন্তা, বিস্ময় ও আনন্দের অবধি নেই। বহু-বিসর্পিলতায় বিচিত্র জীবনের সেই রূপটির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় খুঁজে ফিরেছে উপন্যাস-কলা। এ-পথে কেবল মনের অনুভব নয়,—ইতিহাসের জ্ঞান, বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বিচারবুদ্ধির যৌক্তিকতা শিল্পীর হাতে জীবন-রচনার নিত্য-নব হাতিয়ার তুলে দিয়েছে;—তাঁর শক্তিকে করেছে দুর্জয়। অষ্টাদশ শতকে পদার্থ ও জীব-বিজ্ঞানের উন্নতি, সেই সঙ্গে বিবর্তনবাদের জ্ঞান য়ুরোপের উপন্যাস-শিল্পীর সামনে জীবনের এক সীমাহীন প্রচ্ছদ তুলে ধরেছিল। অনাদি-কালের আদিম উৎস থেকে অনন্তকালের নিরবধি মোহানা পর্যন্ত তার কল্পনাতীত প্রসার। ব্যক্তিমানুষের জীবনকে এই অনন্ত সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে দাঁড় করিয়ে আঠারো-উনিশ শতকের উপন্যাস-শিল্পী তিলে তিলে তার জটিলতার গ্রন্থি মোচন করেছেন। উপন্যাস-শিল্পীর জীবন-দৃষ্টি তাই অনন্ত ব্যাপ্ত,—বহুধা বিচিত্র। ছোটগল্পের শিল্পী সেই অপার-বিস্তৃত দৃষ্টিকে সংসক্ত করে একটি বিন্দুতে একান্ত-কেন্দ্রিত করেছেন। জীবন-সিন্ধুর

অকূলপ্লাবী কলোচ্ছ্বাসকে এক মুহূর্তের গভীরতার মধ্যে আকণ্ঠ পান করে থাকেন তিনি। ছোটগল্পের শিল্পশরীর বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে তুলে ধরে।

একটি জীবনকে অনন্ত জটিলতার মধ্যে পরিকীর্ণ করে শাশ্বত জীবনের মূর্তি রচনা করে উপন্যাস। আর অনন্তে-প্রসৃত জীবনের রূপকে একটি মুহূর্তের গভীর অতলে একান্ত করে বিম্বিত—সীমা-ব্যঞ্জিত করে ছোটগল্প। সকল সার্থক গল্পের মতই উপন্যাস এবং ছোটগল্পও বস্তুময় জীবন-রূপকে প্রতিফলিত করে থাকে নিজ নিজ শিল্প-রূপের মুকুরে।) উপন্যাসের জীবন যেন পূর্ণিমা রাতে জোয়ারের সমুদ্রে বিম্বিত জীবন-রূপ। একখানা ঢেউ হাজারখানা হয়ে ফুলে ফেঁপে আছ্‌ড়ে পড়ছে,—বীভৎস আতঙ্কের সৃষ্টি ক'রে। ঢেউ-এর বুকে ঢেউ-এর মূর্চ্ছা উচ্ছ্বসিত ফেনায় তরঙ্গায়িত হয়ে উঠ্‌ছে প্রতি মুহূর্তে, নীল ঢেউ-এর চূড়ায় চূড়ায় শাদা ফেনার পুঞ্জ,—কালোনাগের মাথায় যেন শুভ্র পদ্মরাগ মণি। মুহূর্তে জাগ্রত স-ফেন ঢেউ-এর শীর্ষে পূর্ণ চাঁদের আলো চক্‌ চক্‌ করে ওঠে; —শাদা ফেনায় মুকুরে সেই পূর্ণ আলোয় একটি মানুষের একটি রূপ হাজারখানা হয়ে হাজার ঢেউ-এর মাথায় চকিতে হেসে ওঠে। কিন্তু সে কেবল ঐ মুহূর্তের জন্যে।—তারপর ঘোর গর্জনে ঢেউগুলি একে অন্যের ওপরে আছ্‌ড়ে ভেঙে কুটি কুটি হয়ে যায়, শুভ্র-সফেনতা কালো জলের ভ্রূকুটিতলে আত্মহত্যা করে বাঁচে। আরো পরে অকূল সমুদ্রের আলোড়নকে আমূল পীড়িত করে আবার চলে শুভ্র-ফেনায় জীবন-মুকুর রচনার প্রাণান্ত প্রয়াস। ঊর্মিমুখর সমুদ্রে সহস্র-বিভঙ্গ জীবনের উত্তাল-ক্ষুব্ধ রূপটিকে পূর্ণ-বিম্বিত করবার শিল্প-মুকুর উপন্যাস।

আর ছোটগল্প পূর্ণ চাঁদের আলোক-দোলায় নিজের অফুরন্ত রূপকে যেন বিম্বিত করে দেখেন জীবন-শিল্পী পদ্মদীঘির ফটিক-জলে। পূর্ণিমা নিশীথের গভীর নিস্তব্ধতায় জলের তলায় দুটি পা ছড়িয়ে ঘাটের ওপরে এসে বসে সারাদিনের বিস্রস্তি-ক্লান্ত নিঃসঙ্গ জীবনের রূপ। ফটিক জল স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ,—নিজের সামনে নিজের স্বচ্ছ পূর্ণ প্রতিবিম্বের পাশে অতল জলে ডুবে আছে পূর্ণ চাঁদ। পাশে জীবনের পদ্মবন ঘুমিয়ে থাকে,—ক্লান্ত মৌমাছিরাও আর গুন্‌ গুন্‌ করে না। ক্বচিৎ কারণে-অকারণে দীঘির স্থির জলে চঞ্চলতা জাগে যদি, প্রশান্ত ঢেউ-এর ভাঁজে ভাঁজে তখনো জীবন-বিম্বটি পূর্ণরূপের উজ্জ্বলতায় কেবল হাসে আর কাঁপে। পরে কাঁপতে কাঁপতে আবার সুস্থির-সম্পূর্ণ অখণ্ড রূপের মাধুরীতে নিশ্চল হয়ে দাঁড়ায়। জীবনের উত্তাপ তাতে রয়েছে,—রয়েছে তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা-সংগ্রামের বস্তু-নিবিড় স্পর্শ। কিন্তু শিল্পীর নিঃসঙ্গ অনুভবের নিভৃত অতলতায় সকল বৈচিত্র্য, সব বিস্তার ডুব দিয়েছে শ্বাস রুদ্ধ করে। নিরুদ্ধশ্বাস জীবনের সেই ডুবে-থাকা মুহূর্তটিকে ছোটগল্পকার তুলে ধরেন তাঁর শিল্পের মুকুরে। জীবন সেখানে প্রাণতপ্ত কিন্তু নিস্তরঙ্গ; সংসক্ত কিন্তু গভীর; পূর্ণ হয়েও প্রশান্ত!

এখানে গীতিকবির সঙ্গে ছোটগল্পকারের ভূমিকার সাদৃশ্য রয়েছে। ছোটগল্প যেন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার পাতায় গদ্যে লেখা গীতিকবিতা। গীতিকবিতার পরিচয় প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন,—"...গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতি-কাব্য।"[৩] অর্থাৎ, জীবন সম্বন্ধে যে অনুভব শিল্পীর নিতান্ত একক ও একান্ত,—পৃথিবীর দ্বিতীয় মানুষের সঙ্গে নিভৃত নিঃসঙ্গ যে উপলব্ধির কোনো প্রত্যক্ষ যোগ রচনার উপায় নেই, গীতিকবি জীবন পরিচয়ের সেই অনিবার্য চেতনাকে বচনের ব্যঞ্জনায় সহৃদয় চিত্তে সঞ্চারিত করেন। কবির বচনাতিরিক্ত নিজস্ব অনুভূতির রঙে পাঠক-চিত্তকে অনুভাবিত এবং অনুরঞ্জিত করার আকাঙ্ক্ষাতেই গীতিকবিতা-রূপের জন্ম। এই কথাকে স্পষ্ট করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,—"যখন হৃদয় কোনো বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়,—স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখনো ব্যক্ত হয় না, কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটকের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী।"[৪] ছোটগল্প একাধারে গীতিকবিতা ও নাটকের মিলিত রূপ।

প্রথমত গীতিকবিতার মত ছোটগল্পেরও উৎস শিল্পীর নিবিড়-নিঃসঙ্গ অনুভবের গভীরতার মধ্যে। কিন্তু গীতিকবির অনুভূতির বিকাশভূমি তাঁর নিভৃত মনোলোক,—আর ছোটগল্প-কারের উপলব্ধির আশ্রয় তাঁর পরিচিত বস্তুময় জীবন-ভূমি। দৃশ্যমান বস্তু-জগৎ সকল শিল্পীরই সৃজন-ভাবনাকে অনুপ্রেরিত করে থাকে। গীতিকবিতায় সেই জীবন 'কবির মনের জারক রসে জারিত' হয়ে বস্তু-নির্মুক্ত একান্ত অনুভবময় এক নূতন রূপ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কবিতার কল্পনা-ভূমিতে আছে কাশ্মীর উপত্যকার সান্ধ্য নিভৃতি ও ঝিলমের রক্তিম স্রোতের অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য;—নিয়ত চলমান হয়েও সে পরিবেশ নিতান্ত গভীর! সুগম্ভীর সে গভীরতার বুক চিরে এক ঝাঁক বলাকার সশব্দ গতিবেগ কবির ধ্যান-মৌন চিত্তকে গতিমুখর করে তুলেছিল। কিন্তু আ-চৈতন্য চলার আবেগ নিয়ে কবি-মন যখন অনির্বাণ গতির আকাশে উড়ে চলেছে, ঝিলমের সুস্থির বস্তুময় প্রেক্ষাপট তখন কবিতার পরিণতির পক্ষে অর্থহীন হয়ে পড়ে। কবির অনন্ত গতিপথের এক পাশেও তার স্থান হয়নি,—সমস্ত কবিতার ভাবলোকের বাইরে নিজের নিঃসঙ্গতার অতলে সে ডুবে মরেছে।

বস্তুময় যে জীবন-ভূমি গীতিকবির অনুভবকে উদ্বোধিত করে,—সৃষ্টির পথে তাকে

৩। বঙ্কিমচন্দ্র—'বিবিধ প্রবন্ধ' (প্রথম খণ্ড)—'গীতিকাব্য'।
৪। তদেব।

নিচের তলায় ফেলে স্রষ্টা ভেসে চলেন আপন ব্যক্তিগত কল্পনার ভাবলোকে। কিন্তু ছোটগল্পে শিল্পীর উপলব্ধির বিচরণভূমি দৃশ্যমান জীবনেরই একটি বিশেষ প্রচ্ছদ। রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পে সেই প্রচ্ছদ রচিত হয়েছে পল্লী অঞ্চলে নির্বাসিত আজন্ম কলকাতাবাসী এক যুবক পোস্টমাস্টার, এবং উন্মুখ-যৌবনা নির্বোধ পল্লী-কিশোরী ঝি রতনের নিভৃত জীবন-ভূমিতে।—পোস্টমাস্টার "কলিকাতার ছেলে, ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না।"

অথচ ছোট পোস্ট-অফিসে কাজ কম, অবকাশ বিস্তর! নিস্তব্ধ পল্লী-প্রকৃতির গতানুগতিকতার মধ্যে প্রবাস-জীবনের একাকিত্ব সঙ্গ-কামনায় বুভুক্ষু হয়ে ওঠে। "সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোল-করতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত"—তখন পোস্টমাস্টারের নিভৃতচারী মন রতনকে নিয়ে ডুব দিত মনের মানুষের সন্ধানে। পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা, পোস্টমাস্টারের কাজকর্ম করে দিয়ে চারটি করে খেতে পেত। "বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা নাই।" নিঝুম পল্লীর নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় পোস্টমাস্টার অদম্য উৎসাহে খুঁজে ফিরতেন এ-হেন রতনের বাল্য-স্মৃতির টুক্‌রো-ভাঙা সঞ্চয়! রতনের মাকে তার মনে পড়ে কি না,—তার বাবা তাকে মার চেয়ে ভালোবাসত কি না;—একমাত্র ভাইকে নিয়ে একদিনকার মাছ-ধরা খেলার গল্প;—এই সব তুচ্ছ, অথচ বালিকার মর্মে-নিহিত প্রাণের আলোকোজ্জ্বল শুক্তি খুঁজে পোস্টমাস্টার সন্ধ্যাকে গড়িয়ে দিতেন গভীর রাতে।

কোনোদিন বা সন্ধ্যায় "পোস্টমাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন—ছোটো ভাই, মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত, তাহাদের কথা। যে-সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয়, অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনো মতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না।" পোস্টমাস্টারের সঙ্গ-লোভাতুর মনকে একটি সর্ব-রিক্তা কিশোরী এমনি করে পূর্ণ করে তুলছিল।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। "একদিন বর্ষাকালে মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল, রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল; মনে হইতেছিল, যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে - এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বার বার আবৃত্তি করিতেছিল।

পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না—সেদিন বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময়ে কাছে একটি কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত—হৃদয়ের সহিত একান্ত সংলগ্ন একটি স্নেহ-পুত্তলি মানবমূর্তি।" মনের সেই শূন্যতা পূরণ করতে আবার রতনের ডাক পড়েছে। পোস্টমাস্টার প্রতিদিন নিভৃত দুপুরবেলায় রতনকে 'স্বরে অ, স্বরে আ' থেকে যুক্ত অক্ষর পর্যন্ত শিক্ষাদানে একমনে অগ্রসর হয়ে চলেছেন। নির্বোধ রতনের মধ্যে নিজের একটি 'স্নেহের পুত্তলিকে' ভেঙে গড়ার এই খেয়াল-খেলায় দিন তাঁর ভালই কাটছিল।

এমন সময় বর্ষাঘন এক প্রাতঃকালে পোস্টমাস্টারের নিঃসঙ্গবাস রোগযন্ত্রণায় তপ্ত হয়ে উঠল। "এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখা-পরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারী-রূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন, এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে এবং এস্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না, সেই মুহূর্তে সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল। বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভাল বোধ হচ্ছে কি'?"

পোস্টমাস্টার ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলেন, সেবার প্রয়োজন আর রইল না। কিন্তু এমনি করে অপরের শূন্যতাকে কূলে কূলে পূর্ণ করতে গিয়ে হতভাগিনী রতন নিজেকেও কখন হারিয়ে বসেছিল, সে খবর সে নিজেও রাখেনি। প্রথম সে সংবাদ তার মর্মে বিদ্ধ হল, যেদিন এলো পোস্টমাস্টারের গ্রাম ছেড়ে যাবার খবর। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতার ছেলে কলকাতায় ফিরে যাবেন। অজ্ঞাত-যৌবন-পীড়িত কিশোরীর মনের তখনকার অবস্থা তাঁর জানবার কথা নয়; রতনই বা কি বোঝাবে?—সেও কিছু কি বুঝেছিল? কেবল এক অপরিচিত-পূর্ব বোবা ব্যথায় তার মন আচ্ছন্ন হয়েছিল,—সে বেদনার ভাষা তার জানা ছিল না,—তাকে প্রকাশ করবার উপায়ও তাই ছিল না কিছু।

একবার শুধু সে জিজ্ঞাসা করেছিল, "দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?" পোস্টমাস্টার হেসে জবাব দিয়েছিলেন, "সে কী করে হবে?"—তারপর তার সারারাত দুঃস্বপ্ন-তপ্ত জ্বালা ছড়িয়েছিল সেই সহাস্য কণ্ঠস্বরে,—"সে কী করে হবে?"

পরদিন সকালে পোস্টমাস্টার তাঁর স্থলবর্তীর কাছে রতনের চাকরির জন্যে সুপারিশ

করতে চেয়েছিলেন। তখন রতন 'একেবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে' কেঁদে বলেছিল,—"না, না, তোমার কাউকে কিছু বল্‌তে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।"

নিজের পথ-খরচাটুকু বাদে এক মাসের পুরো মাইনেটা পোস্টমাস্টার যাবার মুখে রতনকে বক্‌শিস্ করতে চেয়েছিলেন। "তখন রতন ধূলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া কহিল, 'দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না;—তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাব্‌তে হবে না'—বলিয়া একদৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।"

পোস্টমাস্টার চলে গেলেন, ভরা বর্ষার ভরা নদীর আ-কূল কলস্বর মুহূর্তের জন্য তাঁর মনকে আর্দ্র করেছিল জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীর জন্য; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে তত্ত্বকথার উদয় হয়েছিল,—"জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে। ফিরিয়া ফল কী? এই পৃথিবীতে কে কাহার?"

"কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্টআপিস্ গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল,—দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে—সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানব হৃদয়, ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহু-পাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়,—অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া, হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে—তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তি-পাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।"

'পোস্টমাস্টার' একটি সাথক ছোটগল্প;—এই গল্পের মুকুরে—বিশেষ করে সমাপ্তিক ছত্র কয়টির ভাব-ব্যঞ্জনার মধ্যে, "একটি গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ" করে বসেছে। রতনের অনির্বচনীয় মর্মবেদনার গভীরে মানব-জীবন-স্বভাবের এই ট্রাজিক রূপ-বিম্বন সম্ভব হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নিভৃত-একক অনুভূতির আলোক-প্রতিফলনে,—তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শিল্পীর সংবেদনশীলতার সেই আলো রতনের জীবনেরই নানা ক্ষুদ্র-খণ্ড মুহূর্তের ওপরে বিচ্ছুরিত হয়ে তারই ভেতর থেকে সর্বকালীন জীবনের রস আহরণ করে নিয়েছে। রতনের জীবনকে বাদ দিয়ে,—যে কয়টি ধাপে ধাপে তার বিশ্ব-নির্বাসিত নিঃসঙ্গ নারী-মন 'দাদাবাবু'র প্রবাস-বিধুরতার সামনে বিকচ কুসুমের মত উন্মুখ হয়ে উঠেছিল,—জীবনের সেই প্রত্যেকটি ধাপকে একসঙ্গে আলোকিত না করে কবি-কল্পনার দাঁড়াবার আশ্রয় ছিল না। এখানেই গীতিকবিতার সঙ্গে ছোটগল্পের শিল্প-শৈলীর পার্থক্য। গীতিকবিতা

জীবনের বস্তু-ভূমি থেকে নিরঙ্গ বস্তু-সারটুকু মাত্র সঞ্চয় করে কবির একক কল্পনার আকাশে উড়ে বেড়ায়। ছোটগল্পের আধারে শিল্পীর ব্যক্তি-মনের নিভৃত অনুভব জীবনের একটি মুহূর্তের বস্তু-রূপ দিয়ে নিত্যকালের ভাবমূর্তি রচনা করে। অতএব ছোটগল্পের পক্ষে শিল্পীর ব্যক্তিগত অনুভূতির একান্ত বিশুদ্ধির মতই বাস্তব জীবনের যথাযথ বর্ণন ও প্রতিফলনও আবশ্যিক।

এই জীবন-বর্ণনার ক্ষেত্রেই ছোটগল্পের নাটকীয় স্বভাবের বিকাশ। প্রতীচ্য ছোটগল্প-রসিক একজন বলেছেন,—ছোটগল্প "In its use of action is nearer to the drama than to the novel"[৫] জীবনের বস্তুরূপের সঙ্গে ছোটগল্পের মতই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ উপন্যাস আর নাটক এই দুয়েরই। কিন্তু জীবন-রূপায়ণে উপন্যাস বিস্তারধর্মী। —সে ক্ষেত্রে নাটকের একমাত্র প্রয়াস সংসক্তি। জীবনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকে সংঘাতের তীব্রতম কেন্দ্রবিন্দুতে সংহত করার দিকেই নাটকের প্রধান ঝোঁক। ছোটগল্পের বেলাও দেখেছি, জীবনকে বিন্দু-বদ্ধ, তথা একটিমাত্র কেন্দ্রে সুস্থির করে তোলা, এবং সেই অবিচল স্থিরতার অতলে ডুব দিয়ে অনন্ত জীবনের স্বাদ গ্রহণ করাই তার শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা। এই কারণে ছোটগল্পের জীবন-বর্ণনা উপন্যাসের ব্যাপ্তির পথ পরিহার করেছে। নাটকের কেন্দ্রাভিগ সংসক্তির প্রতিও এই কারণেই তার স্বভাব-উৎকণ্ঠা; উপন্যাসের মত বিস্তার এবং বিশ্লেষণ ছোট-গল্পাঙ্গিকের আত্মমুক্তির পক্ষে বাধাস্বরূপ। Edgar Allen Poe এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন,—"The ordinary novel is objectionable for its length,...... . It cannot be read at one sitting, it derrives itself, of course, of the immense force derivable from 'totality'...... . In the brief tale, however, the author is enabled to carry out the fullness of his intention, be it what it may. During the hour of perusal, the soul of the reader is at the writer's control. There are no external or extrinsic influences—resulting from weariness or interruption"[৬]

ছোটগল্পের রূপাঙ্গিক গঠনে এই 'totality'-র ধারণা বিশেষ মূল্যবান্। Poe-র মতে 'totality' হচ্ছে রচনার সেই অবিভাজ্য শক্তি, যা দিয়ে শিল্পী তাঁর পাঠকের আত্মাকে পুরোপুরি নিজের অধিকারে ধরে রাখতে পারেন। সেই শক্তি দিয়ে ছোটগল্পকার নিজ রচনার মধ্যে তাঁর ইচ্ছাকে পূর্ণতম প্রতিফলিত করতে পারেন। অতএব দেখছি, ছোটগল্পের স্বভাবগত উদ্দেশ্য দুটি,—(১) গল্পের আধারে শিল্পীর প্রাণের যথেচ্ছ আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ বিম্বিত করা,—আর (২) গল্প পড়ার সময়ে পাঠকের মনকে সেই

৫। Elizabeth Bowen. [Ed.]—'Faber Book of Modern Stories'.

৬। E. A. Poe—Nathaniel Hawthorne—'Works of Edgar Allen Poe'—Vol. III.

আকাঙ্ক্ষার গভীরে একান্ত করে ধরে রাখা। এ-দিক থেকে স্রষ্টার মনোভূমির একান্ত রূপায়ণ ও আস্বাদনেই ছোটগল্পের চূড়ান্ত রস-সিদ্ধি। আর সেই প্রচেষ্টায় বস্তুগত জীবন-প্রচ্ছদ শিল্পীর হাতের এক শ্রেষ্ঠ উপাদান। ছোটগল্পকারের অনুভব-সীমায় ধরা পড়ে আছে সমকালীন জীবনের পুরো পরিচয়টি, যেন মৃৎ-শিল্পীর হাতের কাছে স্তূপাকারে পড়ে-থাকা একতাল মাটি। শিল্পী হাত ভরে ঠিক ততটুকু মাটি তুলে নেন,—দুহাত দিয়ে যে-টুকুকে নেড়ে চেড়ে পুরো সুখ! মৃৎশিল্পী যত কম মাটি দিয়ে তাঁর মনের মূর্তিকে সংক্ষিপ্ত, অথচ স্পষ্টতম রূপ দিতে পারেন, ছোটগল্পে জীবনের ঠিক ততখানি ব্যবহারই করে থাকেন গল্পকার। অতএব গল্পকারের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্যের দ্বারা ছোটগল্পে জীবন-উপাদানের ব্যবহার একান্ত নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে; এখানেই ছোটগল্পের সংসক্তি ও একাভিমুখিতার কেন্দ্রমূল। এই প্রসঙ্গে ছোটগল্পকে আবার নাটকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—"The short story fulfils the three unities of the French Classical drama; it shows one action, in one place, on one day. A short story deals with a single character, a single event, a single emotion, or the series of emotions, called forth by a single situation"[৭] একালে ছোটগল্পের কাহিনীকে একদিনের এক প্রেক্ষাপটে একমাত্র ঘটনার মধ্যে নিবদ্ধ রাখার কথা অনেকটা আলঙ্কারিক অর্থেই এখন গ্রহণ করা সমীচীন। আসলে একটি মাত্র চরিত্র, ঘটনা, আবেগ বা অবস্থানের বৃন্তমূলে শিল্পীর অনুভবকে কুসুম-সম অনির্বাচ্যতা দানই ছোটগল্পের শিল্প-বৈশিষ্ট্য।

'পোস্টমাস্টার' গল্পে রতনের বারো-তেরো বছরের জীবনের দৈর্ঘ্য নিতান্ত কম নয়। বহু ঘটনা ও দুর্ঘটনায় সেই স্বল্প পরিসর ছিল সমাকীর্ণ। রতনের মা-বাবা ছিল; ভাইও ছিল একটি। তারা কি অবস্থায় মারা গিয়েছিল, তার ফলে সর্বস্বান্ত রতনের অর্থনৈতিক অবস্থান ও মানসিক ভারসাম্য কিভাবে কতখানি বিচলিত হয়েছিল,—রতনের পূর্ব-জীবনের পরিচয়ের পক্ষে ঐসব তথ্য এবং তাদের জটিল গ্রন্থিমূলের বর্ণনা অপরিহার্য। পোস্টমাস্টারের-ও অতীত জীবনের প্রাসঙ্গিক উল্লেখমাত্র ছাড়া আর কোনো পরিচয় নেই আলোচ্য গল্পে। অথচ জীবন-উপন্যাসের ঐটুকু আবশ্যিক উপাদান। অন্য দিকে গল্পটির পূর্ণ পরিধি জুড়ে পোস্টমাস্টার ও রতনের অল্পস্থায়ী সান্নিধ্যকে খুঁটিনাটিসহ আমূল বর্ণনা করা হয়েছে। কি করে জগতের কক্ষচ্যুত অনাথিনী এই কিশোরীকে পোস্টমাস্টার তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনের স্বজন-তৃষ্ণার সঙ্গে ক্রমেই জড়িয়ে ফেলছিলেন,—তাঁর শূন্য মনোলোকের পথে রতনের অন্যমনস্ক পদসঞ্চার কি করে ধাপে ধাপে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল,—

৭। Brander Mathews—'Pailosophy of the short story'.

এ-সব ঘটনার বাস্তব পটভূমি সুবিস্তারে চিত্রিত হয়েছে। কারণ সেই ক্রমাগ্রসৃতির পরিণাম-পথ বেয়েই ত সর্বস্বান্ত বালিকার জীবনে চরম সর্বনাশ আকার ধরেছিল। মাতৃ-পিতৃহীনতা ও নিরন্ন দারিদ্র্য ছাড়াও রিক্ততা মানুষের জীবনে যে রয়েছে,—আর সেই রিক্ততা আপাত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মায়া-পথ বেয়ে এসে জীবনকে আমূল দুঃখের অতলে গ্রাস করে নেয়,—প্রাণধর্মের শিল্পী রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধিটুকুই ব্যঞ্জিত হয়েছে রতনের জীবন-পরিণামে। রতনের গল্প যদি তার দুর্দশা ও করুণতার প্রতি হতাশ্বাস রচনা করেই নিঃশেষিত হত, তাহলে একটি ভাল গল্প হলেও ছোটগল্প তা হতে পারত না। একটি বিশেষ জীবনের বিশেষ মুহূর্তের সুখ দুঃখের রূপ-রচনা ছোটগল্পের উদ্দেশ্য নয়; একটি জীবনের এক মুহূর্তের অতলস্পর্শতার মধ্যে পূর্ণ জীবন-ধর্মের একটি অখণ্ড ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতেই এই শিল্পাঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্য। রতনের অনির্বচনীয় যন্ত্রণার বৃন্তে মানবজীবনের স্বভাব ট্রাজেডি কুসুমায়িত ব্যঞ্জনা পেয়েছে,—অবিমৃষ্যকারী হৃদয়ানুকূলতা ও তার ভ্রান্তি-প্রবণতার বেদনা হয়েছে রস-প্রমূর্ত। এখানেই রতনের গল্প যথার্থ ছোটগল্প হয়েছে।

অতএব ছোটগল্পের উপাদান তিনটি :—

(১) প্রথমত, অপার-বিস্তৃত রহস্য-জটিল আধুনিক জীবন-ভূমি ;—যার প্রতি মুহূর্তে,—প্রতি বিন্দুতে জমে আছে অতলান্ত রহস্য-গভীরতা।—তার যে-কোনো একটি বিন্দুর গহনে তলিয়ে পূর্ণ জীবনের একটি অখণ্ড ছায়ারূপকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে।

(২) ছোটগল্পের দ্বিতীয় উপাদান শিল্পি-ব্যক্তির ঘন-নিবিড় অনুভব-তন্ময়তা,—চলমান জীবন সম্বন্ধে তাঁর ধ্যানিজনোচিত আত্মস্থতা। সেই সুস্থির চেতনার মুকুরে জীবনের যে-কোনো মুহূর্ত যেন পূর্ণ জীবনের ছায়া ফেলতে পারে।

(৩) তৃতীয়ত, চাই রচনার ব্যঞ্জনা-ধর্মিতা। যেন একটি জীবনের বিশেষ মুহূর্তের অবস্থান, অভিঘাত, বা আবেগ সর্বদেশকালের জীবনভূমিতে উৎক্রমণ (transcend) করতে পারে।

এই উপাদান-বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই ছোটগল্পের অনন্যতুল্য স্বাতন্ত্র্য। মুহূর্তের বিন্দুমূলে জীবন-সিন্ধুর পূর্ণ-চেতনা যে গল্পের পরিণামে ব্যঞ্জিত হয় না, সে গল্প আকারে ছোট হলেও ছোটগল্প নয় ;—আখ্যান, উপাখ্যান, উপকথা বা যা-খুশি হতে তার বাধা নেই। অতএব সীমায়িত-জীবনের ক্ষণ-বৃন্তে অনন্ত-জীবনের ব্যঞ্জনা রচনাতেই ছোটগল্পের রূপ-শৈলীর বিশিষ্টতা।

চতুর্থ অধ্যায়

ছোট গল্প এবং ছোটগল্প

শিল্পের জগতে, আগেই বলেছি, রূপের আবির্ভাব ভাবনার পশ্চাৎপটে। যুগে যুগে জীবন-বোধের বিবর্তন চলেছে ;—জীবনের পরিচয় নিয়ে নিত্য-নূতন অনুভব মানব-শিল্পীর মনে নব নব ভাবনাকে দোলায়িত করে। জীবনকে নূতন করে জানার সেই আনন্দ-সংবাদটুকু নবীন আধারে তুলে ধরবার চেষ্টাতেই শিল্প-সাহিত্যে নূতন রূপকল্পের সৃষ্টি। ভাবনার প্রয়োজন থেকেই রূপের জন্ম। অতএব জীবন-চিন্তার একটি বিশেষ রূপ যতক্ষণ শিল্পীর চেতনার ফলকে পূর্ণাঙ্গ হয়ে না উঠছে, ততক্ষণ তার উপযোগী নূতন অবয়বের কাঠামো-ও সুগঠিত হতে পারে না। এ-দিক থেকে ছোটগল্পের রূপাঙ্গিক আধুনিকতম জীবন-চিন্তার ফল ;—ছোটগল্প উপন্যাস-কলারও উত্তরসূরী।

উপন্যাস সম্বন্ধে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়েই বলা হয়েছে,—মানুষের ইতিহাসে স্বতন্ত্র-ব্যক্তিত্বের চেতনা (individuality) জাগবার আগে উপন্যাসের উদ্ভব সম্ভব ছিল না।[১]

Shakespeare-এর সাহিত্যে জোরালো কাহিনী, সুগঠিত চরিত্রাবলী এবং আনুপূর্বিক জীবনবোধের অখণ্ডতা—সার্থক উপন্যাসের এই সকল উপাদানই রয়েছে। তবু উপন্যাস তাঁর হাতে একখানাও রচিত হয়নি; কারণ ইংলণ্ডের সমাজে ব্যক্তিত্বের (personality) অনুভব সেকালে সুতীব্র হলেও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের (individuality) বুদ্ধি তখনো জাগেনি। অন্যপক্ষে, নিছক স্বতন্ত্র-ব্যক্তিত্বের অনুভবই যথেষ্ট নয়,—উপন্যাসের আদি রূপ-কল্পনার পিছনে রয়েছে দ্বান্দ্বিক জীবন-চেতনা।—নবজাগ্রত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে চিরাগত সামাজিক সংস্কারের অভিঘাতে উৎক্ষিপ্ত জটিলতাই প্রাথমিক উপন্যাস-কলার প্রাণ :—"The novel deals with the individual, it is the epic of the struggle of the individual against society, against nature, and it could only develop in a society where the balance between man and society was lost, where man was at war with his fellows or with nature."[২]

সন্দেহ নেই, আধুনিক সমাজ-চিন্তায় এক বিশেষ ধরনের ভার-সাম্যের অভাব-তীব্রতা

১। "If the novel is a record of the emotion of an individual soul, influenced by and influencing some other soul, one cannot have the novel until some notion of individuality has come to the world".—Stoddard—'Evolution of the Novel'.

২। R.lph Fox—'Novel and the People'.

যখন ক্রমে হ্রাস পেয়েছে, তখনও সার্থক উপন্যাস রচিত হচ্ছে। আসলে উপন্যাসের প্রাথমিক রূপ সেখানে বিবর্তন লাভ করেছে।—যেমন আদিম মহাকাব্য নবরূপায়িত হয়েছিল সাহিত্যিক মহাকাব্যের মধ্যে।

সে যাই হোক্, মধ্যযুগীয় সমষ্টি-চেতনার সঙ্গে আধুনিককালের ব্যষ্টিবোধের সংঘাত-জটিলতার মধ্যে উপন্যাস-কলার জন্ম। আমাদের ধারণা,—সেই অভিঘাতের তীব্রতা যেদিন নূতন ভার-সাম্যে সুস্থির হয়েছে, তখনই ছোটগল্প-রূপের উদ্ভব। বহমান জীবনের অপার ব্যাপ্তি ও জটিলতার প্রেক্ষাপটে সমৃদ্ধ ব্যক্তি-মানুষ যেদিন নিজের যথার্থ অবস্থান-ভূমি খুঁজে পেয়েছে,—স্বয়ম্পূর্ণ প্রত্যয়ের সমৃদ্ধিতে যেদিন বৃহৎ জগতের সঙ্গে একান্ত অন্বিত হয়েছে,—ছোট-গল্পাঙ্গিক সেই নূতন কালের নবীন সৃষ্টি। বহমান জীবনধারার সঙ্গে সচেতন শিল্পি-ব্যক্তির আত্মার সমন্বয়ে কান্তি পেয়েছে ছোটগল্পের কলা-রূপ!

সুচিহ্নিত রূপাঙ্গিকযুক্ত আধুনিক ছোটগল্পের উদ্ভব কল্পনা করা হয় ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার লেখক Washington Irving-এর 'Sketch Book' রচনার কাল থেকে। বলা হয়েছে,—"Before 1819 there had been short fiction,—an abundance of it; the tale in prose and verse in all languages one of the most abundant varieties of literature, but Irving was the first to recognise that it could be moulded into a prose literary form that would have laws and an individuality of its own."*

Irving-এর ছোটগল্প লেখার ইতিহাস যথার্থ গল্পের মতই লোভনীয়। ছোটবেলা থেকেই দেশভ্রমণের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল;—প্রকৃতি এবং জীবনের গতি-বিচিত্রতা তাঁর সৌন্দর্য-লোভী মনকে কেবলই আকর্ষণ করত। চলার নেশায় Irving য়ুরোপে গিয়ে পৌঁছেছিলেন; কিন্তু হাতে তাঁর পাথেয় ছিল না। অর্থের প্রয়োজনে তাঁকে লেখনীর আশ্রয় নিতে হয়। আর সাহিত্যের জগতে সংক্ষিপ্তি ও চমৎকারিতার প্রতিই ছিল তাঁর সহজ প্রবণতা। সেই প্রবণতার সঙ্গে নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষাকে জড়িয়ে Irving তাঁর 'Sketch Book'-এর গল্প লিখেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, প্রয়োজনীয় অর্থলাভের জন্যে তাঁকে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে হবে; নূতনের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা সর্বজনীন। কিন্তু Irving-এর সফলতার কারণ—অভিনবতার বাসনাকে তিনি নিজের শিল্পি-স্বভাবের অনুগামী করে নিতে পেরেছিলেন। এই নবীন রূপাঙ্গিকের ব্যবহার সম্বন্ধে বন্ধুর কাছে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন:—"I choose to take a line of writing

---

৩। 'Encyclopaedia Britannica'.—'Short Story'

peculiar to myself rather than to fall into the manner or school of any other writer."[৪]

স্পষ্টই দেখছি, শিল্পী হিসেবে Irving প্রথমাবধি রূপ-সচেতন ছিলেন। আধুনিক শিল্প-চেতনার এটি এক মহৎ স্বকীয়তা। ব্যাস-বাল্মীকি, Homer তাঁদের কাব্য-কথাকে রূপ-বদ্ধ করেছিলেন প্রাকৃতিক বৃত্তির বশে। ফলে, তাঁদের রচনায় কোনো রূপই স্পষ্ট পরিণতি পায়নি। মহাকাব্যের মধ্যে নাটক, উপাখ্যান এবং কবিতার সম্ভাবনা যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে; কিন্তু বিস্রস্ত বিস্তার হেতু কোনো রূপই তাতে দানা বাঁধতে পারেনি। এদিকে মানুষের শিল্প-চেতনা যত অগ্রসর হয়েছে, শিল্পী ততই চেয়েছেন বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাগ্‌ভঙ্গীর ওপরেও নিজের অধিকার সুদৃঢ় করতে। অবশ্য রচনার ক্ষেত্রে রচয়িতার প্রাণের সহজ প্রণোদনা যেখানে অনুপস্থিত, রূপ-সচেতনা সেখানে কৃত্রিম সৃষ্টির মধ্যে ব্যর্থ হতে বাধ্য। Irving-এর বৈশিষ্ট্য, সৃষ্টির পথে তিনি নূতন রূপের কাঠামোকে খুঁজেছেন,—যে কাঠামো তাঁর বিশেষিত স্বভাবেরই একান্ত উপযুক্ত ['peculiar to myself']।

লক্ষ্য করলে দেখব, Irving-এর মধ্যে সার্থক ছোটগল্প লেখকের দুটি উপাদানই প্রচুর ছিল। প্রবহমান জীবনধারার বৈচিত্র্য বিস্তার ও পরিবর্তনশীলতার প্রতি তাঁর কৌতূহল ছিল আ-মূল। নিজের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন,—"I was always fond of new scenes, and observing strange characters and manners.······

"This rambling propensity strengthened with my years. Books of voyages and travels became my passion, and in devouring their contents I neglected the regular exercises of the school. How wistfully would I wander about the pier-heads in fine weather, and watch the parting ships bound to distant climes—with what longing eyes would I gaze after their lessening sails, and waft myself in imagination to the hands of the earth."[৫]

এ আত্মপরিচয় নিছক কৌতূহলী ভূ-পর্যটকের নয়;—পৃথিবীর সৌন্দর্য-পিয়াসী ধ্যানী শিল্পীর। রবীন্দ্রনাথের আত্মকথার অনুরূপ অংশ এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে;—'পেনেটি'র বাগান বাড়িতে নিজের বিশ্ব-অভিসার লিপ্সু কিশোর মনের বিবৃতি দিয়ে কবি লিখেছেন,—"পিছনে আমার বাধা রইল; কিন্তু গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন। পাল তোলা নৌকায় যখন-তখন আমার মন বিনাভাড়ায়

৪। দ্রষ্টব্য—তদেব।

৫। Irving, W.—'Sketch Book'—'Author's account of himself'.

সওয়ারি হইয়া বসিত এবং যে-সব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইত, ভূগোলে আজ পর্যন্ত তাহাদের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই।"[৬]

ভ্রমণ-পিয়াসী কিশোর Irving এখানে কিশোর-কবিরই স্বগোত্র। জীবনের সীমাহীন বিস্তারকে তিনি নিজ কল্পনার গভীরে একান্ত করে বাঁধতে চেয়েছিলেন। পরিব্রাজক Irving-এর একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল অসীম ব্যাপ্ত জগৎ-চিত্রের ফলকে সমকালীন জীবনকে প্রত্যক্ষ করার কৌতূহল। তাঁর সে আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ চরিতার্থ করতে পেরেছিল তাঁর দেশের মাটি,—আমেরিকার জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে ডুবে পৃথিবীর 'বর্তমান'কে নিজের মধ্যে তিনি ধারণ করতে পেরেছিলেন। তবু যে কেন য়ুরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে শিল্পী লিখেছেন,—"My native land was full of youthful promise. Europe was rich in the accumulated treasures of age. Her every ruins told the history of times gone by, and every mouldering stone was a chronicle. I longed to wander over the scenes of renowned achievement—to tread, as it were in the footsteps of antiquity—to loiter about the ruined castle—to meditate on the falling tower—to escape, in short, from the common-place realities of the present, and lose myself among the shadowy grandeurs of the past."[৭]

নিষ্প্রাণ বস্তুজগতের মধ্যে মহৎ প্রাণের এই সন্ধিৎসা,—বস্তুজগতের অভিজ্ঞতাকে নিয়ে ভাবুকতার অতলে অবগাহন করবার এই কবি-সুলভ আকাঙ্ক্ষা পর্যটক Irving-এর মধ্যে ছোটগল্পকারের অন্তর্দৃষ্টি স্ফুরিত করে তুলেছিল। অভিনব শিল্পরূপের আকর তাঁর গ্রন্থটিকে লেখক 'Sketch Book' নামে প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। এ-সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন: "As it is the fashion for modern tourists to travel pencil in hand, and bring their portfolios filled with sketches, I am disposed to get up a few for the entertainment of my friends"[৮] সে-কালের পর্যটকদের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে Irving চোখে-দেখা জীবনের কয়েকটি ছবি এনেছিলেন;—তুলিতে এঁকে নয়, কলমে লিখে! এটা বড় কথা নয়; এই রচনার পেছনে নিহিত তাঁর শিল্পি-স্বভাবই সেই সৃষ্টিকে অনন্যপূর্ব বিশিষ্টতা দিয়েছে। তিনি লিখেছেন: "I have wandered through different countries, and witnessed many of the shifting scenes of life. I cannot say that I have studied them with the eye of a philosopher, but rather with

---

৬। রবীন্দ্রনাথ—'জীবনস্মৃতি'।

৭। Irving, W.—পূর্বোক্ত গ্রন্থ ও অধ্যায়। ৮। তদেব।

the sauntering gaze with which humble lovers of the picturesque stroll from the window of one print-shop to another; caught, sometimes with delineations of beauty, sometimes by the distortions of caricature, and sometimes by the loveliness of landscape."[১]

পর্যটকের স্বভাব-কৌতূহল নিয়ে জীবনের সৌন্দর্যরূপ এবং ব্যঙ্গ-চিত্র,—তথা, পরস্পর বিপরীত সকল উপাদানকে অনায়াসে উপভোগ করেছেন Irving;—আর ধ্যানী শিল্পীর মন নিয়ে তার কোনো কোনোটির সঙ্গে একাত্মও হয়ে পড়েছেন। পর্যটকের কৌতূহল যেখানে জীবনের কৌতুক-রূপ নিয়ে লিপি-চিত্র রচনা করেছে,—সেখানে Irving-এর লেখা গল্প নক্শার পর্যায়ে নিবদ্ধ হয়ে আছে;—'Ripvan Winkle'-এর গল্প এমনি একটি কৌতুক-চিত্র! এদিক থেকে বিখ্যাত 'Don Quixote'-এর অনেক অংশের সমধর্মী 'Ripvan Winkle.' কিন্তু 'The Wife' গল্পে জীবনের একটি অকিঞ্চিৎকর অভিজ্ঞতাকে Irving তাঁর মর্মবদ্ধ মানবিক সহৃদয়তার আলোকে প্রতিফলিত করে একটি শাশ্বত জীবমূর্তি রচনা করেছেন;—তাই, 'The Wife' একটি সার্থক ছোটগল্প।

Ripvan Winkle-এর গল্প সুপরিচিত! আল্পীয় পর্বতমালার স্বপ্নাবিষ্ট পরিবেশে—Kaatskill পাহাড়ের উপত্যকায় এক প্রাগৈতিহাসিক গ্রামের অধিবাসী ছিল Ripvan. গ্রামের পুরনারী এবং শিশুদের মধ্যে তার জনপ্রীতি ছিল অবিচল; কেবল তার নিজের স্ত্রীর পক্ষে সে ছিল দুর্বহ বোঝা। একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে তাদের, তবু সেই ছোট সংসারটি চালাতে গিয়ে হিমশিম্ খেয়ে যায় Ripvan-এর স্ত্রী;—পূর্বপুরুষের উপার্জিত ভূসম্পত্তির অনেকখানি হাতছাড়া হয়ে যায়; দিনে দিনে বসত্‌বাড়ি, তার আসবাবপত্র এবং অধিবাসীদের পোশাকেও দারিদ্র্যের ছাপ সংশয়াতীত হয়ে ওঠে। এ-সব কিছুর একমাত্র কারণ Ripvan-এর কর্মবিমুখ অলসতা। পাড়ায় পাড়ায় সে ঘুরে বেড়ায়, মনের সজীবতা দিয়ে পল্লীবাসীদের মাতিয়ে তোলে; কিন্তু নিজের সংসারের শ্রমসাধ্য কাজে চিরকাল সে বিমুখ। তারই মত অকর্মণ্য আর একটি অবাঞ্ছিত জীব Ripvan-এর কুকুর। প্রভুর পেছনে পেছনে সারাদিন সে ঘুরে বেড়ায়; কিন্তু শিকারে প্রভু-ভৃত্য দুজনেই সমান অপটু;—কোনোদিন একটি ক্ষুদ্রতম জীবও তারা ঘরে আনেনি। শৈশব থেকেই পুত্রটির মধ্যেও পিতার স্বভাবের উত্তরাধিকার বর্তেছে। তিনটি অকর্মণ্য অলস পরিবার-বাসীকে নিয়ে পাঁচটি মানুষের সংসার চালানো যতই কঠিন হয়, Ripvan-পত্নীর স্বাভাবিক কর্কশতা ততই হয়ে ওঠে রুক্ষ ক্ষিপ্ত। পেটের দায়ে Ripvan সেই কটূভাষণ নীরবে সহ্য করে,—আহারান্তে আবার বেরিয়ে পড়ে পাড়ার পথে।

১। তদেব।

এমনই অবস্থায় পত্নীর পরুষ কণ্ঠের ভৎর্সনা-তাড়িত Ripvan এক অপরাহ্ণে নিজের কুকুর ও পৈতৃক বন্দুক নিয়ে পাহাড়ে যায় শিকারের সন্ধানে। পর্বতচূড়ায় পৌঁছে পরিপার্শ্ব এবং দূরতর উপত্যকার সৌন্দর্য দেখে স্তব্ধ-অভিভূত হয়ে বসে থাকে Ripvan-এর ভাবুক প্রাণ ;—বৈকালিক সূর্যের আলো সন্ধ্যার রক্তিমাভা দিয়ে ক্রমেই স্বভাব-সুন্দরতাকে আরো গভীর করে তোলে। আরো পরে, সন্ধ্যার রহস্যাবরণ রাত্রির গাঢ়তায় আচ্ছন্ন হয় ; কুকুর আর বন্দুক নিয়ে ব্যর্থ শিকারী ফিরে চলে ঘরের পথে।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত পরিবেশে Ripvan এক বিচিত্র-বেশ বৃদ্ধের সম্মুখীন হয়,—কাঁধে তার ভারি সুরাপাত্র। ক্লান্ত অপরিচিতের অনুরোধে Ripvan আবার উঠতে থাকে পাহাড়ের দুর্গমতায়, দুর্বহ পানপাত্র-বহনে সঙ্গীকে সে সাহায্য করে। তারপর অপরিচিত বন-প্রদেশের নিভৃতির মধ্যে রহস্যময় সঙ্গীদের মাঝখানে Ripvan-এর রাত কেটে যায় পান-ভোজন-সংগীতের উত্তপ্ততায়। অনাস্বাদিত-পূর্ব পানীয়ের মাধুর্যে Ripvan লোভাতুর হয়ে ওঠে, অবশেষে তার তন্দ্রাতুর বিবশ দেহ-মন-মস্তিষ্ক ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়।

সকালে জেগে উঠে Ripvan-এর বিস্ময়ের আর অবধি নেই। যেখানে, যে পরিবেশে সে শুয়েছিল, জেগে উঠেছে আজ তার চেয়ে এক নূতন পটভূমিতে!—চারদিকে গহন অরণ্য ছাপিয়ে উঠেছে ;—রাত্রি, লোকজন এবং উৎসবের কোনো চিহ্ন নেই কোথাও,—তার চিরসঙ্গী কুকুরটিও কাছে নেই। মাথার পাশে বন্দুক একটি রয়েছে, কিন্তু মরচে ধরেছে তাতে,—কা'রা বুঝি তার সতেজ বন্দুকটি চুরি করে এই ভাঙা বিকল আগ্নেয়াস্ত্রটি রেখে গেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য, Ripvan-এর মাথায় মুখে গজিয়েছে পাকা চুলদাড়ির বোঝা! ভাঙা বন্দুকের ওপরে স্থবির দেহের ভার রেখে বিস্ময়-ক্লান্ত স্তিমিত চোখে Ripvan এগিয়ে চলে গ্রামের পথে ; কিন্তু পাহাড়ের ওপরে আগাছায়-জঙ্গলে সে পথ হারিয়ে গেছে। অনেক কষ্টে উপত্যকায় নেমে এসে দেখে, যে পথ দিয়ে সে চলেছে, সে তার চেনা পথের চেয়ে অনেক ভালো, অথচ এ পথ তার গাঁয়েরই পথ। পথিক যারা আনাগোনা করছে, Ripvan তাদের কাউকে চেনে না ; গ্রামের ঘরগুলোও সব পাল্‌টে গেছে, অনেক নতুন বাড়ি হয়েছে, কিছু কিছু পুরোনো বাড়ি ভেঙে দুমড়ে পড়ে আছে। এর সব কিছুই Ripvan-এর অচেনা-অজানা, তবু এ তার নিজেরই গ্রাম। নিজের বাড়ির পরিচিত অঞ্চলে পৌঁছে দেখলো ঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ে আছে,—লোকজন কেউ নেই। একটি বুড়ো রোগ-কাতর কুকুর সেই ভগ্নস্তূপের মধ্য থেকে বেরিয়ে বিকট আওয়াজ করে চলে গেল। Ripvan কুকুরটিকে চেনে না,—কুকুরও চিনল না তাকে।

আবার পথে বেরুলো Ripvan। কিন্তু কোথাও পরিচিত কাউকে খুঁজে পেল না; পুরোনো সরাইখানার নবায়িত হোটেল-রূপ দেখে অভিভূত হল, তার নবীন অধিবাসীদের হাতে তাকে হতে হল নাজেহাল। নানা অপ্রত্যাশিত উপদ্রবে Ripvan যখন উন্মাদপ্রায়, তখনই অকল্পিতভাবে সে নিজের মেয়ে এবং নাতিকে আবিষ্কার করে অভিভূত হয়ে পড়ে;—মেয়ের মুখ থেকে সে জানতে পারে, তার শিকার করতে যাওয়া আর ফিরে আসার মধ্যে দীর্ঘ বিশ বছর কেটে গেছে; এর মধ্যে মেয়ের বিয়ে হয়ে তারও ছেলে হয়েছে; বুড়ি Ripvan-এর ঘটেছে দেহান্ত।

তবে কি Ripvan বিশ বছর ধরে ঘুমিয়ে ছিল? কেন, কিসের প্রভাবে এমন ঘুম সম্ভব হতে পেরেছিল! এই নিরুত্তর জিজ্ঞাসার মুখে Ripvan-এর গল্প দাঁড়িয়ে আছে চির-বিস্ময়ের সম্মুখ-পটে। উত্তরহীন জিজ্ঞাসা গল্পের সমাপ্তি মুহূর্তকে রহস্যাবৃত করেছে,—কিন্তু সেই রহস্যভূমি ভেদ করে কোনো সুগঠিত প্রত্যয় বা প্রাপ্তির ব্যঞ্জনা আভাসিত হতে পারেনি; তাই Ripvan-এর লিপি-চিত্র ('sketch') তার অপার চমৎকারিত্ব নিয়েও ছোটগল্প হয়ে উঠতে পারেনি।

অন্যদিকে 'The Wife'-এর গল্পাংশ একান্ত পরিচিত, অনেকটা গতানুগতিকও। গল্পটির প্রয়োজনীয়াংশ নিম্নরূপে বিবৃত হয়েছে:

"আমার একটি বন্ধুকে একদিন আমি অভিনন্দিত করতে চেয়েছিলাম; তার জীবনের চারপাশে গভীর স্নেহের বাঁধনে ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছিল ফুলের মত একটি পরিবার-জীবন। বন্ধু আমায় বলেছিল, স্ত্রী এবং সন্তান লাভ করো,—এর চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য আমি তোমার জন্যে কামনা করতে পারি না। তোমার সম্পদের অংশ তারা ভাগ করে নেবে, কিন্তু বিপদের দিনে দেবে তোমায় স্বস্তি আর সান্ত্বনা।

* * * *

"এই সব কথা ভাবছিলাম আর আমার মনে জেগে উঠছিল একটি ছোট্ট পরিবার-জীবনের গল্প; সে গল্পের সাক্ষী ছিলাম আমি নিজে।

Leslie ছিল আমার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু,—রূপে-গুণে অপরূপ একটি মেয়েকে সে বিয়ে করেছিল;—একান্ত ফ্যাশন্যাবল্ পরিবেশের মাঝখানে মানুষ হয়েছিল সেই মেয়ে। মেয়েটির নিজের আর্থিক সঙ্গতি খুব একটা ছিল না; কিন্তু আমার বন্ধুর সঙ্গতি ছিল অজস্র। স্ত্রীর যে-কোনো চেষ্টায় সহায়তা করতে পারার কল্পনাতেও সে উৎফুল্ল হয়ে উঠত, তার রুচি-সূক্ষ্ম কামনা ও কল্পনার অনুবর্তন করে বন্ধু আমার অভিভূত হত। স্ত্রীর প্রসঙ্গে Leslie বলত: 'তার জীবন হবে রূপকথার মত'।

স্বামি-স্ত্রীর মৌল স্বভাবের মধ্যে ছিল পার্থক্যের বীজ,—সেই পরস্পর-বিভিন্নতাই

যেন তাদের মিলনকে সমন্বয়ের একতারায় বেঁধে দিয়েছিল। Leslie ছিল রোমান্টিক ঐকান্তিকতায় ভরা,—তার স্ত্রী ছিল কেবল প্রাণ আর আনন্দের উৎস। আমি প্রায়ই দেখতাম, সজীব প্রাণের সহজ উৎসাহে Mary যখন আনন্দিত হয়ে উঠত, তখন অন্য সংগীতের মধ্যে Leslie একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত স্ত্রীর পানে। আরো দেখেছি,— মুখর প্রশংসার মাঝখানেও Mary-র চোখ দুটি স্বামীর দিকেই ফিরে যেত,—যেন কেবল ঐখানেই সে জীবনের সকল দাক্ষিণ্য এবং স্বীকৃতি খুঁজে ফিরেছে। স্বামীর বাহুতে হেলে চলবার সময় তার চিকণ অবয়ব Leslie-র পৌরুষদীর্ঘ দেহের পাশে আশ্চর্য প্রতিকূলতার সৌন্দর্য সৃষ্টি করে ফিরত, প্রেমে-প্রত্যয়ে স্নিগ্ধ-আকুল দৃষ্টি মেলে সে স্বামীর মুখে চেয়ে দেখত,—Leslie-র হৃদয় বিজয়গর্বে উঠত ভরে,—জীবনের এই মধুমান দায়িত্ব যেন সে কেবল Mary-র অসহায়তার প্রতি তাকিয়েই আয়াসহীন আনন্দে বয়ে ফিরতে পারে। প্রথম জীবনে মধুমিলনের এমন কুসুম-সুন্দর পথে পৃথিবীতে আর কোনো দম্পতি পদক্ষেপ করেনি, প্রথম প্রেমের রাখি পরিণামী সফলতার উজ্জ্বল সম্ভাবনায় আর কখনো এমন আলোকিত হয়নি!

এমন সময়ে এলো দুর্দিন। নিজের বিরাট সম্পত্তি নিয়ে জুয়াখেলার অভ্যাস ছিল Leslie-র। তাদের বিয়ের অল্পদিন পরেই আকস্মিক বিপদে প্রায় সব কিছু তার হাতছাড়া হয়ে যায়। দারিদ্র্যের প্রান্তদেশে এসে দাঁড়াল Leslie,—তার জীবন হয়ে উঠল ঘনায়মান যন্ত্রণার দুর্বহ বোঝা। সে বোঝা অসহনীয় হয়ে উঠতে চাইল এক সুকঠিন দায়িত্বের কথা স্মরণ করে; স্ত্রীর সামনে নিজের মুখের হাসিকে তার অক্ষুণ্ন রাখতেই হবে,—এই দুঃসংবাদ দিয়ে বেচারিকে কিছুতেই অভিভূত করা চলবে না।

কিন্তু প্রেমের মর্মভেদী দৃষ্টিতে Mary বুঝেছিল, কোথায় একটা গোলমাল ঘটেছে! স্বামীর চকিত দৃষ্টি, রুদ্ধ নিশ্বাস সে লক্ষ্য করছিল,—তাই Leslie-র ক্লান্ত, পাংশু উৎসাহের ভান আর তাকে বঞ্চনা করতে পারছিল না। নিবিড়তর ভালবাসার স্পর্শ দিয়ে স্বামীর এই অবসাদকে সে সুস্থ, প্রসন্ন করে তুলতে চাইল। কিন্তু Leslie-র প্রাণের গভীরে তীরের আঘাত যেন তাতে আরো তীব্র বেদনার সঞ্চার করছিল। সে ভাবছিল, কত ভালবাসা, কত স্নিগ্ধতা! অথচ নিজের অন্তরে সে যে বিষ-বাষ্প বহন করছে, তার একটি দমকে সব কিছু যাবে নিষ্প্রভ মলিন হয়ে।

অবশেষে আর সহ্য করতে না পেরে Leslie এল আমার কাছে;—হতাশ করুণ কণ্ঠে সব কথা সে খুলে বললে আমায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—'তোমার স্ত্রী এ খবর জানেন?'

জিজ্ঞাসা মাত্র কান্নায় ভেঙে পড়লো Leslie, চীৎকার করে বললো,—'ভগবানের

দোহাই, আমার স্ত্রীর কথা মুখেও এনো না ; তার কথা চিন্তা যখন করি, তখন পাগল হওয়া ছাড়া আর উপায় দেখি না আমি।'

আমি। কিন্তু কেন তুমি তাঁকে বলবে না একথা? একদিন তিনি জানবেনই সব খবর,—তোমার মুখ থেকে শুনলে যে ভাবে শুনতেন, তার চেয়ে হয়ত ভয়াবহ হবে সে জানার বেদনা ;—প্রিয়জনের কণ্ঠস্বরে রূঢ়তম আঘাতও লঘু হয়ে পড়ে! তাছাড়া এই দুর্দিনে তুমি নিজেকেও বঞ্চিত করছো তাঁর সান্ত্বনা আর সহানুভূতি থেকে। শুধু তাই নয়, তোমাদের প্রেমের বন্ধনকেও তুমি আঘাত করতে চলেছ,—অপকট আত্ম-দানেই হৃদয়ের বন্ধন চিরস্থায়ী হয়। তোমার স্ত্রী একদিন সব কথা বুঝতে পারবেনই ; আর সত্য-প্রেম সেদিন গোপনতার অপরাধ সহ্য করবে না। প্রেমের পাত্রদের দুঃসংবাদ থেকে বঞ্চিত হতে হলেও অমর্যাদাবোধে প্রেম হয় ক্ষুন্ন।

Leslie। কিন্তু বন্ধু, আমি তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পথে যে চরম আঘাত দিতে চলেছি,—তার স্বামী একটি ভিখারি—এই দুঃসংবাদ দিয়ে তার আত্মাকে ধুলায় লুটিয়ে দিতে চলেছি!

আমি লক্ষ্য করছিলাম, Leslie-র দুঃখ মুখর হয়ে উঠেছে। চুপ করে থাকলাম, কথায় প্রকাশিত হলে দুঃখ প্রশান্তির পথ খুঁজে পায়। তীব্র হতাশ্বাসের অবস্থা কেটে গেলে এবার আমি বন্ধুকে বললাম,—'অবিলম্বে তোমার স্ত্রীকে সব কথা জানানো উচিত। জীবনযাত্রার মান তোমাকে কমাতেই হবে। কিন্তু সব কিছু Mary-কে না জানালে তুমি তো এই ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারবে না!'

আমার কথায় তার মুখে যন্ত্রণার ছায়া ফুটে উঠেছে দেখে বললাম,—'দুঃখিত হয়ো না ······Mary-কে নিয়ে সুখী হবার জন্যে নিশ্চয়ই তোমার প্রাসাদের দরকার হওয়া উচিত নয়।'

Leslie চীৎকার করে উঠলো,—'তাকে নিয়ে আমি ভাঙা কুঁড়েতেও সুখী হতে পারব,—সুখী হতে পারব দারিদ্র্যের ধূলি-মালিন্যের মধ্যে। হায়, ভগবান্ তাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন তাকে।'

এবারে আমি Lesli র কাছে উঠে এসে দুহাত দিয়ে তার হাত চেপে ধরলাম,—'বিশ্বাস করো বন্ধু, সেও তোমায় নিয়ে এমনি খুশি হতে পারবে ;—তোমার চেয়ে সে সুখী হবে বেশি! তার পক্ষে এ হল বিজয়-গর্বিত উৎসাহের এক অপূর্ব মুহূর্ত ; —এই পরিবেশ তার সকল সুপ্ত শক্তি ও তপ্ত স্নেহকে অবারিত করে তুলবে ;—তোমারই জন্যে সে তোমাকে ভালবাসে, এ-কথা প্রমাণ করার অপূর্ব সুযোগ পেয়ে সে হবে উদ্দীপ্ত। প্রত্যেক যথার্থ নারীর হৃদয়ে স্বর্গীয় আগুনের শিখা রয়েছে,—পুরুষের উন্নতির দিবালোকে

সে থাকে সুপ্ত, আচ্ছন্ন; কিন্তু দুর্দিনের অন্ধকার মুহূর্তে পূর্ণ দীপ্তিতে জ্বলে আলোকিত হয়ে ওঠে। কোনো পুরুষই জানে না তার বক্ষলগ্না নারীর যথার্থ স্বরূপ,—যতদিন পৃথিবীর তপ্ত পথে দুঃখের অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত না হয়, ততদিন জানতে পারে না, জীবনে নারী কি অপরূপ দেবদূতী!'

Leslie-র ওপরে আমার কথার প্রভাব পড়েছিল।**পরদিন সকালে তার সঙ্গে দেখা হলো,—স্ত্রীর কাছে সব কথা খুলে বলেছে সে! জিজ্ঞাসা করলাম—'Mary কিভাবে গ্রহণ করেছে তোমার কথা?'

Leslie। ঠিক একটি দেবদূতীর মত! তার মন যেন এক প্রবল স্বস্তি খুঁজে পেলো,—আমার কাঁধের দুপাশে দুটি বাহু জড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে,—আমায় যা অসুখী করে রেখেছিল এই ক'দিন,—এই কী তার সব কারণ? কিন্তু হায় দুর্ভাগিনী বুঝছে না, কি দুঃসহ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাকে এগোতে হবে। দারিদ্র্য সম্বন্ধে কোনো সঠিক ধারণাই তার নেই,—দরিদ্রতার কথা কেবল কবিতাতেই পড়েছে বেচারি! —জেনেছে, প্রেমের তা·সগোত্র! আজও কোনো কষ্ট তাকে সইতে হয়নি, অভ্যস্ত কোনো সুবিধার অভাব ঘটেনি। কিন্তু যেদিন দারিদ্র্যের রূঢ় আঘাত প্রত্যক্ষ পেতে হবে,— জানতে হবে প্রয়োজনের উলঙ্গ রূপ, সইতে হবে এর অসম্মান, সেইদিন আসবে যথার্থ পরীক্ষার সময়।

"যাই হোক্, কিছুদিনের মধ্যেই Leslie তার বাড়ি এবং আসবাবপত্র সব বিলি-ব্যবস্থা করে দিলো। শহর থেকে মাইল কয় দূরে একটি নিভৃত নিবাস নিলো স্থির করে। নতুন ঘরকন্নার তদারক করতে Mary আগেই চলে গেছে সেখানে। সারাদিন ক্লান্ত দেহে ঘুরে ফিরে Leslie এবার ফিরে চলেছে সেই নতুন জৌলসহীন সংসারে। আমার ভারি কৌতূহল হল। সন্ধ্যাটিও ছিল মনোরম; তাই আমিও বন্ধুর সঙ্গী হতে চাইলাম।

'বেচারি Mary'—চলতে চলতে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ভেঙ্গে পড়লো Leslie. আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—'কেন, কিছু কি হয়েছে তার?'

'সে কী?'—আমার প্রতি অধীর দৃষ্টি ফিরিয়ে বললে Leslie,—'এই বুভুক্ষুতার মধ্যে ছিট্‌কে পড়া,—দরিদ্র ঘরকন্নায় ঝি-র মত পরিশ্রম করতে বাধ্য হওয়া,—এ কী কিছুই নয়?'

আমি। এই পরিবর্তনে সে কী ক্ষুণ্ণ হয়েছে?

Leslie। ক্ষুণ্ণ! সে যেন মাধুর্য আর আনন্দ-কৌতুকের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে।

এর চেয়ে ভালো মনে আর কখনো দেখিনি আমি তাকে—প্রেম, কোমলতা আর সান্ত্বনায় ভরে উঠেছে সে আমার দৃষ্টিতে।

আমি। আশ্চর্য মেয়ে! আর তুমি নিজেকে গরিব বলছো বন্ধু,—এর চেয়ে ধনী কোনো কালে তুমি ছিলে না!

Leslie। ওঃ! বন্ধু, আজকের কুটীরের এই প্রথম সাক্ষাৎটি সারা হয়ে গেলে, মনে হয়, আমি শান্ত হতে পারতাম, আজই তার বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রথম দিন; ঘরকন্নার অকিঞ্চিৎকর উপাদান নিয়ে আজই তাকে প্রথম নাড়াচাড়া করতে হয়েছে,—সংসার-কর্মের ক্লান্তি আজ সে প্রথম অনুভব করেছে,—দরিদ্র সংসারের নিরুজ্জ্বলতা আজই তাকে প্রথম স্পর্শ করেছে। ক্লান্ত দেহ, উৎসাহহীন মন নিয়ে সে হয়ত এখন ভাবছে ভাবী দারিদ্র্যের দুঃসম্ভাবনার ছবি!

বন্ধুর কল্পনায় সম্ভাব্যতার ছাপ অনেকখানি ছিল, অস্বীকার করতে পারিনি;—তাই চুপ করেই হাঁটছিলাম।

বড়ো রাস্তা ছেড়ে ছোটো গলির মধ্যে ঢুকতে হল;—বনবীথিকার ছায়াচ্ছাদিত ছোট পথ নিঃসঙ্গতার অনুভূতি পরিপূর্ণ করে তুলেছিল;—কুটীর আমাদের দৃষ্টির সামনে এসে পড়েছিল। লোক-কবিদের জীবন-প্রচ্ছদ হিসেবে পরিবেশটি দরিদ্র ছিল, তবু তার চারপাশে ঘিরে ছিল মধুময় পল্লীস্বভাব।......ছোট ফটক পেরিয়ে গুল্মাবৃত হাঁটা-পথে কুটীরের দিকে এগিয়ে চলেছি,—গানের সুর শুনতে পেলাম, লেজ্‌লি আমার হাত চেপে ধরলো! আমরা থেমে গিয়ে শুনতে লাগলাম—Mary গাইছিলো মর্মস্পর্শী সরল ভঙ্গিতে, তার স্বামী এই সুর-ভঙ্গি ভারি ভালোবাসে!

লেজ্‌লির হাত কাঁপছিলো আমার হাতে; আরো স্পষ্ট শুনবার আগ্রহে সে এগিয়ে গেল;—হাঁটা-পথে আওয়াজ উঠল। উজ্জ্বল সুন্দর একটি মুখ জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখেই মিলিয়ে গেলো। তারপর শুনতে পেলাম লঘু পদক্ষেপ,—Mary ছুটে এলো আমাদের কাছে! একটি সুন্দর শাদা পল্লীপোশাকে সেজেছিল সে, অলকে গুঁজে দিয়েছিল শাদা বনফুল—সজীবতা যেন তার ঠোঁটে মুখে খেলা করছিল,—সারা দেহ হয়ে উঠেছিল স্মিতহাস্যে উজ্জ্বল। এমন অপরূপ মধুরতায় কখনো আমি তাকে আর দেখিনি!

'জর্জ আমার!'—বলে উঠল সে;—'এসেছো তুমি;—কী খুশি আমার! আমি তোমার পথে কেবল চেয়েই ছিলাম! গলি পথে কতবার ছুটে গেছি, দেখেছি তুমি আসছ কিনা! কুটীরের পেছনে একটা সুন্দর গাছের তলায় আমি টেবিল পেতেছি; —মিষ্টি স্ট্র-বেরি এনেছি জোগাড় করে, আমি তো জানি স্ট্র-বেরি তুমি কত ভালোবাস! আর কী ভালো মাখন যে পেয়েছি! সব কিছুই এখানে কী মিষ্টি!'

স্বামীর বাহুর পাশে নিজের বাহু দুটি জড়িয়ে তার চোখের ওপরে উজ্জ্বল দুটি চোখ রেখে Mary বললে,—'কী সুখে যে থাক্‌ব আমরা এখানে।'

বেচারা লেজ্‌লি অভিভূত হয়ে পড়েছিল। Maryকে সে বুকের মধ্যে টেনে নিলো,—নিজের বাহু দুটি ছড়িয়ে দিলো তার বাহুর দুপাশে—চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিলো তাকে! একটি কথাও বলতে পারলো না,—জল এসেছিল তার দুচোখ ছাপিয়ে!

পরে Leslie আবার সুদিনের মুখ দেখেছিল, তার জীবনও সত্যিই সুখী হয়েছে আগাগোড়া। তবু সে আমায় বারেবারে বলেছে, 'জীবনে এমন একটি অখণ্ড-পরম মুহূর্ত সে আর কখনো অনুভব করেনি!'—

কেবল লেজ্‌লি নয়,—এমন পরম অখণ্ড-মুহূর্ত মানুষের ইতিহাসে একান্ত কাম্য হলেও একান্ত দুর্লভ। নারীর মধ্যে পুরুষ তার সুখের সঙ্গিনীকে কামনা করে সন্দেহ নেই;—কিন্তু নারীর কাছে তার শ্রেষ্ঠ দাবি দুঃখ-দিনের পরমাশ্রয়। সর্ব দেশ-কালের পক্ষে নারীর এই কল্যাণময়ী ধাত্রী ভূমিকার চেয়ে সত্যতর পরিচয় পুরুষের চেতনায় আর কিছু নেই। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে স্বয়ং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বারোবছরের বনবাস-জীবনে ক্ষুধাতুর দৃষ্টিতে দ্রৌপদীর মধ্যে সেই নারী-স্বভাবকেই অহরহ সন্ধান করে ফিরেছেন। তাতেও তৃপ্তি নেই,—নারদকে ডেকে নারীর সেই একান্ত কাম্য পরিচয়কেই আস্বাদন করতে চেয়েছেন শ্রীবৎস-চিন্তা, নল-দময়ন্তী, সত্যবান্-সাবিত্রীর উপাখ্যান শুনে। মহারাজ রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে আসীন হয়ে সন্তান-সম্ভবা সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন অকারণে; কিন্তু নিজের বনযাত্রার মুহূর্তে সীতার সান্নিধ্যকে উপেক্ষা করবার সাধ্য ছিল না তাঁর! নিত্যকালীন পুরুষের কামনার এই মর্মময়ী শাশ্বত নারীমূর্তিকে এক মুহূর্তের ফলকে অখণ্ডরূপে বিম্বিত করে তুলেছেন Irving তাঁর গল্পে। ক্ষণ-জীবনের মুকুরে চিরন্তন জীবনাকাঙ্ক্ষার এই ব্যঞ্জনাই 'The Wife' গল্পকে ছোটগল্প করে তুলেছে। আর লক্ষ্য করতে হবে, গল্পের বস্তুগত অভিঘাতের চরম পরিণতি হিসেবেই শেষ মুহূর্তের আশ্বস্তি পূর্ণ ব্যঞ্জনা লাভ করতে পেরেছে। প্রত্যেক পট-পরিবর্তনের সঙ্গে লেজ্‌লির দুশ্চিন্তা, আক্ষেপ ও হতাশাকে শিল্পী নাটকীয় দৃঢ়বদ্ধতার মধ্যে তীব্র এবং সংসক্ত করে তুলেছেন,—ঘনতম মুহূর্তে সেই বিপরীত সম্ভাবনার বিস্ফোরণের কেন্দ্রভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে Mary-র অপ্রত্যাশিত অথচ একান্ত কাম্য আত্মোৎসর্জনের মধুরিমা। ছোটগল্প, আগেই বলেছি, সমকালীন বস্তুজীবনের বৃন্তে চিরন্তন জীবন-প্রত্যয়ের ব্যঞ্জনা।

অতএব, স্থূলভাবে, ছোটগল্পের বহিরুপাদান দুটি:

(১) একটি গল্প,—সমকালীন জীবনের সঙ্গে যার সম্পর্ক আংশিক হলেও একান্ত ঘন-নিবদ্ধ।

(২) দ্বিতীয়টি, গল্পের জীবন-ভূমির সঙ্গে শিল্পীর ভাব-লোকের একাত্মতা। আগের অধ্যায়ে বলেছি, এই দুয়ের সর্বাঙ্গীণ সমন্বয়ের সঙ্গম-মূলেই ছোটগল্পের শিল্প-ব্যঞ্জনা। এমন অবস্থায় ছোটগল্পের সঙ্গে গদ্যে রচিত অন্যান্য প্রকারের কথাশিল্পের অল্প-বেশি সাদৃশ্য রয়েছে। ঐ সকল আপাতসদৃশ রচনা-শৈলীর মূলগত বৈশিষ্ট্য বিশদ্ করে দেখলে ছোটগল্প-সাহিত্যের অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনা-ধর্মের স্বতন্ত্র স্বভাব আরো স্পষ্ট হতে পারে।

ছোট আকারের গল্পের একটি সুপ্রাচীন রূপ ধরা পড়েছে উপকথায়। ইংরেজিতে এই শ্রেণীর গল্পকে 'Fable' বলা হয়েছে। Johnson বলেছিলেন: "A fable or apologue seems to be, in its genuine state, a narrative in which irrational, and sometimes inanimate are, for the purpose of moral instruction, feigned to act and speak with human interests and passions।"[১০] আমাদের দেশে 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ' ঐ সব উপকথার স্বর্ণখনি; সোমদেবের সম্পাদিত গল্প-সংকলন 'কথাসরিৎসাগর'-কে এই শ্রেণীর রচনার বিশ্বসাম্রাজ্য বলা হয়েছে, ভারতের মাটিতেই এই গল্প-শৈলীর বিশেষিত বিকাশ ঘটেছিল। এখান থেকে পারস্য এবং আরব হয়ে ক্রমে এই শিল্পপ্রবাহ য়ুরোপের মাটিতে গ্রীস্-এ প্রথম পদক্ষেপ করে। হোমারের বহু আখ্যায়িকায় ভারতীয় কথার সাদৃশ্য রয়েছে। সে যাই হোক্, Boccaccio, Chaucer এবং La Fontane-এর মত শ্রেষ্ঠ য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রবর্তকেরা এই রচনা-শৈলীর দ্বারা প্রভাবিত যে হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।[১১] 'ঈশপের গল্প' ব'লে এদেশে যা প্রচলিত আছে, তার অধিকাংশই আসলে ভারতের পুরাতন উপকথার ইংরেজি ভাষায় পরিবর্তিত সংস্করণের ভারতীয় ভাষায় পুনরনুবাদ।

ইংরেজি ভাষায় যাকে 'Parable' বলা হয়েছে, বাংলা 'রূপকথা' নামটি হয়ত তাদের পক্ষেই সুব্যবহার্য। Parable রূপক গল্প,—সে গল্পে একটি রূপের আধারে নূতনতর আদর্শবোধকে রূপকাবৃত করে রাখা হয়। বিশেষ করে ধর্মতত্ত্ব-জ্ঞাপক রূপক গল্পকেই parable বলা হত। 'বাইবেল'-এ 'Prodigal Son'-এর সুপরিচিত গল্পটি একটি উৎকৃষ্ট parable—এই গল্পটিকে ছোটগল্প-লক্ষণাক্রান্ত বলেও দাবি করা হয়েছে।[১২] একালে রূপক-গল্প অর্থেই parable শব্দের সাধারণ ব্যবহার ঘটে থাকে।

'Tale' বা উপাখ্যান গল্প-সাহিত্যের সর্বদেশ-কাল-সাধারণ একটি বহু ব্যাপক

১০। 'Life of Gay';—'Encyclopaedia Britannica'-তে উদ্ধৃত। ১১। দ্রষ্টব্য:—N. M. Penzer (Ed.)—'The Ocean Stories'; (Translated by C. H. Tawney)—'Introduction' (New Ed.).

১২। দ্রষ্টব্য:—'Encyclopaedia Britannica.'

রূপাধার ;—"A general term in usual acceptance of the word, for fictitious narratives, long or short, ancient or modern."[১৩]—এই অর্থে 'Iliad,' 'Odyssey', 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' উপাখ্যানের মহাসমুদ্র।—আধুনিককালে ছোটগল্প নামে পরিচিত বহু রচনাও আসলে এই উপাখ্যান শ্রেণীর অন্তর্ভূত। বস্তুতঃ ছোট আকারের খণ্ডগল্প বা উপাখ্যানের পরিণতিতেই ছোটগল্পের জন্ম। স্বয়ং Irving লোক-প্রচলিত উপাখ্যানের ওপরে নির্ভর করে তাঁর ছোটগল্প-সাহিত্য রচনা করেছিলেন; নিজেই তিনি এ বিষয়ে নিঃসংশয় স্বীকৃতি রেখে গেছেন। একটি পত্রে Irving বন্ধুকে লিখেছিলেন: "I would give anything to be stretched on that sopha you talk of and to have the historical society collected round me. I could tell them such stories! Since I left them I had fallen in with another old woman and have got from her a whole budget of tales......I speak with confidence of my new stock of the stories, for I have tried them on several convocations of the most experienced little story-mongers in all Birmingham."[১৪]

Irving তাঁর গল্পের উপাদান সংগ্রহ করতেন প্রাচীন বৃদ্ধাদের কাছ থেকে,—সকল দেশেই এঁরা গল্পের চিরকালীন বিশ্বকোষ। কিন্তু ছোটগল্পকার Irving-এর শিল্পীর ভূমিকা এখানে নয়; সেই চিরাগত উপাখ্যানকে নিজ প্রাণের প্রত্যয়-রসে নিষিক্ত-সংহত করে এক অপরূপ ব্যঞ্জনা দিয়েছেন তিনি। বস্তুত:—"The leisurely tale of the writing, old-style, has become the short story of to-day, in which nearly everything depends on narrative speed and the climacteric sensation."[১৫]—চরম মুহূর্তের এই আবেগ উৎসার ('climacteric sensation')-এর বৈশিষ্ট্যেই ছোটগল্প অপরাপর উপাখ্যান এবং বড়গল্প (Novelette) থেকে স্বতন্ত্র। 'Ripvan Winkle'-এর গল্প প্রসঙ্গে উপাখ্যানের স্বভাব বিবৃত করে বলেছি। আর novelette বা বড়গল্প সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য, এই শ্রেণীর শিল্প-কৃতি উপন্যাসের সগোত্র। বড়গল্প ছোট আকারের উপন্যাস;—উপন্যাসের মতই ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য এবং জটিলতার বিবৃতি (narration) বড় গল্পেরও স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, উপন্যাসের তুলনায় বড় গল্পের কাহিনীর (plot) আকৃতিই মাত্র সংক্ষিপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'যুগলাঙ্গুরীয়' এবং 'রাধারাণী' বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট বড় গল্পের নিদর্শন।

১৩। তদেব। ১৪। দ্রষ্টব্য:—'Van Wyck Brooks—The World of Washington Irving'

১৫। Ernest Rhys and Dawson Scott. (Ed.)—'Tale from Far and Near: 'Foreword'

এই রচনা দুটিকে বঙ্কিমের ছোটগল্পের পর্যায়ভুক্ত করা হয় ;—কারণ বঙ্কিমের বিস্তারধর্মী রচনার তুলনায় এদের দীর্ঘতা অপেক্ষাকৃত কম। এমন কথাও বলা হয়েছে যে, প্রথমে 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারাণী' এবং 'রাজসিংহ' এই চারটিই ছোটগল্প ছিল ; পরে বঙ্কিম 'ইন্দিরা' ও 'রাজসিংহ'কে বৃহদায়তন উপন্যাসরূপ দিয়েছিলেন ; অতএব ছোটগল্প হিসেবে বাকী দুটিমাত্র রইল অবশিষ্ট। অর্থাৎ, ছোটগল্প যেন উপন্যাসেরই সংক্ষিপ্ত রূপ! বারে বারে বলেছি, উপন্যাস আকারে ছোট হলে ছোটগল্প হয় না ;- হয় বড়গল্প। বঙ্কিমের সংক্ষিপ্ত গল্প দুটি ঐ পর্যায়ে পড়ে। 'যুগলাঙ্গুরীয়'তে কাহিনীর (plot) আপেক্ষিক সংক্ষিপ্তির সঙ্গে উপাখ্যান-সুলভ একটি রহস্যময়তাও ছিল।—গল্পের শেষে ঘটনার নাটকীয় অভিঘাতের মুখে সেই রহস্যাবরণকে উন্মোচিত করা হয়েছে,—"রাজা কহিলেন, —'হিরন্ময়ি, ইনিই তোমার স্বামী।'

"হিরন্ময়ী চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল—জাগ্রত-স্বপ্নের ভেদ-জ্ঞানশূন্যা হইলেন। দেখিলেন পুরন্দর!

"উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত উন্মত্ত-প্রায় হইলেন। কেহই যেন কথা বিশ্বাস করিলেন না।"

এই চরম মুহূর্তেও গল্পের পটক্ষেপ করে বঙ্কিমের তৃপ্তি নেই ; সেমুহূর্ত যত গভীর-অতলান্তই হোক্, বঙ্কিমের পূর্ণ জীবনায়নের সাধনায় তার কোনো মূল্য নেই। 'চন্দ্রশেখরে' 'অগাধ জলে সাঁতার'-এর চরম সৌন্দর্যবিন্দুকে তিনি ভেঙে বিচূর্ণ অনায়াসে করে দিতে পারেন 'যোগবল' বা 'Psychic Force'-এর জীবন-জিজ্ঞাসায়। এখানেও বঙ্কিম তাই করেছেন ;—হিরন্ময়ী-পুরন্দরের পরম মিলনের মুহূর্তকে পূর্ণতর পরিচিতি দিয়েছেন নিতান্ত স্থূল ঘটনার মাধ্যমে পূর্বকথার রহস্যাবরণ দীর্ণ করে। এক নিশ্বাসে যত কথা বলা যায়, তাতেও সব কথা বলা হল না ; তখন হিরন্ময়ীকে দিয়ে বঙ্কিম নতুন প্রশ্নের সূত্র রচনা করলেন ; সকল প্রসঙ্গ, সকল কৌতূহল আগাগোড়া শেষ করে তবেই তিনি থামতে পেরেছেন।

তাছাড়া নাটকীয় দ্রুততার মধ্যে গল্পের সমাপ্তি বিহিত যদি হত-ও, তবু 'যুগলাঙ্গুরীয়' ছোটগল্প হতে পারত না। কারণ ছোটগল্পের আঙ্গিকের মূলে তার ভাবগত স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের প্রণোদনা রয়েছে। শিল্পীর চেতনালীন নিশ্চিত প্রত্যয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে জীবন-চিত্রণের সংবৃতির সহজ প্রবণতাই সে বিশিষ্টতার মূল। অতএব চলমান জীবন-ভূমির প্রতি ভারসম প্রত্যয়ের একান্ততা স্রষ্টার চিত্তে যতদিন জাগেনি, ছোটগল্প-কলার সহজ স্ফূর্তি ততদিন পর্যন্ত সম্ভব নয়। বঙ্কিমের শিল্পি-চেতনার মূলে একটি জীবন-বিশ্বাস ক্রমশ বিকশিত হয়ে উঠছিল ;—তাঁর সমকালীন বাংলার নাগরিক সমাজের সার্বিক আদর্শ-

সংঘাতের মধ্যেই সেই বিশ্বাসের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা।[১৬] বঙ্কিমোত্তর বাঙালি সমাজে শিল্পি-ব্যক্তির আত্মস্থতার মধ্যে সেই জীবন-প্রত্যয় সংশয়হীন অবিচল আদর্শের রূপ লাভ করেছে। তারই ফল,—বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের দ্বান্দ্বিক জীবন-পরিচয় পূর্ণ অভিব্যক্তি পেয়েছে। আর বঙ্কিমোত্তর কালে রবীন্দ্রনাথের হাতে সংঘাতময় জীবনের দ্বন্দ্বাতীত পরিণাম-প্রত্যয়ের মধ্যে বাংলা ছোটগল্প-কলা প্রথম সার্থক মুক্তি পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে শিল্পি-ব্যক্তির আত্মস্থ জীবন-প্রত্যয়ের বিশদ পরিচায়ন প্রয়োজন। জীবন সম্বন্ধে একটি অবিচল প্রত্যয় বলতে অপরিহার্যভাবে কোনো নির্দ্বন্দ্ব সমাজ-ব্যবস্থার কথা কল্পনা করার কারণ নেই। বস্তুত বহু উৎকৃষ্ট ছোটগল্প জীবনাদর্শের সংঘাতময় পটভূমিতে জন্মলাভ করেছে,—রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' তাদের মধ্যে একটি। 'চোখেরবালি' উপন্যাস এবং 'নষ্টনীড়' গল্পের রচনা ও প্রকাশকাল প্রায় অভিন্ন। কাহিনী দুটিতে জীবন-সমস্যার মূলগত স্বভাবও প্রায় এক,—পরিবার-কেন্দ্রিক সমাজ-মূল্যবোধের চিরাগত ভূমিকায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যময়ী নবীনা নারীর আত্মবিকাশ ও প্রতিষ্ঠার সমস্যা দুটি কাহিনীরই প্রাণ। এমন অবস্থায় উপন্যাসের কলা-কৃতির বিচারে 'চোখেরবালি' যত পূর্ণাঙ্গ, ছোটগল্প হিসেবে 'নষ্টনীড়' তার চেয়ে অনেক বেশি সার্থক। 'চোখেরবালি' সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ অভিযোগ,—সুবিপুল গ্রন্থের অপার বিস্তৃতি ও জটিলতাকে রবীন্দ্রনাথ একমুহূর্তে হ্রস্ব ও সরল করে ফেলেছেন অকস্মাৎ;—বিহারীর কণ্ঠে বিনোদিনীর স্বীকৃতির মুহূর্তে গল্প হঠাৎ এসে থেমে গেছে। উপন্যাসেব ক্ষেত্রে কাহিনীর এই আকস্মিক স্তব্ধতা জীবনের আদি-অন্তে পরিপূর্ণ পরিচয় লাভের আকাঙ্ক্ষাকে আহত করে। নর-নারীর জীবনমূল্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নির্দ্বন্দ্ব প্রত্যয় চরম পরিণতির মুখে গল্পের রাশ টেনে ধরেছে,—উপন্যাসকে করেছে হঠাৎ সমাপ্ত।

কিন্তু কবি-শিল্পীর এই অবিচল জীবন-প্রত্যয়ই 'নষ্টনীড়'-এর ছোটগল্প-রূপকে পূর্ণাঙ্গ সুন্দর করেছে। ধনীর দুলাল ভূপতির অনবধানের মধ্যে কখন যে তার "বালিকা বধূ চারুলতা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ" করেছিল, সে খবর রাখবার উপায় ছিল না তার,—নিজ ব্যয়ে প্রকাশিত খবরের কাগজের সম্পাদনায় সে তখন নেশাগ্রস্ত। ধনীগৃহের বধূ চারুর নিজের হাতে করবার মত কাজও প্রচুর ছিল না।—অতএব, "ফলপরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিনরাত্রির একমাত্র কাজ ছিল।" কিন্তু জগতে ফলকামনাই ফুলের স্বভাব-ধর্ম;—সেই পরম পরিণামের আকাঙ্ক্ষায় উপযুক্ত মধুপের আগমনপথে সে উন্মুখ হয়ে থাকে নিজের মর্মমূলে।

১৬। দ্রষ্টব্য :—ভূদেব চৌধুরী—'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' (দ্বিতীয় পর্যায়—চতুর্থ সং) 'বাংলা সাহিত্যের যৌবন-মুক্তি—বাংলা উপন্যাস'।

চারুর জীবনে ভূপতির উপেক্ষার ভার লাঘব করতে এল দূর সম্পর্কের দেওর অমল,—কিন্তু নারীর মৌল আকাঙ্ক্ষার পথ বেয়ে ক্রমে যে সে চারুর হৃদয়ের গোপন গহনে এগিয়ে আস্‌ছিল, দুজনের কেউই সে খবর রাখেনি। তাহলেও চারুর নারী-চেতনার মর্মতলে অমল একচ্ছত্র হয়ে উঠেছিল ;—ভূপতি হয়েছিল চির-নির্বাসিত। সে খবর প্রথম আবিষ্কার করল স্বয়ং ভূপতিই,—খবরের কাগজের বেসাতিতে সর্বস্ব হারিয়ে সে চারুকে জড়িয়ে ধরতে এসেছিল। সেই চরম মুহূর্তে তাকে আবিষ্কার করতে হল,—সেখানেও তার ভরাডুবি হয়ে গেছে। দাম্পত্য-সম্পর্ক বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণ, বা একসঙ্গে জীবন যাপনের আবশ্যিক ফল নয় ; দাম্পত্য একটি 'আর্ট'—এখানে স্বামি-স্ত্রীর হৃদয়ের সম্পদ দিয়ে প্রেমের দেউল নিত্য নূতন করে সাজাতে হয়। এই সাধনায় কোথাও অবধানের ত্রুটি ঘটলে প্রেমের দেবতা জীবনের ওপরে চরম প্রতিশোধ নেন ;—রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের কালের জীবনকে এই সত্য উপলব্ধির পরিচয়টুকু দিতে চেয়েছিলেন 'নষ্টনীড়' গল্পের মধ্যে। কিন্তু এই প্রতিশোধের চিত্রাঙ্কনে লেখনীকে তিনি হঠাৎ স্তব্ধ করেছেন। ঘরে-বাইরে জীবনের ভরাডুবির খবর নিয়ে সর্বনাশ-আহত ভূপতি চারুর ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছিল ;—ঠিক ঐ সময় ঝড়ের মত চারুর ঘরে যাবার মুখে অমল ভূপতির চেহারা দেখে আঁৎকে উঠেছিল। কিন্তু চারুর কাছে সে কথা পাড়তেই উপেক্ষাভরে সে তা এড়িয়ে গেল। ভূপতির কথা ভাববার অবকাশ নেই তার,—চারুর মধ্যে সে মন চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে ; সেই মুহূর্তে হঠাৎ এই খবর আবিষ্কার করে অমল অভিভূত হয়ে পড়ল।—সে "একবার তীব্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চারুর মুখের দিকে চাহিল—কী বুঝিল, কী ভাবিল জানি না। চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। পর্বত পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময়ে মেঘের কুয়াশা কাটিবামাত্র পথিক যেন চম্‌কিয়া দেখিল, সে সহস্র হস্ত গভীর গহ্বরের মধ্যে পা বাড়াইতে যাইতেছিল। অমল কোন কথা না বলিয়া একেবারে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।"

এ-চমক কেবল অমলের নয়। 'নষ্টনীড়' গল্পের স্রষ্টারও। নারীর কল্যাণমূর্তিতে একান্ত প্রত্যয়ান্বিত কবি রবীন্দ্রনাথ, অমল ও চারুর জীবন-পরিণতিকে আরো দূরে টেনে নিতে পারেন নি—স্তব্ধ করে দিয়েছেন চারুর আত্মদর্শনে-অভিভূত অসহায়তার ব্যঞ্জনার মধ্যে। 'নষ্টনীড়' 'পোস্টমাস্টার'-এর চেয়ে ছোটগল্প হিসেবে উৎকৃষ্ট। রতনের জীবন-বেদনার অতলস্পর্শতাকে সর্বাতিশায়ী ব্যঞ্জনা দেবার জন্যে কবিকে নিজের কথার মালা গাঁথতে হয়েছে। কিন্তু 'নষ্টনীড়' গল্পের পরিসমাপ্তিতে চারুর কণ্ঠে—"না থাক্‌"—এই একটিমাত্র উক্তি নাটকীয় সংক্ষিপ্তি ও সংহতির গভীর ফলকে এক বিড়ম্বিত নারী-জীবনের আমূল জটিল রূপকে প্রাণ-ব্যঞ্জিত করে তুলেছে।

অতএব, দেখছি, এক যুগসন্ধির সমাজ জটিলতার ট্রাজিক ফলশ্রুতিটুকুই

'নষ্টনীড়' গল্পের বিষয়বস্তু। রবীন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন এই ভারসমতাহীন সমাজের অন্যতম সামাজিক। কিন্তু সেই ভঙ্গুরতার মধ্যেও মহত্তর জীবন-পরিণাম সম্বন্ধে তাঁর কবিমনের অটুট প্রত্যয় গল্পের কাঠামোকে নিত্যকালীন জীবনধর্মের সঙ্গে মানব-রসে অন্বিত করেছে।

১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে রুশ সাহিত্যের দুটি বিখ্যাত ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল। একটির লেখক পুশ্‌কিন,—গল্পের নাম 'The Queen of Spades'; আর গোগোল লিখেছিলেন 'The Cloak' পুশ্‌কিন রুশভাষার শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক; কিন্তু গোগোল-এর 'The Cloak' গল্প রচনার পর থেকে রুশীয় ছোটগল্প তার স্বাতন্ত্র্যের নিজস্ব রূপ খুঁজে পেয়েছে। রুশ লেখক একজন নাকি বলেছিলেন, "আমরা সবাই গোগোলের 'ক্লোক্' থেকে জন্ম নিয়েছি।"[১৭] এর কারণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "The Cloak for the first time strikes that truly Russian note of deep sympathy with the disinherited."[১৮]

রুশদেশে তখনো 'জার'-এর আধিপত্য চলেছে; একদিকে ধনতান্ত্রিক শক্তির যথেচ্ছাচার-স্ফীত দম্ভ,—অপরদিকে সর্বহারা জনের নগ্ন লোলুপতা;—সমাজের উভয় পর্যায়েই জীবনের পঙ্কিল নর্দমা তৈরি হচ্ছিল। পুশ্‌কিন্-এর গল্পেও তার পরিচ্ছন্ন ছবি রয়েছে। কিন্তু গোগোল ঐখানেই থামেন নি; সেই বিনষ্টির যুগেও আর্থিক দৈন্যের অন্তরালবর্তী মানবিকতার বিপন্ন আক্রুষ্ট রূপটিকে রক্তক্ষরা সমবেদনার ভাবায় জীবন্ত করে তুলেছেন। স্বৈরাচারী সমাজের পীড়নে মানবতার মহানিপাতকে প্রতিরোধ করবার সংগ্রামী প্রত্যয় গোগোলের গল্পকে একটি সর্বদেশকালীন ট্রাজিক্ ব্যঞ্জনা দিয়েছে। উত্তরাধিকারহীন মনুষ্যত্বের প্রতি এই মমতাময় বিশ্বাসই রুশীয় ছোটগল্পের প্রাণকেন্দ্র।

এই অর্থেই বলেছি, সংগ্রাম অথবা শান্তি, অসাম্য অথবা সমতামূলক যে-কোনো জীবনের ভূমিতে শিল্পি-ব্যক্তির দৃঢ় জীবন-প্রত্যয় ছোটগল্পের ক্ষণ-মুকুরে চিরন্তনতাময় জীবনছবিকে বিম্বিত করে থাকে। এই প্রসঙ্গে ছোটগল্প এবং ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত প্রবন্ধ-('Essay')-সাহিত্যের সাদৃশ্য এবং পার্থক্যও যুগপৎ লক্ষণীয়। ব্যক্তিত্ব-ধর্মী প্রবন্ধের একমাত্র বিষয়বস্তু স্রষ্টার ধ্যানী ব্যক্তিত্বের আত্ম-উপভোগ। যে-কোনো বিষয়ের গল্প, বর্ণনা বা বিবৃতি যা-কিছুই থাক্ না কেন, সকল কিছুকে উপলক্ষ্য করে স্রষ্টা সেখানে নিজেকেই আস্বাদন করেন। অন্যদিকে বলেছি, ছোটগল্প-লেখকের ব্যক্তিত্ব-নিহিত

১৭। দ্রষ্টব্য:—T. Seltyer (Ed.)—'Best Russian short stories,'—Introduction.
১৮। তদেব।

জীবন-প্রত্যয়ের অবিচলতাই ছোটগল্পের পরিণামী রসব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে থাকে। ফলে অনেক সময়ে ব্যক্তিত্ব-ধর্মী প্রবন্ধ সাহিত্যকেও ভুল করে ছোটগল্পের অভিধায় তুলে ধরা হয়। Nathaniel Hawthorne-এর 'Twice Told Tales'-এর অনেক কয়েকটিই যে 'Essay', Edgar Allen Poe সে কথা স্বীকার করেছেন।[১৯] অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথমতম একটি ছোটগল্প 'রাজপথের কথা' 'রাজপথ' নামে প্রথমে 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র অন্তর্ভূত হয়েছিল।[২০] Hawthorne-এর 'Twice Told Tales'-এ, Poe বলেছেন, 'Sunday at Home' একটি উৎকৃষ্ট 'Essay'। লেখাটি খুললেই দেখব—Hawthorne রবিবারের সারাদিন নিজের নিঃসঙ্গ জানালায় বসে রাস্তার পরপারের গীর্জার জনসমাগম দেখছিলেন,—আর তাঁর নিভৃত মন দোলায়িত হয়ে উঠ্‌ছিল ভাবনায় ভাবনায়! একক মনের সেই ব্যক্তিগত ভাবনার কম্পনই 'Sunday at Home'-এর একমাত্র আস্বাদ্য উপাদান। অপর দিকে 'রাজপথের কথা'তেও অসীমাভিসারী রবীন্দ্র-কবি-ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ ব্যঞ্জনা পেয়েছে। নিজের দেশকালকে আশ্রয় করে অনন্ত দেশ-কালের মধ্যে নিজেকে প্রসৃত করে দেবার,—সীমার সঙ্গে অসীমের অন্তরঙ্গ অবিচ্ছিন্ন মিলন সাধনই রবীন্দ্র-কবি-ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা। রাজপথের ধূলিকণার সঙ্গে নিজের আত্মার আকাঙ্ক্ষাকে একান্ত সম্পৃক্ত করে রবীন্দ্রনাথ 'রাজপথে'র বকলমায় নিজের আত্মকথাই বলেছিলেন। এই অর্থে 'রাজপথের কথা' একটি ব্যক্তিত্ব-ধর্মী সাহিত্য-প্রবন্ধ। কিন্তু নিজের সীমাতেই নিজেকে নিয়ে কবি বদ্ধ থাকেন নি;—একটি বালিকার দুঃখকে,—যে বালিকার 'ঠোঁটদুটি কথা কহিবার ঠোঁট নহে', যার 'বড়ো বড়ো চোখ দুটি সন্ধ্যার আকাশের মতো বড়ো ম্লানভাবে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত,'—সেই বালিকার দুঃখকে নিজের আর্ত আকাঙ্ক্ষার সূত্রে গেঁথে অনন্তজীবনের বেদনাবিদ্ধতাকে ব্যঞ্জিত করে তুলেছেন সেই ছোট্ট জীবনের মুকুরে। তাই—উপেক্ষিতা বালিকার মর্ম-ফলকে অনন্তজীবনের ক্ষণ-বিম্ব বলেই—কবি-কথার প্রাধান্য সত্ত্বেও 'রাজপথের কথা' ছোটগল্প।

অতএব, ছোটগল্প-কলা ও তার ভাব-স্বরূপের নিয়ামক উপাদান দুটি;—(১) বস্তুময় জীবন-ভূমি এবং (২) স্রষ্টার ব্যক্তিগত উপলব্ধির প্রত্যয়-ব্যঞ্জনা। জীবন-পটভূমির বিবর্তন এবং স্রষ্টার ব্যক্তি-স্বভাবের পরিবর্তনের সূত্র অনুসারে ছোটগল্পের রূপ-শৈলী ও ভাব-স্বরূপেরও বিবর্তন-পরিবর্তন ঘটে থাকে। বাংলা ছোটগল্প আলোচনার পূর্বভূমিতে এই সিদ্ধান্তের সত্যতা চিরস্মরণীয়।

১৯। দ্রষ্টব্য:—E. A. Poe—Nathaniel Hawthorne'—Works of Edgar Allen Poe, Vol. III. ২০। দ্রষ্টব্য:—রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ('রবীন্দ্র রচনাবলী'—৫ম-'গ্রন্থপরিচয়')।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্প : জন্মকথা

শিল্পের জগতে সুবিন্যস্ত কলা-রূপ কালের হাতের রচনা। মহাকাল অনন্ত জীবনের মহাশিল্পী ;—তাঁর চারণ-পথে জীবনের বিবর্তমান রূপ কেবলই নিত্য-নতুন এবং বিচিত্র হয়ে উঠ্‌ছে।

এই নিয়ত বিকাশমান জীবন-স্বভাবের নব নব অনুভবকে আস্বাদন করবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই মানুষের হাতে শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি। আবার জীবন-অনুভবের অভূতপূর্বতাই নতুন ভাবনার সঙ্গে নবীন রূপ-রচনার পথেও শিল্পীর চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। এদিক থেকে সুচিহ্নিত জীবন-চিন্তা সুবিন্যস্ত নূতন কলাঙ্গিকের জন্ম দিয়ে থাকে। অতএব কালের হাতে একটি বিশেষিত জীবন-রূপ যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ অবয়ব না পাচ্ছে,—যতক্ষণ সেই জীবন সম্বন্ধে শিল্পী ও তাঁর সমকালীন চিন্তা স্পষ্ট-সংজ্ঞক হতে না পারছে, ততদিন পর্যন্ত সেই বিশেষ জীবন-স্বভাবের পরিব্যঞ্জক নতুন রূপাঙ্গিকের জন্ম সম্ভব নয়। আগের আলোচনায় দেখেছি, শেক্‌স্‌পীয়রের নাট্য-সাহিত্যে উপন্যাসের অনেক কয়টি উপাদান পূর্ণ বিকশিত হয়ে থাকলেও তাঁর একটি রচনাও উপন্যাস হয়ে ওঠে নি ; কারণ উপন্যাস-কলা সৃষ্টির উপযোগী জীবন-প্রচ্ছদ শেক্‌স্‌পীয়রের যুগের ইংলণ্ডে গড়ে ওঠে নি।

এ-সব কথাই পূর্বে বিশদ আলোচিত হয়েছে। তা হলেও দেখব, সাহিত্য-শৈলীর ইতিহাসে পূর্বাগম নিতান্ত দুর্লভ নয় ; মহাকাব্যের মধ্যে নাট্যকলার অপূর্ণ অঙ্কুর আত্মগোপন করে আছে,—উপন্যাসের অগঠিত আধারে লুকিয়ে আছে ছোটগল্পের অস্বচ্ছ সম্ভাবনা ;—এমন অবস্থাকে নেহাৎই কাকতালীয় বলা চলে না। কালের প্রগতির ধারায় জীবন নিছক নব জন্মলাভই করছে না ; অর্থাৎ, তার পুরাতন পরিচয় একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়ে আবার এক আমূল নতুন রূপ দেখা দেয় না। বরং পুরাতনের সুপ্ত অগঠিত অঙ্কুরই নতুন বিকাশ ও পরিণতি খুঁজে পায় কালে কালে। এমন অবস্থায় জীবনের সকল পর্যায়ের মধ্যেই তার সব কটি উপাদান নিহিত রয়েছে ;—সদ্যোজাত শিশু-দেহের গভীরে যেমন গোপন থাকে তার শৈশব-বাল্য-কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ়ীয় ক্রম-বিকাশের সম্ভাবনা। কালের প্রভাবে মানবদেহের ভারসম অবস্থাকে ছাপিয়ে কখনো শৈশবের, কখনো বা বাল্য ইত্যাদির বিশেষ লক্ষণ একান্ত হয়ে ওঠে। তখনই ঐসব অবস্থা আমাদের বোধগম্য হয়। কিন্তু দূরদৃষ্টি যার আছে, তিনি 'শিশুর মধ্যেই ভবিষ্যৎ

পিতা'কে প্রত্যক্ষ করতে পারেন ; অর্থাৎ শিশুর অবচেতনার মধ্যে পিতৃত্ব লক্ষণের যে-সব উপাদান আচ্ছন্ন হয়ে আছে, দূরদর্শয়িতার অনুভূতির আলোকে কচিৎ-কখনো তা পূর্ব-আভাসিত হয়ে ওঠে। এইভাবেই কোনো কোনো সার্থক শিল্পীর রচনার অতলে অনাগত কালের কলা-শৈলীর সম্ভাবনা কচিৎ কখনো ব্যঞ্জিত হয়ে থাকে। ছোটগল্প-রূপ সম্বন্ধেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি :—"The short story has always existed, though it was not until the 19th century, that the art of writing it was consciously practised. As Sophocles said of Aeschylus, these early authors of short stories did the right thing without knowing why."[১]

'নিউ টেস্টামেণ্ট'-এ 'Prodigal Son'-এর গল্পকে অনুরূপ অবচেতন ছোটগল্প রচনার একটি নিদর্শন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ছোটগল্পের রূপাঙ্গিক সেই অসচেতন লেখায় পূর্ণায়ত হতে পারেনি, এ-কথা বলাই বাহুল্য। অধ্যাপক বল্‌ডুইন Boccaccio-র 'Decameron'-এর দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় গল্প এবং নবম দিনের ষষ্ঠ গল্পকেও ছোটগল্পের পর্যায়ভুক্ত করতে চেয়েছেন ;—সারাটি বই-এর ১০০টি গল্পের মধ্যে, তাঁর মতে, ঐ দুইটিই কেবল 'যথার্থ ছোটগল্প'।[২] কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখব, ঐ গল্প দু'টিতেও জীবনবোধের অনুভূতি নিবিড়ভাবে কেন্দ্রিত হতে পারেনি কোথাও ; —অনির্বাচ্য ব্যঞ্জনাধর্মিতার তো প্রশ্নই ওঠে না। এমন কি, উনিশ শতকে Irving-এর রচনাতেও দেখেছি ছোটগল্পের রূপাঙ্গিক এবং ভাব-ব্যঞ্জনা সর্বত্র সুপরিণতি লাভ করেনি। আগেই বলেছি, ছোটগল্প লিখবার জন্যই Irving গল্প লেখেননি ; এ-ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো যথার্থ-শিল্পীই রচনায় ব্রতী হন না। ভাবানুপ্রেরিত শিল্পীর মনে রূপের বিন্যাস ঘটে স্বতঃস্ফূর্তির অজ্ঞাত পথ বেয়ে। Irving-এর বেলাতেও তাই হয়েছিল,— প্রথমে তাঁর গল্পগুলি কেবল উপভোগ্যতার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়। ক্রমশ সেই নির্বিশেষ আকাঙ্ক্ষা সুচিহ্নিত অবয়বের মধ্যে বিশেষিত হয়েছে। সব শেষে, কাহিনী (plot) বা নাটকীয় অভিঘাত (dramatic action)-এর প্রতি লক্ষ্য মাত্র না করে পাঠকের মনে তিনি একটি সবিশেষ মনোভাবনা (mood),—একটি আবেগ-কম্পিত পরিবেশ (atmosphere) রচনা করে তুলেছেন।[৩]

কিন্তু Irving-এর রচনাতেও ছোটগল্প তার পূর্ণাঙ্গ-স্বাতন্ত্র্যে দীপ্ত হয়ে ওঠেনি ;— তার জন্যে কালের হাতের পরিমার্জনা, তথা সচেতনতর জীবন-চিন্তা বিকাশের অপেক্ষা ছিল। Irving-এর নিজের দেশে Edgar Allen Poe এবং য়ুরোপের পূর্ব প্রত্যন্তে

১। দ্রষ্টব্য :—'Encyclopaedia Britannica'—'Short Story'.
২। দ্রষ্টব্য :—তদেব। ৩। দ্রষ্টব্য :—তদেব।

রুশ-শিল্পী Gogol ছোটগল্পের কলা-কৃতিকে প্রথম পূর্ণ পরিণতি দিলেন। কৌতুকের কথা এই, শিল্পী দুজনেরই জন্মসাল অভিন্ন,—১৮০৯ খ্রীস্টাব্দ। কিন্তু Irving থেকে পো-গোগোল-এর কাল পর্যন্ত প্রতীচ্য পৃথিবীতে অসংখ্য ছোটগল্প এবং গল্প-লেখকের অভ্যুদয় ঘটেছে। ছোটগল্প-রচনার প্রথম পর্যায়ে এঁদের ভূমিকাও অবিস্মরণীয়।

সকল সৃষ্টির পেছনেই প্রয়োজনের তাড়না রয়েছে। সাহিত্যের জগতে সেই প্রয়োজন-বুদ্ধির বিকাশ দ্বিমুখী। শিল্পীর মনোলোকে নবজীবন-বোধের তাড়না নবীন সৃষ্টির পথকে অবারিত করে;—তার গোপন প্রক্রিয়া চলে লোকচক্ষুর অন্তরালে। আর একদিকে পারিপার্শ্বিক জীবনের লোক-গ্রাহ্য প্রয়োজনের প্রভাবও শিল্পীর ওপরে কম নয়। য়ুরোপ ভ্রমণকালে আর্থিক প্রয়োজন অ-পরিহার্য না হলে Irving তাঁর 'Sketch Book'-এর গল্প কবে লিখতে শুরু করতেন বলা দুষ্কর। শুধু তাই নয়, Irving-এর সমকালে এবং তারপরে ছোট আকারের গল্প লেখার এক নূতন প্রয়োজন আমেরিকায় একান্তভাবে দেখা দিয়েছিল অজস্র প্রকাশিত সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকার তাগিদে। প্রাক্-পো যুগের অসংখ্য অখ্যাত ছোটগল্প-রচয়িতার প্রেরণা-উৎস ছিল এখানেই।

বাংলা সাহিত্যেও ছোটগল্পের প্রথম অসচেতন বিকাশ সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকার প্রয়োজনের পথ বেয়ে। সংক্ষিপ্ত পরিসরের সীমায় সাহিত্যের সকল শাখারই একটি হ্রস্ব-হলেও পূর্ণাঙ্গ আস্বাদন পরিবেশন করা সাময়িক সাহিত্য-পত্রের সাধারণ উদ্দেশ্য। উপন্যাসের আধারে গল্প-রস পূর্ণাঙ্গ হলেও সাময়িক পত্রিকার বহু-রুচি-চারণের পক্ষে তার পরিধি অতিমাত্রিক। অতএব সীমিত পরিসরে অনুবৃত্তিহীন সম্পূর্ণ গল্প পরিবেশনের আকাঙ্ক্ষাতেই ছোট আকৃতির উপন্যাস বা বড়গল্প (Novelette) জাতীয় রচনা বাংলা সাহিত্যে বহুল প্রচলিত হয়ে পড়ে। এই সব ছোট আকারের গল্পের বাহুল্য থেকেই শিল্পীর অবচেতনার মধ্যে অজ্ঞাত মুহূর্তে বাংলা ছোটগল্প প্রথম জন্মলাভ করে। অতএব বাংলা ছোটগল্পের প্রথম জনয়িতা যিনিই হোন্ না কেন, সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকাই তার প্রথম যথার্থ ধাত্রী।[8]

বাংলা ভাষায় সাহিত্য-সাময়িক হিসেবে 'বঙ্গদর্শন' কেবল নূতন যুগের পথিকৃৎ-ই নয়; নবজীবনের ধারাবাহকও। ১২৭৯ বাংলা সালের প্রথমাবধি 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশ বাঙালির রস্-বাসনা ও জ্ঞান-পিপাসার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্যের সূচনা করেছিল। বস্তুত 'ভারতী', 'সাধনা', 'হিতবাদী', 'নবজীবন', 'সাহিত্য' ইত্যাদি উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পত্রিকার অজস্র প্রবাহ 'বঙ্গদর্শনে'র জীবন-প্রেরণারই উৎসজাত। তাছাড়া

৪। ব্যাপক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য :—ডঃ শিশিরকুমার দাশ—'বাংলা ছোটগল্প'।

শুধু সেকালেরই নয়, একালের সাহিত্য-পত্রিকাবলীও অনেকাংশে 'বঙ্গদর্শনে'র ভাব ও আঙ্গিকগত আদর্শ আজ পর্যন্ত অনুসরণ করে চলেছে। ছোট আকৃতির গল্প রচনা, তথা ছোটগল্প লেখারও প্রয়োজন-প্রেরণা প্রথমে যুগিয়েছে এই 'বঙ্গদর্শন'ই।

প্রথম বর্ষের (১২৭৯) 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম ছোট আকারের গল্প লিখলেন,—'ইন্দিরা'।[৫] বড় উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' শেষ হয় ঐ বছরের ফাল্গুন মাসে। সুদীর্ঘ অনুবৃত্তি-খণ্ডিত সেই উপন্যাসের পরে 'ইন্দিরা' একটিমাত্র সংখ্যায় সমাপ্ত। ১২৮০ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হল আদ্যন্ত সম্পূর্ণ 'যুগলাঙ্গুরীয়'। 'যুগলাঙ্গুরীয়' এবং 'ইন্দিরা'কে 'বঙ্গদর্শনে' 'উপন্যাস' নামে পরিচায়িত করা হয়েছে। পূর্বের অধ্যায়ে আমরাও বলেছি, গল্প দু'টি উপন্যাস-ধর্মী রচনা,—বড়গল্প। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত গল্প-রচনাবলীর অনেক কয়টিকেই বঙ্কিম পরে দীর্ঘ-সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছেন। উপন্যাস রচনাই তাঁর শিল্পিচরিত্রের স্বধর্ম ছিল ; ছোটগল্প তিনি একটিও লিখতে পারেননি। তবু যে 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য ছোট আকারের গল্পও তাঁকে লিখতে হয়েছিল, এর থেকেই ছোটগল্প রচনার বহিঃপ্রেরণা হিসাবে সাময়িক পত্রের প্রভাব অনুমান করা যেতে পারে।

বলা হয়েছে,[৬] প্রথম সার্থকনামা বাংলা ছোটগল্পও আবির্ভূত হয়েছিল 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠাতেই। গল্পটির নাম 'মধুমতী', প্রকাশকাল ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস ['বঙ্গদর্শন,' ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা]। গল্পের নীচে লেখকের নাম লিখিত আছে শ্রীপূঃ—ইনি ছিলেন বঙ্কিম-সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'মধুমতী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থনামা ছোট-গল্প, কিন্তু তা স্রষ্টার অবচেতন মনের রচনা। 'বঙ্গদর্শনে' রচনাটিকে 'উপন্যাস' নামে পরিচিত করা হয়েছে। মূল গল্পাংশে বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন কাহিনীর প্রভাব অনায়াসে চোখে পড়বে,—বিন্যাস এবং ভাষাভঙ্গিতেও তাই। তাছাড়া মনে হয়, 'ইন্দিরা'র মতই সংক্ষিপ্ত গল্প বা উপন্যাস হিসাবে কাহিনীটির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। 'বঙ্গদর্শনে' 'ইন্দিরা'র বিস্তার প্রায় ১৮ পৃষ্ঠা ; 'যুগলাঙ্গুরীয়' সমাপ্ত হয়েছে কিঞ্চিৎ-অধিক ১৫ পৃষ্ঠায়। সেই একই আকারের মুদ্রিত পৃষ্ঠার ১৪টির কিছু বেশি জুড়েছে 'মধুমতী'। কিন্তু এই আকৃতি-সংক্ষিপ্তির জন্যেই 'মধুমতী' ছোটগল্প নয় ;—স্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গীর হ্রস্বতা ও আপেক্ষিক সামান্যতিই বরং যথার্থ ছোটগল্পের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরিত করেছে।

আধুনিক কালে উপন্যাস এবং ছোটগল্পের ধারা যুগপৎ প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

৫। দ্রষ্টব্য :—'বঙ্গদর্শন' চৈত্র, ১২৭৯।

৬। দ্রষ্টব্য :—নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—'বাংলা ছোটগল্প' এবং উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—'বাংলা ছোটগল্প, ১৯০১-১৯২৫'—'দেশ' পত্রিকা (সাহিত্য সংখ্যা—১৩৬৪)।

কথাসাহিত্যের ইতিহাসে ছোটগল্প উপন্যাসের পরবর্তী আগন্তুক; তাহলেও উপন্যাসের যুগ গত হয়েছে, এমন কথা বলা চলে না। ছোটগল্প যেদিন ছিল না, আধুনিক পৃথিবীর গল্প-সাহিত্যের জগতে উপন্যাস সেদিন একচ্ছত্র রাজত্ব করেছে; কিন্তু ছোটগল্পের আবির্ভাব ও পূর্ণবিকাশের পরেও উপন্যাসের রাজাসন সমান্তরাল ভূমিতে স্বয়ম্প্রতিষ্ঠ হয়ে আছে। উপন্যাস এবং ছোটগল্পের মধ্যে যেন এখানে আভ্যন্তর বিবাদ রয়েছে; তাই একই কথাশিল্পী,—তিনি যত সার্থক-কর্মাই হোন্ না কেন,—উপন্যাস এবং ছোটগল্প রচনায় সমান সফল হয়েছেন, এমনটা খুব কমই দেখা যায়। এর অন্যতম কারণ হিসেবে অনুমান করা হয়েছে: "......perhaps,......the minute exactness and restriction of structure required for success in the short story create a mentality which cannot give us cross section through the vast body of human life or trace its bewildering intricacies. The painter of miniatures, if we may risk a comparison from another art, cannot hope to be successful in work of a large canvas."[৭]

আগের দীর্ঘ আলোচনায় বলেছি,—সুবৃহৎ প্রচ্ছদের ওপরে আদ্যন্ত জটিল জীবনের চিত্রণেই উপন্যাস-শিল্প আপন পূর্ণতার সন্ধান করে। অপরপক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত মুহূর্তের সংহত আধারে জীবনের গভীর পূর্ণ পরিচয়টিকে বিম্বিত করে তোলাই ছোটগল্পের স্বভাব-ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন জটিলতার অভিঘাত-সংকুল আদি-অন্তে পূর্ণ জীবনের শিল্পী; প্রত্যেকটি মুহূর্তকে তিনি খণ্ড খণ্ড করে ভেঙে গেঁথেছেন অখণ্ড-সম্পূর্ণ জীবনের ইমারত গড়বার আকাঙ্ক্ষায়। অখণ্ডের অংশ,—এ ছাড়া তাঁর চোখে খণ্ডের আর কোনো মূল্য নেই। তাই বাংলা সাহিত্যের প্রথম দক্ষ ঔপন্যাসিক তিনি। অপরপক্ষে 'শ্রীপূঃ' অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র বঙ্কিমের রূপ-সৃষ্টির অতলে অবগাহন করেছিলেন নিজের স্বভাব-রোমান্টিক মন নিয়ে। জীবনকে তিনি দেখেছিলেন বঙ্কিম-রচিত সমস্যা-জটিলতার মধ্যে; তার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছিলেন নিজের মনের সহজ সৌন্দর্য-পিপাসা। এদিক থেকে জীবনের আদি-অন্তে অখণ্ড রূপটিকে প্রত্যক্ষ করবার মত বিস্তার তাঁর দৃষ্টিতে ছিল না; শিল্পি-ব্যক্তিত্বে ছিল না তার উপযুক্ত অতন্দ্রতা। ফলে বঙ্কিমের চোখে দেখা জীবনের বিস্তার তাঁর রচনায় এসে আপনা থেকেই সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। সমকালীন জীবন-সমস্যার আগাগোড়া বিন্যাসের পরিবর্তে একটি মুহূর্তের অতলগর্ভতার বিন্দুমূলে গল্প-লেখকের সমবেদনার সকল আলো কেন্দ্রিত হয়ে পড়েছে! তাই, অর্থাৎ—একদিকে জীবন-সমস্যাকে আদ্যন্ত বিন্যস্ত করে দেখবার অক্ষমতা অন্যদিকে সমকালীন জীবনের প্রতি সহৃদয়

৭। দ্রষ্টব্য:—'Encyclopaedia Britannica'.—'Short Story'

সহানুভূতি;—এই দুই দোষগুণের সমন্বয়ে 'মধুমতী'-তে ছোটগল্পের সার্থক সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হতে পেরেছে।

গল্পটির সারসংক্ষেপ এই রকম :

ঢাকা থেকে স্থলপথে কলকাতা যাকার সময় মহম্মদপুর গ্রামের কাছে মধুমতী নামে নদী পার হতে হত। বছর কয় আগেও মধুমতী ছিল "তরঙ্গময়ী"! গ্রীষ্মদিনের এক ঝড়ের শেষের রাত্রিতে এক শিবিকা এসে দাঁড়ালো মধুমতীর তীরে। ডাকের বেয়ারারা যথারীতি 'বকশিস্' নিয়ে চলে গেল। পূর্ব ব্যবস্থামত সেখানে আর একদল বেয়ারার উপস্থিত থাকবার কথা। কিন্তু কারো সন্ধান না পেয়ে পঁচিশ বছরের সৌম্যদর্শন এক যুবক শিবিকা থেকে বেরিয়ে এল। কাছের কুটীরে খবর নিয়ে জানলো, ঝড়ের সময়ে বেয়ারার দল পলাতক হয়েছে।

নিরাশ মনে যুবকটি ফিরে আসছিল ; পূর্ণিমার মধ্যরাত্রি তখন, নদীতীর এবং নদীর জল উজ্জ্বল কিরণালোকে চক্‌চক্ করে উঠেছে। যুবক অন্যমনে নৈশ প্রকৃতির নিস্তব্ধ শোভা দেখে ফিরছিল,—হঠাৎ জলের কাছে একটি শাদা জিনিস দেখতে পেলো। কাছে গিয়ে দেখল নিষ্প্রাণ নরদেহ। আরো ঠাহর করে বোঝা গেল, মৃতদেহটি অপরূপ সুষমাময়ী এক নারীর; তার বয়স হবে বছর বাইশ। মেয়েটির কাছে উপকূল-ভূমিতে পড়েছিল দু-এক টুকরো ভাঙা কাঠ ; আর ছিল নৌকার হাল একখানি।

যুবক করালীপ্রসন্ন বুঝলো, সন্ধ্যার ঝড়ে নৌকাডুবিতে মেয়েটা প্রাণ হারিয়েছে। করালী দক্ষ চিকিৎসক ; পূর্ববঙ্গের চিকিৎসা বিভাগের অন্যতম প্রধান। পাল্‌কি থেকে গরম কাপড় এবং উষ্ণতাবিধায়ক পানীয় এনে নানা প্রক্রিয়ার দ্বারা মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হলো ; বিষণ্ণ করালী ফিরে এলো নিজের শিবিকায়। কিন্তু ঘুম আর কিছুতে আসে না ; মৃত যুবতীর কুণ্ঠাহীন সৌন্দর্য তার যুব-মনকে কুসুম-শোভায় আমোদিত করেছিল। এমন সুন্দরীকে বাঁচানো গেল না ; চিকিৎসক-জীবনের এমন দুঃখ—অত বড় পরাভব আর কী হতে পারে! বার বার মনে পড়ছিল, নদী তীরে-শয়ানা "অপূর্ব মহিমময়ী" সেই "মৃত রমণীর মুখমণ্ডল,"—এক একবার সে পাল্‌কির দরজা খুলে তাকায় সেই সুন্দরী 'হতভাগিনীর' প্রতি ; করালীর চোখে জল আসে।

অবশেষে কখন বুঝি ঘুম এসেছিল ; ব্যথাপীড়িত অশান্ত নিদ্রা! করালী স্বপ্ন দেখছিলো,—সেই মেয়েটি যেন 'শ্মশান-শয্যা' ছেড়ে উঠে এসেছে,—দাঁড়িয়েছে এসে পাল্‌কির দ্বার খুলে। করালীর মুখোমুখি "প্রেম পরিপূরিত লোচনে" সে চেয়ে দেখছে,—কী যেন বল্‌ছেও! চকিত দৃষ্টিতে জেগে করালী আশ্চর্য হয়ে গেল ;—পাল্‌কির দরজা সত্যিই খোলা। রাত ভোর হয়ে আসছিল ; কিন্তু মৃতদেহটি যথাস্থানে নেই। অনেক

খুঁজেও করালী তার সন্ধান করতে পারলো না ;—অমন সুন্দর দেহটি হয়ত শেয়াল-কুকুরের ভোগে লেগেছে !

ব্যথিত অন্যমনে করালী ফিরে এল ; কিন্তু শিবিকার পাশে এসেই স্তব্ধ হয়ে গেল ! সেই মৃতদেহ শুয়ে আছে পাল্‌কির কাছে। কিছুক্ষণ হতবাক্‌ হয়ে রইলেও করালী কর্তব্যবুদ্ধি হারালো না। মৃতদেহের "প্রকোষ্ঠে" হাত দিয়ে দেখলো প্রাণের স্পন্দন স্পষ্ট। বুঝতে অসুবিধা হলো না, করালীর চিকিৎসাতেই মেয়েটির মৃতপ্রায় দেহে প্রাণ ফিরে এসেছিল, পরে রাত্রে তার জ্ঞান হয়। তখন শিবিকার কাছ পর্যন্ত এসে অবসন্ন দেহ আবার মূর্ছিত হয়ে পড়ে ; পাল্‌কির দরজা নিশ্চয় মেয়েটিই খুলেছিল।

সন্তর্পণে নারীদেহটিকে পাল্‌কিতে তুলে করালী একটি নৌকা ভাড়া করলো,—মেয়েটিকে নিয়ে চল্‌লো সৈয়দপুরে। পথে অনেক চেষ্টায় তার জ্ঞান ফিরে এলো, কিন্তু তখন দেখা দিল নতুন বিভ্রাট্‌। মেয়েটি কোনো কথা বলে না ; কোনো প্রশ্নের জবাব দেয় না ; ভরা যৌবনে চপলা বালিকার মত অর্থহীন আচরণ করে। মেয়েটি কি পাগল ! পরে স্থির অনুধাবনায় বোঝা গেলো, দুর্ঘটনায় তার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে, কিন্তু সে নির্বুদ্ধি বা উন্মাদ কি না সে-কথা নিশ্চয় করে জানা গেল না। মেয়েটি আত্মীয়দেরও কারো নাম বলতে পারে না ; এমন অবস্থায় তাকে নিরাশ্রয় করা চলে না। করালী একটি দাসীকে তার পরিচর্যার জন্যে নিযুক্ত করে দিলেন ;—নতুন করে মেয়েটির নাম রাখলেন মধুমতী।

দিন যায় ; দিনে দিনে মধুমতীর জড়তাও কেটে আসে ;—বালিকার চাপল্য ঘুচে গিয়ে হঠাৎ একমুহূর্তে সে পরিপূর্ণ যৌবনে বিকশিত হয়ে ওঠে। করালী তন্ময় হয়ে সেই সৌন্দর্য উপভোগ করে। ওদিকে মধুমতীও করালীসর্বস্ব-প্রাণ হয়ে উঠেছে। করালী বাড়ি না থাকলে সে অধীর কান্নায় ভেঙে পড়ে। বাড়ি থাকলে তার সান্নিধ্যে ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায় ; তার কাছে পাঠ নেয় ; মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অক্লান্ত স্থির চোখে। করালী যত উৎসাহিত হয়, দুশ্চিন্তাও তত বাড়ে। তার একমাত্র জিজ্ঞাসা,—মধুমতী কি সধবা ? অনেক সন্ধান করেও কোনো নিশ্চিত খবর পাওয়া গেল না ; মধুমতী তো পূর্বস্মৃতি একেবারে হারিয়ে বসেছে ! অবশেষে করালী স্থির করলো, মধুমতী বিধবা। বিধবা-বিবাহে তার অসুবিধা কিছু নেই ; সে ব্রাহ্ম। কিন্তু সধবা-বিবাহ ব্রাহ্ম মতেও গর্হিত। অপরূপ সুন্দরী এই প্রেমের পুত্তলিকে একান্ত আপন করে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করালীর চেতনায় আমূল—মধুমতী বিধবা হলে সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হতে কোনো বাধা থাকে না। করালী ভাবলো মধুমতী বিধবা ! যখন নদীতীরে সে অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিল, মধুমতীর গায়ে তখন অলঙ্কার বা

অপর কোনো সধবা-চিহ্ন ছিল না ;—অতএব করালী অনায়াসে ভাব্‌তে পারলো, মধুমতী বিধবা !

এবার আর কোনো বাধা নেই। একদিন পড়াবার সময়ে সে মধুমতীকে জিজ্ঞাসা করলো —তুমি কি সধবা ? মধুমতীর কোনো কথা স্মরণ নেই, বললো, 'হয়ত বিধবা' ; তখন করালী বিবাহের প্রস্তাব করলো, মধুমতী জানালো ব্রীড়াকুণ্ঠিত সম্মতি। তারপর অনবচ্ছিন্ন সুখের দিন ! নববিবাহিতা বধূ নিয়ে নৌকাপথে সে বাড়ি ফিরে চলে। পথে মধুমতীর তীরে মহম্মদপুরের ঘাটে আবার ঝড় দেখা দিল। ঝড়ের মুখে এক বিশালকায় শ্মশ্রুমণ্ডিত পুরুষ মূর্তি দেখে করালী স্তম্ভিত হয়ে যায়। মাঝিরা বলে, ঝড়ের রাত্রিতে এই ঘাটে উদ্‌ভ্রান্ত লোকটিকে প্রায়ই চোখে পড়ে।

করালী বাড়ি ফিরে এলো ; বউ দেখে সবাই খুশি ! অত রূপ এক দেহে কী ধরে ! সুখে কাটে নব-দম্পতির মিলন-ভরা দিনরাত্রি। এমন সময় বৈষয়িক প্রয়োজনে করালীকে একবার কলকাতা যেতে হয় ; মধুমতী আবার ভেঙে পড়ে অবুঝ কান্নায়। করালীর বোন শ্যামাসুন্দরী মধুমতাকে বড় ভালবাসত, এখন থেকে সে ভ্রাতৃবধূর নিত্য-সঙ্গিনী হলো। কিন্তু মধুমতীর আর্তি কিছুতেই বাধা মানে না ; শ্যামাসুন্দরীও প্রায় বিরক্ত হয়ে উঠলো। এমন সময়ে স্থির রজনীর বক্ষভেদ করে মধুর একটানা সুর ভেসে আসে বহুদূর থেকে ; চকিত উৎকর্ণ হয়ে ওঠে মধুমতী। বহুদিনের বড়ো প্রিয় পরিচিত সুর ! তারপর গানের কথাও স্পষ্ট হয় :

'আদর তরঙ্গ বহে রূপের সাগরে।'

মধুমতী নিজের মধ্যে গুম্‌রে আছড়ে পড়ে ; সুরের ঝংকার বিস্মৃতির আবরণ তখন দীর্ণ করেছে।

ভয়ানক সে রাত্রি কেটে যায় অসহ্য নীরব মর্মযন্ত্রণায়। মধুমতীর মনে পড়েছে, সে ছিল লালগোপাল দত্তের স্ত্রী,—তার অবিচল প্রেমের বরনারী। গোপাল ভালোবাসার তারে স্ত্রীর বন্দনার সুর লাগিয়েছিল : "আদর তরঙ্গ বহে রূপের সাগরে।" মধুমতীর পূর্ব নাম ছিল 'আদর'—আদরিণী। স্বামীর কণ্ঠে প্রেমের সে সুর ভারি ভাল লাগ্‌ত তার ; গোপাল বার বার ঐ একটি গান গাইত, আদরিণীর বার বার তা শুনতে ইচ্ছে করত। এই সেই গান, সেই সুর, সেই কণ্ঠ ! আদরিণীর স্বামী জীবিত ;—সে আজ কোথায় ?

পরদিন রাত্রে গোপনে করালীর অন্তঃপুর-বাটিকায় প্রবেশ করলো লালগোপাল ;— স্ত্রীর সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করলো, আদরিণী সব কথাই বললো তাকে,—নৌকা নিমজ্জন, করালীর কাছে জীবন ও আশ্রয়লাভ, এবং তার আত্মবিস্মরণের সব কথা বলেও বলতে পারলো না একটি কথা,—করালীর সঙ্গে তার নবীন পরিণয়-বন্ধনের কথা।

গোপাল পরদিনই আবার আসতে চায়; আদর তাকে অপেক্ষা করতে বলে করালীর ফিরে আসা পর্যন্ত;—তখন তাদের দেখা হবে গৃহচ্ছায়ায় নয় আর,—নদীতীরে।

অবশেষে করালীও ফিরে এলো; কিন্তু কোথায় তার প্রেম-বিহ্বলা সুন্দরী নববধূ! মধুমতী নিস্তব্ধ হয়ে নিভে গেছে,—করালীর দিকে তাকিয়েও আর দেখতে পারে না সে; করালীর আর্তস্বরেও আর কোনো আকুলতার আভাস জাগে না তার দেহভঙ্গীতে। হতাশ করালী ছুটে গিয়ে শয়নগৃহে প্রবেশ করে,—বুঝি কাঁদবার জন্যে।

রাত গভীর হয়েছে,—মেঘাচ্ছন্ন আকাশ রাত্রির অন্ধকারকে করেছে গাঢ়তর। করালীর বৃহৎ প্রাসাদ সুপ্তিমগ্ন,—কেবল তার নিজের চোখে ঘুম নেই। হঠাৎ যেন কার পদশব্দ শোনা গেল;—শব্দ ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠল। চোর মনে করে করালী ঘর থেকে বেরিয়ে এল,—কিন্তু অনেক খুঁজেও কারো সন্ধান পেলো না। রুদ্ধগৃহে প্রবেশ করতেই আবার সেই পদশব্দ,—এবার তা স্পষ্টতর। খুব কাছে শব্দ শুনে করালী জানলা দিয়ে তাকাতেই চোখের পরে ভেসে উঠল "শ্মশ্রুবিশিষ্ট এক বৃহৎ মনুষ্য মস্তক।"

দুইমহলা বাড়ির আগাগোড়া তন্নতন্ন করে খুঁজেও করালী লোকটির সন্ধান পেলো না; নিজের ঘরে ফিরবার পথে হঠাৎ অন্ধকারে চোখে পড়লো এক নারী মূর্তি;—সে মধুমতী, মধুমতী এবার ঘরে এসে করালীর কাছে সব কথা প্রকাশ করলো;—বললো শ্মশ্রু-শোভিত সেই বিরাট পুরুষটিই তার পূর্ব-স্বামী। বলতে বলতে মধুমতী ভেঙে পড়লো;—মৃত্যু ভিন্ন এ-জীবনে আদরিণীর আর কোনো উপায় নেই। সব কথা শেষ হলে ছুটে গিয়ে সে পৃথক্ ঘরে দ্বার রুদ্ধ করলো;—করালী মৃতের মত পড়ে রইলো নিজের শয্যায়!

পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত করালী ও মধুমতী কেউ কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো না। করালী ধর্মভীরু; সে জানে সধবা মধুমতী তার বৈধপত্নী হতে পারে না, অতএব তাকে ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু তার চেয়ে যে নিজের প্রাণত্যাগও সহজ! ক্রমে রাত্রি চার-পাঁচ দণ্ড হয়ে গেল; প্রথম রাত্রে জ্যোৎস্না! পূর্ব রাত্রির কথামত গোপাল গঙ্গাতীরে এসেছে আদরিণীর সন্ধানে; কিন্তু সেখানে কেউ নেই। হঠাৎ চোখে পড়লো,—আবক্ষ জলে, আদরিণী দাঁড়িয়ে আছে। পূর্ব স্বামীকে সে আদর করে বুক-জলে ডেকে নিলো। তখন আবক্ষ গঙ্গায় ডুবিয়ে স্বামীর বুকের কাছে দাঁড়িয়ে সে পূর্বকথা বলতে লাগলো,—সব শেষে বললো করালীর সঙ্গে তার পুনর্বিবাহের কথা।

গোপাল মুমূর্ষুর মত সব কথা শুনলো, কিন্তু নিরস্ত হলো না। বললো, ভাগ্যে যা ছিল হয়েছে, কিন্তু 'শত বিবাহ' করলেও আদর তার "অত্যাজ্য"। আদরকে

নিয়ে দেশান্তরে গিয়ে কলঙ্ক গোপন করবে,—করবে "সুখে দিন যাপন"। এমন অবস্থাতেও গোপালের প্রণয়-আকুলতা আদরিণীকে অভিভূত করে ফেলে। কিন্তু গোপালের ঘরে ফিরে যাবার আর কোনো উপায় নেই তার,—অতবড় প্রেমের প্রতারণা করবে সে কী করে? সে বলে ওঠে,—"আমি পরের। আমার প্রাণ পর্যন্ত পরের। আমি মহা পাপিষ্ঠা, আমি তোমার স্নেহ ভুলিয়া গিয়াছি। আমার সকল ভালবাসা নূতন স্বামীর প্রতি। আমি তোমার গৃহে যাইব না।"

ধীরে ধীরে গভীর জলে নেমে যায় আদরিণী,—কণ্ঠ ছাপিয়ে চিবুক পর্যন্ত উঠে আসে গঙ্গার জলরেখা। গোপাল আকুলকণ্ঠে তাকে ফিরে আসতে আহ্বান করে। অধর প্রান্তে বিশ্বমোহিনী হাসি হেসে আদরিণী বলে,—"আমি ফিরিব না। কিন্তু তোমার কাছে এক ভিক্ষা, একবার আমায় আলিঙ্গন কর—বুঝিব যে আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়াছ।" চিবুক জলে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত হাস্যে আদরিণী স্বামীর শেষ আলিঙ্গন ভিক্ষা করে;—সেই মুহূর্তে করালী তার মন থেকে "অন্তর্হিত" হয়েছে।

উন্মত্তের মত গভীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে গোপাল; আদরিণী যদি না ফিরে আসে, সেও সঙ্গে যাবে। তারপরে,—"গোপাল চিবুক পরিমিত জলে দাঁড়াইয়া চির প্রেম-ভাগিনী আদরিণীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিল।

"তাহার পর উভয়কে পৃথিবীতে আর কেহ কখন দেখিল না।"

গল্পটির কাহিনীতে সমকালীন জীবন-সমস্যার ছায়া পড়েছে। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব ও প্রসারের আঘাত বাঙালির গৃহবলিভুক্ জীবন এবং মধ্যযুগীয় সামাজিক সংস্কারের বনিয়াদকে ধাক্কা দিয়েছিল আমূল। শিক্ষিত, স্বাতন্ত্র্যসচেতন ব্যক্তি-নারীর উদীয়মানতার পটভূমিতে প্রাচীন নারী-জীবনাদর্শের সমস্যাগুলিকে নতুন করে যাচাই করে নিতে চেয়েছিল সে-যুগের সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তার সামুদ্রিক বিস্তার ও গভীরতা।[৮] 'মধুমতী' গল্পের লেখক সেই সুবৃহৎ জটিল জীবন-ভূমি থেকে একটি জীবনের একটিমাত্র সমস্যার দুরবগাহিতাকে সযত্নে তুলে ধরেছেন এক আকস্মিক দুর্ঘটনার বৃন্তে। ক্ষণকালের বিন্দুমূলে তাঁর সমকালের জীবন-বেদনা অন্তহীনতার ব্যঞ্জনা নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে;—বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র বহুল ছায়া-সম্পাৎ সত্ত্বেও এই কারণেই 'মধুমতী' একটি ছোটগল্প: কেবল ছোট আকারের গল্পই নয়।

৮। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য:—ভূদেব চৌধুরী—'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' (দ্বিতীয় পর্যায়—চতুর্থ সং)।

'মধুমতী'র পরেই বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ্য গল্প পাওয়া গেছে,—রবীন্দ্রনাথের 'ভিখারিণী'; ১২৮৪ বাংলা সালের 'ভারতী' পত্রিকায় (শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা) গল্পটি প্রকাশিত হয়। 'ভিখারিণী' রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম গল্প; তবু কবি একে কখনো তাঁর রচনাবলীর পংক্তিবদ্ধ হতে দেননি।[১] গল্প হিসেবে এটি খুব কাঁচা হাতের লেখা,—কবির বয়সও তখন ছিল মাত্র ষোল বছর। কিন্তু নিছক ঐ কারণেই 'রবীন্দ্র রচনাবলী' থেকে পরবর্তীকালে লেখাটি বাদ পড়েছে, এমন কথা মনে হয় না। ছোটগল্প হিসেবে 'ঘাটের কথা' বা 'রাজপথের কথা' খুব উৎকৃষ্ট শিল্প-কর্ম নয়, তাহলেও কবি এদের বর্জন করেননি। আমাদের ধারণা, 'ভিখারিণী' ছোটগল্প ত নয়ই, একটি সুগঠিত গল্পও নয়;—এ যেন অপরিণত মনের ভাবালুতা মাত্র সম্বল ক'রে লঘু চালের গালগল্প। রবীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রতিভা তখনো 'স্বরাজ্য' লাভের পথে প্রথম পদক্ষেপও করেনি। বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', রমেশচন্দ্রের 'জীবন-সন্ধ্যা', 'জীবন প্রভাতে'র স্বপ্ন-সৈকতে ঘুরে ফিরছে তাঁর সমুত্তীর্ণ-কৈশোর বয়ঃসন্ধির উদ্বেল আবেগ। রোমান্টিকতার আকাঙ্ক্ষায় মন মদির, কিন্তু স্বপ্ন-কল্পনার দাঁড়াবার মত জীবন-ভিতটুকুও তখনো শিল্পীর অধিকারে আসেনি। তাই দুর্গম কাশ্মীর অঞ্চলের কোন্ অজ্ঞেয় অতীতের আকাশে কবি ভাসিয়ে দিয়েছেন স্বপ্নের তরী,—যাত্রার সমাপ্তি মুহূর্তে 'একবিন্দু নয়নের জল' কেবল ঝরে নিঃশেষ হয়ে গেছে।—

তাহলেও 'ভিখারিণী' বাংলা ছোটগল্পের জন্মলগ্নের সার্থক স্বভাব-পরিচায়ক। ছোটগল্প, তথা উপন্যাসেতর গল্প-শৈলী রচনার সচেতনতা তখনো আসেনি; অথচ তার প্রয়োজন-বোধ বাইরের দিক থেকে মনকে নাড়া দিয়েছে। আর সে প্রয়োজনবোধের উৎস ছিল জাগ্রয়মান সাহিত্য-পত্র-পত্রিকা! রবীন্দ্রনাথও সেই বাইরের সূত্র ধরে গল্প লিখতে বসেছিলেন। কিন্তু আগেই বলেছি, শিল্পি-ব্যক্তির আন্তর প্রেরণা নিজের মধ্যে সু-নিবদ্ধ না হলে ছোটগল্পের সার্থক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি অসম্ভব। তাই আলোচ্যকালে ছোটগল্প সংখ্যায় যত লিখিত হয়েছে, গল্প-শৈলীর উৎকর্ষ তার তুলনায় কিছুই প্রায় হয়নি। উৎকর্ষের প্রথম যুগ এলো আরো প্রায় চৌদ্দ বছর পরে;—১২৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন 'হিতবাদী' পত্রিকায় একের পর এক ছোটগল্প লিখতে লাগলেন অন্তঃপ্রেরণার উৎসার বশে। তার আগে সাহিত্য-পত্রিকায় পাঠকের সাময়িক কৌতূহলকে ক্ষণরস-ঘনিষ্ঠ করে তোলার চেষ্টায় যে অজস্র গল্পসমষ্টি রচিত হয়েছে, তাদের কিছু কিছু তালিকা উদ্ধৃত আছে অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লিখিত 'বাংলা

১। গল্পটি এখন 'গল্পগুচ্ছ' চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

ছোটগল্প' গ্রন্থে। ঐ সব রচনাবলীর পুনরুল্লেখ বা পুনরুদ্ধার বর্তমান প্রসঙ্গে আবশ্যিক নয়। বাংলা ছোটগল্প-শৈলীর স্বভাববিকাশের ধারাকে সংক্ষেপে হলেও সম্পূর্ণ করে দেখাই বর্তমান আলোচনার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। আর তার জন্যে, আগেই বলেছি,—সমকালীন জীবন-স্বভাবের সঙ্গে শিল্পিব্যক্তির আত্মস্থ স্বভাবের অন্বয়সূত্রই প্রধানভাবে সন্ধানযোগ্য। ছোটগল্পের জীবন-প্রচ্ছদ সর্বদেশ-কালে ব্যাপ্ত, কিন্তু সম্বন্ধ শিল্পি-ব্যক্তিত্বের সোনালি স্পর্শের অভাবে বাংলাদেশে কলালক্ষ্মীর সেই নব-রূপে জাগরণ তখনো সম্পূর্ণ হয়নি। 'মধুমতী'র মত দু-একটি লেখায় কচিৎ বাচ্য-বিষয়ের সঙ্গে শিল্পি-প্রাণের সহজ সহৃদয়তার যোগ ঘটেছে,—ছোটগল্পের দুটি-একটি অঙ্কুরও হয়েছে আভাসিত। 'মধুমতী'ও আসলে শিল্পীর অবচেতন অন্যমনস্কতার বৃন্তে সহজ প্রাণের আকস্মিক সৃষ্টি।

এই আকস্মিকতার কবল থেকে মুক্ত করে বাংলা ছোটগল্পকে সচেতন শিল্পাঙ্গিকে বিন্যস্ত করার বৈজ্ঞানিক আকাঙ্ক্ষায় 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি এক আলোচনা সভার ব্যবস্থা করেছিলেন ১২৯৮ বাংলা সালে। সমাজপতির নিজ বাড়িতে অনুষ্ঠিত সেই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। চৌধুরী ম'শায় কেবল কলা-রসিক ছিলেন না,—ছিলেন যথার্থ কলা-বিদ্। তাঁর সহজাত শিল্পি-প্রাণকে তিনি সমৃদ্ধ করেছিলেন সুকর্ষিত মনীষা, বিচার-বুদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক অন্বীক্ষা দিয়ে। একটি ফরাসী গল্পকে হাতে নিয়ে বোটানিস্ট্-এর ফুল-চেরার মত তিনি তাকে বিশ্লেষণ করে সার্থক ছোট-গল্পাঙ্গিকের পরিচয় দিয়েছিলেন। সাহিত্য'-এর পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত 'ফুলদানি' গল্পটি সেই বিচার-সভার সাহিত্যিক ফসল। প্রমথ চৌধুরীর পথ ধরে বাংলা সাহিত্যে তখন অজস্র ফরাসী গল্পের অনুবাদ হতে থাকে। সেই সঙ্গে পদ্মাপার থেকে কবির আশ্বাসের বাণী রূপ পেতে লাগলো 'হিতবাদী'র পৃষ্ঠায়। সে-সব কথা পৃথক্ আলোচনার দাবি রাখে। বাংলা ছোটগল্পের সেটি আদিপর্ব। আদিপর্বেরও আগে আছে প্রস্তুতিপর্ব। সমাজপতির গৃহের আলোচনা সভা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ১২৯৮-পূর্ব সাহিত্য-সাময়িকী সংস্করণ বাংলা ছোটগল্পের অজস্রতা সু-রেখ প্রস্তুতি, পথের দিশারি হতে পারেনি। তবু এই বিস্রস্ততার অতলে নবসৃষ্টির ফল্গুবারি যেখানে সঞ্চিত হচ্ছিল, তারই সন্ধান অপরিহার্য হয় প্রস্তুতি পর্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেও।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রস্তুতি পর্ব

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন : "মধুমালতী ['মধুমতী' ?] প্রকাশিত হইবার পর দীর্ঘ আঠারো বৎসর ছোটগল্পের পক্ষে একেবারে অজন্মার কাল না হইলেও মোটের উপর ক্ষীণ ফসলের যুগ, সে কথা বলিতেই হইবে,—যদিও ঐ সময় ছোটগল্পের আকারে কিছু কিছু রচনা মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল,—এমন কি, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথও 'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা' নামে দুইটি গল্প রচিত করিয়াছিলেন।"[১]

কথাটির তাৎপর্য লক্ষ্য করবার মতো। ১২৮০ সাল থেকে ১২৯৮ সাল,—তথা ১৮৭৩ থেকে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্প রচনার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম ছিল। পরে ক্রমশ রচনার প্রাচুর্য প্রায় অগুনতি হতে চেয়েছে। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'Encyclopaedia Britannica' জানিয়েছে,—পূর্ববর্তী দশ বছরে অন্ততঃ একলক্ষ ইংরেজি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে,—অর্থাৎ বছরে গড়পড়তা ছোটগল্প প্রকাশের হার দশ হাজার। বাংলাদেশে এ ধরনের পরিসংখ্যানগত তথ্য পাবার উপায় নেই; তবু কেবল বাংলা ভাষাতেই যে একালে অন্তত সহস্রাধিক গল্প বছরে প্রকাশিত হয়, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। তাহলেও বাংলা ছোটগল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের অধিকাংশেরই উল্লেখও অপরিহার্য নয়।

শিল্প মাত্রেরই মূল্য রসের আস্বাদনে। সৃজন-শৈলীর আকার-প্রকারগত বৈশিষ্ট্যের দরুন আস্বাদ্যমানতারও স্বাভাবিক তারতম্য ঘটে। সকল রকমের সাহিত্য আলোচনাই আসলে শিল্পরসের আস্বাদ্যমানতার এই স্বরূপকে সন্ধান করে ফিরে। বারে বারে বলেছি—ক্ষণকালের মুকুরে অনন্ত-অখণ্ড জীবনের আস্বাদ রচনাই ছোটগল্প-রূপাঙ্গিকের স্বভাবধর্ম। কিন্তু এমনটি না হলেও কেবল গল্প বলেই এই শ্রেণীর রচনার একটি পৃথক বিশেষ আবেদন রয়েছে। ফলে ছোট আকারের অসংখ্য গল্প তাদের ক্ষণ-কালিক আবেদন নিয়ে ছোটগল্পের পরিণামী রসের প্রতিভাস রচনা করে।[২] অবোধজনের বিভ্রান্তি তাতে ঘটলেও, বাংলা ছোটগল্পের চিরন্তন স্বভাব তার অন্তরালে কখনোই ঢাকা

১। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—'বাংলা ছোটগল্প ১৯০১-২৫' : 'দেশ' (সাহিত্য সংখ্যা) ১৩৬৪ বাংলা।

২। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

পড়ে নি। অতএব ১২৮০ সাল থেকে ১২৯৮ বাংলা সালের আগে পর্যন্ত এই আঠারো বছর বাংলা ছোটগল্পের প্রস্তুতি যুগ ;—তার কারণ এই নয় যে, এই সময়ে গল্প রচনার সংখ্যা ছিল কম। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্প-শৈলীর সর্বজনবেদ্য ভগীরথ এবং তাঁর নিজের স্বাকৃতিযুক্ত 'গল্পগুচ্ছে'র প্রথম দুটি গল্প এই সময়-সীমাতেই লিখিত হয়েছিল। তাহলেও আলোচ্য কাল বাংলা ছোটগল্প রচনার প্রস্তুতি-পর্বই।

ছোটগল্পের জন্মলগ্নকে ধারণ করবার জন্যে দু'টি প্রধান উপাদান একান্ত প্রয়োজন। প্রথমত চাই একটি মানবতা-সচেতন আধুনিক জীবন-প্চ্ছদ। মানব-মূল্যের একান্ততায় বিশ্বাসহীন মধ্যযুগীয় জীবন ছোটগল্পেব উপযুক্ত ধাত্রী হতে পারে না। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে মুরারি শীল-এর উপাখ্যান একটি কৌতুক-চকিত ছোটগল্পের সম্ভাবনায় ভাস্বর। কিন্তু দেবী চণ্ডী বেচারাকে স্বপ্নে ভয় দেখিয়ে কাহিনীর ছোটগাল্পিক পরিণতি একেবারে নষ্ট করেছেন।

ছোটগল্পের দ্বিতীয় উপাদান শিল্পীর আত্ম-সংহত জীবন-প্রত্যয়। সেই প্রত্যয়ের বিভূতি আমূল চেতনায় মেখে ছোটগল্পের লেখক ডুব দিতে পারেন অপার বিস্তৃত জীবনের যে-কোনো এক মুহূর্তের অতলে,—সেখান থেকে অনায়াসে আহরণ করে আনতে পারেন সম্পূর্ণ জীবনবোধের আস্বাদ। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের নগর-বাংলায় মানবতা-প্রবুদ্ধ জীবন-চেতনা দ্বিধাহীন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কিন্তু সেই উত্তাল জীবন-প্রবাহের অভিঘাতকে সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে অতিক্রম করার দুঃসাধ্য তপস্যাতেই শিল্পীর সহৃদয় শক্তি তখন সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়েছে,—তাই বঙ্কিম ছোটগল্প লিখতে পারেননি। উপন্যাসের মতো ছোটগল্প কেবল objective নয়,—বহুলাংশে subjective-ও। বঙ্কিমের শিল্পি-মন subjective আবেগে ভরপুর ছিল, কিন্তু সমকালীন সামাজিক সমস্যার প্রতি তাঁর নিমগ্ন-চেতনতা 'কমলাকান্তের দপ্তর' ছাড়া আর কোথাও সেই subjective ব্যক্তিত্বকে একান্ত প্রকাশিত হতে দেয়নি।

রবীন্দ্রনাথের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর আত্ম-নিরুদ্ধ subjective মন; শৈশব থেকে যৌবনসীমা পর্যন্ত 'হৃদয় অরণ্যে'র মধ্যে সেই শিল্পি-মনের অভ্যুদয় ও বিকাশ। ধ্যানিজনোচিত আত্মনিমগ্নতা তাই রবীন্দ্রনাথের শিল্পিস্বভাব। এহেন রবীন্দ্রনাথ আমাদের আলোচ্যকালে ছোটগল্প রচনায় হাত দিয়েছিলেন; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্প তখনো তিনি লিখতে পারেননি। কারণ তাঁর শিল্প-দৃষ্টির সীমায় ছোটগল্প রচনার উপযোগী জীবন-প্রচ্ছদ তখনো ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মানুষের জীবন,—মানুষের জগৎকে তখনো তাঁর একেবারেই দেখা হয়নি। সে কথা পরে বলছি,—পরের অধ্যায়ে। তাহলেও এই সময়-সীমাতেই বাংলা ছোটগল্পের বীজ উপ্ত হয়েছিল, এমন এক শিল্পীর সাধনায়, বস্তু-

জীবনের অভিজ্ঞতা এবং সহৃদয়তা যাঁর পক্ষে ছিল ব্যক্তি-জীবন-সম্ভব। অন্যদিকে জীবনের বাস্তব দীনতার প্রতি তাঁর সহজ চেতনা ছিল বৈরাগীর মতোই উদাসীন। পর্যটকের পুরুষোচিত জঙ্গমতার সঙ্গে কবির স্পর্শকাতর মমতার যুগপৎ মিলনে প্রতীচ্য ছোটগল্প প্রথম জন্ম নিয়েছিল Irving-এর শিল্পি-চেতনায়। আর বাংলা ছোটগল্প অঙ্কুরিত হল এমন এক শিল্পীর হাতে, দুর্বল জীবনের প্রতি যাঁর মমতা কবির মত নয় বস্তুর রোগপাণ্ডুর একমাত্র সন্তানের মার মত; আবার একই সঙ্গে পৌরুষদীপ্ত অনাসক্তি যার পর্যটক-জীবনের সীমাকেও ছাপিয়ে অপার নিস্পৃহতার মধ্যে হয়েছে অন্তহীন—ধূসর। ছোটগল্প objective জীবন-প্রচ্ছদের বৃন্তে শিল্পীর subjective মনোধর্মের কুসুমরূপ। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯) objective জীবনের অজস্র ব্যথা-নিপীড়নের গভীরে ধীর-বাহিত হয়েছিল প্রচ্ছন্ন জীবন-প্রেম; রুক্ষ অভিজ্ঞতাকে প্রসন্ন প্রীতির তরলতায় গলিয়ে নিজের অজ্ঞাতে তিনি বাংলা ছোটগল্প-রূপের গোড়াপত্তন করেছিলেন।

১২৫৪ বাংলা সালে (১৮৪৭ খ্রীঃ) ত্রৈলোক্যনাথের জন্ম হয়। দরিদ্র পিতার ঘরে ছয় ভাই-এর মধ্যে ইনি ছিলেন দ্বিতীয়। দরিদ্রের ঘরে সেকালে বিদ্যাশিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব ছিল,—ত্রৈলোক্যনাথের ভাগ্যে তার চেয়ে বেশি হয়নি। চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সের সীমায় বারবার স্কুল পরিবর্তন করে তিনি তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত হয়েছিলেন। এই সময়ে ম্যালেরিয়ায় পিতা, মাতা ও পিতামহীর মৃত্যু হয়, নিজের অবস্থাও শঙ্কাজনক হয়েছিল। অতএব এখানে এসেই ত্রৈলোক্যনাথের স্কুল-জীবনের সমাপ্তি।

বাড়িতে সকলে অসুস্থ; পৈতৃক জমির আয়ে সংসার চলে না; অর্থের প্রয়োজন চূড়ান্ত, কিন্তু উপার্জনের উপায় জানা নেই। এই অবস্থায় ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে ত্রৈলোক্যনাথ একদিন নিরুদ্দিষ্ট হলেন; বয়স তখন আঠারো বছর। মানভূম-পুরুলিয়ায় এক আত্মীয় থাকতেন, ত্রৈলোক্যনাথ চললেন তাঁর কাছে। রানীগঞ্জ পর্যন্ত রেলে এসেই পাথেয় শেষ হলো; —এবার চরণ ভরসা! রানীগঞ্জে দামোদর পার হবার সময়ে এক 'হিন্দুস্থানী চাপরাসী'র সঙ্গে দেখা; ত্রৈলোক্যনাথকে সে ভরসা দিলে,—আসামে চাকরির ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দেবে। অগত্যা চাপরাসীর সঙ্গে এসে আটকে পড়লেন,—"নীচ জাতীয় স্ত্রী-পুরুষের'. সঙ্গে এবার চা-বাগানের কুলি হয়ে চালান যাবেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে চাপরাসীর এক 'রক্ষিতা'র মমতায় এই দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান;—ত্রৈলোক্যনাথ অতর্কিতে দল ছেড়ে পালিয়ে আসেন।

বন-জঙ্গল-পাহাড়ের দুর্গমতার মধ্য দিয়ে আবার চলেন মানভূমের পথে—পাথেয় নেই; একমাত্র খাদ্য গাছের বুনো কুল। মানভূমে পৌঁছানোর পর আত্মীয়টি তাঁকে স্কুলে ভর্তি করে দেন; কিছুদিন পরে ত্রৈলোক্যনাথ প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষা-ভ্রমণে রাঁচি

যান। সেখান থেকে বনের পথে হাতী-খেদা একদল মুসলমানের সঙ্গে আবার পলাতক হন। কিছুদিন পরে পথে একদিন তারা গায়ের-কাপড় কেড়ে নিয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দেয়,—অতএব আবার রাঁচি,—রাচি থেকে মানভূম। কিন্তু স্কুলের পড়ায় আর মন বসলো না; মৌলবীর কাছে নূতন করে শুরু হল ফার্সি শিক্ষা।

তারপরে আবার বাড়ি ফিরে আসেন ত্রৈলোক্যনাথ; মাসচারেক ইছাপুরে একটা স্কুলে 'একটিনী' করেন। এবার যশোরে গেলেন এক কন্ট্রাক্টর আত্মীয়ের কাছে। কিন্তু আত্মসম্মান জ্ঞান প্রবল;—ফিরে এলেন আর এক আত্মীয়ের কাছে বর্ধমানে। শিক্ষা-বিভাগের সরকারী পরিদর্শক ছিলেন তিনি। চাকরির জন্যে প্রথমে ত্রৈলোক্যনাথকে তিনি কাটোয়া পাঠালেন,—সেখানে চাকরি হলো না;—ফিরে এসে আবার গেলেন বীরভূম-কীর্ণাহার,—সেখান থেকে ফিরে আবার রামপুরহাট; তারপরেও ফিরতে হলো। হাতে একটি পয়সাও নেই,—অতএব প্রতিবারেই পায়ে হাঁটাই ভরসা। আত্মীয়ের কাছে চাইলে কিছু পাওয়া যেত, কিন্তু শিল্পী বলেছেন,—"চাইতে পারিতাম না। লোকের বাটিতে অতিথি হইয়া পথ চলিতাম।"[৩]

এই চলার দুঃসহতা অকথ্য। কতদিন জলমাত্র সম্বল করে চলতে হয়েছে, শূন্যোদর বুভুক্ষার সামনে সদ্য-প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অবশেষে ক্ষুধার জ্বালায় তেঁতুল পাতা চিবোতে হয়েছে, পথ চলার একমাত্র সম্বল পুরোনো ছাতা বাঁধা দিয়ে একবেলার ফলাহার এবং খেয়া পার হবার এক পয়সা ভাড়া যোগাড় করতে হয়েছে। সেবার ত্রৈলোক্যনাথ বর্ধমান থেকে বাড়ি ফিরছিলেন পিতামহীর মুমূর্ষুতার সংবাদ নিয়ে।

এরপরে চাকরি মিললো, "বীরভূম জেলায় দ্বারকা নামক স্থানে স্কুল মাস্টারি।"—মাইনে আঠারো টাকা। ত্রৈলোক্যনাথ লিখেছেন, "এই সময় ঘোরতর দুর্ভিক্ষ। রাত্রিদিন লোকের কাতর ক্রন্দনে শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল। অস্থিচর্মসার, কৃষ্ণবর্ণ, শীর্ণকায় নর, নারী, বালক-বালিকাদের অবস্থা দেখিয়া বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যে যেখানে পড়িল, সে সেইখানেই মরিতে লাগিল।"[৪] যথাসম্ভব এদের মৃত্যু রোধ করতে হবে; "বাড়িতে শিশুভাইগণ",—তাদেরও প্রাণরক্ষা করতে হবে; "নিজের তখন যৌবনের প্রারম্ভ—অতিশয় ক্ষুধা।" অথচ সম্বল মাত্র আঠারো টাকা। নিজের জন্য ব্যবস্থা হলো একবেলা হবিষ্যান্ন, অন্য বেলা "পেট ভরিয়া কেবল এক লোটা জল।" অবশিষ্ট সঞ্চয় ভাই এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবায় ব্যয়িত হতো। কত

৩। দ্রষ্টব্য—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়:—'বঙ্গভাষার লেখক'।
৪। তদেব।

অকিঞ্চিৎকর সে প্রচেষ্টা। তা হলেও,—"সেই সময় হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে যাহাতে এই স্বর্ণভূমি ভারত-ভূমিতে দুর্ভিক্ষ হইতে না পারে, এইরূপ কার্যে আমি আমার মনকে নিয়োজিত করিব। সেইদিন হইতে এই সম্বন্ধে যাহা কিছু শিখিবার আবশ্যক শিখিতে লাগিলাম। তখন মনে মনে এই স্থির হইয়াছে যে, ভারতের লোক যদি নিজে নিজে একটু যত্ন করে, তাহা হইলে এই দেশের অন্তত: অর্ধেক দুঃখও দূর হইতে পারে। আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চক্ষু উন্মীলিত করিতে যত্ন পাইতেছি। কিন্তু কি করিব, সকলেই আপনার নিজের স্বার্থের জন্য ব্যস্ত।"[৫]

প্রমথনাথ বিশী বলেছেন,—"ত্রৈলোক্যনাথের এই প্রতিজ্ঞাই তাঁহার জীবন ও সাহিত্যের মেরুদণ্ড। তাঁহার কর্মজীবন ও সাহিত্য-জীবনকে এই একটি মেরুদণ্ডই বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে।"[৬] পরে দেখব, এই অবিচল প্রতিজ্ঞার মূলেই নিহিত ছিল ত্রৈলোক্যনাথের ছোটগল্পের শিল্প-সমুচিত জীবন-প্রত্যয়। কিন্তু সে কথার আগে শিল্পীর জীবন-পরিচয় নিয়ে আর একটু অগ্রসর হতে হয় :—

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের পূর্বাবধি পরিচয় ছিল ;—এবারে তাঁর সাজাদপুরের জমিদারিতে স্কুল মাষ্টারির আহ্বান এলো,—বেতন মাসে পঁচিশ টাকা। কিন্তু সেখানেও জমিদারের দূরদর্শী নায়েব এবং অন্যান্যদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিল ;—কারণ ছন্নছাড়া শিক্ষকটির পরিণাম-বোধহীন দয়াবৃত্তির একাগ্রতা। যাই হোক, একবার বাড়ি থেকে সাজাদপুরে ফেরার পথে কুমীরের অতর্কিত আক্রমণে প্রাণ বাঁচলো ; কিন্তু প্রবল ঝড়ের মুখে ভরা পদ্মায় হলো নৌকাডুবি ! নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে একটি গাছের আশ্রয় পাওয়া গেল,—কিন্তু তখনই কাঁটায় সর্বাঙ্গ বিক্ষত হল;—ঢারা বাবলার গাছ সেটি। অল্পক্ষণ পরে একটি ঝোপের আশ্রয় পেয়েই জ্ঞানহীন হয়ে পড়লেন। ত্রৈলোক্যনাথের জ্ঞান হলো চণ্ডালদের ঘরে ; নিমজ্জিত নৌকার জিনিসপত্র পাবার লোভে এরা নদীতে গিয়েছিল,—ঝোপের মধ্যে খুঁজে পায় মুমূর্ষু ব্রাহ্মণকে।

সামান্য সুস্থ হয়েই এবার ত্রৈলোক্যনাথ উত্তরবঙ্গ থেকে চললেন কটকে ; বর্ধমানের পুরাতন আত্মীয়টি তখন কটকের ম্যাজিস্ট্রেট। সেখানে পুলিসের চাকরি জুটলো ; এবং অল্পদিনের মধ্যেই কেউঝর বিদ্রোহ দমনে সশস্ত্র অভিযানে যোগ দেবার আহ্বান এলো। প্লীহাজ্বরের দরুন পথ থেকেই অবশ্য ফিরে এলেন। সুস্থ হতে হতে উড়িষ্যার বিদ্রোহ সব থেমে গেছে। তখন কটকের দারোগাগিরিতে বহাল হলেন। এখানকার আদালতেই একদিন W. W. Hunter-এর সঙ্গে প্রথম দেখা ;—তাঁর সস্নেহ আনুকূল্যে এবার কলকাতায় নূতন চাকরি হলো ১২৫ টাকা বেতনে ;—১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ত্রৈলোক্যনাথ

৫। তদেব। ৬। প্রমথনাথ বিশী—'বাংলার লেখক'—'ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়'।

'Literary Assistant and Head Clerk'-এর পদ পেলেন 'Bengal Gazetters'-এর সম্পাদকের দপ্তরে। Hunter পরে ভারত সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ হন ; ত্রৈলোক্যনাথও তখন সেই অফিসের প্রধান করণিকের পদ লাভ করেন।

তাঁর দক্ষতা এবং সততা একাধিক য়ুরোপীয় কর্মকর্তার শ্রদ্ধা ও অনুকূলতা আকর্ষণ করেছিল। ফলে বিখ্যাত 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় ভালো পদ লাভের সম্ভাবনা দেখা দেয় ; আর Hunter তাঁকে ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত করতে চান। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ লিখেছেন,—"ঐ সময় উত্তর-পশ্চিমে কৃষি-বাণিজ্য অফিস হইতেছিল। পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে দরিদ্রের দুঃখমোচনে সমর্থ হইব, এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য আশা ছাড়িয়া দিয়া এখানে হেড ক্লার্কের পদ গ্রহণ করি।"[৭] অতএব ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে কর্ম-উপলক্ষে ত্রৈলোক্যনাথ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যায় গেলেন।

পরবর্তী জীবন ঘটনাবহুল হলেও বর্তমান প্রসঙ্গে তা বহুল উল্লেখ্য নয়, মনের মত কাজ পেয়ে ত্রৈলোক্যনাথ এবারে কল্পনাকে বাস্তব রূপ দেবার অসাধ্য-সাধনে ব্রতী হলেন। তাঁর চেষ্টাতেই দেশীয় কুটীর-শিল্প প্রথম বিদেশের বাজারে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠালাভের পথ খুঁজে পায়। দুর্ভিক্ষের সময়ে গাজরের চাষ করে দেশবাসীর ক্ষুধা নিবারণের নূতন সম্ভাবনাও তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। ক্রমে পুস্তক লিখে এবং অন্যান্য উপায়ে ভারতের রপ্তানিযোগ্য কাঁচামাল এবং ভারতে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যের পরিচয় তিনি বিশ্বের সামনে তুলে ধরলেন। ভারতের জিনিসের বিনিময়ে আমরা বিদেশের টাকা উপার্জন করতে লাগলাম। এবারে বিদেশের বাণিজ্য-সভায় ভারতের পক্ষে উপস্থিত থাকবার দাবি এলো ত্রৈলোক্যনাথের কাছে; কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান—সমুদ্রযাত্রায় আত্মীয়দের বাধা এড়াতে পারলেন না। সর্বশেষে দেশের উন্নতির কথা ভেবে সংস্কারের এই শেষ বন্ধনটিকেও তিনি ছিন্ন করেছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীস্ট-সালে বিলাতে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ত্রৈলোক্যনাথ উপস্থিত হন। সেবারকার য়ুরোপ ভ্রমণ দশ মাস স্থায়ী হয়েছিল।

ছোটগল্পের আলোচনায় প্রথম অবচেতন গল্পশৈলী-স্রষ্টার এই জীবন-বিচার অপ্রাসঙ্গিক নয়। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পসাহিত্যকে রূপকথা-ধর্মী বলা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখব,—শিল্পীর আগাগোড়া ব্যক্তি-জীবনই ছিল রূপকথার মত অবিশ্বাস্য দুর্যোগের শোভাযাত্রা। বস্তুত তাঁর অনেক আজগুবি গল্পই নিজ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিমিশ্রিতরূপ ;—'বাঙাল নিধিরাম' এই রকম একটি গল্প।[৮]

এই সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের অভিজ্ঞতার বিস্তারও অবশ্য লক্ষণীয়। এক মুঠো অন্নের

৭। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় :—'বঙ্গভাষার লেখক'। দ্রষ্টব্য : ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় —'ভূত ও মানুষ'।

প্রয়োজনে বাংলাদেশের পূর্ব প্রত্যন্ত থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত তাঁকে ছুটে ফিরতে হয়েছে মৃত্যু-শিখরের চূড়ায় চূড়ায়। অথচ প্রতিবারেই রূপকথার রাজপুত্রের মতো নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তিনি অমিশ্র অমৃত আহরণ করে এনেছেন। জীবনের ভয়াবহ বাস্তবতার গহনে পড়ে থেকে এই অমৃত-সিদ্ধির সাধনা, ত্রৈলোক্যনাথের ব্যক্তিত্বের মধ্যে এক অ-নিঃশেষ দূরযানিতার সঞ্চার করেছিল। তার সঙ্গে স্বদেশহিতব্রতের, এবং পরৈকমুখী সেবাধর্মের অবিচল আকাঙ্ক্ষা যুক্ত হয়ে তাঁকে আত্ম-বিমুখ উদাসীন করেছিল।

একদিকে বাস্তব জীবনে দুস্তর আঘাতের তলায় পিষ্ট হয়েছেন, অন্যদিকে মরণশীল দীন-মানুষের সঙ্গে অপার মমতায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন আষ্টে-পৃষ্ঠে। তবু সেই সমস্যা-জটিল অপার দুঃখের জালে কখনো বাঁধা পড়েনি তাঁর ব্যক্তিত্ব; দুঃখীর উদ্ধারের জন্য মরণ-পণ করলেও দুঃখের তাপ তাঁর চেতনাকে স্পর্শ করতে পারেনি; আজীবন দারিদ্র্য ও বিপদের সঙ্গে লড়েও বিপদকে তিনি স্বীকার করেননি। এখানেই ত্রৈলোক্যনাথ যথার্থ আত্ম-বিবিক্ত সন্ন্যাসী ;—উনিশ শতকের বাংলার দুর্গম জীবনপথে তিনি উন্মনা পর্যটক। দুঃখ-বিপদের অলিগলিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অভিজ্ঞতা আহরণ করে ফিরেছেন,—তারপর পর্যটকের ঝুলি যখন পূর্ণ হয়েছে, তখনই সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েছেন! তাঁর মুক্ত বিবেক কখনো কোনো কিছুতেই বাঁধা পড়েনি। এইজন্যেই জীবনের সুগভীর জটিলতা, দুরপনেয় সমস্যা, এবং প্রত্যক্ষতম বাস্তব অভিজ্ঞতাকে নিয়েও তিনি যেন খেলা করেছেন অন্যমনে নিতান্ত অনায়াসে।

ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম প্রকাশিত রচনা 'কঙ্কাবতী' ('উপকথার উপন্যাস') ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—এই উপন্যাসের "গল্পটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে প্রকৃত ঘটনা এবং দ্বিতীয় ভাগে অসম্ভব অমূলক অদ্ভুত রসের কথা।"......

"উপাখ্যানের প্রথম অংশের বাস্তব ঘটনা এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে যে, মধ্যে সহসা অসম্ভব রাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া পাঠকের বিরক্তি মিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। একটা গল্প যেন রেলগাড়িতে করিয়া চলিতেছিল, হঠাৎ অর্ধরাত্রে অজ্ঞাতসারে বিপরীত দিক হইতে আর একটা গাড়ি আসিয়া ধাক্কা দিল এবং সমস্তটা রেলচ্যুত হইয়া মারা গেল। পাঠকের মনে রীতিমত করুণা ও কৌতূহল উদ্রেক করিয়া দিয়া অসতর্কে তাহার সহিত এরূপ রূঢ় ব্যবহার করা সাহিত্য-শিষ্টাচারের বহির্ভূত।......কিন্তু গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে আমরা এই সকল ত্রুটি মার্জনা করিয়াছি।"

অতবড় 'অশিষ্টাচার'ও যে 'পড়িতে পড়িতে' মার্জনা করা চলে, তার কারণ ত্রৈলোক্যনাথ এই অসম্ভব অসঙ্গতির শিল্পায়নেও পূর্ণ সফল হয়েছেন। আর এই

সফলতার মূলে রয়েছে যথার্থ ছোটগাল্পিকের প্রতিভা। জীবনের অন্তহীন জটিলতাকে অবধারণ করেও আদি-অন্তের জ্যামিতিক হিসাবকে সহজে অতিক্রম করতে পারার মানস প্রস্তুতি সার্থক ছোটগাল্পিকের আবশ্যিক গুণ। নিজ মনে ত্রৈলোক্যনাথ জীবন সম্বন্ধে মমতা-নিষ্ঠ হয়েও ছিলেন সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ। তাই জটিল-গ্রন্থিত জীবনের আত্মস্বরূপ রচনা না করেও, যে-কোনো উপলক্ষ্যেই তিনি তার একটি খুঁটিনাটি সম্পূর্ণ ছবি এঁকে তুলতে পেরেছেন। যেখানে খুশি গল্প আরম্ভ করেছেন,—সেখান থেকেই যেন সে প্রথম চলতে আরম্ভ করেছে; ত্রৈলোক্যনাথ যখনই থেমেছেন, গল্পও তৎক্ষণাৎ একেবারে থেমে চুপ করে গেছে। অথচ এমন অবস্থাতেও প্রত্যেক আরম্ভ এবং সমাপ্তির সীমায় একটি করে অখণ্ড গল্প পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছে। Homer-বাল্মীকি-ব্যাসের কাব্য-কলাকে প্রকৃতির হাতের দান বলা হয়েছে,—তাঁদের সৃজনশৈলী ছিল শিল্পীর সহজাত (instinctive) বৃত্তির রচনা। ছোটগল্প-শিল্প সম্বন্ধেও ত্রৈলোক্যনাথের ঐরকম একটি সহজ instinct ছিল। ফলে গল্পের আকারে যখনই তিনি যা-খুশি লিখেছেন, তার সব কিছুতেই অঙ্কুরিত হয়েছে ছোটগল্পের পূর্ব-সম্ভাবনা। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন: "প্রকৃতপক্ষে ত্রৈলোক্যনাথের প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ রচনাই ছোটগল্প পর্যায়ের রচনা; কিংবা বলা উচিত যে, তাঁহার প্রায় সমস্ত রচনাই টানা গল্পের ফ্রেমে বাঁধানো ছোটগল্পের সমষ্টি।"[১০]

'কঙ্কাবতী' থেকেই একটি দৃষ্টান্ত নে'য়া যাক :—

"তনু রায়ের সহিত নিরঞ্জন কবিরত্নের ভাব নাই। নিরঞ্জন তনু রায়ের প্রতিবেশী।

"নিরঞ্জন বলেন, 'রায় মহাশয়! কন্যার বিবাহ দিয়া টাকা লইবেন না, টাকা লইলে ঘোর পাপ হয়।'

"তনু রায় তাই নিরঞ্জনকে দেখিতে পারেন না, নিরঞ্জনকে তিনি ঘৃণা করেন। যেদিন তনু রায়ের কন্যার বিবাহ হয়, নিরঞ্জন সেইদিন গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অপর গ্রামে গমন করেন। তিনি বলেন, 'কন্যাবিক্রয় চক্ষে দেখিলে, কি, সে কথা কর্ণে শুনিলেও পাপ হয়।'

"নিরঞ্জন অতি পণ্ডিত লোক। নানাশাস্ত্র তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন। বিদ্যা-শিক্ষার শেষ নাই, তাই রাত্রিদিন তিনি পুথি-পুস্তক লইয়া থাকেন। লোকের কাছে আপনার বিদ্যার পরিচয় দিতে তিনি ভালবাসেন না। তাই জগৎ জুড়িয়া তাঁহার নাম হয় নাই। পূর্বে অনেকগুলি ছাত্র তাঁহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিত। দিবারাত্রি তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিয়া তিনি পরম পরিতোষ লাভ করিতেন, আহার পরিচ্ছদ দিয়া ছাত্রগুলিকে পুত্রের মত প্রতিপালন করিতেন। লোকের বাড়ি নিমন্ত্রণে গিয়া বিদায়ের জন্য তিনি

১০। প্রমথনাথ বিশী—'বাংলার লেখক'—'ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়'।

মারামারি করিতেন না। কারণ তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল, পৈতৃক অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমি ছিল।

"গ্রামের জমিদার জনার্দন চৌধুরীর সহিত এই ভূমি লইয়া কিছু গোলমাল হয়। একদিন দুই প্রহরের সময় জমিদার একজন পেয়াদা পাঠাইয়া দেন।

"পেয়াদা আসিয়া নিরঞ্জনকে বলে, 'ঠাকুর! চৌধুরী মহাশয় তোমাকে ডাকিতেছেন, চল।'

"নিরঞ্জন বলিলেন, 'আমার আহার প্রস্তুত, আমি আহার করিতে যাইতেছি। আহার হইলে জমিদার মহাশয়ের নিকট যাইব, তুমি এক্ষণে যাও।'

"পেয়াদা বলিল, 'তাহা হইবে না, তোমাকে এক্ষণেই আমার সহিত যাইতে হইবে।'

"নিরঞ্জন বলিলেন, 'বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে; ঠাঁই হইয়াছে, ভাত প্রস্তুত, ভাত দুইটি মুখে দিয়া চল, যাইতেছি। কারণ আমি আহার না করিলে গৃহিণী আহার করিবেন না, ছাত্রগণেরও আহার হইবে না। সকলেই উপবাস থাকিবে।'

"পেয়াদা বলিল, 'তা হইবে না, তোমাকে এক্ষণেই যাইতে হইবে।'

"নিরঞ্জন বলিলেন, 'এইক্ষণেই যাইতে হইবে, বটে? আচ্ছা, তবে চল যাই।'

"পেয়াদার সহিত নিরঞ্জন গিয়া জমিদারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

"জনার্দন চৌধুরী বলিলেন, 'কখন আপনাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছি, আপনার যে আর আসিবার বার হয় না।

"নিরঞ্জন বলিলেন, 'আজ্ঞা হাঁ মহাশয়, আমার একটু বিলম্ব হইয়াছে।'

"জমিদার বলিলেন, "বামুনমারীর মাঠে আপনার যে পঞ্চাশ বিঘা ভূমি আছে, জরিপে তাহা পঞ্চান্ন বিঘা হইয়াছে। আপনার দলিলপত্র ভাল আছে, সেজন্য সবটুকু ভূমি আমি কাড়িয়া লইতে বাসনা করি না, তবে মাপে যেটুকু অধিক হইয়াছে, সেটুকু আমার প্রাপ্য।'

"নিরঞ্জন উত্তর করিলেন, 'আজ্ঞা হাঁ মহাশয়, দলিলপত্র আমার ভাল আছে। দেখুন দেখি, এই কাগজখানি কি না।'

"জনার্দন চৌধুরী কাগজখানি হাতে লইয়া বলিলেন, 'হাঁ, এই কাগজখানি বটে, ইহা আমি পূর্বে দেখিয়াছি, এখন আর দেখিবার আবশ্যক নাই।

"এই বলিয়া নিরঞ্জনের হাতে তিনি কাগজখানি ফিরাইয়া দিলেন। নিরঞ্জন কাগজখানি তামাক খাইবার আগুনের মালসায় ফেলিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে কাগজখানি জ্বলিয়া উঠিল।

"জমিদার বলিলেন, 'হাঁ হাঁ, করেন কি, করেন কি ?'

"নিরঞ্জন বলিলেন, 'কেবল পাঁচ বিঘা কেন ? আজ হইতে আমার সমুদয় ব্রহ্মোত্তর আপনার, যিনি জীব দিয়াছেন, নিরঞ্জনকে তিনি আহার দিবেন।'

"পাছে ব্রহ্মশাপে পড়েন, জনার্দন চৌধুরীর ভয় হইল। তিনি বলিলেন, দলিল গিয়াছে গিয়াছে, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। আপনি ভূমি ভোগ করুন, আপনাকে আমি কিছু বলিব না।'

"নিরঞ্জন উত্তর করিলেন, 'না মহাশয়, জীব যিনি দিয়াছেন, আহার তিনি দিবেন। সেই দীনবন্ধুকে ধ্যান করিয়া তাঁহার প্রতি জীবন সমর্পণ করিয়া কালাতিপাত করাই ভাল। আমার ভূমি ছিল বলিয়াই তো আজ দুই প্রহরের সময় আপনার পেয়াদার নিষ্ঠুর বচন আমাকে শুনিতে হইল ? সুতরাং সে ভূমিতে আমার কাজ নাই।'

"এই কথা বলিয়া নিরঞ্জন প্রস্থান করিলেন। নিরঞ্জনের সেইদিন হইতে অবস্থা মন্দ হইল। অতিকষ্টে তিনি দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ একে একে তাঁহাকে ছাড়িয়া গোবর্ধন শিরোমণির চতুষ্পাঠীতে গেল।

"গোবর্ধন শিরোমণি জনার্দন চৌধুরীর সভাপণ্ডিত ; অনেকগুলি ছাত্রকে তিনি অন্নদান করেন। বিদ্যাদান করিবার তাঁহার অবকাশ নাই। চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে সকাল সন্ধ্যা উপস্থিত থাকিতে হয়, তাহা ব্যতীত অধ্যাপকের নিমন্ত্রণে সর্বদা তাঁহাকে নানাস্থানে গমনাগমন করিতে হয়। সুতরাং ছাত্রগণ আপনা আপনি বিদ্যা শিক্ষা করে।

"সেজন্য কিন্তু কেহ দুঃখিত নয়। গোবর্ধন শিরোমণির উপর রাগ হয় না, অভিমানও হয় না। কারণ তিনি অতি মধুরভাষী, বাক্যসুধা দান করিয়া সকলকেই পরিতুষ্ট করেন। বিশেষতঃ ধনবান লোক পাইলে শ্রাবণের বৃষ্টিধারায় তিনি বাক্যসুধা বর্ষণ করিতে থাকেন ; তৃষিত চাতকের মত তাহারা সেই সুধা পান করে।

"একদিন জনার্দন চৌধুরীর বাটীতে আসিয়া তনু রায় শাস্ত্র বিচার করিতেছিলেন। নিরঞ্জন, গোবর্ধন প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

"তনু রায় বলিলেন, 'কন্যা দান করিয়া বংশজ কিঞ্চিৎ সম্মান গ্রহণ করিবে। শাস্ত্রে ইহার বিধি আছে।'

"নিরঞ্জন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন্ শাস্ত্রে আছে ? এরূপ শুল্ক গ্রহণ করা তো ধর্মশাস্ত্রে একেবারেই নিষিদ্ধ।'

"গোবর্ধন চুপি চুপি বলিলেন, 'বল না, মহাভারতে আছে।'

"তনু রায় তাহা শুনিতে পাইলেন না। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, 'দাতাকর্ণে আছে।'

"এই কথা শুনিয়া নিরঞ্জন একটু হাসিলেন। নিরঞ্জনের হাসি দেখিয়া তনু রায়ের রাগ হইল।

"নিরঞ্জন বলিলেন, 'রায়মহাশয়, আপনি শাস্ত্র জানেন না, শাস্ত্র পড়েন নাই।'

"তনু রায় আর রাগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। নিরঞ্জনের প্রতি নানা কটুকথা প্রয়োগ করিয়া অবশেষে বলিলেন, 'আমি শাস্ত্র পড়ি নাই? ভাল, কিসের জন্য আমি পরের শাস্ত্র পড়িব? যদি মনে করি তো আমি নিজে কত শাস্ত্র করিতে পারি। যে নিজে শাস্ত্র করিতে পারে, সে পরের শাস্ত্র কেন পড়িবে?'

"নিরঞ্জনকে এইবার পরাস্ত মানিতে হইল। তাহাকে স্বীকার করিতে হইল যে, যে লোক নিজে শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে পারে, পরের শাস্ত্র তাহার পড়িবার আবশ্যক নাই।"—

এই পরিসমাপ্তির মুখে এসে ছোটগল্প-রসিককে স্তব্ধ হয়ে থামতে হয়। ষোলকলায় পূর্ণ না হলেও ওপরের কাহিনীকে ছোটগল্পের কলাবতী মূর্তি না বলে উপায় নেই। অথচ এটি 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসের আগাগোড়া 'তৃতীয় পরিচ্ছেদ'—মূলগ্রন্থে এর স্পষ্ট পূর্ব-সূত্র রয়েছে, আর পর-প্রসঙ্গ তো অপার। তবু সেই প্রাসঙ্গিকতার বাইরে টেনে আনলেও কাহিনীর স্বয়ম্পূর্ণতার বৈভব ম্লান হয় না। কারণ ত্রৈলোক্যনাথের স্বভাব-শৈলীর হাতে উপন্যাসও "আসলে ছোটগল্পের মালা গাঁথিয়া টানা গল্প।"[১১]

তাহলেও ত্রৈলোক্যনাথের সকল রচনাকেই উৎকৃষ্ট বা পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্প মনে করা অসঙ্গত হবে। আগেই বলেছি, ছোটগল্পের রচনাশৈলী তাঁর হাতে রূপ পেয়েছে নিতান্ত স্বভাববশে, শিল্পি-মনের একান্ত অবচেতনায়। মজার গল্প লিখলেও স্পষ্টত ছোটগল্প লেখা ত্রৈলোক্যনাথের সচেতন উদ্দেশ্য ছিল না। তাছাড়া তাঁর গল্পের ছোটগল্প হয়ে ওঠার পক্ষে প্রধান বাধা ছিল রচনার অন্তর্নিহিত আজগুবি উপাদান। উপন্যাস, উপাখ্যান বা অন্য যা কিছু হোক,—একালের গল্পের কাছে পাঠকের প্রথম দাবি,—গল্পকে বাস্তব হতে হবে। ত্রৈলোক্যনাথের সব লেখাতেই কাহিনীর এই বাস্তব রস অনুপস্থিত। শুধু তাই নয়, লেখক যেন ইচ্ছে করেই বাস্তবতার জগৎকে এড়িয়ে আজগুবি অসম্ভবের দুনিয়ায় যেমন খুশি ঘুরে ফিরেছেন। আগে দেখেছি, ত্রৈলোক্যনাথের ব্যক্তিজীবন ছিল বাস্তবের রূঢ় আঘাতে নিত্য-পীড়িত। জীবনের সেই অভিজ্ঞতাকে শিল্পের জগতে ব্যবহার করার অপার দক্ষতাও যে তাঁর ছিল, সে-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ 'কঙ্কাবতীর'র প্রথম খণ্ড। তাহলেও সেই প্রথম রচনাকে শিল্পী 'উপকথার উপন্যাস' ব'লে পরিচিত করেছেন ;—এবং নিতান্ত খেয়ালের বশেই

১১। তদেব।

যেন, সাহিত্যিক নিয়ম লঙ্ঘন ক'রেও বাস্তবধর্মী কাহিনীকে জোর ক'রে টেনে নিয়েছেন উপকথার পথে। কেবল 'কঙ্কাবতী' উপন্যাস নয়, ত্রৈলোক্যনাথের সব কয়টি গল্পই আসলে শিল্পীর স্বেচ্ছা-রচিত 'উপকথার গল্প'।

তবু লক্ষ্য করলে দেখব, আজগুবি রসের কৌতুক-আবরণ আলোচ্য গল্প-সাহিত্যের অনেকখানি হ'লেও সবটুকু নয়। আগাগোড়া পরিকল্পনার মধ্যে একান্তে জড়িয়ে আছে শিল্পি-ব্যক্তির অনাসক্ত মমতায় ভরা জীবন-চিন্তা। ফলে নিতান্ত উপকথাধর্মী কাহিনীও নিছক ভূতের গল্পে পর্যবসিত হ'তে পারেনি; কৌতুকহাস্যে সরস বাচনভঙ্গী অতিরিক্ত তরলতায় এলিয়ে পড়েনি কোথাও। আজগুবি গল্পের আধারে ত্রৈলোক্যনাথ অনায়াসে পরিবেশন করেছেন নিভৃত, গোপন জীবন-রস। নিজের জীবনের মতই তাঁর রচনাবলীও বস্তুসঞ্চয়ের পীড়াকর প্রয়াস পরিত্যাগ ক'রে বাস্তব অনুভবের ভারহীন স্বাদুতাকে আহরণ করেছে আমূল।

কৌতুক-লঘু আবরণের মধ্যে জীবনের বিষতিক্ত অভিজ্ঞতার এ পরিবেশন সাহিত্যের জগতে অভূতপূর্ব নয়। ডঃ সুকুমার সেন ত্রৈলোক্যনাথের 'ডমরু চরিত'কে Cerventes-এর 'Don Quixote'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন;[১২]—তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের রচনাশৈলী প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী সাধারণভাবে স্মরণ করেছেন 'Gulliver's Travels'-খ্যাত Swift-এর রচনাভঙ্গির কথা।[১৩] 'Don Quixote'-এর জন্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে : "All of it had been planned and composed amidst the squalor of poverty and the bitterness of despair."[১৪] 'Gulliver's Travels'-এর শিল্পি-স্বভাব সম্বন্ধে বলা হয়েছে : "He had a compassionate contempt for the Yahoos of the human race, with their perjuries and their passions and their stupidities and their swindles and their wars. He was amazed at man's inhumanity to man. He had lost all faith in human reason". আরো পরে, প্রায় উনষাট বছরের কাছে এসে, "Swift had now reached the years of disillusioned wisdom and he decided to incorporate this wisdom into the imaginary Travels of Lemuel Gulliver"[১৫]

প্রমথনাথ বিশী ত্রৈলোক্যনাথের গল্প-রচনাবলীর পেছনেও উদ্দেশ্যমূলকতার স্পষ্ট চিহ্ন লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেছেন,—"ত্রৈলোক্যনাথ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন আমৃত্যু দেশের দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণের পরে পূর্বতনভাবে

১২। দ্রষ্টব্য :—ডঃ সুকুমার সেন—'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ২য় খণ্ড (২য় সংস্করণ)। ১৩। দ্রষ্টব্য—প্রমথনাথ বিশী—'বাংলার লেখক'—'ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়'। ১৪। H. Thomas & D. L. Thomas—'Living Biographies of Famous Novelist's—Cerventes'. ১৫। পূর্বোক্ত গ্রন্থ—'Swift'.

প্রতিজ্ঞা রক্ষার উপায় ছিল না, তখন প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত তিনি সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার রচনা তাঁহার জীবন-কর্মেরই একটা প্রক্ষেপ মাত্র।"[১৬] নিছক তথ্যের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত পূর্ণ সমর্থন করা চলে না। 'কঙ্কাবতী'র প্রকাশ কাল ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে। ত্রৈলোক্যনাথের বয়স তখন ৪৫ বছর। কর্ম থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে। এর মধ্যে 'লুল্লু', 'বীরবালা', 'বাঙাল নিধিরাম' এবং 'নয়নচাঁদের ব্যবসা',—ত্রৈলোক্যনাথের এই শ্রেষ্ঠ কয়টি গল্প সাময়িক পত্রের পাতা থেকে প্রথম গ্রন্থরূপও পেয়েছে।[১৭] ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম গল্প 'বীরবালা'র প্রকাশকাল ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ (পৌষ—১২৯৯ সাল)। আরো তিন বছর পরে তিনি অবসর নিয়েছিলেন। সে যাই হোক্, ত্রৈলোক্যনাথ খুব সচেতনভাবে সমাজ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গল্প লিখেছিলেন, অথবা Cerventes বা Swift-এর মত জীবনের বিষতিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর বক্রোক্তি-জীবিত লেখনীর একমাত্র আশ্রয় ছিল,—এমন কথা জোর করে বলা চলে না। কিন্তু অন্য দিক্ থেকে এ-কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, তাঁর ভূয়োদর্শন এবং আত্ম-বিমুখ জীবন-প্রীতি মজার গল্পের ফাঁকে ফাঁকে একটি সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের রস-রূপও রচনা করে তুলেছে। তাই নিছক শিশুপাঠ্য গল্প হিশেবে ত্রৈলোক্যনাথের কোনো রচনাই পূর্ণ উপভোগ্য নয়; আবাব হাল্কা রসের সন্ধানী বয়স্ক পাঠকের মনেও নির্ভয় গভীরতার আস্বাদন রচনায় এ-গল্পের জুড়ি নেই।

Cerventes এবং Swift-এর থেকে ত্রৈলোক্যনাথের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে,—কথাকে তাঁর রচনায় কখনোই অস্ত্রের প্রয়োজন নির্বাহ করতে হয়নি। জীবনের জ্বালাকে প্রকাশ করবার জন্যেই তাঁর সাহিত্য রচনার উদ্যম নয়,—এমন কি অসাম্য এবং অসঙ্গতির প্রতি বক্রদৃষ্টিও তাঁর রচনার প্রধান বিষয় নয়;—অন্তত 'মজার গল্প' বা ত্রৈলোক্যনাথের অন্যান্য ছোট আকারের গল্প পড়ে এমন কথা বলা চলে না। যথার্থ-ই তিনি 'মজার গল্প' লিখেছিলেন।[১৮] বস্তুত গল্প লিখলেও আসলে শিল্পি-ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন গল্পের কথক;—লেখনীর মুখ দিয়ে তিনি গল্প বলেছেন। আর যে-কোনো আদর্শ 'গল্প-বলিয়ে'র মতই কাহিনীর সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতেই তিনি সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন। তখন মূল কাহিনীর আড়ালে-আবডালে বক্তার বিশ্বাস এবং অনুভূতি স্মিতহাস্যের মত এখানে-ওখানে অনায়াসে ছড়িয়ে পড়েছে। আগে বলেছি,—ব্যক্তি ত্রৈলোক্যনাথের প্রতিজ্ঞা ছিল,—দুঃস্থ দেশবাসীর উন্নতির জন্য সর্বস্ব পণ করতে হবে; তাঁর অবিচল প্রত্যয় ছিল,—ভারতের লোক নিজে নিজে চেষ্টা করলে "এই দেশের অন্তত: অর্ধেক দুঃখও দূর" হতে

১৬। প্রমথনাথ বিশী—পূর্বোক্ত গ্রন্থ। ১৭। এই গল্প-সংকলন 'ভূত ও মানুষ' নামে প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। ১৮। ত্রৈলোক্যনাথের দ্বিতীয় গল্প-সংকলনের নাম 'মজার গল্প' (১৯০৬)।

পারে। কিন্তু তার কোন উপায় ছিল না ; কারণ এদেশে "সকলেই আপনার নিজের স্বার্থের জন্য ব্যস্ত।" তবু দেশবাসীর 'চক্ষু উন্মীলিত' করতে 'যত্ন' পেয়েছেন তিনি,—জীবনের প্রতি পদে। ব্যক্তি ত্রৈলোক্যনাথের পক্ষে এই 'বিশ্বাস' এবং 'যত্ন' দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। তাঁর মজার গল্পের ফাঁকে ফাঁকে শিল্পীর এই ব্যক্তি-স্বভাব সহজে প্রবেশ ক'রে নূতন রসের রসদ রচনা করেছে।

দৃষ্টান্ত হিশেবে প্রথম প্রকাশিত গল্প 'বীরবালা'র উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গল্পের শিরোনামায় লেখক সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন,—"পাঠক গল্পটি বুঝিয়া পড়িবেন।" গল্পটি যে অসাধারণ, প্রারম্ভিক ছত্র ক'টিতেও লেখক এই ইঙ্গিত করেছেন,—"গল্পটি এদেশের নয়,—পশ্চিমের, বাঙালির নয়,—হিন্দুস্থানীর। ব্রাহ্মণ কায়েতের নয়,—রাজপুতের।" অতএব সমজদার পাঠক যাঁরা,—নিছক গল্পের জন্যেই গল্প পড়তে যাঁরা নারাজ,—তাঁরা এই আদি-অন্তহীন আজগুবি গল্পের গভীরে যা-নয়-তাই তত্ত্বের সন্ধানে গলদ্‌ঘর্ম হতে থাকবেন। আসলে গল্প-বলিয়ের এ-ও এক মজা। আগে থেকেই শ্রোতার[১৯] মনে অভিনব রসের প্রত্যাশা জাগিয়ে, তাকে অধীর উৎকণ্ঠিত রেখে সহজ স্বরে সরল গল্প শেষ ক'রে ফেলার এক নূতন মজা খেলেছেন এখানে ত্রৈলোক্যনাথ। ভালো গল্প-বলিয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য গল্পের আগাগোড়া শ্রোতার উৎকণ্ঠা (suspense)-টুকুকে অটুট রেখে যাওয়ার দক্ষতা ; ত্রৈলোক্যনাথ এখানে তাই করেছেন। তবু সচেতন শ্রোতার অনবধানের ফাঁকে জীবনের দু'টি-একটি পরিচিত রূপকে স্মিতহাস্যের মুকুরে তিনি নিতান্ত সহজে প্রতিফলিত করে গেছেন ;—তাতে শ্রোতার মনে চিন্তার তরঙ্গ জাগে না, কিন্তু কৌতুকরসের উপভোগ লঘুতার পথ পরিহার ক'রে ধীর-গভীর খাতে ঘন হয়ে ওঠে। আলোচ্য গল্পে ধর্মদত্তকে 'চিমটা দ্বারা সবলে প্রহার' করে অমাবস্যা বাবাজি বলেছিলেন,—"ধর্মদত্ত! দিন দিন তুই অতি মূর্খ ও অতি নির্বোধ হইতেছিস্। শাস্ত্রে আছে, 'চাচা আপনা বাঁচা'। তাই প্রতিবাসীর গৃহে ডাকাত পড়িলে সেকালের লোকে আপনার আপনার ঘরে দোহারা তেহারা খিল ও হুড়কো দিয়া বসিয়া থাকিত, কেহ বাহির হইত না। আজ কালের ছেলেরা সব হইল কি ? পরের জন্য প্রাণ সমর্পণ।"

শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ এখানে তাঁর শ্রোতাদের মনের কোণেও আঘাত করতে চেয়েছেন ;—অমাবস্যা বাবাজির চিম্‌টার মতো তা মারাত্মক নয়,—এ আঘাত কৌতুকের মৃদু আঘাত ;—মনের তলায় একটু সুড়্‌সুড়ি,—বড় জোর আদর-করা চিম্‌টির আঘাত। আর এই আঘাত রচনা করেছে ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পি-ব্যক্তিত্ব। বাঙালি, তথা

১৯। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের প্রসঙ্গে 'শ্রোতা' কথাটিই ব্যবহার করব,—'পাঠক' নয়। কারণ আগেই বলেছি, তাঁর আর্ট গল্প-লেখকের নয়,—গল্প-কথকের।

ভারতবাসীর যুগ-যুগব্যাপী স্বার্থান্ধতার রুদ্ধ দ্বারে দরদীর হাতের এই মৃদু আঘাত! এমন কথা মনে করবার কারণ নেই যে, শিল্পীর প্রত্যয়জাত এই সংযোগ গল্পের পক্ষে কোনো নূতন মূল্যের দাবি রচনা করেছে। গল্প-শেষে ত্রৈলোক্যনাথ বলেছেন,—"এই বীরবালার গল্পটি যাঁহারা মনোযোগ দিয়া পাঠ করেন, চিরদিন তাঁহাদের ঘরে পৌষ পার্বণের আনন্দ বিরাজ করে, তাঁহাদের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়।" এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোনো ফলশ্রুতি গল্পটির নেই। আর আমাদের উদ্ধৃত অংশকে বিশেষ অর্থে গ্রহণ করতে না পারলেও, কারো পক্ষে গল্প শোনার এই মহৎ ফল-লাভ থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা নেই। তাহলেও কেবল 'বীরবালা'তেই নয়, ত্রৈলোক্যনাথের অন্যান্য গল্পেও তাঁর সহজ জীবন-বোধ আজগুবি কাহিনীর আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে গিয়ে মজার গল্পের এক নূতন জাতি সৃষ্টি করেছে। 'বীরবালা'তে সেই জাতি-স্বভাব অস্বচ্ছ, তাই ত্রৈলোক্যনাথের গল্প-সাহিত্যের মধ্যে তা অপেক্ষাকৃত দুর্বল। এই নূতন জাতের গল্পের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে কেবল গাল্পিকের সিদ্ধির পরিচায়ন প্রসঙ্গেই। ত্রৈলোক্যনাথ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত শিল্পী নন,—চিরাচরিত মজার গল্পের পোঁটলায় পুরে নিজের চোখে-দেখা জীবনের একটি প্রাণময় স্বাদ তাঁর সকল রচনার মধ্যে বিস্তার ক'রে দিয়েছেন। জীবনের সেই ঝাঁজহীন আঘ্রাণেই ত্রৈলোক্যনাথের মজার গল্পের স্বাতন্ত্র্য।

এই প্রসঙ্গে Victor Hugo-র সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের সাদৃশ্যের কথা মনে পড়ে। আসলে শিল্পী যে মুহূর্তে সৃষ্টি করেন,—কেবল সেই মুহূর্তের জন্য তিনি অনন্য-সদৃশ,—স্বয়ম্ভু। অতএব একজন শিল্পীর রচনাকে আর একজনের রচনার সঙ্গে তুলনা করা অনেক সময় নিরর্থক হয়, বিশেষ করে দেশকালের দিক্ থেকেও আলোচ্য শিল্পীরা যখন বিভিন্ন। তা ছাড়া তুলনা করবার ঝোঁক অনেক সময় অতি-প্রসারিত হয়ে শিল্পীর দেশ-কালে নিবদ্ধ নিজস্ব পরিচয়কে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। উনিশ শতকে মধুসূদন-হেম-নবীন-বঙ্কিমের ভাগ্যে এমন দুর্ভোগ প্রায়ই ঘটেছে; একালে রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ শিল্পি-স্বভাব দেশি-বিদেশি পূর্বসূরীদের সঙ্গে তুলনার রাহুগ্রাস থেকে আজও সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। অতএব সাদৃশ্য-কথনের আগে তার সীমায়তি এবং প্রাসঙ্গিকতার কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

ত্রৈলোক্যনাথের প্রসঙ্গে আলোচ্য তুলনার কথা আসে,—তাঁর অন্তত একটি গল্পে Hugo-র খ্যাততম উপন্যাস 'Toilers of the Sea'-র কাহিনীর আগাগোড়া ছায়া পড়েছে। এ'টি ত্রৈলোক্যনাথের দ্বিতীয় প্রকাশিত গল্প,—'বাঙাল নিধিরাম' (১৩০০ বাংলা সাল)। কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখব, ঐ ছায়া পর্যন্তই;—Hugo-র অতল প্রসারিত জীবন-দৃষ্টি, দুঃখ-বেদনার সঙ্গে তাঁর আমূল একাত্মতা,—তাঁর জীবন-চিন্তার

বিশ্বজনীনতা, কিছুই ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যে ছিল না। জীবনের প্রতি Hugo-র দরদ তাঁর অভিজ্ঞতার রক্তাক্ষরে রচিত ; তাই দুঃখের প্রতি সহানুভূতি তাঁর রচনায় মর্মান্তিক ট্রাজেডি রচনা করেছে। Hugo-র জীবন-ভাবনা গভীর,—তাই সৃষ্টির পথে তাঁর পদক্ষেপ গুরু-গম্ভীর। ত্রৈলোক্যনাথের নিজের ক্ষেত্রে দুঃখবোধের অভিজ্ঞতা সীমাহীন ; কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব সন্ন্যাস-ধর্মী, দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন, সুখে প্রায় বিগতস্পৃহ ;—অথচ উদাসীন হলেও জীবনের প্রতি তিনি নির্মম নন। তাই জীবনের সুখ-দুঃখ তাঁর শিল্পি-চেতনার কাছে কোনো স্বতন্ত্র মূল্য দাবি করতে পারে না ;—চিরাগত মজার গল্পের আধারে তিনি জীবনের কথা বলেন অন্যমনে। জীবন-ভাবনায় আত্ম-সাপেক্ষতার ভাব নেই বলেই শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর চাল লঘু। Hugo-র ট্রাজেডি-ঘন কাহিনী নিঙড়ে তিনি করুণা-বিমিশ্র কৌতুকের নতুন রস রচনা করেন। সেখানে তাঁর নিজস্ব প্রত্যয়ের ছাপটুকুও লেগেছে,—যেন নিতান্ত আনমনে !—

বাঙাল নিধিরাম তার যথাসর্বস্ব দিয়ে জীবন-পণ করে,—পদে পদে মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করে যে অর্থ সঞ্চয় করেছিল, তাই দিয়ে হিরণ্ময়ীর বিয়ে দিল জমিদারপুত্র নবীনের সঙ্গে। এই অর্থ সংগ্রহের জন্য নিধিরাম অসাধ্য সাধন করেছিল, অসহ্যকেও সয়েছিল ; কারণ হিরণ্ময়ীর সঙ্গে তার নিজের বিবাহের জন্য এই অর্থ ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়। হিরণ্ময়ী স্বেচ্ছায় আত্মদান করেছিল নিধিরামের কাছে, তার সত্যসন্ধ পিতা বাগ্‌দান করেছিলেন অশেষ উৎসাহে। দৈবচক্রে নিধিরামও এই অসমবয়সিনী বালিকাকে ভালবেসেছিল প্রাণের অধিক। কিন্তু টাকা নিয়ে মুমূর্ষু নিধিরাম যেদিন ফিরে এল, হিরণ্ময়ী ততদিনে ভালবেসেছে ধনী নবযুবক নবীনকে। নিজের সর্বস্ব দিয়ে নিধিরাম হিরণ্ময়ীর বিয়ে দিয়েছে নবীনের সঙ্গে,—হিরন্ময়ীর বাবারও অমতে ;—কারণ নিধিরাম সত্যই তাকে ভালবেসেছিল,—তার সুখ-কামনা করেছিল প্রাণ দিয়ে।

বিয়ের পরে নববধূকে নিয়ে নবীন বাড়ি ফিরে চললো নৌকাযোগে ;—গঙ্গার ঘাটে তাদের বিদায় দিয়ে নিধিরাম হিরন্ময়ীর পিতা এককড়িকে প্রণাম করলো। তারপর গলা পর্যন্ত গঙ্গার জলে ডুবিয়ে, এককড়ির বুকে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো,—হাতে পৈতা জড়িয়ে জপ করে বললো,—"ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম……" ইত্যাদি ঠিক সেই সময়ে "হিরণ্ময়ী মৃদুমধুর ভাষে নবীনকে বলিলেন,—'বাঙাল কি করিতেছে দেখ ! ঠাট্ করিয়া আবার বাবার কোলে শোওয়া হইয়াছে' ।"

তারপরে গল্প সংক্ষিপ্ত,—"নিধিরাম সেই নৌকাপানে একদৃষ্টে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। এককড়ি দেখিলেন যে, নৌকা যতই দূরে যাইতে লাগিল, আর নিধিরামের শরীর ততই অবশ অবসন্ন গুরু হইতে লাগিল। মোড় ফিরিয়া সেই নৌকাখানি অদৃশ্য হইল, আর নিধিরামের প্রাণ বিয়োগ হইল।"

সবশেষে লেখক "ওঁ গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ রামঃ……" ইত্যাদি ব'লে সংক্ষেপে গল্পের ফলশ্রুতি ঘোষণা করেছেন। কিন্তু Hugo-র কল্পিত কাহিনীর সমাপ্তি-মুখে,—'হিরণ্ময়ীর মৃদুমধুর ভাষণে' একটি মাত্র উক্তিতে ত্রৈলোক্যনাথের অনাসক্ত শিল্পি-ব্যক্তিত্ব অমর হয়ে আছে,—এ-যেন ব্যক্তি-ত্রৈলোক্যনাথের দীর্ঘশ্বাসের প্রতিধ্বনি,—"কি করিব, সকলেই আপনার স্বার্থের জন্য ব্যস্ত।"

Hugo-র জীবন-বেদনা ত্রৈলোক্যনাথে অনুপস্থিত নয়,—'বাঙাল নিধিরাম'-এর সমাপ্তিক আবেদন তার প্রমাণ। কিন্তু একান্ত আত্মবিমুখ অনাসক্ত জীবন-দৃষ্টি ত্রৈলোক্যনাথের চিন্তায় জীবনের দুরবগাহ ঘনতাকে লঘু করেছে। তাই বাঙাল নিধিরামের ট্রাজিক পরিণতির সূত্রে তিনি অনায়াসে গাথতে পেরেছেন 'উদ্ধব দাদা'র কৌতুক-চপল মজার গল্পকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আবার বলা যেতে পারে,—এমন ব্যবহার "সাহিত্য-শিষ্টাচার বহির্ভূত।" অথচ ত্রৈলোক্যনাথ অবলীলায় তা পেরেছেন,—কারণ সুখ বা দুঃখ,—কোনো অবস্থাতেই জীবনের প্রতি তাঁর আসক্তি নেই।

কিন্তু আসক্তির অভাব অর্থে মমতার অভাব যেন না বুঝি। এখানেই Cervantes বা Swift-এর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের মৌলিক তফাত। 'Don Quixote' বা 'Gulliver's Travels'-এর শিল্পিদ্বয় অপ্রত্যাশিত অনতিক্রম্য দুঃখের যন্ত্রণায় জীবনের প্রতি আক্রুষ্ট ও বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন। কৌতুক-প্রচ্ছন্ন কাহিনীর অন্তরালে তাঁরা সেই বিষজ্বালার স্বাদ সাহিত্যে সঞ্চার করেছেন। তাঁদের হাতে লেখনী যেন মৌমাছির হুল,—মধুর লোভ দেখিয়ে জ্বালা ছড়িয়েছে জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তাই তাঁরা ব্যঙ্গরসিক,—satirist,—'হাসির ছলে' কেবল লজ্জা নয়,—আঘাত দিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথে আঘাত নেই। পাঠকের মনকে তিনি যেখানে খুব বেশি নাড়া দিয়েছেন—সেখানেই হঠাৎ জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বসিয়েছেন,—বসিয়েই হেসে উঠেছেন যেন হো-হো করে। 'ডমরুচরিত' তার চরম নিদর্শন। মানুষের স্বার্থান্ধ লোলুপতার হাতে মানুষের চরম নির্যাতনের কাহিনী আত্মগোপন করে আছে সাত পর্যায়ে সমাপ্ত ঐ গল্প-মালায়। ত্রৈলোক্যনাথের জীবন-অভিজ্ঞতার লক্ষ্মী-ভাণ্ডার 'ডমরুচরিত'। ঠিক এই কারণেই আজগুবি অবিশ্বাস্য উপাদানের প্রাণখোলা অট্টহাসির আতিশয্য এখানেই সবচেয়ে বেশি। সহজ-মমতায় ভরা শিল্পি-মন সন্তর্পণে লক্ষ্য রেখেছে নিজ জীবনের উত্তাপ যেন শ্রোতার মনে দাহ-সঞ্চার না করে। এ দেশের চিরাগত ধারা অনুসারে গল্প ব'লে শ্রোতাকে তিনি খুশি ক'রে তুলতে চেয়েছেন,—তাঁর সহজাত গাল্পিক প্রতিভার পক্ষে ঐটুকুই ছিল নগদ বিদায়। তার সঙ্গে ফাউ হিশেবে চোখে-দেখা জীবনের একটি আভাস,—আগে বলেছি,—একটি ঘ্রাণময় স্বাদ যুক্ত করেছেন,—

সে স্বাদ নির্ভার কৌতুকরসে ভরা। অতএব বাংলা সাহিত্যের প্রথম গল্প-শিল্পী।[২০] ত্রৈলোক্যনাথ কোনো উদ্দেশ্য-মূলক রচনার স্রষ্টা নন,—এদেশের চিরাগত গল্প-বলিয়ের সহজ উত্তরাধিকারী তিনি ;—নূতন যুগের শিল্পী হিশেবে তাঁর রচনা-শৈলী জ্বালাতপ্ত satirist-এর নয়,—বাংলা গল্পে দৃশ্যমান জীবনকে তিনি কৌতুকের স্মিতহাস্যে সঞ্জীবিত করেছেন,—ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা গল্পের প্রথম সার্থক 'হিউমারিস্ট'।

ত্রৈলোক্যনাথের পরে আলোচ্য প্রস্তুতি-পর্বে উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পের সংখ্যা আর বেশি নয়। এই সময়ে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৯-১৯১১) 'ক্ষুদিরাম' প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৮৮ খ্রীঃ)। কিন্তু 'ক্ষুদিরাম' ছোটগল্প নয়,—গল্পও নয় ঠিক। লেখক নিজ রচনার পরিচয় দিয়েছেন 'গাল-গল্প' বলে। গল্পের চেয়ে 'গাল' অর্থাৎ বিদ্রূপের তেজস্ক্রিয় অস্ত্রক্ষেপণই ইন্দ্রনাথের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ফলে গল্প-রস জমেনি ;—'ক্ষুদিরাম' অনেকটা ব্যঙ্গ-নক্সা।

এ-ছাড়া 'পূজার গল্প' এবং 'বড় গল্প নয়' নামে দু'টি বেনামা লেখকের রচনা আলোচ্য সময়ের উল্লেখ্য গল্প বলে নির্দিষ্ট হয়েছে।[২১] গল্প দু'টি ১২৯১ বাংলা সালের 'নবজীবন' পত্রিকায় আশ্বিন ও ফাল্গুন সংখ্যায় যথাক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম গল্পটির ছোটগল্পাঙ্গিক অপেক্ষাকৃত পরিণত, সন্দেহ নেই। কিন্তু দ্বিতীয় গল্পটির কাহিনী এবং উপস্থাপনা অনেকটা সরস উপাখ্যানের মতো। যাই হোক্,—এই সকল আকস্মিক ও প্রচ্ছন্ন কলাকর্মের মধ্যে অনাগতের স্বাক্ষর ক্রমেই স্পষ্ট মুদ্রিত হয়ে উঠছিল ;—বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের যুগ ক্রমশই এগিয়ে আসছে,—এই ঐতিহাসিক বার্তাবহনের ভূমিকাতেই এদের শ্রেষ্ঠ শৈল্পিক সার্থকতাও।

এদিক থেকে ত্রৈলোক্যনাথের পরে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের গল্প-সমষ্টিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য। আগে বলেছি,—রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প 'ভিখারিণী' ১২৮৪ বাংলা সালে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে কবি তাঁর সকল গল্প-সংকলন থেকেই এটিকে বাদ দিয়েছেন। বিশুদ্ধ রসমূল্যের বিচারে এই অস্বীকৃতি, সন্দেহ নেই, গল্পটির প্রাপ্য ছিল। 'ভিখারিণীর'-র পরে 'হিতবাদী'-পর্যায়ের আগে কবির আর তিনটি গল্প প্রকাশিত হয় :—

১। 'ঘাটের কথা' —'ভারতী,'—কার্তিক ১২৯১ সাল।
২। 'রাজপথের কথা'—'নবজীবন,'—অগ্রহায়ণ ১২৯১ সাল।
৩। 'মুকুট' —'বালক,'—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ সাল।

প্রথম দু'টি গল্প রবীন্দ্রনাথের একাধিক গল্প-সংগ্রহে স্থান পেয়েছে,—'গল্পগুচ্ছে'র ও প্রথমে ঐ দু'টি গল্পই আছে। 'মুকুট'কে নাট্য-রূপান্তরিত ক'রে তার গল্প-রূপকে কবি

২০। বাংলা সাহিত্যে প্রথম উল্লেখ্য গল্পের লেখক পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; কিন্তু গল্প-শিল্পীর সহজ-প্রতিভা তাঁর ছিল না,—ঐ একটি গল্প অনেকটা আকস্মিক রচনা। ত্রৈলোক্যনাথ এদিক থেকে গল্পের প্রথম স্বভাব-শিল্পী। ২১। দ্রষ্টব্য :—নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'বাংলা ছোটগল্প'।

ভুলেছিলেন। 'মুকুট'-এর কাহিনীতে নাটকীয় অভিঘাত সৃষ্টির অবকাশ প্রচুর হ'লেও গল্পের সুর ঠিক লাগে নি। প্রথম উল্লিখিত গল্প দু'টি সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। 'রাজপথের কথা' তো 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্গত হয়েছিল একবার। 'ঘাটের কথা'তেও সেই একই কথা ;—গল্পের সুর খুব মিহি। প্রথম যৌবনের প্রবেশ দ্বারে পৌঁছেও কবিমনের ভীরু সংশয় তখনো কাটেনি। জীবনের সঙ্গে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিচয়ই তখনো তাঁর নেই ; ঠাকুর বাড়ির আভিজাত্যের দুর্গে বন্দি-প্রাণ অশোক-কাননে বন্দিনী সীতার মতো মাথা খুঁড়ে মরছে। মনের ভূমিতে বাইরের জগতের আলো যখন পড়লো না, কবির স্বপ্ন-প্রাণ তখন নতুন চোরা-কুঠবির সৃষ্টি করেছে। 'ভৃত্যরাজকতন্ত্র' নয়,—ঠাকুর বাড়ির নিয়মতন্ত্রের ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু জীবনের তাপ এসে লাগলো, তারই মধ্যে কল্পনায় বিছিয়ে দিলেন আপন সঙ্গ-লোলুপ হৃদয়ের বেদনা। ফলে কবি বলেছেন,[২২]—"খুব ছেলেবেলায় পৃথিবীর সমস্ত রূপরসগন্ধ, সমস্ত নড়া-চড়া আন্দোলন, বাড়ির ভেতরের নারিকেল গাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপরকার ছায়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক, ভোরের বেলাকার বাগানের গন্ধ—সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণী নানান মূর্তিতে আমায় সঙ্গদান করত।"

এই বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণীর সঙ্গে মানস-মিলনের করুণ লালিত্য নবযৌবনের ভাবালুতায় রস-সিক্ত হয়ে জন্ম নিয়েছে 'ঘাটের কথা' আর 'রাজপথের কথা'। আসলে রচনা দু'টি কবির জীবন-বিরহী প্রাণের আত্মকথা। এই সময়ে তাঁর কবি-মানসের আযৌবন ধাত্রী 'নতুন বৌঠানে'র আকস্মিক মৃত্যুর বেদনাও তাতে অন্তর্লীন হয়ে আছে। গল্পের রস রচনা দু'টিতে নেই,—ব্যথিত যৌবনের আলুলায়িত আবেগ ভাবালু মনের কাছে এদের গতিবেগ সৃষ্টি করেছে। আগে বলেছি, বস্তুময় জীবন-অভিজ্ঞতার প্রচ্ছদ সার্থক গল্পের ভিত্তি ; তার পরিণাম শিল্পীর আত্ম-সম্ভব অবিচল প্রত্যয়ে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আলোচ্য যুগে কোনো বিশেষ প্রত্যয়ের দৃঢ়তা না থাক্, আত্ম-রুদ্ধ আবেগ ছিল দুর্বার। তবু ভাল গল্প লেখা হলো না,—কারণ objective জীবন-ভূমি তখনো ছিল তাঁর আয়ত্তের বাইরে। ত্রৈলোক্যনাথে objective জীবন-প্রেরণা ছিল প্রচুর,—কিন্তু যৌবনের প্রভাতে নিজের subjective ভাবনার কণামাত্রও সমূলে বিসর্জন দিয়েছিলেন তিনি। এই দু'য়ের প্রথম মিলন ঘটলো পদ্মা-ধৌত উত্তরবঙ্গে। তাই শাজাদপুর-শিলাইদহ-কুষ্টিয়ার রবীন্দ্র-জীবনভূমি বাংলা ছোটগল্পের ত্রিবেণী-তীর্থ। বাংলা ছোটগল্পের আদিপর্বের সূচনা ঐখানে।

২২। রবীন্দ্র-পত্র ; দ্রষ্টব্য—অজিত চক্রবর্তী 'রবীন্দ্রনাথ'।

সপ্তম অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্প : আদিপর্ব

১। 'গল্পগুচ্ছে'র রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-রচনার আশ্রয়ে বাংলা ছোটগল্প প্রথম পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছিল। কিন্তু এইটেই বড় কথা নয়। 'গল্পগুচ্ছে'র প্রাথমিক যুগের রবীন্দ্র-গল্পের মধ্যেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জীবনভূমি পরিবর্তিত হয়েছে—শিল্পীর জীবন-দৃষ্টি পেয়েছে এক অনাবিষ্কৃতপূর্ব জগতে প্রথম প্রবেশাধিকার। সাহিত্যের ইতিহাসে এইটেই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি ;—কেবল নূতন রূপ-কল্প নয়, নবতর জীবনের স্বাদ ও সন্ধান। স্বয়ং কবি এই জীবন পরিচায়নের প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"আমি যে ছোট ছোট গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালি সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি প্রথম তাতেই ধরা পড়ে।"[১] ইতিহাসের গ্রন্থিমোচনের প্রয়োজনে এই কবি-কথার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

উনিশ শতকে রামমোহন রায় থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত প্রতিভা-প্রবাহের সাধনায় যে রেনেসাঁস-এর জন্ম বিকাশ এবং পরিণতি, তার সর্বাঙ্গে বহুমুখী সম্ভাবনা উত্তুঙ্গ হয়েছিল। তাহলেও তারই মূলে অন্তর্নিহিত ছিল একান্তবদ্ধতার এক অনপনেয় সীমায়তিও। এই রেনেসাঁস-এর ফসল বাঙালি জীবনের সকল স্তরকে স্পর্শও করতে পারেনি, প্রধানভাবে কলকাতা এবং অংশতঃ অন্যান্য কয়েকটি মাত্র শহর-উপনগরের সংকীর্ণ সীমায় একান্তভাবে বাধা পড়েছিল। নাগরিক জীবনের বাইরে বৃহত্তম বাঙালি সমাজ অসংখ্য পল্লীতে ছিল চির অন্ধকারে নিমজ্জিত। কেবল গ্রামেই নয়, শহর-নগরেও একমাত্র ইংরেজি শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাইরে উনিশ শতকের নবজাগরণের কোনো প্রভাবই ছিল না। বাঙালি সমাজের এ ছিল এক ভার-সমতাহীন আশ্চর্য অবস্থা। বাংলার শহর-নগর তখনও এমনই অ-পূর্ণ গঠিত ছিল যে, গ্রাম ও শহরের মধ্যে তফাত খুব দূরবর্তী ছিল না। তাছাড়া, নিছক দৈহিক অবস্থানের দিক থেকে গ্রাম ও শহর তখনো ছিল ঘন-সন্নিবদ্ধ। তবু মন ও মননের জগতে এদের পার্থক্য ছিল আমূল। স্বয়ং রামমোহন রায় জন্মসূত্রে ছিলেন গ্রামীণ ; তাঁর প্রথম জীবনের কর্মক্ষেত্রও বহুলাংশে পল্লী-বাংলায় প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু যেদিন থেকে রামমোহন নব-বাংলার মহা-বিপ্লবীর ভূমিকা নিয়েছেন, তার আগে থেকেই তিনি কলকাতার মহানাগরিক। কেবল বাসস্থানের দিক্ থেকেই নয়, মনন-চিন্তার ক্ষেত্রেও কলকাতার বাইরেকার বাঙালি সমাজের অস্তিত্ব তাঁর ভাবনায় গভীর

১। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য, গান ও ছবি' [প্রবাসী, ১৩৪৮ বাংলা, আষাঢ়]।

ছায়া ফেল্‌তে পারেনি। অথচ বৈষয়িক কর্মসূত্রে এঁদের সঙ্গে এককালে তার যোগ ছিল প্রত্যক্ষ। সেকালের সংবাদপত্রে প্রথমাবধি পল্লীবাংলার দুর্নীতি ও দুর্গতির সংবাদ বহুল প্রকাশিত হয়েছে।[২] অথচ তার প্রতিকার সম্পর্কে বিচার ও আন্দোলন শহরের সীমাকে কখনো অতিক্রম করতে পারেনি। সমগ্র উনিশ শতকে বাঙালির জাতীয় অভ্যুত্থানে একবার মাত্র গ্রাম ও শহর সমপ্রাণ হয়েছিল,—সে ছিল নীল বিপ্লবের যুগ (১৮৫৯ খ্রীঃ)। কিন্তু নীল বিপ্লবের আন্দোলনেও শহর ও গ্রামীণ বাংলা একত্র-বদ্ধ হয়নি। সহাবস্থান, সমধর্মী জীবনযাত্রা, উদ্দেশ্য ও উৎপীড়নবোধের একতা সত্ত্বেও শহর-বাংলা সেদিন বৃহত্তর বাঙালি জীবন থেকে মনে মনে একান্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

এসম্বন্ধে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করেছেন, "শিক্ষিত জনমত ও অশিক্ষিত জনশক্তির মধ্যে যে ভেদ তাহা বর্তমান ইংরেজি শিক্ষার অন্যতম ফল।"[৩] কেবল ইংরেজি শিক্ষা নয়,—আসলে সেকালের ইংরেজ শাসকের দেওয়া শিক্ষাই বৃহত্তর বাংলার সঙ্গে শিক্ষাভিমানী বাঙালির ভেদবুদ্ধিকে অন্ধ ক'রে তুলেছিল। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ভাগ থেকে গ্রাম-বাংলা ও নগর-বাংলার বিচ্ছেদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পলাশি যুদ্ধের পরে এবং ক্রমে উনিশ শতকে বণিকরাজ ইংরেজের প্রতিপত্তি এদেশে যতই বেড়েছে, কলকাতা ততই আমাদের জাতীয় জীবনের কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির লোভে এককালে বাঙালি-শ্রেষ্ঠরা গ্রামের ভিটা ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন; ক্রমে মনের যোগও এখানেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল;—সুব্যাপ্ত দেশের প্রাণ-ভূমি তৃষিত হ'তে লাগলো বঞ্চনা-বুভুক্ষায়। কলকাতার ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের নব-সংগঠন থেকে দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের ছাপ ফিকে হয়ে এলো; অন্যদিকে সজীব প্রাণ-প্রবাহের স্পর্শহীন গ্রামও নিজের মূলগত শক্তিকে ফেললো হারিয়ে। ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির আবহমানকালের সম্পদ থেকে সেই অন্ধকার যুগে সারা দেশই বঞ্চিত হ'লো। রামমোহন রায় প্রথম এদেশে বেদ-উপনিষদের স্মৃতি জাগরিত করতে চাইলে নিষ্ঠাবান সংস্কৃত পণ্ডিতেরাই বলেছিলেন;—"এ সবকিছুই স্বধর্মদ্বেষী রামমোহন রায়ের 'ধাপ্পা'; বেদ-উপনিষদ বলে হিন্দুশাস্ত্রে কিছু নেই।"[৪]

দেশীয় মননচিন্তা সম্বন্ধে এইরূপ অজ্ঞান-অন্ধকার যখন সবদিক থেকে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, তখনই এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠা। অতএব ইংরেজি বিদ্যার প্রাণোত্তাপ একদিকে বাঙালির মনকে যত আলোক-দীপ্ত করেছে, দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব জাতীয় জীবনের প্রতি বিরূপ অবজ্ঞার সৃষ্টি করেছে ততই। 'নব্য

২। দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সঃ)—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'। ৩। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-'ভারতে জাতীয় আন্দোলন'। ৪। প্রমথ চৌধুরী—'রামমোহন রায়'—'প্রবন্ধ সংগ্রহ ১ম খণ্ড'।

বঙ্গ দল' যে প্রথমে নিরীহ স্বদেশবাসীদের প্রতি অনাচার-উৎপীড়নে অধীর হয়ে উঠেছিল, তারও মূল কারণ রয়েছে এইখানেই। পরবর্তীকালে শিক্ষিত বাঙালির বুদ্ধি-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ স্বদেশীয় ঐতিহ্য-আদর্শের মূল্য পুনরায় আবিষ্কৃত এবং স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু দেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে পুঁথিগত জ্ঞান বর্ধিত হ'লেও, গ্রামের অশিক্ষিত অধিবাসীদের সঙ্গে মনের যোগ কিছুতেই আর গড়ে উঠলো না। প্রতীচ্য শিক্ষার গৌরবে অন্ধ বাঙালি-সমাজ ঐ বিদেশী জ্ঞানকেই আত্মোন্নতির একমাত্র কারণ বলে ধরে নিয়েছিল। বস্তুত দেশের পুরাতন সংস্কৃতির উদ্ধার ও নব মূল্যায়ন যে সম্ভব হয়েছিল, সেও তো বিদেশী জ্ঞান বা বিদেশী পণ্ডিতদের সাধনার বলেই! অতএব সেই জ্ঞান-মহাবৃক্ষের ফল যারা ভোগ করতে পারলো না, স্বদেশবাসী হ'লেও তারা নেহাৎ-ই হয়ে রইল অবজ্ঞেয়। সেদিনকার প্রতীচ্য শিক্ষার অতি-মূল্যায়নের অন্ধতা বাংলাদেশে নূতন শ্রেণী-বৈষম্যের সৃষ্টি করলো। ইংরেজি শিক্ষিত অর্থেই ধরে নেয়া হ'ল বুদ্ধিজীবী উন্নত শ্রেণীর মানুষ :— বুদ্ধি বা জ্ঞানের পরিমাপ না করেও চাকুরিজীবী যাঁরা আপিসে-দপ্তরে কলম চালনা করেন, তারাই নির্বিশেষে বুদ্ধিজীবীর নূতন মর্যাদা পেলেন। মসীচালক চাকুরিজীবী মাত্রই বুদ্ধিমান্, অতএব যাঁরা তা না করেন তাঁরাই নির্বোধ অজ্ঞান—অবহেলার যোগ্য; এই অসুস্থ মনোভাব থেকেই বাংলাদেশে শ্রমজীবিতা আজও নিন্দনীয় হয়ে আছে।

অন্যদিকে নিজের ঘরে আপনজনকে 'পরবাসী' করে রাখার, তথা স্বদেশবাসীদের মধ্যে এই অবজ্ঞাভরা বিভেদ রচনার ক্ষেত্রে কূট-নীতিকের ভূমিকা নিয়েছিলেন বিদেশী সরকার। বাঙালিকে ইংরেজি শিক্ষা দেবার একেবারে প্রথম পর্যায়েই দেশীয় শিক্ষার্থীর অপ্রত্যাশিত চিৎপ্রকর্ষের পরিচয় পেয়ে আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তি ভীত হয়েছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন, বুদ্ধি-দীপ্ত এই বাঙালি মনীষার সঙ্গে শ্রমজীবী বাঙালি বাহুর যোগ ঘটলে, তৎক্ষণাৎ এদেশে বৃটিশ সূর্য অস্তমিত হবে। তাই শিক্ষিত বাঙালির মনের দূরত্বকে তারা প্রথম থেকেই অশিক্ষিত বাঙালির প্রতি ঘৃণায় পরিবর্তিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। ফলে, কেবল গ্রামে নয়, শহরে-নগরে যে-সব অশিক্ষিত 'কুলির' দল একসঙ্গে এক পথে হেঁটেছে, 'বাঙালি বাবু' প্রতিমুহূর্তে দেহে-মনে তাদের প্রতি বিমুখ হয়ে ফিরেছেন। ভাবলে কৌতুককর মনে হবে,—এক পয়সা বেশি ভাড়ায় কলকাতার ট্রামের প্রথম শ্রেণী, আর 'দেড়া ভাড়ায়' রেলের মধ্যম শ্রেণী আসলে ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এই বৈষম্য-বিরাগকে স্থায়ী করে রাখবার জন্যে ব্রিটিশ রাজশক্তির কল্পিত আরো দু'টি কূট-অস্ত্র।

বর্তমান প্রসঙ্গে এসব তথ্যের আনুপূর্বিক আলোচনা বা বিশ্লেষণ অপরিহার্য নয়। কেবল এই ধারণা দ্বিধাহীন হলেই যথেষ্ট যে, উনিশ শতকে বাংলাদেশের নবজাগরণ বাংলামাটির সঙ্গে একান্ত যুক্ত ছিল না। এর প্রেরণা এসেছিল প্রতীচ্য ইতিহাস-দর্শন-

সাহিত্য-বিজ্ঞানের জগৎ থেকে ; এর উৎসাহ ছিল সেই জ্ঞানলব্ধ আদর্শে নিজেদের জীবনকে নব-উদ্বুদ্ধ করে তোলার পথে। অথচ সেই জীবন ইংরেজি শিক্ষিত শহরবাসী বাঙালি সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে নিতান্ত নিরঙ্গ অস্তিত্বে পর্যবসিত হয়েছিল। ফলে, স্বদেশ ও স্বজাতির বাস্তব-জীবনের সংস্পর্শহীন এ-যুগের আদর্শ ও উদ্দীপনা কখনো কল্পনা-সর্বস্ব রোমান্টিক ভাবলোকে উড়ে ফিরেছে ; কখনো বা নিছক অধিবিদ্যামূলক যুক্তি-তর্ক বিস্তারে হয়েছে বহু ব্যাপক। কেবল উনিশ শতকের বাংলা কাব্য-সাহিত্যে নয়, সেকালের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আন্দোলনেও কাজের চেয়ে আলোচনা, বিপ্লবের চেয়ে আবেদন-নিবেদনই বেশি জায়গা জুড়েছিল। বাংলা সাহিত্যে সে ছিল অনেকটা বস্তুত্তীর্ণ কল্পনা-সমুচ্ছল আদর্শবাদের যুগ।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে এই যুগ-স্বভাবের পরিচয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "বঙ্কিম যে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা লিখেছিলেন, সে-সব কি সত্য ছিল? সে-সব romantic situation কি তখন ঘটতে পারতো? সত্যি হচ্ছে এই যে, তিনি পড়েছিলেন ইংরেজি রোমান্স, পড়ে ভালো লেগেছিল। তৃপ্তির একটা ক্ষেত্র তো চাই। বঙ্কিম পেয়েছিলেন সে ক্ষেত্র, আমাদের দিয়েছিলেন। আমি তাই বলি, বঙ্কিমের রচনায় আমরা যা পাই তা সামন্ততন্ত্র নয়। তাকে নতুন একটা পিপাসা বলতে পার, যা মেটাবার শখ তিনি যেখান থেকে হোক সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর বইগুলোতে যে-সব কাণ্ড-কারখানা আছে, সেগুলো তাঁর স্মৃতির মধ্যেও ছিল না।"[৪]

বস্তুত বাঙালির জীবন-শিল্প রচনার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক বঙ্কিম ছিলেন অনাগত-বিধাতা। তাঁর যুগের নগর-বাংলায় সদ্য ইংরেজি-শিক্ষিত নরনারীর ভাবলোকে নবীন আদর্শের আবেগ-অভিঘাত সদ্য ফেনিল হয়ে উঠেছিল। যুগপ্রাচীন সমাজ-সংস্কারের প্রতিক্রিয়াশীলতা সেই ভাবাবেগকে ক্ষণে ক্ষণে তপ্ত-ক্ষুব্ধ করেও তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সংঘাতের প্রত্যক্ষতা বাস্তব জীবন-ভূমিতে তখনও অপরিহার্য হয়ে ওঠেনি। সমাজে বিধবা-বিবাহ চলছে বিদ্যাসাগর মশায়ের প্রবল উৎসাহে। কিন্তু সে ঘটনা নিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন কোলাহলের আকার ধরলেও যথার্থ সামাজিক জটিলতা তখনও সৃষ্ট হয়নি। অপরপক্ষে অ-সিদ্ধ, বা অ-প্রচলিত প্রণয়ের অগ্নিদাহে একটি-দু'টি করে তরুণপ্রাণ আত্মনাশ করতে থাকলেও তখনো তা ব্যাপক সমস্যার আকারে দেখা দেয়নি। অতএব বিধবার প্রণয় ('বিষবৃক্ষ'-'কৃষ্ণকান্তের উইল'), অথবা অ-চরিতার্থকামা কুমারী প্রণয়িনীর পক্ষে সধবা জীবনেও পূর্ব-প্রণয়ী পরপুরুষের

৪। "শ্রীবুদ্ধদেব বসুর সহিত আলোচনার অনুলিপি"—দ্র: 'রবীন্দ্র রচনাবলী' ১৪শ খণ্ড, 'গ্রন্থপরিচয়'।

সঙ্গ-লিপ্সার ('চন্দ্রশেখর') প্রতিক্রিয়া বাংলার সমাজ-দেহে তখনো বাস্তবরূপ লাভ করেনি।[৫]

বঙ্কিম তাঁর সমকালের নাগরিক বাংলার জীবনযাত্রাকে সাধকের ঐকান্তিকতা নিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন,—ধ্যানীর তন্ময়তা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার ভাবী সম্ভাবনার শিল্পরূপ। সন্দেহ নেই, ইংরেজি রোমান্স-এর রসরূপ তাঁর কল্পনার শুশ্রূষা করেছিল। কিন্তু আসলে গল্পগুলির উৎস-বিন্দু ছিল বাঙালি জীবনের অতন্দ্র-অন্বীক্ষু বঙ্কিমের ভাবলোকে। এই কারণেই, একালেও বঙ্কিমের উপন্যাস পড়ে আমরা বিদেশি গল্পের প্রতিরূপ বলে ভুল করি না; বরং ভুল করি অষ্টাদশ-উনিশ শতকের সামন্ততান্ত্রিক বাংলার যথার্থ অবস্থার ইতিহাস বলে। কিন্তু, এই ভুল ভাঙতেও খুব দেরি হয় না।

দৃষ্টান্ত হিশেবে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর কথাই বলি। উপন্যাসটির পরিণামী ট্রাজেডির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটিমাত্র ঘটনা। গোবিন্দলালের অনুপস্থিতিতে রোহিণী দিনদুপুরে কৃষ্ণকান্তের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিল সর্বাঙ্গে ধার-করা গিল্‌টির গয়না পরে; ভ্রমরকে উচ্চকণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছিল,—ঐসব সোনার গয়না সে গোবিন্দলালের কাছে পেয়েছে। আশ্চর্য, এর পরেও কৃষ্ণকান্তের জমিদারিতে অসহায়া রোহিণীকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হয়নি গোবিন্দলালের দেশে ফিরে আসবার, এমন কি ভ্রমরের পিতৃগৃহে চলে যাবারও আগে! তারচেয়েও বড় বিস্ময়, অত কিছুর পরেও রোহিণী বিনা বাধায় ঐ গ্রামেই বাস করতে পেরেছিল গোবিন্দলালের সঙ্গে পালিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত। সেকালের গ্রাম্য সমাজের পক্ষে এর চেয়ে অসম্ভব অবাস্তব ঘটনা আর কিছু হতে পারত না। 'উইল চুরি' প্রসঙ্গে স্বয়ং বঙ্কিম যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতেও বুঝি, রোহিণীর পক্ষে দিনদুপুরে এ-ধরনের আচরণ করে বেঁচে থাকার চেয়ে বাঘিনীর বুক থেকে সদ্য-প্রসূত শাবককে ছিনিয়ে আনাও বরং সহজ ও স্বাভাবিক হতে পারত। অতএব দেখছি, যে-একটিমাত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে আগাগোড়া উপন্যাসের কাহিনী আমূল বিচঞ্চল হয়েছে, তার জীবন-ভিত্তিই থেকে গেছে অবাস্তবতায় আচ্ছন্ন। বস্তুত কেবল 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এই নয়, 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর' ইত্যাদি প্রায় সব কয়টি বঙ্কিম-উপন্যাসেই বাংলার পল্লীজীবনের পরিচয় বস্তু-সম্পর্ক-মুক্ত স্বপ্নকল্পনায় আলোকিত হয়ে আছে। এর কারণ প্রধানত দুটি:—এক, সেকালের গ্রাম-জীবনের স্বভাব ও বিশিষ্টতা সম্পর্কে ব্যক্তি-বঙ্কিমের কোনো সুসংলগ্ন অভিজ্ঞতা ছিল না, যদিও দীর্ঘকাল তিনি কাঁটালপাড়ার পৈতৃক বাড়িতে বাস করেছিলেন। কেবল বঙ্কিম সম্বন্ধেই নয়, সাধারণভাবে সেকালের শিক্ষিত নাগরিক

৫। এই সময়কার ঐতিহাসিক জীবন-পটভূমির জন্য দ্রষ্টব্য: ভূদেব চৌধুরী—'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'; ২য় পর্যায়, চতুর্থ সং।

বাঙালি সমাজের পক্ষেও এ-কথা জ্ঞান সত্য ছিল। আর দ্বিতীয়ত পল্লীজীবনের সবিশেষ পরিচায়ন আসলে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের উদ্দেশ্যেরও বহির্ভূত ছিল। পুরুষ ও নারী-সমাজে ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে সে-যুগের নগর-বাংলায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অভিমান অতিশয় তীব্র হয়ে উঠেছিল। তারই ফলে দেখা দেয় প্রাচীন সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক সংস্কারের বিরুদ্ধে নব-প্রবুদ্ধ ব্যক্তি-চেতনার সংঘাত। এই জীবনাবর্তে সেকালের একাধিক শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর প্রাণ পাকে পাকে তলিয়ে গিয়েছিল এমন কি কখনো কখনো আত্মঘাতনেরও পথে। সেই জীবন-জটিলতার গ্রন্থি-সন্ধান ও গ্রন্থি-মোচনই ছিল বঙ্কিম-সাধনার মূল প্রেরণা।[৬]

এদিক থেকে সমসাময়িক মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন ছিল বঙ্কিম-উপন্যাসের বিষয়। কিন্তু সেই জীবনে যথার্থ জটিলতার বীজ তখন কেবল অঙ্কুরিত হতে আরম্ভ করেছে। এমন অবস্থায় সেখানে ঔপন্যাসিক জীবন-কল্পনার বেদী রচনা তখনো ছিল অসম্ভব। রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম যুগে এই জীবনাঙ্কুর বিবর্ধিত হয়ে সমাজ-মহীরূহের রূপ ধরেছিল। কবি তখন অনায়াসে তাঁর 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'গোরা'র বনিয়াদ রচনা করেছেন সেই সুগঠিত নবজীবনের প্রচ্ছায়ে বসে। বঙ্কিমের যুগে 'চোখের বালি'র অঙ্কুর কেবল সমাজ-ভূমিতে মাথা তুলেছে, অথচ সেকালের নগর-জীবনের মাটিতে সেই গাছকে বাড়িয়ে তোলার মতো দৃঢ়তা তখনো দেখা দেয়নি। অতএব অনাগত-বিধাতা বঙ্কিম আগন্তুক জীবন-সমস্যাকে রূপ দিয়েছেন অতীতের রহস্যাচ্ছন্ন জগতে ;—সেই রূপ-রচনার প্রেক্ষাপট হিশেবে গ্রহণ করেছেন সেকালের নাগরিক অভিজ্ঞতা থেকে দূরলীন গ্রামীণ জীবন-ভূমিকে। ফলে না ইতিহাসের কাল, না গ্রামের জীবন-লোক, কোনোটিই সমুচিত বস্তুময় রূপ লাভ করেনি। দূর-গমনের অস্পষ্ট রহস্যাবরণের অন্তরালে বসে কবি-বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন অনাগত সম্ভাব্য জীবনের কল্পনা-চিত্রকে। তাঁর সাহিত্যে তাই নিত্যকালের মানুষকে প্রত্যক্ষ করি সেকালের জাগ্রয়মান সমস্যার পটভূমিতে ;—কিন্তু না পাই সে সমস্যার বস্তুময় রূপায়ণ,—না পাই রক্তমাংসের বাঙালি-বাঙালিনীর বাস্তব জীবনচ্ছবি। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে এই অভিযোগই প্রসঙ্গান্তরে ধ্বনিত হয়েছে :—
"বাংলার অন্তর্দেশবাসী নিতান্ত বাঙালিদের সুখ-দুঃখের কথা এ পর্যন্ত কেহই বলেন নি··· বঙ্কিমবাবু উনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র আধুনিক বাঙালির কথা যেখানে বলেছেন, সেখানে কৃতকার্য হয়েছেন, কিন্তু যেখানে পুরাতন বাঙালির কথা বলতে গিয়েছেন সেখানে তাঁকে অনেক বানাতে হয়েছে ; চন্দ্রশেখর, প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় মানুষ

৬। দ্রষ্টব্য :—ভূদেব চৌধুরী—'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' ; ২য় পর্যায়, চতুর্থ সং—'বাংলা সাহিত্যের যৌবন মুক্তি : বাংলা উপন্যাস'।

এঁকেছেন (অর্থাৎ তাঁরা সকল-দেশীয় সকল-জাতীয় লোকই হতে পারতেন, তাঁদের মধ্যে দেশকালের বিশেষ চিহ্ন নেই) কিন্তু বাঙালি আঁকতে পারেননি। আমাদের এই চিরপরিচিত, ধৈর্যশীল, স্বজন-বৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী, প্রচণ্ডকর্মশীল পৃথিবীর একপ্রান্তবাসী শান্ত বাঙালির কাহিনী কেউ ভালো করে বলেনি।"৭

'উনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র আধুনিক বাঙালি' বলতে কবি এখানে বঙ্কিম-কল্পনার সৃষ্ট ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের প্রতিভূ চরিত্রাবলীর কথাই বলেছেন; এদের মধ্যে বাস্তব জীবন-মূল-বিহীনতা তাঁকে পীড়িত করেছিল। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে এইটুকুই বড় কথা নয়। লক্ষ্য করতে হয়, ওপরের মন্তব্যটি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লেখা একটি পত্রের অংশ। পল্লী-জীবনের সঙ্গে তখনো কবির প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘনিষ্ঠ হয় নি। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারি পরিচালনার ভার তিনি স্থায়িভাবে গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে, এবং তারপর থেকে গ্রাম-বাংলার দেহ-মনের সঙ্গে তাঁর সান্নিধ্যে দিনে দিনে নিবিড় হয়ে ওঠে। কিন্তু এই চিঠির লিপিকাল কবির দ্বিতীয়বার বিলাত-যাত্রারও আগে। অথচ এই চিঠিরই সমাপ্তিক ছত্রে "আমাদের এই চিরপীড়িত...বাস্তুভিটাবলম্বী, প্রচণ্ড কর্মশীল পৃথিবীর এক নিভৃতপ্রান্তবাসী শান্ত বাঙালির" জীবন-রূপটির জন্য একান্ত আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে। সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের হাতে বহু বিশেষণে স্নিগ্ধ এ জীবন গ্রামীণ বাঙালির।

কবি-প্রকৃতির মর্মান্তরালগত এই সহজ-শান্ত গ্রামীণ বাঙালি-প্রীতির বহিরঙ্গ উৎস নানা ঘটনার মধ্যে সন্ধান করা যেতে পারে। নানাপ্রকার দুর্যোগ ও পীড়নের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত বাঙালির সমাজে রাষ্ট্রীয় চেতনা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ দৃঢ়মূল হয়েছে। তাহলেও প্রধানত সুরেন্দ্রনাথের অতন্দ্র সাধনা ও দুঃসাধ্য বাগ্মিতার ফলে সেই স্বরাষ্ট্র-বোধের প্রেরণা প্রথমে জেগেছিল বিদেশী মহানায়কদের আদর্শ থেকেই। সেদিনকার শিক্ষিত বাঙালি স্বাধীনতার জন্য সর্বস্বপণ করবার আগে গ্যারিবল্ডি ম্যাটসিনির জীবনী পড়েছে বারে বারে; কিন্তু স্বদেশবাসী বাঙালির দুর্গতি মোচন দূরে থাক্, তাদের দুঃখের খবর নেবার কথা কল্পনাও করেনি। অতএব রবীন্দ্রনাথের ঐ চিঠি লিখবার সময়ে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলেও (১৮৮৫ খ্রীঃ) কবির পল্লী-ভাবনার উৎস-সন্ধানে সে প্রসঙ্গ অবান্তর। সমসাময়িক অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসও একই কারণে আলোচনার যোগ্য নয়। কেবল হিন্দুমেলার (প্রথম অধিবেশন :—১৮৬৭ খ্রীঃ) কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এই স্বদেশী মেলার অনুষ্ঠানে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির নেতৃত্ব ছিল দূরপ্রসারী। আর কেবল সাধারণ অর্থেই এ-মেলা 'স্বদেশী' ছিল না। পরবর্তী কালের সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন এই হিন্দুমেলার প্রেরণা বশে নানাভাবে

৭। রবীন্দ্রনাথ—'ছিন্নপত্র' :—পত্রসংখ্যা ৫।

প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু ঐটুকুই মেলার চরম ফলশ্রুতি নয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের ক্ষেত্রে আপামর জাতির কৃতি ও কীর্তিকে মর্যাদা দেবার প্রথম মহৎ গৌরব হিন্দুমেলার। মেলার দ্বিতীয় বছরের অধিবেশনের (১৮৬৮) প্রধান বক্তা মনোমোহন বসু তাঁদের আদর্শের চরিতার্থতা বিষয়ে বলেছিলেন: "যখন দেখিবেন ঢাকা ও শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ, কাশী ও কাশ্মীরের কারুগণ, জয়পুর ও লক্ষ্ণৌ-এর ভাস্করগণ, চণ্ডালগড় ও কুমারটুলির কুমারগণ, পাটনার কৃষকগণ, অথবা সংক্ষেপে বলিতে গেলে উত্তর ও দক্ষিণের পূর্ব ও পশ্চিমের সমব্যবসায়ী, সমশিল্পী এবং সমবিদ্য গুণিগণ এই চৈত্রমেলার রসভূমিতে আপনা হইতে আসিয়া পরস্পর প্রতিযোগিতা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে—যখন দেখিবেন তাহারা এই মেলার প্রদত্ত প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কারকে অমূল্য ও অতুল্য গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেছে—যখন দেখিবেন এই মেলাকে স্বজাতীয় গৌরব-ভূমি বলিয়া সকলের প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তখনই জানিবেন এই নবরোপিত বৃক্ষের ফল লাভ হইল।"[৮]

স্পষ্টই দেখছি,—সারাভারতের শ্রমজীবী ও গ্রামীণ জনতার প্রতি হিন্দুমেলার উদ্যোক্তাদের অবধান ছিল অতন্দ্র আবেগে পূর্ণ। বস্তুত এই সভার ফলশ্রুতি বাংলা-দেশের গ্রামেও উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। ১২৭৮ বাংলা সালের ৩০শে ফাল্গুন তথা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বারুইপুরে হিন্দুমেলার অনুমত এক মেলা বসেছিল। সেই সভাতেও মনোমোহন বসু ছিলেন প্রধান বক্তা,—আর গ্রামবাসীরা ছিলেন প্রধানত উৎসাহী শ্রোতা।[৯] গ্রাম-সচেতন,—পল্লী-প্রিয় এই হিন্দুমেলার জন্মকালে কবির বয়স ছিল পাঁচ বছর। কিন্তু উত্তরকালে অগ্রজদের সঙ্গে তিনিও মেলার আদর্শ ও কর্মসাধনার পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। চৌদ্দ বছর বয়সে নবম বার্ষিক মেলায় বালক কবি 'হিন্দুমেলার উপহার' নামক স্বরচিত কবিতা পড়ে সারা দেশকে মুগ্ধ করেছিলেন। সে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৭ সালের হিন্দুমেলায়ও আর একটি বিখ্যাত কবিতা পাঠ করেন।"[১০] তখন থেকেই নিখিল বাংলার প্রাণভূমির প্রতি কবি-মনের সহজ দৃষ্টি উৎসারিত হয়েছিল।

এরপরে স্বাদেশিকতার প্রতি রবীন্দ্র-মানসের দ্বিতীয় সংযোগ 'সঞ্জীবনী সভা'র মাধ্যমে। মনীষী রাজনারায়ণকে পুরোধা করে এই সভায় 'খ্যাপামি' ও 'উত্তেজনার আগুন পোহানো' চলেছিল অপরূপ পন্থায়। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। 'খ্যাপামি' ও 'উত্তেজনা' ছাড়া এই সভার সত্য স্বভাব যেটুকু ছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে তারই মূর্তিরূপ যেন দেখতে পাই। 'রবীন্দ্রজীবনী'কার এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন: "সঞ্জীবনী সভা স্থাপন করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত ছিলেন না।

৮। দ্রষ্টব্য—যোগেশচন্দ্র বাগল—'মুক্তির সন্ধানে ভারত'। ৯। দ্রঃ তদেব। ১০। দ্রঃ তদেব।

বাঙালির মৃতকল্প প্রাণে জীবনীশক্তি দান করিবার জন্য তিনি যে সব চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা আজ সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে, তাঁহার সার্বজনীন পোষাক তাঁহার শিকার করা ও শিকার শেখানোর উদ্যম, তাঁহার তাঁত ও দেশলাই-এর কল করিবার জন্য প্রয়াস ও সর্বশেষে স্বদেশী স্টীমার কোম্পানি খুলিয়া দেউলিয়া হইয়া যাইবার কাহিনী আজ বিস্মৃত ইতিহাসের মধ্যে গিয়াছে, কিন্তু বাঙালির সকল প্রকার স্বাদেশিকতাব মূলে এই মহাত্মার ব্যর্থ জীবনের কথা অমর হইয়া রহিয়াছে সেকথা ভুলিলে জাতীয় কৃতঘ্নতা হইবে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর কাটে।[১১] রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমে সকল মতবাদ-মুক্ত যে উদার মানস-ব্যাপ্তি, তার মূলে লক্ষ্য করি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই ভাব-প্রভাব। সত্তর বছরের জন্ম-জয়ন্তী উৎসবে কবি নিজের জীবন-বিকাশের ইতিহাস সন্ধান করে বলেছিলেন : "জ্যোতিদাদা যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোনো বাঁধন পরান নি।······আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের সহায়তা করেছেন।"[১২] কবি বলেছেন, তিনি যে তাঁর নিজের মতো হতে পেরেছেন তাও ঐ জ্যোতিদাদার প্রভাবিত চিত্ত-বিকাশের ফলে। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপ্ত স্বদেশ-প্রীতির সঙ্গে গ্রাম-সন্দর্শনের মানস-আকৃতিও এসেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছ থেকে। ওপরে যে-সব প্রয়াসের কথা প্রভাতকুমার উল্লেখ করেছেন তার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখব—দেশীয় জীবন-চেতনার এক অনিবার্য উদার ব্যাপ্তি ও মুক্তিই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সকল কর্ম-প্রচেষ্টাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কোনো মতবাদের প্রভাবে নয়,—মনের সহজ অনুভবের একান্ততা তাঁর দেশ-দেখা-চোখে সমগ্রতার রূপটি ফুটিয়ে তুলেছিল। ফলে গ্রাম অথবা নগর সম্বন্ধে কোনো বিশেষ অবধান বা অতিরিক্ত ঝোঁক পড়েনি তাঁর চিন্তায়। নগর-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বসে গ্রামীণ মানুষের—দেশের সুবৃহৎ জনতার জীবন-বেদনাও তাঁর নিভৃত অন্তরে অনুস্যূত হয়েছিল। সেই আন্তর স্পর্শ রবীন্দ্রনাথকেও 'খাঁটি বাঙালি'র জীবন-রচনায় উন্মুক্ত করেছিল ; অথচ তখনো তিনি গ্রাম-বাংলার নিকট সান্নিধ্যে আসেননি।

প্রভাব যেখান থেকেই আসুক বর্তমান প্রসঙ্গে আসল কথা, নগর-বাংলার আভিজাত্যের মহাপীঠে জাত এবং বর্ধিত হয়েও 'খাঁটি বাঙালি'—গ্রামীণ বাঙালির প্রতি কবি-মনের উৎকণ্ঠা ছিল আবাল্য। ইতিহাসের এই সত্যকে সচেতনভাবে স্বীকার করতে হবে। বাংলা ছোটগল্প-সাহিত্যের জন্ম ও বিকাশেরধারায় এ-তথ্যের বিশেষ তাৎপর্য আছে। রবীন্দ্র-গল্পকে রবীন্দ্র-কাব্য থেকে আজও পৃথক্ করে বিচার করা হয় না। তার প্রয়োজনও অবশ্য অপরিহার্য নয়। কিন্তু কবিতা ও গল্পকে একসঙ্গে যুক্ত করে সাধারণ ভাবে বলা

১১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—'রবীন্দ্রজীবনী'—১ম খণ্ড। ১২। রবীন্দ্রনাথ—'অবতরণিকা' রবীন্দ্র রচনাবলী ১ম খণ্ড।

হয়, রবীন্দ্র-রচনা জীবন-বিমুখ, স্বপ্ন-কল্পনাময়—রোমান্টিক্। কাব্য-প্রসঙ্গের আলোচনা বর্তমান উপলক্ষ্যে অবান্তর। কিন্তু ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বাঙালি-জীবন-মুখীনতাই সাহিত্যের নবীন মুক্তি-পথ রচনা করেছিল। তা না হলে, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন,—সেদিনকার বিদেশী গল্পের আঙ্গিক অনুকরণের মধ্যে বাংলা ছোটগল্প কোন্ রূপ পেত তা কে জানে ?[১৩]

এই নতুন ধারার প্রবর্তনা করেছিলেন সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য'-অফিসের সভায় স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী। 'প্রস্পর মেরিমের ফরাসী হইতে অনুবাদিত,' সে গল্পটি 'ফুলদানী' নামে 'সাহিত্য' পত্রিকার পরের সংখ্যায় ছাপাও হয়েছিল।[১৪] তারপরে অসংখ্য বিদেশী গল্পের অনুবাদ চল্‌তে থাকে,—প্রায়ই অক্ষম হাতে। ফলে, ভঙ্গি-সর্বস্ব সেই রচনাবলীর মধ্যে নবজাত বাংলা ছোটগল্প-শিশুর অব্যবহিত মৃত্যু অনিবার্য হত। ফরাসী সাহিত্যের মর্মলোকের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর প্রাণের যোগ ছিল ; তাছাড়া, তাঁর 'অ-পূর্ব বস্তু-নির্মাণ-ক্ষমা প্রজ্ঞা' বা প্রতিভাও ছিল অতুল্য। তাতেও 'ফুলদানী' গল্পানুবাদের রসোত্তীর্ণতা কিন্তু সংশয়াতীত ছিল না। তা ছাড়া একটি-দু'টি উৎকৃষ্ট অনুবাদ-গল্প লেখা এক কথা ; আর সাহিত্যের ইতিহাসে ছোটগল্পের একটি নূতন ধারার জন্ম, বিকাশ ও পূর্ণতা বিধান সম্পূর্ণ পৃথক্ আর এক কথা। প্রথমটির পক্ষে ভাষা ও রসজ্ঞানই যথেষ্ট। দ্বিতীয়টির জন্য শিল্পিপ্রাণের একান্ত অনুমোদন,—তথা মর্মলীন জীবন-চেতনার একান্ত প্রেরণা আবশ্যিক। স্বয়ং প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক জীবনেও গল্প লেখার সেই সহজ প্রণোদনা এসেছিল তাঁর শিল্পি-আত্মার বিশেষ জীবন-বোধের পথ বেয়ে। সেখানে ফরাসী গল্পের আকৃতি বা প্রকৃতির সঙ্গে 'চারইয়ারি কথা'র কোনো যোগ নেই। শিল্পি-প্রকৃতির বিশেষ প্রবণতাই এই গল্পাবলীকে অনন্য স্বাদুতা দিতে পেরেছে।

প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্পের জীবন-স্বভাবের কথা পরে আলোচনা করব। এখানে কেবল লক্ষ্য করতে হবে, 'ফুলদানী'র পরে তিনি নিজেও গল্পানুবাদের পথে আর বেশি দূর অগ্রসর হননি। তা ছাড়া সাহিত্যের এক নূতন রূপলোকের দ্বার উদ্‌ঘাটনই ছিল প্রমথ চৌধুরীর ঐ অনুবাদের উদ্দেশ্য। এমন অবস্থায় একটি নূতন আকৃতির শিল্প-শরীরের প্রায় একমাত্র আকাঙ্ক্ষাতেই যখন অসংখ্য গল্পানুবাদ হয়ে চলেছিল, বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে তখন প্রাণহীন মাংসপিণ্ডের অতিসঞ্চয় কিছু অসম্ভব ছিল না। এমন সময় পদ্মাপার থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুললেন ছোটগল্পের নবীন দেহের

১৩। দ্রষ্টব্য :—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—'বাংলা ছোটগল্প' (১৯০১-১৯২৫)—'দেশ' (সাহিত্য সংখ্যা)—১৩৬৪ বাংলা। ১৪। দ্র. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সঃ)—'সাহিত্য পত্রিকা'—১২৯৮ সাল।

হৃৎপিণ্ডে আর ধমনীতে। এ-প্রাণ কবির চিরকাম্য 'বাঙালি'র। বঙ্কিম-যুগের আবেগপুষ্ট রোমান্স ও নাগরিক আভিজাত্যের কল্পলোক থেকে গ্রামীণ বাংলার বস্তু-ঘন জীবন-ভূমিতে নেমে এল বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস। এখান থেকেই সাহিত্যের পটপরিবর্তন। রবীন্দ্রগল্পের আলোচনায় ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র এ-কথা জোরের সঙ্গে বলতে পেরেছেন যে, 'গল্পগুচ্ছে' রবীন্দ্রনাথের জীবনানুভব শরৎচন্দ্র-প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্যকুমারের শিল্প-চিন্তারই পূর্বসূরী। "রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্পে যে দরদ, সংক্ষিপ্ত বর্ণনার যে নৈপুণ্য ও সর্বোপরি যে নৈরাত্ম দৃষ্টিভঙ্গী দেখা গেছে, শরৎচন্দ্রের একাধিক পতিতা-জীবনীর ফলশ্রুতির সঙ্গে তা তুলনীয় ; এ-যুগের শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' তারই পুনরাবৃত্তিমাত্র।" অথবা, অচিন্ত্যকুমারের " 'অপূর্ণ' 'আপদ'-এরই অন্য সংস্করণ।"[১৫] অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্র-উত্তর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকারদের বিশিষ্টতা তাঁদের জীবনবোধের গুণগত পার্থক্যে নয়, পরিমাণগত বিভিন্নতায়।

অথচ রবীন্দ্র-বংশের আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে গল্পগুচ্ছের বাস্তবতার স্বভাবকে চোখ বুজে অস্বীকার করা হয়। মৃত্যুর সন্নিধানে পৌঁছে যন্ত্রণা-তিক্ত কণ্ঠে কবি এই অসত্য-বোধের বিরোধিতা করেছেন,—"লোকে অনেক সময়েই আমার সম্বন্ধে সমালোচনা করে ঘরগড়া মত নিয়ে। বলে, 'উনি তো ধনী ঘরের ছেলে। ইংরেজিতে যাকে বলে রুপোর চামচে মুখে নিয়ে জন্মেছেন। পল্লীগ্রামের কথা উনি কী জানেন।' আমি বলতে পারি আমার থেকে কম জানেন তাঁরা যাঁরা এমন কথা বলেন। কী দিয়ে জানেন তাঁরা। অভ্যাসের জড়তার ভিতর দিয়ে জানা কি যায়। যথার্থ জানায় ভালোবাসা। কুঁড়ির মধ্যে যে কীট জন্মেছে সে জানে না ফুলকে। জানে, বাইরে থেকে যে পেয়েছে আনন্দ। আমার যে নিরন্তর ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে আমি পল্লীগ্রামকে দেখেছি তাতেই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছে। আজ বললে অহংকারের মত শোনাবে, তবু বলব আমাদের দেশের খুব অল্প লেখক এই রসবোধের চোখে বাংলাদেশকে দেখেছেন। আমার রচনাতে পল্লী-পরিচয়ের যে অন্তরঙ্গতা আছে, কোনো বাঁধা বুলি দিয়ে তার সত্যতাকে উপেক্ষা করা চলবে না।"[১৬] বাংলা ছোটগল্পের সচেতন, সম্পূর্ণ প্রথম রূপায়ণ প্রসঙ্গে এখানে কবির দাবি দু'টি,—এক, এই ছোটগল্প রচনার উপলক্ষ্যে বাংলার পল্লী-জীবনের 'হৃদয়ের দ্বার' তিনি খুলে দিয়েছিলেন। আর দুই, সেটা সম্ভব হয়েছিল পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে তাঁর "নিরন্তর ভালোবাসার দৃষ্টি"র প্রভাবে। আমাদের ধারণা, এই পল্লীপ্রীতির সহজ ধারা কবি-চেতনার মূলে ছিল আবাল্য ;—এমনকি প্রত্যক্ষভাবে পল্লী-সান্নিধ্যে আসবারও আগে

১৫। ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র—'গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ' :— সাহিত্য পরিক্রমা'। ১৬। 'কবির উত্তর' —'প্রবাসী', বৈশাখ, ১৩৪৭ বাংলা।

থেকে। ব্যক্তিগতভাবে কবি যখন গ্রামের প্রাণের কাছে এসে পৌঁছালেন, তখন সেই অন্তর্লীন সহজ জীবনানুরাগই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সিঞ্চিত হয়ে নবীন শিল্পরূপ ধারণ করল ছোটগল্পের নবগঠিত শরীরে। রবীন্দ্রনাথের অনুভব-সীমায় সাহিত্যের আশ্রয়স্বরূপ জীবন-চেতনার এই আমূল পট পরিবর্তন না ঘট্‌লে সার্থক বাংলা ছোটগল্পের জন্ম ঘট্‌ত কি না, কবে ঘট্‌ত,—সে-কথা আজ নিশ্চিত করে বলা কঠিন। অতএব, রবীন্দ্র-গল্প তথা বাংলা ছোটগল্পের প্রাণ-পরিচয়ের ঐতিহাসিক স্বরূপ অবধারণের জন্যেও স্মরণ রাখতে হবে—রবীন্দ্রনাথ "সমাজের যে স্তরের অধিবাসী, তার বাইরে অনেক দূব পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি চলে এবং সে দৃষ্টি এতোটুকু ঝাপসা নয়। এবং প্রসঙ্গবিশেষে অতি-মনোযোগ বা obsession-এর দোষও তাঁর নেই। তাঁর মন সজীব, সুতরাং তাঁর কৌতূহলও ব্যাপক। গল্পগুচ্ছে বালকের চাপল্য এবং প্রৌঢ়ের জল্পনা, দরিদ্রের অশ্রু এবং ধনবানের অপব্যয়, কুমারীর অনুরাগ এবং বিধবার প্রেম, সবই আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কোথাও অতি-নিবদ্ধ নয়......।"[১৭]

২। রবীন্দ্র-ছোটগল্পের স্বভাব : প্রথম যুগের গল্প

এ-পর্যন্ত আলোচনায় রবীন্দ্র-গল্পের উৎসগত একটি বিশেষ জীবনভূমির প্রতি অতিশয় জোর দিয়েছি। তার কারণ দু'টি। প্রথমত 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পাবলীর জন্ম-প্রসঙ্গেই ইংরেজ প্রভাবোত্তর বাংলা সাহিত্যে গ্রামবাংলার পদক্ষেপ ও প্রতিষ্ঠা অবারিত হয়েছে। সাহিত্যে এই জীবন-প্রসার রস-সৃষ্টির স্বভাবে বিশিষ্টতা সম্পাদন করে থাকে। ইতিহাসের পক্ষে সেই স্বাদুতার মূল্যায়ন আবশ্যিক। দ্বিতীয়ত এই জীবন-বোধের নবীনতা এবং গভীরতাই রসোত্তীর্ণ ছোটগল্পের সৃষ্টি সম্ভাবিত করেছিল। আগে বলেছি, সাহিত্যে বিশেষ বিশেষ রূপাঙ্গিক বিশেষিত বিভিন্ন জীবন-ঋতুর ফসল। যে জীবনের বৃন্তে ছোটগল্পের ফসল মুকুলিত হয়,—সংহতি, নিবিড়তা আর গভীরতা তার মৌল স্বভাব। উপন্যাস-কলার আশ্রয় জীবনের ব্যাপ্তি, জটিলতা ও সম্পূর্ণতার মধ্যে; কিন্তু ছোটগল্পের জন্ম হতে পারে কেবল গভীর, সংসক্ত, স্বচ্ছ-অখণ্ড জীবন-ফলকে : আগে এক অধ্যায়ে বলেছি, পদ্মদীঘির স্ফটিক জলে সংহত, প্রশান্ত, নিস্তরঙ্গ গভীরতায় বঙ্কিম তাঁর রোমান্স ও উপন্যাস রচনার উপলক্ষ্যে সমকালীন নগরবাংলার জীবন-যন্ত্রণা ও সমস্যা-জটিলতার তরঙ্গে তরঙ্গে ছুটে ফিরেছেন নিজের কবিকল্পনা নিয়ে। জীবনের কোনো একটি মুহূর্তের ওপরে নিবিষ্ট—ধ্যানস্তব্ধ হয়ে বসবার উপায় ছিল না তাঁর পক্ষে। অন্যদিকে রবীন্দ্রযুগে সমস্যা ও জটিলতার অভাব ছিল না।

১৭। ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র—'গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ'—পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

বরং বঙ্কিমের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কালের বাংলাদেশে বিক্ষোভ ও বিপ্লবের আন্দোলন তীব্রতর হয়েছিল। কিন্তু সমসাময়িক জীবনের সেই অকূল পাথার সমস্যা-জগতে ভেসে বেড়াবার শক্তি ছিল না কবির। তাঁর ধ্যান-কল্পনামগ্ন শিল্প-চেতনা নিজের জন্য শান্তির নীড়,—তথা সম্পূর্ণতার আশ্রয় কামনা করেছে চিরকাল। খণ্ড-জীবনের বীজকে বিদীর্ণ করে অখণ্ডের অঙ্কুর জাগিয়ে তোলার সাধনা করেছেন কবি। দৃষ্টান্ত হিশেবে 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গল্পের রচনাকাল ১৩০১ বাংলা সাল (১৮৯৪ খ্রীঃ)। সমকালীন জীবন-পটভূমির পরিচয় দিয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন : "তখন পথে-ঘাটে ইংরেজের হাতে দেশীয়দের অপমান, সাহেবদের পদাঘাতে প্লীহা-বিদারণ প্রভৃতি ঘটনা কাগজপত্রে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইত। রবীন্দ্রনাথ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে দুই-একটি উৎপীড়নের ঘটনা এই গল্পের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।"[১৮] এ-সম্পর্কে গল্পে উল্লিখিত ঘটনা দু'টি হচ্ছে যথাক্রমে ম্যানেজার সাহেব কর্তৃক নৌকার পালে গুলি করে যাত্রীসহ নৌকো ডুবিয়ে দেওয়া; আর পুলিশ সাহেব কর্তৃক জেলেদের নূতন জাল কাটিয়ে ফেলা। এই ধরনের ক্ষোভ-আক্ষেপ নিয়ে সমস্যাজটিল উপন্যাস লেখা সম্ভব ছিল; রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন একাধিক প্রবন্ধ। তাদের মধ্যে 'অপমানের প্রতিকার' এবং 'সুবিচারের অধিকার' অন্যতম। দ্বিতীয় প্রবন্ধে কবি সেকালের জাতীয় সমস্যার একটি শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি ঘোষণা করেছেন :[১৯] "অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি দণ্ডায়মান হইতে হয় তবে সর্বাপেক্ষা ভয় আমাদের স্বজাতিকে—যাহার হিতের জন্য প্রাণপণ করা যাইবে, সেই আমাদের বিপদের কারণ, আমরা যাহার সহায়তা করিতে যাইব তাহার নিকট হইতে সহায়তা পাইব না, কাপুরুষগণ সত্য অস্বীকার করিবে, নিপীড়িতগণ আপন পীড়া গোপন করিয়া যাইবে, আইন আপন বজ্রমুষ্টি প্রসারিত করিতে এবং জেলখানা আপন লৌহবদন ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিবে……।"

স্পষ্টই দেখছি সেকালের রাজনৈতিক জীবন-জটিলতা কবির মনের সঙ্গে মননকেও একান্তভাবে আকর্ষণ করেছিল। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে শশীভূষণের জীবনে একই ধরনের দুর্যোগ-পাতের ছবি দেখি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেখানে জীবনশিল্পী, সেখানে বিরোধের উৎক্ষিপ্ততার মাঝখানে থেমে যাওয়া বা তলিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। দ্বন্দ্বোত্তর সুমিতির মধ্যেই তিনি কমেডিকে স্মিত-উজ্জ্বল, অথবা ট্রাজেডিকে করেছেন করুণ-মধুর। এই অর্থেই বুদ্ধদেব বসু বলেছেন 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পেও "বেদনার ধার ভোঁতা হয় না,

---

১৮। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র-জীবনী'—প্রথম খণ্ড। ১৯। রবীন্দ্রনাথ—'সুবিচারের অধিকার', 'রাজা প্রজা', রবীন্দ্র রচনাবলী ১০।

বেদনা মধুর হয়ে ওঠে।"[২০] কিন্তু এই সবেদন মাধুর্য আহরণ করার জন্য গল্পটিকে তার মূল প্রসঙ্গ থেকে বিচ্যুত হতে হয়েছে। পরিবর্তে কবির স্পর্শকাতর অনুভবের অতল গভীরে নতুন গীতিমূল্য সঞ্চয় করে সে ধন্য হয়েছে। শশীভূষণের জীবনের বৈপ্লবিক ভূমিকা সেখানে সম্পূর্ণ তিরোহিত; অপ্রত্যাশিত পরিবেশে অতীত জীবনের জীর্ণ-স্মৃতি দলিত করে বিধবা গিরিবালা শশীভূষণের মুখের দিকে সকরুণ স্নেহে চেয়ে থাকে, শশীভূষণের কপোল বেয়ে ঝরে চোখের জল। আর কীর্তনের দল দূর থেকে কাছে এসে পুনঃপুনঃ-হৃদয় দ্বারে গাইতে থাকে—'এসো এসো হে।'

কিন্তু মূল রাজনৈতিক সংঘাতের অতলস্পর্শ অনুভব নিয়েও সফল ছোটগল্প রচিত হতে পারত। বরং মূল প্রসঙ্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে 'মেঘ ও রৌদ্র'-তে ছোটগল্পের অখণ্ডতা এবং সংসক্তি আহত হয়েছে। কিন্তু আসল কথা, জীবনের জটিল বিস্তার ও সমস্যা-ক্ষুব্ধ বিরোধের পাথারে কবি তাঁর সৌন্দর্য চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে রাজি ছিলেন না। সংহতি প্রশান্তি ও নিবিড়তার অতলে তিনি ডুব দিয়েছিলেন। আগেও বলেছি, রাজনৈতিক জীবন-চিন্তাকেও সংহত বিন্দু-কেন্দ্রিত করতে পারলে 'মেঘ ও রৌদ্র' তার প্রাথমিক কাহিনী বিষয় নিয়েই রসোত্তীর্ণ হতে পারত।

কিন্তু ঐটুকুই সব নয়। বস্তুত সেকালের বাংলাদেশে আলোচ্য রাজনৈতিক বিক্ষোভ জাতীয় সমস্যার আকার ধরেছিল। তাকে নিয়ে সফল উপন্যাস রচনার সম্ভাবনা ছিল বিরাট্। আমাদের ধারণা, সেই অতি-বিস্তারিত আদ্যন্ত-সম্পূর্ণ জীবন-বর্ণনার ঔপন্যাসিক ক্ষেত্র থেকে পালাবার জন্যেই 'মেঘ ও রৌদ্র'-র শিল্পী ভাব-কল্পনাময় গীত-ভূমিতে অকস্মাৎ-প্রয়াণ করেছিলেন। 'গোরা' উপন্যাসে অনেকটা এই ধরনের জীবন-সমস্যাকেই কবি বিস্তারিত করে দেখেছেন। কিন্তু সেখানেও অপার-বিস্তৃত ঔপন্যাসিক বস্তু-ভূমি থেকে তাঁর শিল্পভাবনা কাব্য-স্বাদী গীতি-প্রবণতার পথে যাত্রা করেছে। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ চিত্ত-প্রবণতা ছিল ব্যাপ্তির চেয়ে সংহতির, বিস্তারের চেয়ে গভীরতার, আদ্যন্ত সম্পূর্ণতার চেয়ে খণ্ডকে অখণ্ড করে তোলার অভিমুখী। এই প্রবণতাই তাঁর হাতে গীতি-কবিতার মত ছোটগল্পের জন্মকেও শাশ্বত প্রাণের প্রাচুর্যে পূর্ণ করেছিল।

কিন্তু সার্থক সৃষ্টির জন্য কেবল স্রষ্টার আকাঙ্ক্ষা বা প্রবণতাই যথেষ্ট নয়, সমুচিত জীবন-ভূমির পক্ষপুটাশ্রয়ও অপরিহার্য। পদ্মা-বিধৌত উত্তরবঙ্গের পল্লীভূমি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প—তথা প্রথম বাংলা ছোটগল্পের জন্মকে সেই জীবনাশ্রয় দিয়েছিল। পদ্মা-আত্রেয়ী-গৌরী, বড়ল-নাগর প্রভৃতি বহু নদ-নদী বিধৌত এই গ্রামীণ ভূখণ্ডের ব্যাপ্তি ছিল সীমাহীন। কেবল নদীস্রোতে নয়, মাঠ-বিল প্রান্তর-বনানী শোভিত প্রাকৃতিক

২০। বুদ্ধদেব বসু—'রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য'।

পটভূমি ও 'বহু পুত্র-কন্যা এবং লাঙল-সর্বস্ব' গ্রামীণ মানুষের জীবন, সব কিছুতেই বিস্তার এবং বিচিত্রতা ছিল নিরবধি। কিন্তু আবালবৃদ্ধ অসংখ্য নরনারী এবং অনন্ত প্রসারিত নিসর্গপটের অন্তলে নিহিত ছিল এক অপার প্রশান্তি, এক নিস্তব্ধ নিবিড়তা। সমকালীন উদ্ভ্রান্ত-জটিল নাগরিক পরিবেশ থেকে এই পটভূমির পার্থক্য আপনা থেকেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ছিন্নপত্রের নানা কবি-কথায় :

(১) "এদেশে গোলমাল কোথাও নেই, ইচ্ছে করলেও পাওয়া যায় না, কেবল অন্যান্য বিবিধ জিনিসের সঙ্গে হাটে পাওয়া যেতে পারে।"[২১]

(২) "সবসুদ্ধ খুব ঢিলে-ঢিলে একলা-একলা কী এক রকম মনে হচ্ছে। যেন পৃথিবীতে অত্যাবশ্যক কাজ বলে একটা কিছুই নেই—এমন কি নাইলেও চলে, না নাইলেও চলে এবং ঠিক সময়মতো খাওয়াটা কলকাতার লোকের মধ্যে প্রচলিত একটা বহু দিনের কুসংস্কার বলে মনে হয়। .... এখানকার দিনগুলো এই রকম বারো ঘণ্টা পড়ে পড়ে কেবল রোদ পোহায়, এবং অবশিষ্ট বারো ঘণ্টা খুব গভীর অন্ধকারে মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নিদ্রা দেয়। এখানে সমস্ত ক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে কেবল নিজের মনের ভাবগুলোকে বসে বসে দোলা দিতে ইচ্ছে করে, তার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু গুন্‌গুন্ করে গান গাওয়া যায়, মাঝে মাঝে বা ঘুমে চোখ একটু অলস হয়ে আসে। মা যেমন করে শীতকালের সারা বেলা রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে ছেলে কোলে করে গুন্‌গুন্ স্বরে দোলা দেয়, সেই রকম।"[২২]

এই নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ততা,—এই নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ-মেদুর জীবনের নিস্তরঙ্গ গভীরতা, শিল্পীর করুণা-কোমল দৃষ্টিকে আপন অন্তগতার প্রতি অনায়াসে আকর্ষণ করে। রবীন্দ্র-রচনায় ছোটগল্পের জন্ম কবিতা-উপন্যাসের অনেক পরে। এর অন্যতম কারণ নির্দেশ করে জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় বলেছেন : "রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে প্রকৃতিকে অন্তরঙ্গভাবে জানিয়াছিলেন, মানুষকে তেমন নিবিড়ভাবে জানিতে সুযোগ লাভ করেন নাই। জমিদারি পরিদর্শন ও পরিচালনা করিতে আসিয়া বাংলার অন্তরের সঙ্গে তাঁহার যোগ হইল—মানুষকে তিনি পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিলেন।"[২৩] বর্তমান প্রসঙ্গে এ কথার তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুধাবন করবার মত।

সত্য বটে, উত্তরবঙ্গে যাবার আগে রবীন্দ্র-জীবনে মানবসমাজের এমন ব্যাপক বিচিত্র পরিচয় আর কখনো ধরা পড়েনি। কিন্তু শহরের চেনা সমাজে,—ইংরেজি শিক্ষিত বিদগ্ধ অভিজাত সমাজের জীবন নিয়েও গল্প তিনি লেখেননি,—লিখতে পারেননি।

২১। রবীন্দ্রনাথ—'ছিন্নপত্র'—পত্র সংখ্যা ১৪। ২২। তদেব—পত্র সংখ্যা ১৫। ২৩। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র-জীবনী' প্রথম খণ্ড।

চলমান সে জীবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া হয়ত একেবারে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু শিল্পি-প্রাণের নিভৃত অনুভব নিয়ে ডুবে যাবার মত গহন অতলতা ছিল না সে জীবনে। ছোটগল্পের শিল্পরূপকে বিম্বিত করবার ক্ষমতা নেই জটিলতায় আবিল অগভীর জীবন-স্রোতস্বিনীর ; কেবল জীবন-প্রান্তরের মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা কাহিনী বা অনুভবের কম্পনে স্রোতের জল যেখানে মুহূর্তের জন্য থম্‌কে দাঁড়ায়, নিয়ত চলমানতার সেই ক্ষণিক অতলে ছোট গল্পের শিল্পরূপ প্রকাশের পূর্ণতা পেতে পারে। উত্তরবঙ্গের গ্রাম্য জীবন-পট সকল ছোটগল্প রচনার প্রচ্ছদ তুলে ধরেছিল কবির চোখের সামনে।

রবীন্দ্র-ছোটগল্প রচনায় আর একদিক থেকে বরেন্দ্র পল্লীমালার সার্থকতা অতুল্য। ছোটগল্পের শিল্পীকে একসঙ্গে হতে হয় গীতিপ্রাণ এবং বস্তুসচেতন। আর সেজন্যে প্রয়োজন সহজ ভাব-সহৃদয়তার সঙ্গে উদার আত্মবিবিক্ততার সংযোগ। এখানেই সিদ্ধকাম গীতিকবি এবং ঔপন্যাসিকের সঙ্গে সার্থক ছোটগল্প-শিল্পীর মৌল প্রভেদ। গীতিকবি তাঁর সকল অভিজ্ঞতা ও চিন্তাকে একান্ত আত্মলীন উপলব্ধির রঙে রাঙিয়ে নবরূপ দেন। তাতে অভিজ্ঞতা আর অভিজ্ঞতা থাকে না, চিন্তা তার নিজের স্বরূপ হারিয়ে বসে। কবির মন্ময় ভাবনার রসে পরিস্রুত হয়ে সব কিছুই অনন্যসদৃশ নূতনতা লাভ করে। কিন্তু ছোটগল্পের শিল্পী তাঁর নিভৃত জীবনানুভবকে নানা অভিজ্ঞতা ও পরিচিত জীবনের নানা খুঁটিনাটির মধ্য দিয়ে এমনভাবে প্রকাশ করেন যাতে করে তাঁর আত্মলীন ব্যক্তিচেতনার স্বাতন্ত্র্য গল্পের বস্তুভূমিতে আত্মসংহরণপূর্বক এক নৈর্ব্যক্তিক সংহতি ও সর্বজনীনতা লাভ করে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সমকালীন জীবন থেকে এই বিষয়ের উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। 'সোনারতরী'র 'শৈশব-সন্ধ্যা' কবিতা লেখা হয়েছিল ১২৯৮ বাংলা সালে। গল্পগুচ্ছের 'পোস্টমাস্টার'ও ঐ একই বছরে লেখা। কবিতাটির পেছনে বরেন্দ্র পল্লীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ আছে। 'ছিন্নপত্রে'র একটি চিঠিতে কবি জানিয়েছেন : "সন্ধ্যাবেলায় পাবনা শহরের একটি খেয়া ঘাটের কাছে বোট বাঁধা গেল।" জলের ওপরে নানা রকমের নৌকা, দূরের প্রান্তর, কাছের খেয়া ঘাট,—সুদূরের পল্লীপ্রাঙ্গণ,—সব জায়গা থেকে বিচিত্র কর্মের অজস্র ছন্দায়িত কলরব ভেসে আসছিল কবির কানে এবং প্রাণে ; ওপরে ছিল বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। "এই মেঘলা আকাশের নীচে নিবিড় সন্ধ্যার মধ্যে, কত লোক, কত ইচ্ছা, কত কাজ, কত গৃহ, গৃহের মধ্যে জীবনের কত রহস্য,—মানুষে মানুষে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি কত শত সহস্র প্রকারের ঘাতপ্রতিঘাত।" গোটা কবিতাটির প্রারম্ভিক অংশে এই বস্তুক অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ ছবি আঁকা হয়েছে। কিন্তু সেই বর্ণনার যেখানে শেষ, আসল গীতিকবিতা-স্ফূর্তির শুরু তারপর থেকে। তখন, কবি বলেছেন, "বৃহৎ জনতার সমস্ত ভালমন্দ, সমস্ত সুখ দুঃখ এক হয়ে

তরুলতা বেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্ষানদীর দুই তীর থেকে একটি সকরুণ সুন্দর সুগম্ভীর রাগিণীর মতো আমার হৃদয়ে এসে প্রবেশ করতে লাগল।"[২৪]

তারপরে যা ঘটলো, সে নিছক কবি-হৃদয়ের সীমাতেই। বাইরের বস্তুভূমি থেকে সে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। শুধু তাই নয়, কবির আত্মলীন ভাবনার পরিস্রুতির ফলে প্রথমাংশের জীবন-বর্ণনাও যথার্থ বস্তুময় প্রসঙ্গ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। বস্তু এবং অনুভব মিলে একমাত্র সত্য উপলব্ধিকে শাশ্বত আবেদনময় করে রেখেছে কবিতান্তে :

"দাঁড়াইয়া অন্ধকারে
দেখিনু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে
রয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক,
সন্ধ্যা শয্যা, মার মুখ, দীপের আলোক।"

সৃষ্টির অব্যবহিত বস্তুপটভূমি, রবীন্দ্রনাথের অতীতজীবন-স্মৃতি, সব কিছু কবি-ভাবনার মন্ময় উত্তাপে বিগলিত-পরিস্রুত হয়ে 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতায় এক সর্বাতিশায়ী সুর-বলয়িত উপলব্ধির স্বাদকে অক্ষয় করে রেখেছে। কবিতার স্বাদুতা উৎপাদনে কবি-চৈতন্যের যোগ এখানে কেবল অপরিচ্ছেদ্য নয়, অনন্যতুল্য। অপর পক্ষে 'ছিন্নপত্রে'র আর এক চিঠিতে কবি 'পোস্টমাস্টা'র গল্পের পোস্টমাস্টার-এর বাস্তব উৎসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন : "এই লোকটির [সাজাদপুরের পোস্টমাস্টার] সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট অপিস ছিল, এবং একে প্রতিদিন দেখতে পেতুম তখনই আমি একদিন দুপুর বেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্টমাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম এবং সে গল্পটি যখন 'হিতবাদী'তে বেরোল, তখন আমাদের পোস্টমাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন।"[২৫] সন্দেহ নেই, মূল গল্পটির সঙ্গে বাস্তবের পোস্টমাস্টারের তথ্যগত যোগ নিছক ছায়ার চেয়ে গাঢ় হতে পারেনি। ভাবনার দিক্ থেকে এই গল্পের সঙ্গে আরো একটি ব্যক্তিত্বের ঘনতর যোগ কল্পনা করেছেন অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী।[২৬] কলকাতার নাগরিক জীবন থেকে সদ্য নির্বাসিত কবির জীবনার্তিকেই তিনি অনুভব করেছেন পোস্টমাস্টারের গ্রাম-বিমুখ কলকাতা লোভাতুরতার উৎস হিশেবে। এই ধারণা একেবারে অমূলক না-ও হতে পারে। কিন্তু 'শৈশবসন্ধ্যা'র মত ব্যক্তি-চেতনার সে আর্তি আপন বস্তুভূমিকে একচ্ছত্র মন্ময়তার অতলে অন্তর্হিত হতে দেয়নি। বরং বাস্তব তথ্য এবং শৈল্পিক কল্পনার আধারে নিজ ব্যক্তিমনের বেদনাকে সীমিত ব্যঞ্জনা দিয়ে কবি মূল গল্পের

২৪। রবীন্দ্রনাথ—'ছিন্নপত্র', পত্রসংখ্যা ১০৮। ২৫। রবীন্দ্রনাথ—তদেব—পত্রসংখ্যা ৬০।
২৬। দ্র. প্রমথনাথ বিশী—'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প'।

প্লট-এ এক অপূর্ব গীতি-সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছেন। ঐটুকুই 'পোস্টমাস্টার'-এর ছোটগল্পত্বের প্রাণ ; একথা বলেছি পূর্বের আর এক অধ্যায়ে। আর ছোটগল্প-শৈলীর সংগঠন ক্ষেত্রে একথা কেবল রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রযোজ্য নয়,—সর্বদেশ-কালের সার্থক গল্প সম্বন্ধে সাধারণভাবে সত্য।

দৃষ্টান্ত হিশেবে প্রখ্যাত ফরাসী কথা-সাহিত্যিক Emile Zola-র কথা বলা যেতে পারে। এ কে বলা হয়েছে "The most brutal of the realists."[২৭] ঔপন্যাসিক জোলা সম্বন্ধে এর চেয়ে সত্য উক্তি আর কিছু হতে পারে না। ব্যক্তিগত দারিদ্র্য, সামাজিক বিনষ্টি ও ঐতিহাসিক অবক্ষয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জোলা আসলে "was no longer describing a living organism but dissecting the corpse of a defunct society."[২৮] অথচ এই জোলা যখন ছোটগল্প লিখলেন, তখন তারা অবিস্মরণীয় হয়ে রইল,—সমালোচক বলেছেন,—"for their unusual delicacy, lightness & grace."[২৯] দৃষ্টান্ত হিশেবে 'The Shoulders of the Marquise" গল্পের একটুকরো বলি। গল্পের শুরুতে বস্তুবাদী জোলা তাঁর সকল ভীষণতা ও জালাতির্যক বাগ্‌ভঙ্গির তীব্রতা নিয়ে পুরোপরি আত্মপ্রকাশ করেছেন :

—"মার্কুইস্ তার মস্ত বিছানায় ঘুমোচ্ছেন,—হল্‌দে সার্টিনের মস্ত বড়ো মশারির তলায়। ভরা দুপুরে,—ঘড়ির স্পষ্ট ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে তিনি ঠিক করলেন,—চোখ খুলবেন। শোবার ঘরটি গরম। কার্পেট, পর্দা, দরজা-জানালায় ঘরটিকে একটি নরম তৃপ্তি-সুখকর পাখির নীড়ের মতো করে তুলেছে,—শীতের ঠাণ্ডা সেখানে ঢোকে না। গন্ধমদির কবোষ্ণ বাতাস চারদিকে ভেসে বেড়ায়। শাশ্বত বসন্ত বিরাজ করে এখানে।

ভাল করে জেগে ওঠা মাত্রই হঠাৎ কোনো চিন্তায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন মার্কুইস্। পেছন দিকে ছোট্ট বিছানা-ঢাকার ওপরে ছিট্‌কে পড়ে তিনি জুলি-র জন্য ঘণ্টা টিপ্‌লেন।

'দেবী কী ঘণ্টা বাজালেন ?'

'বরফ কী গল্‌তে শুরু করেছে,—বলো !'

আহা, বেচারি মার্কুইস্! কী উদ্বিগ্ন স্বরে তিনি এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। এই বি-ভীষণ তুষার স্তূপের জন্যে তাঁর প্রথম ভাবনা,—আর সেই তীব্র উত্তুরে হাওয়ার জন্যে, যা তিনি নিজে কখ্‌না অনুভব করেন না,—কিন্তু দরিদ্রের জীর্ণ কুটিরে যা অনিবার্য নিষ্ঠুর বেগে বয়ে ফেরে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—দেবতা কি প্রসন্ন হয়েছেন, যাতে

২৭। 'The Master Piece Library of Short Stories.' Vol. 4. ২৮। Chambers' Encyclopedia. ২৯। 'The Master Piece Library of Short Stories' Vol. 4.

তিনি নির্ভাবনায় নিজেকে তপ্ত করে রাখ্‌তে পারেন,—বাইরে যারা কাঁপ্‌ছে, তাদের কথা ভাবেন-ও না তিনি।

'বরফ কী গল্‌তে শুরু করেছে, জুলি ?'

প্রকাণ্ড চুল্লির আগুনে তাতিয়ে রাখা তাঁর সকালের 'ড্রেসিং-গাউন' নিয়ে ঢোকে পরিচারিকা।

'ও, না, দেবি! বরফ গল্‌ছে না। উল্টো বরং কঠিন হয়ে জমে উঠ্‌ছে। এইমাত্র একটা লোককে বাসে জমে মরে থাক্‌তে পাওয়া গেছে।'

শিশুর মত উল্লাসে ছিট্‌কে পড়েন মার্ক্‌ইস্‌,—হাততালি দিয়ে বলে ওঠেন তিনি,—'এই ভালো, আজ বিকেলে 'স্কেট্‌' করতে পারব আমি'।"—

ধনীর কদর্য বিলাস, নির্মম হৃদয়হীনতা ও অন্ধ স্বার্থপরতার প্রতিচ্ছবি চিত্রণে এখানেও জোলা 'most brutal of the realists.' তাহলেও, শিল্পীর ভাষাভঙ্গীর বিশিষ্টতা এখানে লক্ষ্য করবার মতো। তথ্য-চিত্রণে এ-ভাষা মর্মাতিশায়ী ; কিন্তু আনুপূর্বিক নয় ;—নয় মর্মান্তিক রূপে পুঙ্খানুপুঙ্খ, সমালোচক যাকে বলেছেন 'dissecting'। তার বদলে এই ভাষার চলমানতায় যেন কবিতার বিগলিত সাবলীল ভঙ্গী রয়েছে। তা ছাড়া, তথ্য-সঞ্চয় ও তথ্য-ব্যবহারেও লেখক এখানে কবির মতই ব্যঞ্জনাধর্মী। এর চরম দৃষ্টান্ত রয়েছে ওপরের গল্পাংশের একেবারে শেষে। বরফ-জমা শীতের তীব্রতায় একটি লোক জমে গেছে আ-মৃত্যু। এই খবর শুনে অপরের অনেক যত্নে তাতিয়ে-রাখা 'গাউন' পরে স্বপ্ন-পুরী-নিবাসিনী মার্ক্‌ইস্‌ শিশুর মতো আহ্লাদে হাততালি দিয়ে ওঠেন,—কারণ বিকেলে তিনি জমাট বরফের ওপর দিয়ে 'স্কেট্‌' করে বেড়াতে পারবেন। 'মানুষ মানুষের কী করেছে'—এই অমানুষিক তথ্য-জিজ্ঞাসার এক অপূর্ব কবিতা-রূপ যেন জোলার এ বর্ণনা। উপন্যাসে হলে শিল্পী একে ব্যাখ্যা করে বিশদ করতেন। কিন্তু ছোটগল্প-শিল্পীর সবচেয়ে ভাল তুলি সংক্ষিপ্তি, সংহতি, আর ব্যঞ্জনায়। এই ব্যঞ্জনার সৌরভেই জোলা এখানে গীতি-ধর্মী। কেবল যন্ত্রণা আর জ্বালা নয়,—অনুভূতি নিভৃতি আর একান্ততা না থাকলে অত সংক্ষেপে এমন সংগীতের মূর্ছনা সৃষ্টি অসম্ভব হত। জীবনানুভবের প্রত্যক্ষতার সঙ্গে এই সহজ গীতি-নিভৃতিই ছোটগল্প-শিল্পীর শ্রেষ্ঠ সম্বল।

বারে বারে গীতি-ধর্ম বলতে আমরা বিশুদ্ধ 'লিরিসিজম'-এর কথা বলছি না। যে-কোনো রকমের সৃজন-শিল্পীর ('creative artist') কলা-কর্মের সম্বন্ধে Stevenson বলেছেন : "His stories may be nourished with the realities of life, but their true mark is to satisfy the nameless longings of the reader and to obey the ideal laws of day-dreams. The right kind of

thing should fall out in the right kind of place; the right kind of thing should follow; and not only the characters talk aptly and think naturally but all the circumstances in a tale answer one another like notes in music"[৩০] ওপরের টুক্‌রো গল্পে এই সব-জড়ানো গানের ঝংকারই চরম স্বাদুতার সৃষ্টি করেছে। একেই আমরা ছোটগল্পের গীতসৌরভ বলেছি। সার্থক ছোটগল্পায়নের জন্যে ঘটনা, বর্ণনা বা উপলব্ধির এই ব্যঞ্জনাময় সুর-পরিস্রবণ আবশ্যিক।

আর তার জন্যে, বলেছিলাম, গভীর জীবনানুভবের সঙ্গে শিল্পীর আত্ম-বিবিক্ত নিবিড় ভাবনানুরাগও অপরিহার্য। গীতিকবিতায় বিবিক্তির বদলে আত্মলীনতা কথাবস্তুকে ভাবলোকে বিলীন করে দেয়,—সে কথা আগে দেখেছি। আবার উপন্যাসে কথা আছে,—গীত নেই। বঙ্কিমচন্দ্র একটিও ছোটগল্প লিখ্‌তে পারেন নি। শরৎচন্দ্রের কয়েকটি মাত্র ছোটগল্প তাঁর বহু সংখ্যক উপন্যাসের তুলনায় নিষ্প্রভ,—কেবল পরিমাণে নয়, গুণেও। তার কারণ, এই দুইজন সহজ-ঔপন্যাসিকের ব্যক্তি-চেতনা তাঁদের আলোচ্য জীবনের ভূমিতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছিল। তাই সংক্ষেপে বলবার, বাদ দিয়ে বলবার, সংকেতে বলবার উপায় ছিল না তাঁদের। যতটুকু দেখেছেন, জেনেছেন, ভেবেছেন তার মাঝখানে বসে সবটুকু নিঃশেষে বলে সাঙ্গ করতে পেরে তবে তাঁদের কলা-কর্মের নিস্তার। ফলে 'ইন্দিরা'-'যুগলাঙ্গুরীয়ের' মত 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে'-ও ছোটগল্প নয়,—বড়গল্প বা ছোট উপন্যাস,—Novellet. জীবনকে তার বস্তুরূপে অন্তরঙ্গ করে দেখার, এবং সেই সঙ্গে নিজের সৃজন-চৈতন্যকে নৈর্ব্যক্তিক অনুভবের ব্যঞ্জনায় ছড়িয়ে দিতে পারার ক্ষমতা এক সঙ্গে জড়ো না হলে সার্থক ছোটগল্প রচনা অসম্ভব হয়। এই সুদীর্ঘ আলোচনায় এই কথাই বলতে চেয়েছি। আর বলেছিলাম উত্তরবঙ্গের পল্লীজীবন মমতাময় কবি-মনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সামনে এই বিবিক্ত-চিত্ততার এক আশ্চর্য সুযোগ রচনা করেছিল।

আলোচ্য যুগে বাংলার পল্লীজীবনের সঙ্গে কবির যোগ দু'ধারায়। এক জায়গায়, "মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয়নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে।"[৩১] কর্মের সঙ্গে সাহিত্যের,—চোখে-দেখা জীবনের নিবিড় অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিল্পি-চেতনার একান্ত

৩০। Stevenson—'Gossip on Romance.'

৩১। রবীন্দ্রনাথ—'সোনারতরী'—সূচনা। রবীন্দ্র রচনাবলী ৩য় খণ্ড।

অনুভবের যোগে রচনার সঙ্গে রচয়িতার সম্পর্কের বিবিক্ততা আর রইল না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বভাবত কবি,—গীতিকবি। তাই সৃষ্টির বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর নিরন্তর আত্ম-সংযোগের ফলে যার সৃষ্টি হল, তা রবীন্দ্রসাহিত্যেও অনুপম গীতিকবিতার গুচ্ছ। 'সোনারতরী' থেকে এই কবিতার প্রথম উৎসার। আগে দেখেছি, রচনার মূলীভূত বস্তুভূমি এখানে কবির মন্ময় অনুভবের একান্ত পরিস্রবণে আপন স্বরূপ হারিয়েছে সম্পূর্ণ।

একই সময়ে একই পল্লীজীবনকে কবি প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন আর এক পৃথক্ পটভূমি থেকে। সেখানে, "জল ছল ছল করছে এবং তার উপরে রোদ্দুর চিক্ চিক্ করছে; বালির চর ধূ ধূ করছে, তার উপর ছোটো ছোটো বনঝাউ উঠেছে। জলের শব্দ, দুপুর বেলাকার নিস্তব্ধতার ঝাঁ ঝাঁ, এবং ঝাউ-ঝোপ থেকে দুটো একটা পাখির চিক্ চিক্ শব্দ, সব শুদ্ধ খুব একটা স্বপ্নাবিষ্ট ভাব।···দুই ধারে মেয়েরা স্নান করছে, কাপড় কাচছে, এবং ভিজে কাপড়ে একমাথা ঘোমটা টেনে জলের কলসী নিয়ে ডান হাত দুলিয়ে ঘরে চলেছে; ছেলেরা কাদা ছুঁড়ে মাতামাতি করছে, এবং একটা ছেলে বিনা সুরে গান গাচ্ছে, 'একবার দাদা বলে ডাক্ রে লক্ষ্মণ'। উঁচু পাড়ের উপর দিয়ে অদূরবর্তী গ্রামের খড়ের চাল এবং বাঁশবনের ডগা দেখা যাচ্ছে।"[৩২] 'ছিন্নপত্রে' এমন অনেক চিঠি রয়েছে যা পড়লে 'রঘুবংশে'র দ্বিতীয় সর্গের ছবিমালিকার কথা মনে পড়ে।[৩৩] উত্তরবঙ্গের নব-আবিষ্কৃত জীবন-ভূমির সঙ্গে কবি ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে পড়তে পারেন নি। চলমান বোট্-এর খোলা জানালার ফ্রেম-এ আঁটা জীবনের টুক্‌রো ছবি দেখে গেছেন একের পর এক। তার সৌন্দর্যের সুরভি কবির চেতনাকে কানায় কানায় ভরে তুলেছিল। আধোজানার আনন্দ-সৌরভকে কল্পনা দিয়ে ভরাট্ করে তোলার প্রেরণা জেগেছে তখন একান্ত ভাবে। ফলে দূর-থেকে-দেখা বস্তু-জীবনেব রহস্যচ্ছবিকে মানস অনুভবে আলোকিত করে পূর্ণাঙ্গ রূপ ধরেছে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প। অবশ্য বর্তমান প্রসঙ্গে কেবল 'গল্পগুচ্ছের' প্রথম যুগের ছোটগল্পের কথাই বলছি। পদ্মা-পারের চোখে দেখা জীবনের টুক্‌রো ছবি সেই 'গল্পগুচ্ছে'র শিল্পমূর্তির কাঠামো;—নিজের অনুরাগের উত্তাপ দিয়ে রক্ত-মাংস প্রাণের ধারা সঞ্চার করেছেন কবি তাতে। নিজেও তিনি একথা স্বীকার করেছেন:—

"এক সময়ে ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনযাত্রা। একটি মেয়ে নৌকো করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল, তার বন্ধুরা ঘাটে নাইতে নাইতে বলাবলি করতে লাগল; আহা, যে পাগলাটে মেয়ে, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওর কী জানি দশা হবে। কিংবা ধর, একটা খ্যাপাটে ছেলে সারাগ্রাম দুষ্টুমির চোটে মাতিয়ে

৩২। রবীন্দ্রনাথ—'ছিন্নপত্র' পত্রসংখ্যা ২২। ৩৩। দ্রষ্টব্য—বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়।

বেড়ায়, তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে বলা হল তার মামার কাছে। এইটুকু দেখছি, বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে।"[৩৪]

ওপরের পত্রাংশে যথাক্রমে 'সমাপ্তি' ও 'ছুটি' গল্প দুটির বস্তুগত পটভূমির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় সমস্যার সৃষ্টি করে কবির শেষ কথা,—'বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে।' সাহিত্যের জগতে যাঁদের দৃষ্টি মতবাদে আকীর্ণ, তাঁরা এখানেই কবির জবানিতে 'গল্পগুচ্ছে'র অবাস্তবতার প্রমাণ আহরণ করতে পারেন। কিন্তু এ কোনো কথাই নয়। এ-পর্যন্ত আলোচনায় দেখেছি নিছক বস্তু-সঞ্চয় ও বস্তু-বর্ণনা উপন্যাস-কলার একটি প্রকরণ যদি হয়-ও তবু সফল ছোটগল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে তা অচল। বর্ণনার সংক্ষিপ্তি, বস্তুবর্জন ও বস্তু-বিন্যাসে সংহতি এবং বস্তূত্তর ব্যঞ্জনা রচনার সফলতাই সার্থক ছোটগল্পের প্রাণ। এদিক থেকে, অধ্যাপক প্রমথ বিশী যথার্থ বলেছেন,—"রবীন্দ্রনাথের ও পরবর্তীদের ছোটগল্পে প্রধান প্রভেদ এই যে, পরবর্তীদের ছোটগল্প সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্তসার, তাহাতে অনাবশ্যক তথ্যকে বাদ দেওয়াই প্রধান সমস্যা। আর রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অপূর্ণ অভিজ্ঞতার আভাস, অজ্ঞাত তথ্যকে সৃষ্টি করাই সেখানে সমস্যা।"[৩৫] 'গল্পগুচ্ছে'র রবীন্দ্র-ছোটগল্প সফল ভাবে এই সমস্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রোত্তর শিল্পিদলের, তথা সকল দেশের সকল স্রষ্টার সাহিত্য-ভূমিতেই বস্তু ও ভাব, কথা ও কল্পনার দুই পায়ে ভর করেই চলে ছোটগল্পের পথ-পরিক্রমা। কেবল এই কারণেই তারা কালোত্তীর্ণ রস-সৃষ্টি। এযুগে রবীন্দ্রনাথের সফলতার মূলে একদিকে ছিল পল্লীবাংলার বস্তু-প্রচ্ছদ, আর একদিকে ছিল কবির স্মিত কল্পনা ;—সমানুভূতি-(ampathy)-ঋদ্ধ যে কল্পনা জীবনেব মূল বস্তুভূমিকে ছেড়ে কখনোই দূরযানী হতে পারেনি।

অতএব পল্লীবঙ্গের জীবন-রস এবং কবির সমকালীন হৃদবৃত্তির সমন্বয়ে এ সময়ের ছোটগল্পের ভাব এবং রূপ-স্বভাব পূর্ণ গঠিত হতে পেরেছে। তাই বলে 'গল্পগুচ্ছে'র সকল রচনাকেই বরেন্দ্র-পল্লী-জীবন ও একই কবি-মনোভাবনার ফসল বলে মনে করবার কারণ নেই। তিনখণ্ড 'গচ্ছগুচ্ছে' ছোট গল্পের মোট সংখ্যা ৮৪।[৩৬] তার মধ্যে 'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা'-ও আছে। এ দু'টি পূর্ব-জীবনের রচনা। আছাড়া 'সবুজপত্রে'

৩৪। রবীন্দ্রনাথ—'সাহিত্য, গান ও ছবি'—'প্রবাসী' ১৩৪৮ বাংলা।

৩৫। প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' পাদটীকা।

৩৬। অধুনা রবীন্দ্র-গল্পের 'অচলিত' পর্যায়ের 'করুণা' ও 'ভিখারিণী', উত্তর পর্যায়ের 'তিনসঙ্গী' গল্পত্রয় এবং আন্তম রচনার অগ্রন্থিত সংকলন নিয়ে 'গল্পগুচ্ছ' চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান আলোচনার প্রয়োজনে রবীন্দ্র-জীবৎ কালে সঙ্কলিত প্রথম তিনখণ্ড 'গল্পগুচ্ছ'ই ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যান্য রবীন্দ্রগল্পের আলোচনা করা হয়েছে পৃথকভাবে। দ্র. পঞ্চম ও সপ্তদশ অধ্যায়।

প্রকাশিত ছোটগল্প রচনার কালে কবির জীবন ও কল্পনার বস্তুভূমি অন্যত্র পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এই সময় থেকে গল্পের ভাব, বিষয় এবং রূপকল্পে আমূল নবীনতা দেখা দিয়েছে। সে হচ্ছে ১৩২১ বাংলা সনের কথা। কিন্তু তার আগে থেকেই রবীন্দ্র-গল্পে পল্লী-বরেন্দ্রের প্রভাব শিথিল হতে আরম্ভ করেছে; স্পষ্টভাবে ১৩০৮ বাংলা সাল থেকে। আগে দেখেছি, জমিদারির তদারক করতে গিয়েই কবি সর্বপ্রথম উত্তরবঙ্গের জীবনভূমির সঙ্গে গভীর সমমর্মিতা অর্জন করেছিলেন। পরে সেখানকার পল্লী-নিবাস কিছুদিনের জন্য সপরিবার কবির স্থায়ী আবাস হয়ে উঠেছিল; আত্মার বন্ধন হয়েছিল সুনিবিড়। ১৩০৮ বাংলা সালের শুরুতে শিলাইদহে কবির পারিবারিক আবাস ভেঙে যায়; স্থায়িভাবে থাকবার উদ্দেশ্যে কবির পত্নী-পুত্র-কন্যা আর কখনো পদ্মাতীরে আসেননি। আর ঐ একই বছর থেকে শান্তিনিকেতনে 'বোর্ডিং বিদ্যালয়' ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবির মন নদীমাতৃক বঙ্গ-ভূখণ্ড থেকে রাঢ়ের রুক্ষ-তপ্ত প্রান্তর-ভূমির প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হয়েছে। বস্তুত নিছক দৈহিক অবস্থানের দিক থেকে কখনো কখনো বরেন্দ্রবাস ঘটলেও, কবি-প্রাণের বাসস্থান বাংলার উত্তর থেকে পশ্চিম প্রান্তে স্থায়িভাবে তখনই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ফলে তখন থেকেই গল্পের অন্তর এবং বহিরঙ্গে পালা বদলের ছাপ পড়েছে নিঃসংশয়িতভাবে। সে ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'নষ্টনীড়' (১৩০৮) গল্প থেকে। এখান থেকে গল্পগুচ্ছে প্রকাশিত গল্প সংখ্যা ২৩। অতএব উত্তরবঙ্গের জীবন-পর্যায়ে লেখা রবীন্দ্র-গল্পের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৯টি।

কিন্তু ঐসব ক'টি গল্পেরও আকার কিংবা স্বাদ অভিন্ন নয়। আসলে সৃষ্টি যে করে, সে হচ্ছে কবির মন বা প্রাণ-চেতনা,—তাঁর বাইরের পরিবেশ নয়। শিল্পী যখন বাইরের জীবনকে প্রাণেই গভীরে আহরণ করে আত্মার সম্পদ করে নেন, তখন সেই গভীরতা থেকেই উৎসারিত হয় সার্থক সৃষ্টির উৎস। তা না হলে, চোখে-দেখা বাস্তব জীবন সৃজন-ভূমির বাইরে অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে থাকে। এ-বিষয়ের চরম নজির প্রায় সমকালে লেখা 'সোনারতরী' কবিতা (১২৯৯ বাংলা সাল)। ঐ একই বছরে 'সাধনা' পত্রিকায় পুরো বারোটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল। পদ্মাতীরের বর্ষণ-ঘন জীবনের এই সংগীত-সংকেত জন্মলাভ করেছিল ফাল্গুনের এক বাসন্তী দিনে। এ-বিষয়ে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবি লিখেছিলেন: "তুমি পঞ্জিকা মিলিয়ে যদি কবিতার তাৎপর্য নির্ণয় করতে চাও তো বিপন্ন হবে। বুধবারের পর বৃহস্পতিবার আসে অত্যন্ত সাধারণ নিয়মে। সেটাকে অবজ্ঞা করো। আমাদের জীবনে সুতরাং সাহিত্যেও হয়ত কোনো একটা বিশেষ বুধ বা বৃহস্পতিবার সপ্তাহ ডিঙ্গিয়ে চব্বিশ ঘণ্টাকে উপেক্ষা করেই আসন রক্ষা করে। যেদিন বর্ষার অপরাহ্ণে খরস্রোত পদ্মার উপর দিয়ে কাঁচা ধানে ডিঙিনৌকা

বোঝাই করে মগ্নপ্রায় চর থেকে, চাষীরা এপারে চলে আসছে সেদিনটা সন তারিখ মাস পার হয়ে আজও আমার মনে আছে। সেইদিনেই সোনারতরী কাব্যের সঞ্চার হয়েছিল। তার প্রকাশ হয়েছিল কবে, তা আমার মনেও নেই।[৩৭]

ছোটগল্পের সম্বন্ধেও একই কথা বলা যেতে পারে। 'নষ্টনীড়'-পূর্ব গল্পগুচ্ছের মধ্যেও এমন গল্প হয়ত আছে, যার রচনা বরেন্দ্র-বঙ্গের ভৌগোলিক সীমার বাইরে। তাছাড়া, এমন গল্পের সংখ্যাও কম নয়, যারা উক্ত জীবনের ভূগোল-সীমায় রচিত হয়েও দেশ-কালের সকল গণ্ডিকে ছাপিয়ে নির্বিশেষ হয়ে উঠেছে। দৃষ্টান্ত হিশেবে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটির কথা বলি। 'সাধনা'য় এটি প্রকাশিত হয় ১২৯৯ বাংলা সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। এর পরের মাসে প্রকাশিত গল্প 'ছুটি'। এই দ্বিতীয় গল্পের সঙ্গে পদ্মাপারের জীবনভূমি বাস্তব তথ্যের সূত্রে জড়িয়ে আছে। 'ছিন্নপত্রে'র ২৮ সংখ্যক পত্র তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বস্তুর ওপরে কবি তাঁর গল্পে কতটা কল্পনার তুলি বুলিয়েছেন, তারও একটি উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এই চিঠি আর গল্পের তুলনায়। চিঠিতে 'ডাঙার উপর একটা মস্ত নৌকোর মাস্তুল পড়েছিল'। গল্পে তাই পরিণত হয়েছে 'একটা প্রকাণ্ড শাল কাষ্ঠ'তে, যা 'মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়াছিল।' চিঠির 'সর্বজ্যেষ্ঠ ছেলে' গল্পে রূপ পেয়েছে 'বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তী'র মূর্তিতে। চিঠির 'একটি ছোটমেয়ে' গল্পে ফটিক-অনুজ মাখন চক্রবর্তীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এসব ছাড়া গল্পের প্রথম অংশ মোটামুটি চিঠির চোখে-দেখা বর্ণনাকেই অনুসরণ করে ফিরেছে। তারপরে গল্প যেখানে চিঠির বর্ণনাক্ষেত্র পেরিয়ে গেছে, সেখানেও পদ্মা-তীরভূমির সঙ্গে তার ভাব-সংযোগ অচ্ছেদ্য। অন্য পক্ষে ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র বলেছেন: "কাবুলিওয়ালা নিগ্রো হলেও ক্ষতি ছিল না এবং ভূটানী হলেও গল্প ঠিক থাকত।"[৩৮] এ-কথা 'কাবুলিওয়ালা' সম্বন্ধে যত সত্য, ঠিক ততখানি অ-সত্য 'ছুটি' গল্পের ফটিক সম্বন্ধে। কবির মনে 'কাবুলিওয়ালা'র কোনো বিশেষ দেশ-কালের অস্তিত্ব নেই। সর্বকালের সর্বস্তরের মানুষের এক চিরন্তন আকুতির সূত্রে এই গল্প শাশ্বত মানবপরিচয়কে মালা করে গেঁথেছে। কিন্তু কবির মনে, এবং 'ছুটি' গল্পেও ফটিকের জীবনের ইতিহাস-ভূগোল সুচিহ্নিত। পদ্মাতীরের অশিক্ষিত গ্রাম্য-পল্লীর জীবন-বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনলে এই গল্প-কুসুম মুহূর্তে ঝরে যায়; আর কোনো কল্পভূমিতে দাঁড়াবার কোনো স্থানই তার নেই। ফলে 'কাবুলিওয়ালা' এবং 'ছুটি' গল্পের রূপ এক নয়, তাদের রস-প্রকৃতিও হয়েছে স্বতন্ত্র। অথচ এই দু'টি গল্প একই জীবন-পরিবেশে পরপর

৩৭। দ্র. রবীন্দ্র রচনাবলী—৩, 'গ্রন্থপরিচয়'। ৩৮। ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র 'গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ'—সাহিত্য পরিক্রমা।

রচিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এদের অন্তরবর্তী ভাব-প্রেরণাও অভিন্ন। প্রায় একই সময়ে লিখিত 'পঞ্চভূত'-এর 'বৈষ্ণব-কবিতা' প্রবন্ধে এই মনোভাব সুব্যক্ত হয়েছে : "যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই নাম ভালবাসা।"

'কাবুলিওয়ালা' গল্পে প্রেমের সেই অনন্তরূপ একান্ত সুব্যক্ত। তুষারমৌলী হিমালয়ের রুক্ষ অধিত্যকাবাসী রহমত বাংলার এক অখ্যাত গৃহস্থ-কন্যা মিনিকে দেশ, ভাষা, বয়স, অবস্থা, সব কিছুর বাধা অতিক্রম করে প্রাণের গভীরে টেনে নিয়েছিল। এ অসম্ভবের গোপন ইতিহাস মিনির বাবার কাছে সে নিজেই ব্যক্ত করেছে : "বাবু, তোমার যেমন একটি লড়্‌কী আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়্‌কী আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোকীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।"—নিজের মেয়েকে ভালবেসে সেই ভালবাসার মধ্যেই অশিক্ষিত মেওয়াওয়ালা কাবুলি রহমত অনন্তের পরিচয় পেয়েছিল। আর মিনির বাবা উৎসব-সমারোহ ও 'গড়ের বাদ্য'-র জন্যে রাখা টাকা অনায়াসে রহমতকে দিয়ে বলেছিলেন,—"রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও, তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।" অন্তঃপুরের অসন্তোষ সত্ত্বেও অনুভব করেছিলেন, "মঙ্গল আলোকে আমার শুভ-উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।" সে মঙ্গল, সে উজ্জ্বলতা তার মন থেকে বিচ্ছুরিত ভালবাসার বিশ্ব-রূপেরই আলোক-প্রতিফলন।

'ছুটি' গল্পেও প্রেমের এই অনন্ত রূপই অশিক্ষিত অচেতন ফটিকের মনে জৈবিক অস্পষ্টতার মধ্যে মাথাকুটে মরেছে, "জন্তুর মতো একপ্রকার অবুঝ ভালোবাসা—কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধূলি সময়ের মাতৃহীন বৎসের মতো কেবল একটা আন্তরিক ক্রন্দন—সেই লজ্জিত শংকিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।" দু'টি গল্পই একই উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছে,—তাদের জন্মকালীন কবি-জীবন-পরিবেশও অভিন্ন; অথচ মৌলিক রচনা-প্রকৃতি এবং স্বাদুতায় এরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পৃথক। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে প্রেমের বিশ্বরূপ নির্বিশেষ মূর্তিতে করুণাঘন উদাত্ত-সুন্দর হয়ে উঠেছে! 'ছুটি' গল্পে অব্যক্ত ভালোবাসার অবোধ অনন্ত আকূতির আর্তধ্বনি উদাত্ত-করুণ ট্রাজেডির সৃষ্টি করেছে। একটি কেবল ভাব,—দীপ্ত, উজ্জ্বল! আর একটি বস্তুসাপেক্ষ, বস্তু-সুনিবিড় যন্ত্রণাতপ্ত,—করুণাদীর্ণ। এই পার্থক্যের মূলে রয়েছে গল্প দু'টির সৃজন-কালীন কবি-মনোভাব (creative mood)। সেই সৃজনভূমির উপরে প্রতিফলিত করে দেখলে পদ্মাতীরের গল্পগুলিতেও স্বাদ ও রূপের তারতম্য অনুভব করা সম্ভব হবে।

নিছক বহিরঙ্গ প্রকরণের দিক থেকে ছোটগল্পের সঙ্গে কম-বেশি সাদৃশ্য আছে উপাখ্যান (tale), গীতিকবিতা, এমন কি নাট্যধর্মেরও। এদিক থেকে উপাদানগত বিশিষ্টতার বিচারে ছোটগল্পকে নানা কোঠায় ভাগ করা যেতে পারে। যেমন,—(১) আখ্যান বা বর্ণনা প্রধান, (২) গীত, সুর বা আবহ প্রধান, এবং (৩) সংঘাত ও নাটকীয়তা প্রধান। ছোটগল্প কথাসাহিত্য ; তাই আখ্যান বা 'প্লট' একটা থাকবেই এতে। কিন্তু এই প্লট আধুনিক জীবনের সঙ্গে প্রায়ই যুক্ত বলে মনোবিকলনের সুযোগও থাকে এতে প্রচুর। কাজেই ছোটগল্পের আর এক চতুর্থ শ্রেণী ভাগ করা যেতে পারে,- 'মনস্তত্ত্বমূলক'! প্রথমেই মনে রাখা উচিত, শিল্পীর বিশেষ মনোভূমি, এবং বিশেষ গল্পের বিশেষ প্রসঙ্গের বাইরে এই সাধারণ ভাগ-বণ্টন যান্ত্রিক হয়ে পড়তে বাধ্য। মোটামুটি আলোচনার সুবিধার জন্যেই এইসব স্থূল বিভাগের অবতারণা ;—শ্রীপ্রমথ বিশীর ভাষায় এসব ভাগকে কখনো 'জল-অচল' (water-tight) করে তোলা অসম্ভব। একথা স্মরণে রেখেই এবারে রবীন্দ্র-গল্পের আলোচনায় পূর্বোক্ত বিভাগ-চিন্তার প্রয়োগ করব। বরেন্দ্রবঙ্গে লেখা প্রথম ছয়টি গল্প 'হিতবাদী' পত্রিকার প্রথম ছয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ আরো সহজ গল্প চেয়েছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ 'হিতবাদীতে' লেখা বন্ধ করে দেন। এরপরে যথাক্রমে 'সাধনা' ও 'ভারতী'তে প্রকাশ করবার তাগিদেই পদ্মা-যুগের অন্যান্য গল্প রচিত হয়েছিল। যাই হোক, এক 'পোস্টমাস্টার' ছাড়া 'হিতবাদী'-পর্যায়ের আর একটি গল্পও উল্লেখ্য পরিমাণে সফল হয়নি,—পণ্ডিতেরা সাধারণভাবে একথা স্বীকার করেন। বলা হয়, ফরমায়েস মাফিক লিখিতে গিয়েই গল্পগুলি অ-সফল হয়েছে। হতে পারে, এটি গৌণ বা পরোক্ষ কারণ। এ-কারণ বহিরাগত। কিন্তু গল্পের ভেতরে এই অপরিণতির মূল সন্ধান করলে ছোটগল্পের আঙ্গিক সম্বন্ধেও একটা সাধারণ ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

প্রথম ভাগের এই গল্প-পঞ্চকের প্রধান দুর্বলতা এদের উপাখ্যান-সর্বস্বতায়। ছোটগল্প স্বভাবত গল্প—আখ্যান বা গল্প তাই তার রূপ-বিকাশের ভিত্তি। কিন্তু ঐটুকুই ছোট-গল্পের গোটা ইমারত নয়। বর্ণনা আর বিশ্লেষণ উপন্যাসের আখ্যানের দু'টি প্রধান নির্ভর। কিন্তু বারে বারে বলেছি, ছোটগল্পের বর্ণনাকে সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনাময় করতে পারলে তবেই তার সফল রস-মোক্ষণ সম্ভব। 'ব্যঞ্জনা' অর্থে কোন কাব্যিক অতি-উচ্ছ্বাসের কথা ভাবছি না। ছোটগল্পে কথার সংহতি আর সুমিতিই কথার অতীত ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্ত হিশেবে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের কথা বলি। পদ্মাবক্ষে খোকাবাবুর বিলীন হয়ে যাওয়ার বার্তা জ্ঞাপন করে কবি লিখেছেন,—খোকাবাবুর অনুরোধে রাইচরণ তখন কদম ফুল তুলতে গেছে ; "কিন্তু ওই যে [যাবার সময়] জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে

শিশুর মন কদম্বফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল জল খল্‌খল্ ছল্‌ছল্ করিয়া চলিয়াছে, যেন দুষ্টামি করিয়া কোনো এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া একলক্ষ শিশুপ্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে।

*　　　*　　　*　　　*

"একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্বফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল কেহ নাই, চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কাহারও কোন চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত **হিম হইয়া গেল**।"

ওপরের স্থূলাক্ষর আমাদের প্রয়োগ। বড় হরফের এই কথা দুটোর অর্থ অভিধানের সীমা ছাড়িয়ে মর্মের গহনে গিয়ে পৌঁছায়; 'মুহূর্তে' পাঠকেরও 'শরীরের রক্ত হিম' হয়ে আসে। অথচ গল্পের যেটি চরম কথা,—খোকাবাবুর মৃত্যু, একবারও কবি তার উল্লেখ করেননি। বরং প্রথমভাগের রণদুর্মদ পদ্মা-পরিচায়নের পাশে সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কারুকলা—["একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল,—কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্বফুল তুলিল।"] সু'মিতি এবং সংকেতবহ সংক্ষিপ্তির প্রভাবে মুহূর্তে শরীরের রক্ত জল হয়ে যাওয়ার ব্যঞ্জনাকে প্রাণের আমূলে ছড়িয়ে দেয়।

'হিতবাদী' পর্যায়ের একটি ছাড়া বাকি গল্পে এ ধরনের ব্যঞ্জনার অভাব একান্ত। তার ওপরে গতানুগতিক বর্ণনা গল্পের আখ্যানভাগকে ছোটগল্পের গুণান্বিত করতে পারেনি। এর চরম উদাহরণ হল প্রথম গল্প 'দেনাপাওনা'। হিন্দুঘরের মেয়ের বিয়ের দেনাপাওনার দরকষাকষি আজও কদর্য সামাজিক সমস্যা হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-মন এবং মানবিক ভাবনার পক্ষে এ-সমস্যা দুঃসহ ছিল। কিন্তু নিজের কবিচিত্তের উত্তাপে এই অমানুষিক সমাজ-প্রবৃত্তিকে তিনি ছোটগাল্পিক ব্যঞ্জনায় পরিস্রুত করতে পারেন নি। এ-গল্পে বর্ণাটাই প্রধান এবং একটানা। অবশ্য শরৎচন্দ্রের মত রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্প -বর্ণনাই আগা থেকে গোড়া অবধি সুসম্পূর্ণ নয়। এমন কি, 'দেনাপাওনা'-র আখ্যান-বিন্যাসেও টুক্‌রো টুক্‌রো পর্যায় রয়েছে। কিন্তু সেই সব বিভাগ ধাপে ধাপে সুরের আবহ সৃষ্টি করতে পারেনি। Stevenson যাকে বলেছেন 'notes of music', তার রচনা সম্ভব হয়নি কোথাও। একটি দৃষ্টান্ত দিই। নব-বৈবাহিকের কাছে লাঞ্ছিত রামসুন্দরকে সান্ত্বনা দেবার আকুল আকাঙ্ক্ষায় কন্যা নিরুপমা বাপের বাড়ি ফিরে যেতে চায়।

শ্বশুরগৃহের কারাগার থেকে দিন কয়েকের জন্যও তাকে নিয়ে যেতে অনুরোধ করে। অসহায় রামসুন্দর কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'আচ্ছা'।

"কিন্তু তাঁহার কোনো জোর নাই। নিজের কন্যার উপরে পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে, তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রাখিতে হইয়াছে। এমন কি কন্যার দর্শন সেও অতি সসংকোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং সময় বিশেষে নিরাশ হইলে দ্বিতীয় কথাটি কহিবার মুখ থাকে না।" এইসব একটানা বর্ণনায় সহজ দুঃখের পাত্র কিছু পরিমাণ ক্ষোভেও হয়ত পূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু বাক্-বিন্যাস ও বাক্-সংযমের সু-পরিমাণজনিত ছোটগাল্পিক ব্যঞ্জনা জাগে না, পূর্বে উদ্ধৃত 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ফলে, গল্পের শেষে কবির একান্ত সাংকেতিক উক্তিও এই 'ফ্ল্যাট' বর্ণনার আগাগোড়া সর্বাংশে নূতন প্রাণের শক্তি সঞ্চার করতে পারে না। এই কারণেই গল্প হিশেবে 'দেনাপাওনা' সবচেয়ে দুর্বল। অপরাপর গল্পগুলিতে তির্যক্ বাচনের দীপ্তি মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হয়েছে স্নিগ্ধ সহানুভূতির সঙ্গে। কিন্তু আবার বলি, Stevenson যাকে 'notes of music' বলেছেন, অঙ্গে অঙ্গে সেই সুরের সুরভি জেগে ওঠেনি বলেই ঐসব গল্প ছোটগল্প হিশেবে পূর্ণ সফল হয়নি।

'পোস্টমাস্টার' গল্পেও সেই নিরুচ্ছ্বসিত স্বাভাবিক বর্ণনাই রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির আন্তরিকতা-নিবিড় ঝঙ্কার পোস্টমাস্টারের নিঃসঙ্গ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নূতন সুরের মূর্ছনা রচনা করেছে। ফলে ছোটগল্পের আখ্যান-ভিত্তিতে প্রাণের আবহ জমাট হয়েছে,—„একদিন বর্ষাকালের মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল; রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল; মনে হইতেছিল যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে; এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণ স্বরে বার বার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না—সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময়ে কাছে কেহ একটি আপনার লোক থাকিত—হৃদয়ের সহিত একান্ত সংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ওই কথাই বার বার বলিতেছে এবং এই জনহীন তরুচ্ছায়া নিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লব-মর্মরের অর্থও কতকটা ওই রূপ। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোটপল্লীর সামান্য বেতনের সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

"পোস্টমাস্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন, 'রতন'। রতন তখন পেয়ারা তলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল—হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'দাদাবাবু, ডাকছ?' পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'তোকে আমি একটু একটু করে পড়া শেখাব। বলিয়া সমস্ত দুপুরবেলা তাহাকে লইয়া 'স্বরে অ' 'স্বরে আ' করিলেন। এবং এইরূপে যুক্ত অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।"

এখানে ব্যঞ্জনা প্রায় সাংকেতিকতার অতিসূক্ষ্ম সীমায় গিয়ে পৌঁচেছে। একটি নির্বোধ, পেয়ারাতলা-সর্বস্ব অনাথ বালিকাকে নিয়ে সারা দুপুর 'স্বরে অ' 'স্বরে আ' করার অর্থহীনতা পূর্ব অনুচ্ছেদের প্রকৃতি-প্রভাবিত জীবনানুভবের প্রচ্ছদে অনির্বাচ্য অর্থের দ্যোতনায় অপরূপ হয়ে উঠেছে। নিছক ঘটনা বা incidents-এর বর্ণনা এ-যুগের অপরাপর গল্পের মত এখানেও অকিঞ্চিৎকর,—বরং 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের মতই অর্থপূর্ণ ভাবে সংক্ষিপ্ত-ও। কিন্তু পরিবেশ-বর্ণন ও মনোসন্দর্শনের অপূর্বতা এই অকিঞ্চিৎকর incidents-গুলোকেই প্রাণ-ব্যঞ্জনাপূর্ণ সাংকেতিকতায় ভরে তুলেছে। আর একটি দৃষ্টান্ত দিই—"এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারীরূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন, এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে এবং এস্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি'।" এধরনের রচনাকে বর্ণনা-প্রধান (narrative) বল্‌তে বাধা নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ছোটগল্পে নিছক তথ্যের বর্ণন প্রত্যাশিত শিল্পের মধুরতা সৃষ্টি করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ যেখানে নিছক গল্প বলেছেন, সেখানেও বর্ণনার মধ্যে সুরের আবহ সৃষ্টি করে ছোটগল্পকে ব্যঞ্জনা, এমন কি মাঝে মাঝে সাংকেতিকতার সূক্ষ্ম রসেও সিক্ত করেছেন। অতএব রবীন্দ্রনাথের কিছু গল্প আখ্যান বা বর্ণনা-প্রধান কেবল সামিতার্থে।

'পোস্টমাস্টার'-এর মত এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে 'খোকবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'স্বর্ণমৃগ', 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি', 'সুভা', 'সমাপ্তি', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'আপদ', 'ঠাকুরদা', 'প্রতিহিংসা', 'অধ্যাপক', 'রাজটিকা', 'দৃষ্টিদান' ইত্যাদি গল্পকে। আলোচনার প্রথমেই আবার বলি, এই রূপ-বিভাগ কিছু আঁটসাঁট সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নয়,—নিতান্ত সাধারণ

এবং স্থূল। তাছাড়া বর্তমান উপলক্ষে প্রত্যেকটি গল্পের পৃথক পূর্ণাঙ্গ আলোচনাও সম্ভব নয়। তাই খুব উৎকৃষ্ট যে কয়টি গল্প অবশ্য-আলোচ্য, কেবল সেগুলিকেই একটি সাধারণ আঙ্গিকধর্মের অধীন করে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে। তাতেও, এরই মধ্যে দেখেছি, 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি' এবং 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্প তিনটির স্বাদুতার প্রকৃতি অভিন্ন নয়। দৈহিক আকৃতিতেও এদের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। কেবল এই সবগুলি গল্পের মধ্যে একটি মোটামুটি সাধারণ গুণ পাওয়া যেতে পারে। প্রধানত গল্পাংশের বর্ণনার মধ্য দিয়েই এদের ছোটগল্পোচিত রস-পরিস্রুতি ঘটেছে ;—আখ্যান বর্ণনার মধ্য দিয়ে সুরের দোলা গোটা রচনাকে পরিণামী ব্যঞ্জনায় কম্পিত করে তুলেছে। 'কাবুলিওয়ালা'য় সেই কম্পন চিত্তের তারে এক বিশেষ ধরনের অনুরণন সৃষ্টি করে ; 'ছুটি' বা 'মেঘ ও রৌদ্র'-তে সেই দোলা লেগেছে পৃথক্ পৃথক্ পথে এবং উপায়ে। ফলে কেবল ঐ তিনটি গল্পেরই নয়, প্রত্যেক গল্পেরই রসাবেদন স্বতন্ত্র আকার ধরেছে, তবে তাদের আকৃতিতে একটা নিতান্ত সাধারণ সাধর্ম্য দেখা দিয়েছে গল্প-রসের আখ্যান-সমাশ্রয়িতায়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্পষ্ট করে নিতে হয়। ওপরে শ্রেণী-নিবদ্ধ কোনো কোনো গল্পে মনস্তাত্ত্বিক উপাদান-প্রাচুর্যের কথাও বলা হয়ে থাকে। মানুষ মনোময় জীব। বিশেষ করে মন ও বুদ্ধির অতি দীপ্তিই আধুনিক মানুষকে দুরবগাহ করে তুলেছে। আর ছোটগল্প একান্তভাবেই আধুনিক জীবনাশ্রয়ী শিল্প। এদিক থেকে যে-কোনো ছোটগল্পের প্লট থেকেই মনের উপাদানকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা সম্ভব নয়। তাছাড়া মানবধর্মের চূড়ান্ত জটিলতাচ্ছন্ন এই যুগে বিচিত্র ও বিভিন্নধর্মী মানবিক গুণের সংমিশ্রণই যে-কোনো জীবন বা চরিত্রের স্বভাবধর্ম। ফলে কোনো গল্পকেই কেবল মনস্তাত্ত্বিক, কেবল বৌদ্ধিক, বা কেবল হাস্য-রসাত্মক ইত্যাদি 'জল-অচল' পৃথক্ পৃথক্ বিভাগে বিন্যস্ত করা সম্ভব নয়,—উচিতও নয়। তবু, গল্পাংশের উপাদান-মিশ্রতাকে স্বীকার করেও কেবল রস-পরিস্রুতির প্রধান আশ্রয়ের ওপরে নির্ভর করে বর্তমান শ্রেণী-বিন্যাসে প্রবৃত্ত হওয়া গেছে। তাছাড়া ছোটগল্পের আঙ্গিক-ই এমন যাতে আখ্যানের মতো গল্পকারের মনের দোলাও এক আবশ্যিক উপাদান। এমন অবস্থায় কোনো গল্পের মনোময়তা এবং মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যানের মধ্যে পার্থক্য অনুভব করতে ভুল যেন না হয়।

দৃষ্টান্ত হিশেবে প্রথমে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের কথাই বলি আবার। খোকাবাবুর মৃত্যুর পর নিজের একটি পুত্রসন্তান হওয়ায় রাইচরণ নিজের পিতৃত্বকে ক্ষমা করতে পারছিল না,—শিশু পুত্রের প্রতি প্রথমে সে বিরূপ হয়েছিল। এই তথ্যের পেছনে যে সহজ অথচ দুর্লভ মানবিক মনোভাব রয়েছে, তাকে অনুভব করবার জন্যে কোনো মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যে ঘটনা-প্রবাহের ফলে হঠাৎ একদিন

রাইচরণের মনে হল যে, খোকাবাবুই 'চন্ন'-র মায়া কাটাতে না পেরে তার ঘরে এসে জন্ম নিয়েছে—গল্পের মধ্যে সেই সব ঘটনাবলীর কার্য-কারণ-সমর্থিত কোনো ব্যাখ্যা নেই। অথচ মনোধর্মের প্রভাবে এখানেই গল্পের গতি চরম মুহূর্তের (climax) অভিমুখী হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে কবি কেবল বলেছেন,—রাইচরণের "এই বিশ্বাসের অনুকূলে কতকগুলি অকাট্য যুক্তি ছিল। প্রথমত, সে (খোকাবাবু) যাইবার অনতিবিলম্বেই ইহার জন্ম। দ্বিতীয়ত, এতকাল পরে সহসা যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কথনো স্ত্রীর নিজগুণে হইতে পারে না। তৃতীয়ত, এও হামাগুড়ি দেয়, টল্‌মল্‌ করিয়া চলে, এবং পিসিকে পিচি বলে। যে-সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ হইবার কথা তাহার অনেকগুলি ইহাতে বর্তিয়াছে।" কিন্তু খোকাবাবু-ই ফেল্‌না হয়ে পুনর্জন্ম নিয়েছে, রাইচরণের মতো স্নেহান্ধ অশিক্ষিত ভৃত্যের পক্ষেও একথা বিশ্বাস করতে পারার মতো 'অকাট্য যুক্তি' কি এগুলো? মনের প্রসঙ্গ থাকলেই গল্প মনস্তাত্ত্বিক হয়ে ওঠে না। মনোবিকলনের বিশিষ্টতা যেখানে ছোটগল্পের পরিণামী রস-পরিস্ফুতির আকর, কেবল সেখানেই তাকে বলি মনস্তাত্ত্বিক গল্প। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়', 'হৈমন্তী' ইত্যাদি গল্প এই ধরনের উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। কিন্তু ওপরের বর্ণনার সহযোগে রাইচরণের মনোবিকলন করতে গেলে তা হাস্যকর হয়ে পড়ে। কবির স-কৌতুক বাচনভঙ্গীও আলোচ্য উক্তির মধ্যেই এ-বিষয়ে সরস ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। তাই বলে গল্প হিশেবে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' মোটেই অসার্থক নয়। রাইচরণের অন্ধ স্নেহের সূত্রে তার অবোধ বিশ্বাসকে জড়িয়ে সকরুণ-কৌতুকের এক অপরূপ জীবন-মূর্ছনা রচনা করেছেন কবি সারাটি আখ্যান বর্ণনায়। সেখানে প্রাণ-তরঙ্গিত সুরের দোলা মনোবিকলনের সংগতি সন্ধানের অপেক্ষা রাখে না; এক আশ্চর্য মানবিক সংবেদনার সৃষ্টি করে গল্পের পরিণামী ট্রাজেডির তপ্ততাকে অনিবার্য করে তোলে। এই কারণেই বলছিলাম, গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক নয়, রসধর্মের বিচারে আখ্যান-সমাশ্রয়ী।

তেমনি 'কাবুলিওয়ালা' গল্পেও রহমত এবং মিনির বাবার পিতৃ-ধর্মের অনুপম হার্দ্য মূল্যই অনুচ্ছ্বসিত সহজ গল্পবর্ণনায় সুরের ঝঙ্কার রচনা করেছে। আখ্যানভাগের মনোময়তাই আখ্যান বর্ণনাকে ছোটগল্পের সার্থক রসে সিক্ত করেছে। তাই বলে গল্পের বুননের বিচারে 'কাবুলিওয়ালা' মনস্তত্ত্বপ্রধান নয়, এ-কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

ছোটগল্পের মনোময়তাকে মনস্তাত্ত্বিকতা বলে ভুল করলে পূর্বকথিত গল্পগুচ্ছের 'সমাপ্তি' থেকে 'প্রতিহিংসা' পর্যন্ত সব কয়টি গল্প এবং 'দৃষ্টিদান'কে বিশেষভাবে মনস্তত্ত্বমূলক গল্প বল্‌তে হয়। কিন্তু এই সব গল্পের কোনটিতেই মনোবিকলনের দূরতম চেষ্টাও নেই। বস্তুত বরেন্দ্রবঙ্গের পরিবেশ প্রভাবিত গল্প রচনার এই যুগে মনের অপার রহস্যলোকের

ঘাটে ঘাটে কবি খেয়া দিয়ে ফিরেছেন, নদীমাতৃক বাংলার প্রকৃতি ও জলোচ্ছ্বাসের মত সে জীবনের বিস্তার এবং গভীরতাও তাঁর মনকে মুগ্ধ করেছে। সেই অসীম সৌন্দর্যরহস্য-লোকের গ্রন্থি মোচন করে করেই কবির দিন কেটেছে,—মন দেখে দেখে থৈ পাননি বলেই মনোব্যাখ্যার কথা ভাবতেও পারেননি। 'নষ্টনীড়' থেকে যথার্থ মনস্তত্ত্বমূলক গল্প রচনার শুরু,—কবিমনের সৃজনলোকে তখন নতুন ঋতুর হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে। সে পৃথক্ আলোচনার কথা। পদ্মাপারের গল্প লেখার এই ঋতুতে মন-পরিচিতির ছবি আছে একের পর এক,—তারা যেমন বিচিত্র, তেমনি প্রাণরসে অজস্র ঋদ্ধ। কিন্তু সেই নতুন পাওয়া পরিচয়কে গুছিয়ে বিচার করে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা নেই কোথাও।

'সমাপ্তি' গল্পে মন-পরিচায়নের চরম প্রকাশ ঘটেছে অপূবর কলকাতা চলে যাওয়ার পরে মৃন্ময়ীর অবস্থান্তর বর্ণনার মধ্যে,—"মৃন্ময়ীর হঠাৎ মনে হইল, যেন সমস্ত গৃহে ও সমস্ত গ্রামে কেহ লোক নাই। যেন মধ্যাহ্নে সূর্যগ্রহণ হইল। কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, আজ কলিকাতায় চলিয়া যাইবাব জন্য এত প্রাণপণ ইচ্ছা করিতেছে, কাল রাত্রে এই ইচ্ছা কোথায় ছিল. কাল সে জানিত না যে, জীবনের যে অংশ পরিহার করিয়া যাইবার জন্য এত মন-কেমন করিতেছিল, তৎপূর্বেই তাহার সম্পূর্ণ স্বাদ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। গাছের পক্ক পত্রের ন্যায় আজ সেই বৃন্তচ্যুত অতীত জীবনটাকে ইচ্ছাপূর্বক অনায়াসে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

"গল্পে শুনা যায়, নিপুণ অস্ত্রকার এমন সূক্ষ্ম তরবারি নির্মাণ করিত যে, তদ্দ্বারা মানুষকে দ্বিখণ্ড করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিলে দুই অর্ধখণ্ড ভিন্ন হইয়া যায়। বিধাতার তরবারি সেইরূপ সূক্ষ্ম, কখন তিনি মৃন্ময়ীর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিয়াছিলেন সে জানিতে পারে নাই; আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য-অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল এবং মৃন্ময়ী বিস্মিত হইয়া, ব্যথিত হইয়া চাহিয়া রহিল।"

একেই বলছিলাম মন খুঁজে পাওয়া! মানুষের মনের গহনে থাকে যে মন, তার পরিচয় খুঁজে পেয়েছেন কবি,—একে মনোব্যাখ্যা বলব কি করে! এর পরেও সুদীর্ঘ মন-খোজা মন-দেখার মধু-বিহ্বল ছবি আছে শ্বশুরগৃহে মৃন্ময়ীর নিঃসঙ্গ জীবনের বর্ণনায়। কবি-চিত্তের মন-মন্থন-করা এই জীবনামৃতের পিপাসাকে যদি মনোবিকলন বলে ভুলও করি, তবু দেখ্‌ব, গল্পের পরিণামী স্বাদুতা জন্ম নিয়েছে আখ্যানের গীতি-দোলায়িত সমাপ্তির মধ্যে :—বোনের বাড়িতে অনীপ্সিত শয্যায় প্রবেশ করেছে অপূর্ব। ঘর অন্ধকার,—মনও। কারণ, মনে মনে নিশ্চিত বিশ্বাস করেছে মা এলেও মৃন্ময়ী আসেনি তার সঙ্গে। এই অবস্থায় অপূর্ব "খাটে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ বলয়নিক্কণ

শব্দে একটি সুকোমল বাহুপাশ তাহাকে সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপুটতুল্য ওষ্ঠাধর দস্যুর মতো আসিয়া পড়িয়া অবিরল অশ্রুজলসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বনে তাহাকে বিস্ময় প্রকাশের অবসর দিল না। অপূর্ব প্রথমে চমকিয়া উঠিল, তাহার পর বুঝিতে পারিল, অনেক দিনের একটি হাস্যবাধায়-অসম্পন্ন চেষ্টা আজ অশ্রুজল ধারায় সমাপ্ত হইল।"

এই 'সমাপ্তি'-কে কেবল ছন্দ-দোলায়িত বললে যথেষ্ট হয় না; একে. বলতে হয় রোমান্টিক্। রবীন্দ্রনাথের কবি-স্বভাব আদি-অন্তে রোমান্টিক্ ছিল,—তাঁর রোমান্টিক্ গল্পের সংখ্যাও তাই কম নয়। এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির মধ্যে বর্তমান উপলক্ষ্যে 'মেঘ ও রৌদ্র'-র সমাপ্তি অংশ, 'দালিয়া', 'দুরাশা,' 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'অতিথি' ইত্যাদির কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু অন্তত ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রোমান্টিকতা কেবল একটি মেজাজ,—এর ওপর নির্ভর করে গল্পাঙ্গিকের শ্রেণী ভাগ করা চলে না। 'মেঘ ও রৌদ্র', আগে বলেছি, আখ্যান-বর্ণনা প্রধান, 'দালিয়া' গল্পের রোমান্স-রস চরম মুহূর্তের নাটকীয় আকস্মিকতায় সার্থক পরিস্রুতি লাভ করেছে। অন্য পক্ষে শেষোক্ত গল্প তিনটিকে বিশেষভাবে আবহ-প্রধান বলে মনে করি। রবীন্দ্র-গল্পে রোমান্স-ঘনতা আছে আরো বহুক্ষেত্রে, তবু কেবল পূর্বোক্ত কারণেই, রোমান্টিক্ বলে কোনো একগুচ্ছ গল্পের বিশেষ শ্রেণী নির্ণয় করা উচিত বলে মনে হয় না।

যাই হোক্, পূর্বের আলোচনার মূল সূত্র স্বীকার করে নিলে 'মেঘ ও রৌদ্র', 'আপদ', 'ঠাকুরদা' প্রভৃতি গল্পের রূপাঙ্গিকে মনস্তত্ত্ব-প্রধানতার প্রসঙ্গ অবান্তর মনে হবে। 'প্রতিহিংসা' গল্পে মনস্তত্ত্ব নেই,—কিন্তু মন আছে তার বিচিত্র রসের সম্ভার নিয়ে,—একাধারে যা মহৎ এবং মধুর, উদাত্ত, কিন্তু কোমল-সুন্দর। ভূতপূর্ব মুকুন্দবাবুর ভূতপূর্ব দেওয়ান গৌরীকান্তের পৌত্রী ইন্দ্রাণী এবং ইন্দ্রাণীর স্বামী বর্তমান ম্যানেজার অম্বিকাচরণ, এই দুইটি চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ কোমল-কঠোরের অপরূপ মিশ্রণ সমন্বয়ে রচনা করেছেন তাঁর কবি-মনের সবটুকু মাধুরী মিশিয়ে। এর মধুরতম অংশ ইন্দ্রাণী ও অম্বিকাচরণের সুধা-সুরভিত দাম্পত্য প্রণয়। অধ্যাপক প্রমথ বিশী বলেছেন, কোনো কোনো রবীন্দ্র-গল্পে দাম্পত্য জীবনের গোপন-মধুর রস-গুঞ্জন শুনতে শুনতে কেবল পুলক নয়, কুণ্ঠাও জাগে। ইন্দ্রাণী-অম্বিকাচরণ প্রসঙ্গে একথা সর্বাংশে প্রযোজ্য। এই বিশ্রম্ভালাপকে রোমান্টিক্ বলা যেত স্বচ্ছন্দে। কিন্তু আলোচ্য দম্পতির কুলিশ-কঠিন আভিজাত্য-অভিমান এবং কঠিনতর কর্তব্যবুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করে এদের 'রোমান্টিক' বলতে বাধে। এই গল্পের আখ্যান, বর্ণনায় কারুকর্মের ঋজু-কাঠিন্য রয়েছে,—ঘটনা-বিন্যাসে আছে নাটকের সংঘাত। আর সব কিছুর অতলে কলস্বরে বয়ে গেছে রোমান্স-বিগলিত দাম্পত্য প্রণয়ের গীতি-

আবহ। যেন হিমালয়ের পাষাণফলকে তুলির সূক্ষ্মতা দিয়ে আঁকা হয়েছে গঙ্গার প্রাণধারা। রবীন্দ্র-গল্পে 'প্রতিহিংসা' একটি শ্রেষ্ঠ রচনা।

'দৃষ্টিদান' গল্পের ফলশ্রুতিতে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ইঙ্গিত রয়েছে। কুমু এবং তার স্বামী দাম্পত্য সম্পর্কের পাশ কাটিয়ে দু'জনেই দু'জনকে 'দেবতা' করে তুলেছিল। মানবিক বন্ধনে এই কণ্ঠাগতির মধ্যেই তাদের প্রাণ শুষ্ক ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই সমাপ্তিক ইঙ্গিত আগাগোড়া আখ্যান বর্ণনারই অব্যবহিত রস-পরিণাম। অতএব, কেবল অস্ফুট ইঙ্গিতের জোরেই গল্পটিকে মনস্তত্ত্বমূলক বলা চলে না।

পদ্মা-ঋতুর ফসল যত গল্প 'গল্পগুচ্ছে' আছে, তার মধ্যে একমাত্র 'দিদি'ই আগাগোড়া মনোবিকলনের রীতি অনেকটা রক্ষা করেছে। কিন্তু ঐ গল্পের রস-পরিস্রুতির প্রধান অবলম্বন মনোবিকলন নয়, নাটকীয়তা। পূর্বের এক অধ্যায়ে ছোটগল্পের আঙ্গিকে নাট্যধর্মের সম্ভাবনার কথা আলোচনা করেছি।[৩৯] নাটকের রূপগত উপাদান একাধিক,—(১) প্লট্-এর সংঘাতময়তা, (২) চরিত্রের তীব্র সংহতি ও সক্রিয়তা, (৩) দ্বন্দ্বমুখর ঘটনামুখে প্লট-এর আকস্মিক সমাপ্তিজনিত স্তব্ধতা, ইত্যাদি। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে নাট্যকলা-শৈলীর সব কয়টিই যে-কোনো একটি গল্পে একত্র প্রত্যাশা করা অসঙ্গত। কারণ প্রথমত ছোটগল্প সর্বাংশে নাটক নয়,—এর নিজস্ব শিল্প-প্রকরণে স্বাতন্ত্র্য আছে। দ্বিতীয়ত ছোটগল্পের আকৃতি সংক্ষিপ্ত,—বৃহৎ নাটকের সব কয়টি উপাদান এক সঙ্গে ধারণ করতে পারা ক্ষুদ্র পরিসরের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। তবু আখ্যানকে ছাপিয়ে প্লট-এর ঘটনা-তীব্রতা, চারিত্রিক উজ্জ্বলতা ও সমাপ্তি যেখানে নাটকীয় স্পষ্টতা ও আকস্মিতার মধ্যে পরিস্রুতি লাভ করেছে, সেখানেই গল্পকে বলি নাট্য-ধর্মান্বিত।

'দিদি' গল্পে এই নাট্যগুণের প্রাধান্য দেখি। প্রথম থেকেই আশ্চর্য সফল নাটকীয় পূর্বসংকেত (dramatic irony) নিয়ে গল্পটির শুরু হয়েছে—পল্লীবাসিনী কোনো হতভাগিনীর অন্যায় ও অত্যাচারকারী স্বামীকে উদ্দেশ করে প্রতিবেশিনী তারা বলেছিল,—"এমন স্বামীর মুখে আগুন।" স্পষ্টবাদিনীর এই কথা শুনে পতিপ্রাণা শশিকলা মনে মনে সংকুচিত হয়েছিল; বিশেষত তার স্বামী জয়গোপাল তখন বিদেশে। শশিকলার সংকোচ লক্ষ্য করে "কঠিন হৃদয় তারা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কহিল, এমন স্বামী থাকার চেয়ে সাতজন্ম বিধবা হওয়া ভাল।" তারা চলে গেলে "শশী মনে মনে কহিল, স্বামীর এমন কোনো অপরাধ কল্পনা করিতে পারি না, যাহাতে তাঁহার প্রতি মনের ভাব এত কঠিন হইতে পারে।" তারপর পতিগত-প্রাণা, প্রোষিতভর্তৃকা শশিকলা শয্যাগৃহের

৩৯। দ্রষ্টব্য—তৃতীয় অধ্যায়।

দ্বাররুদ্ধ করে, স্বামীর উপাধান চুম্বন করে, শয্যাংশে তার গায়ের ঘ্রাণ নিয়ে তার অস্পষ্ট ফটোগ্রাফ ও চিঠিপত্র নিয়ে সারা দুপুর এমন কাণ্ড বাঁধিয়ে তুল্‌ল, যা নিছক কৌতুককর। অথচ শশী তখন নবোঢ়া নয়,—পতি-পুত্রবতী! এই শশীরই মর্মান্তিক জীবনান্ত সম্বন্ধে স্পষ্টবাদিনী তারা মাঝে মাঝে গর্জন করে উঠেও যা বলতে পারত না কেবল প্রতিবেশিনীদের তাড়নায়, তার নাটকীয় ব্যঞ্জনা গল্প-রসের প্রাণস্থলেও ছড়িয়ে আছে। অর্থাৎ, স্বামীই হত্যা করেছিল শশীকে। এই ভয়াবহ ট্রাজিক পরিণাম-ব্যঞ্জনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গল্পের প্রারম্ভিক ছত্রগুলি শেক্‌স্‌পীয়রের হাতের নাট্য-সংকেত-শৈলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্ত্রী ও দিদি,—শশীর এই দ্বৈত সত্তার জটিলতা বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ সফল মনোবিকলন-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। 'নষ্টনীড়', 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীর পত্র' ইত্যাদির অ-সচেতন প্রস্তুতি যেন এখানেই। কিন্তু গল্পের যে পটভূমি কবি সৃষ্টি করেছেন—তাতে শশীর অন্তর্বেদনা সার্থক নাটকীয় অন্তঃসংঘাতের মূর্তি এঁকেছে। স্বামীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিরোধিতার অবতারণায় এই অন্তঃসংঘাত নাটকীয় অ্যাক্‌শন্‌-এর রূপ পেয়েছে। 'প্রতিহিংসা' গল্পের দেহে মাঝে মাঝে [এবং 'সমাপ্তিতে'ও] এই নাটকীয়তার আভাস-ব্যঞ্জনা আছে। তাহলেও, আগেই বলেছি, বর্ণনার অন্তর্লীন সহজ ভাব-কম্পনই ঐসব গল্পের পরিণামী রস-পরিস্রবণে সহায়তা করেছে। কিন্তু, 'দিদি' গল্পের শুরু থেকে সারা পর্যন্ত বিন্যাস, চরিত্রায়ণ ও পরিসমাপ্তি নাটকের সংক্ষিপ্তি, সংহতি ও তীব্রতার দ্বারা পরিশোধিত। রবীন্দ্র-রচনায় 'দিদি'-গল্প অতুল্য, একক।

সমপরিমাণে না হলেও, কম-বেশি নাট্যগুণান্বিত আরো যে-কটি গল্প আছে গল্পগুচ্ছে, তাদের মধ্যে 'দালিয়া' 'ত্যাগ', 'মহামায়া', 'শাস্তি', 'অনধিকার প্রবেশ', 'মানভঞ্জন', ইত্যাদি অবশ্য উল্লেখ্য। এই প্রসঙ্গে আর একবার বলি,—আঙ্গিকগত এই শ্রেণী নির্ণয় নিতান্ত সাধারণতা এবং স্থূলতার সীমা অতিক্রম করতে পারে না। সৃষ্টির মত স্রষ্টার হাতের হাতিয়ারও সাধারণ লক্ষ্যের অতীত। স্রষ্টার নির্মাণশালা জ্ঞানলোকের একান্ত অদৃশ্য নেপথ্যে। অতএব জ্ঞানাতীতকে বুদ্ধি-বিচারের কামারশালে টেনে এনে ঢালাই করতে গেলে মূল সৃষ্টির সূক্ষ্ম কলাকর্ম অনেকটাই বাদ পড়ে যায়। 'দালিয়া'কে নাট্যপ্রধান গল্প বললে তার গীতি-রোমান্স-নিবিড় অনুপম স্বাদুতাকে অস্বাকৃতির পশ্চাৎপটে ঠেলে রাখা হয়। আবার 'শাস্তি' গল্পের কারুকর্ম এমন সূক্ষ্ম, জটিল, অখণ্ড যে, খালি নাট্য-গুণান্বিত বললে এর অনির্বাচ্য কলাশৈলীর কিছুই বলা হয় না। তবু, এই সব সৃষ্টির প্রসঙ্গে স্রষ্টার হাতের একমাত্র মোটা হাতিয়ারটিকেই একবার করে দেখে নিচ্ছি। প্রত্যেক রচনায় প্রত্যেক হাতিয়ারের আঁচড়, প্রতিটি তুলির ছোপ পৃথক্ সম্পূর্ণ করে দেখবার অবকাশ এ নয়,—তার জন্যে রবীন্দ্র-গল্পবিষয়ক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের প্রয়োজন। বাংলা

ছোটগল্পের কারুকর্মের ইতিহাস সন্ধানে কবির হাতের স্থূল ভাগগুলোকে দেখেই আমরা নিরস্ত হব।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "দালিয়া গল্পটি ইতিহাসের ক্ষীণ ধারা অবলম্বনে লেখা।"[৪০] মনে হয়, গল্পের মূল রসসৃষ্টির প্রয়োজনে কবি সচেতনভাবে ইতিহাসের এই উপলক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন। ঔরঙ্গজীবের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে শাহ সুজা সপরিবারে আরাকান রাজের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু পরিণামে তাঁর ভাগ্যে সে আশ্রয় স্থায়ী হয়নি। এই ঘটনার ফলশ্রুতি নিয়ে 'দালিয়া' গল্পের ভিত্তি। কিন্তু ইতিহাসের সেই লুপ্ত সূত্র কবি মোটেই সন্ধান করেননি।—চলমান জীবনের প্রচ্ছদ থেকে বহুদূরে এসে পড়তে পারার সুযোগে একখানি অখণ্ড নিঁখুত রোমান্সের ছবি আঁকতে শুরু করেছিলেন। গোটা গল্পটি যেন নীহারিকাপুঞ্জের রহস্য-বর্ণে আঁকা সুদূর জীবনের রূপাভাস। ভাষার গুণে নয়,—নিছক বর্ণনীয় জীবন প্রচ্ছদের অপরূপতায় 'দালিয়া' সুরে-আঁকা ছবির অনুপম মধুরিমা ও তান-সুষমায় ভরে উঠেছে। তাই কেউ বলেছেন, এ গল্প অতীব রোমান্টিক,—কেউ বলেছেন, 'দালিয়া' এক অখণ্ড লিরিক্। আর, প্রমথ বিশী তাঁর অতুল্য ভঙ্গিতে বলেছেন,—গল্পটি রোমান্টিক্ হয়েও যথেষ্ট রোমান্টিক্ হয়নি বলেই যত দুঃখ। এই সব কটি উক্তিকেই সাধারণভাবে 'দালিয়া'-র শিল্প-কর্মের অসম্পূর্ণতার পরিচয়বহ বলে মনে করা হয়। তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলবার প্রয়োজন আছে,—কেবল রবীন্দ্র-গল্পের ইতিহাসেই নয়, বাংলা সাহিত্যে 'দালিয়া' গল্পের রস-সফলতা অপরূপ। অজস্র ধারায় উৎসারিত স্বপ্ন-কল্পনার ঝর্ণা একমুহূর্তের অপ্রত্যাশিত ঘটনার চাপে (pressure) যদি জমে বরফ হয়ে যায়, আর তখনি প্রভাতসূর্যের রশ্মিরেখা যদি সেই তুষার-ফলকে পড়ে মুহূর্তে সপ্তবর্ণের মায়াজাল রচনা করে,—তবে সেই আকস্মিকতা, সেই কল্পনাতীত নূতন অপরূপতা যে স্তব্ধ বিস্ময়, যে অনির্বাচ্য মাধুর্যের সৃষ্টি করে,—তাই 'দালিয়া' গল্পের রস-পরিণাম। শাহ সুজার কন্যা আমিনা বন্য 'বুঢ়া'র স্নেহে আর বন্যতর দালিয়ার প্রেমে বন্য তিন্নি হয়ে গিয়েছিল। নিজের মধ্যেকার 'শাহজাদী'র প্রতি তিন্নির প্রাণে করুণা ছাড়া আর কিছু নেই। এমন দিনে এলো বড় বোন জুলিখা। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ সে দাবি করল, নতুন আরাকান-রাজের হত্যার মধ্যে। তিন্নির কাছে আবার দাবি করল শাহজাদীর দার্ঢ্য এবং কর্তব্য ও মহিমাবোধ। অবশেষে বন্য প্রাণের প্রার্থনার পরাভব ঘটে রাজকীয় কর্তব্যবোধের বেদীতে। জুলিখা ও আমিনা রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। ভাবী রাজবধূবেশের গহনে আমিনা লুকিয়ে রাখে তীক্ষ্ণ ছুরি। এখানেই নাটকীয়তার climax। কিন্তু তার আগে তিন্নি, দালিয়া, বুঢ়া এবং অবশেষে জুলিখাকে নিয়ে বন্যপ্রাণ আর বন্য

৪০। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—'রবীন্দ্র-জীবনী' ১ম।

প্রণয়ের যে স্বপ্নচ্ছবি কবি এঁকেছেন, মদিরতা উজ্জ্বলতা উৎসাহ এবং আনন্দে তা অপরূপ তরঙ্গিত। গোটা গল্প উদ্ধার না করলে তার বিশ্লেষণ অসম্ভব,—খণ্ড সুরের টুকরো দিয়ে অখণ্ড তানের পরিচয় দেবার মতোই সে অপপ্রয়াস কেবল চিত্তপীড়াকর। তাই সেই সুর যখন নাটকীয় সম্ভাবনায় জমতে শুরু করেছে, তখনকার সমাপ্তি ছত্র কয়টি কেবল উদ্ধার করব।

রাজবাড়ির বাসরঘরে প্রবেশের মুখে :—

"জুলেখা আমিনাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া চুম্বন করিল।

"উভয়ে ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল।

"রাজবেশ পরিয়া ঘরের মাঝখানে মছলন্দ-শয্যার উপর রাজা বসিয়া আছেন। আমিনা সসংকোচে দ্বারের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

"জুলেখা অগ্রসর হইয়া নিকটবর্তী হইয়া দেখিল, রাজা নিঃশব্দে সকৌতুকে হাসিতেছেন।

"জুলেখা বলিয়া উঠিল, 'দালিয়া।' আমিনা মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

"দালিয়া উঠিয়া তাহাকে আহত পাখিটির মতো কোলে করিয়া তুলিয়া শয্যায় লইয়া গেল। আমিনা সচেতন হইয়া বুকের মধ্য হইতে ছুরিটি বাহির করিয়া, দিদির মুখের দিকে চাহিল, দিদি দালিয়ার মুখের দিকে চাহিল, দালিয়া চুপ করিয়া হাস্যমুখে উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল। ছুরিও তাহার খাপের মধ্য হইতে একটুখানি মুখ বাহির করিয়া এই রঙ্গ দেখিয়া ঝিক্‌মিক্ করিয়া হাসিল।"

বর্ণনা-রীতির সঙ্গে অনুচ্ছেদ বিন্যাসও এখানে লক্ষ্য করবার মত। একটি দুটি বাক্যের সীমায় বাঁধা প্রতিটি অনুচ্ছেদ একটি করে ঘটনার উল্লেখ করছে,—বর্ণনা যত সংক্ষিপ্ত, তত তপ্ত তীব্র। প্রতি অনুচ্ছেদে ঘটনার গতি ও তাপ একধাপ করে এগিয়ে চলেছে। কবির ভাষা ও অনুচ্ছেদ বিন্যাস যেন সেই ক্রম-তুঙ্গায়িত ঘটনা ধারার পেছনে সুরের নাটকীয় আবহ রচনা করছিল। চরম মুহূর্তে আমিনার মূর্ছার সঙ্গে সঙ্গে সে গান বাঁশির রন্ধ্রে হঠাৎ জমাট বেঁধে গিয়ে শেষ অনুচ্ছেদের সর্বশেষ সুদীর্ঘ বাক্যে প্রাণ হয়ে যেন ঝলমল করে উঠেছে।

'দালিয়া'র সমাপ্তি নাটকীয়, কিন্তু তার বর্ণনা ও আবহ সুরময়—স্বপ্নাবিষ্ট। আর এই স্বপ্নাবেশ রচনায় ইতিহাসের রহস্যলোকে কবির অতীতচারণ অনেকখানি রসের রসদ যুগিয়েছে। রোমান্টিকতার পক্ষে অপরিহার্য রহস্যময়তার এক আশ্চর্য আশ্রয় ইতিহাসের অতীত-ভূমি।

'মহামায়া' গল্পেও কবি এ-সুযোগ নিয়েছেন। এই গল্পের জীবনভূমি কোনো সুনির্দিষ্ট

ঐতিহাসিক কালের নয়,—সতীদাহ ও কৌলীন্য প্রথার মধ্যাহ্ন-যুগে। 'দালিয়া' গল্পে অতীতের রহস্যাবরণ রোমান্সের লীলায়িত ভঙ্গিতে গতি এবং শক্তি সঞ্চার করেছে। কিন্তু 'মহামায়া' গল্পে সেই অতীত প্রচ্ছদই রোমান্সের ওপরে নাটকের গাঢ়তা ও ট্রাজেডির লোমহর্ষণ সঞ্চার করেছে। বর্ণনার মধ্যেও এবারংগানের লালিত্য নেই, ঝড়ের সুর যেন থমথম্ করছে। প্রতিটি চরিত্র সুগঠিত, সুচিহ্নিত, প্রগাঢ় ,—কর্ম ও বাচনের নাটকীয়তার মাধ্যমে তাদের প্রকাশও নাটকীয়। গল্পের কোনো বিশেষ অংশ তুলে দেবার উপায় নেই, বর্ণনার ছত্রে ছত্রে, ঘটনার ধাপে ধাপে মহামায়া, রাজীব, এমন কি ভবানীচরণেরও চরিত্র রচনার প্রতি পদে কবির হাতে লেখনী যেন বিধাতার অমোঘ রাজদণ্ডের মত বিচরণ করেছে। গল্পের দেহে নাটকের এই আবহ-ঝংকৃত দার্ঢ্য অপরূপ। আবার নাটকের অন্ধ এককেন্দ্রিক নিষ্ঠাকে অনুসরণ করেই গল্প তার অপরিহার্য ট্রাজেডির অতলে গিয়ে পড়েছে। মহামায়ার সেই চির-অন্তর্ধান ও রাজীবের জীবনের অপার শূন্যতার সন্ধিভূমিতে বসে কবি বিধাতার মতই বিবিক্ত চিত্তে গল্পের পরিণাম ঘোষণা করেন,—"মহামায়া একটি উত্তরমাত্র না করিয়া, মুহূর্তের জন্য পশ্চাতে না ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রাজীবের ঘরে আর সে প্রবেশ করিল না। কোথাও তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের নীরব ক্রোধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে একটি সুদীর্ঘ দগ্ধ চিহ্ন রাখিয়া গেল।"

শিল্পি-প্রাণের এই অমোঘ দার্ঢ্য ও সহজ বিবিক্ততা-ই আগাগোড়া গল্পটিকে নাটকীয় রসের গতি ও গাঢ়তায় একসঙ্গে ভরে তুলেছে। 'ত্যাগ' গল্পেরও দেহে অজস্র বিচিত্র ঘটনাপরম্পরার বিন্যাসে এই নাটকীয় ঘনতার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এর পরিসমাপ্তিতে আছে অনিবার্যপ্রায় ট্রাজেডির মুখে 'দালিয়া'র মতই আকস্মিক রস-পরিস্রুতি। তাহলেও 'ত্যাগ' পূর্বোক্ত গল্প দু'টির তুলনায় অত উদ্দীপনাময় নয়। তার কারণ, এই গল্পে বিচিত্রতা আর ব্যাপ্তির অপেক্ষা গাঢ়তা আর সংহতির অভাব ঘটেছে। প্রভাতকুমারের ভাষায় "ত্যাগ গল্পেও বহু দুঃখ-বেদনাপূর্ণ ঘটনা আছে, হিংসা-প্রতিহিংসা স্বল্পপরিসর গল্পে অত্যন্ত ঠাসা।"[৪১] কিন্তু, গল্প-দেহের ওপর দিয়ে বহু ঘটনা বয়ে গেলেও তার অঙ্গে অঙ্গে সুদৃঢ় অবয়ব-বন্ধন জাগাতে পারেনি। তাই এই গল্পের যা কিছু রস-পরিস্রুতি সে ঐ শেষ মুহূর্তের আকস্মিক-মধুর পরিণামে।

শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে বাংলার হিন্দুসমাজে নারী-নির্যাতনের বিচিত্রতা কবিকে চিরদিন পীড়িত করেছে। এ নিয়ে গল্পে প্রবন্ধে কবিতায় তাঁর চিন্তা আর নালিশের

৪১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—'রবীন্দ্র জীবনী' ১ম খণ্ড

অন্ত ছিল না। 'মহামায়া' এবং 'ত্যাগ' গল্পে প্রাচীন ও নূতন যুগের বাংলায় নারী-নির্যাতনের দুইটি ছবি দুই পৃথক্ রকমের স্বাদুতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। একজায়গায় ট্রাজেডি নারী-জীবনের অজ্ঞাত সমাপ্তি রচনা করেছে; অন্যত্র পুরুষের অনুকম্পা প্রেমের ছদ্মবেশে অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনাকে করেছে বারিত। অন্যপক্ষে 'মানভঞ্জন' গল্পে রবীন্দ্রনাথের বিরক্তি বিদ্রোহের অভিমুখী। একদা তিনি সখেদে প্রশ্ন করেছিলেন,—

"নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?"

'নামঞ্জুর' গল্পে নিজে বিধাতার ভূমিকায় বসে গিরিবালাকে কবি সেই আত্মভাগ্য জয় করবার অধিকার দিয়েছেন। প্রেক্ষাগৃহে অভিনয়ের চরম মুহূর্তে গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে। সারাটি গল্পের দেহেও প্রেক্ষাগৃহের আবহ-সংগীত যেন ঘটনা ও বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে ঝংকৃত হয়ে ফিরেছে। এইরূপ একটি চরম মুহূর্ত রচিত হয়েছে অলঙ্কার-শিঞ্জন-চঞ্চলা অপরূপ সুন্দরী গিরিবালার স্বামি-জয় করার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা যখন গোপীনাথের প্রবল আঘাতে বাতাহত ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে, তখন। যেমন, অ্যাক্শন্, তেমনি সিম্ফনি যেন গায়ে গায়ে লেগে জড়িয়ে পড়েছে। গল্পশেষে মদমত্ত গোপীনাথকে প্রেক্ষাগৃহ থেকে টেনে বার করে দেবার দৃশ্যে কবির ব্যথাতুর আত্মা যেন প্রতিবিধানের আশ্বস্তি খুঁজে পেয়েছে।

'অনধিকার প্রবেশ' গল্পের পেছনে সমকালীন কবি-হৃদয়ের আর এক জীবন-বেদনার প্রেরণা অনুমান করেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। হামারগ্রেন্ নামক একটি সুইস্ যুবক ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে এ দেশে এসেছিলেন। রামমোহন রায়ের রচনা তাঁকে ভারতভক্ত করেছিল। বাংলাদেশে কোনো সেবাকার্যে আত্মদান করবেন,—এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তিনি ইচ্ছে করেছিলেন, হিন্দুদের মতো যেন তাঁকে দাহ করা হয়। কিন্তু হিন্দুসমাজপতিরা 'বিধর্মী'র মৃতদেহকেও শ্মশানপ্রবেশের অধিকার পর্যন্ত দেন নি। এতে চূড়ান্ত ব্যথিত হয়ে কবি একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। সেই একই মাসে 'অনধিকার প্রবেশ' নামক গল্পটি লেখা হয়। "হামারগ্রেন-হিন্দুসমাজে অনধিকার প্রবেশ চাহিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত গল্পের জয়কালীর সকল আচার ধ্বংস হইয়া গেল যখন অপবিত্র শূকর উন্মত্ত ডোমদের হাত হইতে পলায়ন করিয়া তাঁহারই পরম পবিত্র মন্দিরে জীবন রক্ষার জন্য আশ্রয় লইল। এই সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন, কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর সমাজ-নামধারী অতি ক্ষুদ্র দেবতাটি নিরতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল'।[৪২] গল্পটির উৎকর্ষ

৪২ তদেব।

কিন্তু সংশয়াতীত নয়। কেবল জয়কালীর সংস্কারমুক্তি, আকস্মিক জীবে-দয়া এবং ডোমেদের নিকট মিথ্যা ভাষণ গল্পটির গায়ে নাটকীয়তার উপাদান যোজনা করেছে।

এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প 'শাস্তি' ;—যে-কোনো দৃষ্টিভঙ্গিতেই এর ছোটগল্পত্বের শ্রেষ্ঠতা সংশয়হীন। অধ্যাপক প্রমথ বিশী রবীন্দ্র-গল্পের ইতিহাসে এর আরো এক অতুল্যতার কথা বলেছেন। কবি নিজেও দাবি করেছেন, " ...আমি যে ছোট ছোট গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালি সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।"[৪৩] সন্দেহ নেই, 'গল্পগুচ্ছে' সেই বাস্তব জীবনের রসদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুগিয়েছিল কবির সবচেয়ে পরিচিত মধ্যবিত্ত সমাজ। কিন্তু তথাকথিত অন্ত্যজ, দরিদ্র জীবনের রূপ-রচনাতেও তাঁর লেখার তুলি যে নিপুণ আর নিখুঁত ছিল, তার উজ্জ্বল প্রমাণ এই গল্পটি। এই ধরনের রবীন্দ্র-গল্পের পথ ধরেই বাংলা সাহিত্যে তথাকথিত নিম্নবর্ণের অপাংক্তেয় জীবন-কথা সর্বজনীন প্রীতি ও মর্যাদার আসন পেয়েছে। এই গল্পটির রস-পরিণাম সৃষ্টিতে কবি-কল্পনার প্রভাব কম নয় ; কিন্তু কোথাও এতটুকু অবাস্তবতা বা অস্বাভাবিকতা নেই ; চন্দরার স্বামীর বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন,—"ছিদামকে একখানি চকচকে কালো পাথরে কে যেন বহু যত্নে কুঁদিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে।" কেবল ছিদাম নয়, গোটা গল্পটিকে, এবং বিশেষ করে চন্দরাকে কবি নিজে নিকষ কালো কষ্টি পাথরে জীবন জমিয়ে অনুপম ভঙ্গিতে কুঁদে তুলেছেন,—প্রতি অঙ্গে তার সুগঠিত নিখুঁত প্রাণের তরঙ্গ। আগাগোড়া রুই পরিবারের প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনার বর্ণনায় অ-সংস্কৃত জীবনের আদিমতা পাথরের মূর্তির মতো জমাট রূপ ধরেছে। আর একদিকে সেই আদিম জীবনের অপরিহার্য কঠিন উদাত্ততা শতবর্ণে যেন ঠিক্‌রে পড়েছে। চন্দরার মৃত্যুবরণের দৃঢ়চিত্ত একগুঁয়েমির অন্তরালে এক প্রচ্ছন্ন অভিমানের সুর সৃষ্টিকালের আদিম সুর-তরঙ্গের মতো ঘন-গম্ভীর গাঢ় ঝংকারে অনুরণিত হয়ে ফিরেছে। চন্দরা তার স্বামীকে ভালবাসত,—ছিদামও স্ত্রীকে ভালবেসেছিল ;—সে ভালবাসায় আদিমতাধর্মী বস্তু-ঘনতাকে কবি খোদাইকরের মত গড়েছেন গল্পের প্রস্তর ফলকে,—"অপরাপর গ্রামবধূদিগের সৌন্দর্যের প্রতি যদিও তাহার উদাসীন দৃষ্টি ছিল না এবং তাহাদের চক্ষে আপনাকে মনোরম করিয়া তুলিবার ইচ্ছাও তাহার যথেষ্ট ছিল—তবু ছিদাম তার যুবতী স্ত্রীকে একটু বিশেষ ভালবাসিত। উভয়ে ঝগড়াও হইত, ভাবও হইত, কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিত না। আর একটি কারণে উভয়ের মধ্যে বন্ধন কিছু সুদৃঢ় ছিল। ছিদাম মনে করিত, চন্দরা যেরূপ চটুল চঞ্চল প্রকৃতির স্ত্রীলোক তাতে যথেষ্ট বিশ্বাস নাই ; আর চন্দরা মনে করিত, আমার স্বামীটির চতুর্দিকেই দৃষ্টি, তাহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোনদিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই।"

৪৩। রবীন্দ্রনাথ : 'সাহিত্য, গান ও ছবি'।

এমনি করে চন্দরা আর ছিদাম দুজন দুজনকে বাঁধতে গিয়ে, দুজনেই পরস্পরের কাছে একান্ত বাঁধা পড়েছিল। এমন অবস্থায় স্বামী যখন অপরের হত্যাপরাধ স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নিতে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতে পারল, তখন চন্দরার আদিম প্রেমের অভিমান আগুনের শিখা হ'য়ে জ্বলেছিল,—"চন্দরাকে যখন তাহার স্বামী খুন স্বীকার করিয়া লইতে কহিল, সে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার কালো দুটি চক্ষু কালো অগ্নির ন্যায় নীরবে তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সংকুচিত হইয়া স্বামী রাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা একান্ত বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল।"

একে কেবল অভিমান বললেই যথেষ্ট হয় না,—ক্ষোভ এবং আক্রোশের আগুনও এখানে জাজ্বল্যমান। আর সে কেবল 'স্বামী-রাক্ষসের' বিরুদ্ধেই নয়,—নিজের ব্যথাহত প্রেমের বিরুদ্ধেও এ যেন উদ্যত-ফণা সর্পিণীর নিরুদ্ধ আক্রোশ। নিজের অভিমানাহত প্রেমের প্রতি এই আক্রোশের ছবি কবি যেন পাথরের গায়ে তক্ষণের অমোঘ বাটালির আঘাতে জীবন্ত করে তুলেছেন,—"যখন ছিদামকে আদালতে উপস্থিত করিল, চন্দরা মুখ ফিরাইল। জজ বলিলেন, 'সাক্ষীর দিকে চাহিয়া বলো, এ তোমার কে হয়'।

চন্দরা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল, 'ও আমার স্বামী হয়'।

প্রশ্ন হইল, 'ও তোমাকে ভালবাসে না' ?

উত্তর। উঃ, ভারি ভালবাসে।

প্রশ্ন। তুমি উহাকে ভালবাস না ?

উত্তর। খুব ভালবাসি।"

এই আদিম অথচ অতলস্পর্শ, বন্য অথচ উদাত্ত অভিমান-আক্রোশের অগ্নিকুণ্ডে স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিয়ে ফাঁসি বরণ করেছিল চন্দরা। স্বামীর ভালবাসায় তার সংশয় ছিল না, শেষ মুহূর্তেও স্বামীর প্রতি ভালবাসার অভাব ঘটেছিল বলে মনে হয় না। যে ভালবাসে এবং যাকে চন্দরাও ভালবাসে, সে কেন অতবড় অন্যায় অপবাদ মাথায় তুলে দিতে চায়! এই অভিমান আর নালিশই চন্দরাকে মৃত্যুবরণে কৃতনিশ্চয় করেছিল। ছিদাম যে কেবল ভাইকে রক্ষা করবার জন্যেই এ-টুকু করেছিল এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই উপায়ে ভাইয়ের সঙ্গে স্ত্রীও বাঁচবে,—চন্দরার বিমুখ অন্তরাত্মার কাছে এ-তথ্য বিবর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। অভিমানের জ্বালা বক্ষে ধরেই সে আত্মহত্যা করেছে,—সেই জ্বালার তপ্ততাকে বধ্যভূমির আকাশে-বাতাসে এবং গল্পেরও সারা দেহে-প্রাণে-মর্মে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে যন্ত্রণাকাতর-বিষ-ব্যঞ্জনার আকারে : "ডাক্তার কহিল, 'তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব।' চন্দরা কহিল, 'মরণ!—' "

এই শেষ কথার অনন্তপাথার ব্যঞ্জনাকে নাটকীয় বললে যথেষ্ট বলা হয় না;—লিরিক্ ত একে কিছুতেই বলা চলে না। এ সমাপ্তি যেন আদিম এপিক্-এর। বস্তুতঃ সারাটি গল্পের দেহে-প্রাণে এই এপিক্-ধর্মিতাই সহস্র বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়েছে।

জানা নেই, রুইপরিবারের এই এপিক্-রস-সম্পূর্ণ বর্ণনায় চন্দরার মনোপরিচয় কারো অস্বাভাবিক বা অসংগত মনে হবে কিনা। এ-গল্পের রস-পরিণামের অনেকখানি ভিত্তি মনস্তাত্ত্বিক সংকেত-ধর্মিতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত। একটি আদিম অসংস্কৃত-চিত্ত নারীর পক্ষে এই জটিল, গভীর অনির্বাচ্য মনোধর্ম স্বাভাবিক কি না, বাস্তবতার পক্ষ থেকেও এ-প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়। তবু তা উঠতে পারে কেবল রবীন্দ্রনাথের অভিজাত জন্ম-উৎসের ভ্রান্ত মূল্যায়নের দরুনই। এই প্রসঙ্গে বলা চলে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে মনের ধর্ম অভিন্ন। পরিবেশ, রুচি ও শিক্ষার সূক্ষ্মতা কেবল সেই মৌল ধর্মের প্রকাশকে পৃথক করে। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'কয়লাখনির শিল্পী' শৈলজানন্দের 'নারীর মন' গল্পটির উল্লেখ করি। কয়লাখনি পর্যায়ের এটি দ্বিতীয় গল্প,—'কল্লোল পত্রিকা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ—১৩৩০ বাংলা সন) প্রকাশিত হয়েছিল। যথাস্থানে আমরা গল্পটির আলোচনা করব। সহৃদয় পাঠককে এখানে কেবল লক্ষ্য করতে বলি,—প্লট-এর ভাব-সার, এবং গল্পের মনস্তত্ত্ব এখানে রবীন্দ্রনাথের 'দুইবোন' গল্পের সঙ্গে অভিন্ন। দু'টি গল্পের পরিণতিতেও আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শর্মিলা আর উর্মিমালার আদ্যন্ত মনোধর্ম নবরূপ পেয়েছে যথাক্রমে শৈলজানন্দের ভুলি আর টুরনীর মধ্যে। পার্থক্য কেবল তাদের জীবন-প্রতিবেশ ও প্রকাশভঙ্গীর। শৈলজানন্দের গল্পকে কেউ অবাস্তব বলেন না,—অথচ রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' সম্বন্ধে সংশয় থাকে। এ কেবল সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে অন্ধ পূর্বসংস্কারের প্রভাব। 'নারীর মন' আর 'শাস্তি'র মধ্যে তফাৎ,—প্রথমটি আদ্যন্ত বাস্তব,—দ্বিতীয়টি অখণ্ড এপিক্।

এবারে আর এক শ্রেণীর রবীন্দ্র-গল্পের কথা বলি,—আমরা এদের বলেছি 'আবহ-প্রধান'। আগাগোড়া একটা সুরের বহমানতার বুকে বিন্দুর মতো যেন দুলছে এইসব গল্পের রস-পরিণাম। আগে বলেছি, আখ্যান-প্রধান, নাট্য-প্রধান, মনস্তত্ত্ব-প্রধান, বা আরো যে-কোনো রকমের রূপাঙ্গিক যুক্ত হোক, সব ছোটগল্পের রসপরিস্ফুতির মূলে রয়েছে এক ব্যঞ্জনাময় ধ্বনি-সুরভি,—যাকে সুরের দোলার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্র-গল্পের পূর্বালোচনায় এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। কিন্তু এবার যেসব গল্পের কথা বলব, ক্ষীণ প্লট-এর বৃন্তে তারা সবকয়টিই অখণ্ড সুরের ফুল। প্রথম কয় শ্রেণীর গল্পে সুরের ঝঙ্কার অন্তর্লীন,—তার ব্যঞ্জনা পরিণাম-বিদ্ধ। কিন্তু এই শেষোক্ত ধরনের গল্পগুচ্ছে সুর "আদাবন্তে চ মধ্যে চ",—সুরের বহমানতাই গল্পের উৎস, গতি ও প্রাণ।

এই শ্রেণীর গল্পের নাম ও প্রকৃতি চিহ্নিত করবার আগে মনে রাখতে হয়, এদের মধ্যে সুর-আবহের প্রাধান্য সাধারণ বিশিষ্টতা হলেও, গল্পদেহে তার বিকাশ ঘটেছে বিচিত্ররূপে। সেদিক থেকে এই সব গল্পকে আঙ্গিক অনুসারে আবার পৃথক পৃথক উপভাগে বিচ্ছিন্ন করতে হয়। সে বিভেদ-বিচ্ছেদের আগে আবহময় একটি শ্রেষ্ঠ গল্প 'অতিথি'-র প্রসঙ্গে এই শ্রেণীর গল্পগুচ্ছের সাধারণ পরিচয় সন্ধান করা যেতে পারে। 'অতিথি'-র মত আশ্চর্য কাব্যস্বাদী গল্পেও আলঙ্কারিক সৌন্দর্য ও ছন্দোঝংকারের কবিতাধর্মী অতিশয়তা কল্পনাতীত। আসলে কবিতার আক্ষেপ ছিল কবির প্রাণে। তাকেই তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন গল্পের অনুচ্ছ্বসিত স্বভাব-বর্ণনার মধ্যে। আমাদের দেশে আলঙ্কারিকেরা কাব্যধর্মের আত্মা হিশেবে 'রসধ্বনি'-র কথা বলেছেন,—যা বাচ্যার্থ, ছন্দ, অলঙ্কার, রীতি-সৌষ্ঠব, সব কিছুর অতীত। 'অতিথি' গল্প এই সিদ্ধান্তের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এর চেয়ে স্বাভাবিক অকৃত্রিম বর্ণনার ভাষা গদ্যের পক্ষেও কল্পনা করা কঠিন। অথচ শাদা কথার ফাঁকে ফাঁকে কানায় কানায় ভরে উঠেছে কবিতার অনির্বাচ্য ধ্বনি,—যা সুরের মতই আবহময়,—"তারাপদ হরিণশিশুর মত বন্ধনভীরু, আবার হরিণেরই মত সংগীতমুগ্ধ। যাত্রার গানেই তাহাকে প্রথম ঘর হইতে বিবাগী করিয়া দেয়। গানের সুরে তাহার সমস্ত শিরার মধ্যে অনুকম্পন এবং গানের তালে তালে তাহার সর্বাঙ্গে আন্দোলন উপস্থিত হইত। যখন সে নিতান্ত শিশু ছিল তখনও সংগীত সভায় যেরূপ সংযত গম্ভীর বয়স্কভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া বসিয়া দুলিত, দেখিয়া প্রবীণ লোকের হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইত। কেবল সংগীত কেন, গাছের ঘন পল্লবের উপর যখন শ্রাবণের বৃষ্টিধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ডাকিত, অরণ্যের ভিতর মাতৃহীন দৈত্যশিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত, তখন তাহার চিত্ত যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বহুদূর আকাশ হইতে চিলের ডাক, বর্ষার সন্ধ্যায় ভেকের কলরব, গভীর রাত্রে শৃগালের চীৎকারধ্বনি, সকলই তাহাকে উতলা করিত। এই সংগীতের মোহে আকৃষ্ট হইয়া সে অনতিবিলম্বে এক পাঁচালীর দলের মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইল। দলাধ্যক্ষ তাহাকে পরম যত্নে গান শিখাইতে এবং পাঁচালী মুখস্থ করাইতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাহাকে আপন বক্ষ পিঞ্জরের পাখির মতো প্রিয় জ্ঞান করিয়া স্নেহ করিতে লাগিল। পাখি কিছু কিছু গান শিখিল এবং একদিন প্রত্যূষে উড়িয়া চলিয়া গেল।"

রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের গল্পের প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন,—"···একটা স্তর আমরা পাই, যেখানে গল্প তার বস্তুঘনতা বিসর্জন দিতে দিতে প্রায় একটা গান হয়ে ওঠে। যেমন লিপিকা, বোদলেয়ার-এর গদ্য-কবিতা, টুর্গোনিয়েভ্-এর Poems in Prose।

এখানেই বলা যায় যে, গল্প পুরোপুরি কাব্যধর্মী হয়ে উঠল।"[৪৪] 'লিপিকা'র গল্প পূর্ণাঙ্গ কাব্য ; কিন্তু গল্পগুচ্ছে 'অতিথি'র মত গল্প তার বস্তুঘনতা পুরোপুরি বিসর্জন দেয়নি ;— বরং গল্প-বর্ণনাই কাব্যের রসে,—গানের সুর-ব্যঞ্জনায় ফেনিল হয়ে উঠেছে। ওপরের উদ্ধৃত গল্পাংশে সারা অনুচ্ছেদ-এর পরে শেষ ছত্রটি সেই আবহ-প্রাধান্যের এক পরম পরিচয়। বর্ণনার উচ্ছ্বসিত পদ্যায়তির মধ্যে এ আবহের উৎস নয়,—'লিপিকা'র যা একটি প্রধান উপাদান। আগেই বলেছি, এই যথাপরিমিত গল্পের দেহে এই আবহ-প্রাধান্যের দোলা কবি-আত্মার অবচেতন বাসনার একমাত্র সৃষ্টি। সত্তর বছরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আত্মপরিচয় বিবৃত করে কবি বলেছিলেন,—"জীবনের দীর্ঘ চক্রপথ ভ্রমণ করতে করতে নিজেকে নানা খানা করে দেখেছি, নানা কর্মে প্রবর্তিত করেছি, তাতে নিজের কাছে নিজের অভিজ্ঞান আচ্ছন্ন হয়েছে।......আজ বিদায় বেলায় সেই সমগ্র চক্রটিকে যখন সম্পূর্ণ করে দেখতে পেলুম, তখন একটা কথা বুঝেছি, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।"[৪৫]—অর্থাৎ, সৃষ্টির সকল প্রকরণের মধ্য দিয়েই কবি যাকে মুক্তি দিয়েছেন,—সে তাঁর কবি-আত্মা। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথের সকল রচনাই কবি-কর্ম। আর শিল্পীর কবি-আত্মা যেখানে রচনার উপকরণ বা উপলক্ষ্যের সীমায় পূর্ণাঙ্গ মুক্তি পেয়েছে, সেখানে আপনা থেকেই তা হয়ে উঠেছে কবিতা, সুর— গান ; 'অতিথি' গল্পের প্রসঙ্গেও এই কথাই বলা চলে। ওপরের বর্ণনায় কবি যেন তাঁর নিজের অন্তর-চেতনাকেই ধ্যানের গহনলোক থেকে একটু একটু করে টেনে এনে গল্পের দেহে রূপ দিয়েছেন। তারাপদ কবি-আত্মার ছোট-গাল্পিক প্রতিমূর্তি। নিজের শৈশব-স্মৃতি সম্বন্ধে কবি লিখেছিলেন,—"পৃথিবীর সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন, বাড়ির ভেতরের নারিকেল গাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপরকার ছায়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক, ভোর বেলাকার বাগানের গন্ধ—সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণী নানান মূর্তিতে আমায় সঙ্গ দিয়ে ফিরত।[৪৬]

স্পষ্ট বোঝা যাবে, তারাপদ সেই প্রকৃতি-সঙ্গ-তন্ময় কবি-আত্মার প্রোজেক্‌শান্‌। রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-চেতনা তাঁর কবি-আত্মায় এক অলৌকিক সুরের সুরভি সঞ্চার করেছিল। 'অতিথি' গল্পের অপরূপ সুরের আবহ সেই তদাত্ম প্রকৃতি-লীনতারই রস-পরিক্রুতি। কবি নিজেও এই কথা স্বীকার করেছেন,—"বসে বসে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখ্‌ছি—খুব একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। একটু একটু করে লিখ্‌ছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া, আলোক, বর্ণধ্বনি আমার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে সকল দৃশ্য,

৪৪। 'গল্পগুচ্ছ'—বুদ্ধদেব বসু—'রবীন্দ্রনাথ : কথা সাহিত্য'।
৪৫। 'অবতরণিকা'—রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথম খণ্ড।
৪৬। রবীন্দ্রনাথের পত্র দ্রষ্টব্য :—অজিত চক্রবর্তী—'রবীন্দ্রনাথ'।

লোক ও ঘটনা কল্পনা করছি, তারই চারিদিকে এই রৌদ্রবৃষ্টি, নদীস্রোত এবং তীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারা-প্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে ও সৌন্দর্যে সজীব করে তুলেছে।···আমার গল্পের সঙ্গে যদি এই মেঘমুক্ত বর্ষাকালের স্নিগ্ধ রৌদ্ররঞ্জিত ছোট নদীটি এবং নদীর তীরটি, এই গাছের ছায়া, এবং গ্রামের শান্তিটি এমনি অখণ্ডভাবে তুলে দিতে পারতুম তাহলে সবাই তার সত্যটুকু একেবারে সমগ্রভাবে একমুহূর্তে বুঝে নিতে পারত।"[৪৭] প্রাণকে প্রকৃতির গভীরে ডুবিয়ে চোখে-দেখা জীবনের প্রচ্ছদে কবি এই গল্পের ছবি এঁকেছেন। 'পোস্টমাস্টার' গল্পের বর্ণনায় প্রকৃতি স্বরের দোলা রচনা করেছিল, দেখেছি। প্রকৃতি সেখানে পোস্টমাস্টারের নিঃসঙ্গ জীবনের সহচর। কিন্তু 'অতিথি' গল্পে তারাপদ-র ভিতরে-বাহিরে প্রকৃতি। কবির ভাষায় এই গল্পের সকল দৃশ্য, লোক ও ঘটনা-কল্পনা চারদিকের রৌদ্রবৃষ্টি নদীস্রোত ইত্যাদির দ্বারা সত্যে ও সৌন্দর্যে সজীব হয়ে উঠেছে। মানুষ ও প্রকৃতির হৃদয়কে অভিন্ন-করা এই সজীব শক্তির রহস্য-সুন্দরতা 'অতিথি' গল্পে অসীম অনন্তের সুর-ব্যঞ্জনা বিস্তাবিত করে দিয়েছিল। ঐটুকুই গল্পের সর্বস্ব,—তাই গল্পটি আগাগোড়া সংগীত-রসময়,— আবহ-প্রধান।

'অতিথি' গল্পের এই আবহময় ঝংকার কবি-চেতনার প্রকৃতি-তন্ময়তার দান। খুব স্থূলভাবে 'আপদ' গল্পের নীলকান্ত এবং 'অতিথি'র তারাপদ-র মধ্যে অবস্থাগত সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই ঘরছাড়া যাত্রাদলের দু'টি দরিদ্র বালক বড়লোকের ঘরে আশ্রয় পেয়েছিল। কিন্তু নীলকান্তের মধ্যে প্রাণের অপার বিস্তার ছিল না; বরং বাতাহত মানব-চিত্ত সেখানে কিরণের সস্নেহতার আশ্রয়ে দুর্বল লতার মত বেড়ে উঠতে চাইছিল। সেই আশ্রয়চ্যুত হয়ে নীলকান্তের 'আত্মবিলোপ' গল্পের সহজ বর্ণনার বৃন্তে কারুণ্যের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু 'অতিথি' গল্পের রস-পরিস্রুতি 'মেঘ' কাব্যের সঙ্গে বা 'ডাকঘর' নাটকের সঙ্গে তুলনীয়, এখানে করুণার মধ্যে ছড়িয়ে থাকে সমুদ্রের ব্যাপ্তি, বিষণ্ণতাকে ছাপিয়ে ওঠে উদাস-মধুর অন্তহীনতার মন-কেমন-করা অনুভব। নীলকান্তের শূন্যতা কখনো ঘোচেনি, তার পরিবেশের দারিদ্র্য তাঁকেও দরিদ্র, লোভাতুর করেছিল। কিন্তু প্রকৃতির আনন্ত্য এবং অতলস্পর্শতা তারাপদকে করেছিল পরিপূর্ণ। তাই সে ছিল সর্বাতিক্রমী। আত্ম-উৎক্রান্তির এই অসীমাভিসার গল্পটিতে, তথা তারাপদ-র জীবনেও নীহারিকালোক থেকে ভেসে-আসা সুরের আবহ সৃষ্টি করেছে। এই কারণেই 'আপদ' গল্পের রসাবেদন উপাখ্যান-শরীরের সীমা পার হতে পারেনি; অথচ 'অতিথি' নির্বন্ধন দূরযানিতার রূপ-প্রকরণে আগাগোড়া আবহ-উড্ডীন হয়ে উঠেছে।

৪৭। রবীন্দ্রনাথ—'ছিন্ন পত্র'—পত্র সংখ্যা ১৪৪।

'অতিথি' গল্পের আবহ-প্রাধান্য কবির প্রকৃতি-ভাবুকতার ফল। কিন্তু সকল গল্পেই একই রকমের আঙ্গিক অনুসৃত হয়নি। 'একরাত্রি' গল্পে বর্ষণ-আকুল ঝড়ের রাতের নিসর্গ-সংহতি পরিণামী আবহ রচনায় সহায়তা করেছে। যেখানে এক ভাঙা স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টারের জীবনে তার 'পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটিমাত্র রাত্রিই তার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা' সম্পাদন করেছে। গল্পের দীর্ঘ প্রথম অংশ প্রধানত বর্ণনা-নির্ভর; কেবল শেষের ছোট-বড় এগারটি অনুচ্ছেদের পরিবেশ-বর্ণনা ধাপে ধাপে ঘনীভূত হয়ে আখ্যানের ওপরে সুরের আবরণ রচনা করেছে,—ধীরে ধীরে গল্পাংশের প্রাধান্য ক্রমস্ফীত সেই আবহ প্রবাহের অতলে নিজেকে বিলীন করে দিয়েছে। 'অতিথি' গল্পের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত নিসর্গপ্রাণের আবহ-দোলায় চঞ্চল,—'একরাত্রি'-তে প্রথমভাগের ব্যাপক বর্ণনা পরিণামে ভাব-কম্পিত সুর বিলীন হয়েছে।

এই শ্রেণীর আবহ-প্রধান গল্পের পর্যায়ে আরো উল্লেখ করতে হয় 'কঙ্কাল,' 'জীবিত ও মৃত,' 'জয়পরাজয়', 'বিচারক,' 'নিশীথে,' 'ক্ষুধিত পাষাণ,' 'দুরাশা' ইত্যাদি রচনা। এদের মধ্যে এক 'দুরাশা' ছাড়া আর কোথাও প্রাকৃতিক পরিবেশ, তথা নিসর্গ-প্রাণের একান্ত প্রভাব নেই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এ-কথা স্পষ্ট অনুভব করা উচিত, রবীন্দ্রনাথের আবহ-প্রধান গল্পগুলিতে তাঁর অন্তর্লীন কবি-প্রকৃতিই একাধারে স্রষ্টা এবং সৃষ্টিরও বিষয়। সকল সার্থক সৃষ্টিতেই শিল্পীর মনের অব্যবহিত সংযোগ অনিবার্য। আর রবীন্দ্রনাথের মন-প্রকৃতি বিশেষভাবে কবিত্ব-ধর্মী, তাঁর সকল রচনাতেই একটি স্ফুট-অস্ফুট কাব্য-স্বাদুতা রয়েছে। এই গুণে 'গল্পগুচ্ছ' প্রথম-দ্বিতীয় খণ্ডের ছোটগল্প অন্যান্য বাংলা ছোটগল্পের চেয়ে স্বভাবতঃ পৃথক। 'শাস্তি' ও 'নারীর মন' গল্পের তুলনা-প্রসঙ্গে এ-কথার ইঙ্গিত করেছি। কিন্তু আবহ-প্রধান বলে যে-কয়টি গল্পের পর্যায়-বিভাগ করছি তাতে যে-কোনো উপলক্ষ্যে আসলে রবীন্দ্রনাথের মৌল কবি-প্রকৃতির স্বাদুতাই একান্ত অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। ভাষান্তরে এই সব গল্পকেই সমালোচকেরা 'কাব্যধর্মী', 'গীতিধর্মী' ইত্যাদি বিশেষণ দিয়েছেন। এই কাব্য বা গীতিধর্মের বিশেষিত দোলা কোথাও রচিত হয়েছে নিসর্গ-প্রাণের স্পন্দনে,—কোথাও বা মুহূর্তের প্রাকৃতিক ঘনঘটার আলোড়নে। অন্য আরো কোথাও সেই সুরের সিম্‌ফনি সৃষ্টি করেছে রোমান্স-মেদুর রহস্যময়তা, মিষ্টিসিজম্-এর ব্যঞ্জনা,—কোথাও বা বিশেষজ্ঞেরা যাকে বলেছেন 'অতিপ্রাকৃত'—তারই দোলা। ওপরে লিখিত গল্পসমষ্টিতে একই প্রেরণার ব্যবহৃত বিচিত্র হাতিয়ারের কারুকর্ম লক্ষ্য করব।

'কঙ্কাল' গল্পটি আসলে বিবৃতিমূলক প্রেমের গল্প। কিন্তু তার চারপাশে কবি যে রোমাঞ্চকর রহস্য-পরিবেশ রচনা করেছেন, তারই বিচ্ছুরণ মনের গহনে ভাবের সুরমূর্তিকে ধাপে ধাপে গড়ে তুলেছে। গল্পটির শুরু থেকে সারা পর্যন্ত একটা ভূতুড়েপনার অনুভব

ছড়িয়ে আছে। তা সত্ত্বেও এই গল্পকে অতিপ্রাকৃত-প্রধান বলতে বাধে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অতিপ্রাকৃত-প্রধান রবীন্দ্র গল্পের আলোচনায় এর উল্লেখ করেননি।[৪৮] ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত একই প্রসঙ্গে আলোচ্য গল্পের উল্লেখ করলেও তার চৈতন্যময় রূপানুভবের কথাই বলেছেন :—"কঙ্কাল গল্পটিতে দেখিতে পাই যাহাকে লইয়া ডাক্তারেরা অস্থিবিদ্যা শিখিতেছে তাহার চারিদিকে একটি প্রাণবান আত্মা ঘুরিয়া বেড়ায়; তাহার অনুভবের শক্তি আছে, সে মানুষের মত গল্প করিতে ভালবাসে। সে শ্মশানের মধ্যে হুহু করিয়া বেড়ায়, কিন্তু মানবজীবনের সুখ-দুঃখের কথা তাহার মনে আছে।"[৪৯] 'কঙ্কাল' -এর সেই অপরূপ যুবতীর কণ্ঠে তার পূর্ব-প্রণয়ের কাহিনী এমন আবেগ ও উত্তাপের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, তাতে প্রত্যক্ষদর্শনের চঞ্চলতায় শরীরী পাঠকের শিরা-উপশিরাও আন্দোলিত হয়ে ওঠে। প্রেমের আকাঙ্ক্ষা, রূপের উল্লাস, ব্যর্থতার ক্ষোভ ও আক্রোশ, রিক্ততার দীর্ঘশ্বাস, সব কিছু মিলে আজকের কঙ্কালের অস্থিময় প্রত্যেক সন্ধিবিন্দুর রন্ধ্রপথে সুদূর যুবতী-জীবনের জীবন্ত সৌরভ যেন চারদিক থেকে ভেসে ছুটে এসেছে। এই রহস্য-মগ্ন সৌন্দর্য-মাধুর্যের মুখোমুখি বসে গল্প-বলিয়ের বাস্তব পরিচয় আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা জাগে না।—কেবল মনে হয়, —"স্বপ্ন নু, মায়া নু, মতিভ্রমো নু বা।" এই দেহহীন চেতনার মধুময় সুরভিই সারাটি গল্পের প্রণয়-কথার মর্মে-মর্মে সুরের আবহ বইয়ে দিয়েছে। 'কঙ্কাল' রোমান্টিক নয়, 'সুপার ন্যাচার্যাল'ও নয়; মরদেহে 'দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাসে'র স্বাদুতায় লীলাতরঙ্গিত।

'জীবিত ও মৃত' গল্পের পরিবেশও আবহময় রহস্যে করুণ। অবশ্য এই রহস্যাচ্ছন্নতা রোমান্টিক কলাশৈলীর সীমা অতিক্রম করতে পারেনি। তাহলেও রোমান্স-এর অমৃত চোখে-দেখা জীবনের রহস্য-সিন্ধু মন্থন করা। মৃত্যুর পরপার আমাদের কাছে অপার রহস্যাচ্ছন্ন,—জীবনের এপারও তার চেয়ে খুব কম নয়। তাই এপার থেকে ওপারে উঁকি-ঝুঁকি দেবার কৌতূহল মানুষের চিরকালীন প্রবৃত্তিরই একটি। দৈবাৎ কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনায় জীবন-মৃত্যুর সচেতন সীমারেখাটা যদি আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তেমন পরিবেশে দাঁড়িয়ে আত্ম-জ্ঞানহীন মানুষের আত্ম-সন্ধানের রহস্য-করুণ এক ছবি এঁকেছেন কবি কাদম্বিনীর মধ্যে। কাদম্বিনীর মৃত্যুতুল্য অসাড়তায় বাস্তবতার অভাব নেই কোথাও; বরং সেকালের য়ুরোপে এরকম একাধিক ঘটনা প্রায় একই সময়ে ঘটেছিল। এই অল্পদিন আগেও জানা গেছে, মধ্য-ভারতের একটি বৃদ্ধার দেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় হঠাৎ সে সপ্রাণ হয়ে উঠে হেঁটে বাড়ি ফিরে যায়। অতএব গল্পের মূল দুর্ঘটনাটির

৪৮। দ্রষ্টব্য :—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প'—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। ৪৯। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—'রবীন্দ্রনাথ'।

কোথাও অ-প্রাকৃত কিছু নেই। তারপরে, বর্ষণাকুল নির্জন শ্মশানের অন্ধকারে সদ্য জেগে উঠে কাদম্বিনীর মধ্যে যে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা জেগেছিল, তাতেও অস্বাভাবিকতা নেই কোথাও। আত্মপরিচয়ের অসীমতায় মানুষ অপরূপ! নিজের চেতন মনেও নিজের নিঃশেষ পরিচয় তার জানা নেই। এমন অবস্থায় হঠাৎ-আসা অবচেতনার মধ্যে জীবনের খেই হারিয়ে ফেলেছিল কাদম্বিনী। তারপরে নিজের কার্যকরণ-বুদ্ধি দিয়ে জীবনের দুই চেতন ভারে আর কিছুতেই জোড়া মেলাতে পারছিল না। নিজেকে নিয়ে মানুষের এই অসহ্য সমস্যা ও নিরুত্তর জিজ্ঞাসার যন্ত্রণাকে কবি রোমান্সের স্বপ্ন-দোলায় তরঙ্গায়িত করে দিয়েছেন। শ্মশানে জ্ঞান ফিরে পেয়ে কাদম্বিনীর প্রথম মনে হয়েছিল, সে ভূত হয়ে গিয়েছে। অনেক ভাবনায় নিজের সম্বন্ধে কিছু ঠিক করে উঠতে না পেরে অন্ধকারে বহুকষ্টে পথ চলছিল কাদম্বিনী। ক্রমে ভোরের আলো একটু একটু দেখা দিতে লাগল, দূরে লোকালয়ে বাঁশের ঝাড়ে একটি দুটি পাখি ডাকতে লাগল। "তখন তাহার [কাদম্বিনীর] কেমন ভয় করিতে লাগিল। পৃথিবীর সহিত, জীবিত মনুষ্যের সহিত এখন তাহার কিরূপ নূতন সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে সে কিছু জানে না। যতক্ষণ মাঠে ছিল, শ্মশানে ছিল, শ্রাবণ-রজনীর অন্ধকারের মধ্যে ছিল, ততক্ষণ সে যেন নির্ভয়ে ছিল, যেন আপন রাজ্যে ছিল। দিনের আলোকে লোকালয় তাহার পক্ষে অতি ভয়ংকর স্থান বলিয়া বোধ হইল। মানুষ ভূতকে ভয় করে, ভূতও মানুষকে ভয় করে, মৃত্যু-নদীর দুই পারে দুইজনের বাস।"

যার ভাগ্যে এপার গেছে, ওপারও মেলেনি,—'যে জন আছে মাঝখানে', সেই মানুষের অসহনীয়তার বেদনাকে এপারের অনুভূতি-লোকে বিচ্ছুরিত করে দিয়ে সুরের ফুলঝুরি খেলেছেন কবি। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের কবি-আত্মা বস্তু-রূপের মধ্য দিয়েই বস্তু-স্বরূপের চৈতন্য-লোকের অভিসারী। এই কবি-স্বভাব যেখানে গল্পের আধারে পূর্ণ মুক্ত, সেখানে গল্পের মধ্যেও চেতনার কিরণ স্বপ্ন-কম্পিত হয়ে উঠেছে। যেমন করেই রচিত হোক, এই চৈতন্য-কিরণ-কম্পনই আবহ-প্রধান রবীন্দ্র-গল্পের প্রাণ।

'জয় পরাজয়' গল্প যেন গল্প নয় কবিতা। এর ভাষায় 'লিপিকা'র আবেশভরা তরঙ্গ-স্পন্দন নেই। কিন্তু পরিবেশ ও ভাবমধুরতায় এ-গল্প 'লিপিকা'রই যেন সগোত্র। অধ্যাপক প্রমথ বিশী মনে করেছেন, সমকালীন বিদগ্ধ সমাজে অকারণ-নিন্দিত কবি নিজে তাঁর মানস সুন্দরীর হাতের প্রসাদ ও জয়মাল্য গ্রহণ করেছেন শেখর-কবির স্বপ্নোচ্ছ্বসিত অন্তিম প্রাপ্তির মাধ্যমে। এ বর-প্রার্থনা ও বরলাভ কেবল রবীন্দ্রনাথের নয়,—সকল কালের সকল কবির,—সকল মানুষের। প্রতিদিনের জীবনাচরণে আত্ম-বঞ্চিত মানুষ প্রতি নিভৃত মুহূর্তের কামনায় নিজ জীবন-লক্ষ্মীর হাতে এই অন্তিম অথচ অনন্ত দাক্ষিণ্যলাভের স্বপ্ন দেখে। আধুনিক পৃথিবীর নোংরা 'গলিতে বাস' করেও যে কবি

'জন্ম-রোমান্টিক',—তাঁর চিরদিনের স্বপ্ন ছিল, "আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।" বস্তুতঃ কি কবিতায়, কি গল্পে-প্রবন্ধে, তাঁর রোমান্টিক পিপাসা নির্বন্ধন মুক্তি পেয়েছে কেবল কালিদাসের যুগেই পৌঁছে গিয়ে। এখানেও সেই সংস্কৃত রোমান্টিক কাব্যের জীবন-প্রচ্ছদ কবির এক হাতের কলমকে একশ রসের ধারায় যেন বইয়ে দিয়েছে। অতীতচারী এই স্বপ্ন-পরিবেশের সুযোগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই কবিতার সুর ছড়িয়ে দিয়েছেন গল্পের অঙ্গে অঙ্গে। কবি-মনের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা চিরকালের আকাশে শাশ্বত মানব-বাসনার গান হয়ে বেজেছে। 'জয় পরাজয়' গল্পের-তারে-বাঁধা গান;—তারকে বাদ দিয়ে তানপুরায় সুর জাগে না, কিন্তু তারকে ছাড়িয়ে যায় তান! 'জয় পরাজয়'-এও ছোটগল্পের শরীরে গান জেগেছে,—একই ভাবে গল্প-শরীরকে সে গানের আবেদন ছাড়িয়ে গেছে অনেক দূরে।

'দুরাশা' গল্পেও গানেরই সুর! ক্যালকাটা রোড্-এর কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্য-স্বপ্নকে চিরকালের মানব-বেদনার গহন পাতালে অগ্নিধারায় সিঞ্চিত করেছেন কবি। মানব-অনুভবের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি—

"যাহা চাই, তাহা ভুল করে চাই।
যাহা পাই তাহা চাই না॥"

চিরন্তন মানব-মনের এই করুণ রাগিণী গল্পের পৃষ্ঠায় নবরূপ পেয়েছে বদ্রাওনের নবাব-পুত্রীর কণ্ঠে: "হায় ব্রাহ্মণ, তুমি তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।" ট্রাজেডি-তপ্ত জীবনের এই আর্ত জিজ্ঞাসা নাটকীয় সাংকেতিকতায় ভরে উঠেছে পরবর্তী বর্ণনায়: "এই বলিয়া রমণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'নমস্কার বাবুজি'।

"মুহূর্ত পরেই যেন সংশোধন করিয়া কহিল, 'সেলাম বাবু সাহেব।' এই মুসলমান অভিবাদনের দ্বারা সে যেন জীর্ণ-ভিত্তি ধূলিশায়ী ভগ্ন ব্রাহ্মণ্যের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিল। আমি কোনো কথা না বলিতেই সে সেই হিমাদ্রি শিখরের ধূসর কুজ্ঝটিকারাশির মধ্যে মেঘের মত মিলাইয়া গেল।"

গল্পের শেষে এইটুকুই গান—এখানে মনে হয় গল্প যেন 'শেষ হয়ে হইল না শেষ।' শেষ মুহূর্তে বদ্রাওনের নবাব-কন্যা জীর্ণ ব্রাহ্মণ্যের সঙ্গে নিজের এক যৌবন-জীবনের ব্যর্থ সাধনার কাছেও যে শেষ বিদায় নিয়ে গেল 'তার শেষ কোথায়, কি আছে শেষে!' এর পরেও দীর্ঘ অভ্যস্ত জীবনের অচরিতার্থ বাসনা ও নৈরাশ্যের কাছে এমনি বিদায় নিতে নিতে তার জীবন কাটবে কী করে? সেই উত্তরহীন জিজ্ঞাসা গল্পের মধ্যে করুণ

ভৈরবী রাগিণীর মতো ঘুরে ফিরেছে ক্যানকাটা রোড্-এর হঠাৎ নব-রৌদ্র-চকিত পরিবেশেও,—কবির মনে মনে। তখনো এবং এখনো, "একটি সুকুমার রমণী দেহে ব্রাহ্মণ-মুসলমানের রক্ত-তরঙ্গের বিপরীত সংঘর্ষ-জনিত বিচিত্র ব্যাকুল সংগীতধ্বনি সুন্দর সুসম্পূর্ণ উর্দুভাষায় বিগলিত হইয়া আমার [পাঠকের-ও] মস্তিষ্কের মধ্যে স্পন্দিত হইতে লাগিল।" এইটুকুই 'দুরাশা' গল্পের চরম ফলশ্রুতি।

এ পর্যন্ত আলোচিত আবহ-প্রধান গল্প কয়টির সম্পর্কে একটা কথা এখানে স্পষ্ট করে নিতে হয়,—বিশেষ করে 'কঙ্কাল', 'জীবিত ও মৃত' এবং 'দুরাশা' গল্প সম্বন্ধে। এ-সব গল্পে শরীরী অংশের পরিমাণ যেন কম! রক্তমাংসময় জীবনের প্রতপ্ত, সূক্ষ্ম-অথচ-বাস্তব অনুভব রয়েছে; কিন্তু যে-মানুষটির ভাবনা ও বেদনা শুধু মর্মস্পর্শী নয় প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-ও, তাকে কোথাও যেন পাঞ্চ-ভৌতিক দেহের সীমায় কিছুতেই ধরা যায় না; ধরতে গেলে একমুঠো পারদের মত বারে বারে হাত গলিয়ে বেরিয়ে যায়। এই কারণেই এই গল্পগুলির সম্বন্ধে কেমন যেন অতিলৌকিকতা-বোধের বিস্ময় থেকে যায়, যাকে অতিপ্রাকৃত অনুভূতি বলে ভুল করতেও বাধা নেই। কিন্তু আসলে এগুলো অতিপ্রাকৃত তো নয়ই, বরং নিছক স্বাভাবিক! আমাদের দেশে কাব্যরসকে 'লোকোত্তর আনন্দ' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, তাঁর কবি-মনোবাসনার পক্ষে একথা বিশেষ অর্থে সত্য। একেবারে বালক বয়স থেকেই বাস্তব জীবনের কঠিন মাটিতে কখনোই কবি চেপে বসতে পারেন নি। প্রথম বয়সে তাঁর পারিবারিক পরিবেশ ও 'ভৃত্য-রাজক'-জীবন এ-বিষয়ে প্রধান বাধা হয়েছিল। অথচ সুন্দর-পিপাসু কবি-শিশুর মনের সঙ্গে তাঁর ইন্দ্রিয়গ্রামও পৃথিবীর রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময়তার প্রতি টেনে-বাঁধা তারযন্ত্রের মত কাতরতা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়েছিল। পৃথিবীর রূপময় সৌন্দর্য কবির ইন্দ্রিয়গ্রামকে পুলকিত করেছে, তাঁর মনকে করেছে আবেশ-বিহ্বল। অথচ রূপলোকের একেবারে গভীরে নেমে গিয়ে সেই অমৃতরস আস্বাদন করবার উপায় ছিল না কবি-ব্যক্তির। তাই দশ-ইন্দ্রিয়ের দশ দ্বারে আকণ্ঠ রূপ-সুরভি পান করে নিজ মনের অরূপলোকে পৌঁছে গিয়ে তবেই তিনি তাকে উপভোগ করতে পেরেছেন। যে-কবি সৌন্দর্যের দ্রষ্টা, তিনি আমাদের চোখে-দেখা জীবনের নিত্যসঙ্গী; কিন্তু ভোক্তা যিনি, তাঁর বাস ভাবাদর্শময় কল্পলোকে—এক আইডিয়া-ময় জগতে! 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে শরীরী অনুভবের এই অশরীরী আস্বাদনের প্রথম শিল্পরূপ। পরবর্তী কাব্য-গল্প-উপন্যাসেও দেখি প্রেমের রক্তিমা ও উত্তাপ আছে,—কিন্তু রক্তমাংসের শরীরী প্রিয়া অনুপস্থিত। ফলে, রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতাবলী এক ইন্দ্রিয়-নির্ভর-হয়েও অতীন্দ্রিয়তার রহস্যে ভরপুর হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ যেখানে সহজমুক্ত কবি, সেখানে সকল

অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়লোকের বস্তুগ্রাহ্যতা নিয়ে অতীন্দ্রিয় রহস্যলোকে তিনি অবগাহন করেছেন। ফলে, এক বস্তু-নির্ভর নির্বস্তুকতা, লোকায়ত জীবন-বিলগ্নী অলৌকিকতার সৌরভ ছড়িয়ে আছে তাঁর বহু রচনায়। ওপরে আলোচিত গল্প-কয়টির মধ্যে কবির সেই সহজ মনের স্পর্শ যে লেগেছে, একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন পৃথক পৃথক ভাবে। ঠিক এই বিশেষিত কবি-প্রাণ-সঞ্জীবনের জন্যেই এই গল্পগুলিকে কেমন লৌকিক হয়েও রহস্যময়, অ-প্রাকৃত না হলেও অতি-প্রাকৃতের আবেশভরা বলে মনে হয়। এই শিল্প-প্রকরণেরই চরম প্রকাশ ঘটেছে 'ক্ষুধিত পাসাণ'-এর মত সব গল্পে, যাদের বিশেষভাবে বলা হয়েছে অতিপ্রাকৃত-প্রধান গল্প। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই সৃজন-শৈলীর প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন স্পষ্ট ভাষায় : "রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য কুহক বলে আমাদের অতি পরিচিত গৃহাঙ্গনের মধ্যেই অতি-প্রাকৃতকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন এবং নৈসর্গিকের সীমা ছাড়াইয়া একপদও অগ্রসর হন নাই।"[৫০]

এই প্রসঙ্গে সাহিত্যে প্রাকৃত-অতিপ্রাকৃত সৃষ্টির পরিচয় নির্ধারণ করতে হয়। প্রাকৃত অর্থে সাধারণভাবে বুঝি 'প্রকৃতিসিদ্ধ, স্বাভাবিক'।[৫১] কিন্তু অতি-প্রাকৃত বলতে অন্তত আলঙ্কারিক অর্থে অস্বাভাবিক বোঝায় না। বাংলা ভাষায় এই দুইটি শব্দ যথাক্রমে ইংরেজি 'natural' এবং 'super-natural'-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। Unnatural এবং super-natural-এর ধারণাগত তফাৎ আছে ইংরেজি ভাষায়; সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরাও অ-প্রাকৃত এবং অতি-প্রাকৃত শব্দ দুটিকে সমার্থে ব্যবহার করার ভুল যেন না করি। প্রাকৃত, অ-প্রাকৃত এবং অতি-প্রাকৃত কথা তিনটির অর্থগত বিভেদ বিশ্লেষণের আগে প্রাকৃত, অর্থাৎ 'প্রকৃতিসিদ্ধ' কথাটির ব্যাখ্যা প্রথমে প্রয়োজন। মানব-প্রকৃতির সবটুকুই আমাদের জানা নেই। বহু যুগের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং নিজেদের বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ করে এবিষয়ে একটা নির্ভরযোগ্য সাধারণ ধারণামাত্র আমরা গড়ে তুলতে পেরেছি। সেই সর্বজনস্বীকৃত সাধারণ ধারণা ও বিশ্বাসের সঙ্গে যা মেলে, তাকেই বলি প্রাকৃত, প্রকৃতি-সিদ্ধ, স্বাভাবিক। যে সব বিষয় স্পষ্টত সেই ধারণা-বিশ্বাসের বিপরীত এবং বিরোধী, তাকেই বলি অ-প্রকৃত, অস্বাভাবিক। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথের 'দেনা পাওনা' গল্প স্বাভাবিক, কিন্তু রূপকথার ভূতের গল্প অ-প্রকৃত, অবাস্তব, অস্বাভাবিক। মানুষের মনোলোকে অতি-প্রাকৃতের অবস্থান প্রাকৃত ও অ-প্রাকৃত-চেতনার মধ্যবর্তী রহস্যভূমিতে। যাকে প্রাকৃত বলে নিঃসন্দেহে মানতে পারি না, কিন্তু অ-প্রাকৃত বলে উপেক্ষা করতেও বাধে, দোটানায় পড়ে মন কেবল অনিশ্চয়তা-চঞ্চল

৫০। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' :—'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (৩য় সং)। ৫১। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গীয় শব্দকোষ'।

হয়ে ওঠে এমন রহস্য-মেদুর লেখাকে বলি অতি-প্রাকৃত। অতি-প্রাকৃত রস-রচনার স্বজন-ভূমি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দোলাচল বৃত্তির একেবারে গভীরে।

আগে বলেছি, আমাদের প্রাকৃতজ্ঞান হচ্ছে মানব-প্রকৃতির স্বভাবধর্ম সম্বন্ধে যুগসঞ্চিত জ্ঞান-বিশ্বাস ও বিচার-বিবেচনার ফল। কিন্তু সভ্যতার এই সুদীর্ঘ পথযাত্রার শেষেও মানুষের সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ক্রান্তদর্শী হয়ে ওঠেনি। ফলে, জীবনের চরমমুহূর্তে নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান বুদ্ধি ভরসা হারিয়ে ফেলে' অসম্ভবকেও সম্ভব বলে মনে হয়। এক অনির্বাচ্য চেতনাচ্ছন্নতার মধ্যে অবিশ্বাস্যকেও বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না। আর যে মনোভূমিতে দাঁড়িয়ে আমরা এমন অনুভূতিকে স্বীকার বা উপভোগ করি, তা আমাদের চিরপরিচিত জীবন ও জগতের সামাকে ছাড়িয়ে একটু ঊর্ধ্বে, কোনো এক স্বপ্নলোকের কাছাকাছি যেন অবস্থিত। তার প্রতি তাকিয়ে রহস্য-কম্পিত ভাবনায় মনে হয়, এ যেন 'পরস্য ন পরস্যেতি, মমেতি ন মমেতি চ।'

অতএব, অতি-প্রাকৃত শিল্পীর পক্ষে প্রথম প্রয়োজন সেই রহস্যময় জীবনভূমি ও মনোলোকের প্রচ্ছদ রচনা। ঐটুকুর অভাবে অতি-প্রাকৃত-প্রসঙ্গ অ-প্রাকৃত হয়ে পড়ে —রূপকথার ভূতের গল্পের মত। এই কারণেই অতি-প্রাকৃত শিল্পায়নের সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও কষ্টসাধ্য বুনন ঐ প্রচ্ছদের। কোল্‌রিজ-এর মত ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত সুপার-ন্যাচারালিস্ট্‌ কবি-ও এই প্রয়োজন সাধনের জন্য পাঠককে 'অনৈসর্গিক' প্রেতলোকে নিয়ে গেছেন। কিন্তু 'ক্ষুধিত পাষাণে'র শিল্পী প্রাকৃত জীবনের চল্‌তি ভূমিতে অ-প্রাকৃতের ভূমিকা রচনা করেছেন। ট্রেন আসা-যাওয়ার ব্যস্ততার মধ্যে স্টেশনের বিশ্রামাগারে গল্পের জন্ম এবং আবার এক ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আকস্মিক সমাপ্তি। তার মাঝখানে কত স্বপ্ন, কত রহস্যের জালবোনা, ভয়-ভাবনা-কৌতূহলের কত উত্তাপ, হৃদ্‌যন্ত্রের কত দ্রুত এবং কত লঘু উত্থান-পতন, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কত দোলাচল বৃত্তি! অথচ অত কিছুর পরেও 'অন্তরে অতৃপ্তি' রয়ে যায়,—মনে হয় 'শেষ হয়ে হইল না শেষ।'

রবীন্দ্রনাথের এই অভিনব শিল্প-প্রকৃতির মূলে ছিল তাঁর উৎক্রান্তিময় (transcendental) কবি-স্বভাব। বস্তুজগতের অপার বিস্তারের মধ্যে থেকেও অনায়াসে তা বস্তুত্তর জীবন-ভূমিতে সচেতন পরিক্রমা করে ফিরেছে। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পও ব্যক্ত-কবির চেতনাভিসারের অনুভব আর স্মৃতি দিয়ে গড়া। এই কারণেই গল্পটি এমন অপরূপ সার্থক —কেবল তার ইন্দ্রিয়ানুগ-হয়েও-ইন্দ্রিয়াতীত রহস্যব্যঞ্জনার দরুন। এইটুকুকেই আমরা বলেছি গল্পের আবহপ্রাধান্য। কবি-কথায় সেই আবহ-উৎসের পরিচয় দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করব—সতেরো বছর বয়সে প্রথম বিলেতে যাবার মুখে কিছুদিন তিনি আমেদাবাদ-এ

ছিলেন 'মেজদা' সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে। 'মেজদা' সেখানকার জজ,—জজের বাসাবাড়ি ছিল বাদশাহী প্রাসাদ শাহিবাগে। দুপুরবেলা কবি একলা বাড়িতে থাকতেন; বড় বড় ফাঁকা ফাঁকা ঘরগুলোতে 'ভূতে পাওয়ার মতো' ঘুরে বেড়াতেন। "সামনে প্রকাণ্ড চাতাল, সেখান থেকে দেখা যেত সবরমতী নদী হাঁটুজল লুটিয়ে নিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে বালির মধ্যে। চাতালটার কোথাও কোথাও চৌবাচ্চার পাথরের গাঁথনিতে যেন খবর জমা হয়ে আছে বেগমদের স্নানের আমিরিআনার।" এমন অবস্থায় "মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল ক্ষুধিত পাষাণের গল্পের।" কবির মনে হয়েছিল,—'সে আজ কত শত বৎসরের কথা। নহবতখানায় বাজছে রসনচৌকি দিনরাত্রে অষ্ট-প্রহরের রাগিণীতে, রাস্তায় তালে তালে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠছে, ঘোড়সওয়ার তুর্কি ফৌজের চলেছে কুচকাওয়াজ, তাদের বর্শার ফলায় রোদ উঠছে ঝক্‌ঝকিয়ে। বাদ্‌শাহি দরবারের চারদিকে চলেছে সর্বনেশে কানাকানি ফুসফাস। অন্দরমহলে খোলাতলোয়ার হাতে হাব্‌সী খোজারা পাহারা দিচ্ছে। বেগমদের হারামে ছুটছে গোলাপ জলের ফোয়ারা, উঠছে বাজুবন্ধ-কাঁকনের ঝন্‌ঝনি। আজ স্থির দাঁড়িয়ে শাহিবাগ, ভুলে-যাওয়া গল্পের মত।'[৫২] শাহিবাগের বিবর্ণ পাণ্ডুরতার উপরে দাঁড়িয়ে সেই ভুলে-যাওয়া গল্পকে আবার জাগিয়ে তুলেছেন কবি।

'নিশীথে' গল্পটিতেও একই কবি-মনোধর্ম সফল রূপ পেয়েছে।[৫৩] এই গল্পের পেছনে যে প্রাকৃত মানবিক অনুভব রয়েছে, 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে তার সুন্দর প্রকাশ। প্লট্‌-এর কাঠামোতেও এ দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। সন্তানহীনা রোগশীর্ণা প্রথমা স্ত্রী স্বামীকে আবার বিয়ে দিয়ে ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ নূতন চরিতার্থতা দিতে চেয়েছিল। 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে অনেক সুখ-দুঃখ মন্থনের পরে দ্বিতীয়া স্ত্রী শৈলবালার মৃত্যুশেষে একদিন নিশুতি রাতে নিবারণ এসে নিঃশব্দে প্রথমা পত্নী হরসুন্দরীর শয্যায় চুপ করে শুয়ে পড়ল। "হরসুন্দরীও একটি কথা বলিল না। নিবারণও একটি কথা বলিল না। উহারা পূর্বে

৫২। রবীন্দ্রনাথ—'ছেলেবেলা'।

৫৩। শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় 'নিশীথে' গল্পের সঙ্গে এডগার অ্যালান পো-র 'লিজিয়া' (Ligeia) নামে চমৎকার গল্পটির 'গভীর সাদৃশ্য' খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মতে "দুই গল্পের বিষয়বস্তুর মধ্যে বেশ ঐক্য আছে, এবং ভাষার দিক দিয়েও কোন কোন জায়গায় মিল খুঁজে পাওয়া যায়।"—সে মিল যে দূরান্বিত তা শ্রীমুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী আলোচনা থেকেও বোঝা যায়। গল্পবস্তু এবং গল্পরসে দুই শিল্পীর ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্যের ছাপ সকল সংশয়ের অতীত। রবীন্দ্রনাথ পো-র গল্পটি পূর্বাবধি পড়েছিলেন হয়ত; কিন্তু 'নিশীথে' গল্প 'দেহে আর মনে প্রাণে' তাঁর কবি-আত্মারই মৌলিক ফসল। [শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য তাঁর 'রবীন্দ্র সাহিত্যের নবরাগ' গ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথ ও এডগার অ্যালান পো' প্রবন্ধ।]

যেরূপ পাশাপাশি শয়ন করিত এখনও সেরূপ পাশাপাশি শুইল। কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।”

‘নিশীথে’ গল্পে এই বাস্তব অনুভবেরই অতি-প্রাকৃত ফলশ্রুতি। ঐ নিতান্ত মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতিকে একটু অতিরিক্ত টেনে, রহস্য-দোলায়িত পরিবেশের নীহারিকা-বর্ণে ধূসর-কম্পিত করে দক্ষিণাবাবুর মধ্যে কবি এক অস্বাভাবিক উচ্ছন্নতার সৃষ্টি করেছেন। রাত্রির আবছায়ায় যার জন্ম, দিনের স্পষ্ট আলোকে তার কল্পনামাত্র লজ্জিত এবং ক্রুদ্ধ করে। অথচ এর স্বাভাবিকতা অস্বীকার করাও অসম্ভব,—ভূত নেই জেনেও যেমন অসম্ভব হয় অমাবস্যা নিশীথের অন্ধকারে পল্লীশ্মশানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে গা-ছমছমিয়ে ওঠার নিরোধ করা।

অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলেও ‘মণিহারা’ গল্পে একই শিল্পরূপ গড়ে তোলা হয়েছে। এইসব গল্প অতি-প্রাকৃত, কিন্তু গতানুগতিক অর্থে নয়, অর্থাৎ ভৌতিক বা অলৌকিক চেতনা এদের মর্মগত নয়। তা আছে ‘গুপ্তধন’-এর মত গল্পে। কিন্তু সেখানেও তান্ত্রিক পদ্ধতি এবং গোপন সংকেত ইত্যাদি অনুসরণ করে যক্ষপুরীর স্বর্ণ-গহ্বরে প্রবেশ করা পর্যন্তই যা-কিছু অলৌকিকতার ছাপ। পরবর্তী অংশে পাতালতলশায়ী মৃত্যুঞ্জয়ের পৃথিবী-বুভুক্ষা ও রক্তাক্ত জীবন-পিপাসা গল্পটির পরিণামকে একান্ত প্রাকৃত মানব-রসে নিষিক্ত করেছে,—অলৌকিকতা-বুদ্ধি সেখানে জীবন-রসে সম্পূর্ণরূপে পরিস্রুত হয়ে উঠেছে। এই কারণেই প্রমথ বিশী এমন মন্তব্যও করেছেন যে, রবীন্দ্রগল্পে অতি-প্রাকৃত গল্প একটিও নেই। আমরা লক্ষ্য করেছি,—গতানুগতিক অতি-প্রাকৃত প্রসঙ্গের রচনায় রবীন্দ্রনাথের উৎক্রান্তি-ধর্মী কবি-স্বভাব এক নূতন শিল্প-প্রকরণের সৃষ্টি করেছে।

শিল্পী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বগ-ভাব ; জীবনের সকল পথে তাঁর অবাধ অভিসার,—পরস্পর-বিপরীত অভিজ্ঞতা-অনুভবের সকল ক্ষেত্রে তাঁর পদক্ষেপ অকম্পিত। প্রধানতঃ তিনি কবি, গীতিকবি। আর অনুভবের গভীর অতল-স্পর্শতাই গীতিকবির স্বভাবধর্ম। এমন অবস্থায় জীবনের হাস্যোজ্জ্বল স্থলপথে তাঁর সহজ বিচরণ প্রায় অ-কল্পিত ঘটনা। তবু, অ-কল্পনীয়-ও তাঁর প্রতিভার স্পর্শে বাস্তব হয়েছে। রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি চির রসিক-পুরুষ আত্মগোপন করেছিলেন। প্রতিদিনের কথাবার্তায়, এমন কি প্রাণঘাতী রোগের সময়েও সেই সহজ রসিক মনের পরিচয় ক্ষণে ক্ষণে ঠিকরে পড়েছে।[৫৪] কাব্যে-প্রবন্ধে-গল্পে-কথায় সেই রসিকতার স্পর্শ আয়াসহীন সহাস্যতায় জ্বলজ্বল্ করছে। হাসির আবার রকমফের আছে। রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসময় রচনায়

৫৪। দ্রষ্টব্য :—রাণী চন্দ ‘আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ’ এবং দ্বিতীয়া—‘মৃত্যুর আলোকে রবীন্দ্রনাথ’ প্রবাসী, ১৩৪৮ বাংলা।

উইট-এর দীপ্তি এবং হিউমার-এর স্বচ্ছতাই কেবল ছিল না, বিদ্রূপ বা স্যাটায়ার-এর তীব্র কষাঘাতও ছিল। 'মানসী' কাব্যে 'বঙ্গবীর' বা 'নববঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপ'-এর মত কবিতা এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সহজ হিউমার-এর পক্ষপাতী। 'মুক্তির উপায়'-এর মত সরস গল্পে কবির মুখে জীবনের হাসি যেন শরৎকালের মধুর রৌদ্রের মত স্বচ্ছতায় ঝক্‌ঝক্ করছে। এই ধরনের সৃষ্টিরই পরিণতি হয়ত দেখতে পাই 'পরশুরাম'-এ।

তাছাড়া উইট-এর আকাশ-চেরা না হলেও মন-আলো-করা ঝলক্ রয়েছে অনেক গল্পেরই এখানে-সেখানে ছড়িয়ে। সে-সব গল্প আবশ্যিকভাবে হাস্যরসাত্মক নয়,—কিন্তু বুদ্ধির আলো তাদের বিষয়-ভার লঘু করেছে, প্লট্-এর আবছায়াকে করেছে উজ্জ্বল। 'তারাপ্রসন্নর কীর্তি' নামক অপেক্ষাকৃত অসফল গল্পেও এই সহাসতা প্লট্-নিরপেক্ষ এক সরসতার সৃষ্টি করেছে। তারাপ্রসন্ন লেখক, দাক্ষায়ণী তার স্ত্রী। এই গল্পেও লেখক দাম্পত্যরসের লোভনীয় মধুরতা সৃষ্টি করেছেন,—সে মাধুর্য মর্মের গভীরতলশায়ী নয়, সহাস-চঞ্চল :—"অনুরোধ করিয়া দাক্ষায়ণী মাঝে মাঝে স্বামীর লেখা শুনিতেন, যতই না-বুঝিতেন ততই আশ্চর্য হইয়া যাইতেন। তিনি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী পড়িয়াছেন, এবং কথকতাও শুনিয়াছেন। সে-সমস্তই জলের মত বোঝা যায়, নিরক্ষর লোকেও অনায়াসে বুঝিতে পারে, কিন্তু তাঁহার মতো এমন সম্পূর্ণ দুর্বোধ হইবার আশ্চর্য ক্ষমতা তিনি ইতিপূর্বে দেখেন নাই।

"তিনি মনে মনে কল্পনা করিতেন, এই বই যখন ছাপানো হইবে এবং কেহ এক অক্ষর বুঝিতে পারিবে না তখন দেশশুদ্ধ লোক বিস্ময়ে কিরূপ অভিভূত হইয়া যাইবে।"

এই বর্ণনায় দুর্বোধ্যতার প্রতি নির্বোধের অন্ধ আসক্তিকে ব্যঙ্গাঘাত করা হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। কিংবা,—"তারাপ্রসন্নের চারিটি সন্তান, চারই কন্যা। দাক্ষায়ণী মনে করিতেন সেটা গর্ভধারিণীরই অক্ষমতা। এইজন্য তিনি আপনাকে প্রতিভাসম্পন্ন স্বামীর অত্যন্ত অযোগ্য স্ত্রী মনে করিতেন। যে-স্বামী কথায় কথায় এমন সকল দুরূহ গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে কন্যা বই আর সন্তান হয় না। স্ত্রীর পক্ষে এমন অপটুতার পরিচয় আর কি দিব।" এই বর্ণনাকেও নিছক 'হিউমার' বলা চলে না। উভয় স্থলে যে রস-প্রকাশ পেয়েছে, তা তীব্র বিদ্রূপের চেয়ে বেশ কিছু কম ঝাঁজালো, নিছক হিউমারের চেয়ে কিছু বেশি উজ্জ্বল। আর উভয় ক্ষেত্রেই এক সহাস দীপ্তির সঞ্চার ঘটেছে বুদ্ধি-তির্যক্ বাচন বিন্যাসের দ্বারা।

কেবল লঘু রসের গল্পে নয়; নিতান্ত গুরুগম্ভীর স্বরময় পরিবেশেও বুদ্ধির দোলা নাতিব্যঙ্গোজ্জ্বল সহাসতার আভাস সৃষ্টি করেছে। 'জয়পরাজয়' গল্পের গীতি-সুরভিত

বর্ণনাতেও কাব্য-নিকুঞ্জ-বনে অ-সমঝদার মত্ত পণ্ডিত-হস্তীর প্রবেশ-চিত্রে এরূপ একটি বুদ্ধি-সমুজ্জ্বল বক্রোক্তির ব্যঞ্জনা রয়েছে। চিরন্তন নারী ও চিরন্তন নরের অনাদি দুঃখ এবং অনন্ত সুখের পাথার নিয়ে শেখর কবি অমরাপুরে চির সৌন্দর্যের নন্দন নিকেতন গড়ে তুলেছেন। এমন সময়ে সরস্বতীর কাব্য-কাননে প্রবেশ করলেন মহাপণ্ডিত পুণ্ডরীক—

"রাজা পরম সমাদরের সহিত কহিলেন,—এহি এহি।

কবি পুণ্ডরীক দম্ভভরে কহিলেন,—যুদ্ধং দেহি।"

কবিতার ভাষায় কবির দুঃখকে রবীন্দ্রনাথ এখানে ব্যঙ্গাল্প তির্যক্ ভাষণের উজ্জ্বলতায় দোলা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সহাস গল্প রচনাতেও কবি-কলার সহজ স্নিগ্ধতা রয়েছে।

৩। রবীন্দ্র-গল্পের দ্বিতীয় যুগ

এবারে আমরা রবীন্দ্র-গল্পের নতুন পর্যায়ে এসে পৌঁচেছি,—যেমন রূপে, তেমনি স্বাদেও পদ্মা-ঋতুর গল্পগুলি থেকে এদের অভিনবতা মৌলিক। পদ্মা-ঋতু বলতে বুঝেছি পদ্মা, তথা নদীমাতৃক বরেন্দ্র-পল্লীর প্রভাবিত কবি-মনোঋতুকে। আর নতুন ঋতুর ফসল ফলতে শুরু করেছে, মনে করি, 'নষ্টনীড়' থেকে। কারণ হিশেবে আগেও বলেছি, 'নষ্টনীড়'-পূর্ব কাল থেকেই বরেন্দ্র-বাংলার সঙ্গে কবির আত্মার যোগ শিথিল হয়েছে, শিলাইদহের কবি-তীর্থ সপরিবারে স্থানান্তরিত হয়েছে ভুবনডাঙা-স্বরুলে,—রাঢ়ের লালমাটির প্রান্তরে। এই নূতন পর্যায়ে শুধু নদী-ধৌত পল্লীজীবনের সঙ্গেই যোগ কমল না,—অবস্থানগত নৈকট্যের সঙ্গে সঙ্গে নগর-বাংলার প্রতি যোগও বৃদ্ধি পেল। তাতে সৃজন-প্রকৃতির পার্থক্য যেটুকু ঘটলো, স্বয়ং কবিই তার তুলনা-ক্রমিক আলোচনা করেছেন,—"My later stories have not got that freshness, though they have greater psychological value and th y deal with problems. Happily I had no social or political problems before my mind when I was quite young. Now there are a number of problems of all kinds and they crop up unconsciously when I write a story I am very susceptible to environment and until and unless I am in the midst of a certain type of atmosphere I cannot produce any artistic work. During my youth whatever I saw appealed to me with pathos quite strong, and therefore, my earlier stories have a greater literary value because of their spontaneity. But now it is different. My stories of a later period have got the necessary technique, but I wish I could go back once more to my former life."[৫৫]

৫৫। শ্রীচন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ—দ্র: 'গল্পগুচ্ছ' চতুর্থখণ্ড (গ্রন্থ পরিচয়)। 'Foreward', ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬।

এই উক্তির বিষয়বস্তুকে কেবল তথ্যের দিক থেকে বিচার করলে দেখব,—

১। নূতন পর্যায়ের গল্পগুলোকে কবি টেক্‌নিক্‌-প্রধান গল্প বলেছেন,—আর সেই নূতন টেক্‌নিক্‌-এর উৎস হিশেবে গল্পগুলির 'মনস্তাত্ত্বিক মূল' ও সমস্যা-প্রধানতার কথাও উল্লেখ করেছেন।

২। এই নবীন আকৃতি ও প্রকৃতির কারণ হিশেবে তিনি আপন প্রতিভার একান্ত পরিবেশ-সচেতনতার কথা বলেছেন। কোনো বিশেষ পরিবেশের মধ্যে সুস্থিত হতে না পারলে শিল্পসৃষ্টি তাঁর পক্ষে অসম্ভব হত।

৩। প্রথম যুগের ছোটগল্পগুলোকে কবি নদীমাতৃক পল্লীজীবন-পরিবেশের সৃষ্টি বলে দাবি করেছেন ;—ঐ সব যৌবন-রচনায় সকল দেখা ও জানার অন্তরালে ছিল এক প্রবল আবেগভরা আবেদন। সে-যুগে কবির মনের সামনে কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যা ছিল না।

৪। দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্প-রচনার কালে জীবনের চারদিকে সব রকমের অসংখ্য সমস্যা জমা হয়েছিল। লিখবার সময়ে শিল্পীর অজ্ঞাতেও তারা ছোটগল্পের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্প-সাহিত্যের স্বভাবগত বিভিন্নতার আলোচনায় এই কবি-সিদ্ধান্তের বিচার ও মূল্যায়ন বিশেষ প্রয়োজনীয়। এদিক্‌ থেকে প্রথমেই দেখি,—'হিতবাদী' যুগ থেকে 'নষ্টনীড়'-পূর্ব বাংলাদেশের জীবনে কোনো সামাজিক বা রাষ্ট্রিক সমস্যা প্রধান হয়ে ছিল না—একথা কোনো অর্থেই সত্য নয়।

এই প্রসঙ্গে সমকালীন ইতিহাসের দীর্ঘ তথ্যপঞ্জী উদ্ধার করা বাহুল্য। কেবল স্মরণ করি, খ্রীস্টীয় ১৮৯১ থেকে ১৯০০ অব্দ পর্যন্ত এই সময়ে ভারতের বিপ্লবাত্মক জাতীয় আন্দোলনের জন্ম-পূর্ব অগ্ন্যুত্তাপ প্রচণ্ডতম হয়ে উঠছিল। জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম-উত্তর এবং বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সূচনা-পূর্ব এই যুগ বাংলাদেশে সমিধ সংগ্রহ আর অগ্নি আহরণের কাল। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমন-ও এবিষয়ে যে চরম অবহিত হয়েছিল তার শ্রেষ্ঠ ছোটগাল্পিক প্রমাণ 'মেঘ ও রৌদ্র'। এ-বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করেছি। কেবল রাষ্ট্রিক অঘটন সম্বন্ধেই নয়, সমাজ, আচার, ধর্ম—জীবনের সকল দিকের সমস্যা ও অপূর্ণতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ-যুগে সম-সচেতন। প্রমাণ হিশেবে দেখি, 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রথম ছয়টি গল্প লিখবার একই সময়ে অকাল-বিবাহ নিয়ে প্রবন্ধও লিখেছিলেন। তাছাড়া, ছোটগল্প লেখার প্রথম পর্যায়েই চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে প্রবন্ধে-বিতর্ক, 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরি'-র ভূমিকা ও অপরাপর বিস্তর প্রবন্ধ লিখেছেন, যাতে সমকালীন জীবন-সমস্যার প্রতি কবির গভীর অবধানের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ

বিষয়ের একটি লক্ষণীয় তথ্য, 'সাধনা' পত্রিকার একই সংখ্যায় "'স্ত্রীমজুর' নামে সংকলন-প্রবন্ধ ও 'দালিয়া' নামে ছোটগল্প বাহির হয়।"[৫৬] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, এর আগে স্ত্রী-মজুরের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়নি প্রায় একেবারেই। অর্থাৎ, এ-দেশে দুষ্কল্পনীয় সমস্যাদি নিয়ে কবি যখন ভাবছেন এবং লিখছেন,—তখনই—হয়ত একই লেখনী দিয়ে রচনা করেছেন 'দালিয়া'-র মত স্বপ্ন-ঘেরা গল্প। "সাধনার যুগে রাজনৈতিক প্রবন্ধ"-ও কবি প্রচুর লিখেছেন সুপ্রচুর জোরের সঙ্গে।[৫৭] আর এ-সব রচনা কোনো আকস্মিক ঘটনার ফল নয়;—'সাধনা'-যুগের সকল রচনার পেছনে কবি-আত্মার এক নিরন্তর অভিপ্রায়ের দ্যোতনা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আভাসিত হয়েছে। এই পত্রিকার প্রসঙ্গে কবি বলেছেন,—"মন ভাল থাক্‌লে মনে হয় সমস্ত ভার আমি একলা বহন করতে পারি। তখন মনে হয়, আমি দেশের কাজ করব এবং কৃতকার্য হব। তখন লোকের উৎসাহ এবং অবস্থার অনুকূলতা কিছুই আবশ্যক মনে হয় না, মনে হয় আমার কাজের পক্ষে আমি নিজেই যথেষ্ট। তখন এক এক সময়ে আমি নিজের খুব দূর ভবিষ্যতের যেন ছবি দেখ্‌তে পাই,—

"...আমি নিশ্চয় জানি, 'আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে।' ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে আমি দেশের মন হরণ করে আন্‌ব, নিদেন আমার দুচারটি কথা তার অন্তরে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকবে। এই কথা যখন মনে আসে, তখন আবার সাধনার প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়ে ওঠে। তখন মনে হয় সাধনা আমার হাতের কুঠারের মত। আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য ছেদন করবার জন্যে একে আমি ফেলে রেখে মরচে পড়তে দেব না, একে আমি বরাবর হাতে রেখে দেব।"[৫৮]

'সাধনা'-কে কবি তাঁর জাতি-সেবার সাধনায় হাতের হাতিয়ার রূপে অনুভব করেছেন,—'সাধনা'র জন্যে কেবল প্রবন্ধ রচনার কালেই নয়, গল্প-কবিতা লিখবার সময়েও এই অনুভব একান্ত হয়েছিল নিঃসন্দেহে। জাতি-সেবা অর্থে কোনো আন্দোলন বা বিপ্লব সৃষ্টির কথা কবি ভাবেননি। তাঁর মনে হয়েছে,—"ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে আমি দেশের মন হরণ করে আনব, নিদেন আমার দুচারটি কথা তার অন্তরে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকবে।" 'সাধনা'-যুগের ছোটগল্পও ছিল এই অন্তর দিয়ে অন্তর স্পর্শ করতে চাওয়ার হাতিয়ার। ফল কথা, রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ-সচেতন শিল্পি-আত্মা জাতি-সেবার প্রসঙ্গে সমকালীন জাতীয় জীবন-সমস্যার প্রতি অনবহিত ছিল না। প্রথম পর্যায়ের 'গল্পগুচ্ছে'র বিষয়গত শ্রেণী-বিন্যাস করলেও একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই পর্যায়ে সামাজিক সমস্যামূলক

৫৬। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—'রবীন্দ্র জীবনী' ১ম খণ্ড। ৫৭। দ্রঃ তদেব। ৫৮। রবীন্দ্রনাথ-'ছিন্নপত্র'—পত্রসংখ্যা।

গল্পের সংখ্যাই বেশি। আর আমাদের সমাজে অসাম্যের কেন্দ্রে আছে নারী-নির্যাতনের বিচিত্ররূপ। নানাভাবে এই একই বিষয়ের চারদিকে ঘিরে আছে 'দেনাপাওনা', 'কঙ্কাল', 'ত্যাগ', জীবিত ও মৃত', 'সুভা', 'মহামায়া', 'মধ্যবর্তিনী,' 'সমাপ্তি', 'খাতা', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'বিচারক', 'দিদি', 'মানভঞ্জন', 'দৃষ্টিদান' ইত্যাদি গল্প। তাছাড়া আরো বিচিত্র সামাজিক সংস্কার ও সমস্যার ছবি রয়েছে 'ব্যবধান', 'সম্পত্তিসমর্পণ', 'মুক্তির উপায়', 'দান প্রতিদান', 'অনধিকার প্রবেশ', 'ঠাকুরদা', 'দুর্বুদ্ধি, 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' ইত্যাদি গল্পে। রাজনৈতিক চেতনার ছাপ আছে 'মেঘ ও রৌদ্র' এবং 'রাজটিকা' গল্পে। যেসব গল্পে কোনো সুচিরস্থায়ী সামাজিক বা রাষ্ট্রিক সমস্যার ছবি আঁকেননি, তাদের মধ্যেও সমকালীন জীবনানুভবের ছায়া দুর্লক্ষ্য নয়। তাহলেও কবি বলেছেন, পদ্মাতীরের মরশুমে লেখা গল্পগুলি লিখবার সময়ে কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যা তাঁর চোখের ওপরে ছিল না। আর গল্পগুলিতেও দেখি, সমকালীন জীবন-জটিলতার ভার এড়িয়ে যাবার দিকেই কবির একান্ত ঝোঁক। 'মেঘ ও রৌদ্র' প্রসঙ্গে এ কথার বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

কিন্তু এসব তথ্য থেকে এমন কথা প্রমাণিত হয় না যে, আলোচ্য যুগে কবি-মনের জীবন-চিন্তা অগভীর, অস্পষ্ট বা পল্লবচারী ছিল। আসলে সে-জীবনে বৈচিত্র্য আর জটিলতা দুইই ছিল ; দুচোখ ভরে কবি তাদের প্রত্যক্ষও করেছিলেন। কিন্তু কবি-মনের সে ছিল এক অভিনব ঋতু, জীবনের বস্তুপুঞ্জকে পেরিয়ে যেখানে সব কিছুকেই প্রবল আবেগ ('pathos quite strong') ভরা আবেদনে ভরপুর করে তুলতে ইচ্ছে করে। কবি নিজেও বলেছেন,—"সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল নিঃসন্দেহ তার মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাত-প্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে মানবজীবনের সেই সুখ-দুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে পল্লী-পার্বণে, আপন প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ নিয়ে। কখনো বা মোগল রাজত্বে কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতিসরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে। সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে, কোনো সমাজতন্ত্র নয় কেনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়।"[৫৯] অর্থাৎ, এই পর্যায়ের গল্পে বিশেষ জীবনচ্ছবি নির্বিশেষ অনুভবের সুরতরঙ্গে রসায়িত হয়ে উঠেছে। বিশেষকে নিয়ে নির্বিশেষ লোকে পাড়ি দেবার,—সান্তকে অনন্তের প্রেক্ষা-তটে আস্বাদন করবার মাধ্যম ছিল বরেন্দ্র-পরিবেশের জল-স্থলে ব্যাপ্ত উদার অসীমতা। এই অর্থেই কবি তাঁর ইংরেজি-বাংলা আলোচনায় বলেছেন পদ্মাতীর থেকে চলে না এলে গল্পের সে ধারা, সে প্রকৃতি থামত না।

৫৯। রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা—'সাহিত্যের স্বরূপ'।

'নষ্টনীড়' থেকে নতুন যে ঋতু এল, দেহের দিক্ থেকে পুরো না হলেও মনের দিক্ থেকে তা সম্পূর্ণ পদ্মা-সঙ্গ-বিচ্যুত। এ বিষয়ের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছি বর্তমান অধ্যায়েরই অন্যত্র। এবার থেকে পদ্মা প্রকৃতির সেই পরিস্রবণকারী প্রভাব নেই। ফলে, বিশেষকে আর নির্বিশেষ রূপে নয়, বিশেষের সীমাতেই একান্ত খুঁটিয়ে দেখছেন কবি। তাই 'নষ্টনীড়' গল্পে হৃদয়াবেগের চেয়ে মনোবিকলন, গতির চেয়ে বিবৃতি, চলমানতার চেয়ে বিশ্লেষণ বেশি। এ'কেই কবি পূর্বের ইংরেজি আলোচনায় স্বতঃস্ফূর্তির (spontaneity) অভাব এবং টেক্নিক্-এর প্রাবল্য বলে উল্লেখ করেছেন। সামাজিক মানসিকতার বৈশিষ্ট্যে 'নষ্টনীড়' রবীন্দ্র-গল্পে আগাগোড়া অভিনব নয়। আমাদের অকরুণ সমাজে-পরিবারে নারীর মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকার ঘোষণায় রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন 'দেনাপাওনা'-র যুগ থেকেই। 'ত্যাগ' গল্পের শেষে তাঁর প্রচেষ্টাকে দুঃসাহসী বলে ইঙ্গিত করেছেন শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়। প্রেমের জন্যে,—বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি আকুল মমতায় "জাত মানি না", এমন কথা বলতে পারা সেকালে চরম বিপ্লবের পরিচায়ক ছিল। আর নায়ক হেমন্ত সেই দুঃসাহসী বাক্য উচ্চারণ করেছিল তার দোর্দণ্ড-প্রতাপ পিতৃদেবতার মুখের ওপরে। 'কঙ্কাল' এবং 'প্রতিবেশিনী' গল্পে বিধবার দাম্পত্য সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা অপরূপ সৌন্দর্য-কারুণ্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'বিচারক' গল্পে সেই প্রণয়-লিপ্সা বিধবা হেমশশীর জীবনে বারবনিতা মোক্ষদার বীভৎস পরিণামকে অবারিত করেছে, মোক্ষদার প্রতি কবি-আত্মার শ্রদ্ধা আর মমতা অকল্পনীয় সমাজ-দ্রোহের পর্যায়ে পৌঁচেছিল। ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র শরৎসাহিত্যে এই প্রবণতারই পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করেছেন সম্পূর্ণ সংগতভাবে।[৬০] অতএব, তথাকথিত সমাজ-বিগর্হিত ঘটনা-চিত্রণের রবীন্দ্র-প্রয়াস এই গল্পে অভিনব নয়। 'নষ্টনীড়'-এর যা-কিছু স্বকীয়তা, সে তার প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য আর কবি-মনোভাবের অ-পূর্বতায়।

প্রথমে দেখি, সধবা নারীর প্রণয়বিস্তারের অপ্রত্যাশিত গতি এই গল্পের ভিত্তি হয়ে আছে। বঙ্কিম-যুগ থেকে বিধবার জীবন-সম্ভোগ-বাসনা ও তার সামাজিক ফলশ্রুতি সকল তীব্রতা-জটিলতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। তাছাড়া, ছোটগল্পেই কুমারী-প্রণয়ের বিচিত্র ছবি এঁকেছেন কবি 'জয়পরাজয়' বা 'মহামায়া'র মত গল্পেও। কিন্তু স্বামি-সঙ্গ-বাসিনী সধবার অন্যাসক্তি বাংলার সমাজ ও পরিবার-চেতনার পক্ষে আজও অক্ষমণীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। এরকম ঘটনা এখনো প্রায় দুঃস্বপ্নেরও অতীত। অথচ রবীন্দ্রনাথ যেভাবে এ-গল্পের বিস্তার ও পরিণতি ঘটিয়েছেন, তাতে সাধারণ অর্থে গল্পকে অপরাধ বা পাপ-চেতনাময় বলা চলে না। বস্তুত চারু অমল ও ভূপতিকে

৬০। দ্রঃ ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র—'গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ'—'সাহিত্য পারিক্রমা'।

নিয়ে গড়া জীবনভূমিতে ঐসব গতানুগতিক শব্দ কেবল নিরর্থক নয় অব্যবহার্যও। অথচ 'নষ্টনীড়' গল্পের চেয়ে বেশি সমাজ-সমস্যামূলক বাস্তবতাময় গল্পের কল্পনা করাও কঠিন।

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এমন অকল্পনীয় বাস্তব গল্পের সৃষ্টিও সম্ভব হয়েছিল কেবল তাঁর অবিচল কবি-প্রত্যয়েরই প্রভাবে। আপন কবি-অন্তঃকরণে তিনি নারী-পুরুষের দাম্পত্য সম্পর্কের এক নব-গীতা রচনা করেছিলেন। অন্যান্য নানা প্রসঙ্গের সঙ্গে 'গল্পগুচ্ছে'ও 'চোরাইধন' গল্পে কবি তাঁর এই বিশ্বাসকে রূপ দিয়েছেন। "বিবাহটা চিরজীবনের পালাগান, তার ধুয়ো একটামাত্র, কিন্তু সংগীতের বিস্তার প্রতি দিনের নব নব পর্যায়ে।" নায়িকা সুনেত্রার দৈনন্দিন জীবনাচরণের বর্ণনায় কবি এ কথার অর্থ অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করেছেন। আর কেবল স্ত্রীর পক্ষে নয়, পুরুষের পক্ষেও এ-কথা সমান সত্য। অভ্যাস আর অন্ধ আচরণের স্তর থেকে মুক্ত করে দাম্পত্যের মধ্যেও প্রেমকে চিরস্বাদু করে রাখতে গেলে প্রতিদিনের ভরা মন নিয়ে নিত্য নূতন করে স্ত্রীকে আবিষ্কার করতে হয় স্বামীকেও। যে তা পারে না, তার জীবনে আচার আর প্রয়োজনের তলায় প্রাণের অপমৃত্যু ঘটে। সেখানে নির্জীব দাম্পত্যের গায়ে জড়িয়ে থাকে গতানুগতিক অভ্যাসের অবসাদ। এমন অবস্থায়ও প্রাণ যেখানে মরেও মরে না, অন্তর্লীন অতৃপ্তিই সেখানে কেবল সার হয়। কোথাও-বা অশান্ত প্রাণ সমাজের মার্কামারা সীমার বাইরে ভয়ঙ্কর পথে পরিক্রমা করতে বেরোয় জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে।

এমন অবস্থাতেও আমাদের অধিকাংশ দম্পতি নিত্যদিনের জীবন-যাত্রায় প্রেমের পৃথক মূল্যকে স্বীকার করার কথা ভাবতেও পারেন না। বেদমন্ত্রের মূল্য দিয়ে এদেশের অসংখ্য পুরুষ ঘটা করে নারীদেহের ওপরে অধিকারের ছাপ এঁকে দেন। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও বিয়ের রাতের সানাই সেই জৈব অধিকারের সরব সাক্ষীর ভূমিকায় বিড়ম্বিত হতে থাকে প্রতিদিন। আর নিষ্প্রাণ আচারের অন্ধতা নিয়ে 'পতিদেবতা'রা কল্পনা করেন, একরাত্রে কেবল দুর্বোধ্য কয়টি মন্ত্র উচ্চারণের জোরেই নারীর দেহের সঙ্গে তার মন এবং আত্মাও চিরকালের জন্য কেনা হয়ে রইল। এই অপঘাতে অধিকাংশ নারীপ্রাণ অসাড় হয়ে পড়ে। চারুর অপরাধ হ'ল, ভূপতির উপেক্ষা ও অন্যমনস্ক ব্যস্ততার আঘাতেও তার জীবনরস-লিপ্সু নারী-প্রাণ মরে যায় নি,—অবসন্নতার ঊর্ধ্বে আপন মুক্তির আকাশ খুঁজে ফিরেছে। এখানেই 'নষ্টনীড়' গল্পের সামাজিক সমস্যা আর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতারও শুরু।

এই জটিলতার আর একটি উপাদান সৃষ্টি করেছিল ভূপতি আর চারুর অ-সম বয়স্কতা। দাম্পত্যের প্রতিষ্ঠা সমান-মর্মিতার দৃঢ়-ভিত্তিতে; হিন্দুশাস্ত্রের ভাষাতেও স্ত্রী স্বামীর

সহধর্মিণী। অথচ আমাদের গতানুগতিক বিবাহব্যবস্থায় বালিকাবধূর সঙ্গে পরিণত-যৌবন যুবকের পরিণয়-বন্ধন অনেক সময় নাগপাশের মত দুঃসহ হয়। সে বীভৎসতার চিত্র 'মানসী' কাব্যের 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ' কবিতায় তীব্র ব্যঙ্গের সুরে কবি প্রকাশ করেছিলেন তাঁর প্রথম যৌবনেই। 'নষ্টনীড়' গল্পে দেখি, চারুর সম্পর্কে ভূপতির চিত্ত বিমুখ ছিল না। তাই বলে স্ত্রীর প্রতি তার আচরণকে সকৌতুক স্নেহ বা করুণার পর্যায়ের ওপরেও স্থান দেওয়া চলে না। ভূপতি চারুকে শ্রদ্ধা করতে পারে নি;—অথচ ভালবাসার ঐটুকুই নিম্নতম ভিত্তি বা আশ্রয়। চারুর বয়স, সাধ্য, সাহিত্য-প্রীতি, সব কিছুকেই ভূপতি ছেলেমানুষি বলে করুণা-বিগলিত কৌতুকে এড়িয়ে গেছে,—বরং নিজেই অমল নামক আর একটি 'ছেলেমানুষ'-কে জুটিয়ে এনেছে চারুর 'জীবন-জীবন' খেলার সঙ্গী হিশেবে। অবশেষে জীবন নিয়ে খেলতে গিয়ে এই দুটি সমবয়স্ক, সমান-মর্মী নরনারী জীবনের দুরূহ জিজ্ঞাসার এক তুঙ্গশিখরে এসে পৌঁচেছে, যেখানে বাঙালির চিরকালের সমাজ-চিন্তা এক সুবৃহৎ প্রশ্ন-চিহ্নের মুখে 'হাঁ' করে দাঁড়িয়েছে।

ভূপতির সর্বনাশের মধ্যে অমল যে অকথিত সমস্যার প্রলয়াচ্ছন্নতা হঠাৎ আবিষ্কার করলো, আর অমলের অকস্মাৎ অন্তর্ধানের প্রেক্ষাপটে চারু যে আত্ম-আবিষ্কার করলো, এ দুইকে দুর্নৈতিক বলবো কোন্ মূঢ়তায়! সুবৃহৎ গল্পের অতি সংক্ষিপ্ত সমাপ্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটি কথাই কেবল বুঝি,—মানুষের মন বিচিত্র, জটিল, দুরবগাহ;—মানুষের যুগযুগ সঞ্চিত আদর্শবাদ ও বিবেকবুদ্ধির সব কিছু দিয়েও তার অতলান্ততার পরিমাপ হয় না। সেই অন্তহীন জিজ্ঞাসার সম্মুখে স্তব্ধ হয়ে, নম্রশিরে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়;—মানুষের জীবনে অনন্ত-প্রাণকে প্রণাম করেই এই সমাপ্তিহীন রহস্যযাত্রা সাঙ্গ করতে হয়। ধাপে ধাপে সুকল্পিত বর্ণনা ও বিশ্লেষণের বিন্যাসে জীবনের সেই সীমাহীন জিজ্ঞাসার প্রান্তরে বাংলা গল্পকে প্রথম টেনে এনেছে 'নষ্টনীড়'। এখান থেকেই মনো-বিকলনাশ্রিত আধুনিক বিজ্ঞান-এষণাময় জীবন-চিন্তার অগ্রস্থতি।

'নষ্টনীড়'-এ এই মনোবিকলন ও বিশ্লেষণ সুচয়িত ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়ে এত বিস্তারিত এবং আমূল সম্পূর্ণ হয়েছে যে, এই গল্পের ছোটগল্প-ত্ব সম্বন্ধেই কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছেন। এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আগে 'চোখের বালি' ও 'নষ্টনীড়'-এর তুলনামূলক বিচারপ্রসঙ্গে।[৬১] বস্তুত উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের পার্থক্য পরিধির বিস্তার বা বিশ্লেষণের প্রকৃতি দ্বারা নির্ণীত হয় না। পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, উপন্যাসের প্রসঙ্গে জীবন-চেতনার 'entirety'-র ওপরে জোর দিয়েছেন Ralph Fox

৬১। দ্রষ্টব্য—বর্তমান গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়।

এবং অন্যান্য প্রায় সকল বিচারকেরা। আর ছোটগল্পের রসপরিস্রুতির ব্যাখ্যা করতে Poe জোর দিয়েছেন 'totality'-র ধারণার ওপরে। সাধারণভাবে শব্দার্থ দুটিতে পার্থক্য কিছু নেই, কিন্তু বিশেষার্থে আছে। 'Entirety' বলতে বুঝি আদি-অন্তে অ-ভঙ্গ ('unbroken'—'Shorter Oxford Dictionary') সম্পূর্ণতা। আর 'totality' কথাটি Poe যেভাবে ব্যবহার করেছেন, তাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-নিরপেক্ষ পরিণামী অখণ্ডতার কথাই বুঝি বিশেষভাবে। জানি, এ আলোচনা নিতান্ত স্থূল হবে, তবু 'নষ্টনীড়'-প্রসঙ্গে এই অর্থ-পার্থক্যের প্রয়োগগত বিশিষ্টতা লক্ষ্য করে দেখব। এই গল্পে চারুর জীবন বর্ণনাকে 'entire',—আদি-অন্তে সম্পূর্ণ অভঙ্গ বলা চলে না। চারুর মধ্যে একটি বিশুদ্ধ নারী-সত্তা যেমন ছিল, তেমনি একটি সামাজিক চেতনা ও অবস্থানের প্রভাবকেও অস্বীকার করবার উপায় তার ছিল না। সে হিন্দু পরিবারের বিবাহিতা বধূ, যৌথপরিবারের কর্ত্রী, হিন্দু সমাজের সামাজিকা। এহেন অবস্থায় ভূপতির অবচেতন উপেক্ষার অন্তরাল বেয়ে অমলের সঙ্গে তার নবসৃজ্যমান মন দেওয়া-নেওয়ার ধারা অপ্রতিহত বেগে চল্‌তে পারত না। চারুর প্রতি অভিমান-ভরে অমল যখন মন্দাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিল, তখন স্বয়ং চারু ভূপতির কাছে এ-বিষয়ে অভিযোগ করেছিল। অমলের সম্পর্কে অতি-আসক্তি নিয়ে স্বামীর প্রতি অসংগত অবিচার করছে মন্দা, এমন কথাও ভেবেছিল, এমন কি মুখ ফুটে বলেও ছিল চারু। অথচ চারু যখন সেই সংগতির মাত্রা সহস্রগুণে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, তখন মন্দা অথবা পরিবারের আর কেউ, কিংবা পাড়ার কোনো প্রতিবেশিনী সে কথা নিয়ে কখনোই আলোচনা করেনি। কানাঘুসায় সে কথা পৌঁছায়নি চারুর কানে। এমন কি বিবাহিতা হিন্দুনারীর সংস্কারও চারুর মধ্যে গোপনে মাথা তোলেনি কখনো। তা যদি হত, তবে চারুর নারীসত্তা, সামাজিক অস্তিত্ব এবং বিবাহিত জীবনের কর্তব্য-সংস্কার মিলে যে সংঘাত ও আবর্ত সৃষ্টি করতে পারত, তার রক্তক্ষরা ছুড়ের আঘাতে চারুর আদি-অন্তে অভঙ্গ জীবনের পরিচয় অবিষ্কার করতে পারতাম আমরা। উপন্যাসের জীবন-চেতনার পক্ষে বিস্তার অপরিহার্য কেবল এই আবর্ত-জটিলতায় বিদ্ধ আদ্যন্ত সম্পূর্ণতার জন্য। জীবন-বর্ণনার অভঙ্গ পূর্ণতা উপন্যাসের উপাদান; বিচার এবং বিশ্লেষণ ঔপন্যাসিকের হাতের হাতিয়ার। 'নষ্টনীড়'-এ জীবনসমস্যার সেই অভঙ্গতা নেই, প্রয়োজন নেই বলেই সেই সুতীক্ষ্ণ বিচারেরও অভাব রয়েছে। অথচ অসম-মর্মী স্বামীর এড়িয়ে চলার পটভূমিতে সমাজকুণ্ঠিত পথে চারুর নারীত্বের অবাধ অভিসার একটানা সুরের মতো অখণ্ডতা নিয়ে শেষ পরিণামের মুখে পৌঁচেছে;—Stevenson-এর ভাষায়, একের পর এক incidentগুলোর উত্থান-পতন 'notes of music'-এর মতো বেজে উঠেছে।

তাতে মনোবিকলন আছে, কিন্তু ঔপন্যাসিক অর্থে মনোবিশ্লেষণ নেই। প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভূপতি যেদিন চারুর ঘরে ছুটে এসেছিল শেষ আশ্রয় খুঁজবার জন্যে, শরৎচন্দ্রের ভাষায় তার বিশ্লেষণ করা যেত। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে অভাগীর অন্তিম মুহূর্তে তার স্বামী রসিক বাঘের উপস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,—"জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালবাসা দেয় নাই, অশনবসন দেয় নাই, কোনো খোঁজ খবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু পায়ের ধূলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ভূপতি সম্বন্ধেও বলতে পারি,—জীবনে যে স্ত্রীকে স্নেহ করলেও শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিতে পারেনি,—যার নারীমনের 'অশন-বসন' যোগাবার কথা কোনোদিন ভাবেওনি,—চরম রিক্ততার দিনে তারই কাছে পরম আশ্রয় ভিক্ষা করতে গিয়ে ভূপতিকে আঘাত-জর্জরিত হয়ে ফিরতে হল। এই ব্যাখ্যা আর মনোবিশ্লেষণ ঔপন্যাসিকের। রবীন্দ্রনাথ কখনো তা করেননি; করতে চাইলেও সফল হতেন না। তাঁর হাতের লেখনী ছোটগল্প-শিল্পীর, বর্ণনার মধ্যেও ইঙ্গিত এবং ব্যঞ্জনার ঝঙ্কার পুরে দিয়ে খণ্ড-সীমিতের মধ্য থেকে অসীম অখণ্ডের সুরটুকু জাগিয়ে তোলার সাধনা তাঁর। গল্পের শেষ চারটি বাক্যে চারু-ভূপতির কথোপকথনে সেই ব্যঞ্জনা, সেই সুর অখণ্ড ঘনতা আয়ত্ত করেছে। 'নষ্টনীড়' আশ্চর্য সফল এক ছোটগল্প।

মনের খবরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে মনোবিকলনমূলক এমন সার্থক গল্প অনেক কয়টিই লেখা সহজ ছিল না। তাই এই পর্যায়ের সব গল্প সমান রসোত্তীর্ণ নয়। 'গুপ্তধন,' 'রাসমণির ছেলে,' 'পণরক্ষা' প্রভৃতি আখ্যানমূলক এমন সব গল্প রয়েছে, যারা tale-এর পর্যায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। অবশ্য এই সব গল্পে মনস্তাত্ত্বিক সন্ধিৎসাও নেই মোটেই। 'মাল্যদান' গল্পে আবার দেখি সেই মন দেখবার প্রয়াস। এই গল্পে কবি যেন নারী-মনের চিরন্তন রহস্যের অতলে ডুব দিয়েছেন। সেই অবচেতনার গভীরে বসে একটু একটু করে নারীত্বের উষা-বিকাশকে প্রত্যক্ষ করেছেন, নিজের পৌরুষ-সিক্ত শিল্পি-আত্মা দিয়ে করেছেন উপভোগ। বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে শ্যামাসুন্দরী কপালকুণ্ডলাকে পুরুষ-স্পর্শমণির কথা বলেছিল। যতীনের মধ্যে সেই স্পর্শমণির ছোঁয়া পেয়েছিল কুড়ানির আজন্ম-আচ্ছন্ন নারী-আত্মা। 'মাল্যদান' গল্পকে সাধারণ অর্থে মনোবিকলনমূলক বলা চলে না, এতে যা আছে তা মন-উন্মোচন। অপরূপ কাব্য-কৌশলে রবীন্দ্রনাথ কুড়ানির নিদ্রিত মনকে ভাঁজে ভাঁজে খুলে দেখেছেন ;—খুল্‌তে খুল্‌তে আহৃদয় পান করেছেন সেই মধু-সৌরভ। এই গল্পের এক বৃন্তে যেন দুটি ফুল ফুটেছে,—তারা রোমান্স আর বাস্তব দিয়ে গড়া। তবু কবি বুঝি শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। কুড়ানির হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে কাহিনী শেষ করতে পারলে তার ছোটগল্প-ধর্ম অক্ষুণ্ণ থাক্‌তে পারত। কিন্তু

আখ্যানের লোভ কবিকে পেয়ে বসেছিল। তাই ছোটগল্প শেষ হবার পরেও গল্প যেখানে শেষ হল, সেখানে মাধুর্য আছে, কারুণ্য আছে, ব্যঞ্জনাও আছে। কিন্তু কবির ভাষায়, গল্প শেষে 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'—ছোটগল্প গুণের এই অনুভবটি সর্বাঙ্গব্যাপক হয়ে থাকেনি। সমাপ্তির পূর্ণচ্ছেদ ছোটগল্পের চির-অশেষতার রহস্যধর্মকে ধরে রাখতে না পেরে অনেকটা যেন ফিকে করে দিয়েছে।

এই যুগের 'কর্মফল' গল্পটি লিখেছিলেন ফরমায়েস-এর তাগিদে—কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গে। কুন্তলীন তেলের কোম্পানী প্রায় প্রতি বছর একটি গল্পকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দিতেন ; গল্পের মধ্যে নিতান্ত প্রাসঙ্গিকভাবে কুন্তলীনের দেলখোস তেলের উল্লেখ থাক্‌বে—এইটুকুই ছিল একমাত্র শর্ত। এই গল্পটির উৎকর্ষ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সংঘাত-সংশয়ের গতিশীল ভঙ্গিতে লেখা এই রচনায় একটি নাটকীয় আবহময় পরিবেশ সৃষ্ট হতে পেরেছে। পরবর্তী কালে কবি এর সদ্ব্যবহার করেছিলেন 'কর্মফল' গল্পকে 'শোধবোধ' নাটকে রূপান্তরিত করে (১৩৩১ বাংলা সাল)।

৪। রবীন্দ্র-গল্পে 'সবুজপত্রে'র যুগ

দ্বিতীয় পর্যায়ের রবীন্দ্র-গল্পধারাতে আবার এক নূতন প্রকৃতি বিকশিত হতে লাগল 'সবুজপত্র' পর্যায় থেকে। প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৩২১ বাংলা সালের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র-জন্মদিনে 'সবুজপত্রে'র প্রথম প্রকাশ। মাস কয় আগে কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির খবর ঘরে-বাইরে অপার চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। 'সবুজপত্র' প্রকাশের মাসেক পরে নতুন চাঞ্চল্যের সঙ্গে বিভীষিকা নিয়ে এল বিশ্বব্যাপী প্রথম মহাসমর। নোবেল পুরস্কার লাভ কবির পক্ষে অমিশ্র আনন্দের কারণ হয়নি, দুঃখের অভিঘাত-ও সে বয়ে এনেছিল। শান্তিনিকেতনে দেশবাসীর সম্বর্ধনার উত্তরে কবি নিজে একথা বলেছিলেন,—তার পরের আঘাত তাঁর পক্ষে ছিল আরো অস্বস্তিকর। অন্যদিকে তাঁর পরিবেশ-সচেতন জীবন-প্রিয় চেতনা মহাযুদ্ধের আঘাতেও আমূল চকিত হয়ে উঠেছিল। 'মনুষ্যত্বের ভবিষ্যৎ' এবারে অনায়াসে কবির সন্ধিৎসার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। তাতেই ঘট্‌লো কবি-প্রকৃতির এক নূতন পরিচয়ের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি ছিলেন না,—তিনি কবি-মনীষী। একেবারে প্রথম বয়স থেকেই তাঁর কাব্য-কবিতাতেও গভীর উপলব্ধির সঙ্গে জ্ঞান-মনীষার অচ্ছেদ্য পরিণয় বন্ধন ঘটেছিল। 'প্রভাত সংগীতে'র 'অনন্ত জীবন,' 'অনন্ত মরণ' কবিতায় কবির এই দ্বৈত-হয়েও-অদ্বৈত স্বভাবের প্রথম সংশয়হীন প্রকাশ।

"যতবর্ষ বেঁচে আছি ততবর্ষ মরে গেছি
মরিতেছি প্রতি পলে পলে
জীবন্ত মরণ মোরা, মরণের ঘরে থাকি
জানিনে মরণ কারে বলে।"—

—'অনন্ত মরণ' কবিতার একটুকরো এই অংশ।

পরে কবি বলেছেন এই সব কবিতায় উপলব্ধির নিবিষ্টতার চেয়ে একটা মত প্রকাশ করার ঝোঁক বেশি ছিল। তা হলেও প্রথম যৌবনেই শিল্পীর প্রাণের প্রবণতা যে বিশেষ পথ ধরে চলেছিল, সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিজ্ঞার পথ বেয়ে এসে উপলব্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছে স্পষ্ট ব্যঞ্জনাময়: "জীবন্ত মরণ মোরা, মরণের ঘরে থাকি জানিনে মরণ কারে বলে।"

জানার সঙ্গে অনুভবকে, মনীষার সঙ্গে উপলব্ধিকে প্রাণের একই বন্ধনে বেঁধে একান্ত মিলিয়ে নিয়ে চলার সাধনাই ধাপে ধাপে বিকশিত হয়েছে রবীন্দ্র-সৃজন-ধারায়। 'সোনার তরী'-'চিত্রা'র 'সমুদ্রের প্রতি', 'বসুন্ধরা,' এমন কি 'মানস সুন্দরী' কবিতাতেও এই দুই উপাদানের পরিণয় বন্ধন কবির আত্মিক গ্রন্থি, বন্ধনে চিরস্থায়ী হয়ে উঠেছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রথমোক্ত কবিতাটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিজ্ঞান-বিষয়াশ্রিত রসোত্তীর্ণ কবিতা বলেছেন। 'সোনার তরী'-'চিত্রা' কাব্যে যে কবি-মনীষা জ্ঞান-পথের পথিক, 'নৈবেদ্য'-যুগে নূতন পথ পরিবর্তন করে সে আধ্যাত্মিক ভাবনা ও বিশ্ব-চিন্তার অভিমুখী হয়েছিল। 'সবুজপত্র যুগে'র গল্পগুলি 'বলাকা' কাব্যঋতুর সমসাময়িক। সেইকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-আধ্যাত্মিকতার সকল পথ ঘুরে কবির উপলব্ধির নৌকো জীবনের ঘাটে ঘাটে ফিরে এবার পরিণতির তীর্থ-মন্দিরের অভিমুখী হয়েছে। এখানে বলবত্তম মনীষা অখণ্ডতম উপলব্ধির সঙ্গে হরগৌরী সম্মিলনে বাঁধা পড়েছে। এবারে কবির লেখায় কি গদ্যে, কি পদ্যে, কি উপন্যাসে-গল্পে-প্রবন্ধে, সর্বত্র এক অপূর্ব আলোকের দীপ্তি ঠিক্‌রে পড়েছে। এ যেন নিজের শক্তিকে সম্পূর্ণ জানতে পারার প্রশান্ত প্রত্যয়ের আকাশে সহজ-স্ফূর্ত বুদ্ধির ধারালো বিদ্যুৎ-ঝলক। এই সময় থেকে কবির মুখের কথা কেবল বাচ্যার্থকে নয়, ব্যঙ্গ্যার্থকেও ছাড়িয়ে গেছে;— প্রকাশশৈলী একই সঙ্গে হয়ে উঠেছে তীব্র ধারালো,—এবং সাংকেতিক। বিশ্বসম্মান লাভের দায়িত্ব স্বীকার করে এবং বিশ্ব-বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি-আত্মাও এই পর্যায়ে তার জীবন-জিজ্ঞাসাকে প্রাণের উত্তাপ দিয়ে অখণ্ড সম্পূর্ণ করে দেখতে চাইছিল। তাই ভাষার মধ্যে দূরধাবিতা যেমন ছিল, তেমনি প্রবল ছিল বুদ্ধিদীপ্ত তীব্রতা আর তির্যক ভঙ্গীও। ফলে, এই সময়কার রচনাপ্রবাহ বিশেষ করে চেতনাকে আঘাত যত করে, আন্দোলিত

করে তার চেয়ে বেশি,—প্রায় আমূল। 'সবুজপত্র'-যুগের কবিতা ও প্রবন্ধের মত ছোটগল্পেও কবি-মনের এই নব প্রকৃতি প্রকাশ-প্রকরণকে নূতন রূপ দিয়েছিল।

'সবুজপত্রে' প্রকাশিত প্রথম গল্প 'হাল্‌দার গোষ্ঠী' (বৈশাখ, ১৩২১)। একদিক থেকে 'নষ্টনীড়'-এর (১৩০৮ সাল) সঙ্গে এই গল্পের যোগ আছে। আমাদের গতানুগতিক অন্ধ জীবনযাত্রার ফলকে সদ্যজাগ্রত নারী-ব্যক্তিত্বের নবজন্ম-পীড়াকেই কবি চারুর মধ্যে একটু একটু করে ধাপে ধাপে এঁকেছেন। 'হাল্‌দার গোষ্ঠী' গল্পে সেই বেদনা-যন্ত্রণারই উল্টোপিঠ আঁকা হয়েছে লাঞ্ছিত-পৌরুষ বনোয়ারীর অজেয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে। এক দিক্ থেকে 'সবুজপত্র'-যুগের সব কয়টি গল্পই পুরাতন প্রসঙ্গ। সেই দেনাপাওনা নিয়ে বধূর ওপরে অত্যাচার ['হৈমন্তী'], অথবা বিয়ের রাতে গয়নাগাঁটির হিশাব নিয়ে বরপক্ষের নির্লজ্জ গৃধ্নুতা ['অপরিচিতা'], ধর্মাধিকারী গুরুর গোপন লালসাবৃত্তি ['বোষ্টমী'], কিংবা পারিবারিক আভিজাত্য ও অন্ধ ঐতিহ্য-গৌরবের দম্ভে নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে ব্যক্তিত্বের —প্রাণধর্মের অকথ্য নির্যাতন ['স্ত্রীর পত্র' এবং 'হালদার গোষ্ঠী'] ইত্যাদি। কিন্তু সব গল্পেই পুরাতন জীবনের পাতায় নূতন প্রত্যয়ের ছবি এঁকেছেন কবি,—নবীন প্রাণের তুলি দিয়ে। 'সবুজপত্র' বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে'র পরে প্রথম বিদ্রোহী বাংলা সাহিত্য-পত্র। এর সকল বিদ্রোহ ছিল গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে, বুদ্ধি-বর্জিত বিশ্বাসের অন্ধকারে পোষমানা জীবনকে কোনো রকমে টিঁকিয়ে রাখার বিরুদ্ধে,—শান্তির নামে নির্জীবতার কৃত্রিম সাধনার বিরুদ্ধে। 'সবুজপত্র'-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী এই বিদ্রোহের দূত হিশাবেই বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়।

"বাংলার মন যাতে বেশি ঘুমিয়ে না পড়ে" সেই চেষ্টা করাই 'সবুজপত্রে'র অন্যতম লক্ষ্য বলে প্রথম সংখ্যাতেই উল্লিখিত হয়েছিল।

এই ঘুমিয়ে পড়া মনের বিরুদ্ধেই 'সবুজপত্র'-যুগের রবীন্দ্র-মনের ছিল শ্রেষ্ঠ অভিযান। ঘরে-পরে মানুষের যা কিছু দুর্ভোগ আর দুর্গতি সেদিন দেখা গিয়েছিল, সব কিছুর পেছনেই গতানুগতিক জীবনাচরণের অন্ধতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন কবি। প্রাণের গতিপথকে সংস্কার ও অর্থহীন আদর্শবাদের খাঁচায় সে পুরে রাখে। বিশেষ করে সেকালের বাংলাদেশের জীবনযাত্রায় প্রতিফলিত চিরকেলে সেই খাঁচার ছবি আঁকলেন 'সবুজপত্রে'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে :—খাঁচা ভাঙবার শক্তি-ব্যাকুল আহ্বান জানালেন ঐ একই সংখ্যায় প্রকাশিত 'সবুজের অভিযান' কবিতায়। এ-সময়কার গল্পগুলোতেও আছে খাঁচায় বদ্ধ থাকার তীব্র যন্ত্রণা, অথবা খাঁচা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার দৃপ্ত সাধনা। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে কবি লিখেছিলেন—"প্রাণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে, সমস্তকেই সে পরখ করিয়া দেখে। নূতন অভিজ্ঞতার

পথ ধরিয়া সে আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া চলিতে চায়। প্রাণ দুঃসাহসিক বিপদের ঠোকর খাইলেও সে আপনার জয়যাত্রার পথ হইতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে চায় না। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি প্রবীণও আছে, বাধার বিকট চেহারা দেখিবামাত্রই সে বলে, কাজ কি! বহু পুরাতন যুগ হইতে পুরুষানুক্রমে যত কিছু বিপদের তাড়না আপনার ভয়ের সংবাদ রাখিয়া গিয়াছে তাহাকে পুঁথির আকারে বাঁধাইয়া রাখিয়া একটি বৃদ্ধ তাহারই খবরদারি করিতেছে। নবীন প্রাণ এবং প্রবীণ ভয়, জীবের মধ্যে উভয়েই কাজ করিতেছে। ভয় বলিতেছে, 'রোস রোস', প্রাণ বলিতেছে, 'দেখাই যাক্ না!'

"অতএব, এই প্রবীণতার বিরুদ্ধে আমরা আপত্তি করিবার কে? আপত্তি করিও না। তাঁহার বৈঠকে তিনি গদীয়ান হইয়া থাকিবেন, সেখান হইতে তাঁহাকে আমরা নড়িয়া বসিতে বলিব এমন বেআদব আমরা নই। কিন্তু প্রাণের রাজ্যে তাঁহাকেই একেশ্বর করিবার যখন যড়যন্ত্র হয় তখনই বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া বাহির হইবার দিন আসে।"[৬২]

'সবুজপত্রে' কবিতা ও প্রবন্ধের মত গল্প-উপন্যাসেও কবি এই বিদ্রোহের ধ্বজা ধরে বেরিয়েছেন। 'সবুজের অভিযান' প্রবীণের ভয়-মুক্ত নবীন প্রাণের অভিযান 'হালদার গোষ্ঠী'র বনোয়ারী সেই প্রথম অভিযাত্রী, প্রাণের দাবিতে হালদার পরিবারের প্রাবীণ্যের খাঁচা থেকে যে চিরকালের জন্যে মুক্ত হয়ে চলে গেছে।

'নষ্টনীড়'-এর মত গল্পে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পূজায় কবি দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এবারে তিনি বিদ্রোহী, আর সে বিদ্রোহের শিল্পমূর্তি রচনা করেছে তাঁর পরিণততম শিল্পি-মনীষা। তাই এই গল্পে ব্যক্তিত্বের স্বধর্ম ও স্বরূপ উন্মোচন বিস্ময়কর কাব্যগুণে মণ্ডিত :—

"প্রেমের নিবিড়তায় সকলের তো প্রয়োজন নাই; সংসারের ছোটো কুন্‌কের মাপের বাঁধা বরাদ্দে অধিকাংশ লোকের বেশ চলিয়া যায়। সেই পরিমিত ব্যবস্থায় বৃহৎ সংসারে কোনো উৎপাত ঘটে না। কিন্তু, এক-এক জনের ইহাতে কুলায় না। তাহারা অজাত পক্ষিশাবকের মত কেবল মাত্র ডিমের ভিতরকার সংকীর্ণ খাদ্য রসটুকু লইয়া বাঁচে না, তাহারা ডিম ভাঙিয়া বাহির হইয়াছে, নিজের শক্তিতে খাদ্য আহরণের বৃহৎ ক্ষেত্র তাহাদের চাই। বনোয়ারী সেই ক্ষুধা লইয়া জন্মিয়াছে, নিজের প্রেমকে নিজের পৌরুষের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য তাহার চিত্ত উৎসুক, কিন্তু যে দিকেই সে ছুটিতে চায় সেই দিকেই হালদার গোষ্ঠীর পাকা ভিত; নড়িতে গেলেই তাহার মাথা ঠুকিয়া যায়।"

এ বর্ণনায় প্রাণকে অনুভব করার কবি-শক্তির মূলে রয়েছে প্রাণভেদী বৌদ্ধিক (intellectual) অন্তর্দৃষ্টির বিদ্যুৎ দীপ্তি। এই বৌদ্ধিক অনুভব-ঋদ্ধতার গুণেই

৬২। দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ—'কালান্তর'—রবীন্দ্র রচনাবলী—২৪।

এ-যুগের রচনা তির্যক্‌, এমন কি সাংকেতিকও হয়ে উঠেছে। বাঁধন-ভাঙার বিদ্রোহী সুরেও সকল গল্পের সাধারণ সাধর্ম্য। বিভিন্ন যন্ত্রের আধারে জীবনের একই সুর ধ্বনিত হয়েছে এই সময়কার সকল গল্পে। নিজের পৌরুষের মূল্য দিয়ে নিজের প্রেমকে সম্পূর্ণ করে তোলার সুযোগ না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিল বনোয়ারীর প্রাণ, তার বিদ্রোহী আত্মা হালদার গোষ্ঠীর খাঁচা ভেঙে তবেই শান্ত হতে পেরেছিল। এই বিদ্রোহের সুর তীব্রতম হয়ে আছে 'স্ত্রীর পত্র'-তে। সাতাশ নম্বর মাখন বড়াল লেনের মেজবৌ মৃণাল পনেরো বছরের দাম্পত্য জীবনের অন্ধকূপ থেকে পালিয়ে এসে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে প্রথম জানতে পেরেছে,—"আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে।" মাখন বড়াল লেনের ডিমের খোলস বিদীর্ণ করে তাই মৃণালের নূতন অভিযান অনন্তের পথে, যেখানে সে জেনেছে,—"মীরাবাঈও তো আমারই মত মেয়েমানুষ ছিল—তার শিকলও ত কম ভারী ছিল না, তাঁকে ত বাঁচবার জন্যে মরতে হয়নি। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল,—'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু—তাতে তার যা হবার তা হোক।' এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা।"

এ কেবল বিদ্রোহ নয়—একসঙ্গে বিপ্লব ও বিপ্লব-শান্তি। প্রাণের তপ্ত রক্তধারা দিয়েই এই শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন কবি,—শান্তির অছিলায় প্রাবীণ্যের মত জরা-মরতাকে প্রশ্রয় দেননি। বিদ্রোহ কেবল ভাঙা নয়, ভাঙার পরে গড়ে তোলাও। বরং গড়বার জন্যেই যে-ভাঙা, তাইত সার্থক বিপ্লব! মৃণাল যদি কেবল আক্রোশের বশেই মাখন বড়াল লেনের খাঁচা ভেঙে আসত, তা হলে তার মধ্যে প্রাণের পরাভবই ঘটত—যে প্রাণের স্বাভাবিক ধর্মই হচ্ছে,—কবি বলেছেন,—"নূতন নূতন অভিজ্ঞতার পথ ধরিয়া আপনার অধিকার বিস্তার" করা। অসত্যের কৃত্রিম জড়তা কাটিয়ে মৃণাল সত্যের সঙ্গে লেগে রইল,—সেই "লেগে থাকাইত বেঁচে থাকা"।

'নষ্টনীড়ে'র জীবন-জিজ্ঞাসা বিরাট প্রশ্ন-চিহ্নের সামনে থমকে দাঁড়িয়েছে। 'স্ত্রীর পত্র'র শিল্পী সেই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন; তাই এই পর্যায়ের গল্পগুলি যেখানে এসে থাম্‌লো, সেখানে জিজ্ঞাসা-চিহ্নের রহস্য-ব্যঞ্জনা নেই,—আগে-পিছে রয়েছে অন্তহীন পথ-চিহ্নের অসীম সংকেত। 'বোষ্টমী' গল্পে সেই সংকেত আরো স্পষ্ট, উজ্জ্বল। বোষ্টমী যে খাঁচা ভেঙেছে, সে গুরুবুদ্ধি ও অন্ধ সংস্কারের;—অন্ধ আত্মাদরেরও। অপরূপ সুন্দরী ছিল আনন্দী, তা ছাড়া স্বামীর মৌন-গভীর প্রাণের অজস্র দাক্ষিণ্য লাভ করেছিল যৌবনের নবউন্মেষিত প্রভাতে। অত-পাওয়া,—মূল্য না দিয়ে পাওয়া, তার নিজের মনকে কেবল নিজের ভেতরই ঠেলে ঠেলে দিচ্ছিল। ডিমের কুসুম খোলসের ভেতরে জমে জমে যাচ্ছিল। বাইরেকে দেখ্‌বার, তাকে যোগ্য মূল্য দেবার সাধ এবং সাধ্য আচ্ছন্ন হয়েছিল সেদিন

আনন্দীর মধ্যে ;—তার "গোপাল আসিয়া দেখিল, তখনো তাহার জন্য ননী তৈরি নাই, তাই সে রাগ করিয়া চলিয়া গেছে।" ছেলেকে কোলে পেয়ে আনন্দী মা হতে পারেনি ; ছেলেকে অনাদরে হারিয়ে তার অতৃপ্ত মাতৃত্ব উদ্বাহু দুরন্ত শিশুর মত লাফিয়ে উঠেছিল। আনন্দীর ছেলেই নিজের মৃত্যু দিয়ে তার আত্মাদরের ডিমের খোলস বিদীর্ণ করে দিয়ে গেল। তাই গুরু যেদিন আনন্দীর স্নান-সিক্ত দেহ-সৌন্দর্যের উল্লেখ করেছিলেন, সেদিন আর সে ঘরে থাকতে পারেনি। তার স্বামী তার মনটা একরকম করে দেখে নিয়েছিল,—তবু হয়ত তারা একসঙ্গে ঘর করতে পারত ; কিন্তু সে ঘর আনন্দী নিজে হাতে ভেঙে দিয়ে এসেছে। কারণ, পৃথিবীতে দুটি মানুষ তাকে ভালবেসেছিল ;—ছেলে আর স্বামী। আনন্দী বলেছে,—"সে ভালবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল। একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর ফাঁকি নয়।"

রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি থেকেই জানা যায় এই বোষ্টমী তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার সৃষ্টি। আনন্দী আসলে কবির শিলাইদহ জমিদারির অধিবাসিনী সর্বখেপী। কবিকে বোষ্টমী 'গৌর' বলতো—প্রণাম করতো,—তাঁর 'প্রসাদ'ও পেত। অপর কেউ তার জীবনের ইতিহাস জানত না।

কবি নিজে বলেছেন,—"বোষ্টমী অনেকখানিই সত্যি।…শেষ অংশটায় কিছু বদল করেছি। বোষ্টমী যে গুরুকে ত্যাগ করেছিল সেটা সত্য নয়—সংসার ত্যাগ করেছিল বটে।"[৬৩] সেই চোখে-দেখা বাস্তবে-জানা ঘটনাকে মনের মাধুরি মিশিয়ে কবি রচনা করেছেন,—ঠিক্ উল্টো করে। এই পর্যায়ের গল্পগুলিকে পূর্ববর্তী রচনার তুলনায় পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্প বলা চলে কি না, তাতে সন্দেহ আছে। কিন্তু সৃষ্টি হিশেবে এরা অনবদ্য। মাঝে মাঝে মনে হয়, গল্পের নাম করে এ-যেন কবির আত্ম-সৃষ্টি। প্রতীচ্য প্রবন্ধ-শিল্পী মতে তাঁর বিচিত্র বিষয়ক 'Essais' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছিলেন, "আমিই আমার গ্রন্থের বিষয়বস্তু।" আলোচ্য পর্যায়ের গল্পগুচ্ছের শিল্পী রবীন্দ্রনাথও একথা বলতে পারতেন। বিচিত্র গল্পের প্লটকে আশ্রয় করে নিজের সমসাময়িক মনের প্রাবীণ্য-বিদ্রোহ ও প্রশান্ত সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রূপ দিয়েছেন কবি ;—এইসব খোদাই-চিত্রে বুদ্ধির হাতিয়ার চালিয়েছে শিল্পীর প্রাণের হাত। কোথাও বা কেবল মুক্তি,—কোথাও মুক্তির সঙ্গে প্রশান্তির সিদ্ধি ; কোথাও বিদ্রোহ,—কোথাও কেবল সয়ে যাওয়া।

'পয়লা নম্বর'-এর অনিলা অনেক দুঃখে সেই মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল,—তার দুপাশে ছিল মাথা ঠুকবার দুই দেয়াল। একপাশে নিজের স্বামী, আর একপাশে

৬৩। পুলিনবিহারী সেন সংকলিত তথ্যপঞ্জী দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ : 'গল্পগুচ্ছ' চতুর্থ খণ্ড।

সিতাংশুমৌলি। জীবনের চোরাগলিতে কোনো দেয়ালের আঁচড়ই সে লাগতে দেয়নি প্রাণের গায়ে। তার মুক্তি আকাশচারী বিহঙ্গমের। 'শেষের রাত্রি' যেন 'পয়লানম্বর' আর 'বোষ্টমী'র উল্‌টো পিঠ। আনন্দীকে জাগিয়েছিল তার ছেলের মৃত্যু,—মণিকে কী যতীন জাগতে দিলো নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে? নিজের স্বামীকে জাগাতে পারেনি অনিলা কোনোদিন,—কিন্তু দূর থেকে সিতাংশুমৌলিকে আমূল নাড়া দিয়েছিল সে। যতীন মাসীর প্রাণের দুলাল, কিন্তু মণির রুদ্ধ মনের দ্বারে মাথাকুটে মরেছে তার ভালবাসা। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্তি এল কী যতীনের জীবনে? 'শেষের রাত্রি'র ভাষায় 'লিপিকা'র সুর,—তার প্রাণে 'লিপিকা'র রহস্য-অপার সংকেত। গল্প নয়,—'শেষের রাত্রি' গদ্যে-লেখা কবি-জীবনের গান।

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যতীনের প্রাণ খাঁচা-মুক্ত হয়েছিল কি না, জানা নেই। কিন্তু 'হৈমন্তী' গল্পের নায়িকা সেই মুক্তির সাধনাতেই নিঃসংশয়ে সিদ্ধ হয়েছে। হৈমন্তী সম্বন্ধে তার স্বামী বলেছিল,—"এই গিরিনন্দিনী সতেরো বৎসরকাল অন্তরে-বাহিরে কত বড়ো একটা মুক্তির মধ্যে মানুষ হইয়াছে। কি নির্মল সত্যে ও উদার আলোকে তাহার প্রকৃতি এমন ঋজু শুভ্র ও সবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইতে হৈম যে কিরূপ নিরতিশয় ও নিষ্ঠুর রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এতদিন তাহা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারি নাই।" কিন্তু সত্যের উদার জীবন-ভূমি থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে আকণ্ঠ মিথ্যার গভীরে প্রোথিত থেকেও হৈমন্তী মিথ্যাকে কোনোদিন বেড়ে উঠতে দেয়নি নিজের জীবনে। নীরব আত্মদান, মৌন কঠোর সংযমের মধ্যে তার ধীর প্রশান্ত জীবনাবসানের দ্বার দিয়ে মিথ্যার জগৎ থেকে মৃত্যুর অক্ষয় সত্যে যেন সে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'অপরিচিতা' গল্প আবার যেন 'হৈমন্তী'র উল্টোপিঠ। মিথ্যার জালে ধরা পড়ে হৈমন্তী মৃত্যুর মধ্যে মুক্তি পেয়েছিল। শম্ভুনাথ সেনের কন্যা কল্যাণী জীবনেই মিথ্যার বস্তুভূমিকে অস্বীকার করে আপন কল্যাণ-ব্রতের সত্য ভূমিকায় অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু এই ধরনের তুলনা ও আলোচনা অশেষ হওয়া উচিত নয়। অন্তত এই ধরনের বিচারে পৃথক পৃথক গল্পের শিল্প-স্বাদুতার পূর্ণ পরিচায়ন অসম্ভব। তবু অত আলোচনার শেষে পুরাতন বক্তব্যকেই আবার স্পষ্ট করে নিতে হয় আলোচ্য যুগে রবীন্দ্রনাথ পদ্মা-ঋতুর তুলনায় প্রত্যক্ষ জীবন-সংযোগবিহীন। তাই যে-জীবনকে মনের চোখে দেখছেন,—প্রাণ দিয়ে জীবনের যে তাপ এবং যন্ত্রণা অনুভব করেছেন,—মনগড়া গল্পের ছাঁচে সেই মনের আকৃতিকেই রূপ দিয়েছেন একে একে। 'মনগড়া' বলতে এখানে বুঝছি এমন সৃষ্টি, কবির মনোজগতেই যাদের জন্ম, অবস্থান এবং বিলয়। 'বোষ্টমী' গল্পে বস্তুর তলানি থাকলেও তাকে মনের মত করতে গিয়ে একেবারে উল্টে দিয়েছেন কবি,—একথা লক্ষ্য

করেছি। তাই বলছিলাম, এই সব গল্পে মনে মনে নিজের মনকেই সৃষ্টি করেছেন শিল্পী; যে-মন, তিনি নিজেই বলেছেন, একান্ত পরিবেশ-সচেতন। সেই সৃজনশৈলীর বিশেষ প্রকরণই ধরা পড়েছে এই সব গল্পের দেহে।

'সবুজপত্রে'র গল্প লেখা শেস হয়ে গিয়েছিল ১৩২৪ বাংলা সালে,—সবশুদ্ধ দশটি গল্পের প্রথম 'হালদার গোষ্ঠী'।—শেষ, 'পাত্র ও পাত্রী'। তার পরেই এল নতুন 'কথা'র ঝোঁক; কেবল আকারে নয় স্বাদের প্রকারেও এরা অভিনব। কবি কিন্তু নিছক আকারের কথা ভেবেই তাদের নতুন নামকরণ করতে চেয়েছেন 'কথিকা'। প্রমথ চৌধুরীকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমার লেখাটির কি নাম দেব ভেবে পাই নে। 'পুরানো শোক' বোধ হয় চলতে পারে। ছোট ছোট গল্পকে 'কথানু' না বলে 'কথিকা' বলা যেতে পারে। 'গল্প-স্বল্প' বলতে ক্ষতি কি?"[৬৪]

এই সব স্বল্প গল্পও 'সবুজপত্র' ঋতুর ফসল; ধরা আছে 'লিপিকা' গ্রন্থে (১৩২৮), 'লিপিকা'র আলোচনা গল্পের পর্যায়ে ফেলে পূর্বাচার্যরা কেউ-ই স্পষ্ট করে করতে চান-নি; বরং সকলেই প্রায় একবাক্যে, এবং সংগত কারণেই, বলেছেন 'লিপিকা' একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। রবীন্দ্রনাথ নিজে 'পুনশ্চ'-র ভূমিকায় স্বীকারোক্তি করেছেন, গদ্যকবিতা লিখবার প্রথম চেষ্টা তিনি করেছেন 'লিপিকা'-তেই; সাহসের অভাবে তাকে পদ্যে পংক্তিবদ্ধ করা হয়ে ওঠেনি।

'লিপিকা'য় সংকলিত রচনাগুচ্ছ বিমিশ্র স্বভাবের; রসস্বাদুতার অনুসারেই সম্ভবত তাদের তিনটি ভাগে সাজানো হয়েছে; কালের অনুক্রমে নয়। প্রথম ভাগের চৌদ্দটি রচনার সম্পর্কেই গদ্যকবিতা-ধর্মিতার দাবি সাধারণভাবে গ্রাহ্য বলে মনে হয়। দ্বিতীয় ভাগের সাতটি লেখার মধ্যে প্রথম সংকলিত 'গল্প' ছাড়া বাকি কয়টি গল্পের স্বাদুতাবহ। তৃতীয় ভাগের ১৮টি রচনার[৬৫] অনেক কয়টিতে গল্পের উপাদান থাকলেও স্বাদের পার্থক্য আছে। এই গুচ্ছের একটি রচনা 'স্বর্গ-মর্ত' নাটকের সংলাপিক ভঙ্গিতে লেখা; ডঃ সুকুমার সেন তাতেও গাল্পিকতার উপাদান নির্দেশ করেছেন।[৬৬]

গল্পের উপাদান বলতে খুব ভাসা ভাসা ভাবে হলেও প্লট-এর কথাই মনে আসে,—কথা-বস্তুর স্বাদ যার মূল হতে উৎসারিত। কবিতা,—সে গদ্যকবিতাও যদি হয়, এবং

৬৪। রবীন্দ্রনাথ 'চিঠিপত্র'-৫। প্রমথ চৌধুরীকে লেখা পত্র সংখ্যা ৮০।

৬৫। 'লিপিকা'য় সংকলিত রচনা সংখ্যা ৩৮; রবীন্দ্র রচনাবলীতে (২৬) একটি কথিকা অতিরিক্ত 'সংযোজন' রূপে আছে।

৬৬। সুকুমার সেন—'রবীন্দ্রনাথের গল্পে রূপক ও রূপকথা'। দ্রঃ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (সঃ) 'শত-বার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ'।

এই উক্তির বিষয়বস্তুকে কেবল তথ্যের দিক থেকে বিচার করলে দেখব,—

১। নূতন পর্যায়ের গল্পগুলোকে কবি টেক্‌নিক্‌-প্রধান গল্প বলেছেন,—আর সেই নূতন টেক্‌নিক্‌-এর উৎস হিশেবে গল্পগুলির 'মনস্তাত্ত্বিক মূল' ও সমস্যা-প্রধানতার কথাও উল্লেখ করেছেন।

২। এই নবীন আকৃতি ও প্রকৃতির কারণ হিশেবে তিনি আপন প্রতিভার একান্ত পরিবেশ-সচেতনতার কথা বলেছেন। কোনো বিশেষ পরিবেশের মধ্যে সুস্থিত হতে না পারলে শিল্পসৃষ্টি তাঁর পক্ষে অসম্ভব হত।

৩। প্রথম যুগের ছোটগল্পগুলোকে কবি নদীমাতৃক পল্লীজীবন-পরিবেশের সৃষ্টি বলে দাবি করেছেন ;—ঐ সব যৌবন-রচনায় সকল দেখা ও জানার অন্তরালে ছিল এক প্রবল আবেগভরা আবেদন। সে-যুগে কবির মনের সামনে কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যা ছিল না।

৪। দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্প-রচনার কালে জীবনের চারদিকে সব রকমের অসংখ্য সমস্যা জমা হয়েছিল। লিখবার সময়ে শিল্পীর অজ্ঞাতেও তারা ছোটগল্পের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্প-সাহিত্যের স্বভাবগত বিভিন্নতার আলোচনায় এই কবি-সিদ্ধান্তের বিচার ও মূল্যায়ন বিশেষ প্রয়োজনীয়। এদিক্‌ থেকে প্রথমেই দেখি,—'হিতবাদী' যুগ থেকে 'নষ্টনীড'-পূর্ব বাংলাদেশের জীবনে কোনো সামাজিক বা রাষ্ট্রিক সমস্যা প্রধান হয়ে ছিল না—একথা কোনো অর্থেই সত্য নয়।

এই প্রসঙ্গে সমকালীন ইতিহাসের দীর্ঘ তথ্যপঞ্জী উদ্ধার করা বাহুল্য। কেবল স্মরণ করি, খ্রীষ্টীয় ১৮৯১ থেকে ১৯০০ অব্দ পর্যন্ত এই সময়ে ভারতের বিপ্লবাত্মক জাতীয় আন্দোলনের জন্ম-পূর্ব অগ্ন্যুত্তাপ প্রচণ্ডতম হয়ে উঠছিল। জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম-উত্তর এবং বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সূচনা-পূর্ব এই যুগ বাংলাদেশে সমিধ সংগ্রহ আর অগ্নি আহরণের কাল। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমন্‌-ও এবিষয়ে যে চরম অবহিত হয়েছিল তার শ্রেষ্ঠ ছোটগাল্পিক প্রমাণ 'মেঘ ও রৌদ্র'। এ-বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করেছি। কেবল রাষ্ট্রিক অঘটন সম্বন্ধেই নয়, সমাজ, আচার, ধর্ম—জীবনের সকল দিকের সমস্যা ও অপূর্ণতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ-যুগে সম-সচেতন। প্রমাণ হিশেবে দেখি, 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রথম ছয়টি গল্প লিখবার একই সময়ে অকাল-বিবাহ নিয়ে প্রবন্ধও লিখেছিলেন। তাছাড়া, ছোটগল্প লেখার প্রথম পর্যায়েই চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে প্রবন্ধে-বিতর্ক, 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরি'-র ভূমিকা ও অপরাপর বিস্তর প্রবন্ধ লিখেছেন, যাতে সমকালীন জীবন-সমস্যার প্রতি কবির গভীর অবধানের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ

বিষয়ের একটি লক্ষণীয় তথ্য, 'সাধনা' পত্রিকার একই সংখ্যায় "'স্ত্রীমজুর' নামে সংকলন-প্রবন্ধ ও 'দালিয়া' নামে ছোটগল্প বাহির হয়।"[৫৬] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, এর আগে স্ত্রী-মজুরের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়নি প্রায় একেবারেই। অর্থাৎ, এ-দেশে দুষ্কল্পনীয় সমস্যাদি নিয়ে কবি যখন ভাবছেন এবং লিখছেন,—তখনই—হয়ত একই লেখনী দিয়ে রচনা করেছেন 'দালিয়া'-র মত স্বপ্ন-ঘেরা গল্প। "সাধনার যুগে রাজনৈতিক প্রবন্ধ"-ও কবি প্রচুর লিখেছেন সুপ্রচুর জোরের সঙ্গে।[৫৭] আর এ-সব রচনা কোনো আকস্মিক ঘটনার ফল নয়;—'সাধনা'-যুগের সকল রচনার পেছনে কবি-আত্মার এক নিরন্তর অভিপ্রায়ের দ্যোতনা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আভাসিত হয়েছে। এই পত্রিকার প্রসঙ্গে কবি বলেছেন,—"মন ভাল থাকলে মনে হয় সমস্ত ভার আমি একলা বহন করতে পারি। তখন মনে হয়, আমি দেশের কাজ করব এবং কৃতকার্য হব। তখন লোকের উৎসাহ এবং অবস্থার অনুকূলতা কিছুই আবশ্যক মনে হয় না, মনে হয় আমার কাজের পক্ষে আমি নিজেই যথেষ্ট। তখন এক এক সময়ে আমি নিজের খুব দূর ভবিষ্যতের যেন ছবি দেখ্‌তে পাই,—

"...আমি নিশ্চয় জানি, 'আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে।' ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে আমি দেশের মন হরণ করে আন্‌ব, নিদেন আমার দুচারটি কথা তার অন্তরে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকবে। এই কথা যখন মনে আসে, তখন আবার সাধনার প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়ে ওঠে। তখন মনে হয় সাধনা আমার হাতের কুঠারের মত। আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য ছেদন করবার জন্যে একে আমি ফেলে রেখে মরচে পড়তে দেব না, একে আমি বরাবর হাতে রেখে দেব।"[৫৮]

'সাধনা'-কে কবি তাঁর জাতি-সেবার সাধনায় হাতের হাতিয়ার রূপে অনুভব করেছেন,—'সাধনা'র জন্যে কেবল প্রবন্ধ রচনার কালেই নয়, গল্প-কবিতা লিখবার সময়েও এই অনুভব একান্ত হয়েছিল নিঃসন্দেহে। জাতি-সেবা অর্থে কোনো আন্দোলন বা বিপ্লব সৃষ্টির কথা কবি ভাবেননি। তাঁর মনে হয়েছে,—"ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে আমি দেশের মন হরণ করে আনব, নিদেন আমার দুচারটি কথা তার অন্তরে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকবে।" 'সাধনা'-যুগের ছোটগল্পও ছিল এই অন্তর দিয়ে অন্তর স্পর্শ করতে চাওয়ার হাতিয়ার। ফল কথা, রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ-সচেতন শিল্পি-আত্মা জাতি-সেবার প্রসঙ্গে সমকালীন জাতীয় জীবন-সমস্যার প্রতি অনবহিত ছিল না। প্রথম পর্যায়ের 'গল্পগুচ্ছে'র বিষয়গত শ্রেণী-বিন্যাস করলেও একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই পর্যায়ে সামাজিক সমস্যামূলক

৫৬। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—'রবীন্দ্র জীবনী' ১ম খণ্ড। ৫৭। দ্রঃ তদেব। ৫৮। রবীন্দ্রনাথ-'ছিন্নপত্র'—পত্রসংখ্যা।

গল্পের সংখ্যাই বেশি। আর আমাদের সমাজে অসাম্যের কেন্দ্রে আছে নারী-নির্যাতনের বিচিত্ররূপ। নানাভাবে এই একই বিষয়ের চারদিকে ঘিরে আছে 'দেনাপাওনা', 'কঙ্কাল', 'ত্যাগ', জীবিত ও মৃত', 'সুভা', 'মহামায়া', 'মধ্যবর্তিনী,' 'সমাপ্তি', 'খাতা', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'বিচারক', 'দিদি', 'মানভঞ্জন', 'দৃষ্টিদান' ইত্যাদি গল্প। তাছাড়া আরো বিচিত্র সামাজিক সংস্কার ও সমস্যার ছবি রয়েছে 'ব্যবধান', 'সম্পত্তিসমর্পণ', 'মুক্তির উপায়', 'দান প্রতিদান', 'অনধিকার প্রবেশ', 'ঠাকুরদা', 'দুর্বুদ্ধি, 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' ইত্যাদি গল্পে। রাজনৈতিক চেতনার ছাপ আছে 'মেঘ ও রৌদ্র' এবং 'রাজটিকা' গল্পে। যেসব গল্পে কোনো সুচিরস্থায়ী সামাজিক বা রাষ্ট্রিক সমস্যার ছবি আঁকেননি, তাদের মধ্যেও সমকালীন জীবনানুভবের ছায়া দুর্লক্ষ্য নয়। তাহলেও কবি বলেছেন, পদ্মাতীরের মরশুমে লেখা গল্পগুলি লিখবার সময়ে কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যা তাঁর চোখের ওপরে ছিল না। আর গল্পগুলিতেও দেখি, সমকালীন জীবন-জটিলতার ভার এড়িয়ে যাবার দিকেই কবির একান্ত ঝোঁক। 'মেঘ ও রৌদ্র' প্রসঙ্গে এ কথার বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

কিন্তু এসব তথ্য থেকে এমন কথা প্রমাণিত হয় না যে, আলোচ্য যুগে কবি-মনের জীবন-চিন্তা অগভীর, অস্পষ্ট বা পল্লবচারী ছিল। আসলে সে-জীবনে বৈচিত্র্য আর জটিলতা দুইই ছিল; দুচোখ ভরে কবি তাদের প্রত্যক্ষও করেছিলেন। কিন্তু কবি-মনের সে ছিল এক অভিনব ঋতু, জীবনের বস্তুপুঞ্জকে পেরিয়ে যেখানে সব কিছুকেই প্রবল আবেগ ('pathos quite strong') ভরা আবেদনে ভরপুর করে তুলতে ইচ্ছে করে। কবি নিজেও বলেছেন,—"সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল নিঃসন্দেহ তার মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাত-প্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে মানবজীবনের সেই সুখ-দুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে পল্লী-পার্বণে; আপন প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ নিয়ে। কখনো বা মোগল রাজত্বে কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতিসরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে। সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে, কোনো সমাজতন্ত্র নয় কেনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়।"[৫১] অর্থাৎ, এই পর্যায়ের গল্পে বিশেষ জীবনচ্ছবি নির্বিশেষ অনুভবের সুরতরঙ্গে রসায়িত হয়ে উঠেছে। বিশেষকে নিয়ে নির্বিশেষ লোকে পাড়ি দেবার,—সান্তকে অনন্তের প্রেক্ষা-তটে আস্বাদন করবার মাধ্যম ছিল বরেন্দ্র-পরিবেশের জল-স্থলে ব্যাপ্ত উদার অসীমতা। এই অর্থেই কবি তাঁর ইংরেজি-বাংলা আলোচনায় বলেছেন পদ্মাতীর থেকে চলে না এলে গল্পের সে ধারা, সে প্রকৃতি থামত না।

৫১। রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা—'সাহিত্যের স্বরূপ'।

'নষ্টনীড়' থেকে নতুন যে ঋতু এল, দেহের দিক্ থেকে পুরো না হলেও মনের দিক্ থেকে তা সম্পূর্ণ পদ্মা-সঙ্গ-বিচ্যুত। এ বিষয়ের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছি বর্তমান অধ্যায়েরই অন্যত্র। এবার থেকে পদ্মা প্রকৃতির সেই পরিস্রবণকারী প্রভাব নেই। ফলে, বিশেষকে আর নির্বিশেষ রূপে নয়, বিশেষের সীমাতেই একান্ত খুঁটিয়ে দেখছেন কবি। তাই 'নষ্টনীড়' গল্পে হৃদয়াবেগের চেয়ে মনোবিকলন, গতির চেয়ে বিবৃতি, চলমানতার চেয়ে বিশ্লেষণ বেশি। এ'কেই কবি পূর্বের ইংরেজি আলোচনায় স্বতঃস্ফূর্তির (spontaneity) অভাব এবং টেক্‌নিক্-এর প্রাবল্য বলে উল্লেখ করেছেন। সামাজিক মানসিকতার বৈশিষ্ট্যে 'নষ্টনীড়' রবীন্দ্র-গল্পে আগাগোড়া অভিনব নয়। আমাদের অকরুণ সমাজে-পরিবারে নারীর মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকার ঘোষণায় রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন 'দেনাপাওনা'-র যুগ থেকেই। 'ত্যাগ' গল্পের শেষে তাঁর প্রচেষ্টাকে দুঃসাহী বলে ইঙ্গিত করেছেন শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়। প্রেমের জন্যে,—বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি আকুল মমতায় "জাত মানি না", এমন কথা বলতে পারা সেকালে চরম বিপ্লবের পরিচায়ক ছিল। আর নায়ক হেমন্ত সেই দুঃসাহসী বাক্য উচ্চারণ করেছিল তার দোর্দণ্ড-প্রতাপ পিতৃদেবতার মুখের ওপরে। 'কঙ্কাল' এবং 'প্রতিবেশিনী' গল্পে বিধবার দাম্পত্য সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা অপরূপ সৌন্দর্য-কারুণ্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'বিচারক' গল্পে সেই প্রণয়-লিপ্সা বিধবা হেমশশীর জীবনে বারবনিতা মোক্ষদার বীভৎস পরিণামকে অবারিত করেছে, মোক্ষদার প্রতি কবি-আত্মার শ্রদ্ধা আর মমতা অকল্পনীয় সমাজ-দ্রোহের পর্যায়ে পৌঁচেছিল। ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র শরৎসাহিত্যে এই প্রবণতারই পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করেছেন সম্পূর্ণ সংগতভাবে।[৩০] অতএব, তথাকথিত সমাজ-বিগর্হিত ঘটনা-চিত্রণের রবীন্দ্র-প্রয়াস এই গল্পে অভিনব নয়। 'নষ্টনীড়'-এর যা-কিছু স্বকীয়তা, সে তার প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য আর কবি-মনোভাবের অ-পূর্বতায়।

প্রথমে দেখি, সধবা নারীর প্রণয়বিস্তারের অপ্রত্যাশিত গতি এই গল্পের ভিত্তি হয়ে আছে। বঙ্কিম-যুগ থেকে বিধবার জীবন-সম্ভোগ-বাসনা ও তার সামাজিক ফলশ্রুতি সকল তীব্রতা-জটিলতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। তাছাড়া, ছোটগল্পেই কুমারী-প্রণয়ের বিচিত্র ছবি এঁকেছেন কবি 'জয়পরাজয়' বা 'মহামায়া'র মত গল্পেও। কিন্তু স্বামি-সঙ্গ-বাসিনী সধবার অন্যাসক্তি বাংলার সমাজ ও পরিবার-চেতনার পক্ষে আজও অক্ষমণীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। এরকম ঘটনা এখনো প্রায় দুঃস্বপ্নেরও অতীত। অথচ রবীন্দ্রনাথ যেভাবে এ-গল্পের বিস্তার ও পরিণতি ঘটিয়েছেন, তাতে সাধারণ অর্থে গল্পকে অপরাধ বা পাপ-চেতনাময় বলা চলে না। বস্তুত চারু অমল ও ভূপতিকে

৩০। দ্রঃ ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র—'গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ'—'সাহিত্য পারক্রমা'।

নিয়ে গড়া জীবনভূমিতে ঐসব গতানুগতিক শব্দ কেবল নিরর্থক নয় অব্যবহার্যও। অথচ 'নষ্টনীড়' গল্পের চেয়ে বেশি সমাজ-সমস্যামূলক বাস্তবতাময় গল্পের কল্পনা করাও কঠিন।

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এমন অকল্পনীয় বাস্তব গল্পের সৃষ্টিও সম্ভব হয়েছিল কেবল তাঁর অবিচল কবি-প্রত্যয়েরই প্রভাবে। আপন কবি-অন্তঃকরণে তিনি নারী-পুরুষের দাম্পত্য সম্পর্কের এক নব-গীতা রচনা করেছিলেন। অন্যান্য নানা প্রসঙ্গের সঙ্গে 'গল্পগুচ্ছে'ও 'চোরাইধন' গল্পে কবি তাঁর এই বিশ্বাসকে রূপ দিয়েছেন। "বিবাহটা চিরজীবনের পালাগান ; তার ধুয়ো একটামাত্র, কিন্তু সংগীতের বিস্তার প্রতি দিনের নব নব পর্যায়ে।" নায়িকা সুনেত্রার দৈনন্দিন জীবনাচরণের বর্ণনায় কবি এ কথার অর্থ অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করেছেন। আর কেবল স্ত্রীর পক্ষে নয়, পুরুষের পক্ষেও এ-কথা সমান সত্য। অভ্যাস আর অন্ধ আচরণের স্তর থেকে মুক্ত করে দাম্পত্যের মধ্যেও প্রেমকে চিরস্বাদু করে রাখতে গেলে প্রতিদিনের ভরা মন নিয়ে নিত্য নূতন করে স্ত্রীকে আবিষ্কার করতে হয় স্বামীকেও। যে তা পারে না, তার জীবনে আচার আর প্রয়োজনের তলায় প্রাণের অপমৃত্যু ঘটে। সেখানে নির্জীব দাম্পত্যের গায়ে জড়িয়ে থাকে গতানুগতিক অভ্যাসের অবসাদ। এমন অবস্থায়ও প্রাণ যেখানে মরেও মরে না, অন্তর্লীন অতৃপ্তিই সেখানে কেবল সার হয়। কোথাও-বা অশান্ত প্রাণ সমাজের মার্কামারা সীমার বাইরে ভয়ঙ্কর পথে পরিক্রমা করতে বেরোয় জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে।

এমন অবস্থাতেও আমাদের অধিকাংশ দম্পতি নিত্যদিনের জীবন-যাত্রায় প্রেমের পৃথক মূল্যকে স্বীকার করার কথা ভাবতেও পারেন না। বেদমন্ত্রের মূল্য দিয়ে এদেশের অসংখ্য পুরুষ ঘটা করে নারীদেহের ওপরে অধিকারের ছাপ এঁকে দেন। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও বিয়ের রাতের সানাই সেই জৈব অধিকারের সরব সাক্ষীর ভূমিকায় বিড়ম্বিত হতে থাকে প্রতিদিন। আর নিষ্প্রাণ আচারের অন্ধতা নিয়ে 'পতিদেবতা'রা কল্পনা করেন, একরাত্রে কেবল দুর্বোধ্য কয়টি মন্ত্র উচ্চারণের জোরেই নারীর দেহের সঙ্গে তার মন এবং আত্মাও চিরকালের জন্য কেনা হয়ে রইল। এই অপঘাতে অধিকাংশ নারীপ্রাণ অসাড় হয়ে পড়ে। চারুর অপরাধ হ'ল, ভূপতির উপেক্ষা ও অন্যমনস্ক ব্যস্ততার আঘাতেও তার জীবনরস-লিপ্সু নারী-প্রাণ মরে যায় নি,—অবসন্নতার ঊর্ধ্বে আপন মুক্তির আকাশ খুঁজে ফিরেছে। এখানেই 'নষ্টনীড়' গল্পের সামাজিক সমস্যা আর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতারও শুরু।

এই জটিলতার আর একটি উপাদান সৃষ্টি করেছিল ভূপতি আর চারুর অ-সম বয়স্কতা। দাম্পত্যের প্রতিষ্ঠা সমান-মর্মিতার দৃঢ়-ভিত্তিতে; হিন্দুশাস্ত্রের ভাষাতেও স্ত্রী স্বামীর

সহধর্মিণী। অথচ আমাদের গতানুগতিক বিবাহব্যবস্থায় বালিকাবধূর সঙ্গে পরিণত-যৌবন যুবকের পরিণয়-বন্ধন অনেক সময় নাগপাশের মত দুঃসহ হয়। সে বীভৎসতার চিত্র 'মানসী' কাব্যের 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ' কবিতায় তীব্র ব্যঙ্গের সুরে কবি প্রকাশ করেছিলেন তাঁর প্রথম যৌবনেই। 'নষ্টনীড়' গল্পে দেখি, চারুর সম্পর্কে ভূপতির চিত্ত বিমুখ ছিল না। তাই বলে স্ত্রীর প্রতি তার আচরণকে সকৌতুক স্নেহ বা করুণার পর্যায়ের ওপরেও স্থান দেওয়া চলে না। ভূপতি চারুকে শ্রদ্ধা করতে পারে নি;—অথচ ভালবাসার ঐটুকুই নিম্নতম ভিত্তি বা আশ্রয়। চারুর বয়স, সাধ্য, সাহিত্য-প্রীতি, সব কিছুকেই ভূপতি ছেলেমানুষি বলে করুণা-বিগলিত কৌতুকে এড়িয়ে গেছে,—বরং নিজেই অমল নামক আর একটি 'ছেলেমানুষ'-কে জুটিয়ে এনেছে চারুর 'জীবন-জীবন' খেলার সঙ্গী হিশেবে। অবশেষে জীবন নিয়ে খেলতে গিয়ে এই দুটি সমবয়স্ক, সমান-মর্মী নরনারী জীবনের দুরূহ জিজ্ঞাসার এক তুঙ্গশিখরে এসে পৌঁচেছে, যেখানে বাঙালির চিরকালের সমাজ-চিন্তা এক সুবৃহৎ প্রশ্ন-চিহ্নের মুখে 'হাঁ' করে দাঁড়িয়েছে।

ভূপতির সর্বনাশের মধ্যে অমল যে অকথিত সমস্যার প্রলয়াচ্ছন্নতা হঠাৎ আবিষ্কার করলো, আর অমলের অকস্মাৎ অন্তর্ধানের প্রেক্ষাপটে চারু যে আত্ম-আবিষ্কার করলো, এ দুইকে দুর্নৈতিক বলবো কোন্ মূঢ়তায়! সুবৃহৎ গল্পের অতি সংক্ষিপ্ত সমাপ্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটি কথাই কেবল বুঝি,—মানুষের মন বিচিত্র, জটিল, দুরবগাহ;—মানুষের যুগযুগ সঞ্চিত আদর্শবাদ ও বিবেকবুদ্ধির সব কিছু দিয়েও তার অতলান্ততার পরিমাপ হয় না। সেই অন্তহীন জিজ্ঞাসার সম্মুখে স্তব্ধ হয়ে, নম্রশিরে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়;—মানুষের জীবনে অনন্ত-প্রাণকে প্রণাম করেই এই সমাপ্তিহীন রহস্যযাত্রা সাঙ্গ করতে হয়। ধাপে ধাপে সুকল্পিত বর্ণনা ও বিশ্লেষণের বিন্যাসে জীবনের সেই সীমাহীন জিজ্ঞাসার প্রান্তরে বাংলা গল্পকে প্রথম টেনে এনেছে 'নষ্টনীড়'। এখান থেকেই মনো-বিকলনাশ্রিত আধুনিক বিজ্ঞান-এষণাময় জীবন-চিন্তার অগ্রসৃতি।

'নষ্টনীড়'-এ এই মনোবিকলন ও বিশ্লেষণ সুচয়িত ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়ে এত বিস্তারিত এবং আমূল সম্পূর্ণ হয়েছে যে, এই গল্পের ছোটগল্প-ত্ব সম্বন্ধেই কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছেন। এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আগে 'চোখের বালি' ও 'নষ্টনীড়'-এর তুলনামূলক বিচারপ্রসঙ্গে।[৬১] বস্তুত উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের পার্থক্য পরিধির বিস্তার বা বিশ্লেষণের প্রকৃতি দ্বারা নির্ণীত হয় না। পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, উপন্যাসের প্রসঙ্গে জীবন-চেতনার 'entirety'-র ওপরে জোর দিয়েছেন Ralph Fox

৬১। দ্রষ্টব্য—বর্তমান গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়।

এবং অন্যান্য প্রায় সকল বিচারকেরা। আর ছোটগল্পের রসপরিস্রুতির ব্যাখ্যা করতে Poe জোর দিয়েছেন 'totality'-র ধারণার ওপরে। সাধারণভাবে শব্দার্থ দুটিতে পার্থক্য কিছু নেই, কিন্তু বিশেষার্থে আছে। 'Entirety' বলতে বুঝি আদি-অন্তে অ-ভঙ্গ ('unbroken'—'Shorter Oxford Dictionary') সম্পূর্ণতা। আর 'totality' কথাটি Poe যেভাবে ব্যবহার করেছেন, তাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-নিরপেক্ষ পরিণামী অখণ্ডতার কথাই বুঝি বিশেষভাবে। জানি, এ আলোচনা নিতান্ত স্থূল হবে, তবু 'নষ্টনীড়'-প্রসঙ্গে এই অর্থ-পার্থক্যের প্রয়োগগত বিশিষ্টতা লক্ষ্য করে দেখব। এই গল্পে চারুর জীবন বর্ণনাকে 'entire',—আদি-অন্তে সম্পূর্ণ অভঙ্গ বলা চলে না। চারুর মধ্যে একটি বিশুদ্ধ নারী-সত্তা যেমন ছিল, তেমনি একটি সামাজিক চেতনা ও অবস্থানের প্রভাবকেও অস্বীকার করবার উপায় তার ছিল না। সে হিন্দু পরিবারের বিবাহিতা বধূ, যৌথপরিবারের কর্ত্রী, হিন্দু সমাজের সামাজিকা। এহেন অবস্থায় ভূপতির অবচেতন উপেক্ষার অন্তরাল বেয়ে অমলের সঙ্গে তার নবস্ফুজ্যমান মন দেওয়া-নেওয়ার ধারা অপ্রতিহত বেগে চল্‌তে পারত না। চারুর প্রতি অভিমান-ভরে অমল যখন মন্দাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিল, তখন স্বয়ং চারু ভূপতির কাছে এ-বিষয়ে অভিযোগ করেছিল। অমলের সম্পর্কে অতি-আসক্তি নিয়ে স্বামীর প্রতি অসংগত অবিচার করছে মন্দা, এমন কথাও ভেবেছিল, এমন কি মুখ ফুটে বলেও ছিল চারু। অথচ চারু যখন সেই সংগতির মাত্রা সহস্রগুণে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, তখন মন্দা অথবা পরিবারের আর কেউ, কিংবা পাড়ার কোনো প্রতিবেশিনী সে কথা নিয়ে কখনোই আলোচনা করেনি। কানাঘুসায় সে কথা পৌছায়নি চারুর কানে। এমন কি বিবাহিতা হিন্দুনারীর সংস্কারও চারুর মধ্যে গোপনে মাথা তোলেনি কখনো। তা যদি হত, তবে চারুর নারীসত্তা, সামাজিক অস্তিত্ব এবং বিবাহিত জীবনের কর্তব্য-সংস্কার মিলে যে সংঘাত ও আবর্ত সৃষ্টি করতে পারত, তার রক্তক্ষরা ছড়ের আঘাতে চারুর আদি-অন্তে অভঙ্গ জীবনের পরিচয় অবিষ্কার করতে পারতাম আমরা। উপন্যাসের জীবন-চেতনার পক্ষে বিস্তার অপরিহার্য কেবল এই আবর্ত-জটিলতায় বিদ্ধ আদ্যন্ত সম্পূর্ণতার জন্য। জীবন-বর্ণনার অভঙ্গ পূর্ণতা উপন্যাসের উপাদান; বিচার এবং বিশ্লেষণ ঔপন্যাসিকের হাতের হাতিয়ার। 'নষ্টনীড়'-এ জীবনসমস্যার সেই অভঙ্গতা নেই, প্রয়োজন নেই বলেই সেই সুতীক্ষ্ণ বিচারেরও অভাব রয়েছে। অথচ অসম-মর্মী স্বামীর এড়িয়ে চলার পটভূমিতে সমাজকুণ্ঠিত পথে চারুর নারীত্বের অবাধ অভিসার একটানা সুরের মতো অখণ্ডতা নিয়ে শেষ পরিণামের মুখে পৌচেছে;—Stevenson-এর ভাষায়, একের পর এক incidentগুলোর উত্থান-পতন 'notes of music'-এর মতো বেজে উঠেছে।

তাতে মনোবিকলন আছে, কিন্তু ঔপন্যাসিক অর্থে মনোবিশ্লেষণ নেই। প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভূপতি যেদিন চারুর ঘরে ছুটে এসেছিল শেষ আশ্রয় খুঁজবার জন্যে, শরৎচন্দ্রের ভাষায় তার বিশ্লেষণ করা যেত। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে অভাগীর অন্তিম মুহূর্তে তার স্বামী রসিক বাঘের উপস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,—"জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালবাসা দেয় নাই, অশনবসন দেয় নাই, কোনো খোঁজ খবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু পায়ের ধূলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ভূপতি সম্বন্ধেও বলতে পারি,—জীবনে যে স্ত্রীকে স্নেহ করলেও শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিতে পারেনি,—যার নারীমনের 'অশন-বসন' যোগাবার কথা কোনোদিন ভাবেওনি,—চরম রিক্ততার দিনে তারই কাছে পরম আশ্রয় ভিক্ষা করতে গিয়ে ভূপতিকে আঘাত-জর্জরিত হয়ে ফিরতে হল। এই ব্যাখ্যা আর মনোবিশ্লেষণ ঔপন্যাসিকের। রবীন্দ্রনাথ কখনো তা করেননি; করতে চাইলেও সফল হতেন না। তাঁর হাতের লেখনী ছোটগল্প-শিল্পীর, বর্ণনার মধ্যেও ইঙ্গিত এবং ব্যঞ্জনাব ঝঙ্কার পুরে দিয়ে খণ্ড-সীমিতের মধ্য থেকে অসীম অখণ্ডের সুরটুকু জাগিয়ে তোলার সাধনা তাঁর। গল্পের শেষ চারটি বাক্যে চারু-ভূপতির কথোপকথনে সেই ব্যঞ্জনা, সেই সুর অখণ্ড ঘনতা আয়ত্ত করেছে। 'নষ্টনীড়' আশ্চর্য সফল এক ছোটগল্প।

মনের খবরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে মনোবিকলনমূলক এমন সার্থক গল্প অনেক কয়টিই লেখা সহজ ছিল না। তাই এই পর্যায়ের সব গল্প সমান রসোত্তীর্ণ নয়। 'গুপ্তধন,' 'রাসমণির ছেলে,' 'পণরক্ষা' প্রভৃতি আখ্যানমূলক এমন সব গল্প রয়েছে, যারা tale-এর পর্যায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। অবশ্য এই সব গল্পে মনস্তাত্ত্বিক সন্ধিৎসাও নেই মোটেই। 'মাল্যদান' গল্পে আবার দেখি সেই মন দেখবার প্রয়াস। এই গল্পে কবি যেন নারী-মনের চিরন্তন রহস্যের অতলে ডুব দিয়েছেন। সেই অবচেতনার গভীরে বসে একটু একটু করে নারীত্বের ঊষা-বিকাশকে প্রত্যক্ষ করেছেন, নিজের পৌরুষ-সিক্ত শিল্পি-আত্মা দিয়ে করেছেন উপভোগ। বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে শ্যামাসুন্দরী কপালকুণ্ডলাকে পুরুষ-স্পর্শমণির কথা বলেছিল। যতীনের মধ্যে সেই স্পর্শমণির ছোঁয়া পেয়েছিল কুড়ানির আজন্ম-আচ্ছন্ন নারী-আত্মা। 'মাল্যদান' গল্পকে সাধারণ অর্থে মনোবিকলনমূলক বলা চলে না, এতে যা আছে তা মন-উন্মোচন। অপরূপ কাব্য-কৌশলে রবীন্দ্রনাথ কুড়ানির নিদ্রিত মনকে ভাঁজে ভাঁজে খুলে দেখেছেন;—খুল্‌তে খুল্‌তে আহ্লদয় পান করেছেন সেই মধু-সৌরভ। এই গল্পের এক বৃন্তে যেন দুটি ফুল ফুটেছে,—তারা রোমান্স আর বাস্তব দিয়ে গড়া। তবু কবি বুঝি শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। কুড়ানির হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে কাহিনী শেষ করতে পারলে তার ছোটগল্প-ধর্ম অক্ষুণ্ণ থাক্‌তে পারত। কিন্তু

আখ্যানের লোভ কবিকে পেয়ে বসেছিল। তাই ছোটগল্প শেষ হবার পরেও গল্প যেখানে শেষ হল, সেখানে মাধুর্য আছে, কারুণ্য আছে, ব্যঞ্জনাও আছে। কিন্তু কবির ভাষায়, গল্প শেষে 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'—ছোটগল্প গুণের এই অনুভবটি সর্বাঙ্গব্যাপক হয়ে থাকেনি। সমাপ্তির পূর্ণচ্ছেদ ছোটগল্পের চির-অশেষতার রহস্যধর্মকে ধরে বাখতে না পেরে অনেকটা যেন ফিকে করে দিয়েছে।

এই যুগের 'কর্মফল' গল্পটি লিখেছিলেন ফরমায়েস-এর তাগিদে—কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গে। কুন্তলীন তেলের কোম্পানী প্রায় প্রতি বছর একটি গল্পকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দিতেন ; গল্পের মধ্যে নিতান্ত প্রাসঙ্গিকভাবে কুন্তলীনের দেলখোস তেলের উল্লেখ থাক্‌বে—এইটুকুই ছিল একমাত্র শর্ত। এই গল্পটির উৎকর্ষ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সংঘাত-সংশয়ের গতিশীল ভঙ্গিতে লেখা এই রচনায় একটি নাটকীয় আবহময় পরিবেশ সৃষ্ট হতে পেরেছে। পরবর্তী কালে কবি এর সদ্ব্যবহার করেছিলেন 'কর্মফল' গল্পকে 'শোধবোধ' নাটকে রূপান্তরিত করে (১৩৩১ বাংলা সাল)।

৪। রবীন্দ্র-গল্পে 'সবুজপত্রে'র যুগ

দ্বিতীয় পর্যায়ের রবীন্দ্র-গল্পধারাতে আবার এক নূতন প্রকৃতি বিকশিত হতে লাগল 'সবুজপত্র' পর্যায় থেকে। প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৩২১ বাংলা সালের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র-জন্মদিনে 'সবুজপত্রে'র প্রথম প্রকাশ। মাস কয় আগে কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির খবর ঘরে-বাইরে অপার চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। 'সবুজপত্র' প্রকাশের মাসেক পরে নতুন চাঞ্চল্যের সঙ্গে বিভীষিকা নিয়ে এল বিশ্বব্যাপী প্রথম মহাসমর। নোবেল পুরস্কার লাভ কবির পক্ষে অমিশ্র আনন্দের কারণ হয়নি, দুঃখের অভিঘাত-ও সে বয়ে এনেছিল। শান্তিনিকেতনে দেশবাসীর সম্বর্ধনার উত্তরে কবি নিজে একথা বলেছিলেন,—তার পরের আঘাত তাঁর পক্ষে ছিল আরো অস্বস্তিকর। অন্যদিকে তাঁর পরিবেশ-সচেতন জীবন-প্রিয় চেতনা মহাযুদ্ধের আঘাতেও আমূল চকিত হয়ে উঠেছিল। 'মনুষ্যত্বের ভবিষ্যৎ' এবারে অনায়াসে কবির সন্ধিৎসার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। তাতেই ঘট্‌লো কবি-প্রকৃতির এক নূতন পরিচয়ের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি ছিলেন না,—তিনি কবি-মনীষী। একেবারে প্রথম বয়স থেকেই তাঁর কাব্য-কবিতাতেও গভীর উপলব্ধির সঙ্গে জ্ঞান-মনীষার অচ্ছেদ্য পরিণয় বন্ধন ঘটেছিল। 'প্রভাত সংগীতে'র 'অনন্ত জীবন,' 'অনন্ত মরণ' কবিতায় কবির এই দ্বৈত-হয়েও-অদ্বৈত স্বভাবের প্রথম সংশয়হীন প্রকাশ।

"যতবর্ষ বেঁচে আছি ততবর্ষ মরে গেছি
মরিতেছি প্রতি পলে পলে
জীবন্ত মরণ মোরা, মরণের ঘরে থাকি
জানিনে মরণ কারে বলে।"—

—'অনন্ত মরণ' কবিতার একটুকরো এই অংশ।

পরে কবি বলেছেন এই সব কবিতায় উপলব্ধির নিবিষ্টতার চেয়ে একটা মত প্রকাশ করার ঝোঁক বেশি ছিল। তা হলেও প্রথম যৌবনেই শিল্পীর প্রাণের প্রবণতা যে বিশেষ পথ ধরে চলেছিল, সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে এসে উপলব্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছে স্পষ্ট ব্যঞ্জনাময়ঃ "জীবন্ত মরণ মোরা, মরণেব ঘরে থাকি জানিনে মরণ কারে বলে।"

জানার সঙ্গে অনুভবকে, মনীষার সঙ্গে উপলব্ধিকে প্রাণের একই বন্ধনে বেঁধে একান্ত মিলিয়ে নিয়ে চলার সাধনাই ধাপে ধাপে বিকশিত হয়েছে রবীন্দ্র-সৃজন-ধারায়। 'সোনার তরী'-'চিত্রা'র 'সমুদ্রের প্রতি', 'বসুন্ধরা,' এমন কি 'মানস সুন্দরী' কবিতাতেও এই দুই উপাদানের পরিণয় বন্ধন কবির আত্মিক গ্রন্থি, বন্ধনে চিরস্থায়ী হয়ে উঠেছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রথমোক্ত কবিতাটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিজ্ঞান-বিষয়াশ্রিত রসোত্তীর্ণ কবিতা বলেছেন। 'সোনার তরী'-'চিত্রা' কাব্যে যে কবি-মনীষা জ্ঞান-পথের পথিক, 'নৈবেদ্য'-যুগে নূতন পথ পরিবর্তন করে সে আধ্যাত্মিক ভাবনা ও বিশ্ব-চিন্তার অভিমুখী হয়েছিল। 'সবুজপত্র যুগে'র গল্পগুলি 'বলাকা' কাব্যঋতুর সমসাময়িক। সেইকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-আধ্যাত্মিকতার সকল পথ ঘুরে কবির উপলব্ধির নৌকো জীবনের ঘাটে ঘাটে ফিরে এবার পরিণতির তীর্থ-মন্দিরের অভিমুখী হয়েছে। এখানে বলবত্তম মনীষা অখণ্ডতম উপলব্ধির সঙ্গে হরগৌরী সম্মিলনে বাঁধা পড়েছে। এবারে কবির লেখায় কি গদ্যে, কি পদ্যে, কি উপন্যাসে-গল্পে-প্রবন্ধে, সর্বত্র এক অপূর্ব আলোকের দীপ্তি ঠিক্‌রে পড়েছে। এ যেন নিজের শক্তিকে সম্পূর্ণ জানতে পারার প্রশান্ত প্রত্যয়ের আকাশে সহজ-স্ফূর্ত বুদ্ধির ধারালো বিদ্যুৎ-ঝলক। এই সময় থেকে কবির মুখের কথা কেবল বাচ্যার্থকে নয়, ব্যঙ্গ্যার্থকেও ছাড়িয়ে গেছে ;— প্রকাশশৈলী একই সঙ্গে হয়ে উঠেছে তীব্র ধারালো,—এবং সাংকেতিক। বিশ্বসম্মান লাভের দায়িত্ব স্বীকার করে এবং বিশ্ব-বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি-আত্মাও এই পর্যায়ে তার জীবন-জিজ্ঞাসাকে প্রাণের উত্তাপ দিয়ে অখণ্ড সম্পূর্ণ করে দেখতে চাইছিল। তাই ভাষার মধ্যে দূরধানিতা যেমন ছিল, তেমনি প্রবল ছিল বুদ্ধিদীপ্ত তীব্রতা আর তির্যক ভঙ্গীও। ফলে, এই সময়কার রচনাপ্রবাহ বিশেষ করে চেতনাকে আঘাত যত করে, আন্দোলিত

করে তার চেয়ে বেশি,—প্রায় আমূল। 'সবুজপত্র'-যুগের কবিতা ও প্রবন্ধের মত ছোটগল্পেও কবি-মনের এই নব প্রকৃতি প্রকাশ-প্রকরণকে নূতন রূপ দিয়েছিল।

'সবুজপত্রে' প্রকাশিত প্রথম গল্প 'হাল্‌দার গোষ্ঠী' (বৈশাখ, ১৩২১)। একদিক থেকে 'নষ্টনীড়'-এর (১৩০৮ সাল) সঙ্গে এই গল্পের যোগ আছে। আমাদের গতানুগতিক অন্ধ জীবনযাত্রার ফলকে সদ্যজাগ্রত নারী-ব্যক্তিত্বের নবজন্ম-পীড়াকেই কবি চারুর মধ্যে একটু একটু করে ধাপে ধাপে এঁকেছেন। 'হাল্‌দার গোষ্ঠী' গল্পে সেই বেদনা যন্ত্রণারই উল্টোপিঠ আঁকা হয়েছে লাঞ্ছিত-পৌরুষ বনোয়ারীর অজেয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে। এক দিক্ থেকে 'সবুজপত্র'-যুগের সব কয়টি গল্পই পুরাতন প্রসঙ্গ। সেই দেনাপাওনা নিয়ে বধূর ওপরে অত্যাচার ['হৈমন্তী'], অথবা বিয়ের রাতে গয়নাগাটির হিশাব নিয়ে বরপক্ষের নির্লজ্জ গৃধ্নুতা ['অপরিচিতা'], ধর্মাধিকারী গুরুর গোপন লালসাবৃত্তি ['বোষ্টমী'], কিংবা পারিবারিক আভিজাত্য ও অন্ধ ঐতিহ্য-গৌরবের দম্ভে নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে ব্যক্তিত্বের —প্রাণধর্মের অকথ্য নির্যাতন ['স্ত্রীর পত্র' এবং 'হালদার গোষ্ঠী'] ইত্যাদি। কিন্তু সব গল্পেই পুরাতন জীবনের পাতায় নূতন প্রত্যয়ের ছবি এঁকেছেন কবি,—নবীন প্রাণের তুলি দিয়ে। 'সবুজপত্র' বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে'র পরে প্রথম বিদ্রোহী বাংলা সাহিত্য-পত্র। এর সকল বিদ্রোহ ছিল গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে, বুদ্ধি-বর্জিত বিশ্বাসের অন্ধকারে পোয়মান জীবনকে কোনো রকমে টিঁকিয়ে রাখার বিরুদ্ধে,—শান্তির নামে নির্জীবতার কৃত্রিম সাধনার বিরুদ্ধে। 'সবুজপত্র'-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী এই বিদ্রোহের দূত হিশাবেই বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়।

"বাংলার মন যাতে বেশি ঘুমিয়ে না পড়ে" সেই চেষ্টা করাই 'সবুজপত্রে'র অন্যতম লক্ষ্য বলে প্রথম সংখ্যাতেই উল্লিখিত হয়েছিল।

এই ঘুমিয়ে পড়া মনের বিরুদ্ধেই 'সবুজপত্র'-যুগের রবীন্দ্র-মনের ছিল শ্রেষ্ঠ অভিযান। ঘরে-পরে মানুষের যা কিছু দুর্ভোগ আর দুর্গতি সেদিন দেখা গিয়েছিল, সব কিছুর পেছনেই গতানুগতিক জীবনাচরণের অন্ধতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন কবি। প্রাণের গতিপথকে সংস্কার ও অর্থহীন আদর্শবাদের খাঁচায় সে পুরে রাখে। বিশেষ করে সেকালের বাংলাদেশের জীবনযাত্রায় প্রতিফলিত চিরকেলে সেই খাঁচার ছবি আঁকলেন 'সবুজপত্রে'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে :—খাঁচা ভাঙবার শক্তি-ব্যাকুল আহ্বান জানালেন ঐ একই সংখ্যায় প্রকাশিত 'সবুজের অভিযান' কবিতায়। এ-সময়কার গল্পগুলোতেও আছে খাঁচায় বন্ধ থাকার তীব্র যন্ত্রণা, অথবা খাঁচা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার দৃপ্ত সাধনা। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে কবি লিখেছিলেন—"প্রাণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে, সমস্তকেই সে পরখ করিয়া দেখে। নূতন অভিজ্ঞতার

পথ ধরিয়া সে আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া চলিতে চায়। প্রাণ দুঃসাহসিক বিপদের ঠোকর খাইলেও সে আপনার জয়যাত্রার পথ হইতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে চায় না। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি প্রবীণও আছে, বাধার বিকট চেহারা দেখিবামাত্রই সে বলে, কাজ কি! বহু পুরাতন যুগ হইতে পুরুষানুক্রমে যত কিছু বিপদের তাড়না আপনার ভয়ের সংবাদ রাখিয়া গিয়াছে তাহাকে পুঁথির আকারে বাঁধাইয়া রাখিয়া একটি বৃদ্ধ তাহারই খবরদারি করিতেছে। নবীন প্রাণ এবং প্রবীণ ভয়, জীবের মধ্যে উভয়েই কাজ করিতেছে। ভয় বলিতেছে, 'রোস রোস', প্রাণ বলিতেছে, 'দেখাই যাক্ না!'

"অতএব, এই প্রবীণতার বিরুদ্ধে আমরা আপত্তি করিবার কে? আপত্তি করিও না। তাঁহার বৈঠকে তিনি গদীয়ান হইয়া থাকিবেন, সেখান হইতে তাঁহাকে আমরা নড়িয়া বসিতে বলিব এমন বেআদব আমরা নই। কিন্তু প্রাণের রাজ্যে তাঁহাকেই একেশ্বর করিবার যখন ষড়যন্ত্র হয় তখনই বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া বাহির হইবার দিন আসে।"[৬২]

'সবুজপত্রে' কবিতা ও প্রবন্ধের মত গল্প-উপন্যাসেও কবি এই বিদ্রোহের ধ্বজা ধরে বেরিয়েছেন। 'সবুজের অভিযান' প্রবীণের ভয়-মুক্ত নবীন প্রাণের অভিযান 'হালদার গোষ্ঠী'র বনোয়ারী সেই প্রথম অভিযাত্রী, প্রাণের দাবিতে হালদার পরিবারের প্রাবীণ্যের খাঁচা থেকে যে চিরকালের জন্যে মুক্ত হয়ে চলে গেছে।

'নষ্টনীড়'-এর মত গল্পে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পূজায় কবি দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এবারে তিনি বিদ্রোহী, আর সে বিদ্রোহের শিল্পমূর্তি রচনা করেছে তাঁর পরিণততম শিল্পি-মনীষা। তাই এই গল্পে ব্যক্তিত্বের স্বধর্ম ও স্বরূপ উন্মোচন বিস্ময়কর কাব্যগুণে মণ্ডিত :—

"প্রেমের নিবিড়তায় সকলের তো প্রয়োজন নাই; সংসারের ছোটো কুন্‌কের মাপের বাঁধা বরাদ্দে অধিকাংশ লোকের বেশ চলিয়া যায়। সেই পরিমিত ব্যবস্থায় বৃহৎ সংসারে কোনো উৎপাত ঘটে না। কিন্তু, এক-এক জনের ইহাতে কুলায় না। তাহারা অজাত পক্ষিশাবকের মত কেবল মাত্র ডিমের ভিতরকার সংকীর্ণ খাদ্য রসটুকু লইয়া বাঁচে না, তাহারা ডিম ভাঙিয়া বাহির হইয়াছে, নিজের শক্তিতে খাদ্য আহরণের বৃহৎ ক্ষেত্র তাহাদের চাই। বনোয়ারী সেই ক্ষুধা লইয়া জন্মিয়াছে, নিজের প্রেমকে নিজের পৌরুষের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য তাহার চিত্ত উৎসুক, কিন্তু যে দিকেই সে ছুটিতে চায় সেই দিকেই হালদার গোষ্ঠীর পাকা ভিত; নড়িতে গেলেই তাহার মাথা ঠুকিয়া যায়।"

এ বর্ণনায় প্রাণকে অনুভব করার কবি-শক্তির মূলে রয়েছে প্রাণভেদী বৌদ্ধিক (intellectual) অন্তর্দৃষ্টির বিদ্যুৎ দীপ্তি। এই বৌদ্ধিক অনুভব-ঋদ্ধতার গুণেই

৬২। দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ—'কালান্তর'—রবীন্দ্র রচনাবলী—২৪।

এ-যুগের রচনা তির্যক্, এমন কি সাংকেতিকও হয়ে উঠেছে। বাঁধন-ভাঙার বিদ্রোহী সুরেও সকল গল্পের সাধারণ সাধর্ম্য। বিভিন্ন যন্ত্রের আধারে জীবনের একই সুর ধ্বনিত হয়েছে এই সময়কার সকল গল্পে। নিজের পৌরুষের মূল্য দিয়ে নিজের প্রেমকে সম্পূর্ণ করে তোলার সুযোগ না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিল বনোয়ারীর প্রাণ, তার বিদ্রোহী আত্মা হালদার গোষ্ঠীর খাঁচা ভেঙে তবেই শান্ত হতে পেরেছিল। এই বিদ্রোহের সুর তীব্রতম হয়ে আছে 'স্ত্রীর পত্র'-তে। সাতাশ নম্বর মাখন বড়াল লেনের মেজবৌ মৃণাল পনেরো বছরের দাম্পত্য জীবনের অন্ধকূপ থেকে পালিয়ে এসে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে প্রথম জানতে পেরেছে,—"আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে।" মাখন বড়াল লেনের ডিমের খোলস বিদীর্ণ করে তাই মৃণালের নূতন অভিযান অনন্তের পথে যেখানে সে জেনেছে,—"মীরাবাঈও তো আমারই মত মেয়েমানুষ ছিল—তার শিকলও ত কম ভারী ছিল না, তাঁকে ত বাঁচবার জন্যে মরতে হয়নি। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল,—'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল প্রভু—তাতে তার যা হবার তা হোক।' এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা।"

এ কেবল বিদ্রোহ নয়—একসঙ্গে বিপ্লব ও বিপ্লব-শান্তি। প্রাণের তপ্ত রক্তধারা দিয়েই এই শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন কবি,—শান্তির অছিলায় প্রাবীণ্যের মত জরা মরতাকে প্রশ্রয় দেননি। বিদ্রোহ কেবল ভাঙা নয়, ভাঙার পরে গড়ে তোলাও। বরং গড়বার জন্যেই যে-ভাঙা, তাইত সার্থক বিপ্লব! মৃণাল যদি কেবল আক্রোশের বশে মাখন বড়াল লেনের খাঁচা ভেঙে আসত, তা হলে তার মধ্যে প্রাণের পরাভবই ঘটত—যে প্রাণের স্বাভাবিক ধর্মই হচ্ছে,—কবি বলেছেন,—"নূতন নূতন অভিজ্ঞতার পথ ধরিয়া আপনার অধিকার বিস্তার" করা। অসত্যের কৃত্রিম জড়তা কাটিয়ে মৃণাল সত্যের সঙ্গে লেগে রইল,—সেই "লেগে থাকাইত বেঁচে থাকা"।

'নষ্টনীড়ে'র জীবন-জিজ্ঞাসা বিরাট প্রশ্ন-চিহ্নের সামনে থম্‌কে দাঁড়িয়েছে। 'স্ত্রীর পত্রে' শিল্পী সেই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন; তাই এই পর্যায়ের গল্পগুলি যেখানে এসে থাম্‌লো সেখানে জিজ্ঞাসা-চিহ্নের রহস্য-ব্যঞ্জনা নেই,—আগে-পিছে রয়েছে অন্তহীন পথ-চিহ্নের অসীম সংকেত। 'বোষ্টমী' গল্পে সেই সংকেত আরো স্পষ্ট, উজ্জ্বল। বোষ্টমী যে খাঁচা ভেঙেছে, সে গুরুবুদ্ধি ও অন্ধ সংস্কারের;—অন্ধ আত্মাদরেরও। অপরূপ সুন্দরী ছিল আনন্দী, তা ছাড়া স্বামীর যৌন-গভীর প্রাণের অজস্র দাক্ষিণ্য লাভ করেছিল যৌবনের নবউন্মেষিত প্রভাতে। অত-পাওয়া,—মূল্য না দিয়ে পাওয়া, তার নিজের মনকে কেবল নিজের ভেতরই ঠেলে ঠেলে দিচ্ছিল। ডিমের কুসুম খোলসের ভেতরে জমে জমে যাচ্ছিল বাইরেকে দেখ্‌বার, তাকে যোগ্য মূল্য দেবার সাধ এবং সাধ্য আচ্ছন্ন হয়েছিল সেদিন

আনন্দীর মধ্যে ;—তার "গোপাল আসিয়া দেখিল, তখনো তাহার জন্য ননী তৈরি নাই, তাই সে রাগ করিয়া চলিয়া গেছে।" ছেলেকে কোলে পেয়ে আনন্দী মা হতে পারেনি ; ছেলেকে অনাদরে হারিয়ে তার অতৃপ্ত মাতৃত্ব উদ্বাহু দুরন্ত শিশুর মত লাফিয়ে উঠেছিল। আনন্দীর ছেলেই নিজের মৃত্যু দিয়ে তার আত্মাদরের ডিমের খোলস বিদীর্ণ করে দিয়ে গেল। তাই গুরু যেদিন আনন্দীর স্নান-সিক্ত দেহ-সৌন্দর্যের উল্লেখ করেছিলেন, সেদিন আর সে ঘরে থাকতে পারেনি। তার স্বামী তার মনটা একরকম করে দেখে নিয়েছিল,—তবু হয়ত তারা একসঙ্গে ঘর করতে পারত ; কিন্তু সে ঘর আনন্দী নিজে হাতে ভেঙে দিয়ে এসেছে। কারণ, পৃথিবীতে দুটি মানুষ তাকে ভালবেসেছিল ;—ছেলে আর স্বামী। আনন্দী বলেছে,—"সে ভালবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল। একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর ফাঁকি নয়।"

রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি থেকেই জানা যায় এই বোষ্টমী তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার সৃষ্টি। আনন্দী আসলে কবির শিলাইদহ জমিদারির অধিবাসিনী সর্বখেপী। কবিকে বোষ্টমী 'গৌর' বলতো—প্রণাম করতো,—তাঁর 'প্রসাদ'ও পেত। অপর কেউ তার জীবনের ইতিহাস জানত না।

কবি নিজে বলেছেন,—"বোষ্টমী অনেকখানিই সত্যি।···শেষ অংশটায় কিছু বদল করেছি। বোষ্টমী যে গুরুকে ত্যাগ করেছিল সেটা সত্য নয়—সংসার ত্যাগ করেছিল বটে।"[৬৩] সেই চোখে-দেখা বাস্তবে-জানা ঘটনাকে মনের মাধুরি মিশিয়ে কবি রচনা করেছেন,—ঠিক্ উল্টো করে। এই পর্যায়ের গল্পগুলিকে পূর্ববর্তী রচনার তুলনায় পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্প বলা চলে কি না, তাতে সন্দেহ আছে। কিন্তু সৃষ্টি হিশেবে এরা অনবদ্য। মাঝে মাঝে মনে হয়, গল্পের নাম করে এ-যেন কবির আত্ম-সৃষ্টি। প্রতীচ্য প্রবন্ধ-শিল্পী মতে তাঁর বিচিত্র বিষয়ক 'Essais' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছিলেন, "আমিই আমার গ্রন্থের বিষয়বস্তু।" আলোচ্য পর্যায়ের গল্পগুচ্ছের শিল্পী রবীন্দ্রনাথও একথা বলতে পারতেন। বিচিত্র গল্পের প্লটকে আশ্রয় করে নিজের সমসাময়িক মনের প্রাবীণ্য-বিদ্রোহ ও প্রশান্ত সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রূপ দিয়েছেন কবি ;—এইসব খোদাই-চিত্রে বুদ্ধির হাতিয়ার চালিয়েছে শিল্পীর প্রাণের হাত। কোথাও বা কেবল মুক্তি,—কোথাও মুক্তির সঙ্গে প্রশান্তির সিদ্ধি ; কোথাও বিদ্রোহ,—কোথাও কেবল সয়ে যাওয়া।

'পয়লা নম্বর'-এর অনিলা অনেক দুঃখে সেই মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল,—তার দুপাশে ছিল মাথা ঠুকবার দুই দেয়াল। একপাশে নিজের স্বামী, আর একপাশে

৬৩। পুলিনবিহারী সেন সংকলিত তথ্যপঞ্জী দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ : 'গল্পগুচ্ছ' চতুর্থ খণ্ড।

সিতাংশুমৌলি। জীবনের চোরাগলিতে কোনো দেয়ালের আঁচড়ই সে লাগতে দেয়নি প্রাণের গায়ে। তার মুক্তি আকাশচারী বিহঙ্গমের। 'শেষের রাত্রি' যেন 'পয়লানম্বর' আর 'বোষ্টমী'র উল্‌টো পিঠ। আনন্দীকে জাগিয়েছিল তার ছেলের মৃত্যু,—মণিকে কী যতীন জাগতে দিলো নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে? নিজের স্বামীকে জাগাতে পারেনি অনিলা কোনোদিন,—কিন্তু দূর থেকে সিতাংশুমৌলিকে আমূল নাড়া দিয়েছিল সে। যতীন মাসীর প্রাণের দুলাল, কিন্তু মণির রুদ্ধ মনের দ্বারে মাথাকুটে মরেছে তার ভালবাসা। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্তি এল কী যতীনের জীবনে? 'শেষের রাত্রি'র ভাষায় 'লিপিকা'র সুর,—তার প্রাণে 'লিপিকা'র রহস্য-অপার সংকেত। গল্প নয়,—'শেষের রাত্রি' গদ্যে-লেখা কবি-জীবনের গান।

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যতীনের প্রাণ খাঁচা-মুক্ত হয়েছিল কি না, জানা নেই। কিন্তু 'হৈমন্তী' গল্পের নায়িকা সেই মুক্তির সাধনাতেই নিঃসংশয়ে সিদ্ধ হয়েছে। হৈমন্তী সম্বন্ধে তার স্বামী বলেছিল,—"এই গিরিনন্দিনী সতেরো বৎসরকাল অন্তরে-বাহিরে কত বড়ো একটা মুক্তির মধ্যে মানুষ হইয়াছে। কি নির্মল সত্যে ও উদার আলোকে তাহার প্রকৃতি এমন ঋজু শুভ্র ও সবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইতে হৈম যে কিরূপ নিরতিশয় ও নিষ্ঠুর রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এতদিন তাহা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারি নাই।" কিন্তু সত্যের উদার জীবন-ভূমি থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে আকণ্ঠ মিথ্যার গভীরে প্রোথিত থেকেও হৈমন্তী মিথ্যাকে কোনোদিন বেড়ে উঠতে দেয়নি নিজের জীবনে। নীরব আত্মদান, মৌন কঠোর সংযমের মধ্যে তার ধীর প্রশান্ত জীবনাবসানের দ্বার দিয়ে মিথ্যার জগৎ থেকে মৃত্যুর অক্ষয় সত্যে যেন সে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'অপরিচিতা' গল্প আবার যেন 'হৈমন্তী'র উল্টোপিঠ। মিথ্যার জালে ধরা পড়ে হৈমন্তী মৃত্যুর মধ্যে মুক্তি পেয়েছিল। শম্ভুনাথ সেনের কন্যা কল্যাণী জীবনেই মিথ্যার বস্তুভূমিকে অস্বীকার করে আপন কল্যাণ-ব্রতের সত্য ভূমিকায় অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু এই ধরনের তুলনা ও আলোচনা অশেষ হওয়া উচিত নয়। অন্তত এই ধরনের বিচারে পৃথক পৃথক গল্পের শিল্প-স্বাদুতার পূর্ণ পরিচায়ন অসম্ভব। তবু অত আলোচনার শেষে পুরাতন বক্তব্যকেই আবার স্পষ্ট করে নিতে হয় আলোচ্য যুগে রবীন্দ্রনাথ পদ্মা-ঋতুর তুলনায় প্রত্যক্ষ জীবন-সংযোগবিহীন। তাই যে-জীবনকে মনের চোখে দেখছেন,—প্রাণ দিয়ে জীবনের যে তাপ এবং যন্ত্রণা অনুভব করেছেন,—মনগড়া গল্পের ছাঁচে সেই মনের আকৃতিকেই রূপ দিয়েছেন একে একে। 'মনগড়া' বলতে এখানে বুঝছি এমন সৃষ্টি, কবির মনোজগতেই যাদের জন্ম, অবস্থান এবং বিলয়। 'বোষ্টমী' গল্পে বস্তুর তগানি থাকলেও তাকে মনের মত করতে গিয়ে একেবারে উল্টে দিয়েছেন কবি,—একথা লক্ষ্য

করেছি। তাই বলছিলাম, এই সব গল্পে মনে মনে নিজের মনকেই সৃষ্টি করেছেন শিল্পী; যে-মন, তিনি নিজেই বলেছেন, একান্ত পরিবেশ-সচেতন। সেই সৃজনশৈলীর বিশেষ প্রকরণই ধরা পড়েছে এই সব গল্পের দেহে।

'সবুজপত্রে'র গল্প লেখা শেষ হয়ে গিয়েছিল ১৩২৪ বাংলা সালে,—সবশুদ্ধ দশটি গল্পের প্রথম 'হালদার গোষ্ঠী'।—শেষ, 'পাত্র ও পাত্রী'। তার পরেই এল নতুন 'কথা'র ঝোঁক; কেবল আকারে নয় স্বাদের প্রকারেও এরা অভিনব। কবি কিন্তু নিছক আকারের কথা ভেবেই তাদের নতুন নামকরণ করতে চেয়েছেন 'কথিকা'। প্রমথ চৌধুরীকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমার লেখাটির কি নাম দেব ভেবে পাই নে। 'পুরানো শোক' বোধ হয় চলতে পারে। ছোট ছোট গল্পকে 'কথান্থ' না বলে 'কথিকা' বলা যেতে পারে। 'গল্প-স্বল্প' বলতে ক্ষতি কি?"[৬৪]

এই সব স্বল্প গল্পও 'সবুজপত্র' ঋতুর ফসল; ধরা আছে 'লিপিকা' গ্রন্থে (১৩২৮), 'লিপিকা'র আলোচনা গল্পের পর্যায়ে ফেলে পূর্বাচার্যরা কেউ ই স্পষ্ট করে করতে চান-নি; বরং সকলেই প্রায় একবাক্যে, এবং সংগত কারণেই, বলেছেন 'লিপিকা' একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। রবীন্দ্রনাথ নিজে 'পুনশ্চ'-র ভূমিকায় স্বীকারোক্তি করেছেন, গদ্যকবিতা লিখবার প্রথম চেষ্টা তিনি করেছেন 'লিপিকা'-তেই; সাহসের অভাবে তাকে পদ্যে পংক্তিবদ্ধ করা হয়ে ওঠেনি।

'লিপিকা'য় সংকলিত রচনাগুচ্ছ বিমিশ্র স্বভাবের; রসস্বাদুতার অনুসারেই সম্ভবত তাদের তিনটি ভাগে সাজানো হয়েছে; কালের অনুক্রমে নয়। প্রথম ভাগের চৌদ্দটি রচনার সম্পর্কেই গদ্যকবিতা-ধর্মিতার দাবি সাধারণভাবে গ্রাহ্য বলে মনে হয়। দ্বিতীয় ভাগের সাতটি লেখার মধ্যে প্রথম সংকলিত 'গল্প' ছাড়া বাকি কয়টি গল্পের স্বাদুতাবহ। তৃতীয় ভাগের ১৮টি রচনার[৬৫] অনেক কয়টিতে গল্পের উপাদান থাকলে: স্বাদের পার্থক্য আছে। এই গুচ্ছের একটি রচনা 'স্বর্গ-মর্ত' নাটকের সংলাপিক ভঙ্গিতে লেখা; ডঃ সুকুমার সেন তাতেও গাল্পিকতার উপাদান নির্দেশ করেছেন।[৬৬]

গল্পের উপাদান বলতে খুব ভাসা ভাসা ভাবে হলেও প্লট-এর কথাই মনে আসে,—কথা-বস্তুর স্বাদ যার মূল হতে উৎসারিত। কবিতা,—সে গদ্যকবিতাও যদি হয়, এবং

৬৪। রবীন্দ্রনাথ 'চিঠিপত্র'-৫। প্রমথ চৌধুরীকে লেখা পত্র সংখ্যা ৮০।

৬৫। 'লিপিকা'য় সংকলিত রচনা সংখ্যা ৩৮; রবীন্দ্র রচনাবলীতে (২৬) একটি কথিকা অতিরিক্ত 'সংযোজন' রূপে আছে।

৬৬। সুকুমার সেন—'রবীন্দ্রনাথের গল্পে রূপক ও রূপকথা'। দ্রঃ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (সঃ) 'শত-বার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ'।

যদি হয় বর্ণনামূলক-ও, তাহলেও তার পরিণামী আবেদন মন্ময় উপলব্ধিরই গভীরে, যা অনির্বচনীয়। 'পুনশ্চ' কাব্যের 'কোপাই' কবিতা সম্পর্কেও একথা সমান সত্য। অন্যপক্ষে গল্পের আবেদন কথা-গর্ভ। কবিতা আসলে কথার অতীত। তাহলেও 'লিপিকা'-সংকলনের প্রথম দফা রচনাগুচ্ছ-র উপলক্ষেই 'কথিকা,' 'কথান্থ' কিংবা 'গল্প-স্বল্প' নামকরণের কথা ভেবেছিলেন কবি। পূর্বোক্ত চিঠির তারিখ ছিল '৪ ভাদ্র, ১৩২৬'; ঐ বছরের ভাদ্র-সংখ্যা 'সবুজপত্র'-তে 'লিপিকা'র 'প্রথম শোক' লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবত এই লেখা শেষ করেই তার নাম-পরিচয় সন্ধানের কথা কবির মনে এসেছিল। 'সবুজপত্র' সাধারণত মাসের শেষে প্রকাশিত হত; আর 'কথিকা', শিরোনামেই লেখাটি 'সবুজপত্রে' মুদ্রিত হয়। তাহলেও 'প্রথম শোক' কিংবা 'কৃতঘ্ন শোক' [৬৭] আসলে 'কথিকা'-ই; গল্প-স্বল্প নয়। কথা কম,—কিন্তু অল্প কথার অফুরন্ত রস উপচে পড়েছে চারদিকে নাতিস্পষ্ট বেদনার অন্তহীন মৃদু সুরভির মত; কথা আর কবিতার স্বাদুতায় যেন মেশামেশি হয়েছে।

রবীন্দ্রলেখনীতে এ ধরনের রচনা নূতন নয়; 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১২৯০)' 'আলোচনা' (১২৯২) এবং 'পুষ্পাঞ্জলি'তে ('ভারতী' ১২৯২ বৈশাখ) তার পূর্বরূপ স্পষ্ট হয়ে আছে। প্রথম দুটি বই-এর উপাদান একটি দুটি রচনার আকার ধরে প্রকাশ পেয়েছিল উন্মুখ যৌবনে—কাদম্বরী দেবীর নিভৃত-কবোষ্ণ সান্নিধ্যে। শেষের লেখাটির জন্ম ১২৯১ সালের বৈশাখে তাঁর আকস্মিক অপঘাত-মৃত্যু বরণের তীব্র আঘাতের স্পন্দনে। 'আলোচনা'র একটি লেখায় বলেছিলেন, "যাহা বলিলাম তাহা কিছুই বুঝা গেল না, কেবল কতগুলা কথা কহা গেল মাত্র।[৬৮] কেবল 'কথা-কহার' এই ব্যক্তি-ভোগ্য মন্ময় আস্বাদন-প্রবণতাই 'লিপিকা'রও মুখ্য প্রেরণা; বয়স, পরিবেশ এবং মেজাজের পরিণতি-সূত্রেই তার স্বাদুতার পার্থক্য ঘটেছে। তা না হলে 'সন্ধ্যা ও প্রভাত,' একটি চাউনি', 'কৃতঘ্ন শোক', 'সতেরো বছর,' 'প্রথম শোক' প্রভৃতি 'লিপিকা'র রচনাগুচ্ছ আসলে 'পুষ্পাঞ্জলি'র বেদনানুভবকেই বাণীবদ্ধ করেছে,—সেই একই অনুভব, অভিন্ন বক্তব্যে ধরা দিয়েছে;—বাগ্‌বিন্যাসই কেবল পৃথক। এই আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন, এলাহাবাদে বহুদিন পরে 'নতুন বৌঠান'-এর ছবি দেখে যেমন 'বলাকা'র 'ছবি' কবিতার জন্ম, তেমনি 'পুষ্পাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপি কিংবা 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় তার মুদ্রিত রূপ দেখেই কি 'জীবনের মূল' আলোড়িত করে আবার উঠে এসেছিল সেই পুরাতন শোক ভাবনা![৬৯] তাই হওয়া সম্ভব।

৬৭। প্রথম প্রকাশ—'সবুজ পত্র' ১৩২৬, কার্তিক সংখ্যা।

৬৮। 'ডুব দেওয়া : ছোট বড়'—আলোচনা।

৬৯। দ্র: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড।

কিন্তু ঐটুকুই সব নয়; আসলে 'লিপিকা'র সংকলিত বিচিত্রধর্মী সকল রচনারই মূলে রয়েছে 'সবুজপত্র'-ঋতুর বিশেষ মেজাজ; তার পরিচয় দেখে এসেছি 'বিবেচনা ও ও অবিবেচনা' প্রবন্ধ এবং আনুষঙ্গিক আলোচনায়। বস্তুত কালের দিক থেকে 'লিপিকা'র প্রথম রচনা 'তোতাকাহিনী'-তে[১০] সেই মনোভঙ্গিই স্পষ্ট। পুরাতনের জড়তা, বিশেষ-জ্ঞতার ছদ্মবেশে প্রাণহীন স্থবিরতা ও স্বার্থ-চর্চা – সব মিলে নির্বোধ ভাঁড়ামি আর নিষ্ঠুর প্রাণ-হত্যা,—আমাদের শিক্ষার দুর্গতির প্রতি নীতি-তীব্র কটাক্ষের ইঙ্গিতে তারই পরিচয় দিয়েছেন রূপকে আবৃত গল্পের আধারে। এরই উল্টোপিঠ 'স্বর্গমর্ত' নামক সাংলাপিক বিবরণী। কালের হিশেবে 'লিপিকা'-গুচ্ছের এটি দ্বিতীয় লেখা; রূপকের আকারে জীবনের মৃৎ-সম্ভব সজীব সত্তার মধ্যে আত্মপ্রসারণের আকাঙ্ক্ষায় স্পন্দিত —অনেকটা যেন 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতার ভাবনা 'সবুজের অভিযান'-এর প্রেরণা ও মেজাজে উদ্দীপিত।

কিন্তু 'লিপিকা'র কাব্য কিংবা গল্পগুণ নির্ণয়ে এসব কথাও কেবল প্রাসঙ্গিক। আসলে 'সবুজপত্র'-যুগে রবীন্দ্র-সৃজনী চেতনায় এক আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় যা গিয়ে পৌঁছেছিল 'বিপ্লবের কাছাকাছি';[১১] এবং পদ্যে যত, তার চেয়ে সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন গদ্যের জগতে ছিল প্রবলতর। পদ্যে তখন 'বলাকা'-ঋতুর সূত্রপাত;—মুক্তবন্ধ নূতন ছন্দের পত্রপুটে মননদীপ্ত মানসিকতার নবীন ফসল যেন গদ্য-পদ্যের সীমান্তচূর্ণী দিকৃচক্রবালের প্রত্যাশী হয়ে উঠেছে। দিগন্তকে স্পষ্ট করে স্পর্শ করা গিয়েছিল 'পুনশ্চ'-তে; কিংবা রবীন্দ্রনাথের দাবি অনুসারে 'লিপিকা'-তেই তার সূত্রপাত। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়, "এই নতুন রবীন্দ্রনাথ সমস্ত দিকেই প্রতীয়মান হলেন, কিন্তু কবিতার চেয়েও প্রবলভাবে তাঁকে চেনা গেলো তাঁর গদ্যে।"[১২] ফলে কেবল গদ্য ভাষার নয়, গদ্য-বাণীরও বদল হল;—উপন্যাসে, গল্পে, এমন কি প্রবন্ধে-ও। সৃজনমূলক গদ্যে, অর্থাৎ কথাসাহিত্যে তার ফলে রূপেরও পার্থক্য ঘটে গেল। ১৯১৫ সালে 'বলাকা'র পাশেই প্রকাশিত হল 'ঘরে বাইরে', আর 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস; সদ্য-আলোচিত 'সবুজপত্র' যুগের 'গল্পগুচ্ছ'ও একই সময়ের রচনা। তাই এ-কালের উপন্যাস সম্পর্কে যত, ছোটগল্প সম্পর্কেও বুদ্ধদেব বসুর অনুভব সমপরিমাণেই প্রযোজ্য— "তিনি যা চাচ্ছিলেন, খুঁজছিলেন, পরখ ক'রে-ক'রে দেখছিলেন, তা উপন্যাসের এমন একটি রূপ, যা কবির স্বভাবের পক্ষে অনুকূল। তাঁর ভিতরকার কবিটি যাতে প্রশ্রয় পায়, কবিত্ব সহযোগী হয় কথাশিল্পে, এই ছিলো রবীন্দ্রনাথের সচেতন না হোক অবচেতন

১০। দ্রঃ রবীন্দ্র রচনাবলী ২৬ : 'গ্রন্থপরিচয়' (লিপিকা)।

১১। দ্রঃ বুদ্ধদেব বসু—'রবীন্দ্রনাথ : কথা সাহিত্য'। ১২। তদেব।

মনের লক্ষ্য।"[৭৩] আসলে ঐ অবচেতন বাসনাই 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পেও এই সময়ে কাহিনী-অংশকে সরল করে দিয়ে তার বদলে 'স্বগতোক্তি, মননশীলতা, বিশ্লেষণা পদ্ধতি'র দোলা লাগিয়ে দিল।

তারই বিপরীত ছবি দেখি 'পলাতকা'র (১৯১৮) গল্পে; কবিতার বুক ভরে গদ্যের বেদনাকে বুঝি পুঞ্জিত করে দিলেন শিল্পী। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, বড় মেয়ে বেলা (মাধুরীলতা)-র রোগপীড়িত নিঃসন্তান জীবনের অবসান-সম্ভাবনার প্রচ্ছন্ন চিত্ত-পীড়াই নিভৃত রূপ ধরেছে 'পলাতকা'র একাধিক কবিতা-গল্পে।[৭৪] কবির-বেদনা ঐ সব রচনার গভীরে কাব্য-স্বাদুতার সঞ্চার করেছে; কিন্তু তার মূলে অনুপুঙ্খ, বিস্তারিত, বর্ণনাবাহিত গল্পাবেদনকেও অস্বীকার করবার উপায় কী? 'সবুজপত্র'-যুগের 'গল্পগুচ্ছে' গদ্য-গল্পে 'কবি'কে 'প্রশ্রয়' দেবার আগ্রহ রসপুঞ্জিত; 'পলাতকা'র কবিতায় গাল্পিকের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তি-কবিমনের ব্যথায় স্পন্দিত। 'লিপিকা' এল তারপরে; 'লিপিকা'র যে রচনাগুচ্ছ নিছক 'রূপক' নয় আক্ষরিক অর্থে 'সাংকেতিক', 'প্রথম শোক' থেকেই যদি তার জন্ম হিশেব করি, তাহলে সেছিল ১৩২৬, আষাঢ়—অর্থাৎ ১৯১৯ খ্রীস্ট সাল। এই সব রচনায় 'গল্পগুচ্ছে'র সমকালীন গদ্য-গল্প আর 'পলাতকা'র গল্প-কবিতার সীমান্ত পুরোই ভেঙে-চুরে একে-অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে একাকার হয়ে গেছে। সেখানে কবিতার রস আস্বাদন করতে গেলে 'কথা'র ঝঙ্কার মনের কানে ঝম ঝম করে বাজে, আর কথারস-সম্ভোগের শুরুতেই মনকে গলাতে চায় কবিতার তান। এ-সব রচনা কথা-কাব্য নয় 'স্বার পত্রে'-র মত; কিংবা নয় 'কাব্য কথা', 'পলাতকা' যেমন,—এসব আসলে 'কথা-কবিতা'; অর্থাৎ কথা হয়েও কবিতা; অথবা কবিতা হলেও কথা-স্বাদমুক্ত নয়,—উভয় রসের মিশোল পাকে তৈরি এক অভিনব স্বাদুতার বাহন।

'লিপিকা'র সকল লেখাই এক রকমের নয় দেখেছি আগে; এবং তারা এক সময়ের রচনাও নয়। ১৩২৪-এর মাঘ সংখ্যা 'সবুজপত্র'-তে শুরু হয়ে ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের 'সবুজপত্র', 'প্রবাসী', 'ভারতী', 'মানসী ও মর্মবাণী,' 'আঙ্গুর', 'পার্বণী', 'মোসলেম ভারত', 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা' 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতি সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল সবশুদ্ধ চল্লিশটি রচনা।[৭৫] প্রকাশভঙ্গির কথা ছেড়ে দিলেও কবিমনোভাব, কিংবা 'মুড্'-এর দিক থেকেও এই দীর্ঘকালব্যাপী রচনাধারায় অভিন্নতা প্রত্যাশা করা নিরর্থক। কিন্তু মূল প্রবণতাটি প্রায় সর্বত্রই অভিন্ন; কথা-শিল্পের শরীরে কবির প্রাণ এবং তাঁর অনিবার্য শৈলীকে আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে সহজ সাবলীন হবার প্রচ্ছন্ন অদম্য আগ্রহ।

৭৩। তদেব। ৭৪। দ্রঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী'—দ্বিতীয় খণ্ড।

৭৫। দ্রঃ 'রবীন্দ্র রচনাবলী'-২৬-'গ্রন্থপরিচয়' ('লিপিকা')।

"—পশুপাখির জীবন হল আহার নিদ্রা সন্তান পালন ; মানুষের জীবন হল গল্প। কত বেদনা, কত ঘটনা ; সুখদুঃখ রাগবিরাগ ভালোমন্দের কত ঘাতপ্রতিঘাত। ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার, একের সঙ্গে দশের, সাধনার সঙ্গে স্বভাবের, কামনার সঙ্গে ঘটনার সংঘাতে কত আবর্তন।"—বলেছেন রবীন্দ্রনাথ 'লিপিকা'র 'গল্প'-নামক রচনায়। 'লিপিকা'র গল্পের স্বভাবও তাই ; জীবনের বিন্দু-বিম্বিত বিচিত্র 'আবর্তনে'র রেশ নিয়ে জমেছে যেন গানের তান। সে গান উৎসারিত 'বলাকা'-ঋতুর কবি-ভাবুকতার উৎস হতে, ঐ একই ঋতুর সুতীক্ষ্ণ দীপ্ত মননশীলতার স্পর্শকাতর আবরণে তা সংবৃত। তাই সে-কথা কথার-অতীত-যা, তারই চারপাশে আবর্তিত হতে চায় ; সে ভাষায় তাই ব্যঞ্জনা-কম্পিত উপলব্ধির সংকেত। গল্প এবং গান, কথা আর কবির অনুভূতি, এবং সেই সঙ্গে সাংকেতিকতাগর্ভ বাণীর মিশ্রণে যে তারতম্য, তারই ফলে 'লিপিকা'র বিভিন্ন রচনার স্বাদ পৃথক্ হয়েছে।

'তোতা কাহিনী'র সংকেত আগাগোড়াই বুদ্ধিগ্রাহ্য স্পষ্ট রূপগর্ভ। 'ঘোড়া', 'কর্তার ভূত' প্রভৃতিও তাই ; এগুলো রূপকধর্মী রচনা। কিন্তু :—"বাঁশির বাণী চিরদিনের বাণী—শিবের জটা থেকে গঙ্গার ধারা, প্রতিদিনের মাটির বুক বেয়ে চলেছে ; অমরাবতীর শিশু নেমে এল মর্ত্যের ধূলি নিয়ে স্বর্গ-স্বর্গ খেলতে।

"পথের ধারে দাঁড়িয়ে বাঁশি শুনি আর মন যে কেমন করে বুঝতে পারিনে। সেই ব্যথাকে চেনা সুখদুঃখের সঙ্গে মেলাতে চাই, মেলে না। দেখি, চেনা হাসির চেয়ে সে উজ্জ্বল, চেনা চোখের জলের চেয়ে সে গভীর। আর মনে হতে থাকে, চেনাটা সত্য নয়, অচেনাই সত্য। মন এমন সৃষ্টিছাড়া ভাব ভাবে কী করে। কথায় তার কোনো জবাব নেই।"

'বাঁশি' রচনায় এই সুরে-লেখা কথার মালায়-গাঁথা নিভৃত অনুভবের দোলা, কথায় যার জবাব হয় না।—একে 'কথিকা' কিংবা কথা-শিল্প বলি যদি, তবু গল্পের উপাদান এতে নেই। 'মেঘদূত' সম্পর্কে, কিংবা 'সন্ধ্যা ও প্রভাত'-এর সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলা যায়। 'মেঘদূত'-এর মূল ভাবটির সাদৃশ্য আছে 'মানসীর' 'মেঘদূত' কবিতা, কিংবা 'প্রাচীন সাহিত্য'-র 'মেঘদূত' প্রবন্ধের সঙ্গে। দুই ভাবের মিশ্রণে তৃতীয় যে বস্তুর ব্যঞ্জনা এল তা না-কবিতা না-গদ্য ; কিংবা এ-দুয়ের বিমিশ্রতারও ফসল সে নয়,—সব কিছু মিলে এক নতুন আস্বাদনের দ্যোতনা যেন,—'সন্ধ্যা ও প্রভাত' যেমন 'পুষ্পাঞ্জলি'র গদ্যকাব্য-ভাবুকতার অনুসারী হয়েও আদিগন্ত স্বতন্ত্র।

এ-সব লেখা 'কথিকা'ই ; কিন্তু এমন কি 'গল্প-স্বল্প'-ও নয়। আগে যে অর্থ বলেছি, 'প্রথম শোক' কিংবা 'কৃতঘ্ন শোক'-ও তাই ঐ একই অভিন্ন অর্থে। 'লিপিকায়'

প্রথম পর্যায়ের সবগুলি লেখা সম্পর্কেই একই কথা বলা চলে ; এবং তৃতীয় পর্যায়ের 'প্রথম চিঠি', 'রথযাত্রা', 'সওগাত', 'প্রাণমন', 'আগমনী' সম্পর্কেও।

গল্প-র আদল এসেছে 'লিপিকা'র যে-সব লেখায়, অর্থাৎ স্পষ্ট-আবছা যেমনই হোক্, গল্পের কুঞ্চিকা খুঁজে তবেই যার রসলোকে প্রবেশ করা যায়, তাতেও রূপ-গুণ-রসের পার্থক্য ঘটেছে ঐ মিশ্রণ-জনিত নূতন সারাৎসার গঠনের তারতম্যে। অনেক ক্ষেত্রেই এ-সব লেখার ঝোঁক রূপক পেরিয়ে রূপকথার দিকে। রূপকের সংকেত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অনুভবের মুঠো ভরে পাওয়া যায় সেই স্থূল রূপের তাৎপর্য ; কথায় ধরা যায় কথার অর্থ আর পূর্বনির্দেশিত 'কথিকা'য় রূপকের স্পষ্টতা নেই বলে কথার রস থাকলেও, যার নাম কথাবস্তু বা গল্প, তা অনুপস্থিত। 'রূপকথা'য় কথার বায়বীয় মায়াও থাকে, আর থাকে কিছু বস্তু-উপাদানও,—'রূপকথা'কে যা গল্প-রসেও রসান্বিত করে। এই বিশিষ্ট শৈলীতে রূপকথা কেবল শিশু-সাহিত্য নয় ; দক্ষ শিল্পীর হাতের পরিপূর্ণ সৃষ্টি। অবনীন্দ্রনাথের হাতে এই গুণেই এমন কি শিশুগল্পও বড়োদের আপন হয়েছে ;[৭৬] 'গল্প-সল্প'তে রবীন্দ্রনাথ নিজের মত করে সেই কলাশিল্পের অনুসরণ করেছেন। 'লিপিকা'তেও ঐ একই প্রকরণ, কিন্তু পার্থক্য হল, এ-লেখা শিশুর নয় একেবারেই ; শিশুগল্পধর্মী রূপকথার রূপাধারে বড়োদের গল্পই কেবল। অথচ তার রসগ্রহণের পন্থাটি শিশুগল্পের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। বিশ্বের সম্পর্কে কৌতূহলী মনের অন্তহীন জিজ্ঞাসা যেখানে বিস্ফারিত-দৃষ্টি আদিগন্ত বিস্ময়-চিহ্নের আকার ধরেছে, সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে শিশু সেই অনন্ত-রসকেই অধীর আগ্রহে পান করে না ঠিক, গিলতে থাকে যেন। 'লিপিকা'র গল্পরসের আস্বাদনও সেইখানে চূড়ান্ত, গল্প-রূপের আধারে পরিণত মন যেখানে অসীম-অরূপ অনন্তরসের স্পর্শই কেবল যাচ্ঞা করে, কিংবা উন্মুখ হয়ে থাকে সেই স্পর্শ লাভ করতে। 'সীমার মাঝে অসীম' যেন 'আপন সুর' বাজিয়ে মোহমুগ্ধ করে রাখেন,—রস-সংপূর্ণ মানসে কেবলই মনে হয় একি গল্প, একি কবিতা,—কিংবা কিছুই নয় ; কেবল মতিভ্রম! অথচ সব কিছু বলেও গাল্পিকতার রেশ পুরো ঘুচে যায় না মন থেকে। 'রাজপুত্তুর' এমনি একটি গল্প, কিংবা তারও চেয়ে নিটোল আর একটি 'সুয়োরানীর সাধ'। প্রথমটি সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন,—"'রাজপুত্তুর'-এ বর্তমান কালের সাধারণ বাঙালি ঘরের ছেলেমেয়ের কাহিনী উপলক্ষ্য করিয়া মানুষের জয়যাত্রা চিরকালের জন্য ভণিত। ৬১০ শব্দের একটি মহাকাব্য বলিলে অন্যায় হয় মনে করি না।"[৭৭] —নিশ্চয়ই হয় না। তবু মহাকাব্যের বস্তু-কঠিন দৃঢ় স্পষ্টতার বদলে এর সর্বাঙ্গে জীবনের নিভৃততম 'কামনার সঙ্গে সংঘাতের আবর্তন' আরো জমাট রহস্যে

৭৬। দ্রঃ ভূদেব চৌধুরী—'শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ'—দ্বিতীয় অধ্যায়।

৭৭। ডঃ সুকুমার সেন—পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

জমাট বেঁধে আছে অন্তহীন রহস্যের বাতাবরণ,—যাকে 'মিষ্টিক' না হলেও 'মিস্টেরিয়াস' মনে হয়, যে মিস্ট্রি কাব্যের নয়, জীবনেরই প্রাণের প্রাণ! 'সুয়োরানীর সাধ' গল্পে জীবনের নিভৃততম কামনার সঙ্গে সংঘাতের আবর্তন আরও জমাট রহস্যে নীহারিকাবদ্ধ।—ঠিক আচ্ছন্ন নয়,—উপলব্ধির কিরণ-কম্পিত। তবু, বুদ্ধির অগম্য বলেই এখানেও সেই জীবনমন্ত্রই বুঝি অশেষের রহস্য-বীণায় ঝংকৃত :- 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।''

এ-সব লেখায় গল্পের 'তার' আছে, গল্প-রস পুরোপুরি নেই। তার কাছাকাছি এসেছে,—'নামের খেলা,' 'ভুল স্বর্গ,' কিংবা হয়ত 'বিদূষক'-ও। ডঃ সেন ঠিক বলেছেন, "নামের খেলা' 'গল্পগুচ্ছে' স্থান পাইবার যোগ্য"।—'ভুল স্বর্গ' এবং অনেকটাই 'বিদূষক' সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। শেষোক্ত লেখার অধিক উপাদান অতীত-প্রসঙ্গ; তাতে গল্প-কল্পনা শিশুগল্পের অতিরিক্ত আমেজ সংগ্রহ করেছে।

'মীনু' সম্পর্কে সেকথা বলবার উপায় নেই; তার মধ্যে গল্প আর কবিতার দোটানা কোনো রসকেই নিটোল হতে দেয় নি,—না 'গল্পগুচ্ছে'র মর্ত্য না 'শেষ সপ্তক'-'পত্রপুট'-এর গল্প-স্বর্গ।

তৃতীয় পর্যায়ের 'লিপিকা'য় অনেক কয়টি রচনা আছে, যেমন 'অস্পষ্ট,' 'পট,' 'নূতন পুতুল,' 'উপসংহার', 'পুনরাবৃত্তি', 'সিদ্ধি', 'মুক্তি' এবং 'পরীর পরিচয়',—এদের মধ্যে গল্পের প্লট-এ কবির মনকে 'প্রশ্রয়' দেবার স্নিগ্ধ শৈথিল্য বিচিত্র কাব্য-স্বাদী 'গল্প-স্বপ্নে'র সংগঠনকে সম্ভব করে তুলেছে।

এমনি করে রূপকথা, রূপককথা এবং রূপ আর কথার অনাশ্লিষ্ট কিংবা স্বল্পাশ্লিষ্ট মিশ্র আকারের রচনাসম্ভারেই পূর্ণ হয়ে আছে 'লিপিকা'র গল্পের মত-লেখার অপরূপ ভাণ্ডার।

'লিপিকা'র গল্পতুল্য লেখার রবীন্দ্রনাথকে আবার যথারীতি গল্প লিখতে দেখি ১৩৩২ বাংলা সালে,—'প্রবাসী' পত্রিকায়। 'প্রবাসী'র চারটি, এবং আরো একটি এই পাঁচটি গল্প লেখা হয় ১৩৪০ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে। এগুলিও আসলে 'সবুজপত্র'-পর্যায়ের রচনা-প্রকরণের অনুস্মৃতি। সমুল্লেখ্য গল্প খুব একটা নেই। কেবল শেষ গল্প 'চোরাই ধন'-এ কবির মনোস্বপ্ন অকুণ্ঠ কবিতার আকার পেয়েছে। সুনেত্রা আর তার স্বামী, তাদের কন্যা অরুণা আর তার প্রিয়-পতি শৈলেন-এর দুই পুরুষের মধ্য দিয়ে দাম্পত্য-প্রণয়, এবং যৌবন-প্রেমের যেন রোমান্টিক স্তোত্র গেঁথেছেন কবি। সুনেত্রার প্রসঙ্গে তার স্বামী বলেছে,—"বিবাহটা চিরজীবনের পালাগান; তার ধুয়ো একটা মাত্র কিন্তু সংগীতের বিস্তার প্রতিদিনের নব নব পর্যায়ে। এই কথাটা বুঝেছি সুনেত্রার কাছ থেকেই। ওর মধ্যে আছে ভালবাসার ঐশ্বর্য, ফুরাতে চায় না

তার সমারোহ ; দেউড়িতে চার প্রহর বাজে তার সাহানা রাগিণী। আপিস থেকে ফিরে এসে একদিন দেখি আমার জন্যে সাজানো আছে বরফ-দেওয়া ফলসার শরবত। রঙ্ দেখেই মনটা চমকে ওঠে ; তার পাশেই ছোটো রূপোর থালায় গোড়ে মালা, ঘরে ঢোক্‌বার আগেই গন্ধ আসে এগিয়ে। আবার কোনোদিন দেখি আইসক্রীমের যন্ত্রে জমানো শাঁসে-রসে মেশানো তালশাঁস এক-পেয়ালা আর পিরিচে একটি সূর্যমুখী। ব্যাপারটা শুনতে বেশ কিছু নয়, কিন্তু বোঝা যায়, দিনে দিনে নতুন করে সে অনুভব করেছে আমার অস্তিত্ব। এই পুরোনোকে নতুন করে অনুভব করাব শক্তি আর্টিস্টের। আর ইতরে জনা: প্রতিদিন চলে দস্তুরের দাগা বুলিয়ে। ভালোবাসার প্রতিভা সুনেত্রার নব-নবোন্মেষশালিনী সেবা।"

এই গল্প যখন লিখেছিলেন কবির বয়স তখন সত্তর পেরিয়েছে। মনে হয়, বার্ধক্যের উপান্তে এসে যৌবন-বাসনাকে স্বপ্নের ছায়াপটে আর একবার এঁকে দেখলেন কবি-কল্পনার তুলি দিয়ে। 'চোরাই ধন' নিঃসন্দেহে আত্মসৃষ্টি,—শিল্পীর গহন বাসনার গল্প-রূপ।

এর পরেও রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখেছেন। সে ছোটগল্প-সাহিত্যের মধ্যপর্বের কথা। তার মুখবন্ধে আছে 'কল্লোল'-'কালিকলম'-'প্রগতি' এবং অপরাপরের প্রয়াস। যথাস্থানে সে ইতিহাস আলোচনা করব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাংলা ছোটগল্প : আদিপর্ব (২)

রবীন্দ্রেত্তর শিল্পিগোষ্ঠী

বাংলা ছোটগল্পের জন্ম, বিকাশ ও পরিণতি একাধারে রবীন্দ্র-কল্পনারই সৃষ্টি। আর পূর্বের অধ্যায়ে আমরা রবীন্দ্র-রচনার আদিপর্বে থেমেছি এসে 'কল্লোল-যুগে'র মুখে। 'কল্লোল' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩০ বাংলা সালের বৈশাখে। আর তৃতীয় খণ্ড গল্পগুচ্ছের শেষ পাঁচটি লেখা ('নামঞ্জুর গল্প', 'সংস্কার,' 'বলাই,' 'চিত্রকর,' 'চোরাই ধন') আগেই বলেছি, ১৩৩২ থেকে ১৩৪০ বাংলা সালের মধ্যে লেখা। এদিক্ থেকে ঐ গল্প-পঞ্চক 'কল্লোল'-উত্তর কালের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা দাবি করতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের জগতে কালের হিশাব দিন-মাস-বছরের নিরিখে নয়, শিল্পি-মনের ঋতু পরিবর্তনের পরিমাপ অনুসারে। এদিক্ থেকে পূর্বোক্ত গল্প-পঞ্চক কেবল 'সবুজপত্র'-পর্বেরই মানস

অনুবৃত্তি। শুধু তাই নয়, এক শেষতম 'চোরাই ধন' ছাড়া আর কোনোটিই উৎকৃষ্ট ছোটগল্প-রূপের স্বাতন্ত্র্যও দাবি করতে পারে না। এ-সব কথা পূর্বের অধ্যায়ে বলেছি। তবে আলোচ্য গল্প-পঞ্চকের কালগত পরগামিতার কারণ মোটামুটিভাবে অনুমান করা যেতে পারে। জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে রবীন্দ্র-চেতনা ও রবীন্দ্র-প্রত্যয়ের নিছক বিরোধিতা করার উত্তেজনা নিয়েই 'কল্লোল'-এর প্রয়াস শুরু হয়। অবশ্য এর জীবন-প্রয়োজন ও সাহিত্যিক ফলশ্রুতি সম্বন্ধে স্পষ্ট অবহিত হতে আন্দোলনের পুরোধাদের-ও সময় লেগেছিল। ফলে, নিছক আত্ম-বিরোধিতার বদলে নতুন যুগের নতুন প্রয়োজন-বোধের ক্ষেত্রে আপন শিল্প-প্রেরণাকে পুনর্বাসিত করতে কবিরও কিছু সময় লাগা অস্বাভাবিক ছিল না। কাব্যের জগতে এই পুনর্বাসন শুরু হয়েছে 'পুনশ্চ'-র (১৩৩৯) যুগ থেকেই, —'নবজাতক' (১৩৪৭) থেকে সেই নব চেতনার পূর্ণ উৎসার। আলোচ্য কাব্য দুটির গ্রন্থাকারে প্রকাশের কালই ওপরে উল্লেখ করেছি। নতুন সৃষ্টির ঋতু, এবং পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কবিতা রচনার শুরু হয়েছিল আরো আগে। কিন্তু একেবারে নির্বাণ পর্বের আগে রবীন্দ্রনাথ আর ছোটগল্প লেখেননি। তাই 'কল্লোল'-উত্তর কালের চেতনায়-উদ্বোধিত তাঁর গল্প-সংখ্যা প্রচুর নয়। এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা স্পষ্ট করে বলে রাখা প্রয়োজন। 'কল্লোল' বল্‌তে একটি বিশেষ পত্রিকা বা তার লেখক ও পরিচালক-গোষ্ঠীর কথাই বুঝ্‌ছি না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে (১৯১৭-১৯১৮ খ্রীঃ) বিশ্বব্যাপী প্রথম আর্থিক মান্দ্যের (১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ ও পরে) কাল-সীমায় বাংলার রাষ্ট্রিক ও অর্থ নৈতিক জীবনে এক প্রবল পরিবর্তনের ঝড় দেখা দিয়েছিল, আর সে ঝড়ের দোলা পৌঁছেছিল জাতির চেতনার মূল অবধি। ফলে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রয়োজন এবং মৌল বাসনাতেও নূতন দাবির আক্ষেপ দেখা দিয়েছিল। 'কল্লোল' আর তার অনুষঙ্গী পত্র-পত্রিকাকে আশ্রয় করে সেকালের কয়েকটি অস্থির তরুণ-চিত্ত সেই ভাষাহীন আক্ষেপের প্রথম পর্যায়টিকে প্রকাশিত করেছিল। যুগসন্ধির মানসিক দ্বন্দ্ব কখনো ভার-সম হয় না, তা ছাড়া ক্ষুব্ধ তারুণ্যের বাঁধন-ভাঙাব উন্মত্ত প্রয়াস অনেক সময়ে অবাঞ্ছিত রূপও ধরেছিল। তবু সার্থক-অসার্থক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এক নতুন ভঙ্গুর জীবনের আর্তনাদী প্রয়োজনকে জাতির শিল্প-চেতনার মূলে পৌঁছে দিতে পারাতেই কল্লোলীয় প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক মর্যাদা। সেই নূতন চেতনার আঘাতে 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর সমভাবাত্মক ও তাঁর বিপরীত মনোভাবের রচনা একসঙ্গে অজস্র প্রকাশিত হয়েছে। ঐতিহাসিক মূল্যের স্বভাব নির্দেশ করবার উদ্দেশ্যে এই সকল রকমের রচনাকেই আমরা 'কল্লোল'-চেতনার ফসল বলব,—অর্থাৎ এরা একই আক্ষেপের দুই পরস্পর-বিরোধী দিক ; একে অন্যের উল্টো পিঠ যেন। যথাস্থানে এই যুগ-স্বভাবের পরিচয় দেব। এখানে কেবল বলে রাখি, 'কল্লোল'-উত্তর রবীন্দ্র-রচনা

বলতে আমরা কল্লোল-গোষ্ঠীর প্রভাবিত কোনো লেখার কথা বল্‌ছি না, বস্তুত সে রকম কোনো সৃষ্টি রবীন্দ্র-সাহিত্যে বোধ হয় নেই। 'কল্লোল'-উত্তর সৃষ্টি বল্‌তে সকলক্ষেত্রেই বুঝ্‌ব 'কল্লোলীয় প্রচেষ্টা'-উত্তর যুগজীবনের অবধানজনিত বিশেষ সাহিত্যিক ফলশ্রুতিকে।

এইটুকু সাধারণ ধারণা নিয়ে বাংলা ছোটগল্পের আদিপর্ব সম্বন্ধে এবারে একটা মোটামুটি কালগত হিশাব হয়ত করা যেতে পারে। ১২৯৮ বাংলা সালে রবীন্দ্রনাথের 'হিতবাদী' গল্পমালা প্রকাশের কাছাকাছি সময় থেকে ১৩৩০ সালে 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশের আগে পিছে কিছু সময় পর্যন্ত এই পর্বের সীমারেখা। এই নিরিখে আলোচ্য সময়সীমার বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকারদের পরিচয় সন্ধান করা যেতে পারে এবারে।

কিন্তু সে আলোচনার পথে বাধা অনেক। প্রথমত, গীতি-কবিতার বেলায় যেমন ছোট আকারের গল্প রচনাতেও বাঙালি মানসের তেমনি এক আশ্চর্য সহজাত প্রবণতা রয়েছে। তা ছাড়া প্রতীচ্য পৃথিবীর মত আমাদের দেশেও সাময়িক সাহিত্যপত্রের অপরিহার্য দাবি মেটাবার প্রয়োজনে রচিত ছোট ছোট আকারের গল্প থেকেই ছোটগল্পের রূপাঙ্গিক ক্রমশ সুগঠিত হয়েছে। সাহিত্য-সাময়িক পত্রিকায় এই ছোট আকারের গল্প সন্ধান করতে করতে একেবারে বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্য-সাময়িক 'দিগ্‌দর্শন'-এর কালে গিয়ে পৌছানো সম্ভব। ঐ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় 'বৃদ্ধ তাহার পুত্র ও গাধার কথা', চতুর্থ সংখ্যায় 'পৃথিবী ও তাহার সন্তান', দ্বাদশ সংখ্যায় 'মাতৃভক্তি', এবং 'স্থির প্রতিজ্ঞার ফল', চতুর্দশ সংখ্যায় 'সুশ্রীপদ ও সুশ্রীপদের কথা' ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। আলোচ্য পত্রিকার ইংরেজি অংশে প্রথম গল্পটিকে 'A fable' এবং শেষেরটিকে 'An allegory' বলা হয়েছে। এর থেকেই গল্পগুলির মৌল স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। তারপরে বাংলা সাহিত্যপত্রিকার সংখ্যা যত বেড়েছে ছোট আকারে গল্প রচনার প্রয়াসও ততই ব্যাপক হয়েছে। পরিণামে এই ব্যাপ্তি বস্তুত বিশৃঙ্খলারই সৃষ্টি করেছিল। বাংলা সাহিত্যে ছোট আকারের গল্প লেখার আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন দুর্বার; অথচ সার্থক ছোটগল্প লিখ্‌বার মত পরিচ্ছন্ন আঙ্গিক-চিন্তার অভাব রয়েছে;—এ কথা লক্ষ্য করেই 'সাহিত্য'-পত্রিকার সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি প্রমথ চৌধুরীকে 'সাহিত্যে'র বৈঠকে ডেকেছিলেন। এদিক থেকে ১২৯৮ সালে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রমথ চৌধুরীর অনুবাদ গল্প বা 'হিতবাদী'তে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক ছোটগল্প প্রকাশিত হবার আগে থেকেই বাংলা সাহিত্যে ছোট আকারের অনেক গল্প পাওয়া যেতে পারে। এই গল্প-শিল্পীদের মধ্যে রবীন্দ্র-ভগ্নী স্বর্ণকুমারীও[১] রয়েছেন।—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের 'ভিখারিণী', 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা' প্রভৃতিও এই প্রসঙ্গে আবার স্মরণযোগ্য।

১। স্বর্ণকুমারী সম্পর্কে পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য।

অন্যপক্ষে, প্রমথ চৌধুরীর 'ফুলদানী', আর রবীন্দ্রনাথের 'হিতবাদী' গল্পমালা প্রকাশের পর থেকে সার্থক ছোটগল্প-রসের স্বাদুতা অনুভব করে বাংলায় ছোট আকারের গল্প রচনার প্রয়াস প্রায় সংখ্যাহীন প্রাচুর্যে ভরে উঠেছিল। এই সময়কার প্রাপ্তব্য সাহিত্য, সাময়িকী কয়টির পৃষ্ঠা থেকে সকল গল্প ও গল্প-লেখকের নাম উল্লেখ করতে গেলেও তা প্রায় এক অফুরন্ত ব্যাপার হবে। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একদা এই চেষ্টা করে এই সময়কার ৭৯ জন লেখক আর নামহীন-লেখকের রচিত ১২৬টি গল্পের সন্ধান দিতে পেরেছিলেন।[২] কিন্তু এই লেখা ও লেখক-পঞ্জীও যথার্থ সংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশকেই পরিচিত করতে পেরেছে। বর্তমান উপলক্ষে সেই সুদীর্ঘ পঞ্জী সংকলন অপরিহার্য নয়। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প-শৈলীর বিকাশে সমকালীন জীবন-ভূমি ও গল্পকারের মানসিকতার সংযোগ সন্ধান করে বাংলা ছোটগল্প-শিল্পের বিবর্তনের ক্রমিক ধারাটিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্যের বিষয়। এমন অবস্থায় যে সব লেখা বা লেখকের মধ্যে বিচিত্রচারী বাংলা গল্প-স্বভাবের কোনো-না-কোনো বিশেষ রূপ অথবা প্রকৃতির আভাস লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে বলে মনে করি, কেবল তাঁদের সম্বন্ধেই প্রাসঙ্গিক আলোচনা করব। এমন কি সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পীরও প্রতিটি উৎকৃষ্ট গল্প আলোচিত হবে, এমন কথা দাবি করবার সাধ্য নেই। তাছাড়া, যে-সব শিল্পীর সম্বন্ধে কোনো উল্লেখই সম্ভব হবে না, তাঁদেরও সু-কীর্তি সম্পর্কে আমাদের কোনো অমনোযোগ নেই। কেবল পরিকল্পিত আলোচনা-পদ্ধতির সীমিত গণ্ডি অতিক্রম করা অসাধ্য বলেই আনুপূর্বিক আলোচনা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে না।

১। 'ভারতী' পত্রিকার লেখকদল

এই আলোচনা-ধারায় বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে 'ভারতী' পত্রিকার ভূমিকা অবিস্মরণীয়। ১২৮৪ বাংলা সালে প্রধানত সপত্নীক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে এই পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তাঁর হাত থেকে সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বর্ণকুমারী দেবী ১২৯১ বাংলা সালে; মাঝে বছর কয় ফাঁক দিয়ে দুই দফায় প্রায় আঠারো বছর তিনি 'ভারতী' সম্পাদনা করেছিলেন। তাছাড়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কিছুকাল এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। অন্যান্য সম্পাদকদের মধ্যে আছেন সেকালের স্মরণীয় গল্প-লেখক-লেখিকা,—সরলা দেবী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

২। দ্রঃ নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—'বাংলা ছোটগল্প'।

একেবারে প্রথম থেকেই গল্প প্রকাশের প্রতি 'ভারতীর' ঝোঁক ছিল প্রবল। ফলে প্রবীণ ও নবীন, নবজাগৃয়মান বাংলা ছোটগল্পের বহু শ্রেষ্ঠশিল্পী 'ভারতী'র পাতায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। প্রথম থেকেই 'ভারতী' পত্রিকায় অন্তরঙ্গ ঘরোয়া পরিবেশ গড়ে উঠেছিল ; মূলত এটি ছিল ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক পত্রিকা। পরিবারের বাইরে থেকে প্রথম দিকে যাঁরা লেখ-সূচীর মধ্যে স্থান পেয়েছিলেন,—তাঁদের অনেকেই ছিলেন ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠ। পরে শিল্পি-চক্রের পরিধি যখন বেড়েছে, তখন বাইরের লেখকও 'ভারতী'র আসরে এসেই আপন হয়ে উঠেছেন। এঁদের সকলেরই সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল, বা এঁরা অন্য পত্র-পত্রিকায় কখনো লেখেন নি, একথা মনে করবার কারণ নেই। রচনা প্রকাশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেও এঁরা ছিলেন 'ভারতী'র একান্ত আপন। নিবিড় আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে 'ভারতী' পত্রিকা বাংলাদেশের একাধিক প্রজন্মব্যাপী শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প-লেখকদের নিভৃত প্রীতির গণ্ডিতে এনে বেঁধেছিল। এঁদের মধ্যে বিচিত্র শিল্প-প্রকৃতির সমাবেশ হয়েছিল ;—কল্পনা-রোমান্স, বাস্তব তথ্যানুসারিতা, রক্ষণশীল আদর্শবাদ ও বন্ধন-বিমুখ দীপ্ত বিদ্রোহ-বাসনা, আবেগ-আবহ-উচ্ছ্বাস, তথ্যসংক্ষিপ্তি ও নাটকীয়তা,—ভারতীর গল্পের আসরে ছোটগল্পের সকল স্বাদই ছিল একান্ত লভ্য। আবার কাল ও ভাবের দিক থেকেও এঁদের মধ্যে রবীন্দ্র-পূর্ব, রবীন্দ্র-উত্তর, রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত, বিচিত্র রকমের শিল্পী ছিলেন। এদিক থেকে লেখক নির্বাচনে 'ভারতী'র কোনো গোঁড়ামি ছিল না। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার প্রাণধর্মের অচ্ছেদ্য যোগই তার বিচার-সভায় ছিল পাশ-মার্কার একমাত্র মান। সেই অনুসারে 'ভারতী'র শিল্পিগোষ্ঠী সেকালের দৃষ্টিতে ছিলেন প্রগতিশীলতার প্রতীক। অর্থাৎ, কোনো বিশেষ মতবাদ নয়,—বহমান জীবনের কোনো-না-কোনো ধারার সঙ্গে শিল্পীর অন্তঃকরণের যোগ থাকলেই তাঁর লেখা 'ভারতী'র পাতায় স্থান পেত। আর জীবন-গতির অনুসরণই তো প্রগতিশীলতার একমাত্র ধর্ম।

'ভারতী'র এই গতিশীল শিল্পী ও শিল্প-প্রবাহকে এবার অনুসরণ করব দুইটি পৃথক ধারায়। প্রথম পর্যায়ে থাকবেন রবীন্দ্র-পূর্ব ও রবীন্দ্র-সমসাময়িক লেখকগণ,—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের অল্প পরে গল্প লিখলেও যাঁরা রবীন্দ্রভাবনামুক্ত। আর আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায় গঠন করবেন রবীন্দ্র-উত্তর শিল্পিগোষ্ঠী।

(ক) রবীন্দ্র-পূর্ব ও রবীন্দ্র-সমসাময়িক গাল্পিকদল

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসেও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া সাধারণভাবে ঠাকুরবাড়ির দান খুব কম নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) গল্প লিখেছিলেন কিছু কিছু,—সব কয়টিই ফরাসী গল্পের অনুবাদ। 'ফরাসীপ্রসূন'-এর গল্পাংশে এবং জ্যোতিরিন্দ্র-গ্রন্থাবলীর অন্যত্র এই ছোটগল্পানুবাদগুচ্ছ সংকলিত আছে। তাতে এমিল জোলা, আলফাঁস দোদে, আলেকজান্দার দুমা, বালজাক, মোপাসাঁ প্রভৃতি প্রখ্যাত লেখকদের গল্পের অনুবাদ যেমন আছে, তেমনি রয়েছে অপ্রধান, ইংরেজি নবিশ ফরাসি গল্পের পড়ুয়া বাঙালির কাছে অপরিচিত, বহু লেখকের গল্পানুবাদ।[৩] বস্তুত ইংরেজি অনুবাদের মধ্য দিয়েই সেকালে বাংলার শিক্ষিত সমাজে শ্রেষ্ঠ ফরাসি গল্পের স্বাদ অল্পবিস্তর পরিচিত হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংযোগ ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে ছিল প্রত্যক্ষ,—এবং ফরাসি ভাষারই মাধ্যমে নিবিড়। তাই অপেক্ষাকৃত স্বল্পজ্ঞাত লেখকদেরও উৎকৃষ্ট গল্পের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল,—অনুবাদের ক্ষমতাও ছিল অনায়াসসিদ্ধ। এতে নবসৃজ্জমান বাংলা ছোটগল্প-জগতের পক্ষে ফরাসি গল্প-সাহিত্যের একটি অ-পূর্ব পরিচিত কক্ষের অধিকার সুগমতর হয়েছে। অনুবাদের ভাষায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ সরলতার সঙ্গে সহজ রস-সমৃদ্ধিও রয়েছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী

কেবল কথাসাহিত্যে নয়, বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক ক্ষেত্রে মহিলাদের আত্মবিকাশের ইতিহাস স্বর্ণকুমারী দেবীকে (১৮৫৬—১৯৩২)[৪] নিয়েই স্ব-প্রকাশ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের তিনি ছিলেন ন' দিদি;—'ভারতী' পত্রিকার সুদীর্ঘকালের সম্পাদিকা। বস্তুত গদ্যে-পদ্যে, গল্পে-উপন্যাসে তাঁর লেখনী ছিল বিচিত্রচারী। কথাসাহিত্যের জগতে তিনি উপন্যাসই লিখেছেন বেশি। তাতে পাণ্ডিত্য আছে, ব্যাপ্তিও আছে, কিন্তু রসানুভবের সংহতি নেই। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথোচিত বিচারের পরে মন্তব্য করেছেন,—'কাহাকে ?' ছাড়া স্বর্ণময়ীর রচিত দোষ-রহিত উপন্যাস বিরল।[৫] অথচ, অন্যপক্ষে দেখি, সংখ্যা অল্প হলেও তাঁর ছোট গল্পগুলি এক নবীন স্বাদুতায় অনবদ্য।

৩। দ্র: 'জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলী' বসুমতী সংস্করণ।

৪। দ্রষ্টব্য :—ডঃ পশুপতি শাসমল—"স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য।"

৫। দ্রষ্টব্য :—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ৪র্থ সং : 'স্ত্রী-ঔপন্যাসিক'।

ঠিক ঠিক ছোটগল্পের রূপপ্রকরণ সম্পর্কে অবহিত হয়েই যে স্বর্ণকুমারী গল্প লিখেছিলেন, এমন দাবি করা চলে না। তাহলেও এইসব রচনার স্বাদুতা যে অভিনব সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন, তাঁর একমাত্র গল্প-সংকলন গ্রন্থের আখ্যাপত্রে তার স্বাক্ষর রয়েছে;—'নব কাহিনী বা ছোট ছোট গল্প' গ্রন্থিত হয়েছিল ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে। 'কাহিনী'-চরিত্রের অভিনবতা, তথা তাদের 'ছোট ছোট' আকারের বৈশিষ্ট্য স্বর্ণময়ী স্পষ্টই অনুভব করেছিলেন।

'নব কাহিনী'র প্রথম গল্প 'ভীমসিংহ' প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায়, ১২৯৩ বৈশাখ সংখ্যায়; লেখিকার প্রথম বড় গল্প 'মালতী' প্রকাশিত হয় ১২৮৬ বঙ্গাব্দের 'ভারতী' পত্রিকায়। স্বর্ণকুমারীর গল্প-রচনার প্রয়াস কিন্তু আরো প্রাচীন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' থেকে জানা যায়, পরিবার-পরিজনের কাছে তাঁর সানুবাদ ইংরেজি গল্প পাঠ কিশোরী স্বর্ণকুমারীকে বিবাহের পূর্বাবধিই 'ছোট ছোট গল্প' রচনায় প্রবুদ্ধ করেছিল।[৬] ১৮৬৭-র নভেম্বর মাসে স্বর্ণকুমারীর বিয়ে হয়; অতএব তাঁর ছোট আকারের গল্প রচনা সূচিত হয়েছিল তারও আগে। তাহলেও ডঃ পশুপতি শাসমল সংগতভাবেই নির্দেশ করেছেন, স্বর্ণকুমারীর বয়স তখন কেবল এগারো পূর্ণ হয়েছিল।[৭] তাঁর পরিণত রচনা, যা গ্রন্থিত হয়েছে, কিংবা পত্রিকায় প্রকাশিত, নিশ্চয়ই আরো পরবর্তী কালের লেখা। রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধ গল্প রচনা-যুগের পরেও প্রথম লেখার স্বভাব বিচলিত হয় নি তাঁর গল্পে—স্বর্ণকুমারী সচেতনভাবেই 'ছোট ছোট গল্প' লিখেছিলেন,—অর্থাৎ ছোট আকারের গল্প। তাহলেও, লেখিকার অন্তঃস্বভাবের বিশিষ্টতাগুণে তাতে ছোটগল্পের আবহ ফল্গুধারার মত সঞ্চারিত হয়ে আছে। সে স্বভাব তাঁর নারীত্বের বৈশিষ্ট্যে অভিনব। ছোটগল্পগুলির মধ্যেও যেখানে "আগাগোড়া স্ত্রীলোকের সুর ধ্বনিত"[৮] হয়েছে, সেখানেই স্বর্ণকুমারীর রচনার রস-স্বাতন্ত্র্য।

নারী-স্বভাবের এক সহজ প্রবণতা আছে গুছিয়ে চলায়। বস্তুত নারীর জীবনভূমি তার মনের গৃহিণীপনার আকাঙ্ক্ষায় আঁটসাঁট—পারপাটি। জীবনের যতটুকু পাওয়া যায়, তাকেই সাজিয়ে ঝকঝকে তকতকে করে রাখার আকাঙ্ক্ষায় প্রায়ই নারীমন ব্যাপ্তিবিমুখ হয়। কারণ জীবনের পরিধি যত বাড়বে, বিশৃঙ্খলাও প্রায় তত অবশ্যম্ভাবী। বিশেষ করে বাংলাদেশের নারীমন আজও ঘরোয়া আবহাওয়ার অভীপ্সায় মুগ্ধ। স্বর্ণকুমারীর

৬। দ্রষ্টব্য—ডঃ শিশিরকুমার দাশ—'বাংলা ছোটগল্প'।
ডঃ পশুপতি শাসমল—'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য'।

৭। ডঃ পশুপতি শাসমল - পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৮। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

যুগে এই আকাঙ্ক্ষা ও আবেশ আরো ঘন নিবিড় ছিল। অনেক বিদ্যা অর্জন করেছিলেন তিনি,—সেকালের সমাজ ও স্বদেশ-চিন্তায়ও তাঁর সুকর্ষিত বুদ্ধির দীপ্তি 'ভারতী'-পত্রিকার সম্পাদকীয় এবং অপরাপর প্রবন্ধে উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু ব্যক্তি-স্বর্ণকুমারীর অন্তর-তলে আত্মগোপন করেছিল একটি পারিপাট্যলুব্ধ নারীমন। তাঁর শিল্পকর্মে সেই 'Eternal She'-ইর জয় জয়কার। তাই উপন্যাসের ব্যাপ্ত আধারে তাঁর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানমনীষা অকারণ মাথা খুঁড়ে মরেছে। কিন্তু যেখানেই বাইরের জগৎ ছেড়ে মনের অন্তঃপুরে নিজের সহজ জায়গাটি জুড়ে বসেছেন, সেখানেই স্বর্ণকুমারী অতুলনীয়া।

এদিক থেকে ছোট গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসর তাঁর শিল্পি-মনের ঘরকন্না সাজিয়ে বসবার একটি উপযুক্ত প্রচ্ছদ রচনা করেছিল বলে মনে করি। তাই উপন্যাসের চেয়ে 'ছোট্ট ছোট গল্প' লেখায় স্বর্ণকুমারীর সহজ দক্ষতা। আর তাঁর রূপদক্ষ শিল্পশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সমকালীন বাংলার নারীমনের অন্তঃপুরে। মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, নারীর জীবন-দৃষ্টি বিশেষভাবে আবেগ-নির্ভর। পুরুষ জীবনকে দেখে reasons দিয়ে,—নারীর জীবন-পাথেয় emotion। স্বর্ণকুমারী যেখানে নারীহৃদয়ের সেই সহজ বেদীতে বসে সেখানকার বেদনার ছবি এঁকেছেন, সেখানেই তাঁর রচনার স্বাদ বাংলা গল্পে অতুল্য।

উপন্যাসের মতই ইতিহাস এবং সমাজ উভয় বিষয়েই গল্প লিখেছেন স্বর্ণকুমারী। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই নারী-মনের মণিকোঠার আলোক-রূপায়ণই তাঁর শিল্পের প্রকরণ। বিশেষভাবে বঙ্কিম-উত্তর শিল্পী তিনি; নিজে ছিলেন ঠাকুরবাড়ির সুশিক্ষিতা মহিলা,—মহর্ষির মানস সম্পদের উত্তরাধিকারিণী। ফলে, নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মহিমা এবং সমাজ-লাঞ্ছিত নারী-ব্যক্তিত্বের বেদনা সমানভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন নিজের নারী-সত্তার স্বভাব-শক্তি দিয়ে। নারীত্বের এই রক্তক্ষরা গোপন বেদনার অনায়াস-চিত্রণেই তিনি অতুলনীয়া হয়ে উঠেছেন। দৃষ্টান্ত হিশেবে 'যমুনা' গল্পটির কথাই প্রথমে বলি।

যমুনার নারীহৃদয় পুরুষ-প্রধান সমাজের হাতে আবাল্য লাঞ্ছিত। তার পিতার প্রভূত ধনাধিকার ছিল। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর একটি বিধবা আর একটি বালিকা,—এই দুই মাতা-পুত্রীকে কেবল অসহায় নারী বলেই বঞ্চিত করতে বাধেনি তাদের আত্মীয় পুরুষদের। পৌরুষের বর্বরতা এখানে অনাবৃত। যমুনার জীবনে পুরুষ হস্তের রূঢ়তম লাঞ্ছনা এসেছে তারই হাত থেকে, যাকে সে সবচেয়ে ভালবেসেছিল। যিনি অপরিচিত পথিক-অতিথিরূপে তাদের মাতা-পুত্রীর দরিদ্র জীবন থেকে দিনে দিনে অনাবিল সেবা ও সাহচর্য পেয়েছেন,—রোগশয্যায় যমুনা যাকে হৃদয় দিয়েছে এবং যার হৃদয় নিয়েছে,—পরে বিবাহিত সেই পতিদেবতা তার রূপেই দগ্ধ হয়েছিলেন,—নারী প্রাণের স্নিগ্ধ পরিচয় লাভের সাধ্য ছিল না তার। তাই মিথ্যা আত্মপরিচয় দিয়ে তিনি যমুনাকে লাভ

করেছিলেন,—বাড়ি গিয়ে স্ত্রীর মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলেন দাসী বলে। যমুনা নিজ নারীধর্মের এই অপমান সহ্য করতে পারেনি। হিন্দু নারীর শ্রেষ্ঠ তীর্থ পতিগৃহ গোপনে সে ত্যাগ করে এসেছে। স্বামী বার বার তাকে ফিরে নিতে চেয়েছে। যমুনা দ্বিতীয়বার স্বামিগৃহে যাবার আগে তাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে,—স্ত্রীর সম্পর্ক তিনি আর দাবি করতে পারবেন না। কারণ সে জানে, স্বামী তার ঠিকই আছেন,—কিন্তু সে তার পত্নী নয়। অর্থাৎ, যেখানে স্ত্রীর মর্যাদা নেই, সেখানে স্বামি-সঙ্গচারণ যমুনা ব্যভিচার বলেই জানে। তাই দ্বিতীয়বারও সে স্বামীর ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে বেরিয়েছিল; কারণ স্বামী অপরের কাছে "—" বলে তার পরিচয় দিতেন। শ্মশান-ভূমিতে যমুনার জীবন্ত জীবনাবসান পুরুষ-প্রধান সমাজের বর্বরতার বিরুদ্ধে নারী-চেতনার স্মিত তীব্র ধিক্কার। অথবা, আগাগোড়া রচনায় অপ্রগল্ভ সংযম, এবং নারী-প্রকৃতির স্বভাব-উন্মোচন পুরুষের চোখে জীবনের এক নূতন রূপ যেন এঁকে দিয়েছে। এই অ-পরিচিত স্বাদুতার দোলাই স্বর্ণকুমারীর কোনো কোনো 'ছোট ছোট গল্প'কে 'যমুনা'র মতই ছোটগল্প করে তুলেছে।

যেমন সামাজিক বিষয়ের অবতারণায়, তেমনি,—আগেই বলেছি,—'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-এর গল্প-চিত্রণেও নারীত্বের স্বভাব-বর্ণনাই স্বর্ণকুমারীর শ্রেষ্ঠ পুঁজি। 'কুমার ভীমসিংহ' গল্পের স্বাদুতার কেন্দ্র ভীমসিংহের রাজপুত-সমুচিত স্বার্থত্যাগ ও আত্মদানে নয়,—ভীমসিংহ-জননী কমলকুমারীর ব্যথা-বিগলিত নারীধর্মের সহজ রূপায়ণে। পতি-সোহাগে বঞ্চিতা চিরমৌনা রমণী চরম মুহূর্তে পুত্রের ন্যায্য অধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে সমস্ত কুণ্ঠা বিসর্জন দিয়ে এসেছেন স্বামি-সন্দর্শনে। কথায় কথায় কথা বাড়ে। তখন "মহিষী বলিলেন,—'কুমারদের জন্মদিনের কথা মনে পড়ে কি?' বলিতে বলিতে মহিষীর কথা বাধিয়া গেল, আর বলিতে পারিলেন না, মুহূর্তে বিশ বৎসর যেন পিছাইয়া পড়িল, তখনকার ঘটনা নূতন হইয়া তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। সেই দিনের সরলা, বিশ্বস্ত হৃদয়া, অভিমানিনী বালিকাবধূতে আর আজিকার এই প্রৌঢ়া, স্বামি-প্রেমবঞ্চিতা, দলিতপ্রাণা রাজরানীতে কত তফাত! আজিকার এ মর্মাহত, গর্বিত কমলকুমারী নহেন—সেদিন যেন আর এক কমলকুমারী—নব-প্রসূত সন্তান ক্রোড়দেশে লইয়া—প্রেমপূর্ণ উৎসুক হৃদয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন,—প্রসবের যন্ত্রণা আর তাঁহার মনে ছিল না, পুত্রমুখ দেখিয়া স্বামী কত না আহ্লাদিত হইবেন—কিরূপ উৎফুল্ল হৃদয়ে না জানি তিনি নব-শিশুকে ক্রোড়ে লইবেন—এই ভাবিয়া হৃদয়ে সুখের উৎস বহিয়া যাইতেছিল। কিন্তু, যখন পল গেল, দণ্ড গেল, স্বামী আসিলেন না, তখন সে সুখ কষ্টে পরিণত হইল, মহিষী ম্রিয়মাণ, কাতর হইয়া পড়িলেন। দুই দণ্ড পরে একজন দাসী আসিয়া বলিলেন,—'রানী চঞ্চলকুমারীর এই মুহূর্তে একটি পুত্র হইল, মহারাজ তাহার

পদে অমর কবচ বাঁধিয়া দিতেছেন। সেখান হইতে এখানে আসিবেন'।" চঞ্চলকুমারী কমলকুমারীর সপত্নী। নারী-বাসনার এমন স্নিগ্ধ উল্লাস,—নারীবেদনার এই নিঃসাড় অবসাদ নারী-শিল্পীর অনুভব ছাড়া কে আঁকবে! অথচ 'ভীমসিংহ'র মত গল্পেও ইতিহাসের যথাসম্ভব উপাদান বিশ্বস্ততার সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়েছে; অবশ্য তার উৎস ছিল সেকালের বাংলাদেশের অতিজনপ্রিয় গ্রন্থ টডের 'রাজস্থান'।[১]

উদ্ধৃতি দীর্ঘ করে লাভ নেই, স্বর্ণকুমারীর সকল সার্থক সৃষ্টিই শিল্পীর এই নারীধর্মের দ্বারা বিভাম্বিত। 'সন্ন্যাসিনী,' 'লজ্জাবতী,' 'কেন'? ইত্যাদি গল্পে নারীহাতের এই মিষ্টি স্বাদ উৎরেছে চমৎকার। নারীর অনুভব ও চেতনা নিয়ে সমাজ, পরিবার এবং জীবনকে দেখতে পারার এই ব্যক্তিত্বস্পৃষ্ট আন্তরিকতাবশে স্বর্ণকুমারীর গল্প বাংলা কথা-সাহিত্যে এক অ-পূর্ব স্বাদুতার সঞ্চার করছে।

(খ) রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত বাংলা গল্প

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ছিলেন,—কবির সঙ্গে তাঁর সৌহৃদ্যও ছিল গভীর। কবিকে লেখা দুখানি পত্রে এই আন্তরিকতার পরিচয় স্পষ্ট। কিন্তু তাঁর শিল্পকর্ম ছিল বিশেষভাবে বঙ্কিমানুসারী। সুরেশ সমাজপতির সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল ঘনিষ্ঠ। দীর্ঘদিন বাংলাদেশের বাইরে ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদনা ছিল তাঁর পেশা। সাংবাদিকতার সেই ব্রতে তিনি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিলেন। ফলে, নগেন্দ্রনাথের জীবন-চেতনায় সাংবাদিকের বস্তু-নিষ্ঠা থাকলেও, বাংলা ও বাঙালি জীবনের বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে তাঁর যোগ অন্তরঙ্গ হতে পারেনি। অন্যদিকে, তাঁর ব্যক্তি-ভাবনায় রাধা-কৃষ্ণ-লীলারস-মুগ্ধতা ছিল সুনিবিড়। বিদ্যাপতির পদ-সংকলন এবং অন্যান্য প্রয়াসের মধ্যে বিষয়নিষ্ঠা ও বিদগ্ধতার পরিচয়কে ছাপিয়ে সেই রস-স্নিগ্ধ মনের পরিচয়ও প্রকাশিত হয়েছে। মনে হয়, নগেন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট গল্পগুলি অন্তত এই রসিক চৈতন্যেরই রচনা।

এদিক থেকে সাধারণভাবে বাঙালি মনের অপরিচিত এক রহস্যাচ্ছন্ন জীবন-ভূমিতে প্রায়ই গল্পের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে। সে যেমন বাংলা দেশের নয়,—তেমনি অন্য কোনো ভৌগোলিক অবস্থানের একান্ত সীমাতেও বাঁধা নেই। চিরকালের অনন্ত রহস্য-বাসনার সৌরভ দিয়ে ঘেরা সে জীবন-পরিবেশ—"একবার সেই বসন্ত-প্রভাতে মুঞ্জরিত আম্রকাননে, মৃদুবাহিনী তরঙ্গিত নদীতীরে আর একবার প্রদোষকালে শৈলমূলে

১। বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য দ্রঃ ডঃ পশুপতি শাসমল—পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

সন্ধ্যাগগনতলে—দুইবার দেখিয়াছিলাম। যাহা দেখিয়াছিলাম,—যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা চিরদিন মনে রহিয়াছে, আজ আবার সেই কথা বলিতে বসিয়াছি।"—'দুইবার' নামক গল্পের শুরু হয়েছে এমনি করে। দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন লেখক,—দুই পৃথক পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু কোথায় তাদের অবস্থান?—মনে হয়, কত কাছে, তবু যেন কতদূরে! 'মুক্তি' গল্পের চরম মুহূর্তের চিত্র-পরিবেশ আঁকা হয়েছে,—"অতি ভীম সৌন্দর্য-বিশিষ্ট স্থান সেই হিমানী-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ সম্মুখে প্রতিহত বালসূর্য-কিরণে সুবর্ণ শৃঙ্গের ন্যায় জ্বলিতেছে। সে স্থানে পশু নাই, পক্ষী নাই, মাত্র নিস্তব্ধতা। সৌম্য, উদার, গম্ভীর প্রকৃতি মূর্তি।" এ পরিবেশের কোনো ভূগোল নেই।

তেমনি নগেন্দ্র গুপ্তের গল্পাবলীর কোনো বিশেষ ইতিহাসও নেই। অর্থাৎ, কোনো বিশেষ ব্যক্তি-জীবনের মূলভূমি থেকে সে-সব গল্পের জন্ম হয় নি। মানুষের চিরন্তন রোমান্টিক বাসনার বৃন্তে গল্পগুলি যেন সব প্রেম-বিহ্বলতায় গড়া আকাশ-কুসুম। অনির্বাচ্য সৌরভ একটু-আধটু আছে, কিন্তু কোনো বিশেষ আকার নেই। নগেন্দ্রনাথের জীবন-জিজ্ঞাসা বৈষ্ণব ধর্মান্বিত! রমণী-প্রণয় ও বৈরাগ্যের দ্বন্দ্বকে কল্পনার প্রশ্ন-মদির আকুলতা দিয়ে তিনি গল্পে গেঁথেছেন। এখানে তাঁর ভাবনায় দ্বিধা রয়েছে,—আর তাতেই গল্পগুলির অন্তরে মাধুর্যের সৃষ্টি হয়েছে। রমণী-প্রেমকে অস্বীকার করবার উপায় নেই বৈষ্ণবের,—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে রাধাবল্লভ,—শ্রীমতী-চরণ-চারণ তিনি! কিন্তু এই রাধা-প্রেমকেই আরাধনা করবার নবীন বৈরাগ্যময় সরণি রচনা করে গেলেন মহাপ্রভু,—সেখানে "স্ত্রী-হেন নাম"-ও মনে-মুখে আনবার উপায় নেই। অতএব, কী করবে মানুষ এই প্রেম নিয়ে!—কাম বর্জনীয়,—"কাম অন্ধতম"। কিন্তু নরনারীর সব প্রেম-ই-তো প্রচ্ছন্ন কাম নয়। আর বৈরাগ্য তো সাধারণভাবে নিপ্রেম! 'মুক্তি', 'দুইবার', 'মায়াবিনী' ইত্যাদি গল্পে শিল্পী এই রহস্য-জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে ফিরেছেন। কিন্তু নিরুত্তরতার মুখে গল্প যেখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে জানা-না-জানা উত্তরের আভাস নিয়ে,—সেখানেই তাদের রোমান্টিক মাধুর্য।

নগেন্দ্র গুপ্তের গল্পাবলীকে বিশেষভাবে ছোটগল্প বলবার উপায় নেই। তাঁর ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিতে বঙ্কিমের রোমান্টিক উপন্যাস বা 'ইন্দিরা', 'রাধারাণী'-র মত বড় গল্পের রোমান্টিক বিন্যাস রয়েছে। ছোটগল্পের উপযোগী অর্থপূর্ণ ব্যঞ্জনাময়তা বা তির্যক সংক্ষিপ্তি নেই তাতে। উপরি-কথিত কয়েকটি গল্পে প্রণয়-রহস্য-জিজ্ঞাসা এক অপূর্ব দোলা সৃষ্টি করেছে,—যার আবেদন কেবল মৃদু অথচ পরিপূর্ণ নয়। অন্যান্য গল্পগুলি সাধারণ উপাখ্যানের পর্যায়ে পড়ে,—তার মধ্যে কিছু কিছু বর্ণনা-রসে স্নিগ্ধ। 'লক্ষহীরা,' 'শ্যামার কাহিনা,' 'বন্ধু' প্রভৃতি এই ধরনের গল্প। প্রথম দুটি গল্পের পরিবেশ বাঙালির জীবন-

ভূমির সদৃশ; অপরটি পশ্চিমের আহীরপল্লীর কাহিনী। এই সব গল্পেও বিশেষ দেশ-কালের ইতিহাস-ভূগোল কোনো নির্দিষ্ট চিহ্ন রচনা করতে পারেনি; মানুষের সর্বজনীন সুখ এবং দুঃখ, বাসনা এবং বেদনাকে এক-একটি চরিত্রের বোঁটায় ফুলের মতো এঁকে তুলেছেন শিল্পী,—চিরকালের আকাশে। দেশী-বিদেশী নানা জীবন-পরিবেশের প্রচ্ছদে গড়ে ওঠা নগেন্দ্রনাথের বহু গল্প সম্বন্ধেই এ কথা প্রায় সমান সত্য!

আরো কিছু গল্প আছে যাদের ঠিক রহস্যময় বলা চলে না,—অথচ তাদের সমাপ্তি গল্পের বাচ্যার্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থ কোনোটিকেই পূর্ণ অনুভূত হতে দেয় না। জাল কুঞ্জলাল কেন পরের বিধবার প্রতি অন্ধমোহে সর্বস্ব পণ করেছিল; কিংবা বাদ্‌লা এবং চন্দ্রকুমারকে যে বিদ্যুৎ-গর্ভ ছায়া হঠাৎ হত্যা করলো,—সেই মীরণ-এরই পরিচয় কী;—'জাল কুঞ্জলাল' বা 'ছায়া' গল্পে তার কোনো উত্তর নেই। অথচ যেখানে গল্প দুটি থেমে গেল, তাতেও কোনো নালিশ নেই;—আবার অকথিত বক্তব্য শেষ করে বল্‌লেও আপত্তি ছিল না। যতটুকু বলা হল, সেটুকু বেশ,—প্লট্‌-এর আবেদন-নিরপেক্ষভাবেই মনোরম। এই প্রকাশভঙ্গী অনেকটা গাল-গল্প জমিয়ে তোলার আঙ্গিক দিয়ে গড়া।

'গল্প ত অল্প', বা 'চুলের কলপ'-এর মত কয়েকটি সহাস গল্পও লিখেছিলেন নগেন্দ্রনাথ। এগুলোকে হাস্যরসাত্মক গল্প না বলে বরং মজার গল্প বলা ভাল। 'শ্যামার কাহিনী'-ও আসলে তাই।

১২৯৪ বাংলা সালে নগেন্দ্রনাথের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকায়—নাম ছিল 'চুরী না বাহাদুরী'। এঁর গল্প-সংকলন গ্রথিত হয়েছিল 'বসুমতী' প্রকাশিত দুইখণ্ড 'নগেন্দ্র গ্রন্থাবলী' (১৯২৫) প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে। আর একটি গল্প-সংকলন গ্রন্থের নাম 'রথযাত্রা ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩২)।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবনীন্দ্রনাথও (১৮৭১-১৯৫০) গল্প লিখেছিলেন। 'শকুন্তলা'—'ক্ষীরের পুতুল'-এর মত কেবল শিশু-গল্প না, কিংবা নয় 'রাজকাহিনী'-'নালক'-এর মত ছোটবড় সকলের জন্য লেখা সর্বজনীন গল্প, নিছক বড়দের পড়বার গল্পও তাঁর কম নেই। অধিকাংশই 'ভারতী' পত্রিকার পাতায় আবদ্ধ রয়েছে আজও; ছোটবড় মিলিয়ে 'অন্যূন চুরনব্বইটি'।[১০] তারই মধ্যে এক বিশেষ মনোঋতুর ফসল অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে গ্রথিত হয়েছিল 'পথে বিপথে' বইয়ের (১৯১৯) 'নদীনীরে' অংশে। অবনীন্দ্রনাথ

১০। দ্রঃ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সনৎ গুপ্ত (সঃ)—'সাময়িকপত্রে প্রকাশিত 'অবনীন্দ্রনাথের রচনাপঞ্জী': 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' ১৮৮১-৮২ শক :'কার্তিক-চৈত্র সংখ্যা।

প্রধানত শিশুসাহিত্যের শিল্পী রূপেই সুপরিচিত; কিন্তু সে তাঁর ছদ্মবেশ। আসলে বিশ্ব-বিস্ময়কর চিত্র-শিল্পীর অদ্ভুত প্রতিভা রেখা ছেড়ে লেখার ভাষাতেও অবাধ মুক্তি কামনা করেছিল; অবনীন্দ্রনাথের লিপিশিল্প সেই বাসনা এবং প্রেরণারই অব্যবহিত ফসল।[১১] আর ছবির ভাষা আসলে সর্বজনীন। রেখার ইঙ্গিতে যে সাড়া দিতে জানে, ছোটবড় নির্বিশেষে সেই সকল মনকেই টানে ছবির সৌন্দর্য। অবনীন্দ্রনাথের গল্পের রস-স্বভাব তাই আকারের ছোটবড় পরিমাণে নির্ভরশীল নয়,—একটানা অপরূপ রূপকথার ভাষা এবং ভাবুকতায় ঝংকৃত চিত্রশিল্পের মোহাবেশ তাতে এক অতুলনীয় নতুন, স্বাদুতার সঞ্চার করেছে। এই গল্প-ছবি তাদের ইঙ্গিত এবং ব্যঞ্জনা-গুণেই ছোটগল্প-রসের যথাসম্ভব কাছাকাছি পৌঁছাতে চেয়েছে প্রত্যাশিত আঙ্গিকের রাজপথ বেয়ে নয়, ছবি-আঁকিয়ের রহস্যময় মানবিকতাবোধের চোরাগলি পথে। অবনীন্দ্রনাথের কোনো গল্পই তাই বিশিষ্টার্থে ছোটগল্প নয়, অথচ সব গল্পই সার্থক গল্প, —শিল্পীর মনের তুলিতে আঁকা সবুজ জীবনের রসে স্নিগ্ধ।

'ঘরোয়া'য় অবনীন্দ্রনাথের গল্প-রসের জমাট রূপ দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—যেন "প্রাণের মধ্যে প্রাণ রক্ষিত হয়েছে।"[১২] লেখকের অফুরন্ত জীবনীশক্তিভরা উদাত্ত প্রাণটুকুই তাঁর গল্প-সাহিত্যেরও প্রাণ। চোখে-দেখা বাস্তবের সঙ্গে গল্প-শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই; অথচ তাহলেও তাঁর গল্পগুলো কল্পনা-বিলাসী নয়। জীবনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ-বর্ণালির সঙ্গে ধ্যানী চিত্র-শিল্পীর আত্মার যে যোগ, তাঁর গল্পগুলোতেও জীবনের সূক্ষ্ম দেহহীন সেই সুরভি মদিরতার সৃষ্টি করে ফিরেছে। বস্তুত গল্পের প্রচ্ছদে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-কল্পনার ছবি এঁকেছেন।

অস্পষ্ট রূপ-রেখায়িত স্কেচ্-এর সারাদেহ ভরে কল্পনার তুলিকা-বোলানোর অপরূপ এই শিল্প-সিদ্ধির এক সার্থক নিদর্শন 'পথে-বিপথে'র প্রথম গল্প 'মোহিনী'। 'নদীনীরে' অংশের সব-কয়টি গল্পেরই পটভূমি গঙ্গার ওপরে স্টীমার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কিছুকাল অবনীন্দ্রনাথ সকাল-বিকাল স্টীমারে করে বেড়াতেন,—স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে। "ঐ স্টীমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে পশ্চাৎপট করিয়া 'ভারতী'তে ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি অভিনব গল্প ও চিত্র লিখিয়াছিলেন।"[১৩] 'নদীনীরে' অংশে তাই গ্রথিত হয়েছে 'পথেবিপথে'-তে। সেই গল্পধারার গল্পের নায়ক অবিন্ তাদের পুরাতন বাড়ির ভাঙা পুরাতন স্তূপ সরিয়ে ফেলে নতুন কালের নতুন রূপ আমদানি করতে লেগেছিল। একদিন

১১। বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য দ্রঃ ভূদেব চৌধুরী—'লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ'।

১২। অবনীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি—'প্রবাসী', কার্তিক, ১৩৪৮ সাল।

১৩। ডঃ সুকুমার সেন—'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ৪র্থ খণ্ড।

সেই স্তূপের তলা থেকে বেরোল আশ্চর্য ছবি ; সব তা'র লেপে-মুছে গেছে, কেবল রয়েছে আশ্চর্য দুই চোখ ;—আর ছিল, ছবির ফ্রেমের তলায় একটা পিতলের ফলকে বড়ো বড়ো করে লেখা 'মোহিনী'।

সেই দুটি চোখের নেশা পেয়ে বসেছিল অবিন্‌কে। সে নেশা তাকে বন্ধুদের সঙ্গ-ছাড়া করে করেছিল উদ্‌ভ্রান্ত। অবশেষে একদিন এক বন্ধু ঐ কেবল দুটি চোখের মোহিনী নেশা থেকে তাকে মুক্ত করার জন্যে কিছুটা আরক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ছবির গায়ে তা লেপে দিতে চোখ দুটিও গেল নিঃশেষে মুছে ; কিন্তু সেই সঙ্গে অবিনের জ্ঞানও লুপ্ত হল। অবশেষে, গল্প যখন শেষ হয়েছে, তখন অবিন্ বলেছে, সে মোছেনি,—"ছবিখানা পটের গভীরতর অংশে গিয়েই আমার অন্তরতম স্থানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।"

সীমিত রূপের অতলে অরূপের অনুধ্যান, আর অরূপের অন্তরালের রূপ আবিষ্কারের প্রয়াসই রূপস্রষ্টার আত্মার ধর্ম। সে সাধনায় তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ শিল্পীর কল্পনা। অবনীন্দ্রনাথের সকল গল্পের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে ঐ artist's fancy-দুটি তড়িৎময় চোখের অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনা কেবল সেইদিনই আর্টিস্ট্-এর প্রাণের গহন-প্রচ্ছদে চিরন্তন মূর্তি ধরে ওঠে,—রূপের যেদিন চিরবিসর্জন হল। রূপকে নিয়ে শিল্পের কারবার শুরু হয়,—কিন্তু রূপের যেখানে শেষ সীমা, সেখানেই অরূপ রতনের জন্যে শিল্পি-আত্মার ধ্যানের আরম্ভ। সেই শিল্পধ্যানের স্বভাবকে সার্থক ব্যঞ্জনা দিয়েছে এই fancy-সুন্দর গল্প।

'গুরুজি' গল্প আকাশ-পাতালে সঞ্চরমান fancy-র অবাধ অভিযানের এক আশ্চর্য সুন্দর নিদর্শন। আরব্য উপন্যাসের গল্প নয়,—নীল, গেরুয়া, শাদা কপোতের কাহিনীর ব্যঞ্জনাভাসে শিল্পী এক সার্থক রঙের খেলা খেলেছেন,—এ-খেলা রঙের পাত্রে জীবন নিয়ে খেলা। আর সে-খেলায় লেখনী দেখা দিয়েছে চিত্রকরের হাতে রঙে-ছোপানো তুলি হয়ে :—"আজ পূর্ণচন্দ্র আকাশের নীলের উপরে শাদা আলোর একটা জাল বিস্তার করে দেখা দিয়েছেন। এমন পরিষ্কার ধবধবে রাত আমি দেখিনি। তার মাঝে একটা শ্বেত পাথরের মন্দিরে আমরা এসে বসেছি। অবিনের পরনে তার সেই নেভি-ব্লু চায়নাকোট্, আমার সেই গেরুয়া অলস্টার, আর তাঁর [গুরুজি] পা থেকে মাথা পর্যন্ত শাদা সাজ। তাঁর মাথার চুল যে এত শাদা, তা পূর্বে আমার চোখে পড়েনি। যেন শাদা ফেনার মধ্যে তাঁর সুন্দর মুখ শ্বেত-পদ্মের মত দেখা যাচ্ছে। মেঘ যখন তার সমস্ত জল ছড়িয়ে দিয়ে হাল্কা হয়ে উঠেছে, এ তেম্‌নি শাদা। হিমালয় পর্বতের শিখরের তুষার যখন তার সমস্ত তরলতার সমাহার করে কঠিন হয়ে

উঠেছে, এ তেমনি শাদা। এরই মাঝে তিনি আস্তে আস্তে তাঁর ইতিহাস শুরু করলেন :—।"

এ কেবল গুরুজির কথা নয়। চারদিকে কেবল রঙ্, তুলি, রূপ,—কথার মালায় গাঁথা রেখাহীন রূপের বর্ণালি সমারোহ। এরই মাঝে চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনাকে (fancy) ছেড়ে দিয়েছেন গল্প বল্তে। মাঝে মাঝে সেই স্বচ্ছ কল্পনার চোখে রূপহীন সিচুয়েশন-ও রূপের রেখায় চিত্রায়িত হয়ে উঠেছে। 'দোশালা' গল্পে দেখি, "রবারের সঙ্গে একটা কাবুলি গান আরম্ভ করলে :—

'স্নমিওসী পমঙ্গল স্নমিওসী
পদম্কেনা·পমঙ্গল স্নমিওসী-ঈ-ঈ—'

"সুরও যেমন, কথাও তেমনি বিদ্ঘুটে! 'পমঙ্গল', 'পমঙ্গল' যেন মশার ঝাঁকের মতো কানের কাছে কেবলই ভন্ ভন্ করছে আর মাঝে মাঝে 'স্নমিওসী' সেগুলোকে ফু দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে।"

কথা বা গল্প নয়,—চিত্রশিল্পীর ফ্যান্সী দিয়ে আঁকা এ এক নিখুঁত ছবি। অবনীন্দ্রনাথের গল্পে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট আকারে এই ছবি-আকার খেলাই প্রধান,—ছবির রেখা সর্বত্র প্রাঞ্জল যদি না-ও হয়, তবু গল্পের রস ঐ ফ্যান্সির উৎসজাত। এই জন্যেই এক অর্থে অবনীন্দ্রনাথের প্রায় সব গল্পই ছোটদের গল্প। আবার তাঁর ছোটদের গল্প-গুলোও নিছক ছোটদের গল্প নয়। শিশুমনে রূপকথার শ্রেষ্ঠ আবেদন তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপময়তায়। ভূত-পেত্নী-রাক্ষস-খোক্কস-ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর বর্ণনা কান দিয়ে যত সে শোনে, ততই কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল চক্‌চকে হয়ে ওঠে। বর্ণনা যত নিখুত হয়, উৎকণ্ঠিত উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে চোখ তত বড় বড় হয়ে ওঠে। রূপকথার গল্পে-শোনা-কাহিনীর রূপ শিশু তার চোখ দিয়ে দেখতে চায়,—তাই বুঝি সে গল্পের নাম রূপকথা, যে কথা রূপের দিশারি। অবনীন্দ্রনাথের গল্প কেবল চোখ দিয়ে পড়ি, বা মন দিয়ে বুঝি না,—মনের চোখ দিয়ে দেখতে না পারলে তার রস অনেকখানি ফিকে হয়ে যায়। তাই সে গল্প রূপকথা-ধর্মী। তবু পুরো রূপকথা নয়,—কারণ অবনীন্দ্রনাথ জীবনকে নিয়ে আজগুবি গল্প বলেন না,—তাঁর গল্পের আশ্চর্য theme তাঁর ধ্যানী fancy-র সৃষ্টি। তাই, তাঁর ছোটদের গল্প নিছক রূপকথার চেয়ে সিরিয়াস্,—আর বড়দের গল্প আজগুবি গল্পের চেয়ে গভীর,—জীবনের অনির্বাচ্য অকারণ আনন্দ-খেলার ব্যঞ্জনাবহ।

এই কারণেই অবনীন্দ্রনাথের গল্পে ছোট-বড় আকারের বালাই নেই। সব আকারের গল্পেরই প্রায় অভিন্ন স্বভাব। তার মধ্যে 'কোটরা' গল্পে নবীন জীবনের স্বাদুতা রয়েছে।

'ভারতী' পত্রিকার দীর্ঘ ছাব্বিশ পৃষ্ঠা জোড়া বড় আকারের এই গল্পটি আসলে সার্থক ছোটগল্প-স্বভাবিত। অবনীন্দ্রনাথের অপরাপর গল্পের মতো এটি কেবল একটি গল্প-চিত্র নয়,—শিল্পি-কল্পনার খেয়ালে আঁকা নিছক কথার ছবি নয়। এর প্রচ্ছদপটে রয়েছে এক কর্মব্যস্ত জীবনের বাস্তব পটভূমি। আর আশ্চর্য, সে পটভূমি নিরন্ন দরিদ্র খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনের এঁদো-গলিতে প্রতিষ্ঠিত। সুন্দরের ধ্যানী অবনীন্দ্রনাথ জীবনের অন্ধকার গলিতে আনন্দ-সুন্দরের পরিণামী আলোর ফুলঝুরি রচনা করেছেন গল্প-শেষে। এ গল্পের আর এক বৈশিষ্ট্য, বস্তু-নির্ভর বলেই আগাগোড়া গল্পটি যেন প্রত্যক্ষ জীবনের নিখুঁত একটি ছবি। কল্পনার ফাঁককে ভরিয়ে তোলার প্রয়োজনে fancy-র খেয়াল-খেলা নেই,—নেই কথার পিঠে কথার মালা গাঁথবার রহস্য-কৌশল। দুচোখ ভরে যা দেখি, জীবনের সেই রূপটিকে গল্পের ফ্রেমে ছবি করে এঁকেছেন শিল্পী। সে ছবি কত নিখুঁত, গল্পের শুরুতেই তার প্রমাণ :—

"মীরবহর ঘাটের কাছে মহাজন-পটি থেকে কাঠগোলা পর্যন্ত বাঁশতলার গলি আঁকাবাঁকা, সরু, অন্ধকার, নর্দমার পাঁক আর কাদায় পিছল। দুধারে চারতলা পাঁচতলা বাড়ির দেওয়াল সোজা উঠেছে; জানলা নেই, বারাণ্ডা নেই, পায়রার খোপের মতো এখানে-ওখানে দু-একটা কেবল ঘুলঘুলি, তার থেকে ময়লা চটের পর্দা ঝুলছে। মুটে-মজুর, গরীব ফেরিওয়ালা, দোকানী-পশারী—এরাই সব এখানে থাকে অল্প ভাড়ায়। বাড়িগুলোর একতলায় মুদির দোকান, কাফিখানা মদের আড্ডা, চালের আড়ৎ, ফুল ফুলুরির বাজার—এম্‌নি সব দু-সারি। রাস্তায় সারি সারি গরুর গাড়ি দিনরাত চলছে; ভদ্রলোক মোটেই চলে না; যত কুলীমজুর বদমাস-গুণ্ডা—কেউ লাঠি, কেউ ছেঁড়া কম্বল, কেউ খালি ঝুড়ি নিয়ে চলাচল করছে। মাসের পয়লা, তাই আজ বাড়িওয়ালা মাড়োয়াড়ি দুচার জন গরীব ভাড়াটেদের কাছে ভাড়া আদায় করতে, আর যারা অনেক দিনের ভাড়া বাকি ফেলেছে, সেই সব নিরুপায় লোকগুলোকে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিতে হাজির হয়েছে।"

গল্পের সুদীর্ঘ প্রচ্ছদ-চিত্রের একটু অংশ মাত্র উদ্ধার করা গেল—কিন্তু তাতেই আলোচ্য জীবনের নিখুঁত ছবি তুলির এক-এক ছোপে যেন নিটোল হয়ে উঠেছে। এ-ছবি একান্ত বাস্তবানুগ হয়েও ফটোগ্রাফ নয়,—বিশ্বজন-মনোহর চিত্রশিল্পীর হৃদয়ের দরদ দিয়ে আঁকা,—শেষ ছত্রে অসহায় দরিদ্র-জীবনের প্রতি শিল্পীর সেই অনির্বাচ্য মমতা কথায় রেখা-বলয়িত হয়ে উঠেছে। এমনিই আসলে অবনীন্দ্রনাথের গল্প-শিল্প! তাঁর গল্পের theme কান দিয়ে শুন্‌লে হয় না, চোখ দিয়ে দেখতে হয়; আর তার রসবস্তুর স্বাদগ্রহণ করতে হয় উৎকেন্দ্রিত সহৃদয় মনের চোখে।

১৪। দ্রষ্টব্য—'ভারতী' আশ্বিন সংখ্যা ১৩২৬ বাংলা।

(গ) রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা গল্প ও গল্পকার

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলা গল্পের আদিপর্ব এক অর্থে রবীন্দ্র-পর্বও। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির দ্বারাই এই পর্ব কেবল সমৃদ্ধ নয়—এ-যুগের শ্রেষ্ঠ গল্প-শিল্পীদেরও অনেকে রবীন্দ্র-রচনা অথবা রবীন্দ্র-ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত। এঁদের পুরোবর্তী ছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)। প্রথম বয়সে কবিতা নিয়ে সরস্বতীর সৃষ্টি-কুঞ্জে প্রবেশ করেছিলেন তিনি। পরবর্তী কালে গদ্য,—অর্থাৎ কিছু প্রবন্ধের সঙ্গে বহু সংখ্যক গল্প-উপন্যাসই ছিল তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বাহন। আর প্রভাতকুমার নিজে বলেছেন,—"রবিবাবুর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই আমি গদ্য রচনায় হাত দিই।"—

নিছক ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্র-সংবর্ধনাই লেখকের সাহস ও উৎসাহ বাড়িয়েছিল; একথাও প্রভাতকুমারেরই উক্তি। প্রথমে তিনি শ্রীরাধামণি দেবী ছদ্মনামে গল্প প্রকাশ করেছিলেন পর পর দুটি। 'প্রদীপ' পত্রিকায় প্রকাশিত সেই গল্পগুলির প্রশংসা রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে করেছিলেন 'ভারতী'-তে। তাতেই উৎসাহিত হয়ে প্রভাতকুমার স্বনামে গল্প প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। রবীন্দ্র-সম্পাদনায় এবং পরে সরলাদেবীর সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর বহু উৎকৃষ্ট গল্প ছাপা হয়েছিল। প্রভাতকুমারের এক শ্রেষ্ঠ গল্প 'দেবী'-র প্লট্-ও রবীন্দ্রনাথের কাছে পাওয়া;—এ-কথাও লেখক নিজে স্বীকার করেছেন।[১৫]

তাহলেও, ছোটগল্প-শিল্পী প্রভাতকুমার আপন স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। রবীন্দ্র-ভক্ত হয়েও তিনি আগাগোড়াই রবীন্দ্রনাথের থেকে পৃথক। 'দেবী' গল্পটি পড়লেই বোঝা যায়,—রবীন্দ্রনাথ ঐ গল্প নিশ্চয়ই তেমনভাবে লিখতেন না। কবির সঙ্গে এই স্বভাব-গাল্পিকের পার্থক্য নির্দেশ প্রসঙ্গে আপেক্ষিক লঘুতা ও সরসতা-প্রবণতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু রসিকতাই প্রভাতকুমারের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য মনে করলে ভুল করা হবে; লঘুতার তো প্রশ্নই ওঠে না। গল্পলেখক হিশেবে প্রভাতকুমার যেখানে সর্বাপেক্ষা রসোত্তীর্ণ, সেখানে তিনি রীতিমত 'সিরিয়াস'। 'দেবী', 'আদরিণী', 'হিমানী', কাশীবাসিনী', 'মাতৃহীন', ইত্যাদি গল্প তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। 'দেশী ও বিলাতী' গ্রন্থের গল্পগুলিতে গাম্ভীর্যের মাত্রা অনেকটা কম বলে মনে করা হয়। কিন্তু 'ফুলের মূল্য'-র মত গল্পে শিল্পীর জীবন-সহানুভূতি বেদনামন্থর। 'দেশী' অংশে 'আমার উপন্যাস' অথবা 'বিলাতী' অংশে 'মুক্তি'র মতো গল্পের পরিণামে 'কমেডি' যেমন আছে, তেমনি গল্পের ফাঁকে ফাঁকে কমিক্-এর

১৫। দ্রষ্টব্য—'নবকথা' ২য় সং ভূমিকা।

উপাদান-ও রয়েছে যথাক্রমে প্রিয়ম্বদার পুনর্বিবাহিত পিতা ও নববিবাহিতা নবীন-বিলাতী নরেন-এর আচরণে। কিন্তু সে রচনাকে না বলা চলে হিউমার—না স্যাটায়ার্। এই সব গল্পও আসলে শিল্পীর সিরিয়াস্ জীবন-সন্ধিৎসারই ফল। তাছাড়া 'বউচুরি', 'বলবান জামাতা,' 'বিষবৃক্ষের ফল'-এর মত সহাস গল্পই প্রভাতকুমার বেশি লিখেছেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্প না বলে উৎকৃষ্ট মজার গল্প বলাই বরং শ্রেয়। শিল্পি-অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই ধরনের গল্পাবলীর প্রসঙ্গেই fun শব্দটি ব্যবহার করেছেন।[১৬] সে আলোচনা পরে করব। আপাতত স্মরণ করি, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ছোটগল্প-শিল্পী প্রভাতকুমারের জীবন-দৃষ্টি তাঁর নিজের মতে ও পথে কম ঐকান্তিক ছিল না। তবু-যে এঁদের রচনার প্রকরণে ও স্বাদুতায় পার্থক্য, সে কেবল তাঁদের মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা, তথা স্বকীয়তার দরুন।

তুলনায় আলোচনা করা উচিত হলে প্রভাতকুমারের গল্প পড়ে Washington Irving-এর কথা মনে হয়। পৃথিবীর যথার্থনামা ছোটগল্পের এই প্রথম শিল্পী তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থের নাম রেখেছিলেন 'Sketch Book,' প্রভাতকুমার-ও বাংলা গল্প-সাহিত্যের প্রথম সিদ্ধকাম স্কেচ্-রচয়িতা। এদিক্ থেকে আর্ভিং-এর মনঃ-প্রবণতার সঙ্গে প্রভাতকুমারের গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। আর্ভিং-এর সৃষ্টির পেছনে ছিল একটি ভ্রাম্যমাণ মন। পথিক প্রবৃত্তি তাঁকে দেশ-ছাড়া করেছিল। য়ুরোপের অর্ধপরিচিত ও ভাসমান জীবন-ধারার ওপর দিয়ে একবার করে মন-বুলিয়ে নিতেন পথিক আর্ভিং, আর একদফা গল্পের—স্কেচ্-এর রসদ জমে উঠ্‌ত। চোখে-দেখা জীবনের অতলে অবগাহন করেন নি তিনি,—না আবেগ-অনুভব দিয়ে, না অভিজ্ঞতা দিয়ে। তাই তাঁর গল্পে টুর্গেনিভ এর কাব্য-ব্যঞ্জনা নেই[১৭];—নেই জোলার মর্মপীড়ার প্রবল কম্পন। অথচ চারপাশের জীবনের সৌরভ রাজহাঁসের মতো মনের পালকের ওপরে বয়ে বেড়াতেন তিনি। সেই মৃদু অনুভব-অভিজ্ঞতার সর্বস্ব দিয়ে জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-বাসনা-বেদনার 'স্কেচ্' আঁকা হয়েছে তাঁর গল্প-উপাখ্যানে। তাতে অনুভবের অতলস্পর্শতা নেই, সেই সঙ্গে নেই সত্যবোধ ও ঐকান্তিকতারও অভাব।

প্রভাতকুমারের সম্বন্ধেও একই কথা। তাঁর শিল্প-দৃষ্টি ছিল চির-পথিকের। আর্ভিং-এর মতো বস্তুগত অর্থে প্রভাতকুমার অতটাই পথচারী ছিলেন না। তাঁর কর্মক্ষেত্র বারকয় পরিবর্তিত হয়েছে পূর্বভারতের সন্নিহিত একাধিক প্রদেশে। ব্যারিস্টারি পড়বার জন্যে বিলেতেও তিনি গিয়েছিলেন একবার। কিন্তু সেকালের ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির

১৬। দ্রষ্টব্য—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'গল্প বিচিত্র'।
১৭। দ্রষ্টব্য—'The Singers' বা 'Poems in Prose'-এর গল্প।

পক্ষে একে অতিশয় পথচারিতার নিদর্শন হিশেবে উল্লেখ করা চলে না। তাহলেও, যখনই যেখানে গেছেন, প্রভাতকুমারের শিল্পিমন কোথাও স্থির হয়ে বসে নি। এদিক থেকে মনঃ-প্রকৃতিতে তিনি যেন অনেকটা নির্বিকার ছিলেন। যে পরিবেশে স্থায়িভাবে বাস করেছেন, নিজের শিল্পি-আত্মাকে তার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেননি। তাই দৈহিক বিচারে স্থায়ী জীবন-ভূমিতে বাস করেও প্রভাতকুমারের মন পথিক-বৃত্ত। এই কারণেই সার্থক উপন্যাস লেখা কঠিন হয়েছিল তাঁর পক্ষে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিমিত প্রাঞ্জলতায় প্রভাতকুমারের উপন্যাস-কলার পরিচয় দিয়েছেন,—"তাঁহার উপন্যাসগুলি পড়িলে মনে হয় যেন ছোটগল্পের উপযুক্ত স্বল্প পরিমাণ আখ্যানবস্তুকে কেবল ঘটনা-সমাবেশের দ্বারা অস্বাভাবিক রূপে স্ফীত করা হইয়াছে।"[১৮]

অর্থাৎ, ছোটগল্পে প্রভাতকুমার যেসব চোখে-দেখা ভাসমান ঘটনার ছবি এঁকেছেন,—তেমনি ভেসে-বেড়ানো আরো কিছু বেশি ঘটনাপুঞ্জকে সজ্জিত করে গেঁথে তুলেছেন তাঁর উপন্যাস-কাহিনী। কিন্তু জীবনের আদি-অন্তে সম্পূর্ণ অ-ভঙ্গ রূপটিকে গভীরভাবে আয়ত্ত করতে না পারলে—বিচার, ব্যাখ্যা বর্ণনার মধ্য দিয়ে সেই অ-ভগ্ন পূর্ণতার বোধ রচনা করা সম্ভব না হলে সার্থক উপন্যাস রচনা অসম্ভব হয়। অথচ প্রভাতকুমারের শিল্প-প্রকৃতির প্রবৃত্তিই ছিল গতি,—স্থিতি নয়। পথ চল্‌তে দুহাতের মুঠোভরে জীবনের যতটুকু পেয়েছেন, কথার মধ্যে তাকে ঠিক্ তেমনি দিয়েছেন ধরে। ফলে, তাঁর অপেক্ষাকৃত অসফল উপন্যাস-সাহিত্য গুচ্ছায়িত স্কেচ্-এর সমষ্টি; অপরপক্ষে তাঁর ছোটগল্পগুলি চল্‌তি জীবনের এক-এক টুক্‌রো ভাসমান ছবি!—একে লঘু বা অগভীর বল্‌বো না,—এর মধ্যে রয়েছে নূতন প্রকৃতির স্বাদ, রবীন্দ্রসৃষ্টির স্বাদুতা থেকে যা ভিন্ন।

প্রভাতকুমারের 'সরস', 'বিরস' সকল গল্পেই এই পথিকধর্মী গতির ছবি দেখ্‌তে পাব। প্রথমতঃ, তাঁর রচনায় বিষয়-বিচিত্রতা প্রায় সীমাহীন। বাংলাদেশের শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত সমাজের গণ্ডী থেকে য়ুরোপের বহু বিসর্পিত জীবনভূমি পর্যন্ত প্রভাতকুমারের দৃষ্টির বিস্তার বাধাহীন। এর আরো একটা কারণ আছে; আর তাই হচ্ছে তাঁর ছোটগল্পগুলির আঙ্গিকগত বিশিষ্টতারও উৎস। আগে দেখেছি, প্রভাতকুমারের শিল্প-প্রকৃতি পথিক-বৃত্ত,—ছবি দেখা আর ছবি আঁকা তাঁর স্বভাব। চলমান জীবন-যানের দ্বার-পথে ছুটে-চলা জগৎকে তিনি তাঁর নির্বিকার মন দিয়ে দেখেছেন,—তাকেই হুবহু ধরে এঁকে দিয়েছেন গল্পের মধ্যে। জীবনের ছবি দেখে গল্পের ছবি আঁকা প্রভাতকুমারের শিল্প-ধর্ম, এই অর্থেই তাঁকে স্কেচ-শিল্পী বলছিলাম। আর এই কারণেই প্রভাতকুমারের

১৮। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ৩য় সং।

গল্পের যা কিছু আবেদন সে কেবল গল্পের শরীর-সংস্থানের সীমাতেই আবদ্ধ। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য রবীন্দ্র-গল্পের সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে এই বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষায় :—"রবীন্দ্রনাথের রচনায় কবিধ্যেয় ভাব-সত্যই গল্পদেহে বিরাজমান, প্রভাতকুমারের গল্পে প্রাথমিক আবেদন গল্পের মধ্যেই। ভাবাত্মা তার গল্পদেহে অনুবিষ্ট নয়, গল্পদেহেই তার উদ্ভব।"[১৯]

গল্পের বিন্যাসেই শিল্পী এমন পরিস্থিতি (situation) রচনার দক্ষতা দেখিয়েছেন যে, তার একেবারে মূল থেকেই ছোটগল্পের পরিণামী আবেদন স্বতঃ বিকশিত হয়ে ওঠে।

এই গল্প-নির্ভর রস-স্বভাবের জন্যেই বোধহয় প্রমথ চৌধুরী প্রভাতকুমারের শিল্প-শৈলীকে মোপাসাঁর রচনার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সে তুলনা যে একান্ত বহিরাঙ্গিক, একথা বর্তমানকালের সকল আলোচকই বলেছেন। অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জোরের সঙ্গে সত্য ঘোষণা করেছেন,—"লেখক হিসেবে প্রভাতকুমার এবং মোপাসাঁর সন্নিহিতি ত দূরের কথা তাঁরা উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরুতে বাস করেছেন।"[২০] সন্দেহ নেই, মোপাসাঁ-র ছোটগল্পের স্বাদুতাও প্রধানতঃ গল্প-শরীর-বিলম্বী। কিন্তু গল্পের দেহেই তিনি গল্পের অতীত জীবন-বোধের তপ্ত ক্ষোভ ও যন্ত্রণাকে অগ্নির রেখায় চিত্রিত করেছেন। প্রকৃতিবাদী (Naturalist) মোপাসাঁ জীবনকেই কথা বল্‌বার ভার দিয়েছেন, কিন্তু প্রতিটি রেখায় শিল্পীর অধীর প্রাণের দাহ লক্ষ মূক কণ্ঠে কথা বলে উঠেছে। স্বয়ং প্রভাতকুমার ফরাসীগল্পের বিশিষ্টতা ব্যাখ্যা করে বলেছেন,—"ইংরাজি ছোটগল্প ঘটনা-প্রধান। ফরাসী ছোটগল্পে রসের প্রাধান্য পরিস্ফুট। বিষয়টা কিছুই নহে—ঘটনাটা তুচ্ছ বলিলেও হয়—কিন্তু পড়িতে পড়িতে পাঠকের হৃদয়ে বিচিত্র ভাবের লহরী খেলিতে থাকে।"[২১] উদাহরণ হিশেবে তিনি বাল্‌জাক্‌-এর 'Passions of the Desert'-এর উল্লেখ করেছেন। মোপাসাঁ সম্বন্ধেও একই মন্তব্য প্রয়োগ করা চলে,—বহুপঠিত 'Neclacc' গল্পও তার একটি উল্লেখ্য প্রমাণ। প্রভাতকুমার রসের প্রাধান্য বলতে এক অন্তর-বিলম্বী ব্যঞ্জনাধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এখানে। এই ধরনের একমাত্র শিল্পী বলে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথকেই তিনি নির্দেশ করেছেন।

ইংরেজি গল্প ঘটনাপ্রধান, ফরাসী গল্প রসপ্রধান ;—প্রভাতকুমারের এই ধরনের বিভাগ-মূলকতার পূর্বাদর্শ অনুসরণযোগ্য হলে তাঁর নিজের গল্পশৈলীকে পরিস্থিতি বা

১৯। জগদীশ ভট্টাচার্য—দ্র. 'প্রভাতকুমারের শ্রেষ্ঠ গল্প'—ভূমিকা।

২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—'গল্পবিচিত্রা।'।

২১। ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সংগ্রহ 'ঘরের কথা'র প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লিখিত ভূমিকা। দ্রষ্টব্য—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'সাহিত্য সাধক চরিতমালা—৫৪'।

সিচুয়েশন-প্রধান বলে নির্দেশ করা যেতে পারে। কেবল স্থমিত ভাষণ ও পরিবেশোচিত বিন্যাসের বলেই গল্পের দেহে তিনি ছোটগল্পের ইম্‌প্রেশন সৃষ্টি করতে পেরেছেন। দৃষ্টান্ত হিশেবে 'দেবী' গল্পটির কথাই ধরা যেতে পারে। প্লটটি রবীন্দ্রনাথের দান, কিন্তু সৃষ্টি অকৃত্রিম প্রভাতকুমারের হাতের। আগে বলেছি, রবীন্দ্রনাথ এমন গল্প এমনি করেই লিখ্‌তেন না। আমাদের অন্ধসংস্কারের কালো পাথরের বেদীতে প্রাণের রক্তাক্ত আত্মহত্যা রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্তকে ঘন ঘন বেদনার্ত করেছে। গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন থেকে বোষ্টমীর স্বামী বিসর্জন পর্যন্ত প্রতি ছোটবড় দুর্ঘটনা কবি-কল্পনাকে মথিত করেছে। আর এই অন্ধসংস্কারের অমা-রূপ রচনায় তান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের ভীষণতাও কবির বহু রচনায় থম্‌থম্ করছে। 'বিসর্জন' বা 'রাজর্ষি'র কথা ছেড়ে দিলেও 'বৌঠাকুরাণীর হাট', 'প্রায়শ্চিত্ত' ইত্যাদি রচনায় সেই অনুভবের রক্তাক্ত আভাস আছে। সবক্ষেত্রেই—কবিতা, উপন্যাস বা নাটকের পটভূমি কবির হৃদয়-বেদনা, ও স্পর্শকাতর সহানুভূতি দিয়ে গড়া। তাতে আবেগ আছে,—আবহ-ও আছে। কিন্তু 'দেবী' গল্পে কোথাও তা নেই,—এ-যেন ঘুমন্ত জীবনের ওপরে পাহাড় প্রমাণ এক অখণ্ড পাথরের ভার,—কোথাও ভাঁজ নেই,—কোথাও বিভগ্নতার ফাঁক দিয়ে আবেগের তরলিত (liquid) ধারা গলে পড়তে পারে নি।

পাথরের ভার প্রথম অবচেতন মনের কানায়-কানায় অনুভূত হতে আরম্ভ করেছে উমাপ্রসন্ন ও দয়ার নবদাম্পত্য-সুরভিত শয্যাগৃহের দ্বারে ব্রাহ্মমুহূর্তে কালীকিঙ্করের গুরুগম্ভীর আহ্বান-ধ্বনিতে। পূর্বরাত্রির উচ্চকিত মিলনমাধুরীর মাঝখানেও তার বীজ অঙ্কুরিত ছিল—অনেকটা নাটকীয় পূর্বসংকেত-এর মত। দয়ার অন্যমনস্ক ভয়াতুরতায় তার ব্যঞ্জনা আছে। তারপরে গল্প যত এগিয়েছে,—দেবগৃহে দম্পতির প্রথম গোপন সাক্ষাৎ ও ষড়যন্ত্র, অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সঞ্চারিত সংস্কারের গাঢ়তা, দ্বিতীয় সাক্ষাৎ, দয়ার সংশয়, স্বামি-স্ত্রীর পলায়ন,—দয়ার প্রত্যাবর্তন, খোকার অসুখ-এর ধাপে ধাপে গল্প যত এগিয়েছে, পাথরের ভার আর চাপ ততই শ্বাসরোধী হয়ে উঠেছে ক্ষণে ক্ষণে। তারপর সর্বশেষ পরিস্থিতির উল্লেখের সঙ্গে একেবারে উৎকণ্ঠার শেষতম নিঃশ্বাস উদ্গীর্ণ করে ট্রাজেডির মধ্যে গল্পের অবসান:—খোকার মৃত্যুর "পরদিন কালীকিঙ্কর উঠিয়া পূজার ঘরে গিয়া দেখিলেন, সর্বনাশ! পরিধেয় বস্ত্র রজ্জুর মত করিয়া পাকাইয়া, কড়িকাঠে লাগাইয়া দেবী আত্মহত্যা করিয়াছেন।" এখানে দয়া নয়, 'দেবী' শব্দের প্রয়োগ-পরিমিতির ব্যঞ্জনাটুকুও লক্ষ্য করতে বলি—"**দেবী আত্মহত্যা করিয়াছেন।**"

গল্পের এই গতি ও পরিণতিকে নাটকীয় বলা চলে না,—এর পূর্বাংশে না আছে প্রত্যক্ষ সংঘাত,—না আছে পরিণামের আকস্মিকতা। এ যেন সত্যিই সিচুয়েশন-এর

ওপরে সিচুয়েশন-এর চাপ দিয়ে দিয়ে অনুভবের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাথরের ভার বাড়িয়ে নিরুদ্ধশ্বাস করে তোলার আর্ট।

'হিমানী' গল্পেও তাই। সবচেয়ে লক্ষ্য করতে হয় লেখকের এক অদ্ভুত নির্লিপ্তি। বিধাতার মতো নিজের সৃষ্টির প্রতি তিনি নির্মম নন,—কিন্তু পাত্র-পাত্রীদের সম্বন্ধে নির্বিকার। হিমানী আর মণি পরস্পরকে আপ্রাণ ভালবেসেছিল। সেই ভালবাসার মর্যাদা দিতেই মণি হিমানীর কাছ থেকে দূরে সরে এসেছিল। তার প্রেমবোধই কর্তব্যবুদ্ধি ও আত্মরক্ষাপ্রবণতার রূপ ধরে স্ত্রী নবদুর্গার কাছে আত্মপ্রকাশে তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু নবদুর্গা তাকে বুঝল না, তার আত্মমুক্তির সহায়তা করল না,—উল্টে করলো কদর্য সন্দেহ। মণির সে ট্রাজেডি অনির্বাচ্য, যাকে প্রাণভরে ভালবাসে, যাকে পেতে পারলে জীবন চরিতার্থ হয়ে যায়, তাকে পাবার উপায় নেই কেবল একটি নারীর জন্য। অথচ তার প্রতি, সেই ধর্ম-পত্নীর (?) প্রতি ঘৃণা ছাড়া আর কোনো মনোভাব পোষণ করা চলে না। জীবন-সন্ধানের এক অতলান্ততার মুখে এসে পৌঁচেছেন শিল্পী এখানে। কিন্তু ব্যাখ্যা নয়, আবেগ নয়, এই দুঃসাধ্য পাথার পেরিয়ে গেলেন তিনি কেবল সুসজ্জিত সিচুয়েশন-এর সেতু বেঁধে :—

মণির 'মনোম্যানিয়া' দেখা দিল,—স্ত্রীকে দেখলেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অতএব নবদুর্গা পিত্রালয়ে গেল। নদীতীরে বিরাট ব্যবসা ফেঁদে সেই নির্জনতায় নিঃসঙ্গ-বাস বরণ করলো মণি। তারপর একে একে হিমানীর তিনটি ছবি আঁকা, তার হস্তলিপির অনুকরণ, তার ভাবে ভাবিত হয়ে তারই বকলমায় কবিতা লেখা,—এ সবই নির্লিপ্ত শিল্পীর হাতের কয়েকটি তুলির আঁচড় যেন। বাংলাদেশে এই অনুভূতির পুঁজি নিয়ে বৈষ্ণব কবিতার অনিঃশেষ অশ্রুপ্রবাহ যুগে যুগে গঙ্গাযমুনার কূল ছাপিয়ে উঠেছে। সামান্য সে আবেগের কম্পনে এখানেও তা হতে পারত। কিন্তু স্বভাব-পথিক শিল্পী সে পথ দিয়েও যান নি। অথচ নির্মম নন তিনি। অকম্পিত ভঙ্গিতে আবার সিচুয়েশন্-এর মালা গেঁথে হিমানীর সঙ্গে পুনঃ সাক্ষাৎ থেকে আশ্চর্য পরিণাম পর্যন্ত গল্পকে পৌঁছে দিয়েছেন—যেন একান্তই অনায়াসে।

গল্প রচনায় এই সিচুয়েশন-সর্বস্বতা প্রভাতকুমারের একমাত্র গুণ এবং দোষও। অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভাতকুমারের লেখায় 'great short story' বলতে মাত্র দেড়টি গল্পের উল্লেখ করেছেন। তাতে আছে 'দেবী' আর "আংশিক ভাবে আদরিণী"।[২২] বস্তুতঃ 'আদরিণী' গল্পটিতে মহৎ ছোটগল্পের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু লেখক শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। প্রথমবারের বিদায়-যাত্রার পরে আদরিণীকে আবার ঘরে

২২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—'গল্পবিচিত্রা'।

টেনে এনে পুনরায় বিদায়-দান ও অবশেষে তার মৃত্যুর চিত্রে গল্পের সমাপ্তি রচনায় ঘটনা-বিন্যাস অতি বিলম্বিত হয়েছে। মাঝখানে জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের অবস্থা-বিপর্যয়ের চিত্রতেও একের পর এক তথ্যের সরবরাহে বর্ণনা stale হতে আরম্ভ করেছে। এ ধরনের ঘটনা-বিন্যাস গল্পকে ঘটনা-ভারাক্রান্ত করে তোলে। এই অতিলম্বিত (over stretched) সিচুয়েশন-প্রবাহের ভারেই প্রভাতকুমারের অনেক গল্প ছোটগল্পোচিত আবেদনের তীক্ষ্ণতা হারিয়েছে। মাত্র দেড়খানা যদি নাও হয়, তবু প্রভাতকুমারের মহৎ গল্পের সংখ্যা তাঁর রচনা-পরিধির বিচারে প্রচুর নয়।

তাই বলে তাঁর অধিকাংশ গল্পই নীরস-ও নয় আবার। ছোটগল্পের এক বিশেষ আঙ্গিক আছে,—রূপের সেই কাঠামো নিখুঁত না হলে তার গভীর তলদেশ থেকে বিশেষ রসের উৎসার অনবদ্য প্রকাশ পেতে পারে না। কিন্তু ছোটগল্প ছাড়াও গল্প-রসের আরো একাধিক বাহন রয়েছে,—এই গ্রন্থের প্রথম তিন পরিচ্ছেদে তাদের কথা বলেছি। প্রভাতকুমারের যে-সব গল্প ছোটগল্প হয়নি, তারও অনেক কয়টি চিরন্তন গল্প রসে ঋদ্ধ। আমাদের সকল রসবোধের পেছনেই রয়েছে জীবনকে আস্বাদন করবার আকাঙ্ক্ষা। সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায়, হাসি-অশ্রুতে মেশা সেই অনতিতীব্র জীবন-সৌরভ পরিবেশন করে গেছেন প্রভাতকুমার তাঁর গল্পগুচ্ছে। ছোটবড় ঘটনায় সহজে-তরঙ্গিত জীবনের একটা নিজস্ব স্বাদুতা রয়েছে। দুঃখের তীব্রতা বা হাসির উল্লাস জীবনের সেই মৃদু স্বাদ-গন্ধকে আচ্ছন্ন করে ফেলে মশলা-পীড়িত ঝাঁজালো তরকারির মতো। প্রভাতকুমার আবেগ বা অভিজ্ঞতার, প্রত্যয় বা অপ্রত্যয়ের মশলা ছড়িয়ে দেননি চোখে-দেখা জীবনের ওপরে। তাই তাঁর গল্পে প্রতিদিনের খুঁটিনাটি-ভরা চিরন্তন জীবনের অনতিমৃদু, নাতি-তীব্র একটি সৌরভ যেন ছড়িয়ে আছে। তাই 'কাশীবাসিনী' 'মাতৃহীন' বা 'ফুলের মূল্য'র মত গল্প পড়ে ট্রাজেডির তীব্রতাবোধে আমরা ভেঙে পড়ি না। আবার 'রসময়ীর রসিকতা', 'বলবান জামাতা' বা 'প্রণয় পরিণাম'-এর মত গল্প পড়ে হেসেও ফেটে পড়ি না। দুঃখে হোক্, সুখে হোক্, কেমন নিরবচ্ছিন্ন ভাল লাগার এক দুর্লভ অনুভব মনে ছড়িয়ে থাকে,—ভাবতেও মজা লাগে।

দৃষ্টান্ত হিশেবে 'কাশীবাসিনী' গল্পটির কথাই বলি। রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্পের সঙ্গে এর বিষয়গত যোগ আছে। কিন্তু দ্বিতীয় গল্পটির সমাপ্তিক্ষণে মন যেমন ট্রাজেডি-স্তব্ধ হয়ে থাকে, প্রথমটিতে তা হয় না! বরং মালতী যখন মার পায়ে প্রণাম করে আবার তাঁকে ফিরে পেতে চায়, তখন নির্ভার ভাললাগায় মন ভরে ওঠে। বিন্যাসের অতিব্যাপ্তি আর-একটু সংহত হলে এ-সব গল্পও ছোটগল্প হয়ে উঠতো,—তবে অতটা 'মজার গল্প' হয়ত থাকত না। মজার বলতে খুশির গল্প বলছি না,—'কাশীবাসিনী'

দুঃখে খুশি হতে পারা পৈশাচিক। কিন্তু নির্ভার ভাললাগার এক আশ্চর্য আমেজ অনুভব করি ঐ গল্প-শেষেও। প্রভাতকুমারের প্রতিটি সার্থক গল্পেরই এই গুণ ; তাই ভাল ছোটগল্প না হলেও, স্মরণীয় হয়ে থাকবে তারা যথার্থ গল্পরসিকদের কাছে।

বিশেষ করে সরস গল্পগুলিতে এই মজার রসদই যুগিয়েছেন প্রভাতকুমার—সকল সম্ভব-অসম্ভব অর্থে। প্রচলিত সংস্কার অনুসারে তিনি লঘু পদসঞ্চারী রসিক গল্পকার। কিন্তু যে অর্থে ত্রৈলোক্যনাথ রসিক, যে অর্থে পরশুরামকে বলি সরস গল্পের স্রষ্টা,—প্রভাতকুমার সে অর্থে হাস-রসিক নন। হাসির চেয়ে দুঃখের প্রতিই তাঁর মায়া বেশি,—সংখ্যায় এবং গুণে. সিরিয়াস্ গল্পগুলিই প্রাধন। এ-কথা আগেও বলেছি। এক 'প্রণয় পরিণাম' ছাড়া এমন স-হাস গল্প প্রভাতকুমারের রচনায় দুর্লভ, যাকে উৎকৃষ্ট ছোটগল্প বলা চলে। হিন্দুস্কুলের চোদ্দবছরের ছাত্র মাণিক-এর অকাল-প্রণয়ের যে হাস-মধুর ছবি শিল্পী এঁকেছেন তার, অনতিতীব্র মজার আমেজ অনেকক্ষণ মনকে অধিকার করে রাখে। বিশেষ করে গল্পের ফলশ্রুতি ঘোষণায় লেখকের রসার্দ্রচিত্ততা অমিশ্র হাসসমুদ্ভাস! আগেই বলেছি, এই হাসিকে হিউমার বা স্যাটায়ার-এর পর্যায়ে ফেলা যায় না। এগুলি নিছক 'ফান্'-এ ভরা ; মাঝে মাঝে তির্যক স্মিত ভাষণে উইট্-এর দীপ্তিও ঝরে পড়েছে। ফল কথা, ছোটগাল্পিক প্রভাতকুমার জীবনের হাসি-অশ্রুমাখা সকল পথেই সমান উৎসাহে এগিয়ে গেছেন—অমিশ্র জীবনের সহজ-সৌরভ অনুভব করেছেন প্রতিদিনের পথ চলায়,—গল্পে এঁকেছেন তার হুবহু স্কেচ্। জীবনের পথে তাঁর পদক্ষেপ লঘু নয়, অনতিতীব্র,—তাঁর গল্প-রসের স্বাদুতাও তাই মৃদু।

তাঁর গল্পগ্রন্থ সংকলনের মধ্যে আছে 'নবকথা' (১৮৯৯), 'ষোড়শী' (১৯০৬), 'দেশী ও বিলাতী' (১৯০৯), 'গল্পাঞ্জলি' (১৯১৩), 'গল্পবীথি' (১৯১৬), 'পত্রপুষ্প' (১৯১৭), 'গহনার বাক্স ও অন্যান্য গল্প' (১৯২১), 'হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৪), 'বিলাসিনী ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৬), 'যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৮), 'নূতন বৌ ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৯), 'জামাতা বাবাজী ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩১)। প্রথম দিকের সংকলনগুলির কোনো কোনো গল্প পরবর্তী গ্রন্থে পুনঃসজ্জিত হয়েছে। তাছাড়া কেবল বড়দের গল্প-ই নয়, শিশুগল্পও লিখেছিলেন প্রভাতকুমার কিছু কিছু।

২। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮) ছিলেন বিচিত্র কর্মা। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, মৌলিক গবেষণা ও নিবন্ধ রচনা এবং প্রখ্যাত পত্রিকা সম্পাদনায় সহযোগিতার

কথাশিল্পী ছিলেন। তাঁর লেখা উপন্যাসের সংখ্যা আটাশ এবং গল্প-সংকলন ষোলটি। দুটি গ্রন্থ পুরাতন গল্প-সংকলনের পুনঃসম্পাদিত রূপ। কেবল পত্রিকা সম্পাদনের ধারা অব্যাহত রাখবার জন্যেই চারুচন্দ্র গল্প-উপন্যাস লিখতেন না ; এ পথে তাঁর একটি নিজস্ব প্রবণতাও ছিল। আর কথাশিল্পী চারুচন্দ্রের সৃজন-প্রেরণার অনেকখানিই ছিল তাঁর রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের ফল।

কবি রবীন্দ্রনাথ অননুকরণীয় ;—রবীন্দ্রগোষ্ঠীর কবি বলতে যাঁদের বুঝি, রবীন্দ্র-প্রকৃতির অতলস্পর্শ অনুভব-সূক্ষ্মতার সঙ্গে তাঁদের অনেকেরই দূরতম সান্নিধ্য আবিষ্কার করাও কঠিন হয়। ঔপন্যাসিক এবং প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথও নিঃসঙ্গ—একক। তাঁর অন্তর্লীন কবি-ধর্মের প্রেরণা সর্বত্রই অননুকরণীয়। ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই কেবল গল্পগুচ্ছের যুগের প্রতি লক্ষ্য রেখে একটি রবীন্দ্রগোষ্ঠীর কথা কল্পনা করা চলে। প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রানুরক্ত স্বাতন্ত্র্যের কথা ছেড়ে দিলে চারুচন্দ্রকেই এই গোষ্ঠীর মুখ্য ব্যক্তিত্ব বলা যেতে পারে। অবশ্য তাঁর শিল্প-জীবনের শুরু 'গল্পগুচ্ছে'র শ্রেষ্ঠ মরশুমের পরে।[২৩] এই গোষ্ঠীর মধ্যে আরো আছেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি-কন্যা মাধুরীলতা, অক্ষয় চৌধুরীর পত্নী শরৎকুমারী চৌধুরাণী প্রভৃতি। কিন্তু চারুচন্দ্রের মুখ্যত্ব কেবল তাঁর গল্প-সংখ্যার প্রাচুর্যে নয়, প্রবল রবীন্দ্র-ভক্তি ও গভীর রবীন্দ্র-সান্নিধ্য রবীন্দ্র-ভাবনার সঙ্গে তাঁর শিল্পি-আত্মাকে একান্ত অন্বিত করেছিল। এক এক সময়ে মনে হয়, রবীন্দ্র-প্রতিভার থেকে তাঁর অলোকসামান্যতার অংশ এবং রবীন্দ্র-মর্ম থেকে তাঁর সহজ-গভীর কবিত্বকে ছেঁকে নিতে পারলে যেটুকু থাকে, তারই অভিব্যক্তি ছিলেন চারুচন্দ্র।

চারুচন্দ্রের শিল্প-স্বভাবের যথার্থ পরিচায়নের জন্য এই উক্তির তাৎপর্য নির্দেশ হয়ত প্রয়োজন। রবীন্দ্র-প্রতিভার অলোকসামান্যতা সারা পৃথিবীর ইতিহাসেও দুর্লভ সম্পদ। চারুচন্দ্রের পক্ষ থেকে সেই অসামান্যতা দাবি করবার কারণ নেই। অন্যপক্ষে, বলেন্দ্রনাথের মতোও কোনো সহজ-কবিধর্ম তাঁর মধ্যে নিহিত ছিল না। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিল একটি রুচি-সূক্ষ্ম কাব্য-সাহিত্য-রসিক মন,—রবীন্দ্র-চেতনার আলোকস্পর্শে তা দীপ্ত সঞ্জীবিত হয়েছিল। গল্প-রচনার ক্ষেত্রে ঐটুকুই ছিল চারুচন্দ্রের প্রধান পুঁজি,—আর সেটুকু খুব কম ছিল না যে,—লেখকের রসস্নিগ্ধ গল্প-উপন্যাসগুলিই এ-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

'স্রোতের ফুল', 'দুই তার', 'হেরফের' ও 'ধোঁকার টাটি',—এই চারখানি উপন্যাসের

২৩। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই দুঃখ করে লিখেছিলেন, "তোমরা সব বড় পরে জন্মেছ। বছর কুড়ি আগে যদি জন্মাতে, তাহলে তোমাদের আমি দেদার প্লট্ দিতে পারতাম। তখন আমার মনে হত আমি দুহাতে প্লট্ বিলিয়ে হরির লুট দিতে পারি।" —দ্রষ্টব্য : শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত—

প্লট তাঁকে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন,—একথা চারুচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে কেবল 'চাঁদির জুতা'র প্লটই কবির হাতের দান বলে জানা যায়। কিন্তু যে-সব গল্পে প্রত্যক্ষ রবীন্দ্র-সান্নিধ্য নেই, সেখানেও গল্পের বর্ণনায়—ভাষা ও জীবন-কল্পনায়, সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের ভাব-সাযুজ্য ভাস্বর হয়ে আছে। এই অর্থেই বলছিলাম,—মনে হয়—চারুচন্দ্র যেন রবীন্দ্র-মানসের গহনে একবার করে ডুব দিয়ে এসে গল্প লিখতে বসেছেন। আসলে তাঁর শিল্পি-মন রবীন্দ্র-ভাবলোকেরই স্থায়ী বাসিন্দা ছিল।

যে-কয়টি গল্প পড়লে একথা খুব স্পষ্ট বোঝা যায়,—তাদের মধ্যে 'অপরাজিতা'-ও শ্রেষ্ঠ একটি। রবীন্দ্রনাথের 'আবেদন' কবিতার সঙ্গে 'জয়-পরাজয়' গল্পের সমন্বয় ঘটাতে পারলে যে ভাব-পরিস্ফুতির জন্ম হয়, তারই কান্ত রূপ প্রত্যক্ষ করি 'অপরাজিতা' গল্পে। একটা কথা স্পষ্ট করে বলবার প্রয়োজন এল এই প্রসঙ্গে,—চারুচন্দ্রকে রবীন্দ্র-ভাব-নিষ্ণাত শিল্পী বলতে অন্ধ বা অক্ষম রবীন্দ্রানুকারী মনে করছি না কিছুতেই। রবীন্দ্র-ভাবনা দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হলে তার শিল্পমূর্তি কেমন হয়, তাই দেখেছি চারুচন্দ্রের 'অপরাজিতা' গল্পে। প্রেমের জগতে রূপের মোহ এবং প্রাণের সত্যতার দ্বন্দ্ব একেবারে 'কড়ি ও কোমল'-এর যুগ থেকে রবীন্দ্র-অনুভবের একটা প্রধান অংশ হয়ে আছে। রূপের অন্ধতা এখানে ক্লান্তিকর,—প্রাণের উজ্জীবনেই প্রেমের নবনবোন্মেষশালিনী মুক্তি। রবীন্দ্র-জীবনের এই সত্য-বোধ চারুচন্দ্রের চেতনায় দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে। অবন্তী-সম্রাট,—সার্বভৌম হিন্দু নরপতি বসন্ত, মালাকারের ছদ্মবেশে হৃদয় জয়ের অভিযানে বেরিয়েছিলেন। কারণ, "রাজার প্রাসাদে হৃদয় কিনিতে পাওয়া যায়, জয় করিয়া পাওয়া যায় না। তাহা জানিয়াই" বসন্ত বলেন—"এই দীনবেশে হৃদয় জয়ে বাহির হইয়াছিলাম। একটি হৃদয় আমি পাইয়াছি, যাহা হৃদয় চায়, রাজ্য চায় না। জয় করিতে আসিয়া বড় আনন্দে হারিয়া গেলাম।" চিরলাঞ্ছিতা কাশীরাজ-কন্যা যমুনার নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্জনে অবন্তী-সম্রাটের প্রেমের অভিষেক হল।

কেবল প্লট-এর কল্পনায় নয়,—বর্ণনাতেও বাসন্ত ফাগ-এর মত উচ্ছ্বসিত রোমান্স্‌ধারা অজস্র উৎসারিত হয়েছে। বরং রোমান্টিক্ কবি-কর্মের একটু অতিশয়তাই আছে এই নিটোল-সুন্দর গল্পে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গভীরতা থেকে চারুচন্দ্রের গল্প-সাহিত্যের জন্ম নয়। বহু গল্পেই তাই রোমান্টিক অতীত প্রচ্ছদের আশ্রয়কামনা শিল্পীর পক্ষে প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। দৃষ্টান্ত হিশেবে 'প্রেমের নিরিখ' নামে আর একটি গল্পের উল্লেখ করি। মহেন্দ্রবিদার নগরের রাজকন্যা ভদ্রসোমা যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার সহযোগিতা করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের বীর মন্ত্রী বল্লকণ্ঠের শৌর্যে মুগ্ধ হয়। যুদ্ধ-শিবির থেকে ফিরে এসে দয়িতকে সে গোপন অনুরাগ-লিপি প্রেরণ করে। বল্লকণ্ঠ-ও এই শূর-সুন্দরীর মহিমায়

বিগলিত-চিত্ত হয়েছিল। সোমভদ্রার সঙ্গে বিবাহ-প্রস্তাবের প্রতিদানে নিজ প্রভুর রাজ্যের বিরাট এক অংশ সে ফিরিয়ে দেয় বিপক্ষের হস্তে। তারপর সন্ধিসূত্রের অধিকারে সোমভদ্রার মালঞ্চে প্রবেশ করলে রূঢ়কণ্ঠে ঝল্লকণ্ঠকে সোমভদ্রা প্রত্যাখ্যান করে। অথচ তার প্রত্যাবর্তন-পথের ওপরেই নিজের প্রেম-বুভুক্ষু হৃদয়কে লুটিয়ে দেয় আর্তধ্বনিতে। যাকে বীরবেশে ভাল বেসেছিল, সে কেন কামুকের দীনতা বরণ করে এল,—এই সবেদন জিজ্ঞাসার শেষ কোথায়! অবশেষে ঝল্লকণ্ঠ প্রেমিকার প্রত্যাখ্যানের আঘাতের মধ্যেই কামনার নাগপাশ থেকে মুক্তি খুঁজে পায়। অনুতপ্ত চিত্তে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্জয় যুদ্ধে। কামনার বশে যা বিকিয়ে দিয়েছিল, প্রাণপণ শক্তি দিয়ে তাকে উদ্ধার করল। কিন্তু সেখানেই থাম্‌ল না তার আক্রোশ। এবার বিপক্ষ-পক্ষের রাজ্য আক্রমণ করল দুর্মদ বলে। রাজপুত্র সোমভদ্র সন্ধি বিষয়ের আলোচনা করতে এসে আমূল ছুরিকা বিঁধে দিল তার বুকে। সেই অন্তিম ক্ষণেই এল সোমভদ্রার প্রণয়বার্তা, বিজয়ী বীরকে প্রেমের অর্ঘ্যে বন্দনা করবে বীরাঙ্গনা। প্রশান্ত স্নিগ্ধতায় এবার মৃত্যুকে বরণ করলো ঝল্লকণ্ঠ। মৃত্যুর আলোকে বুঝে গেল,—এ-প্রায়শ্চিত্ত তার পক্ষে অপরিহার্য ছিল। একদিন কামাতুরতার আগুনে অদেয়কে সে দান করেছিল,—আপ্রাণ যুদ্ধে তা ফিরিয়ে এনে হয়েছিল তার প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু এখানেই সে থাম্‌তে পারেনি,—নির্জিত আক্রোশে পররাজ্যের অপ্রাপ্য ভাগ জোর করে পেতে চেয়েছিল। তারই প্রায়শ্চিত্ত হল এই মৃত্যুতে।

এই জীবনমূল্য-বোধে রবীন্দ্রচ্ছায়া রয়েছে। এর নবকল্পনা এবং প্রকাশ চারুচন্দ্রের একান্ত স্বকীয়। কিন্তু এই কবি-ভাবনাকে কাব্যিক প্রকাশ দিতে গিয়ে এবারে এসেছে জড়তা, —তৎসম শব্দবহুল ভাষা হয়ে পড়েছে আড়ষ্ট। চারুচন্দ্র কবি ছিলেন না,—ছিলেন কবিশিষ্য ;—তাঁর সফলতা-ব্যর্থতা একাধারে এই সত্যই প্রমাণ করে। যে-সব গল্প অপেক্ষাকৃত সমসাময়িক জীবনানুভবের সঙ্গে অন্বিত, সেখানেও ঐ একই কথা। 'চুড়িওয়ালা' গল্পটিতে একাধারে 'কাবুলিওয়ালা'-র কান্তি এবং 'মেঘ ও রৌদ্রে'র পরিণামী করুণা যুক্ত হয়ে আছে। তা হলেও এক বৃদ্ধ মুসলমান চুড়িওয়ালার সঙ্গে এক বালিকাবধূর স্নিগ্ধ হৃদ্যতার বেদনাঘন পরিণাম অপরূপ মধুর।

জটিল-সমস্যাময় জীবন-পরিণাম নিয়েও চারুচন্দ্র কিছু কিছু গল্প লিখেছেন। সেখানেও তাঁর দৃষ্টি রোমান্‌স্‌-স্বপ্নাতুর। দৃষ্টান্ত হিশেবে 'বায়ুবহে পূরবৈয়াঁ' এবং 'বন্ধু' গল্পের উল্লেখ করতে পারি। স্কুলের গাড়ির সহিস একটি চামার ছেলে কি করে প্রায় সমবয়স্ক স্কুলের ছাত্রীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল, তার দুঃসাহসিক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রয়েছে প্রথম গল্পে। কানুর মনোরূপায়ণে, শিল্পী যেন একটি প্রণয়-কবিতাকে ভাঁজে ভাঁজে খুলে

পড়েছেন। এর পরিসমাপ্তিতে মাধুর্য যেমন আছে, তেমনি কাব্যগন্ধিতাও অপরূপ। এটি চারুচন্দ্রের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। একই প্লট-কে বাড়িয়ে একই নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন শিল্পী পরে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, রবীন্দ্রানুরক্ত কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে অসামাজিক প্রণয়চিত্রণের দক্ষতায় চারুচন্দ্র এককালে 'কুখ্যাত' হয়েছিলেন।

'বন্ধু' গল্পের প্রেম-জটিলতা বা দুঃসাহসিকতা তত অকল্পনীয় নয়,—কিন্তু গল্পটি সত্যিই মিষ্টি। বীরেন্দ্র ও সুকুমারী নামক দুটি সগোত্র তরুণ-তরুণীর প্রণয়-পরিণাম শিল্পী যেভাবে এঁকেছেন, তাতে সমস্যাচিত্রের অপরিণতি অতৃপ্তির কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু সে পরিণামেরও কাব্যিক উদাত্ততা অস্বীকার করবার নয়। সকল রকমের গল্পেই এই সংগত-অসংগত কবি-দৃষ্টি চারুচন্দ্রের ছোটগল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

এঁর গল্প-সংকলনের মধ্যে রয়েছে—'পুষ্পপাত্র' (১৩১৭), 'সওগাত' (১৩১৮), 'ধূপছায়া' (১৩১৯), 'বরণডালা' (১৩২০), 'চাঁদমালা' (১৩২২), 'মণিমঞ্জরী' (১৩২৪), 'কনকচুর' (১৩২৫), 'পঙ্কদলী' (১৩৩৪), 'বজ্রাহত বনস্পতি' (১৩৪২), 'সদানন্দের বৈরাগ্য' (১৩৪২), 'বায়ুবহে পূরবৈয়াঁ' (১৩৪২), 'ব্যবধান' (১৩৪৩), 'যাত্রাসহচরী' (১৩৪৪), 'বনজ্যোৎস্না' (১৩৪৫), 'শমীশাখা' (১৩৪৫), 'দেউলিয়ার জমাখরচ' (১৩৪৫)।

এর মধ্যে 'বজ্রাহত বনস্পতি', 'সদানন্দের বৈরাগ্য', 'বায়ুবহে পূরবৈয়াঁ' এবং 'ব্যবধান' আসলে 'পুষ্পপাত্র', 'সওগাত' ও 'চাঁদমালা'র সংকলিত গল্পগুলিরই পুনঃ-সংকলন।

'যাত্রাসহচরী', 'ধূপছায়া' সংকলনের গল্পগুচ্ছের সঙ্গে 'যাত্রাসহচরী' নামক নূতন একটি গল্পের সহযোগে গ্রন্থিত।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশ্চর্য সুন্দর গল্প লিখে গেছেন সুধীন্দ্রনাথ (১৮৬৯-১৯২৯); তার চেয়েও আশ্চর্য বাংলা সাহিত্যে এমন সব সুন্দর ছোটগল্পের মূল্য প্রায় হারিয়ে গেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনি চতুর্থ পুত্র ছিলেন,—রবীন্দ্রনাথের ছিলেন একান্ত স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র। ২২ বছর বয়সে 'সাধনা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক হয়েছিলেন ইনি,—আর দক্ষতার সঙ্গে তিন বছর ধরে এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন। কবিতা এবং প্রবন্ধও লিখেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ,—কিন্তু রূপ রসে সফল ছোটগল্প রচনাতেই তাঁর পূর্ণসিদ্ধি।

সুধীন্দ্রনাথের প্রাণের গহনে ছিল অতন্দ্র জীবন-প্রীতি, কিন্তু তাঁর প্রকাশে ছিল নাট্যকারের মত নৈর্ব্যক্তিকতা আর অর্থপূর্ণ সংক্ষিপ্তি। গল্পের বিষয়বস্তুও সমারোহহীন—সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের পথচলার ছোট সুখ, ছোট দুঃখ গল্পগুলিকে ধারণ করে রয়েছে।

অথচ সেসব ঘটনা বা বর্ণনায় বিশেষ দেশকালের ছাপ পড়ে নি। মানুষের তুচ্ছ অথচ চিরন্তন বৃত্তি ও প্রবৃত্তিসমূহই সুধীন্দ্রনাথের গল্পে অনায়াস-ধৃত হয়ে আছে। বর্ণনায় উচ্ছ্বাস বা আতিশয্য নেই কোথাও, প্রকাশে নেই আবেগ-কম্পনজনিত কুঞ্চন। ঋজু অথচ নিরাভরণ ভাষা সরল স্বচ্ছন্দ-গতি ;—কিন্তু সার্থক সংক্ষিপ্তির গুণে মর্মস্পর্শীও। বাংলা সাহিত্যে সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই বোধ হয় বলা চলে,—যে-কোনো বিষয় নিয়ে যা-খুশি গল্প লিখ্‌তে পারতেন তিনি,—আর সে গল্প অনায়াসে হতে পারত রস-সিদ্ধ। 'কাসিমের মুরগী', 'পাড়া-গেঁয়ে,' 'কুকুরের মূল্য', 'স্নেহের জয়', 'পোড়ারমুখী', লাঠির কথা', 'পিতা ও পুত্র', 'মা ও ছেলে', ইত্যাদি গল্পের নামেই বিষয়বস্তুর অকিঞ্চিৎকরতার প্রকাশ। অথচ কেবল বিন্যাসের গুণে প্রাণের অলক্ষ্য উত্তাপ গল্পের মূল থেকে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে পরিণামে সারা গল্পকে এবং পাঠকের মনকেও গম্ভীরভাবে আলোড়িত করে তোলে।

তবে সুধীন্দ্রনাথের গল্পগুলি কিন্তু তাদের ক্রমান্বিত সংঘাতমূলকতার জন্যেই নাট্যধর্মী নয়। বস্তুত ভাবের বিরোধিতা তাঁর কোনো গল্পে যদি থাকেও, তবু তা সংঘাতের রূপ ধরতে পারেনি। আগেই বলেছি, লেখকের বর্ণনাভঙ্গী ঘন-গম্ভীর নয় ; অর্থপূর্ণ সংক্ষিপ্তি ও নির্ভার গতিই তাঁর প্রকাশের বৈশিষ্ট্য। কেবল একটানা দ্রুতগতির শেষে মন-মন্থিত স্তব্ধতার বিস্ময়-ব্যঞ্জনা গ্রীক নাট্যপরিণামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এদিক্ থেকে শিল্পীর লেখনীকে আদিম স্থপতির খোদাই-যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের কম্পনে কুণ্ঠিত চিরন্তন জীবনের নিকষ কঠিন পাথরে কুঁদে কুঁদে ছোট ছোট রূপের রেখা টেনে তুলেছেন সুধীন্দ্রনাথ। প্রায় প্রত্যেকটি টান, প্রতিটি বিভঙ্গ সু-সীম, স্পষ্ট, যথাপরিমিত। এই রেখার টানে চল্‌তে চল্‌তে গল্প যখন হঠাৎ থেমে গেছে,—তখন পাথরের দাগগুলোই প্রাণের আবেগরূপে কলকণ্ঠ হয়ে উঠেছে। তার বাইরে নিস্তব্ধ কাঠিন্য,—ভিতরে প্রস্তরভেদী অনুভবের স্রোত।

সুধীন্দ্রনাথের গল্পের বিন্যাস এতো অতুল্য,—এবং এই বিন্যাস-এর ওপরেই তার ছোটগল্পগুণ এত বেশি নির্ভর করে আছে যে, গোটা গল্প তুলে না দিলে বক্তব্য কেবল অস্পষ্টই থাকে। তবু, এ-পর্যন্ত প্রমাণহীন মন্তব্যের ভার যে-পরিমাণ অস্পষ্টতা রচনা করেছে, তার নিরসন কামনায় একটি গল্পের আংশিক উদ্ধার করব ; প্রত্যাশা করব, এ-যুগে সুধীন্দ্রনাথের গল্প আবার বহু পঠিত হবে।

গল্পটির নাম 'পোড়ারমুখী' ; শুরু হয়েছে :—"যামিনীনাথের স্ত্রী দামিনীলতার অষ্টম গর্ভের সন্তান স্নেহলতা, ওরফে পোড়ারমুখী।

"পোড়ারমুখী বড় অসময়ে আসিয়াছিল। যামিনীনাথ পাঁচটি কন্যার বিবাহে সর্বস্বান্ত

হইয়া ঋণের দায়ে জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দুইটি পুত্র; তাহাদের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহে তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত। মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে কোন্‌দিক রক্ষা করিবেন যামিনীনাথ ভাবিয়া কূল পাইলেন না।

"অষ্টম গর্ভে পুত্র না হইয়া কন্যা হইল। যামিনীনাথ মনের কষ্ট মনে চাপিয়া নাম রাখিলেন স্নেহলতা, মা নাম রাখিল পোড়ারমুখী।" -

তারপর, পোড়ারমুখীর বয়স যত বাড়ে, রূপ যেন সর্বাঙ্গ বেয়ে ফেটে পড়ে; মার আতঙ্ক বাড়ে,—বাবার চিন্তার অবধি থাকে না। পোড়ারমুখী তাকিয়ে দেখে, বাবা বিষণ্ণ, মা উদাসীন;—ভাবে, মা-বাবা কী অত ভাবেন। মা'র দুর্ভাবনা আছে, কিন্তু পোড়ারমুখীর ওপরে রাগ করতে পারেন না,—যেমন তার রূপ, তেমনি মধুর স্বভাব। চড় মারতে হাত তুললে, অজান্তে সে-হাত পোড়ারমুখীর গলা জড়িয়ে আদর করে। বাপ ডাকেন স্নেহ-লক্ষ্মী। দিনে দিনে পোড়ারমুখী বোঝে বাবা কেন অত বিষণ্ণ,— মা কেন উদাসীন! দেনার দায়ে মুদি অপমান করে, স্যাকরা শাসিয়ে যায়, দুধওয়ালা কথা শোনায়,—কোথা থেকে দৈত্যের মত দারওয়ান ছুটো আসে জুলুম করতে। পোড়ারমুখী ভাবে, শিউলীফুল যদি টাকা হত,—লক্ষ লক্ষ টাকা! বাবার সব ঋণ শোধ করে দিত সে। মা তখন বলতেন, পোড়ারমুখী আমার সোনামুখী,—বাপ বলতেন নিশ্চয়,—'স্নেহ-লক্ষ্মী,—লক্ষ্মী!' ঘুমে-জাগরণে স্বস্তি নেই পোড়ারমুখীর। একদিন আধোজাগা, আধো-স্বপ্নে শুন্‌লো পাড়ার মোক্ষদা মাসী মাকে বলছেন জমিদার-গিন্নীর স্বপ্ন-কথা; নতুন পুকুর কাটিয়েছেন রানীমা—স্বপ্ন দেখেছেন, মা-কালী বলছেন জলের তলায় রয়েছেন তিনি,—অষ্টম গর্ভের একটি সন্তান সে-জলে বলি দিলে ধনেধান্যে ভরে উঠ্‌বে তাঁর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন জমিদার,—যে অষ্টম-গর্ভের সন্তান বলি দেবে পুকুরের জলে। মা শিউরে ওঠেন মনে মনে, স্নেহ-স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে লালন করেন পোড়ারমুখীর ঘুমন্ত মুখটি,—'ছি ছি এ-সব কথা শোনাও পাপ!' পোড়ারমুখী কিন্তু শুনেছে সে-কথা,—মা-বাবা কেউ জানেন না। বাবাকে সে জিজ্ঞাসা করে,—লক্ষ টাকায় স—ব ধার শোধ হয় কি না,—সকলের! বাবা বলেন, 'হয়'। পোড়ারমুখী ভাবে!

তারপর, "দেওয়ালীর দিন সকলে বাড়িতে প্রদীপ সাজাইতে লাগিল। পোড়ারমুখী বলিল, মা, আমি ঘাটে প্রদীপ দিয়ে আসব। মা বলিল, শীগ্‌গির ফিরে আসিস্‌, কিন্তু নতুন পুকুরে যাস নে যেন।

"একখানি ছোট ডুরে সাড়ি পরিয়া, ছোট একখানি থালায় মাটির প্রদীপগুলি সাজাইয়া পোড়ারমুখী ঘাটের দিকে চলিল। সে নতুন পুকুরের দিকেই চলিল। পুকুরে

তখনো সিঁড়ি কাটা হয় নাই, মাটির উপর মাটি জমিয়া পুকুরের পাড় পাড়ের মত উঁচু হইয়া রহিয়াছে; তাহার চারিধারে পোড়ারমুখী প্রদীপগুলি সাজাইয়া দিল। পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, পুকুরের জল থই থই করিতেছে—কালো জল, রাত্রে আরো কালো দেখাইতেছে। পোড়ারমুখী একদৃষ্টে অনেকক্ষণ জলের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে আঁচলখানি গলায় দিয়া ধীরে ধীরে জলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—যোড় করে 'মা কালী!' বলিয়া চীৎকার করিয়া একেবারে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। সেই শব্দে বনের পাখীরা পাখা ঝাড়া দিয়া উঠিল, ত্রস্ত পশুর পদক্ষেপে শুকনো পাতা মর্‌মর্‌ করিয়া উঠিল—তাহার পর সমস্ত নীরব। ক্রমে প্রদীপগুলি একে একে সব নিবিয়া গেল, চারিদিকে কেবল অন্ধকার—কালীর মত কালো অন্ধকার।"

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে মন্তব্যের প্রয়োজন নিঃশেষিত হয়েছে, নিঃসন্দেহে এতাবৎ কৃত বক্তব্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পেরেছে। সুধীন্দ্রনাথের চারখানি গল্প সংকলন আছে,—'মঞ্জুষা', (১৯০৩) 'চিত্ররেখা', (১৯১০) 'করঙ্ক', (১৯১২) এবং 'চিত্রালী', (১৯১৯)। প্রথম সংকলনের গল্পগুলি পরে অন্যান্য সংকলনে স্থান পেয়েছে।

৪। শরৎকুমারী চৌধুরাণী

এক বিশেষ সীমিত অর্থে শিল্পী হচ্ছেন স্বয়ম্ভূ। অর্থাৎ, নিজের পরিবেশ, চোখে-দেখা জীবন, ও তার অনুভবকে আশ্রয় করে তিনি যা সৃষ্টি করেন, সে আসলে তাঁরই গোপন প্রাণ-প্রকৃতির প্রতিভাস। এদিক থেকে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রভাব বা সাধর্ম্যের যে-কোনো উল্লেখই অবাস্তর। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনাতেও দেখেছি, রবীন্দ্র-জীবনভাবনার জগতে মগ্ন-চেতন হয়েও তিনি যা রচনা করেছেন, সে তাঁর নিজস্ব নির্মিতি। অতএব, বর্তমান উপলক্ষ্যে সমধর্মিতার প্রসঙ্গ কেবল জীবন-চেতনার স্বভাব-সাম্যের বিচারেই।

এদিক থেকে রবীন্দ্রানুসারিণী বলে শরৎকুমারী চৌধুরাণীর (১৮৬১-১৯২০ খ্রীঃ) নাম অবশ্য উল্লেখ্য। ইনি 'উদাসিনী' কাব্যের কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সহধর্মিণী। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে এঁদের যোগ আযৌবন ঘনিষ্ঠ ছিল। অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বন্ধু, আর রবীন্দ্রনাথের কবি-আত্মার সুহৃৎ। এঁরা স্বামি-স্ত্রী দুজনেই 'ভারতী'র সম্পাদকমণ্ডলীর উৎসাহী সভ্য ছিলেন। স্বামীর মতই সৃষ্টির অনায়াসক্ষমতা যেমন শরৎকুমারীরও ছিল, তেমনি সৃষ্টির প্রতি ঔদাসীন্যও ছিল তাঁরই মত সমান গভীর। লেখিকার অধিকাংশ রচনাই বেনামীতে প্রকাশিত হয়েছিল। তাই তাঁর সৃষ্টির পূর্ণ

পরিচয় পাওয়া কঠিন। তবে সৃজন-কারিণীর পরিচয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই দিয়ে গেছেন লেখিকার প্রকাশিত একমাত্র গল্পের বই 'শুভবিবাহ'-এর (১৯০৬) আলোচনা প্রসঙ্গে,—"মেয়েদের কথা মেয়েতে যেমন লিখিয়াছে, এমন কোনো পুরুষে লিখিতে পারিত না।"[২৪] একই প্রবন্ধে অন্যত্র কবি লিখেছেন—"রোমান্টিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আছে, কিন্তু বাস্তব চিত্রের অত্যন্ত অভাব। এজন্যও এই গ্রন্থকে ['শুভবিবাহ'] আমরা সাহিত্যের একটি বিশেষ লাভ বলিয়া মনে করিলাম।" বস্তুত বাংলাদেশের নারী সমাজের একটি জীবন্ত ছবি এঁকেছেন লেখিকা, অনেকটা সামাজিক নক্সার মত যথাযাথ্য সহকারে। তাঁর একটি লেখার নাম 'মেয়েযজ্ঞি',—শুরু হয়েছে,— "মেয়েযজ্ঞি বলিলেই বুঝিতে হইবে বিশৃঙ্খলতার সমষ্টি। প্রাতঃকাল হইতে ভিয়েনের গন্ধে, দাসীর কলরবে, ছেলের কান্নায়, মলের রুমু-ঝুমুতে, চুড়ির ঝম্ ঝম্ শব্দে যজ্ঞিবাড়ি সরগরম। পিচ্ছলে তাড়াতাড়ি চলা যায় না, অথচ হাতে অনেক কাজ, তাড়াতাড়ি করিতেই হইবে—সুতরাং কেহ আছাড় খাইয়া লোক হাসাইতেছে, কাহারও ঢাকাই সাড়িতে কাদা লাগায় মন খুঁত-খুঁত করিতেছে, কোনো ছেলে 'সন্দেশ খাবরে' বলিয়া সেই কাদাতেই গড়াগড়ি দিতেছে।"

আগাগোড়া রচনাই এমনি স্নিগ্ধ-সহাস, অনেকটাই উদ্ধার করতে ইচ্ছে করে। 'মেয়েযজ্ঞি' ঠিক ছোটগল্প নয়,—সরস নক্সা,—একালের পরিভাষায় রম্যরচনাও বোধ হয় বলা চলে। কিন্তু যে-সব রচনায় পুরোপুরি একটা গল্পের প্লট্ আছে, তাদেরও প্রকাশের শৈলীতে ইতরবিশেষ কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া প্লট্ নিয়ে 'যৌতুক' গল্প লিখেছিলেন শরৎকুমারী,—শিরোনামায় রচনা-পরিচয় দিয়েছিলেন 'সমাজ চিত্র' নামে। বস্তুত তাঁর সব গল্পই সমাজ-চিত্র, বিশেষভাবে বাংলা দেশের বহুজন-পরিবৃত যৌথপরিবার-জীবনের নারী সমাজের চিত্র।

'যৌতুক' গল্পটি বাঙালি হিন্দুসমাজে পণপ্রথার বিরোধিতা করে লেখা। হরিশ মোক্তার কুলীন হলেও উদার-হৃদয় মানুষ;—এবং স্নেহময় পিতা। তার বড় মেয়ে মনোরমার সঙ্গে অর্থপিশাচ জমিদার মহেশ গাঙুলির মোটাবুদ্ধি কুরূপ ছেলের বিয়ে হয়ে কন্যা এবং পিতামাতা অশেষ দুঃখ ভোগ করেছিলেন। অথচ দ্বিতীয় মেয়ে প্রিয়তমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সুপুরুষ, সুশিক্ষিত কুলীন ডাক্তারের। তার বাবা কিছুই গ্রহণ করেন নি, পরোক্ষে পণ দিতে চাইলে বিয়ে ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। এদের মিলনে দুটি পরিবারই পরম আপ্যায়িত হয়েছিল। নিতান্ত বিবৃতির (narrative) মতো অতি-বিস্তারে এই 'সমাজ চিত্র' অঙ্কন করেছেন শরৎকুমারী,—গল্প জমেনি।

২৪। রবীন্দ্রনাথ—'শুভবিবাহ' (আধুনিক সাহিত্য)।

ঐ একই প্লট্ রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়েছিলেন—শরৎকুমারী যে এ নিয়ে গল্প লিখে ফেলেছিলেন, কবির তা স্মরণেই ছিল না। চারুচন্দ্রের 'চাঁদির জুতো' নামেতেই তাঁর গল্প-স্বভাবের ব্যঞ্জনা রয়েছে। সেখানে গল্প-গুণ আরো জমাট্। কিন্তু শরৎকুমারীর হাতে গল্পরস যেখানে জমে উঠেছে, সেখানেও তিনি আসলে মধুর পরিবার-রসান্বিত সমাজ-চিত্রিকা। সাত ছেলে, পাঁচ মেয়ে; ছয় পুত্রবধূ, নাতি, নাত্নী, সদ্যোবিবাহিতা প্রথমা পৌত্রী নন্দরাণীকে নিয়ে গড়া পঁচাত্তর বছরের বুড়ো কৃষ্ণকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার জীবনের বর্ণনায় সেই সহজ মাধুর্য অনাবিল ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। গল্পটির নাম 'শ্রীপঞ্চমী'।

শরৎকুমারীর রচনায় নারীর মমতা ও কৌতূহল-কৌতুকের সঙ্গে নারী-জীবনের নক্সাই আঁকা পড়েছে,—এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা।

সরলাদেবী

সরলাদেবী (১৮৭২-১৯৪৫) ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী;—স্বর্ণকুমারীর কন্যা তিনি। মা'র কাছ থেকে তাঁর সাহিত্যসাধনার উত্তরাধিকারও পেয়েছিলেন। ১৩০১ বাংলা সালে স্বর্ণকুমারী অসুস্থতার জন্যে 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব ত্যাগ করলে অগ্রজা হিরণ্ময়ীর সঙ্গে সরলাদেবী পত্রিকা সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেছিলেন। সম্পাদিকার সাহিত্যরুচির প্রসন্ন প্রসার 'ভারতী'র বিভিন্ন সংখ্যায় মুদ্রিত রয়েছে। রবীন্দ্র-সংগীতের স্বরলিপি সংযোজন বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে সরলাদেবীর এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি নিজেও গান লিখেছিলেন,—সে গানের স্বরলিপি যোজনা করে ছাপিয়েছিলেন 'ভারতী' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায়। কিন্তু এ সবের আগে থেকে নিতান্ত বালিকা-বয়সেই তিনি গল্প লিখ্তে শুরু করেছিলেন; যদিও সংখ্যায় তাঁর গল্প প্রচুর নয়।

১২৯২ বাংলা সালে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। তার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'দুর্ভিক্ষ' নামে সরলাদেবীর একটি কথিকা প্রকাশিত হয়,—আর্তজনের জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করে; সেটি 'বালিকার রচনা' বলে নির্দেশিত হয়েছে। ঐ একই বছরের কার্তিক সংখ্যায় 'বাবলাগাছের কথা' নাম দিয়ে তাঁর প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হতে দেখি। নামে যেমন, তেমনি বিষয়-বস্তু আর প্রকরণের বিচারেও এটি রবীন্দ্রনাথের 'ঘাটের কথা' জাতীয় রচনার প্রতিধ্বনি,—বালিকা-হৃদয়ের অপরিণত সেন্টিমেন্ট কথিকার আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে "কুমুদ, মা আমার, আজি তুই কোথায়? মাগো দেখে যা আজি তোর স্নেহের সাধের বাবলা

গাছের কি দশা হয়েছে!...মা, সেই যে তুই পাঁচ বছরের মেয়েটি একদিন সাধ করিয়া তোর কচি হাত দুখানি দিয়া একটা বাবলাগাছ রোপণ করিয়াছিলি, সে হাত দুখানি আজ কোথায় কোন্ গাছগুলিকে সেইরূপ সাধ করিয়া রোপিতেছে!" এম্‌নি করে শুরু হয়েছে 'বাবলা গাছের কথা' ;—সারাও হয়েছে একই ভঙ্গিতে।

সরলাদেবীর একটিমাত্র গল্প সংকলন 'নববর্ষের স্বপ্ন'; প্রকাশ কাল ১৩২৫ বাংলা সাল। গল্পসংখ্যা পাঁচটি হলেও আসলে উপাখ্যান হচ্ছে চারটি। অর্থাৎ প্রথম গল্পটি দুবার বলা হয়েছে,—তার বিষয়বস্তু 'নববর্ষের স্বপ্ন'। বছরের প্রথম দিনে একটি বিবাহ-বিমুখচিত্ত যুবক রোমান্স-মধুর প্রেমস্বপ্ন দেখেছিল। সেই স্বপ্নকে কেন্দ্র করে দুটি গল্পে দু-রকমের জীবন-পরিণাম দেখানো হয়েছে—প্রথমটি বেদনাঘন; দ্বিতীয়টি রোমান্স-মিলন-মধুর। প্রকরণের দিক থেকে একই কেন্দ্র-কোষকে আশ্রয় করে দুটি গল্প লেখার এই পদ্ধতি সেকালে ছিল অভিনব; এবং একালের পক্ষেও কৌতূহলের কারণ। কিছুদিন আগে প্লট্ নিয়ে দুজন শিল্পীকে দিয়ে তার ট্রাজিক ও কৌতুক-বহ দুটি পৃথক রূপ রচনা করিয়ে দেখাবার প্রয়াস লক্ষ-যোগ্য হয়েছিল প্রধানত আকাশ-বাণীর চেষ্টায়। অন্যপক্ষে সেকালে একই লেখিকা একটি গল্পের নিউক্লিয়াস নিয়ে দুটি পৃথক পরিণাম সৃষ্টির শিল্পখেলা খেলেছিলেন দেখে চমক্ লাগে।

দুটি গল্পের মধ্যে প্রথম গল্পের পরিণতিতে নারীসুলভ স্পর্শকাতর অনুভবের দোলা ছোটগল্প-স্বভাবকে সার্থক রূপান্বিত করেছে। দুটি গল্পেই ঘটনার পরিণতি সম্পর্কে সাস্‌পেন্স রক্ষা করা হয়েছে। প্রথম গল্পটিতে সেই রোমান্টিক প্রতীক্ষার অনুভব পূর্ণ-সংহত থেকে হঠাৎ যেখানে রহস্যমুক্ত হয়েছে, তখন অতৃপ্তি-নিবিড় বেদনার দোলা নাটকীয় আকস্মিকতায় আরো ঘন-কম্পিত হয়েছে। এমন পরিমণ্ডলে সমাপ্তিক ব্যঞ্জনাটুকু গল্পকে ছোটগাল্পিক রসোত্তীর্ণতায় সফল করেছে। গল্পের নায়ক কিরণ প্রথম যৌবনের ঔদ্ধত্যে প্রেম ও দাম্পত্য-প্রণয় সম্পর্কে উন্নাসিক ছিল। হঠাৎ এক নববর্ষে ভোরের প্রণয়স্বপ্ন তার যৌবন-চেতনাকে আমোদিত করে। তারপর নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে—বিশেষ করে প্রাণাধিক অনুজা প্রভার প্রথম দৌত্যে নিজের অজ্ঞাতে সে চারুশীলার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই উপলক্ষ্যে চূড়ান্ত আশাহতও তাকে হতে হয়েছিল,—চারু ভালবেসেছিল তার বাল্যসঙ্গী নিঃসম্বল মন্মথকে। চারুর বাবা উভয়ের বিয়ে দিয়ে মন্মথকে ব্যারিস্টারি পাশ করিয়ে আনবেন স্থির করেন।

এ খবর জানার মুহূর্তে কিরণের কাছে "বিশ্বছবি মসীমলিন বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় প্রতিভাত হইল।"

তারপরে "পাঁচবৎসর কাটিয়া গিয়াছে। চারুর দুটি ছেলে-মেয়ে, কিরণকাকার দুটি

স্কন্ধ দপ্তশালার বন্দোবস্তে অধিকার করিয়া লইয়াছে, মন্মথ ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়াছে, প্রতিদিনই তাহার পসার বৃদ্ধি হইতেছে।…

"নববর্ষের স্বপ্ন আমার জাগ্রত অনুভূতি নহে, আমি আজ পর্যন্ত বিবাহ করি নাই, দাম্পত্যের সেই পূর্ব উপহসিত সহস্র ছোটখাট খুঁটিনাটি, ছোটখাট সুখদুঃখও রুচির, তাহা এখন জানি, আমার এই বুভুক্ষময় কঙ্কালসার জীবন অসার, তাহা জানি; কিন্তু তবু বিবাহে প্রবৃত্তি নাই। এ রহস্য তোমরা পারত উদ্ঘাটন কর। আর আমার যে সুখ নাই, তাহাও নহে, সে কথা তোমরা না বুঝিলেও ক্ষতি নাই। শুধু প্রভা যখন আমার শূন্যগৃহের জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করে, তখন তাহাকে বুঝাইবার অক্ষমতায় নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মে।"

'নববর্ষের স্বপ্ন' প্রথম পর্যায় এখানে শেষ হয়েছে। সাসপেন্স্-ভরা সিচুয়েশন-কে নারীচিত্তের সহজে-স্পর্শাতুর সেন্টিমেন্ট-এর সুতোয় গেঁথে ছোটগল্পের মালা গাঁথা ছিল সরলাদেবীর শিল্পি-স্বভাব; আলোচ্য গল্পটি তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। পরবর্তী গল্পাংশ,—'নববর্ষের স্বপ্ন নূতন ধরণে' লিখতে গিয়ে এই সাসপেন্স্ চরম মুহূর্তের (climax) আগেই আভাসিত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাছাড়া পূর্ব-গল্পের কারুণ্যের চিত্রণে যেমন, স্নিগ্ধ-মধুর মিলন বর্ণনায় সেন্টিমেন্ট-এর দোলাটিও তেমন ঠিক জায়গায় এসে লাগেনি। গল্প হিশেবে 'নববর্ষের স্বপ্ন নূতন ধরণে' তাই দুর্বলতর।

এই সংকলনের অন্যান্য গল্পগুলি হচ্ছে, 'খবরের কাগজে অভক্তি ও তস্য পরিণাম', 'সুরেশের উপহার' আর 'বাঁশী'। প্রথম গল্পটির নামে যদিও রহস্য-কৌতুকের আভাস রয়েছে,—তবু গল্পটি সেই একই শৈলীর ছাঁচে ঢালাই,—সেই সিচুয়েশন্ গ্রন্থন, সাসপেন্স্—সেই আবেগের দোলা। অন্য গল্প দুটিও তাই। তাছাড়া প্রথম গল্পযুগ্মকের তুলনায় এদের রসদীপ্তি দুর্বলতর; অন্তত ছোটগল্পের রসসিদ্ধি এদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গতা পায়নি।

মাধুরীলতা

রবীন্দ্র-কন্যা মাধুরীলতাও (১৮৮৬-১৯১৮) কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ডঃ প্রশান্ত মহলানবিশ-কে বলেছিলেন, "ওর ক্ষমতা ছিল,—কিন্তু লিখত না।"[২৫] এঁর লেখা তিনটি গল্পের সন্ধান পাওয়া গেছে,—'মাতাশক্র' প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায়, 'সুরো' 'সবুজপত্রে'। আর 'বঙ্গদর্শনে' 'সৎপাত্র' বলে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল বেনামিতে। কবি বলেছেন, "ওটা আসলে বেলা [মাধুরীলতা] নিজেই লিখেছিল। ওর

২৫। দ্র, শ্রীপুলিনবিহারী সেন কৃত 'তথ্যপঞ্জী : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প'।

আখ্যানভাগ, কাঠামো, সব ওর নিজের।' কবি কেবল তাতে "কিছু কলম" চালিয়েছিলেন।[২৬] অনুবাদ-গল্পও ইনি লিখেছিলেন কিছু কিছু।

মাধুরীলতার গল্পে কবি-কন্যার সমুচিত সূক্ষ্ম মনোদর্শনের ক্ষমতা লক্ষ্য করি; কিন্তু সেই স্পর্শকাতর অতি-সূক্ষ্ম হৃদয়ভাবকে সমান সূক্ষ্মতার সঙ্গে প্রকাশ করার দিকে হয়ত তাঁর ইচ্ছাকৃত অনবধানই ছিল। 'মাতাশত্রু' গল্পের কথাই বলি; নারীর আকাঙ্ক্ষা, তথা জননীর গোপনতম বাসনার এমন অকল্পনীয় স্বাভাবিক ছবি কেবল নারী-মনের অতি-সূক্ষ্ম অনুভব দিয়েই আঁকা সম্ভব:

রামসদয় ছিলেন ডেপুটি—শশিমুখী তার প্রাণপ্রতিমা পত্নী। শশিমুখী যখন আসন্ন সন্তানসম্ভবা, তখন ডেপুটির ওপরে সরকারি হুকুম এল মফঃস্বলে যেতে হবে; অথচ এদের দাম্পত্য জীবন ছিল "কপোত-কপোতী যথা"—নিঃসঙ্গ নিভৃত। এমন অবস্থায় স্ত্রীকে ফেলে যাওয়া যায় না,—অথচ বারবার আবেদন করেও সরকারি হুকুমের হাত থেকে মুক্তি মেলেনি। রামসদয় রাগ করে ভাবতেন, চাকরিতে রইল ইস্তফা। এমন সময় শশিমুখীই সুরাহা করে দেয়,—কাছেই এক স্টেশনে 'নয়ন দিদি'র বর সামান্য কাজ করেন,—নয়ন শশিমুখীর দূর সম্পর্কের বোন। খুব গরিব তারা। ডেপুটি ভগ্নীপতির অনুরোধ রাখতে নিশ্চয়ই ছুটে আসবেন!

হল-ও তাই। রামসদয়ের 'তার' পেয়ে নয়ন যখন এসে গাড়ি থেকে নামলেন,—সেই গাড়িতেই রামসদয়কে চলে যেতে হল। স্টেশনে দুজনের সাক্ষাৎ,—তাড়াতাড়িতে কোনো রকমে নয়নের বাড়ি পৌঁছাবার ব্যবস্থা করে, তার হাতে শশিমুখীকে বারেবারে সঁপে দিয়ে রামসদয় চলে গেলেন। কিন্তু সেই দিনই শশিমুখীর ব্যথা উঠ্‌লো,—অবস্থা মারাত্মক হল। অবশেষে একটি নধরদেহ পুত্রসন্তান প্রসব করে তার মৃত্যু হল। শশীর অসুস্থতার সময় নয়ন একান্ত মনে সেবা করেছিল,—মরবার সময়ে শশিমুখী আকুল মিনতিভরে নবজাত শিশুকে সঁপে দিয়ে গেল নয়নের হাতে।

ক্রমে লোকজন দেখ্‌তে এল। নয়নেরও একটি শিশুপুত্র ছিল মাস কয়েকের। গরিবের ছেলে বলে অপুষ্ট,—বয়সের চেয়ে ছোট দেখায়,—শশির ছেলে অতি পুষ্ট, তাই নয়নের ছেলের চেয়ে তাকেই বড় দেখায়। পাড়াপ্রতিবেশিনীরা এসে নয়নের ছেলেকেই নবজাত শিশু মনে করে আদর করে গেলেন, পাশেই শুয়েছিল শশীর ছেলে। এই দেখে দরিদ্র মাতার বক্ষ লোভাতুর হয়ে উঠ্‌ল, দরিদ্র সন্তানের ভবিষ্যৎ কল্পনায়। সাতপাঁচ ভেবে রামসদয় ফিরে এলে নিজের ছেলে উপেনকেই তার কোলে তুলে দিল নয়ন। রামসদয়ের নিজের ছেলে যতীন নয়নের ছেলে বলে পরিচিত হল। রামসদয় আর বিয়ে

২৬। তদেব।

করেন নি ; তার অনুরোধে নয়নের স্বামীও এখানে এসে আছেন। নয়ন দুটি ছেলেরই দেখাশোনা করেন,—সবাই বলে, 'পরের ছেলে উপনের জন্যেই নয়ন যেন প্রাণটা দিলে ;—এমন কৃতজ্ঞতা দেখা যায় না।' নিজের ছেলে (!) যতীনের ওপরে নয়ন কেবলই অত্যাচার করে,—অকারণে তাকে লাঞ্ছিত করে। রামসদয় দুটি ছেলেরই সমান পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিলেন,—তাতে নয়নের মন ভার! গরিবের ছেলেকে অত লেখাপড়া শিখিয়ে কী হবে! অথচ এই ছেলেটিই পড়াশোনায় দিনে দিনে এগিয়ে যেতে লাগ্‌ল,—উপেন কেবলই পিছিয়ে পড়্‌ছিল। অবশেষে যতীনকে বাড়িছাড়া করল নয়ন। কলকাতায় গিয়ে যতীনের লাভই হল, খুব ভাল পড়াশোনা করে সে উকিল হল,—অনেক পসার তার। যত টাকা, তত নম্র স্বভাব। এদিকে রামসদয়ের মৃত্যুর পর, তার সকল সম্পত্তি দুদিনেই উড়িয়ে দিল উপেন,—বদ্‌খেয়ালের তার অন্ত ছিল না। অবশেষে সব হারিয়ে নয়ন আর উপেন যতীনের কাছেই এসে হাজির হল,—এ-যেন তাদের চিরকালের স্বত্ব। যতীনও তাদের সাদরে গ্রহণ করল :—যতীন উপায় করে, উপেন কেবল উড়ায়। এমন সময় খুব ভাল বংশে,—ধনীর দুলালী সুন্দরী পাত্রীর সঙ্গে যতীনের বিয়ে স্থির হল। নয়ন আর উপেন অনেক অপপ্রয়াস করেও সে বিয়ে ভাঙ্‌তে পারলো না, উপেনের সঙ্গে ঐ মেয়ের বিয়ে দিতে কন্যাপক্ষকে রাজি করানো অসম্ভব হল। তখন হতাশ উপেন চিরকালের মত 'মাসিমা' বলে এসে দাঁড়ালো। অতদিন পরে নয়ন এবার ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বল্‌লো, 'আর মাসিমা নয় বাবা,—এবার থেকে 'মা',. অনেক কষ্টে ছেলের কাছে নয়ন স্বীকার করলো নিজের দুষ্কৃতির কথা,—কী দুরাশা ভরে পরের হাতে নিজের ছেলেকে তুলে দিয়েছিল পরিচয় ভাঁড়িয়ে। সে আশা অচরিতার্থ থেকেই গেল ; অথচ নিজের ছেলের 'মা' ডাকও শুন্‌তে পেল না কখনো হতভাগিনী। সবকথা শুনে উপেন স্তব্ধ হয়ে গেল,—তারপর থেকে আর কোনো সন্ধান নেই তার। কদিন পরে নয়ন একখানি ছোট চিঠি পেল ছেলের কাছ থেকে,—"রেঙ্গুনে যাত্রা করিলাম। ঈশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন।"

অদ্ভুত, অভিনব এই প্লট্-এর কল্পনা !—অথচ একে অস্বাভাবিক বা অবাস্তব বল্‌বার কোনো উপায় নেই। বরং যেমন অভাবিত,—তেম্‌নি দুঃসাহসী। সাহস এবং যোগ্যতার সঙ্গে গল্পকে স্বাভাবিক প্রতিপন্ন করার দুঃসাধ্য সাধন করেছেন লেখিকা ; একই ট্রেনের থেকে রামসদয় ও নয়নের ওঠা-নামার অবস্থাটি এমন কৌশলে বিন্যস্ত হয়েছে, তার পেছনে লেখিকার যে বিশেষ উদ্দেশ্য প্রথম থেকে কাজ করছিল,—গল্প শেষ করেও তা অনুভব করতে সময় লাগে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কবি-কথাতেই বোঝা গেছে, সৃষ্টির আনুষঙ্গিক কৃচ্ছ্রসাধনার পরাঙ্‌মুখ ছিল মাধুরীলতার স্বভাব। কবি বলেছেন,

—তিনি লিখ্‌তে পারতেন কিন্তু লিখ্‌তেন না। গল্প লিখ্‌তে বসেও লেখার আয়াস তিনি স্বীকার করতেন না। ফলে, তাঁর গল্পের দেহে অভিনব কল্পনার দোলা লেগেছে,—কিন্তু তার প্রাণভূমি পর্যন্ত সেই আন্দোলনের ঢেউ গিয়ে পৌঁছায়নি। মাধুরীলতার শিল্পশৈলী, তাই, ছোটগল্পের যোগ্য প্লট্ নিয়েও নিছক বর্ণনাধর্মিতার সীমা অতিক্রম করতে পারেনি।

'সৎপাত্র' গল্পটিতেও কৌলীন্যের নারীঘাতী বীভৎসতা বিষয়ে দুঃসাহসী গল্প রয়েছে। সাধুচরণের নারীমাংসলোলুপ 'শ্বাপদ বৃত্ত' পৌরুষের ছবি যেমন ভয়াবহ, তেমনি সংক্ষিপ্ত বলেই তীব্র। বিশেষ করে সমাপ্তি ক্ষণের একটি ছত্র গোটা গল্পটিকে অনির্বাচ্য ছোটগাল্পিক ব্যঞ্জনায় ভরে তুলেছে: "স্ত্রীর হিসাবে সাধুচরণের 'যত্র আয় তত্র ব্যয়'।" একেবারে নিঁখুত না হলেও এটি অতি উৎকৃষ্ট একটি ছোটগল্প। 'বেলা'র মূল রচনার কতটুকু কবি রক্ষা করেছিলেন, এক মূল কাঠামো ছাড়া, সে কথা বলা শক্ত; তবে গল্পের মর্মগত রসসিঞ্চনের শ্রেষ্ঠ বাহক এমন সব রচনাংশ রয়েছে, যা কেবল কবির হাতের রচনা হওয়াই সম্ভব। সাধুচরণের তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী সপ্তদশী বিমলার বঞ্চিত নারীত্বের ছবিটি উদ্ধার করি:—"বিমলা লিখিতে পড়িতে শিখে নাই;—তাহার সকল বেদনা ও সকল সান্ত্বনাকেই স্বরচিত কল্পনা দোলায় দোলাইয়া মানুষ করিতে হয়,—ইহাতে মনের কথাগুলি নিতান্তই আপনার ধন হইয়া উঠে; ইহাতে অন্তরের ভাবনাগুলিই সত্য এবং সংসারের ঘটনাগুলি ছায়ার মত দাঁড়াইয়া যায়।" গল্পের এক বিরাট অংশে কন্যার কল্পিত প্লট্-এ এম্‌নি করে কবিই কেবল কথা বলে চলেছেন বলে মনে হয়।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯) ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের জামাতা। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "ভারতীর আসরকে সাহিত্যিক আড্ডায়" জাঁকিয়ে তোলার কৃতিত্ব ছিল মণিলালের।[২৭] ১৩২২ থেকে ১৩২৯, এই ক-বছর ইনি 'ভারতী'-র সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিশিল্পি-সাহিত্যিকের অনেকেই এ সময়ে 'ভারতী'-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে পরিচিত হয়েছিলেন,—ভারতী-গোষ্ঠী ভারতী-আড্ডার আকারে আরো সংহত,—স্পষ্ট রূপান্বিত হয়ে উঠেছিল। 'ভারতী'-কে কেন্দ্র করেই মণিলালের রচনা বিচিত্রচারী হয়েছিল,—আর সে রচনাপ্রবাহ আসলে ছিল গল্পপ্রধান। কিছু কিছু গল্প তিনি বিদেশী সাহিত্য থেকে অনুবাদ করেছিলেন শিশুদের জন্য,—আর তার অধিকাংশই ছিল জাপানী গল্প,—ইংরেজি অনুবাদের অনুবাদ। 'জাপানী ফানুস' (১৯০৯)

২৭। ডঃ সুকুমার সেন—'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ৪র্থ খণ্ড।

ও 'কল্পকথা' (১৯১০) সংকলনে এই শ্রেণীর গল্প সংগৃহীত হয়েছে। বড়দের জন্যেও বিদেশী গল্পের অনুবাদ করেছিলেন শিল্পী। 'আলপনা'-র (১৯১০) চারটি গল্প ইংরেজি থেকে গৃহীত,—এ-কথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন। তাছাড়া 'জলছবি'-ও (১৯১১) আসলে বিদেশী গল্পের অনুবাদ-সংকলন। মণিলালের মৌলিক গল্পগুলি সংগৃহীত হয়েছে 'আলপনা', 'মহুয়া', 'পাপড়ি' ও 'খেয়ালের খেসারৎ' ইত্যাদি গ্রন্থে।

এইসব গল্প-সংগ্রহে লেখকের শিল্প-স্বভাবের দুটি পরস্পর-বিরোধী প্রবণতা চোখে পড়ে।—আর বিস্ময়ের কথা, স্বপ্ন-মোহাবেশ ভরা রোমান্টিক গল্পে যেমন, তেমনি বস্তুভূয়িষ্ঠ বিষয়ের বর্ণনাতেও মণিলালের রচনা প্রায় সমান রসোত্তীর্ণ হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ গল্পই রোমান্স-নিবিড়। 'সুরের বন্ধু', 'চিঠি', 'প্রতিমা' ইত্যাদি গল্পে রূপের মৃন্ময়বন্ধনমুক্ত স্বপ্ন-সুরভিত জীবনের এক মোহমদিরতা সৃষ্টি করেছেন শিল্পী,—জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও যাকে সম্পূর্ণ নির্জীবন বলা চলে না। 'চিঠি' গল্পের কথাই বলি :—বস্তিবাসিনী দেলেরাবিবি,—রূপে এবং সংগীতে অনুরাগের সহস্র দেয়ালি জেলে একদা যে ফিরত বিশ্বময়—সেই বিগত-যৌবনা,—বিগতসর্বস্ব দেলেরা চিঠি লিখ্‌তে চায়, চিঠির জবাব পেতে চায়,—স্বপ্নপুরীর রাজকুমারের কাছ থেকে। 'ইয়াসিন' বলে কেউ নেই, একথা নিশ্চিত জেনেও আতর জব্‌জবে ছবি-আঁকা কাগজে ইয়াসিন্‌-এর নামে সে চিঠি লেখায়,—'আশক্‌'-এর চিঠি! ঠিকানা দেয়,—'শাহজাদা! ইয়াসিন্‌,—শাহীবাগ, লক্ষ্ণৌ।' সে চিঠি দেলেরার দেরাজের তলায় পড়ে থাকে। আবার কিছুদিন পরে সে ছোটে নতুন করে চিঠি লেখাতে,—ইয়াসিন্‌-এর চিঠি দেলেরার নামে,—ডাকে ফেলে দিলে তার কাছেই ফিরে আসবে সে চিঠি,—"সে চিঠি পাবার জন্যেই" দেলেরা ব্যাকুল হয়ে থাকে।

আশ্চর্য এ পাগ্‌লামি, তবু নিছক পাগলামি নয়। দেলেরা বলে, "এমন সময় ছিল যখন বিদেশ থেকে আমার চিঠি আস্‌ত;—আমি দিনরাত সেই চিঠির প্রতীক্ষায় থাকতুম;—সে চিঠিতে কত কথাই থাক্‌ত—কত আদরের কথা সে আমায় লিখ্‌ত। সে চিঠি আমি বুকে করে রাখ্‌তুম! তেমনি চিঠি আর এখন আমায় কেউ লেখে না।"

দেলেরাবিবির অদ্ভুত খেয়ালের পরিচয় রয়েছে এতে। নিকষ-কঠিন বাস্তবের একটি যন্ত্রণাজর্জর মনস্তাত্ত্বিক গল্প হতে পারত এই নিয়ে। গল্পটি তবু রক্তমাংসের দেহ ধরে আমাদের চেনা পৃথিবীর মাটিতে কখনো এসে দাঁড়ায়নি। আজগুবি গল্প না হলেও এ-গল্প বাস্তবও নয়; রোমান্সের বিহ্বলতা তার সারা অঙ্গে ছড়িয়ে আছে।

'সুরের বন্ধু' গল্পটি আরো রোমান্স-নিবিড়,—বস্তুহীন রহস্যস্বপ্নে মদির। একটি

অন্ধছেলের ব্যর্থ স্বরসাধনার বেদনা পেরিয়ে কোনো অনামিকা অন্তঃপুরচারিণী মূর্তিময়ী চরিতার্থতার রহস্যরূপ ধরে এসে বারে বারে ধন্য করতেন তাকে। এ-গল্পে রবীন্দ্রনাথের 'জয়পরাজয়'-এর ছায়ারূপ আভাসে দেখা দেয় মনের কোণে। 'টুকুনি' গল্পেও 'কাবুলিওয়ালা'র ভাব-দ্যোতনা রূপান্তরে নবীন আকৃতি ধরেছে; কিন্তু কোনো গল্পেই রবীন্দ্র-গল্পের গাঢ়তা নেই। কারণ, ডঃ সুকুমার সেন যথার্থ বলেছেন, "অভিজ্ঞতা কম এবং রোমান্টিক্ কল্পনার রঙ্ কিছু চড়া।"[২৮]

কিন্তু, আশ্চর্য, এই স্বল্প অভিজ্ঞতার পসরা নিয়েও মণিলাল এমন একটি-দুটি গল্প লিখেছেন, বাস্তব জীবন-চিন্তায় সেকালের পক্ষে যা ছিল পথ-প্রদর্শক। এ-দিক্ থেকে তাঁর 'মুক্তি' গল্প সর্বাধিক খ্যাত। গল্পের গোটা পরিবেশ বা আগাগোড়া 'থীম'টুকুর সবটাই বস্তু-সমুখ, এমন দাবি করবার উপায় নেই। মুক্তির জীবনের দারিদ্র্য থেকে শুরু করে ঘর ছেড়ে তার রাস্তায় পান বিক্রী করতে আসার চিত্র-পরম্পরার মধ্যে ঘটনাধারার অনিবার্য অমোঘতা রয়েছে। কিন্তু সেই দারিদ্র্যের কারণ, মুক্তির স্বামীর আধ্যাত্মিকতার নেশা, গুরু নকলচাঁদ-বাবাজির সঙ্গে গৃহত্যাগ এবং সবশেষে বামার মাকে লেখা চিঠিতে গৃহপ্রত্যাগমনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের মধ্যে কার্য-কারণের বাস্তব-সম্মত সুনিশ্চয়তা নেই। বামার মার সঙ্গে মুক্তির অপত্য সম্পর্কের কাহিনী সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। গল্পের বর্ণনাংশে বাস্তবধর্মিতা এ দিক্ থেকে শ্লথবন্ধন। কিন্তু মণিলালের আসল কৃতিত্ব গল্পের পরিণাম রচনার দুঃসাহসিকতায়। আজন্ম ভাগ্য-বঞ্চিতা, বিধি-বিড়ম্বিতা একটি নিমগ্ন-চেতনা নারীর পক্ষে প্রবলতম প্রলোভনের সামনে আত্মরক্ষা করে দাঁড়াতে না পারার মর্মান্তিক পরিণাম এই গল্পের ফলশ্রুতিকে সেকালের পক্ষে বৈপ্লবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

মুক্তির ভাঙা জীবনের হালে প্রথম পালের হাওয়া লাগাতে পারার সম্ভাবনায় বামার মা উল্লসিত,—মুক্তির স্বামীর গুরু-নেশা কেটেছে,—এবার সে ঘরে ফিরতে উন্মুখ;—কেবল টিকিটের টাকা পেলেই বাঁচে! মনে মনে তখন সে টিকিটের দাম হিশেব করছিল,—"এমন সময় মুক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। বামার মা তার দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—'কোথায় গিয়েছিলি মা?'

"মুক্তি তার সেই বড় বড় চোখ-দুটো হইতে আগুন ঠিক্‌রাইয়া বলিয়া উঠিল, 'যমের বাড়ি!'

"বামার মা হতভম্ব হইয়া মুক্তির সেই জ্বলন্ত চোখের পানে চাহিয়া রহিল। মুক্তির স্বামীর চিঠি তার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া গেল।

২৮। তদেব।

"এমন সময় একজন খরিদ্দার জোর গলায় হাঁকিল,—'এক পয়সার পান'।"

সমাপ্তি-মুহূর্তের আশ্চর্য নাটকীয়তাময় তাৎপর্য ছোটগল্প জমিয়ে তোলায় শিল্পীর দক্ষতার নিঃসংশয় প্রমাণ। বর্ণনার দিক থেকে অনেক সময়ে তাঁর রচনা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। বিশেষ করে 'মুক্তি' গল্পের প্রথমাংশ শরৎচন্দ্রের ব্যাপক বর্ণনপদ্ধতির স্মৃতিবাহী। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ গল্পান্তেই ছোটগাল্পিক বিস্ময়ের দোলা সৃষ্টির প্রয়াস রয়েছে;—আর প্রায়ই তা নিরর্থক হয়নি। 'চিঠি' বা 'খেয়ালের খেসারৎ' গল্প এ সত্যের আরো দুটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

বাস্তবজীবন-চিত্রণের দুঃসাহসিকতার আরো দুটি সফল পরিচয় রয়েছে 'রংছুট্' এবং 'দুই অধ্যায়' গল্পে। এই গল্প দুটি মনে হয় একই প্লটের দুইটি পৃথক্ পর্যায়। প্রথমটি স্ত্রীর জবানিতে নারীজীবনের নিপ্রেমতার অনির্বাচ্য বেদনাকে রূপ দিতে চেয়েছে। কল্যাণী কিছুতেই কাউকে বোঝাতে পারে না, তার যা কিছু প্রাপ্তি—, স্বামী, শাশুড়ী, সংসারের কাছ থেকে,—সারা সমাজের যা ঈর্ষার বস্তু,—সেকিছুই তার প্রাপ্য নয়! কল্যাণীর জীবন থেকে,—তার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় তপ্ত ঠোঁটের কাছ থেকে সব কিছু কেড়ে নেয় 'বড় বৌ'। বড় বৌ-র হিশাব-করা প্রাপ্যের প্রাচুর্য নিয়ে কল্যাণীর ভালবাসার লোভাতুরতা বিষবাষ্পের আকারে ধূমায়িত হয়ে ওঠে,—এ দুঃসহ জ্বালা বোঝে না আর কেউ।

গল্পটি পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মেজবৌর কথা অনিবার্য-ভাবে মনে পড়ে। কিন্তু রবীন্দ্র-চিন্তার সে তীব্র-সংহত স্পষ্টতা বা দার্ঢ্য নেই মণিলালের লেখায়। তাই, মনে হয়, লেখক যেন অস্পষ্টকে স্পষ্ট করবার ব্যর্থ চেষ্টায় কথার স্তূপ পুঞ্জিত করেছেন,—তবু নিজেও তিনি সব কথা নিঃশেষে বুঝিয়ে বলতে পারার নির্ভার তৃপ্তি খুঁজে পাননি কিছুতেই। সেই অতৃপ্তিকে চরিতার্থ করার জন্যেই আবার লিখ্‌লেন 'দুই অধ্যায়' গল্প। কল্যাণী যা চেয়েছিল, তার বাস্তব প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে সেই অনির্বচনীয় প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রাঞ্জল হতে পেরেছে এই গল্পান্তে।

কেবল রোমান্টিক্ বা বাস্তব গল্পেই নয়,—রস-কাহিনীর সৃষ্টিতেও যে, মণিলাল বিশেষ দক্ষ ছিলেন, তার পরিচয় আছে 'ঘুমের ব্যাঘাত' বা 'হুকার জন্ম' জাতীয় গল্পে; প্ল্যান্‌চেট্ ও লোকোত্তর জীবন সম্বন্ধে মণিলালের কৌতূহল ছিল,—ঐ সব অভিজ্ঞতার কাহিনী সংকলিত হয়েছে 'ভুতুড়ে কাণ্ড'-তে (১৯০৮)।

মণিলালের গল্প সংকলনের মধ্যে আছে—'জাপানী ফানুস' (১৩১৫), 'কল্পকথা', 'ঝুমঝুম' ও 'আলপনা' (১৩১৭), 'ঝাঁপি' (১৩১৯) 'মনে মনে' (১৩২৭), 'পাপড়ী' (১৩২৮) ইত্যাদি। 'জাপানী ফানুস' কিংবা 'ঝুমঝুমি' ছোটদের গল্প;

বড়দের গল্পের অনেক কয়টিও "জাপানী ভাব লইয়া রচিত।" মৌলিক গল্পের চেয়ে বিদেশী গল্পের 'ভাব' নিয়ে গল্প লেখার দিকেই শিল্পীর ঝোঁক ছিল বেশি।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৪) 'ভারতী' পত্রিকার সহ-সম্পাদনা এবং সম্পাদনাও করেছিলেন একাধিক পর্যায়ে। জীবনের অন্তিম পর্যায়েও তাঁর লেখনীর গতি ছিল অবিরাম। জীবনদৃষ্টির দিক্ থেকে সৌরীন্দ্রমোহন 'ভারতী-যুগ' অতিক্রম করতে পারেননি। আর সেই বিগত যুগের জীবন-চিন্তাতেও তিনি রবীন্দ্র-সন্নিহিত নন,—তাঁর শিল্পি-আত্মার যোগ বরং স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে। আগে বলেছি, স্বর্ণকুমারীর লেখায় ছোটগল্পের বিশেষিত স্বাদ বা রূপ অনায়াস-সিদ্ধ নয়। শিল্পীর নারীপ্রকৃতির এক সহজ সৌরভ কোনো কোনো গল্পকে ছোটগল্পের মাধুর্য দান করেছে। সেদিক্ থেকে সৌরীন্দ্রমোহনের বিশেষ কোনো সুযোগ ছিল না। তেমনি, প্লট্-এর কল্পনা বা বিন্যাসেও কোনো বিশেষিত রূপের স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাও তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত। ফলে বিষয়-বিচারে তাঁর গল্পগুলো যেমন প্রাক্-আধুনিক, আঙ্গিকের দিক্ থেকেও এরা উপাখ্যানের পর্যায় অতিক্রম করতে পারেনি।

সেই শ্বশুরবাড়ি, বালিকা বধূর নির্যাতন, বিবাহিতা ননদ্-এর সহৃদয়তা ('ঠাকুরঝি', 'পাশের বাড়ি') বাল-বিবাহিতা বধূর সঙ্গে নবোদ্গত যৌবন বরের বিবাহোত্তর কোর্টশিপ্-এর কৌতুককর প্রয়াস, ('গদ্য ও পদ্য', 'প্রতিঘাত') সওদাগরি অফিসের কেরানীর দুঃখ ('হারামণি'), সেই ভাগ্যবঞ্চিত, সমাজপীড়িত মানুষের যে-কোনো গল্পের কথা ('ফেল্ জামিন') সেই বিবাহপণের দর কষাকষি ('সম্প্রদান') ইত্যাদি গতানুগতিক বিষয় নিয়ে অসংখ্য গল্প লিখেছেন সৌরীন্দ্রমোহন। বিন্যাসেও গতানুগতিকতা রয়েছে ;—কখনো বা স্বর্ণময়ীর রচনার পূর্বচ্ছায়াও চোখে পড়ে।[২১] অথচ বিশেষিত কল্পনা বা রূপকল্পের স্বাতন্ত্র্য দুর্লভ। ফলে তাঁর গল্পরচনা প্রায়ই স্কেচ্‌ধর্মী। এই প্রসঙ্গে একথা অবিস্মরণীয় যে, সৌরীন্দ্রমোহনের গল্পে এক ধরনের সরসতা রয়েছে,—যার ফলে একদা তিনি কেবল বহুপঠিত নন, বহুজন-প্রিয়ও হয়েছিলেন। সে সরসতার উৎস ছিল সমকালীন এই জীবন-চিত্রে,—এই স্কেচ্ রচনার মধ্যে। আজ যখন সেই জীবন আমরা অনেক দূরে ফেলে এসেছি, তখন সৌরীন্দ্রমোহনও পিছিয়ে পড়েছেন সাধারণভাবে। তবু সেকালের বহু সাহিত্য-পত্র-পত্রিকায় তাঁর রচনার প্রাচুর্য ও মূল্য ছিল, বাংলা গল্পের ইতিহাসে এ-সত্য অনস্বীকার্য।

২১। দ্রষ্টব্য—স্বর্ণময়ীর 'লজ্জাবতী' এবং সৌরীন্দ্রমোহনের 'ঠাকুরঝি'।

মাঝে মাঝে দুটি-একটি গল্পে সৌরীন্দ্রমোহনের স্বকীয়তা আজও দীপ্তিমান হয়ে আছে। সেখানে এবং অন্য অনেক গল্পেও সাধারণভাবে রোমান্টিক নাটকীয়তার ভঙ্গিতে আগাগোড়া প্লটটিকে তিনি উপস্থিত করেছেন। সৌরীন্দ্রমোহনের বিশেষ প্রবণতা কিছু থাকলে সে এখানেই। প্রথম থেকে ধীরে ধীরে রহস্যাবরণের মধ্য দিয়ে নাটকের ক্রমানুগতির ধারায় প্লট্‌কে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে—হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত পরিণামের মুখে ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে, 'আকস্মিকতাজনিত বিস্ময়বোধ' যেখানে সু-চিহ্নিত তীব্রতা পেয়েছে, গল্পের স্বাদও সেখানে জমে উঠেছে। সৌরীন্দ্রমোহনের এ-রকম একটি দুর্লভ রচনা 'প্রথম প্রণয়' গল্পটি। বিভা নামে একটি কুমারী মেয়ে তার আত্মভোলা বাপের প্রশ্রয়ে সুদর্শন সাহিত্যিক-অধ্যাপক শিশিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল,—পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহৃদয়ও হয়েছিল। এমন সময় এক নিভৃত-গভীর ঝড়ের রাতে শিশির মিলন-প্রস্তাব করল বিভার কাছে। এ-পর্যন্ত বর্ণনা ও সিচুয়েশন-বিন্যাস নিতান্ত মামুলি। কিন্তু যখন গল্পের পূর্ব-প্রস্তুতি থেকে গতানুগতিক 'মধুর-মিলন' আসন্ন বলে মনে হয়, তখনই রুক্ষ কাঠিন্যে বিভা প্রত্যাখ্যান করে শিশিরকে; সেই গভীর ঝড়-জলের মধ্যে তাকে বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য করে। এ অপ্রত্যাশিত আঘাত কেবল শিশিরকে নয় পাঠককেও স্তব্ধ করে। পরদিন সকালে এর আসল কারণ জানা যায়,—সে করুণ-মহিম। বিভার বাগ্‌দত্ত নরেন বিলাতে গিয়েছিল উচ্চ শিক্ষার জন্য,—বিভা তিলে তিলে নিজেকে গড়ে তুল্‌ছিল দেহ-মন-প্রাণে,—কেবল নরেনের জন্যই। অথচ ফেরার পথে জাহাজ-ডুবিতে নরেনের দেহান্ত হয়। "বিভা তার সমস্ত কায়মন নিয়ে নরেনের স্মৃতিকে আঁক্‌ড়ে আছে।"

যে-সব গল্পে সৌরীন্দ্রমোহনের আর্ট-এর ছাপ আছে, সেখানে বৈপরীত্যের চিত্র রচনা করতে করতে হঠাৎ 'ক্লাইম্যাক্স'-এর মুখে একান্ত অপ্রত্যাশিত পরিণামকে অনাবৃত করেই তিনি গল্পলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। 'গ্রেফ্‌তার', 'কোষ্ঠীর ফল', 'সম্প্রদান', 'ঠাকুরঝি' ইত্যাদি অনেক গল্পেই এই একই শৈলীর বিচিত্র খেলা।

বেশ কিছু সংখ্যক বিদেশী ছোটগল্পও অনুবাদ করেছিলেন সৌরীন্দ্রমোহন। 'পরদেশী' নামক গল্প-সংকলনের 'পূর্বকথা'-য় এই ধরনের রচনার স্বভাব বর্ণনা করেছেন তিনি নিজেই, —"গল্পগুলি হুবহু অনুবাদ নহে। স্থল বিশেষে ছায়ামাত্র গ্রহণ করিয়াছি, কোথাও মূল উপাখ্যানের যথেষ্ট পরিবর্তন বা পরিবর্জন করিতে হইয়াছে, আবার কোন গল্প-বা বহু পূর্বে পাঠ করিয়াছিলাম, এখন তাহার ক্ষীণ স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া রং ফলাইয়াছি। মোটের উপর সকলগুলিই আপনার ভাবে গড়িয়াছি। তথাপি সেগুলির বৈদেশিকত্ব একেবারে লোপ করি নাই।"

সৌরীন্দ্রমোহনের অজস্র গল্প-সংকলন গ্রন্থের মধ্যে আছে, 'শেফালি', 'নির্ঝর', 'পুষ্পক', 'মৃণাল', 'তরুণী', 'যৌবরাজ্য', 'পিয়াসী' ইত্যাদি।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১৮৯০-১৯৬৬) নিজেই ছিলেন চাঞ্চল্যকর জীবনীমূলক উপাখ্যান 'মহাস্থবির জাতকে'র প্রখ্যাত মহাস্থবির। লেখকের জীবনে বাংলা সাহিত্যের সাধনা নিরবচ্ছিন্ন হতে পারেনি। তা না হলে তাঁর অপার বিচিত্র অভিজ্ঞতার পুঁজি আর আশ্চর্য তাৎপর্যভরা সহজ সংক্ষিপ্ত ভাষণ বাংলা গল্প-সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্মরণীয়তা দাবি করতে পারত। বহু শাখাপথে বিস্তারিত কর্মজীবনের একটি অংশ বাংলা কথা-সাহিত্যের সঙ্গে অন্বিত করতে পেরেছিলেন, কেবল এই কারণেও তাঁর গল্প-সাহিত্য বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে অবশ্য আলোচ্য। 'ভারতী' পত্রিকায় (১৩২৬-২৭) 'নিশির ডাক' ও 'মঙ্গল মঠ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছোটগল্প রচনার খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এই দুটি গল্পেরই বিষয়বস্তু ও বিন্যাসে যা ফুটে উঠেছে, আসলে তা আশ্চর্যরস। আর এই গল্প দুটি থেকেই লেখকের শিল্প-স্বভাবেরও নিঃসংশয় পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

সে বিচারে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী কেবল উদ্ভট আশ্চর্য গল্পের কারবারী নন, তাঁর গল্প-রসিক স্বভাবের মধ্যে রয়েছে এক অনায়াসমুক্ততা। অর্থাৎ গল্প বল্‌তে গিয়ে বিষয়বস্তুর বাস্তবতা, চরিত্রের অমোঘতা, বিন্যাসের পারিপাট্য, কোনো কিছুর দিকেই কোনো বিশেষ ঝোঁক ছিল না শিল্পীর। যে-কোনো বিষয় নিয়েই সার্থক গল্প গড়ে তোলা চলে,— প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর গল্পে এই সিদ্ধান্ত শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। 'নিশির ডাক' গল্পের সূচনা ভুতুড়ে কাহিনীর পটভূমিতে। কিন্তু সারা গল্পের দেহে কোথাও অতি-লৌকিকতার রোমাঞ্চ (sensation) জমে উঠ্‌তে দেননি শিল্পী। অথচ গল্প যখন শেষ হল, তখন মনে হয়, এ কি কৌতুক, রহস্য, না আর কিছু! পরিবেশটিও ভুতুড়ে গল্প ও জন্মান্তর-রহস্য বিস্তারের উপযোগী করে আঁকা হয়েছে,—মেঘলা দিনের জমাট অন্ধকারের পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু সে পরিবেশও শিল্পীর লেখায় কোনো বিশেষ আয়াস বা যত্নে কোনো বিশেষিত মূল্যের আকর হয়ে উঠেছে বলে মনে হয় না—"সে একদিন দেবতার খেয়ালে দুপুর বেলাতেই সন্ধ্যা নেমেছিল। কদিন থেকেই আকাশটা মেঘলা মেঘলা করছিল, সেদিন চারদিককার যত মেঘ জড় হয়ে সহরটার ঠিক উপরেই একটা কালো চাঁদোয়া খাটিয়ে দিলে। দুপুর বেলাতেই মনে হতে লাগল, যেন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।" 'প্যারাডক্স'-এর ভাষায় প্রথম থেকেই নিতান্ত অনায়াস সাবলীলতা সহকারে শিল্পী যেন এই প্রথম অনুচ্ছেদেই গল্পের আশ্চর্য রসের সমুচিত ভূমিকাটি স্পষ্ট করে তুলেছেন।

বিষয়বস্তুর বিচারে 'নিশির ডাক'-এর কাহিনী আজগুবি, আর 'মঙ্গল মঠ'-এর গল্পকে বলতে হয় যা-খুশি তাই। কিন্তু প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর পক্ষে সে-কথা কোনো চিন্তার বিষয়ই নয়। তাঁর গল্পের আসল রহস্য হল—মন জেগেছে, কল্পনা ছুটেছে, সংক্ষিপ্তির সীমায় অপার অর্থবহ কথার স্রোত অনর্গল ধারায় বেরিয়ে পড়ছে,—আর তাতেই ভরে উঠছে গল্প-রসিক পাঠকের মন। বাস্তব-অবাস্তব, সংগতি-অসংগতির বোঝা-পড়া করে নেবার কোনো সুযোগই পাওয়া যায়নি মনে।

একান্ত গুরুগম্ভীর বেদনাবহ জীবন-চিত্রণেও গল্প-শিল্পীর এই অনায়াসসিদ্ধি প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সহজ ভূষণ হয়েছিল। গল্পের নাম 'মল্লারের সুর'—শুরু হয়েছে—"তার নাম লক্ষ্মীমণি। সে অন্ধ। রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়ায়।" এই অতি সংক্ষিপ্ত কটি কথা গল্প-নামের আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে জীবনের ভাবী মেঘমল্লারের ঝড়ো সংকেত অনাবৃত করে দিয়েছে। লেখকের সংক্ষিপ্ত ভাষণ সংকেত-বহ। সে সংকেত অনির্বচনীয়ের রহস্যরূপ আঁকে না; বরং অব্যক্তকে করে প্রাঞ্জল;—অনেক কথা না বলেও সব কথাকে অসংশয়িত স্পষ্টতা দান করাই তাঁর গল্প-রূপায়ণের যথার্থ আর্ট। আর এই স্পষ্টতা বিধানের মধ্যে যে আয়াস-হীনতা রয়েছে তার ফলে কেবলই মনে হয়, লেখক যেন তাঁর গল্পের এক নিঃসম্পর্ক দ্রষ্টা।—গল্পের দেহে গল্পলেখকের আবেগ কোথাও পুঞ্জিত হয়ে ওঠেনি; তাই প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর মানবিক সহৃদয়তা-ঘন করুণ গল্পেও 'প্যাথোস্' দানা বাঁধতে পারেনি কোথাও।

'মল্লারের সুর' বা 'কালীপুজোর রাত্রি' এই শ্রেণীর গল্পের সার্থক উদাহরণ। দ্বিতীয় গল্পটির পরিণামী সুর ট্রাজিক,—কিন্তু সূচনার তির্যকভাষণ কৌতুকাবহ:—"জগন্নাথ সরকার হঠাৎ একেবারে সাহেব বনে গেল। একটু কারণও ছিল।"

"সে চাকরি করত ইংরেজ টোলার এক বাঙালি দোকানে।"

'ইংরেজ টোলার বাঙালি দোকান'-এর উল্লেখে ইঙ্গবঙ্গ সমাজ বা ইংরেজ-ঘেঁষা বাঙালি ব্যবসায়ীর প্রতি লেখক কোনো প্রচলিত কটাক্ষের পুনঃ ক্ষেপণ করেছেন, এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর লেখায় কটাক্ষ বা বিদ্রূপের চেয়ে কৌতুক বেশি,—তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ নিশ্চিত স্পষ্টার্থের সংকেতে স্মিত-সহাস।

যাই হোক্, এ-হেন জগন্নাথ সরকার কালীপুজোর রাত্রে তার একমেবাদ্বিতীয়ম্ সাহেবি পোশাক সহযোগে তাদের প্রধান আড্ডাধারী চৈতন্যকিঙ্করের রক্ষিতা সরলা সন্নিধানে গেল বাজি পোড়ানোর মজা করতে। ও-পাড়ায় জগন্নাথের সেই প্রথম অভিযান। অতি উৎসাহে রাস্তার দিকের আলসের ওপর তুবড়ী জ্বালাতে গিয়ে নীচের তলার 'সাংঘাতিক

গুণ্ডাদের' বাজির দোকানে আগুন লাগে। অপর সকলে তখন ভয়ে পালিয়েছে,—নিরুপায় জগন্নাথকে সরলা ঠেলে পাশের বাড়ির ছাদ দিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে যেতে বলে। জগন্নাথের ওপরেই গুণ্ডাদের সকল আক্রোশ; বাজি-তে আগুন দিয়েছিল সে।

পাশের বাড়িতে গিয়েও নিস্তার নেই; ততক্ষণে পুলিশ এসে গেছে। গুণ্ডারা অনুমান করেছে, আসামী পালিয়েছে পাশের বাড়ির ছাতে। এমন অবস্থায় একটি মৃত্যুপথযাত্রিণী বারবনিতার শাড়ি পরে জগন্নাথ পলাতক হল। সে শাড়িটি ছিল ঐ হতভাগিনীর মাতৃস্মৃতি। জগন্নাথ প্রথম যখন শাড়িখানিতে হাত দিয়েছিল, তখন সে আর্তকণ্ঠে বলে উঠেছিল, "না,—না, ওগো, ও সাড়িখানা পরে যেয়ো না। ওটা আমার মা দিয়েছিল। ঐটে আমায় পরিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাবে বলে রেখেছি।"

কিন্তু চরম মুহূর্তে জগন্নাথের বিপদ আসন্ন জেনে পরপারের পথিক সেই পতিতা আবার বলেছিল, "দেখ তুমি বড় বিপদে পড়েছ, না? আচ্ছা, সাড়িটা পরে যাও, কিন্তু কাল আবার মনে করে ফিরিয়ে দিয়ে যেয়ো। একবার শীতের দিনে একটা লোক আমার গায়ের কাপড়খানা চেয়ে নিয়ে গেল, আর ফিরিয়ে দিলে না।"

জগন্নাথ নিরাপদে পালাতে পেরে বাঁচল;—সে-রাতের ধকলে ভোরের ঘুম জমে উঠেছিল;—একবার যখন ঘুম ভাঙল বেলা তখন বারটা; —চাকৃরিতে যাবার সময় উৎরেছে,—অতএব, পাশ ফিরে আবার নিশ্চিন্তে ঘুমোলো। বেলা পাঁচটা অবধি ঘুমিয়ে সুস্থ হয়ে,—এবার সে শাড়িটি ফিরিয়ে দিতে চললো। কিন্তু যথাস্থানে পৌঁছে জানা গেল দুর্ভাগিনী দুপুর বারোটায় মরেছে; শ্মশানযাত্রীরা তখনো ফিরে আসেনি।

উন্মাদের মত জগন্নাথ ছুটলো শ্মশানে,—প্রতিটি মৃতা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লো,—কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলে না তার "জীবনদাত্রী'কে।

"বুক জোড়া একটা অবসাদ নিয়ে সে শ্মশান থেকে বেরিয়ে এসে গঙ্গার ওপরে একটা নির্জন পন্টনে গিয়ে বসে পড়ল।

"অমাবস্যার অন্ধকার। নদীর জল মিশকালো, কিছুই দেখা যায় না। চারিদিকে বিসর্জনের করুণ বাজনা, এরই মধ্যে বসে বসে জগন্নাথ ভাব্‌ছিল—কি করা যায়। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে সে ধড়মড়িয়ে উঠে একবার 'ড্যাম ইট্‌' বলে কাগজে-মোড়া শাড়িখানা ছুঁড়ে নদীর জলে ফেলে দিলে। তারপর পকেট্‌ থেকে একটা বিড়ি বার কোরে ধরিয়ে বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিলে।"

এই হচ্ছে গোটা গল্প;—নিছক্ বলার গুণে তার পরিণামী আবেদন করুণ হয়েও বেদনাতুর হয়ে ওঠেনি। বলার এ ভঙ্গিতে হয়ত একটু নাটকীয়তা, একটু সংকেত-তাৎপর্য রয়েছে। 'বাজীকর'-এর মত গল্পের দেহে আবহের রেশ লেগেছে বলে মনে হয়।

কিন্তু প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর রচনার পক্ষে এ-সবই গৌণ,—প্রায় একমাত্র প্রধান সত্য হল গল্প, —গল্পগুলো তার বেশি বা কম আর কিছু নয়।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর প্রথম গল্প-সংকলন 'বাজীকর' (চৈত্র, ১৩২৮)। পরিণত বয়সে প্রকাশিত হয়েছিল 'স্বর্গের চাবি'।

হেমেন্দ্রকুমার রায়

হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩) শিশুপাঠ্য রোমাঞ্চ গল্প রচনাতেই খ্যাতি অর্জন করেছেন। এককালে তিনি বড়দের গল্প-উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি বিচিত্রচারী রচনাতেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সংখ্যায় অবশ্য গল্প রচনাই ছিল বেশি। কিন্তু সে-সব গল্প বিশেষ উল্লেখ্যতা দাবি করে না কোনো দিক থেকেই ;—স্থূলতাধর্মী বিষয়-নির্ভর প্লট-এর নিরায়াস বর্ণনায় মাঝে মাঝে suspense সৃষ্টি করতে পেরেছেন,—এই পর্যন্ত। তাহলেও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে 'ভারতী'তে যে গল্প লেখার আড্ডা গড়ে উঠেছিল, তার চক্র-পরিচয় পূর্ণ হয় না হেমেন্দ্রকুমারকে বাদ দিলে। 'ভারতী' ছাড়াও, 'বসুধা,' 'নব্যভারত', 'মানসী ও মর্মবাণী' ইত্যাদি পত্রিকায় এঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এঁর গল্প-সংকলন-গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'পসরা' (১৯১৫), 'মধুপর্ক' (১৯১৭), 'সিঁদুর চুপড়ী' (১৯১৮), 'মালাচন্দন' (১৯২২), 'বেনোজল' (১৯২৪) ইত্যাদি।

ইন্দিরা দেবী

'ভারতী-গোষ্ঠী'র গল্প-লেখিকাদের মধ্যে ইন্দিরা দেবী আর অনুরূপা দেবী ছিলেন বিশেষ স্মরণীয়। এই দুই সহোদরা ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী ; জীবনের মূল আদর্শ ও প্রত্যয়ের শিক্ষা এঁরা পেয়েছিলেন পিতামহ এবং তাঁরই আদর্শে গঠিত পিতৃ-পরিবার থেকে। ফলে 'ভারতী-গোষ্ঠী'র গল্প-ধারায় এঁরা এক নূতন সুরের ঝঙ্কার তুলেছিলেন,—এক নবীন জীবন-প্রেমের বাণী।

ইন্দিরা দেবীর (১৮৭৯-১৯২২)[৩০] "ছোটগল্প ১৩০১ সালের প্রথম কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।"[৩১] ডঃ সুকুমার সেন জানিয়েছেন, "১৩১৪ সাল হইতে 'ভারতী'তে ইহার গল্প বাহির হইতে থাকে।"[৩২] এ-সময় বাংলাদেশের এক যুগসন্ধির কাল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে সূচিত ইংরেজি শিক্ষার ফলশ্রুতি সমাজে তখন বিচিত্র নূতন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে নারীসমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, প্রধানতঃ ব্রাহ্মসমাজ-

---

৩০। জন্ম-তারিখ অনুরূপা দেবীর উদ্ধৃত :—দ্রষ্টব্য—'সাহিত্যে নারী : 'সৃষ্টি ও স্রষ্টা।' ৩১। তদেব। ৩২। ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড।

প্রবর্তিত স্ত্রী-স্বাধীনতার সূত্রপাত, বাঙালি হিন্দুর বিলাত যাত্রার সংখ্যাধিক্য, এসব-কিছু একদিকে যেমন রক্ষণশীল হিন্দুত্বের নির্মোক মোচিত করেছিল, তেমনি বঙ্কিমী যুগের ইঙ্গ-বঙ্গ বাবুসমাজের পরিবর্তে এক নতুন 'বঙালি সাহেব' দল গঠনেরও পরোক্ষ কারণ হয়ে উঠছিল। একদিকে পুরাতন সংকীর্ণতা ও কূপমণ্ডুকতা পরিহার করে জাতির চেতনাকে বিশ্বাভিমুখী করবার বৈপ্লবিক আহ্বান,—আর একদিকে গণ্ডি-উত্তরণের নামে স্বদেশ ও স্বজাতির আদর্শ-বিমুখ কৃত্রিম পরানুকরণ,—মুক্তির বাসনা, এবং মুক্তির নামে যুগপৎ অন্ধ বন্ধন স্বীকার এই স্ব-বিরোধের তাড়নায় আন্দোলিত ছিল সেই যুগসন্ধি। এমন সময়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দুই পৌত্রী স্বাদেশিকতার—চিরাগত ভারতবর্ষীয়তার মহিমা প্রতিষ্ঠার সার্থক ব্রত গ্রহণ করলেন।

নবজাগ্রত বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাসে মনস্বী ভূদেব একদা রক্ষণশীল বলে অপকীর্তিত হয়েছিলেন। সে বিচার সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নয়। ইতিহাসের ধারায় ভারসমতার স্থৈর্য আসে জীবনের কেন্দ্রাতিগ আর কেন্দ্রাভিগ দুই বিরোধী শক্তির সামঞ্জস্য আশ্রয় করে। জাতীয় আদর্শের কেন্দ্রাতিগমনের দুরন্ত যৌবনশক্তি মূর্তি ধরেছিল মধুসূদনের মধ্যে,—উনিশ শতকের বাঙালি রেনেসাঁস-এর যুগে। ভূদেব ছিলেন সেই বিপ্লবী যুগের কেন্দ্রাভিগ,—centripetal force;[৩৩]—তাঁর আদর্শ "স্থিতিবিধায়িনী"। উনিশ শতকের শেষপাদ, ও বিশ শতকের শুরুতে নতুন যুগসন্ধির কালে দেশীয় জীবনাদর্শের সেই 'স্থিতিবিধায়িনী' শক্তির জ্যোতির্ময়ী মূর্তি এঁকেছেন পিতামহের সার্থক অনুসারিণী এই দুই পৌত্রী।

ইন্দিরা দেবীর রচনায় দেখি স্বাদেশিকতার আদর্শে, এবং ভারতবর্ষীয় মহিমার প্রতি অটুট্ প্রত্যয়ে তাঁর শিল্পি-কল্পনা কল্যাণ-স্নিগ্ধ হয়ে রয়েছে; অথচ অসংগত গোঁড়ামি নেই কোথাও। তাঁর অনেকগুলি গল্পেই কৃত্রিম, কালো-সাহেবিয়ানার বিপরীত প্রেক্ষাপটে সংযত-পূত আদর্শবাদী ভারতীয়তার জয়গান উত্থিত হয়েছে,—অথচ বর্ণনার মধ্যে পর-বিরোধিতার তীব্রতা নেই কোথাও। এ তথ্যের একটি সুন্দর নিদর্শন 'বিলাত ফেরৎ' গল্পটি।

হিন্দুর, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ সন্তানের, বিলাত যাত্রার প্রসঙ্গ সেকালের রক্ষণশীল সমাজে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। যে-যুগে ইন্দিরা দেবী এই গল্প লিখেছিলেন, সেকালে প্রায়শ্চিত্ত করেও বিলাত ফেরৎ-এর সমাজস্থ হওয়া সহজসাধ্য ছিল না। সাংঘাতের সেই তিক্ততাকে শিল্পী নিজের প্রসন্ন চিত্তের উদারতায় এড়িয়ে যেতে পেরেছেন। তাঁর নালিশ কেবল তাদেরই বিরুদ্ধে, যারা বিলেত গিয়ে কিংবা না-গিয়ে অকারণে

৩৩। ব্যাপক অলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—ভূদেব চৌধুরী—'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' ২য় পর্যায় ৪র্থ সং।

নকল সাহেব হয়ে ওঠে। আর সে নালিশ পেশ করতে অভিযোগকারিণীর পক্ষ থেকে কোনো অবাঞ্ছনীয় বিরূপতা, অথবা আত্ম-পর-ধিক্কারের উত্তাপ জমা হয়নি গল্পের মধ্যে।

দরিদ্র ব্রাহ্মণের বিধবার একমাত্র সচ্চরিত্র ধীমান্ পুত্র সুধীরকুমারের সঙ্গে কন্যা 'প্রফুল্ল'র বিয়ে দিয়ে 'ব্যারিস্টার সাহেব' মিস্টার ব্যানার্জি তাকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন; আর এদিকে ঘরে গবর্নেস্ রেখে প্রফুল্লকে ভাবী সিবিলিয়ান্ স্বামীর উপযুক্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে সরস্বতীর বরমাল্য নিয়ে সুধীর দেশে ফিরছে। সাহেবের অভ্যর্থনার উপযোগী সাহেবী পোষাক পরে সবাই তাকে আন্‌তে গেলেন,—স্বয়ং প্রফুল্ল পরেছিল,—"সুন্দর ইংলিশ সিল্ক-এর ফিরোজ রঙের সাড়ি, সুদীর্ঘ লেস্ ও কৃত্রিম পত্রপুষ্পে খচিত সাহেব-বাড়ির জ্যাকেট্ এবং বিলাতি লাল মকমলের জুতা।"

অথচ স্টীমার থেকে নবাগত আত্মপ্রকাশ করলো,—"নগ্নপদ, উত্তরীয় গাত্র, ধূতি পরিহিত" হয়ে। শ্বশুরকে সে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলো,—ব্যারিস্টার সাহেব বিব্রত, বিরক্ত, কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তাঁর সাহেব পুত্র হেমেন্দ্র,—যে বিলাত না গিয়ে এবং বিদেশী সরস্বতীর সঙ্গে সামান্য যোগাযোগ মাত্র স্থাপন করেই কেবল টেনিস্ খেলতে পারার কৃতিত্বে 'সাহেবিআনা'য় বাবার ওপরে টেক্কা দিতে পারত,—জিজ্ঞেস করলো,—"হ্যালো মিস্টার মুখার্জি, সিবিলিয়ানির প্রথম অভিনয় কি ভিক্ষুক সাজের নিয়ম নাকি?"

সুধীর শান্ত হাসির সঙ্গে জবাব দিয়েছিল,—"পোষাকের কথা বল্‌ছ? আমরা ভিক্ষুক নই ত কি ভাই? আমাদের নিজেদের আছে কি? ছোটবেলায় বিলিতি বিস্কুট খেতে খেতে ঠাকুরমাকে ছুঁয়ে দিলে তিনি গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ হতেন। রোগীর জন্যে বিলিতি ওষুধ, সাহেব ডাক্তার, আর শিক্ষার জন্যে বিলাত যাওয়া একই বই আর কি! এখন প্রায়শ্চিত্ত করে তবে মায়ের পা ছুঁতে পাব। কতদিনের পর ঘরে ফিরলুম, এখন কি আর সঙ্ সাজা ভাল লাগে?"

সঙ্ না সাজুক, তাহলেও নগ্নপদ, উত্তরীয়গাত্র প্রায়শ্চিত্তকামী পাপাচারীর বেশেই বা কেন কেউ ঘরে ফিরবে, তার যুক্তি স্পষ্ট নয়। অন্য পক্ষে, বিদেশ থেকে বিদ্যাসংগ্রহ করতে যাওয়ার প্রয়োজন ঘটেছে বলে জাতীয়তাবুদ্ধি আহত হতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে ঠাকুরমার গঙ্গাস্নানে শুদ্ধ হওয়ার প্রয়াস,—ও প্রায়শ্চিত্ত করে মায়ের পা ছুঁতে পারার অধিকার অর্জনের চেষ্টায় সংগতি কোথায়, তা বুঝে ওঠা কঠিন। আসলে লেখিকা সে যুক্তি-বিচারের তিক্ততা এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন;—কেবল ইচ্ছে করেই নয়, ঐটুকুই ছিল তাঁর শিল্পি-ব্যক্তিত্বের সহজ প্রবণতা। জীবনকে নারী পেতে চায় প্রধানত আবেগানুভবের মধ্য দিয়ে, আর পুরুষ জীবনের অধিকার কামনা করে যুক্তি-বিচারদীপ্ত দার্ঢ্যের শক্তিতে; —নারী-পুরুষের ব্যক্তিত্ব-গঠন বিষয়ে এই ধারণার সত্যাসত্য নির্ণয় না করেও বলা চলে,

ইন্দিরা দেবী জীবনে বিচার-দ্বন্দ্বের চেয়ে আবেগ আর সামঞ্জস্যকেই অপার মমতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নারীমনের আকাঙ্ক্ষাকে তাই তিনি সকল ক্ষেত্রেই জয়ী করেছেন হৃদয়াবেগের প্রাণময় স্পর্শে। সেখানে যুক্তি-মতবাদের তর্ক নিরর্থক হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্ত হিশেবে পূর্ব কথারই অনুসরণ করা যাক্। পূর্বে উদ্ধৃত কথা কয়টি বলেই, "বিস্মিত বিচলিত হেমেন্দ্রের হস্তে হরিদ্রা রঞ্জিত সূত্রখণ্ড বাঁধিয়া গম্ভীর আবেগপূর্ণ স্বরে সুধীর বলিল,—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, স্বদেশপ্রীতিতে তোমার সুমতি হোক্। আজ ৩০শে আশ্বিনের বিমল আলোকে তোমার হৃদয় মন আলোকিত হোক্।"—এখানে স্মরণ করতে হয় ৩০শে আশ্বিন রাখীবন্ধন-এর জাতীয় উৎসবের দিন।

এরপরে লেখিকা বলেছেন,—"জামাতার তরুণ তপনের মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সুন্দর শুভ্র মুখে স্বদেশপ্রীতির যে উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া মিস্টার ব্যানার্জির ক্ষণিক বিরক্তির ভাব দূর হইয়া গেল। হৃদয় কোমল স্নেহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, যেন পুরাকালের তপোবনবাসী কোন্ তাপস-কুমার তাহার কঠোর শিক্ষান্তে দ্বাদশ বর্ষ গুরুগৃহে বাসের অবসানে জন্মভূমির স্নেহ অঙ্কে ফিরিয়া আসিয়াছে!

"সমাগত আত্মীয়-বন্ধুকে যথাযোগ্য প্রণামসম্ভাষণান্তে সুধীরকুমার প্রেমপূর্ণ কোমল দৃষ্টিতে হাসিমুখে চকিতে একবার পত্নীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। সে দৃষ্টিতে অঙ্কুশাহতার ন্যায় প্রফুল্ল মনে মনে ধরণীকে দ্বিধা হইতে অনুরোধ করিল। নিজের বহুমূল্য বেশভূষা যেন কঠিন শৃঙ্খলের মতই তাহার সর্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিতে-ছিল। সে দুঃসহ লজ্জার হাত হইতে মুক্তির বুঝি আর কোন উপায় ছিল না। হায়-হায়, এতদিনের এত পরিশ্রমে সে তাঁহার প্রবাসী স্বামীর সুখের জন্য শুধু ভয় কাচখণ্ডই সংগ্রহ করিয়াছে!……

"বাড়ি ফিরিয়া প্রফুল্ল তার সাজসজ্জা দূরে ফেলিয়া একখানা মোটা স্বদেশী তাঁতের কাপড়ে আপনার দুঃসহ লজ্জানত শরীরকে আবৃত্ত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিল।"

একটি মাত্র গল্প থেকে উদ্ধৃতির পরিমাণ হয়ত দীর্ঘ হল। গল্প এর পরেও আরো এক অনুচ্ছেদ এগিয়েছে। কিন্তু উদ্ধৃত অংশ থেকেই শিল্পীর কলাকর্মের স্বরূপ সচ্ছন্দ প্রকাশ পেতে পারে। প্রথমতম গল্প-সংকলন 'নির্মাল্য'-র ভূমিকায় লেখিকা জানিয়েছিলেন —"গৃহকর্মের অন্তরালে গল্পগুলি রচিত" ;—আসলে গল্পগুলি বাংলাদেশের মমতাময়ী গৃহিণী মনের সৃষ্টি; রবীন্দ্রনাথ যে গৃহিণীধর্মকে 'কল্যাণী'র শ্রদ্ধান্বিত আসনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। অন্তর-সুনিবিড় স্নেহপ্রীতির লালনে,—নারীর সহজ ইমোশন্-এর অমোঘ শক্তিতে,

গল্পগুলিকে ভারতবর্ষের পুরাতন আদর্শবাদের নিশ্চিত প্রত্যয়লোকের অভিমুখে পরিচালিত করেছেন লেখিকা। ফলে তাঁর অধিকাংশ গল্পের প্রতিপাদ্য সংশয়যোগ্য হলেও সে সংশয় স্পষ্টভাবে অনুভব করবারও সুযোগ ঘটে ওঠে না। মমতাময়ী নারীর অটুট বিশ্বাসের হৃদয়াবেগে পরিস্রুত হয়ে গল্পগুলির আবেদন মনকে আপ্লুত করে তোলে। এদিক থেকে ইন্দিরা দেবীর গল্পের আর এক পরম দান, পুরাতন বাংলার গৃহবলিভুক্ পরিবার-জীবনের স্নেহ-প্রেম-ভক্তিপুষ্ট মধুময় ঐতিহাসিক প্রকাশ। এই স্বাদুতার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রয়েছে 'ছুটি' গল্পে, আর একটি 'প্রেমের জয়'-এ।

'ছুটি', সেই পুরাতন ভৃত্যের আদর্শ মমতার কাহিনী। রবীন্দ্রনাথের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের রাইচরণ-এর কথা মনে পড়ে; এই ভৃত্যটিরও নাম রাইচরণ। রুগ্না মাতার অক্ষমতার অবকাশে প্রভুকন্যা লক্ষ্মীকে মানুষ করে তুলেছিল সে। এবারে আর প্রভু-সন্তানের মৃত্যুর জন্যে রাইচরণকে দায়ী হতে হয় নি,—দুরন্ত প্লেগ্-এর কবল থেকে লক্ষ্মীকে রক্ষা করে সেই মহামারীর ক্রোড়ে নিজেকেই বৃদ্ধ সঁপে দেয়। 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার কথা মনে পড়ে এখানে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একাধিক রচনার প্রসঙ্গ স্মরণীয় করে তুললেও, 'ছুটি' আপন স্বাদুতায় অনন্যতুল্য। কল্যাণী গৃহিণীর হৃদয়-বেদনা দিয়ে গল্পটির মধ্যে বাঙালির পরিবার জীবন-রসের এমন স্নিগ্ধ-করুণ পরিবেশ লেখিকা গড়ে তুলেছেন, যা কেবল নারীশিল্পীর হাতেই জন্মলাভ করতে পারে।

'প্রেমের জয়' গল্পে এই শিল্প-শৈলী মাতৃ-স্নেহাতুর নবজাতক-প্রীতির এক নিভৃত গভীর প্রবাহে সঞ্চারিত হয়েছে। সিবিলিয়ান পত্নী, প্রখ্যাতা কবি শ্রীমতী নির্মলা রায় তাঁর প্রখ্যাত ফুলের বাগান আর কবিতার মতই নিজের একমাত্র মেয়ে রেণুকেও নিখুঁত সুন্দর মূর্তিময়ী আর্ট করে গড়ে তুল্‌তে চেয়েছিলেন। "কবিতা পুণ্য, আর দরিদ্রতা পাপ,"—মেয়েকে তিনি প্রাণপণে এই শিক্ষাই দিতে চেয়েছিলেন। অথচ রাস্তার অপর পারে নোংরা কামার বাড়িতে নবীন প্রাণের অভ্যুদয় এই প্রাণময়ী বালিকাকে বিস্মিত করে,—'গঙ্গা'র আকর্ষণ রেণুর জীবনে তার মায়ের আজীবন শিক্ষাকে ব্যর্থ করে তুলতে চায়। অবশেষে প্রেমেরই জয় হয়! রেণুর নিষ্পাপ হৃদয়ের উদার উৎসার তার মায়ের মনকে নিভৃত কক্ষে চকিতে জাগ্রত করে তোলে,—তিনি অনুভব করেন,—"জগতের সকল শোভার চেয়ে ঐ একটি ছোট আত্মা অনেক বেশি মূল্যবান্।"—অনুভব করে ধন্য হন।

এই সত্যবোধের উদ্বোধনে লেখিকার দরদভরা সংযম জননীর ধৈর্যের মতই মধুময়;—সেই সঙ্গে সিবিলিয়ান-পত্নীর কৃত্রিমতার প্রতি যে সকৌতুক কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হয়েছে, সহৃদয় চিত্তবৃত্তির স্পর্শে তা এক নিস্তাপ সহাস্যতার স্নিগ্ধ কিরণ ছড়িয়ে দিয়েছে গল্পের বিভিন্ন অঙ্গে।

কিন্তু এই ঐতিহ্য-ভক্তিময়তার জন্যে ইন্দিরা দেবীকে নিছক পুরাতনের পুচ্ছানুসারী বলা চলে না। বিশেষতঃ প্রেম ও গার্হস্থ্যের ক্ষেত্রেও নারীর পক্ষে স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা ও মহিমাবুদ্ধিতে তিনি সুদৃঢ় চেতন। 'সার্থক' গল্পে এই দৃঢ়তার নাতিতীব্র রোমান্টিক পরিচয় রয়েছে,—'উপেক্ষিতা'-য় তা স্পষ্টতর হয়েছে।

'সার্থক' গল্পের নায়ক প্রথম বারে পত্নী-বিয়োগের পর আবার বিয়ে করেছিল কমলাকে। গরীব গ্রাম্য শিক্ষকের একমাত্র মেয়ে,—মেয়ের জীবনকে বাপ আর্থিক প্রাচুর্যে ভরে তুলতে পারেননি, কিন্তু তার মনকে করেছিলেন অমিশ্র জ্ঞান-ভাবনার সম্পদে উজ্জ্বল। এক বন্ধুর শালীর বিয়েতে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে এক আশ্চর্য রোমান্টিক্ পরিবেশে কমলাকে দেখে অভিভূত হয়েছিল। শ্বশুর-সংসারে কমলা 'কমলা'র মতোই নিঃসংশয় আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে নিল। সবাই তাকে ভালবাসে,—সকলের কাছেই স্বচ্ছন্দ মুক্ত-স্বভাব! কেবল স্বামীর কাছে সে আড়ষ্ট, আতংকিত। স্বামী যখন স্ফুট-অস্ফুট ভাষায় এই দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর কাছে অকপট প্রেম নিবেদন করতে আসত, কমলা তখন গম্ভীর, অন্যমনস্ক, উদাস হয়ে পড়ত। অবশেষে একটি হৃদয় জয়ের সকল প্রয়াস বারবার বিড়ম্বিত হতে দেখে কমলার স্বামী আর্তত্রাণে প্রাণ নিবেদন করল। বরিশালে দুর্ভিক্ষ বিধ্বস্তদের সেবা থেকে শুরু করে তার দেশ-প্রীতির প্রচেষ্টা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছালো যে, বিদেশী সরকার তাকে কারারুদ্ধ করলেন। তখন ছিল বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের জীবন-বন্যার যুগ। সেবাপরায়ণ নীরব আত্মদান ও সহজ নিগ্রহ বরণের শক্তিতে কমলার স্বামী সারা দেশের যুবশক্তির শ্রদ্ধা এবং পিতার সস্নেহ বিস্ময় অধিকার করলো। দুঃখযজ্ঞের সেই মহাব্রত উদ্‌যাপনের দিনে কমলার হৃদয়ও আর বিমুখ থাক্‌তে পারেনি।

অবশেষে অনেকের শ্রদ্ধাসন্নত প্রীতি-উৎসাহের ধারাবর্ষণে কমলার স্বামী একদিন কারাগার থেকে বাড়ি ফিরে এল। সে রাত্রে, নিভৃত শয্যাগৃহে কমলাকে যখন তার স্বামী বুকের কাছে টেনে নিল, তখন আতঙ্কে সে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল না, এমন কি, স্বামীর স্পষ্টোচ্চার ভালবাসার কথা শুনেও শিউরে উঠ্‌লো না। কেবল "অতি করুণ অশ্রুরুদ্ধ স্বরে" সে বলেছিল,—'ঈশ্বর জানেন, আমি নিজে কত কষ্ট পাইয়াছি। তোমায় অবিশ্বাস করিয়া, তোমার স্নেহে সন্দিহান হইয়া আমার সমস্ত জীবন ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল। জানিতাম না, পুরুষের ভালবাসা কত বিস্তৃত! আপনাকে লোকের খেলিবার পুতুল, বিলাসের উপাদান মনে করিয়া শত ধিক্কার দিয়াছি। এই হেয় ঘৃণিত জীবন স্বহস্তে নষ্ট করিতে চাহিয়াছি। তুমি যখন অকপটে ভালবাসা ব্যক্ত করিয়াছ, তখন তোমায় ছলনাকারী প্রতারক মনে করিয়া মাটির সহিত মাটি হইয়া মিশিয়াছি। মনে করিয়াছি, আর একদিন আর একজনকেও ঠিক্ এমনই করিয়া ঐকথা বলিয়াছ! ভালবাসাকে আমি

সংকীর্ণ পঙ্কিল পুষ্করিণী মনে করিয়াছিলাম। জানিতাম না, তাহা মহাসমুদ্র! জানিতাম না, তুমি কত মহৎ! তুমি আমার দেবতা'!"

মূল জীবন-সমস্যাটিকে পতিপ্রেমের ভারত-ধর্মী অতি-উচ্ছ্বাসে পাশ কাটিয়ে গেলেও গল্পের মধ্যে তার পরিচয় অস্পষ্ট থাকেনি। এই গল্প রচনার, তথা লেখিকার জীবনান্তেরও বহুদিন পরে তাঁর অনুজা অনুরূপা দেবী বলেছিলেন,—"নারী যেখানে নিজের মহত্ত্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সেখানে সকল দেশের পুরুষই তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে; বিশেষ করে প্রাচীন ভারত নারীকে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি সম্মান দিয়েছিল, তার বহু প্রমাণ আছে।······নারীকে পুরুষই বড় করেছে তার যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে; পুরুষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে হিংসা বিদ্বেষ বাড়িয়ে নারী কোনদিন বড় হতে পারবে না; নিজের চরিত্রের মহত্ত্বে তাকে বড়ো হতে হবে; যোগ্যতার পরিচয় দিয়েই তাকে স্বাধিকার লাভ করতে হবে।"[৩৪] ইন্দিরা দেবীর নিজের জীবন-প্রত্যয়ও ছিল তাই;—এই আদর্শের শিক্ষা এঁরা দুই বোনে একই সূত্র থেকে আহরণ করেছিলেন অভিন্নভাবে। আলোচ্য গল্পের শেষে কমলার জীবনে এই সত্যের ফলশ্রুতি ঘোষিত হয়েছে। তা ছাড়া, পতিপ্রেমে পত্নীর সংশয় প্রকাশের ভারতীয় আদর্শসম্মত অপরাধবোধই রোমান্স-সুন্দর আকুলতায় উদ্বেল হয়েছে কমলার ওপরের উক্তিতে। বস্তুত পুরুষের ভালবাসা এক 'মহাসমুদ্র';—সেখানে একাধিক পত্নীর প্রতি অকৃত্রিম পুণ্য প্রণয়বৃত্তির অস্তিত্ব সম্ভব,—কমলার অনুভূতির মধ্য দিয়ে শিল্পী এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত অতি-উচ্ছ্বাসের প্রবলতায় যুক্তি-বিচারের রেশন্যাল পথ ছেড়ে ইমোশন্-এর জগতেই নিজের মুক্তি খুঁজেছে। ফলে লেখিকার সিদ্ধান্ত হয়ত নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা পেতে পারেনি;—কিন্তু সারাটি গল্প এই সত্য প্রতিপন্ন করতে পেরেছে যে, বিবাহের সূত্রে গেঁথে নিলেই নারীর মন নিষ্প্রাণ মালার মত জীবনের যান্ত্রিক শোভা বর্ধন করে না; ত্যাগ-তিতিক্ষা, আত্মোৎসর্গের মহৎ যজ্ঞসাধনার মধ্য দিয়েই স্বামীকেও জয় করতে হয় তার বিবাহিতা পত্নীর হৃদয়।

বিবাহিত জীবনে নারীর পক্ষ থেকে স্বামীর অন্তঃকরণে ব্যক্তিগত শক্তিতে মর্যাদা দাবির ঐতিহ্য প্রথম স্পষ্টতম রূপে বিকশিত হয়েছে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর ভ্রমরে। কিন্তু ভ্রমরের জীবনের প্রাথমিক নারীত্বসৌরভ পরবর্তী কালে পরুষ-কঠিন দার্ঢ্যের রূপ ধরেছে তার দ্রোহ-বুদ্ধির মাধ্যমে। বাঙালি পুরাঙ্গনার নিভৃতকোমল স্বভাবটি অক্ষুণ্ণ থাকেনি বঙ্কিমচন্দ্রের পৌরুষ-দৃপ্ত প্রতিভার এই অপরূপ সৃষ্টিতে। কিন্তু কমলা আগাগোড়াই কমলা; অন্তঃপুরচারিণী শিল্পি-হৃদয়ের মমতা কমলার আত্মাভিমান-তপ্ত দ্রোহ-বুদ্ধিকে

৩৪। অনুরূপা দেবী—'সাহিত্যে নারী : সৃষ্টি ও স্রষ্টী'।

নারীধর্মী কোমলতা ও স্নিগ্ধতায় সুরভিত করেছে। ভ্রমরের পরিণাম ট্রাজেডিতপ্ত ; 'সার্থক' গল্পের সমাপ্তি কেবল কমেডির সুরে বাঁধা নয়, রোমান্স-মধুর।

কিন্তু এই মাধুর্যই ট্রাজেডির হৃদয়-বিদারণ রূপে দাম্পত্য-প্রেমক্ষুধাতুর নারীব্যক্তিত্বের গহনে আশ্চর্য ঋজুতার স্পষ্ট রূপ রচনা করেছে। আত্মমর্যাদার পবিত্র দায়িত্ব রক্ষায় যে নারী অনমনীয়, অতন্দ্র,—প্রেমরিক্ততার ভারে তারই বাণবিদ্ধ-হৃদয় আবার ভূলুণ্ঠিত। 'উপেক্ষিতা' গল্পের মৃন্ময়ী ছিল মণীন্দ্র-র বাল্য-সঙ্গিনী। একদিন এই নিঃসম্বল প্রতিভাধর বালকটিকে গ্রামের জমিদার বিপিনচন্দ্র পুত্রস্নেহে লালন করেছিলেন,—স্বেচ্ছায় তার ডাক্তারি পড়ার সকল দায়িত্ব বহন করেছিলেন,—একমাত্র কন্যা মৃন্ময়ীর ভবিষ্যৎ জীবন মণীন্দ্র-র জীবনের সূত্রে বেঁধে দেবেন এই ছিল বিপিনচন্দ্রের মনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা। এমন সময় বিপিনচন্দ্রের হাত থেকে মিনুকে পড়াবার ভার পেয়েছিল মণি। সার্থকতা দেখা দিল দুই রূপে ;—মণীন্দ্র ডাক্তারি পাশ করল, কেবল তাই নয় অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে গেল তার ধর্মত্যাগী খ্রীস্টান জ্যেঠামশায়ের বিরাট সম্পত্তি। এই নিঃসন্তান বৃদ্ধ মৃত্যুকালে উইল করে গিয়েছিলেন, তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে মণীন্দ্র কেবল একটি শর্তে ;—বিলেত থেকে তাকে ডাক্তারি পাশ করে আসতে হবে।

মৃন্ময়ীর হৃদয় কেঁপে ওঠে নিজের অজ্ঞাতে ; মণীন্দ্র বিলাত চলে যায় ;—সেখানে যাওয়ার অল্প পরেই বিপিন মণীন্দ্রের কাছে মৃন্ময়ীর বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠান ;—মণীন্দ্র সেদিন হাতে চাঁদ পেয়েছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বিলেতের দত্ত সাহেবের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে মণীন্দ্র জীবনের চরম ভুল করে বসল—তার একমাত্র কন্যা অমিয়াকে বিয়ে করে দেশে ফিরল। এক অপ্রত্যাশিত নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে পিতা-পুত্রী এই দুঃসংবাদ পেল ; কালে সবই সহ্য হয়, মৃন্ময়ীর অভিভূতিও স্তিমিত হয়ে এল। বিপিনচন্দ্র আবার কন্যাকে বিয়ে দিতে চান ;—কিন্তু মিনুর তাতে প্রবল আপত্তি। এমন সময় এক নাটকীয় পরিবেশে মৃন্ময়ীর মামার বাড়িতে বাঁকিপুরে মণীন্দ্র মৃন্ময়ীর আবার দেখা হয়। অমিয়া তখন মারা গেছে,—তাদের দুটি ছেলে তখন মাতৃহীন।

নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় মৃন্ময়ীকে বহুদিন পরে দেখে "মণীন্দ্র বিস্মিত হইল। ইহাকে তুচ্ছ করিয়া সে সৌন্দর্য-গর্বিতা আত্ম-সুখপরায়ণা অমিয়াকে সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিল। ব্রহ্মচর্যের কঠোরতায় মৃন্ময়ীর সুখপালিত দেহ অপেক্ষাকৃত কৃশ হইলেও তাহার সুন্দর মুখে, সুকুমার দেহে এমন একটি স্বর্গীয় জ্যোতি ফুটিয়া উঠিতেছিল যাহাতে মানুষের মন আপনা হইতে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে নত হইয়া পড়ে। দুঃখে বর্ণের জ্যোতি যেন আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।"

লেখিকা তাঁর ভারত-ভক্তি-বিনম্র হৃদয় নিয়ে সর্বংসহ প্রেমের দুঃখপূত মহিমার জয়গান করে নিলেন একবার,—প্রসঙ্গত রূপজ প্রণয়ের নিষ্প্রভতার ছবিটিও ইঙ্গিতে আঁকতে

ভুললেন না—অমিয়ার প্রসঙ্গে। কিন্তু এই প্রেমকরুণাঘন মূর্তির সামনে একদা-ভ্রান্ত মণীন্দ্র যখন নতজানু হয়ে পূর্ব অধিকার ফিরে পেতে ভিক্ষা করে, তখন মৃন্ময়ী "মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে" বলে, "ক্ষমা করবেন মিস্টার সেন, আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ত চিরকাল থাকতে পারে, অন্য কোনো সম্পর্ক নয়!……আজ বিদায়ের দিনে কায়মনে প্রার্থনা কচ্ছি, আপনার মাতৃহীন ছেলেরা যেন ভালো থাকে, সুখে থাকে!"

সংযম-দৃঢ়,—শালীন অথচ নির্ভুল অনমনীয়তায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বময়ী নারীর এ এক অপরূপ রূপ। বিপত্নীক পিতার পক্ষে পুনর্বিবাহের নৈতিকতার প্রতি নবজাগ্রত নারীত্বের কোনো ইঙ্গিতও শেষ ছত্রে রয়েছে কিনা, কে বলবে! সে যাই হোক,—এই দীপ্ত দৃপ্ততার সামনে মণীন্দ্র আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি,—জন্মান্তরে ক্ষমা লাভের আকুল আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে বিদায় নিয়েছে। তখন,—"মৃন্ময়ীর ইচ্ছা হইল, একবার ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ডাকিয়া সে ক্ষমা প্রার্থনা করে! একবার বলে সেও বড় অভাগিনী! কিন্তু সে উঠিল না, বাধিয়া গেল।

"বাহিরে জুতার শব্দ মিলাইয়া গেলে, সে উঠিয়া ঘরের আলো নিভাইয়া দিল। তারপর সহসা মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া বালিকার মত সে কাঁদিতে লাগিল।"

নারী-হৃদয়ের অপার রহস্য নাকি দেবতাদেরও অজ্ঞাত, কিন্তু নারীর পক্ষে তা একেবারেই নয়। লেখিকার নারী-হৃদয়ের স্পর্শস্নিগ্ধ পরবর্তী বিশ্লেষণ তার সার্থক প্রমাণ: —"…এই আলোকহীন অন্ধকার কক্ষের অধিকতর অন্ধকার তাহার [মৃন্ময়ীর] হৃদয়ের মধ্যে মণীন্দ্রর যে উজ্জ্বল ছবি সহসা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, মিঃ সেনের অবজ্ঞাত পরিত্যক্ত চিত্রের সহিত তাহা মিশিয়া এক হইয়া সমস্ত গোলমাল করিয়া দিয়াছে! মণীন্দ্রর ছবি খুঁজিতে গেলে মিঃ সেনের মুখই যে জাগিয়া উঠে!"

—নারীর একই আত্মার গভীরে একই পুরুষের দুই পরস্পর-বিরোধী সত্তার নিভৃত সংঘাতের রূপটি এখানে ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু গল্প থামেনি এখানেও,—"মণীন্দ্র বলিয়া গিয়াছে, পরলোকে আবার সাক্ষাৎ হইবে।

"মৃন্ময়ী আপনার হৃদয়ের মধ্যে খুঁজিয়া দেখিল, কৈ, সে ত মণীন্দ্রর প্রতি কোনো কামনা রাখে না! ইহলোকে ত নহেই, পরলোকেও নহে। তবে চোখের জল বাঁধ মানে না কেন? এ কি সমবেদনা? কে জানে?"

গল্পশেষের এই অনির্বচনীয় জিজ্ঞাসা ছোটগাল্পিকের নয়,—জীবন-রহস্য সন্ধানী কবির। এককালে ইন্দিরা দেবীর রচিত কবিতাবলীর প্রশংসমানদের দলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যোগ দিয়েছিলেন।[৩৫] সেই সহজ-কবির প্রবণতা নিয়েই নারীমনের গহনে নারীদৃষ্টির

৩৫। দ্রষ্টব্য—তদেব।

অনুসন্ধানকে আলোকোজ্জ্বল জিজ্ঞাসার আকারে প্রতিফলিত করেছেন তিনি 'উপেক্ষিতা' গল্পের শেষে। মণীন্দ্রের প্রতি মৃন্ময়ী কোনো কামনা রাখে না;—জন্মান্তরেও নয়,—একি অভিমান, অভিযোগ, না ক্ষোভ!—মণীন্দ্র আর মিঃ সেন-এ জট পাকিয়ে মনকে আক্ষিপ্ত করে তুলেছে বলেই কী এই অনীহা?—এম্‌নি সব অন্তহীন জিজ্ঞাসার আবর্তের গভীরে গল্পকে ইমোশন্-এর তরঙ্গজলে বিসর্জন করে গল্পকার বিদায় নিয়েছেন।

আসলে ইন্দিরা দেবীর গল্প বলার এইটিই শ্রেষ্ঠ আর্ট। নিতান্ত ছোটখাটো ঘরোয়া incident নিয়ে তাঁর গল্প,—এসব theme অনায়াসেই উপাখ্যানের পর্যায়ে বিন্যস্ত হতে পারত। সব গল্পই যে ছোটগল্পের আকার পেয়েছে তাও নয়,—অনেক কয়টিতেই বরং সেই পিনদ্ধ আঙ্গিকের অভাব রয়েছে। তাহলেও অধিকাংশ গল্পেই নারী-প্রত্যয়ের স্বাভাবিক ইমোশনকে সহজ-কবির আবেগে নাতিকম্পিত করে এক সংক্ষিপ্ত অথচ অখণ্ডতার পরিবেশ রচনা করতে পেরেছেন তিনি। ফলে, বৈচিত্র্যহীন নিছক narration-ও অনায়াস আবেগে দোলায়িত হয়ে নিটোল গল্পরসের স্বাদুতা অর্জন করেছে। নারীশিল্পীর গড়া মমতা-স্নিগ্ধ ছোট ছোট মাটির পুতুলের মত ইন্দিরা দেবীর কারু-পারিপাট্যহীন সহজ কথার বর্ণনাময় গল্পগুলি তাঁর গৃহিণীচিত্তের স্পর্শে ছোট ছোট আকারের অখণ্ড গল্পের রস-রূপ ধরে উঠেছে।

ইন্দিরা দেবীর পাঁচখানা গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে আছে,—'নির্মল্য' (১৯১২), 'কেতকী' (১৯১৪), 'মাতৃহীন' (১৯১৭), 'ফুলের তোড়া' (১৯১৮) এবং লেখিকার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'শেষদান' (১৯২৪)। এইসব গল্প সংগ্রহে কিছু কিছু ইংরেজি গল্পেরও অনুবাদ রয়েছে।

অনুরূপা দেবী

অনুরূপা দেবী (১৮৮২—১৯৫৮) ইন্দিরা দেবীর অনুজা সহোদরা ছিলেন। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে একসময়ে তিনি সম্রাজ্ঞীর অভিধা অর্জন করেছিলেন। কালের হাতে সে দুর্লভ পরিচয় কতদূর অক্ষুণ্ণ থাকবে, বলা কঠিন। কিন্তু ভালোমন্দ যতটুকুই হোক্, অনুরূপা দেবীর ঔপন্যাসিক প্রবৃত্তি তাঁর হাতে ছোটগল্পকে কখনো সার্থক হতে দেয়নি।

শিল্পী হিশেবে অনুরূপা ছিলেন অতিশয় আত্মসচেতন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পারিবারিক ঐতিহ্য, ভারতীয় পুরাতন আদর্শ-বুদ্ধির অপরূপ মহিমা, এবং সবার ওপরে দেশী-বিদেশী ভাষার সাহিত্য-দর্শনে নিজের পারঙ্গমতা সম্বন্ধে অতন্দ্র গরিমাবোধ তাঁর উপন্যাস রচনাকে অতি-ভারাক্রান্ত করেছিল। এ-দিক থেকে অতি-ভাষণ ছিল অনুরূপা

দেবীর স্বভাবসিদ্ধ। যে-কোনো গল্পের অবতারণা প্রসঙ্গে একটি মহৎ আদর্শ সৃষ্টি ও তার জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক ফল প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহ লেখিকার বাসনায় চির-অনুস্যূত হয়ে থাকত। ফলে উপন্যাস লিখতে বসে তিনি কাহিনীর অতিরিক্ত এমন অনেক কথা বলেছেন যা কেবল অপ্রাসঙ্গিক নয়,—অপ্রয়োজনীয়ও। গল্প তাতে জটিল, শ্লথগতি, কষ্টপাঠ্য হয়েছে। তাঁর খ্যাততম উপন্যাস 'মা'-ও এই সত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

বস্তুত লেখিকার হাতের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার ছিল বর্ণনা,—বিশুদ্ধ কথাসাহিত্যের বিচারে সে বর্ণনা প্রায়ই নিষ্প্রভ। কিন্তু তত্ত্বকথা, আদর্শবাদ ও আবেগের মিশ্রণে এক অভঙ্গ কান্নার একঘেয়ে স্রোত রচিত হয়েছে প্রায়ই,—যাতে দুর্বল বাঙালি চিত্তের ভাবালুতা প্রশ্রয়পূর্ণ আশ্রয় খুঁজেছে। অনেক সময় মনে হয়,—অনুরূপা দেবীর এককালীন খ্যাতি-প্রাচুর্যের উৎস বুঝি ছিল এইখানে। সে যাই হোক্, অমিত-কথন,—প্রসঙ্গে-প্রসঙ্গান্তরে অন্তহীন একটানা বর্ণনা ছোটগল্পের সার্থক কাঠামো গড়ে তোলার উপযোগী নয় কখনো। ফলে অনুরূপার ছোট আকারের গল্পগুলো কখনোই ছোটগল্প হতে পারে নি ; নিছক গালগল্প হিশেবেও এদের রসপ্রবাহ স্বতঃস্ফূর্ত নয়।

প্রথমত, অধিকাংশ গল্পই উপন্যাসের মতো অতি বিস্তারিত বর্ণনায় ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটি গল্পই পাঁচ, ছয় বা ততোধিক উপ-পরিচ্ছেদ-এ বিভক্ত ; এই সব বিভাগও আবার একটি theme-এর সংহতিতে বাঁধা নয়। দৃষ্টান্ত হিশেবে 'চিত্রদীপ' গ্রন্থের 'পরাজয়' গল্পের কথা বলা যেতে পারে। শিল্পী বিভূতি মুখোপাধ্যায় ও আত্মীয়-পরিজন-হীনা 'মডেল' মারাঠী ব্রাহ্মণ-কন্যার রোমান্‌টিক উপাখ্যান নিয়ে গল্প শুরু হয়েছে, তার সারা হল প্রোটেস্টান্‌ট্ হিন্দুধর্ম-দর্শনের বাদানুবাদমূলক জ্ঞানগর্ভ (!) বক্তৃতায়।

এমন ঘটনা যেখানে ঘটেনি, সেখানেও গল্প অতিব্যাপ্ত হয়ে থেকেছে,—একই প্লট্-এর অন্তরালে একটা-দুটো সাব্-প্লট্ এসে পড়েছে,—তার বর্ণনা-বিস্তার গল্প-রসের সংহতিকে আড়ষ্ট করেছে। বর্ণনার এই নিষ্প্রভতা দূর করবার উদ্দেশ্যে লেখিকা গল্পের উপস্থাপনের নাটকীয় বিন্যাস-পদ্ধতি অনুসরণ করতে চেয়েছেন ; একটা আকস্মিক রহস্যময়তার মধ্যে গল্পের সূচনা করা হয়েছে,—আর আগাগোড়া গল্পে সাস্‌পেন্স রক্ষা ক'রে নাটকীয় ভাবে তার পরিসমাপ্তি বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন, 'অযাচিত' গল্পের শুরু হয়েছে ;—"শুধু সেই জন্যে তুমি আমায় বিয়ে করতে চাও না, না আর কিছু কারণ আছে ?' জমিদার হৃদয়নাথ একটু উত্তেজিতভাবে এই প্রশ্ন করিয়া ব্যগ্রভাবে অদূরবর্তিনী প্রস্তর মূর্তিবৎ স্থির রমণীর পানে চাহিলেন। পার্শ্বস্থ ঝোঁপওয়ালা ঝাঁটি-গাছটির উপর সে বামহস্তের সাজিটি রাখিয়া লজ্জা ও বিষাদে চক্ষু নত করিল, উত্তর দিল না।"

—মোটামুটি এমনিই হচ্ছে অনুরূপার ছোট আকারের গল্প বলার টেক্‌নিক্। কিন্তু সাসপেন্সকে যথোচিত রূপে বজায় রেখে, তার রস-নিষ্কাসনের আর্ট-বর্ণনাশৈলীর সংযম এবং সুমিতি সাপেক্ষ। অনুরূপার শিল্প-স্বভাব কোনো কালেই তা আয়ত্ত করতে পারেনি। ফলে রসোত্তীর্ণ সার্থক গল্প রচনাও তাঁর পক্ষে সহজ হয়নি। এঁর গল্প সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে 'চিত্রদীপ', 'উল্কা', 'রাঙাশাখা' (১৯১৫) এবং 'মধুমল্লী' (১৯১৭)। লেখিকার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে 'ক্রৌঞ্চমিথুনের মিলনকথা'।

নিরুপমা দেবী

নিরুপমা দেবীর (১৮৮৩-১৯৫১) শিল্প-প্রতিভা বিকাশের ইতিহাস শরৎচন্দ্রের ভাগলপুর সাহিত্য সভার সঙ্গে জড়িত।[৩৬] কবিরূপেই সাহিত্যজগতে অনুপমা[৩৭]'র প্রথম প্রকাশ। এই কবিতাবলী ভাগলপুর সাহিত্য সভায় পঠিত হত;—শরৎচন্দ্র লেখিকার রচনার প্রতি প্রশংসমান ছিলেন। 'সভার' পুরুষ সভ্যদের সঙ্গে নিরুপমার সংযোগের সূত্র ছিলেন তাঁর অগ্রজ বিভূতি ভট্ট।[৩৮]

এ-সব সত্ত্বেও নিরুপমাকে শরৎগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। প্রকাশ্য সাহিত্যজগৎ থেকে শরৎচন্দ্র যখন অজ্ঞাতবাসে, তখন থেকেই এঁর লেখা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। শুধু তাই নয়, শরৎ-ভাবনার সঙ্গে তাঁর কথা-সাহিত্যিক রচনাধারার পার্থক্য মৌলিক। জীবন-দৃষ্টির বিচারে শরৎচন্দ্রকে বাংলার সমাজ-চেতনার ইতিহাসে প্রগতিশীল বিপ্লবী বলা যেতে পারে। কিন্তু নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণবংশের বালবিধবা নিরুপমা ছিলেন রক্ষণশীল আচারপূত জীবনাদর্শে বিশ্বাসী। এদিক্ থেকে তিনি অনুরূপা দেবীর সগোত্রা।

অনুরূপার মতই গল্পের চেয়ে উপন্যাস রচনায় নিরুপমার দক্ষতা ছিল সমধিক, আর উপন্যাস-কলার সংগঠনে বর্ণনা-প্রবণতাই ছিল তাঁর-ও শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। কিন্তু নিরুপমার বর্ণনায় তেমন অতিশয় স্ফাতি নেই, বরং বর্ণন-পারিপাট্য রয়েছে। হিন্দুশাস্ত্রে লেখিকার নিগূঢ় অধিকার ছিল। ফলে তাঁর ছোটগল্পেও গীতার শ্লোক, অথবা সংস্কৃত মন্ত্র কিংবা সুভাষিত প্রযুক্ত হতে দেখি কখনো কখনো। কিন্তু ঐ সব ক্ষেত্রেও পাণ্ডিত্য-প্রকাশের ক্লেশকর সচেতনতা নেই। ফলে লেখিকার উপন্যাস-সাহিত্য সুখপাঠ্য হয়েছে;—তাঁর কিছু কিছু গল্পও নারী-হস্তের স্নিগ্ধতায় মনোহর।

৩৬। দ্রষ্টব্য—বর্তমান গ্রন্থের নবম অধ্যায়। ৩৭। শিল্পীর আসল নাম ছিল অনুপমা;—তাঁর প্রথমজীবনের কিছু কিছু রচনা ঐ নামে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে লেখিকা নূতন 'পেন-নেম্' গ্রহণ করেছিলেন। ৩৮। দ্রষ্টব্য—বর্তমান গ্রন্থের নবম অধ্যায়।

অনুরূপার মত নিরুপমার গল্পে আঙ্গিক-বিন্যাসের তেমন প্রত্যক্ষ সচেষ্টতা নেই ;—কিন্তু সকল গল্পই পরিপাটি করে গুছিয়ে বলার সহজ নারী-বৃত্তির প্রভাবে তারা সরস। ঔপন্যাসিকের মত অভগ্ন-সম্পূর্ণ বিস্তারিত বর্ণনার প্রতি আগ্রহের ফলে তাঁর অনেক গল্প কেবল আকারেই বড় হয়নি, হয়েছে যথার্থ বড় গল্প। 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পটি এই তথ্যের সার্থক নিদর্শন। নিরুপমার সকল গল্প-উপন্যাসই বাংলার সামাজিক-পারিবারিক জীবনের বিশ্বস্ত ছবি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু আকারের বৃহত্ত্ব ও বর্ণনার বিস্তার সংবরণ করা তাঁর পক্ষে এক দুঃসাধ্য সমস্যা হয়েছিল। যেখানে তা সম্ভব হয়েছে সেখানে নিরুপমার গল্পের আকার কেবল ছোট হয়নি,—বাংলার অন্তঃপুরচারী মূকজীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার নিভৃত পরিচয় রচনার পারিপাট্যে জীবন-রস-স্নিগ্ধ হয়েছে। 'প্রত্যাখ্যান' বা 'ব্রতভঙ্গ' এই শ্রেণীর রচনা। গল্প না হয়েও কেবল নারীহৃদয়ের দরদের প্রভাবে বৃহত্তর সমাজ-চিত্র কি করে সার্থক- পারিবারিক নক্সার মধুস্মিত রূপ ধারণ করতে পারে, 'নূতন পূজা' গল্পটি তার সফল পরিচয়।

উপন্যাসের তুলনায় নিরুপমা গল্প লিখেছিলেন অনেক কম। অগ্রজ বিভূতি ভট্ট-র সঙ্গে একটি গল্প সংকলন প্রকাশ করেছিলেন তিনি 'অষ্টক' (১৯১৭) নামে। আটটি গল্পের মধ্যে চারটি করে গল্প লিখেছিলেন ভাই-বোনের প্রত্যেকে। 'আলেয়া' (১৯১৭) নামে তাঁর একটি পৃথক্ গল্প সংকলনও প্রকাশিত হয়েছিল।

অপরাপর মহিলা গল্প-শিল্পী

প্রত্যক্ষভাবে 'ভারতী' পত্রিকার লেখিকা নন, অথচ 'ভারতী'-গোষ্ঠীর পূর্বোক্ত শিল্পীদের সঙ্গে সমসূত্রে উল্লেখ্য, এমন ক'জন মহিলা শিল্পীর কথা বলব এবারে। কালের দিক থেকে এরা পরে এসেছিলেন ; কিন্তু রচনার প্রেরণাধর্মে ছিলেন 'ভারতী'-প্রবর্তিত প্রগতি-চেতনার উত্তরসাধিকা। বস্তুত সাধারণভাবে ব্রাহ্মসমাজ, এবং বিশেষভাবে ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে উনিশ শতক থেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতা ও নারী-স্বাতন্ত্র্যের যে প্রবাহ প্রায় বৈপ্লবিক-আকার ধারণ করেছিল, এই সব মহিলা-শিল্পী ছিলেন তার পুরোবর্তী।

এই পর্যায়ের প্রথম উল্লেখ্য লেখিকা দু'জন হচ্ছেন শ্রীমতী শান্তা (১৮৯৪) ও সীতাদেবী (১৮৯৫)। 'প্রবাসী' পত্রিকার বিশ্রুত সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দুই কন্যা এই দুই সহোদরা। 'প্রবাসী'-র পৃষ্ঠাতেই এঁদের গল্প-উপন্যাস প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রেক্ষিতে এক অর্থে এঁরা ছিলেন 'ভারতী'-গোষ্ঠীর উত্তরসাধিকা। রবীন্দ্রনাথের

ব্যক্তিত্ব, জীবনদৃষ্টি ও শিল্পসাধনাকে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্র-কনিষ্ঠ 'ভারতী'-গোষ্ঠীর গল্প-সাধনার ধারা প্রবাহিত হয়েছিল। কয়েক বছর পরে লিখতে বসে এই দুই বোন-ও রবীন্দ্রনাথের ঘন সান্নিধ্যে এসেছিলেন মন ও মননের জগতেও। সীতাদেবীর 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থে এই সত্য নিঃসংশয় অভিব্যক্তি পেয়েছে। 'প্রবাসী' পত্রিকা ও তার সম্পাদক-পরিবারের সঙ্গে কবিচিত্তের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা বস্তুত গোটা পত্রিকাতেই রবীন্দ্র-রুচি ও বিশ্বাসের এক মনোরম পরিবেশ গড়ে তুলেছিল। তৎকালীন পত্রিকা-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ভারত-দুর্লভ সাংবাদিক প্রতিভার দান অবিস্মরণীয়। সেই সঙ্গে 'প্রবাসী'র সৃজন-লোকে রবীন্দ্র-জ্যোতি ছিল অপরিম্লান, এবং অনন্য। শান্তা অথবা সীতাদেবী প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ বা অনুসরণ করেছিলেন তাঁদের গল্প রচনায়, এমন কথা বলবার কারণ নেই। কেবল একথাই স্মরণীয় যে, রবীন্দ্র-স্নেহের মানস-লালনে এঁদের চিত্তবৃত্তি সেই মুক্তির পথে প্রচারিত হয়েছিল, স্বর্ণকুমারী, সরলাদেবী বা মাধুরীলতা প্রভৃতি ঠাকুরবাড়ির পরিবেশে লালিত মহিলা-শিল্পীরা ছিলেন যার পূর্ব-সাধিকা। এদিক থেকে ইন্দিরা-অনুরূপা-নিরুপমা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল শিল্পিগোষ্ঠীর পাশে এক পৃথক্ উজ্জ্বল জীবনদৃষ্টির আলোকবর্তিকা ধরে সমান্তরাল পথে এগিয়েছেন এঁরা।

বাংলা উপন্যাসের বিচার প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই পার্থক্যের পরিচয় নির্দেশ করে বলেছেন: "স্বর্ণকুমারী দেবীর পরবর্তী মহিলা ঔপন্যাসিকদের হাতে উপন্যাস সাধারণতঃ দুইটি বিপরীতমুখী ধারার অনুবর্তন করিয়াছে। এক শ্রেণীর লেখিকা হিন্দুসমাজের উপর আক্রমণ ও সমালোচনার প্রতিক্রিয়ারূপে ইহার সনাতন বিধিনিষেধ ও মূলীভূত আদর্শের পক্ষ সমর্থনের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর প্রতিনিধি নিরুপমা দেবী ও শ্রীযুক্তা অনুরূপাদেবী।...

"দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিদের মধ্যে সীতা ও শান্তা দেবীর নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের উপন্যাসে বিশেষ করিয়া নারী সমাজে আধুনিক মনোবৃত্তির প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে।"[৩১]

ছোটগল্পের প্রচ্ছদ উপন্যাসের চেয়ে অনেক সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ। তাতে শিল্পীর বিশেষ জীবন-দর্শন বা প্রত্যয়কে বিস্তারিতভাবে প্রতিফলিত করবার অবকাশ নেই। তাহলেও, ওপরের আলোচনায় প্রথমোক্ত শিল্পিগোষ্ঠীর সনাতনী জীবন-চিন্তার পরিচয় লক্ষ্য করেছি। এবারে একটি পৃথক পার্শ্ববর্তী ধারা হিসেবে নারীর লেখা ছোটগল্পে আধুনিক মনোভাবনার পরিচয় সন্ধান করা যেতে পারে।

৩১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (৪র্থ সং)

শান্তা দেবী

শান্তা ও সীতাদেবীর রচনায় 'আধুনিক মনোবৃত্তি'র পরিচয় বিশদ করে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,—"পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সংস্কারের নানামুখী আলোড়ন নারীহৃদয়ে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে, নারীর ভাবগভীরতার মধ্যে এই পরিবর্তনের তরঙ্গ-চাঞ্চল্য কতখানি স্থির সংহত হইয়াছে—এই কাহিনীর ইতিহাসই ইঁহাদের উপন্যাসের বিষয়।"[৪০] ছোটগল্পের শরীর সীমিত সংক্ষিপ্ত ; ব্যাপক ইতিহাস বর্ণনার স্থান এখানে নেই। তাছাড়া ছোটগল্পের রস-স্বভাব বিস্তারিত খুঁটিনাটি বর্ণনার চেয়ে সুমিত অর্থবহ ব্যঞ্জনাধর্মেরই অভীপ্সু। ফলে সমাজ-চিন্তন, বা রুচি-বিবর্তনের আগাগোড়া স্পষ্ট পরিচয় এখানে পাওয়া কঠিন। তাহলেও, শিল্পীর মানস প্রত্যয়ের সঙ্গে সমকালীন জীবন-প্রচ্ছদের কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে হরগৌরী সম্পর্কের যোগলগ্নেই সার্থক ছোটগল্পের রস-উৎসার সম্ভব হয়। আলোচ্য শিল্পী দু'জনের মানস পরিমণ্ডল ও জীবন-পটভূমি, দুই-ই যে ইংরেজি শিক্ষাসম্ভূত নব ঐতিহ্যবোধের দ্বারা উদ্বোধিত হয়েছিল, ওপরের উদ্ধৃতিতে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। তাই বর্তমান প্রসঙ্গে বাংলাদেশের নারী-মনের ওপরে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার মোটামুটি পরিচয়টুকু সন্ধান করতে হয়। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এবিষয়ের ক্রমবিন্যস্ত ইতিহাস বিবৃত করেছেন,—আমরা কেবল ছোটগল্পের পক্ষে অপরিহার্য তথ্যটুকুই আহরণ করব।

১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলার নাগরিক নারী-সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হতে থাকে। সেকালের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত সকলেরই জানা রয়েছে, একেবারে প্রথম প্রথম নারীকে শিক্ষিত করে তোলার এই প্রয়াস কলকাতা শহরেও রক্ষণশীল সমাজের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। ফলে, শহর-বাংলায়ও নারীর ইংরেজি শিক্ষার ফলশ্রুতি হল অনভীপ্সিত আকারের। অপেক্ষাকৃত নিষ্ঠাবান রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ নিজ নিজ অন্তঃপুরচারিণীদের বিদেশী শিক্ষা পেতে দেননি। তাতে, প্রথম ইংরেজি শিক্ষা পেয়েছেন বাংলাদেশের সেইসব নারী, যাঁদের পরিবারের শিক্ষিত পুরুষ-অভিভাবকেরা ইংরেজিআনারও ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন আগে থেকেই। ফলে 'মেমসাহেবি' পোশাক, চালচলন, কথাবার্তা এই সবই তাঁদের জীবনে ইংরেজি শিক্ষার অপরিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিশেবে শোভা পেতে লাগ্‌ল,—দেখা দিল অদ্ভুত ইঙ্গবঙ্গ সমাজ।

তারপর, ইংরেজি শিক্ষার প্রসার যখন নারীসমাজে আরো ছড়িয়ে পড়েছে, তখন নগর-বাংলায় এক কৃত্রিম সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে,—ইঙ্গবঙ্গ সমাজের

৪০। তদেব।

ইংরেজিআনা-র উৎকটতা না থাকলেও এই নূতন জীবন-ব্যবস্থা ছিল না-ইংরেজি, না-বাঙালি। এর প্রধান কারণ কর্মপ্রয়োজনের তাড়নায় বা অন্যান্য উপলক্ষ্যে নাগরিক বাঙালি-পুরুষের কিছু কিছু যোগ সুবৃহৎ দেশীয় সমাজের সঙ্গে গড়ে উঠতে পারছিল; কিন্তু নারীসমাজে স্বদেশীয়তার সঙ্গে সে যোগ ঘনিষ্ঠ হতে পারল না। অর্থাৎ, দেশীয় ঐতিহ্যের পীঠভূমি গ্রামীণ কিংবা মফস্বলের সমাজ থেকেও এঁরা ছিলেন, বিচ্ছিন্ন। ঠাকুরমা-দিদিমাদের আচার-আচরণে দেশীয়তার যে আবহাওয়া বইত, নতুন শিক্ষার হাওয়া-লাগা 'মা'য়েদের যুগে তা প্রচ্ছন্ন বিবর্ণ হতে শুরু করেছে। আর মেয়ে যাঁরা ইংরেজি শিখলেন, তাঁরা বিমিশ্রতাচ্ছন্ন পরিবারের সীমায় ইংরেজি সামাজিকতার স্বপ্নজগৎ গড়তে লাগলেন। তারপরে নারীশিক্ষা যখন আরো ছড়িয়ে পড়লো, তখন দেখা দিল নতুন সমস্যা;—মধ্যবিত্ত বাঙালি সামাজিকতার ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন-পাওয়া ইংরেজি শিক্ষার সম্পর্কে ভারসম সামঞ্জস্য গড়ে তোলার সমস্যা।

সেই ভারসমতা-বোধের প্রসন্ন স্নিগ্ধতা নিয়েই শান্তাদেবী ইঙ্গবঙ্গ সমাজের অ-সমঞ্জস জীবনযাত্রার কৌতুকচিত্র আঁকলেন 'ময়ূরপুচ্ছ' গল্পে। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের 'ফিরিঙ্গিয়ানা' যে কত কৃত্রিম এবং অচিরস্থায়ী,—দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ ধারণের মত কত হাস্যকর,—তারই কৌতুককর ছবি এঁকেছেন লেখিকা: "মেয়েকে ইংরেজি ইস্কুলে ভর্তি করবার সময়ে হরিহরবাবু ভাবেননি যে, তাঁর কপালে অকস্মাৎ এমন একটি জামাতৃরত্ন জুটে যাবে। তাই তিনি সে সময় মস্ত বড় সংস্কারক হয়ে ইঙ্গবঙ্গকে হারিয়ে দেবার মতলবে কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছিলেন। কিন্তু এমন সময় সৌম্যদর্শন ইন্দুভূষণ উদয় হয়ে তাঁর ম্লেচ্ছলোকে প্রয়াণ মাঝ পথে থামিয়ে দিল।" কারণ ইন্দু হরিহরের 'স্বজাতি পাল্টা ঘর, বুদ্ধিমান্, সুপুরুষ এবং সর্বোপরি ধনীর দুলাল।' সুতরাং হরিহর মনু-পরাশরের মাহাত্ম্য নূতন করে আবিষ্কার করলেন, এবং লিলির বাল্যবিবাহ হল অবশ্যম্ভাবী।

"হরিহর বয়স হবার পর সংস্কারক হয়েছিলেন, এবং অন্যপথে সুবিধা দেখে যাবার দ্বিতীয় কিস্তি সংস্কার করতেও ত্রুটি করলেন না। কিন্তু কন্যা লিলি মায়ের কোলে বসে যেসব শিক্ষা পেয়েছিল বাপের এক কথাতেই তা ঝেড়ে ফেলতে তার বেগ পেতে হয়েছিল।" ফিরিঙ্গিআনাকে বাঙালিআনায় পুনর্বাসিত করে পূর্ণ বাঙালিরূপ রচনায় যে চিত্ত-বিক্ষেপ ও সাময়িক বিভ্রাট লিলির জীবনে ঘটেছিল, তারই একটি হাস-স্নিগ্ধ চিত্র আঁকা হয়েছে এই গল্পে; লেখিকার নিবিড় আন্তরিকতা ও গভীর দূরদৃষ্টির স্পর্শে যা নিছক কৌতুক-গল্পেই পর্যবসিত হয়নি। অথচ প্রসন্ন অন্তঃকরণের সহৃদয়তা বক্তব্যকে বিশুদ্ধ তত্ত্ব-কথাতেও পরিণত হতে দেয়নি।

সার্থক বাঙালিত্বের সঙ্গে ইঙ্গবঙ্গ সমাজের দূরত্ব যে মূলহীন তরুর মত কৌতুককর,

লিলির জীবন-চিত্রে সে ছবি শিল্পী নিবিড়ভাবে এঁকেছেন। সেকালের বৃহত্তর বাঙালির জীবন-সমুদ্রে কলকাতার সমাজ যেন ছিল এক ছন্নচাড়া দ্বীপ ; দেশের নাড়ির সঙ্গে, তার যথার্থ শোভা-সৌন্দর্যের সঙ্গে কলকাতাবাসী ইঙ্গবঙ্গদের কোনো যোগ ছিল না। দেশ কেবল কতকগুলি ইট্-কাঠ, মাটি-পাথর, গাছ্-পালার জড়পিণ্ড নয়। প্রতি দেশেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেই বিশিষ্টতার সৌন্দর্যে তার আকাশ-বাতাস, বন-প্রান্তর লোকালয় নিমগ্ন হয়ে থাকে, —বয়ে আনে আশ্চর্য মাধুর্যের সৌরভ। এই প্রাণ-জুড়ানো সুরভির স্নিগ্ধ স্পর্শের গুণে দেশবাসীর মনে দেশের ভৌগোলিক অস্তিত্ব মাতৃরূপের মধুরিমা নিয়ে দেখা দেয়। সেই সশ্রদ্ধ অনুভবের সীমায় ক্রমে ক্রমে পুঞ্জিত হতে থাকে দেশের রুচি, ঐতিহ্য, জ্ঞান-সম্পদের প্রখর মর্যাদাবোধ ; ধীরে ধীরে দেশবাসীকে দেশের নাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে নেয় আস্টেপৃষ্ঠে,- মাতৃগর্ভের সন্তানটির মত। ইঙ্গবঙ্গ সমাজ যে মায়ের নাড়ির বাঁধন ছিঁড়তে পেরেছিল, তার কারণ দেশের বস্তু-রূপের যথার্থ মধুরিমাও যে তাদের অন্তর স্পর্শ করেনি !

লিলির বিয়ে হয়েছিল মেদিনীপুরের এক মফঃস্বল শহরে,—যেখানে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াবার প্লাট্‌ফর্‌মটি পর্যন্ত অনুপস্থিত। বিয়ের পরদিন এমন ভিন্‌দেশী শ্বশুর দেশে চলেছে লিলি,—"হাওড়া স্টেশন ছাড়িয়ে কত কলের চিম্‌নি, পানাপুকুর, বাগানবাড়ি, ধোপার আড্ডা, টিনের ছাদ দেওয়া মস্ত মস্ত কারখানা লিলির চোখের উপর দিয়ে স্রোতের মত ছুটে চলে গেল, কিন্তু সেদিকে তাকাবার তার অবসর হল না। ক্রমে মানুষের হাতে গড়া পৃথিবী প্রকৃতির সৃষ্টির সঙ্গে কোলাকুলি করে মিশে গেল। চিম্‌নির ধোঁয়া আর পচা পুকুর, খোলামাঠ আর শালবনের দেখা পেয়ে ভয়ে কোথায় লুকিয়ে পড়ল। লিলির জীবনে এমন দৃশ্য সে কোনদিন দেখেনি। ট্রামের লাইন, সাহেবী দোকান আর পাথরের বীর মূর্তির বোঝা বুকে করে যে গড়ের মাঠ শহুরে মানুষকে হাওয়া খাওয়ায়, সেই ছিল লিলির জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রান্তরভূমি, আর ইডেন গার্ডেন তার প্রকৃতির লীলা-নিকেতন।"

লিলি এখানে কেবল একটি ব্যক্তি নয়, ইঙ্গবঙ্গ সমাজের সে প্রতিভূ। এঁরা দেশ-দেখা চোখ হারিয়েছিলেন বলেই দেশীয়তার প্রতি বিমুখ হতে পেরেছিলেন।

নিতান্ত কলকাতার কাছের মূল প্রাকৃতিক প্রচ্ছদেই যেখানে এমন অকৃত্রিম অপরিচয়ের সুর, অনেক দূরের মফঃস্বল শহরের 'অশিক্ষিত' নারী-সমাজ, আর তাদের চাল-চলন, আচার-বিশ্বাস তো তখন আগাগোড়া বিপরীত হতে বাধ্য। এমন অবস্থায় নববধূকে দেখে শ্বশুরবাড়ির শিশুরাও মহাভাবনায় পড়েছিল,—এ 'মেমসাহেব না মেয়েমানুষ !' আর লিলিরও বিমূঢ়তার অবধি ছিল না। কিন্তু এ-সব পার্থক্য কখনো বিরোধে আঘাতে তিক্ত হতে পারেনি ;—কারণ উভয় পক্ষে প্রাণের যোগসূত্র ছিল প্রেম আর স্নেহের

প্রাণময় আধার,—ইন্দুভূষণ। ফলে, পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত সমাজেও লিলির মানসিক পুনর্বাসন অসম্ভব হল না। "শ্বশুরবাড়ির মেয়াদ শেষ করে লিলি যখন ফিরে গেল, তখন আর সে পল্লীশাস্ত্রে অনভিজ্ঞা বিবি-বউ নয়। লিলি তখন অনেক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে। কার নামের বিষ জিহ্বা স্পর্শ করতেই যে চক্ষু দুটি যায়, আর কার কাপড়ের আঁচলের বাতাসেই যে মাথায় অনন্ত নরক এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, তা লিলি গড়গড় করে বলে যেতে পারত। শ্বশুর সম্পর্কীয় সকলে প্রণম্য হয়েও মামাশ্বশুর যে কোন্ পাপে একেবারে অস্পৃশ্য তা সে না বুঝলেও জ্ঞানটা লাভ করেছিল। আবার যে নামের মহিমায় প্রতিদিন দুধভাত বরাদ্দ পাওয়া যায়, সেই স্বামীর নামও যে ত্যাজ্য, তাও সে শিখে ফেলেছিল।"

কৌতুককর বাচনভঙ্গীর মাধ্যমে সংস্কার-অন্ধ বাঙালিআনার এক জীবন্ত ছবি এঁকেছেন এখানে লেখিকা। তাঁর সহৃদয়তার স্পর্শে এ চিত্র কোথাও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা caricature-এ পরিণত হতে পারেনি। অথচ, এই সব অন্ধ আচার-আচরণের ভেতরকার কৌতুকজনক অসংগতিও কোথাও ঢাকা পড়েনি। কেবল ফিরিঙ্গিআনা নয়, অন্ধ বাঙালিআনা-ও যে হাস্যকর, তার অসংস্রাত ইঙ্গিত রয়েছে এখানে। জ্ঞানহীন ভক্তি বন্ধ্যা, আর ঐতিহ্য-ভক্তিহীন জ্ঞান জীবন-প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মৃত। প্রাচীন ঐতিহ্যভক্তির সঙ্গে নবান্বিত জ্ঞানের পুনর্বাসনের মধুমঙ্গলময় ইঙ্গিত নিয়ে এই গল্প শেষ হয়েছে। অবশ্য দেশী কাক হয়ে বিদেশী ময়ূরপুচ্ছ ধারণের অসংগতির প্রতি কটাক্ষই রয়েছে বেশি,—গল্পের নামকরণও এই রস-ফলশ্রুতি ঘোষণা করে।

কিন্তু বাঙালি নারীর ইংরেজি শিক্ষার ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি নিছক কৌতুককর নয় কিছুতেই। প্রারম্ভিক পর্যায়ের অল্প-বিস্তর অসংগতি ও অসামঞ্জস্যকে ছাপিয়ে এদেশের নারী-জীবনে মানবিক মর্যাদাবোধের অকল্পনীয় সম্পদ সে বয়ে এনেছিল। আত্মপ্রসারেই মানুষের আত্মার মুক্তি। আর সে বিস্তারের জন্যে সকল সময়েই বৃহৎ বা মহৎ কর্মের ক্ষেত্র অপরিহার্য নয়। মানুষের আত্মার প্রসার ঘটে অপরের মধ্যে, বহুর মধ্যে নিজের আত্মাকে ছড়িয়ে দিতে পারার ক্ষমতায়। উপনিষৎ বলেছেন,—"ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।"—পুত্র মার প্রিয়, কারণ পুত্রের মধ্যে মা তাঁর আত্মার একদাসুপ্ত শক্তিকে সজীব করে অনুভব করেন;—অনুভব করেন,—তাঁর দেহ দিয়ে ঐ নবীন প্রাণের আধার নতুন দেহ গড়ে উঠেছে,—তাঁরই দেহের মেদ-মাংস-অস্থিমজ্জা নিয়ে গড়ে উঠেছে ঐ মহৎ প্রাণের শরীর,—তাঁরই প্রাণের শিখা ঐ নূতন প্রাণে জীবনের তাপ আর উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করেছে। আসলে সন্তানের মধ্য দিয়ে জননী নিজেকেই আবার সৃষ্টি করেন, নিজের আত্মায় লীন আত্মার মাধুরীকে

পৃথক্ করে করেন আস্বাদন। সব ভালবাসার,—মানুষের সকল মুমুক্ষুতার মূলগত সত্য এইটি,—আত্মার বিস্তারেই আত্মার আনন্দময় পরিণাম।

আর আত্মার এই অপরিহার্য প্রসারের জন্যে প্রয়োজন আত্মার সংহতি,—পরিপুষ্ট আত্মজ্ঞান। যাকে বাড়িয়ে আমি বাড়ি,—তাকে না চিন্‌লে বাড়াব কি করে! তাই আমাদের ধর্মশাস্ত্রেরও নির্দেশ—নিজেকে জান,—'আত্মানং বিদ্ধি'। ভারতবর্ষের নারী-সমাজ দীর্ঘদিন সংকীর্ণতার অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল; তার কারণ এ নয় যে, ভারতবর্ষে নারী চির-অন্তঃপুরচারিণী। তার কারণ, নারীর অশিক্ষা আর অজ্ঞানতা তাঁর কর্মক্ষেত্রকে কেবলই সীমিত, দীনহীন করে তুলেছিল। যথার্থ জ্ঞানের অভাবে নারী তাঁর আত্মার স্বরূপ অনুভব করতে না পেরে হয়েছিল পুরুষের সেবাদাসী,—অন্তঃপুরের প্রেম-স্নিগ্ধ পুণ্য অঙ্গন এই দৈন্যের কালিমালিপ্ত হয়ে হয়েছিল জীবনের অন্ধ কারাগার।

নারী-হৃদয়ের অন্ধ কারাগারে মুক্তির আলো নিয়ে এলো য়ুরোপের জ্ঞান-ভাণ্ডার,—তারই মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের নারী,—সেকালের বাঙালি নারী আত্মজ্ঞান লাভ করলো,—চিন্‌ল নিজেকে। ফলে তার জীবন দেওয়া-নেওয়ার সাধনাও হল বিচিত্র জটিল। পুরুষের জীবনে নারীর প্রতিষ্ঠা অন্নপূর্ণার সিংহাসনে,—সব দিয়ে সফল হতে পারার পূর্ণতাতেই তার সার্থকতা। কিন্তু পুরুষের জীবনে সেই যথার্থ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা না পেলে নারীর জীবনে যা ঘটে, তা আসলে দানের নামে লুণ্ঠন। নারীর নতুন শিক্ষা তার আপন সত্তাকে বুঝতে শেখালে এবারে,—দান করা আর কেড়ে নিতে-দেওয়া এক কথা নয়। এই শিক্ষার দাক্ষিণ্যেই সে জেনেছে,—অতদিন অজ্ঞানতার অন্ধকারে ফেলে পুরুষ-প্রধান সংস্কার-অন্ধ সমাজ তাঁর মনের নিঃস্বতার ঘরে সতীত্বের নামে ডাকাতি আর রাহাজানি করে ফিরেছে। রিক্তকে করেছে চূর্ণ,—নিজেকেও রেখেছে চির-অতৃপ্ত। এবারে ঘরে-পরে দুজনকেই বিনষ্ট হতে না দিতে নারী হল দৃঢ়পরিকর। নারীর লেখা বাংলা গল্পে তার ফলশ্রুতি দুই নতুন না-জানা পথের সংকেত বয়ে নিয়ে এল। একদিকে সত্ত-সচেতন মন নিয়ে নিজের আত্মপরিচয়ের রহস্য সন্ধান,—যে রহস্য, জ্ঞানিজনেরা বলেছেন, দেবেরও অজ্ঞাত। সে এক অপার বিস্ময়ের অচেনা মধুরিমার জগৎ যেন মুহূর্তে অনাবৃত হয়ে গেল! আর একদিকে রইল, সেই নবজাগ্রত মর্যাদাবোধের আকাঙ্ক্ষায় উৎকণ্ঠিত ব্যক্তিত্বের দৃঢ়-প্রখর জ্যোতি। 'সিঁথির সিঁদুর' গল্পে শান্তাদেবী নারী-হৃদয়ের এই অজ্ঞাতপূর্ব জগতে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন বাংলাদেশের গল্প পাঠককে।

কুমারী জীবনের উৎকণ্ঠা-উল্লাসে উজ্জ্বল-দৃষ্টি নিয়ে সমাগত-প্রায় বিবাহ-চিন্তার নিভৃত মধুর স্বরূপ অঙ্কন করে গল্পের নায়িকা সাগরিকা তার ডায়েরিতে লিখেছে,—"উনি ত এলেন বলে। আমি কারুর কাছে কোনদিন উনি বলিনি, কিন্তু কথাটা যে আমার

কেবলই বলতে ইচ্ছে হয়; মুখে বল্‌তে যখন বাধে তখন কলমের মুখে তোমার [ডায়েরি] কাছেই বলে যাচ্ছি। আনন্দ হচ্ছে কি না কেউ যদি আজ আমায় জিজ্ঞেস করে, তার উত্তরে যে আমি কি বল্‌ব, তা আমি নিজেই খুঁজে পাচ্ছি না। আমার সমস্ত মন কিসে যে ভরে উঠেছে, সে কি সাগরের জল, না স্বর্গের সুধা, তা আমি জানি না। দুঃখ আমায় বানের মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, না সুখের অতল তলে আমি ডুবে যাব, তাত বলতে পারছি না। কিন্তু মনে হচ্ছে ধূপারতির মাঝখানে সন্ধ্যায় মন্দিরে যেমন দেবতার বিগ্রহ আব্‌ছায়া আব্‌ছায়া দেখা যায় তেমনি যেন আমার সমস্ত সুখ-কল্পনার ছায়া-লোকের মাঝখানে কার মুখজ্যোতি ধীরে ধীরে ফুটে উঠ্‌বে। এই যে-জগতে আমি খাই-দাই, ঘুরি-ফিরি, সে-জগৎটা যে ঠিক তেমনই মাটির ধরণীর মত থাক্‌বে, এটা মানতে আমার ইচ্ছে করছে না! জানি, পৃথিবীটা আমার জন্যে এক নিমিষে বদলে যাবে না, কিন্তু আমার মনোলোকে যে নূতন জগতের সৃষ্টি হবে তার আশাতেই আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠেছি। কিন্তু, ভয় হচ্ছে, ছায়া-লোকের কল্পনা হয়ত ছায়ার মতই মিলিয়ে যাবে।"

নারী-মনের গোপন কক্ষে প্রবেশাধিকার লাভের এই স্বাদুতা বাংলা সাহিত্যে অপূর্ব। বাঙালি-কন্যার চিরাবহ সামাজিক বিবাহে এ-ধরনের অনুভব একেবারে দুর্লভ হয়ত ছিল না। অর্থাৎ, 'গৌরীদানে'র যুগে বালিকা কন্যার অন্তঃকরণ হয়ত পুলকের চেয়ে ভয়েই ছেয়ে যেত বেশি,—কিশোরীর বিবাহ-প্রথা যখন চালু হয়েছে, তখন থেকে হয়ত কিছু ভয়,—কিছু পুলকে কম্পিত-রোমাঞ্চিত হয়েছে নারীর অসংজ্ঞাত চেতনা। কিন্তু তার অ-সচেতন মনে সে-অনুভব যেমন ছিল অস্পষ্ট, তেম্‌নি তার প্রকাশও ছিল অসম্ভব। নতুন যুগে শিক্ষিত নারীর আত্ম-অন্বীক্ষা বচন-সীমার পক্ষে অস্পষ্ট গোপন অনুভূতিকে দিয়েছে অনির্বচনীয়তার স্বাদ। নারীর চোখে নারীর সংজ্ঞাত গোপন মনকে দেখ্‌তে দিয়েছে এই শ্রেণীর গল্প।

তারপরে ধাপে ধাপে চলেছে বিবাহিত জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার নির্মোক মোচন;—নারীব্যক্তিত্বের অমর্যাদা ও পরাভবে দিনে দিনে হয়েছে সে অনুভবের রক্ত-স্নান। সাগরিকার পক্ষে অসহ্য হয়েছিল আত্মার সে অপমান।—তাই, স্বামীর ঘরে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিনী যাকে দেখ্‌ছিল,—একদিন যখন জানতে পারলো সে আসলে স্বামীর রক্ষিতা,—সেদিন স্বামীর সাম্‌নে সিঁথির সিঁদুর মুছে হাতের নোয়া খুলে ফেলে প্রকাশ্য দিবালোকে সে বেরিয়ে এল মস্ত বড় ধনী-মানী শ্বশুরঘর থেকে। ঠাকুরঝি রাগ করে লিখেছিল,—"...এইটুকু জেনো যে, যার কলঙ্ক অমন স্বচ্ছন্দে রটিয়ে তেজ দেখালে, যার অপমানের কথা একবার ভাবলে না, যার মুখের দিকে একবার তাকালে না, সে তোমারই

স্বামী, তোমারই সর্বস্ব। তার অপযশে তোমারই সবচেয়ে বড় অপযশ। সতী মেয়ে স্বামীর এমন অপমান করে না।"

সাগরিকা তার ডায়েরিতে লিখেছে,—"ভাবছিলাম ঠাকুরঝিকে লিখি—আমার স্বামী কোথায় যে তার মান রাখব ? থাকলে যে তুষের আগুনে পুড়োলেও তার মানের গায়ে ছুঁচ ফোটাতে দিতাম না!"

অধিকারের সহজ মর্যাদা পেতে পারলে তবেই দান তার মহিমাময় যথার্থ মূল্য অর্জন করে, এই সত্যের সার্থক ব্যঞ্জনা নিয়েই গল্পের অবসান হয়েছে। একই ধরনের আর একটি সফল গল্প রয়েছে 'পিতৃদায়',—যদিও তার দেহ-অবয়বের মত ট্রাজিক বুনন-ও আরো পিনদ্ধ সংহত ;—তার অবসান যেন নাটকীয়তাময় তীব্রতায় ভরা। এক দরিদ্র-কন্যাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল এক রক্ষণশীল ধনি-পরিবারের বুদ্ধিদীপ্ত সন্তান অরুণ। কিন্তু পারিবারিক নিয়মভঙ্গ ও মর্যাদা হানির অভিযোগে পুত্র গৃহচ্যুত হল,—বধূ অলকাও স্বামিহীন শ্বশুরগৃহে দয়ার অন্ন ভুমুঠো খেয়ে বাঁচতে চাইল না,—ফিরে এল পিতৃগৃহে। দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে অরুণ প্রেমের প্রতি,—প্রেমাস্পদা পত্নীর প্রতিও বিমুখ হল। অবশেষে একদিন যখন পিতার দাক্ষিণ্য আবার সে ফিরে পেল,—তখন ছুটে এল অলকাকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু অরুণ পিতার ক্ষমা পেয়েছে, তাই বলে অলকা তো 'পিতৃদায়' মোচন করতে পারেনি।— অর্থাৎ ধনিগৃহের উপযোগী বসন-ভূষণে সজ্জিত হতে পারেনি আপন পিতার অর্থে। অথচ এই কারণেই আসলে ঘটেছিল তার অত নির্যাতন। তাই সে স্বামিগৃহে ফিরে যেতে চাইল না,—স্বামীর দেওয়া অলঙ্কার দিলে ফিরিয়ে। যে প্রেম দুঃখের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি, সুখের দিনে তাকে বিলাসের সামগ্রী করে তোলার অপমান বরণ করতে পারে না এ কালের আত্মজ্ঞান-দীপ্তা নারী,—কারণ সে-পথে আত্মার প্রসার যে রুদ্ধ হয়, -হয় সংকীর্ণ!

ইংরেজের শিক্ষা আরো বিচিত্র পথে মুক্ত—প্রসারিত করেছে আমাদের মনকে ; নারীর পাতিত্য সম্পর্কিত অন্ধ সংস্কারের মূলেও করেছে কুঠারাঘাত। রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্পের পরে 'ভারতী'গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যেও তথাকথিত পাতিত্যের প্রতি নতুন মমতাময় বিচার-বুদ্ধির বিচিত্র বিকাশ লক্ষ্য করা গেছে। আর শরৎচন্দ্র এই জীবনদৃষ্টিকে টেনে নিয়েছেন বহুদূর মুক্তিদিগন্তে। অতএব এ-কিছু নতুন কথা নয়। এমন কি বারবনিতার অপাপ-বিদ্ধা কন্যার পক্ষে পূজার ফুলটির মতই দেবমন্দিরে প্রতিষ্ঠালাভের চিত্রেও অভিনবতা না থাকতে পারে, কিন্তু 'সুনন্দা' গল্পের সুনন্দা নারীপ্রেমের,—নারী-ব্যক্তিত্বের মুক্ত মূর্তির আবরণ মোচন করেছে এক অকল্পনীয় অভিজ্ঞতার জগতে।

মাধবপুরের একমাত্র-পৌত্রসর্বস্ব বৃদ্ধ জমিদার অযাচিত পরিবেশে এক বারবনিতার

তিন বছরের কুসুম-কোরক কন্যার লালনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কালে কালে সে বৃদ্ধের অন্তরে নাতিনীর স্নেহ-মর্যাদার আসনটিতে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একদিন বৃদ্ধের নাতি শংকরপ্রসাদের হৃদয়-গভীরেও দেবীর সিংহাসন পেয়েছিল সে। তাই সর্বস্ব ত্যাগ করতেও বাধল না তার,—বৃদ্ধ দাদামশায়ের মৃত্যুশয্যার পাশে বসে প্রতিজ্ঞা করতে বাধল না,—সারাজীবন ধরে নিজের হৃদয়ের শ্বেত পদ্মটিকে স্বেচ্ছাকৃত ত্যাগের ছুরি দিয়ে কুচিকুচি করে কাটবে,—তিলে তিলে,—দিনে দিনে,—যতদিনে না রক্তাক্ত সে হৃদয় মৃত্যুর অন্ধকার সমুদ্রে তলিয়ে যায়। দাদামশায়ের মৃত্যুর আগে সে জেনেছিল তার আত্মপরিচয়,—জেনেছিল শংকরের প্রাণের পরিচয়ও! আর জেনেছিল,—দাদামশায়ের মুখে সুনন্দার পরিচয় পেয়েও দাদামশায়ের উপদেশ শংকর মান্‌তে পারেনি। অত যে পেয়েছে,—সব পেয়ে সে কি সব দিতে পারে না! সুনন্দা তাই দিয়েছে,—সব পেয়ে সবেরও বেশি দিয়েছে। নারী-শিল্পীর হাতে নারীমনের সেই অতলান্ত রহস্য-সমুদ্রের গভীরে প্রবেশ করতে করতে বিস্ময়ে বিমূঢ় হতে হয় মাঝে মাঝে। বিশেষ করে সুনন্দার চেতনার অশ্রুসাগর মন্থন-করা জোর করা মুখের হাসির রহস্য-পরিচয় আবিষ্কার করে।

আর এই অভিনব নবীন নারী-মনোরূপায়ণের সাধনায় লেখিকা তাঁর গল্পের theme-এর মত গল্প-শরীরের scheme সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের মহিলা-গাল্পিকদের মধ্যে এমন পরিচ্ছন্ন আঙ্গিক-চিন্তা এর আগে চোখে পড়ে না বড় একটা। শান্তাদেবীর গল্প নিছক বর্ণনা নয়,—কিংবা নারীহৃদয়ের গল্প বলার সহজ আর্টও এ নয়। প্রতিটি গল্পের রূপ শিল্পীর পরিচ্ছন্ন চিন্তার ফল। কোনো গল্প প্রকাশিত হয়েছে ডায়েরি-র আকারে ('সিঁথির সিঁদুর')—কোনোটির গল্প-শরীর চিঠির অবয়বে গাঁথা ('সুনন্দা'),। 'পিতৃদায়'-এর মত যে-সব গল্প কাহিনীর আকারে বিন্যস্ত, তাতেও সুমিত এবং সুকল্পিত বাক্-রীতি যথাযোগ্য effect সৃষ্টি করেছে; 'ময়ূরপুচ্ছ'এর উদ্ধৃত বিভিন্ন অংশ একথার স্পষ্ট প্রমাণ। ফলে, নারীবৃত্তির সহজাত emotion-এর অতিস্ফীতিকে সুচিন্তিত সংযমে নিয়ন্ত্রিত করা যে পরিমাণে সম্ভব হয়েছে, শান্তাদেবীর গল্পের আর্ট-ফর্ম্ হয়েছে, ততই স্বচ্ছ—প্রাঞ্জল। স্থানে স্থানে স্বভাব বশেই আবেগ যখন অনায়াস মুক্তি পেয়েছে, তখন কাব্যগন্ধী ভাবণকে কেমন যেন অতি-কাব্যিক মনে হয়:—সুনন্দার বর্ণনা প্রসঙ্গে শিল্পী বলেছেন,—"গায়ের রং তার শাঁখের মত শাদা; রক্তের লেশ তাতে বড় দেখা যেত না। কোন্ গোপন গভীর দুঃখে এই জলদেবীটি তাঁর রহস্যময় জলরাজ্যে বুকের ভিতর থেকে উঠে এসে নিস্তব্ধ ধরণীর এই নিরালা কোণটিতে একলা ভোরের বাতাসে তাঁর বেদনার ভার লঘু করে যেতেন, তা মানুষে দেখ্‌লে বুঝ্‌ত কি না কে জানে?"—শিল্পীর

পক্ষে এ বর্ণনা যেমন অক্লেশ-সাধ্য নয়, পাঠকের পক্ষেও এর আবেদন তেমনি নয় ক্লান্তিহীন।

এ ধরনের অতিকাব্যিকতা কিছু কিছু থাকলেও শান্তাদেবীর সার্থক গল্পগুলি তাদের স্নিগ্ধ সুমিতির প্রাচুর্যে রসমধুর হয়ে আছে,—আর 'সুনন্দা' সেই গল্পেরই একটি। প্রারম্ভিক অতিকাব্যিকতার এক-আধটু ত্রুটি তার অপরূপ শিল্পশৈলীর পরিণামী আবেদনের ওপরে ধুলি নিক্ষেপ করতে পারেনি। কেবল গভীর-গম্ভীর বিষয়ে নয়,—ছোটখাটো মিস্টি গল্পও লিখেছেন শান্তাদেবী ;—নিছক গল্প বলার গুণেই যারা মিস্টি। 'বধূবরণ' সংকলনের 'ফুটকি', 'ভুটকি' প্রভৃতি এই ধরনের সার্থক নিদর্শন। বাক্‌রীতি ও বিন্যাসের সজ্ঞান কলাকৌশলই 'ফুট্‌কি'র মত সাধারণ গল্পকেও একটি সার্থক গল্প করে তুলেছে।

এঁর গল্প সংকলনের মধ্যে আছে—'ঊষসী' (১৩২৬ সাল), 'সিঁথির সিঁদুর' (১৩২৭), 'বধূবরণ' (১৩৩৮), 'পথের দেখা' (১৩৫১), 'দেয়ালের আড়াল' (১৩৫৮) ইত্যাদি।

সীতাদেবী

গল্পের চেয়ে উপন্যাসের প্রতিই সীতাদেবীর প্রবণতা ছিল বেশি ;—যেমন শান্তাদেবী উপন্যাসের তুলনায় গল্প বেশি লিখেছেন,—সংখ্যায় এবং গুণেও। সীতাদেবীর গল্পগুলো আসলে ছোট উপন্যাস না হলেও আকারে বড়। আর সে বড়ত্বের মধ্যে ছোটগল্পের সংহতির চেয়ে উপাখ্যানের বিস্তার ছিল বেশি। অনেক জটিলতা, অনেক বৈচিত্র্যে-ভরা জীবনের অভগ্ন সম্পূর্ণ ঔপন্যাসিক রূপ নেই তাঁর গল্পে কোথাও ; তবু একটি-দুটি জীবনের দু'একটি episode-কেও অনেক ছড়িয়ে খুঁটিনাটি বিস্তারিত করে বলেছেন। ফলে, গল্প জমে উঠেছে,—দুটি-একটি খুব রস-স্নিগ্ধ গল্প! তা ছাড়া আরো অনেক কয়টিই সরস উপাখ্যান বা tale-এর পর্যায় অতিক্রম করতে পারেনি।

সীতাদেবীর ঐ সব গল্পে ঠিক সমকালীন নারীজীবন-সমস্যার কোনো বিশেষ ছায়াপাত ঘটেছিল, এমন কথা বল্‌বার উপায় নেই। তাহলেও, তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি সার্থক গল্পই নিজেকে হারিয়ে-খুঁজে-পাওয়া চিরন্তনী নারীর আত্ম-উন্মোচনের কাহিনী। রূপকথাধর্মী গল্প 'আলোফুল' আসলে নারী-জীবন-বাসনার সার্থক সংকেত-বহ। গল্পের শেষে অরূপবাণী আলো-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন,—"...তোমার এত দুঃখের ধন ত তোমার কাছে রইল না, সে ত পরে নিয়ে গেল!" আলো বলেছিল, "পরকে দিতে পেরেছি বলেই ত আমার দুঃখও সার্থক হয়েছে।"

'দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়' যে নারী 'দলিত দ্রাক্ষা সম' আপন হৃদয় নিঙড়ে ভালবাসার বেদীতে চিরদিন অঞ্জলি রচনা করে চলেছে,—সেই 'শাশ্বতী' সীতাদেবীর

সফল গল্পের নায়িকা। 'আলোর আড়াল' গল্পে এক আশ্চর্য কান্তিমান্ রূপ-তৃষ্ণাতুর জমিদার যুবকের আকস্মিক অন্ধতা, কুৎসিৎ-রূপা মলিনার সঙ্গে তার বিবাহ,—কুরূপার অসাধ্য-সাধনের দৃঢ় ব্রতে অবিচল প্রাণের পাত্রে নবজীবনের অমৃত পান করে অন্ধস্বামীর চরিতার্থতা,—পুনরায় তার চক্ষুলাভ ও কুরূপার প্রতি ঘৃণাকুঞ্চিত দৃষ্টিক্ষেপ,—মলিনার স্বামিগৃহত্যাগ এবং অন্ধ হাসপাতালে সেবিকার কর্মগ্রহণ,—সেখানে পুনরায় চক্ষুহীন স্বামীর সঙ্গে স্থায়ী মিলন,—গল্পের কথাবস্তু এইটুকুই।

পুনর্মিলনের সেই অনুভব ব্যক্ত করে মলিনা বলেছে,—"কিন্তু ওগো, চিরকাল আমার ত ফুলের সঙ্গে কাঁটা গাঁথা রইল। তিনি আমার জন্যে চোখ দিলেন, আর আমি তাঁর সেই ব্যথার মধ্যে আমার হারা আনন্দকে ফিরে পেলুম। এ যে সাপের মাথার মণি। বিষে গা জ্বলে গেল, কিন্তু মণির আলোয় সে দুঃখকেও যে না ভুলে পারলুম না।"

গল্পেরও শেষ হয়েছে এইখানে। আর সীতাদেবীর গল্পের ভাব-বিষয়ও এখানে সার্থক পরিস্ফুট হতে পেরেছে,—সব দিয়ে সব হারিয়ে বসে থাকার, অথবা অনেক হারিয়েও অনেক পাওয়ার আনন্দ-বেদনার অতল-পাথার থেকে নারী-হৃদয়ের রহস্য-গোপন সুরভিটুকু আহরণ করে এনেছেন,—'চোখের আলো' আর 'আলোর আড়াল' দুটি গল্পে এই দুই সত্য যথাক্রমে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রকাশশৈলীতে শান্তাদেবীর সুচিন্তিত রূপ-বিন্যাসের আকাঙ্ক্ষা নেই এঁর রচনায়,—নারী-হৃদয়ের সহজাত অবেগময়তাও উচ্ছ্বসিত হতে পারেনি কোথাও। একটি নিরাবেগ মমতা-স্নিগ্ধ নারী-ব্যক্তিত্বের লালনে গল্পগুলিতে অতিকাব্যিকতা-রহিত নাতিমৃদু কবিতার সৌরভ যেন ছড়িয়ে আছে। প্রকাশের এই বৈশিষ্ট্য যেখানে নিরবচ্ছিন্ন সচ্ছন্দ গতি পেয়েছে,—সেখানেই গল্প-বলা হৃদ্য হয়েছে।

সীতাদেবীর গল্প সংকলনের মধ্যে রয়েছে—'বজ্রমণি' (১৩২৬), 'ছায়াবীথি' (১৩২৬), 'আলোর আড়াল' ইত্যাদি।

শৈলবালা ঘোষজায়া

শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪) শান্তা ও সীতাদেবীর মতই 'প্রবাসী' পত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। 'প্রবাসী'র গল্প প্রতিযোগিতায় ১৩২২ বাংলা সালে ইনি পুরস্কৃত হয়েছিলেন। তাঁর চাঞ্চল্যকর উপন্যাস 'সেখ আন্দু'-ও একই বছরের 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শৈলবালার প্রতিষ্ঠা তাঁর কলাকুশলতার বৈশিষ্ট্যে নয়, বৈপ্লবিক দৃষ্টির দুঃসাহসিকতায়। 'সেখ আন্দু' উপন্যাসে তার চরম প্রকাশ মুসলমান ড্রাইভার এবং হিন্দু মনিব-কন্যার প্রণয়-কাহিনীর মাধ্যমে।

দৃষ্টিভঙ্গীর এই দুঃসাহস তাঁর গল্পে তেমন প্রখরভাবে প্রতিফলিত হয়নি। কিন্তু তথাকথিত অন্ত্যজ, দরিদ্র, অশিক্ষিত মানুষের দেহ-মন-চরিত্রের অনপনেয় দুর্বলতার প্রতি লেখিকার মানবিক সহৃদয়তার পরিচয় গোপনও থাকেনি কোথাও। 'আয়েসা' গল্প এই তথ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাছাড়া 'মনীষা', 'আদেশ পালন', 'রুদ্রকান্ত' ইত্যাদি গল্পেও অবনমিতের প্রতি তাঁর তপ্ত সহানুভূতির স্পর্শ জীবন্ত। কিন্তু লেখিকার দৃষ্টিতে যে দুঃসাহস ও অভিনবতা ছিল, সৃষ্টিতে তার উপযুক্ত শৈল্পিক পরিণতি ছিল না। তবু তাঁর এই সহৃদয় জীবন-চিন্তন পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যকে বহুল প্রভাবিত করেছিল। এই কারণে বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে শৈলবালা অবশ্য উল্লেখনীয়া। এঁর গল্প সংকলনের মধ্যে আছে,—'আড়াইচাল' (১৯১৯), 'মনীষা' (১৯২০), 'অকাল-কুষ্মাণ্ডের কীর্তি' ও 'স্মৃতিচিহ্ন' (১৯২২), 'রুদ্রকান্ত' (১৯৩৪) ইত্যাদি।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

কথাসাহিত্যের ইতিহাসে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১৯০৫-১৯৭২) বহু-প্রজ্ঞ। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা শতাধিক। ছোটগল্পও রয়েছে অগণ্য ; কিন্তু রচনার বিস্তার সর্বত্র বৈচিত্র্যের আকর হয়নি। প্রভাবতীর ব্যক্তিত্বের মূলে আছে সহজাত আবেগের স্বতঃস্ফূর্তি ;—ইমোশন্-এর গাঢ়তার চেয়ে তাতে সেন্টিমেন্ট্-এর বহমানতাই বরং বেশি। আর মোটামুটি বিশ্বাসটিও একমুখী। বিশেষ করে নারী জাতির ওপরে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের রূঢ়তার আঘাত-চিত্রকেই বেদনা-ঘন সেন্টিমেন্টাল রূপ দিয়েছেন তিনি। এটুকুই প্রভাবতী দেবীর গল্প লেখার সুস্পষ্ট motive.

ফলে প্লট্-এর বাস্তবতা বা সংগতির প্রতিও লেখিকা সচেতন থাকেন নি সর্বত্র। কি ঘটে, বা কি ঘট্তে পারে, সিচুয়েশন্ সৃষ্টির কালে সে-বিষয়ে শিল্পী অনবহিত থাকেন,—অনেক সময়ে হয়ত স্বেচ্ছাবশেই। কারণ সমাজ-নিপীড়িত নারীত্বের পরিণামী রূপ অঙ্কনই তাঁর উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্ত হিশেবে 'শুভা' গ্রন্থের 'শ্রী' গল্পের কথা বলা চলে। এই সংকলনে গল্পগুলো সব নামহীন,—অবশ্য প্রথম গল্পটি পড়লে বোঝা যায়, ঐটিই গ্রন্থ-নামের আকর। তা ছাড়া প্রত্যেক গল্পেই একটি করে তরুণী নায়িকা রয়েছে,—সমাজ-লাঞ্ছিতা। সেই নায়িকার নামেই গল্পের নাম করছি। ধনিগৃহের নিঃস্ব কৈবর্ত ঝির মেয়ে শ্রী ; প্রভু-পুত্র ললিতকে সে ভালবেসেছিল,—কারণ ললিত তার ওপরে নিষ্ঠুর অত্যাচার করত শিশু বয়সে,—প্রহার করত নির্মমভাবে! অভিজাত ব্রাহ্মণ সমাজের অমানুষিক বিমুখতায় শ্রী'র ব্যথাহত জীবনের পরিণাম বর্ণনায় গল্পটি শেষ হয়েছে। অথচ বর্ণনাগুণে মূল প্লট্,—অর্থাৎ, শ্রীর প্রতি ললিতের প্রণয়-কথা, অথবা পরবর্তী লাঞ্ছনার কাহিনী,—

কিছুই বিশ্বাস্য হয়ে ওঠেনি। 'হারাণোস্মৃতি' সংকলনের প্রথম গল্প 'হারাণোস্মৃতি'। তার সম্বন্ধেও একই কথা,—পিতা ও ভ্রাতার রক্ষণশীলতা-জনিত অত্যাচারের যে-ছবি ও পরিণতি আঁকা হয়েছে ইতি-র জীবনে,—অষ্টাদশ শতকের যুগসন্ধির অন্ধকার লগ্নেও তা কখনো সত্য হতে পারত না। এ-রকম অসম্ভবের পটভূমিতে বোনা গল্পের সংখ্যা প্রভাবতীর কম নয়। তবে ঐ সব গল্পের theme-এ সেকালের পক্ষে দুঃসাহসিকতার ছাপ রয়েছে। ওপরের গল্প দুটির কথা ছেড়ে দিলেও, 'পাঁকের ফুল' গল্পে কুলত্যাগিনী মাতার কন্যার প্রতি মমতায় রক্ষণশীলতার পাষাণভার বিমোচন, অথবা 'দান প্রতিদান' ও 'শেষের দিকে' গল্পে বিবাহিতা ব্রাহ্মণ-কন্যার প্রতি যথাক্রমে সাহা ও মুসলমান যুবকের মহিমাময় প্রণয়-কথা যে সহৃদয়তা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে লেখিকা চিত্রিত করেছেন, তাতে প্রবল দুঃসাহসিকতার পরিচয় রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে প্রভাবতী দেবী শৈলবালা ঘোষজায়ার সগোত্র।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর দার্ঢ্যেই প্রভাবতীর গল্পের শ্রেষ্ঠ মূল্য। নইলে আঙ্গিক-সিদ্ধ ছোটগল্প তিনি লেখেননি; কিংবা লেখার সচেতন কোনো প্রবণতাও নেই। বরং অজ্ঞাতে যখন ছোটগল্পের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তখন গল্পের পরিণতিকে শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও টেনে সমাপ্ত করবার প্রয়াসও দুর্লক্ষ্য নয়। 'দিদি' গল্পে একটি ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের একমাত্র যুবতী বিধবা কন্যা আর আত্মপরিজনহীন অসহায় জাত-বোষ্টম কীর্তনিয়া কিশোরের স্নেহ-সম্পর্ক যখন অমর্ত্য মধুরিমায় নিবিড় হয়ে উঠেছে;—তখনই সমাজের নির্মম খড়্গাঘাত তাদের বিচ্ছিন্ন করেছে। বৃন্দাবনের সেই বিদায় দৃশ্যে ক্ষীণ হলেও একটি ছোটগাল্পিক পরিণাম সংহত হয়ে উঠছিল,—কিন্তু এর পরেও লেখিকা গল্পকে আরো টেনেছেন,—অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভবানীর দেশের স্টেশনে এসে বৃন্দাবন মৃত্যুবরণ করেছে রক্ত বমি করে। শেষ অংশের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' উপন্যাসের সাদৃশ্য রয়েছে;—তবে শিল্পি-হৃদয়ের উচ্ছ্বাস আরো বেশি sentimental।

বস্তুতঃ রূপ-সিদ্ধ ছোটগল্প লেখেননি প্রভাবতী,—উপাখ্যান বা গালগল্প বলেছেন। তাহলেও, শিল্প-কৃতিত্বের উজ্জ্বল মার্কা না পেলেও, হৃদ্য হয়েছে তাঁর অনেক গল্পই;—আর সে কেবল নারী-প্রাণের নিভৃত আবেগের সহজ স্ফূর্তির কল্যাণে। এই আবেগের একটি অখণ্ড আবহ ধরা রয়েছে 'সাগরপারের চিঠি' গল্পে। কুলদেবতার পূজা-প্রসঙ্গীয় পারিবারিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে একটি যুবকের জীবন কি করে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল প্রাণমনে—সেই সঙ্গে আর একটি নারীও হল বিড়ম্বিত, তথা বর্ধিষ্ণু সেই পরিবার নির্বংশ, ভস্মীভূত হয়ে গেল,—প্রভাবতীর গল্পের সেই চিরন্তন theme নিয়ে এ-গল্পও লেখা হয়েছে। চিঠির আকারে লেখা গল্পটির শুরু:—"অনেক কাল পরে তোমায়

পত্র লিখ্‌তে বসেছি সুপ্রিয়া,—জানিনে, এ পত্র তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছাবে কি না। কোথায় তুমি আজ আছ, কি রকমভাবে জীবিকা নির্বাহ করছো। আমি সে সব আজ জানি নে। এগার বৎসর আগেকার যে ছবিটি আমার মনে জাগছে, সেই দিনটি মনে করে আজ তোমায় পত্র লিখ্‌তে বসেছি।"

"আজ এতদূরে সাগরপারে এসেও দেশের কথা ভুলতে পারিনি সুপ্রিয়া, এই প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও আমার মন সেই দরিদ্র গ্রামের জন্য কাঁদে। বিশ্বাস তুমি করবে না জানি, জোর করে বিশ্বাসও আমি করাতে চাইনে, আমার মনে আজ যত কথা জাগ্‌ছে অসংকোচে বলে যাব।"

সব কথা বলা শেষ হয়ে গেলে গল্পের চিঠি শেষ হয়েছে,—"·· সে ছিল সকলের সুপ্রিয়া—কিন্তু আমার কাছে ছিল কেবল প্রিয়া।

"আমার প্রিয়ার হাতে এ পত্র পৌঁছাবে, এ ভরসা আমার নেই। তবু দিচ্ছি—এ আমার সান্ত্বনা—বিরাট শান্তি!

"যদি এ পত্র তোমার হাতে গিয়ে পড়ে, তুমি, পড়ো, একটিবার পড়ো প্রিয়া! একটিবার এ হতভাগ্যের কথা মনে করো, পারো যদি এ হতভাগ্যের উদ্দেশ্যে দুটি ফোঁটা চোখের জল উপহার দিয়ো!

"আর যদি না যায়—

"এ পত্র প্রিয়াকে খুঁজে বেড়াবে লোকের দ্বারে দ্বারে, তার পরে নেবে এ সমাধি!

"বিদায়—আর লিখ্‌ব না। রাতের নেশা—কিন্তু এই আমার সান্ত্বনা।"

হতে পারে, নিছক নারীচিত্তের sentiment,—কিন্তু এমন প্রাণ-নিঙড়ানো sentiment-এর আকর্ষণ পাঠকের প্রাণকে দোলায়িত করে তোলে,—সহৃদয় হৃদয়ের সেই অনতিগভীর দোলায়মানতাই প্রভাবতীর গল্প-রসের উৎস।

এঁর গল্প-সংগ্রহের মধ্যে আছে 'হারাণো স্মৃতি', 'পাকের ফুল', 'লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা', 'শুভা' ইত্যাদি।

২। রবীন্দ্র-নিরপেক্ষ গল্প-শিল্পী

(ক) সাহিত্য পত্রিকা : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

বাংলা ছোটগল্পে যে অর্থে 'ভারতীর আসর' বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, ঠিক সেই অর্থেই 'সাহিত্য'-পত্রিকার একটি পৃথক্ আসর ছিল, এমন কথা জোর করে বলবার উপায় নেই। তাহলেও 'সাহিত্যে'রও ছিল একটি সংহত গোষ্ঠী। 'ভারতী' পত্রিকা যে-কালে প্রগতিশীলতার গৌরব অর্জন করেছিল, তার সমসময়ে 'সাহিত্য' পত্রিকার খ্যাতি ছিল

রক্ষণশীলতার জন্যে। স্বতন্ত্র কলেবরে এবং শুরু থেকেই সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সম্পাদনায় সাহিত্য পত্রিকা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১২৯৭ বাংলা সালের বৈশাখ মাসে। এর পূর্বরূপ 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' নামে (১২৯৬, শ্রাবণ-চৈত্র) নয় মাস প্রচলিত ছিল। শেষোক্ত পত্রিকার সপ্তম সংখ্যা থেকেই সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সমাজপতি মশায়।

প্রথম সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকার (১২৯৭) সূচনায় সম্পাদক আক্ষেপ করেছিলেন,— "এখন চিন্তার স্রোত পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রাচীন যুগের লেখকগণের মতের সহিত প্রায়ই বর্তমান নবীন যুগের শিক্ষিত যুবকগণের মতবিরোধ উপস্থিত হয় ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সাহিত্যের প্রশস্ত ক্ষেত্রে তাহার মীমাংসা হয় না।"—এই মতবিরোধের নিরসন করে "প্রাচীন ও নবীন মতের সম্মিলন"-ই পত্রিকার উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হয়েছিল দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায়। তাহলেও রক্ষণশীল হিন্দু মনোভাবের অনুসরণে 'ভারতী'-গোষ্ঠী, তথা রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির বিরুদ্ধ সমালোচনায় অগ্রণী হয়েছিলেন এই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ। এই বিরূপতার যাথাযাথ বিচার বর্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত। তবে এ-কথা স্বীকার করতেই হয়, এই বিরুদ্ধতা সর্বাংশেই অকারণ ছিল না ;—অর্থাৎ, 'সাহিত্য' গোষ্ঠী পুরাতন হিন্দু-সংস্কারের প্রতি অটুট্ নিষ্ঠার দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়েই কেবল নবীন-বিমুখ হয়েছিলেন ;—এ ছাড়া কোনো পৃথক অসূয়া-বুদ্ধি, পরে যাই হোক, মূলতঃ তার পেছনে ছিল না। 'সাহিত্য-'র সৃজনভূমিতে এই পুরাতন-প্রীতির বশে বঙ্কিমানুসারিতার অনন্য আকাঙ্ক্ষাও এরা তখনো কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেননি। অথচ আগের অধ্যায়ে দেখেছি,— বঙ্কিম-যুগের জীবনভূমি পেরিয়েই আমাদের দেশে ছোটগল্পের বাস্তব পরিবেশ গড়ে উঠ্‌তে পেরেছিল। সহজ বিমুখতার বশে চলমান সেই নূতন জীবন-সত্যকে আয়ত্ত করতে না পেরে 'সাহিত্য'-পত্রিকার কর্তৃপক্ষ সেকালের রসোত্তীর্ণ ছোটগল্প প্রবাহকেও সমুচিত স্বীকৃতি জানাতে পারেননি। অন্যপক্ষে এই পত্রিকার অন্তরঙ্গ রসিক গোষ্ঠীর মধ্যে মূলগত বন্ধন ছিল ঐ রক্ষণশীলতারই আদর্শে। এমন অবস্থায় সার্থক মৌলিক ছোটগল্পের অভিব্যক্তি এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রত্যাশা করা চলে না ; অনেক দিন পরে (১৩১০ সাল) শরৎচন্দ্র ও তাঁর বাল্যসঙ্গী 'ভাগলপুর কিশোর সাহিত্য সভা'র কোনো কোনো পুরাতন সভ্যের প্রথম বয়সের রচনা 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র বা তাঁর অন্তরঙ্গদের কাউকেই 'সাহিত্য'-পত্রিকা আপন গোষ্ঠীভুক্ত বলে দাবি করতে পারে না। 'সাহিত্য'-পত্রিকার মৌলিক গল্প লেখকদের মধ্যে সুরেশ সমাজপতির পাশেই প্রধান ভূমিকায় দাঁড়িয়েছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (১৮৭৬-১৯৬০)। কিন্তু ভারত-বরেণ্য সাংবাদিকের প্রতিভার গভীরে গল্প-শিল্পের সৃজনীবাসনা কালোত্তীর্ণ শক্তির আশ্রয় খুঁজে পায়নি। অন্যান্যদের প্রসঙ্গ অবান্তর।

তাহলেও বাংলা ছোটগল্প-শিল্পের ইতিহাসে সুরেশচন্দ্র 'সাহিত্য' পত্রিকার পক্ষ থেকে স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা দাবি করেছিলেন,—"ফরাসি গল্পের অনুবাদ 'সাহিত্যে'ই প্রথম প্রকাশিত হয়।"[৪১] পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, বাংলা ছোটগল্পাঙ্গিকের সচেতন সাধনার প্রথম যুগে দুই পৃথক্ ধারার সৃজন-পদ্ধতি চলেছিল। এক রবীন্দ্র-প্রভাবিক মৌলিক ছোটগল্প রচনার ধারা,—'হিতবাদী'-র পরে 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় বহু দিন ধরে এই ধারা বিচিত্রভাবে প্রবর্ধিত হয়েছে। দ্বিতীয় ধারাটি অনুবাদ-গল্প রচনার,—প্রমথ চৌধুরী তার সূত্রপাত করেছিলেন ১২৯৮ সালের 'সাহিত্য' পত্রিকায়,—ফরাসি গল্পের অনুবাদ করে।

আমেরিকার শিল্পি-মানসে আধুনিক প্রতীচ্য ছোটগল্পের প্রথম জন্ম হয়ে থাক্‌লেও, সে দেশে তার পূর্ণ বিকাশ ঘটেনি। ইংরেজি সাহিত্যেও ছোটগল্পের চেয়ে উপন্যাস শিল্পের উজ্জ্বলতাই বেশি। ছোটগল্প-কলা ফরাসি সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম সুষমা লাভ করেছে। রুশ ছোটগল্পের অনবদ্য রূপ স্বয়ং-স্বতন্ত্র,—সে দেশের জীবনের বিশেষ প্যাটার্ন্‌-এর সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য যোগ। এমন অবস্থায় বাংলা ছোটগল্পের উন্নতি সাধনের জন্য ফরাসি সাহিত্যের দ্বারস্থ হওয়া 'সমাজপতি' বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। চৌধুরীমশাই ছিলেন ফরাসি সাহিত্য-কলার রসমুগ্ধ মধুকর। অতএব সেদিনকার সাহিত্য-গোষ্ঠীর সভায় 'সমাজপতি'র আশা ষোল আনার বেশি পূর্ণ হতে পেরেছিল। ফলে 'সাহিত্য'-পত্রিকায় এবার অনুবাদ-গল্প রচনার বান ডাক্‌ল। এই অনুবাদক দলের শ্রেষ্ঠ নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়। "যত দূর মনে পড়িতেছে, নলিনীই প্রথমে বাঙ্গালাভাষায় মোপাসাঁর গল্পের অনুবাদ করেন।"[৪২] আর সে গল্প প্রকাশিত হয়েছিল 'সাহিত্য'-পত্রিকাতেই।

এই বিদেশী গল্পানুবাদের ধারা বহুজনের সাধনার মাধ্যমে 'সাহিত্য' পত্রিকায় দূর-প্রসৃত হয়েছিল। আর তা নিতান্ত অকারণ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সুরেশ সমাজপতির প্রধান নালিশ ছিল,—প্রেম ও পূর্বরাগ প্রভৃতির সমাজগর্হিত ছবি এঁকে তাঁর সমধর্মীরা নাকি বাংলাদেশের সহজ নৈতিক পরিবেশকে ঘোলাটে করে তুলছিলেন। সমাজপতির 'প্রাইভেট্ টিউটার' গল্পের নায়ক বলেছিল,—"আমি কখনো এমন কথা বলি না যে প্রেম পাগলামী। আমার বক্তব্য এই যে, ভালবাসা নিয়ে অত নাড়া-চাড়া কেন? এই যে কাগজে সব দুগ্ধপোষ্য শিশু থেকে পলিত-কেশ বৃদ্ধ পর্যন্ত নানাবিধ কবির রকমারি প্রেমের খেয়াল পড়া যায়, সে সব কবিতা, সে সব সেন্টিমেন্ট্যাল জিনিস জগতে ছড়িয়ে লাভ কী?"—একথা গল্প-লেখকের নিজেরও মনোগত। প্রতীচ্য গল্পাদির

৪১। 'নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়' [প্রবন্ধ]—'সাজি' গল্প সংকলনের মুখবন্ধে মুদ্রিত সুরেশ সমাজপতির মন্তব্য। ৪২। তদেব।

অনুবাদে বাধা নেই।—সেখানে বিদেশী জীবন,—বিদেশী নায়ক-নায়িকা,—অতএব 'যা শত্রু পরে পরে!'

সমাজপতি নিজে যে-কয়টি গল্প লিখেছেন—সবশুদ্ধ সংখ্যা ন্যূনাধিক তেরোটি—তা মৌলিক। ঐ সব গল্পে নীতিগত জীবন-চিন্তার একটি দৃঢ় রক্ষণশীল রূপ রয়েছে,—প্রেম ইত্যাদি 'সেন্টিমেন্ট্যাল জিনিসে'র প্রতি লঘু-গুরু কৌতুকের আঘাত রয়েছে। 'অবৈধ'-তার কোনো প্রসঙ্গমাত্র নেই। এমন অবস্থায় গল্পগুলি ঠিক গল্প থাকেনি, 'প্রবন্ধ' হয়ে উঠেছে অনেক সময়। তবে প্লট্ গড়ার একটা নতুন প্রকরণ দেখা যায় কোনো কোনো গল্পে। পাত্র-পাত্রীদের চিঠির উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে গোটা গল্পের বিকাশ এবং পরিণতি ঘটেছে। 'প্রাইভেট টিউটার', 'কমলা' ইত্যাদি গল্পে এই আঙ্গিকের অনুসৃতি লক্ষিত হয়।

'প্রভা'-র মতো গল্পে রোমান্টিক্ প্রণয়-চিত্র রয়েছে,—কিন্তু লেখক তাকে যথেষ্ট রোমান্টিক্ হতে দেননি; এবং পরিণামে নায়িকার মৃত্যু বিধান করে সকল কৌতূহলের অবসান ঘটিয়েছেন।

সমাজপতির গ্রন্থাকারে প্রকাশিত একমাত্র গল্প-সংকলনের নাম 'সাজি',—এতে দশটি গল্প গ্রথিত হয়েছে।

'সাহিত্য'-পত্রিকা-গোষ্ঠীর আরো একজন ছাড়া অপরাপর মৌলিক গল্প-লেখকদের উল্লেখ আবশ্যিক নয়। অনুবাদ-গল্পের প্রথম যুগে এই গোষ্ঠী নিঃসন্দেহে একটি আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু সে আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত। আর সেই একতম উল্লেখ্য হাস্যরসের গল্প-লেখক সুরেন্দ্র মজুমদারের কথা বলছি পরে[৪৩]। অতএব গোষ্ঠীপতি সমাজপতিকে নিয়েই সাহিত্য-গোষ্ঠীর গল্প-পরিচয় শেষ হতে পারে।

অপরাপর গল্প-লেখক

(খ) জলধর সেন

বাংলা ছোটগল্পে জলধর সেনের (১৮৬০—১৯৩৯) প্রতিষ্ঠাভূমি অসংশয়িত নয়। এঁর রচিত আটটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে গল্প-সংখ্যা ছিল প্রায় ৮৬টি।[৪৪] এককালে তাঁর রচনার অপর্যাপ্তির মত খ্যাতিও খুব কম ছিল না। অথচ অত গল্পের মধ্যেও সফল ছোটগল্প খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাহলেও বর্তমান প্রসঙ্গে জলধরের শিল্প-কৃতি

৪৩। দ্রষ্টব্য—বর্তমান গ্রন্থের দশম অধ্যায়।

৪৪। দ্রষ্টব্য—'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' ষষ্ঠ খণ্ড।

আলোচনার ঐতিহাসিক কারণও রয়েছে। সেকালের সাহিত্য-সাময়িক পত্রে প্রকাশিত এবং পরে গ্রন্থিত বহু গল্প-রচনার সাধারণ প্রকৃতি এর মধ্য থেকে বোঝা যাবে। জলধর সেন একাদিক্রমে ছাব্বিশ বছর খ্যাতি ও দক্ষতার সঙ্গে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন।—সমসাময়িক গল্প লিখিয়েদের মধ্যেও তিনি ছিলেন পুরোধা। এর রচনা থেকে সেকালের বহু গল্প ও গাল্পিকের সাধারণ স্বভাবটি বোঝা যেতে পারে।

জলধর সেনের গল্প-সাহিত্যকে কচিৎ ছোটগল্প-ধর্মান্বিত হতে দেখা যায়। তাঁর গল্পগুলি প্রায়ই আখ্যানধর্মী,—এদের Tale বা উপাখ্যান পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। আঙ্গিকের দিক থেকে নিছক বর্ণনাধর্মী হলেও জলধরের রচনায় জীবনানুভবের এক বিশিষ্ট স্বাদুতা রয়েছে। অবশ্য সে আস্বাদন শিল্প-কর্মের নয় ততটা, যত শিল্পি-ব্যক্তিত্বের। সমসাময়িক জীবন-জটিলতার ভারে সে কখনো কখনো ব্যক্তিত্ব কৌতূহলজনকভাবে পরস্পর-বিরোধীও হয়ে উঠেছে,—অথচ সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে এক আশ্চর্য অখণ্ডিত মানবিক সহানুভূতির দ্যুতি। বাঙালি সমাজের এক যুগ-সন্ধিতে দাঁড়িয়ে জলধরের মধ্যে সংস্কার-ধর্ম ও হৃদয়-ধর্মের এক লুকোচুরি খেলা চলেছে যেন,—যার মধ্যে আছে আবেগ-স্নাত এক প্রসন্ন উদারতা।

ব্যক্তি হিশেবে অন্তরের অন্তরে জলধর ছিলেন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। কাঙাল হরিনাথের তিনি ভাবশিষ্য,—অনায়াস-প্রত্যয়ের প্রবণতাই ছিল তাঁর সহজ প্রকৃতি। ঝটিকাক্ষুব্ধ পদ্মার বুকে আর্তচিত্তের ঈশ্বরানুরক্তি দেবী দুর্গাকে টেনে আনে বিধ্বস্ত পথিক ও নাবিক নফরকে রক্ষা করবার জন্যে,—এমন বিশ্বাসও জলধরের কাছে অলৌকিক মনে হয় নি। শুধু তাই নয়, সমীচীন কোনোরূপ পরিবেশরচনা বা পূর্বপ্রস্তুতির কথা না ভেবেই একান্ত বাস্তব-ধর্মী 'আশীর্ব্বাদ' গল্পের প্লট-এ তিনি এই কাহিনী জুড়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। সন্ন্যাসীর অতিলৌকিক মন্ত্রের শক্তি বালবিধবা বালিকার আত্মাকে 'বিশ্বপতি'র সঙ্গে চির-অন্বিত করে দেয়, এমন কথারও অবতারণা নিতান্ত সিরিয়াস, (রোমান্টিক্ বা মিষ্টিক্ নয়) গল্পে তিনি করেছেন [দ্র. 'আমার বর']।

কেবল ধর্ম-সংস্কারে নয়,—হিন্দুর সামাজিক সংস্কারেও তাঁর প্রত্যয় অনন্যপরতন্ত্র,—অক্ষয়! এগারো বছরের ছেলে অলিমদ্দীর প্রবল নিষেধ অমান্য করেও সাধু সর্দারের প্রেম-সোহাগিনী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পরে জমির শেখকে নিকে করেছিল। এর পেছনে জমিরের 'প্রলোভনে'র প্রভাব যে ছিল,—লেখক নিজেই সে কথা বলেছেন। অথচ 'নসীবের লেখা' গল্প শেষ করেছেন তিনি সাধুশেখের বিধবা, তথা জমির শেখের নিকে-করা এই স্ত্রীর 'সতীবাক্য'-র উচ্ছ্বসিত স্তব রচনা করে। যেমন দৈবী মহিমার কীর্ত্তনে, তেমনি

সামাজিক মূল্যবোধের স্তব রচনায় স্থান-কাল-পরিবেশের কথা ভাবতেও পারেন নি জলধর,—এমনি ছিল তাঁর হিন্দু সংস্কার।

অথচ এই শিল্পীই 'মোহ' এবং 'রমণী'-র মত গল্প লিখেছেন,—এঁরই দু-দুটো গল্পের নাম 'সমাজচিত্র' ও 'সমাজের ছবি'। অসামাজিক প্রণয়, কিংবা সমাজ-গর্হিত দুর্ঘটনার বর্ণনায় শিল্পীর সহানুভূতি সেখানে হিন্দুর চিরকালীন সংস্কারকে অতিক্রম করে গেছে। একই চেতনার এই দুই বিরোধিভাবের মিলন-চিত্র আশ্চর্য কৌতুকময় রূপ পেয়েছে 'বেয়ারিং-চিঠি' গল্পে। যে দুষ্কর্মের ভারে আহত হয়ে কল্‌কাতা শহরের ধনীর একমাত্র শিক্ষিত রুচিমান দুলাল কুলু উপত্যকায় অজ্ঞাত হাসপাতালে জীবনাবসান ঘটালো, সেই জ্বালাতপ্ত কাহিনীর প্রতি শিল্পীর সহৃদয়তা মর্মন্তুদ। অথচ কোন্ দুর্ঘটনা অতবড় আজীবন অন্তর্দাহের উৎস, গল্পের কোনো জায়গায় লেখক সে কথা স্পষ্ট করে বলতেও পারেন নি। এ এক আশ্চর্য কৌতুককর ঘটনা। আর এর রহস্যভেদের জন্যে 'হিন্দু' জলধরের সঙ্গে 'মানুষ' জলধরকেও সন্ধান করে দেখতে হয়। নিখিল বঙ্গ জলধর-সংবর্ধনা সভার (১৩৪১ বাংলা সন) সম্ভাষণ পত্রে সে পরিচয় দিয়েছেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র—"সাহিত্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে তুমি আনন্দ বিতরণ করিতে। সে ব্রত তোমার সফল হইয়াছে। তোমার সৃষ্টি স্বচ্ছন্দ, সুন্দর, অনাড়ম্বর। তোমার দুঃখ-বেদনাভরা হৃদয় একান্ত সহজেই জগতের সকল দুঃখকে আপন করিয়াছে, তাই ব্যথিত যেজন সে তোমারই সৃষ্টির মাঝে আপনার শান্তি ও সান্ত্বনার পথের সন্ধান পাইয়াছে।"

এ পরিচয় কেবল শিল্পীর নয়,—ব্যক্তি জলধরেরও। 'পরাণ মণ্ডল' গ্রন্থের 'নিবেদন'-এ লেখক আত্মপরিচয় দিয়েছেন,—"আমি নিজে দুঃখী ও দরিদ্র, তাই আমার দেশের দরিদ্রের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আমার বলিতে ভাল লাগে।" জলধর ছিলেন দুঃখব্রতী,—দুঃখীর বন্ধু। তাই কেবল পরাণ মণ্ডলের মত গ্রামীণ দরিদ্রদের দুঃখই নয়, কলকাতার ধনীর দুলালী কমল-এর জীবন-যন্ত্রণাও তাঁর লেখনীকে সমান অশ্রুসিক্ত করেছে। আগেই বলেছি, সে ছিল এক যুগ-সন্ধির ক্ষণ। আমাদের পুরাণো জীবনভূমি তলিয়ে যাচ্ছিল, জীবনের মূলে নূতন ধরনের বাসনা ও সমস্যা অঙ্কুরিত হয়ে উঠছে, অথচ কোনো নূতন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের জীবনচিন্তা চলছে,—শরৎচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা তখনো ঘটেনি। কিন্তু জলধর রবীন্দ্রানুসারীও ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক'-এর বৈপ্লবিক উৎসাহ, এমন কি, প্রভাতকুমারের 'কাশীবাসিনী'-র মত বাঁধন-ভাঙার মৃদু প্রয়াসও নেই তাঁর গল্পে। সে মুক্তি,—সে গতিকে আয়ত্ত করবার শক্তি নেই তাঁর স্বভাব-স্নিগ্ধ প্রত্যয়ী চেতনার। এমন কি, 'কাশীবাসিনী'র জীবন বর্ণনাও অসম্ভব হত জলধরের পক্ষে। অথচ, এই অ-সামাজিক (!) ঘটনার পশ্চাৎবর্তী

মনোভূমির তাপ ও বেদনাকেও তাঁর সহজে দুঃখব্রতী স্বভাব অস্বীকার করতে পারে না। 'বিচারক' বা 'কাশীবাসিনী' গল্পে দেখি দিগ্‌ভ্রান্ত রমণী আগুনে দুটি পাখা পুড়িয়ে সারাজীবন সেই দাহ-জ্বালায় আর্তনাদ করেছে। কিন্তু জলধরের কমল ('মোহ' গল্পে) পথে বেরিয়ে পাখা পুড়বার আগেই আবার নিরাপদে ঘরে ফিরেছে। কেবল এক মুহূর্তের গৃহাঙ্গন ত্যাগের প্রায়শ্চিত্ত করেছে বিধবার বেশ ধারণ করে,—বৈধব্যের কলুষ-সিক্ততার তপ্ত অনুভবে মুখমণ্ডলকে চিরজ্বালায় অগ্নিদগ্ধ করে।

জলধরের এই ধরনের দুটি গল্প ভারি মিষ্টি,—এক 'মোহ',—আর এক 'রমণী'। 'এক পেয়ালা চা', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'সমাজ-চিত্র' ইত্যাদি গল্পেও অনুভবের দোলা আখ্যানের দেহকে ছাড়িয়ে যেতে চেয়েছে। তা না হলে সাধারণভাবে জলধর সেন ছোটগাল্পিক নন,—আখ্যান-রসিক। বাংলার পরিবার ও সমাজ-ধর্মের প্রতি অজস্র মমতার প্রবাহকেই তিনি উৎসারিত করেছেন বিভিন্ন উপাখ্যানের উপলক্ষ্য মাত্র অবলম্বন করে।

এসময়ের বহু সাময়িক-পত্রের তৎকাল-বিখ্যাত শিল্পী ছোটগল্পের নামে এই ধরনের উপাখ্যানই লিখেছেন।

উপন্যাস এবং গল্প মিলিয়ে জলধর সেন অনেক লিখেছিলেন। তাঁর গল্প-সংকলন গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে—'নৈবেদ্য' (১৯০০), 'নূতন গিন্নী ও অন্যান্য গল্প' (১৯০৭), 'পুরাতন পঞ্জিকা'—গল্প ও ভ্রমণ বিষয়ক রচনা-সংকলন (১৯০৯), 'আমার বর ও অন্যান্য গল্প' (১৯১৩), 'পরাণমণ্ডল ও অন্যান্য গল্প' (১৯১৪), 'আশীর্ব্বাদ' (১৯১৬), 'এক পেয়ালা চা' (১৯১৮), 'কাঙালের ঠাকুর' (১৯২০), 'মায়ের নাম' (১৯২২), 'বড়মানুষ' (১৯২৯)।

(গ) দীনেন্দ্রকুমার রায়

দীনেন্দ্রকুমার রায়কে (১৮৬৯—১৯৪৩) নিয়ে বাংলা ছোটগল্পে একটি নূতন ধারার সূত্রপাত হয়েছে। 'বাসন্তী', 'পল্লীকথা', 'পল্লীচরিত্র' ইত্যাদি এমন সব গল্প-সংকলন আছে, যাতে লেখকের সহজ জীবন-প্রীতির পরিচয় স্বতঃস্ফূর্ত। সেখানে দীনেন্দ্রকুমার নিছক গতানুগতিক,—কিংবা তার চেয়ে একটু বেশি। কিন্তু ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্পের সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা কেবল প্রথম সফল পথিকৃৎ-এর নয়, সিদ্ধকাম শিল্পীর-ও। এখানেই তিনি রবীন্দ্রোত্তর 'ভারতী' দলের লেখক হয়েও যথার্থ রবীন্দ্র-নিরপেক্ষ; আর পূর্বোক্ত জীবনধর্মী গল্প রচনার ক্ষেত্রেও আসলে জলধরেরই সমধর্মী।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন,—"এক রহস্যলহরী সিরিজ"-এই তাঁহার ২১৭ খানি অনূদিত উপন্যাস মুদ্রিত হইয়াছে।"[৪৫] দীনেন্দ্রকুমার রহস্য-গল্প-ও

৪৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৮১'।

কম লিখেছিলেন না। তাতে উপন্যাসের মতই মৌলিক এবং অনুবাদ-গল্প রয়েছে। তাঁর রচনার এই বিশিষ্ট অংশের পরিচায়নের আগে ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্পের ঐতিহাসিক কুল-নির্ণয় করে নেওয়া প্রয়োজন।

এই শ্রেণীর শিল্প-কর্মের একটি সাধারণ পরিচয় পাওয়া যায় দীনেন্দ্র রায়ের দেওয়া 'রহস্যলহরী' নাম থেকে। সকল রহস্যময় গল্পই ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প নয়,—কিন্তু রহস্যময়তা (mysteriousness) সব ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্পেরই সাধারণ ধর্ম। মানুষের মধ্যে দুটি পরস্পর-বিরোধী উপাদান আদিমকাল থেকেই বহমান রয়েছে। এক তার আদিম প্রবৃত্তি, আর এক মানুষের সভ্যবৃত্তি। প্রথমটি অপরাধ করার দিকেই ঝুঁকে আছে, দ্বিতীয়টির চেষ্টা অপরাধ-প্রবৃত্তির দমন। অপরাধ প্রবণতার মূলে আছে মানুষের জৈব স্বভাব, অপরাধ নিরোধের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে সভ্য, সামাজিক মানুষের। কিন্তু মানব-স্বভাবের মূল থেকে জৈব বৃত্তির একেবারে উৎসাদন যেমন সম্ভব নয়, সম্পূর্ণ অপরাধ-নিরোধের প্রয়াসও তেমনি অসম্ভব। অতএব একদিকে অপরাধবৃত্তি যেমন দুরপনেয় ধারায় চলেছে, তেমনি আর একদিকে চলেছে সভ্য সমাজ-মানসের অন্তরালে সেই অপরাধের বিশেষ পরিচয় বিলোপ করার প্রচেষ্টা। এখানেই পরিবেশ-প্রভাবে হত্যা, মৃত্যু, দুর্ঘটনা ইত্যাদি বিষয় রহস্যময় হয়ে ওঠে। গোপন অপরাধ-কাহিনীর এই রহস্য সন্ধান করতে গিয়েই রহস্যগল্প 'ডিটেক্‌টিভ্‌'এর আকার পেয়েছে।

মানুষের গল্প-সাহিত্যে এই ধরনের রহস্য সন্ধানের কৌতুককর গল্প লোক-গাথার যুগ থেকেই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঐ সব গল্পকে ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প বলা চলে না,—কারণ 'ডিটেক্‌টিভ্‌' সম্বন্ধীয় ধারণাই তখনো সমাজে গজায়নি। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের সংশোধিত-বৃত্তি চোর Eugène Francois Vidocq পৃথিবীর প্রথম কেতামাফিক ডিটেক্‌টিভ্‌ ব্যুরো স্থাপন করেছিলেন; ১৮২৮-২৯ খ্রীস্টাব্দে ছেপেছিলেন তাঁর স্মৃতি-চিত্র। বাস্তব তথ্যে পূর্ণ এই স্মৃতিকথাই এক অর্থে পৃথিবীর ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্পের আদিসূরী।[৪৬] কিন্তু যথার্থ শিল্পগত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথম ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প লেখা হয়েছিল আমেরিকায় :—বিখ্যাত ছোটগল্পকার Edgar Allan Poe ছিলেন তার স্রষ্টা। পো-এর 'The Murders in the Rue Morgue'—পৃথিবীর প্রথম ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প; ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে গল্পটি ফিলাডেল্‌ফিয়া-র Graham's Magazine-এ প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটির শুরুতে দীর্ঘ 'ভূমিকা' (preface) লিখেছিলেন পো। তাতে ছোটগল্পের এই প্রতিষ্ঠিত-নামা শিল্পী ডিটেক্‌টিভ গল্পকে 'somewhat peculiar narrative' বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, ছোটগল্পের এতাবৎ আলোচিত কলা-শৈলীর সঙ্গে ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্পের রূপ ও রস-স্বভাব

৪৬। দ্রষ্টব্য 'Encyclopaedia Britannica'.

অভিন্ন বলে মনে করবার কারণ নেই। এই প্রসঙ্গে লেখক উদ্ভাবনীশক্তি (ingenuity) ও বিশ্লেষণ-ক্ষমতার (analytic ability) পার্থক্য সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ingenious এবং imaginative গল্পের উদাহরণ দিয়ে লেখক যথাক্রমে ডিটেক্‌টিভ্‌ ও অপরাপর ছোটগল্পের প্রকরণ এবং রসগত বিভিন্নতার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, কোনো এক রহস্যময় দুর্ঘটনার প্রতি ধাপে ধাপে পাঠকের কৌতূহল নিবিষ্ট করে, রহস্যের পর রহস্যের জাল দিয়ে তাকে জমাট বাঁধিয়ে হঠাৎ তার রহস্যমুখ খুলে ধরতে পারার কৌশলই ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্পের বিশিষ্ট রচনা-শৈলী। মানুষের সমাজে এই রহস্যজটিল দুর্ঘটনার গ্রন্থি-মোচনে সরকারি-বেসরকারি ডিটেক্‌টিভ্‌ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা আজ সর্বজনমান্য। তাই আজকাল এই ধরনের গল্পে নায়কের ভূমিকায় কোনো ডিটেক্‌টিভ্‌-এর অবস্থান প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠেছে ;—সাধারণভাবে এই কারণেই এরা ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প নামে পরিচিত। পো সবশুদ্ধ তিনটি ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প লিখেছিলেন ; কিন্তু কোনো গল্পেই ডিটেক্‌টিভ্‌ ভূমিকার উল্লেখ তিনি করেন নি। দীনেন্দ্র রায়েরও একাধিক গল্পে ডিটেক্‌টিভ চরিত্র অনুপস্থিত,—'হত্যারহস্য', 'চক্ষুদান' ইত্যাদি গল্প এ-বিষয়ের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রথমোক্ত গল্পটি একটি নিটোল সম্পূর্ণ অপরাধমূলক গল্প (crime story)। কুসুমের প্রেম-স্নিগ্ধ নারীত্বের আবেগ ডিটেক্‌টিভ্‌-এর কর্তব্যকঠিন ভূমিকাকে রস-নিবিড় করেছে।

কিন্তু তাই বলে পো-ই দীনেন্দ্র রায়ের প্রেরণার উৎস ছিলেন না। আমেরিকার এই ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প-শিল্পী তাঁর যুগের আগে চলেছিলেন ;—ফলে, সে যুগে এ ধরনের গল্প যথেষ্ট জনপ্রীতি অর্জন করতে পারে নি। Poe-র আরো কুড়ি বছর পরে (১৮৬১) ফরাসীদেশে এই শিল্প-শৈলীর আবার অবতারণা করেছিলেন Emile Gaborian। তারপরে ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে উইল্‌কি কলিন্‌স্‌ লিখলেন 'The Moon Stone'। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সারা পৃথিবীতে ডিটেক্‌টিভ গল্প লিখে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারার গৌরব ইংরেজ শিল্পী আর্থার কোনান্‌ ডয়েল্‌-এর। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে 'The Study in Scarlet' নামক ছোট পুস্তিকায় Sherlock Holmes-এর প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-সমাজে প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। তারপরে ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে নতুন গল্প পুস্তিকা বেরোলো 'The Sign of Four'। তাতে পাঠকের উৎসাহ বৃদ্ধি করে। এবারে গল্পের লহরী রচনা করতে লাগলেন ডয়েল্‌ ; ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে 'Strand Magazine'-এ প্রথম গল্প-লহরী প্রকাশিত হল 'A Scandal in Bohemia Series' নামে। ধাপে ধাপে এই গল্প-লহরী Sherlock সম্বন্ধীয় পাঁচখণ্ড বইয়ের ৬৮টি গল্পে পূর্ণ রূপ পেয়েছে।[৪৭]

৪৭। দ্রষ্টব্য—A. Connan Doyle—'Case Book of Sherlock Holmes'-এর 'Preface'.

যথার্থ রসোত্তীর্ণ ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প লেখায় বাধা অনেক। হত্যা, মৃত্যু, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধমূলক ঘটনাবলীর মধ্যে এক ধরনের উত্তেজক মাদকতা রয়েছে। গল্পের মাধ্যমে দুর্ঘটনার ঘাম-ছোটানো উদ্দীপনার আস্বাদন, বা গোপন অপরাধ-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার এক নিজস্ব আনন্দ আছে। অনেক সময়ে উল্লাসী পাঠক ঐ-সব অতিরিক্ত মশলার ঝাঁঝ নিয়েই মত্ত হয়ে থাকে, বিশেষ রূপ-নির্মিতির কথা কল্পনাও করতে পারে না। লেখক যেখানে সেই মাদকতার মোহ রচনায় আত্ম-নিয়োগ করেন,—সেখানে স্রষ্টার ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়,—গল্পের শিল্পমূল্যও নষ্ট হয়। বাংলাদেশে মোহন-সিরিজ-এর গল্প এই ধরনের সফলতা-অসফলতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। Poe তাঁর গল্পে 'fancy' এবং 'imagination'-এর কথা বলেছিলেন ;—সার্থক রহস্য-গল্পের স্রষ্টার পক্ষে 'fancy'-ই যথেষ্ট নয়,—'imagination'-এর পরিমিতিও আবশ্যিক। এখানেই ছোটগল্পকারের মতই রহস্য-গাল্পিকও পূর্ণাঙ্গ শিল্পী। কোনান্‌ ডয়েল্‌-এর প্রসঙ্গে এই উক্তির সফলতম প্রমাণ,—শিল্পী হিশেবে তিনি ছিলেন বিচিত্রচারী ;—নাট্যকার, ঐতিহাসিক, উপন্যাস লেখক, কবি এবং যথার্থ গভীর ছোটগাল্পিকও। 'A Straggler of 15' গল্পে ডয়েল্‌-এর জীবন-দরদী বস্তু-সুনিবিড় শিল্প-চেতনার সার্থক পরিচয় রয়েছে। ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্পকার যেখানে শিল্পী, সেখানে তিনিও জীবন-রসিক। আর এই মৌলিক সম্পদের মণ্ডনেই ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প সার্থক সৃষ্ট হয়ে উঠতে পারে। ডয়েল্‌-এর এই রস-পরিমিতিবোধই তাঁর ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্পকে যুগোত্তীর্ণ করেছে।

দীনেন্দ্র রায় এই ইংরেজ শিল্পীর প্রতিভার দ্বারা বহুল প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। ডয়েল্‌-এর প্লট্‌-এর ছাপও আছে দীনেন্দ্রকুমারের গল্পে। ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প ছাড়া কেবল রহস্য-গল্প রচনাতেও দীনেন্দ্রকুমার অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন। আগে বলেছি, রহস্যময়তা ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্পের সাধারণ গুণ হলেও সব রহস্যগল্প-ই ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প নয়। ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্পের মূলে সবসময়েই রয়েছে কোনো-না-কোনো অপরাধমূলক ঘটনা। অপরাধকারী স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করার ফলে, কিংবা কৌশল অবলম্বন করায় মূল দুর্ঘটনার চারপাশে রহস্যের মেঘ জমে ওঠে। সেই দুঃসন্ধেয়কে সন্ধান (detect) করার প্রবণতাই এই শ্রেণীর গল্পের প্রধান উপাদান। কিন্তু জীবনের চারপাশে প্রতিনিয়ত এমন সব ঘটনা বা দুর্ঘটনা আপনা থেকেই জমে ওঠে যারা সহজে রহস্যময়, সহস্র চেষ্টা করলেও সে-সব রহস্যের গ্রন্থি মোচন অসম্ভব হয়। অথচ রহস্যের উন্মোচন করতেই হবে, এমন কোনো আবশ্যিক প্রেরণাও থাকে না ঐসব গল্পের মধ্যে। এই ধরনের গল্পে fancy আর imagination যেন গায়ে গায়ে জড়িয়ে চলে। 'স্বপ্ন' এবং 'সত্যঘটনা না ভৌতিককাণ্ড' যথাক্রমে দীনেন্দ্রকুমারের এই ধরনের দুটি ভারি মিষ্টি আর

করুণ গল্প ;—যাদের কার্য-কারণ আবিষ্কার করা সহজ নয়,—আবিষ্কার করার ইচ্ছাও থাকে না পাঠকের। সব জড়িয়ে এক আশ্চর্য রহস্যলোকে ডুবে থাকার আনন্দ-রস বিহ্বল করে রাখে চিত্তকে।

আগে বলেছি, 'হত্যারহস্য' একটি উৎকৃষ্ট ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প হলেও, এই রহস্যমধুরতাই তার রস-সম্পদ। 'জাল ডিটেকটিভ্‌' বা 'চক্ষুদান'-এর মত গল্পে ডিটেক্‌টিভ্‌ উদ্দীপনার উপাদান (thrill) ঘন জমাট্‌। ফল কথা, রহস্যগল্পের শিল্পী দীনেন্দ্রকুমার বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্রষ্টা হলেও অনবদ্য রূপ-রসকারও।

কিন্তু কেবল রহস্যগল্প-লহরীর রচনাতেই তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। সামাজিক জীবন,—বিশেষভাবে পল্লীজীবন সম্পর্কে তাঁর সহৃদয় অনুভবের বিচিত্র স্পর্শ রয়েছে 'পল্লীকথা' ও 'পল্লী চরিত্রে'র মত গল্প-সংকলনে।

পল্লীজীবনের সঙ্গে দীনেন্দ্রকুমারের যোগ ছিল দীর্ঘায়ত। দরদী স্বজনের স্পর্শকাতরতা নিয়ে পল্লীবাংলার বিচিত্র 'উৎসব-চিত্র' এঁকেছিলেন তিনি 'পল্লীচিত্র' ও 'পল্লী বৈচিত্র্য' গ্রন্থ দুটিতে। 'পল্লীকথা' এবং 'পল্লীচরিত্র',—সেই বস্তু-সুনিবিড় সহানুভূতিঘন জীবন-চিত্রাবলীরই নতুন সংস্করণ। 'পল্লীকথা'র 'নিবেদন' অংশে লেখক নিজেই একথা স্বীকার করেছেন,—"পল্লীকথা পল্লীচিত্র ও পল্লীবৈচিত্র্যের ন্যায় বাঙ্গালীর উৎসব-চিত্র না হইলেও বোধহয় ঐ শ্রেণীর গ্রন্থরূপে পরিগণিত হইবার অযোগ্য নহে। কারণ ইহাও পল্লীজীবনের আলেখ্য।" একই লেখার অপর অংশে তিনি এই গল্পগুলিকে চিত্র নামে উল্লেখ করেছেন। ফলকথা, 'পল্লীকথা' এই 'পল্লী চরিত্রে'র গল্পগুচ্ছ আসলে নক্সা জাতীয় রচনা। বাস্তব তথ্য-সমৃদ্ধি ও একান্ত সহানুভূতির মণ্ডন সত্ত্বেও এইসব রচনাও ছোটগল্প-গুণের অধিকার দাবি করতে পারে না। এখানে স্রষ্টা হিশেবে দীনেন্দ্রকুমারের ভূমিকা আড়ষ্ট ও গতানুগতিক। কিন্তু রহস্যগল্পের ক্ষেত্রে প্রায় সর্বদাই তিনি অভিনব এবং সজীব।

এঁর রহস্য-গল্প গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখ্য 'পট' ও 'চীনের ড্রাগন'।

নবম অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্প : আদিপর্ব (৩)

শরৎচন্দ্র ও শরৎগোষ্ঠী

(ক) শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প

শরৎচন্দ্রকে নিয়ে বাংলা ছোটগল্পের যে পর্যায় সূচিত হয়েছে ভাব-প্রেরণার বিচারে সে রবীন্দ্রানুসরণেরই আর এক ধারা। অকুণ্ঠ ভাষায় শিল্পী স্বয়ং এ-সত্য পুনঃপুনঃ স্বীকার করেছেন। একজায়গায় লিখছেন,—"কবির সম্বন্ধে আমি এখানে ওখানে কখনো কখনো কথা বলেছি রাগের মাথায়, এ যেমন সত্যি—এও তেমনি সত্যি যে আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই,—আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশি মানে নি গুরু বলে,—আমার চাইতে কেউ বেশি মক্‌সো করে নি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আমার চাইতে বেশিবার কেউ পড়েনি তাঁর উপন্যাস,—তাঁর চোখের বালি, তাঁর গোরা, তাঁর গল্পগুচ্ছ। আজকের দিনে যে এতলোক আমার লেখা পড়ে ভাল বলে, সে তাঁরি জন্য। সে সত্য, পরম সত্য আমি জানি।"[১]

এ-প্রসঙ্গে একটা কথা স্পষ্ট করে নেবার প্রয়োজন আছে। শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আকস্মিক—অপ্রত্যাশিত, এরূপ একটি সংস্কার অনেকদিন ধরে প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে নানা সূত্রে। আর এই অপ্রত্যাশিত অভিনবতার কথা বিশেষভাবে বলা হয়ে থাকে শিল্পীর জীবন-বাচ্যের উপলক্ষ্যে। বাংলাদেশে বিবাহিতা নারীর পক্ষে পরতর প্রণয়ীর আসঙ্গলুব্ধতা ও সঙ্গচারণ ['গৃহদাহ'], কুল-ত্যাগিনী মেসের ঝিকে সুবৃহৎ উপন্যাসের মহিমাময়ী নায়িকার ভূমিকায় বরণ ['চরিত্রহীন'], এ-সব বৈপ্লবিক প্রয়াসকে বাঙালি জীবনের পক্ষে চির-অকল্পনীয় বলে মনে করা হয়েছে। 'গৃহদাহ' প্রসঙ্গে শরৎ-বিপ্লবি-চেতনাকে তলস্তয়-এর অ্যানাকারেনিনার দুঃসাহসী বিদ্রোহ-চেষ্টার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।[২] আলোচ্য গ্রন্থগুলি উপন্যাস পর্যায়ভুক্ত ; তাই এরা আমাদের বর্তমান বিচারসীমার বাইরে। কিন্তু তথাকথিত সমাজ-বিরোধী বৈপ্লবিকতা, অত তীব্রভাবে না হলেও, ছোটগল্পগুলিতেও শরৎচন্দ্রের স্বভাব-সিদ্ধ প্রকৃতি

১। দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'শরৎপরিচয়'—অমল হোমকে লেখা চিঠি [২৮শে পৌষ, ১৩৩৮]
২। দ্রঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—'শরৎচন্দ্র'।

নিয়ে যথাপরিমাণে উপস্থিত রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিশেবে তার প্রথম প্রকাশিত গল্প 'মন্দির'-এর (১৩১০ বাংলা সাল) উল্লেখ করা যেতে পারে :—

মূক শিল্পি-প্রাণের আকৃতিকে জীবনে অস্ফুট রেখেই শক্তিনাথ যেদিন সকলের অজ্ঞাতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিল, সেদিন আচার্য যদুনাথ সগর্বে অপর্ণাকে জানিয়েছিলেন, "পাপের ফলে আজকাল মৃত্যু হচ্ছে—দেবতার সঙ্গে কি তামাসা চলে মা ?" মন্দির-বিলগ্না অপর্ণা তখন "দ্বার রুদ্ধ করিয়া মাটিতে মাথা ঠুকিয়া কাঁদিতে লাগিল ; সহস্রবার কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ঠাকুর এ কার পাপে ?" তারপর নির্মাল্য-স্তূপ থেকে উদ্ধার করে এনে একদা-উপেক্ষিত 'দেলখোশ'-এর শিশি দুটি যখন বিগ্রহের পায়ে লুটিয়ে দিলে, তখন বুঝতে বাকি থাকে না তথাকথিত 'পাপ'-এর মূলটুকু কোথায়! একদিন দেব-প্রেমে যে-অপর্ণা স্বামীর উৎকণ্ঠিত প্রণয়-বাসনাকে রূঢ় উপেক্ষায় নির্বাতিত করেছে,—সেই দেব-সেবার মাধ্যমেই তার বিধবা জীবনে মানব-প্রেমের অনির্বচনীয় তপ্ত করুণ অনুভব নিভৃত পদক্ষেপে আত্ম-বিস্তার করেছিল। সমাজের দৃষ্টিতে সে প্রেমানুভব নিঃসন্দেহে অবৈধ। সে প্রেমকে অস্বীকার করতে না পারলেও গ্রহণ করতে পারে নি অপর্ণা! আবার প্রায় সমকালীন গল্প 'অনুপমার প্রেম'-এ সেই অবৈধ প্রণয়েরই গ্রহণীয়তার ছবি আঁকা হয়েছে অপূর্ব দুঃসাহসিকতার সঙ্গে,—বিড়ম্বিত-জীবন অনুপমা পুনর্জীবন লাভ করেছে ললিতমোহনের 'সুসজ্জিত হর্ম্যে পালঙ্কের উপর শয়ন করে'। 'স্বামী' গল্পের বিষয়বস্তুতে এ ধরনের সমাজ-বিরোধিতার বিদ্রোহী মনোভাব সুস্পষ্ট,—যদিও গল্পটি রচিত হয়েছিল শরৎ-প্রতিভার সুপ্রতিষ্ঠিত পরিণতির যুগে (প্রথম প্রকাশ ১৩২৪ বাংলা)। 'বিলাসী' গল্প বিষয়েরও উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু কি ছোটগল্পগুলিতে, কি উপন্যাস-সাহিত্যে, শরৎচন্দ্রের এই বিদ্রোহ অপূর্ব হলেও অপ্রত্যাশিত ছিল না। বরং মৌলিক মানসিকতার বিচারে শিল্পী এখানে বঙ্কিম-রবীন্দ্র-ভাবনারই উত্তরসূরী। নিজের সৃজন-কল্পনার উৎসগত মনোভাব ব্যক্ত করে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "সমাজ জিনিষটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানি না।"[৩] বস্তুতঃ এই মনোভাব থেকেই আধুনিকতাবোধের জন্ম। সমাজকে তার সকল অন্ধ সংস্কার, মানবিক বিচাররহিত সকল ভালমন্দ আচার-আচরণ সমেত দেবতার মর্যাদায় নির্বিচার স্বীকৃতি দান মধ্যযুগের বিনষ্টিকালের ছিল এক অপরিহার্য অবক্ষয়লক্ষণ। রামমোহন রায় যেদিন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেন, সেদিন থেকেই সমাজ-শক্তির দেবতার আসনটি নড়ে উঠলো। ক্রমশঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন-সাধনার প্রভাবে

৩। শরৎচন্দ্র—'স্বদেশ ও সাহিত্য'।

হিন্দুর শাস্ত্রসংস্কারান্ধতার,—অন্ধ সমাজ শক্তির এককালীন শ্রেষ্ঠ স্তম্ভস্বরূপ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের প্রগতিশীল দলের হাতেও সমাজ-শৃঙ্খলা বিচার এবং জিজ্ঞাসার বিষয় হয়ে উঠেছিল। সাহিত্যেও পরোক্ষভাবে এই জিজ্ঞাসা ক্রমশঃ রূপ নিতে শুরু করেছিল মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্য থেকেই।[৪] বঙ্কিমচন্দ্র এ-দেশে রক্ষণশীল হিন্দু সামাজিক বলে পরিকীর্তিত। কিন্তু তাঁর রচনাতেও অবিচল সমাজনীতির বিরুদ্ধে জিজ্ঞাসাচক্রের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে 'বিষবৃক্ষে'র কুন্দনন্দিনী, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণী। পরিণতি যা-ই হোক, বঙ্কিম-সাহিত্যে এই জিজ্ঞাসা স্পষ্টতম রূপ নিয়েছে 'চন্দ্রশেখরে'র 'শৈবলিনীর কণ্ঠে,—প্রতাপকে যখন সে জিজ্ঞাসা করেছে, "আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম ত তোমাকে পাইলাম না কেন?" বঙ্কিমচন্দ্রে কেবল জিজ্ঞাসা আছে, উত্তর নেই।

বঙ্কিমের জিজ্ঞাসা রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় প্রথম বিদ্রোহের আকার নিয়েছে, কেবল 'চোখের বালি' ও 'নষ্টনীড়'-এর প্লট-পরিকল্পনায় নয়, 'চোখের বালি'র বিনোদিনীর উন্নত-ফণা সমাজ-বিদ্বেষের মধ্যে :—"ক্রুদ্ধা মধুকরী যাহাকে পায় তাহাকেই দংশন করে, ক্ষুব্ধা বিনোদিনী তেমনি তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে যাহা চায় তাহাতেই বাধা? কোনো কিছুতেই কি সে কৃতার্থ হইতে পারিবে না! সুখ যদি না পাইল, তবে যাহারা তাহার সকল সুখের অন্তরায়, যাহারা তাহাকে কৃতার্থতা হইতে ভ্রষ্ট, সমস্ত সম্ভবপর সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে তাহাদিগকে পরাস্ত ধূলিলুণ্ঠিত করিলেই তাহার ব্যর্থ জীবনের কর্ম সমাধা হইবে।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবন-ভাবনা পরিণাম-চেতনায় ভূয়িষ্ঠ,—তাঁর ধ্যানী আত্মার গভীরে রয়েছে সেই অবিচল প্রত্যয়,—

"আলোক তীর্থের পথে আলোহীন সেই যাত্রীদল
চলিয়াছে অশ্রান্ত চঞ্চল।[৫]

—মৃত্যুর অন্তরে প্রবেশ করে অমৃতের অনন্ত নির্ঝরের সন্ধান মেলে,—এই দৃঢ় বিশ্বাসে তাঁর নায়ক-নায়িকারা দুঃখের অমারাত্রি অপার ধৈর্য-প্রশান্তিতে অতিবাহিত করে দেয় তমসা-সমুত্তর আলোকের প্রতীক্ষিত তপস্যায়। কেবল এই কারণেই চরম বিদ্রোহিনী বিনোদিনীও বিহারীর পরম স্বীকৃতিকে এড়িয়ে এসে পরিণামে ত্যাগ-তপস্যাকেই বরণ করে নেয়। তাহলেও এই বিনোদিনীই শরৎ-প্রতিভার উন্মেষে সঞ্জীবনী শক্তির কাজ করেছিল। শিল্পী নিজে স্বীকার করেছেন, 'বঙ্গদর্শনে'র নব পর্যায়ে "চোখের বালি তখন

৪। দ্রঃ ভূদেব চৌধুরী—'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'—২য় পর্যায়, ৪র্থ সং।

৫। রবীন্দ্রনাথ—'বলাকা'—কবিতা সংখ্যা ১৬।

ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়ল। সেদিনের সে গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনোদিন ভুলব না। কোনো কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম।"[৬]

অতএব, শরৎ-কাহিনীর বিষয়-ভাবনা বাংলা সাহিত্যে আকস্মিক নয় কিছুতেই;— এ-কথা বলতেই অত কথার অবতারণা। তাই বলে শরৎসাহিত্য এমন কি নিছক গল্প-বিষয়ের মূল্যবিচারেও গতানুগতিক নয়। নিজের সৃজন-কল্পনার একটা মোটামুটি স্বভাব সম্পর্কে লেখক ইঙ্গিত করেছেন "সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্বেও ছিল না, পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, একথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায়, ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়।"[৭] রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্পে (১৩০১ সাল) এই সত্য স্থান পেয়েছিল শরৎচন্দ্রের বাল্য-রচনাবলীরও উদ্ভবের পূর্বে। রবীন্দ্র-সহৃদয়তার উদার মুক্ত জীবনালোকে সমাজের অন্ধ বিচারকের দৃষ্টির 'সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবী-প্রতিমার মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।'. শিল্পীর জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে শরৎ-প্রতিভার মধ্য দিয়ে বাঙালির জীবন-ইতিহাসের বিধাতা-নির্যাতিত নারী-প্রতিমার সেই করুণ মধুরিমাকেই দীপ্ত প্রখর করে তুলেছেন, এখানেই শরৎচন্দ্র রবীন্দ্র-শিষ্য।

কিন্তু 'সাহিত্যে গুরুবাদ' সচেতনভাবে মেনে নিলেও সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র আপন আসনে ছিলেন স্ব-তন্ত্র, স্বয়ম্পূর্ণ। তাঁর শিল্প-চেতনা এখানে রবীন্দ্র-শিষ্য হয়েও রবীন্দ্রেতর। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই পার্থক্যের স্বভাব নির্ণয় করেছেন প্রাঞ্জল ভাষায়। তাঁর কথায়, রবীন্দ্রনাথের "গল্পগুলিতে তথ্য-সন্নিবেশ অপেক্ষাকৃত বিরল, এবং বিশ্লেষণ, মনস্তত্ত্ব ও কল্পনা-সমৃদ্ধি উভয় দিক দিয়াই মনোজ্ঞ ও রমণীয়।" অন্যপক্ষে, শরৎচন্দ্র "কোথায়ও কেবল ঘটনা-বৈচিত্র্য বা কাব্য-সৌন্দর্যের জন্য কোনো দৃশ্যের অবতারণা করেন না—প্রত্যেক দৃশ্যই চরিত্রের উপর আলোকপাত করে।"[৮] শরৎচন্দ্রের নিজের উক্তিতেও তাঁর কলা-কর্মের এই স্বভাব-প্রবণতা স্বীকৃতি পেয়েছে :—

"প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোনোদিন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া লই, তাহাদিগকে ফুটাইবার জন্য যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে। মনের পরশ বলিয়া একটি জিনিস আছে, তাহাতে প্লট কিছু নাই। আসল জিনিস কতকগুলি

৬। শরৎচন্দ্র—'স্বদেশ ও সাহিত্য'। ৭। তদেব

৮। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ৪র্থ সং।

চরিত্র—তাহাদিগকে ফুটাইবার জন্য প্লট-এর দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়, সে সব আপনি আসিয়া পড়ে।"[৯]

অন্যত্র একটি পত্রে লিখেছেন, চরিত্রগুলোকে "ভালো করিয়া সম্পূর্ণ" করে তোলাই শ্রেষ্ঠ গল্প লেখার আর্ট। নিজের বেলায় এ সত্যটি তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। কেবল তাই নয়, স্পষ্টভাষায় বলেওছেন,—"আমি একটা উদ্দেশ্য লইয়াই গল্প লিখি, সেটা পরিস্ফুট না হওয়া পর্যন্ত ছাড়িতে পারি না।"[১০] ঠিক এই কারণেই শরৎচন্দ্র যত বড় ঔপন্যাসিক তত বড় ছোটগল্পকার নন।

অখণ্ড সম্পূর্ণ মানুষ,—Ralph Fox-এর ভাষায়, 'আদি-অন্তে অভঙ্গ মানুষ' উপন্যাসের বিষয়বস্তু। অন্যপক্ষে ছোটগল্পের রসস্ফুরণ সম্ভব হয় তার মুহূর্তচারী অসম্পূর্ণতার বিন্দুমূলে পরিপূর্ণের অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনায়। জীবনের খণ্ডাংশের বর্ণনা, উপলব্ধি বা ঘটনাময় উপস্থাপনার এই অখণ্ড-সম্পূর্ণ ব্যঞ্জনা-ধর্মিতার স্বভাব নির্দেশ করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—ছোটগল্পের সমাপ্তিক রস-পরিস্রুতির মুহূর্তে "মনে হবে, শেষ হয়ে হইল না শেষ!" শেষের পরেও অশেষের জন্য ব্যঞ্জনাময় উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করতে পারাতেই ছোটগল্পের আনন্ত্যময় রস-পরিণাম। আর উপন্যাস-শিল্পে দেখি, পরিপূর্ণ সমাপ্তির মধ্যেই সৃষ্টির ফলশ্রুতি অখণ্ড সম্পূর্ণতা লাভ করে। উপন্যাস যেখানে শেষ হয়, সেখানে আর কিছুই তার বাকি থাকে না। মানব চরিত্রের গোপন-গভীরে সঞ্চরমান শরৎচন্দ্রের কৌতূহলী শিল্প-চেতনা প্রতিটি চরিত্রের মধ্য থেকে তার নিঃশেষ পরিচয়টুকু নিঙড়ে বার করেছে—আর সেই সুস্পষ্ট পরিচয়কে আরো স্পষ্ট করতে তার ওপরে প্রতিফলিত করেছে শিল্পীর জীবন-বাচ্যের তীব্র আলোক,—স্বয়ং শরৎচন্দ্র যাকে বলেছেন চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে প্রতিটি গল্পের সমাপ্তিকে শরৎচন্দ্র নিঃশেষে শেষ করে ছেড়েছেন। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন, "একটা কথা মনে রেখো, গল্প অন্ততঃ ১২।১৪ পাতা হওয়া চাই এবং conclusionটা বেশ স্পষ্ট করা চাই।"[১১] এই conclusionটা স্পষ্ট করতে গিয়ে শেষে তাঁর নিজের ছোট আকারের গল্পগুলো আর ১২।১৪ পৃষ্ঠার সীমাতেও বাঁধা থাকতে পারে নি। নিজেই বারে বারে আক্ষেপ করেছেন,—"আমার ছোটগল্পগুলা কেমন যেন বড় হইয়া পড়ে, এটা ভারী অসুবিধার কথা।"[১২] তার চেয়েও বড় কথা, প্রকৃতিতেও গল্পগুলো প্রায়ই ছোটগল্প থাকে নি, ছোট উপন্যাস বা বড় গল্প (novelette) হয়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্রের এই শ্রেণীর গল্পের সংখ্যাই বেশি,—'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে' ইত্যাদি পরিণত বয়সের রচনা

৯। দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'শরৎচন্দ্র'—৫৩ বছরের জন্মজয়ন্তীতে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভাষণ। ১০। তদেব—ফণীন্দ্রনাথ পালকে লেখা পত্রাংশ। ১১। তদেব। ১২। তদেব।

থেকে শুরু করে প্রথম জীবনে লেখা 'অনুপমার প্রেম', 'বোঝা' প্রভৃতি গল্প,—তাছাড়া 'মেজদিদি', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'নিষ্কৃতি', 'নববিধান', 'স্বামী', 'একাদশী বৈরাগী', 'অভাগীর স্বর্গ', ইত্যাদি সকল গল্পেই plot যেখানে শেষ হয়েছে,—সেখানে গল্পের আর কিছু বাকি থাকে নি ;—কোনো কৌতূহল, কোনো উৎকণ্ঠা, কোনো ব্যঞ্জনার প্রত্যাশা, কিছুই না।

দৃষ্টান্ত হিশেবে কয়েকটি গল্পের সমাপ্তিক অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে। 'বিন্দুর ছেলে' গল্পটির শেষ অনুচ্ছেদ,—"যাদব বাহিরে চলিয়া গেলে বিন্দু মুখ ফিরাইয়া বলিল, দাও দিদি, কি খেতে দেবে। আর অমূল্যকে আমার কাছে শুইয়ে দিয়ে তোমরা সবাই বাইরে গিয়ে বিশ্রাম কর গে। আর ভয় নেই—আমি মরব না।"

বলা বাহুল্য,—বিন্দুর এই উক্তির মধ্য দিয়ে গল্পের কেবল বর্তমান নয়, ভবিষ্যৎ পর্যন্ত নিঃশেষে বলে শেষ করা হয়েছে। সন্দেহ নেই, ঘটনা সমাপ্ত হয়েছে বলেই গল্প-রসের ফলশ্রুতিও অন্যতর ব্যঞ্জনাময় সম্ভাবনা হারাবে, এমন কোনো কথা নেই। দৃষ্টান্ত হিশেবে, রবীন্দ্রনাথের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের উল্লেখ আবারি করা যেতে পারে। গোটা গল্পটি তথ্য বা বিষয়-প্রধান। রাইচরণের চরিত্র রচনাতেও কবি শরৎচন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ও বিস্তারের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তবু গল্প-শেষের পরিণাম বর্ণনায় বস্তুসমুদ্র মন্থন-করা জীবনাবেগ যেন গোটা গল্প-পরিণামকে রক্তত্তপ্ত জীবন-রসের ব্যঞ্জনায় তরঙ্গিত করে তোলে ; গল্পের বস্তু-নির্ভর পরিসমাপ্তি জ্যোতির্ময় অনির্বচনীয়তার স্রোতে যেন অনন্তের পথে বয়ে চলে। ওপরের গল্পের উদ্ধৃতিতে বিন্দুর স্পষ্ট উক্তির মধ্যে গল্পের বস্তুময় পরিণতি কঠিন বন্ধনে প্রোথিত হয়েছে, কাহিনী-সমুত্তর কোনো চলমানতার সম্ভাবনাই আর থাকে নি তার মধ্যে। 'রামের সুমতি', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'বিলাসী' ইত্যাদি গল্পে এই সুনিশ্চিত জীবন-পরিণতির ঔপন্যাসিক স্বাদুতাই একান্ত হয়ে রয়েছে।

কিছু সংখ্যক গল্পের সমাপ্তিতে লেখক অসম্পূর্ণতার একটা নাটকীয় আভাস সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, কিন্তু বিষয়-রসপুষ্ট গল্পের প্রথম থেকে শেষ অবধি বিশ্লেষণ, বিস্তার, ব্যাখ্যাকে পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট করে তোলার ব্যাপক প্রয়াসের পরে আকস্মিক পরিসমাপ্তি কোনো অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারে নি, কেবল একটি ফিকে রহস্যাবরণের অবতারণামাত্র করেছে, যার ভেতর দিয়ে গল্পের অবিচল সুস্পষ্ট পরিণতি আপনা থেকেই অন্তরে সুপরিবদ্ধ হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্ত হিশেবে 'অনুপমার প্রেম', 'মামলার ফল', 'ছবি' ইত্যাদি গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। 'অনুপমার প্রেম' শরৎচন্দ্রের কিশোর বয়সের রচনা। অনুপমা আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল, তারপরে "জ্ঞান হইলে দেখিল, সুসজ্জিত হর্ম্যে পালঙ্কের উপর সে শয়ন করিয়া আছে, পার্শ্বে ললিতমোহন। অনুপমা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কাতর স্বরে বলিল, "কেন আমাকে বাঁচালে ?" এ "কেন"র উত্তর

গল্পের ঠিক অব্যবহিত পূর্ববর্তী অংশেই প্রাঞ্জল হয়ে রয়েছে। জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে ললিতমোহন অনুপমাকে বলেছিল, "বেঁচে দেখ, এ মিথ্যা কলঙ্ক কখনো চিরস্থায়ী হবে না।" অনুপমা জিজ্ঞেস করেছিল, "কিন্তু কোথায় গিয়ে বেঁচে থাকব?" ললিত জবাব দিয়েছিল "আমার সঙ্গে চল।"

তখন "অনুপমার একবার মনে হইল, তাহাই করিবে। চরণে লুটাইয়া পড়িবে, বলিবে আমাকে ক্ষমা কর। বলিবে, তোমার অনেক অর্থ, আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও—আমি দূরে গিয়া কোথাও লুকাইয়া থাকি।"

তার পরেই অনুপমা হঠাৎ জলে ঝাঁপ দিয়েছিল,—আর তার জ্ঞান হয়েছিল ললিতমোহনের সুসজ্জিত হর্ম্যে পালঙ্কে। গল্পের পরিণতি অবিচল স্পষ্টতায় আপনার মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ হয়ে আছে এখানে। অনুপমার প্রশ্ন নিছক প্রশ্ন নয়,—সমস্ত গল্পের নির্ভুল উত্তরটি সে নিজের দেহে বয়ে এনেছে।

আর একটি কথা,—শরৎচন্দ্রের বহু শ্রেষ্ঠ রচনার মত এই গল্পটি চরিত্র-কেন্দ্রিক নয়। স্রষ্টার অন্তর-নিহিত উদ্দেশ্য প্লটের মধ্যেই নিহিত রয়েছে,—যে প্লট আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। এ গল্প ছোটগল্প নয় নিঃসন্দেহে।

আর একটি গল্প পরিণত বয়সের রচনা,—'মামলার ফল' (১৩২৫ সাল); এই গল্পেও চরিত্র রচনার চেয়ে কাহিনীর মধ্য দিয়ে শিল্পীর জীবনবাচ্যকে পরিস্ফুট করার প্রবণতা বেশি। বাঙালি নারীর বাৎসল্যের যে অপরূপ মহিমা পরের ছেলের মা হয়ে উঠে কোনো এক অজানা সহজাত বৃত্তির প্রভাবে, তারই আবেগভরা জয়গান করেছেন শরৎচন্দ্র তাঁর অসংখ্য গল্প-উপন্যাসে। 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'মেজদিদি' গল্পে ঐ একই জীবন-মূল্যের জয়গাথা। 'মামলার ফল'-এও তাই; যদিও গল্প হিশেবে এটি দুর্বল। কারণ শরৎ-গল্পের যা প্রধান রস-ভিত্তি চরিত্রায়ণের সেই অনবদ্যতা নেই এতে। এই গল্পটির যা মধুরিমা, সে কেবল সমাপ্তিক্ষণের আকস্মিক নাটকীয়তায়। শিবুর স্ত্রী গঙ্গামণি পারিবারিক দ্বন্দ্বের টানা পোড়েনে নির্খোঁজ;—গৃহিণীহীন গার্হস্থ্যে শিবু স্বয়ং অসাড়-চেতন। এমন সময় শিবুর শালা পাঁচু খবর নিয়ে এল শিবুর পলাতক ভাইপো গয়ারামের,—যে গয়ারাম সমস্ত দুর্যোগের কেন্দ্র-বিন্দু। পুলিশের পরোয়ানা রয়েছে গয়ারামের বিরুদ্ধে শিবুর পত্নীকে প্রহার করার দায়ে;—অথচ এই মাতৃহান দেবরপুত্রকেই শিবুর স্ত্রী সন্তান-স্নেহে লালন করত।

পাঁচুর অভিসন্ধি ও উৎসাহেই কেবল শিবু রাজি হয়েছে "আদালতের পেয়াদা প্রভৃতি" নিয়ে গয়ারামের সন্ধানে যেতে। তা না হলে, "আপনার খালি ঘরের দিকে চাহিয়া পরের উপর প্রতিশোধ লইবার জোর আর সে [শিবু] নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছিল না এখন পাঁচুর জোর ধার করিয়াই তাহার কাজ চলিতেছিল।"

অনেক খোঁজ করে, অনেক বেলায় পাঁচলার সরকারি পুলের পাশে গ্রামে এসে পৌঁছালো সবাই ;—ভরা দুপুর তখন,—অনেক চেষ্টায় গয়ারামের আবাসের সন্ধান পাওয়া গেল ; বাইরে থেকে গয়ারামের উচ্চকণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছিল ; পুলকিত উল্লাসে পাঁচু এবারে ঘরের দরজা অবরুদ্ধ করে দাঁড়াল। কিন্তু তার সারাটি মুখ "বিস্ময়ে, ক্ষোভে, নিরাশায় কালো হইয়া গেল। তাহার [পাঁচুর] দিদি ভাত বাড়িয়া দিয়া একটা হাত-পাখা লইয়া বাতাস করিতেছে এবং গয়ারাম ভোজনে বসিয়াছে।

"শিবুকে দেখিতে পাইয়া গঙ্গামণি মাথায় আঁচলটা তুলিয়া দিয়া শুধু কহিল, তোমরা একটু জিরিয়ে নিয়ে নদী থেকে নেয়ে এসো গে, আমি ততক্ষণ আর এক হাঁড়ি ভাত চড়িয়ে দিই।"

পারিবারিক কলহ-চিত্রের এই 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'-ময় পরিণতি সারাটি গল্পের ওপরে কৌতুকের স্নিগ্ধ-চ্ছায়া প্রসারিত করতে পারত। কিন্তু এই সমাপ্তি যেমন আকস্মিক, গঙ্গামণির শেষ কথাটি লেখক তেমনি নিরাসক্ত আয়াসহীনতার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন। ফলে অপ্রত্যাশিতের চকিত দোলা মনকে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়েই তৃপ্তি-স্তিমিত করে দেয়। পরিণাম-বিন্যাসের এই আকস্মিকতা প্রথমে নাটকীয় চমক সৃষ্টি করে ; কিন্তু সে কেবল ক্ষণিকের অনুভূতি। তারপরে গল্পের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই চমক্ থেমে যায় ;—সব কিছু নিঃশেষে জেনে ফেলার চরিতার্থতায় পাঠকচিত্ত নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। এ-যেন মেঠো পথে উদ্দাম গরুর গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ কোনো না-জানা খাদে পড়ে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়েই একেবারে অচল হয়ে থেমে যাওয়া।

গল্প হিশেবে 'ছবি'-র (১৩২৬ সাল) কলাশৈলী অনেক সূক্ষ্ম,—অনেক পরিণত ; তবু এ-গল্পও ঠিক ছোটগল্প নয় ;—সংক্ষিপ্তি, সংহতি, সাংকেতিক বাচন-মধুরিমায় এ-গল্পও শেষের মধ্যে অশেষের ব্যঞ্জনা রচনায় সার্থক হতে পারে নি। উপন্যাসের ব্যাপ্তি, বিস্তার বা সর্বায়ব পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাও এতে নেই ; তবু 'ছবি' খুব মিস্টি একটি রোমান্টিক গল্প,—একটি সার্থক প্রণয়োপাখ্যান,—সুন্দর love-tale। শরৎচন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ চরিত্রায়ণের অন্তস্পর্শতা নায়ক বা-থিন-এর মধ্যে এক অপরূপ প্রাণ-সমৃদ্ধির ব্যঞ্জনা রচনা করেছে। শিল্পী শরৎচন্দ্রের লেখনীতে শিল্পী বা-থিন-এর জীবনরূপ রক্তমাংসের উত্তাপ নিয়ে এক অনির্বচনীয় সৌরভে জেগে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি, বর্মা মুলুকে শরৎচন্দ্র স্বয়ং একদা চিত্রশিল্পের সাধনায় বৃত হয়েছিলেন ;—তাঁর সেদিনকার ছবি-আঁকা তাঁর গল্প-রচনার চেয়ে কম চিত্তাকর্ষক ছিল না স্বয়ং শিল্পীর কাছেও। দৈব-দুর্ঘটনায় তাঁর বাসগৃহের সঙ্গে ছবিগুলি,—বিশেষ করে তাঁর 'সাধের মহাশ্বেতা'-ও পুড়ে ছাই হয়ে না গেলে শরৎচন্দ্র কোন্ রূপে অধিকতর পরিচিত হয়ে উঠ্তেন,—সে আজ বলা কঠিন।

আর শরৎচন্দ্রের শিল্পি-ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ উপাদান ছিল তাঁর স্ব-বিমুখ জীবন-প্রীতি ও তজ্জনিত সংযম,—স্বয়ং শিল্পী যাকে বলেছেন তাঁর "বিবেক"।

ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র ঘোর মদ্যপ ছিলেন ;—একদিনে, এক মুহূর্তের অভিজ্ঞতায় তিনি সারাজীবনের জন্য মদ্যপান ত্যাগ করেন,—জীবনে আর কখনো মদ ধরেন নি। হরিদাস শাস্ত্রীর কাছে সে কথা ব্যক্ত করে মন্তব্য করেছিলেন, "একটি ভদ্রলোক—স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখে ঘুমোচ্ছিল, রাত একটায় দুটো মাতাল তাকে টেনে তুলে একেবারে মেরে এল! এর পরও যদি মাতালের বিবেক না আসে, তবে আর আসবে কিসে?"[১৩]

এই 'বিবেক' শরৎচন্দ্রের আত্মার সম্পদ ছিল ; জীবন-অভিজ্ঞতার কদর্যতম পরিবেশেও তাঁর আত্মাকে ভোগ-লালসার গ্লানি স্পর্শ করতে পারে নি,—চিত্তবৃত্তির মত তাঁর দেহও থেকেছে স্বচ্ছ নির্মল,—কেবল এই সহজাত বিবেক-এর প্রভাবে। হরিদাস শাস্ত্রীকে বলেছিলেন, "নারীজাতি সম্বন্ধে আমার চরিত্র কোনো কালেই উচ্ছৃঙ্খল ছিল না, এখনও নয়। নেশার চূড়ান্ত করেছি, অনেক অস্থানে কুস্থানে গিয়েছি, কিন্তু তুমি সে সব জায়গায় খবর নিয়ে জান্‌তে পার, তারা সকলেই আমায় শ্রদ্ধা করতো। কেউ দাঠাকুর কেউ-বা বাবাঠাকুর বল্‌তো। কারণ অত্যন্ত মাতাল অবস্থাতেও তাদের দেহের উপর আমার কখনো লালসা হয়নি।" এই ঘটনার কারণ বিবৃত করে বলেছিলেন,—"প্রথম যৌবনে আমি একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলাম। ভালবাসা নিষ্ফল হল, কিন্তু সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে সে এসে চিরদিন দাঁড়িয়েছে আমার সামনে। সশরীরে যে নয়, সে তোমায় বোঝাতে হবে না বোধ হয়।"[১৪]

এই ত শিল্পীর বিবেক!—এই বিবেক শরৎচন্দ্রের 'কবির অন্তরে কবি',—তাঁর সৃজনী-শক্তির প্রাণ। প্রেয়সীর দেহে একদা-বিমূর্ত প্রেম ব্যর্থ হয়ে শিল্পীর আত্মায় ছড়িয়ে পড়েছিল অমূর্ত বিবেকের অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনায়। বা-থিন্-এর শিল্পি-চরিত্রকে শরৎচন্দ্র তাঁর এই শিল্পি-আত্মার রঙে রাঙিয়ে রচনা করেছেন। নিজের শিল্প-স্বভাব সম্বন্ধে ৫৩ বছরের জন্মদিনের অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন—"নানা অবস্থা বিপর্যয়ে একদিন নানা ব্যক্তির সংস্রবে আসতে হয়েছিল। তাতে ক্ষতি যে কিছু পৌঁছায় নি তা নয়, কিন্তু সেদিন দেখা যাদের পেয়েছিলাম, তারা সকল ক্ষতিই আমার পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। তারা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটুকু রেখে গেছে, ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ—তাকে আত্মা বলা যেতেও পারে—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য-রচনায় তাকে

১৩। দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'শরৎপরিচয়' (হরিদাস শাস্ত্রীর স্মৃতিকথা)।

১৪ তদেব।

যেন অপমান না করি।" শরৎ-চেতনার মূলনিহিত এই 'আসল মানুষ',—তাঁর এই স্রষ্টা-আত্মার পরিচয় ব্যক্ত করেই ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্র একজন সম্ভোগ-বিরোধী নীতিবিদ,—ইংরেজিতে যাহাকে বলে puritan."[১৫] বা-থিন-এর চরিত্রে নিজের আত্মাকে গলিয়ে গলিয়ে শিল্পীর সহজ-সংযমী puritan মূর্তিটি এঁকেছেন শরৎচন্দ্র তুলির পর তুলির আঁচড়ে। 'ছবি' না হয়ে এই গল্পের নাম হতে পারত 'শিল্পীর প্রেম'। সে প্রেম তার পূর্ণাঙ্গ বৈভব নিয়ে কাহিনীর শরীর-সীমায় অবিচল সম্পূর্ণতার আসনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বা-থিন-এর তুলনায় নায়িকা মা-শোয়ের প্রণয়-সাধিকা মূর্তি এমন জীবন্ত,—অত আনুপূর্বিক সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দেয় নি। শরৎ-সাহিত্যে সর্বত্র পুরুষের চেয়ে নারী প্রধান,—নায়িকা নায়কের চেয়ে উজ্জ্বলতর বর্ণে চিত্রিত। কেবল 'ছবি'-তে তা নয় ; এ-গল্পে শরৎচন্দ্রের শিল্পি-ব্যক্তিত্ব নিজের প্রাণরূপকেই বুঝি রচনা করেছে !

তাই গল্প যেখানে শেষ হল, সেখানেও উৎকণ্ঠিত-সংযত, দেহ-মন-মন্থনকারী ধ্যানী প্রেমের রক্তক্ষরা মধুরিমার আভাস ছড়িয়ে থাকে প্রাণের আনাচে কানাচে। কিন্তু সে মাধুর্য-চেতনার উৎস গল্পের দেহ-সীমাতেই একান্ত সম্পৃক্ত। এ-গল্পে মানবজীবন-তল-লীন সিন্ধুর আভাস রয়েছে,—কিন্তু দুটি উন্মুখ-প্রাণ যুবক-যুবতীর ব্যাপক জীবনভূমি অধিকার করে তার বহুবিস্তার। বিন্দুর বিম্বে জীবনের সিন্ধু-শোভাকে কেন্দ্রিত করতে পারেন নি শরৎচন্দ্র এখানেও ; তাই 'ছবি' প্রাণমধুর গল্প-হলেও ঠিক পূর্ণ স্বরেখ ছোট-গল্প নয়।

নিছক আঙ্গিক-বিচারের প্রয়োজনে এই ধরনের সফল-অসফল সকল গল্পের পৃথক্ পৃথক্ বিচারের প্রয়োজন অপরিহার্য নয়। কেবল এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, 'দর্পচূর্ণ', 'আঁধারে আলো', 'হরিলক্ষ্মী' প্রভৃতি গল্পেও মোটামুটি একই রূপশৈলী অনুসৃত হয়েছে। তা ছাড়া শরৎচন্দ্রের আরো একশ্রেণীর রচনা রয়েছে গল্প-হয়েও যারা ছোটগল্প নয়। এই সব গল্পের সমাপ্তিতে ছোটগল্পোচিত অশেষ-ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে গিয়ে শিল্পী আসলে গল্পগুলিকে শেষই করেন নি ;—শেষ-পর্যন্ত তারা প্রায় অসম্পূর্ণই থেকে গেছে। 'আলো ও ছায়া' এবং 'পথ নির্দেশ' এই ধরনের রচনাশৈলীর উল্লেখ্য নিদর্শন।

'আলো ও ছায়া' গল্পটি প্রথম কবে লেখা হয়েছিল জানা নেই,—প্রথম প্রকাশ ১৩২০ সালের 'যমুনা' পত্রিকায়। 'কাশীনাথ' নামক সংকলনে গল্পটি ধৃত হয়েছে। তাতেই মনে হয়, হয়ত শরৎচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা-পূর্ব যুগের অপরিণত মনের সৃষ্টি এ গল্প। এই অনুমানের সমর্থন গল্পের প্লট-এও কিছু কিছু রয়েছে। এর আগে রবীন্দ্র-গল্প

১৫। ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—'শরৎচন্দ্র'।

প্রসঙ্গে উপাদানগত বিশিষ্টতার বিচারে গল্প-শৈলীকে নানা ভাগে ভাগ করে দেখেছি। সেই পদ্ধতি অনুসরণ করলে দেখব, শরৎ-সাহিত্যে এই গল্পটি আশ্চর্য এক আবেগ-প্রবণতার রেশ বহন করে এনেছে। আগাগোড়া সে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে পারলে একটি সুন্দর আবহ-প্রধান গল্প হয়ে উঠ্‌তে পারত এটি। যাই হোক, এই আবেগাত্মক ভাবনার রেশ শিল্পীর মন ভরে রেখেছিল বলেই হয়ত প্লট্-এর বিন্যাসে স্বাভাবিকতার সীমা সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন থাকা সম্ভব হয়নি। 'আলো ও ছায়া'-র প্রাণোচ্ছলা 'ছায়া' সুরমা ;—প্রেম-আলো-আনন্দের ঝর্ণাধারা যেন। গানের মদির আবেশ ভরা পরিবেশে সুরমার পরিচয় ব্যক্ত করা হয়েছে :—

"সুরমা। যজ্ঞদাদা সেই গল্পটা আবার বল না ?

যজ্ঞ। কোন্‌টা সুরমা ?

সুরমা। সেই যে আমাকে যবে বৃন্দাবনে কিনেছিলে। কত টাকায় কিনেছিলে গো ?

যজ্ঞ। পঞ্চাশ টাকায়। আমার তখন আঠার বছর বয়েস। বি. এ. একজামিন দিয়ে পশ্চিমে বেড়াতে যাই। মা তখন বেঁচে, তিনিও সঙ্গে ছিলেন। একদিন দুপুর বেলায় মালতী কুঞ্জের ধারে একদল বৈষ্ণবী গান গাইতে আসে, তারই মধ্যে প্রথম তোমাকে দেখ্‌তে পাই, যৌবনের প্রথম ধাপটিতে পা দিয়ে জগৎটাকে এমন সুশ্রী দেখতে হয় যে, শুধু নিজের দুটি চোখে সে মাধুর্য সবটুকু উপভোগ করতে পারা যায় না। সাধ হয়, মনের মতন আর দুটি চোখ এমনি করে এক সাথে এমনি শোভা সম্ভোগ করতে পারে যদি তাকে বুঝিয়ে বলতে পারি,—ও কি সুরমা, কাঁদছ যে ?

সুরমা। না—তুমি বল।

যজ্ঞ। তুমি তখন তের বছরের নবীন বৈষ্ণবী, হাতে মন্দিরা, গান গাইছিলে।

সুরমা। যাও—আমি বুঝি গান গাইতে পারি ?

যজ্ঞ। তখন ত পারতে, তারপর অনেক পরিশ্রমে তোমাকে পাই, তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে বালবিধবা ; মা তোমার তীর্থে এসে আর ফিরে যেতে পারেন নি—স্বর্গে গিয়েছেন। আমার মার কাছে তোমায় এনে দিই, তিনি বুকে তুলে নিলেন—তারপর মৃত্যুকালে আবার আমাকেই ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।"

পূর্ব-পরিচয় কথনের এ নাটকীয় রীতি সত্যিই সুন্দর,—প্রেমের আপনহারা বিহ্বলতা তাতে নাতিস্পষ্ট মদিরতার সৃষ্টি করেছে। তবু এমন অবস্থাতেও পঞ্চাশ টাকায় বাল-বিধবা বৈষ্ণবী কিনে এনে, পরে পুত্রের হাতে তাকে দিয়ে যাওয়ার গল্পটি বাংলাদেশের সে-কালের কেন, এ-কালের হিন্দু-জননীদের পক্ষেও স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। অবশ্য উপন্যাসের

মত প্লট্-এর সম্ভাব্যতা সন্দেহাতীত করে তোলার আবশ্যিক দায়িত্ব ছোটগল্পকারের পক্ষে সকল ক্ষেত্রেই সমান তীব্র নয়। তা হলেও গল্পের প্রতিবেশ ও তথ্য-উপস্থাপনা পরস্পর সমঞ্জসতার মধ্য দিয়ে অখণ্ডতার সুরময় ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে,—ছোটগল্পের কাছে এটুকু রস-চেতনার নিম্নতম দাবি। সুরমার এই পূর্বপরিচয় কথনে কোথায় যেন সহজ সংগতিবোধে সংশয় জাগে।

তারপরে, মিত্তিরদের বাড়ির মাতৃহীনা রাঁধুনির মেয়ের সঙ্গে যজ্ঞদত্ত-র বিবাহ-সংঘটন সম্ভাব্যতা-বোধকে রীতিমত পীড়িত করে। এ-রকম ঘটনা একেবারেই ঘটে না,—এমন কথা বলবার উপায় নেই; স্বয়ং শরৎচন্দ্রের দু-দুবারের বিবাহিত জীবনে অনেকটা এ-ধরনের ঘটনারই অনুবর্তন ঘটেছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রও স্বীকার করেছেন,—"—ঘটে যা তা সব সত্য নহে।"[১৬] ঘটনাকে প্রাণবান্ শিল্প-সত্যে পরিণত করতে পারার সিদ্ধিতেই শিল্প-সাধনার সার্থকতা। ঐ সাধন-সৌধরচনায় ব্যাঘাত এসেছে যজ্ঞদত্তের বিবাহ-ঘটনার পর থেকে।

বৈষ্ণব-চেতনার মর্মলীন মুক্তশুদ্ধ প্রণয়-ভাবনা শরৎচন্দ্রকে চিরকাল মুগ্ধ করেছিল;—যে-প্রেমে সমাজের বহিরাগত শৃঙ্খল পরানো চলে না,—অথচ অন্তরলীন শৃঙ্খলায় যে প্রণয়-বোধ সহজ-সংযত,—শরৎচন্দ্রের puritan আত্মা জীবনে ও সাহিত্যে তার জয়গান করে ফিরেছে। শরৎ-সাহিত্যে কমললতা বৈষ্ণবী এ-সত্যের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বৃন্দাবনে সমাজ-শাসন-নির্মুক্ত সতীত্ব-চিন্তাহীন 'একনিষ্ঠ প্রেম'-এর সুর-সুন্দর ছবি শিল্পী আঁকতে শুরু করেছিলেন যজ্ঞদত্ত এবং সুরমার,—আলো ও ছায়ার জীবন-কথা নিয়ে। কিন্তু শরৎচন্দ্র একেবারেই ছিলেন বস্তুনিষ্ঠ ঔপন্যাসিক; তাঁর শিল্পি-অন্তঃকরণ কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছিল মানবিক আবেগ ও সহৃদয়তা দিয়ে;—এমন কি অনেক সময়ে তা ভাবালুতার (sentimentality) পর্যায়েও নেমে এসেছে। তা হলেও নিজের ভাবনাকে তিনি চোখে-দেখা বস্তু-সীমার বাইরে কোথাও শিল্প-কল্পনার আকাশে মুক্তি দিতে পারেননি। তাই শরৎ-সাহিত্যে গল্পের বস্তুময় ভিত্তিটিই প্রধান,—অনেক সময়েই যা চরিত্রের ঘটনাবহুল বিস্তারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই বস্তুময়তার ভিতকে আশ্রয় করেই যা-কিছু কল্পনা,—যা-কিছু কামনা, বাসনা, আবেগ তাঁর রচনায় মুক্তি পেয়েছে। অতএব, যজ্ঞদত্ত-সুরমার বস্তু-ভার-মুক্ত প্রেম-মধুরিমা স্বল্পক্ষণেই গল্পের বস্তুময় সংঘাত-ভূমিতে প্রবেশ করে খেই হারিয়ে ফেলেছে।

যেদিন থেকে যজ্ঞদত্তের নববধূ ঘরে এল, সেদিন থেকে গল্পের আকাশের সুরটি যেন

১৬। দিলীপ রায়কে লেখা পত্র—দ্রষ্টব্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'শরৎ-পরিচয়'।

মাটির তলার সুড়ঙ্গে আট্‌কা পড়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌ল। তারপর নানা ঘটনা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে নববধূর মৃত্যু, যজ্ঞদত্তের নিরুদ্দেশ যাত্রা এবং সর্বশেষে সুরমার অসহায়তার মধ্যে গল্প যেখানে শেষ হল, সেখানে অসমাপ্তির অতৃপ্তিটুকুই যেন প্রধান হয়ে ওঠে,—'শেষ হয়ে হইল না শেষ"—না ভেবে মনে-হয় গল্প বুঝি মোটে শেষই হতে পারল না।

সুরমার চরিত্রটি আশ্চর্য রসোচ্ছলতা নিয়ে ফুটে উঠ্‌ছিল প্রথম দিকে,—পরের সংঘাতময়তার মধ্যে সে দীপ্তি কিছুটা নিভে এলেও চরিত্রটি আগাগোড়াই মোটামুটি প্রাণচঞ্চল থেকেছে।

এ-দীপ্তি আরো আদ্যন্ত সম্পূর্ণতা পেয়েছে 'পথ নির্দেশ' গল্পের হেমনলিনীর মধ্যে। শরৎ-সাহিত্যের প্রায় সকল নারী-চরিত্রেই একটি শাশ্বত সাধারণ স্বভাব নানা উপলক্ষ্যে পুনঃপুনঃ আবর্তিত হয়েছে। সব মানুষের মধ্যেই দুটি পরস্পর-বিরোধী চেতনার অস্তিত্ব রয়েছে। এক, মানুষের ব্যষ্টিচেতনা ;—আর এক সমষ্টি-চেতনা। ব্যষ্টিধর্মের আকাঙ্ক্ষা,—মানুষের একক অস্তিত্বের চরিতার্থতা-কামনাকে নিয়ে জীবনের নিঃসঙ্গ নির্বন্ধন আকাশে সে উড়ে বেড়াতে চায়। অন্যপক্ষে মানুষের সমষ্টিবোধ জানে, একাকিত্বে তৃপ্তি নেই,—ব্যক্তি-বাসনার সিদ্ধি নেই নিঃসঙ্গতার শূন্যতায়। তাই সে ব্যক্তিকে—ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষাকে সীমিত করে সর্বজনের কল্যাণময় জীবনভূমিতে টেনে আনে,—আকাশের পাখিকে জীবনের প্রয়োজনে করে পিঞ্জরাবদ্ধ। পাখি কেবলই আকাশে মুক্তি চায়, পিঞ্জর চায় নীড়ের মায়ায় কেবলই তাকে বাঁধতে। প্রতিটি মানুষের স্বভাব-মূলে রয়েছে এই অনাদি-চিরন্তন দ্বন্দ্ব-চেতনা। নারীর মনোভাবনাকে আশ্রয় করে শরৎচন্দ্র সেই স্বভাব-মানুষের ছবি এঁকেছেন। প্রেম-বৃত্তি নারীর পক্ষে সহজাত ;—লতার পক্ষে যেমন মহীরুহ আশ্রয়ের বাসনা। প্রাণবান্‌ পৌরুষের বলিষ্ঠতাকে আশ্রয় করে নারীপ্রাণ মুক্ত আকাশের নীলিমায় নীড় বাঁধতে চায়। প্রেম-চেতনা সকল অবস্থাতেই মুমুক্ষু,—বন্ধনভীরু। কিন্তু আর একদিকে গৃহ-লোভাতুর নারীর প্রাণ যেমন বাঁধতে চায়, তেম্‌নি বাঁধা পড়েও। সমাজ, সংস্কার, কল্যাণবোধের অজস্র বাঁধনে তার মুক্তি-পিপাসু প্রেম-চেতনা পুনঃপুনঃ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তাই নিজের মধ্যে তার অনন্ত দ্বন্দ্ব,—নিজেরই সঙ্গে।

বাংলা সাহিত্যে নারী-চরিত্রের এই হিমালয়-সম অন্তর্দ্বন্দ্ব শরৎচন্দ্রের মৌলিক আবিষ্কার। এর আগে একেবারে মধ্যযুগ থেকেই নারীকে তার একান্ত সামাজিক ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করে দেখা আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ হয়ে পড়েছিল।[১৭] এমন অবস্থায় নারীর

১৭। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : ভূদেব চৌধুরী—'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' ২য় পর্যায়, ৪র্থ সং।

সমাজ-নিরপেক্ষ ব্যক্তি-বাসনার স্বাধীন স্বভাবটুকুর কল্পনা করাও দুঃসাধ্য ছিল সে-কালে। শরৎচন্দ্রের প্রায় সকল নারী-চরিত্রই গার্হস্থ্যজীবন-লোভাতুর,—এমন কি সমাজ-পরিচ্ছিন্না নারীদেরও সেই একই অদম্য আকাঙ্ক্ষা। 'আঁধারে আলো' গল্পের বিজলী থেকে শুরু করে 'দেবদাস' উপন্যাসের চন্দ্রমুখী পর্যন্ত সকলেই এখানে সমগোত্রীয়া। অথচ এরা কেউ-ই বাংলার গার্হস্থ্য ধর্মের আবহমান পথের পথিক নয়,—পরিবার-জীবনের নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে বাস করেও এদের স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা কখনো সামাজিকতার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েনি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎ-নারীত্বের এই স্বাতন্ত্র্যময় স্বভাব প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন,—"শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে স্ত্রী-চরিত্রে এই সমাজ-নিরপেক্ষ, স্বাধীন জীবনের আরও সুস্পষ্ট স্ফূরণ হইয়াছে। এমন কি, তাঁহার প্রথম যুগের উপন্যাসগুলিতেও, যেখানে সমাজ-বিদ্রোহের সুর সেরূপ তীব্র নয়, ও পারিবারিক কর্তব্য পালনই স্ত্রীলোকের প্রধান কার্য, সেখানেও, তাহাদের দৈনিক সমাজ-নির্দিষ্ট কার্যগণ্ডির অভ্যন্তরেও তাহাদের মধ্যে একটা নূতন সতেজ প্রকাশভঙ্গী, একটা দৃপ্ত, মহিমান্বিত তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পারিবারিক জীবনে নারীর প্রভাব খুব active, এমন কি aggressive ধরনের। ইহা অন্তরালবর্তিনীর নীরব কর্মনিষ্ঠা নহে—ইহা কেবল পিছনে থাকিয়া সনাতন আদর্শের পথে সংসার-রথকে ঠেলা দেয় না। ইহা নূতন আদর্শের প্রবর্তনের দ্বারা সংসার যাত্রাকে অভিনব পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করে। স্নেহ-প্রেম-ধারাকে নূতন প্রণালীতে প্রবাহিত করিয়া পারিবারিক জীবনের ভারকেন্দ্রটি সরাইয়া দেয়।"[১৮]

এই স্বাধীন-স্বতন্ত্র নবীনতাধর্মী জীবনাদর্শের প্রবর্তনায় শরৎ-সাহিত্যের নারী ব্যক্তিগত প্রেম-সাধনার ক্ষেত্রে গতানুগতিক 'সতীত্বে'র সংস্কারকে অতিক্রম করে নিজের অন্তর্লীন প্রেম-বাসনার একনিষ্ঠতাকেই একক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। তবু যুগযুগান্তর-ব্যাপী সংস্কার নিজের অজ্ঞাতেই মজ্জাগত হয়েছিল। ফলে নিরবধি চলে মনের দোলাচল বৃত্তি। জীবনের চরম পাওয়া আর পরম চাওয়ার মূলগত অনিঃশেষ বিরোধই শরৎ-সাহিত্যে ট্রাজেডির সঞ্চার করেছে নারীপুরুষের জীবনে। হেমনলিনীর জীবনেও সেই দ্বন্দ্বের ট্রাজেডি ;—'আলো ও ছায়া' গল্পের সুরমার জীবনেও তাই।

যজ্ঞদত্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করেছিল "তবে কি চিরকাল শুধু আমারই সেবা করে কাটাবে ?" তখন "হু", বলিয়া সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।"—তবু সুরমা মিত্তিরদের বাড়ি কনে দেখে এসেছিল ; জোর করে যজ্ঞদত্তকে কনে দেখ্‌তে পাঠিয়ে

১৮। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', ৪র্থ সং।

দিয়েছিল,—জোর করে বলেছিল সে কনে যজ্ঞদত্তের 'মনে ধরবেই'। অথচ সত্যিই যখন যজ্ঞদত্তের কনে পছন্দ হল, তখন "হঠাৎ যেন সুরমা আর কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না।" প্রাণধরে যাকে পরের হাতে সঁপে দেবার উপায় নেই, তাকেই আজীবন প্রাণ দিয়ে আঁকড়ে ধরবার পুঁজিটুকু হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে সমাজ,—এই টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই এসেছে 'আলো ও ছায়া'র জীবনের অনপনেয় ট্রাজেডি।

'পথ-নির্দেশ' গল্পে সে ট্রাজেডি আরও অনপনেয় যন্ত্রণা-মাধুর্যে ভরপুর ;—কারণ নারী-মনের সেই অন্তহীন দ্বন্দ্ব এখানে মর্মস্পর্শী প্রাঞ্জলতা লাভ করেছে ব্যাপক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। এই উপলক্ষ্যে হেমনলিনী এবং গুণেন্দ্র দুজনেরই চারিত্র-পরিচয় আনুপূর্বিক তথ্য-বর্ণনার মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছে। এই গল্প প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা ওঠে। কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে নরনারীর মন-জানাজানির গোপন পরিচয়ের মধুরতা অন্তহীন হলেও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রাচুর্য বা পরিণতি খুব কম গল্পেই রয়েছে ; 'পথ নির্দেশে' তা মোটেই নেই।

পিতার মৃত্যুর পর গুণেন্দ্রনাথের আশ্রয়ে গিয়ে পড়তে হেমনলিনীরই আপত্তি ছিল সবচেয়ে বেশি ! অথচ একবার যখন দুজনে সাক্ষাৎ হল তখন জননী সুলোচনা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ্‌লেন,—"এই দুটিতে কেমন করিয়া যে এত সত্বর এত আপনার হইয়া গেল, এই কথা তিনি যখন তখন ভাবিতে লাগিলেন।" বলা বাহুল্য, সে ভাবনার শেষ ছিল না,—কোনো জবাব ছিল না সে জিজ্ঞাসার। স্বয়ং সে দুটি নরনারীও এর উত্তর দিতে পারত না। অথচ মন যেদিন মনের সঙ্গে গাঁথা হয়ে গেছে,—সেদিনও সংস্কারের বাধা হয়েছিল পর্বতপ্রমাণ। গুণীর সিন্দুকের চাবি হেম আঁচলে বেঁধেছিল,—লাইব্রেরির সঙ্গে লাইব্রেরির মালিকটির হেফাজৎ-ও গ্রহণ করেছিল একচ্ছত্র আধিপত্যে ; বিজয়ার সন্ধ্যায় পায়ের ওপরে প্রণাম করে গুণীর প্রাণের মৌন আশীর্বাদকে মুখর করেও তুলতে চেয়েছিল। অথচ একদিন আদালত থেকে ফিরে গুণী যখন বই-এর সন্ধানে পড়ার ঘরে ঢুক্‌তে গেল, তখনই হেম বলে উঠ্‌লো,—"এসো না গুণী-দা, আমি খাচ্ছি।" চকিত ব্যথায় গুণী জিজ্ঞেস করেছিল "তোমার দাসী মানদা ঢুক্‌লে জাত যায় না—আমি কি তার চেয়ে ছোট ?"

হেম সেদিন এ-জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারেনি,—খাওয়া ছেড়ে উঠে গিয়েছিল। অথচ পরদিন সকালে গুণীর এঁটো পাতে জোর করে ভাত নিয়ে বসেছিল খেতে। এ নিছক অবিমৃষ্যকারিতা নয়,—ব্যক্তিপ্রাণ ও সমাজ-সংস্কারের দুঃসহ দ্বন্দ্ব ! প্রাণ ছুটেছে সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা-মুক্ত প্রেমের বেদীতে আত্মদান করতে, পায়ে পায়ে সংস্কার পরিয়ে দিয়েছে বেড়ি। এই করেই এদের দিন কেটেছে পরস্পর-বিরোধী বৃত্তির টানাপোড়নে।

অবশেষে বাইরের বাধা যখন ঘুচল,—মায়ের অন্তিম আশীর্বাদ গুণীর চিরন্তন কামনার অভিষেকে সিক্ত হয়ে দেখা দিল, তখন বাধা এল অন্তরের সংস্কারের বেশে। একদিন হেমকে পেয়ে গুণী গ্রহণ করতে পারল না ; আর একদিন গুণী পেতে চাইলেও হেম ছুটে পালাল ;—আরো একদিন হেম যখন চরম আত্মদান করতে ছুটে এল,—সেদিন গুণীর জীবনে দুহাত ভরে পাবার, নেবার ও দেবার শক্তি নিঃশেষিত হয়েছে। এমনি করেই চলে বিরোধ-অনিশ্চয়তায় পীড়িত মানুষের পথ চলা ;—কে জানে, এ "পথের শেষ কোথায়, কী আছে শেষে ?" অন্তহীন এই চির জিজ্ঞাসার ব্যথা-ব্যঞ্জনার-পাথারে গল্পের পরিণামকে ছেড়ে দিয়ে গেলে অপরূপ একটি ছোটগল্প হয়ে উঠতে পারত 'পথ নির্দেশ'। কিন্তু বাধা দিল শিল্পীর সুনিশ্চিত উদ্দেশ্য-কথনের ব্যাকুলতা,—"অতৃপ্ত বাসনাই মহৎ প্রেমের প্রাণ, এর দ্বারাই সে অমরত্ব লাভ করে। যুগে যুগে কত কাব্য, কত মধুর, কত অমূল্য অশ্রু সঞ্চিত করে রেখে যায়···।" এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পটির কথা মনে পড়ে। সেখানে বলেছি, ছোটগল্পের পক্ষে এ ধরনের ব্যাখ্যা-বিস্তার,—শিল্পীর আত্মকথন রসহানিকর। তবু দেখেছি, 'পোস্টমাস্টার' গল্পে রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শবাচন প্লট্-এর সমাপ্তিকে সুনিশ্চিতের বাঁধাঘাট থেকে অশেষের অন্তহীন সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে গল্পকে ছোটগল্পের স্বাদে ভরে তুলেছে। এ-গল্পে তেমনটি ঘটেনি। প্রেমের সুদীর্ঘ দার্শনিক স্বভাব বর্ণনার পরে গুণী হেমকে বলেছে,—"চল, আজই আমরা কাশী যাই। যে কটা দিন আরো আছি, সে কটা দিনের শেষ সেবা তোমার ভগবানের আশীর্বাদে, অক্ষয় হয়ে তোমাকে সারাজীবন সুপথে শান্তিতে রাখবে।"

এই সমাপ্তি-ছত্র পড়ে মনে হয় গল্পের অশেষ-ও হারাল,—শেষ-ও বুঝি রক্ষা হল না। সুস্পষ্ট জীবন-ব্যঞ্জনাকে ঘটনার মধ্য দিয়ে আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে গল্পের পরিণতি-তে অস্পষ্টতাই কেবল বেড়েছে ;—গুণীর পক্ষে এ গ্রহণ না বর্জন !—মিলন না বিচ্ছেদ !

বস্তুত মিষ্টি-মধুর অসংখ্য গল্পের স্রষ্টা হয়েও শরৎচন্দ্র উৎকৃষ্ট ছোটগল্প বেশি লিখতে পারেন নি প্রধানতঃ দুটি কারণে। প্রথম কারণ কাহিনীর সৃজনক্ষেত্রে তাঁর একান্ত তথ্য-নির্ভরতা। শিল্পী নিজে বলেছিলেন,—"···সাহিত্য-সাধনার বিষয়বস্তু ও বক্তব্য আমার বিস্তৃত ও ব্যাপক নয় ; তারা সংকীর্ণ, স্বল্প পরিসরবদ্ধ। তবুও এটুকু দাবি করি, অসত্যে অনুরঞ্জিত করে তাদের আজও আমি সত্যভ্রষ্ট করিনি।"[১১] সন্দেহ নেই, এই সত্য সৃষ্টিতে লেখক একান্তভাবে চোখে-দেখা অভিজ্ঞতার photograph রচনা করেননি। কিন্তু তাই বলে তাঁর realistic সত্য-চেতনা অভিজ্ঞতার পরিচিত তথ্য-

১১। ৫৭ তম জন্মদিনের সম্বর্ধনার ভাষণ। দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সঃ) 'শরৎচন্দ্র'।

সীমার বাইরে কল্পনাকে পদক্ষেপ করতে দেয়নি। বরং চোখে-দেখা তথ্যের দেহকে ঘিরেই তাঁর গল্প-উপন্যাসে কল্পনার লাবণ্য সঞ্চার করেছেন। এদিক থেকে তথ্যকে সম্পূর্ণ করে বলবার ঝোঁকটুকু লেখকের মজ্জাগত। তার ওপরে তিনি নিজেই যাকে বলেছেন "conclusion-টা বেশ স্পষ্ট করা," আর 'উদ্দেশ্যকে পরিস্ফুট করা'—তারই প্রভাবে গল্পগুলি পূর্ণাঙ্গ উপাখ্যানের সার্থকতা লাভ করেছে, ছোটগল্প হয়ে উঠ্‌তে পারেনি। কেবল যে-দু'একটি ক্ষেত্রে দৈবাৎ কোনো কারণে শিল্পীর এই স্বভাব-মুক্তি ঘটেনি, সেখানেই দেখি শরৎ-গল্পে ছোটগল্পের ব্যঞ্জনা-ধর্ম আভাসিত হয়েছে।

লেখকের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'মন্দির' এই ব্যতিক্রমের একটি সার্থক উদাহরণ। এটির রচনা-কাল ১৩০৯ বাংলা সাল; সম্পর্কিত মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে গল্পটিকে লেখক কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় পাঠিয়েছিলেন;—সে বছরের প্রথম পুরস্কারও পেয়েছিল এ-গল্প। কিন্তু লেখক তখনো সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করবার কথা সচেতনভাবে কল্পনাও করেননি। বয়স তখন ছাব্বিশ, কিছুদিনের মধ্যে বর্মা চলে গেলেন জীবিকার্জনের দায়ে। অতএব বল্‌বার মত অভিজ্ঞতা সেদিন প্রচুর জমা হয়ে গিয়ে থাকলেও সে-কথা বলতেই হবে স্পষ্ট প্রাঞ্জল করে, এমন সচেতন বিবেকবুদ্ধি ও উদ্দেশ্য-প্রবণতা তখনো দানা বাঁধেনি মনে। এ-প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প 'মধুমতী'-র কথা আবার স্মরণ করা যেতে পারে। সেখানে দেখেছি, উপন্যাসোচিত অখণ্ড জীবন-দৃষ্টির প্রসার পূর্ণ ব্যাপ্ত হতে পারেনি বলেই, পূর্ণচন্দ্রের হাতে উপন্যাসের উপাখ্যান ছোটগল্পের অস্ফুট আকার ধরেছে। শরৎরচনার-ও সেটি অপরিণতির যুগ;— এই পরিণতিহীন অপ্রশস্ততার মধ্যেই যেন স্বভাব-ঔপন্যাসিকের হাতে সার্থক ছোটগল্প রূপ ধরেছে। কেবল 'মন্দির' গল্প-কে কেন্দ্র করেই এমন সাধারণ সিদ্ধান্ত করা চলে না সত্যি;—কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখব শরৎচন্দ্রের অপরিণত বয়সের যে-সব গল্প প্রকাশিত হয়ে পড়ায় একদা তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, সেই 'কাশীনাথ' 'বাল্যস্মৃতি', 'হরিচরণ' প্রভৃতি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ গল্প হয়ে উঠতে না পারলেও, সার্থক ছোটগল্পের লক্ষণান্বিত।

এ'র থেকে এমন ভুল সিদ্ধান্ত যেন না করি যে, অ-পরিণত উপন্যাসই সার্থক ছোট-গল্পের আকর। এই তথ্য কেবল এ-কথাই বুঝতে দিয়ে থাকে যে, শরৎ-প্রতিভার উপন্যাস-ধর্মী ব্যাপ্তিকামনা তাঁর হাতে সকল ছোটগল্পের সৃষ্টিতে অন্যতম বাধার কারণ হয়েছিল।

'মন্দির' গল্প নিয়েই শুরু করা যাক; এ-পর্যায়ের এটিই পরিণততম গল্প। শরৎচন্দ্রের চরিত্র রচনার দক্ষতা এখান থেকেই পূর্ণ-স্ফুট হয়ে উঠেছে, বালিকা অপর্ণার কৈশোর-যৌবনের অজস্র সুখ-দুঃখভরা অভিজ্ঞতার সৌরভ নিয়ে। গোটা গল্পটির ভিত্তি বাস্তব

তথ্য-বিশ্লেষণের ওপরে নির্ভরশীল। বিশেষ করে অপর্ণা-চরিত্রের মর্ম-প্রদেশে জীবন-সন্ধানী দৃষ্টির তীব্র আলোক প্রতিফলিত করে শিল্পী যেন তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে খুঁটিয়ে দেখেছেন। অথচ এই বিচার-বিশ্লেষণে উপন্যাসোচিত অনিঃশেষতা নেই; দু-একটি কথার আঁচড়ে,—দু-একটি সংক্ষিপ্ত সার্থক ইঙ্গিতবহ বর্ণনার তির্যকতায় খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের আভাস দ্যোতিত হয়েছে।

অর্পণা ও শক্তিনাথের মন্দির-কেন্দ্রিক ক্রমসাযুজ্যের ছবি এঁকেছেন শিল্পী; —মধু ভট্টাচার্যের সদ্য-পিতৃহীন পুত্র অপগোণ্ড শক্তিনাথকে অর্পণা নিজে মন্দিরের পূজার ভার দিয়েছে,—নিছক অনুকম্পার বশে। "রুগ্ন শক্তিনাথের শুষ্কমুখে শোকদুঃখের চিহ্ন দেখিয়া অপর্ণার মায়া হইল, কহিল, তুমি পূজো করো; যা জান তাই করো তাতেই ঠাকুর তৃপ্ত হবেন। …পূজা শেষ হইলে অপর্ণা নিজের হাতে সে যাহা খাইতে পারে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, বেশ পূজা করেছ। বামুন ঠাকুর, তুমি কি হাতে রেঁধে খাও?

"কোনদিন রাঁধি, কোনদিন—যেদিন জ্বর হয়, সেদিন আর রাঁধতে পারি না।

"তোমার কি কেউ নাই?"

"'না'। শক্তিনাথ চলিয়া গেলে অপর্ণা তাহার উদ্দেশে বলিল, আহা! দেবতার কাছে যুক্ত করে তাহার হইয়া প্রার্থনা করিল, ঠাকুর ইহার পূজায় তুমি সন্তুষ্ট হইও, ছেলেমানুষের দোষ-অপরাধ লইও না। সেইদিন হইতে…নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণকুমারটিকে সে তাহার অজ্ঞাতসারে আশ্রয় দিয়া তাহার সমস্ত ভার স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইল। এবং সেইদিন হইতে এই কিশোর ও কিশোরী তাহাদের ভক্তিস্নেহ ভুলভ্রান্তি সব এক করিয়া এই মন্দিরটিকে আশ্রয়পূর্বক জীবনের বাকী কাজগুলিকে পর করিয়া দিল। শক্তিনাথ পূজা করে, অপর্ণা দেখাইয়া দেয়। শক্তিনাথ স্তব পাঠ করে, অপর্ণা মনে মনে তাহার সহজ অর্থ দেবতাকে বুঝাইয়া দেয়। শক্তিনাথ গন্ধপুষ্প হাত দিয়া তুলিয়া লয়, অপর্ণা অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া বলে, আজ এম্‌নি করে সিংহাসন সাজাও, বেশ দেখাবে। এম্‌নি করিয়া এই বৃহৎ মন্দিরের বৃহৎ কাজ চলিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া আচার্য কহিলেন, 'ছেলেখেলা হচ্ছে'।"

এই ছেলেখেলার মধ্য দিয়ে মন্দির-দেবতা মদনমোহনের লীলা-খেলা কতদূরে গিয়ে পৌঁচেছিল, তারও ইঙ্গিত রয়েছে :—শক্তিনাথ কলকাতা যাবে মামার আহ্বানে, তাই পূজা করতে যেতে সেদিন ইচ্ছা নেই তার। "বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া অপর্ণা ডাকিয়া পাঠাইল; শক্তিনাথ গিয়া বলিল, আজ আমি কলকাতায় যাব—মামা ডেকে পাঠিয়েছেন—বলিয়াই সে একটু সংকুচিত হইয়া দাঁড়াইল। অপর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল, কবে ফিরে আসবে? শক্তিনাথ ভয়ে ভয়ে বলিল, মামা আসতে

বল্লেই চলে আসব। অপর্ণা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। আবার সেই যদু আচার্য আসিয়া পূজা করিতে বসিল। আবার তেমনি করিয়া অপর্ণা পূজা দেখিতে লাগিল, কিন্তু কোনো কথা বলিবার আর তাহার প্রয়োজন হইল না, ইচ্ছাও ছিল না।"

আগে বলেছি, ছোটগল্প-শিল্পীকে খালি গাল্পিক হলে চলে না, তাঁকে কবিও হতে হয়,—Stevenson যাকে বলেছেন 'সব-জড়ানো গানের ঝঙ্কার',[১০] সুমিত সার্থক তির্যক বর্ণনা-ভঙ্গীর রচনায় শরৎচন্দ্র এখানে জীবনের সেই সুরঝঙ্কার সৃষ্টি করেছেন,—এখানেই গল্পকার হয়েও তিনি কবি। এম্‌নি করে যথার্থ স্থানে যথোচিত বর্ণনা ও তাঁর সমুচিত অনুসরণের পথ বেয়ে গল্প যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে তথ্য-সমাপ্তির অন্তরে ছড়িয়ে রয়েছে অফুরন্ত জীবন-সংগীতের সুরঝঙ্কার—যদু আচার্য নিতান্ত উদাসীনতার সঙ্গে শক্তিনাথের অকাল মৃত্যুর খবর দিয়ে সদর্পে ঘোষণা করে গেলেন,—"পাপের ফলে আজকাল মৃত্যু হচ্ছে।" তার চলে যাবার পর "অপর্ণা [মন্দিরের] দ্বার রুদ্ধ করিয়া মাটিতে মাথা ঠুকিয়া কাঁদিতে লাগিল; সহস্র বার কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'ঠাকুর, এ কার পাপে?'

"বহুক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিল; চোখ মুছিয়া সে সেই শুষ্ক ফুলের ভিতর হইতে স্নেহের দান মাথায় করিয়া তুলিয়া লইল। মন্দিরের ভিতর আবার প্রবেশ করিয়া দেবতার পায়ের কাছে তাহা নামাইয়া দিয়া কাঁদিয়া কহিল, ঠাকুর, আমি যা নিতে পারি নাই—তা তুমি নাও। নিজের হাতে আমি কখনো তোমার পূজা করি নাই, আজ করছি—তুমি গ্রহণ করো, তৃপ্ত হও, আমার অন্য কামনা নাই।"

গল্প এসে থেমেছে তার সঠিক শমে;—কিন্তু অনন্তকামা অপর্ণার সমাপ্তিক আর্তি মনের গহনে অনির্বচনীয় সকরুণ বেদনাবোধের দোলা রচনা করে চলে। একদিন এই অপর্ণা দেব-সেবার অনন্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে স্বামীর বৈধ জীবন-বাসনার প্রতি বিমুখ হয়েছিল; আজ বিধবার জীবনে দেব-সাধনার ঐকান্তিকতাকে ছাপিয়ে মানবিক সংবেদনার এ-কোন্ আর্তি প্রকাশ পেল! এই ব্যঞ্জনাময় জিজ্ঞাসা সারাটি রচনার আনাচে-কানাচে তরঙ্গিত হয়ে 'মন্দির' গল্পকে একটি সুমিত সুন্দর ছোটগল্প করে তুলেছে।

আঙ্গিক ও গল্পরস-সিদ্ধির বিচারে 'কাশীনাথ' অত সার্থক সৃষ্টি নয়,—'হরিচরণ' বা 'বাল্যস্মৃতি' তো আরো দুর্বল। তা হলেও তথ্যের সংক্ষিপ্তি ও জায়গায় জায়গায় বর্ণনার তির্যক্ ইঙ্গিত-বহতা ছোটগাল্পিক ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে কম-বেশি পরিমাণে। 'কাশীনাথ' গল্পটি এদের মধ্যে আকারে বড়; কাশীনাথ চরিত্র শরৎচন্দ্রের স্বভাব-সিদ্ধ

১০। দ্রষ্টব্য—বর্তমান গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়।

দক্ষতায় অপরূপ প্রাণময় হয়ে আছে। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে সবচেয়ে অপরিণত গল্প 'হরিচরণ'-এর উল্লেখ করতেও বাধা নেই। 'হরিচরণ' ও 'বাল্যস্মৃতি' দুটি গল্পেই নিষ্ঠাবান্ পূতচরিত্র দুটি ভৃত্যের মূক লাঞ্ছনার নির্মম-করুণ বিবরণ উপস্থিত করা হয়েছে। এদিক থেকে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের রাইচরণের সঙ্গে ভৃত্য-চরিত্র দুটি,—যথাক্রমে হরিচরণ ও গদাধর ঠাকুরের সাধর্ম্য রয়েছে। তবে এদের জীবনের করুণাবহ পরিণতি রবীন্দ্র-গল্পের মত অত সূক্ষ্ম জটিল স্পর্শকাতর নয়। শরৎচন্দ্রের গল্পগুলো সাধারণতঃ তথ্য-বহুল,—ঘটনার বস্তুগত পরিণতির মধ্য দিয়েই তাদের রস-পরিস্রুতি ঘটেছে। সেই ঘটনার করুণমহিম আকস্মিক নাটকীয় পরিণতিই ছোটগল্পোচিত তরঙ্গ-কম্পন সৃষ্টি করেছে এই দুটি গল্পে।

'হরিচরণ' গল্পে মাতৃ-পিতৃহীন অনাথ বালক হরিচরণ উকিল দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা রামদাসবাবুর সংসারে আশ্রয় পেয়েছিল। দুর্গাদাস তখন বি.এ. পাশ করা কলকাতার তরুণ। ছুটিতে দুর্গাদাস বাড়ি এসেছেন,—পত্নী পিত্রালয়ে, অতএব তাঁর শয়ন ও অবস্থান বহির্বাটিতে। হরিচরণ তার মূক-সহৃদয়তা দিয়ে সেবায়, সাহায্যে ছোটবাবুর জীবন ভরাট করে তুলেছিল। স্নান করিয়ে দেয়া থেকে রাত্রের স্ব-রচিত শয্যায় পদসেবা পর্যন্ত অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গে সম্পাদিত হত। এক গভীর রাত্রে 'বাবু' বহুদূরের বন্ধুগৃহ থেকে ভূরিভোজন সমাধা করে এসেই দেখলেন শয্যা অবিন্যস্ত,—সবকিছু বিশৃঙ্খল;—পাশের ঘরে হরিচরণ তখন উত্তপ্ত জ্বরে অচেতন। 'বাবু'র অত শত দেখবার অবকাশ নেই। ক্রুদ্ধ অসংযত বাবু প্রথমে মূক ভৃত্যের চুলের মুঠি ধরে সবুট পদাঘাত করলেন,—পরে "হস্তের বেত্রযষ্টি আবার হরিচরণের পৃষ্ঠে বার দুই-তিন পড়িয়া গেল।"

সে-রাত্রে হরি যখন পদসেবা করছিল, "তখন এক ফোঁটা গরম জল দুর্গাদাসবাবুর পায়ের উপর পড়িয়াছিল।" সারারাত বাবুর আর ঘুম হয়নি,—"এক ফোঁটা জল বড়ই গরম বোধ হইয়াছিল।" সারারাত মনে হয়েছিল,—ডেকে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করেন,—ব্যথা কি খুবই লেগেছে! কিন্তু লজ্জায় সে আর হয়ে ওঠেনি;—ও যে ভৃত্য!

পরদিন সকালে 'তার' এল বাবুর স্ত্রী কলকাতায় পীড়িত। বাবু তাড়াতাড়ি কলকাতা ছুটলেন,—গাড়িতে উঠে মনে হল, "ভগবান! বুঝি বা প্রায়শ্চিত্ত হয়।"

তার পরে,—"মাস খানেক হইয়া গিয়াছে। দুর্গাদাসবাবুর মুখখানি আজ বড় প্রফুল্ল, তাঁহার স্ত্রী এ-যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছেন। অন্ন পথ্য পাইয়াছেন।

"বাড়ি হইতে আজ একখানা পত্র আসিয়াছে। পত্রখানি দুর্গাদাসবাবুর কনিষ্ঠ

ভ্রাতার লিখিত। তলায় একস্থানে "পুনশ্চ" বলিয়া লিখিত রহিয়াছে—'বড় দুঃখের কথা, কাল সকালবেলা দশ দিনের জ্বরবিকারে আমাদের হরিচরণ মরিয়া গিয়াছে। মরিবার আগে সে অনেকবার আপনাকে দেখিতে চাহিয়াছিল।'

"আহা পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ!

"ধীরে ধীরে দুর্গাদাসবাবু পত্রখানা শতধাছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।"

শরৎচন্দ্রের পরিণত বয়সের গল্পগুলিতে এই ছোটগাল্পিক পরিণতি নেই। প্রমথনাথ বিশী এর কারণ নির্দেশ করেছেন,—"শরৎচন্দ্র মূলতঃ ঔপন্যাসিক। তথ্য বর্জন, সূক্ষ্ম রেখায় অঙ্কন তাঁহার ধর্ম নয়। উপন্যাসের তথ্যবাহুল্য ছোটগল্পের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া অনেক স্থলেই তিনি শিল্পকে অতিরঞ্জনের কোঠায় পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।"[২১] শিল্পীর বিখ্যাত-তম গল্প 'মহেশ' সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। গল্প রচনার টেক্‌নিক সম্বন্ধে একটি পত্রে তিনি নিজে লিখেছিলেন—"কেবল লেখাই ত নয় ভাই, না-লেখার বিদ্যেটাও যে শিখ্‌তে হয়। তখন উচ্ছ্বসিত হৃদয় যে কথা শত মুখে বলতে চায়, তাই শান্ত সম্পূর্ণ হয়ে একটু গভীর ইঙ্গিতেই সম্পূর্ণ হয়ে আসে।"[২২] পরিণত বয়সের গল্প রচনায়,—'মহেশ' গল্পেও শরৎচন্দ্র এই তথ্য-সংক্ষিপ্তিময় ইঙ্গিতে-সম্পূর্ণ করার কলাকর্ম,—তথা 'না লেখার বিদ্যা' আয়ত্ত করে উঠ্‌তে পারেননি। গল্প যেখানে শেষ হয়েছে,—'আল্লার দরবারে' নির্যাতিত গফুরের বিচার-প্রার্থনার মধ্যে, সেখানে কারুণ্য-ভরা আবেগের দোলা সঞ্চারিত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার আগেই একের পর এক নির্মম নির্যাতনের অতিবিস্তারিত কাহিনী চিত্তবৃত্তিকে অবসন্ন করে তোলে। ফলে গল্পান্তিক প্রাণ-চঞ্চলতা সেই ক্লিষ্ট হৃদয়দ্বারে সমুচিত রসাবেদন সৃষ্টি করে উঠ্‌তে পারে না। গল্পটির সবচেয়ে অভিনবতা তার বিষয়গত মহিমায়। মানব-জগৎ ও পশু-জগৎকে শিল্পী তাঁর আশ্চর্য সহৃদয়তার সূত্রে এমন একত্র গেঁথেছেন যে, সেখানে গফুর, তার মেয়ে আমিনা, আর গৃহপালিত বৃদ্ধ ষাঁড় একই পরিবারের তিনটি অংশীদার হয়ে দেখা দিয়েছে। একটি গৃহপালিত পশুকে কেন্দ্র করে গার্হস্থ্য-রসের এমন করুণ-মধুর অপরূপ উৎসার অকল্পনীয় মনে হয়। শরৎচন্দ্রের সকল শিল্পরচনারই প্রাণময় উৎস হয়ে আছে এই সজীব হৃদ্য বিষয়-বিন্যাস। কিন্তু এই অপূর্ব জীবন-কল্পনা মানুষের হাতে মানুষের নির্মমতম নির্যাতনের কদর্য বীভৎসতায় আলোচ্য গল্পে যেন ঘন কালো কঠিন রূপ ধরেছে। শরৎচন্দ্রের মত জীবন-সন্ধানী শিল্পীর পক্ষেই এমন আশ্চর্য সুন্দর প্লট-এর পরিকল্পনা সম্ভব,—কিন্তু তাঁর মতো বিশুদ্ধ ঔপন্যাসিক প্রতিভার পক্ষে এ অতুল্য প্লটের

২১। প্রমথনাথ বিশী 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প'।
২২। দ্রষ্টব্য—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শরৎ পরিচয়'।

ছোটগল্পায়নও ছিল অসম্ভাব্য। 'মহেশ' গল্পের উপাখ্যান বিস্ময়কর,—কিন্তু তার পরিণামী রসপরিস্রুতি অতিবেদনায় ভারাক্রান্ত, আর্ত, আড়ষ্ট।

'অনুরাধা, সতী ও পরেশ' নামে শরৎচন্দ্রের আর একটি গল্প-সংগ্রহ রয়েছে,—তিনটি পৃথক্ নামের তিনটি গল্পের সংকলন। না গল্প হিশেবে, না রচনাশৈলীর উৎকর্ষে, কোনো দিক্ থেকেই এরা বিশেষ উল্লেখ্যতার দাবি করতে পারে না। প্রথমটি শরৎজীবন-ভাবনার অনুসারী একটি উপাখ্যান,—দ্বিতীয়টি সরস কৌতুকময় নক্সা,—সমাজের সংস্কারান্ধ সতীত্ব-চেতনার প্রতি যার ব্যঙ্গাত্মকতা সুস্পষ্ট। বরং ঐ নাতিতীব্র ব্যঙ্গরসই গল্পটিকে কৌতুকহাস্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল করে তুলেছে। সব শেষের গল্পটিও আর একটি tale,—যার উদ্দেশ্য বা পরিণতির রহস্য মোটেই স্পষ্ট নয়। ফলকথা শরৎচন্দ্র সার্থক গল্পশিল্পী হলেও সিদ্ধকাম ছোটগাল্পিক ছিলেন বলে মনে করা চলে না।

(খ) শরৎগোষ্ঠীর গল্প-শিল্পী

শরৎ-ছোটগল্পের প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে। এবার শরৎগোষ্ঠীর কথা। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে একদা 'ভারতী'গোষ্ঠীর এক গল্প-লেখকদল গড়ে উঠেছিলেন। তাঁদের গল্প-রচনার শৈলী, গল্প-ভাবনা, এমন কি অখণ্ড রস-চিন্তাকেও রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত করে রেখেছিলেন জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে। শরৎগোষ্ঠীর লেখকদের সম্বন্ধে এমন কথা সাধারণভাবে বলবার উপায় নেই। কচিৎ দু'-একজন ছাড়া শরৎচন্দ্রের জীবন-চিন্তা অপরের ওপরে সুদৃঢ় প্রতিফলন সৃষ্টি করতে পারেনি,—জীবন-ভাবনার ক্ষেত্রে মোটামুটি তিনি অনন্য। তাহলেও, একদল লেখক-লেখিকার প্রতিভা উন্মীলনের যুগে উত্তীর্ণ-কৈশোর শরৎচন্দ্র ছিলেন কেন্দ্রমণি। পরিণত বয়সে, তাঁদের রচনা-ধারার সূচনা-লগ্নে, শরৎচন্দ্র বিশেষ মমতার অধিকার দাবি করেছেন। পরবর্তী কালে এঁদের অনেকেরই সাহিত্য-সাধনার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আর কোনো প্রত্যক্ষ যোগ থাকে নি। রচনা-ধর্ম ও তার ইতিহাস বিচারে এঁদের অনেককেই 'ভারতী'গোষ্ঠীর ভেতরে টানা যেতে পারে। তাহলেও এঁরা শরৎগোষ্ঠীর লেখক,—শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম আত্মীয়তার স্মৃতি তাঁদের সৃজনীচেতনায় ছিল মূলবদ্ধ।

যে উৎসটিকে আশ্রয় করে এই গোষ্ঠী গঠন, সে ভাগলপুরের সাহিত্যসভা। ১৮৯৩-৯৪ খ্রীস্টাব্দে শরৎচন্দ্রের ১৭-১৮ বছর বয়সের সময়ে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। ক্রমে এই সাহিত্য-সভার 'অঙ্গুলি যন্ত্রে' লিপিবদ্ধ মুখপত্র প্রকাশিত হতে থাকে 'ছায়া' নামে। লেখকগোষ্ঠীর নেতা ছিলেন শরৎচন্দ্র; আর সভ্য ছিলেন প্রধান ভাবে আরো পাঁচজন,—বিভূতিভূষণ ভট্ট, অনুপমা দেবী (নিরুপমা দেবীর যথার্থ নাম), যোগেশচন্দ্র

মজুমদার, গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।[২৩] এঁদের মধ্যে শেষ দু'জন ছিলেন শরৎচন্দ্রের সম্পর্কিত মাতুল; সাহিত্য-ক্ষেত্রেও চিরকাল ছিলেন তাঁর অন্তরের অন্তরঙ্গ। যোগেশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন 'ছায়া' পত্রিকার সম্পাদক,—তাঁর সমালোচনী শক্তিতে স-প্রেম অভিঘাত রচনা করতে 'ছায়া'র কোনো উদীয়মান কবি লিখেছিলেন—

"ঐ কুঞ্চিত কেশ মার্জিত বেশ ক্রিটিক্ যোগেশ ক্রুদ্ধ
বলে, দীনতায় ছবি যত সব কবি কারাগারে হবি রুদ্ধ।"[২৪]

যোগেশের পরিচয় এর থেকেই প্রস্ফুট;—বাকি সকল সভ্যই কিছু-না-কিছু গল্প লিখেছিলেন। প্রধানভাবে এই কিশোর-শিল্পীদের বিকাশকথাকেই এবারে শরৎগোষ্ঠীর ছোটগল্প রচনার ইতিহাস হিশেবে লিপিবদ্ধ করব।

১। বিভূতিভূষণ ভট্ট

শরৎগোষ্ঠীর ছোটগাল্পিক হিশেবে নিজের পরিচয় নিজেই স্পষ্ট বিবৃত করেছেন বিভূতিভূষণ—"তরুণ জীবনে সেই অনুদিত শরৎচন্দ্রের চারিদিকে যে কয়টি অস্ফুট তারা অথবা তাঁহারই অনুদিত জ্যোৎস্নালোকে যে কয়টি অফোটা সাহিত্যিক ফুল ফুটিবার সম্ভাবনাকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিল—আমি তাহাদেরই একটি। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরবর্তী জীবনে সাহিত্যাকাশে দেখা দিয়া শরৎচন্দ্রের পাশে ভাসিয়াছেন,...... কেহ বা জীবনাকাশ হইতে চ্যুত না হইলেও শরৎ-মহিমার ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে আপনাকে অস্তমিত করিয়াছেন। আমি এই শেষের দলের একজন।"[২৫] এদিক থেকে বিভূতিভূষণের রচনাপ্রবাহ দীর্ঘায়ত বা বহু বিস্তৃত হতে পারেনি। আর সে লেখায় শরৎ-অনুসারিতার প্রবণতাও ছিল দূরান্বিত, স্বয়ং লেখক এই সত্য স্বীকার করেছেন দীন বিনয়ের সঙ্গে:—"তিনি আমার বাল্যজীবনের সাহিত্য সাধনার গুরু।......তাঁহার সাহিত্যিক এবং রসসৃষ্টির মত ও ধারা আমরা সব সময় অনুসরণ করিতে পারি নাই।"

এই রস-সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণের বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-পিপাসা প্রত্যেকটি সকল মুহূর্তে আবেগ-আদর্শের ভাবায় গীতি-দোলায়িত হয়ে উঠতে চেয়েছে। এখানে তাঁর ব্যক্তিত্ব কবি-স্বভাবিত। শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "ভাগলপুরের সাহিত্য সভার সভ্যগণের মধ্যে সব চেয়ে মেধাবী ছিলেন......বিভূতি। যেমন ছিল তাঁর পড়াশুনা বেশি, তেমনি ছিলেন তিনি ভদ্র ও বন্ধুবৎসল।"[২৬] বিভূতির সে মেধাবিত্ব—বা 'অনেক বেশি পড়াশোনা'

২৩। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—'শরৎচন্দ্র' (প্রবন্ধ)—'[illegible] পত্রিকা', ১৩৫২।
২৪। নিরুপমা দেবী—'আমাদের শরৎ দাদা' 'ভারতবর্ষ পত্রিকা' চৈত্র, ১৩৩৪।
২৫। বিভূতিভূষণ ভট্ট—'আমাদের শরৎ দা'। তদেব।
২৬। শরৎচন্দ্র—'বাল্যস্মৃতি' (প্রবন্ধ)—দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শরৎ পরিচয়'।

তাঁর গল্প লেখাকে ভারাক্রান্ত করেনি। অপেক্ষাকৃত অপ্রত্যাশিত অভিনব গল্প-বস্তুর অঙ্গে অঙ্গে মানব-বৎসল কল্পনাদর্শবাদের স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে এক স্বপ্নমদির কল্পলোকের রচনা করতে চেয়েছেন তিনি। সকল ক্ষেত্রেই এ চেষ্টা সফল হয়েছে, এমন কথা জোর করে বলবার উপায় নেই; যেখানে হয়েছে, সেখানেও গল্প প্রায়ই প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্প হয়ে ওঠেনি; তবু রোমান্টিক কল্পনার কম্পনে বিস্ময়-স্নিগ্ধ আবেশ রচনার এক নতুন সফলতা খুঁজে পেয়েছে।

'অকাজের কাজ' গল্পটি এমনি এক আদর্শ-রঙিন, স্বপ্ন-লোকের পরিমণ্ডলে জন্ম নিয়েছে। শরৎচন্দ্র নিজে বাস্তববাদী শিল্পী বলে দাবি করতেন;—পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, বস্তুময় দেহকে ঘিরেই তাঁর গল্পে রসের ব্যঞ্জনা দেখা দিতে পেরেছে,—উপাখ্যানের বিষয়গত উপাদান বাদ দিলে গল্পের রসবস্তু দাঁড়াবার দ্বিতীয় ঠাঁই খুঁজে পায় না শরৎ-গল্পে। কিন্তু 'অকাজের কাজ'-এ বস্তু নেই প্রায় কিছুই; সমস্ত গল্পের রূপ ও ভাবের একটি মাত্র আশ্রয় হচ্ছে শিল্পীর অন্তরলীন 'আইডিয়া'। সেই 'আইডিয়া'-র স্বর্গেই গল্পের প্রচ্ছদ স্থাপিত হয়েছে। ১৩২৭ বাংলা সালের 'উপাসনা' পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশিত হয়,—একই বছরে একক আকারে গল্পটি গ্রন্থিতও হয়েছিল প্রথম। গ্রন্থাকারে এটিই বোধহয় লেখকের প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প।

তারিখ দেখলেই বুঝব,—মহাত্মার অহিংস অসহযোগের প্রথম বিস্ময়-ঘোর জড়ানো সে যুগ,—আঘাত খেয়েও আঘাত না-করার সংযম-মহিমা, স্বসম্পূর্ণতার প্রতীক চরকা, হিংসা না করেও অসহযোগ সার্থক করতে পারার অপূর্বতা, সেই প্রথম যুগে স্বর্গের অকল্পনীয়তা নিয়ে যেন নেমে এসেছিল সেদিনকার আদর্শবাদী ভারত-চেতনায়। কবির দরদ দিয়ে সেই স্বর্গের মায়াকে অভ্রান্ত মর্ত্য রূপ দিয়েছেন বিভূতিভূষণ তাঁর এই গল্পে।

গল্পের নায়ক হারাণচন্দ্র—ছেলেদের হারুদা—কাঠ কাটে, বাজনার যন্ত্র তৈরি করে, বাজনা বাজায়, বাজনা শেখায়,—সুর নিয়ে তার খেলা আসলে প্রাণের উপাসনা। এই কর্মী মানুষটির কর্মশালা কিন্তু 'অকাজের' কল্পলোকে। সেখানে মানুষের আদর্শ-সাধনার পথে অমোঘ বাধার আকারে দেখা দেন একে একে ছেলেদের অভিভাবক, সমাজপতির দল,—ছেলেদের মাতৃগোষ্ঠী, রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী এবং পুলিশফৌজ। কারণ ছেলেরা অসহযোগ করে স্কুল ছেড়েছে, তারা জাত মানে না, হারাণচন্দ্রকে কেন্দ্র করে চারদিকে জমিয়ে তুলছে যত 'অকাজের কাজ'। কিন্তু গল্প-পরিমণ্ডলের পক্ষে কোনো বাধাই যেন বাধা নয়,—স্বপ্নে পাওয়া আঘাতের মত তার কোনো রুক্ষতার চিহ্ন গল্পের বস্তু-দেহে কোথাও একটি আঁচড় কাটে না। যারা কথা বলে, যারা কাজ করে তারা

যে ঠিক আমাদের জগতের মানুষ নয়, বিশেষ করে হারাণ, তার মা ও বধূ,—তার ছেলের দল,—সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। তবু এরা যে বাস্তব নয়, তার জন্তে কোনো আক্ষেপও জন্মে না মনে ; যেমন ভেঙে-আসা ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন জেনেও স্বপ্নের শেষটুকুর জন্তে ঘুমে জড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়,—এও তেমনি। এই জাগ্রৎ-স্বপ্নের নির্বিরোধ প্রচ্ছন্ন আসলে শিল্পীর বিস্ময়-প্রভাবিত আদর্শাবিষ্ট হৃদয়-ভূমি। গল্পের শেষটিও সেই 'স্বপ্ন-মঙ্গলে'র মধুরিম কথায় ভরপুর :—"তাই যখন পুলিশ আসিয়া [অসহযোগীদের বিরুদ্ধে] খানাতল্লাসী করার পর ফিরিবার সময় হারাণের পত্নীর হাতে পরিপাটি আহার্য বস্তু পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিয়া বাহিরে দাঁড়াইল, তখন হারাণচন্দ্রের কনসার্টের দল এমন একটা করুণ সুরে বাজিতেছিল যে, সেই সব রাজশক্তির প্রতিনিধিদের মন সুতার মত হারাণের স্বরাজের চরকায় জড়াইয়া জড়াইয়া চিরদিনের মত এক হইয়া রহিয়াই গেল। তারপরে কবে যে সেই সব মনের সুতা হইতে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় তৈয়ারি হইয়া গেল তাহা কেহ জানিতেই পারিল না।"

ভারতবর্ষীয় জাতির জীবন-সংগ্রামের প্রত্যক্ষ বাস্তব ঘটনাভূমিটি রয়েছে এ গল্পের বিষয়মূলে,—অথচ আগাগোড়া গল্পটি কেবল রোমাণ্টিক স্বপ্ন-মন্থর নয়,—শেষ বাক্যটি নিঃসন্দেহে 'সিম্বলিক'। বস্তুত বিভূতিভূষণ ভট্টের শিল্পস্বভাবই এই,—চোখে-দেখা জীবনের বস্তুভূমিকে রোমাণ্টিক আদর্শ-ভাবনায় পরিশ্রুত (sublimate) করে এক স্বপ্নাবিষ্ট জীবন-চিন্তার সিম্বলিক মূর্তি এঁকেছেন তিনি। 'পক্ষীরাজ' গল্পে সে আভাস আরও স্পষ্ট। সওদাগরী অফিসের কোনো কেরানি জীবনের একমাত্র 'বিলাস' (!) সান্ধ্যভ্রমণ বন্ধ করে শিশুপুত্রকে গল্প বলতে বাধ্য হয়েছিলেন গৃহিণীর নির্দেশে,—সেই আবহমানকালের পক্ষীরাজে-চড়া রাজপুত্রের গল্প। রাত্রে কেরানিবাবু স্বপ্নে দেখলেন,—পক্ষীরাজে চড়ে অতল জল-তলের স্বপ্নপুরীতে পৌঁছে গেছেন ; অপ্সরী রাজকন্যার পরম কাম্য বল্লভ তিনি,—বার বারই মোহময়ী রাজকন্যা সখী-দলবলে ঘিরে দাঁড়িয়ে মিনতিভরা প্রশ্ন করে "চেন কী ?" কিন্তু যতবার তিনি বলতে চান চিনি, ততবারই কে যেন জোর করে তাকে দিয়ে বলায় "চিনি না, কিছুতেই চিনিব না।" কিংবা "পারলাম না, তোমায় চিনতে পারলাম না।"

সব শেষে অধীর চীৎকারে ভোরের আলোয় বাস্তব প্রিয়ার জগতে নিজ দরিদ্র সংসারে পুত্রটির পিতা হয়ে ফিরে আসতে পেরে কেরানিবাবুটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। এখানেও নিতান্ত বাস্তব কেরানি জীবনকে নিয়ে চিরন্তন মানব-ধর্মের স্বভাব-বর্ণনা। মানুষের মধ্যে দুটি সত্তা,—এক বস্তু-জগতের রোগ-শোক-জরা-দারিদ্র্যে-জর্জর, পরাভূত ;

—আর এক চিরন্তন স্বপ্নচারী প্রেমময় মানুষ,—যে হেরে গিয়েও বলে "প্রেম কভু নাহি মানে পরাভব"; যে নিজ পরাভূত বস্তু-জীবনের খোলসের ভেতরে বসে শুধু সম্পন্ন পরম জীবনের স্বপ্ন দেখে,—ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে স্বপ্ন দেখে রাজা হবার। তবু স্বপ্নের মধুরিমার চেয়ে বাস্তবের সংগ্রামই মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ;—কল্পনা-বিলাসী অপরাজেয়তার চেয়ে পরাজয় নিশ্চিত জেনেও মৃত্যু-সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার দার্ঢ্যই পরিণামে মানুষকে আকর্ষণ করে,—এই সত্যই মানবিক আবেগ-কম্পনে প্রতীকান্বিত ব্যঞ্জনা পেয়েছে 'পক্ষীরাজ' গল্পে। আর যতটুকু তার ব্যঞ্জনা, ততটুকুই তার রস-সফলতাও; —গল্পের পৃথক্ কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই।

বস্তুর পুঞ্জিত অভিঘাতকে পাশ কাটিয়ে রোমান্টিক কল্পনাধর্মী রহস্যব্যঞ্জনা রচনার এই চেষ্টা কখনো কখনো গল্প-বস্তুকে অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন করেছে। প্লট্-এর দিক্ থেকে আশ্চর্য অভিনব হলেও 'হাসির-উৎস' গল্পটি সকল ভীষণ-মধুর বিস্ময় রসের মাঝখানেও এই অস্পষ্টতার দরুন কিছুটা ম্লানিম হয়েছে যেন। 'বোবার ডায়রি' গল্পটিও গল্প হিশেবে যত উৎরায়নি, প্লট-এর বিস্ময়করতায় তত অভিনব। এই গল্পটির পরিণামে আর একটি সত্য প্রস্ফুটিত হয়েছে,—কবিধর্মী শিল্পী তাঁর ছোটগল্পে মানুষের মধ্যে সেই পরম সুন্দর পরিণামকেই সন্ধান করেছেন,—যিনি 'পূর্ণ',—যেখানে "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

এই আইডিয়ালিস্টিক্ প্রতীকায়ণের স্বপ্নমদিরতাই বিভূতিভূষণের গল্পশৈলীর বৈশিষ্ট্য, তাছাড়া প্লট্ বা চরিত্র সৃষ্টির স্বতন্ত্র কোনো সার্থকতা এ-সব রচনা দাবি করতে পারে না;—এমন কি, 'হাত দুখানি', 'পা দুখানি' জাতীয় যে সব গল্পের ভিত্তি কেবলই আমাদের এই মর্ত্যভূমি,—সে সব গল্পও না।

ভগিনী নিরুপমার সঙ্গে সহ-প্রণেতা রূপে 'অষ্টক' নামে গল্প-সংগ্রহের বই ছাপিয়েছিলেন লেখক,—আটটি গল্পের মধ্যে চারটি নিরুপমার লেখা, চারটি তাঁর নিজের। এ-ছাড়া, 'সপ্তপদা' নামক স্বকীয় স্বতন্ত্র গল্প-সংগ্রহে সাতটি গল্পের মধ্যে 'অকাজের কাজ' গল্পটিও আবার পৃথক্ মুদ্রিত হয়েছে।

২। গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ভাগলপুর কিশোর সাহিত্যসভার দ্বিতীয়া সভ্যা হিশেবে অনুপমা বা নিরুপমা দেবীর নাম করেছেন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ইনি প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যসভায় যোগ দিতেন না। দাদা বিভূতিভূষণ ভট্ট সাহিত্যসভায় বোনের লেখা পাঠ করতেন,—সে বিষয়ে আলোচনা সমালোচনা যা হত, নিজেই গিয়ে বোনকে

জানাতেন। সে সময়ে নিরুপমা দেবী বিশেষভাবে কবিতাই লিখতেন। যদিও 'অঙ্গুলি যন্ত্রে' মুদ্রিত 'ছায়া' পত্রিকায় 'তারার কাহিনী', 'প্রায়শ্চিত্ত' ইত্যাদি "ছোট ছোট গল্পাকারে গল্প" কয়েকটি প্রকাশিত হয়েছিল, তবু লেখিকা বলেছেন—"গল্প লেখার ক্ষমতা অন্ততঃ আমার সে সময়ে আসে নাই। শ্রীমতী অনুরূপা এবং স্পর্শমণির লেখিকা সুরূপা দিদি (৺ইন্দিরা দেবীর)র উৎসাহেই আমি প্রথম একটা বড় গল্প লিখি।"[২৬] বস্তুত গল্প-লেখিকা নিরুপমা শরৎগোষ্ঠীর তত অনুব্রতী নন, যত তিনি মহিলা-শিল্পী ইন্দিরা-অনুরূপার সগোত্রা। তাই এঁর গল্প-কথা নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে,—ঐসব 'মহিলা গাল্পিক'দের একই প্রসঙ্গে।

এবারে তাই আসেন শরৎগোষ্ঠীর দুটি গঙ্গোপাধ্যায়-শিল্পী,—যাঁরা শরৎচন্দ্রের সম্পর্কিত মাতুল, কিন্তু দুজনেই ছিলেন শুধু শরৎ-শিষ্য নন,—শরৎচন্দ্রের অনুসারী এবং অনুকারী-ও।

গিরীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প-সংগ্রহ 'মঞ্জরী'র পূর্বাভাষ-এ বলেছেন,—"অনেকগুলি গল্পে পতিতা অথবা পুণ্যপথ-ভ্রষ্টার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তাহার কারণ সংসারের বহুবিধ সমস্যার মধ্যে ইহাদিগকে আমি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করি না। সমাজ যাহাদিগকে কলঙ্কের ছাপ দিয়া আপনার গণ্ডির বহির্ভূত করিয়া দিয়াছে তাহাদের অনেকেরই হয়ত মুহূর্তের উত্তেজনা অথবা ক্ষণিকের ভ্রান্তির বশে পদস্খলন হইয়াছে, তাহাদের অনেকেই হয়ত তাহার জন্য দারুণ অনুশোচনার কাজ করিয়াছে, এবং এমন যদি কেহ উদার-হৃদয় মহানুভব থাকেন যাঁহারা তাহাদের অপরাধকে মার্জনা করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে সংসার হয়ত তাহাদিগকেই আবার সার্থক গৃহিণীরূপে, স্নেহময়ী সেবিকারূপে, প্রেমময়ী নারীরূপে ফিরিয়া পাইতে পারে।"

শরৎ-সাহিত্যের অবহিত পাঠক লক্ষ্য করবেন,—এ হচ্ছে শরৎচন্দ্রের কথিত-অকথিত বহু অনুভূতির,—তাঁর সকল মর্মকথারই প্রতিধ্বনি। দোষ এতে কিছু নেই। কিন্তু শিল্পের পুঁজি শিল্পীর জীবনানুভূতির রক্তক্ষরা ভাণ্ডারে সঞ্চিত হতে হতে তাঁর হৃদয়-যন্ত্রণায় নিষিক্ত হয়েই মধুমান্ হয়ে ওঠে। অনুভূতি-অভিজ্ঞতার সেই অমৃত-সঞ্চয় না থাকলে অনেক ভাল কথাও ভাল শিল্প হয়ে ওঠে না। শরৎচন্দ্রের অগ্নিদীপ্ত বিদ্রোহে ভরা অসামাজিক জীবন-রূপায়ণের মূলেও ছিল তাঁর অস্বাভাবিক "ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখের মন্থন।" কাপালিক-সমুচিত জীবনের সেই ভয়ঙ্কর-সুন্দর অভিজ্ঞতা আস্বাদনের আলাকর সৌভাগ্য অনেকের জীবনেই আসে না,—

২৬। নিরুপমা দেবী—'আমাদের শরৎ দাদা'; তদেব।

গিরীন্দ্রনাথের জীবনেও আসেনি। তাই তাঁর জীবনাদর্শ জীবনানুভূতির উষ্ণ-রক্তিমায় সিঞ্চিত না হতে পেরে কেবল গালগল্প হয়েই রয়েছে, ভালো গল্প হতে পারেনি।

টেক্‌নিক্‌-এর দিক থেকেও সেই প্লট্‌-নির্ভর বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু চরিত্রায়ণের সজীবতা নেই, গল্পগুলোও তাই স-প্রাণ নয়। প্লট্‌-এর দিক থেকেও শরৎ-ভাবনার ছাপ সুলক্ষ্য। 'প্রত্যর্পণ'-গল্প যেন মামলার ফল-এর নারীসংস্করণ,—'প্রত্যাবর্তন' 'আঁধারে আলো'-র পরিপূরক। কিন্তু সে প্রাণ, সে শক্তি এদের মধ্যে বিচ্ছুরিত হতে পারেনি।

৩। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ছিল একান্ত অন্তরঙ্গ। ইনি 'কল্লোল' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের জীবন-কথা লিখে প্রকাশ করেছিলেন ;—শরৎ-জীবনের শেষ পর্যায়ে এঁর সেবা ও সান্নিধ্য-চারণের নিষ্ঠা ঐতিহাসিক মর্যাদা অর্জন করেছে। সৃষ্টির দিক্ থেকে এই শরৎ-সান্নিধ্য-চারণের অভিনবতা রয়েছে। এমন কি নিষ্প্রাণ সমাজনীতির বিরুদ্ধে প্রাণসত্যের বিদ্রোহ রচনায় সুরেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের পথ অনুসরণ করে গুরুর চেয়ে কিছুটা এগিয়েও গেছেন। এদিক থেকে তিনি যেন অনেকটাই 'কল্লোল'-যুগের পূর্বসাধক। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, সুরেন্দ্রনাথের গল্পের কোনো সংকলন প্রকাশিত হয়নি, 'যমুনা', 'বঙ্গবাণী', 'সংহতি'র সঙ্গে 'কালিকলম' পত্রিকাতেও এঁর অনেক গল্প প্রকাশিত হয়েছিল।

সুরেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য বিন্যাস-ভঙ্গির কাব্যগন্ধী রহস্যময়তায়। সমাজবিরোধী প্রাণপ্রবাহের বিদ্রোহী গতির চিত্রণে তিনি এক রোমান্স-সংকেতময় ভাষা ও উপস্থাপনা-পদ্ধতির অনুসরণ করেছিলেন। তাতে বিদ্রোহের বিক্ষোভ স্পষ্টতার অভাবে বাস্তবেতর স্বপ্নময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। দৃষ্টান্ত হিশেবে 'খোকা আয়! খোকা আয়!' গল্পের কথা বলা যেতে পারে।[২৭] বিধবা মেজবৌ-এর বিরহ-বিলাস এবং সে রোগের ঔষধ হিশেবে বিদেশী বোতলের রঙিন তরল পানীয় গ্রহণের যে ছবি রয়েছে, তাতে বালিগঞ্জ-বিলাসী সমাজের রূপ-চিত্রণে দুঃসাহসের আভাস আছে। এমন কি, সন্ত-পুত্রহীন হৃদয়ে ছোটবৌ যে-করে 'বুকের ধন বুকের মধ্যে' ফিরে পাবার অনুভূতিকে আবিষ্কার করল, তাতেও মাতৃত্বের অন্তর্লীন যৌনতার প্রতি এক অলজ্য্য সংকেত যেন রয়েছে,—কিন্তু সবই অস্পষ্ট, তাই বড় দুর্বল!

২৭। দ্রষ্টব্য 'কালিকলম'—ভাদ্র ১৩৩৪ সাল।

ছোট সাহেবের চলে যাবার আগের দিন; অনেক দিনের জন্য আবার কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাবেন তিনি।

আজ "যে যা চাইলে সব পেয়ে গেল!

ছোটবৌ-এর মলিন মুখ, খালি বুক: কি চাইবে সে নিজেই জানে না।

কালই ত চলে যাবার দিন!

সমস্ত দিন দুচোখ ভরে উঠ্‌ছে জলে; কিছুতেই বাঁধ মানতে চায় না পোড়া চোখের জল।

চোখে জল-না-আসার ওষুধ একটু খেলেই ত পারে।

সে বুদ্ধি তার সন্ধ্যাবেলায় হল, আজকের রাত কিছুতেই কেঁদে কাট্‌তে দেবে না!

একি! ছোটবৌ যে এলিয়ে পড়ে!

কি হল তোর ছোটু?

কি জানি মেজদিদি, চোখ জুড়ে আসছে যে ঘুমে।

আ মরণ, আপনহারা ছুঁড়ি!

বড়দিদি বলেন, তা ঘুমুতে জাগ্‌না কেন?

মেজদিদি রাগ করতে করতে চলে যান নিজের ঘরের দিকে!

ছোটবৌ এলিয়ে পড়ে ঝরা ফুলের মত। তলিয়ে যায় তার ইহলোক-পরলোক, কামনা-বাসনার বিশ্বসংসার, অসীম শূন্যতার মাঝখানে।

তবুও মনের কোন অন্ধকার গুহায় কে যেন সজাগ হয়ে জেগে থাকে! সব-নেই-এর মধ্যে তবু সে আছে, তবু সে থাক্‌বে!

দুটো সবল হাত দিয়ে কে তাকে জড়িয়ে ধরে টেনে তুলচে; কে তার সব ভুলে যাওয়ার স্বপ্নের মধ্যে চেতনা এনে দিয়ে বলে, তুই যে কিছু চাইলি নে?

তুমি কে?

ডুবুরি!

আমায় ঘুমোতে দেবে না?

সেই দুহাতে জড়িয়ে ধরা! সেই বুকের মধ্যে টেনে নেওয়া!

ওকি! ঝড় উঠেছে বুঝি?

দুলচে—দুলচে—হিম-সমুদ্র ঝড়ের দোলায় দুলচে।

একি ঢেউএর চাপ ? না না, এ যে গরম, এ যে আগুন !
হিম-সমুদ্রে আগুন লেগেছে।

সকাল হয়েছে। ছোটবৌ এক ছুটে পুকুরে নাইতে যায়। কি বলে ঐ নির্লজ্জ পাখিটা বার বার মাথার ওপর শিরিশ গাছের ডালে বসে !

ওমা ! বুক আর খালি নয় !

এলো নাকি বুকের ধন বুকের মধ্যে !"

এ গল্পের বর্ণনায় গোপন-কথার বলিষ্ঠ চিত্রণের দুঃসাহস যেন অস্পষ্ট কবিতা-কাকলির আবরণের তলায় কুণ্ঠিত মুখ ঢেকেছে। তাতে বাস্তবের রূঢ় প্রাঞ্জলতা লুপ্ত হয়েছে, কবিতার ব্যঞ্জনাও স্পষ্ট হয়নি। ফলে গল্পের সংসক্তি না বস্তুজগৎ, না রোমান্টিক কল্পনায়, কোথাও প্রগাঢ় হতে পারেনি। 'বিচারক'[২৮] গল্পে শরৎ-ভাবনার ছাপ প্রগাঢ়। প্রয়াগের আশ্রমাধিপ স্বামী লীলানন্দের প্রতি নটী কস্তুরী-বাঈ-এর অকুণ্ঠ প্রেম-বিধুরতার ট্রাজেডি-সুরভিত এ গল্প। কিন্তু গল্পের শরীরে রয়েছে অস্পষ্টতার আবরণ-ছড়ানো সেই একই কবিতাগন্ধী ভাষা। কেবল theme নয়,—গোটা গল্পটির বিন্যাস এমন যে, তাৎপর্য খুঁজে খুঁজে মন কিছুতেই তৃপ্ত হতে পারে না। এ-কে সাংকেতিক, রহস্যময় বা রোমান্টিক্ বল্‌ব না। এযেন সেই স্বপ্নের কথা, ঘুম ভেঙে গেলে যার প্রীতিস্নিগ্ধ স্মৃতি-চারণ করতে ভালো লাগে,—অথচ খুজে খুজে সব খুঁটিনাটির সব রহস্য কিছুতে সচেতন মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। অভিজ্ঞতার গভীরতায় শরৎচন্দ্রের জীবন-ভাবনার অনেক পেছনে, এবং জীবন-প্রত্যয়ের দুঃসাহসী চিত্রণে 'কল্লোল'-ভূমির পূর্ববর্তী অস্পষ্ট দুর্বল মাটিতে এর শেকড়,—তাই গদ্যে-পদ্যে,—বাস্তব-স্বপ্নে সুরেন্দ্রনাথের গল্পে এমন দোটানা।

৪। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শরৎগোষ্ঠীর লেখকদের প্রসঙ্গ কিছুতেই শেষ হয় না আর একজনের কথা না বললে, —তিনি আমাদের কালের[২৯] প্রবীণ লব্ধকাম গল্প-শিল্পী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। উপেন্দ্রনাথের শিল্প-সাধনার প্রকৃতি শরৎচন্দ্রের চেয়ে আমূল পৃথক্,—এই বিচারে বিভূতিভূষণের (ভট্ট) চেয়েও তিনি শরৎ-শিল্প-ধর্ম থেকে অনেক বেশি দূরান্বিত। ভাগলপুরের কিশোর-সাহিত্য-সভার সঙ্গে এঁর যোগ ছিল কম। সেই সাহিত্যসভা থেকে যখন 'অঙ্গুলি যন্ত্রে মুদ্রিত' হয়ে 'ছায়া' পত্রিকা প্রকাশিত হত, তখনই সাউথ সুবার্বণ

২৮। দ্রষ্টব্য 'কালিকলম'—শ্রাবণ ১৩৩৩ সাল।

২৯। এ-রচনাটি উপেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় লিখিত হয়; তাঁর ভালও লেগেছিল খুব। সেই পুণ্যস্মৃতির স্মরণে লেখাটি অপরিবর্তিত রইল।

স্কুলের সহপাঠী বন্ধুদের নিয়ে উপেন্দ্রনাথ একটি সাহিত্যসমিতি গড়েছিলেন ;—এই ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির মুখপত্র হিশেবে প্রকাশিত হত 'তরণী' পত্রিকা। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন এর যুগ্ম-সম্পাদক। এটিও হাতে-লেখা কাগজ,—'অঙ্গুলি যন্ত্রে মুদ্রিত।' 'ছায়া' এবং 'তরণী' পত্রিকার বিনিময় হত দুই পরিচালকগোষ্ঠীর মধ্যে। তাতে একপক্ষ অপর পক্ষের রচনাদির সমালোচনা বিচার করে পাঠাতেন। জানা নেই, এই উপলক্ষ্যেই কি না, শরৎচন্দ্র বয়ঃকনিষ্ঠ এই জ্ঞাতি মাতুলটির সাহিত্যিক গুরুর আসন দখল করে বসেছিলেন। কোনো এক সময়ে উভয় তরফ থেকেই এই দাবী ও সম্মতি জমাট বেঁধেছিল নিঃসংশয়ে। তা না হলে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে উপেন্দ্রনাথের সদ্য প্রকাশিত 'লক্ষ্মী লাভ' গল্প পড়ে রেঙ্গুন থেকে শরৎচন্দ্র উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মুখবন্ধে লিখতে পারতেন না, "আমার মত তুমি বিশ্বাস করিবে কি না, তোমার কথাতেই প্রকাশ করিতেছি। 'বাপের মুখে ছেলের সুখ্যাতি শুনে কাজ নেই'।"[৩০]

এই সূত্রেই শরৎগোষ্ঠীতে উপেন্দ্রনাথের স্বাধিকার প্রবেশ। তা না হলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর আসন স্বতন্ত্রতার ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। বাংলার ছোটগল্প-সাহিত্যকে সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকার গোষ্ঠি-সমাশ্রিত করে দেখলে 'সাধনা'-'ভারতী' গোষ্ঠীর পরে উল্লেখ্যতার দাবি করে যথাক্রমে 'সবুজপত্র', প্রবাসী', 'কল্লোল' ও 'বিচিত্রা'-গোষ্ঠী। জন্মের হিশেবে 'বিচিত্রা' 'কল্লোল'-উত্তর হলেও স্বভাবের বিচারে কল্লোলেতর ; —অনেকটা পরিমাণে 'সাধনা'-'ভারতী'রই নব-যুগোচিত সংস্করণ। 'বিচিত্রা'র গল্প-সভায় নবীনতার যে সুর জাগল, তার মূল গায়েন 'প্রেমেন-অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব' নন,—রবীন্দ্রনাথ-উপেন্দ্রনাথের উত্তর-সাধনার ভূমিতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য আসন সেখানে। 'পথে-প্রবাসে'-র অন্নদাশংকর, 'অতসীমামী'-র মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়-ও 'বিচিত্রা'র পত্র-লোকে আত্মমুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। এই 'বিচিত্রা'-র সম্পাদক, 'বিচিত্রা'-যুগের নূতন-পুরাতন শিল্পিকুলের স্বপ্নদ্রষ্টা যোজক ছিলেন উপেন্দ্রনাথ। কিন্তু, তাঁর সৃজনশীল আত্মার বিকাশ-ইতিহাস আরো আগেকার। 'বিচিত্রা'-র সম্পাদক বাংলা কথাশিল্পের জগতে পূর্বাবধি ছিলেন স্থিত-প্রতিষ্ঠ। বয়সের বিচারে তিনি ছিলেন শরৎচন্দ্রের চেয়ে পাঁচ বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ ;—কালের দিক্ থেকে এঁরা প্রায় সমসাময়িক। দেশগত স্বভাবেই নয়, মনোগত অভিপ্রায়েও এঁদের উদ্ভিন্নকৈশোর-যৌবনের লগ্নে ঘনিষ্ঠ সাধর্ম্যের সংকেত পাওয়া গিয়েছিল,—কেবল এই কারণেই উপেন্দ্রনাথ শরৎগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

৩০। দ্রষ্টব্য—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'—সাঃ সাঃ চঃ।

তা না হলে, তাঁর ভাবনায় রবীন্দ্র-চিন্তারই পরিচ্ছন্ন ছাপ পড়েছে বেশি ; অবশ্য শিল্পীর স্বী-কৃত (assimilated) বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে। লেখক তাঁর স্মৃতি-কথায় এ-সত্য স্বীকার করেছেন। ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতিই উপেন্দ্রনাথের সাহিত্য চিন্তার সূতিকাগৃহ। এই সমিতির জন্ম-উৎসের পরিচয় দিয়ে উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমাদের এই যৌথ সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত হয়েছিল কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত চার বৎসরের আটখণ্ড সাধনা নামক মাসিক পত্রিকাকে অবলম্বন করে।····· নামে সম্পাদক না হলেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাধনার অস্থি এবং রক্ত। বিষয়বস্তুর ষোল আনার মধ্যে বার আনা থাকত তাঁর রচনা।"

প্রতি সন্ধ্যায় সমিতির কিশোর-সভ্যরা মিলিত হয়ে 'সাধনা'র সান্নিধ্য চর্চা করতেন,—একজন পড়ে যেতেন, অপরেরা শুনতেন—তারপর চলত নানা আলোচনা, এমন কি সমালোচনাও। এমনি করে লেখক বলেছেন,—"দীর্ঘকাল ধরে আমরা সাধনার পাঠগ্রহণ করেছিলাম। তার ফলে সাহিত্য বিষয়ে আমাদের ধারণা যত না বিস্তৃত হয়েছিল, গভীর হয়েছিল ততোধিক।"[৩১]

উপেন্দ্রনাথের উপন্যাস-শৈলীর বিশিষ্টতা সম্বন্ধে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, —"তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে যথেষ্ট কলাসংযম ও লিপিকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।··· তাঁহার স্থির সংযত বুদ্ধিবৃত্তি সুলভ উচ্ছ্বাস ও ভাব-প্রবণতার দ্বারা সহজে বিচলিত হয় না।···তবে মার্জিত বুদ্ধি ও সুরুচির প্রাধান্যের জন্য ভাবগভীরতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।"[৩২] এই কলা-সংযম আর মার্জিত বুদ্ধি ও রুচির শালীনতায় উপেন্দ্রনাথ অসংশয়ে রবীন্দ্র-মনোধর্মের সফল উত্তরাধিকারী। সেই সঙ্গে তাঁর অনন্য শিল্প-স্বভাব রবীন্দ্রানুসারীদের থেকে তাঁর আসনকে পৃথক্ পংক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেই স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়ে উপেন্দ্রনাথকে একজন স্বভাব-গাল্পিক বলা যেতে পারে।

আগে এক অধ্যায়ে বলেছি সোমারসেট মম দুঃখ করেছেন,—একালের কথা-সাহিত্যিকদের অনেকে নিছক গল্প বলাটাকেই একটি স্বয়ম্পূর্ণ উৎকৃষ্ট আর্ট বলে স্বীকার করতে পারেন না,—তাই গল্প বলবার জন্যেই গল্প লিখছেন একথা মানতে তাঁদের বাধে। বাংলা সাহিত্যে উপেন্দ্রনাথ অন্ততঃ সেই একজন শিল্পী যিনি গল্প-বলাকেই গল্প-লেখার চরম পরিণাম বলে মন-প্রাণে মেনে নিতে পেরেছিলেন। কোনো বড় আদর্শ,—কোনো মহৎ আনন্দ, কোনো মহত্তর বেদনার গুরুগম্ভীর জীবন-মহিমাকে ফলাও করে দেখার কিংবা দেখাবার কোনো গোপন প্রবণতাও সুলক্ষ্য নয় তাঁর ছোটগল্পগুলিতে। 'লক্ষ্মীলাভ' গল্পের প্রশংসা করে শরৎচন্দ্র তাঁর পূর্ব-ধৃত পত্রে বলেছিলেন,—"অনাবশ্যক আড়ম্বর নেই,

৩১। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-'স্মৃতিকথা'—২য় পর্ব। ৩২। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (৪র্থ সং)।

লোকের দোষ দেখানো, সংসারের দুঃখের দিকটা তুলিয়া ধরা ইত্যাদি কিছু নেই—শুধু একটি সুন্দর-ফুলের মত নির্মল এবং পবিত্র।" এইটুকুই গল্প-শিল্পী উপেন্দ্রনাথের সহজ স্বভাব; অনাড়ম্বর সাবলীলতায় ফুলের মত একটি ঝরঝরে গল্প গড়ে তোলা। সব গল্পই তাঁর খুব উৎকৃষ্ট হয়েছে,—এমন দাবি জোরের সঙ্গে করা চলে না। কিন্তু প্রায় সব গল্পেরই মুখ্য উদ্দেশ্য কেবল গল্প, একথা অসংশয়ে বলতে বাধা নেই। নিজের সাহিত্য-জীবনে উপেন্দ্রনাথ heredity-র প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় (৪র্থ পর্ব); নিজের মা'র নিখুঁত সুন্দর গল্প-বলার শক্তির মুগ্ধ-বিস্মিত বর্ণনা করেছেন। জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে শিল্পীর মাতৃঋণ-স্বীকার বহুদূর পৌঁচেছে তাঁর সাধনার মধ্যে,—মা'র মতো তিনিও সুরসিক গল্প-বলিয়ে।

তাই বলে উপেন্দ্রনাথের গল্প-শৈলীকে কথকতার সঙ্গে তুলনা করব না,—কথার তেমন সম্পন্ন সম্ভার,—তেমন সুর নেই তাঁর গল্পে। শিল্পীর সংযত স্বভাব তাঁর বক্তব্যকেও হ্রস্ব করেছে; কিন্তু তাতে "গম্ভীরার্থক চিন্তাশীলতা"র[৩৩] দ্যোতনা রয়েছে নিঃসন্দেহে। অর্থাৎ, উপেন্দ্রনাথের লেখা কেবল সংক্ষিপ্ত নয়,—সে সংক্ষিপ্তির কানায় কানায় ভরে রয়েছে অনেক না-বলা কথার অরুণালোক-দীপ্ত স্পষ্ট ব্যঞ্জনা। ফলে উপেন্দ্রনাথের স্বল্প-কথনের প্রাঞ্জলতা অনেক সময়ে অনেক বহু-কথনের পক্ষেও দুরায়ত্ত বলে মনে হয়। উপেন্দ্রনাথের গল্পকে জীবনসিন্ধু-মথিত বিষামৃত বলবার উপায় নেই; অত গভীর-গম্ভীরতার দাবি নেই তাঁর সুস্মিত গল্পে। কিন্তু নাতিগভীর রসস্নিগ্ধ সে গল্পের অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে বয়ে চলে জীবনের স্বচ্ছ স্রোত। মহৎ বা বিশেষিত কোনো মূল্য এই জীবনের আছেই, এমন কথা জোর করে বলা চলে না,—কিন্তু নিত্যদিনের যে-জীবন আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ না করেও আমাদের দেহ-মন-বুদ্ধিকে নিয়ত সিক্ত করে চলেছে, —সচেতন ভাবে স্বীকার করবার অবকাশ না-ও যদি ঘটে, তবু যে-জীবন আমাদের অবচেতনার গহনে নিজ অস্তিত্বের নিশ্চিত স্বাক্ষর প্রোথিত করেছে,—সেই সহজ অনপেক্ষিত জীবনের নাতিগভীর সুখ-দুঃখের দোলা বুকে বয়েই এগিয়ে চলেছে উপেন্দ্রনাথের গল্প।

তথ্য প্রতিপাদনের জন্যে একটি দুটি গল্পের কথা ভাবা যেতে পারে। ১৩২৭ বাংলা সালের 'যমুনা' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা) 'দ্বিতীয় পক্ষ' নামে গল্প প্রকাশিত হয়েছিল উপেন্দ্রনাথের। বিশেষভাবে এই গল্পটি গ্রহণ করছি এই কারণে যে, তা'র বদলে শিল্পীর অন্য যে-কোনো গল্প উদ্ধার করা যেতে পারত। অর্থাৎ, কোনো বিচারেই উপেন্দ্রনাথের শিল্পকর্মের কোনো বিশেষ রকমের প্রতিনিধিত্ব এ-গল্প দাবি করতে পারে না। দ্বিতীয়

৩৩। তদেব।

পক্ষের অপরূপ সুন্দরী তরুণীভার্যা সম্পর্কে বয়স্কতর দোজবরের অতি-প্রণয়ের সঙ্গে অতি-সংশয়ের উৎকণ্ঠাটিও এককালের শিক্ষিত বাঙালিসমাজে হাস্যকর কৌতুকের কারণ হয়ে উঠেছিল। নিছক প্লট্-এর বিচারে বলতে বাধা নেই, উপেন্দ্রনাথ সেই নির্দোষ-কৌতুকের একমুঠো আনন্দ গল্পের আধারে আমাদের উপহার দিয়েছেন। কিন্তু কৌতুক-গল্প বলেই নিছক 'হাসির গল্প' নয় এটি।

দ্বিতীয় পক্ষের স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে প্রণয় বা সংশয়ের আতিশয্য কেবল লঘু কৌতুকের উপাদান নয়, দাম্পত্য সম্পর্কের সহজ মাধুর্যের মধ্যে এক দুর্লক্ষ্য-হলেও-অনপনেয় গ্লানির কালিমা তাতে জড়িয়ে থাকে। ফলে পত্নীর অকারণ অসম্মান ও নির্যাতন ঘটে, এবং স্বামীর পক্ষে একমাত্র লাভ হয় স্বভাবের দীনতা-হীনতা, সেই সঙ্গে অকারণ মর্মযন্ত্রণা। অথচ এর সব কিছুই অকারণ। তারাপদ কনকলতাকে ভালবেসেছিল তার প্রথমা স্ত্রীর চেয়ে কম বা বেশি পরিমাণে নয়। ভালবাসার স্বভাব এবং মাত্রা স্থানকালের সদৃশতার প্রভাবে প্রায় অভিন্ন হয়েছিল। তবু এই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সম্পর্কে তারাপদ কিছুতেই সহজ হতে পারছিল না,—না প্রেমে, না ব্যবহারে, না সংশয়ে। তার সবটুকুই কনকলতার অপরূপ সৌন্দর্য বা তার বয়সের নবীনতার দরুন নয়। দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ প্রসঙ্গে তারাপদর অবচেতনায় প্রোথিত অস্পষ্ট সংকোচ ও কুণ্ঠা তার মনোভঙ্গিকেও অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। নাতি-প্রবল আঘাতের চিকিৎসা দিয়ে লেখক তারাপদর সেই অসুস্থ মানসিক কুণ্ঠার রূপ উন্মোচিত করেছেন,—সহজ হয়ে উঠেছে আবার দম্পতির জীবন। গল্পে এই 'শক্-থ্যারাপি'র কৌতুক-স্নিগ্ধ হাস্যরসের সঞ্চার করেছে। অথচ অন্তর্নিহিত মানস অস্বস্তির অস্ফুট আভাস গল্পটিকে কলহাস্যে লঘু হতে দেয়নি। নির্দোষ মধুর হাসির কমিক-কথাকে মানবিক অসুস্থতার নাতিতীব্র গভীরতায় জড়িয়ে যথার্থ 'কমেডি'র মর্যাদা দিয়েছেন শিল্পী। অথচ সারাটি গল্পের কোথাও দ্বিতীয়-বিবাহের সামাজিক কিংবা দাম্পত্য-জীবনগত বিভ্রাট প্রসঙ্গে লেখকের কোনো বিশেষ বক্তব্যের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও কোথাও আত্মগোপন করে নেই; শিল্পীর সকল কথাই তাঁর আপন দেহের সীমায় ধরে ভরপুর হয়ে উঠেছে। তাই গল্পের বাইরে উপেন্দ্রনাথের রচনায় শিল্প-রসের আর কোনো আশ্রয় নেই;—গল্পই তাঁর সৃষ্টির উৎস,—গল্পেই তার শেষ।

আগেই বলেছি, উপেন্দ্রনাথের সকল গল্প সম্বন্ধেই এ-কথা সাধারণভাবে বলা চলে,—এ সত্য প্রতিপাদন করবার জন্যে আর একটি গল্পের কথা বলব। কিন্তু তার আগে লেখকের অর্থবহ নির্ভার রচনাশৈলীর সুমিতি-সংক্ষিপ্ত প্রকাশের তাৎপর্যপূর্ণতার পরিচয় হিশেবে 'দ্বিতীয় পক্ষ' গল্পেরই একটি অংশ উদ্ধার করি :—"দ্বিতীয় পক্ষের নাম কনকলতা।

আকৃতির সহিত নামটির দুই প্রকারের সার্থকতা ছিল। বর্ণ—তাহার কনকের মত সুন্দর, এবং গঠন লতার মত কোমল ছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝা গেল নামটি কনকলতার পরিবর্তে লৌহ-শৃঙ্খল হইলে অপর একটা দিক হইতে সার্থক হইত—অর্থাৎ অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তারাপদকে যে কঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিলেন, সে কনকলতার মত মধুর হইতে পারে, কিন্তু লৌহশৃঙ্খলের মত দৃঢ়।"—'কনকলতা' 'লৌহশৃঙ্খলে' পরিণত হয়েছে,—তারাপদর নবজীবন সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত রূপ-কল্প অতিকাব্যিক না হয়েও স্মিত ছোটগাল্পিক ব্যঞ্জনায় ভরপুর হয়ে আছে। এখানেই উপেন্দ্রনাথের শিল্প-শৈলীর স্বকীয়তা; কাব্য-গন্ধহীন অনাসক্ত ভাষণের উদারতায় তিনি সার্থক ছোটগাল্পিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

'কমিউনিস্ট প্রিয়া' গল্পটি অপেক্ষাকৃত হালের রচনা,—উত্তর-স্বাধীনতা কালের পটভূমিতে তার উপস্থাপনা। এদিক থেকে উপেন্দ্রনাথের পরিবেশ-সচেতনতার একটি সার্থক পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। সাধারণতঃ নরনারীর রোমান্টিক্ প্রণয়, এবং পরিবার-জীবনে প্রেম-বাৎসল্যের বিচিত্র মধুরিমা আশ্রয় করেই তাঁর অধিকাংশ গল্পের জন্ম। তাতে বৃহত্তর জীবনের সমস্যা-জটিলতার কোনো ছাপ পড়তে পারেনি প্রায়ই; যেটুকু পড়েছে তাও অগভীর। তাই বলে আকাশ-কুসুমের স্বপ্নলোকে শিল্পী তাঁর কল্পনাকে ভাসিয়ে দেননি কখনো। আগে বলেছি, প্রতিদিনকার সহজ সাধারণ অনতিরেক জীবনকে সঙ্গে নিয়েই ভেসেছে উপেন্দ্রনাথের গল্পস্রোত। ফলে জীবনের মর্মস্পর্শী গভীরতার অনুভব দুর্লভ হলেও নিত্য-চলা জীবনের মৃদু সৌরভ প্রায় সর্বত্রই উপস্থিত। আগে দেখছি, 'দ্বিতীয় পক্ষ' গল্পে সেকালের দাম্পত্য-জীবনের একটি সমস্যা-জটিল মুহূর্ত কমেডি'র জীবন-কৌতুকে স্নিগ্ধ রূপ পেয়েছে। তার অনেকদিন পরে, আমাদের জীবনে দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত্তি পাল্‌টেছে আমূল। সামাজিক সংস্কার ও ধর্মীয় আচার-নিষ্ঠার বদলে একালের বিবাহিত জীবনে নরনারীর মধ্যে মন ও মতের মিলের প্রয়োজন-বোধই প্রবল হয়েছে। ফলে, একালের ভাবী দম্পতি অনেক ক্ষেত্রেই সেই কামনার নিশ্চিত প্রত্যয় প্রাক্-বিবাহ প্রণয় সম্পর্কের মাধ্যমেই আহরণ করতে চায়। 'দ্বিতীয় পক্ষ'-র তারাপদ ও কনকলতার জীবন-কথা একালে বহু দূরগত ইতিহাসের কাহিনী।

একালের নারী, গৃহিণী বা প্রণয়িনী, কনকলতার মত আর একান্ত পুরুষ-বিলগ্ন-জীবন নয়। শিক্ষায়, স্বাতন্ত্র্যে, জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে অন্য-নিরপেক্ষ স্বসম্পূর্ণতায় সে উজ্জ্বল। তাই ভাবী স্বামীর সঙ্গে মনের মিল নিয়েই সে সন্তুষ্ট হতে পারে না,—মতের মিলও সে-পক্ষে অপরিহার্য, এমন কি রাজনৈতিক মতেরও মিল। এধরনের ভাবনার মধ্যে অবাস্তবতাজনিত এক রকমের কৌতুক রয়েছে। বাস্তবক্ষেত্রেও সাধারণতঃ দেখা

যায় রাজনৈতিক মতবাদের পার্থক্য দাম্পত্য সম্প্রীতির পক্ষে বাধা হয়ে নেই। তাছাড়া, গল্পের নায়ক সুকুমার বিলাত-ফেরত ইঞ্জিনিয়ার, আর নায়িকা কমলাও কিছু জাত-রাজনীতিবিদ্ নয়। তবু এদের মধ্যে মতবাদের বিরোধ ও টানাপোড়েন চলতে লাগল নির্বাচন উপলক্ষ্য করে। নায়ক কংগ্রেস-আদর্শের ধারক, কমলার দাদা বিজয়েশ কমিউনিস্ট্ নেতা। এই কৌতুককর বিরোধের লঘুতাকে লেখক এগিয়ে পড়তে দেন্‌নি ;—সুকুমারের কণ্ঠে বংশগত ঐতিহ্য ও মহিমা-বোধের স্বয়োচ্চার বেদনার মূর্ছনা সৃষ্টি করে গল্পকে সিরিয়াস্ করে তুলেছেন। ফলে, আবারও কমিক্ সম্ভাবনা জীবন-রসস্নিগ্ধ কমেডিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সুকুমারের কমিউনিস্ট-প্রিয়া কমলা শুষ্ক মতবাদের বিতণ্ডা-ভূমি থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনে ভাবী স্বামীর বেদনাহত মনের অদৃশ্য আঘাত-বিন্দুতে প্রলেপের মত জড়িয়ে বেঁধেছে নিজেকে,— বাধা মানেনি কিছুতে। দাদা বিজয়েশকে দুঃখ দিয়েছে তার অন্যায় রকম জেদ ; তবু বিবাহের পূর্বেই কমিউনিস্ট্ দাদার আশ্রয় ছেড়ে কংগ্রেসী শ্বশুরবাড়িতে ভাবী অধিকারকে আগাম আয়ত্ত করতে ছুটে গেছে সে। এই অপ্রত্যাশিত আনন্দের বার্তা শুনে সুকুমার মনে মনে বলেছিল "এই হচ্ছ তুমি কমলা ! এই হচ্ছে তোমার অদ্ভুত প্রকৃতি ! আর, হে আমার কমিউনিস্ট্ প্রিয়া, আর এই জন্তেই তোমার ওপর এত আমার মোহ !"—আগাগোড়া গল্প পড়লে বুঝি, কমলা আসলে অদ্ভুত নয় ; মনসিজ-মোহিনী নারী চিরকাল মতের চেয়ে মনের সাধর্ম্যকেই শ্রেষ্ঠ মূল্য দিয়েছে,—তাই প্রিয়ার জীবনবেদীতে কমিউনিস্ট্ কমলার আত্মদানে গল্পের নিরুচ্চার মহৎ পরিণতি। অর্থাৎ, গল্পেই গল্পের শেষ হয়েছে এখানেও, পৃথক্ ভাবে জীবনদর্শন বিস্তারের অবকাশ শিল্পীর সচেতন মন কখনো দাবি করেনি প্লট্-এর মধ্যে।

একালের জীবন-সমস্যার পটভূমিতে আরো দুটি উল্লেখ্য গল্প 'সীমার সমস্যা' আর 'কেউ কম নয়'। প্রথমটির জীবন-প্রচ্ছদ 'কমিউনিস্ট্ প্রিয়া'র সমধর্মী। দ্বিতীয়টির পটভূমি ছাপ্‌রা জেলার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় পীড়িত 'ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ'-এর চাষী পল্লীতে। দুটি হিন্দু-মুসলমান নারীর অতুল্য মানবিক সহৃদয়তার মধুমান্ পরিণাম গল্পটিকে প্রাণ-সুরভিত করে রেখেছে। তবু এ-কথাও স্বীকার করতেই হয়, উপেন্দ্রনাথের পরিবেশ-সচেতনা বস্তু-জীবনের নিঃসংশয় উপাদানের দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। গল্পের প্লট তিনি আহরণ করেছেন, 'জীবনে যা হয়' তার থেকে নয়, 'যা হলেও হতে পারত' তার থেকে। এই কারণেই তাঁর গল্পের তথাকথিত অবাস্তব স্বপ্নবিলাসিতা অনেক বস্তুরসিক পাঠককে হতাশ করে। কিন্তু গল্প-গল্পই ; বাস্তব নয়,—একথা মেনে নিয়ে উপেন্দ্রনাথের কাহিনী-জগতে প্রবেশ করতে রাজি থাক্‌লে সে গল্প থেকে রস খুঁজে পাওয়া প্রায়ই দুঃসাধ্য হয় না। 'সাতদিন' গল্পটি এ-তথ্যের এক আশ্চর্য উদাহরণ।

অবশ্য এই গল্পরস, বা গল্প-কৌতুক মাঝে মাঝে লঘুতার দরুন নিছক গালগল্প হয়ে উঠেছে,—আর উপেন্দ্রনাথের সার্থক গল্পের তুলনায় গালগল্পের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। তাঁর শেষ দুটি গল্প-সংকলন 'সাতদিন' ও 'বেলকুঁড়ি'র বেশির ভাগ গল্পই এ-সত্যের সমর্থন করবে।

কেবল কৌতুককর রচনাতেই নয়, এই শিল্পীর করুণ গম্ভীর গল্পেও অনতিগভীর জীবনরসের সঙ্গে অ-মিশ্র শুদ্ধ গল্পরসের সমন্বয়ে এক মোহকর স্নিগ্ধতা-বোধের সঞ্চার হয়েছে,—'হেমাঙ্গিনীর সুটকেশ' গল্পটি এই তথ্যের সুন্দর উদাহরণ।

উপেন্দ্রনাথের অসংখ্য গল্প আজও সংকলিত হবার অপেক্ষায় বিভিন্ন সাহিত্য-পত্রিকার পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করে রয়েছে। সর্বপ্রথম গল্প-সংগ্রহ 'সপ্তক'-এর অধিকাংশ গল্প লেখক অন্যান্য সংকলনে গ্রহণ করেছেন, ফলে ঐ সংকলনটি এখন পরিত্যক্ত হয়েছে। এঁর অন্যান্য সংকলনের মধ্যে আছে 'নাস্তিক', 'রাতজাগা', 'গিরিকা', 'নবগ্রহ', 'কমিউনিস্ট-প্রিয়া', 'সাতদিন', 'বেলকুঁড়ি' ও শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'শ্রেষ্ঠ গল্প'-সংকলন।

দশম অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্প ঃ আদিপর্ব (৪)

হাসির গল্প ও গল্পকার

'Encyclopaedia of Wit, Humor and Wisdom' গ্রন্থের মুখবন্ধে সম্পাদক L. B. Williams বলেছেন,—'Who cares about the whys and wherefores of laughter?' কান্নার মত হাসিও একান্তভাবে 'জীবনের ধন',—তাকে ফেলা চলে না—বাধা দেবার উপায় নেই! অশ্রু-তে অন্তর-নিরুদ্ধ বেদনার অভিব্যক্তি, হাসিতে স্বয়ংপ্রকাশ হৃদয়-সুখের আস্বাদন। দমকা হাওয়ার মত মনের গভীরের অনেকখানি দম আর উত্তাপকে আনন্দের ধারায় গলিয়ে বাড়িয়ে দেয় হাসির প্রবাহ।—তার হিশেব-নিকেশের পরিমাণ খুঁজতে গিয়ে এক-আঁজলা সুখের স্বাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে কে? দুঃখের হিশেব মিলোতে মানুষের ঔৎসুক্য বেশি; তাতে দুঃখের শেষ না হোক, দুঃখ নিরসনের সম্ভাবনার সংকেত খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া দুঃখের হিশেব

করে করে তা যদি অথৈ-অপার হয়, তাহলেও সে ভাবনাতেও নাকি অনির্বচনীয় তৃপ্তি লুকিয়ে থাকে বেদনারস-সম্ভোগের। তাই দেখা যায়, জীবনে যেমন, তেমনি সাহিত্য-শিল্পেও হাসির চেয়ে অশ্রুর কারবার বেশি,—হয়ত বিচার-বিশ্লেষণ বা পুনঃপুনঃ আলোড়নের মধ্য দিয়ে তার আবেদন দীর্ঘস্থায়ী (sustained) হয় বলেই।

কিন্তু জীবন কেবল অশ্রুর মালা গাঁথা নয়;—হাসির উচ্ছ্বাস ক্ষণস্থায়ী যদি হয়ও, তার স্বতঃস্ফূর্ত অনাবিলতাকে তবু অস্বীকার করবার উপায় নেই। আর সাহিত্য যে-হেতু জীবন-সম্ভব, তাই হাসির ক্ষণ-সম্পূর্ণ নিটোল রূপটিকে সাহিত্যের আসরদরবার থেকে বহিষ্কৃত করা সম্ভব হয়নি;—যদিও হাসিকে দুঃখ-বেদনার তুলনায় লঘু, দুর্বল ইত্যাদি বিশেষণে অনেক সময়েই অভিযুক্ত করা হয়েছে। সাহিত্যের জগতেও জীবনের মতই হাস্যরসের রূপায়ণ স্বতঃস্ফূর্ততার subtlety-র গভীরে;—সম্ভোগের সঙ্গে সঙ্গে সৃজন-শৈলীকেও এখানে একসঙ্গে হৃদয়গত করতে হয়, তা না হলে পৃথক বিচারের চেষ্টায় মূল রসের স্বাচ্ছতা ফিকে হয়ে পড়ে। তাই পূর্বোক্ত একই আলোচক ঘোষণা করেছেন,—"We do not care whether humorous stories are classified under three heads or twenty seven; what we want is the chuckle."

তা'হলেও, বাংলা হাসির গল্প আলোচনার শুরুতেই হাসির রকম-ফের নিয়ে শ্রেণী বিভাগ করতে হয়। তার কারণ, হাসির মূল উৎস জীবনে হলেও, সাহিত্যেই তার স্পষ্ট প্রকাশ। বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন,—"It is obvious that humour and wit spring primarily from real life and belong to it. ......But they greatly improve in the process of being reported: it is not only that the incident, when it becomes a tale, gains in the telling and the *bon mot* becomes neater and more pointed, but to communicate the amusement greatly enhances the pleasure. Jokes of nearly every kind are improved by repetition, and literature is but speech at its best, so it stands to reason that the highest humour will be found in books."[১]

অর্থাৎ, জীবনে হাসির উৎস দেখা দেয় দম্‌কা ঝড়ের মত অকস্মাৎ। ভেবেচিন্তে কাঁদা হয়ত সম্ভব, কিন্তু হাসা কিছুতেই নয়। রুগ্ন শীর্ণদেহা বৃদ্ধা ভিখারিণী ভিক্ষা প্রার্থনা করবার অতি আগ্রহে হোঁচট্ খেয়ে পড়ে গেলে দুঃখ হয়। সেই পড়ে যাওয়ার পেছনে বৃদ্ধার জীবনের যে নিঃসহায় রূপটি আত্মগোপন করে আছে, তা ভেবে দেখ্‌লে দুঃখের সঙ্গে অনুকম্পা যুক্ত হয়ে ভাবের গাঢ়তা জন্মায়। অন্যপক্ষে একটি পালোয়ান গোছের

১। Humour and Wit;—Cassel's Encyclopaedia of Literature Vol. I,

লোক সদর্পে চলতে চলতে পা ফস্কে হঠাৎ চিৎ হয়ে পড়লে হাসি পায়। কিন্তু কাছে গিয়ে যদি এই আকস্মিক পতনের কারণ সন্ধান করে একটি অযত্ন নিক্ষিপ্ত কলার খোসা দেখতে পাই, তাহলে হাসির বদলে পথচারীর অনর্থকারী কোনো এক দায়িত্বহীন সামাজিকের প্রতি বিরক্তি জন্মে। সেই সঙ্গে লোকটির আঘাতের গুরুত্বও যদি অনুভূত হয়, তা হলে হাসির পরিবর্তে উৎকণ্ঠা ও সহৃদয়তায় মন ভরে ওঠে। এদিক্ থেকে জীবনের অভিজ্ঞতায় হাসির স্বাদুতা তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির ঘুমিয়ে জল পান করার মত। ঘুমের মধ্যে কারো খুব তৃষ্ণা পেয়েছে,—গলা শুকিয়ে কাঠ! অথচ ঘুম ভেঙে জল খাবার মত সচেতনতাও ঠিক আস্‌ছে না। শুষ্ককণ্ঠের গোঙানি, কিংবা কোনো অবচেতন আবেদন শুনে অপর কেউ মুখের সাম্‌নে এক গ্লাস জল তুলে যদি ধরে, আর ঘুমের মধ্যেই তা আকণ্ঠ পান করে শুয়ে পড়া যায়,—তাহলে তৃপ্তির আমেজে ঘুম তখন গাঢ়তর হয়ে ওঠে। এ তৃপ্তি না-জেনে পাওয়ার চরিতার্থতায় মদির। কিন্তু জেগে থেকে, পরিচ্ছন্ন পাত্রে সুপেয় পানীয় গ্রহণের সচেতন পরিতৃপ্তি আর এক ধরনের। সাহিত্যের পাত্রে হাসির ঐ প্রথমোক্ত সুধারসই পান করি আমরা।

বস্তুতঃ রসের স্বাদুতাকে অনেকটা বিপর্যস্ত না করে জীবনের ক্ষেত্রে হাসির উপভোগ, এবং তার উৎস ও প্রকরণের পৃথক বিচার প্রায়ই সম্ভব হয় না। কিন্তু সাহিত্যে শিল্পীর বাচন-পদ্ধতির মধ্যে হাসির উপাদান বা আলম্বন সৃষ্টির দেহ ধরে বিকশিত হয়। তাকে হারাবার আর ভয় নেই; অর্থাৎ পালোয়ানের অকস্মাৎ পতন ও নির্বোধ-সমতুল অবলোকনের পেছন থেকে হঠাৎ কলার খোসার আবির্ভাবের মর্মান্তিক সম্ভাবনা থাকে না সেখানে। অতএব মূল হাসির খোরাকটুকু মাঠে মারা পড়বার ভয় না রেখে তার রূপশৈলীর বিশিষ্ট স্বাদকেও উপভোগ করা যেতে পারে পৃথক সন্ধানের মাধ্যমে। এই কারণেই জীবনে 'হাসিই হাসির পরিণাম',—এই নীতি স্বীকার করেও, সাহিত্যে হাসির প্রকারগত শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি, সাহিত্যে হাস্যরসের শ্রেণীবিভাগ চিরকালই কেবলপ্রকরণগত, তা না হলে জন্ম-উৎসের বিচারে হাসিমাত্রই অভিন্ন;—এমন কি হাসি এবং অশ্রু, এই দুইও জীবনের একই মূল থেকে উদ্ভূত। মানুষের স্বভাবের গভীরে কিছু পরিমাণ অনপনেয় ত্রুটি আর দুর্বলতা রয়েছে, য'র অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষ নিজেও সর্বদা অবহিত নয়। ঐসব ত্রুটি-দুর্বলতাই মানুষের হাসি-অশ্রুর চিরন্তন উৎস। অতিশয় আগ্রহ, উৎসাহ বা উদ্দীপনায় পতন-সম্ভাবনা তাদের মধ্যে একটি। বলা বাহুল্য, সে পতন দেহ বা মনের যে-কোনো ক্ষেত্রেই হতে পারে। এক শীর্ণা বৃদ্ধা ভিখারিণীর ক্ষেত্রে এই ধরনের দৈহিক পতন দুঃখের কারণ হয়েছিল; অথচ একটি বলদৃপ্ত যুবকের একই রকমের আকস্মিক পতন

হাসির উদ্রেক করে। উভয় ক্ষেত্রে ঘটনা এক এবং অভিন্ন ; কেবল তার অনুষ্ঠানের পরিবেশ ও প্রকরণগত বিশিষ্টতা একই পতনের পৃথক রসগত ফল বিহিত করেছে।

সাহিত্যে হাসির এই প্রকরণগত বিশিষ্টতার বিচারে তিনটি পৃথক্ শ্রেণী নির্দেশ করা হয়েছে,— যেমন —(১) Humour, (২) Wit ও (৩) Satire. প্রথম দুটির তুলনায় হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে তৃতীয় উপায়টির প্রকরণগত পার্থক্য সুস্পষ্ট। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও প্রথম দুইটির মধ্যেকার প্রভেদকে সুসংজ্ঞক করে তোলা কঠিন হয়েছে। কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক,—নানা জনে হাসির উৎস ও প্রকরণের আলোচনায় এ সম্পর্কে নানা কথা বলেছেন। সব কথার সার নিষ্কাশন করেও বলা যেতে পারে,—"Humour is the exhibition of individual peculiarities of an entertaining character. Wit is the art of bringing together two notions which would not at first be expected to have any connexion with one another. Humour is the more spontaneous of the two and wit the more intellectual, though wit must not be forced, nor, humour brainless They come to be associated with one another because they usually have the same effect. They make for a surprise which most naturally expresses itself into laughter. This laughter gives a pleasure which by common consent is similar to a tickling sensation and upon this there supervenes a genuine happiness of a contemplative kind."[২]

Satire-এর সঙ্গে wit ও humour-এর মৌলিক পার্থক্য একেবারে হাসির ঐ পরিণামী স্বাতন্ত্র্যে। Satire-এর হাসি কিছুটা তীব্র এবং ঝাঁঝালো ;—বিশেষ করে কোনো এক যুগসঙ্কট কালে মানবিক বিনষ্টির বহু-ব্যাপ্ত রূপ শিল্পীকে যখন মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ ও ক্ষুব্ধ করে তোলে, তখনই বিদ্রূপ আর শ্লেষ satire-এর দেহে হাসির রূপ ধরে। কিন্তু humour-এর আর wit-এর সৃষ্ট হাসি সমস্বভাব-বিশিষ্ট, —সে হাসি আনন্দ-ভাবনা-পরিণামী। কেবল, বলা হয়েছে,—wit-এর হাসি জন্ম নেয় স্রষ্টার মস্তিষ্কের (brain) কারখানায়, অন্যপক্ষে humour-এর হাসি বিকশিত হয় শিল্পীর সহৃদয়তার বৃন্তে। তাই বলে wit-এর হাসিকে হৃদয়হীন বলার কারণ নেই ; —আর নির্বোধ হাসির নামও humour নয় কিছুতেই। মানুষের জটিল অস্তিত্ব থেকে হৃদ্‌বৃত্তি ও চিদ্‌বৃত্তিকে আজ আর পৃথক করে নেবার উপায় নেই। তাই হাস্যরসের জগতে wit ও humour প্রায়ই বিমিশ্র রূপ নিয়ে থাকে ; কেবল তাদের পরিমাণগত

২। [illegible]

আপেক্ষিক প্রাধান্যের জন্যই অনেক সময় একটিকে বলে humorous, আর একটিকে witty ; তবে প্রয়োগ-পদ্ধতির দিক থেকে humour বোধ হয় একটু বেশি objective, আর wit বেশি subjective ; অর্থাৎ, humour-এর শিল্পী তাঁর বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে অন্তরের সহৃদয়তাকে প্রতিফলিত করে হাসির রসরূপ সৃষ্টি করেন। অন্যপক্ষে witty স্রষ্টা অভিজ্ঞতার বিষয়কে তাঁর মস্তিষ্কের জগতে টেনে নিয়ে তীক্ষ্ণ নিরপেক্ষ বিচার-দৃষ্টিতে প্রতিফলিত করে নতুন শিল্পরূপ দেন। তাই humour-এর হাসিকে বন্ধু সমতুল (friendly) বলা হয়েছে,—কিন্তু wit-এর হাসি নাকি সহানুভূতিহীন (unsympathetic)[৩];—নিষ্ঠুর বল্‌ব না,—হয়ত নৈর্ব্যক্তিক।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

এই ধরনের নির্বস্তুক আঙ্গিক আলোচনা নিরবধি হতে পারে। কিন্তু সৃষ্টির প্রত্যক্ষ ভূমিতে রূপ-চিন্তার সত্যরূপ যাচাই করে দেখ্‌লে তবেই তার সার্থকতা। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই সখেদে স্বীকার করতে হয়, বাংলা হাসির গল্পের সার্থক আদি শিল্পী আজ বিস্মৃতির অন্তরালে অপগত হতে চলেছেন,—সেই স্মরণীয় নাম সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৬৬-১৯৩১)। হয়ত রবীন্দ্র-বিরোধী 'সাহিত্য' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকার দরুনই সুরেন্দ্রনাথের আশ্চর্য সফল সৃষ্টি সমসাময়িক কালের হাতে প্রাপ্য মর্যাদা লাভে বঞ্চিত হয়েছে। এমনও হতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-পুষ্ট গুরুগম্ভীর সিরিয়াস গল্পের রচনা ও রচয়িতাদের গুণ এবং সংখ্যাগত উৎকর্ষ এই অ-সাহিত্য ব্যবসায়ী[৪] লেখকের প্রবর্তিত নতুন গল্পরসের প্রতি সমকালীন পাঠককে অবহিত হতে দেয়নি। তা হলেও নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, পরশুরাম-কেদারনাথের রচিত হাস্যোজ্জ্বল বাংলা গল্পের আসরে নিজের পূর্বসূরিত্বের নিঃসংশয় আসনটি সুরেন্দ্রনাথ চিরপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন,—অনেকের অজ্ঞাতে।

'সাহিত্য' পত্রিকাতে এঁর অনেক গল্প প্রকাশিত হয়েছিল, এবং পরে 'ছোট ছোট গল্প' (১৩২২ সাল) ও 'কর্মযোগের টীকা ও অন্যান্য গল্প' (১৩২৩ সাল) নামে দুটি

৩। দ্রষ্টব্য তদেব।

৪। সুরেন্দ্রনাথ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ ছিলেন। সংগীতেও তাঁর আগ্রহ ছিল, কণ্ঠ নাকি ছিল সুরসাত। রবীন্দ্রনাথও তাঁর গানের মুগ্ধ শ্রোতা ছিলেন। শরৎচন্দ্রের কৈশোরে ভাগলপুরে সাহিত্য-চর্চা একদা উৎসাহ-দীপিত হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে বনফুল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ জুড়ে সাহিত্য সাধনা করে'ছেন ভাগলপুর থেকেই। বাংলা সাহিত্যের সাধনায় ভাগলপুরের বাসিন্দা সুরেন্দ্রনাথ এই সব প্রচেষ্টার পূর্বসূরী।

সংকলনে কিছু কিছু গল্প প্রকাশিতও হয়েছিল। এই সব গল্পের অনেক কয়টিতেই হাসির উৎস অতি-উচ্ছ্বসিত নয়; বরং জীবনের বহু দর্শনজনিত এক আশ্চর্য মমতাবোধ ছড়িয়ে রয়েছে অনেক জায়গায়। শিশু তার অবোধ মনের মোহে অনেক নিরর্থ জটিলতা গড়ে তোলে, আর তার নিরসনের চেষ্টায় গলদ্‌ঘর্ম হওয়ার খেলা খেলে;—মা তখন অপার বাৎসল্যে কৌতুক-স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখেন নীরব স্মিতহাস্যে। সুরেন্দ্রনাথের বহু গল্পে শিল্পীর পক্ষ থেকে জননীর মমতায় ভরা এই মজার কৌতুক-হাসি বিচ্ছুরিত হয়েছে নায়ক-নায়িকার আপাত সিরিয়াস্ জীবন-যাত্রার প্রতি। সাহিত্যে হাসির একটি সর্ব-সাধারণ উপাদান হিশেবে মজার (fun) কথা উল্লেখ করা হয়েছে;—সুরেন্দ্রনাথের গল্পে এই fun-এর উজ্জ্বল শোভাযাত্রা,—অথচ সর্বাংশেই তাকে লঘু বলা চলে না।

দৃষ্টান্ত হিশেবে 'দীক্ষা', 'গোলাপজাম', অথবা 'আত্মহত্যা' গল্পের কথা বলা যেতে পারে। 'গোলাপজাম' গল্পের শুরু হয়েছে :—"ফুলশয্যার নিশি! গভীর, শান্ত ও স্নিগ্ধ। রাত্রি তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। রজনীকান্ত তখনও জাগিয়া। নববধূর মুখের প্রথম কথা শুনিতে কে না জাগে? কত মধুর; কত আশার অঙ্কুর! কত ভবিষ্যৎবর্ষের প্রথম কাহিনী।

"কনকলতা কিন্তু বেজায় চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। স্বভাবসিদ্ধ সভ্যতার খাতিরে রজনীকান্ত প্রথমেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কনক! তুমি কোন্ জিনিস্ সকলের চেয়ে খেতে ভালবাস?'

"কনকের ভয় হইয়াছিল, পাছে স্বামী কোনো শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করে। প্রশ্নটা নিতান্ত সহজ দেখিয়া কনক সরিয়া আসিল। আবার ঈষৎ ভয় পাইয়া ফিরিয়া গেল। রজনী সাহস পাইয়া করস্পর্শ করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল; 'তুমি কি খেতে ভালবাস কনক?'

"বধূ মুখ বাড়াইল, কিন্তু ভয়ে কথা বাহির হইল না। রজনী কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল,—'বল না ভয় কি,—আমি কাহাকেও বলিব না।'

"কনকলতা অতি ধীরে একবার মাত্র বলিল,—'গোলাপ জাম?'

"রজনীকান্ত আহ্লাদে মগ্ন হইয়া জীবন-সঙ্গিনীর প্রথম কথার অপূর্ব মাধুরী চিন্তা করিতে লাগিল। কথাটা তাহার বড় ভাল লাগিয়াছিল। ক্রমে ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া গেল।"

প্রথম দেখায় মনে হয়, গল্পের ভিত্তি বুঝি রসিকতার (joke) ওপরে প্রতিষ্ঠিত! ফুলশয্যার প্রথম মিলন-রজনী দম্পতির কত আশা-ভাবনা, ভয়-উল্লাস-কম্পনের মদিরতায় আড়ষ্ট-উদ্বেল। এমন দিনে কিনা নবীন বর নববধূর মনের মণিকোঠায় গোপন গভীর

দৃষ্টি সঞ্চালন না করে জিজ্ঞেস করল, 'কি খেতে ভাল লাগে।' আর এমন স্থূল বেরসিকের মত প্রশ্নে নবীনা বধূ অভিমান-ক্ষুব্ধ না হয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল! কী বা সে ভাল লাগার জিনিস,—'গোলাপজাম'!—সব কিছু মিলে গোটা গল্পটিতে একটি কৌতুক হাস্যের নাতিতীব্র পরিবেশ গড়ে ওঠে। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ এই সস্তা হাসির চটক্ দিয়ে গল্প শেষ করেন নি। প্রথম মুহূর্তের কৌতুক ক্ষণ-পরে করুণা-ঘনতায় নিবিড় হয়ে আসে বুঝি.—

"উভয়েরই পক্ষে তাহা পূর্বস্মৃতি। কিন্তু কনকের পক্ষে তাহা ক্লেশবিজড়িত। বৈশাখের ঝড়ে প্রায় সাত বৎসর পূর্বে কনকলতার গোলাপ জামের গাছটি উদ্যানে পড়িয়া গিয়াছিল। গাছটি তাহার মাতার স্বহস্তরোপিত। তাহার পরে কেহই সে গাছের কথা মুখে আনে নাই। আবার নূতন জীবনে নূতন অবলম্বন পাইয়া সেই পুরাতন স্মৃতি কনকের হৃদয়ে জাগরূক হইয়াছিল। বাঁচিয়া থাকিলে কনকের মাতার আজি কত সুখের দিন হইত!

"রজনীকান্ত কিন্তু তাহা জানে না। তাহার বিলাসপুরের বৃহৎ উদ্যানে গোলাপজামের চারা একটাও বাঁচে নাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এবার গিয়াই আবার রোপণ করিব।"

অথচ এই গোলাপজামের চারা নিয়েই স্বামি-স্ত্রীর পরবর্তী জীবনে চিরবিচ্ছেদের বেদনা পুরাতন কাঁটার ঘায়ের মত যন্ত্রণার্ত হয়ে উঠ্‌লো। কনকলতা কলকাতার ধনি-কন্যা, রজনীকান্ত থাকে বিলাসপুরে,—কৃষিকাজ আর ফলের বাগান তার পেশা, এবং নেশাও। বিয়ের এক বছর পরে দাদা-বৌদিকে নিয়ে কনক হঠাৎ একদিন এল স্বামীর ঘরে, বিনা খবরে এসে পড়ায় রজনী একটু বিব্রত হয়ে পড়ল;—আরো বিব্রত হল সকালেই যখন কনকলতা ক্ষেত-বাগান ঘুরে এসে জেদ ধরলো,—কিছুতেই এই বন-জঙ্গলের দেশে সে থাক্‌বে না। কনক বড় জেদী আর অভিমানী; তার কথাই রইল। কিন্তু দাদা-বৌদি বিনোদ আর সরযূ বেচারা রাজনীকান্তর জন্য ভাবে,—একমাত্র বোনের জন্যেও দুঃখ কম নয়; সংসারী হয়েও সে বিবাগিণী! দীর্ঘ আরো তিন বছর এম্নি করে কেটে যায়,—রজনীকান্তের সঙ্গে বিনোদের পত্রালাপ চলে মাঝে মাঝে,—নিতান্ত মামুলি বিষয়ে। দিনে দিনে কনকের অবস্থা আর দেখা যায় না,—বিনোদ রজনীকে আমন্ত্রণ করে পাঠায়। "কিন্তু রজনীও বেতর। তীব্র শোণিত, এবং অভিমানী।" কাজেই সেও প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায়।

সরযূর এ-সব সহ্য হয় না; মাথার দিব্যি দিয়ে চিঠি লিখেও রজনীর জবাব পায় না। তারপর এক ঘনশ্রাবণের দিনে সরযূর কাছে রজনীকান্তের জবাব আসে;—একটি টুক্‌রি করে শুষ্ক ফুলপাতার সঙ্গে একগুচ্ছ গোলাপ জাম। চিঠিতে খবর আসে, অমরকণ্টকের

পাহাড়ে রজনী শয্যাশায়ী। চার বছরের যত্নে বাঁচানো গোলাপজামের গাছে ফল ধরেছে প্রথম। সেই 'উত্তরাধিকারিহীন জীবন-সম্পত্তি' পাঠিয়ে দিয়ে এবার তার শয্যাশ্রয়। কনক আর সইতে পারে না,—দাদা-বৌদিকে নিয়ে ছোটে দাক্ষিণাত্যে,—অমর পর্বতে। রজনী তখন বিকারে প্রলাপ বক্‌ছে।

এমন সময় "কনকের স্পর্শে রজনীর বিকার অন্তর্হিত হইয়াছে। অভিমানিনী সতী স্বীয় করস্পর্শে আত্মজীবন ঢালিয়া দিয়াছিল। শত বনৌষধি ও শত ধন্বন্তরীর মহিমা তাহার নিকট তুচ্ছ। রজনী সরযূকে বলিল, 'ভাই, তোমাদের কনক বড় গভীর মেয়ে।'

সরযূ। আগে সারিয়া উঠ, তবে শুনিব।

রজনী। না, অদ্যই বলিব। কথাটা বড় হাসির। ফুলশয্যার দিন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, আমি বিলাসপুরে আসিয়াই গোলাপজামের গাছ রোপণ করিব। সে প্রতিজ্ঞা মনে মনে। কনক বোধ হয়, মনের কথা বুঝিতে পারে। তোমরা যখন আসিয়াছিলে, তখন কনক গোলাপজামের গাছ খুঁজিয়াছিল, কিন্তু সেটা অনেক দূর বনের মধ্যে; তাই পায় নাই। ইহাই অভিমানের গোড়া।

সরযূ। তোমার কথা ভার বোধ হইতেছে।

রজনী। ক্রমেই লঘু হইবে। একটু জল খাব।

সরযূ। কনক দেবে। আর একটা কথা বলি, সে যে তিন বৎসর প্রায় অনশনে আছে তার মুখে একটু গোলাপজাম দিও।

রজনী। কি আশ্চর্য! তবে বাঁচিয়াছিল কি করিয়া?

সরযূ। কেবল অভিমানে এবং আত্মদানে।"

গল্পের এই গ্রন্থন এবং এই পরিসমাপ্তিকে লঘু চালের হাসির গল্প বলি কি করে! পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, জীবনের প্রতি সহৃদয় কৃতজ্ঞতায় humour-এর স্নিগ্ধ হাসির উদ্ভব হয় অনেক সময়ে। এ-গল্পে শিল্পীর জীবনপ্রীতি কেবল সহৃদয় নয়, একান্ত অন্তরঙ্গ,—গভীর প্রেমানুভবে subtle। সে মূল্য-চেতনা অপরূপ সূক্ষ্মতার সঙ্গে ব্যঞ্জিত হয়েছে গল্পের সারা দেহে,—বিশেষ করে রজনীকান্তের চিঠির শেষ ছত্রে,—"যদি ফলগুলি ভাল লাগে, তবে মনে করিও, আমার উহাই জীবন-সম্পত্তি, উত্তরাধিকারী কেহই নাই।"—আর সরযূর শেষ কথায়;—কনকলতা বেঁচেছিল "কেবল অভিমানে এবং আত্মদানে।"

জীবন-মহিমার এই ভাব-চিন্তন যে-কোনো সিরিয়াস্ গল্পের পরম সম্পদ হতে পারত। হাসির গল্প লিখ্‌ছেন বলে কোথাও সেই গভীরতাকে শিল্পী তরল হতে দেন নি। তবু

গল্পের সারাদেহে ছড়িয়ে আছে এক অদৃশ্য হাসির বিভা,—গল্প-শেষের মজার পরিণাম যে-হাসিকে ঠোঁটের কোণে স্মিত রেখায় আভাসিত করে তোলে। এ হাসি জীবনের কোনো অসংগতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নি ; বরং গল্পের ভয়াবহ পরিণাম-সম্ভাবনাকে শিল্পী অক্লেশে সুখদ এবং হাস্যকর করে তুলতে পেরেছেন বলে। রজনীকান্ত-কনকের দীর্ঘ বর্ণিত বিরহ-কথাতেও তাপদাহ নেই কোথাও,—কারণ মমতাময় শিল্পী ত জানেন,—এ কোনো জীবন-সমস্যা নয়,—প্রাণ নিয়ে নর-নারীতে অভিমানের খেলা! তাঁর সংশয় নেই, এ খেলা শেষ হবে আনন্দে ;—সেই স্বচ্ছ পরিণামবোধই গল্পদেহের অদৃশ্য হাসির আকর।

মজার গল্প, বা আরো স্পষ্ট করে বললে, খুশির গল্প হিশেবে 'গোলাপজাম' অনবদ্য। কত তুচ্ছ উপলক্ষ্যে কত ভয়ানক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল, গল্পশেষে একথা ভাবতে গিয়ে খুশির সঙ্গে হাসিও অনিবার্য হয়ে ওঠে।

'দীক্ষা' বা 'আত্মহত্যা' গল্পে খুশির চেয়ে মজার (fun) উপাদান বেশি। ভারতীয় গোঁড়ামির উপাসক এক প্রখ্যাত ইতিহাসের অধ্যাপক ও আপাত প্রতীচ্যানুরাগিণী অপরূপ সুন্দরী নায়িকার পারস্পরিক প্রবল বৈরূপ্য কি করে পরিণামী মিলনের মজায় জমে উঠেছিল তারই গল্প 'দীক্ষা'। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলনে নবজন্মের এক ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে,—তাতেই নাকি নায়ক কিরণচন্দ্র দীক্ষা পেয়েছিলেন নায়িকা ইন্দুমতীর কাছ থেকে। এই দীক্ষা যে-আকারে (প্রতিপক্ষের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধ) প্রতিফলিত হয়েছিল, তার হাস্যকরতা গল্পকে সার্থক humour-রসান্বিত করেছি।

'আত্মহত্যা' গল্পে বাল-বিধবা মালতী ভালবেসেছিল, পাশের বাড়ির ব্যারিস্টার প্রফুল্ল দত্তকে ;—প্রফুল্ল মালতীর দাদা বিনয়চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বৌদি কুমুদিনীর দূর সম্পর্কের আত্মায়। এ-হেন প্রফুল্ল দত্ত খ্রীস্টান হয়ে মিস্ ডেভিস্-এর 'পাণি পীড়ন' করেছেন জেনে মালতী আত্মহত্যায় কৃতসংকল্প হল। একটি পত্রে নিজের মনের হা-হুতাশ লিপিবদ্ধ করে মালতী পাশের বাড়িতে প্রফুল্ল-র শয্যাগৃহে ছুঁড়ে ফেলল ; ভাবল,—রাত্রি নটায় মিস্ ডেভিস্‌কে নিয়ে নবপরিণীত প্রফুল্ল যখন এ গৃহে আসবে,—তখন ত সে পরলোকে। ছোট ভাই-এর কাছ থেকে প্লেগ-এর শত্রু ইঁদুর মারবার ওষুধ আর্সেনিক ত জোগাড় করেই রেখেছে! পরিশেষে দেখা গেল মিস্ ডেভিস্‌কে নয়, মালতীকেই প্রফুল্ল দত্ত একান্ত ভালবেসেছিল। আর মালতীরও আত্মহত্যা করা হল না ; তার ঘুমিয়ে পড়ার অবকাশে পোষা ময়না 'আর্সেনিক' মাখানো সন্দেশ সব কয়টা খেয়ে ফেলেছিল। কিন্তু সেও মরে নি,—কারণ আর্সেনিক বলে অবিনাশ মালতীকে যা দিয়েছিল সে ছিল তার "স্বদেশী দন্তমঞ্জন। কার্বলিক্ অ্যাসিড্-এর প্রাবল্যে ময়না একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল,—

ক্রমে সে সুস্থ হয়ে উঠ্‌লো,—আর মালতীর মানসিক অসুখ চিরদিনের জন্যে নিরাময় হয়ে গেল প্রফুল্ল দত্ত-র সঙ্গে বিবাহের কল্যাণে। এ গল্পে কেবল মজা (fun) নয়, তার সঙ্গে রসিকতাও (joke) যুক্ত হয়েছে কিছু পরিমাণে।

হিউমার-এর একটি সুনিশ্চিত উপাদান হিশেবে fun-এর সঙ্গে joke-কেও অন্তর্ভুক্ত করা চলে,—বলেছেন বিশেষজ্ঞেরা।[৫] fun-কে যদি ঘটনাবিন্যাসজনিত 'মজা' বলে অভিহিত করি,—joke-কে বলতে হয় বর্ণনভঙ্গির রসিকতা। নিছক রসিকতাপূর্ণ বর্ণনা ও সিচুয়েশন্‌-বিন্যাসের গুণে গল্প 'অট্ট' না-হোক্‌, স্পষ্ট হাস্য-সরস হয়ে উঠেছে,—এমন নিদর্শনও সুরেন্দ্রনাথের রচনায় কম নেই। 'বাজে খরচ' গল্পটি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ :—

"পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়সে হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের অজীর্ণ রোগ হয়। এক বৎসরের পর অন্য বৎসর ভেড়ার পালের মত একে একে চলিয়া গেল, কিন্তু চাটুর্যের অজীর্ণ রোগ সারিল না।

"চল্লিশের কোঠায় পদার্পণ করিয়া চাটুর্যে বুঝিতে পারিলেন যে, বাজে খরচই অজীর্ণ রোগের কারণ।

"কিন্তু একথা কাহাকেও বলিলেন না।

"কোনো গূঢ় সত্য হৃদয়ঙ্গম হইলে, জীবশরীরে একটা লক্ষণ প্রকাশ পায়। হরিহরেরও তাহাই ঘটিল। অর্থাৎ হরিহর সামান্য কারণেই চটিতে লাগিলেন।"

গল্পের এই সূচনা-অংশেই রসিকতাপূর্ণ বাগ্‌ভঙ্গি হাস্যরসের সম্ভাবনাকে ঘন-নিবিষ্ট করে তুলেছে। তারপরে এই বর্ণনার সঙ্গে জোট পাকিয়েছে একের পর এক হাস্যকর সিচুয়েশন, যার টানা-পোড়েনে অবশেষে গঞ্জিকা বাবদ 'বাজে খরচ' প্রসাদাৎ কেবল অজীর্ণই নয় চাটুর্যের প্লেগ-বিভীষিকা থেকেও মুক্তির আশ্বস্তিপূর্ণ বার্তা ঘোষণায় গল্পের সমাপ্তি হয়েছে। ফলে "বিনোদ ও চাটুর্যে উভয়েই স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, জীবন-ধারণার্থ বাজে খরচ অন্যান্য খরচ অপেক্ষাও অধিক আবশ্যক।" চরিত্র ও পরিবেশের কৌতুককর বিন্যাসের সঙ্গে রস-তাৎপর্যপূর্ণ বাগ্‌-ভঙ্গি গল্পটিকে পরিস্ফুট সহাস্যতায় প্রসন্ন করে তুলেছে।

কেবল চরিত্র ও পরিবেশের অসংগতি প্রদর্শন নয়, সেই সঙ্গে সমুচিত বাগ্‌-বিদগ্ধতাও সার্থক হাস্যরসের এক সমুচিত উপাদান। বাগ্‌-ভঙ্গির এই মুন্সিয়ানা হাস্যকর সিচুয়েশনকে স্ফুটতর হাসির আকর করে তোলে। এ-রকমের একটি সার্থক নিদর্শন 'যেহেতু ও সেহেতু' গল্প। গল্পটির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ থেকে 'যেহেতু সেহেতু'-র খেলা শুরু

৫। দ্রষ্টব্য 'Cassel's Encylopaedia of Literature'-Vol. I,

হয়েছে,—"যেহেতু বিবাহ করিলে প্রায় পুত্রকন্যা জন্মিয়া থাকে, অতএব দীনুর পিতার ভাগ্যে দীনু জন্মিয়াছিল। এবং সেহেতু দীনুর মাতার পুত্রসাধ মিটিয়াছিল। অতএব স্ত্রীর আহ্লাদ দেখিয়া দীনুর পিতাও অপর্যাপ্ত পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন।"

সারাটি গল্পের সিচুয়েশন বর্ণনায় লেখক এই 'যেহেতু-সেহেতু' এবং 'অতএব'-এর পরম্পরায় (sequence) বাক্য বিন্যাস করেছেন। সাধারণভাবে আতিশয্যের দরুন এই পৌনঃপুনিকতা একঘেয়ে ভাঁড়ামিতে পরিণত হতে পারত। কিন্তু এখানে লেখক আশ্চর্য পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। অর্থাৎ কথার বিশেষ ভঙ্গির সঙ্গে সিচুয়েশন ও চরিত্রের অসংগতি পরম্পরাকে এমনভাবে গেঁথেছেন, যাতে গল্পের উপভোগ্যতা হ্রাস না পেয়ে বরং গাঢ় হয়েছে। সীমিতার্থে এই প্রকাশ-রীতিকে witty বলা যেতে পারে।

এ পর্যন্ত আলোচনায় বোঝা গেছে, সুরেন্দ্রনাথের সৃজনধর্মের সহজ প্রবণতা ছিল স্নিগ্ধ humour-এর প্রতি;—তাঁর মত মমতা-ঘনিষ্ঠ জীবন-রসিকের পক্ষে satire প্রকৃতি-বিরুদ্ধ;—আর আলোচ্য রচনাটি শৈলীতে মস্তিষ্কের চেয়ে হৃদয়ের আবেদন বেশি বলে wit-এর খেলাও তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক নয়। কিন্তু আগেই বলেছি, wit আর humour-এর সীমারেখা অত্যন্ত সূক্ষ্ম,—এমন কি অস্পষ্ট। ফলে humour-এর সঙ্গে প্রচ্ছন্ন wit-এর মিশ্রণে এক বিমিশ্র স্বাদুতার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। 'যেহেতু ও সেহেতু'র চেয়েও এই স্বাদ-মিশ্রতা স্ফুটতর হয়েছে 'কর্মযোগ' নামক গল্পে। পারিবারিক বিষয়-বাঁটোয়ারার এক মোকদ্দমা-যুদ্ধকে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে উপস্থিত করে গীতার কর্মযোগের পরিভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই অসংগতি নিছক humour-এর কল্যাণে যতটুকু মোটা হাসিকে উচ্ছল করে তুলতে পারত,—হাসির ততখানি উদ্বেলতা নেই এ গল্পে,—witty উপস্থাপনের কল্যাণে humour-এর সম্ভাব্য অট্টহাসি কলাকুশলতা-স্নিগ্ধ স্মিত হাসিতে পরিণত হয়েছে।

ফল কথা, বিচিত্র স্বাদুতায় সমৃদ্ধ জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞ সহৃদয়তাপরবশ মমতাময় শিল্পী সুরেন্দ্রনাথের হাস্য-সরস গল্প রচনার শ্রেষ্ঠ উপাদান ছিল humour,—বিন্যাসের কৌশলগুণে একই humour নানা গল্পে নানা রূপ ধরেছে। এদিক থেকে বর্তমান কালের পাঠকের কাছে লেখকের পুনরায় পরিচিত হবার বলিষ্ঠ দাবি অনস্বীকার্য।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (১৮৬৩-১৯৪৯) হাসির গল্পের শিল্পী বললে লেখকের যথার্থ পরিচয় হয় না,—তাঁর গল্পের মৌলিক আবেদন সহৃদয় জীবনরসে স্নিগ্ধ। তাঁর

'থাকো' গল্প প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'sublime' কথাটি ব্যবহার করেছেন।[৬] কেদারনাথের গল্প যেখানে যথার্থ রসোত্তীর্ণ, সেখানে তা আর ঠিক humorous নেই,—প্রায়ই sublime হয়ে উঠেছে। আসলে সচেতনভাবে হাস্যরস সৃষ্টি লেখকের অধিকাংশ গল্পেরই উদ্দেশ্যসংলগ্ন ছিল কি না সে বিষয়ে সংশয় জাগে। '৫৬।৫৭ বৎসর বয়সে' কেদারনাথ দ্বিতীয় পর্যায়ে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন,—প্রথম পর্যায় ঘটনাবহুল হলেও, খুব স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল।[৭] গল্প লেখার শুরু দ্বিতীয় পর্যায় থেকে। ততদিনে কলকাতার প্রান্তবাসী 'ডেলিপ্যাসেঞ্জার' কেরানি-সমাজ, আর পশ্চিম ভারতের প্রবাসী বাঙালি চাকুরিজীবী সমাজের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ দিনের-পরিচয় অজস্র বিচিত্রতায় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বার্ধক্যের উপান্তে পৌঁছে সেই অপগত জীবনের প্রতি মমতাবোধ স্নিগ্ধ করুণায় অন্তরে নিবিড় হয়েছিল। জীবনের সেই দরদ-ভরা অভিজ্ঞতাকে সহৃদয়তার বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করে শিল্পী এক কৌতুক-কারুণ্যঘন রূপ দিয়েছেন। সে গল্পে কৌতুক যতটুকু রয়েছে,—আসলে সে ফেলে-আসা জীবনের প্রতি অতীতস্মৃতির সৌরভে সমৃদ্ধ 'দাদা মশায়ের' কৌতুক; কৌতুকের চেয়ে নিবিড় যে বেদনা, সারাজীবনের দুঃখ-ব্যথাতুর হৃদয়-সমুদ্র মন্থন করে তার জন্ম। এদিক থেকে কেদারনাথ এক মধুস্বাদী বিগত জীবনের সত্য-সুন্দর বাণীধর। যে-জীবনের কথা তিনি বলেছেন, তার একটা নিজস্ব message ছিল; গল্পের মাধ্যমে সেই বাণীকে অসংশয়িত প্রতিষ্ঠা দিয়ে তবেই তিনি গল্প-বলার হাত থেকে ছুটি নিতে পেরেছেন। গল্পে বিবৃত জীবনের সঙ্গে সুমহৎ জীবন-বাণীর এই হরগৌরী সম্মিলন সুখ-দুঃখের প্রাধান্য-নির্বিশেষে তাঁর সকল সার্থক গল্পকে এক অনির্বচনীয় স্বাদুতায় ভরে তুলেছে, যাকে কেবল sublime বলা চলে,—বলা চলে জীবন-রস-স্নিগ্ধ গল্প।

তাই বলে শরৎচন্দ্রের মত কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য প্রতিপাদনের জন্য কেদারনাথ গল্প রচনার লেখনী ধরেননি কখনো। তাঁর সৃষ্টির গহনে অনতি-উচ্চারিত যে জীবন-বাণী অন্তর্লীন হয়ে আছে, সে ছিল শিল্পীর চোখে-দেখা জীবনেরই এক অপরিচ্ছেদ্য মহৎ সম্পদ। মধ্যবিত্ত বাঙালি-জীবন-ধর্মের সেই লোভনীয় স্বর্গলোক থেকে আজ আমরা চির নির্বাসিত। তাই এর পরিচয় সবিশেষ অনুধাবনের যোগ্য।

একালে আমরা জীবন ধারণ করি, কেবল ব্যক্তিগতভাবে বেঁচে থাকবার উদ্দেশ্যে। একথা ভেবে আত্মশ্লাঘাও বোধ করি যে, আধুনিক জীবন আগের তুলনায় অনেক জটিল হয়েছে,—আধুনিক জীবনযাত্রা ধরেছে এক দুঃসাধ্য দুরায়ত্ত পদ্ধতির রূপ। তাই জীবন

৬। দ্র. ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (ঐ)।

৭। দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'সাহিত্যসাধকচরিতমালা'—সংখ্যা ৭৬, লেখকের আত্মকথা।

ধারণের জন্যে অধুনা আমাদের সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্ন অতন্দ্র হয়েছে। অথচ এই জীবন-সংগ্রামের একমাত্র motto হচ্ছে নিছক দৈহিক উপায়ে টিকে থাকা,—যাকে গালভরা নাম দেওয়া হয়েছে 'struggle for existence.' কত প্রাণান্ত প্রয়াসের কত অকিঞ্চিৎকর ফলশ্রুতির হাস্যকরতা নিয়ে আমাদের জীবনযাত্রা বন্যার জলে স্রোতের মত কুটিল আবর্তে ছুটে চলেছে, সে খেয়াল করবার অবকাশ নেই একালের সভ্য পৃথিবীর। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের যে জীবনভূমিতে কেদারনাথ জাত এবং প্রায় অর্ধজীবন পরিবর্ধিত হয়েছিলেন, বাংলা দেশের সেই মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনের এক পরম গৌরবময় ফলশ্রুতি ঘোষণা করেছিল। টিকে থাকার জৈব প্রয়োজনকে হ্রস্ব করে জীবনের এক মহত্তর মানবিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করেছিল ;—সে জীবনের motto ছিল 'plain living and high thinking.' জীবনের দাবিতে টিকে থাকার প্রয়োজন অনস্বীকার্য ; অর্থাৎ টিকে থাক্‌তে না পারলে জীবনেরই ত মৃত্যু ! কিন্তু সে-কালের মূল্যবোধ কেবল টিকে থাকার বেদীতলে জীবনের চরম অঞ্জলি সমর্পণ করে বসে থাকেনি ;—যে জীবনে টিকে থাক্‌তেই হবে, মহার্ঘ্য মূল্যের বিনিময়ে তাকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলার স্বেচ্ছাব্রতও গ্রহণ করেছিল। ফলে, আত্মপ্রসার ও আত্মদানের এক উন্নত আদর্শলোকে ছিল সে-যুগের আপামর মধ্যবিত্ত সামাজিকের সহজ-বিচরণ। সে জীবনে 'সকলের তরে সকলে আমরা' না-ও যদি হয়, তবু 'প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেকের তরে'—এই জীবন-নীতি ছিল প্রায় সর্বসাধারণ। কেদারনাথের গল্পে মানুষের উপযোগী জীবন যাপনের সেই গৌরবময় ঐতিহ্যের সুরভি কোন দূরগত জগৎ থেকে ভেসে আসা অনির্বচনীয় জীবনরসের সৃষ্টি করে ;—হাসি-অশ্রু নির্বিশেষে এইটুকুই তাঁর গল্পের শ্রেষ্ঠ রস-উপাদান।

বেছে বেছে 'ধম্মা' গল্পটির কথাই বল্‌ব প্রথমে। 'মানুষ মানুষের কি করেছে ?' এই অন্তহীন জিজ্ঞাসার করুণ-মধুর দুটি উত্তর এক বৃন্তে দুটি ফোটা-ফুলের সৌন্দর্য নিয়ে ধরা দিয়েছে এই গল্পের কাহিনীতে। ধম্মা-র চরিত্র-কল্পনায় আদিম-স্বভাবের উদাত্ততাও যেন মূর্তি ধরেছে। একালের জীবনের পরিভাষায় ধম্মা একটি নির্মম জলদস্যু,—বর্বর, ভয়ানক ! কিন্তু কেদারনাথের কালের মরমী জিজ্ঞাসা,—'কে তাকে এমন করলে ?' ধম্মা নিজেই এ জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছে,—'কত বড় ঘা মেরে মানুষ আমাকে এমন বানিয়েছে তা যে ভুলতে পারি না !' "…যেদিন গদিতে ডেকে নে গে ভাইটেকে ছটা টাকার জন্যে বাঁশ ডলে মারলে। সেঃ ! তখন তো এমন ছিলুম না, কেবল হাত জোড় করেছিলুম ; পায়ে ধরেছিলুম। কি ভুলই করেছিলুম, মরেছিলুম রে !"

দরিদ্র অস্পৃশ্য শ্রমজীবীর ছেলে ধম্মা, ছ'টা টাকা ধার করে শোধ করতে পারেনি ; তাই মানুষের রক্ত খেকো ধনীর কাছারিতে নিয়ে গিয়ে বুকে বাঁশ ডলে হত্যা করা

হয়েছিল শার্দুল-প্রতিম ভাইকে তার। পরবর্তী জীবনে এ জ্বালা ভুলতে পারেনি ধম্মা ;—গভীর রাত পর্যন্ত গঙ্গার ওপরে ধনীর যাত্রী নৌকা লুণ্ঠন ও হত্যা হল তার বাকি জীবনের জীবিকা। অর্থ তাতে কম উপার্জিত হত না ; আর সেই সঙ্গে ধনী ভদ্র সমাজের শ্রদ্ধা না হোক, ভয়টুকু সে আদায় করতে পেরেছিল ঠিকই। তবু তৃপ্তি নেই ধম্মার,—চির অশান্ত সে !

সেকালের বাংলাদেশে মরলোকে স্বর্গ নেমে এসেছিল, এমন কথা বলবার উপায় নেই। কোনো কালেই তা আসে না। চিরকালের মত সেদিনও মানুষ-পশুর অকথ্য নির্যাতনে অমানুষের পথ ধরেছে মানুষ ;—ধম্মা-র জীবনেও তাই ঘটেছিল। কিন্তু কেবল ঈর্ষা-দারিদ্র্য, ক্রূরতা-প্রতিহিংসা স্বার্থবুদ্ধি নিয়েই বাঁচে না মানুষ। এ-সব অন্ধকার নরকে আসলে তার আত্মার মৃত্যু। প্রীতি, সহৃদয়তা, ভালবাসার মধ্যেই মানব প্রাণের আবাস এবং পরিবর্ধন। মৃত্যুর হাত ধরে নরক-পথের যাত্রী ধম্মা আবার অপার আলোর চরিতার্থতাভরা জগতে ফিরে আসতে পেরেছিল,—কেবল সেকালের জীবন-মূল্যবোধের সহজ হৃদ্যতার কল্যাণে। কেবল দান বা কেবল গ্রহণে প্রেমের পূর্ণতা নেই,—তার একমাত্র লক্ষ্য "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।"—সেই দেওয়া-নেওয়ার সদাব্রতে দিনে দিনে সঞ্জীবিত, বিগলিত হতে পেরেছিল ধম্মার পাষাণ-হয়ে-যাওয়া নিষ্ঠুর প্রাণ।

'ছোটলোক' (?) দরিদ্র জলদস্যু ধম্মার জীবনে বিধাতার দান প্রেমের অফুরন্ত ঝর্ণাধারা কাজলা,—তার ভয়শঙ্কাতুর অসহায় বালিকা-বধূ। তার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে চাটুজ্জেদের ছোটবৌ শিবানী দেবীর প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি-বাৎসল্যের পুণ্যধারা। অল্প বয়সে হঠাৎ বিধবা হয়েছিলেন কাকীমা ;—ভাসুর-জা-ননদেরা নিগ্রহের চূড়ান্ত করেছিল, তার ওপরে হঠাৎ হল 'মায়ের দয়া',—জাত বসন্ত। শিবানী দেবীর বাঁচবার উপায় ছিল না ;—তার আগে মরত কোলের মেয়েটি,—মথুরা। কাজলা গিয়ে মথুরাকে কোলে নিল, মথুরা বাঁচল,—কাকীমাও সেরে উঠলেন। সেই থেকে শিবানী দেবী ধম্মা আর কাজলার কাকীমা ;—ওদুটি তাঁর অপত্যবৎ ;—মথুরারও বাড়া !

দিনে দিনে শিবানী দেবী সর্বস্বান্ত হয়েছেন,—তাঁর বৈধব্যের তেরটি বছর অতিবাহিত হয়েছে। মথুরাও বড় হয়েছে, কিন্তু বিয়ের কোনো উপায় নেই। এদিকে ধম্মার ঘরে প্রয়োজনের অধিক সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু কাকীমাদের দিন কাটে উপবাসে ;—ছেঁড়া কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করে মথুরা বাইরে যেতে পারে না। অথচ ধম্মা আর কাজলার সর্বস্বই যে কাকীমা আর দিদিমণির জন্যে। কিন্তু কাকীমা কিছুতেই ধম্মার পাপের পয়সা স্পর্শ করবেন না। কাকীমার কথা তুলে কাজলা উত্তেজিত করতে চায়

স্বামীকে ; তাকে মৃত্যুপথ থেকে প্রত্যাবৃত্ত করতে চায় কাকীমার দুঃখ-বৈরাগ্যের কথা শুনিয়ে। অবশেষে কাকীমা সহজে মুখ তুলে আর চাইতেও পারেন না ধম্মার প্রতি। স্ত্রীর কাছে সব কথা শোনে ধম্মা ; অভিমানে, নৈরাশ্যে, আক্রোশে হতবুদ্ধি হয়ে থাকে। কখনো রাগে ফোলে,—কাকীমাও তাকে ঘৃণা করেন ; কখনো ভাবে কাকীমার অনভীপ্সিত ভয়ংকর জীবন-পথ পরিহার করবে। কখনো আবার হতাশায় বিমূঢ় হয়ে পড়ে। অবশেষে কাকীমাকেও ছুটে আসতে হয়,—নিজের মনের কথা বুঝিয়ে না বলে নিজের কাছেও মুক্তি নেই যে তাঁর,—"আমার ঐশ্বর্য যে তোরা,—তোরা যে আমার ভগবানের দেওয়া সামগ্রী, আমি কার ভরসায় তেরো বছর কাটালুম ধম্মদাস ? পাছে কোন্‌দিন কি ঘটে—তোর কিছু দেখ্‌তে হয়, তোকে খোয়াতে হয়, তাই না তোর ওপর এমনি পাষাণীর মত কঠিন ব্যবহার করে এসেছি। এই ভাবনা এই তেরো বছর বয়ে আসছি ! রাতে কারুর সাড়া পেলে, কি একটু শব্দ হলে বুকটা ধড়াস্‌ করে ওঠে, সমস্ত শরীর হিম হয়ে যায় ! আমার সব পূজো-আহ্নিকই মিছে রে ধম্মদাস ! তোর সুমতি, তোর মঙ্গলই চেয়ে এসেছি। কেবল তোর পয়সাটি ছুঁইনি,—পুণ্যির জন্যে নয় ধম্মদাস। যদি তাতে তোর মনে লাগে—তুই ও-কাজটি ছাড়িস্‌।

"যে মথুরা তোদেরই, কেবল বিইয়েছিলুম আমি, তোর দেওয়া কাপড় তাকে পরতে দিইনি। এত বড় শক্ত সাজা অতি-বড় শত্রুরেও দিতে পারত না। আমি কিন্তু সেই সাজাই তোকে দিয়েছি, আর নিজে তা নিয়েছি— দিনরাত। মেয়েমানুষ, ও ছাড়া আর আমার উপায়ও ছিল না, ভেবেও কিছু পাই নি।"

কাকীমার কথা শুনে "সকলে নীরব। সহসা—

আচ্ছা পায়ের ধূলো দাও তো মা, গঙ্গাস্নান করে আসি। কাজলি ! এসেই ভাত চাই, খিদে লেগেছে।"

"যেন সে মানুষ নয়। কাজলার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই দুজনের চোখের নির্মল হাস্যের উজ্জ্বল রেখাপাত।

"ধম্মা গামছা খানা টেনে নিয়ে নাইতে চলে গেল।"

গল্প এখানে শেষ হয়নি, যদিও তা হলে সার্থক একটি ছোটগল্পের সমাপ্তি সে পেতে পারত। কিন্তু আঙ্গিকের লোভে জীবনের দাবিকে অর্ধসম্পূর্ণ করে রাখতে পারেননি কেদারনাথ। সেদিন থেকে এক কথায় সারাজীবনের যন্ত্রণাপহারী নেশা ছেড়ে দিলে ধম্মা,—সৎপথে উপার্জনের জন্যে প্রাণপাত করতে লাগল। তারপর ভাগ্যের এমনই খেলা, ডাকাত 'ধম্মদাস' সদলে হল গ্রামের জমিদারের প্রাণরক্ষক,—একদল ভয়ংকর ডাকাতের হাত থেকে পুজোর নৌকো শুদ্ধ কর্তার প্রাণ উদ্ধার করল সে।

জমিদার প্রাণদাতার ঋণশোধ করতে চান সর্বস্ব দিয়ে ; ধম্মদাস কিন্তু কিছুই চায় না ! অবশেষে অনেক সাধ্যসাধনার পরে প্রার্থনা করলে জমিদার যেন 'মথুরা দিদি'র একটা ভাল বিয়ে দিয়ে দেন। কিন্তু তার প্রার্থনার কথা যেন গোপন রাখা হয় !

তাই হল ;--জমিদারের একমাত্র উপযুক্ত পুত্রের সঙ্গে মথুরার বিয়ে হয়ে গেল,— এমন অঘটন ঘট্‌লো কী করে,—ভাবতে গিয়ে গ্রামের সবাই অবাক্।

এ-যেন কোনো না-জানা দেশের এক স্বপনপুরীর রূপকথা। ব্রাহ্মণের ঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবা : প্রাণপাত সংযম-ব্রতের পরিবর্তে পুণ্য কামনা করেন না ; দরিদ্র 'ছোটলোক' নরঘাতীর দুষ্প্রবৃত্তি মোচন হোক্—দীর্ঘ তেরো বছরের পূজার্চনার এই একমাত্র ধ্যান,—একমাত্র প্রার্থনা তাঁর। নিজের পেটের মেয়ের মঙ্গলকামনাও তাঁর কাছে তুচ্ছ। আর ধম্মদাস !—কাকীমার এক কথায় জীবিকার চিরকালের পথটিই কেবল ছেড়ে দিলে না ;—সৎপথে যখন জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ করায়ত্ত হতে পারত, তখনো মথুরাদিদির কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই তার কাম্য নেই। এ-কালে 'টিকে থাক্‌বার জন্যেই জীবন সংগ্রাম' যে-জীবনের একমাত্র আদর্শ,—তার কাছে নূতন জীবন-মূল্যের এ মহিমাবাণী দুর্বোধ্য হওয়া স্বাভাবিক,—এ রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন আমাদের কাল করবে কি করে !

কিন্তু যে সুরে যে ভাষায় কেদারনাথ কথা বলেছেন, তাতে গল্পের মুকুরে সেকালের জীবন ছবির মত প্রত্যক্ষ স্পষ্টতা নিয়ে দেখা দিয়েছে,—একে অস্বীকার করবার, এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। লেখকের প্রথম গল্প-সংকলন 'আমরা কি ও কে'-র পরিচয় প্রসঙ্গে 'লিপি-চিত্র' কথাটি আখ্যা-পত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। 'কবলুতি' গল্প সংকলনেও এই পরিচিতি পুনরুল্লিখিত হয়েছে। আসলে কেদারনাথের প্রায় সব গল্পই লিপি-চিত্র বা চোখে-দেখা জীবনের জীবন-রসান্বিত নক্সা-ছবি। ছোটগল্প পুরো না হোক, আকারে ছোটগল্প হিশেবে যে কয়টি লেখা উৎরেছে,—'ধম্মা' তাদের মধ্যে একটি ;—এখানেও গল্পের জীবনকে ছবির মত স্পষ্ট করে আঁকবার সাধনা সার্থক হয়েছে। আর এ-চেষ্টায় লেখকের ভাষা-শৈলীও অনেকখানি সহায়তা করেছে।

যেমন গল্পের theme, তেমনি কেদারনাথের গল্পের ভাষাতেও বর্ণিতব্য জীবন যেন নিজে থেকে কথা বলে উঠেছে। আগে বলেছি, কলকাতার প্রান্তবর্তী পল্লীবাংলা আর চাকুরি-জীবী প্রবাসী বাঙালির সেকালের জীবন ছিল তাঁর গল্পের উপজীব্য। এদের সঙ্গে লেখকের আত্মার যোগ ছিল দীর্ঘকালের সেই জীবনযাত্রার যথার্থ স্বাদ যেমন আত্মার গভীরে উপভোগ করেছেন,- তেমনি তার বহিরঙ্গ রূপ-স্বভাবকেও প্রোথিত করেছিলেন চেতনার মূলে। সৃজনভূমি ও স্রষ্টার ভাব-চেতনার এই আমূল

একাত্মতা কেদারনাথের লেখনীর মুখ দিয়ে জীবনের কথাকে প্রকাশিত করেছে। ফলে যে অঞ্চলের গল্প, তার আঞ্চলিক ভাষা-প্রকৃতি আমূল উৎপাটিত হয়ে প্রোথিত হয়েছে গল্পের রস-কেন্দ্রের গভীরে। ওপরে উদ্ধৃত কাকীমার উক্তির মধ্য দিয়ে সেকালের বঙ্গপল্লীর একটি অটুট সম্পূর্ণ 'কাকীমা' যেন রূপ ধরেছেন বাণীর রেখায় রেখায়। তেম্‌নি, প্রবাসী বাঙালির জীবন-কথায় ইঙ্গ-বঙ্গ বিমিশ্র ভাষার ব্যবহার আরো বহু গল্পকে ছবির স্পষ্টতা দিয়েছে :—কথার পথ বেয়ে চরিত্রকে করে তুলেছে মূর্তিমন্ত। লিপির মাধ্যমে গল্পে জীবনের ছবি এঁকেছেন কেদারনাথ !

'ধম্মা' গল্পটির নামেই এ-সত্যের প্রকাশ ! শুধু তাই নয়, এ-গল্পে দেহবল-ভূয়িষ্ঠ আদিম মানুষের একটি অশৃঙ্খলিত অবাধে-মুক্ত মূর্তি যেন প্রকাশিত হয়েছে,— ধম্মার চরিত্রে। তার ক্রোধ, অভিমান, উৎসাহ-বেদনা, সব কিছুতেই আদিমতার এক epic-ধর্মী হিংস্র-উদাত্ততা রয়েছে ! কাকীমার হৃদয়-শক্তির দৃঢ়তাও যেন কালো পাথরে গড়া মূর্তির মত কঠিন,—অনমনীয়। ঘটনাস্রোতের ভয়াবহ অপ্রত্যাশিত গতি, চরিত্র-প্রবাহের কাঠিন্য এবং বৈচিত্র্য, পরিণতির দৃঢ়-অমোঘ মহিমা, সবকিছু মিলে গল্পটির দেহ ঘিরে যেন epic স্বভাব বিচ্ছুরিত হয়েছে।

অত দৃঢ়-ভিত্তিক না হলেও, 'থাকো' গল্পটিতেও জীবন-রসের এই অনির্বচনীয় স্নিগ্ধতা রয়েছে। 'নেউকি' বাড়ির গৃহিণী,—নিম্নবিত্ত কেরানীদের ঘরে ঘরে প্রয়োজনের দুর্লভ সেবা ও সহযোগিতা সরবরাহ করে ফিরতেন। তাঁর বেশ, আচরণ, ব্যস্ততা—কোনো কিছু থেকেই একটি ব্যবসায়িনী সেবিকা-ঝি ছাড়া আর কিছু তাঁকে মনে করবার উপায় ছিল না,—নামটিও প্রচলিত হয়েছিল তেম্‌নি,—'থাকো'। অথচ নিয়োগী-কর্তা এক-পুরুষে এত ধন সঞ্চয় করেছিলেন যে, গ্রামের শ্রেষ্ঠ ধনীদের মধ্যে তিনি একজন বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। তাহলেও নিরভিমান. সর্বসেবা-ব্রতী এই নিয়োগীর মধ্যে অর্থের উত্তাপ প্রকাশ পায়নি কোনো দিন। বাড়িতে দান-ধর্মের সদাব্রত ;—একটি বিড়াল পর্যন্ত ঘর থেকে বিতাড়িত হলে কর্তার মুখে অন্ন রুচ্‌তে না। তিনি বলতেন,—"আমি মুখ্‌খু চাষা, এই গ্রামেই মুড়ি মুড়কি বেচেছি। এ ধন-দৌলত 'মা'-র, আমি মজুর। কার ভাগ্যে এ-সব আসে, আর কাদের জন্যে তিনি দেন, তা জানি না। এতে সবারই অধিকার আছে। এ বাড়িতে যারা আশ্রয় নিয়েছে, তাদের তাড়াবার অধিকার কারুর নেই।" অথচ সমাজের উচ্চবর্ণের পংক্তির অনেক তলায় ছিল এই 'নেউকি'-র আসন। 'নীচুজাত', অনেক সম্পদের অধিকারী হয়েও নীচুর মত সকলের সেবা করেছেন,—জীবনের গগনচুম্বী আলোর উল্লাস ঘটেছে নিম্নভূমি থেকে। প্রৌঢ়া থাকো-কে দেখে কবিযশপ্রার্থী রামবাবু মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন,—"ঘোমটার আড়ালে—বর্ণে স্বর্ণে সিন্দুরে

হঠাৎ যেন আঁচল ঢাকা প্রদীপ দেখলুম।" জাতি-ভেদের কালো আঁচলে ঢাকা সমগ্র সমাজের কল্যাণ-প্রদীপ রূপে জেগে উঠেছিল নিয়োগী পরিবার।

কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে সিদ্ধ সাধক লক্ষ্মীপুজো করে গৃহলক্ষ্মীকে দেবীর কাছে বর প্রার্থনা করতে আহ্বান জানালেন; দেবী তখন স-শক্তিতে আবির্ভূতা, যা চাওয়া যাবে, তাই মিল্‌বে;—অতএব ভেবে-চিন্তে যেন সবচেয়ে দুর্মূল্য, সবচেয়ে বাঞ্ছিত কাম্যটি প্রার্থনা করা হয়। থাকো কিন্তু শোনামাত্রই প্রণাম করে প্রার্থনাটি নিবেদন করলে,—"মেয়েদের, বিশেষ করে মায়েদের যা সবার বড় কামনা!" পুরোহিতের জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেন,—"বাবা, মা আমাকে কৃপা করে সব সুখ দিয়েছেন,—স্বামী, একটি ছেলে, একটি নাতি, আর এই যা কিছু দেখ্‌ছেন। বড় ভয়ে ভয়ে এতদিন ভোগ করছি। বড় সুখের সঙ্গে বড় ভয় থাকে বাবা। তাই মাকে বল্‌লুম—এই সুখের মাঝখানে, সব অটুট্ থাক্‌তে, তিনি দয়া করে আমাকে তাঁর পাদপদ্মে নিয়ে নিন।"

পুরোহিত আঁৎকে উঠ্‌লেন। বৎসর পূর্ণ হবার আগেই থাকো গঙ্গাযাত্রা করলেন; কর্তা তখন ভেঙে পড়েছেন। থাকো বল্‌লে,—"ছিঃ, পুরুষ মানুষের অমন হতে নেই, পায়ের ধুলো দাও।"

"কর্তা বলিলেন, 'ভগবান এতটা দিলেন, সে সুখ একদিন ভোগ করলে না এই আমার দুঃখ'।"

"থাকো সিক্ত কণ্ঠে বলিল, 'ওগো, তুমি জান না, আমার এত সুখ যে তা সয়ে থাকতে আমার সাহস হচ্ছিল না; মেয়েমানুষের অত সুখ বেশিদিন ভোগ করতে নেই গো'।"

এ-সমাপ্তিতে ট্রাজেডির তাপ বা কারুণ্য নেই। জীবনে নিছক টিকে থাকবার জন্য যখন রুদ্ধশ্বাস লড়াই করে চলি, অথচ তা সত্ত্বেও জীবনের জগৎ থেকে বিদায় নিতে হয়, তখন আত্মার পরাভব ঘটে। সেই হারের মার যন্ত্রণা, অপমান ও অপঘাতের সহস্রধারে জীবনের ওপরে যখন এসে পড়ে, তখনই ট্রাজিক চেতনার উদ্ভব। কিন্তু পরিপূর্ণ প্রাপ্তির মাঝখানে নিজেকে নিঃশেষে অনায়াসে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করে দিতে পারার মহিমা অতুল,—জীবনযজ্ঞের এই পুণ্যবিভা করুণার্দ্র নয়, মৃত্যুপথযাত্রী চেতনার কণ্ঠে মানুষের জীবনের উপান্তভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রাণের পরম বন্দনা গান। এ দান, এ গান করুণ নয়, আনন্দঘন-ও নয়,—জীবনের আনন্দবেদনা-সিন্ধু মন্থন করা 'sublime' অমৃত রস। কেবল পরিসমাপ্তির লগ্নে জীবন-রস-স্নিগ্ধতার আশ্বস্তি নয়,—সারাটি গল্পের দেহে humour-ও নয়, অনির্বচনীয় নির্লোভ তৃপ্তিবোধের স্মিত মধুরিমার আভা ছাড়িয়ে রয়েছে। বস্তুতঃ 'থাকো' গল্প, কেবল থাকো-র জীবন-কথা নয়। যে সমাজ-জীবন-বিশ্বাসের

ভূমিতে থাকো-র পুষ্পসৌরভময় বিকাশ,—সেই সমাজের বস্তুভূমি, ও তার বিশ্বাসের প্রাণচ্ছায়ার একটি অখণ্ড অপরূপ ছবি আঁকা হয়েছে এর কাহিনীতে। তাতে গল্পের বক্তা, রামবাবু, বাঁড়ুজ্জে মশায়, 'নেউকি-কর্তা,' কারো ভূমিকাই থাকোর চেয়ে অনুজ্জ্বল নয়। সবকিছু মিলে সেই অখণ্ডজীবনের মৃগনাভি-সারটুকু শিল্পী সংকলন করেছেন। তাই তাঁর নিজেরও চোখে জল, মুখে কৌতুক।

গোটা গল্পটিতে কৌতুকরসের স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে আছে মধু-সুরভির মত; আর সে কৌতুক-মধুরিমা উৎসারিত হয়েছে চরিত্রগুলির গোপন অন্তরভূমি থেকে। হৃদয়গ্রাহী শিল্প হিশেবে wit-এর তুলনায় humour-এর আপেক্ষিক উৎকর্ষের প্রসঙ্গে পরিবেশ ও চরিত্র বর্ণনার মাধ্যমে জীবনের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ কৃতজ্ঞতাবোধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৮] জীবনের প্রাপ্তির প্রতি শিল্পী কেদারনাথের মনে সহৃদয় শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা আশ্চর্য সুরেখ হয়ে উঠেছিল; 'অন্তিমবাসনা' কবিতায় তার সার্থক প্রকাশ,—

"যা দেখেছি যা পেয়েছি তাই মোর ঢের,
পেতে হয় তোমাদেরি পাই যেন ফের।

* * *

যা দিয়েছ পেয়েছি তা, চলিলাম রাখি
তোমাদেরি শুভকামী, তোমাদেরি থাকি।[৯]

—এই নির্লোভ পরিতৃপ্তি জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবোধের অপার গহনে এক স্বচ্ছ কৌতুক-বোধকে অনুস্যূত করেছিল;—চোখে-দেখা মানব চরিত্রের গভীরতা হতে সেই কৌতুক আপনা থেকে উৎসারিত হয়েছে। Humour-এর আর্ট যে কত স্বতঃস্ফূর্ত, 'থাকো' গল্পে শংকরীকে (মার্জারী) নিয়ে নেউকি দম্পতির 'দাম্পত্য-কলহ' এবং লক্ষ্মী-পুজোয় নূতন পুরোহিত-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে 'নেউকি'-'বাঁড়ুজ্জে'-'থাকো'-সংবাদ তার উজ্জ্বল নিদর্শন। মানুষের মধ্যেই নিহিত রয়েছে হাসি-কান্নার অফুরন্ত গোপন উৎস। সেই মানুষকে তার যথাস্থিতরূপে উপস্থিত করার যাথাযাথ্য থেকে স্বত-উৎসারিত হয়েছে গল্পের সকল কৌতুক ও subtlety-র রস-প্রবাহ। কেদারনাথের গল্পে কৌতুকহাস্য আসলে জীবন-রসের অচ্ছেদ্য উপাদান।

কৌতুকের সঙ্গে এমনি জীবনরসের যোগান ঘটেছে 'কালীঘরামী', 'পুরসুন্দরী', 'আনন্দময়ী দর্শন' ইত্যাদি গল্পে। ছোটগল্প হিশেবে এগুলো অপেক্ষাকৃত দুর্বল; অনেকটা যেন সেকালের জীবনের জীবন্ত নক্সা,—লেখকের ভাষায় 'লিপিচিত্র'। 'কালীঘরামী' গল্পটির প্রশংসা করেছিলেন শরৎচন্দ্র; নিশ্চয়ই গল্প-শৈলীর সম্পূর্ণতার জন্যে নয়,

৮। দ্রষ্টব্য—'Cassel's Encyclopaedia of Literature.' [Humour & Wit]
৯। দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'সাহিত্যসাধক চরিতমালা, (৭৬)

কেদারনাথের গল্পে যে জীবন-বোধ সর্বসাধারণ, তারই একটি মনোজ্ঞ রূপ প্রকাশ পেয়েছিল গল্পটিতে। বিদেশী যে ব্রাহ্মণ পরিবারে ঘরামী-র কাজে নিযুক্ত হয়ে এসেছিল কালী, সেখানে তার অপত্য-স্নেহ লাভ, বর্ষার দুর্যোগে সমৃদ্ধ ভট্টাচার্য পাড়ার পথে রায়বাড়ির বধূর করুণ পতন, কালীর সহায়তা, তাঁকে মাতৃ সম্বোধন ইত্যাদি উপলক্ষ করে একটি দুর্লভ মমতাময় জীবন-পরিবেশ গড়ে উঠেছে। সবশেষে, দীর্ঘদিন যাবৎ বেতের ঝুড়ি বুনে পোল তৈরী করে দেবার প্রয়াসে কালীর যে সামাজিক মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে,—সে কেবল উনিশ শতকের সেই বিশেষ মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত, যার জীবনবাণী ছিল 'plain living & high thinking.' উচ্চভাবনা কেবল অনেক লেখাপড়ার মধ্য দিয়েই আসে না,—কালীঘরামী তার কৃচ্ছ্রসাধ্য অকিঞ্চিৎকর জীবনযাত্রার মাঝখানে বসে অতি উচ্চ ভাবনার,—মহত্তম উদ্দেশ্য সাধনের ক্রত উদ্‌যাপন করেছিল। এই ফলশ্রুতির গভীরেই গল্পটির সার্থকতা।[১০] 'আনন্দময়ী-দর্শন' গল্পটিতে জীবনের লিপি-চিত্রণ sentimental হয়ে পড়েছে,—তাহলেও পূর্বোক্ত জীবনবাণীর ঘোষণায় এর ব্যাপ্তি হিন্দু-মুসলমান সমাজকে ছাপিয়ে একেবারে য়ুরোপীয় ব্যক্তিত্বেরও গভীরে গিয়ে পৌঁচেছে। 'পুরসুন্দরী' গল্পে হেমা-পাগ্‌লীর উন্মত্ততার গহনেও পরার্থে জীবনযাপনের সহজ প্রত্যয়ের যে উৎসার-চিত্র শিল্পী অঙ্কন করেছেন, তার অভিনব স্বাদুতা হৃদয়স্পর্শী।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়, মহৎ গল্পের সুমহৎ ফলশ্রুতির ঘোষণায় কেদারনাথ কখনো serious হয়ে ওঠেননি। আগেই বলেছি, শরৎচন্দ্রের মত কোনো উদ্দেশ্য বা আদর্শের বিঘোষণ তাঁর কাম্য ছিল না। জীবনকে নিজের কথা বলবার ভার দিয়েছেন শিল্পী, তার নিজের বাণী নিজের কণ্ঠেই স্বতঃপ্রকাশিত হয়েছে। লেখকের বকলমায় যতটুকু এসেছে, তা ছিল তাঁর নির্লোভ পরিতৃপ্ত জীবন-রস-চেতনার সৃষ্টি,—তাতে মাধুর্য ছিল, কৌতুক-প্রসন্নরূপে যার প্রকাশ। এই কৌতুক অনেক সময়ে কেবল রসসিদ্ধ বাচনে নয়, গল্পের বিন্যাসের মাধ্যমেও উজ্জ্বল অভিব্যক্তি পেয়েছে। এই সব বিন্যাসের ক্ষেত্রে জীবন-রসিক কেদারনাথ সিদ্ধ wit-এরও নিঃসংশয় পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে 'থাকো' গল্পের বিন্যাসের কথা আবার স্মরণ করি। প্রথম থেকে থাকো-কে এমনভাবে লেখক উপস্থিত করেছেন, যাতে করে তার স্পষ্ট পরিচয় রহস্যাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। লক্ষ্মীপূজার রাত্রে নাটকীয় পরিবেশে তার পরিচয় প্রকাশ ও পরবর্তী পরিণাম-নির্দেশে রচনার যে মুন্সিয়ানার অভিব্যক্তি,—সার্থক wit-এর প্রমাণ তাতেই উদ্ভাসিত হয়েছে। পূর্বোক্ত অপরাপর গল্প অত witty না হলেও, জীবনরস-স্নিগ্ধ; humorous attitude-এর সঙ্গে

১০। দ্রষ্টব্য—শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।

কিঞ্চিৎ wit-এর মিশ্রণে কেদারনাথের serious গল্পসমষ্টিও আশ্চর্য উপভোগ্যতা পেয়েছে। এ ধরনের আলোচনা অশেষ হতে পারে। কেবল আর একটি গভীরতাধর্মী গল্পের উল্লেখ করব,—যেখানে জীবন-রসের অনুচ্চার বৈভব আদিঅন্তে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। গল্পের নাম 'মূল্যদান'। সজনীকান্ত দাস 'দাদামশায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পে'র ভূমিকায় লিখেছেন, —"আসলে দাদামশায়ের সব গল্পই অল্পবিস্তর স্মৃতিকথা ; তিনি নিজে সরাসরি জড়িত না হলেও যা তিনি দেখেছেন বা শুনেছেন, তারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতা গল্পগুলির ভিত্তি।" কেদারনাথের 'স্মৃতিকথা' সামনে রেখে তাঁর গল্পগুলি পড়ে গেলে এ-সত্য চোখের ওপরে প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দেবে। 'মূল্যদান' গল্পটি এ-সত্যের এক শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। জব্বলপুরে প্রথম দুর্গোৎসবের যে স্মৃতি-চিত্র রয়েছে 'স্মৃতিকথা'-য়, গল্পে কেবল তার পুরো প্রচ্ছদটিই মূর্ত হয়ে ওঠেনি ;—গল্পের বিভিন্ন চরিত্রও যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে নেওয়া, তা-ও চোখে পড়বে। এমন কি দেশ-ভিক্ষুর আশ্চর্য চরিত্রটিও সেখান থেকে নেওয়া। বাস্তবের থেকে গল্পের পরিণতিটি কেবল পৃথক। কিন্তু তাই বলে কেদারনাথ চোখে-দেখা জীবনের ফটোগ্রাফার ছিলেন না ;—বস্তুময় জীবনকে নিজের জীবন-প্রিয় প্রত্যয়ের স্নিগ্ধতায় সিক্ত করে নূতন 'নির্মিতি'র আকারে গড়ে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে লেখক তাঁর মনের সংশয়ের কথা জানিয়েছিলেন ;—কাশীবাস স্বীকার করে সাহিত্য সাধনায় আত্মসমর্পণ করা তাঁর পক্ষে দ্বিধার কারণ হয়েছিল। কবি নাকি তাঁর জবাবে বলেছিলেন "মুক্তি দিয়ে মুক্তি পেতে হয়।"[১১]

কবি-কথার তাৎপর্যকে শিল্পীর দৃষ্টিতে আর একটু টেনে বলা চলে,—নিজেকে উজাড় করে বিলিয়ে দিয়ে,—হাতের পাঁচ কিছু না রেখে খুশি মনে নিজেকে নিঃশেষ মুক্তি দিয়ে তবেই মুক্তি পেতে হয় ; সে মুক্তি পেয়েছিল কেদারনাথের গল্পের খাকো। আর জীবন-মূল্য দিয়ে সেই মুক্তির পথে উধাও হয়ে গেলেন দেশ-ভিক্ষু।

দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভব-আবেগকে তিল তিল করে নিঙড়ে হিমালয়-চূড়ার চিরন্তন বরফখণ্ডের মত আদর্শবাদের এক মহৎ কঠিন বনিয়াদ গড়ে তুলেছিলেন কেদারনাথ ; গল্পের ফাঁকে সেই জীবনাদর্শের মূর্তি এঁকেছেন যার চার পাশে দেব-দেহের মতই অশরীরী-দ্যুতি,—অথচ দৃঢ়তা ও গাঢ়তায় যা হিমালয়ের মত সংহত, সুপরিণত অবিচল। দশমীর দিন মৃন্ময়ী প্রতিমা বিসর্জনের পর দেশ-ভিক্ষু উদাস হয়ে পড়েছিলেন। তখন "দেবেনবাবু চোখে হাসির আভাস নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'মাটির মায়ের তরে আপনার যে বড় এ ভাব' ?"

"তিনি [দেশ-ভিক্ষু] কাতর নয়নে বললেন, 'মাটির মা-ই তো সত্যিকারের মা

১১। দ্রষ্টব্য—সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৭৬)

দেবেনবাবু। রক্তমাংসের মা হলে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' হতুম কি করে? দেশ চিরদিনই মাটির, তিনি সন্তানদের বুকে করে লালন-পালন করেন, সকল উপদ্রবই সহ্য করেন, ক্ষমা করেন। তাঁর বুকে থেকেও চিনতে পারি না। যাঁরা চিনেছিলেন, তাঁরা তাই মাটির মা গড়ে পূজা করেছিলেন—ওই তো মায়ের সত্যিকারের প্রতীক। পরের মুখে ঝাল খাওয়া নয়। এ ভুল যেদিন ভাঙবে সেদিন বিসর্জন আর দেব না—অর্জনের দিন আসবে। আজও বিসর্জন দিচ্ছি।" অবিচল আদর্শ-চেতনার এই অকুণ্ঠিত প্রকাশ সাংকেতিকতার ব্যঞ্জনাবহ,—অথচ কোথাও ভাবাবেগে তরলিত হয়নি তার বরফ-শুভ্র কাঠিন্য।

কিন্তু এই কাঠিন্য,—এই গভীরতা গল্পরসের একমাত্র উপাদান নয়। পূজা ও থিয়েটার-এর প্রস্তুতি প্রসঙ্গে ইঙ্গ-বঙ্গ ভাষার কথোপকথন ও বিভিন্ন চরিত্রের স্নেহ-মধুর বিচিত্রণে মমতার হাসি স্মিত ধারায় বিচ্ছুরিত হয়েছে। কিন্তু গল্প যেখানে শেষ হল সেখানে সকল হাসি ও কান্না এক মহৎ পরিণামবোধের বেদীমূলে অভিনব গাঢ়তা লাভ করেছে।

এই অর্থেই বলেছি, কেদারনাথকে নিছক হাস্যরসের শিল্পী বলা চলে না,—নিছক বেদনাঘন গভীর-গম্ভীর জীবন-কথার বেসাত-ও নেই তাঁর রচনায়। হাসি-অশ্রুর এক ঘন-গাঢ়তাময় সংযোগ মিশ্র স্বাদুতার দ্যুতি সৃষ্টি করেছে গল্পগুলিতে। লেখক তাঁর আত্মকথায় এ-সম্বন্ধে বলেছেন,—"অনেক ভেবে জীবন, সমাজ ও সংসারের বেদনাগুলি যথাসম্ভব হাস্যরসের আবরণে প্রকাশ করবার পথ খুঁজি,…।

"মধ্যবিত্ত ভদ্রদের ও ভদ্র পরিবারের কষ্টের জীবন আমাকে চিরদিনই বেদনা দিয়েছে এবং দেয়; বিশেষ মহিলাদের দুঃখের জীবন, যা অন্তরে চেপে প্রসন্নমুখে নীরবে তাঁরা বহন করে চলেছেন ও চলেন। দুঃসাহসের কাজ হলেও আমাকে তা হাসির আবরণে বলে যেতে হয়েছে। আমার অভিজ্ঞতা ৪০।৫০ বৎসর পূর্বের বলা চলে।[১২] তারপর বহু পরিবর্তন ঘটেছে, তাতে যে তাঁদের সংসারের বিশেষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে তা আমার জানা নেই। বাহ্যিক উন্নতিই চোখে পড়ে,—তাও শহরে ও শহরতলীতে। তাই আমি আমার লেখায় কোথাও বিশেষভাবে তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে সাহস পাইনি। কল্পনার উপর নির্ভর করিনি। গরীবদের লোক গরীব বলে, এবং ধনীদের ধনী বলে জানে, মধ্যবিত্তের সে আশ্রয় নাই,—বাঁচোয়াও নাই।"[১৩]

এক যুগান্তর পারের মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের সুখে-দুঃখে বিমিশ্র জীবনরসের মূর্তিকার রূপেই গাল্পিক কেদারনাথের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা।

তা হলেও কেবল হাসির খোরাক নিয়েও গল্প লিখেছেন কেদারনাথ,—তাতে

১২। কেদারনাথের 'আত্মকথা'র রচনাকাল ১৩৪৬ বাংলা সাল—দ্রষ্টব্য তদেব। ১৩। তদেব।

বৈচিত্র্যের অভাবও নেই। প্রথম গল্প-সংকলন 'আমরা কি ও কে'-র নামের আকর প্রথম গল্পটিতে স্বচ্ছ humour-এর অন্তরে অন্তরে ব্যাজস্তুতির বেদনা-ব্যঞ্জনা নিহিত। সেকালের কেরানি বাঙালি, তথা, মধ্যবিত্ত বাঙালির মধ্যে স্বজন-বিমুখ যে আত্মপরতা ক্রমে ক্রমে দেখা দিচ্ছিল শিল্পীর অন্তঃকরণ তাতে ব্যথিত হয়ে ওঠে। 'আনন্দময়ী-দর্শন' গল্পে মিস্টার হার্ডি সতীশকে বলেছিল, "নিজের দেশের লোক—এমন কি স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও, তোমাদের দেশের ঐসব জীবগুলির উপর আমার আদৌ আস্থা নেই। নিজের ছাড়া—দেশের লোকের উপকারে তারা অভ্যস্ত নয়।" গল্পের চরিত্রের মুখ দিয়ে এটুকু শিল্পীর মনের ব্যথাতুর আত্মস্বীকৃতি। অন্য পক্ষে, সেকালের ইংরেজ-সাধারণ পাষণ্ড কিংবা মত্ত হলেও যথার্থ বিপন্নের সহায়তা সম্বন্ধে কোনো অবস্থাতেই কর্তব্যবোধের সচেতনতা হারাতো না, এ অভিজ্ঞতাও হয়ত লেখকের ছিল। উপরোক্ত গল্প-দুটিতে এবং অন্যত্রও এই সত্যের সমর্থন রয়েছে। 'আমরা কি ও কে' গল্পে জাতীয় দৈন্যের একটি বেদনাকর নক্সা আঁকা হয়েছে প্রাণদীপ্ত, বিচ্ছুরিত হাসির আবরণে। বরং মমতাময় শিল্পীর প্রচ্ছন্ন বেদনাবোধ হাসির উপাদানকে আরো সজীব করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর হাসির কবিতার মূলগত প্রেরণা ব্যাখ্যা করে একথা বলেছিলেন:—

> "সবারে চাহে বেদনা দিতে বেদনা ভরা প্রাণ।
>
> ঃ ঃ ঃ
>
> হাসির ছলে সবারে চাহি করিতে লাজ দান।"

['বঙ্গবীর'—'মানসী' কাব্য]

'আমরা কি ও কে' গল্প-নক্সা সম্বন্ধে কেদারনাথও একথা বলতে পারতেন। কিন্তু তিনি হাসির ছলে স্বজাতিকে কেবল লজ্জাই দিতে চেয়েছেন,—আঘাত করবার ইচ্ছে ছিল না কোথাও। তাঁর গল্পে তাই ব্যঙ্গের ঝাঁজ নেই, গল্পের দেহে হাসির সঙ্গে লজ্জার অরুণাভা মিশে এক অভিনব সরসতার সৃষ্টি হয়েছে। হাসি যেন ধিক্কারে আহত না হয়, অথচ আমাদের স্বভাবের লজ্জাকরতার অনুভবও যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়, সে চেষ্টায় লেখক গল্পের humorous-বিষয়কে wit-এর কৌশল-সংযোগে বিন্যস্ত করেছেন। Wit হচ্ছে, Dryden বলেছিলেন, "Propriety of thought and words"—স্বচ্ছবাহিত ভাবনাকে যথোচিত শব্দের বিন্যাসে গেঁথে তোলাই wit-এর শ্রেষ্ঠ কৌশল। গল্পের theme-কে কেদারনাথ এমন যথাযথ কথার পাকে বেঁধেছেন যে, অনাহত হাসির ধারায় লজ্জার অরুণরাগকে সে অনায়াসে রঞ্জিত করেছে। গভীর-গম্ভীর পরিণাম-বিশিষ্ট গল্পকে witty প্রকাশের কল্যাণে সরস করে তোলার কলারীতি লক্ষ্য করেছি এর আগেও 'খাঁদো' গল্পে।

কেদারনাথের আর একটি অনাবিল হাসির গল্প 'দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি'। এ-গল্পটি humorous,—পরিবেশ ও সিচুয়েশন্-এর সঙ্গে উদ্ভট idea-র সংযোগসাধন করে একটি স্বতঃস্ফূর্ত হাসির গল্প গড়ে তোলা হয়েছে। Theme-এ প্রমথ চৌধুরীর 'ফরমায়েসি গল্প'র সাদৃশ্য থাকলেও, রচনা-প্রকরণ ও রস-স্ফুরণের স্বভাবে এই উচ্ছ্বসিত-হাস গল্পটি হিউমারিস্ট কেদারনাথের সার্থক পরিচয়বহ।

আমাদের সামাজিক পরিবেশ ও আত্মীয় সম্পর্কের নানারূপ জটিলতা নিয়ে humorous sketch আঁকা হয়েছে 'ভোলানাথের উইল', 'বিদ্যুৎবরণ', 'নিতাই লাহিড়ী', 'বেয়ান বিভীষিকা' ইত্যাদি গল্পে; এ-সব ক্ষেত্রে চারিত্রিক বিন্যাস এবং অভিব্যক্তির সহযোগিতায় হাসির পরিবেশও গাঢ় হয়ে উঠতে পেরেছে। শেষোক্ত গল্পে কেবল বিভীষিকাময়ী 'বেয়ান' নন, শিবালয়ের জমিদার অসহায় বেয়াই এবং গুপীমোক্তার প্রত্যেকের চরিত্রই শিল্পী যেন কলমের একটা-দুটো আঁচড়ে অনায়াসে এঁকে তুলেছেন,—আর প্রতিটি চরিত্রই অন্তরে অন্তরে হয়ে উঠেছে রস-সম্পূর্ণ।

কিছু কিছু গল্পে লেখক fantasy-র ব্যবহারও করেছেন। কিন্তু এক 'ভগবতীর পলায়ন' ছাড়া এ-ধরনের কোনো গল্প তেমন রসোত্তীর্ণ হয়নি। 'ভগবতীর পলায়ন'কেও একটি সম্পূর্ণ সার্থক সৃষ্টি বলা চলে না।

ফলকথা, গল্প-শিল্পী কেদারনাথ বিশুদ্ধ হাস্যরসিক নন,—হাসির সঙ্গে অশ্রুর, কিংবা তাপ-জ্বালাহীন বেদনার সূত্রে অনতিলঘু হাসির মালা গাঁথাই তাঁর শিল্পি-স্বভাব। যেখানে সে চেষ্টা জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মমতাময় অনুভবের সঙ্গে অন্বিত হতে পেরেছে,—সেখানেই জীবন-রসোজ্জ্বল সৃষ্টির দাক্ষিণ্যে তাঁর সাধনা হয়েছে চরিতার্থ।

এঁর প্রকাশিত গল্প-সংকলন গ্রন্থ হচ্ছে,—'আমরা কি ও কে' (১৯২৭), 'কবলুতি' (১৯২৮), 'পাথেয়' (১৯৩০), 'দুঃখের দেওয়ালী' (১৯৩২), 'মা ফলেষু' (১৯৩৬), 'সন্ধ্যা শঙ্খ' (১৯৪০) ও 'নমস্কারী' (১৯৪৪)।

রাজশেখর বসু (পরশুরাম)

বাংলা হাসির গল্পের ইতিহাসে পরশুরাম ছদ্মনামে রাজশেখর বসুর (১৮৮০—১৯৬০) আত্মপ্রকাশ এক নূতন যুগের সূচনা করেছে;—আর ঐ একটিমাত্র ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করে দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত গতিতে চলেছিল সেই ধারা। ১৩২৯ বাংলা সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর 'বিরিঞ্চি বাবা' গল্প প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল,—আর শিল্পীর তিরোধানের পরেও বেশ কিছুকাল প্রায় সকল সাহিত্য-সাময়িক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা পরশুরামের রস-গল্পের শিরোনামাঙ্কন নিয়ে আত্মপ্রকাশে উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। আশিবছর বয়সেও তাঁর হাসির উৎস ম্লান হয়নি,—মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত—সে এক পরম বিস্ময়।

তার চেয়েও বড় বিস্ময় রাজশেখর-প্রতিভার বিচিত্রমুখী দক্ষতা। বিজ্ঞানের সফল ছাত্র,—দীর্ঘ কর্মজীবন অতিবাহিত করেছিলেন দেশীয় ভেষজ-নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধকাম কর্ণধার হিশেবে ;—'চলন্তিকা' অভিধান, এবং সংস্কৃত 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'র অনুবাদে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য মননশীলতা ও গবেষণা-প্রবৃত্তির পরিচয়,—সেই সঙ্গে রয়েছে চিন্তা-দীপ্ত আরো ছোটবড় প্রবন্ধ ও প্রবন্ধসংগ্রহ। এত বড় জ্ঞানী আর বিজ্ঞানী যিনি, স্বভাবে যিনি রাশভারি এবং সংবৃতবাক্[১৪] বাংলা গল্পে তিনিই নির্ভার হাসি যোগাবার স্বেচ্ছা-ব্রতে সিদ্ধরসের যোগান দিয়েছেন প্রায় চার যুগ ধরে, এর বাড়া বিস্ময় কি হতে পারে! মনীষি-পণ্ডিতের চেতনায় wit-এর দীপ্তি হয়ত সর্বদা দুর্লভ নয় ;—কিন্তু পরশুরামের হাসি রচনার কুঠার হিউমার দিয়ে শানানো!

তাহলেও হাসির গল্প রচনায় লেখকের মননশীল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-শক্তি এবং জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্পদ ব্যর্থ হয়নি। বরং সে অভিজ্ঞতা এবং দুর্লভ গভীর পর্যবেক্ষণ-শক্তিই তাঁর গল্পে হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ যোগান দিয়েছে। একালের কোনো মার্কিন সমালোচক বলেছেন, "Wit is subjective while humor is objective"[১৫] এ-কথার পুঙ্খানুপুঙ্খ যাথার্থ্য সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু পরশুরাম প্রায় সব গল্পেই হাস্যরসের সার্থক অবতারণা করেছেন নিঃসন্দেহে ঐ objective কলাশৈলীরই অবলম্বনে,—এদিক থেকে বস্তু-বিশ্ব (objective world) সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত জ্ঞানের বিস্তৃত পরিধি রস-রচনার একান্ত সহায়ক হয়েছে।

দৃষ্টান্ত হিশেবে 'চিকিৎসা-সংকট' গল্পটির কথা বলা যেতে পারে। এ-গল্পের theme একান্ত সংক্ষিপ্ত, এবং তার মধ্যে যেটুকু সামান্য হাসির খোরাক ছিল, তা নায়ক নন্দবাবুর জীবন-পরিচয়ের প্রসঙ্গে ছোট-বড় প্রথম আটটি অনুচ্ছেদেই শেষ হয়েছে। তারপর গোটা গল্পটি পাতার পর পাতা ধরে এগিয়ে চলেছে নন্দবাবুর রহস্যজনক বৈদেহ ব্যাধির রহস্যকর চিকিৎসার প্রয়াসে। সকল ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্যটি অভিন্ন,—অর্থাৎ রোগমুক্তির পুনঃপুনঃ প্রয়াস ; তবু গল্প কোথাও পৌনঃপুনিকতায় একঘেয়ে হয়ে পড়েনি। এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি-ডাক্তার, কবিরাজ, হকিম থেকে একেবারে লেডি ডাক্তার পর্যন্ত,—সর্বত্রই দেখি একই রোগী এবং চিকিৎসকের প্রায় অভিন্ন ভূমিকা। কিন্তু এই একই উপলক্ষ্যের উপকরণ দিয়ে পরশুরাম প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটি করে নতুন রসমূর্তি রচনা করেছেন,—দেখলেই যাকে মনে হয় অভূতপূর্ব। আর এ অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছে প্রত্যেকটি চিকিৎসক

১৪। প্রমথনাথ বিশী অবশ্য গুরু-গম্ভীর ব্যক্তিত্বই হাস্যরস-রচয়িতার সাধারণ চারিত্র লক্ষণ বলে নির্দেশ করেছেন। দ্র. 'পরশুরামের গ্রন্থাবলী'—ভূমিকা।

১৫। Carolyn Wells—'An Outline of Humor'.

ও চিকিৎসা-পদ্ধতির খুঁটিনাটি (detail) বর্ণনার কৌশলে। খুব নিখুঁত এবং গভীরভাবে না দেখতে জানলে সত্যের এমন হাসি-মোড়া প্রতিরূপ রচনা অসম্ভব হত। দেখলেই মনে হয় প্রত্যেকটি incident যেন একেবারে খাঁটি অনন্ত হাসির রূপটি পেয়েছে। এই হাস্য-চিত্রগুলিকে রবীন্দ্রনাথ মূর্তি-শিল্পের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন,—"['গড্ডলিকা'] বইখানি চরিত্র-চিত্রশালা। মূর্তিকারের ঘরে ঢুকিলে পাথর-ভাঙার আওয়াজ শুনিয়া যদি মনে করি ভাঙাচোরাই তার কাজ, তবে সে ধারণাটা ছেলেমানুষের মত হয়,—ঠিকভাবে দেখিলে বোঝা যায়, গড়িয়া তোলাই তাহার ব্যবসা। মানুষের অবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধিকে লেখক তাঁহার রচনায় আঘাত করিয়াছেন কি না, সেটা তো তেমন করিয়া আমার নজরে পড়ে নাই। আমি দেখিলাম তিনি মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন।"[১৬]

'চিকিৎসা সংকটে' objective details-এর পাথর ভেঙে পরশুরাম নিটোল হাসির মূর্তি গড়েছেন। এক্ষেত্রে অবশ্য সে details চরিত্রের তত নয়, যত পরিবেশ বর্ণনার। হিউমার সৃষ্টির উপাদান হিশেবে চরিত্র ও পরিবেশ বর্ণনার প্রয়োগগত কলাকৌশলের কথা উল্লিখিত হয়ে থাকে,—আগে একথা লক্ষ্য করেছি। পরশুরামের সৃষ্টিতে চরিত্রায়ণ পদ্ধতির প্রশংসা করেছেন রবীন্দ্রনাথ,—'চরিত্র-চিত্রশালা' বলেছেন তাঁর 'গড্ডলিকা'র গল্পগুলিকে। এই নিখুঁত চরিত্র-চিত্রাঙ্কণে হাস্যরস-সিদ্ধির শ্রেষ্ঠ পরিচয় 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড্' গল্প। বিশেষভাবে শ্যামবাবু, ওরফে স্বামী শ্যামানন্দের আপাত ধার্মিক আন্তর ধূর্ততা, গণ্ডেরীরামের অর্থগৃধ্নুতার সঙ্গে ধর্মসংস্কারের এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি মনোভাব, এবং রায়সাহেব তিনকড়ির 'লেফাফা দুরস্ত' হিশাববুদ্ধির ও কেতা-দুরস্ত সাবধানতার নির্বুদ্ধিতা জীবনের এক-একটি হাস্যকর type-কে জীবন্ত করে তুলেছে। আর এই সব চরিত্রের details বর্ণনায় শিল্পী অবিশ্বাস্যকরভাবে নিখুত ও যথাপরিমিত। ফলে এদের চরিত্র নিঙড়ে হাসির যে ফোয়ারা স্বতোবিকশিত হয়, তার মধ্যে মানুষের বিচিত্র হাস্যকরতার এক-একটি type-কেই কেবল উপভোগ করি না,—একটি স্বয়ম্পূর্ণ individual-এর অন্তর-লোকে প্রবেশের গোপন অধিকার লাভের আনন্দও সেই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। 'চিকিৎসা-সংকটে'র চরিত্রগুলি type,—'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড্'-এর চরিত্রায়ণ আরো নিখুঁত, বস্তু-বিন্যাসে detailed, আরো পূর্ণাঙ্গ,—এরা individuals.

কেবল পরিবেশ বা চরিত্র-বিন্যাসে নয়, মনোভঙ্গী বা attitude-এর দিক্ থেকেও শিল্পী পরশুরাম একান্ত objective. প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই হাস্যকরতার উপাদান রয়েছে,—জীবনের বিস্তৃত রঙ্গভূমিতে আমরা প্রত্যেকেই না-জেনে অসংখ্য হিউমার সৃষ্টি করে থাকি। আমাদের ব্যক্তিত্বের অন্তর্লীন অজ্ঞাত অসংগতি বা ত্রুটিকে ভাঙিয়ে

১৬। রবীন্দ্রনাথ 'গড্ডলিকা' (সমালোচনা) 'প্রবাসী' অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

অপরে হাসির সুখ উপভোগ করে। পরশুরাম এ-ধরনে পরের দৌলতে,—হাসির আসর জমাতে রাজী নন। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন পরের 'অবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধি'-কে আঘাত করে পরশুরাম হাসি সৃষ্টি করেন না। বস্তুত ঐ সব ক্ষেত্রেই attitude-এর subjectivity-র প্রশ্ন এসে পড়ে। কোনো এক বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ রকমের কোনো অসংগতি দেখে আমার যখন হাসি পায়, তখন আর একজন তাতে বিরক্ত হতে পারেন। হুতোমপ্যাঁচার নক্সা প্রসঙ্গে বঙ্কিমের বিরূপ attitude-এর কথা এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে।[১৭] শিল্পের ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যক্তিগত মনোভঙ্গীর বিশ্বজনীনতা সম্পাদনই মুখ্য কথা। যাঁরা মানব চরিত্রের অসংগতির কোনো ব্যক্তিগত অনুভবকে নিয়ে হিউমার সৃষ্টি করতে বসেন, তাঁদের রচনাও কেবল এই বিশ্বজনীনতা সম্পাদনের সাফল্যের বলেই satire বা অনুরূপ কিছু না হয়ে যথার্থ হিউমার হয়ে উঠতে পারে। সে আর এক পৃথক্ প্রসঙ্গ। বর্তমান উপলক্ষ্যে কেবল লক্ষ্য করব, পরশুরামের রসরচনা সাধারণভাবে সে পথ পরিহার করেছে।

তাঁর মোটামুটি সৃজন-কৌশল বস্তু-বিশ্বের নিখুঁত অভিজ্ঞতার সঙ্গে লেখকের মননশীল মনের fantasy-র বিমিশ্রতায় গড়ে উঠেছে,—ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যাকে বলেছেন, —'উদ্ভট্ কল্পনা।'[১৮] দৃষ্টান্ত হিসেবে 'ভূশণ্ডীর মাঠে', 'লম্বকর্ণ,' 'দক্ষিণ রায়', 'নিরামিষাশী বাঘ' ইত্যাদি গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। নিত্য দেখা জীবনে যা ঘটে, সেই সব incident-এর ওপরে আতিশয্যের রঙ্ ফলিয়ে তাকে স্বাভাবিকতার গণ্ডিমুক্ত করে দিয়েছেন শিল্পী,—আর তাতে গল্পগুলো হাসির আকর হয়ে উঠেছে। কোথাও সেই কল্পনাতিশয্য বা fantasy-র রঙ্ কড়া,—কোথাও মৃদু। 'ভূশণ্ডীর মাঠে' গল্প এই ধরনের উদ্ভট্ কল্পনার এক পূর্ণ সফলতার নিদর্শন। এক মর-জীবনের দুই স্ত্রী পুরুষের জীবনে পূর্বপূর্বজীবনের স্বামী ও স্ত্রীদের দাবির সম্মিলনে যে ত্রিভুজ দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, কেবল উদ্ভট বলেই তা হাস্যকর নয়। নারীপুরুষের ইহজীবনে এই ধরনের দ্বন্দ্ব জটিলতা নিয়েই সে কালের অনেক গল্প উপন্যাসের আধুনিক রূপ অঙ্কিত হচ্ছিল;—সমসাময়িক সেই বাস্তব জীবন-জটিলতার ওপরে এক 'জীবনের প্রচ্ছদ' টেনে দিয়ে শিল্পী তারই গায়ে উদ্ভট্ কল্পনার হাসির তুলি বুলিয়েছেন। অতি-স্বাভাবিকের উদ্ভব যে স্বাভাবিকতার গভীরে fantasy-র রঙ্ ফলিয়েই,—গল্পশেষে সে ইঙ্গিত রয়েছে শিল্পীর 'সনির্বন্ধ অনুরোধে',—"শ্রীযুক্ত শরৎ চাটুজ্যে, চারু বাঁড়ুজ্যে, নরেশ সেন এবং যতীন সিংহ

১৭। দ্র. ভূদেব চৌধুরী—'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' (২য় পর্যায়)

১৮। ড: শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (৪র্থ সং) দ্র. 'হাস্যরস প্রধান উপন্যাস'।

মহাশয়গণ যুক্তি করিয়া একটা বিলিব্যবস্থা করিয়া দিন—যাতে এই ভূতের সংসারটি ছারেখারে না যায় এবং কোনরকম নীতি বিগর্হিত বিদ্‌কুটে ব্যাপার না ঘটে।"

রবীন্দ্রনাথও এই সব গল্পের স্বাভাবিক সম্ভাবনা স্বীকার করে বলেছেন,—"তাঁর ভূশণ্ডীর মাঠের ভূত-প্রেতগুলোর ঠিকানা যেন আমার ভ্রমণ বিবরণের কোথাও লেখা আছে।"[১৯] সন্দেহ নেই, বিশেষ করে লোকোত্তর জগৎ ও পৌরাণিক উপাখ্যান-এর প্রতিরূপ (parody) নিয়ে লেখা গল্পসমষ্টিতে উদ্ভট কল্পনার রং একটু বেশি। তাহলেও 'হনুমানের স্বপ্ন', 'ভীমগীতা', 'তৃতীয় দ্যূত সভা,' 'ভরতের ঝুমঝুমি', 'বিরিঞ্চিবাবা', 'ধুস্তরী মায়া' ইত্যাদি গল্প যে হাস্য-রহস্যলোকের সৃষ্টি করেছে, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার সার্থক ফলশ্রুতি ঘোষণা করে লিখেছেন,—"এই দেবলোক ও মর্ত্যলোকের সংমিশ্রণ যে রাজশেখরবাবুর হাতে নানারকম বিচিত্র রসসৃষ্টির হেতু হইয়াছে ও আমাদের কল্পনার পরিধিকে নানাদিকে প্রসারিত করিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।"[২০]

কিন্তু পরশুরামের এমন আরো বহু গল্প রয়েছে, যেখানে শিল্পীর কল্পনা আমাদের চেনা জগতের চারপাশেই হাসির ঘেরাটোপ-পরা নিজের স্বতন্ত্র জগৎটি গড়ে তুলেছে। এসব গল্প কেবল হাস্যরসের আকর নয়, অনেক সময় জীবন-রসেও স্নিগ্ধ-মধুর। 'তিরি চৌধুরী' এ-ধরনের একটি আশ্চর্য সার্থক গল্প। তিরি চৌধুরী এ-কালের আধুনিকা,—বয়সের হিশাবে প্রণয়-স্বপ্নের জটিল জগতে তারই ঘোর-পাক খেয়ে ফেরার কথা। তার পরিবর্তে তার ঠাকুরমা-ঠাকুর্দার জীবনেই ঘনিয়ে এল নূতন দুর্যোগ। ঠাকুরদা তাঁর যৌবন বয়সে একটি তন্বীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন,—কিন্তু ঠাকুরদার বাবা ছিলেন একটি "অর্থগৃধ্র"; তাই সেই দরিদ্র-কন্যা প্রভাবতীর আর চৌধুরী-পরিবারে বধূ হয়ে আসা হল না। তার বদলে এলেন কনকলতা তাঁর অপরূপ রূপের সম্ভার আর পিতার অর্থের বিরাট পসরা নিয়ে। প্রভাবতী সারাজীবনে আর বিয়ে করেন নি;—অবশ্য তার কারণ প্রণয় ঘটিত ছিল কি না, কে জানে। বিলাত থেকে নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী হয়ে তিনি পশ্চিমের এক কলেজে অধ্যক্ষার পদ অলঙ্কৃত করেন; এবারে অবসর জীবন যাপনের জন্যে এসেছেন কলকাতায়। সেখানে এক বাড়ি কেনার ব্যাপারে ঘটনাচক্রে এসে পড়লেন সলিসিটর প্রিয়নাথ চৌধুরীর সান্নিধ্যে—একদা যাঁর সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

এতে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন 'ঠাকুরমা' কনকলতা। আর পিতামহ-পিতামহীর জীবনসায়াহ্নের সেই মুস্কিল আসানের ভার নিলে তিরি চৌধুরী। কনকলতাকেও

১৯। রবীন্দ্রনাথ 'গড্ডলিকা'—'প্রবাসী'—তদেব।
২০। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'—তদেব।

একদা ভাল বেসেছিলেন অল্ডারম্যান গৌরগোপাল মিত্র। তিরির জন্মদিনের আমন্ত্রণ সভায় স্বচ্ছ পরিবেশে তার ঠাকুরদা ও ঠাকুরমা এবং হতে-পারতেন ঠাকুরদা ও হতে-পারতেন ঠাকুমার উপস্থিতিতে গল্প-সমস্যার সমাপ্তি কেবল হাস্য-স্নিগ্ধ নয়, মিষ্টি-মধুর হয়ে উঠেছে। এই ধরনের আর একটি মিষ্টি গল্প 'বরনারী বরণ'। গল্পটির রচনাকাল ১৩৬০ বাংলা সাল। 'মিস্ ইণ্ডিয়া' 'মিস্ য়ুনিভার্স', নির্বাচনের ঢেউ আমাদের দেশেও পৌঁছে ক্রমশঃ রুচি-বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে সদ্য তখন। জীবনের সেই স্পর্শকাতর সমস্যাকে উপলক্ষ্য করে হাসির যে ছবি আঁকলেন পরশুরাম, সত্যই তা রম্য, রমণীয়। গল্প শেষে রাজলক্ষ্মী দেবী "মহিলাদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাধহরি লাহিড়ী মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ" দিয়েছিলেন; এ ধন্যবাদ রুচিস্মিত পাঠকের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাস্পদ শিল্পীরও অবশ্য-প্রাপ্য। রুচি, কল্পনা, জীবন-দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও সরসতা,—সবদিক থেকেই "তাঁর বরনারীবরণ অনবদ্য হয়েছে।"

আরো কিছু কিছু গল্প রয়েছে, যেখানে কালগত উৎকট আধুনিকতার প্রতি ইঙ্গিত আছে গল্পের দেহে;—কিন্তু সে ইঙ্গিত কটাক্ষের পর্যায়েও পৌঁছাতে পারেনি।—গল্প ও গল্পের জীবনের প্রতি সস্নেহ হয়েও এমনই objective ছিল শিল্পীর attitude. দৃষ্টান্ত হিশেবে 'কচি সংসদ'-এর সভ্য নামকরণের উল্লেখ করতে হয়। এককালে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে এই নামগুলি এক ধরনের দুর্বল তরুণ জীবনবৃত্তির প্রতি সহাস কটাক্ষের আকারে ব্যবহৃত হত। কিন্তু মূল গল্পে সে কটাক্ষের স্পর্শ নেই,—আর নেই বলেই হয়ত গল্পের রসস্ফূরণ মাত্রায় ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। কৃষ্ণচন্দ্রের বিবাহ-পরিণতির সঙ্গে 'কচি সংসদ'-এর প্রারম্ভিক পটভূমির কোনো অচ্ছেদ্য যোগ স্থাপিত হতে পারে নি; ফলে গল্পটির রস-কেন্দ্র দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছে। এ ধরনের দ্বৈধপূর্ণ গল্প পরশুরামের আরো আছে,—যেখানে বিন্দু-কেন্দ্রিত হয়ে উঠ্‌তে না পেরে গল্পের হাস্যরস কিছু লঘু কিছু শিথিল হয়ে পড়েছে। দৃষ্টান্ত হিশেবে 'লম্বকর্ণ' গল্পে লম্বকর্ণ, কাহিনী ও বংশলোচনের দাম্পত্য, কলহের দ্বিধা-বিভক্তির কথা বলা যেতে পারে। প্রত্যেক শিল্পীর সকল রচনাই উৎকর্ষের উচ্চতম গ্রামে উঠে যেতে পারে না;—বিশেষ করে সৃষ্টির ধারা যেখানে প্রায় নিরবধি। অতএব সে আলোচনা আমাদের প্রসঙ্গ-বহির্ভূত। কিন্তু পরশুরাম যেখানে চলমান জীবনের উৎকট আধুনিকতার প্রতি সহাস ইঙ্গিতপূর্ণ, সেখানেও কটাক্ষহীন স্নিগ্ধতায় গল্প মধুর হয়ে উঠ্‌তে পেরেছে 'কৃষ্ণকলি' গল্পে। প্রৌঢ় শিল্পীর নপ্তৃক-স্নেহ কালো কালিন্দী 'কেলিন্দী'কেই কেবল কৃষ্ণকলি করে আঁকেনি,—দশ বছরের রামচন্দ্রের আট বছরের পত্নী কেলিন্দীর স্বামি-নাম অনুচ্চারণের প্রতিজ্ঞা, এবং পরমুহূর্তেই 'রেমো' নামে তাকে সম্ভাষণ ও সেই সঙ্গে আধুনিকী নারীর পতি, নামোচ্চারণের প্রসঙ্গে যে

অনতি-উচ্চার হাসির ঝলক খেলেছে, রস-রচনাকে তা এক অপূর্ব রম্যতা দান করেছে। কটাক্ষ বা শ্লেষ-এর কোনো পরোক্ষ ঝাঁজও নেই এর কোথাও।

এও সম্ভব হয়েছে কারণ অধিকাংশ গল্পেই পরশুরামের শিল্পসৃষ্টির মূল উপাদান পরিবেশ রচনার দক্ষতায়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এ প্রসঙ্গে চরিত্রসৃষ্টির কথা বলেছেন,—কিন্তু 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড্'-এর মত একটি-দুটি গল্পে ছাড়া চরিত্রসৃষ্টির কারুকার্য পৃথক্ ভাবে বড় একটা চোখে পড়ে না। আসলে circumstance এবং সিচুয়েশন-এর বিন্যাস-কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছে, বরং চরিত্রগুলিকে বলা যেতে পারে পরিবেশ ও সিচুয়েশন-এরই ফলশ্রুতি। চরিত্র আছে, কারণ তা না হলে গল্প হয় না; আর হাস্যরসটুকু যেহেতু জীবন্ত, তাই চরিত্রগুলিও হয়েছে সজীব;—কিন্তু আসলে হাসির উৎস ঐ পরিবেশ ও সিচুয়েশন-এর বিন্যাসে। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'উপেক্ষিতা' গল্পটি প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ধার করব,—অত ছোট আকারের গল্প পরশুরামও খুব কম লিখেছেন;—শুধু তাই নয়, পরশুরামের লেখা একটি নিটোল ছোটগল্প-ও এটি—কেবল হাসির গল্প নয়,—

"তিন নম্বর রডোডেনড্রন রোড, বালিগঞ্জ। বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। ড্রইংরুমে পিয়ানোর কাছে উপবিষ্ট গরিমা গাঙ্গুলি, তাহার সম্মুখে ইজিচেয়ারে চটক রায়। ঘরে আসবাব বেশি নাই, কারণ গরিমার বাবার ঢাকায় বদলির হুকুম আসিয়াছে, অধিকাংশ জিনিস প্যাক হইয়া আগেই রওনা হইয়া গিয়াছে।

"এই চটক ছেলেটি যেমন ধনী তেমনি মিষ্টভাষী বিনয়ী বাধ্য, চিমটি কাটিলেও টুঁ শব্দ করে না—যাহাকে বলে নারীর মনুষ্য অর্থাৎ লেডিজ্‌ম্যান। না হইবে কেন, সে যে পাঁচ বৎসর বিলাতে সেরেফ এটিকেট অধ্যয়ন করিয়াছে। এমন সুপাত্র আজকালকার বাজারে দুর্লভ। গরিমার পিতামাতা কলিকাতা ত্যাগের পূর্বেই কন্যাকে বাগদত্তা দেখিতে চান, তাই তাঁহারা যাত্রার পূর্ব সন্ধ্যায় ভাবী দম্পতিকে বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ দিয়া দোতলায় বসিয়া সুসংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

"কিন্তু আলাপ তেমন জমে নাই। গোটা-পনর গান শেষ করিয়া গরিমা তৃতীয়বার জানাইল—'কাল আমরা যাচ্ছি।'

"চটক বলিল—'ও'।"

"হায়রে, বিদায় বার্তার এই কি উত্তর! গরিমার কথা যোগাইতেছে না। অগত্যা বলিল,—'সেই ভুটানী গজলটা গাইব কি?'

'না; এইবার ওঠা যাক্।'

'সে কি হয়, আগে বৃষ্টি থামুক।'

"চটক চেয়ারে বসিয়া উশখুশ করিতে লাগিল। মিনিট দুই পরে আবার বলিল,—এইবার উঠি।'

"গরিমা ভাবিতেছিল, কবি বৃথাই লিখিয়াছেন,—'এমন দিনে তারে বলা যায়।' এই বাদল সন্ধ্যা কি নিষ্ফল হইবে? চটকের কী হইল? কেন সে পলাইতে চায়? তাহার কিসের অস্বস্তি, কিসের অস্থিরতা? গরিমার মোহিনী শক্তি আজ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। সেই ভেট্‌কিমুখী বেহায়া মেনি মিত্তিরটা চটককে হাত করে নাই তো!···গরিমা তাহার কণ্ঠাগত ক্রন্দন গিলিয়া ফেলিয়া বলিল—'আর একটু বসুন।'

"কিন্তু চটক বসিল না। চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—'না, চললুম, গুড্‌ নাইট।

"বৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন ঝমঝমানি ভেদ করিয়া চটকের মোটর গুঞ্জরিয়া উঠিল। গেল, যাহা বলিবার তাহা না বলিয়াই চলিয়া গেল—ভেঁপো, ভোঁপ—দূরে, বহুদূরে।

"গরিমা কাঁদিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া চটকের পরিত্যক্ত চেয়ারে দেহলতা এলাইয়া দিল। তাহার পরেই এক লাফ। ভীষণ সত্য সহসা প্রকট হইল। বেচারা চটক!

"চেয়ারে অগন্‌তি ছারপোকা।"

—এ গল্পের theme-এ কৌতুক-হাস্যের নিঃসংশয় উপাদান ছিল; ইঙ্গবঙ্গ আধুনিক সমাজে বয়স্থা কন্যার জন্য যোগ্য পাত্র হাত করবার চেষ্টায় কন্যার সঙ্গে স-পরিবার পিতামাতারও কোর্টশিপ-এর হাস্যকর প্রয়াস; লুব্ধা কুমারীর গায়ে-পড়া আত্মীয়তা গড়ে তোলার নির্লজ্জ প্রগলভতা; একই পাত্রকে ঘিরে বহু কুমারীর অশ্রান্ত প্রণয়-প্রতিযোগিতা ও পারস্পরিক ঈর্ষা—সব কিছুতেই হাসির খোরাক প্রচুর। দক্ষ বর্ণনার গুণে গরিমা ত বটেই, সেই সঙ্গে কিছু পরিমাণে তার মা-বাবা ও তাদের সমাজের রূপ-চিত্রও জীবন্ত হয়ে উঠেছে;—ব্যক্তি ও সমাজ-চরিত্রের এক সজীব প্রতিফলন হয়েছে উপভোগ্য। কিন্তু এই চারিত্রগুণ গল্পের বর্ণনা ও সিচুয়েশন-এর পারস্পরিক সহযোগিতায় স্বতোবিকশিত হয়েছে; শুধু তাই নয়, গল্প-পরিণামের পক্ষে সে চারিত্রিক সজীবতার কোনো স্বতন্ত্র ভূমিকা নেই।

ছারপোকার অবস্থান নামক ঘটনাকে শিল্পী সারা গল্পের বিবর্তনের মধ্যে এমন চরম বিন্দুতে বিন্যস্ত করেছেন যে,—অন্তরের হাসির উৎস তাতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। ছারপোকার তাড়নায় উদ্গত যৌবনের মদির মিলন-লগ্ন বিপর্যস্ত হয়ে গেল,—এমন কল্পনাই চরম হাস্যরসের আকর। অথচ শিল্পী নিপুণ হাতে গল্পের যে পরিবেশ গড়েছেন, তার পক্ষে এ কল্পনাকে একেবারে উদ্ভট বলবার উপায় নেই। এ সাধারণ সমাজের কথা নয়,—এ-সমাজে লজ্জা নারীর ভূষণ নয় কখনো, কিন্তু এটিকেট্ পুরুষের প্রাণেরও বাড়া,—

বিশেষ করে তরুণী নায়িকার উপস্থিতিতে। আর চটক্ কি না পাঁচ বছর 'বিলেতে সেরেফ এটিকেট অধ্যয়ন' করে এসেছে; 'চিম্‌টি কাটলেও টুঁ-শব্দ' করে না,—কারণ তা এটিকেট-বিরুদ্ধ। কৃত্রিম সমাজ-ব্যবস্থার বেহায়াপনা এবং ভদ্রতাবোধ, দুইই যেখানে মাত্রাতিরিক্ত—সেখানে কল্পনার মাত্রাকে আর একটু সীমা পার করে এনে গল্পের এই চমৎকার হাসির উপাদান রচনা করেছেন পরশুরাম। আর গল্প-সমাপ্তির এই অপ্রত্যাশিত নাটকীয়তা কেবল অট্টহাসিকেই অবারিত করে না,—ছোটগল্পের সফল সংকেতকেও করে দোলায়িত।

এখানেই শিল্পীর কলাশৈলীর স্বকীয়তা,—এখানেই তাঁর অতুল্য, সার্থকতার সংকেত।

পরশুরামের হাসির গল্পের রসস্ফূর্তি প্রসঙ্গে যতীন্দ্রকুমার সেনের 'বিচিত্রণ'-বিশিষ্টতার উল্লেখ অপরিহার্য। এসব গল্পের হাসির উৎস কেবল লেখায় নয়:—লেখায় এবং রেখায়, বরং বর্ণনার সত্যকে ছবিতে প্রত্যক্ষ করতে পারাতেই হাসির উৎস হতে পেরেছে এমন অফুরন্ত। এ-যেন পড়ে-বুঝে হাসা নয়,—চোখে দেখে হাসা। 'গড্ডলিকা'-র এই বিচিত্রণ-বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "লেখার দিক হইতে বইখানি আমার কাছে বিস্ময়কর, ইহাতে আরো বিস্ময়ের বিষয় আছে, সে যতীন্দ্রকুমার সেনের চিত্র, লেখনীর সঙ্গে তুলিকার কী চমৎকার জোড় মিলিয়াছে, লেখার ধারা রেখার ধারা সমানতালে চলে, কেহ কাহারো চেয়ে খাটো নহে। তাই চরিত্রগুলো ভাবায় ও চেহারায় ভাবে ও ভঙ্গিতে ডাহিনে বামে এমন করিয়া ধরা পড়িয়াছে যে, তাহাদের আর পলাইবার ফাঁক নাই।"[২১]

যতীন্দ্রকুমারের ব্যঙ্গচিত্র থেকেই নাকি পরশুরাম তাঁর হাসির গল্প লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন,—প্রথম থেকেই এই 'অত্যাগ-সহন' বন্ধু তাঁর বাণীকে রূপ দিয়ে এসেছেন। তাতে গল্পের স্বাদুতা কত বর্ধিত হয়েছে, 'চিকিৎসা সংকট', 'লম্বকর্ণ', 'ভূশণ্ডীর মাঠে' ইত্যাদি গল্পের চিত্র-কর্মই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কিন্তু গল্পকে সুনিশ্চিত চিত্ররূপায়িত করতে পারার প্রতিশ্রুতি শিল্পীর লেখার মধ্যেও এক বিশেষ চিত্র-নির্ভর প্রকরণের সৃষ্টি করেছিল। অনেক জায়গায় পরশুরামের কলম কেবল ছবির details রচনা করে গেছে বলে মনে হয়,—ছবি যেখানে নেই,—সেখানেও গল্পরসের সফল আস্বাদনের জন্য 'লেখার খুঁটিনাটি দিয়ে মনের গহনে ছবি এঁকে নিতে পারলেই রসস্ফূর্তি যেন সম্ভব হয়। পরশুরামের অন্তিম পর্যায়ের গল্পসংকলনগুলো বিচিত্রিত নয়। দৃষ্টান্ত হিশেবে 'কৃষ্ণকলি' সংকলনের 'বরনারীবরণ' গল্পের কথা বলা যেতে পারে; বরণসভার চিত্র, থাকমণি দেবী এবং রাখহরি লাহিড়ীর বরণদৃশ্যের ছবিগুলি আঁকা থাকলে রসগ্রহণ যেন আরও

২১। রবীন্দ্রনাথ 'গড্ডলিকা'—'প্রবাসী' অগ্রহ।

সংহত হতে পারত ; অন্ততঃ মনের গভীরে সে-সব ছবি যত পূর্ণরেখ হয়, গল্পরসের স্বাদুতা হয়ে ওঠে ততই ঘন নিবিড়।

তাছাড়া গল্পরসের স্ফুরণে শিল্পী যে সচেতন ভাবেও ছবির ওপরে নির্ভর করতেন, তার সুনিশ্চিত প্রমাণ রয়েছে 'প্রেমচক্র' গল্পে। বিশ্বচক্রের মত এই গল্প-চক্রের বর্ণনা এত জটিল যে, শিল্পী নিজেই বিভিন্ন নম্বরের ছবি দেখে তা স্পষ্ট করে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। যতীন্দ্রনাথ সেনের বিচিত্রণ পরশুরামের গল্পের স্বাদকেই কেবল নিবিড় করেনি,—তাঁর রচনাশৈলীকেও জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে প্রভাবিত করেছে। বস্তুত এক বিশেষ প্রকরণের হাসির গল্প রচনায় পরশুরাম আজও প্রায় অনন্য, সে-কথা অবিস্মরণীয়।

রাজশেখরের গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে—'গড্ডলিকা', 'ধুস্তুরীমায়া' ইত্যাদি গল্প, 'গল্পকল্প,' 'কজ্জলী', 'আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প', 'চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প', 'হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প', 'নীলতারা ইত্যাদি গল্প', 'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প'।

একাদশ অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্প ঃ আদিপর্ব (৫)

প্রমথ চৌধুরী ও অনুব্রতী দল

(ক) গল্প-শিল্পী প্রমথ চৌধুরী

কালের বিচারে গল্পকার প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) পূর্বালোচিত অনেক শিল্পীর অগ্রগামী ছিলেন। পূর্ব অধ্যায়ে হাস্যরসিক যে-সব গল্প-লেখকের কথা বলেছি, তাঁদের মধ্যে কেবল সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের রচনা কিছু পরিমাণে চৌধুরী মশায়ের লেখার সমসাময়িক ছিল ;—পরশুরাম ও কেদারনাথ গল্প রচনার ক্ষেত্রে নিঃসংশয়ে তাঁর উত্তরসাধক। অপর আর একদিক থেকে বাংলা ছোটগল্পের জন্ম-ইতিহাসে তাঁর পথিকৃৎ-এর ভূমিকা রবীন্দ্রনাথের সতীর্থতা দাবি করতে পারে। আগে বলেছি, ১২৯৮ সালের 'সাহিত্য'-পত্রে প্রস্পের মেরিমি-র Etruscan Vase-এর প্রমথ চৌধুরী কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'ফুলদানী' নামে। বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ-গল্প রচনার ধারা সেদিন থেকে অবাধ মুক্তি পেল। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-ধন্য মৌলিক গল্পের যোগান যথাসময়ে না পেলে, বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস অনুবাদ কর্মের পথে একান্ত বিস্তৃত হতে পারত। শুধু তাই নয়, মৌলিক গল্প-প্রবাহের সমান্তরাল ধারায় অনুবাদ-গল্পের স্রোতও সেদিন খুব মন্দগতি ছিল না। এখানে রবীন্দ্রনাথের গল্পের সমসূত্রে প্রবহমান আর এক গল্প-স্রোতের আদিসূরিত্ব দাবি করতে পারেন চৌধুরী মশায়। কিন্তু ছোটগল্পকার প্রমথ চৌধুরীর কীর্তি-পঞ্জীতে এ-ঘটনা শ্রেষ্ঠতার কোনো মূল্য দাবি করতে পারে না। তিনি নিজে এ সম্বন্ধে বলেছেন, —"আমি প্রথমে কলম ধরেই ফুলদানী নামে একটি গল্প ফরাসী থেকে অনুবাদ করি। সে গল্প যে পুনর্মুদ্রিত করিনি, তার কারণ, গল্পটি একটি প্রসিদ্ধ গল্প হলেও, আমার কাঁচা হাতের স্পর্শে তার যথার্থ রূপ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। গল্পটির লেখক Maupassant নন—Merimee নামক তাঁর পূর্ববর্তী জনৈক খ্যাতনামা সাহিত্যিক।

"এরপর বাঙালি লেখকরা Maupassant-এর বহু গল্প বাংলায় অনুবাদ করেন। আমি যদি এক্ষেত্রে কোনো পথ দেখিয়ে থাকি, তবে তা অনুবাদের পথ। কিন্তু এই অনূদিত বিলেতি গল্পগুলি বঙ্গ সাহিত্যের অঙ্গ বলে গ্রাহ্য হয়নি।"[১]

১। দ্র. সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'কথাগুচ্ছ'র ভূমিকা।

তাহলেও কোনো প্রকার অসাফল্যের দরুন প্রমথ চৌধুরী অনুবাদ-গল্প রচনায় বিরত হয়েছিলেন, এমন কথা ভাবলে ভুল হবে। 'ফুলদানী'র পরে তিনি মেরিমির 'কার্মেন' উপন্যাস অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন, এর মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথের বিরূপ মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া। 'ফুলদানী' প্রকাশিত হবার পরে 'সাধনা' পত্রিকায় কবি এর সমালোচনা করেছিলেন; প্রমথ চৌধুরীর কাঁচা হাতের অসাফল্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন তিনিই প্রথম। সেই সঙ্গে বলেছিলেন নীতির দিক্ থেকেও "ফুলদানির মত গল্প বঙ্গসাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত করা অনুচিত।" প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, "তারপরেই আমি মেরিমের কার্মেন তর্জমা করি। কিন্তু সেটি শেষ করতে পারিনি বলে প্রকাশ করিনি। কার্মেন অনুবাদ করবার কারণ, তার বিষয়বস্তু ফুলদানীর চাইতে ঢের বেশি অসামাজিক। সাহিত্যিক শুচিবাই প্রথম থেকে আমার ধাতে ছিল না। এবং প্যুরিটানিজম্‌কে আমি কোনো কালেই একটা গুণের মধ্যে গণ্য করিনি।"[২]

এখানেই প্রমথ চৌধুরীর শিল্পি-ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। বিবাহ-সম্পর্কে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে যুক্ত হবার আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধাভক্তির কথা নিজে তিনি বিবৃত করেছেন কুণ্ঠাহীন স্পষ্টতায়। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও নিজের মতের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে চৌধুরী মশায় ছিলেন অতন্দ্র সচেতন। যে-কোনো কারণেই সেই স্বাতন্ত্র্যের পথকে বর্জন করা বা সে পথের বাধা নীরবে এড়িয়ে যাওয়া তাঁর ব্যক্তিত্বের পক্ষে অসম্ভব ছিল। ব্যক্তি-স্বভাবের এই অবিচলিত স্বতন্ত্রতাবোধ নিয়ে পরের লেখার সার্থক অনুবাদ করা সম্ভব ছিল না। বস্তুতঃ অনুবাদ-গল্প-রচনার অবসান সাধনে যেমন, মৌলিক গল্প-রূপের উদ্বোধনেও চৌধুরী মহাশয়ের এই সদাচকিত চারিত্র-স্বাতন্ত্র্যই প্রধান উপাদান হয়ে আছে।

নিজের অন্তর্লীন এই স্বভাবের পরিচয় দিয়ে তিনি লিখেছিলেন, "আমার মনের স্বাভাবিক গতিই হচ্ছে প্রচলিত মতগুলোকে আমল না দেওয়া। অর্থাৎ সচরাচর enlightened নামধারী লোকদের সঙ্গে মতে যাতে না মেলে তার জন্যে আমার একটু চেষ্টা আছে।"[৩] আপন সহজ প্রকৃতিতে প্রমথ চৌধুরী ছিলেন একটি distinct individual,—বাংলা সাহিত্যে সব চেয়ে অ-মিশ্র সম্পূর্ণ individual. নিরাবেগ বিশুদ্ধ intellect-এর কঠিন নির্মোকের অন্তরালে সেই individuality-র সদাজাগ্রত অধিষ্ঠান। ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে সেই বৌদ্ধিক ব্যক্তিত্ব (intellectual individuality) theme এবং form উভয়ের সৃষ্টিতেই ক্লান্তিহীন তৎপরতায় আত্মপ্রকাশ করেছে।

২। প্রমথ চৌধুরী 'আত্মকথা'।

৩। ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীকে লেখা পত্র—দ্রঃ 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'—৫ম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।

তাহলেও দেখব,—বিষয়বস্তুর চেয়ে গল্প-শরীরের সংগঠনেই শিল্পীর আবেগ-বন্ধনহীন বুদ্ধির হাতিয়ার নিখুঁত-নূতন মূর্তি রচনা করেছে।

এখানেই গল্প-শিল্পী প্রমথ চৌধুরীর যথার্থ ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা। আধুনিক কালের বাংলা গল্পে বিশুদ্ধ স্বতন্ত্র রূপ-চিন্তনের পথ-প্রবর্তক তিনি। এই প্রকরণগত বিশিষ্টতার দরুন তাঁর সৃষ্টির আলোচনা পরাগত হতে বাধ্য। সৃষ্টির ক্ষেত্রে রূপ-সচেতনতা আধুনিকতার লক্ষণ। অর্থাৎ, প্রাচীন মহাকাব্যের কাল থেকে মানুষের জীবনবোধ ক্রমেই যত পরিচ্ছন্ন, স্পষ্ট-সংজ্ঞক হয়েছে, তার রচিত সাহিত্যের শরীরও হয়েছে তত সংহত, সুরেখা-বলয়িত। সুকল্পিত রূপের রেখায় প্রাণের চিরন্তন প্রাচুর্যকে নিত্য-নূতন বিন্যাসে অপরূপ করে দেখার আকাঙ্ক্ষা আধুনিক কারুশৈলীর বিচিত্র-স্বাদুতার এক শ্রেষ্ঠ উপাদান। প্রমথ চৌধুরীর বৌদ্ধিক প্রতিভা বাংলা ছোটগল্পের শরীর-সীমায় চেনা জীবনকে নূতন রূপের অবয়বে নূতন করে আস্বাদ করবার আধুনিক বৈচিত্র্য দান করেছে, —এই অর্থে তিনি আধুনিক-গল্প কলার পথিকৃৎ। তাই, সরস্বতীর মন্দিরে পরে এসেও যাঁরা পুরাতন পুষ্পে অঞ্জলি রচনা করে গেলেন,—চৌধুরী মহাশয়ের নূতন আহৃত পুষ্পাঞ্জলির মধুরিমা তাঁদের পরে উপভোগ্য। সাহিত্যের স্বরূপ আবিষ্কার সমাজের বহু লোকের মনোমিলনের মাধ্যমে সম্ভব হয় না,—"বহু লোকের ভিতর চৌদ্দ আনা মনের মিল থাকলে 'সাহিত্য সম্মিলন' হতে পারে কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।" এ কথা বলেছেন,—স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী। তাঁর বিশ্বাস,—"সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ। সুতরাং সাহিত্যের পক্ষে মনের ঐ পড়ে-পাওয়া চৌদ্দ আনার চাইতে ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব দু'আনার মূল্য ঢের বেশি। কেন না, ঐ দু'আনা হতেই তার সৃষ্টি ও স্থিতি; বাকী চৌদ্দ আনায় তার লয়। যার সমাজের সঙ্গে ষোল আনা মিল আছে তার কিছু বক্তব্য নেই। মন পদার্থটি মিলনের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, আর বিরোধের স্পর্শে জেগে উঠে। এবং মনের এই জাগ্রত ভাব থেকেই সকল কাব্য, সকল দর্শন, সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি।"[৪]

এ সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য নিয়ে তর্ক করবার অবকাশ নেই,—কারণ এ-টুকু প্রমথ চৌধুরীর শিল্পি-চেতনার মূল-নিহিত প্রত্যয়,—এই প্রত্যয়ের আলোকেই তাঁর সৃজন-স্বভাবের পরিচয় আবিষ্কার করতে হবে। এই প্রত্যয়ের বশেই প্রমথ চৌধুরী আজীবন সাহিত্য-সাধনায় চির অতন্দ্র-চেতনা। তীক্ষ্ণ ধারালো চিন্তার কুঠার হাতে সকল গতানুগতিকতার বিরোধিতা করে,—সকল convention-এর মূল উৎপাটন করে করে

৪। প্রমথ চৌধুরী—'প্রাণের কথা' (প্রবন্ধ)—দ্র:—'সবুজপত্র' প্রথমবর্ষ প্রথম সংখ্যা।

এগিয়ে চলেছেন তিনি চিরদিন। সার্থক সৃষ্টির উৎস হিশেবে মনের যে 'জাগ্রত ভাব'-এর কথা উল্লেখ করেছেন চৌধুরী মশায় আসলে তা অমিশ্র মননশীলতার শক্তি,—হৃদয়-ধর্মের তরল মাদকতা নেই তার কোথাও। অন্ততঃ তাঁর চোখে হৃদয়ধর্ম যে মনের সদাজাগৃতির পক্ষে আবেশময় তরল পানীয় ছাড়া আর কিছু ছিল না, তাতে সন্দেহ নেই। হৃদয়-ধর্মের প্রতিষ্ঠা সুহৃদয়তার ঘন গহনে,—মনের সঙ্গে মনের নিবিড় 'সাহিত্যে'। কিন্তু সাহিত্য,—অনেকের সঙ্গে অনেকের মনের মিল স্রষ্টার 'মনকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে'—এই ছিল প্রমথ চৌধুরীর বিশ্বাস তাই মনোধর্মের তথা মনোমিলনের বিরুদ্ধে তাঁর চিরকালের জেহাদ, এ সম্পর্কে তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি সদা-সচেতন।

এই অর্থে সমাজের সঙ্গে,—বহুর সঙ্গে বিচ্ছেদের একক ভূমিতে নিজের সৃষ্টির আসন পেতেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। তাই বলে তাঁর রচনা সমাজ-বিমুখ বা সমাজ-বহির্ভূত ছিল না। আমাদের চেনা জগতের চির-চেনা জীবনের পটভূমিতে তিনি তাঁর সৃষ্টির ভিত রচনা করেছেন,—অন্ততঃ তাঁর ছোটগল্প-সাহিত্যের। 'আত্মকথা'র বিভিন্ন অংশে নিজ জীবনের পরিচয়-পরিধির যে ইঙ্গিত তিনি দান করেছেন, তা বিস্ময়করব্রূপে বিচিত্র এবং বহু ব্যাপক। ডঃ অতুলচন্দ্র গুপ্ত এই সত্যের সুরেখ পরিচয় ব্যক্ত করেছেন,—"প্রথম বয়স থেকেই প্রমথবাবু মিশেছেন সকল শ্রেণীর নানা লোকের সঙ্গে। আমরা অনেক সময় রহস্য করে বলেছি যে, ছয় কোটি বাঙালির মধ্যে প্রমথ চৌধুরী চারকোটী লোককে চেনেন। এবং যার সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয় তার শরীর ও মনের চেহারা ও ভাব-ভঙ্গী তাঁর মনে এঁকে যায়। আর মনে করলেই তার শব্দচিত্র অসাধারণ কৌশলে লেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন। এর পরিচয় তাঁর ছোটগল্পে ছড়ানো রয়েছে।"[৫]

অতএব গল্প রচনার ক্ষেত্রে আর পাঁচজন শিল্পীর মতই প্রমথ চৌধুরীরও মূল পুঁজি চোখে-দেখা জীবনের অভিজ্ঞতা। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা যে-বিশেষিত উদ্দেশ্যে তিনি প্রয়োগ করেছেন এক অ-পূর্ব পদ্ধতিতে, সেখানে তিনি পাঁচজনের মধ্যে থেকেও আর একজন,—একতমজন। জীবন-চিন্তার অতন্দ্র individuality ও প্রয়োগ-বিধির intellectual অনন্যতাই প্রমথ চৌধুরীর গল্প-শিল্পকে তুলনারহিত স্বতন্ত্রতার মহিমায় নিঃসঙ্গ করে রেখেছে। আসলে, তাঁর সকল সৃষ্টিই নিজ 'ব্যক্তিত্বের বিকাশ'।

এই ব্যক্তিত্বের মধ্যে নানা রকমের আপাত-বিরোধ, নানা রকমের paradox রয়েছে। কিন্তু সকল বৈচিত্র্য, সকল রহস্য-কৌতুক-বৌদ্ধিকতা নিয়েও প্রমথ চৌধুরী আসলে ছিলেন আমাদেরই মত রক্তমাংসের মানুষ,—আর হয়ত নিঃসংশয়েই ছিলেন আমাদের মতই বাঙালি। বাংলাদেশের বাইরে,—সুদূর য়ুরোপ খণ্ডের জীবনের সঙ্গেও তাঁর

৫। ড. অতুলচন্দ্র গুপ্ত—দ্র. প্রমথ চৌধুরীর 'আত্মকথা'-র ভূমিকা।

ঘনিষ্ঠতা কম ছিল না ; প্রমথ চৌধুরীর প্রথম লেখা মৌলিক গল্প 'প্রবাসস্মৃতি'র পটভূমি ইংলণ্ডে। যে 'চারইয়ারি কথা' নিয়ে বাংলার গল্পসাহিত্যে তিনি পাঁচজনের একতমজন রূপে অসংশয় প্রতিষ্ঠা পেলেন,—তারও সব কয়টি নায়িকা শ্বেতদ্বীপ-বাসিনী। আর একথা বলতে দ্বিধা নেই, সেই বিদেশিনী নায়িকাদের 'শব্দ-চিত্র,'—তাদের 'শরীর ও মনের চেহারা' তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে এঁকে তুলতে পেরেছেন,—যেমন পেরেছেন দেশীয় নায়িকার জীবন-রূপায়ণে। তবু বিশেষ করে বলতে ইচ্ছে করে, 'ছয় কোটি বাঙালির মধ্যে চার কোটি বাঙালিকেই' চৌধুরী মশায় একান্তভাবে আত্মস্থ করেছিলেন। ব্যক্তিত্বের মৌল স্বভাবে অমিশ্র কৃষ্ণনাগরিক যদি তিনি নাও হন, তবু নিঃসংশয়ে ছিলেন বিশুদ্ধ বাঙালি। সেই বাঙালি প্রাণের রস-চেতনায় পরিস্রুত হয়ে য়ুরোপের নায়িকা-কথার সকৌতুক বিবরণ সফল পরিণাম পেয়েছে 'চারইয়ারি কথা'-র 'আমার কথা'য়। চারটি গল্পের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঐ গল্পটিকেই বলেছেন সবচেয়ে 'human'।[৬] তার কারণ, গল্পের বিদেহিনী নায়িকা প্রমথ চৌধুরীর বাঙালি চেতনার অন্তর-রসে স্নিগ্ধ হয়ে একটি বাঙালিনী হতে হতেও ফস্কে গেছে,—কিন্তু নিঃসংশয়ে হয়েছে 'Eternal Feminine'. 'বীণাবাই'-এর বীণা পশ্চিমভারতের বর্ণাঢ্য বিচিত্রতার জগতে ঘুরে-ফিরে তার সবশেষের অশেষ সুরটি খুঁজে পেয়েছে বাংলাদেশে, বাঙালি সুর-সাধকের সম-আত্মিকতায়। 'একটি সাদা গল্প', 'ছোটগল্প', 'সম্পাদক ও বন্ধু', 'ট্রাজেডির সূত্রপাত' ইত্যাদি আরো বহু গল্পে প্রমথ চৌধুরীর এই বাঙালি-প্রাণতার বৈভব স্বতঃস্ফূর্ত হতে পেরেছে।

একাকিত্বের চির-অতন্দ্র পতাকাধারী প্রমথ চৌধুরীকে দশজন বাঙালির একজন করে প্রতিপন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়,—দশজনের মধ্যে নিঃসন্দেহে তিনি একাদশতম। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের আগাগোড়া সুরেখতা সত্ত্বেও তাঁর গল্প-রচনার শ্রেষ্ঠ উপাদান মানবজীবন-অভিজ্ঞতার মূল থেকে উৎসারিত,—একান্তভাবে মানবিক ;—রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'human'। এই মানসিক অবধানের,—তথা এই human understanding-এর মূলগত প্রবণতায় প্রমথ চৌধুরী বাংলার মানব-সমাজের অন্তর্গত ; আর সেখানে আর পাঁচজন বাঙালিরই মত তাঁর সুখ-দুঃখের জ্ঞান, প্রেম-ভালবাসা যদি নাও বলি, তবু 'Eternal Feminine'-এর জন্য রূপময় উৎকণ্ঠা,—কোনো কিছুই কম নয়। বরং অমিশ্র-সূক্ষ্ম কুশাগ্র বৌদ্ধিকতার প্রভাবে সকল অভিজ্ঞতা সম্বন্ধেই তাঁর চেতনার প্রতিক্রিয়া মৃদুতম আঘাতেও অতি-প্রখর।

কালে কালে এমন একটা ধারণা দাঁড়িয়ে গেছে যে, মানুষের প্রণয়বৃত্তি, তথা 'ভালবাসা'র প্রতি প্রমথ চৌধুরীর মনোভাব স্মিত ব্যঙ্গ-মিশ্রিত কৌতুক-সহাস্যতার

৬। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ 'চিঠিপত্র' (৫ম খণ্ড)।

পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। এ-কথা অংশতঃ সত্য হলেও পূর্ণ সত্য নয়। আর আংশিক সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যের রেখাও আসলে অদূরবর্তী। স্ত্রীর কাছে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন,—"আমি কৈশোর উত্তীর্ণ না হতে হতেই টের পেয়েছিলুম যে জীবনে কোন্ কোন্ জিনিস আমাকে অধিকার করে নেবে—beauty, mind—এবং এটাও বুঝতে বাকি ছিল না যে আমার মনোজগতের কেন্দ্র হবে The Eternal Feminine।"[৭] সৌন্দর্য, মন ও মনোজগতের অধিষ্ঠাত্রী চিরন্তনী নারী,—এই তিনে মিলে প্রমথ চৌধুরীর শিল্প-চেতনায় মৌলিক গঠন;—এই তিনেতে মিলেই তাঁর ব্যক্তিত্বের কাঠামো। এমন অবস্থায় প্রণয়বৃত্তি বা ভালবাসার বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ থাকা সম্ভব নয়;—আসলে প্রেমের জগতেও তাঁর নালিশ গতানুগতিকতা, তথা কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে :—

"প্রিয় কবি হতে চাও, লেখো ভালবাসা,
যা পড়ে গলিয়া যাবে পাঠকের মন।
তার লাগি চাই কিন্তু দুটি আয়োজন,—
জোর করা ভাব, আর ধার করা ভাষা।"[৮]

অতএব প্রমথ চৌধুরীর কটাক্ষ আসলে ভালবাসার বিরুদ্ধে নয়,—তার কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে;—জোর-করা ভাব, আর ধার-করা ভাষার conventionকে অন্ধ অনুসরণ করে যা কেবল পাঠকের মনকে মায়ামোহে বিগলিত করে দেয়। সাহিত্যে ও জীবনে চিরাচরণের গোষ্পদে ব্যক্তিত্বের প্রাণস্রোত যেখানে রুদ্ধ হয়ে গেছে,—সেখানেই রসধর প্রমথ চৌধুরী ব্যঙ্গ-মুখর হয়ে উঠেছেন।

কেমন করে এ-দুর্ঘটনা ঘটে সে-কথা শিল্পী নিজেই লিখেছেন,—"মন্ত্র সাপকে মুগ্ধ করতে পারে কিনা জানিনে, কিন্তু মানুষকে যে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গোটা ভারতবর্ষ। সংস্কৃত শব্দ যে সংস্কারকে বাধা দিতে পারে তার প্রমাণ বাংলা সাহিত্য। মানুষ মাত্রেরই মন কতক সুপ্ত আর কতক জাগ্রত। আমাদের মনের যে অংশটুকু জেগে আছে সেই অংশটুকুকেই আমরা সমগ্র মন বলে ভুল করি,—নিদ্রিত অস্তিত্বটুকুর অস্তিত্ব আমরা মানি নে, কেন না জানি নে। সাহিত্য মানবজীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয় নিদ্রার অধিকার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা।"[৯]

অর্থাৎ বহুদিন ধরে বহুর কণ্ঠে যে-কথা যে-ভঙ্গীতে উচ্চারিত হয়ে আসছে, নিজের অনন্যতার বলে কোনো এক সুপ্রাচীন কালে যে-কথা মানব-মনের উদ্বোধন ঘটিয়েছিল,

---

৭। ইন্দিরা দেবীকে লেখা পত্র—দ্র 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'—তদেব।
৮। 'উপদেশ' কবিতা—'সনেট পঞ্চাশৎ'। ৯। প্রমথ চৌধুরী—'মুখপত্র' সবুজপত্র ১মবর্ষ, ১ম সংখ্যা।

কালে কালে আবার সেই কথা, সেই ললিত ভঙ্গীই মানুষের মনকে ঘুম পাড়াতে থাকে। কারণ একদিন যে-কথায় মনের জগৎ হঠাৎ আলোকিত হয়েছিল, সেদিকেই মানুষের মত ঝোঁক গিয়ে পড়ে। কিন্তু দিনে দিনে জীবনের মূলে আরো নূতন কথার দাবি যে জমতে থাকে,—মনের অনালোকিত আরো সব কুঠরিতে নতুন আলো জ্বালার আকাঙ্ক্ষা পুঞ্জিত হয়ে চলে, সেদিকে খেয়াল থাকে না। তাই চিরপুরাতনের গড্ডলিকা প্রবাহে মানুষ ভেসে যায়, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ আর ঘটে না,—পাঁচজনের একজন হয়ে পড়ে সে আর 'নিজের মত হতে' পারে না।

আমাদের প্রেমানুভবের মূলেও সেই গড্ডলিকা প্রবাহ চলে আসছে কতদিন ধরে, তার হিশাব নেই; আর জাগর ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য-স্পর্শহীন সে প্রেম কেবলি বিগলিত হয়ে, রোমান্টিক হয়ে পড়ে। প্রায় আগাগোড়া ছোটগল্প-সাহিত্যে কচিৎ এক-আধটি ছাড়া প্রমথ চৌধুরী এই প্রেমবৃত্তি,—তথা, পুরুষের 'feminine' বাসনার রূপ-চিত্র রচনা করেছেন। এমন কি, 'নীল লোহিত' বা 'ঝোট্টন ও লোট্টন' গল্পও আসলে feminine প্রসঙ্গীয়;—যদিও একটু অদ্ভুত ধরনের। আর সে-সব গল্পে সহাসতা যেটুকু রয়েছে, প্রায়ই তা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের স্বভাববিশিষ্ট নয়,—গতানুগত্যের বিরোধিতাপূর্ণ বিস্ময়-কৌতুকে স্নিগ্ধ paradox. মানুষের প্রেমের কথা বলতে গিয়ে সে প্রেমকে ভেঙ্‌চি কাটেননি প্রমথ চৌধুরী; তার দুর্বল, পরানুবৃত্ত অন্ধতাকে নিয়ে যেটুকু হেসেছেন, তার মূলেও রয়েছে সহানুভূতির কারুণ্য :—

> "নয়ন যখন দিই হাসিতে মুড়িয়ে,
> লুকিয়ে তাহার নীচে থাকে অশ্রুজল।"[১০]

—প্রমথ চৌধুরীর paradoxical গল্পগুলি সম্বন্ধে এ-কথা বিশেষভাবে সত্য।

দৃষ্টান্ত হিশেবে 'ছোটগল্প' গল্পের কথাই বলি। প্রোফেসারের কথায় প্রেমানুভবের একটি করুণ-মহিম রূপ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল;—এমন কি লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত অদ্ভুত প্রয়োগ-ভঙ্গী সত্ত্বেও প্রেমের হীরক-কঠিন উজ্জ্বল স্বভাবটি অক্ষুণ্ণ থেকেছে। আর চরম ত্যাগের করুণা-মিশ্র একবিন্দু অশ্রুকে ক্ষুরধার বুদ্ধি ও বিদগ্ধ স্মিতহাস্যের চাপে (pressure) ঘনীভূত করে তবেই এই হীরার ধার সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। প্রোফেসার যখন গল্পের শেষ কথাটি "হেসে বললেন", তখন গল্পের তলায় একবিন্দু অশ্রু যে লুকিয়ে জমে গিয়েছিল, তাতে সংশয় নেই। শরৎচন্দ্রও খুব জোর দিয়ে এই কথাই বলেছেন,—'ridicule' করা নয়, জীবনের প্রতি সানুরাগ প্রীতিকে বিস্ময়কর নির্লিপ্ততা ও কটাক্ষদীপ্ত কৌতুকের আবরণে উপস্থিত করাই ছিল প্রমথ চৌধুরীর গল্পশিল্পের মূল সংকেত :—অনেক সমঝদার

১০। 'হাসির কবিতা'—'সনেট্ পঞ্চাশৎ'।

হয়ত বলেন, "বিদ্রূপ ব্যঙ্গের খোঁচায় মানুষের বিশেষ কোনো একটা বাঁদরামি প্রবৃত্তিকে পাঠকের কাছে রিডিক্লাস করে তুলতে আপনি ভারি পারেন। কিন্তু আমি দেখি মানুষকে মানুষ করে দেখাবার ক্ষমতা এর চেয়েও আপনার ঢের বেশি। এক-একটা চাপা লোক যেমন তার বড় দুঃখটাকেও বলবার সময় এমন একটা তাচ্ছিল্যের সুর দেয় যে, হঠাৎ মনে হয় যেন সে আর কারো দুঃখটা গল্প করে বলে যাচ্ছে, এর সঙ্গে তার নিজের যেন কোন সম্পর্ক নেই। আপনিও বলেন ঠিক্ তেম্‌নি করে।"[১১]

এখানে কেবল প্রমথ চৌধুরীর মনোভঙ্গীই নয়, তাঁর ছোটগল্পের প্রকরণ সম্বন্ধেও সার্থক ইঙ্গিত রয়েছে। সিরিয়াস্ জীবনানুভবের ক্ষেত্রে প্রকাশের এই তাচ্ছিল্যের সুরটুকুই প্রমথ-গল্পের সাধারণ টেক্‌নিক্। অনুভূতি বা হৃদয়ধর্মকে বুদ্ধিদীপ্ত চাপাহাসি ও সকৌতুক কথার কারসাজির তলায় ঢেকে দেওয়াই ছিল তাঁর রচনাপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। 'নিজের দুঃখটাকেও' তিনি যথার্থভাবে স্বীকার কেন করেননি, তার কারণ নিহিত রয়েছে শিল্পীর সহজাত চেতনার মূলে। আগেই বলেছি গতানুগতিকতা,—তথা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দীপ্তিরোধকারী আবেশ ছিল তাঁর পক্ষে অসহনীয়। 'বীরবল', 'সবুজপত্র' সম্পাদককে একদা লিখেছিলেন,—"সকল দেশেই মনেরও একটা চল্‌তি পথ আছে। অভ্যাসবশতঃ এবং সংস্কারবশতঃ দলে দলে লোক সেই পথ ধরেই চলতে ভালবাসে, কারণ মুখ্যতঃ সে পথ হচ্ছে জনসাধারণের জীবনযাত্রার পথ।···আপনাদের মত এই যে, সামাজিক জীবনের পদানুসরণ কবি কিম্বা দার্শনিকের মনের কাজ নয়। জীবনকে পথ দেখানোই হচ্ছে সে মনের ধর্ম, অতএব কর্তব্য।"[১২]

বলা বাহুল্য, এটুকু প্রমথ চৌধুরীর স্বগতভাষণ,—বীরবলের বেনামিতে আত্ম-আবিষ্কারের সফল প্রয়াস। আর আবহমান কাল ধরে আবেগ ও আবেশের পথই যে বাঙালি মনের চল্‌তি পথ হয়ে আছে, অপর অনেকের মত প্রমথ চৌধুরীও ছিলেন সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ফলে আমাদের প্রেমানুভবের মধ্যেও যুগ-যুগান্তরের এক আবিষ্ট মোহময়তা জড়িয়ে আছে; যার যথার্থ মূল্য কোনো কালে কেউ বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে দেখেনি, সংস্কার দিয়ে মেনে নিয়েছে। প্রেমের মূলে রোমান্টিক্ ভাবনার উৎসও এই গতানুগতিকতার মধ্যে! এই জন্যই রোমান্স ও রোমান্টিক প্রণয়ের প্রতি প্রমথ চৌধুরী চির-বিমুখ। কেবল এই কারণেই 'ফরমায়েসি গল্পে' ঘোষালের মুখে বাংলার প্রথম সার্থক কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম রোমান্স 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রতিও কটাক্ষ করতে পেরেছেন তিনি। তবে, মনে হয়, এ গল্পের কটাক্ষ শিল্পীর প্রতি তত নয়, যত গদ্‌গদতায়

১১। দ্রঃ [ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] 'শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী'। ১২। 'বীরবলের পত্র'—সবুজপত্র, ১ম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।

রোমান্স্-পাঠকের প্রতি ; সে কটাক্ষ কৌতুকের সীমা পেরিয়ে ব্যঙ্গের অম্ল-কষায় জগতে পদক্ষেপ করতে পারেনি।

কেবল রোমান্টিসিজম্ নয়, সকল প্রকারের সংস্কারের বিরুদ্ধেই চির উদ্যত ছিল তাঁর কটাক্ষের সহাস-মৃদু আঘাত,—satire-এর তীব্রতায় কখনোই যা অতি ঝাঁঝালো হয়ে ওঠেনি, বড়জোর হয়েছে সরস caricature। আমাদের অতিশয় বাস্তবতাবুদ্ধি, তথা 'সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা'র অতি-সচেতনা নিয়ে এই ধরনের caricature করা হয়েছে ঐ একই 'ফরমায়েসি গল্পে', এখানে শিল্পী এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছেন।

ফল কথা, যে-কোনো সংস্কার বা ইমোশন্-এর পক্ষেই আবিষ্ট হয়ে পড়া একান্ত স্বাভাবিক ; আর আবেশের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ অপহৃত হয়,—এই বিশ্বাসে প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রত্যেকটি গল্পের theme-কে বুদ্ধির তৌলে ওজন করেছেন প্রতি ধাপে। এই বিচার-বিশ্লেষণের বৌদ্ধিক অংশটুকুই তাঁর অধিকাংশ গল্পের পটভূমি,—আলোচনা, বিতর্ক, অথবা কথকতার ভঙ্গীতে যার নিয়ত প্রকাশ। এই অর্থেই শিল্পী ইঙ্গিত করেছেন,—তাঁর গল্প আসলে গল্প ও প্রবন্ধ "একাধারে ও দুইই"।[১৩]

গল্পের প্লট্-কে আলোচনা, আর যুক্তি-বিতর্কের যাঁতাকলে ফেলে নিছক ছোটগল্পের রসকে জমাট্ হতে দেননি ; অথচ গল্পাংশ ও তর্কাংশ মিলিয়ে একটি আশ্চর্য গালগল্পের পরিবেশ গড়ে তুলেছেন,—এটুকুই প্রমথ চৌধুরীর গল্প লেখার সাধারণ টেক্‌নিক্। এতে তাঁর দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে, আর বাংলা সাহিত্যও পেয়েছে একটি বিশেষ স্বাদুতার স্পর্শ। প্রথমতঃ জীবন-মূলক গল্পে জীবনের সহজ ইমোশন-কে জমাট্ হতে না দিয়ে তাকে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখা হয়েছে প্রতি পদে ;—এই বুদ্ধির খেলায় চৌধুরী মশায়ের "অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে মিলেছে তাঁর অভিজাত মনের অনন্যতা ;"[১৪]—ফলে তাঁর মনীষাদীপ্ত ব্যক্তিত্বের ঘটেছে অ-সাধারণ স্বতন্ত্র প্রকাশ। আর একদিকে, নিজ ব্যক্তি-জীবনের মত নিজের গল্পের আবেদনকেও আবেশে লঘু হয়ে পড়তে দিতে শিল্পীর ঘোর আপত্তি ছিল ;—তাই গভীরতম অনুভবকেও বেদনাঘন হতে দিতে তিনি নারাজ। শরৎচন্দ্র তাঁর পূর্বোক্ত চিঠিতে লিখেছিলেন, "ইনিয়ে বিনিয়ে কাতরোক্তি কোথাও নেই—অথচ কত বড় না একটা ট্রাজেডি পাঠকের বুকে গিয়ে বাজে। আপনার লেখায় এই সহজ শান্ত রিফাইণ্ড্ বলার ভঙ্গীটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে।" প্রমথ-গল্পে তাঁর বলার এই 'রিফাইণ্ড্ ভঙ্গি' এনে দিয়েছে গালগল্পের এক নিপুণ বাক্‌শৈলী। এখানে চৌধুরী মশায় নবজীবনের ভূমিতে বাংলার প্রাচীন কথকতা-শিল্পের উত্তরসাধক।

১৩। দ্র. জ্যোতিপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় (সঃ) 'গল্পলেখার গল্প'।
১৪। দ্র. রবীন্দ্রনাথ 'প্রমথ-গল্পসংগ্রহের ভূমিকা'।

'সবুজপত্রে'র মুখপত্রে তিনি লিখেছেন, সাহিত্য নিঃসংশয়ে জীবন-নির্ভর হলেও, তার সবটুকুই দৈনিক জীবনের পড়ে-পাওয়া টুকরো নয়। তাঁর কথায়, "সাহিত্য হাতে হাতে মানুষের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দিতে পারে না। কোনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কিন্তু কোনো কোনো কথায় মন ভেজে, এবং সেই জাতের কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য।" অনেকগুলি গল্পের মধ্যে সেই মন-ভেজানো কথার মালা গেঁথেছেন প্রমথ চৌধুরী। 'আহুতি', 'ঘোষালের হেঁয়ালি,' 'বীণাবাই' এই ধরনের স্নিগ্ধ উজ্জ্বল কথকতা-মাধুর্যের সুন্দর নিদর্শন। কিন্তু কথার মালা গেঁথে মন ভেজানো প্রমথ চৌধুরীর উদ্দেশ্য হলেও, 'মনকে ঘুম পাড়ানো' তাঁর পক্ষে কল্পনাতীত। তাই তাঁর ভাবগভীর গল্পগুলিতে তাঁর প্রবন্ধের মতই "সকল আলোচনাকে অনুস্যূত করে আছে এক দীপ্তিমান রসিকতার সুতীক্ষ্ণ সরসতা।"[১৫] মনকে যা ঘুমিয়ে ঝিমিয়ে পড়তে দেয় না কিছুতেই,—বেদনাহীন আলোর আঘাতে আঘাতে কেবল সচেতন— উন্মুখ করে রাখে পরবর্তী কথার অপেক্ষায়,—কথার মালায় গাঁথা পরের ফুলটির উৎকণ্ঠ সন্ধানে।

আর একশ্রেণীর গল্পে রয়েছে তার্কিকতার পটভূমি। এখানে শিল্পী য়ুরোপীয় জ্ঞানে বিদগ্ধ পাণ্ডিত্যের প্রাচুর্য নিয়েও প্রাচ্য পথানুসারী। ডঃ অতুল গুপ্ত লিখেছেন, "প্রাচীন ভারতবর্ষের ভাষ্যকার ও টীকাকারদের তিনি পরম অনুরাগী ছিলেন; এঁদের মধ্যে যাঁরা বড় তাঁদের সূক্ষ্ম অথচ বস্তুনিষ্ঠ যুক্তির ধারা এবং বিপুল শব্দসম্পদের প্রয়োগনৈপুণ্য এই প্রোজ্জ্বলবুদ্ধি অসাধারণ বাঙালি লেখককে মুগ্ধ করেছিল।"[১৬] প্রাচীন ভারতের বিদগ্ধ মানসের মতই চৌধুরী মশায় তাঁর অনেক বক্তব্যকে নৈয়ায়িক যুক্তির পরম্পরায় সাজিয়েছেন,—যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পূর্বপক্ষের আগাগোড়া উপস্থাপনার পর তীক্ষ্ণ যুক্তিজালে তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খণ্ডনপূর্বক উত্তর পক্ষের প্রতিষ্ঠা। বহু প্রবন্ধে এই রীতি বিচিত্র সার্থক পদ্ধতিতে অনুসৃত হয়েছে। গল্পের পটভূমিতেও এই তার্কিকতার পূর্বপ্রচ্ছদ গড়ে উঠেছে। 'ছোটগল্প', 'গল্প লেখা', এমন কি 'চারইয়ারি কথা'তেও এ ধরনের তর্ক ও আলোচনার পরিবেশ জমাট,—অমিশ্র ছোটগল্পের স্বাদুতাকে যা গভীর-ঘন হতে বাধা দিয়েছে। গল্পের তার্কিকতায় প্রাচীন টীকা ও ভাষ্যকারদের মত কূট নৈয়ায়িক যুক্তিজাল বর্ষিত হয়নি,—কিন্তু এ-ধরনের প্রায় সকল গল্পেই প্রাচীন শাস্ত্রীয় বিচার সভার বৈঠকী পরিবেশটি পুরোপুরি গড়ে উঠতে পেরেছে। 'চারইয়ারি কথা'-র বিলিতি ধরনের ক্লাব্-এ বিলাতি নায়িকাদের গল্প বাঙালি জীবনের স্বাদ বয়ে এনেছে আরো অনেক কিছুর সঙ্গে তার ঐ বৈঠকী পরিবেশের প্রভাবে।

১৫। ডঃ অতুলচন্দ্র গুপ্ত, 'প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ' (১ম খণ্ড) ভূমিকা।
১৬। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' ১৩৫০ সাল (বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা)।

বুদ্ধি-দীপ্ত মন-ভেজানো কথায় কথকতার স্বাদ ও সহাস-তীক্ষ্ণ মনোজ্জ্বল তার্কিকতার পরিবেশে বৈঠকী গল্পের স্বাদুতা সৃষ্টি করে প্রমথ চৌধুরী এক নতুন রসের জোগান দিয়েছেন, বাংলা গল্প-সাহিত্যে এ-পর্যন্ত যা 'ন ভূত', এমন কি হয়ত 'ন ভবিষ্যতি'। এবারে সেই রসগ্রহণের প্রকরণ নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

প্রমথ চৌধুরীর গল্পের আবেদন মূলতঃ 'সহৃদয় হৃদয়-সংবাদী' নয়, সেই জন্যে এমন সংশয়ও দেখা দেয় যে, ওর বুঝি কোনো আবেদনই নেই। সাহিত্য আসলে হৃদ্‌বৃত্তির দান,—প্রমথ-গল্পের প্রকাশ্য চিদ্-বৃত্তির অব্যবহিত মাধ্যমে। অর্থাৎ, তাঁর লেখায় মনের স্পর্শ নেই,—অতবড় মিথ্যা কথা বলা দুষ্কর। বরং সূক্ষ্ম সুকর্ষিত মননের প্রভাববশে তাঁর মনোধর্ম ছিল অসাধারণ রকমে স্পর্শকাতর। কিন্তু আগেই বলেছি, মনের অমিশ্র আবেগ প্রকাশকে অপরিহার্য আবেশের পূর্বসম্ভাবনা বলে তিনি চিরকাল ভয় করতেন। তাই মন যাতে ঘুমিয়ে পড়তে না পারে, সেইজন্য মনের কথাকে বুদ্ধির মারফৎ ওজন করে তার নিরাবিষ্ট শিল্পরূপটি আঁকতে চেয়েছেন চৌধুরী মশায়। দৃষ্টান্ত হিশেবে 'নীল লোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলা' গল্পটির কথা উল্লেখ করি।

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে সুরাট কংগ্রেসে যে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড হয়, আর পাঁচজন শিক্ষিত ভারতীয়ের চেয়ে চৌধুরী মশায়ের মন তাতে উদ্বেলিত হয়েছিল অনেক বেশি,—কারণ আগেই বলেছি, সুকর্ষিত মননের প্রভাবে তাঁর মন হয়েছিল অতিসূক্ষ্ম রুচি-স্নিগ্ধ। এই উদ্বিগ্ন মানসিকতাকে যে প্রাঞ্জল বলিষ্ঠ ভাষায় তিনি রূপ দিয়েছেন—নিছক প্রসঙ্গত—সে কেবল চৌধুরী মশায়ের পক্ষেই সম্ভব ছিল :—"...সমাজে থাক্‌তে হলেই পাঁচটি 'মি' নিয়েই আমাদের ঘর করতে হয়, এবং সেই কারণেই সুপরিচিত 'মি'গুলি সাহিত্যে না হোক্, জীবনে আমাদের সকলেরই অনেকটা সওয়া আছে। কিন্তু যা আছে, তার উপর যদি একটা নতুন 'মি' এসে আমাদের ঘাড়ে চাপে, তাহলে সেটা নিতান্ত ভয়ের বিষয় হয়ে উঠে। আমরা এতদিন নিরীহ প্রকৃতির লোক বলেই পরিচিত ছিলুম। কিছুদিন থেকে ষণ্ডামি নামে একটা নতুন 'মি' আমাদের সমাজে প্রবেশ করেছে। এতদিন রাজনীতির রঙ্গভূমিতেই আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। সুরাট কংগ্রেসে সেই 'মি'র তাণ্ডব নৃত্যের অভিনয় হয়েছিল।"[১৭]

এ ধরনের দুর্ঘটনার প্রতি বিরূপতায় মনে স্বভাবতঃই ঝাঁঝ জমে অনেকখানি, তার প্রকাশও একেবারে নিরুত্তাপ হতে পারে না। কিন্তু একটি চূড়ান্ত অশালীন ঘটনার প্রতি প্রমথ চৌধুরী তাঁর মনের প্রবল উত্তাপ প্রকাশ করতে পেরেছেন কোনো প্রকার অভব্য জ্বালা সৃষ্টি না করেও। কেবল 'মি' ও 'ষণ্ডামি' কথা দুটির তাৎপর্য বুদ্ধি দিয়ে

১৭। প্রমথ চৌধুরী, 'সাহিত্যে চাবুক'—দ্র. 'বীরবলের হালখাতা'

গ্রহণ করলে তিরস্কার ও কটাক্ষ দুই-ই দিবালোকের মত স্পষ্ট উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ঐ 'ষণ্ডামি'র বদলে 'গুণ্ডামি' শব্দ প্রয়োগ করলে মনের কিছুটা উত্তাপের সঙ্গে অনেকখানি জ্বালা প্রকাশ পেতে পারত; সেই সঙ্গে প্রয়োগবিধির ঝাঁঝালো অভব্যতাও মনস্তাপের কারণ হতে পারত। 'ষণ্ডামি' শব্দটি প্রমথ চৌধুরী যে অসাধারণ ভঙ্গীতে ব্যবহার করেছেন, তা বুদ্ধিকে তিরস্কৃত ও লজ্জিত করে, কিন্তু বাংলা ভাষায় গুণ্ডামি শব্দের সাধারণ প্রয়োগ যে-কোনো কানে গালাগালের মত শোনাবে। প্রমথ চৌধুরীর রচনাশৈলীর অনন্য বিশিষ্টতা এখানেই। মানসিক আবেগের অতিশয়তা হেতু ভাল-মন্দ যে-কোনো অনুভব যেখানে আবিল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা, সেখানে মনের অনুভূতিকে নিরুচ্ছ্বাস মননশীলতার আলোকে পরিস্রুত করে তিনি যে যথার্থ সত্য রূপ সৃষ্টি করেছেন, নিরাবেগ বুদ্ধির দ্বারেই তার আবেদন।

যেমন প্রবন্ধের ক্ষেত্রে, গল্প রচনার ক্ষেত্রেও তাই। এ ধরনের আলোচনায় দুই বিরুদ্ধ-স্বভাব শিল্পীর তুলনা করা কিছু নয়। তবু মনে হয়, সুরাট কংগ্রেসের দুর্ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি আবেগপরায়ণ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র প্রবন্ধ বা গল্প লিখলে তাতে মনের উচ্ছ্বাস অধীর ক্ষোভ ও আক্রোশের ঝড়ো রূপ নিয়ে দেখা দিত। রবীন্দ্রনাথের হাতে এই উপাদান পৌঁছালে দেবদুর্লভ সুন্দর ভাষণে সে শাসন মর্মস্পর্শী হয়ে উঠত। এমন বিষয় নিয়ে প্রমথ চৌধুরী গল্প লিখলেন, 'নীললোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলা'। গল্পের কথক জানিয়েছেন, তাঁর "বন্ধুবান্ধবরা সবাই বলতেন যে, নীললোহিতের তুল্য মিথ্যাবাদী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।" কথক নিজেও বলেন, "বন্ধুবর [নীললোহিত] ভুলেও কখনো সত্য কথা বলতেন না।"[১৮] কথা সত্য না হলেই তা মিথ্যে হয়ে পড়ে, অথবা আর কিছু হয়, এ-ধরনের মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর। কিন্তু এমন একটি চরিত্র যে সৌরাষ্ট্র-দুর্ঘটনার মত ব্যাপার চিত্রণের মাধ্যম হতে পারে না, সে সম্বন্ধে সিরিয়াস্ পাঠকের মনে সন্দেহ থাকবার কথা নয়। অতএব এইরূপ একটি জাতীয় সমস্তাকে প্রমথ চৌধুরী গালগল্পে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন দেখে বিস্মিত হতে হয়। এ-গল্পটি কেবল অসত্যবাদীর যথেচ্ছভাষণ নয়,—প্লট্ ও পরিণামের বিচারে আজগুবি,—আশ্চর্য। প্রমথ চৌধুরীর স্বভাবসিদ্ধ caricature বলেও যদি ধরি,—তাহলেও এ-কার caricature? কংগ্রেসের "হোম্‌রা চোমরাদের", না যে-অর্বাচীন জুতো ছোঁড়া নামক 'ষণ্ডামি' করেছিল, তার? ফল কথা, "এই অপূর্ব কাহিনী শুনে" সকলের 'মুখ চাওয়া-চাওয়ি' করতে হয়, কার এ-গল্প সম্বন্ধে কি বলা উচিত, ঠাউরে ওঠা কঠিন! কংগ্রেসের সৌরাষ্ট্র বিভ্রাট-এর প্রসঙ্গে যে সৌরাষ্ট্রলীলা লেখা হয়েছে, তা যা-কিছু হতে

১৮। 'নীললোহিত' গল্প।

পারত বা পারা উচিত ছিল, তাছাড়া হয়েছে আর সব কিছু,—হয়েছে আন্‌কনভেন্‌শন্যাল অপ্রত্যাশিত এক প্যারাডক্স্‌।

কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখব, কংগ্রেসের ভেতরে 'ষণ্ডামি' যে প্রবেশ করেছিল, তার অনুচ্ছ্বসিত কৌতুক-কটাক্ষ শিল্পী রেখে গেছেন কোনো এক বিশেষ হোম্‌রা-চোম্‌রার চরিত্র-চিত্রণে। নীললোহিতের পরিচয় প্রসঙ্গে 'নীললোহিত' গল্পের কথক জানিয়েছেন, "তিনি বাস করতেন কল্পনার জগতে। তাই নীললোহিত যা বলতেন, সে সবই হচ্ছে কল্পলোকের সত্য কথা।" এখানেও প্রমথ চৌধুরী-সুলভ epigram-এর সংকেতবহতা রইল। বস্তু-জগতের স্থূল তথ্য-দেহ থেকে তার ইথারময় প্রাণবস্তুকে আকর্ষণ করে নিয়ে এক বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে কাল্পনিক গল্প ফেঁদেছেন শিল্পী ; সেই নিরাকার, নিরাবেগ কল্পনা-জগতে মূল ঘটনার শারীর স্পর্শ, 'দেহহীন চামেলির লাবণ্য বিলাসে'র মত ছড়িয়ে আছে। নিরুত্তাপ মননের কাছে তার নিরঙ্গ সংকেত অর্থহীন নয়,—কিন্তু তার চেয়ে স্পষ্ট বা স্থূল মূর্তিতে পেতে চাইলে এ-গল্পের জীবনাবেদন কর্পূরের মত উবে যায়।

'চারইয়ার কথা'র প্রসঙ্গেও সেই একই কথা বলা চলে। ছোটগল্পের স্বভাব বিচারে এই গল্পটিকে গল্প-চতুষ্টয় নাম দিতে হয়। অর্থাৎ চার 'ইয়ারে'র বলা চারটি গল্পই পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে চারটি উৎকৃষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ ছোট গল্প হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর আধুনিকযুগ-দুর্লভ বৈঠকী মনোভাব চারটি গল্পকে একই বৈঠকের রসসূত্রে গেঁথে একটিমাত্র প্রসঙ্গদেহে বেঁধে দিয়েছে। সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ গদ্য কথা-সাহিত্য 'কাদম্বরী' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কাদম্বরী যিনি উপভোগ করিতে চান, তাঁহাকে ভুলিতে হইবে যে, আপিসের বেলা হইতেছে ; মনে করিতে হইবে যে তিনি বাক্যরস-বিলাসী রাজ্যেশ্বর বিশেষ।"[১৯] রাজসভা, তথা রাজার বৈঠকে রসপ্রকাশের এই ছিল প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতি—বাংলা ভাষায় 'বাক্যরস-বিলাসের রাজ্যেশ্বর' প্রমথ চৌধুরীর গল্প বর্ণনাতেওরয়েছে একই রকমের নিরুদ্বেগ ব্যাপ্তি, মূল প্লট্‌-এর সংগতি ও সমাপনের বিষয়ে যা উৎকণ্ঠা-রহিত। বাংলা ছোটগল্পের আঙ্গিকে অনাবিষ্ট এবং অশেষ গালগল্প জমিয়ে তোলার পদ্ধতি প্রমথ চৌধুরীর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের দান। 'চারইয়ারি কথা'য় প্রথম প্রকাশিত হয়ে এই অপূর্ব ভঙ্গী ছোটগল্পের রূপ-চিন্তনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল।

'চারইয়ারি কথা'র শুরুতে দেখি বাড়ি যাবার জন্যে সবারই তাড়া, সীতেশের পক্ষে স্ত্রীর বকুনির ভয়,—অপরাপরের পক্ষে ঝড়ের। কিন্তু ঝড়ের তীব্রতার ভয়ে গাড়োয়ানরা পর্যন্ত গাড়ি ছাড়তে যেখানে ভয় পাচ্ছে,—সেই চরম অবস্থায় গল্প একবার শুরু হয়েছে ত, হয়ে পড়েছে অশেষ। কেবল সেনের প্রথম গল্পের সূচনা ছাড়া ঝড়ের নামগন্ধও নেই

১৯। রবীন্দ্রনাথ—'কাদম্বরীচিত্র'—দ্র. 'প্রাচীন সাহিত্য'।

আর কোথাও ;—গল্পের ঝোঁকে গল্প চলেছে একের পর এক ;—অবিরাম। এবারে গল্পগুলির বিকাশ লক্ষ্য করলে দেখব, সেনের গল্প আবার এক হেঁয়ালি। Paradox তো বটেই, প্রেমের রোমান্সগন্ধিতার প্রতি কটাক্ষও বুঝি রয়েছে আভাসে! কিন্তু সে যাই থাক, গল্পের প্রচ্ছদ বিন্যাসে শিল্পীর বিগাঢ় জীবন-ভাবনা মানব-(human)-রস-স্নিগ্ধ হয়ে দেখা দিয়েছে!—"দেখতে পাচ্ছ বাইরে যা কিছু আছে, চোখের পলকে সব কি রকম নিস্পন্দ নিশ্চেষ্ট নিস্তব্ধ হয়ে গেছে ; যা জীবন্ত তাও মৃতের মত দেখাচ্ছে ; বিশ্বের হৃৎপিণ্ড যেন জড়পিণ্ড হয়ে গেছে, তার বাক্‌রোধ নিশ্বাসরোধ হয়ে গেছে ; রক্ত চলাচল বন্ধ হয়েছে ; মনে হচ্ছে যেন সব শেষ হয়ে গেছে, এর পর আর কিছুই নেই।...আমি আর একদিন এই আকাশে আর-এক আলো দেখেছিলুম—যার মায়াতে পৃথিবী প্রাণে ভরপুর হয়ে উঠেছিল ; যা মৃত তা জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, যা মিছে তা সত্য হয়ে উঠেছিল।"

নিসর্গ রূপের এমন আবিষ্ট ধ্যান,—জীবন-মধুরিমার প্রতি এমন স্বপ্নাবেগ ভরা উৎকণ্ঠা, আদর্শ রোমান্টিক্ কল্পনার পক্ষেও দুরায়ত্ত। গোটা গল্পটির অভিব্যক্তিতে ভাষার এই কাব্য-সুরভিত আবেশ কেবল অক্ষুণ্ন থাকেনি, আশ্চর্য সুরমূর্ছনার সৃষ্টি করেছে। এমন গল্প পড়ে মনে হয়, প্রমথ চৌধুরী রোমান্স-রস-বিমুখ, এ-কথা বলবে কে? কিন্তু গল্প শেষে উন্মাদিনীর অট্টহাসির মধ্যে সেনের আত্ম-আবিষ্কারে কারুণ্যের ঘনতা অপেক্ষা অস্বস্তির কৌতুকস্নিগ্ধতাই বিচ্ছুরিত হয়েছে। কেবলমাত্র মন দিয়ে যাঁরা গল্প পড়েন, তাঁদের পক্ষে এ-গল্পের আদি-অন্তে অসংগতির চমকই প্রধান হয়ে ওঠে ; মনে হওয়া অসম্ভব নয়, এ বুঝি আজ্‌গুবি এক অর্থহীন গল্প—paradox। আসলে এই আপাত প্যারাডক্স্-প্রাধান্যই প্রমথ চৌধুরীর অতি সূক্ষ্ম বৌদ্ধিক চেতনায় পরিহাসের বৈদেহ মাধ্যম। বৈদেহ বল্‌ছি এই কারণে যে, গল্পের গায়ে পরিহাসের ছোপ লাগে না কখনো,—স্যাটায়ার বা হিউমার-এর বস্তুগত আশ্রয় গল্পের মধ্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন ; অথচ সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরের অবতারণার পরিণামে দুর্লক্ষ্য উইট্-এর ক্ষণিক দোলা সারা গল্পটিকে যেন এক অনির্বচনীয় বিপরীত রসের ব্যঞ্জনায় ভরে দিয়েছে, করুণাঘন রোমান্টিকতা উইট্-এর স্মিত কৌতুকে হয়ে উঠেছে মৃদু আন্দোলিত। গল্পের গোটা শেষ অনুচ্ছেদে যে বেদনা পুঞ্জিত হতে চাইছিল, শেষ ছত্রে অপ্রত্যাশিত অদৃশ্য আঘাতের দোলা দিয়ে তাকেই কমেডি-র কৌতুকে পরিণত করেছেন শিল্পী,—"আমি সেইদিন থেকে চিরদিনের জন্য ইটর্ণল ফিমিনিন্‌কে হারিয়েছি কিন্তু তার বদলে নিজেকে ফিরে পেয়েছি।"—এই শেষ কথাটিই গল্প-রসের মোড় মুহূর্তে ফিরিয়ে দিয়েছে বিপরীত মুখে, অথচ এই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ানোর ঝাঁকুনি মনকে আঘাত করে না,—আসল হাসিটুকু এই আঘাতহীন

দোলায়মানতার,—এ হয়ত পুরো হাসি নয়,—বুদ্ধির অপূর্ব খেলা-কৌশলে জেগে-ওঠা মনের খুশি।

এই খুশিটুকুই পরিহাস-ঘন হাসির রূপ পেয়েছে সীতেশের দ্বিতীয় গল্পে ;—রোমাণ্টিক্ প্রণয়ের প্রতি উইট এর দীপ্তিভরা হিউমার সুগঠিত হয়ে উঠেছে এখানে। গল্পের অনামিকা নায়িকা সীতেশকে বলেছিল,—"তোমার বয়সের লোক নিজের মন জানে না। মনের সত্য-মিথ্যা চিন্‌তেও সময় লাগে। ছোটছেলের যেমন মিষ্টি দেখলেই খাবার লোভ হয়, বিশ-একুশ বৎসর বয়সের বড় ছেলেদেরও তেম্‌নি মেয়ে দেখলেই ভালবাসা হয়। ওসব হচ্ছে যৌবনের দুষ্ট খিদে।"—রোমাণ্টিক্ প্রণয়ের মূলগত অপরিণতির প্রতি লেখক এখানে স্পষ্ট পরিহাসের মৃদু আঘাত হেনেছেন। বস্তুত মোহাবেশে উচ্ছ্বসিত প্রেমভাবনার প্রতি শিল্পীর স্বভাব-বিমুখতার কারণটুকুও যেন এখানে আভাসিত হয়েছে।

'চারইয়ারি কথা'র গল্প এগিয়ে চলতে চলতে ক্রমশঃই জমে উঠেছে। সীতেশের গল্পের চেয়ে সোমনাথের গল্প আরো জমাট। এও এক প্রণয়বঞ্চিত পুরুষের আত্মকথা; কিন্তু বঞ্চনার পরিমাণ এবারে আগের গল্পের মত অত হাল্‌কা বা হাস্যকর নয়। বিশেষ করে সোমনাথের চরিত্রের সিরিয়াসনেস্ তার প্রণয়বঞ্চনার মধ্যে সার্থক ট্রাজেডির সুর অনুস্যূত করে দিতে পারত। কিন্তু চৌধুরীমশায় তাঁর স্বভাব-নিপুণ কৌতুক-প্রিয়তা দিয়ে গল্পের পরিণামবিন্দুতে এক অনতিচ্ছেদ্য স্মিত সুহাস ছড়িয়ে দিয়েছেন। চল্‌তি কথা আছে, "তেল পোড়ে, সল্‌তে হাসে"—প্রমথ চৌধুরীর গল্পের সহাস প্রসন্নতা তেমনি; তাঁর হাসি পরিহাস-তীব্র ব্যঙ্গ-রূঢ় নয়,—পাঠকের চিত্তভূমি যখন নির্ভার কৌতুকে স্নিগ্ধ প্রসন্ন হয়ে ওঠে, গল্পের দেহে তখনো seriousness-এর আবরণ ঘোচে না,—শিল্পীর মন যখন পাঠককে কৌতুকে হাসায়, গল্প তখনো হাসে না,—রচনাশৈলীর আশ্চর্য paradox এখানেই।

সোমনাথ সম্বন্ধে লেখক বলেছেন,—"হাড়ের মত কঠিন ঝিনুকের মধ্যে যেমন জেলির মত কোমল দেহ থাকে, সোমনাথেরও তেমনি অতি কঠিন মতামতের ভিতর অতি কোমল মনোভাব লুকিয়ে থাকত। তাই, তাঁর মতামত শুনে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হত না, যা হত, তা হচ্ছে ঈষৎ চিত্তচাঞ্চল্য, কেন না তাঁর কথা যতই অপ্রিয় হোক্, তার ভিতর থেকে একটি সত্যের চেহারা উঁকি মারত,—যে সত্য আমরা দেখতে চাই নে বলে দেখতে পাই নে।"—গল্প-শিল্পী প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধেও এ মন্তব্য প্রায় সমান সত্য; মনে হয়, নিজ স্বভাবের একটি বিশেষ অংশকে প্রতিবিম্বিত করেই যেন লেখক সোমনাথ চরিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর আপাত নৈর্ব্যক্তিকতার অন্তরালে একটি জীবনপ্রিয় মন আত্মগোপন করেছিল। প্রমথ চৌধুরীর গল্প-সাহিত্য যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রধান হয়ে ওঠেনি, সে ঐ স্নিগ্ধ

মমতাবোধেরই ফল। অন্যপক্ষে নিজ মনোধর্মকে একপেশেমির অতিশয়তায় উচ্ছ্বসিত হতেও তিনি দেননি; এখানে তাঁর তীক্ষ্ণ প্রখর মনীষা প্রহরীর ভূমিকা নিয়েছে। জীবনের প্রতি অতি-মমতার বশে যে-সব বাস্তব সত্যের প্রতি আমরা সাধারণত চোখ বুঁজে থাকতে অভ্যস্ত, গল্পের পটভূমিতে তাদের আহ্বান করে এনে শিল্পী অপরিহার্য আবেশের পথরোধ করেছেন। 'চারইয়ারি কথা'য় এই সত্যই প্রকট হয়েছে। নরনারীর প্রণয়-প্রবৃত্তির সততার ওপরে সুস্থ-সুন্দর সমাজ-জীবনের ভিত্তি গড়ে উঠেছে। তাই, জীবনের জয়গান করতে গিয়ে প্রেমের ও যৌবনের বন্দনা অনেক সময়ে উচ্ছ্বাসের অতিশয়তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণের মধ্যেও স্বার্থ ও অভিসন্ধি-সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে,—প্রেমের ছদ্মবেশে যৌবনের 'দুষ্ট খিদে'-ও অনেক সময় নরনারীর জীবন-বাসনাকে আবিল করতে চায়,—এ-সব "সত্য আমরা দেখতে চাই নে।" 'চারইয়ারি কথায়' সেই না-দেখতে চাওয়া অপ্রিয় সত্যকে তিনি দেখিয়ে ছেড়েছেন,—অথচ সে-দেখার মূলে জ্বালার তপ্ততা জমেনি কোথাও।

তাই বলে প্রমথ চৌধুরী জীবন-মূল্যায়নে সিনিক্-ও ছিলেন না। শেষ গল্পটিতে প্রণয়ের একটি তিতিক্ষা-করুণ স্নিগ্ধ-মধুর ছবি রূপ-সুরেখ হয়ে উঠছিল। গল্প-কথকের আগে ঝড়ের রাতের 'দুষ্ট-ক্লিষ্ট-আলোয়' তাঁর তিনবন্ধু ভালোবাসার স্বভাবকে 'ঘুলিয়ে দিয়েছিলেন'। এবার কথক নিজে সম্মোমেঘমুক্ত জীবন-পরিবেশে প্রেমের যথার্থ স্বরূপকে আলোকিত করেছেন। তাঁর মতে "ভালোবাসা আসলে হাস্যরসের জিনিস"। তবু লেখক বলেছেন তাঁর গল্পে ['আমার কথা'] "কোনো হাস্যকর কিম্বা লজ্জাকর পদার্থ নেই।" এখানে লেখক আবার একটি আত্মসত্য ঘোষণা করেছেন,—প্রমথ চৌধুরীর গল্প যদি হাস্যরস-সিক্ত হয়ও, তবু 'হাস্যকর বা লজ্জাকর' উপাদান তাতে কিছু নেই;—সে-হাসি কৌতুক বা ব্যঙ্গের উৎসজাত নয়,—উইট্-এর নিরঙ্গ আলোক-ধারায় হাসির আভাস বা ব্যঞ্জনাটুকুই কেবল ছড়িয়ে থাকে ভাবনার অদৃশ্য আলোক-লোকে। 'আমার কথা'য় সেই হাস্যকরতাহীন হাস্যরসের আভাস আছে গল্পের শেষে,—ঘনজমাট্ প্রেমের গল্পের সমাপ্তিতে যখন জানতে হয়, গোটা গল্পটি একটি সদ্য পরলোকগতার দূর-ভাষণ-প্রয়াসের ফল! কিন্তু সে পরিণাম গল্পে যেভাবে বিন্যস্ত হয়েছে, তাতে একটি অসম্ভব গল্প বলে একে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। স্বাভাবিক জীবন-সম্ভাবনার অতীত paradox-এর বিস্ময় গল্পের সমাপ্তিকে রহস্যাবৃত করে রেখেছে। পরিণামী পরিচয়ে প্রেম মানবজীবনের এক অনির্বাচ্য অনুভব,—গল্পের জমাট্ theme-কে পরিশেষে সর্বশূন্যতায় বিলীন করে দিয়ে শিল্পী সেই অনির্বচনীয়তার আভাসই যেন সৃষ্টি করেছেন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ এই গল্পটিকে বিশেষভাবে বলেছেন 'human'.

প্রসঙ্গ দীর্ঘায়ত করে লাভ নেই, প্রণয়-গল্পের অনেক কয়েকটিতে প্রমথ চৌধুরী প্রায় একই রচনা-পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। 'ছোটগল্প', 'গল্প লেখা', 'সম্পাদক ও বন্ধু' ইত্যাদি গল্প এই শ্রেণীর অন্তর্ভূ্ত। এ-ছাড়া প্রণয় বা নরনারীর জীবন নিয়ে প্রমথ চৌধুরী আরো কিছু গল্প লিখেছেন, যেখানে pathos-কে wit-এর অনতি তীব্র দীপ্তির আলোয় নিষ্প্রভ করে ফেলা সম্ভব হয়নি ;—'একটি সাদা গল্প', 'ট্র্যাজেডির সূত্রপাত', 'বীণাবাই' ইত্যাদি গল্পে এবং গল্পান্তে সিরিয়াস্ ছোটগল্প-সমুচিত জীবন-ব্যঞ্জনা অনাহত করুণা-রসে রঞ্জিত হয়ে আছে, যাকে sentimentalism-এ কিছুতেই ভেঙে পড়তে দেননি প্রমথ চৌধুরী। 'সম্পাদক ও বন্ধু' গল্পে সম্পাদকের কাহিনী শুনে বন্ধু বলেছিল, এতে "রোমান্স নেই সত্য, কিন্তু এই একই ব্যাপারের ভিতর ট্র্যাজেডি থাকতে পারে।"—থাকতে পারে নয়, নিঃসংশয় ট্রাজেডির সুর ধ্বনিত হয়েছে 'একটি সাদা গল্প'-এর অন্তে। শ্যামলালের অপূর্ব সুন্দরী শিক্ষিতা কিশোরী কন্যার বিয়ে হল ক্ষেত্রপতির সঙ্গে, যে "ক্ষেত্রপতি তাঁর বিগত স্ত্রীর আদ্যশ্রাদ্ধ করেই, আগত স্ত্রীকে ঘরে আনবেন" ঠিক করেছিলেন এবং যিনি ছিলেন বয়সে শ্রীমতীর বাবার সমান। "ক্ষেত্রপতির এ বিবাহ করবার একমাত্র কারণ, শ্রীমতী সুন্দরী এবং কিশোরী। সুন্দরী স্ত্রীলোককে হস্তগত করবার লোভ ক্ষেত্রপতি কখনো সংবরণ করতে পারেননি ; এবং এক্ষেত্রে বিবাহ ছাড়া শ্রীমতীকে আত্মসাৎ করবার উপায়ান্তর নেই জেনে তিনি তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত হলেন।"

বিবাহ বাসরে অপরূপ সুন্দরী শ্রীমতীকে দেখে সদানন্দের [গল্পের কথক] মনে হয়েছিল,—"...সুন্দরী স্ত্রীলোক নয় ;—শ্বেতপাথরে খোদা দেবীমূর্তি ; তার সকল অঙ্গ দেবতার মতই সুঠাম, দেবতার মতই নিশ্চল, আর তার মুখ দেবতার মতই প্রশান্ত আর নির্বিকার। বর-কনে মানিয়েছিল ভাল, কেননা ক্ষেত্রপতিও যেমন বলিষ্ঠ তেমনি সুপুরুষ ; তার বয়েস পঁয়তাল্লিশের উপর হলেও ত্রিশের বেশি দেখাত না, আর তার মুখও ছিল পাষাণের মতই নিটোল ও কঠিন।" দেখে সদানন্দের মনে হয়েছিল, যেন দুটি statue-র বিয়ের অভিনয় দেখছে। হঠাৎ তার অন্যমনস্ক কানে এল, "ক্ষেত্রপতি বলছেন 'যদস্তু হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব'।" সদানন্দ বলেছে,—"একথা শোনামাত্র আমি উঠে চলে এলুম। বুঝলুম এ অভিনয় সত্যিকার জীবনের, তবে তা comedy কি tragedy তা বুঝতে পারলুম না।" গল্প-রস সম্বন্ধে শিল্পীর সংকেত এখানে অর্থবহ, comedy-tragedy-র বিতর্কের অতীত অনির্বচনীয় জীবন-রসে তপ্ত ছোটগাল্পিক ব্যঞ্জনায় গল্পান্ত ভরপুর হয়ে আছে। কিন্তু সচেতন ভাবেই শিল্পী এখানে একটি অখণ্ড ছোটগল্পকে বিন্দু-কেন্দ্রিত হতে দেননি ; বরং গল্পের theme-কে বিকেন্দ্রিত করে দিয়েছেন একাধিক

ছোটগল্পোচিত প্লট্-এর বিস্তীর্ণতায়। শ্যামলাল আর তার ছেলেকে নিয়ে আর একটি সুন্দর ছোটগল্পের প্লট্ গড়ে তোলা যেত। গল্প নয়, আগেই বলেছি, ইচ্ছে করেই গালগল্পের ভঙ্গীতে কাহিনী রচনা করেছেন প্রমথ চৌধুরী, ঐটিই তাঁর গল্প সৃষ্টির টেকনিক্।

'বীণাবাই' গল্পের সমাপ্তি প্রণয়-স্বপ্নে মন্থর করুণ রোমান্স-এর পরিণতি পেতে পারত। উপন্যাসের মত অতি বিস্তারিত করেছেন শিল্পী এই গল্পকে; বীণা ও বীণার দাদা, বীণা ও মাষ্টার মশায়, বীণার সংগীত-সাধনা, এবং বীণা ও ঘোষাল এই চা:টি পৃথক্ কাহিনীর সম্ভাবনাকে শিল্পী তাঁর কথকতার বৈদগ্ধ্যগুণে একসূত্রে টেনে বেঁধেছেন,—গল্পের দেহে বিস্তার থাকলেও শিথিলতা নেই,—একটি কাহিনীর মুখে আর একটি কাহিনী ঠিক্ বসে গেছে,—যেন একই ভাণ্ডামণির এ-পিঠ ও-পিঠ। ফলে গল্প-দেহে ছোটগল্পোচিত সংসক্তির অভাব ঘটে থাকলেও জীবন-তপ্ত pathos রোমান্টিক স্বাদুতায় জমাট বাঁধতে বাধা ছিল না। কিন্তু শিল্পী তা হতে দিলেন না,—গল্পের অশেষ ব্যঞ্জনাময় সুচিহ্নিত শেষকে ইচ্ছে করে যেন দুহাতে ঠেকে দিলেন একটু,—তাতে বিশুদ্ধ আর্ট-এর গায়ে যেন সায়েন্স-এর জাতিহর স্পর্শ লাগল মৃদু—বিগাঢ় ইমোশনের নিস্তব্ধতা "ঈষৎ চঞ্চল" হয়ে উঠল বুদ্ধির তির্যক প্রতিফলনে।

'ট্রাজেডির সূত্রপাত' গল্পে প্রণয় ধর্মের অঘটনঘটন পটীয়সী শক্তিকে শিল্পী স্বীকার করে নিয়েছেন। বিপত্নীক প্রৌঢ় অধ্যাপকের জীবনে কন্যা-সমতুল ছাত্রীর প্রতি আসক্তির দুর্বলতাকে প্রমথ চৌধুরীর মত হাস-রসিকও হেসে উড়িয়ে দিতে পারেননি। এখানেই তাঁর মমতাময় জীবনবোধের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। ফলে প্রণয়-গল্পে না-হলেও অন্যত্র জীবনের অনাবৃত রূপকে একান্ত pathos-সিক্ত করে ছেড়ে দিতেও তাঁর বাধেনি। প্রমথ-প্রবন্ধের প্রসঙ্গে ড: অতুল গুপ্ত বলেছেন,—"ঋজু কঠিন তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে তিনি যা বলেছেন তার প্রধান কথা হচ্ছে মন ও সাহিত্যের মুক্তির কথা।"[২০] মনপ্রাণের অবাধ মুক্তিতেই প্রমথ চৌধুরীর শিল্প-লেখনীরও মুক্তি। মুক্ত-প্রাণ মানুষের জীবন-বর্ণনায় তাঁর 'ঋজু-কঠিন-তীক্ষ্ণ' বাক্‌শৈলীও উদ্দাম হয়ে উঠেছে ;—sentiment না থাক্,—দীপ্ত প্রাণের অনতি উচ্ছ্বসিত আবেগ স্বচ্ছ ধারায় ঝরে পড়েছে তাতে। 'ঝাঁপান খেলা'র পরিসমাপ্তি একটি নিটোল ছোটগল্পের করুণ ব্যঞ্জনাকে ধারণ করে ধন্য হয়েছে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'বীরবল' সমাজের নীচের তলার মানুষ ;—কিন্তু অমিশ্র দৃপ্ত 'পুরুষমানুষ' সে। গল্পের কথক বলেছেন, "আর তার রূপ! অমন সুপুরুষ আমি জীবনে কখনো দেখি নি। সে ছিল কালো পাথরের জীবন্ত এপোলো।" সেই নির্ভেজাল পৌরুষের রূপ ঝগড়ু

২০। ড. অতুলচন্দ্র গুপ্ত 'প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ' (প্রথম খণ্ড) 'ভূমিকা'।

মেথরের বৌকে মুগ্ধ করেছিল,—বীরবলের সার্থক পুরুষসত্তাকে চিন্‌তে ভুল করেনি চিরন্তনী নারী। ঝগড়ুর নালিশকে আমল দেননি গল্প-কথকের পিতা। পরে গৃহিণীর জিজ্ঞাসায় জবাব দিয়েছিলেন ;—"তুমিও যেমন, ওদের বিয়েই নেই, ত 'কে কার বউ। আর তাছাড়া ঝগ্‌ড়ুকে ত দেখেছ, বেটা বাঁদরের বাচ্ছা। আর লখিয়াকেও ত দেখেছ ? কি সুন্দরী ! সে যে-ঝগ্‌ড়ুকে ছেড়ে বীরবলের কাছে চলে যাবে, এত নিতান্ত স্বাভাবিক। রাধাকে কেউ ঘরে রাখতে পারবে না,— সে কৃষ্ণের কাছে যাবেই যাবে। এই হচ্ছে ভগবানের নিয়ম।"

এ-হেন বীরবল মরেছেও বীরপুরুষের মত,—একটা প্রকাণ্ড খয়ে-গোখরো নিয়ে ঝাঁপান খেলা খেলতে গিয়ে অনায়াসে নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করে নিলে। বিষে অভিভূত বীরবল চরম মুহূর্তে একটিবারের জন্যে চোখ খুলে তার প্রিয়তম কিশোর গল্প-কথককে বলে গেল, "বাবা, হাম চলতা, কুচ্ ডর নেই।"

তারপর কথক বলেছেন, "আমিও কি একদিন এই শেষ কথাটি বলে যেতে পারব !" —এই নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে প্রমথ-গল্পে সার্থক subjective বাসনার স্পর্শ লেগেছে যেন,—অন্ততঃ এই একবার গল্প-বলিয়ের সঙ্গে মূল শিল্পী অভিন্ন-হৃদয় হয়ে পড়েছেন ;— আর বীরবলের জীবন-পরিণাম উপলক্ষ্য করে বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভার হৃদয়ের রূপটি যেন হতে পেরেছে নিরাবরণ। এই প্রসঙ্গে সামাজিক সুনীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন উঠতেও বাধা নেই। আগেই দেখেছি, প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, চিরকাল তিনি puritanism-এর বিরোধী। তাছাড়া, রবীন্দ্র-গল্পপ্রসঙ্গে এ-ও দেখেছি যে, 'সবুজপত্র'-যুগে প্রাচীন জীবন-চিন্তার, তথা প্রচলিত সামাজিক মূল্যমানের পরিবর্তন ঘট্‌তে শুরু করেছিল। অনেকটা পরিমাণে এ ছিল কালের হাতের দান। 'সবুজপত্র' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক মুখে। বাংলার প্রাচীন জীবন-সংস্কারের বনিয়াদ এর আগেই ভাঙতে শুরু করেছিল স্বদেশী আন্দোলনের সমকালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধই নানা জটিলতায় ভরা পৃথিবীকে প্রথম টেনে এনে দিলে বাঙালির গৃহবলিভুক্ স্বপ্নাবিল জীবনের দ্বারে। তারপরে যুদ্ধোত্তর আরো ভাঙনের পরিণাম-পথ বেয়ে এলো 'কল্লোল'-'কালিকলম'-'প্রগতি'র ধারা। সেই ভাঙনের মুখে রবীন্দ্রনাথ 'সবুজের অভিযানে' খাঁচা-ভাঙার গান গাইলেন 'সবুজপত্রে'—'সবুজপত্র'-যুগের ছোটগল্পে সামাজিক বিধি-নিষেধের লোহার খাঁচাকে দিলেন ভেঙে।

তাহলেও রবীন্দ্রনাথের রুচিসূক্ষ্ম ভাবনায় লখিয়া-বীরবল সম্পর্কের আবরণ-হীনতার চিত্রণ অসম্ভব ছিল। শরৎচন্দ্রের পক্ষেও এই জীবন-রূপের চিত্রণ সম্ভব ছিল না ; মনের গহনে তিনি ছিলেন জাত puritan. সমাজের অন্ধকার স্তরের জীবনকে আলোয় টেনে

আনতে গিয়ে তিনি অপাপবিদ্ধ শুচিতায় উজ্জ্বল করে তুলেছেন। পিয়ারী বাইজি তাঁর উপন্যাসে প্রবেশ মাত্র রাজলক্ষ্মী,—তথা, 'লক্ষ্মী' হয়ে ওঠে;—পিয়ারী নামের উচ্চারণ মাত্রে সে হয় লজ্জারক্তিম। বারবিলাসিনী চন্দ্রমুখী তাঁর কল্পনায় "পারুর চেয়েও বড়;" —মেসের ঝি সাবিত্রী দেবী সাবিত্রী! একমাত্র কিরণময়ীর জীবনে ঐ পরিণাম রচনা করতে না পেরে চরিত্রটির অপার সম্ভাবনাকে শরৎচন্দ্র হঠাৎ পা ভেঙে যেন স্তব্ধ-গতি করে দিয়েছেন। তাঁর পক্ষে ঝগড়ু-পত্নী ও বীরবলের প্রণয় সম্পর্কের এমন উদাত্ত চিত্র রচনা অসহ্য হত। 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বে মধুডোম-কন্যার বিবাহচিত্র-বর্ণনায় এ সত্য অমোঘ স্পষ্টতা পেয়েছে।

সমাজের অন্তেবাসী জীবনকে কেন্দ্র করে প্রমথ চৌধুরীর এই জীবনায়ন একদিক থেকে বিস্ময়কর। বাংলা সাহিত্যে তিনি সূক্ষ্ম অভিজাত নাগরিক রুচির মূর্ত প্রতীক বলে স্বীকৃত,—যে সহ-জ আভিজাত্য ফরাসী সাহিত্যের সু-কর্ষণে মার্জিত এবং উজ্জ্বল হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরীর puritanism-বিরোধী মনোভাবের সু-গঠনে তাঁর ফরাসী সাহিত্য-পড়া মনের প্রভাব হয়ত ছিল। কিন্তু বীরবল-লখিয়া-ঝগড়ু-কথার মত অনভিজাত গল্পকে চৌধুরী মশায় বঙ্গ-সরস্বতীর মন্দিরে ঠাঁই দিয়েছেন, এ-কথা অবিস্মরণীয়। এখানে তিনি যে-পরিমাণে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সমান-ধর্মা, তার চেয়ে বেশি পরিমাণে যেন 'কল্লোল'-শিল্পীদের পূর্বসূরী।

এখানে স্পষ্ট করে নেয়া প্রয়োজন, অসামাজিক যৌন সংযোগই 'কল্লোল'-সাহিত্যের প্রধান বা একমাত্র বিষয়বস্তু বলে মনে করি না। তাছাড়া, আলোচ্য গল্পে চৌধুরী মশায় এ-ধরনের দুর্ঘটনা ঘটিয়েছেন, এমন কথাও বিশেষভাবে বলা নিরর্থক। আসল কথা, সমাজের নীচের তলার অন্ধকারে যে-সব মানুষ বাস করে,—আমাদের সুচিন্তিত রুচি-কুরুচি বা নীতি-দুর্নীতিবোধের sophistication সম্বন্ধে যারা নির্বিকার, তাদের জীবন-চিত্রণকে অভিজাত শালীনতাবোধের প্রভাবে বিকৃত করে দেখতে শিল্পী রাজি হননি। তাই বলে আমাদের দৃষ্টিতেও গল্পটিকে নীতিরহিত বলে কল্পনা করা অসম্ভব। লেখকের সহ-জ সংযত ব্যক্তিত্ব সংযমের মধ্যেই সুন্দরের সৃষ্টিকে সার্থক করতে চেয়েছে। অন্নদাশংকর রায় শিল্পী বীরবলের ক্লাসিক্যাল মনোভঙ্গীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন,[২১]—কেবল রূপশৈলীর বিচারেই নয়, জীবন-চিন্তার বৈশিষ্ট্যেও তিনি ক্লাসিক্যাল আর্টিস্টদের সগোত্র। তিনি বিশ্বাস করতেন, কেবল আর্ট-এর মধ্য দিয়েই মানুষের নির্বার প্রাণ-শক্তিকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব,—"কারণ প্রাণশক্তি একমাত্র আর্ট-এরই বাধ্য।"[২২] এই প্রাণশক্তির একটা নিজস্ব প্রবাহ রয়েছে, গঙ্গার ধারার মত যেখানে তার গতি

২১। দ্রষ্টব্য:—অন্নদাশংকর রায়—'বীরবল: জীবনশিল্পী'। ২২। 'সবুজপত্রে'র 'মুখপত্র।'

এবং মুক্তি, সেখানে সে অপাপবিদ্ধ,—যেখানে তার বন্ধন সেখানেই তাকে স্পর্শ করে পাপ।

'ঝাঁপান খেলা' গল্পে নায়ক বীরবলের পক্ষে যা অনাবিল সহজ জীবনের স্বাভাবিক উপাদান, 'অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি' গল্পে অবনীভূষণের পক্ষে তাই পঙ্ককালিমায় পূর্ণ,—বিনিষ্টিময় ট্রাজিডির কারণ। অবনীভূষণ শিক্ষিত, আদর্শবাদী; যৌবনেও ছিলেন রোমান্স-বিমুখ। আর চরম দুর্গতির মধ্যেও তিনি 'কাণ্ডজ্ঞান' হারাননি। তবু তাঁর শিক্ষা ও চারিত্রশক্তি নিজের প্রবৃত্তির ওপরে নিঃশেষ অধিকার অর্জন করতে পারেনি, বরং দুর্বল বন্য প্রবৃত্তির অধীন হয়ে পড়েছিল। এই আড়ষ্টতার মধ্যে অবনীভূষণের ব্যক্তিত্ব পঙ্গু হয়েছিল। আর ব্যক্তিত্বের বিকাশেই যেমন মানুষের মুক্তি, —ব্যক্তিত্বের জড়তায় তেমনি তার মৃত্যু। অন্যপক্ষে বীরবলের ব্যক্তিত্বে প্রবৃত্তির তাড়না নেই,—তাই প্রবৃত্তিনিরোধের আকাঙ্ক্ষাও সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। জীবনের পথে কেবলই হিশেব করে পা ফেলেন অবনীভূষণ, তবু অনিবার্য পতনের ভয় ঘোচে না;— বীরবলের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে পড়বার ভয় নেই কিছুতেই,—তাই সে স্বভাবত বেহিশেবি।

এই প্রসঙ্গে 'ঝাঁপান খেলা' গল্পে রাধাকৃষ্ণের রূপ-চিত্রটি সাংকেতিক অর্থবহ। রাধাকৃষ্ণের পক্ষে যা লীলা, অক্ষমের পক্ষে তাই তপ্ত জীবন-জ্বালা।

বস্তুত বীরবলের মুক্ত প্রাণের পক্ষে লখিয়ার জীবন-সান্নিধ্য মুক্তির আকর হয়ে উঠেছে,—নীতি-দুর্নীতির প্রসঙ্গ তার নির্বন্ধন পৌরুষের কোনো গোপন কোণেও ছায়া ফেলে না, তাই পাঠকের মনেও এই জিজ্ঞাসা নিরর্থক। মুক্ত জীবনের নিরাবরণ বর্ণনায় কোনো কৃত্রিম বাধার বেড়া স্বীকার করেনি প্রমথ চৌধুরীর মুক্তি-পিপাসু লেখনী। কেবল এই বিশেষ প্রসঙ্গে নয়,—সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব-অবাস্তবের কোনো conventional সীমারেখাও স্বীকার করেনি তাঁর মুমুক্ষু শিল্পি-চেতনা। 'নীললোহিতের গল্প'বলী বা 'ভূতের গল্প' তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অদ্ভুত আজগুবি এই সব গল্পের উৎসও আসলে আকাশকুসুমের বাগানে নয়, প্রমথ চৌধুরীর অদ্ভুত মনোভাবনায়। প্রৌঢ় বয়সে আত্মকথায় তিনি লিখেছিলেন,—"আর আমি একটি বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলুম। একটি বালিকাকে আজও মনে আছে।......পাঁচ বৎসর বয়সে যদি কেউ love-এ পড়ে, তাহলে আমি তার সঙ্গে love-এ পড়েছিলুম।" সেই অসাধারণ love-এ পড়ার প্রসঙ্গ নিয়ে 'নীললোহিতের আদি প্রেম' গল্প। নায়ক নীললোহিতের গাল্পিক স্বভাব বর্ণনা করে লেখক বলেছেন,—"তিনি বাস করতেন কল্পনার জগতে। তাই নীললোহিত যা বলতেন, সে সবই হচ্ছে কল্পলোকের সত্যকথা। তাঁর সুখ, তাঁর আনন্দ, সবই ছিল ঐ কল্পনার রাজ্যে অবাধে বিচরণ করায়।"

এ-শুধু নীললোহিতের পরিচয় নয়,—শিল্পী প্রমথ চৌধুরীরও এই পরিচয়। কল্পলোক তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মনন-কল্পনার জীবন-প্রচ্ছদ। এই মুক্ত জীবনের নির্বন্ধন মুক্তির ধ্যান করেছেন প্রমথ চৌধুরী তাঁর গল্প রচনায়; জীবনের অসংখ্য বিচিত্র দুর্লভ অভিজ্ঞতার জমিতে ফলিয়েছেন মনীষা-প্রোজ্জ্বল সৃষ্টির ফুল। "বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে" ছোটগল্পের প্রাচুর্যের কারণ ব্যক্ত করে তিনি লিখেছিলেন;—"এ-সমাজে যা পাওয়া যায়, এবং সম্ভবত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সে হচ্ছে ছোটগল্পের খোরাক। আমাদের জীবনের রঙ্গভূমি যতই ছোট হোক্ না কেন, তারই মধ্যে হাসিকান্নার অভিনয় নিত্য চলছে, কেননা আমরা আমাদের মনুষ্যত্ব খর্ব করেও নিজেদের মানুষ ছাড়া অপর কোন শ্রেণীর জীবে পরিণত করতে পারিনি। ভয়, আশা, উদ্যম, নৈরাশ্য, ভক্তি, ঘৃণা, মমতা, নিষ্ঠুরতা, ভালবাসা, দ্বেষ, হিংসা, বীরত্ব, কাপুরুষতা, এক কথায় যা নিয়ে মানবজীবন—তা miniature-এ এ-সমাজে সবই মেলে।"[২৩] এই মানবজীবনের ছবিই এঁকেছেন প্রমথ চৌধুরী তার বৈচিত্র্য-প্রচুরতাময় নানা উপাদান নিয়ে; কেবল শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য-ধ্যানী ব্যক্তিত্বের অতন্দ্র মুক্তি-বাসনা রীতি ও মননের অনন্যতায় সেই চিরন্তন জীবন-কথাকেই তুলনাহীন নূতন বিশিষ্টতা দান করেছে, রূপে এবং স্বভাবে।

'আহুতি' গল্পে এই তথ্যের প্রাঞ্জল পরিচয় রয়েছে। Theme-এর দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পের সঙ্গে এর সাদৃশ্য সন্নিকট না হলেও সুদূরবর্তী নয়,—সেই কৃপণ ধনীর যখের হাতে টাকা সঁপে যাবার বীভৎসতা! ধনঞ্জয়, রঙ্গিনী ও রত্নময়ীর চরিত্র-চিত্রণে মনোবিশ্লেষণের একান্ততা সাবলীল ও রসোত্তীর্ণ হয়েছে অবাধে। বরং রুদ্রপুরের ঐতিহ্যচিত্র গল্পটির চেহারায় মহাকাব্যিক উদাত্ততা সংহত করে তুলেছে। এদিক থেকে গল্পের পরিবেশ রবীন্দ্র-গল্পের তুলনায় আরো দৃঢ়;—পাষাণ কঠিন,—স্তব্ধগম্ভীর। কিন্তু এমন গল্পও গালগল্প হল—ছোটগল্প হল না,—কথকতার অতিবিস্তারে। আর বলা-বাহুল্য, এ-টুকু শিল্পীর ইচ্ছাকৃত।

পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আরো সব গল্পের আলোচনা অপরিহার্য নয়; একই অভিজ্ঞতার পুনরুল্লেখ ঘটবে তাতে। কেবল আর এক ধরনের গল্পের কথা স্মরণযোগ্য, যারা গল্পের আধারে প্রবন্ধ। গল্পের theme বা plot কিছুই এতে সুরেখ নয়। 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার স্থলে', 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার জলে' ইত্যাদি এই পর্যায়ের গল্প।

সব কথার শেষে কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়,—বিচিত্রভঙ্গিতে গল্প লিখেছিলেন চৌধুরী মশায় নানা অ-সদৃশ বিষয়বস্তু নিয়ে। কিন্তু তাঁর সকল গল্পেরই আঙ্গিক ও রসপারিণামগত ফলশ্রুতি প্রায় অভিন্ন। অর্থাৎ, কোনো গল্পই পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্প হয়ে উঠতে

২৩। প্রমথ চৌধুরী 'বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্য';—দ্র. 'নানা-কথা'।

পারেনি কেবল একান্ত রূপ-সংহতির অভাবে ;—বস্তুত তাঁর সব গল্পেই ছোটগল্প, প্রবন্ধ বা ব্যক্তিত্বধর্মী রচনা (personal essay) এবং কথিকার রূপ-মিশ্রতা রয়েছে। মনে হয়, শৈলী-সিদ্ধ শিল্পীর আত্মার আকুতি বুঝি ছিল এইরূপ বিমিশ্রণের প্রতি। তাই গল্পের এক দেহে অনেক আঙ্গিকের যৌথমণ্ডনের কলাকৌশলে শিল্পের অভিনব এক রমণীয় মূর্তি গড়ে তোলার 'সাহিত্যিক খেলা' খেলে গেছেন তিনি বাংলা গল্পের ইতিহাসে। এখানেই তাঁর স্বকীয়তা,—তাঁর অনন্যতা-ও।

(খ) প্রমথ চৌধুরীর অনুব্রতী গল্প-শিল্পিগণ

গল্প-রচনার ধারাকে emotion-এর চিরাগত সৃজনভূমি থেকে এনে intellect-এর আলোক-প্রখর কলা-লোকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করলেন,—ছোটগল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে এ-টুকু প্রমথ চৌধুরীর সর্বশ্রেষ্ঠ দান। পূর্ব আলোচনায় লক্ষ্য করে এসেছি, চৌধুরী মশায়ের বিদ্যুৎ-চকিত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতম প্রতিফলন এক-কেন্দ্রিত হয়েছিল গল্প-শরীরের গঠন-পারিপাট্য বিধানের আকাঙ্ক্ষায়। তাঁর সবগল্পই প্রাণবস্তু-নিরপেক্ষ চকিত দেহ-সৌন্দর্যের এক বিদগ্ধতাপূর্ণ লাবণ্য বিচ্ছুরিত করে থাকে,—তাতেই এই গল্প-সমষ্টির গায়ে লেগেছে মননশীল আভিজাত্যের দ্যুতি। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়, গল্পের দ্যুতিময় আঙ্গিক-পরিকল্পনার প্রতি শিল্পীর অবধান সমধিক হলেও প্রমথ চৌধুরীর সৃষ্টিতে জীবন-বিষয়ের অপ্রাচুর্য ছিল না কখনো ;—গল্পের schematic beauty তাঁর চিত্তের মুখ্য আকর্ষণ হলেও, theme-এর প্রাণময় দাবিকেও তিনি অস্বীকার করেননি। বরং তাঁর অপার-বিস্তৃত বিচিত্র জীবন-পরিচয়ের পুঞ্জিত সম্পদকেই সহৃদয় মনের সচেতন অনবধানে ভরা পরিপাটি কলাকৌশলের মাধ্যমে উপস্থিত করেছেন। তা সত্ত্বেও, জীবনীশক্তির প্রচুরতাকে বুদ্ধিদীপ্ত বিন্যাসের অন্তরালে আড়াল করে রাখার intellectual লুকোচুরি খেলাই প্রমথ চৌধুরীর সার্থক 'সাহিত্যে খেলা'। পরবর্তী কালের স্বভাবত-মননশীল কিছু কিছু শিল্পী এই বুদ্ধি-প্রধান রূপ-বিন্যাসের খেলায় সচেতনভাবে আত্মনিয়োগ করে খ্যাতিমান হয়েছেন। বলা বাহুল্য, এঁদের প্রায় সকলেই চৌধুরী মশায়ের মননোজ্জ্বল দুর্লভ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে সমৃদ্ধ-চেতন হয়েছিলেন।

তাই বলে এমন কথা মনে করবার কারণ নেই, প্রমথ-ভক্ত এই সব উত্তরসাধক সকলেই তাঁর রচনার প্রকৃতি বা পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করেছিলেন। বস্তুত অনন্যতুল্য স্বতন্ত্রতাই হচ্ছে প্রতিভার স্বভাবধর্ম। ফলে প্রমথ চৌধুরীর অনুব্রতী হিশেবে বাংলা ছোটগল্পের যে-সব শিল্পী বরণীয়, তাঁরা সকলেই নিজ নিজ স্বভাবের অনুবর্তনে স্বতন্ত্রতাঋদ্ধ গল্প রচনা করেছেন। কেবল প্রমথ চৌধুরীর প্রবর্তিত পথে গল্প-শরীরের পারিপাট্য

বিধানে এঁরা সকলেই সবিশেষ মননশীল—এইটুকুই এই শিল্পিগোষ্ঠীর অন্তর্বর্তী সাধারণ সদৃশতার উপাদান। এ-পথে কারো রচনায় গল্পের theme একেবারে নিরর্থক হয়ে পড়েছে, পরিপাটি scheme-এর বৌদ্ধিক বিন্যাসই হয়েছে একমাত্র উপজীব্য। কেউ-বা গল্পের সংহত জীবনাবেদনকে ছড়িয়ে দিয়েছেন paradoxical কথামালার কথকতাধর্মী বৈঠকী বাগ্‌-বিন্যাসে। আরো-কেউ আবার সংহত গল্পের plot বর্ণনার আধার হিশেবে বেছে নিয়েছেন মিশ্র বিচিত্র রূপাবয়বের কাঠামো। তবু সকলেই গল্প-রচনার ক্ষেত্রে emotion-এর সঙ্গে সমান বা শ্রেষ্ঠতর আসনে বসিয়েছেন intellect-কেও,—theme-এর চেয়ে গল্পের schematic beauty-কেও নিম্নতর আসন দেননি,—এই অর্থেই তাঁরা প্রমথ চৌধুরীর গল্প-শিল্প প্রবণতার অনুব্রতী। এঁদেরই কারো কারো শিল্প-প্রকরণের পরিচয় নেব এবারে।

১। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বাংলা গল্পসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর সচেতন স্বীকৃতিময় অনুসৃতি যাঁদের মধ্যে প্রকট, ধূর্জটিপ্রসাদ (১৮৯৪-১৯৬২) তাঁদের অন্যতম অগ্রণী। 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসের ভূমিকায় শিল্পী লিখেছেন,—"সকলেই জানেন যে আমি বীরবলের শিষ্য, অযোগ্য হলেও শিষ্য।" বলাই বাহুল্য, এটুকু তাঁর সচেতন মনের বিনয়। তাহলেও,—অর্থাৎ, প্রমথ চৌধুরীর এক শ্রেষ্ঠ অনুব্রতী হওয়া সত্ত্বেও, ধূর্জটিপ্রসাদ একান্তভাবেই গুরুর অনুমত ছিলেন না। 'অন্তঃশীলা'র আলোচ্য ভূমিকা এই সত্যই ব্যক্ত করতে চেয়েছে। অন্যপক্ষে যে মননশীলতার প্রেক্ষিতে তাঁর প্রথম যৌবন সমৃদ্ধ ও পরিণত হয়েছিল, তাকে 'সবুজপত্রের দল' নামে পরিচিত করে শিল্পী অন্যত্র লিখেছেন,—"এই দলের গোটাকয়েক সাধারণ মানসিক ধারার উল্লেখ করছি। বুদ্ধিবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, এই দুটোই প্রধান।"[২৪] বস্তুত তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বে এই দুইধারার প্রতিফলনই সুতীব্র।

একই প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন,—"বুদ্ধিবাদ অর্থ (১) চরিত্র-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তির অপেক্ষা বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার, (২) বুদ্ধির পরিচয় তর্কে, (৩) যে তর্কের গোটাকয়েক রীতিনীতি আছে, এবং (৪) যার সাধারণ অস্তিত্বের জন্য আপেক্ষিকতার হাত থেকে, বাস্তবিকতার কবল থেকে, সাময়িকতার কবল থেকে মুক্ত হওয়া যায়।" এই অনাপেক্ষিক বাস্তব-নির্মুক্ত নিরঙ্কুশ বুদ্ধিবাদের অনুবর্তনে রচিত সাহিত্যের গুণ যতই থাক্, তার মূলে অপরিহার্য এক ত্রুটিও এসে পৌঁচেছিল। আশ্চর্য যথার্থদৃষ্টি ও আত্মেষণার সঙ্গে শিল্পী তার পরিচয় দিয়েছেন,—"সবচেয়ে বেশি ছিল জীবন

২৪। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—'নতুন ও পুরাতন'—দ্র. 'বক্তব্য'।

থেকে, বিশেষতঃ সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুতি। বুদ্ধির চর্চায় আমরা বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ি।"[২৫]

'সবুজপত্রের দল'-এর অপরাপর সভ্যের চেয়েও ধূর্জটিপ্রসাদ সম্বন্ধে এ-মন্তব্যের সত্যতা সমধিক; আর এখানেই গুরুর গল্প-শৈলীর সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য। প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্পকে নিছক intellectual বল্‌বার উপায় নেই। জীবনের অপার-বিচিত্র অভিজ্ঞতাময় সহৃদয় জীবনানুভবের ওপরে বুদ্ধির দীপ্ত-মার্জিত স্মিত আলোক প্রতিফলিত করেছেন তিনি। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের অভিজ্ঞতা ছিল সীমিত,—তাঁর নিজেরই ভাষায় 'বাস্তবতার কবল থেকে মুক্ত', 'জীবন থেকে—সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুত'। যথার্থ অর্থে তাঁর চেতনা এক অনপেক্ষিত বিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবীর। তাই বলে তাঁর গল্পসাহিত্য বা ব্যক্তি-অনুভবকে নির্জীবন বলবার উপায় নেই। কারণ মানুষ সামাজিক জীব,—ঠিক্ যে অর্থে মাছ জলজীবী। অতএব সমাজের বিশেষ জীবন-প্রেক্ষিতে পরিবর্ধিত হয়ে, তার প্রভাব থেকে মুক্ত হবার উপায় কারো নেই। সীমিত এমন কি অনভিপ্রেতও যদি হয়, তবু ধূর্জটিপ্রসাদের অভিজ্ঞতার গণ্ডিতেও জীবনের ভাব-বেদ্য অস্তিত্ব (emotional entity) সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল না। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর গল্পে জীবনায়নের যে পার্থক্য, তা প্রধানতঃ তাঁদের দু'জনের অন্তর্লীন attitude বা মনোভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত। অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরীর গল্পের প্লট-এ সহানুভূতি-স্নিগ্ধ জীবন-অভিজ্ঞতার অবতারণা ঘটেছে তার স্বতন্ত্র মূল্যে,—প্রসঙ্গতঃ সেই অভিজ্ঞতার শরীরে শিল্পীর স্বভাব-সিদ্ধ বৌদ্ধিকতার দীপ্তি প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের লেখনীতে প্লট্-এর ভূমিকা বুদ্ধির আলোক-প্রতিফলনের মাধ্যম হিশেবে;—তাঁর গল্পের লক্ষ্য বুদ্ধিবাদের অবাধ মুক্তি,—প্লট্ কেবল তার উপলক্ষ্য। আর তাঁর ভাব-সচেতনার কাছে সে প্লট্-এর মূল্য কেবল গল্প-দেহ সৃষ্টির একটি আবশ্যিক আঙ্গিক হিশেবে, এর চেয়ে বেশি কোনো জীবন-মূল্য তার নেই। এই সত্যের ঘোষণাতেও শিল্পী সর্বদাই অকুণ্ঠ মুখর।

'রিয়ালিষ্ট' গল্পের মুখবন্ধে তার অনাবৃত প্রকাশ,—"প্রবাসের কোন একটি আড্ডায় আমরা কখনো কখনো সাহিত্য আলোচনার বদলে সাহিত্য-রচনা করতাম। অবশ্য লিখে নয়, মুখে মুখে। আমাদের মধ্যে প্রবীণ রসিক পুরুষটি তিন-চারটি সংজ্ঞা ঠিক্ করে দিতেন, তাদের আশ্রয় করেই গল্প পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি করতে হত। সেদিন ছিল আমার পালা—সংজ্ঞা ছিল রিয়ালিষ্ট, বন্ধ্যা, হিংসা ও পলায়ন। ঠিক্ পর পর কি বলেছিলাম মনে নেই, তবে এই ধরনেরই স্মরণ হচ্ছে। মুখবন্ধ করেছিলাম এই প্রকারে;—

'যাঁরা গল্প রচনা করেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রাণপণে প্রমাণ করতে চান যে গল্পটি

২৫। তদেব।

গল্প নয়, নিছক সত্যিঘটনা। তাদের চেষ্টা সফল হয় না, যদি বা হয় তাহলে সত্য ঘটনার বিবৃতি, অর্থাৎ ইতিহাসের মত গল্পটি নীরস হয়ে পড়ে। তার চেয়ে গোড়াতেই স্বীকার করা ভাল যে, এ গল্পটি কাল্পনিক এবং অস্বাভাবিক ঘটনারই সমাবেশ। যা বরাত দিয়েছেন, তাতে মামুলি গল্প চলে না। পৃথিবীতে রিয়ালিষ্ট বলে কোনো মানুষ নেই, হতে পারে না, হতে চেষ্টা করে'।"

শরৎচন্দ্র নাকি গল্প-শিল্পকে বলেছিলেন 'মিছে কথা বলার আর্ট'। ধূর্জটিপ্রসাদের ওপরের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, যে-কোনো রকমের মিছে বা বানানো কথাকে আর্টিষ্টিক্ শরীরের আধারে বিন্যস্ত করতে পারাতেই, তাঁর নিজের প্রকরণ মতে, গল্প-শৈলীর যথার্থ সার্থকতা। অন্যপক্ষে যে প্রেক্ষাপরিবেশে তাঁর গল্প-সৃজনের প্রেরণার উদ্ভব, তাতে এই রচনা-পদ্ধতিকে বুদ্ধির খেলা নামেই অভিহিত করা যেতে পারে। সাধারণভাবে সৃষ্টির উৎস স্রষ্টার অন্তঃকরণে স্বতঃস্ফূর্ত বলেই মনে করা হয়। বহিরাগত নির্দেশ বা উপদেশ সেই স্বতঃস্ফূর্তির অন্তরায় বলে অনুভূত হয়ে থাকে। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের ক্ষেত্রে কয়েকটি সংযোগহীন শব্দের, অথবা একটি-দু'টি গতিরেখাহীন কথার মধ্য দিয়ে সংযোগের সেতু, অথবা পথের স্পষ্ট রেখা টেনে talent ও intellect-কে খেলিয়ে খেলিয়ে কোনো এক পরিসমাপ্তির মুখে এসে পৌঁছে যাওয়াই রচনা-শৈলীর মৌল বৈশিষ্ট্য।

ওপরের উদ্ধৃতিটুকু ধূর্জটিপ্রসাদের পক্ষে আজগুবি গল্পের অসম্ভব মুখবন্ধ বলে মনে করবার উপায় নেই। তথ্য সন্ধান করলে দেখা যাবে, তাঁর গল্পরচনা এই ধরনের ইন্টেলেকচুয়াল এক্সারসাইজ-এর পটভূমি ও প্রক্রিয়ার ভিত্তি ভেদ করেই উদ্ভূত হয়েছে। 'রিয়ালিষ্ট' গ্রন্থের 'একদা তুমি প্রিয়ে' গল্পটি লেখকের প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর বলে অনুমিত হয়ে থাকে। অথচ এ-গল্পটি তিনি প্রথমে মুখে মুখে গড়ে তুলেছিলেন ;— রবীন্দ্রনাথের কবিতার কোনো এক ছত্র নিয়ে একটি গল্প গড়ে তোলা যায় কিনা, তারই experiment করবার চেষ্টায়।[২৬] গল্প-শেষের ভাষায়, গল্পের theme হচ্ছে,—"সংগীত সমালোচনা।" অর্থাৎ,—"একদা তুমি প্রিয়ে আমারি তরুমূলে

বসেছ ফুল সাজে

সে কথা গেছ ভুলে।"

এই গানটি কোন্ পরিবেশে কোন্ বিশেষ ব্যক্তির কণ্ঠে সবচেয়ে সার্থক, স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত হতে পারত, তারই বুদ্ধি-বিচারময় অনুসন্ধান রয়েছে সারা গল্পের প্লট-এ। সে প্লট আবার দুই বন্ধুর কথোপকথন ও বিতর্কের আকারে গঠিত। অর্থাৎ গল্পের দেহে রয়েছে প্রমথ-শৈলীর সেই রূপ-মিশ্রতার স্বভাব,—কিছু কাহিনী, কিছু তর্ক, কিছু সংলাপ, কিছু-

২৬। এ তথ্যটুকু শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দান।

বা কথোপকথন ও বর্ণনার মাধ্যমে বুদ্ধিধর্মী বিচার-আলোচনা। পূর্বে দেখেছি, গল্পের একতম শরীরে অনেক আঙ্গিকের সংকেতকে সংমিশ্রিত করায় প্রমথ চৌধুরীর শিল্পী-আত্মার ছিল এক বিশেষ পরিতৃপ্তি। গল্প রচনার কালে নিজের শিষ্য ও স্নেহাস্পদদেরও তিনি এই বিমিশ্র রূপাঙ্গিকের বিন্যাস-বিষয়ে উৎসাহিত করতেন।[২৭] আর অন্তত এই বিশেষক্ষেত্রে গুরুর প্রভাব ধূর্জটিপ্রসাদের মধ্যে তাঁর নিজস্ব প্রকৃতির অনুমতে দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। ফলে তাঁর সব গল্পেই রূপের এক্স্পেরিমেণ্ট, বুদ্ধির সচেতন খেয়াল-খেলা; এবং গল্পের প্লট-এ বিচিত্র আঙ্গিক-মিশ্রণের প্রয়াস! তাছাড়া তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়েছে প্লট্-এর মধ্যে বিশেষ আবেগময় কোনো জীবন-মূল্যের সচেতন অস্বীকৃতিতে। 'একদা তুমি প্রিয়ে' গল্পেরও শুরু হয়েছে সেই অস্বীকৃতি এবং রূপময় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংকেত নিয়ে,—

"ছোট্ট নদীর ধার, আনিকাটের ফাটক খোলা হয়েছে বলে জলের ওপর একটা প্রশস্ত কাদার পাড় পড়েছে। সেই কাদার গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে। নদী-কিনারের সরকারী রাস্তার একধারে ঝাউগাছের সার, অন্যধারে জলরেখার কিছু ওপরে কাশের বন। দীর্ঘ ঝাউগাছের গথিক উচ্চাভিলাষ, কাশগুচ্ছের সাদি-ক্রীড়ারত অশ্বারোহীর শিরস্ত্রাণের পক্ষ-কম্পন এবং গোধূলির মন্দির অভ্যন্তরস্থ অস্পষ্টতা মনকে যেমন কল্পলোকের দিকে নিয়ে যায়, তেমনি পেট্রলের ও কাদার গন্ধ, মোটরের হুঙ্কার ও ধূলাকেতুর পুচ্ছ-সম্মার্জন বর্তমান সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের মনকে নিষ্ঠুরভাবে সচেতন করে তোলে। এ বেষ্টনীতে, প্রেমের গল্প বলতে হলে ভ্রমণরত কোনো বন্ধুযুগলকে গাছের তলায় বসতে হয়।"

কেবল এই কারণেই শিল্পী তাঁর গল্পের প্রচ্ছদ হিশেবে দেওদার-ত্রিবেণীর অবতারণা করেছেন!—"তিনটি দেওদার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, মধ্যবিত্তের নিমন্ত্রণ-বাড়িতে বড়লোক কুটুম্বিনীর মতন। বন্ধুযুগল দেওদার তলায় বসে পড়লেন। একজন বললেন, 'এ যেন সেই ছবির 'তিন বোন'—এঁরা তিনজনে এক হয়ে আছেন। গল্প করতে ইচ্ছা হচ্ছে শোন'।"

এখানে বিন্যাসের এক অদ্ভুত অভিনবত্ব লক্ষ্য করার মত। দেওদার গাছের বিশেষ প্রেক্ষিত-এর প্রভাবেই কেবল বন্ধুযুগলের একজনের "গল্প করতে ইচ্ছে" হয়নি। লেখকের উদ্দেশ্য, তিনি একটি প্রেমের গল্প ফাঁদবেন প্রথম-উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের পটভূমিতে। আর তার প্রয়োজনে "ভ্রমণরত কোনো বন্ধুযুগলকে গাছের তলায় বসতে হয়।" কেবলমাত্র এই কারণেই গল্পে দেওদার-ত্রয়ীর সন্নিবেশ, এবং সেই গাছের তলায় বসে একবন্ধুর গল্প বলবার ইচ্ছা।

২৭। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে নানা তথ্য জানিয়ে উপকৃত করেছেন।

সকল সার্থক সৃষ্টিরই ভিত্তি হচ্ছে প্রকাশের ঔচিত্য-বোধ ;—যথোচিত প্রেক্ষিতে সমুচিত ঘটনার প্রক্ষেপ ঘটিয়ে, তবেই শিল্পী তাঁর গল্পকে বিশ্বাসযোগ্য এবং হৃদয়গ্রাহী করে তোলেন। কিন্তু শিল্পীর এই কলাকৌশলের যথার্থ সফলতা তাঁর আত্মগোপন ক্ষমতায়। অর্থাৎ যাদুকর যেমন হস্ত-পদ চালনার কৌশলে মিথ্যার মধ্যে সত্যের বিভ্রম রচনা করেন, তেমনি শিল্পীও তাঁর হাতের প্রেক্ষিত-রচনা ও আরো নানা আনুষঙ্গিক হৃদ্গত উপাদানের মাধ্যমে এক রসস্নিগ্ধ মায়াজগৎ সৃষ্টি করেন,—যেখানে উপস্থিত হতে পারলে সহজেই মনে হয়,—"এ অনুভব পরের হয়েও যেন পরের নয় ;—আমার নয়, তবু বুঝি আমার।" কিন্তু যেমন যাদুকরের বেলায় তেমনি স্রষ্টার ক্ষেত্রেও মায়াজগৎ রচনার কৌশলযুক্ত এই অন্তরঙ্গ উপাদানসমূহ সাধারণ পাঠকের সম্মুখে প্রকট হয়ে পড়লে গল্পের জীবনাবেদন ফিকে,—এমন কি নিরর্থক হয়ে পড়ে।

ওপরের গল্প-পরিস্থিতি বর্ণনায় ধূর্জটিপ্রসাদ সেই অঘটনই ঘটিয়েছেন, এবং তা ইচ্ছে করেই! তাঁর গল্প রচনার উদ্দেশ্য সংশ্লেষমূলক বা synthetic নয়,—বিশ্লেষণমূলক, তথা analytic. গল্প বলার মধ্য দিয়ে তিনি একটি জীবন-রসঘনিষ্ঠ অনুভবের স্বাদ নিবিড় করে তুলতে চান না ; বরং গল্প-রচনার গোপন হাতিয়ারগুলোর কার্য-কারণাত্মক মূল্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখাতে চান ;—সৌন্দর্য সম্ভোগের চেয়ে বোটানিস্ট্-এর অঙ্গচ্ছেদী এষণার প্রতি তাঁর ঝোঁক প্রবল। এই ধরনের শৈলীর আরও এক উদ্দেশ্য রয়েছে ;—গল্প যে গল্পই, অর্থাৎ বানানো কথা,—গল্পাঙ্গিকের অন্তর বিচ্ছিন্ন করে এই সত্যটিকে নির্মোহ প্রতিষ্ঠা দানে শিল্পি-হৃদয়ের যেন এক নিষ্ঠুর পরিতৃপ্তি রয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদ একান্তভাবে বুদ্ধিজীবী, প্রবন্ধই তাঁর আত্মমুক্তির সহজ আধার। অতএব গল্পের আবেগময় ললিতকলার প্রতি উপেক্ষা না হলেও তাঁর মনের রয়েছে এক করুণাবোধ। ফলে তাঁর শৈলীর বৈশিষ্ট্য গল্প-রস নিবিড় করে তোলা নয়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, "গল্পের convention-এর প্রতি বিদ্রূপ ও তাহার কলকব্জার রহস্যোদ্ঘাটন।"[২৮] দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার সংশয়-রহিত পরিচয় রয়েছে তাঁর যে-কোনো গল্পে। প্রথমোক্ত মনোভাবের চরম অভিব্যক্তি দেখতে পাই 'রিয়ালিষ্ট্'-ই। গল্পের নায়কের নাম রেখেছেন শিল্পী 'ক-বাবু'। অর্থাৎ এ-গল্প কোনো ব্যক্তি-জীবনের নয়,—একটি hypothetical algebric figure-এর মাধ্যমে লেখক তাঁর মনের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গরসিকতাকে কেবল মুক্তি দিয়েছেন,—গল্পের এই ফলশ্রুতি নায়কের নামকরণের মধ্যেই প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। গল্পের অভ্যন্তরে ক-বাবুর যক্ষ্মা রোগগ্রস্তা পত্নীর ঈর্ষার আতিশয্য-চিত্রণে সেই ব্যঙ্গরস আশ্চর্য সফলতা পেয়েছে।

তাছাড়া ধূর্জটিপ্রসাদের গল্পের আর এক অনন্যতা তাঁর ভাষা-রীতিতে। বীরবলী

২৮। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ৪র্থ সং।

স্টাইল-এর শ্রদ্ধান্বিত অনুবর্তী শিল্পী এই ভাষার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন অতিশয় 'সচেতন' বলে।[২৯] ধূর্জটিপ্রসাদের সকল রচনাতেই স্টাইল্-এর এই অতি-সচেতনতা তাঁর দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। ফলে গল্পের মধ্যে সূচিত হয়েছে এক প্রসঙ্গাতিরিক্ত কথার আড়ম্বর,—ওপরে উদ্ধৃত 'একদা তুমি প্রিয়ে' গল্পের প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদটি শিল্পীর এই স্বভাবসিদ্ধ স্টাইল্-এর এক সার্থক নিদর্শন। কথার সুপরিকল্পিত আতিশয্য ও আড়ম্বর গল্প-রসের সংহতিকে ছড়িয়ে বিচ্ছিন্ন বিস্তারিত করেছে প্রায়ই। 'রিয়ালিষ্ট্' গল্পের ক-বাবু ও মনোরমার প্রণয়-কথার স্বাদ-বিনষ্টি এর এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এ-গল্পের প্রধান প্রচ্ছদ বেরিলিতে ক-বাবুর এক বন্ধুর বাড়িতে। ভাওয়ালি থেকে ফেরবার মুখে ভয়াবহ অবস্থার তাড়নায় স্ত্রীকে নিয়ে ক-বাবুর এখানে এসেই উঠ্‌তে হয়,—এখানেই হয় তার দেহান্ত। মনোরমা ছিলেন ক-বাবুর সেই বিপত্নীক বন্ধুর 'পত্নীর বোন'।

সে যাই হোক্, একটি রহস্য-তীব্র প্রণয়-কথার রসহানি ঘটায় ধূর্জটিপ্রসাদের মনে কোনো ক্ষুণ্ণতা নেই। কারণ বারে বারে দেখেছি, প্লট-এর নিবিড়তার প্রতি তাঁর কোনো মমতা ত ছিলই না, বরং ছিল সুগভীর উপেক্ষা। গল্পাঙ্গিকের ভিত্তি সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণাই 'একদা তুমি প্রিয়ে' গল্পের প্রথম বন্ধুর মুখে প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে করি। দ্বিতীয় বন্ধু যখন অনেক বিতর্ক-কথোপকথনের পরে বলল, "এবার গল্প শুরু হোক্।" প্রথমজন তখন জবাব দিয়েছিল, "গল্পের প্রয়োজন নেই। এই তিনটি চরিত্রের [দুই বন্ধু ও দ্বিতীয় বন্ধুর কল্পিত স্ত্রী] ঘাত-প্রতিঘাতেই গল্প তৈরি হবে। গল্পের অন্য অস্তিত্ব আছে নাকি ?"

চরিত্র রচনাই ধূর্জটিপ্রসাদের গল্পের মুখ্য আকাঙ্ক্ষা ; আর আগে দেখেছি চরিত্র অর্থ তাঁর নিজের দৃষ্টিতে—"(১) চরিত্র-শক্তি, ইচ্ছা-শক্তির অপেক্ষা বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার, (২) বুদ্ধির পরিচয় তর্কে, (৩) যে তর্কের গোটা কয়েক রীতিনীতি আছে, এবং (৪) যার সাধারণ অস্তিত্বের জন্য আপেক্ষিকতার হাত থেকে, বাস্তবিকতার কবল্ থেকে, সাময়িকতার কবল থেকে মুক্ত হওয়া যায়।" ফলে তাঁর গল্পে আছে রূপায়ণের অজস্র সন্ধানী এক্‌সপেরিমেন্ট, গল্পের এক দেহে অনেক আঙ্গিকের বিমিশ্রতা, চরিত্র বিস্তারের উপলক্ষ্যে গল্পের পরিবেশ ও বাস্তব প্রসঙ্গ-রহিত বিতর্কের অবতারণা, প্লট্-এর নামমাত্র আধারে তর্ক-বিশ্লেষণ-প্রধান প্রবন্ধ শৈলীর প্রয়োগ।—এক কথায় তাঁর গল্প রচনা আসলে গল্প লেখার শিল্প-খেলা।

২৯। দ্রষ্টব্য—ভূমিকা, 'অন্তঃশীলা'।

২। সতীশচন্দ্র ঘটক

'সবুজপত্র'-গোষ্ঠীর এক বিশ্বস্ত লেখক হিশেবে সতীশচন্দ্র ঘটক (১৮৮৫-১৯৩২) অবশ্য স্মরণীয়। কবিতা, লঘু-গুরু প্রবন্ধ, নাটিকা ও গল্প রচনার বিচিত্র ধারায় ইনি লেখনী চালনা করেছিলেন। রঙ্গ-ব্যঙ্গ নামক গদ্য-পদ্য রস-রচনার সংকলন (১৩২২ বাংলা সাল) প্রকাশিত হবার পর প্রমথ চৌধুরী মশায় 'সবুজপত্রে' এঁর রচনাভঙ্গির যথেষ্ট প্রশংসা করেন। কিন্তু সৃষ্টির প্রকরণে সহাস রচনার ক্ষেত্রেও সতীশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গেই নিবিড়তর। 'রঙ্গ-ব্যঙ্গ' গ্রন্থটি দ্বিজেন্দ্রলালের নামে উৎসর্গ করে লেখক তাঁর শিল্পি-আত্মার উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন। 'ঝলক' (১৯২৩) ও 'লালিকাগুচ্ছ' (১৯৩০) নামক কবিতা পুস্তক দু'টিতেও দ্বিজেন্দ্রলালের সহাস কবিতার পুনরাবর্তনই বিশেষভাবে চোখে পড়ে। ছোটগল্পের সৃজনভূমিতে সতীশচন্দ্র অপেক্ষাকৃত গুরুগম্ভীর, কিন্তু সেখানেও প্রমথ-ভাবনার পরিচয় সুলক্ষ্য নয়। বরং জীবনের প্রভাতলগ্নে তিনি যে ভবানীপুর সাহিত্য সমিতির এক ঘনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন, তাঁর গল্পগুলি পড়তে পড়তে এ-কথা নতুন করে বারবার মনে পড়ে।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা প্রসঙ্গে লক্ষ্য করেছি, স্বয়ং উপেন্দ্রনাথ ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই সাহিত্য সমিতির সম্পাদক,—আর প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল কয়েকটি সাহিত্য-প্রিয় কিশোর ও তরুণের স্বতন্ত্র রস-চিন্তনের সহায়তা। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বর্ণনা থেকেই জানা যায়,—নিতান্ত অন্তরঙ্গ, সমপ্রাণ কয়েকটি সীমিত সংখ্যক কিশোর রসপিপাসুকে নিয়ে এ-সমিতি গঠিত হয়েছিল।[৩০] উদীয়মানতার সেই প্রথম ক্ষণে এদের মিলনের মূলে সাহিত্য-প্রকৃতিরও এক মৌলিক সমধর্মিতা ছিল, এমন সিদ্ধান্ত কতদূর যুক্তি-সঙ্গত বলা কঠিন। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ ও সৌরীন্দ্রমোহনের গল্প-স্বভাবের কথাই বারবার মনে পড়ে সতীশচন্দ্রের গল্প পড়বার সময়েও। উপেন্দ্রনাথের মত 'গল্পের জন্যই গল্প',—সতীশচন্দ্রের সৃষ্টির 'motto' ছিল না। কিন্তু যে-কোনো উপলক্ষ্যে গল্প বলে একটি নাতিগভীর সহজ সেন্টি-মেন্টাল মুহূর্ত গড়ে তোলার প্রতিই যেন তাঁর প্রধান ঝোঁক ছিল। তাই, 'দাঁড়কাক', 'তিনপাখী', 'তুক্' বা 'ডাংপিটে' থেকে শুরু করে 'সতীর জেদ,' 'মাতৃহীন' ইত্যাদি লঘু-গুরু যে-কোনো বিষয়ই অনায়াসে তাঁর গল্পের বিষয় হতে পেরেছে। অধিকাংশ গল্পই প্রকরণের দিক্ থেকে এক নাতিউজ্জ্বল স্বতঃস্ফূর্তির সহজ রসে মণ্ডিত। গল্প-রচনার পেছনে শিল্পীর মনের কোনো serious attitude ছিল না। 'সতীর জেদ'

৩০। দ্রষ্টব্য—'উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়'—'স্মৃতিকথা' ২য় পর্ব।

(১৯২৪) গল্প সংকলনের 'নিবেদন'-এ তাঁর নিজের মুখের স্বীকৃতিই রয়েছে এ-বিষয়ে, —"'নেই কাজ খই ভাজ'—এমনি ভাবেই গল্পগুলি লেখা হয়েছিল।" ফলে সিরিয়াস্ গল্পগুলিও যথেষ্ট সিরিয়াস্ হতে পারেনি,—সহাস গল্পগুচ্ছ যথেষ্ট লঘু হতে পারলেও প্রকরণের দিক্ থেকে সুচিন্তিত পরিমার্জন বা বৌদ্ধিক সূক্ষ্মতা আয়ত্ত করতে পারেনি, প্রমথ-পরিমণ্ডলের যা ছিল অপরিচ্ছেদ্য উপাদান। যদিও লেখক বলেছেন তাঁর "দুয়েকটি গল্পের ছাটকাট" প্রমথ চৌধুরী মহাশয় "আগ্রহের সঙ্গে দেখে দিয়েছিলেন।"

ফল কথা, কি হাসির গল্প, কি সিরিয়াস গল্প, সর্বত্রই অনপেক্ষিত-চিন্তনে সহজ স্বতঃস্ফূর্ত গল্প জমিয়ে তোলার দিকেই ছিল লেখকের প্রধান ঝোঁক। হাসির গল্পে সিচুয়েশন্-এর সরস নিষেক ধাপে ধাপে চড়িয়ে বাড়িয়ে দিয়ে চরম মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত চটকে হাস্যরসকে জমাট স্তূপীকৃত করে তোলা হয়েছে। 'ঘোমটা' এই শ্রেণীর একটি উৎকৃষ্ট গল্প। অন্যপক্ষে, সিরিয়াস গল্পে যে-কোনো ক্ষীণতম কাহিনীকে সুলভ সেন্টিমেন্ট্-এ জমিয়ে তোলার দিকে শিল্পীর একান্ত ঝোঁক। ফলে, কোনো কোনো সময় গল্পে প্লট্-এর ভাগ যেন শূন্য হয়ে গেছে,—অনেক সময় হয়েছে অস্পষ্ট। তাতে গল্প ধরেছে নিছক সেন্টিমেন্ট্যাল কথিকা-র আকার। দৃষ্টান্ত হিশেবে 'মাতৃহীন', 'অবুঝব্যথা', 'ফাঁকা' বা 'ভিনপাখী'-র মত গল্পের কথা উল্লেখ করা চলে। আকারে অতি হ্রস্ব বলে সতীশচন্দ্রের রচনার নিদর্শন হিশেবে 'ফাঁকা' গল্পের কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে!—

"বাড়ির উঠানে একটা মস্ত জাম গাছ ছিল। জাম সে বছর বছর দিত না —তবু তার বয়স পঞ্চাশ বছর। জন্মে অবধি তাকে দেখ্‌ছি। শুনেছি সে বাবার নিজের হাতে পোঁতা। আমার বেশ মনে আছে, পেরেক ফুট্‌বে বলে বাবা তার গায়ে বাড়ির নম্বর-আলা টিনের চাকৃতি মারতে দেননি।

কতজনে তার কত নিন্দা করতে লাগল। কেউ এসে বললে, 'জামগাছের হাওয়া ভাল নয়', কেউ বললে, 'এই জন্যেই তোমাদের বাড়ির অসুখ ছাড়ায় না,' কেউ বললে, 'তা না হোক্, বাড়িটাকে আওতা করে রেখেছে,' কেউ বললে, 'রাত্রে মাথা ঠুকে যাওয়া সম্ভব,' কেউ বললে, 'জামের ডাল বড় পল্‌কা—ছেলেপিলে পড়ে যায়', কেউ বললে, 'কাট্‌লে অনেক তক্তা বেরোবে—বাড়ি মেরামত করচ কাজে লাগবে'।

দশের কথায় কান ভারি হল—তবলদার ডেকে আনলুম। তারা এসেই কোপ জুড়ে দিলে।"

নিতান্ত সাদা-সিধে, সাধারণ এ বর্ণনা ও বিন্যাসের ভঙ্গী। কিন্তু প্রথম-দেখতে যত সোজা মনে হয়, আসলে কিন্তু তেমন বৈশিষ্ট্য-হীন নয়। জামগাছটির অস্তিত্ব তার জামগাছ হওয়ার মধ্যেই নয়,—তার প্রাচীনতাতেও না। বক্তার পিতার মমতার ঐতিহ্যকে সে সর্বাঙ্গে ধারণ করে আছে অদৃশ্য বিভূতির মত। গাছের গায়ে পেরেকের আঁচড়টি লাগতে দিতেও তিনি নারাজ ছিলেন! মানুষের চোখ যেখানে বৈষয়িক প্রয়োজন আর লাভের তুলাদণ্ডে জীবনের মান নির্ণয় করে, সেখানে জামগাছটি মূল্যহীন,—বয়স তার পঞ্চাশ বছর,—কি বছর ফলও ধরত না তাতে! কিন্তু কাঞ্চনাতিরিক্ত মূল্য যদি কিছু থাকে জীবনের,—তাহলে পিতৃহৃদয়ের মমতার উত্তাপে সন্তানের কাছে সে জামগাছ অমূল্য। কিন্তু প্রাণের নিরিখ চোখে-দেখা জীবনবোধের কাছে দুর্বোধ্য ধোঁয়াটে,—বরং পুরানো বাড়ি সারাতে নতুন কাঠের প্রয়োজন-সিদ্ধির লোভ দুর্নিরোধ্য হতে বাধ্য। জীবনের বৈষয়িক পটভূমিতে উৎপাদনী কাঞ্চনমূল্যের সঙ্গে আপাতবন্ধ্যা প্রাণ-মূল্যের এই সংঘাত! প্রাণের পরাভব-মুহূর্তকে নিজ ভাবালু মনের আনুগত্যে সুরভিত করে গল্পের পরিণাম-লগ্নে শিল্পী উড়িয়েছেন তার বিজয়কেতন। আর সারা গল্পে চলেছে তার সুবিন্যস্ত প্রস্তুতি। গাছটির প্রতি বক্তার পিতার প্রীতিকে উচ্ছ্বসিত বর্ণনায় স্ফীত করে তুলেননি লেখক,—কেবল তিনটি মাত্র সুপরিমিত পরিবেশোচিত তথ্য বিন্যাস করেই সেই অনির্বচনীয় জীবন-মূল্যকে সার্থক ব্যঞ্জনা দিতে পেরেছেন—(১) "জন্মে অবধি তাকে দেখ্‌ছি!" (২) "শুনেছি সে বাবার নিজের হাতের পোঁতা।" এবং (৩) "আমার বেশ মনে আছে, পেরেক ফুট্‌বে বলে বাবা তার গায়ে বাড়ির নম্বর-আলা টিনের চাক্‌তি মারতে দেননি।" তিনটি উক্তি যেন দ্রুতগতিশীল এক নাটকের তিনটি অঙ্ক,—ধাপে ধাপে চরম কথায় পৌঁছে দেয় climax-এর চরম মুহূর্তে।

একই-কথা বলা যেতে পারে গাছটি কাটবার পেছনে দশজনের দশকথার প্রেরণা ও পরিণতি বর্ণনার প্রসঙ্গে। গাছটিকে নির্মূল করার পক্ষে এবং টিকতে দেবার বিপক্ষে নানা জনে নানা কথা বলছিলেন,—কিন্তু যে কথায় বক্তার সত্যিই "কান ভারি হল",—সে হচ্ছে,—"কাটলে অনেক তক্তা বেরোবে, বাড়ি মেরামত করার কাজে লাগবে।" এখানেও চরম কথাটি চরম মুহূর্তেই বলা হয়েছে,—আর সে মুহূর্তটিকে অনায়াসে হলেও সুবিন্যস্ত প্রাঞ্জলতায় পরিস্ফুট করতে পেরেছেন শিল্পী। এই পরিমিতিবোধ ও পরিবেশচেতনার আয়াসহীন পরিচ্ছন্নতাই সতীশচন্দ্রকে প্রমথ চৌধুরীর আন্তরিকতা-ধন্য করেছিল বলে বিশ্বাস করি।

তথ্য-বিন্যাসের অনপেক্ষিত পরিমাণবৃদ্ধি তির্যক না হয়েও সংক্ষিপ্তির সঙ্গে অনাবৃত

প্রাঞ্জলতার বৈশিষ্ট্যকে অনুস্যূত করতে পেরেছিল সতীশচন্দ্রের রচনায়। 'মুখরক্ষা' গল্পের শুরুতেই তার সুন্দর নিদর্শন রয়েছে :—"ভয়ঙ্কর গোলমাল! সন্ধ্যার পর থেকেই সদর দরজার উপর থেকে সানাইয়ের চীৎকার এবং এঁটোপাতা নিয়ে কুকুরদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপে গুটিকয়েক ভট্‌চায্যি নস্যি নাকে টিপে শাস্ত্রের কচকচানি জুড়ে দিয়েছেন, এবং বাড়ির মধ্যে মেয়েরা কুট্‌নোকোটা এবং ছেলেদের দুটো খাইয়ে দেবার তালে হুলস্থুল বাঁধিয়ে দিয়েছেন।"

এই বর্ণনাকে বাঁকা কথার ঘোরালো রসিকতা বলবার উপায় নেই,—বরং বিবাহোৎসব-মুখরিত সচ্ছল গৃহস্থ সংসারের এ-যেন এক স্বভাব-বর্ণনা। তাতে চণ্ডীমণ্ডপের ভট্‌চায্যি মশায়রা এবং বাড়ির ভেতরকার মেয়েদের আচরণের একটি করে type-চিত্র এক-একটি অসমাপ্ত বাক্যে যেন পূর্ণ আকৃতি ধরেছে। তাতেও শেষ নয়,—চিত্রধর্মকে সংক্ষেপে সমাপ্ত করতে পারার কৌশলে কৌতুকের মৃদু সরসতাও সহাস করেছে এই বর্ণনাংশটিকে।

এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে ভাবতে হয়, সতীশচন্দ্রের পক্ষে এ কলা-কৌশল ছিল তাঁর সহজ স্বভাবের অঙ্গ। অন্যপক্ষে প্রমথ চৌধুরীর রচনাশৈলী আসলে তাঁর দুর্লভ মননশক্তির রুচিসূক্ষ্ম কর্ষণের ফল। সতীশচন্দ্রের রচনায় মননের চেয়ে আবেগধর্মী মনের খেলার বিস্তার ও বৈচিত্র্য বেশি। তাঁর সৃষ্টির প্রকরণে সহজ পরিমিতি-বোধ রয়েছে,—কিন্তু অভিজাত চিন্তার সুকল্পিত পরিমার্জনা নেই। এই স্বভাব-সৃষ্টির নাতিগভীর সৌন্দর্য উপেন্দ্রনাথ ও সৌরীন্দ্রমোহনকে বারবার স্মরণীয় করে তোলে। আর যথাপরিমিতি ও যথৌচিত্যবুদ্ধির যে স্বতঃস্ফূর্তি ছিল শিল্পীর সহজ ভূষণ, তারই বিশিষ্টতায় 'সবুজপত্রে'র বিদগ্ধ পরিমণ্ডলে সতীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সুচিরস্থায়ী।

'সতীর জেদ' ছাড়া আরো একটি গল্প সংকলন এঁর প্রকাশিত হয়েছিল 'দুই চিঠি' নামে,—প্রকাশকাল ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ।

৩। কিরণশঙ্কর রায়

বাংলা তথা বৃহত্তর ভারতের কংগ্রেসী রাজনীতির ইতিহাসে কিরণশঙ্কর রায় (১৮৯১-১৯৪৯) এক স্মরণীয় নাম। স্বদেশী সংগ্রামের সাধন-ভূমিতে তাঁর সার্থকতার স্বাক্ষর দিকে দিকে। দেশবন্ধুর আসিস্‌-পূত স্বরাজ্যদলের শ্রেষ্ঠ-পঞ্চকের (Big Five) অন্যতম,—স্বাধীন ভারতে আমৃত্যু পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিরণশঙ্করের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও আত্মদানের মহিমা তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননায়কের মর্যাদায় ভূষিত করেছিল। বিস্ময়ের কথা, যে-হাতে তিনি সর্বজয়ী অহিংস সেনা-নায়কের সংগ্রামী হাতিয়ার

ধরেছিলেন, সেই হাত দিয়েই বাজিয়েছেন মধুস্যন্দী বাঁশের বাঁশরি ;—সংখ্যায় প্রচুর না হলেও কিরণশঙ্কর ছোটগল্প লিখে গেছেন,—মর্মস্পর্শী নিবিড়তার গুণে যা কেবল বাঁশির সুরের সঙ্গেই তুলনীয়। 'সবুজপত্রে'র বৈঠককে আশ্রয় করেই স্রষ্টারূপে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ;—'সবুজপত্রে' তাঁর একাধিক গল্প পত্রস্থ হয়েছিল। তাহলেও প্রমথ চৌধুরীর অনুব্রতী দলে গল্পকার কিরণশঙ্করের আসন অনন্য স্বাতন্ত্র্যের গুণে অনেকখানি দূরান্বিত। সুরশিল্পের পরিভাষায় চৌধুরী মশায়ের গল্প-শৈলীর পরিচয় দিতে হলে বলব,—তাঁর হাতের লেখনী ছিল উচ্চাঙ্গের কলাবিৎ-এর হাতে তার-যন্ত্রের মত ;—তার সুরের বিন্যাসে তানলয়ের যেমন বিশুদ্ধি,—তেমনি নিখুঁত চমকপ্রদ কারুকার্য। কিন্তু কিরণশঙ্করের গল্পে যেন গাঁয়ের মেঠো সুরের মিঠে বাঁশির তান ;—তাতে অন্তরের তপ্ত উদ্বেল প্রাণশক্তি যত নিবিড়, বাগ্‌ভঙ্গীর কলাকৌশল তত সচেতন চাকচিক্যে মার্জিত নয়। এক কথায়, 'সবুজপত্র'-গোষ্ঠীর শিল্প-স্বভাবকে যদি বিদগ্ধ বলা চলে, তাহলে কিরণশঙ্করের রচনা প্রধানত অনুভব-গভীর। এই প্রসঙ্গে 'সবুজপত্রের দল'-এর বুদ্ধি-প্রখরতার মৌল উৎস সন্ধান করা যেতে পারে আবার ধূর্জটিপ্রসাদের আত্মসন্ধানী ভাষায়,—"বুদ্ধি সমাজের নেই, মানুষেরই আছে, একটা মস্তিষ্ক দুটো স্কন্ধে যেকালে থাকতে পারে না। তার ওপর আমাদের বাস শহরে, ভদ্র মধ্যবিত্তের সন্তান, হীরের টুক্‌রো ছেলে, অর্থাৎ বাপমায়ের গৌরব, অথচ তাঁদের সঙ্গে বনিবনাও নেই। তার ওপর বুদ্ধিবাদের জের। অবরোহী যুক্তির ধরনই এমন যে তার সাহায্যে একমাত্র ব্যক্তিবাদেই পৌঁছানো যায়।… ব্যক্তিবাদের মূল কথা ব্যক্তির বিশেষত্ব-স্বীকার করা নয়, তার সাধারণত্বের ঘোষণা করা।"[৩১]

অর্থাৎ, সমাজ ও পরিবারগত ঐতিহ্যের গণ্ডিচ্যুত এক স্বয়ংপূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের অভিলাষী ছিলেন এই দলের শিল্পিকুল,—যে স্বাতন্ত্র্যের একমাত্র আশ্রয় বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল অনাপেক্ষিক মস্তিষ্ক-জীবিতা বা একান্ত বুদ্ধি-প্রাধান্য। আগেও বলেছি, 'সবুজপত্র' দলের গোষ্ঠিপতি প্রমথ চৌধুরীর ভাব-চেতনা বৃহত্তর জীবনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে বিচ্যুত ছিল না। তাহলেও সহৃদয় সে জীবনবোধ শিল্পীর একান্ত বুদ্ধি-সমাশ্রয়ী ব্যক্তিত্বের প্রভাবে পরিস্রুত হয়ে এক আশ্চর্য নৈর্ব্যক্তিকতার স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল। অন্যপক্ষে তাঁর শ্রেষ্ঠ অনুব্রতিজনেরা ছিলেন প্রধানতঃ শহরবাসী,—বৃহত্তর সমাজজীবনের ভাব-পরিমণ্ডলের 'বৃন্তচ্যুত' ; এক কথায় তাঁরা ছিলেন intellectual highbrows.

কিন্তু কিরণশঙ্করের জীবনের বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছিল সম্পূর্ণ পৃথক্ পটভূমিতে। পরিণত বয়সে অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, এবং আরো পরে, মহানগরীর শ্রেষ্ঠ আইনব্যবসায়ী ব্যারিস্টার কিরণশঙ্কর রায় তাঁর

৩১। 'নতুন ও পুরাতন'– দ্র. 'বক্তব্য।'

রুচিস্নিগ্ধ ও সুকর্ষিত মননের গুণে 'সবুজপত্র' দলের এক শ্রেষ্ঠ অংশীদার হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সকল জ্ঞান-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতার ভিত্তি ছিল বাল্য বয়সের স্নিগ্ধ-ঘনিষ্ঠ পল্লীজীবন-সান্নিধ্য। সুবৃহৎ সমাজ-জীবনের সঙ্গে শিল্পীর আত্মার যোগ ঘটেছিল আবেগ-নিবিড় অনুভবের সূত্রে। এই ভাবোদ্বেল জীবন-প্রীতির গভীরতাই কিরণশঙ্করকে জাতীয় জাগরণের অগ্নিদীপ্ত দিনে নিশ্চিন্ত চাকুরি ও নৈর্ব্যক্তিক মননের নিক্রিয়তার সীমায় বদ্ধ থাকতে দেয়নি। জাতীয় জীবনের সংগ্রামভূমিতে ঝাঁপিয়ে পড়বার আকাঙ্ক্ষায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করে তিনি আবার বিলেত গিয়েছিলেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একই জাহাজে ফিরে এসে প্রায় এক সঙ্গে দেশবন্ধুর কাছে নিয়েছিলেন দেশহিত-ব্রতের দীক্ষা।

দেশের সঙ্গে আত্মার সংযোগ সম্ভব হয় ভক্তি-প্রীতির আবেগ-প্লুত অন্বয়ে। সে অন্বয় চিদ্‌বৃত্তির নয়,—সুগভীর হৃদয়ানুভূতির। শিল্পী হিশেবে এবং ব্যক্তি হিশেবেও, কিরণশঙ্কর ছিলেন হৃদয়ভাব-ঘনিষ্ঠ আবেগপ্রধান; দেশের ঐতিহ্য, তার ভালমন্দ, সার্থকতা-দীনতা, আধি-ব্যাধি, অশিক্ষা-দলাদলি, সব কিছুর সঙ্গেই দেশকে তিনি ভালবেসেছিলেন,—তার মুক্তি-সাধনায় করেছিলেন সর্বস্বপণ। তাঁর গল্প-রচনাতেও দেখি দেশহিতব্রতী এই মৌল চেতনারই এক নূতনতর অভিব্যক্তি।

ফলে তাঁর সকল গল্পেই রয়েছে চোখে-দেখা সমাজজীবনের এক বাস্তব প্রচ্ছদ,—'সবুজপত্র'গোষ্ঠীর বুদ্ধি-প্রধান শিল্পীদের রচনার পক্ষে যা প্রত্যাশিত নয়। অন্যপক্ষে গল্পের আঙ্গিক-বিন্যাসে ঐ বিশেষ গোষ্ঠীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাধারণ প্রবণতাও তাঁর রচনার দেহে প্রকট নয়। সর্বোপরি প্রায় সকল গল্পের বিষয়বস্তুতেই বহমান জীবনের প্রতি মমতাঘনিষ্ঠ এক আবেগ-অনুভবের গাঢ়তা রয়েছে,—intellectual highbrow-দের পক্ষে যা স্বভাবত বরণীয় হতে পারে না। আত্মার মূলগত আকাঙ্ক্ষা ও স্বভাবধর্মে কিরণশঙ্কর শহুরে বা একান্তভাবে মস্তিষ্কজীবী ছিলেন না,—ছিলেন হৃদয়বান্ মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনলোকের অধিবাসী। অন্তরগত এই মৌল পার্থক্যের সূত্রেই তাঁর গল্প-রচনার প্রকৃতি এবং আকৃতি বুদ্ধি-প্রধান গল্প-শিল্পপ্রকরণের থেকে স্বতন্ত্র।

কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেও সদৃশতার লক্ষণের অভাব ছিল না। কারণ গ্রামীণ জীবন-ভূমির মধ্যে আবাল্য-কৈশোর পরিবর্ধিত হলেও স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে কিরণশঙ্কর 'গ্রাম্য' ছিলেন না। নিজেকে শহুরেপনার একান্ত অঙ্গীভূত না করেও নাগরিক চেতনার পারিপাট্যবোধ, এবং অকৃত্রিম হৃদয়ানুভব প্রকাশের কালেও সুমিত সংযমের শাসন-রশ্মি প্রয়োগের রুচি-স্নিগ্ধতা তাঁর দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। ফলে কি অনুরাগ, কি বিরাগ, কোনো অনুভবের অভিব্যক্তিতেই অমিশ্র উচ্ছ্বাসের প্রকাশ তাঁর পক্ষে সম্ভব

হয়নি। কোথাও নাতি-তীব্র ব্যঙ্গের বক্রোক্তি, কোথাও স্বভাব-বর্ণনার গাঢ়তার মাধ্যমে অন্তরের ভাব-বাসনাকে তিনি স্মিত যথোচিত রূপ দিয়েছেন। প্রকাশ-ভঙ্গীর এই শালীন স্নিগ্ধ পারিপাট্যের নাগরিকোচিত রুচি-সূক্ষ্মতার গুণেই তিনি 'সবুজপত্র'-গোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ একজন।

জীবন-অভিজ্ঞতার বিরূপ অনুভবকে ব্যঙ্গ-সহাস তির্যক বাক্‌পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকাশ করবার সার্থক দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে 'শুকতারা'-র গল্পাংশে। "অবিনাশদের বাড়িতে প্রতি রবিবার···যে আড্ডা বসত", তার সর্বজ্যেষ্ঠ সদস্য 'মদনদা'র প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন,—"মানুষের মুখকে যে অরসিকেরা 'বদন' আখ্যা দিয়েছিল, তাদের প্রতি মনে মনে আমার একটা রাগ ছিল; কিন্তু মদনদাকে দেখলে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হতাম যে, তাঁর মুখটা ছিল শুধু বদন নয়, একেবারে বদনমণ্ডল। সাদাসিদে, মোটা, গভীর, প্রশান্ত লোকটি, জুলপির উপর চশমার নিকেলের ডাঁটা দুটো একেবারে বসে যেত। এলোমেলো খামখেয়ালিভাবে খানিকটা গালে, বেশির ভাগ চিবুকের নীচে দাড়ি উঠেছিল, মদনদা সেগুলোকে কেটে-ছেড়ে সমানও করতেন না, বা কামাতেন না। লোকে সচরাচর যাকে ধার্মিক বলে, তিনি ছিলেন তাই,—অর্থাৎ ভক্তির বিহ্বলতা বা অনন্তের প্রতি একটা ব্যথায় ভরা সূক্ষ্ম আকর্ষণ, এ-সব কখনো তিনি অনুভব করেন নি; কিন্তু গীতা, রাজযোগ, কর্মযোগ প্রভৃতি বই তিনি পড়েছিলেন এবং চুরুট খাওয়া, থিয়েটার দেখা, নাটকনভেল পড়া, কি স্ত্রী-স্বাধীনতার তিনি বিশেষ বিরুদ্ধে ছিলেন। পাঁচ বছর হল তাঁর বিয়ে হয়েছিল। শুনেছি এরি মধ্যে তাঁর চারটি ছেলেপিলে হয়েছে। বলাবাহুল্য সচ্চরিত্র বলে মদনদার বিশেষ খ্যাতি ছিল।"

নীতিবোধের যথার্থ মূল্য জীবনের রক্ষা-কবচ হিশেবে। অথচ অনেক সময়েই জীবন-বিমুখ অন্ধ আচার-আচরণের কৃত্রিম উন্নাসিকতা নীতিবাদের মিথ্যা খোলস পরে সদম্ভে আবির্ভূত হয়। শিল্পী কিরণশঙ্কর তাঁর সহজ জীবনপ্রীতির স্নিগ্ধ পসরা নিয়ে এই অসংগতির হাস্যকর রূপ পরিস্ফুট করেছেন 'মদনদা'র চরিত্রে। এ হাসির উৎসমূলে তীব্র ব্যঙ্গের জ্বালাকরতা উত্তপ্ত হয়ে নেই তত,—পরিমিত প্রাঞ্জল ভাষণ-জনিত স্বভাব-বর্ণনার সঙ্গে যত যুক্ত হয়ে আছে তির্যক বক্রোক্তির স্মিত পরিহাস। বিন্যাসের পারিপাট্য,—তথা শব্দ প্রয়োগের তীব্রতার মধ্যেও যে রুচি-নিয়ত সংযমের পরিচয় রয়েছে, তার সবটুকুই মনের কারিগরি নয়; সূক্ষ্ম মননশক্তির অভাবে একই বক্তব্য আরো অনেক স্থূল আকারে চক্ষু-পীড়াকর হতে পারত, ওপরের উদ্ধৃতির শেষ ছত্রটি তার প্রমাণ :—"পাঁচ বছর হল তাঁর [মদনদার] বিয়ে হয়েছিল।···এরই মধ্যে তাঁর চারটি ছেলেপিলে হয়েছে। বলাবাহুল্য সচ্চরিত্র বলে মদনদার বিশেষ খ্যাতি ছিল।"—মধুস্নিগ্ধ মন নিয়ে

এ-হুলের আঘাত দূর-বিস্তৃত বিষ-ব্যঞ্জনায় আলোড়ন রচনা করেছে। এ আঘাত কেবল মদনদার প্রতিই নয়,—যিনি পাঁচ বছরে চারটি সন্তানের জন্ম দিয়েও নীতিবাদের দম্ভ নিয়ে ঘুরে বেড়ান ;—যে-সমাজ সংযমহীন সচ্চরিত্রতার এই কৃত্রিম মূল্যমানকে স্বীকার করে নিয়েছে, কিরণশঙ্করের তির্যকভাষণের কটাক্ষ থেকে তারও মুক্তি নেই। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের এই সূক্ষ্মদেহী ব্যঞ্জনাময় বিন্যাস ও তার মূলগত মননশীলতার গুণেই মনোধর্মী শিল্পী কিরণশঙ্করও 'সবুজপত্র'-গোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ।

শুধু তাই নয়, এই 'শুকতারা' গল্পে সেই বৈঠকী ছাঁদটি রয়েছে, প্রমথ-শৈলীর যা এক স্বকীয় উপাদান। গোটা গল্পের পটভূমি অবিনাশদের বাড়ির রবিবারের আড্ডা। লেখক এই আড্ডার পরিচয় দিয়ে বলেছেন,—"তাকে সভা বললে অত্যুক্তি করা হয়,—তাকে ক্লাব বললেও তার প্রতি অবিচার করা হয়, আসলে সেটা ছিল একটা পুরোপুরি আড্ডা।" আড্ডাধারীদের কেউ তখনো পড়ছেন, কেউ সভ্য পাশ করা,—সংসারের রূপ সম্বন্ধে কেউই তখনো ওয়াকেফ্‌হাল নন। তাই নির্ভার লঘুতার জমাট পরিবেশে কলেজ স্কোয়ারের বক্তৃতা বা প্রোফেসারদের পড়ানোর গুণাগুণ থেকে শুরু করে পাটের ওপর ট্যাক্স বসানোর ঔচিত্য বা 'Economo-Biological Background of Euro-American Civilization' পর্যন্ত পৃথিবীর লঘু-গুরু সকল বিষয় নিয়েই একই রকমের আড্ডাধর্মী আলোচনা জমানোতে ছিল সভ্যদের একমাত্র আনন্দ। এই সূত্রে লেখক নিজেদের intellectual আড্ডার প্রয়োজনভারহীন উল্লাস-বিলাস নিয়েও একটু কৌতুক করে নিলেন কিনা, সে কথাও ভেবে দেখবার মত। তার চেয়েও বড় কথা, গোটা গল্পটি তার দেহভঙ্গীতে বৈঠকী কথোপকথনের অকারণ-বিস্তারের শৈলী নিয়ে গালগল্পের এক আপাত স্বাদ গড়ে তুলেছে।

কিন্তু নিছক লঘুচালের গালগল্পের মধ্যেই কিরণশঙ্করের গল্প কোথাও শেষ হতে পারেনি। প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে দেখেছি, জীবনের সুগভীর সমস্যাকুল অভিজ্ঞতাকেও বুদ্ধি-দীপ্ত নৈর্ব্যক্তিক মননের সহাসতার মাধ্যমে dilute করে দেবার আশ্চর্য দক্ষতায় ছিল তাঁর প্রকরণ-বৈশিষ্ট্য। অপর পক্ষে কিরণশঙ্করের অনুভূতি-নিবিড় ভাব-দৃষ্টির প্রভাবে তাঁর গল্পে লঘুতম বিষয়ও জীবন রস-ভূয়িষ্ঠ এক সার্থক গাঢ়তার সঙ্গে অন্বিত হয়েছে। 'শুকতারা' গল্পের শেষে একান্ত নির্ভার ভঙ্গীতে হলেও মমতা-ঘনিষ্ঠ এই জীবনানুভবের মধুস্বাদ অনপনেয় হয়ে যাচ্ছে।

অমলের গল্পের রোমান্টিক রস-ফলশ্রুতি যে-কোনো একটি ছত্রে প্রকাশ করা যেতে পারে, রবীন্দ্র কবিতায় এমন ছত্রের অভাব নেই। একই কালের সান্নিধ্যবর্তী দুই শিল্পীর সমান্তরাল আলোচনায় বক্তব্য স্পষ্ট হতে পারবে ভরসা করে ধূর্জটিপ্রসাদের সুখ্যাত

গল্পটির কথাই আবার স্মরণ করি। 'শুকতারা' গল্পের কিশোর অমলও তার জীবনে প্রথম প্রণয়ের নায়িকা সরলা বা ·অবলা নাম্নী রাখালের মাসিকে উদ্দেশ করে সচ্ছন্দে বলতে পারত,—

> "একদা তুমি প্রিয়ে আমারি তরুমূলে
> বসেছ ফুলসাজে,
> সে-কথা গেছ ভুলে।"

—শেষ ছত্রটির হয়ত পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে। অমল হয়ত বলতে পারত,— 'সেকথা তুমি জান-শুনি কোনো দিন!' কিন্তু আসল কথা তা নয়। ধূর্জটিপ্রসাদ চিদ্‌বৃত্তিমূলক মননের তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি দিয়ে একটি অখণ্ড ইমোশন্-কে টুক্‌রো টুক্‌রো করে খুলে তার বিশ্লিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে বৌদ্ধিক এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট-এর খেলা খেলেছেন। অপরপক্ষে নিতান্ত ক্ষণিক চপলতার কৌতুক-লঘু সূত্রের ওপরে একটি জমাট ইমোশন্‌কে অনায়াস-গতিতে পরিচালিত করতে পেরে গল্প-শেষে কিরণশঙ্কর একটি নির্ভার অখণ্ড অনুভবের মুহূর্ত গড়ে তুলেছেন।

প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, 'প্রেম যৌবনের ব্যাধি'। সে বিতর্কের গভীরে না গিয়েও মানতে হয়,—যৌবনের পক্ষে প্রেম বৃত্তি এবং প্রবৃত্তি, সোনার কাঠি আর রুপোর কাঠি, —এ-দুইই। অর্থাৎ রোমাণ্টিক প্রণয়ের বাষ্পীয় লঘুতাকে যতই উপহাস করি, কোনো প্রকারের অপঘাত ছাড়া তার স্বভাব-অধিকার থেকে যৌবনের মুক্তি নেই। সে প্রেম যেখানে দুর্বলতা, সেখানে তা হাস্যকর, অন্যত্র তা জীবনের শক্তি। কিন্তু যে-কোনো রূপেই হোক, উদীয়মান যৌবনের প্রণয়বৃত্তি নিঃসন্দেহে রোমাণ্টিক,—অবাস্তব-মনোহর। বাস্তবের আলম্বন তার পক্ষে সকল ক্ষেত্রেই উপলক্ষ্য,—মনোহারিতার জগতে মানস-মুক্তিতেই তার সার্থকতার পরাকাষ্ঠা।

তাই বয়ঃসন্ধির পুণ্য গোধূলিতে এক সদ্য-অর্ধপরিচিতা কিশোরীর প্রতি উদ্দেশ করে 'দিদি' যখন অত্যন্ত সংক্ষেপে জবাব দিলে 'তোর বৌ',—তখনই একমুহূর্তের মধ্যে অমলের 'ভিতর বাহির বদলে গেল'। তার মনে হল, "সে যেন একান্ত আমার আপনার। আমি দেখতে পেলাম সে বসে আছে বাসর ঘরের পাটির উপর লজ্জাবনত হয়ে আমার আগমনের প্রতীক্ষায়।···আমি যাচ্ছি আলো জালিয়ে, বাজনা বাজিয়ে আমার মাথায় মুকুট, গলায় ফুলের মালা। যুগে যুগে আমি তাকে পেয়েছি কখনো কালো ঘোড়ার উপর চড়ে, মন্ত্রপূত বাঁকা তলোয়ার হাতে করে দৈত্যপুরী থেকে তাকে উদ্ধার করে। আসন্ন সন্ধ্যায় তেপান্তরের মাঠ ধু ধু করছে—সে যেন আর ফুরোয় না—সমস্ত দীর্ঘ পথটা তার দুই ক্ষীণ বাহু দিয়ে আমাকে সে জড়িয়ে ধরেছে। কখনো বা তাকে

পেয়েছি স্বয়ম্বর সভার লক্ষ্য ভেদ করে, সমস্ত রাজাদের যুদ্ধে হারিয়ে। কখনো বা ঝোড়ো রাতে ভগ্ন মন্দিরে স্তিমিত আলোকে তার সঙ্গে আমার দেখা। যে-সকল কাব্য-উপন্যাস পড়েছিলাম সে সব যেন তারি সঙ্গে আমার মিলন হবার অপূর্ব কাহিনী।"

রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতার কথা মনে পড়ে—

"ঠাকুরমা দ্রুততালে ছড়া যেত পড়ে—
ভাবখানা মনে আছে—'বউ আসে চতুর্দোলা চড়ে
আম-কাঁঠালের ছায়ে,
গলায় মোতির মালা সোনার চরণচক্র পায়ে।'
বালকের প্রাণে
প্রথম সে নারীমন্ত্র আগমনী গানে
ছন্দের লাগালো দোল আধোজাগা কল্পনার শিহরদোলায়,
আঁধার-আলোর দ্বন্দ্বে যে প্রদোষে মনেরে ভোলায়,
সত্য-অসত্যের মাঝে লোপ করি সীমা
দেখা দেয় ছায়ার প্রতিমা।" ['আকাশ প্রদীপ' কাব্য]

বাল্যের দিক্-চক্রবাল পেরিয়ে জীবনের দিক্-দিগন্তে সেই রহস্যময়ীর আবির্ভাব-সংগীতের এক অনামিকা ব্যঞ্জনা উৎসারিত করে দিয়েছেন কবি উদ্ধৃত কবিতার পরবর্তী অংশে। তার সবটুকুই বর্তমান উপলক্ষ্যে আমাদের আলোচ্য নয়। কিন্তু জীবনের মধুলগ্নে যৌবনের আবেগ-পূত এমন আহ্বান এসে পৌছায়, যেখানে চেনা-অচেনা যে-কোনো মানসীকে উদ্দেশ করে কল্পনার প্রণয়াভিসার অবারিত হতে চায়। যৌবনের স্বভাবই হচ্ছে আত্মবিস্তার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। প্রথম প্রেমানুভবের ভাবরথে চড়ে সে অনন্তের আকাশে আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিযানে বেরোয়। তখন তার একমাত্র পাথেয় হয় সেই আবেগ-বাণী :—

"তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয় গাঁথিয়াছে গীতহার
কতরূপ ধরে পরেছ গলায় নিয়েছ সে উপহার—
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।" ['অনন্তপ্রেম' : 'মানসী'কাব্য]

অমলের অপারণত বয়সের প্রথম প্রণয়বোধে ছেলেমানুষি আছে অনেক। 'তোর বৌ' কথাটি শুনেই প্রথম-দেখা যে অপরিচিতাকে সে তার অনন্তজীবনের সঙ্গিনী বলে এক মুহূর্তে আবিষ্কার করে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল, সে ছিল তার চেয়ে বয়সেও "বছর

খানেকের বড়"। তাতেও কোনো বাধা ছিল না। ভাবী বৌ-এর আত্মীয় বলে রাখালের প্রতি তার সুচিরকালের বিমুখতা এক মুহূর্তে আত্মার অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়ে গেল। এমনকি 'মিথ্যাকথা ও চুরি বিত্তায় ওস্তাদ', 'কাঁদুনে ও নালিশ-পটু' রাখালকে "অযাচিত একটা লাটাই" পর্যন্ত দিয়ে বসেছিল। এই প্রেমানুভবের উদ্ভব ও অভিব্যক্তিতে যেমন ছেলেমানুষি রয়েছে,—তেমনি আছে তার পরিণতিতেও। মেয়েটি চলে যাবার "দিন-সাতেক পরে"—অমল বলে,—"একটা ক্রিকেট ম্যাচ নিয়ে এমন মেতে গিয়েছিলাম যে ও ঘটনা ভুলেই গেলাম। এমন কি রাখালকে যে লাটাইটা দিয়েছিলাম সেটাও ফিরিয়ে নিলাম।"

কেবল এখানেই শেষ নয়, হঠাৎ-পাওয়া যে দয়িতার মানস-সান্নিধ্য অমলের সন্ত-বিকচ হৃদি-পদ্মকে পত্রে পত্রে উল্লসিত করে তুলেছিল, বাকি জীবনে তার কথা আর কখনো মনেও পড়েনি। এই গল্প বলার মাত্র দুদিন আগে,—'পরশুদিন' অমল তাকে আবার একবার দেখে এসেছিল—"ওজনে দুমণের উপরে এবং চার পাঁচ ছেলের মা।" "কিন্তু অমলের কোনো বিকার নেই তাতে।" এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' গল্পের প্লট্ মনে পড়া স্বাভাবিক,— একই ধরনের কাহিনীর সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ভাবপ্রেরণা ও পরিণতির দরুণ। দীপ্ততনু বীর্যভাস্বর ব্রাহ্মণ-যুবক কেশরলালের তেজঃপুঞ্জ উদাত্ততা অন্তঃপুরচারিণী বদ্রাওনের নবাব-পুত্রীর উদীয়মান যৌবন-বাসনাকে উদ্বেলিত করেছিল ;—দিনে দিনে অবদমিত সে প্রাণ-বাসনা জীবনের সর্বস্ব-পণ আরাধনার রূপ ধরেছিল। পিতৃ পরিবারের ব্যসনাসক্ত আশ্রয়,—আজন্মের ধর্ম-সংস্কার ও আচার-আচরণের পরিধি অতিক্রম করে সেই প্রণয়-যজ্ঞের সিদ্ধি সন্ধানে সে ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছে। গভীর আত্ম-উৎসর্জন, প্রিয়-সম্মিলনের সেই অবিচল কৃচ্ছ্রসাধনায় অবিধ্বস্ত জীবনের চরম মুহূর্তে যেদিন সে কেশরলালকে খুঁজে পেল ভুটিয়া বস্তির দৈন্যের মধ্যে পার্বতী স্ত্রী ও বহু পুত্র-কন্যার মাঝখানে,—সেদিনকার সে ট্রাজেডি গভীরতা আর অপারতায় নিঃসীম অনির্বচনীয়।

তার পাশে অমলের এই ক্ষণমোহ-চঞ্চল প্রণয়ের অগভীর নিরুদ্বেগ কাহিনী রোমান্টিক প্রেম-ধর্মের প্রতি অনতিতীব্র শ্লেষের অভিপ্রকাশ বলে মনে হতে বাধা নেই,—অন্ততঃ আপাতদৃষ্টিতে। কিন্তু আগেই বলেছি, বীরবল এবং ততোধিক ধূর্জটিপ্রসাদের মত তির্যক বক্রোক্তি-জীবিত ছিল না কিরণশঙ্করের জীবন ভাবনা। তাই নিছক সহাস লঘুতার চেয়ে গভীরতর জীবন-জিজ্ঞাসার এক নিরাবেগ ব্যঞ্জনা রেখে গেছেন শিল্পী গল্পের শেষে অমলেরই মুখে :—"···আমি শুধু এই কথা বলে রাখতে চাই যে, যে মনোভাবের ইতিহাস তোমাদের বললাম—সেটা মোহ হতে পারে, কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি

সেটা রূপজ মোহ নয়। দ্বিতীয়ত, প্রথম থেকেই আমি বিয়ে করতে প্রস্তুত ছিলাম, অতএব ওটাকে অবৈধ বা অন্যায় বলাও ঠিক হবে না।"

তাহলে এর যথার্থ স্বরূপ কী?—এ 'মায়া'ও হতে পারে, 'মতিভ্রম' হতেও বাধা নেই;—কিন্তু তারপর?

এই সুবৃহৎ জিজ্ঞাসার মুখে এনে গল্পের কাহিনীকে শিল্পী লঘুতর বৈঠকী কথার কলমুখরিত পথে পরিচালিত করে দিয়েছেন। তাহলেও গল্পের পক্ষে এ জিজ্ঞাসা অর্থহীন নয়;—সে কথার নিশ্চিত সংকেত রয়েছে গল্প-নামে। স্থূল-দৃষ্টিতে গল্প-বিষয়ের মত গল্পের নামটিও নিরর্থক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু গভীরতর তাৎপর্যে নিতান্ত বিষয় সর্বস্ব এই গল্পটি বিষয়াতিরিক্ত মূল্যের এক ব্যঞ্জনাময় নির্দেশ অন্তরে ধারণ করে রয়েছে কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় মুদ্রণ 'সপ্তপর্ণ'র ভূমিকায় লিখেছেন,—"প্লট্ বাদ দিয়ে রূপক বা symbol-এর আশ্রয় নিয়ে যে সুন্দর রচনা জমানো যেতে পারে এবং তার ব্যঞ্জনাও যে গল্পের ব্যঞ্জনার সমগোত্রীয় হওয়া সম্ভব নয়,—সপ্তপর্ণ-এর গল্পগুলিতে সেই কথাই প্রমাণিত হয়েছে।" এখানে ভূমিকা-লেখকের বিশেষ উদ্দিষ্ট গল্পটি হচ্ছে 'হেঁয়ালি'। কিন্তু নিতান্ত বিষয়-নিষ্ঠ প্লটের অঙ্গ ঘিরে সূক্ষ্মতম মানবিক হৃদয়ানুভবের এক কাব্যাতি-শয্যহীন কবিতাধর্মী ব্যঞ্জনার সার্থক দুর্লভ নিদর্শন 'শুকতারা' গল্প। শুকতারা ক্ষণ-সমুজ্জ্বল প্রভাতী তারা,—তরুণী উষার বক্ষে নবারুণের রক্তিম উদয়-পথের দিকে উন্মুখ দৃষ্টি মেলে তার আবির্ভাব; আলোক-দীপ্ত সূর্যের অভ্যুদয় লগ্নেই তার ক্ষণদীপ্ত চঞ্চল জীবনের অবসান! বৃহত্তর—স্পষ্টতর আলোকতীর্থের আগমন সংকেত করেই তার নিরর্থক জীবনের সার্থক উদ্‌যাপন।

যৌবন-উষায় অমলের নিরুদ্ধ প্রেম-চেতনার নির্মোক-সীমায় জাগৃয়মান প্রাণ-রহস্যের বিদ্যুৎ-সচকিত সংকেত রচনা করে তার সেই প্রথম প্রণয়ের ক্ষণ-মোহ অকস্মাৎ বিদায় নিয়েছিল। তাই, অমলের অবচেতন চিত্ততলে সে সৌরভ কোনোদিনও "শেষ হয়ে হইল না শেষ"। অর্থাৎ সংজ্ঞাত জগতে যার অবলুপ্তি নিতান্ত স্বাভাবিক, অক্ষুব্ধ— অন্তরের অসংজ্ঞাত ভূমিতে তার শাশ্বত প্রতিষ্ঠা এক আকারহীন বাসনার অনাঘ্রাত সৌরভরূপে! এই প্রণয়ানুভবে ছেলেমানুষি রয়েছে,—কিন্তু সে ছেলেমানুষি প্রাণ-চঞ্চল জীবনের মৌল স্বভাবতল থেকে উৎসারিত। জীবনের মতই তা রহস্য-অপার, জীবনের মতই অতল-স্পর্শ সুগভীর। খুব গম্ভীর ভাষায় বলা যেতে পারে, যৌবনধর্মের একটি অনির্বচনীয় জীবন-দর্শনের প্রতি সংকেত করেছেন শিল্পী এই গল্পে। কিন্তু কিরণশঙ্কর সম্বন্ধে অতটা গম্ভীর হবার উপায় নেই,—অতি গম্ভীর কথাকেও তিনি যথেষ্ট আবেগ-গম্ভীর না করে নির্ভার অনায়াস ভঙ্গীতে বলতে পেরেছেন।

এখানেই তাঁর পরিহাস-কুশল বিদগ্ধ মননের সার্থকতা,—ভারি জিনিসকেও সে বোঝা হয়ে উঠ্‌তে দেয়নি। সেই সঙ্গে ছিল ঐতিহাসিকোচিত নৈর্ব্যক্তিকতার নির্মোক,—নিতান্ত ব্যক্তি-ভাবনা-গভীর অনুভবকেও যা দিয়েছে এক অকম্পিত নিরাবেগ প্রকাশের আশ্চর্য স্বচ্ছ ঋজুগতি।

এই সিদ্ধান্তের শ্রেষ্ঠ পরিচয় 'কাহিনী' গল্পে। সাবিত্রীপ্রসন্ন এই গল্পের বাচন-প্রকরণের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিতপাষাণ'-এর কথা স্মরণ করেছেন। তাছাড়া বিশেষ করে এই গল্পটির কথা ভেবেই হয়ত তিনি কিরণশঙ্করের রচনায় শেখভ্-এর আঙ্গিক-প্রকৃতির সাদৃশ্যের কথাও উল্লেখ করতে চেয়েছেন।[৩২] রূঢ় বাস্তবের যথার্থ বর্ণনায় পুঙ্খানুপুঙ্খতার মাধ্যমে শেখভ্ চিরকালীন জীবনের ঐতিহাসিক স্বভাব সংকেত করেছেন কখনো কখনো ;—মানুষের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি ও বঞ্চনার নিতান্ত গতানুগতিক গল্প যেন তাতে জীবনের জমাট কালো পাথরের ওপরে সমাজ-ধর্মের নাড়ি-ছেঁড়া ক্ষীণ-উষ্ণ রক্ত-স্রোতের মত প্রবাহিত হয়েছে। 'The Bet' এই সত্যের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন, এমন কি 'The Darling'-এর মত মিষ্টি করুণ গল্পের কথাও একই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে বাধা নেই। 'কাহিনী' গল্পে ইতিহাসের বুকে জমাট-বাঁধা এক বিশেষ দেশকাল-সীমায় ধৃত কালো কঠিন-পাথরের মত জ বন-রূপ রক্ত-মাংসের বেদনা ও প্রাণোত্তাপ নিয়ে যেন মাথা কুটে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। তাতে শেখভ্-এর গল্পের চেয়ে আরো অতিরিক্ত কিছু রয়েছে,—যাকে মহাকাব্যের উদাত্ত কাঠিন্যের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে,—বাচন-শৈলীর মধ্যেও এক দুঃসহ সংযমের দার্ঢ্য রয়েছে, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে যা কেবল মহাকবির নির্মম নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে। তাই ভূতের গল্পের একান্ত বাহ্য প্রসঙ্গ নিয়ে বিকশিত হলেও 'ক্ষুধিতপাষাণে'র রহস্যময় অতীন্দ্রিয়তার অনির্বচনীয় বিভূতি নেই এ-গল্পে ;—লিরিক্ নয় এ গল্প—ছোট-গল্পের আকারে এক অখণ্ড সার্থক এপিক্।

প্রাচীন সমাজতান্ত্রিক যুগের যে দাপট সংগতভাবেই বিগত হয়েছে, তারই ভগ্নস্তূপের শীর্ষে বসে ইতিহাস-লক্ষ্মীর তপ্ত দীর্ঘশ্বাস যেন নির্গলিত হয়েছে এই গল্পের মধ্য দিয়ে। মহালক্ষ্মীপুর বাজারের 'কাহিনী' উপলক্ষ্য করে ইতিহাসের এক হারানো যুগ যেন মাটির তলা থেকে পূর্ণাঙ্গ মূর্তিতে ষোল কলায় বিকশিত হয়ে উঠেছে,—তা এত বাস্তব, এত স্পষ্ট-প্রাঞ্জল যে, এ-কে ভৌতিক কাহিনী বলবার উপায় নেই কোনো অর্থেই,—গল্প পড়তে বসে এক মরা যুগের অতীত কথা বলে মনে হয় না

৩২। দ্রষ্টব্য 'সপ্তপর্ণ' (২য় সং) ভূমিকা।

কিছুতেই। রোমান্টিসিজম্ বা মিষ্টিসিজম্-এর শৈলীগত বিশেষ আশ্রয় অতীত লোকে দূরগতির সুযোগ সন্ধান। তারই গভীরে নিজেকে অনায়াসে রহস্য-সুনিবিড় অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন করে সার্থক হতে পারে সেই কলাশৈলী। কিন্তু এপিক-স্রষ্টার ঐতিহাসিক চেতনার বিভূতি অতীতকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরে, সমকালীন জীবনের সমতুল একান্ত বাস্তবধর্মী প্রাঞ্জল বর্ণনার খুটিনাটিগত প্রাচুর্যে তাকে পরিণত করে প্রত্যক্ষ সত্যে। অন্যপক্ষে ঐতিহাসিকের তথ্য-সঞ্চয়ের সর্বাতিশায়ী আকাঙ্ক্ষা এপিক্-এর কাহিনীতে বিস্তার ও প্রাচুর্যের সমৃদ্ধি যত সৃষ্টি করে, অখণ্ডতার কেন্দ্রিত-উজ্জ্বল দীপ্তি সৃষ্টি করতে পারে না তেমন। তাই সম্পূর্ণ জীবনের সত্য-দ্রষ্টা হিশেবে রবীন্দ্রনাথ একদা কবিকেই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বলে অভিহিত করেছিলেন। —"তথ্য যাহাকে ইংরেজীতে fact বলে, তদপেক্ষা সত্য অনেক ব্যাপক। এই তথ্যস্তূপ হইতে যুক্তি ও কল্পনা বলে সত্যকে উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। অনেক সময় ইতিহাসে শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় রাশীকৃত তথ্য পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সত্য কবির প্রতিভাবলে কাব্যেই উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে। সেই কারণেই কবি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। মহৎ ব্যক্তির কার্য-বিবরণ কেবল তথ্য মাত্র, তাঁহার মহত্ত্বটাই সত্য; সেই সত্যটি পাঠকের মনে উদিত করিয়া দিতে ঐতিহাসিকের গবেষণা অপেক্ষা কবি-প্রতিভার আবশ্যকতা অধিক।"[৩৩]

মহাকাব্যের 'ইতিহাসোদ্ভব বৃত্ত' প্রাসঙ্গিক জীবনের পরিচায়নে সর্বমুখী অনুপুঙ্খতার অভিলাষী। ফলে মহাভারতে ভারতের সকল কথাই রয়েছে,—নেই কেবল সব কথার সংহত ফলশ্রুতি রূপ একটি অখণ্ড চুম্বক। ইতিহাস-প্রান্তরের আনাচে-কানাচে ঘুরে কবি আমাদের জন্যে সংগ্রহ করেন সেই পূর্ণাঙ্গ চুম্বকটি। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন ইতিহাসের তথ্যাশ্রয়ী সত্য স্বরূপ। 'কাহিনী' গল্পে সামন্ততান্ত্রিক জীবনের সেই প্রাণ-সত্যটিকে কবির দৃষ্টি নিয়ে উদ্‌ঘাটিত করেছেন কিরণশঙ্কর;—তাতে ঐতিহাসিকের সহজ বিবিক্ততার মর্মমূলে আত্মগোপন করে রয়েছে দরদী মনের মমতা। গল্পের নায়ক-গোষ্ঠীর সম্বন্ধে শিল্পী লিখেছেন, "মহালক্ষ্মীপুরের রাজ-বংশের মত অত্যাচারী জমিদার বংশ ও অঞ্চলে ছিল না বললেই হয়।"

অথচ তার আগেই লিখেছেন,—"মহালক্ষ্মীপুরের রঘুরাম রায়, তাঁর পুত্র রামলোচন রায় সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত জমিদার ছিলেন। বাংলার ইতিহাসে অবশ্য তাঁদের নাম পাবে না। কিন্তু সে দোষ তাঁদের নয়,—যারা ইতিহাস লেখে তাদের। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, যদি কখনো বাংলার সত্যকার ইতিহাস লেখা হয় তখন

৩৩। রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণচরিত্র'—দ্র. 'আধুনিক সাহিত্য'।

তাতে মহালক্ষ্মীপুরের রাজাদের নাম থাকবেই—আর থাকবে শেষ রাজা সহদেব রায়ের স্ত্রী রানী মহামায়ার নাম, যাঁর প্ররোচনায় মধুগঞ্জের কুঠির হে-সাহেবকে হত্যা করা হয়েছিল বলে প্রবাদ। কারণ হে-সাহেব নাকি বামুনের মেয়ে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। হে-সাহেব সত্যি এ-কাজ করেছিলেন কি না তাও বলা কঠিন. কারণ সেকালে এত সাক্ষী-সাবুদ আইন-কানুন ছিল না। লোকের মনে যা সন্দেহ হত তাই সত্যি বলে বিশ্বাস করত।"

সেকালের সঙ্গে একালের তুলনা করে লিখেছেন,—"বাংলার সেই অর্ধস্বাধীন দুর্ধর্ষ জমিদারেরা লোপ পেয়েছে। ভালই হয়েছে। লোকে সুখে-শান্তিতে বাস করতে পারছে। সকলের জন্যে এক আইন। রাজাই হও বা প্রজাই হও কেউ কারো উপর অত্যাচার করতে পারে না; থানা আছে, ইউনিয়ন বোর্ড আছে। আজ কোথায় সেই জনার্দন রায় যিনি কেদার রায়কে সাহায্য করতে গিয়ে মোগলদের হাতে প্রাণ হারান। কোথায় সেই রামলোচন রায় যিনি একদিন কূটযুদ্ধে মগ দস্যুদের পদ্মা থেকে ইছামতী নদীতে ভুলিয়ে এনে—কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়ে বাজপাখীর মত তাদের আক্রমণ করে তাদের নৌকা বিধ্বস্ত করে ইছামতীর অতল জলে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। মাত্র একটি মগী নৌকা কোনরকমে সেই সর্বনাশ থেকে বাঁচতে সমর্থ হয়েছিল। যাই হোক্, তারা যে নাই—সেজন্য দুঃখ নাই। এখন যুদ্ধবিগ্রহ নাই—দেশে পূর্ণ শান্তি। দেশে দস্যুভীতি নাই—অতএব দস্যু নিবারণের জন্য সর্বদা লাঠি সড়কি নিয়ে প্রস্তুত থাকবার প্রয়োজন নাই।·········বস্তুতঃ তিন তিন বছর পরে ইউনিয়ন বোর্ডের ইলেক্‌শান ছাড়া আমাদের. দেশে সেরকম কোনো উত্তেজনার কারণই ঘটে না।"

বলা বাহুল্য, এই দীর্ঘ বর্ণনার সবটুকুই অতীতের নিন্দা আর বর্তমানের প্রশংসায় মুখর নয়। অন্যপক্ষে বর্তমান আইনানুগ শান্তিপ্রিয় মনোভাবের মধ্যে যে নির্জীবতা রয়েছে তার প্রতি কটাক্ষ বরং সুস্পষ্ট। এই ব্যাজস্তুতি-কুশল শৈলীর অভ্যন্তরে অতীত মূল্য-বুদ্ধির প্রতি শিল্পীর অন্তর্লীন এক অনুরাগ অনুচ্ছ্বসিত হলেও প্রাঞ্জল মূর্তিতে প্রকাশ পেতে পেরেছে। অতীতে শান্তি ও শৃঙ্খলার অভাব ছিল। সেই সঙ্গে প্রাণের প্রাচুর্যও ছিল, যার ফলে যে-কোনো সামান্য উপলক্ষ্যেও জলজ্যান্ত প্রাণটাকে অকাতরে উপড়ে ফেলতে দ্বিধা-সংশয় ঘটত না বিন্দুমাত্র-ও। বস্তুতঃ এক ব্রাহ্মণ-কন্যা লাঞ্ছিত হয়েছে। এই অনুমানকে উপলক্ষ্য করেই মহালক্ষ্মীপুরের জমিদারবংশ ও তাঁর কুললক্ষ্মী মুহূর্তে এমন ভয়াবহ প্রতিবিধিৎসার পথে প্রবর্তিত হয়েছিলেন, যাতে সারাটি বংশ অপঘাত-বিনষ্টির অতলে লুপ্ত হয়ে গেল,

মেহেরআলি নিছক জমিদারের আদেশ পালন করার অন্ধ কর্তব্য-ব্রতে নিজের জন্য বীভৎস মৃত্যুর পরিণাম বরণ করে আনল। অথচ তাতে কোনো পক্ষেরই কোনো স্বার্থ-সংশ্লেষ ছিল না। এই অকারণ সর্বনাশ বরণ একালের আইনানুগ হিশেবী সমাজের দৃষ্টিতে নিছক অবিমৃষ্যকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু প্রাণের অপার দার্ঢ্য যাঁদের ছিল,—প্রাণ নিয়ে এমনি সর্বনাশী খেলায় মেতে ওঠার সহজ অধিকারও ছিল তাঁদেরই। ইতিহাসের পুঞ্জিত তথ্যের মিথ্যা যে সামন্ততন্ত্রকে মধ্যযুগীয় শক্তির ব্যভিচার বলে চিহ্নিত করেছে, কিরণশঙ্করের মরমী সত্য-দৃষ্টি তার মধ্যে বিমুগ্ধ শ্রদ্ধায় খুঁজে পেয়েছে নিঃসীম প্রাণসম্পদের উদাত্ত সুন্দর অমিতাচার। জীবনমূল্যের এই এপিক্ সৌষ্ঠবকে এপিক্ শিল্পীর-ই সমুচিত বস্তুনিষ্ঠ ঐকান্তিকতা নিয়ে খোদাইকরের মত গেঁথে তুলেছেন কিরণশঙ্কর। এতে নৈর্ব্যক্তিকতার যে অনাসক্ত রূপ রয়েছে,—তা কেবল আপাত সত্য। শিল্পী হিশেবে কিরণশঙ্কর আবেগ-সমাকুল কবি,—কেবল তাঁর মরমী মনটিকে স্নিগ্ধ মননের উজ্জ্বল অবগুণ্ঠনে ঢেকে প্রকাশ করেছেন। অন্যথায় যা হতে পারত উচ্ছ্বসিত জীবনমূল্য-বোধের গীতিকবিতা,—তাই বিশেষ শিল্প-প্রবণতা ও শৈলীর গুণে হয়ে উঠেছে কবির লেখা ইতিহাস-সত্য।

মনের এই স্পর্শকাতর সশ্রদ্ধ জীবন-মূল্যবোধ, ঐতিহাসিকের স্বাভাবিক তথ্য-চেতনা, ও বিদগ্ধ মনের অতি সূক্ষ্ম মনন-দীপ্তি মিলে গল্পের দেহে-মনে নাতি-তীব্র মরমী জীবনমূল্য-বোধের সঞ্চার করেছে ;—অনুচ্ছ্বসিত হয়েও যা দ্ব্যর্থহীন। 'কাহিনী' গল্পের ফলশ্রুতিতে শিল্পীর কণ্ঠে এই সত্য সংশয়হীন প্রকাশ পেয়েছে। কীর্তিরায়ের সবংশ বিনষ্টির আদ্যোপান্ত কাহিনী বর্ণনা করে কিরণশঙ্কর বলেছেন,—"অতীত কালের জন্য দুঃখ করি না। কীর্তিরায়ের মত জমিদারের এলাকায় বাস করা খুব সুখের হত বলি না। এই বর্তমান উন্নতির যুগে অত্যাচারী নৃশংস মধ্যযুগের জমিদার-তন্ত্রের যে প্রশংসা করতে চাই না—তাও বোধহয় কাকেও বোঝাতে হবে না। মেহেরআলি খাঁর মত লোক যে আজকাল নেই—সে আমাদের মত ভীরু লোকের পক্ষে ভালই। তবু মহালক্ষ্মীপুরের গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যখন যাই, তখন ঐ প্রচ্ছন্ন চাঁপার গন্ধ, ঝুমকা জবার বিচিত্র বর্ণ, মজা জলাশয়ের একমাত্র প্রস্ফুটিত রক্তশাপলা আমার মনকে একেবারে উদাস করে দেয়—এ স্বীকার না করে উপায় নেই।"

প্রথম দিকের উচ্ছ্বসিত বাচন-বাসনা মনন-সূক্ষ্ম শৈলীর আধারে সংযত হয়েছে। মধ্যযুগীয়তার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল, নৃশংসতা ছিল,—সভ্য মানুষের জীবনে সে আর কিছুতেই কাম্য হতে পারে না। কিন্তু বিমুখতার এই নগদমূল্য দিয়েই অতীতের সেই দৃঢ় উদাত্ত জীবনকে,—যে জীবন অঙ্গ ধরেছিল রানী মহামায়া, সর্দার মেহেরআলি খাঁর

মধ্যে,—তাকে এক কথায় বিদায় দিতে পারেন নি শিল্পী। সংযত ভাষণের মধ্য দিয়ে সেই শ্রদ্ধান্বিত মনের সুরভি উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রকাশিত হয়েছে।

'সপ্তপর্ণে'র সাতটি গল্পের আঙ্গিক প্রায় সাতরকমের। প্রথমটি বৈঠকী গাল-গল্পের ভঙ্গীতে বলা, দ্বিতীয়টিতে বৈঠকী বিস্তারের রূপাভাস থাকলেও মহাকাব্যিক দার্ঢ্য ঘন-কঠিন-নিটোল হয়ে রয়েছে। 'ক্ষেমী' নামক তৃতীয় গল্প monologue-এর ভঙ্গীতে লেখা,—আকৃতি ও বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্রে'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবু মনে হয়, এ লেখা রবীন্দ্র-রচনার থেকে কত ভিন্ন;—যেমন সম্পূর্ণ বিভিন্ন 'কাহিনী' গল্পে প্রকৃতি প্রমথ চৌধুরীর 'আহুতি' গল্পের থেকে,—যদিও এ-দুয়ের বিষয় ও আকৃতিগত সদৃশতার কথা মনে না পড়েই যায় না। 'হেঁয়ালী' নামক গল্পে রয়েছে কথিকার প্রকৃতি,—যা 'লিপিকা'-র রচনাশৈলীর সদৃশ হয়েও সদৃশ নয়।

অর্থাৎ, কিরণশঙ্করের সব রচনাই তাঁকে অনন্যতা দিয়েছে—মনের সঙ্গে মননের, ঐতিহাসিকের বস্তু-নিষ্ঠার আন্তরিকতার সঙ্গে কবির প্রত্যয়াবেগে ঘনসন্নিবিষ্ট যৌথ জটিল শিল্প-সুষমার সমন্বয় করে। ফলে তাঁর রচনা অনেক শ্রেষ্ঠ কীর্তির রূপ-সদৃশতা বহন করলেও—শিল্পী কিরণশঙ্কর একক নিঃসঙ্গ—কারোই তিনি অনুগত নন।

৪। বিশ্বপতি চৌধুরী

বাংলার সাহিত্য-শিল্পের ইতিহাসে বিশ্বপতি চৌধুরী (১৮৯৫) এক বেদনাকর বিস্ময়। সহ-জ শিল্পীর অধিকার সারা চেতনায় ধারণ করে তাঁর আবির্ভাব। মাত্র একখানি উপন্যাস 'ঘরের ডাক' লিখে বাংলা সাহিত্যের দরবারে বিস্ময়ের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনের আঁকা কয়েকখানি চিত্র রসিক-মনকে মুগ্ধ করেছিল। অন্তরঙ্গজন বিস্মিত হয়েছেন সুর-শিল্পে তাঁর আশ্চর্য অধিকারের পরিধি দেখে। রবীন্দ্র-কবিতার অধ্যাপনা উপলক্ষ্যে প্রতিদিন নিত্যনূতন সৃষ্টির স্বাদ পরিবেশন করেছেন তরুণ পাঠার্থীদের অন্তরে। কথাসাহিত্য, সংগীত বা চিত্র-শিল্পের জগতে তাঁর প্রতিষ্ঠার আসন চিরস্মরণীয় হতে পারত অনায়াসে। কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধু পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় দুঃখ করেছেন,—কেবল 'আলস্যপ্রিয় স্বভাবে'র দরুন সে অপার সম্ভাবনা সমুচিত ফলপ্রসূ হয়নি।[৩৪]

শিল্পীর বিচিত্র সৃজনপ্রবাহের মধ্যে কথাসাহিত্যই জন্মের বিচারে সর্বজ্যেষ্ঠ। ষোল বছর বয়সের সীমায় স্কুল পেরিয়ে কলেজে পৌঁছেই গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন। সে-সব গল্প প্রথমে প্রকাশিত হয় কুলদাপ্রসাদ মল্লিকের সম্পাদিত 'বীরভূমি' পত্রে। পরে 'ব্যথা'

৩৪। পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—'চলমান জীবন' (প্রথম পর্ব)।

নামে গ্রথিত হয়েছিল একত্র (১৯১৫)। ঐসব আবেগ-উচ্ছ্বাসপূর্ণ গল্পেও সহ-জ জীবন-প্রীতির পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছিল।

এঁর গল্প-প্রবাহের দ্বিতীয় পর্যায় সূচিত হয় 'যমুনা', 'সবুজপত্র' ও 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায়। আরো পরে, কিছু গল্প প্রকাশিত হয়েছিল 'গল্পভারতী'তে। কোনো গল্পই প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ দাবি করতে পারে না,—তাহলেও প্রায় প্রতি গল্পেই wit-এর সঙ্গে emotion-এর সমন্বয় বুদ্ধি ও হৃদয়-ধর্মকে যুগপৎ আন্দোলিত করে তোলে। এদিক থেকে লেখককে 'সবুজপত্র'-গোষ্ঠীর সমধর্মা বলে মনে করা যেতে পারে। কমলালয়ের 'সবুজপত্র'-বৈঠকে অন্যতম মুখ্য আসন ছিল তাঁর। বুদ্ধির দীপ্তি, প্রখর তার্কিকতা এবং গভীরতম আন্তরিকতার সমৃদ্ধিতেই ছিল সে আসনের প্রতিষ্ঠা।[৩৫] অন্তঃস্বভাবের বিশিষ্টতায় কথাশিল্পী বিশ্বপতি চৌধুরী 'সবুজপত্রে'র গোষ্ঠিভুক্ত। তাঁর ছোটগল্পের সার্থকতা-ব্যর্থতার পরিমাপও এই পরিচয়ের অন্তরালে।

গাল্পিক বিশ্বপতি কথার রসিক;—তাঁর বৈঠকী কথার তরঙ্গ, জমাট গল্প আর আন্তরিকতাতপ্ত তর্কের দীপ্তি সকল শ্রোতাকেই মুগ্ধ করেছে। গল্পের ভূমিতেও কথার ফসল বুনেছেন বিশ্বপতি,—অনেকটাই বিদগ্ধ কথকতার আকারে। 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত 'দু-দুবার' গল্পটি এর এক সার্থক নিদর্শন;—"ছেলেবেলায় খিড়কি পুকুরের ঘাটের পাশে পাশগাদায় যেসব কচুগাছ জন্মাত, তারি কচিপাতা ছিঁড়ে পুকুরের জলে চুবিয়ে নিয়ে যখন দেখতুম, তার উপরে জলের দাগ একটুও ধরেনি, তখন ভারি আনন্দ হতো, কিন্তু বিবাহিত জীবনের পানাপুকুরের মধ্যে মনটাকে দু-দুবার চুবিয়ে ধরেও আজ এই ষাট বৎসর বয়সে তাকে ডেঙায় তুলে নিয়ে যখন দেখি, তার উপরে উক্ত জীবনের একটুও দাগ লেগে নেই, তখন ঠিক ছেলেবেলাকার মত আনন্দ হয় কি না বলতে পারি না।

"আমার বয়স আজ ষাট্ কি তার চেয়েও দু-এক বছর বেশি হবে, কিন্তু এখনও আমি নিজেকে যুবা বলে মনে করি।"

এই paradox-এর বিস্ময়-দোলা দিয়ে গল্পের শুরু। সেই দুর্বোধ্য বিস্ময় মোচনের উপায় হিশেবে নায়ক তার জীবন-কথা বলেছে গল্পে। Theme-এর বিচারে গল্পটি tragedy-করুণ। নায়ক দু-দুবার বিবাহ করে প্রথমা পত্নীর কাছে পেয়েছিল পায়ের নির্ভয়। নবযৌবনে নবীনা বধূর কাছে কৃতজ্ঞতা-বোধকেই প্রখর করে তুলতে চেয়েছিল সে:—গরিবের মেয়েকে বিয়ে করে কত বড় উপকার করেছে তার, সে-কথা বধূর অন্তরে তপ্ত শলাকায় মুদ্রিত করে দিতে পেরেই নায়কের আত্মমহিমাবোধের পরিতৃপ্তি! বউ তার কৃতজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে স্বামীর পদতল আশ্রয় করে রইল;—হৃদয়ের সান্নিধ্যে

৩৫। দ্র. ওরের (দ্বিতীয় পর্ব)।

আসবার আকাঙ্ক্ষার উৎস তার মনে চিররুদ্ধ হয়েছিল। অথচ হৃদয় দিয়ে হৃদয়ের আশ্রয় পাবার বাসনা স্বামীর মনে ক্রমশ অধীর হয়ে উঠলো; কিন্তু দাম্পত্য-সম্পর্কের উষালগ্নে হৃদয়ের অভিষেক না পেয়ে নববধূর যে-মন বোবা হয়ে গেছে,—সে আজ আর কিছুতেই কথা কইতে পারল না। অবশেষে স্বামীর হৃদয়ের যৌবন-বাসনাকে অচরিতার্থ রেখেই জীবনের পানাপুকুরে তার চির বিলয়। ফলে প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরে কোনো বেদনা মনে জাগল না, তার সেবাপুষ্ট পা দু'খানিই কেবল অভাব-পীড়িত হয়ে রইল।

চল্লিশ বৎসরের 'তরুণ বয়সে' নায়ক আবার বিয়ে করলে। দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যাকে নিয়ে যৌবনের ভ্রান্তি সংশোধন করতে সে এবার উঠে পড়ে লাগল; পত্নীর সকল আকাঙ্ক্ষাই পালন করতে লাগল আদেশের মত। ফলে নতুন গৃহিণী তার হৃদয়-বাসনার ধারও ধারল না,—চড়ে বসল মাথায়। আদেশে-উপদেশে, দাবিতে-জবরদস্তিতে মাথা থেকে তার আসন বুকের কাছে কিছুতেই নামল না। "এমনি করে এই চড়ামনিবের হাতে" দশটি বছর নীরবে সব সহ্য করে থাকতে হয়েছিল তাকে। তারপরে সেও চলে গেল মাথার উপরটাকে অভিভাবকহীন করে।

তারপরে দীর্ঘ দিন কেটেছে। নায়ক বলে,—"আজও যৌবনের রত্নসিংহাসন তেমনি করেই খালি পড়ে রয়েছে দেবীর অভাবে। ধূপ-ধূনা দিনের পর দিন কেবল ছাই হয়ে মরছে সিংহাসনের চারদিকে তার কুণ্ডলাকৃতি সুগন্ধি ধূমরাশি ছড়িয়ে ছড়িয়ে। ঘণ্টা বাজছে। আরতি-প্রদীপ জ্বলে জ্বলে নিভে যাচ্ছে। পুষ্প-সম্ভার পুষ্পপাত্রে উন্মুখ হয়ে রয়েছে কার চরণ-স্পর্শের মানসে।

"পায়ের সেবা আমার হয়ে গেছে—মাথার সেবাও মন্দ হয় নি। কিন্তু বুকের সেবা আজও বাকি রয়েছে। হুকুম করবার সাধ আমার মিটেছে; হুকুম তামিল করবার সখও পূর্ণ হয়েছে; কিন্তু আব্দার শুনবার সাধ আজও অপূর্ণ রয়েছে।"

এখানেই শিল্পী বিশ্বপতি চৌধুরীর স্বভাব-প্রকাশ। ওপরের শেষ দু'টি অনুচ্ছেদের প্রথমটিতে যৌবন-বাসনার আবেগ-সুন্দর স্বর্ণবেদী রচনা করেছেন শিল্পী। শেষের অনুচ্ছেদে গল্পকে তার paradox ব্যাখ্যার আদ্যন্ত প্রসঙ্গে বিন্যস্ত করে সেই অনুভবের উত্তাপকে ফিকে করে দিতে চেয়েছেন। বিশ্বপতি চৌধুরীর ব্যক্তি-স্বভাবও এমনি। জাত-শিল্পীর মত নিরতিশয় স্পর্শকাতর তাঁর সৌন্দর্য-পিপাসু মনের আবেগ-অনুভব; কিন্তু সেই সহজ emotion-কে তিনি চিরকাল সযত্নে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছেন wit-এর দীপ্ত হাসি দিয়ে। এখানেই নিজ স্বভাবে অধিষ্ঠিত থেকেও তিনি প্রমথ চৌধুরীর অনুব্রতী।

জীবনবোধের নিবিড়তায় কবোষ্ণ আবেগপুঞ্জকে ছড়িয়ে ফিকে করে দেবার এই কলা-কৌশলে কথার প্রাচুর্য ও বিস্তারকে তিনি হাতিয়ার হিশেবে গ্রহণ করেছেন। ফলে

প্রধানতঃ আবেগ-গর্ভ তাঁর অধিকাংশ গল্পই অতিকথনের প্রান্তরে প্রসৃত হয়েছে, কোনো এক নিটোল ছোটগল্পের সংহতি ও সংক্ষিপ্তির রস-তাৎপর্য আয়ত্ত করতে পারেনি ; যদিও witty ব্যঞ্জনাবহতার অভাব হয়নি তাঁর প্রায় কোনো গল্পেই। 'স্বপ্নশেষ' গল্প এ-কথার সার্থক উদাহরণ। সেও এক স্বভাব-লাজুক লোক-সঙ্গ-বিহ্বল পর্যবসিত-তারুণ্য প্রৌঢ় জীবন-বাসনার অকাল মুক্তি-কামনার ট্রাজেডি। নিবারণের জীবন কেবল অস্বাভাবিক নয়, অদ্ভুতও। বিশ্বপতি চৌধুরীর মত চিত্র-শিল্পী লেখনীর একটি-দু'টি আঁচড়ে সেই আশ্চর্য স্বভাবের সুচিহ্নিত রূপরেখা গড়ে তুলতে পারতেন। তা না করে খণ্ড খণ্ড তথ্য ও incident-এর বিচিত্র-ব্যাপ্ত বিন্যাসের মধ্য দিয়ে একটি মৃদু অস্পষ্ট রেখাঙ্কনে অদ্ভুত চরিত্রের আভাস রচিত হয়েছে ; সরস কথার পুঞ্জ দিয়ে তৈরি হয়েছে এই ব্যাপ্তির আধার ; তাই কেবল কথার জন্যেই কথার মায়া মনে জড়াতে থাকে ; অথচ ছোটগল্পের সংহতি ছড়িয়ে পড়ে ঔপন্যাসিক অতি-বিস্তারে। আগেও বলেছি, শিল্পীর পক্ষে emotion-এর জমাটতাকে এড়িয়ে যাবার এ-যেন এক সচেতন কৌশল। বিশ্বপতি চৌধুরীর সব কয়টি serious গল্পের আগ্রহ মানুষের গোপন মনের দুরবগাহতার প্রতি। কিন্তু সেই অতলস্পর্শ আবেগানুভবের গভীরতাকে স্তিমিত করা হয়েছে witty কথকতার কল্যাণে। 'সেতু', 'মিছে কথা' ইত্যাদি গল্পে প্রকাশের স্মিত হাসির আলোকে নিবিড় জীবন-বোধের অবদমিত একবিন্দু অশ্রু হঠাৎ যেন চকচক করে ওঠে।

নিছক হাসির গল্পও লিখেছেন বিশ্বপতি চৌধুরী। 'বহুরূপী'-তে (১৩৩৯ সাল) ঐসব গল্প সংকলিত হয়েছে। সাধারণ স্বভাবে গল্পগুলো হিউমারাস্ ; কখনো fantasy, কখনো fantastic বিন্যাস তাকে হাসির রসদ যুগিয়েছে। প্রকাশের দিক থেকে শিল্পীর স্বভাব-সিদ্ধ অতিবিস্তার ছোটগল্পের স্বাদুতাকে যেন আরো বেশি শিথিল—ফিকে করে তুলেছে। তবে হাসিটুকু অনবদ্য,—শিল্পীর রসিক আত্মার অকৃত্রিম প্রকাশের দ্যুতি তাতে সুস্পষ্ট মধুর।

'ব্যথা' এবং 'বহুরূপী' ছাড়া লেখকের আরো দু'টি গল্প সংকলন,—'স্বপ্নশেষ', (১৩৩৯) এবং 'সেতু' (১৩৪১ সাল)।

৫। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বাংলা গল্পের জগতে বিমলাপ্রসাদের (১৯০৬ খ্রীঃ) আবির্ভাব কমলালয়-বৈঠকের স্বর্ণযুগ,—তথা 'সবুজপত্রে'র অবলুপ্তির অনেক পরে। তাঁর প্রথম গল্প ডাকবাক্স' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৭ খ্রীস্ট-সালের (১৩৩৪ বাংলা) 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ; অবশ্য 'ডাকবাক্স' যে পরিমাণে গল্প তার চেয়ে বেশি

পরিমাণে একটি সার্থক কথিকা। বিমলাপ্রসাদ পূর্ণাঙ্গ গল্প লিখেছিলেন আরো পরে,—যদিও 'ডাকবাক্স'-র মধ্যেই তাঁর গল্প-শৈলীর বিমিশ্রতাময় স্বভাব স্পষ্ট অভিব্যক্তি পেতে পেরেছিল। সে যাই হোক, সাহিত্যক্ষেত্রে এই পরাগতি সত্ত্বেও প্রমথ চৌধুরীর স্নেহসিক্ত সান্নিধ্যের নিবিড়তা তিনি লাভ করেছিলেন,—ধূর্জটিপ্রসাদের অনুজ বলে নয়, নিজের ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র মূল্যে। 'রূপ ও রীতি'-র (প্রথম প্রকাশ কার্তিক, ১৩৪৬ বাংলা) আসর জমেছিল প্রমথ চৌধুরীর প্রবীণ মননশীলতাকে পুরোবর্তী করেই। 'পরিচয়'-এর সূচনাপর্ব পর্যন্ত এ ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ ছিল।

তাহলেও শিল্পীর মনোধর্মের অনন্যতায় বিমলাপ্রসাদ স্বতন্ত্র। অর্থাৎ প্রমথ-অনুচর এবং ধূর্জটি-অনুজ হয়েও তিনি একান্তভাবে, এমন কি বিশেষভাবেও, অন্তরঙ্গ প্রমথ-গোষ্ঠীর একজন হয়ে ওঠেননি। নিজের শিল্পরীতির কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই খুব জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, 'আমি কোনো দলের নই, প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে আমায় জড়িয়ে দেখার কোনো সংগতি নেই।' তারপর আর একদিন শান্ত স্নিগ্ধ স্বরে বলেছিলেন, 'তা প্রভাব পড়েছে বৈ কি,—খুবই পড়েছে! আমাদের মন গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথ আর প্রমথ চৌধুরীর মাঝখানে। দু'জনের ছাপই পড়েছে লেখায়, তবে সচেতন ভাবে নয়।' নিজের সম্বন্ধে শিল্পীর এই দ্বিতীয় অভিমতকেই যথার্থ বলে মনে করি। আর সেই যৌথ প্রভাবের পরিণামী ফলশ্রুতিতেই তাঁর স্থান প্রমথ চৌধুরীর অনুব্রতী গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে।

গল্পের জগতে রূপ-অন্বীক্ষার আকাঙ্ক্ষাটি বিমলাপ্রসাদের মনে প্রমথ চৌধুরীর প্রত্যক্ষ দান। গল্পের অঙ্গে বিভিন্নতর শৈলীর সমন্বয় বিধানের চেষ্টাতেই শুধু নয়, প্লট্-এর বিন্যাস ও বিস্তার, চরিত্রের ক্রম-সংগঠন, theme-এর পরিকল্পনা ও গ্রন্থন,—সকল দিকেই পরীক্ষামূলক সন্ধিৎসা তাঁর শিল্পি-মনের এক স্থায়ী প্রবণতা। এই বিশেষ attitude প্রমথ চৌধুরীর কাছে পাওয়া। অনেক গল্পের প্লট্, বা theme-এর নির্দেশও দিয়েছিলেন চৌধুরীমশায় ;—যেমন বিমলাপ্রসাদ নিজে স্বীকার করেছেন 'বৈঠকী' গল্প সম্বন্ধে। প্রমথ চৌধুরী একদিন বললেন,—'একালে তোমরা বৈঠক বসাতে জান না, তাই বৈঠকী গল্পও আর জমে না।' এই কথার সূত্রে 'বৈঠকী' গল্পের জন্ম,—এক্স্পেরিমেণ্ট-এর আকারে। গল্পের দেহে অপরাপর সমধর্মী শৈলীর সমাবেশের উৎসাহও তিনিই দিয়েছিলেন। ফলে ধূর্জটিপ্রসাদের গল্পে যেমন সাধারণভাবে গল্প আর প্রবন্ধের বিমিশ্রতা, তেমনি বিমলাপ্রসাদের লেখায় ছোটগল্প একই সঙ্গে ধরেছে কথিকা বা ব্যক্তিত্ব-ধর্মী প্রবন্ধের (personal essay) যৌথ-সমন্বিত রূপ। শুধু তাই নয়, এই সাধারণ গণ্ডী পেরিয়ে শিল্পী তাঁর গল্পে কখনো রূপক, কখনো কাব্য-ব্যঞ্জনাধর্মী সাংকেতিকতার স্বাদও

পরিবেশন করেছেন। এই বিচিত্র স্বাদুতা বিমলাপ্রসাদের স্বতন্ত্র মনের সৃষ্টি হলেও, তার বৈচিত্র্যময় রূপাধার গড়বার প্রেরণা এসেছে প্রমথ চৌধুরীর মনন-সান্নিধ্যের প্রভাবে। এ-সত্য তিনি নিজেও স্বীকার করেন।

অপর পক্ষে রবীন্দ্র-প্রভাবে বিগাঢ় হতে পেরেছে শিল্পীর মনের সহজাত প্রত্যয়-প্রবণতা। এই প্রত্যয়-বশেই বিমলাপ্রসাদ ধূর্জটিপ্রসাদ বা প্রমথ চৌধুরীর থেকে ভিন্ন। এমন কথা বলবার স্পর্ধা নেই যে, চৌধুরীমশায় বা ধূর্জটিপ্রসাদ প্রত্যয়হীন; কিন্তু তাঁদের সৃজনীচেতনার পক্ষে প্রত্যয়বান হতে পারাই শ্রেষ্ঠ সত্য নয়। জীবনের যে-কোনো অনুভব বা অভিজ্ঞতাকে সকল রকমের পূর্ববিশ্বাস-নিরপেক্ষ বৌদ্ধিক পদ্ধতিতে চুলচেরা বিচার করতে পারাই তাঁদের মৌলিক শিল্প-স্বভাব। এদিক থেকে বিমলাপ্রসাদের প্রকৃতি বিপরীতমুখী। Analysis নয়, synthesis-ই তাঁর প্রতিভার স্বধর্ম। শিল্পী হিশেবে প্রধানত: তিনি হৃদয়বান্;—আর প্রত্যয় হচ্ছে হৃদয়ের অন্তর্লীন এক পরিগূঢ় ধর্ম। প্লট্-এর বুননের মধ্য দিয়ে সেই বিশ্বাসকে তিনি একান্ত সংহত করেছেন,—বৌদ্ধিক বিচারের তীব্র আলো প্রতিফলিত করে তাকে বিকীর্ণ বিকেন্দ্রিত হতে দেননি। ফলে বিমলাপ্রসাদের গল্পের শরীরে রয়েছে রূপের বিস্তার ও বৈচিত্র্যের উজ্জ্বলতা, আর অন্তরে একতম জীবন-প্রত্যয়ের সংহতি ও সংশ্লেষ। 'দম্পতি' গল্পে এই সত্যের সুন্দর প্রকাশ।

সুচারু আর কল্যাণী,—আদর্শ দম্পতি। দু'জনের মিলিত প্রাণের সাধনায় দাম্পত্য তাদের অভিনব আর্ট-এর মধুরূপ ধরেছিল। নিভৃত চরিতার্থতার অনুভবে জীবন তাদের স্নিগ্ধ সুরভিত। তার চেয়েও বেশি, সেই জীবন-সিদ্ধির প্রতি বন্ধু ও পরিচিতজনের শ্রদ্ধা, বিস্ময় আর কৌতূহল। বন্ধু অমল এক ছুটির সন্ধ্যায় গিয়েছিল সুচারুদের বাড়িতে। কল্যাণী তাকে দেখেই জানালে, সুচারু তখন বিস্রস্ত মন নিয়ে ভারি বিব্রত। পত্রিকা-সম্পাদকের তরফ থেকে জোর তাগাদা এসেছে, গল্প চাই-ই,—অবিলম্বে। কিন্তু সারাদিন ধরে গল্প খুঁজে খুঁজে হয়রান্, কিছুতেই কিছু মনে ধরা দিচ্ছিল না! অমল ভাবছিল, এমন অবস্থায় ফিরে যাওয়াই উচিত। কিন্তু কল্যাণী তাকে জোর করে এনে পৌঁছে দেয় সুচারুর বসবার ঘরে; তার ভরসা, বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে করতেও সুচারু যদি যথার্থ 'গল্প' একটি গড়ে তুলতে পারে।

বসবার ঘরে প্রশস্ত টেবিলের সামনে বসে সুচারু; তার সামনে খোলা দরজা দিয়ে চোখে পড়ে সুচারুর পড়ার ঘর, পড়ার টেবিল। তাতে পরিপাটি করে গোছানো রয়েছে দামি কাগজ, কয়েকটি সুসজ্জিত দামি কলম। লিখবার পক্ষে মনোভিরাম পরিবেশ,—তবু সুচারুর মনে আসছে না লেখার প্রেরণা। অমল এসে বসল সুচারুর মুখোমুখি

চেয়ারে,—অর্থাৎ পড়ার ঘরটির দিকে পেছন ফিরে। এমন সময় ঘর থেকে টেলিফোন বেজে উঠল। কল্যাণী তাড়াতাড়ি উঠে গেল টেলিফোন ধরতে ;—সুচারু হঠাৎ বলে উঠলো,—'এই টেলিফোন্-এর শব্দ শুনলে আমার একটি কথাই মনে পড়ে।' সে এক গোপন প্রণয়ের কথা। টেলিফোনের তারের মাধ্যমে কোনো এক অদৃশ্য প্রণয়িনীর নিভৃত আত্মনিবেদনের কাহিনী। গল্পের theme-এ 'চারইয়ারি কথা'র চতুর্থ গল্প 'আমার কথা'র ছায়া-সম্পাত ঘটেছে ;—অদেখা নারীর সঙ্গে প্রণয়-নৈকট্যের নিবিড়তা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে দূরভাষ-যন্ত্রের পৌনঃপুনিক দৌত্যের মাধ্যমে। গল্পের দেহেও প্রমথ-ভঙ্গীর প্রভাব সুস্পষ্ট : বৈঠকী বাচনশৈলীর মাধ্যমে মূল গল্প এক সুগঠিত কথিকা বা গালগল্পের আকার ধরেছে।

কিন্তু ঐটুকুই গল্পের শৈলী বা জীবন-বাচ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ নয়। সুচারুর কাহিনী ধাপে ধাপে এগিয়ে অমলকে বিস্মিত, বিমূঢ়,—ক্রমে আরক্ত, উত্তেজিত করে তুলেছিল। যে সুচারু-দম্পতির জীবন-মহিমার পবিত্রতা আর অপরূপতাবোধ পরিচিত সমাজের এক মহৎ বিস্ময়, তাদেরই মধ্যে কি না এমন আশ্চর্য দুঃসহ লুকোচুরি খেলা! স্ত্রীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে রোমান্টিক্ প্রণয়ের অবৈধ খেলায় ডুবেছিল সুচারু। আর আতঙ্কিত উৎকণ্ঠায় অমল লক্ষ্য করছিল, সেই পুরাতন প্রণয়কথার স্মৃতি রোমন্থনে সুচারু এমনই তন্ময় হয়ে পড়েছিল যে, যে-কোনো মুহূর্তে কল্যাণী এসে পড়তে পারে, সে খেয়ালও সে হারিয়েছিল। নিজের জন্যেও অমলের দুর্ভাবনা কম ছিল না। কল্যাণীর আতিথ্যে সংবর্ধিত হয়ে, তারই অনুপস্থিতিতে তার স্বামীর অবৈধ প্রণয়ের গোপন কাহিনী শুনছে বসে, এ-অস্বস্তি তাকে দুঃসহ উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলছিল। কিন্তু সকল উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনার সীমা পেরিয়ে গল্প যে-মুহূর্তে শেষ হল,—ঠিক তখনই হতবাক্ বিমূঢ়তায় অমল দেখতে পেল, " 'চমৎকার হয়েছে,'—বলতে বলতে কল্যাণী দেবী কতকগুলো লেখা কাগজ নিয়ে আমাদের ঘরে উঠে এলেন।"

অমলের মুখ তখন ভয়ে, হতাশায় সম্পূর্ণ বিবর্ণ ক্যাকাসে হয়ে গেছে। তার দুরবস্থা লক্ষ্য করে "সুচারু হো হো করে হেসে উঠ্‌ল" ; কল্যাণীর দিকে চেয়ে বলল,—"অমল বোধ হয় ধরতে পারেনি যে, আমি গল্প রচনা করে যাচ্ছি, আর তুমি সেটা নকল করে নিচ্ছ। না, অমল ?…কিন্তু ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে, ভাই। নইলে টেলিফোনের আওয়াজ থেকে এ-স্বপ্ন কাহিনী রচনা করতাম কাকে ধরে ?"

গল্পের শ্রেষ্ঠ চমক এইখানে। এমন নিবিষ্ট অন্তরঙ্গতার মধ্যে গল্পের মূল কাহিনী গড়ে উঠেছিল যে, এযে সত্য নয়, গল্প,—এ-কথা বলে দিলেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু সুচারুর অট্টহাস, কল্যাণীর স্নিগ্ধ সহৃদয় গল্প সমালোচনা, সব কিছু মিলে একে গল্প

ছাড়া আরো কিছু বলেও ভাববার উপায় থাকে না। তবু এই অপ্রত্যাশিত চমক্-এর চরমতাতেও গল্পের শেষ নয়; জীবন-স্বপ্নের প্রত্যয়বান্ স্রষ্টা বিমলাপ্রসাদ তাঁর মন্ময় বিশ্বাসের দ্যুতি গল্পের দেহে-মনে জড়িয়ে দিয়ে তবে তার ছেদ টানতে পেরেছেন। গল্পশেষে অমল বলে,—"সেদিন আমি ভীষণ প্রতারিত হয়েছিলাম। তবে সে প্রতারণার বিস্ময়-জনিত আনন্দও ছিল। হাঁ...ওরা সঙ্গী বটে। আদর্শ দম্পতি বলে যখন অন্যলোকে ওদের প্রশংসা করে, আমি চুপ করে থাকি। ভাবি সেদিনকার রাত্রির কথা। স্মরণ করি ওদের পরিগূঢ় প্রেম...ওদের বিশ্বাসের পরিপূর্ণতা—যা আমার বাহ্যদৃষ্টিকে মধুরভাবে চমকিত ও প্রবঞ্চিত করেছিল।"

বুঝতে অসুবিধা হয় না, অমলের মধ্য দিয়ে শিল্পী তাঁর নিভৃত ব্যক্তি-বাসনার এক প্রক্ষেপ ঘটিয়েছেন। শেষ ছত্রগুলিতে তাঁর নিজের হৃদয়-স্বপ্নের প্রতিধ্বনিই উচ্চারিত হয়েছে। দাম্পত্যের একটি ভাবময় স্বভাব তাঁর অন্তঃকরণে অরূপ বিভায় সঞ্চারিত হয়েছে,—তার মূল কথা নরনারী হবে পরস্পরের 'সঙ্গী'—'বিশ্বাসের পরিপূর্ণতা' হবে তাদের মিলিত জীবনের বিগাঢ় ভিত্তি। সেই আত্মলীন অমূর্ত আকাঙ্ক্ষার মূর্তিময় ফলশ্রুতি ঘোষণা করেই শেষ হয়েছে 'দম্পতি' গল্প। গল্পের শরীর বিভিন্ন আকারের বিচিত্রতায় যতই খণ্ডিত হোক্,—এ পরিসমাপ্তি কিছুতেই intellectual বা analytic নয়। ব্যক্তিত্বধর্মী প্রবন্ধ, বৈঠকী গালগল্প, আর গল্পের সংমিশ্রিত বহিরঙ্গ আধারে কবির স্বপ্নকে পরিবেশন করেছেন শিল্পী; বস্তুত প্রত্যয়স্নিগ্ধ এই স্বপ্নিল আত্মভাষণেই গল্পের synthetic পরিণাম। ফলে অলোক-সুন্দর এক জীবনমূল্যের প্রগাঢ় বিশ্বাসে 'দম্পতি' গল্পের স্রষ্টা বিমলাপ্রসাদ কেবল গাল্পিক নন, সার্থক কবি-ও।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, ধূর্জটিপ্রসাদ যেমন প্রধানতঃ প্রাবন্ধিক, তেমনি বিমলাপ্রসাদ মূলতঃ কবি। কবিতা লিখেই বাংলা সাহিত্য-সরস্বতীর মন্দিরে তিনি প্রথম প্রবেশাধিকার কামনা করেছিলেন; একথা তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি। পরবর্তী কালে সৃজনশীল গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠা পাবার পরেও তিনি কবিতা লিখেছেন অনেক,—কবিতাপুস্তক প্রকাশ করেছেন একাধিক।[৩৬] আসলে কবিপ্রাণতা বিমলাপ্রসাদের মর্মলীন সম্পদ। তার পরিমাপ রচিত কবিতার সংখ্যা দিয়ে নয়,—আত্মলীন ভাবকল্পনার প্রত্যয়-নিষ্ঠায়। সেই মৌল স্বভাবই বৈচিত্র্য-বিস্তারধর্মী গল্পের বিশ্লিষ্ট দেহে সংসক্তির অন্বয়কে দৃঢ় এক-কেন্দ্রিত করতে পেরেছে। গল্পে জমেছে কবিতার স্বাদ;—সে কেবল ভাবমাধুর্যের প্রভাবে নয়,—ভাবসঙ্গতর স্বপ্নাবিষ্ট কাব্য-স্বাদুতায়ও। 'দম্পতি' একটি আশ্চর্য মিষ্টি রোমানটিক্ গল্প,—যাতে theme-এর চেয়ে কথার স্বাদ অনেক কম নয়।

৩৬। 'সংক্রান্ত' (১৩৪৪), 'সঞ্চার' (১৩৪৮), 'চন্দ্রকণা' (১৩৫০), 'সম্ভবা' (১৩৬০)।

'কথা' আর 'কথ্য' দুই-ই সমবেতভাবে অরূপধর্মী কবিতার রস-বিস্তার করে গল্পকে সাংকেতিক কাব্যের ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করেছে,—তেমন আর একটি গল্প 'সুমনার স্বপ্ন'।

গল্পের শুরু হয়েছে,—"সুমনাকে সকলেরই ভাল লাগে।

"সুমনাকে ভাল না লেগে পারা যায় না, তার অসহায় নিশ্চিন্ততা ভাবিয়ে তোলে। কৃশকায় ছোটো মেয়েটির দিকে সবাই আকৃষ্ট হয়। দূর থেকে তাকে দেখলে মনে হয়—নেহাৎ স্কুলে পড়া মেয়ে। কাছে এলে ভালো করে ঠাহর করলে নজর হয়, তার মুখে-চোখে সূক্ষ্ম বলিরেখা।"

সুমনার দেহের এই পরস্পর-বিরোধিতার মানস-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে গল্পের সারা অঙ্গে সুরের ক্রম-বিস্তারিত আবহ পরম্পরার মত।—

সুমনা আবাল্য বেড়ে গড়ে উঠেছে পিসীমার সস্নেহ সর্বগ্রাসী অভিভাবকত্বের কুক্ষিতলে। ফলে বয়সের দাবি যখন মনের মূল ধরে নাড়া দিতে চায়, তখনো সুমনা নিজেকে মুক্ত করে আনতে পারে না পিসীর সর্বগ্রাসী অভিভাবকতার কবল থেকে। বন্ধুরা বিদ্রোহ করে সুমনার এই চির নাবালকত্ব নিয়ে। কেবল শেফালীই কিছুতে রাগ করতে পারে না; দূরে গিয়েও কাছে কাছে ফেরে; সুমনার ঘুমন্ত মনকে জাগাতে চায় নিজের যৌবন-তরঙ্গায়িত মনের উষ্ণস্পর্শে। গল্পে গল্পে একদিন সুমনা তার নিভৃত স্বপ্ন-কথা বলে শেফালীর কাছে। সাংকেতিক তাৎপর্যে ভরা এই স্বপ্ন-কাহিনীর ইঙ্গিত-মাধ্যমে সুমনার জীবন-সমস্যাকে ব্যঞ্জিত করতে চেয়েছেন শিল্পী রেখাহীন অনুভবের বর্ণে।

স্বপ্নে এক অচেনাপুরীর দ্বারদেশে গিয়ে পৌঁচেছিল সুমনা,—তার বাইরেকার প্রকাণ্ড দেয়ালে দেয়ালে ভরা বিচিত্র রঙের প্রজাপতি। সুমনা বলে, "জগতে এমন আশ্চর্য রঙিন প্রজাপতি আছে, কখনো জানতাম না—কোনোটা ঘোর রঙের, কোনোটা হালকা, আবার কোনোটা এক রঙা, কোনোটা বা পাঁচ মিশেলি, ছিটে ফোঁটা দেওয়া। হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম। এমন সুন্দর।—"

শুধুই কি বিচিত্র সুন্দর প্রজাপতি! তার মাঝে মাঝে রয়েছে দেয়াল-ভরা অপরূপ সুন্দর অসংখ্য ফুলের বর্ণালি! কিন্তু প্রজাপতিগুলোর একটারও প্রাণ নেই,—আর ফুলগুলো সব আঁকা। সুমনা সেই পুরীর দ্বারে দেখতে পায় আপাদমস্তক আলখাল্লায় ঢাকা এক প্রৌঢ়া সন্ন্যাসিনীকে। বড় সেই ঘরটার চারিদিকে আরো ঘরগুলো সব মাথা নিচু পাথরের দেয়ালে ঘেরা। সুমনার হাতের স্পর্শে এমনি একটি ঘরের দ্বার আপনা থেকে খুলে যায়। কৌতূহলী চোখে ঢুকে পড়ে সুমনা সে ঘরের ভেতর। খাটের ওপরে শুয়েছিল এক সন্ন্যাসী যুবা,—পেছন ফিরে শুয়েছিল সে,—তার মুখ দেখবার উপায় নেই,—তবু সুমনা নিশ্চিত বোঝে,—সন্ন্যাসী যুবা,—অপার প্রাণবান্। কিন্তু সুমনা

দীর্ঘক্ষণ থাকতে পারে না সে ঘরে। ছোটঘর থেকে সে বেরিয়ে আসে সেই ফুল-প্রজাপতি-ছাওয়া বড় ঘরে,—সেখান থেকে একেবারে ঘরের বাইরে বারান্দায়, যেখানে বসেছিল সেই আপাদমস্তক-আবৃতা প্রৌঢ়া সন্ন্যাসিনী। ঠাহর করে দেখতেই সুমনার নিজেরই কথায় তার চোখে পড়ে,—"সন্ন্যাসিনীর আলখাল্লার নীচে মাংসবিহীন পায়ের হাড়! চমকে উঠে মুখের দিকে তাকালুম। সেখানেও কঙ্কাল চেহারা।"

সুমনা কিন্তু ভয়ে আঁৎকে ওঠে না, বরং ঐ দেখে কচি খুকীর মত হাততালি দিয়ে খুশি হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে তার। যতক্ষণ ঐ প্রাণবান্ যুবা সন্ন্যাসীর কাছে ছিল, ততক্ষণই যেন ছিল তার আসোয়াস্তি।

গল্প শেষে শেফালী খুটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে ঐ সন্ন্যাসী যুবকের কথা,—কিন্তু সুমনা তাকে একদম ভুলেই গিয়েছিল,—কিছু মনে পড়ে না তার কথা। "বরং খুব স্পষ্ট মনে আছে সন্ন্যাসিনী মা, আর মরা রঙিন প্রজাপতি…… ।"

শোনে আর শিউলি নিরাশ হয়,—সব শেষে স্বগত বলে ওঠে,—"নাঃ কোনো আশাই নেই দেখছি।"

নৈরাশ্য সুমনার সম্বন্ধে,—স্বপ্ন-কথার ভাঁজে ভাঁজে শিল্পী সুমনার যে জীবনরূপ এঁকেছেন, তার পরিণাম সম্বন্ধে। যৌবনের রঙ, তার পুষ্পশোভার সমারোহ সুমনার পিসীমা-তাড়িত নাবালক মনের অবচেতন অভীপ্সার গভীরে দোলা জাগায়! যৌবনের প্রতিষ্ঠা আত্মশক্তির উদ্বোধনে; সহজাত বলিষ্ঠতার অনাপেক্ষিকতায়। সুমনার দেহে যৌবনের জোয়ার আসে, মনে লাগে অজস্র রঙিন প্রজাপতির বিপুল বর্ণাঢ্যতা, ফুলের রূপসুন্দর অরূপ সৌরভ। কিন্তু দেহের প্রাণান্ত বাসনা তবু সুমনার ভীরু মনকে টলাতে পারে না; তার দ্বারদেশে মূক-কঠোর প্রহরায় নিরত পিসীমার বৈরাগ্য-বিধুর সাবধানী কঙ্কাল মূর্তি। সেই কঠোর তত্ত্বাবধানের তাড়নায় সুমনার মনের প্রজাপতি মরে শুকিয়ে যায়, ফুলের সৌন্দর্য হয়ে যায় অর্থহীন মিথ্যা। তার যৌবন-বাসনার বলিষ্ঠ প্রেরণা ধূসর সন্ন্যাসের গৈরিক পরে বিমুখ হয়ে থাকে; তবু সেই বিমুখ শয্যাশায়ী যৌবনের পশ্চাৎভূমিতেও ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই সুমনার। পিসীমার কঙ্কাল-চেতনার নিত্য স্নেহনিষ্পেষণে নাবালকত্বের নির্মোক ভেদ করে স্বশক্তিতে আত্মপ্রকাশ করবার সাধ্য যে সে হারিয়েছে! তাই সেখান থেকে পালিয়ে মরা প্রজাপতি আর আঁকা ফুলের বাসরে প্রৌঢ়া সন্ন্যাসিনীর কঙ্কাল মূর্তি আবিষ্কার করতে পেরে কচি খুকির মত খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে তার। মরা কঙ্কালের ভরসাতেই ত যৌবনের স্বর্ণপ্রকোষ্ঠকে আষ্টে-পৃষ্ঠে মনের গহনে শীর্ণ-পরিধি করেও স্বস্তি নেই তার,—সেখান থেকে পালিয়ে তবে অপার মৃত্যুর মধ্যে তার নিষ্প্রাণ মুক্তি!

তাই সুমনার যৌবনাবিষ্ট দেহে কিশোরীর দূরান্বিত আভাস,—কিন্তু তার ঘনিষ্ঠ স্বরূপে পরাভূত যৌবনের বিষণ্ণ বলিরেখা।

গল্পের সংকেতকে মনস্তাত্ত্বিক প্রাঞ্জলতার পটভূমিতে এনে ব্যাখ্যা করতে চাইলে তার তাৎপর্য অনেকটা এই রকমই দাঁড়ায়। কিন্তু গল্পের পক্ষে সেই বাস্তব পরিচায়নই মুখ্য কথা নয়। যৌবনের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিষ্ঠানময় স্বভাব সম্পর্কে শিল্পি-মনের স্বপ্ন এক নারী-জীবন-রূপের নিভৃতিকে আশ্রয় করে যে গোপন-মধুর সুর-সংকেত রচনা করেছে, তাতেই 'সুমনার স্বপ্ন' গল্পের স্বপ্নাবিষ্ট কাব্যস্বাদুতার সার্থকতা। আর এই রসসাফল্য বিমলা-প্রসাদের প্রত্যয়-সুরভিত অনুভব-প্রধান কবি মনের দান।

কেবল গল্প-বস্তুর পরিকল্পনাতেই নয়, প্রকাশের নব নব অনবদ্যতায়ও তাঁর এই কবি-প্রকৃতির অভিব্যক্তি স্পষ্ট। ভাবের দিক থেকে প্রায় সকল গল্পেরই প্রধান উপাদান উপলব্ধি-নির্ভর স্বচ্ছ জীবন-প্রত্যয়; আর রূপকর্মে রয়েছে সাধারণভাবে গল্প ও কথিকা বা personal essay-র সংমিশ্রণ। কিন্তু এই সাধারণত্বের রূপ-সীমায় গল্পের বিষয় ও আকারগত অপার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন প্রমথ-শিষ্য নিরীক্ষাধর্মী শিল্পী বিমলাপ্রসাদ। যেমন 'বৈঠকী' গল্পে বৈঠকী গালগল্পের স্বাদ—'দম্পতি' গল্পে সংলাপ, কথিকা ও ছোটগল্পের সংমিশ্রণ,—'সুমনার স্বপ্ন' গল্পে তেমনি কিছু কথা, কিছু কথিকা, কিছু symbol কেবল ভাবের বিন্যাস বা রূপের প্রচ্ছদ-সজ্জাতেই নয়, ভাষার কারুকর্মেও প্রায় প্রত্যেক গল্পে বিমলাপ্রসাদের কবিমন বিষয় ও পরিবেশোচিত অখণ্ডতা সৃষ্টি করতে পেরেছে। প্রমথ চৌধুরীর গল্পের ভাষায় আশ্চর্য সজীবতা রয়েছে, যাতে একই intellectual বাচনভঙ্গিকে পরিপাটি বিন্যাসের গুণে নিত্যনূতন বলে মনে হয়। ধূর্জটিপ্রসাদের সকল গল্পেই ভাষার এক এবং অভিন্ন বুদ্ধি-সচেতন দৃঢ়কঠিন রূপ। কিন্তু বিমলাপ্রসাদের গল্পে গল্পে ভাষার নূতন স্বর, নূতন স্বাদ—গল্পের form ও content-কে অবিচ্ছিন্ন সামগ্রিকতার সূত্রে সংশ্লিষ্ট (synthesise) করে তোলাই তাঁর প্রধান অকাঙ্ক্ষা—আর তারই সাফল্যে তাঁর চরম চরিতার্থতাও।

তাঁর অনেক গল্প-কথিকাই আজও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি,—দু'টি মাত্র সংকলন গ্রন্থিত হয়েছে যথাক্রমে ১৯৩৭ ও ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে। বই দু'টির নাম 'পঞ্চমী' ও 'সেকেণ্ডহ্যাণ্ড'।

দ্বাদশ অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্পের দ্বিতীয় পর্ব

কালে কালে বাংলা ছোটগল্পের ভাব-রূপের সন্ধানে এবারে দ্বিতীয় পর্বের সীমাভূমিতে এসে পৌঁছানো গেছে। যেমন কবিতায়, তেমনি বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসেও এ-কাল 'রবীন্দ্রোত্তর যুগ' নামে অভিহিত। রবীন্দ্র-উত্তরণের প্রয়াস বাংলা গল্পে সেদিন সফল হয়েছিল কি না, সে তর্ক বর্তমান উপলক্ষ্যে অপরিহার্য নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে উত্তীর্ণ হতেই হবে,—এই প্রবল উৎসাহে সেকালের একদল তরুণ সাহিত্যিক জোট্ বেঁধেছিলেন; তাঁদের সে সমবেত প্রয়াস ইতিহাসের স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রধানতঃ 'কল্লোল' (১৩৩০-১৩৩৬ সাল), 'কালিকলম' (প্রথম প্রকাশ ১৩৩৩ সাল) এবং 'প্রগতি' (প্রথম প্রকাশ ১৩৩৪) নামক তিনটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এই জুটির সাহিত্যিক যুগান্তর সাধনের চেষ্টা বহিরঙ্গ রূপ ধরেছিল। সেই সঙ্গে আরো ছিল 'উত্তরা', 'ধূপছায়া', 'আত্মশক্তি' ইত্যাদি। এদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী পত্রিকা 'কল্লোল'-এর নামানুসারে এ-কালের জনপ্রিয় নাম বাংলা সাহিত্যের 'কল্লোল যুগ'।

কিন্তু পূর্বে বলেছি, সাহিত্য-ভাবনা ও সাহিত্য-রচনার কোনো স্পষ্ট-সংজ্ঞক স্বয়ম্পূর্ণ আদর্শ হাতে করে আসেননি 'কল্লোল'গোষ্ঠী। এঁদের শিল্পচেতনার মূলে ছিল কোনো এক অজ্ঞাত বন্ধন থেকে অপরিচিত এক মুক্তিলাভের দুর্বার রোমান্টিক্ পিপাসা,—যাকে তাঁরা 'প্রগতি' বা আধুনিকতা নামে অভিহিত করেছিলেন। সদ্য-উদ্ভিন্ন নবীন যৌবনের যে উদ্দাম কলোচ্ছ্বাস অজ্ঞাত রহস্য-লোকের অভিযানে বিপ্লবের ধ্বজা ধরে বেরিয়েছিল, প্রথম সংখ্যা 'কল্লোল' পত্রিকার শুরুতেই তার সাহিত্যিক পরিচয় রচনা করেন সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ :

> "আমি কল্লোল শুধু কলরোল দিশাহীন
> অজানা জানার নয়নের বারি
> নীল চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি
> পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি ফিরে আসি নিশিদিন।
> মনে নাই মোর কোন্ আদিকালে কে দিল এমন ধরা,
> মোর নীল জলে কোন্ গতিহীন
> ঝাঁপ দিল আসি কবে কোন্ দিন ?

চিরদিন তরে জাগাইল এই বিপুল রোষের কান্না!
জানি এই ধ্বনি জনমে মরণে হবে নাকো তার সারা,
যাবে না শুকায়ে সাগরের বুক
যাবে না ঘুচিয়া মানুষের দুখ
তবু নিরুপায় কেঁদে দিন যায় আমি যে বাক্যহারা!

আশা আছে তবু যদি কোনোদিন শত শত যুগ পরে
বধির শিলার ফেটে যায় বুক
গুঁড়াইয়া যায় তার নিজ সুখ,
জলকল্লোল তুলি কলরোল বক্ষ তাহার ভরে।"

এই অস্ফুট বাসনার অতি-উচ্চারিত কলোচ্ছ্বাস বহু বাধাবিপত্তির মুখোমুখি হয়ে ক্রমশঃ আত্মস্থ হয়েছে; ধীরে ধীরে খুঁজে পেতে আরম্ভ করেছে নিজের সুরেখ পরিচয়। বাংলা সাহিত্যের 'রবীন্দ্রোত্তর' পর্বের এই সুস্থির পরিচয় গঠনে কল্লোল-গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁদের মতবিরোধী প্রতিপক্ষ সংগ্রামীদলও অবশ্য-উল্লেখ্যতার দাবি রাখেন। এ-পক্ষে 'বঙ্গশ্রী'-'শনিবারের চিঠি'-র পত্রিকা-নিয়ামকেরা অবশ্যস্মরণীয়,—সেই সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে আসে 'প্রবাসী' আর 'বিচিত্রা'র কথাও। 'প্রবাসী' প্রবীণ সম্পাদকের পরিচালনাধীন প্রবীণ পত্রিকা; 'বিচিত্রা'র প্রকাশ নবীন হলেও, সম্পাদক ছিলেন প্রবীণ কথা-সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বন্দ্বমুখর কোনো সাহিত্যিক জুটির অন্তর্ভুক্ত না হয়েও সেকালের জীবন ও সাহিত্য-ভাবনার একটি সুস্থ ও বলিষ্ঠ রস-রূপায়ণে এঁরা সহায়তা করেছেন। 'প্রবাসী'-'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-বিষয়ক সমকালীন নিবন্ধাদি এবং 'বিচিত্রা'র পাতায় প্রথম প্রকাশিত বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', অন্নদাশংকরের 'পথে-প্রবাসে', মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অতসীমাসী' গল্পের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ফলকথা, 'কল্লোল'-'কালিকলম'-'প্রগতি'র দল যে বিশেষ পথে বাংলা সাহিত্য-ভাবনার মোড় ফেরাতে চেয়েছিলেন; আর অপরেরা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তারই যে প্রতিরোধ করেছিলেন, এই দুই পক্ষের বিপরীত-ধর্মী সৃজনীপ্রবাহের অভিঘাত (impact)-এর প্রভাবে, এবং সহজে স্বচ্ছ-চেতন শিল্পি-সমাজের রচনার সহযোগে বাংলা ছোটগল্প যে নূতনতর ভাবরূপের অভিমুখী হয়েছে ধীরে ধীরে, এবারে তারই পরিচয় সন্ধান করব।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই সেকালের ক্রমপরিবর্তিত জীবন-প্রচ্ছদের স্বরূপ সন্ধান করতে হয়; বারে বারেই বলেছি, নবীন জীবনবোধের অনুপ্রেরণা থেকেই জন্ম নেয় নূতন সাহিত্যের নূতন ভাব ও নবতর কলারূপ। 'কল্লোল' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩০ বাংলা সাল, তথা ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু জীবনের পশ্চাৎভূমিতে 'কল্লোল'-

ভাবনার প্রস্তুতি চলছিল অনেক দিন ধরে। সে হিশেব খুঁজতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের পদ্মাপারের গল্পগুচ্ছের পর থেকে কথা শুরু করতে হয়।

উনিশ শতকের শেষপাদে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প লিখতে আরম্ভ করেন (১৮৯১ খ্রীঃ), তারপরে 'গল্পগুচ্ছে'র পদ্মাপর্ব চলেছে বিশ শতকের একেবারে শুরু পর্যন্ত (১৯০১ খ্রীঃ)। ঐ সময়ে, ১৩০৮ বাংলা সালে, কবি শান্তিনিকেতনে বাস স্থাপন করেছিলেন। অতএব কালের বিচারে পদ্মাযুগের রবীন্দ্র-গল্প উনিশ শতকের ফসল। ভাবের দিক থেকেও রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষ উনিশ শতকের বাঙালি রেনেসাঁসের দান, —এ-কথা মনে করবার কারণ রয়েছে। দুই অব্যবহিত শতাব্দীর জীবন-স্বভাব বিচারের বিস্তারিত ক্ষেত্র এ নয়। কেবল সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলাদেশে মধ্যযুগীয় জীবন-ধারার যে বিপর্যয় ও বিনষ্টি দেখা দিয়েছিল, তারই রন্ধ্রহীন অন্ধকার বিদীর্ণ করে উনিশ শতকের জাতীয় জাগরণের জন্ম।[1] অন্তর-বাহিরের দুস্তর ঝঞ্ঝা-সাগর পেরিয়ে এই জীবন-স্রোত এক সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের তীরে চেতনার তরী ভিড়িয়েছিল। এ বিশ্বাসের মূল কথা ছিল 'plain living and high thinking'-এর আদর্শ। উনিশ শতকীয় বাঙালি রেনেসাঁস্ সকল যন্ত্রণার শেষে আপন আদর্শের অটুট্ সিদ্ধির রূপটি খুঁজে পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে। কবি যেন ছিলেন বিশ্ব-বিধানের পরিণামী কল্যাণে প্রত্যয়ের মূর্ত প্রতীক। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মৃত্যুক্রান্ত জীবনের অন্ধকার গলিতে বাস করেও তিনি 'জন্ম রোমান্টিক্'—তাই, তমসালীন মুমূর্ষু পৃথিবীর কর্ণে তাঁর শেষ অভয় বাণী,—"মানুষের শক্তিকে অবিশ্বাস করা আমি পাপ মনে করি।"

সন্দেহ নেই, রবীন্দ্র-প্রতিভা সর্বদেশকালের মহৎ সম্পদ্, আপন স্বরূপে সে সর্বদেশ-কালের অতীত। অর্থাৎ, তাঁর স্বয়ংসিদ্ধ গতিশীল সৃজনীচেতনা কোনো বিশেষ দেশকালের ভূমিতেই শিকড় গাড়েনি। তাই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেও বিশ শতকের বাংলা, ভারত, তথা সারা বিশ্বের জাগ্রৎমান অভিনব সমস্যা, জটিলতা ও জীবনযন্ত্রণাকে তিনি সত্যদৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছেন,—তাদের রূপ ও মূল্য রচনা করে গেছেন সার্থক আর্য অনুভবের যথার্থতা নিয়ে। অন্যপক্ষে কবির অতুল্য জীবন-প্রত্যয় তাঁর নিজস্ব ধ্যানগভীরতা ও ব্যক্তিত্বের অকল্পনীয় দৃঢ়তার সহজ সম্পদ্। এই প্রত্যয়ের অবিচল ধ্যানাসনে বসেই ইতিহাসের দুঃসহ ক্রান্তিলগ্নে তিনি চির নির্ভয়, চির-আশার আশ্বাসে বিশ্বাসী।

১। দীর্ঘতর আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—ভূদেব চৌধুরী : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' (২য় পর্যায়, ৪র্থ সং)।

তাহলেও রবীন্দ্রনাথের মত স্রষ্টাও স্বয়ম্ভু নন। অর্থাৎ, যে-দেশ ও যে-পরিবেশের অভিজ্ঞতায় নব নব ধারায় বিকাশমান তাঁর মানবিক মূল্য-চেতনা প্রথম পুষ্ট হয়েছিল, তার ফল-পরিণামকে ধারণ করেই বিশ্বমানবের কল্যাণতীর্থে কবির অভিযাত্রা দিনে দিনে ক্রম-পরিণত হয়েছে—নিজের দেশ-কালকে ছাড়িয়ে ক্রমশ আয়ত্ত করেছে পরমতম স্বয়ং-সিদ্ধি। অতএব উদ্ভবের ইতিহাস-বিচারে রবীন্দ্রনাথও উনিশ শতকের প্রত্যয়-নিষ্ঠ বাঙালি রেনেসাঁসের সন্তান।

কিন্তু তার বিপরীত দিক্ থেকে বিশ শতক হল সংশয়ের, হতাশার, এমন কি প্রত্যয়ভঙ্গের যুগ;—কেবল বাংলাদেশে নয় বৃহৎ-বিশ্বেও। বিশ্বের প্রসঙ্গ পরে আসবে,—যেদিন আমাদের গৃহবলিভুক্ নিভৃত নিঃসঙ্গ বাঙালি জীবন আত্মলীনতার নির্মোক-মুক্ত হল, সেইদিন থেকে। তার আগে উনিশ শতকের বিশ্বাস আর বিশ শতকের বিশ্বাসহানির বাঙালি ইতিহাস সন্ধান করে দেখতে হয়। সন্দেহ নেই, মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাস তার আত্মার সম্পদ্। তা হলেও আত্মার অভিব্যক্তিও তো দেহ-নির্ভর; শারীরিক বিকাশের পূর্ণ প্রতিশ্রুতির অভাবে আত্মার ধ্যান নির্ভয় সংশয়হীন হতে পারে না। কাব্য অথবা ভাগবত ধ্যান,—উভয়ক্ষেত্রেই এ-কথা সমান সত্য। উনিশ শতকের বাংলাদেশে 'plain living'-এর মোটামুটি সুস্থির সংগতি ছিল বলেই 'high thinking'-এর স্বপ্ন দেখা স্বাভাবিক হয়েছিল। বিশ শতকে প্রথমোক্ত সংগতির নিশ্চয়তা লুপ্ত হয়েছে বলেই দ্বিতীয়ের প্রতি শ্রদ্ধা অটুট থাকতে পারেনি।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়, উনিশ শতকের বাঙালি জীবন-বিপ্লবের পরিধির মত তার ফল-পরিণতিও ছিল একান্ত সীমিত খণ্ডিত। মোটামুটি ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শহরবাসী বাঙালির পক্ষেই এই আদর্শের প্রভাব যথার্থ কার্যকর হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত উচ্চবিত্ত প্রতীচ্য-ভীরু রক্ষণশীল সমাজের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার প্রদত্ত চিৎ-প্রকর্ষের প্রতি সংশয়-বুদ্ধিই বরং প্রখর ছিল। সেকালের বনেদি ধনীরা ছিলেন বংশানুক্রমে ভূম্যধিকারী। অতএব পুরাতন প্রথার অচলায়তন আঁকড়ে ধরে সুপ্রাচীন লাভের পুঁজিটি অক্ষুণ্ণ রাখবার দিকে ছিল তাঁদের অন্ধ আকর্ষণ। ইংরেজি শিক্ষা দেশের যুব-জনের 'মতিগতি' হঠাৎ বিগড়ে দিতে পারে, এই ভয়ে এঁরা ম্লেচ্ছ বিদ্যার পাড়া মাড়াতে ভয় পেতেন। অপরপক্ষে শিক্ষা-দীন গ্রামীণ প্রজার দলও গতানুগতিক নিয়মের যন্ত্রে নিত্য পিষ্ট হচ্ছিল। কলকাতার বনেদি অধিবাসীদের মধ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, শোভাবাজার ও পাইকপাড়ার রাজবাড়ি বা অনুরূপ কিছু ব্যতিক্রম থাক্‌লেও মোটামুটি সেকালের রেনেসাঁসের সৈনিক এবং ফলভোগী দুই-ই প্রধানভাবে ছিল সমসাময়িক মধ্যবিত্ত শহুরে বাঙালি;—বৃত্তি হিশেবে যাঁরা প্রায়ই ছিলেন চাকুরিজীবী। দেওয়ান নবকৃষ্ণ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ,

অথবা রামমোহন ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রাথমিক অভ্যুদয়ও তো বাঙালির এই সাধারণ জাতীয় বৃত্তিকে অবলম্বন করেই।

ইংরেজ-প্রভাব প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই মধ্যবিত্ত-সমাজও আসলে ছিল ভূমিস্বত্বের উপজীবী। বস্তুতঃ আমাদের দেশে "মধ্যবিত্ত কথাটির উদ্ভব ইংরেজ আমলে। এমন কি ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে কিছু ছিল না। নিতান্তই চাকুরিজীবী বা তৎস্থানীয় সামান্য ব্যবসাজীবী শ্রেণী—তাকেই আমরা বলে থাকি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ;···বাংলায়ও ইংরেজ আমলের পূর্ব পর্যন্ত দুটি শ্রেণীর লোককেই আমরা বিশেষভাবে জানি : তারা হচ্ছে (১) ধনী ও (২) নির্ধন—একদিকে আমীর-ওমরাহ্ রাজ-রাজড়া নবাব-জমিদার ভুঁইঞা প্রভৃতি, আর অন্যদিকে কৃষক বা তৎস্থানীয় জনসাধারণ। মাঝামাঝি রকমের বিত্তসম্পন্ন লোক যে ছিল না তা নয়, কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল এত মুষ্টিমেয় যে, শ্রেণিগত প্রাধান্য তাদের কিছু ছিল না। ইংরেজ আমল থেকে এদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সূত্রপাত।"[২]

ইংরেজ আমলে এই মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী গঠনের কারণ ভূমিস্বত্বের অতিরিক্ত নগদ অর্থ উপার্জনের প্রতিশ্রুতি। মধ্যবিত্ত অর্থে উনিশ শতকে বোঝা গেছে এমন সংগতিবিশিষ্ট মানুষকে, যার 'গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ আর গোয়াল-ভরা গরু' না থাকলেও মোটামুটি 'মোটা ভাত মোটা কাপড়ে'র সংস্থান ছিল পৈতৃক ভূমিস্বত্বকে কেন্দ্র করে। তারপরে বৃহৎ যৌথ পরিবারের একজন-দুজন ব্যক্তি শহরে চাকরি নিয়ে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করতে পারলে মধ্যবিত্ত সংসার সচ্ছল হয়ে উঠ্‌ত। পূজা বা অন্যান্য অবকাশে শহরবাসী ও গ্রামীণ পারিবারিকদের উৎসব-সম্মিলনের মধ্য দিয়ে মোটামুটি যৌথ পরিবার-ধর্মের ঠাটটিও প্রথম দিকে বজায় ছিল। তাতে ভূ-স্বত্বের তত্ত্বাবধান ও অফিসে চাকুরি বা সামান্য ব্যবসাদির দায়িত্ব পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বণ্টিত হয়ে যাওয়ার ফলে আর্থিক দুশ্চিন্তার ভার কম্‌ত; অথচ বিভিন্ন খাতে সকলের উপার্জনের উপস্বত্ব সাধারণভাবে উপভোগ্য হত বলে স্বাচ্ছন্দ্যও ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি।

একদিকে ইংরেজের প্রথম প্রতিষ্ঠা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকতর প্রতিশ্রুতি যেমন এনেছিল, তেমনি ইংরেজি শিক্ষাও 'উচ্চ আদর্শ' পোষণের এক অপার সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ লগ্নে তার পরিচয় ঘোষণা করে গেছেন,—'বৃহৎ মানব-বিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হল একটি মহৎ সাহিত্যের উচ্চশিখর থেকে ভারতের এই আগন্তুকের চরিত্র পরিচয়।···তখন ইংরেজি ভাষার ভিতর

২। নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য—'বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস'।

দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়।... তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে, এক সময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা, একসময় অত্যাচার প্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলণ্ডে। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল, তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংলণ্ডে। মানব-মৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ-চরিত্রে, তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম। তখনো সাম্রাজ্য-মদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয়নি।"[৩]

কিন্তু সে কলুষ-স্পর্শ ঘট্‌তে বিলম্বও ঘটেনি খুব। ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা যত বেড়েছে, ততই জীবনধারণের সুখ-সুবিধার কামনা নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হয়েছে অনিবার্য। প্রথম দিকে ইংরেজের দপ্তরে 'বাবু' বা কেরানি হতে পারাই ছিল ভারতীয় মধ্যবিত্তের পরমার্থ। ক্রমশ আর্থিক উন্নতি-কামনার মান বেড়েছে;—অথচ শিক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধির তুলনায় এ-দেশবাসীর প্রাপ্য চাকুরির সংখ্যা গেছে দিনে দিনে কমে। অতএব বৈষয়িক প্রতিষ্ঠায় উন্নতি ও ব্যাপ্তি কামনার প্রভাবে ইংরেজের খুশির দান নিয়ে শিক্ষিত বাঙালি আর চরিতার্থ বোধ করতে পারল না। এমন কি, কালে কালে বৃটিশ-ভারতের চাকুরিলোকের স্বর্গবাস আই. সি. এস্.-এর পদবি পর্যন্ত দাবি করে বসল; আর তাতে ঠেকিয়েও রাখা গেল না তাঁদের। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম আই. সি এস্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তারপরে ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে সার্থকতা নিয়ে দেশে ফিরলেন আরো তিন জন,—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং বিহারীলাল গুপ্ত। এবার থেকে বিদেশী আমলাতন্ত্রের টনক নড়ে উঠ্‌লো,—ভারতীয় পরীক্ষার্থীর সফলতার পথে নানা বাধার কণ্টক রোপিত হতে লাগল নির্লজ্জ অকুণ্ঠতায়। এই বৈষম্য ভারতীয় মধ্যবিত্তের ইংরেজ-বিশ্বাসের মূলে প্রথম কুঠারাঘাত করল। তারপর ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে নিতান্ত সামান্য কারণে সুরেন্দ্রনাথ আই. সি. এস্. পদ থেকে বিতাড়িত হলেন। ইংরেজের সততায় তখনো অটুট বিশ্বাস; অতএব এদেশের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আপীল করতে তিনি বিলাতে গেলেন টাকা ধার করে। কিন্তু প্রিভি-কাউন্সিল্‌ও বিজিত পরজাতি ও বিজয়ী স্বজাতির মধ্যে দ্বন্দ্বে সুবিচার করতে পারে না—একথা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হয়ে গেল; সুরেন্দ্রনাথের আপীল অগ্রাহ্য হল। শুধু তাই নয়, ব্যারিস্টারি পাশ করা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত পদচ্যুতির ওজুহাতে তাঁকে সনদ দেওয়া হল না।

৩। রবীন্দ্রনাথ—'সভ্যতার সংকট'

ইংরেজের ন্যায়নিষ্ঠার প্রতি ভারতীয় প্রত্যয় এবারে নির্মূল হল। সেই সঙ্গে দেখা দিল ইলবার্ট বিল আন্দোলনের বিষক্রিয়া। আর্থিক এবং অন্যান্য 'আধিভৌতিক উন্নতি-কামনার ক্ষেত্রে ভারতীয়ের তীব্র প্রতিযোগী হয়েও বাংলার মফঃস্বলবাসী কায়েমী-স্বার্থযুক্ত ইংরেজ ধনি-সম্প্রদায় স্বতন্ত্র আইনের সুযোগ উপভোগ করে দেশীয়দের প্রতি বর্বর অত্যাচার করতেন। এই অব্যবস্থার নিরসনের জন্য ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে ইলবার্ট বিল প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু কেবলমাত্র সংঘবদ্ধতার নির্লজ্জ জবরদস্তি দিয়ে এদেশের প্রতাপশালী শ্বেতাঙ্গরা সেদিন বিলটিকে আইনে পরিণত হতে দিলেন না। যে-শিক্ষিত বাঙালি একদিন ইংরেজের দাক্ষিণ্যে আত্মমুক্তি বিধানের স্বপ্ন দেখেছিল, তাঁরাই এবার ইংরেজ-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সংঘ-বন্ধনে উন্মুখ হয়ে উঠলেন।

একদিকে ইংরেজি শিক্ষাকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা বিশ্বমানবিকতামূলক ন্যায়নীতির বিশ্বাস বিচলিত হল। আর একদিকে ইংরেজের প্রবর্তিত চাকুরি-নির্ভর আর্থিক উন্নতির প্রতিশ্রুতিও হয়ে উঠল সংশয়-কণ্টকিত। সেই সঙ্গে মূল ভূমি-জ সম্পদের নির্ভরযোগ্যতাও লুপ্ত হল মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনে। "বাঙালি মধ্যবিত্ত এমন কি উনবিংশ শতকেও জমি-বিহীন ছিল না। জনসংখ্যা যতই বেড়ে চললো, ততই জীবিকার একান্ত নির্ভরশীল জমিজমার বণ্টন হয়ে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে লাগলো। তখন জমির উপর নির্ভর করতে না পেরে ক্রমবর্ধিষ্ণু বিদেশী ব্যবসা-বাণিজ্যের কুঠিগুলোতে কিম্বা সরকারি অফিসগুলোতে তারা চাকুরিজীবী, নয়ত ছোটখাটো ব্যবসাজীবি হতে থাকলো। ফলে বিংশতি শতকে বাঙালি মধ্যবিত্ত বিশেষ করেই জমিজমাহীন।"[৪]

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়, ইংরেজি শিক্ষার প্রেরণা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রভাব, এবং ভূমি-জ আয়ের ক্রম-স্বল্পতার দরুন যৌথ পরিবার-প্রথাও তখন লুপ্ত হয়েছে। ফলে সেদিক থেকেও আর্থিক নির্ভরযোগ্যতার ভিত হয়েছে দুর্বল। আর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) আগে আমাদের দেশে শিল্প-উৎপাদন আরম্ভ হয়নি। অতএব ছোট ব্যবসা বলতে বুঝি সামান্য পুঁজি নিয়ে খুচরো বিক্রি, আর বাণিজ্যকুঠির চাকরি বলতে বাঙালির ভাগ্যে ছিল সদাগরি অফিসের কেরানিগিরি। তাও ছিল সুদুর্লভ। অতএব ইংরেজের মানবিক ন্যায়পরতার প্রতি বিশ্বাসের বিলোপ, ইংরেজ শাসনে আর্থিক সংগতি বিষয়ে প্রাথমিক প্রত্যাশার অবসান, এবং মৌলিক ভূ-স্বত্বের বিনষ্টি,—এই ত্রিবিধ শূন্যতা নিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্তের বিশ শতকে পদক্ষেপ।

এই অবক্ষয়কে সম্পূর্ণ পরাজিতের মনোবৃত্তি নিয়ে গ্রহণ করেনি সেদিনের বাঙালি। ইংরেজের দরবারে সব চেয়ে পরাভব ঘটলো যাঁর, সেই সুরেন্দ্রনাথই দেশের মনে মুক্তির

৪। নৃপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য—'বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস'।

আলো জালতে এলেন পৃথিবীর বিপ্লব-ইতিহাসের বারুদ-স্তূপ হাতে করে। জাতীয়তা-মন্ত্রে সেই দীক্ষার ইতিহাস বিবৃত করে বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন,—"সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মি-প্রতিভাই আমাদের সমক্ষে আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শকেও উজ্জ্বল করিয়া ধরে। ম্যাট্‌সিনীর দৈবী প্রতিভা, গ্যারিবল্‌ডির স্বদেশ-উদ্ধার-কল্পে অদ্ভুত কর্মচেষ্টা, য়ুন ইটালী (Young Itali) সম্প্রদায়ের ও নব্য আয়র্লণ্ডের (New Ireland) আত্মোৎসর্গপূর্ণ দেশচর্যা, এ-সকলের কথা সুরেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এদেশে প্রচার করেন এবং তাঁহার এইসকল ঐতিহাসিক শিক্ষাকে আশ্রয় করিয়া পূর্বে আমাদের যে স্বদেশাভিমান বহুল পরিমাণে কবি-কল্পনা ও পৌরাণিকী কাহিনী অবলম্বন করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাই এখন স্বদেশের ও বিদেশের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে সত্যোপেত বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিল।"[৫]

এখানেও লক্ষ্য করি, বাংলাদেশে স্বাদেশিকতা-বোধের সম্ভ্রম-চেতনা, এবং সেই সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিপ্লব সাধনের আকাঙ্ক্ষাও ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সাধনা-প্রসূত; অবশ্য এই নতুন বিপ্লব-যজ্ঞের সৈনিক আশাহত মধ্যবিত্ত বাঙালি। আগে রবীন্দ্র-গল্পের প্রসঙ্গে দেখেছি উনিশ শতকে বাঙালির রেনেসাঁস বিশেষ কারণ বশেই গ্রামীণ সমাজের প্রতি বিমুখ ছিল চিরকাল। বিশ শতকের শুরুতেও সেই বিমুখতা কাটেনি। বরং গ্রাম্য ভূমি-স্বত্বের অধিকার লুপ্ত অথবা অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ার দরুন গ্রাম-বাংলার সঙ্গে শিক্ষিত শহুরে বাঙালির পরোক্ষ যোগটিও নিঃশেষিত হল। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, শহুরে বাঙালির গ্রামীণ ভূমি-সম্পদের মধ্যস্থতাই বাংলা সাহিত্যে পদ্মাপারের রবীন্দ্র-রচনার স্বর্ণযুগের ধাত্রী। এবারে সেই সংযোগ-সেতুও লুপ্ত হল। বিশ শতকের প্রথম পাদের এই নবপরিবেশে ক্রমবিবর্ধিত মধ্যবিত্ত শহুরে বাঙালি জীবন-সমুদ্রে নিঃসঙ্গ দ্বীপের একাকিত্বে চির-নির্বাসিত।

নতুন জীবন-সংযোগের অবকাশ এল কার্জনী বাংলায়। বঙ্গভঙ্গ-কে (১৯০৫-১৯১১) উপলক্ষ্য করে 'স্বদেশীর' যে ঝড় সারা দেশের ওপরে বয়ে গেল, তাতে শহরের বাঙালি আর গ্রামের বাঙালি অভিন্নহৃদয়তার নৈকট্যে অপেক্ষাকৃত নিবিড় হয়ে এল। 'বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন' শহরে-গ্রামে সবাই এবার অবিচ্ছিন্ন ঐক্যে বাঁধা পড়ল। বঙ্গভঙ্গের জীবন-পণ সংগ্রাম সার্থক ফলপ্রসূ হয়েছিল,—কার্জন-এর 'settled fact' unsettled হয়েছিল,—ভাঙা বাংলা জোড়া লেগেছিল। কিন্তু আন্দোলনের সার্থক উদ্‌যাপনের পরে সমুচিত ইন্ধনের অভাবে 'স্বদেশী'র প্রস্তুতি গেল নিভে। তাতে মধ্যবিত্ত যুবচিত্তে নৈরাশ্যের অবসাদ আরো ব্যাপক হয়েছিল।

৫। 'মুক্তির সন্ধানে ভারত'—(যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত)-এ উদ্ধৃত।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের বারাণসী অধিবেশনে সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে স্পষ্ট ভরসা করেছিলেন, বাংলায় সঞ্চিত বিপ্লবের আগুন ভারত-মুক্তির সাধনায় সার্থক সমিধ ও অগ্নিশলাকার ভূমিকা নেবে।[৮] বাংলাদেশের গণনায়ক ও বিপ্লবের স্বেচ্ছা-সৈনিকেরাও এই একই ভরসা করেছিলেন একান্তভাবে। কিন্তু ভাঙা বাংলা জুড়ে যেতেই দেখা গেল অতদিনের অত আগুনে হঠাৎ যেন জল পড়েছে। সেদিনকার বাংলার নাভিকুণ্ডের আগুনকে সারা ভারতের যজ্ঞশালায় প্রদীপ্ত করে তুলতে পারত জাতীয় কংগ্রেস। কিন্তু ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে সুরাট কংগ্রেসে দক্ষযজ্ঞের পর আত্মস্থ হতে এই প্রতিষ্ঠানের সময় লেগেছিল প্রায় দশ বছর (১৯১৬-১৭)। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল। অতএব সব দিকেই তখন অনিশ্চয়তা। কংগ্রেস তার নব-সঞ্চিত শক্তি-পরীক্ষার যুদ্ধ-ভূমিতে দাঁড়াতে পেরেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে। ১৯১৯-২২-এর গান্ধী-কংগ্রেসে গণ-সংযোগ সাধনের সর্বভারতীয় যজ্ঞের সূচনা ;—নূতন আশার দিগন্তভূমি নূতন সম্ভাবনায় আলোকিত হয়েছে আবার। কিন্তু গান্ধী-সাধনা মন্থর-গতি। তাঁর যুদ্ধ রাজনীতিকের নয়,—ধ্যানী সাধকের। প্রতিপদে নিজ আত্মার আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তবেই সত্যাগ্রহের প্রতি তাঁর সুধীর অভিযাত্রা। পরিণামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তিনি প্রায় প্রথম থেকেই সুনিশ্চিত-চেতন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়,—তাঁর আদর্শ 'স্বরাজ' ;—খালি দেহের নয়, আত্মার 'স্বরাট'-ত্বে যার সার্থক উদ্‌যাপন। আর তিনি জানেন, 'means justifies the end;'—পরিণামের মত উপায়কেও বিশুদ্ধ হতে হবে। অতএব আত্মিক বিশুদ্ধি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে না পারলে সত্যাগ্রহের হাতিয়ারও তিনি কখনো প্রয়োগ করতে পারেননি। অথচ একেবারে প্রথম থেকেই আত্মার নিঃশেষ পরিচয় আবিষ্কার করতে পারা গান্ধীজির পক্ষেও নিতান্ত সহজ ছিল না। অতএব ১৯২০-৩০ এই দশ বছরে গণ-সংযোগ নানা আকারে ক্রমব্যাপ্ত হয়ে এলেও জাতির যৌবন-চেতনায় অনিশ্চয়তার শংকা পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি।

১৯৩০ নেহরু কংগ্রেসের যুগ ;—পূর্ণ স্বাধীনতার নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা ধ্বনিত হল জবাহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে। অতএব এবার সংগ্রামের উৎসাহ এবং প্রয়াসও হল সুরেখ—সুনিশ্চিত। ১৯৩০-১৯৫০ ;—বিশ শতকের প্রথমার্ধের এই শেষ কুড়ি বছরের ইতিহাস প্রতি পদে পতন-অভ্যুদয়ে বন্ধুর। প্রথম পর্যায় ১৯৩০-১৯৪১ ;—বিশ্বব্যাপী আর্থিক মান্দ্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রেশাক্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ফল-পরিণতি এবং পৃথিবী জোড়া অনিশ্চয়তা বোধ একদিকে ভারতের,—বাংলার যৌবন-ভাবনাকে অবসন্ন করেছে ; আর একদিকে ঐ একই পর্যায়ে কংগ্রেসে নব উদ্দীপনা, সমাজতন্ত্রবাদ-প্রভাবিত নূতন

৮ দ্রষ্টব্য—হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ—'কংগ্রেস' ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বপ্লব উত্তেজনা, এবং সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটনের অগ্নিময়ী প্রেরণা ইত্যাদি সবকিছু মিলে বাংলার পথহারা তারুণ্যের কর্মশক্তিকে মৃত্যুযজ্ঞের মহৎ-ভীষণ পরিণামের পথে আকর্ষণ করে চলেছে। এরই মধ্যে ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বসমরের আগুন জ্বলল:—ভারত তথা বাংলাদেশের অর্থ-সমাজ-ও-রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব ১৯৪১-এর আগে প্রকট হয়ে ওঠেনি। ঐ সময়ে সিঙ্গাপুরের পতন ও তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের অভিঘাতে বাঙালির সার্বিক জীবন-ভূমিতে নূতন সাধনা চলেছে। সে আর এক নূতন যুগ—নূতন বাণী,—নূতন করে বিষামৃতসিন্ধুর নব-মন্থন।

সে সব প্রসঙ্গ পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনা প্রতীক্ষা করবে। এমন কি ১৯৩০-উত্তর নূতন প্রেরণাদীপ্ত যুগের ধাত্রীত্বে যেসব শিল্পীর সৃজনী-চেতনা লালিত হয়েছে,—যৌবনের প্রাণোত্তাপ আহরণ করেছেন যাঁরা সেই যুগ-জীবনের আকাশে বাতাসে,—তাঁদের নূতন ভাব-প্রকরণ-সিদ্ধ সৃজনকর্মের পরিচয় সন্ধান পরবর্তী স্তরের দায়িত্ব। ১৯৩০-এর আগেকার শিল্পিকুল, ১৯৩০ বা তার আগে-পরে প্রতিভার নিশ্চিত স্বাক্ষরবহ গল্প যাঁরা প্রকাশ করেছেন, তাঁদের কথা নিয়ে বাংলা ছোটগল্পের দ্বিতীয় পর্বের উপাদান। অর্থাৎ 'ত্রিশ-পূর্ব' অনিশ্চয়তা-কম্পিত জীবন-ভূমিতে জন্ম নিয়ে যাঁদের সৃজনী-চেতনা বর্ধিত হয়েছে এক সীমাহীন দ্বিধা-নৈরাশ্যের পীড়িত প্রান্তরে,—তাঁদের কথা স্মরণ করেই বাংলা গল্প আর গল্পকারদের দ্বিতীয় স্তরের আলোচনা শেষ করব।

কিন্তু তাহলেও কেবল কংগ্রেসের ইতিহাস দিয়েই আলোচ্যকালের দ্বিধা-সংশয়-নৈরাশ্যভরা জীবন-সংগ্রামের পরিচয় হয় না। বঙ্গভঙ্গ যখন শেষ হয়েছে, স্বদেশীর উত্তাপ নিভে গেলেও তখনো জাতির যুবচেতনায় বিপ্লবের আগুন একেবারে মরে যায়নি। মোটামুটি বঙ্গভঙ্গের যুগ থেকেই বাংলাদেশে সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রত্যক্ষ সক্রিয়তার আকার ধরে। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট এলেনসাহেব পৃষ্ঠদেশে গুলিবিদ্ধ হন, কিন্তু আততায়ী ধরা পড়েনি এবং এলেনও সে যাত্রা বেঁচে গিয়েছিলেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ্যে প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেন;—ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে মৃত্যুদণ্ড বরণ করেন। দেশ-জননীর শৃঙ্খল-মোচনের সংগ্রাম-ব্রতে প্রথম দুই বিপ্লবী শহীদ প্রফুল্ল আর ক্ষুদিরাম। তারপরে বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য করে সে আগুন কেবল জ্বলেছে দীপ্ত থেকে দীপ্ততর হয়ে; বঙ্গভঙ্গ স্থগিত হয়ে গেলেও থেমে পড়েনি। স্বৈরাচারী শাসক-শক্তিকে ক্ষমা করতে পারেনি বাংলার অগ্নিব্রতী তরুণ দল। প্রথম বিশ্বসমরের সুযোগ নিয়ে বিদেশ থেকে অস্ত্র এনে দেশমাতৃকার বন্ধনমোচনের বিস্ময়কর প্রতিজ্ঞায় অসাধ্যসাধন করেছিলেন এঁরা। কিন্তু ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে বালেশ্বরে বাঘা-যতীন-এর পরাজয়ের পর একে একে শেষ আশার দীপটিও নির্বাপিত হতে লাগল।

অন্যপক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ একদিকে অভাবিতপূর্ব দুর্মূল্যতা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জীবন-উপাদানের অবিশ্রান্ত দুর্লভতার বিভীষিকা নিয়ে দেখা দিল। সেই সঙ্গে যুদ্ধ ছাড়া অপর কোনো স্বাভাবিক ক্ষেত্রে জীবিকার্জনের পথও প্রায় নিরুদ্ধ হয়েছিল।

যুদ্ধ যেদিন শেষ হল, তখনো বিশ্বাসের দীনতা বাড়ল, অথচ অর্থনৈতিক জীবনের আশংকা কমল না। বরং বাংলার ওপরেই নূতন চাপ এসে পড়ল। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিফরম্‌-এর কল্যাণে অর্থ, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় ছাড়া প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হল। অর্থাৎ নিজের আয়ে নিজের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব এল; অথচ কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত দায়-এর বাবদ প্রতি প্রদেশকে আপন রাষ্ট্রিক আয়ের এক বিরাট অংশ ভারত সরকারকে দিতে হত। সে দায় আবার বাংলাদেশের ওপর চাপানো হল সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া আরো নানা খাতে বাংলাদেশ তার মোট আয়ের শতকরা পঁচিশ ভাগ মাত্র নিজের জন্য রাখতে পারত, যেখানে মাদ্রাজ তার নিজের জন্য ব্যয় করতে পারত মোট রাষ্ট্রিক আয়ের শতকরা আশি ভাগ।[৭]

বাংলাদেশ নিজের জন্যে ব্যয় করতে পারত আয়ের অনুপাতে সবচেয়ে কম, অথচ তার মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আগে শিক্ষিত বাঙালি অপরাপর প্রদেশে নানা প্রয়োজনীয় কর্মে নিযুক্ত হতে পারত। অতদিনে তাদের মধ্যেও শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়েছে; পর-প্রদেশের লোকের প্রবেশ ক্রমে হয়েছে সীমিত বা নিরুদ্ধ। তাছাড়া বাংলার বাইরে বাঙালিদের ছড়িয়ে পড়ার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শাসকদের মনোভাবও একান্ত প্রতিকূল হয়ে উঠছিল।

অতএব ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের জন্মকাল থেকে শুরু করে ১৯১৯-২২-এর পরে গান্ধী-কংগ্রেসের পূর্ণবিকাশের আগে পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালিসমাজে জন্মে যাঁরা বড় হয়েছেন, বিশেষ করে যাঁদের মন বয়ঃসন্ধির স্বপ্নলোকে প্রথম জেগেছে স্বদেশী যুগোত্তর (১৯১১) পটভূমিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রায় মুখোমুখি,—তাঁদের মনোগঠনের পটভূমি ছিল নিরবচ্ছিন্ন বিনষ্টি ও হতাশার মধ্যে যৌবনের ব্যাকুল পথ খুঁজে বেড়ানোর উৎকণ্ঠায় আকুল। 'কল্লোল'-সমকালীন গল্প-শিল্পীদের রচনার এইটি সাধারণ লক্ষণ,—অন্ধকার, আলো-হাতড়ানো,—ক্বচিৎ এক-আধ ঝলক আলোর সন্ধান লাভ।

সেই সঙ্গে জীবন-চিন্তার আরো একটি সাধারণ অভিনবতা লক্ষ্য করি একালের প্রায় সকল শিল্পীর গল্পে;—সে নর-নারীর জীবন-সম্পর্কের অকুণ্ঠ শারীর বিশ্লেষণ। প্রাচীনতম কাল থেকেই মানুষের সাহিত্যের প্রধান সম্পদ নর ও নারীর পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের অপার রহস্যময়তা। সন্দেহ নেই, এই রহস্য-সম্পর্কের অনেকখানিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে

৭। দ্রষ্টব্য: নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য—'বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস'।

যৌন বাসনার দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু দেহের ক্ষুধা মনের গভীরে বিচিত্র সমস্তার রহস্যজাল কি করে বুনে চলে, তার গ্রন্থি মোচন দীর্ঘকাল সম্ভব হয়নি। ফলে নরনারীর প্রণয়-সম্পর্কের রূপ-সন্ধান অনেক সময়েই রোমান্টিক রহস্য-কল্পনার জগতে আত্ম-অপসারণ করেছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই চিরন্তন রহস্য-জিজ্ঞাসার বিজ্ঞান-স্বীকৃত বাস্তব উত্তর নিয়ে দেখা দিলেন সিগ্‌মুণ্ড্ ফ্রয়েড্ (১৮৫৬-১৯৩৯)। নরনারীর সকল হৃদয়-সম্পর্কের গভীরে নিহিত চেতন-অচেতন-অবচেতন যৌন আক্ষেপের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে মনোবিকলন শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা ঘটল। য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক মহলে ফ্রয়েড্-এর আবিষ্কার স্বীকৃতি পেতে পেরেছিল উনিশ শতকের শেষ দশকের আগে নয়। এ দেশে তার এক-আধটু আভাসই কেবল ভেসে আসছিল। ফ্রয়েড-এর তত্ত্বকে আরো দুঃসাহসিক পটভূমিতে প্রয়োগ করে মনোবিকলনের ক্ষেত্রে যৌন-চিন্তাকে দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠা দিলেন ইংলণ্ডের চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হ্যাভলক এলিস্ (১৮৫৯-১৯৩৯)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পৃথিবীব্যাপী অবসন্নতার যুগে ফ্রয়েড্, এবং বিশেষ করে হ্যাভ্‌লক এলিস-এর সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের তরুণ সমাজে নূতন চঞ্চলতার সৃষ্টি করল। নতুন যুগের সাহিত্যে এর প্রভাব দুই পথে প্রসারিত হয়েছিল। প্রথমত নরনারীর প্রণয়-সম্পর্কের যুগ-যুগব্যাপী রহস্যকরতার অর্গল খুলে যাওয়ার দরুন দুজ্ঞেয়কে আবিষ্কার করার এক আশ্চর্য আনন্দ-উল্লাস লক্ষিত হল। তার ফলে প্রসঙ্গত প্রণয়-বৃত্তির অলক্ষিতপূর্ব নানা নূতন রূপ-জটিলতা ও সূক্ষ্ম কুটিল বিভঙ্গ এবারে দৃষ্টিগোচর হল। অন্যপক্ষে যৌবনের নিষিদ্ধ কৌতূহল চরিতার্থতার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা এক নতুন আশ্রয় পেল এই বিজ্ঞানসমর্থিত দেহ-বিকলন-প্রচেষ্টার মধ্যে। ফলে নরনারী-নির্ভর গল্পের দেহে প্রণয়-কল্পনার অসংখ্য বৈচিত্র্য, প্রণয়-প্রবৃত্তির জটিলতা বিশ্লেষণে দুঃসাহসী প্রয়াস, এবং কল্পনাপ্রধান বিষয়-জগতেও বাস্তব দৃষ্টির প্রক্ষেপ-চেষ্টা, সবকিছু মিলে নূতন জীবন-চিন্তার সঙ্গে গল্পের নূতন কাহিনীও রূপকল্পের সম্ভাবনাকে যেন সহজেই উৎসারিত করে তুলেছিল।

এখানেও শেষ নয়, দিগন্তব্যাপী ভাঙনের দিক্‌চক্রবালে এক নবীনতর জীবন-আবিষ্কারের উষারুণরাগ আভাসিত হতে পেরেছিল সেদিনের বাঙালি মধ্যবিত্ত চেতনায়। ইংরেজের গড়া নাগরিক আভিজাত্য ও ইংরেজি সাহিত্য-দর্শনের স্বপ্নলোকে নির্বাসিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণের মন এবারে অর্থ-ও-রাজনৈতিক অবস্থার প্রয়োজন-তাড়নায় বাংলাদেশ-তথা বৃহত্তর ভারতেও অশিক্ষিত নিরাশা-শঙ্কা-অন্ধ-বিশ্বাসে পীড়িত গ্রামীণ এবং শ্রমিক মানুষের সান্নিধ্যে এসে পৌছালো। গ্রামের "লাঙল ও বহু পুত্রকন্যা-সর্বস্ব চাষী" এবং কয়লা-কুঠির শ্রমিকের জীবনে হঠাৎ-আবিষ্কৃত মানব-প্রাণের সুমহৎ জটিল বৈভবের পরিচয় সেদিন চকিত—অভিভূত করেছিল তাঁদের। মানুষের রহস্য-কুটিল চিরন্তন ইতিহাসকে,

—চিরন্তন মানুষকে খুঁজে পাওয়ার এই নূতন বিস্ময় অবক্ষয়-পীড়িত হতাশ বাঙালির তারুণ্যের অন্তরতলে এক অভিনব উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। ওদের কদর্য দরিদ্রতা, সভ্য নীতিবোধের তাপ-ভারহীন unsophisticated দেহ-মনের নগ্নতা, নিরাভরণ ক্ষুধা-লালসার সর্বাঙ্গে জড়ানো সহজ স্বতঃস্ফূর্ত মানব স্বভাবের আদিম উদাত্ততা, মধ্যবিত্ত রুচিবোধের সঙ্গ নিগড়-মুক্ত এই তরুণ শিল্পিদলের হাতে জীবন রচনার এক নূতন সম্পদ তুলে দিল।

ফলে পরিচিত জীবন-ভূমির ক্রম-অপসারণ, অপ্রত্যাশিত পরিত্যক্ত সামাজিক প্রতিবেশে নতুন জীবন-প্রচ্ছদের আবিষ্কার, এবং দেহ-মনের অতলান্ত গোপন-লোকে ক্রান্তদর্শী নতুন মনোবিজ্ঞানের প্রক্ষিপ্ত দীপ্ত জীবনালোক,—যুগধর্মের এই সাধারণ উপাদান বিভিন্ন শিল্পীর নানামুখী অভিজ্ঞতা ও মনোভঙ্গির আধারে প্রতিফলিত হয়ে বিচিত্র আকারের ছোটগল্পের মূর্তি ধরেছে;—বিচিত্র এ'রা যেমন আঙ্গিকে, তেমনি জীবন-বাচ্যে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মরণশীল মানুষের জীবন তল থেকে আহরণ করে এনেছেন মানব-চেতনার দুর্মর প্রাণ-বাসনাকে,—দেহের পাকে পাকে জটিল মনের মণিদীপ্ত সর্পিল গতিকে যে আকণ্ঠ উপভোগ করতে চেয়েছে তার বিষামৃতের পসরা নিয়ে। তাতে যত অবসাদ—উল্লাসও তত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বস্তু-ভূয়িষ্ঠ জীবনায়নে মানবজগতের সেই অতলান্ত পাতালপুরীতে প্রবেশের নতুন চাবিকাঠি খুঁজে পাওয়া গেল,—এই নতুন জগতে মানুষ শরীরের বেড়াজালে কেবল পাক খেয়ে মরে না,—তার চোখে ভোগের অন্ধ মত্ততার চেয়ে বিদ্বেষের বিষদীপ্তি ঝলসে ওঠে, হাতে উদ্যত হয়ে ওঠে প্রতিবিধানের,—আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বর্ম-কৃপাণ। 'কেরাণী জীবন'-এর অবক্ষয়িত ভিত্তিভূমি বিদীর্ণ করে লাঞ্ছিত মানুষের মিছিল পথে এসে দাঁড়ায় আরো নিচের তলা থেকে। তারাশঙ্করের হাতে বীরভূমের রুক্ষ মরময় লালমাটি কথা বলে ওঠে যেন লোকোত্তর মায়ামন্ত্র বলে,—ডোম-বাউরি-অন্ত্যজদের উদাত্ত আদিম জীবনের শোভাযাত্রার পাশে পাশে 'জলসাঘর', 'সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার'-এর মত গল্প জমে ওঠে,—যার গভীরে সঞ্চিত হয়ে আছে অবক্ষয়িত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত জীবন-ঐতিহ্যের পুঞ্জিত দীর্ঘশ্বাস। শৈলজানন্দ বলেন কয়লাকুঠির রূপ-কথা। এমনি আরো নানা সিদ্ধকাম শিল্পী বলেছেন অপরূপ জীবনকথা। অভিজ্ঞতা আর বক্তব্য যেমন বিচিত্র অভিনব—তেমনি নিত্য-নূতন বলার ভঙ্গী আর রসাবেদন,—কোথাও আশা, কোথাও নৈরাশ্য, কোথাও উদ্দীপনা বা অবসাদ,—আবার কোথাও নিঃস্ব অন্তর-জীবনের বাহিরঙ্গে কৃত্রিম প্রসাধনের ব্যর্থ প্রলেপ। সব কিছু মিলে একালের গল্পের দেহে আর প্রাণে এমন অপার বিচিত্রতা, এমন কি এমন স্ব-বিরোধিতাও,—আধুনিক বাংলা কবিতা সম্বন্ধে

বুদ্ধদেব বসুর উক্তির[৮] প্রতিধ্বনি করে যার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে,—"একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের প্রতিবাদের গল্প[৯] সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের; আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি।"

বিশ শতকের শুরুতে অবক্ষয়-পীড়িত দুর্মর যৌবনের আত্মমুক্তির এক অন্তহীন অভিসারকে উপলক্ষ্য করে বাংলা ছোটগল্পের ভাব এবং রূপমূর্তিতে সেই বিচিত্রস্বাদী আধুনিক মর্জির সন্ধান করব এবারে।

সব কিছু মিলে লক্ষ করব, কেবল জীবনবাচ্যে নয়, বলার ভঙ্গিতেও পুরাপ্রচলিত ছোটগল্পের মৌল সংস্কারকেও এই নতুন মর্জি প্রায়ই ভেঙে গড়তে চেয়েছে। এবারকার অনুসন্ধানও তাই নূতন দৃষ্টিকোণের অপেক্ষা করবে নিঃসন্দেহে।

৮। দ্রষ্টব্য: 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সঙ্কলনের ভূমিকা।

৯। মূল "কবিতা" শব্দের পরিবর্তে "গল্প" শব্দটি বর্তমান লেখকের প্রয়োগ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দ্বিতীয় পর্বের বাংলা গল্প (১)

কল্লোলের ধারা

১। পূর্বসূত্র

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে মধ্যবিত্ত বাঙালির অবক্ষয়ের ইতিহাসকে আশ্রয় করে নূতন জীবন-প্রতিক্রিয়ার যে রসদ সঞ্চিত হচ্ছিল দিনে দিনে, তার দ্বিধাহীন স্পষ্ট উৎসার চোখে পড়ে 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর সাধনায়। 'কল্লোল,' 'কালিকলম' ও 'প্রগতি' পত্রিকার ত্রিধারায় আসলে একই বাসনার ধারা ত্রিস্রোতা বয়েছিল। পরে প্রবাস থেকে সেই ধারায় কিছু রসের যোগান দিয়েছিলেন 'উত্তরা'-র সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'কল্লোলে'র রচনাপ্রবাহকে একটিমাত্র শ্রেণীর নিগড়বদ্ধ করা সহজ নয়। আগের অধ্যায়ে দেখেছি, সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতিগত সর্বময় অবক্ষয়ের সাধারণ প্রেক্ষিতকে কেন্দ্র করে নরনারীর জীবনপথের নানা অনাবিষ্কৃত রহস্য-পথে সন্ধানের আলো ফেলেছে একালের ছোটগল্প। তার মধ্যে 'কল্লোল'-গোষ্ঠী জনপ্রিয়তা ও জনবিরুদ্ধতার প্রবল ঘূর্ণী ঝড়ের মুখে এসে পড়লেন প্রধানভাবে যৌন সম্পর্ক-চিত্রণের অতি-কৌতূহল ও দুঃসাহসিকতার প্রভাবে। অচিন্ত্যকুমারের প্রথম যৌবনের সৃষ্টি প্রথম গল্প 'বেদে'-তে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ "মিথুন প্রবৃত্তির পৌনঃপুন্য" লক্ষ্য করেছিলেন।[১] এ-যুগের তরুণ লেখকদের অনেকের রচনায় কেবল পৌনঃপুন্য নয়, মিথুন প্রবৃত্তির মাত্রাতিশায়িতা প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। 'কল্লোল'-এর তরুণ লেখকদের চোখে এ পথের শ্রেষ্ঠ দিশারি হয়েছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪)। বস্তুত আধুনিক সাহিত্যের রুচিদৈন্যের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দরবারে সজনীকান্ত দাস যে নালিশ উপস্থিত করেছিলেন, তার তালিকায় প্রথম নাম ছিল নরেশচন্দ্রের।[২] পরবর্তী শিল্পীদের অনেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর 'গুরুতা'-ও স্বীকার করেছেন।

কিন্তু অন্তত নরেশচন্দ্রের প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে, বাংলা সাহিত্যে যৌন

১। অচিন্ত্যকুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি (৩১।৬।১৩৩৫ সাল) 'বেদে' গল্প গ্রন্থের সঙ্গে প্রকাশিত।

২। সজনীকান্তের পত্রের প্রয়োজনীয় অংশ পরে উদ্ধৃত হয়েছে 'সজনীকান্ত দাসের গল্প' আলোচনার প্রসঙ্গে।

জটিলতামূলক এই জিজ্ঞাসা একেবারে আকস্মিক আগন্তুক নয়। আগের অধ্যায়ে বলেছি, নরনারীর জীবন-সম্পর্কের রহস্য-রূপই আদিমকাল থেকে পৃথিবীর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রসদ যুগিয়ে এসেছে। আর সে সম্পর্কের মূল ভিত্তি জ্ঞাত বা অজ্ঞাত আকারের জৈবিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের জটিলতা। সভ্যতা যত এগিয়েছে, নিয়ম-সংযম-শোভনতার বন্ধনে এই সহজ যৌন আকাঙ্ক্ষা বা প্রবৃত্তি তত জটিল রহস্যময় হয়েছে। ফলে পরিবর্তমান জীবন-ব্যবস্থায় চির-পুরাতনকে নিত্যনূতন করে আবিষ্কার করতে গিয়ে একই সহজ সত্যের নানা দিকে বিচিত্র সন্ধানী দৃষ্টির আলো বিকিরিত হয়েছে।

অন্যপক্ষে সভ্যতার স্বভাবই হচ্ছে জীবনের মূল থেকে 'সহজিয়া' প্রবণতার উচ্ছেদ সাধন। অতএব নরনারীর যে দেহ-সম্পর্কের বন্ধন 'প্রাকৃতিক পর্যায়' থেকেই অনিবার্য সত্যে পরিণত হয়েছে, তাকে নিয়মিত আবৃত অলঙ্কৃত করে প্রকাশ করার দিকেই সভ্যতা,—বিশেষ করে দর্শন ও সাহিত্যের চিরকালের আগ্রহ। তারই ফলে পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব,—রাধাকৃষ্ণ-লীলামৃত, শিব-শক্তি সংজ্ঞা; তারই ফল আদম-ঈভ্-এর গল্প। তারই পরিণামে প্রেম-ভক্তি-স্নেহ ইত্যাদি নামে প্রণয়-বৃত্তির মহিমাময় বিচিত্র অভিধা! অবশ্যম্ভাবীকে অস্বীকার না করেও অশালীন হতে না দেওয়ার সাধনাতেই সভ্যতার চির প্রসার। একদিকে সেই যৌন সম্বন্ধের অন্তর্লীন রহস্য দিনে দিনে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে; আর একদিকে তাকে অশোভন হতে না দেবার প্রয়াস হচ্ছে সংহত, এই দুয়েতে মিলেই আধুনিক সাহিত্যের জটিল সমস্যা।

মানুষের জৈব প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার সভ্যতার হাতে দিয়েছে সামাজিক আদর্শবোধ, আর তার বলাধানের প্রয়োজনে উদ্ভূত হয়েছে,—নীতি-চিন্তা, ব্যাবহারিক শাস্ত্র ও ধর্মাদর্শের বিভিন্ন শস্ত্র। কিন্তু সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জৈবিক আকাঙ্ক্ষাও যখন বিচিত্র জটিল আকার ধরে, তখন পুরাতন নীতিবোধের হাতিয়ার নূতন বাসনার পথরোধ করতে পুরোপুরি সক্ষম হয় না; একদিকে তখন সুদৃঢ় সামাজিক সংযমের অনুকূলে প্রণয়-প্রবৃত্তির নিয়মন প্রয়োজন হয়, কখনো-বা দুর্নিরোধ্য নূতন জীবন-বাসনাকে আশ্রয় দিতে সমাজ তার নৈতিক মূল্যবোধের গণ্ডিকে করে পরিবর্ধিত। কিন্তু কোনো একদিক থেকে এই ভারসমতার স্বীকৃতি যতক্ষণ প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে ততক্ষণই অভিযোগ, আলোড়ন, বিক্ষোভ! 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর বঙ্কিমচন্দ্র একদা রুচি ও নীতিলঙ্ঘনের জন্য নিন্দিত হয়েছিলেন,—আর একদিন 'চোখের বালি'-'নষ্টনীড়'-'ঘরে-বাইরে'র রবীন্দ্রনাথকে অপবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের তো কথাই নেই! 'কল্লোল-যুগ' গ্রন্থে এ-সব যুক্তির কিছু কিছু অবতারণা করেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও। অন্যত্রও এসব কথা পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হয়েছে।

এ-প্রসঙ্গে ন্যায়-অন্যায়ের বিতর্কে রায় দেবার সময় এখনও আসেনি ; সে বিচারের একমাত্র অধিকারী মহাকাল। যথাসময় পর্যন্ত তাঁর সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের কেবল বক্তব্য, সাহিত্যে সংগতি-অসংগতির বিচার জীবন-প্রয়োজনের মান নিয়ে নির্ধারণ করতে হয় ; সাহিত্য আসলে জীবন-সম্ভব। জীবনের প্রয়োজনে সব কিছুই সাহিত্যের পংক্তিভুক্ত হতে পারে, অপ্রয়োজনে বা প্রয়োজনের সীমালঙ্ঘনেই কেবল

নরনারীর প্রণয়-সম্পর্ককে মধ্যযুগীয় অন্ধ সামাজিক আদর্শের লৌহশৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে যথাযথরূপে প্রত্যক্ষ করবার নৈতিক প্রয়োজন-বোধ দেখা দিয়েছিল উনিশ শতকের রেনেসাঁস-এর কাল থেকে। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' থেকে বঙ্কিমের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পর্যন্ত সেই প্রয়োজন-বোধের স্বীকৃতির স্বাক্ষর।[৩] নারীর মধ্যে সমাজ-নিরপেক্ষ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বৃন্তে ব্যক্তি-বাসনার কোরক তখন সবে মুকুলিত হচ্ছে। তারপরে সেই স্বাতন্ত্র্যবোধের বিস্তার ও বলিষ্ঠতা সম্পাদিত হয়েছে বাঙালি নারীসমাজে প্রতীচ্য শিক্ষার প্রসারে। এই অগ্রগতি সুনিয়মিত অবিরতি পেয়েছে ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠার পর থেকে। সমাজ-শৃঙ্খলমুক্ত নারীর প্রণয়-বাসনার দৃপ্ত রূপ দেখি 'চোখের বালি'-র বিনোদিনীর প্রাথমিক বিদ্রোহে। তার সুশিক্ষিত, মর্যাদাদীপ্ত হৃদয়ধর্মের আর এক জটিল রূপ দেখি 'নষ্টনীড়' গল্পে। এ-সব কথা পূর্ব আলোচনায় একাধিক বার বলেছি। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের রচনার পেছনে জীবন-প্রয়োজনের সমর্থন ছিল। তবু প্রথমে তাঁরা নীতিলঙ্ঘনের জন্য নিন্দিত হয়েছিলেন, তার কারণ সমাজের পুরাতন আদর্শ প্রথমে আহত হয়েছিল। পরে মানবিক সহানুভূতির দাবিতে নীতিবোধের গণ্ডিকে সমাজ প্রশস্ত করেছে ; অপরপক্ষে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের চেতনায় সমাজ অনুল্লঙ্ঘনের প্রয়াসও ছিল সতর্ক। রোহিণী সেখানে গুলির আঘাতে নিহত, বিনোদিনী পরিণামে কাশীবাসিনী, আর 'নষ্টনীড়'-এর অমল পলাতক। অতএব প্রবৃত্তি আর সংযম, ব্যক্তির বাসনা আর সমাজের নিয়ম, দুয়ের মধ্যে ভারসমতার রাখিবন্ধন সেখানে অসম্ভব হয়নি।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বাংলা গল্পের সূত্র ধরলেন 'নষ্টনীড়'-এর পর থেকে। তাঁর স্বনামে প্রকাশিত প্রথম গল্প 'ঠানদি'।[৪] 'নষ্টনীড়ে'র গল্প-সমাপ্তি সমাজ-বিবেক-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ শিল্প-রসিকের মনে পলায়নপরতার যে নালিশ পুঞ্জিত করেছিল, 'ঠানদি' যেন তার গাল্পিক জবাব। চরম মুহূর্তে অমলকে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে পাঠিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভূপতির

৩। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য,—ভূদেব চৌধুরী—'বাংলাসাহিত্যের ইতিকথা।' (২য় পর্যায় ৪র্থ সং)

৪। দ্রষ্টব্য : জ্যোতিপ্রসাদ বসু (স)—'গল্প লেখার গল্প'।

ভাঙা ঘরকে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে দেননি;—অন্ততঃ সমাজ-চিন্তার নৈতিক ভিতটুকুকে আগলে রেখেছেন। 'ঠান্‌দি' গল্পে নরেশচন্দ্র ঠান্‌দির স্বামীর সংসারকে বিচূর্ণ করেছেন,—ঠান্‌দি বিধবা হয়েছেন, কিন্তু বিধবা হবার আগে নিভৃত সুনিশ্চিত প্রণয়-আকর্ষণ অনুভব করেছেন 'পিসতুতো দেবর' শচীকান্তের প্রতি। এমন কি, স্বামীর মৃত্যুর পরেও ঠান্‌দি অকুণ্ঠ স্বরে শচীকান্তকে বলতে পেরেছেন,—"আমি জানি, তুমি আমায় ভালবাস। এমন কি, আমারও মনে হয়েছে যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমি যেন তোমাকে সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে ভাল না বেসে, আমার সমস্ত জীবন দিয়ে তোমাকে আকাঙ্ক্ষা না করে পারিনি।……তোমাকে দেখলে আমার লোভ হয়; তুমি আমার কাছে আর এসো না।"

গল্প সেই 'নষ্টনীড়'-এর। স্বামী সুপুরুষ-সুদর্শন, অনেক টাকা তার রোজগার। কাজের ব্যস্ততায় স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন, আর স্বল্পতর বয়স্ক দূর সম্পর্কের দেওর-এর সঙ্গে বৌদির প্রণয়-বন্ধন হয়ে উঠ্‌লো নিবিড়। কিন্তু নরেশ সেনগুপ্তের গল্পে রবীন্দ্র-রচনার সে দৃঢ় বন্ধন নেই,—নেই জীবন-বিন্যাসের সেই পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্রমিকতার অমোঘ শক্তি। অমলের চেয়ে শচীকান্ত অনেক দুঃসাহসী :—অনেক বেশি অভিসন্ধিপর। এদিক্ থেকে বরং 'ঘরেবাইরে'-র সন্দীপ-এর ছায়া পড়েছে তার মধ্যে। আর জীবনের সেই বিচ্যুতির চিত্রাঙ্কনে নরেশচন্দ্র সচেতনভাবে হয়েছেন অসমসাহসী। একদিন দেওর-বৌদিতে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হচ্ছিল,—ঠান্‌দি ডুবেছিল সে কথার নেশায়। ফলে সে বলেছে,—"এমন করিয়া কতক্ষণ গেল বুঝিতে পারিলাম না। যখন প্রায় সূর্যাস্ত হইতেছে, এমন সময় শচীকান্ত বলিল, বৌদি, খালি কি কথা খাইয়েই আমায় রাখবে না কি? খাবার দাও।' আমি লজ্জিত হইয়া একটু হাসিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, শচী একাগ্র চিত্তে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। আমার কান পর্যন্ত লাল হইয়া উঠিল, আমি লজ্জিত নববধূর মত ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া গেলাম।

"মিথ্যা কথা কহিব না। শচীর চোখের ভাষা আমি বুঝিয়াছিলাম। তাহাতে আমার রাগ করাই উচিত ছিল; কিন্তু আমি পোড়ারমুখী—তাহার উপর রাগ হইল না, লজ্জা পাইয়া আমি তাহার হৃদয়ের পিপাসা বাড়াইয়া দিলাম, হয়তো বা আশাও দিলাম।"

শচীকান্তের খাবার চাওয়া এবং ঠান্‌দির উক্তির শেষ অংশের বর্ণনায় এমন একটু অভিনবত্ব আছে, যাকে অসাধারণ না বলে উপায় নেই। একে অশালীন বলব না, কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবার-জীবনের দৃষ্টিতে এই কথোপকথনে এমন একটা কিছু ছিল যাতে স্পষ্টই মনে হয়, লেখক যেন ইচ্ছে করেই প্রচলিত নীতি ও শালীনতাবোধের

গণ্ডী একটুখানি অতিক্রম করে গেলেন। এই গণ্ডি-অতিক্রমণের ঝোঁক নরেশচন্দ্রের গল্পকে ভারসম সুগঠনের সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত করেছে। শ্লীলতার মাত্রা অনতি-লঙ্ঘিত হল, অথচ তার কোনো সংগত কারণের প্রেরণা খুঁজে পাওয়া গেল না গল্পটিতে। চারুর মত ঠান্‌দি ও তার স্বামীর মধ্যে বয়সের প্রবল পার্থক্য ছিল না,—স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর প্রাপ্য ঠান্‌দি প্রথম দিন থেকেই পেয়েছিলেন তার সর্বাঙ্গ ও সারা মন ভরে। এর পর চাকরিতে পদোন্নতি উপলক্ষ্য করে স্বামী যখন অনবকাশের ভারে পীড়িত হতে থাকল, তখনই স্ত্রী হঠাৎ উড়ে-এসে জুড়ে-বসা দেওরের প্রণয়-আকর্ষণে একেবারে বিনা ভূমিকায় দেহ-মন বিকিয়ে দিল,—এমন অবস্থা সহজেই স্বীকার করা কঠিন হয়।

এই গল্পের পরিণতিতে বাস্তব সম্ভাবনা কিছু ছিল না, এমন কথা বল্‌ছি না। স্বামি-স্ত্রীর সচেতন চরিতার্থতা-বোধের অন্তরালে স্ত্রীর অবচেতনায় কোন্ গোপন ক্ষুধা অতৃপ্ত থেকে এমনটি ঘটাতে পেরেছিল, সে তথ্য মনোবিকলনের জিজ্ঞাস্য। কিন্তু গল্পের বাঁধুনিতে এমন ঘটনার অপরিহার্যতা দূরে থাক্, সম্ভাব্যতারও কোনো ইঙ্গিত স্পষ্ট নয়। সন্দেহ নেই, মনস্তাত্ত্বিক তথ্য প্রতিষ্ঠার কোনো বিশেষ দায়িত্ব ছোটগল্পের ওপরে আরোপ করা উচিত নয়। কিন্তু গল্পের জীবন-বাচ্যকে প্লট ও চরিত্রের বর্ণনা-মাধ্যমে স্বাভাবিক করে গড়ে তোলার দায়িত্ব ছোট-গাল্পিক অস্বীকার করতে পারেন না। 'নষ্টনীড়'-এ রবীন্দ্রনাথ যে দায়িত্ব একান্ত অবহিতচিত্তে পালন করেছেন, 'ঠান্‌দি' গল্পে নরেশচন্দ্র তা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন। এখানেই গল্পরসের ভারসমতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। গল্পের সংঘট্ট (incident) বর্ণনায় একটা বিশেষ বক্তব্যের ওপর জোর পড়েছে, অথচ গল্পের শরীরে সে বক্তব্য মূর্তি ধরেনি;—না চরিত্র-চিত্রণে, না প্লট-এর ব্যাখ্যানে,—না বর্ণনার বিন্যাসে।

তা হলেও নরনারীর প্রণয় প্রবৃত্তির এই ক্ষীণ মাত্রাতিক্রমণকে অকারণ উগ্রতা বলে অভিহিত করা হয়ত উচিত হবে না। আগের অধ্যায়ে বলেছি, ফ্রয়েড ও হ্যাভ্‌লক এলিস্-এর আবিষ্কার সেকালে আমাদের দেশের মাটিতে হঠাৎ এসে পড়ে ঝড়ের আন্দোলন জাগিয়েছিল। মনে রাখতে হবে, 'ঠান্‌দি' গল্পের রচনাকাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক (১৯১৮)। আমাদের পরিবার-সুখ-লালিত জীবন বাংলাদেশের নীড়ের সীমা ছেড়ে বিশ্বের বড়ো আকাশে উড়ে বেড়াবার ক্লেশসাধ্য অধিকার পেয়েছে তখন, এ-যুগে য়ুরোপের জীবনের সঙ্গে আমাদের আবহমানকালের জীবনযাত্রার তুলনা নূতন করে শুরু হয়েছে,—নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে। নরেশ সেনগুপ্তের গল্প-উপন্যাসের প্রসঙ্গে ফ্রয়েড ও এলিস্-এর কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়,—অপরাধ-বিজ্ঞান ও যৌনবোধ তাঁর লেখায় হাত মিলিয়েছে। আসল কথা, এই দুই প্রতীচ্য মনীষীর আবিষ্কার মানুষের দেহ-মনোলোকের

ভাবনায় এক যুগান্তর এনেছিল প্রতীচ্য দেশেও। আর সে-দেশের তুলনায় আমাদের নরনারী-নির্ভর জীবন-সম্পর্কের গণ্ডী অনেক সীমিত, অনেক অবদমিত। নূতন জ্ঞানের উল্লসিত আবেগে সেই অবদমনের বন্ধন-সীমাকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন একালের প্রথম শিল্পিদল। আর প্রত্যেক প্রথম অনুভূতিই ভার-সমতাহীন উদ্বেলতায় কম-বেশি অতিস্ফীত,—প্রত্যেক প্রথম প্রাপ্তির গভীরে রয়েছে বাঁধন-ভাঙার আগ্রহাতিশয্য;—শিশুর প্রথম কথা বলা, নব-প্রণয়িযুগলের প্রথম প্রেমাভিসার,—নবদম্পতির প্রথম গোপন মিলন,—সর্বত্রই সীমালঙ্ঘনের বাসনা দুর্মদ নেশার আকার ধরে।

নরেশচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে সেই প্রথম প্রাপ্তির দুঃসাহসী অধীর গতি রয়েছে, ফলে তাঁর গল্পের বক্তব্য সুকল্পিত পরিণতির সৌষ্ঠব আয়ত্ত করতে পারেনি;—বরং বিশেষ বক্তব্যের প্রতি শিল্পীর অতীহা গল্পের প্লটকে প্রসঙ্গ-বহির্ভূত বিস্তৃতির ক্ষেত্রে ছড়িয়ে ফেলেছে। দৃষ্টান্ত হিশেবে 'দ্বিতীয় পক্ষ' গল্পের কথা বলা যেতে পারে। 'ঠানদি'-র মত এর বিষয়বস্তু সমাজ-বিরোধী বৈপ্লবিকতার দাবি করতে পারে না। বরং আমাদের অতি পুরাতন সমাজের চিরপুরাতন প্রথম পক্ষের প্রেম ও দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ-বিষয়ের একটি সার্থক রসগল্প গড়ে তোলার অবকাশ ছিল এর 'থীম্'-এ। লেখক তার সদ্ব্যবহারও করেছেন যথাপরিমাণে; ভববিভূতি ও রমার বৈবাহিক অনিচ্ছা যেভাবে পরস্পরের বিবাহ-মিলনে পরিণতি পেল, তাতে একটা রস-স্নিগ্ধতার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। রমার পিতা রামসর্বস্ব চক্রবর্তী ও তদীয় দ্বিতীয় পক্ষ রমার জননী নয়নতারা, রোমান্সরসের গল্পে হাসির সরসতার যোগান দিয়েছেন।

কিন্তু কেবলমাত্র বর্ণনার ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত ভারসাম্যের অভাবে গল্পটি জমে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহে ভববিভূতির অনিচ্ছা উপলক্ষ্য করে বিবাহ এবং ভালবাসার দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক স্বরূপ নির্ণয়ে লেখক মোরগ্যান থেকে এলিস্,—সামাজিক নৃতত্ত্ব থেকে অপরাধবিজ্ঞান ও যৌনবোধের জগৎ পর্যন্ত পদসঞ্চার করে ফিরেছেন। "ভালবাসাটাকে আমি বেশ ভাল জিনিস বলেই মনে করি। সেটা হচ্ছে নিয়ত প্রবৃত্তি। সমাজের অভিজ্ঞতা যে গণ্ডীতে প্রবৃত্তিকে আবদ্ধ করেছে, তার ভিতর প্রবৃত্তিটা ভালই বলতে হবে।" নায়ক ভববিভূতির কণ্ঠে ভালবাসার এই যৌনবিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা গল্পের ফলশ্রুতির পক্ষে অবান্তর। ভববিভূতির বাড়ির বৈঠকে 'ঘরে-বাইরে'র প্রণয় ও যৌনতত্ত্বের আলোচনা গল্পের পক্ষে আরো অপ্রাসঙ্গিক। তাতে ছোটগল্পের আকার অকারণে ব্যাপ্ত হয়েছে, রসগত পিনদ্ধতাও বিস্রস্ত হয়ে দুর্লক্ষ্য তরল হয়ে পড়েছে।

কল কথা, নরেশচন্দ্রের প্রতিভায় সার্থক গল্প রচনার উপযোগী অন্তর্দৃষ্টির অভাব নেই,

—কেবল সুকল্পিত প্রকাশের অভাবে তা সংহত হতে পারেনি। তবে এমন কথা মনে করলে ভুল হবে যে, যৌনতত্ত্ব প্রকটনের অতি উৎসাহেই এমনটি ঘটেছে। আসলে এ বিস্রস্ততা নরেশচন্দ্রের শিল্প-স্বভাবের মজ্জাগত। নিজের গল্প রচনার প্রকরণ সম্বন্ধে লেখক বলেছেন,—"আমার কোনো গল্পই গ্রীক্ পুরাণের মিনার্ভার মত বর্মে-চর্মে পূর্ণাঙ্গ হয়ে আমার মনে আকারিত হয় না। একটা ছোট ঘটনা বা অবস্থার কথা আমার মাথায় এসে তা লতাপল্লবিত হয়ে উঠে ক্রমে লেখবার যোগ্য আকার ধারণ করে। এই যে লতা-পল্লব, তাও প্রায় মনে মনে ধ্যান করে জন্মায় না, জন্মায় বেশির ভাগ কলমের ডগায়। গোড়ার কথাটা মনের ভিতর আকারিত হলেই আমি কলম নিয়ে বসি, তারপর কলম চলতে চলতে কথা, চিত্র ও চরিত্র আমার মাথার চারপাশে ভিড় করে এসে কলমের মুখে আত্মপ্রকাশ করে ফেলে।"[৫] অর্থাৎ, নরেশচন্দ্রের লেখা কোনো দিক থেকেই পুরাকল্পিত নয়,—তার ফলে তাঁর গল্পে কোন সুঠাম পরিকল্পনাই অনুপস্থিত। ভাষাপ্রয়োগেও কলমের মুখের সহজ গতির ওপরে তাঁর নির্ভর; তাই গল্পের কোথাও কোনো আবহ, কোনো সুর, এমন কি বিশেষিত তাৎপর্যের কোনো ব্যঞ্জনা নেই। ভাষাও নিতান্ত গদ্যায়িত (prosaic)। চরিত্রায়ণ ও বিন্যাসে পূর্ণাঙ্গতার আভাস চোখে পড়ে; কিন্তু পরিকল্পনাহীন অতি-বিস্তার তাকে জমাট হতে দেয়নি। 'পাগল', 'কাঁটার ফুল' এবং 'রক্ত' গল্প তিনটি 'ঠানদি' বা 'দ্বিতীয় পক্ষ'-এর বহু আগে রচিত হয়েছিল;— ঐসব গল্পে শিল্পীর স্বভাবসিদ্ধ যৌন-চিন্তার প্রসার নেই। শেষোক্ত দুটি গল্পে শরৎ-গল্পের প্রভাব রয়েছে। আর 'পাগল' গল্পটি সর্বদিক থেকেই একটি আদর্শ জীবনের কাহিনী। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বয়ংসিদ্ধা' উপন্যাসের কথা মনে পড়ে। কিন্তু এ-সব গল্পও ছোটগল্পের প্রয়োজন-সীমাকে ছাড়িয়ে অতি-বিস্তারিত হয়ে পড়েছে,—কোনো বিশেষিত উদ্দেশ্যের উগ্রতার ফলে নয়,—গল্প রচনায় শিল্পীর 'সহজিয়া' স্বভাবের দরুন। পরবর্তী কালে লেখা 'দত্তগিন্নী' বা 'যোগী'-র মত গল্পে নীতিহীন জীবন-যাপনের বর্ণনায় লেখক দুঃসাহসিকতার সুদূর সীমায় গিয়ে পৌঁছেছেন। কিন্তু এ-সব গল্পে যৌন-চিত্রণ যদি অশালীনও হয়, তবু অপ্রাসঙ্গিক নয়। গল্পের শরীরে সকল ঘটনা-দুর্ঘটনার সামঞ্জস্য বিধায়ক প্রস্তুতি রয়েছে। অথচ গল্পগুলি তবু সফল ছোটগল্পের আকার ধরেনি। হয়ত তার আরো একটা কারণ, সহজ বর্ণনার মাধ্যমে উপন্যাসের বিস্তারকে আয়ত্ত করার দিকেই লেখকের ঝোঁক ছিল বেশি। ফলে তাঁর গল্পগুলোও আসলে ছোট উপন্যাসের (novelette) সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিয়েছে। ফলকথা, ছোটগাল্পিক নরেশচন্দ্র ঔপন্যাসিক বা নাট্যকার নরেশচন্দ্রের সমতুল নন, এমন কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

৫। জ্যোতিপ্রসাদ বসু (স)—'গল্প লেখার গল্প'।

এঁর গল্প সংকলনের মধ্যে রয়েছে,—'দ্বিতীয় পক্ষ' (১৩২৬), 'অগ্নি সংস্কার' (১৩২৭) 'গ্রামের কথা' (১৩৩১) ইত্যাদি।

(খ) মণীন্দ্রলাল বসু

মণীন্দ্রলাল বসু (১৮৯৭) নানা সূত্রে 'কল্লোল'-চেতনার যথার্থ পূর্বসূরী। অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন, "সেসব দিনে দুজন লেখক আমাদের অভিভূত করেছিল,—গল্পে-উপন্যাসে মণীন্দ্রলাল বসু আর কবিতায় সুধীরকুমার চৌধুরী।"[৬] এ-অভিভূতি গোকুল-অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ 'কল্লোল'-শিল্পীদের চেতনার গভীরতা পার হয়ে তাঁদের সৃষ্টির ক্ষেত্রেও পদ-সঞ্চার করেছিল। শুধু তাই নয়, 'ফোর আর্টস্ ক্লাব' গড়েছিলেন দীনেশ-গোকুল-সুনীতিবালা ও মণীন্দ্রলাল মিলে। এই 'ফোর আর্টস্ ক্লাব' ভেঙে যেতেই তার স্বপ্ন রূপ নিল 'কল্লোল'-এ দীনেশ-গোকুলের অক্লান্ত সাধনায়। এদিক থেকে 'ফোর আর্টস্ ক্লাব'-এর অনুভাবনা 'কল্লোল'-কল্পনার জন্মভূমির ধাত্রী ; সেই নীহারিকা এখানে প্রাণবান্ শিশু। এদিক থেকেও মণীন্দ্রলালের শিল্প-ভাবনা 'কল্লোল'-ধারার অগ্রজ।

সেদিনের আধুনিক গল্প-সাহিত্যের দরবারে মণীন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ ছিল একটি। বাংলা সাহিত্যের আসরে য়ুরোপের জীবনকে যাঁরা স্বীকৃতি দিয়েছেন, ইনি সেই স্বল্প সংখ্যক শিল্পীদের একজন। 'রমলা' উপন্যাস এদিক থেকে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল ; এটি ১৩২৯ বাংলা সালের 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। তার আগে থেকেই বাংলা ছোটগল্পের জগতে লেখকের মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি অবিসংবাদিত হয়েছিল ১৩২৭ সাল থেকে কয়েক বছর ধরে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁর গল্পগুচ্ছের কল্যাণে। কিন্তু সে-সব লেখার যে মূল্যায়ন আজ সাধারণভাবে স্থায়িত্ব পেয়েছে, মণীন্দ্রলালের ছোটগল্প-কৃতির পূর্ণ পরিচয় তাতে প্রকাশিত হয়নি বলেই মনে হয়।

একদিক থেকে বিশ শতকের বিচিত্র-জটিল বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজের একটা বিশেষ অংশের নিঃসংশয় প্রতিনিধিত্ব তিনি দাবি করতে পারেন। "বেদ হইতে নীট্‌সে, কালিদাস হইতে শেলী, গতিয়ে বাৎস্যায়ন হইতে ফ্রয়েড্, সবই"[৭] তিনি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর মন জেগেছিল সেই পুস্তক-ধৃত জ্ঞান-সাগরের তীরে। অন্যপক্ষে দেশ-বিদেশের কোনো জীবনেরই কোনো বিশেষ বস্তুভূমির সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ অন্বয় ঘটেনি। অর্থাৎ ব্যক্তি হিসেবে মণীন্দ্রলাল বিশ শতকের শহুরে মধ্যবিত্তের পর্যায়ভুক্ত ; গ্রাম ও মফঃস্বল বাংলার অপার বিস্তীর্ণ দেশী জীবনের

৬। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—'কল্লোলযুগ'।

৭। ঐ, ঐ।

কোনো অব্যবহিত বাস্তব জ্ঞানে তাঁর শিল্পি-হৃদয়কে পরিপূর্ণ করতে পারেনি। বালিগঞ্জের অভিজাত বাঙালি পল্লীর অভূমি-সম্ভব রুচিসূক্ষ্ম মন ও বিদগ্ধ স্নিগ্ধ মনন নিয়ে জীবনের এক স্বপ্নাবিষ্ট রূপ এঁকেছেন শিল্পী; যাকে 'অবাস্তব রোমান্টিক' বলে একই 'আধুনিক'দের দল পরবর্তী কালে পংক্তি-চ্যুত করতে চেয়েছেন। আসলে স্মরণ রাখতে হবে, মণীন্দ্রলালের রোমান্টিকতা কোনো উন্নাসিক আভিজাত্যবোধের ফল নয়। অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ অন্বয়ে কোনো বিশেষ বাস্তব পটভূমির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন না সত্য, কিন্তু সেকালের মধ্যবিত্ত জীবনের অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও নৈতিক আদর্শ-বুদ্ধির অবসাদ সম্বন্ধে একনিষ্ঠ সচেতনতার অভাব তাঁর মধ্যে কোনোকালে ঘটেনি। বরং সেই বিনষ্টির পীড়া ব্যক্তি এবং শিল্পীর অন্তরকে গোপনে গোপনে যন্ত্রণার্ত করেছে। অনেক পুঁথি-পড়া জ্ঞান ও সূক্ষ্ম-সুমার্জিত রুচির বৈদগ্ধ্য নিয়ে মণীন্দ্রলাল সেই যন্ত্রণা-মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন।

১৩৫১ বাংলা সালে 'পরিকল্পনা' নামে একটি কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন তিনি প্রকাশ করেছিলেন। সূচীপত্রে গ্রন্থ-পরিচয় দেওয়া হয়েছে "সমস্যা ও সংকল্পের কথা।" তাতে 'হলায়ুধের ডায়েরি' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন মণীন্দ্রলাল নিজে। তার শেষ ছত্রটিতে রয়েছে হলায়ুধের দৃঢ় উদার প্রতিশ্রুতি,—"ভাঙনের দুর্দিনে জন্মেছি বলে দুঃখ নেই, নূতন যুগকে গড়ে তোলবার, নূতন কালের স্বর্ণদ্বার উদ্ঘাটন করবার আনন্দ আমাদেরই।"[১২]

গল্পের পটভূমি গল্প রচনার সমকালীন, ১৯৪৪-৪৫ খ্রীস্টসাল। গান্ধীজি কারামুক্ত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুন নিষ্প্রভ-প্রায়। তাহলেও বাংলা ও ভারতের অর্থনীতি-রাজনীতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বিপ্লবের আগুন জ্বালাতে গিয়ে হলায়ুধ নিজে সে-আগুনে পুড়েছিল; দীর্ঘদিনের নির্যাতিত জীবনের অবসানে প্রাণান্তকর রুগ্ন দেহে সম্ভ মুক্তি পেয়েছে। ছোটবোনের চোখে নবীন উৎসাহ; নবতর সংশয়ে আচ্ছন্ন তার অবচেতনা। দাদার অগ্নিব্রতে কণাও একদিন সঙ্গ নিতে চেয়েছিল;—সঙ্গ মিলেছিল আরো তিনটি তরুণের। তাদের একজন যুদ্ধের বাজারে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে তরুণী কণার বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। আর একজন য়ুরোপের আকাশে যুদ্ধ-বিমান চালিয়ে তার মনে নূতন বাসনার আকাশকে উচ্ছল করে তোলে। আরো একজন ভারত সরকারের নিগড় ভাঙতে নিজেই জেলের শেকলে বাঁধা। কণার মনে তার জন্যে পরোক্ষ করুণা। চারিদিকে জীবনের তার ছিঁড়ে আছে, হলায়ুধের প্রিয়া আজ কম্যুনিজম্-প্রিয়। এমন দিনে তার শিল্পীর হাতের এস্রাজের ছেঁড়া তার কিছুতে জোড় লাগে না। এই রন্ধ্রহীন নৈরাশ্য-মৃত্যুর অন্ধকারে হলায়ুধের সর্বশেষ প্রতিশ্রুতি,—"...নূতন কালের স্বর্ণদ্বার উদ্ঘাটন করবার আনন্দ আমাদেরই।"

মনে হয়, এ-বাণী বুঝি মণীন্দ্রলালের শিল্পি-আত্মার—"ভাঙনের দুর্দিনে জন্মেও নূতন যুগকে গড়ে তুলবার" স্বপ্ন দেখেছেন যিনি নিজের স্নিগ্ধ-রুচি চিত্তের উত্তাপকে কবিতার রক্তরাগে রাঙিয়ে। বহু দূরান্বিত হলেও জীবনানন্দের কবিতা মনে পড়ে :—

"মাটি পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভাল হত অনুভব করে ;
এসে যে গভীরতর লাভ হলো সে-সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জল ভোরে ;
দেখেছি যা হলো হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।" ['সুচেতনা']

মণীন্দ্রলালের শিল্পি-জীবনেও অনেকটা যেন সেই আকাঙ্ক্ষা,—যদিও অনেক ফিকে। সেই আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা কামনা করে 'দক্ষিণ পাড়া'র-অভিজাত জীবন-সীমায় বাঁধা রাখেননি তিনি তাঁর গল্পকে। 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩২৭ সালে প্রকাশিত তিনটি গল্পের প্রথম গল্প 'মা'।[৮] মধ্যবিত্ত জীবনে আর্থিক অবক্ষয়ের পরিণামে মহত্তম আদর্শচেতনারও বিনষ্টির এক রুক্ষ ট্র্যাজিক রূপ এঁকেছেন শিল্পী এই গল্পে :—দরিদ্রের মেয়ে বিভা, বিয়ে হয়েছে কলকাতা থেকে অনেক দূরে আরো এক দরিদ্রের ঘরে। "সেখানে খাওয়া-পরার সুখ ত নাই, স্বামি-সেবারও সুখ নাই। স্বামী দূরে বিদেশে অল্প মাইনের কাজ করেন, স্ত্রীকে লইয়া যাইতে চান না, বছরে একবার কি দুইবার আসেন।"

এমন অবস্থাতেও, "দুইটি পুত্রসন্তান নষ্ট হইবার পর স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার আঁতুড় ঘর উজ্জ্বল করিয়া যখন একটি জীবন্ত মেয়ে জন্মাইল, বিভা হাতে স্বর্গ পাইল ;" আঁতুড়ের একমাস ভরে বিভা মেয়ের জন্যে চরিতার্থতম জীবনের কল্যাণস্বপ্ন দেখল। আঁতুড় উঠতেই প্রাণান্ত কাজের চাপে স্বপ্নের অবিরলতা ব্যাহত হয়। কিন্তু বিভা তবু থামে না,—তার কাজকে উৎসাহিত, ত্বরান্বিত করে তোলে কন্যার অস্তিত্ব,—কন্যার পিতা তখন স্বল্প মাইনে উপার্জন করতে আসামের বহু দূর চা-বাগানে। কয়মাস মধ্যে মেয়ের দেহে দুর্লক্ষ্য ব্যাধির পদসঞ্চার ঘটতে থাকে। ক্রমে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। পাশের বাড়ির সখীর ডাক্তার-স্বামী বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেন। কিন্তু বহুমূল্য ঔষধের খরচ যোগানোও গরিব পরিবারের অসাধ্য হয়,—গরিবের মেয়ের চিকিৎসার ঘটা দেখে শাশুড়ি বিরক্ত ; ক্রমশঃ চিকিৎসা বন্ধ হয়, ক্ষীণ হতে হতে দুমাসের মেয়েটি ঝরে পড়ে মৃত্যুর কোলে। বিভা তখন উন্মাদিনী প্রায়। পাশের বাড়ির সখীর একটি শিশু-পুত্র আছে,—মাতৃ-

৮। দ্রষ্টব্য : পৌষ সংখ্যা।

হৃদয়ের দুর্নিবার ক্ষুধায় তাকে বুকে ধরতে ছুটে যায়। অন্তরাল থেকে কানে আসে ডাক্তার বলছেন তাঁর স্ত্রীকে,—বিভার মেয়েরই মৃত্যুপ্রসঙ্গে,—"কি করবে, ওসব ভগবানের নিয়ম, বাপ করে পাপ আর ছেলেমেয়েরা অমন ভুগে মরে।"

সেই দিন থেকে বিভা প্রায় উন্মাদিনী;—সেই দিন থেকে তার ফিট্-এর অসুখ। মেয়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বিদেশ থেকে স্বামী কয়েকমাস ধরে স্ত্রীর সঙ্গে পত্রালাপ বন্ধ করেন। তারপর বাড়ি এলেন আবার বছর দেড়েক পরে। প্রথম রাত্রে ভয়-চকিতা বিভা শাশুড়ির বিছানায় গিয়ে শুল,—স্বামীর কাছে যাবার আতঙ্কে তার বিহ্বল মুখে ফিট্-এর আশংকা রেখায়িত হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই রাত্রিশেষেই উঠে যায় স্বামীর বিছানায়। বিচিত্র ঘটনার অভিঘাতে কখন ফিট্ হয়ে পড়ে, কখন ফিট্ ভেঙে ঘুমিয়ে পড়ে কিছুই প্রথম রাত্রে সে জানতে পারেনি,—যেমন পারেননি সুখনিদ্রিত পতিদেবতা।

তারপর,—"স্বামী আবার কাজে চা-বাগানে চলিয়া গিয়াছেন। হয়ত দুই বছর পরে আসিবেন। বিভা রোজ তুলসী তলায় সন্ধ্যা প্রদীপ দিয়া প্রণাম করিয়া বলে, 'ঠাকুর, এবার যেন আমার একটি মরা ছেলে হয়'।"

গল্পের সমাপ্তি মৃত মানুষের আর্ত কঙ্কালের দেহ ঘিরে প্রবৃত্তি-পশুর এক আদিম ক্রীড়া-রূপকে যেন আশ্চর্য এপিক গাঢ়তায়,—অনবদ্য এক ট্রাজেডির আকারে কালো-পাথরের মত জমাট করে তুলেছে, অথচ শিল্পীর ভাষা-ভঙ্গী আদ্যন্ত রোমান্স-লিরিকের মায়া-সুরভিত। এ-গাঢ়তা শিল্পি-প্রাণের,—নিজের রুচিসূক্ষ্ম আত্মাটিকে যেন মধ্যবিত্ত অবক্ষয়ের ট্রাজিক মূর্তি-রূপ দিয়েছেন তিনি।

ঐ একই বছরের মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে সেই মধ্যবিত্ত অবক্ষয়েরই আর এক ছবি আঁকা হয়েছে 'সুকান্ত' গল্পে;—এবার আর অর্ধ-এপিক্ নয়, পুরো লিরিক্। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র সুকান্ত,—রসায়নের গবেষণায় দুটি একটি প্রবন্ধ লিখে প্রতীচ্য পৃথিবীরও শ্রদ্ধা আর বিস্ময় আকর্ষণ করেছিল। ভরসা ছিল, "যদি কাজ করতে পারতুম, হয়ত দুয়েকটি জিনিস বার করতে পারতুম যা কোনো দেশের কোনো বৈজ্ঞানিক ভাবেন নি। হ্যাঁ, সব পথেরই সন্ধান হবে, তবু আমি হয়ত অনেক আগে এ জগৎকে পথের খোঁজটা দিতে পারতুম।"

কিন্তু সুকান্তর 'সব চুকে-বুকে গেছে';—দুরন্ত গ্যালপিং থাইসিস্-এ মৃত্যু বরণ করতে এসেছে বৈদ্যনাথের নিঃসঙ্গ জীবনে। মার কাছে পাওয়া এই মৃত্যুর উত্তরাধিকার;—তিনিও গিয়েছিলেন ক্ষয়রোগে। মৃত্যুর আগে নিঃসঙ্গ বিদেশ-বাসের প্রতিবেশী হয়ে এল বাল্যবন্ধু সতীশ। তার বাবা, ভাই, বোন,—সবাই 'দিদিমণি'-কেন্দ্রিক। সতীশের ছোট বোন উষা এই দিদিমণি। সতীশের অনুরোধে উষা গান শোনাতে আসে মৃত্যুপথের

যাত্রা সুকান্তকে। গানের সঙ্গে, গানের গভীরে আরো হয়ত কিছু ছিল,—আশ্চর্য হয়ে যান ডাক্তারও—এমন মারাত্মক গ্যালপিং থাইসিস্‌ও মিরাক্‌ল্‌-এর মত সেরে আসে প্রায়! কিন্তু কার্যকারণের প্রভাবে তা স্থায়ী হতে পারে না। সুকান্ত আবার রোগজর্জর হতে থাকে। আরো পরে সতীশেরা চলে যায় ঢুদিনের স্বাস্থ্যনিবাসের বাসা ছেড়ে। সুকান্ত পড়ে পড়ে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলে।

প্রতিবেশিনীর অন্তর্ধান-পটে আজ তার স্পষ্ট মনে হয়,—"তাকে যে আমার ভাল লাগছিল, সেইটেই ভালবাসা।"

আরো ক'দিন পরে সুকান্ত তার ডায়েরিতে লেখে, "উষা, সত্যিই সে আমার জীবনে অরুণ-বরণা উষার মত এসেছিল, উষার স্বপ্ন শেষ হল। পাঁচ অঙ্কে জীবনের অভিনয় শেষ হয়ে মৃত্যুর যবনিকা পড়ে। এই পাঁচ অঙ্কে নারী পাঁচরূপে আসে। মাতা হয়ে সে আপন স্নেহকোলে জন্ম দেয়, বোন্ হয়ে সে ছেলেবেলায় খেলা করে, প্রিয়া হয়ে সে যৌবনে মন ভুলিয়ে ঘর বাঁধায়, কন্যা হয়ে সে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বার্ধক্যে পৌত্রী হয়ে সে জীর্ণ জীবনতরীটার ছিন্নপ্রায় দড়ি পৃথিবীর দিকে টেনে ধরে থাকে।"

সুকান্তের জীবনে প্রথম দুই অঙ্ক অনভিনীত,—শৈশবে মা মারা গিয়েছিলেন, বোন ছিল না মোটেও;—তৃতীয় অঙ্কে জীবন-নাট্যের অকালসমাপ্তির ক্রান্তি লগ্নে উষা এসেছিল জীবন-বাসনার পাদপীঠে লক্ষ্মীর কল্যাণী মূর্তি ধরে,—একাধারে মাতা-বোন-প্রিয়ার সমবেত মূর্তি নিয়ে। উষার গার্হস্থ্য, উষার লালিত্য,—সুকান্তের প্রতিভার অনির্বচনীয় অনুকম্পার ছবি বর্ণাঢ্য কল্পনার মধুরিমায় এঁকেছেন শিল্পী। মনে হয় উষা যেন মূর্তিমতী রোমান্স। তাহলেও উষার কল্পনা সেকালের জীর্ণ মধ্যবিত্ত জীবনেও বস্তু-ভূমিহীন আকাশকুসুম নয়। বরং উষার মত নারীচরিত্রকে আশ্রয় করে শিল্পী তাঁর মনের গোপন আকাঙ্ক্ষাকে মূর্তি দিতে চেয়েছেন,—'ভাঙনের ঢুর্দিনে জন্মেও', জীবনের স্বর্ণকান্ত রূপ আঁকবার কামনাকে করেছেন চরিতার্থ।

এখানেও মণীন্দ্রলালের জীবন-চিন্তার যেন এক অভিনব বিশিষ্টতা চোখে পড়ে। আলোচ্যকালের বাঙালি-জীবনের অবক্ষয়ের মূলে ছিল দেখেছি আধিভৌতিক দৈন্যের কালিমা। কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালি কখনো কেবল শরীর নিয়ে বাঁচেনি;—দেহের গভীরে নিহিত প্রাণের সজীব দীপ্তিই ছিল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব। সে দীপ্তি কেবল সচ্ছল আর্থিক জীবন থেকে বিচ্ছুরিত হয়নি,—সে ছিল তার মন ও মননের রুচি-স্মিত ঔদার্যের এক মধুময় দান। নারীর হৃদয়ের পাত্রে সে অমৃতের অনেকখানি সঞ্চিত হয়েছিল; জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের পঞ্চাঙ্ক বিবর্তনে পাঁচটি পৃথকরূপে ঘটেছে তার সার্থক প্রকাশ। নারীর মধ্যে অবক্ষয়িত বাঙালি মধ্যবিত্তের শেষ জীবনামৃতের এক প্রাণোজ্জ্বল রূপ

এঁকেছেন মণীন্দ্রলাল। এদিক থেকে তাঁর আঁকা নারী-চরিত্রে শরৎ-ভাবনার আংশিক সাধর্ম্য লক্ষিত হয়। শরৎচন্দ্রের নারী চিরন্তনী ধাত্রী, জননীরূপা; প্রিয়া হলেও সে প্রেমিকা হতে পারে না। সাবিত্রী-রাজলক্ষ্মীর প্রসঙ্গে যেমন, বিজয়ার পক্ষেও একথা সমান সত্য। মণীন্দ্রলালের নারী-চরিত্রে প্রিয়ার—ধাত্রীর কল্যাণ-স্নিগ্ধ রূপ রয়েছে,—সেই সঙ্গেই সে প্রেমিকাও। একাধারে কল্যাণী আর মোহিনী। উষার কল্যাণ-স্নিগ্ধ মূর্তি জীবনের বিশীর্ণ উপান্তে সুকান্তকে শেষবারের মত মুগ্ধ করেছিল। নারীর এই মোহ-মঙ্গলময় নিগূঢ় রূপের রচনায় মণীন্দ্রলাল কবির ভূমিকা নিয়েছেন।

প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুচ্ছ 'Eternal She'-র চিরসন্ধানী। অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে'-ও বিশ্বব্যাপী নারীমনের বিচিত্র গহনে পথ-হারিয়ে পথ খোঁজার ব্রত নিয়েছিল। নারীর কাছে সেকালের অবদমিত জীর্ণ মধ্যবিত্ত জীবনের অনন্ত দাবি,—অপার পিপাসার ব্যাকুলতা। 'জন্ম-জন্মান্তর' গল্পে মণীন্দ্রলাল সেই যুগ-বাসনার সাংকেতিক মূর্তি এঁকেছেন। ঘরের পাশের বেলাকে ফেলে তরুণ বিশ্বপরিক্রমায় বেরিয়ে পড়ে। কারণ "পৃথিবীর দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে নারীর বিশ্বরূপ দেখিবার জন্য উল্লসিত" সে। সে উল্লাস পারস্য থেকে স্পেন, জাপান থেকে প্যারিসে তাকে ছুটিয়ে ফিরেছে সোনালি যৌবনের দীর্ঘ একুশটি বছর। কিন্তু বারে বারেই নেশা-শেষের মাতালের মত অন্তরে সে পীড়িত হয়েছে,—অতৃপ্তির পিপাসা থেকেছে অনির্বাণ। তারপর সমাগত প্রৌঢ়িতে নিরাশ দেহ-মন নিয়ে দেশে ফিরছিল তরুণ। জাহাজে স্বপ্ন দেখল রূপকথার। সাতসমুদ্র তেরনদীর ঝড়ঝঞ্ঝা পেরিয়ে দূরদেশী রাজপুত্র গিয়েছিল পদ্মাবতী রাজকন্যার জন্যে প্রেমপদ্ম আনতে। অনেক দুঃখরাত্রির অবসানে ক্ষীরসমুদ্রের সীমা পেরিয়ে অমৃত-সমুদ্রে পদ্মবনের কাছে গিয়ে যখন পৌঁছলো, পদ্ম থেকে বেরিয়ে এল এক অপরূপা নারী। বললে, "যে পদ্মের জন্যে তুমি জগৎ ঘুরে বেড়ালে, সে পদ্ম দেখ তোমার বুকেই ফুটে রয়েছে।"

রাজপুত্র তরুণ নিজের বুকের গহনে পদ্মাসনে দেখতে পেলে প্রথম প্রেয়সী বেলাকে,—তারপরেই মনে হল "সকল প্রেমের মাঝারে" যেন সেই একেকেই ভালবেসেছে "শতরূপে শতবার, জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।" এই জন্মান্তরীণ প্রণয়-রহস্যের ইতিকথা রচনা করতে বসে এই শিল্পীও মরগ্যান থেকে হাভ্‌লক্ এলিস্-ফ্রয়েডের জগতে অবাধ বিচরণ করেছেন,—বর্বরযুগ থেকে বিশ শতকের সভ্য মানুষের নারী-রহস্য-জিজ্ঞাসার অতলান্ত পারাবারে। কিন্তু প্রতিপদে কথা তাঁর হাতে বাঁশীর সুর হয়ে বেজেছে, বচনের মধ্যে সংকেতিত হয়েছে অনির্বচনীয়। পদ্মাবতী রাজকন্যা তার পদ্মগন্ধে-ভরা দেহের কোলে সেতার রেখে বাজাচ্ছিল পদ্মের মৃণালের মত কোমল হাত দিয়ে। সেতারের ঝংকারে দূরদেশী রাজপুত্রের কালো ঘোড়া থমকে দাঁড়ালো। রাজপুত্র চেয়ে দেখলেন,—

"পদ্মের মত সুন্দরী রাজকন্যা সাগরের মত নীল শাড়ির উপর গোলাপের মত রাঙা ওড়না জড়িয়ে চাঁপার কলির মত মোহন আঙুলে সোনার সুতার মত সেতারের তারগুলিতে ঝঙ্কার তুলেছেন, হাতে পান্নার চুড়ি নীলার আংটি ঝিকমিক্ করছে।"

এখানেই মণীন্দ্রলালের বিরুদ্ধে রোমান্টিকতার নালিশ। কেবল এই রূপকথার গল্পে নয়, তাঁর বাস্তব গল্পেও ষড়ৈশ্বর্যময়ী নারীর জীবনাঙ্কনে অষ্টধাতুর অমূল্য পাদপীঠ রচনা করেছেন শিল্পী—অথচ মধ্যবিত্ত জীবনের চারদিকে তখন কেবলই তো জর্ণতার জরা-ভার পুঞ্জিত হয়েছিল। কিন্তু জীবনের ভাঙাহাটে প্রাণের সুর সপ্তমে চড়িয়ে যে নারী মনের গহনে সোনার ফুলঝুরি খেলে, তাকে রিক্ত করে ছেড়ে দেবেন কী করে! তাই বাস্তবতার কূল না ভেঙেও মনের বাসনাকে রূপ দিতে শিল্পী বালিগঞ্জের উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু এ-সব গল্পেরও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইঙ্গ-বঙ্গ জীবন-যাত্রার কৃত্রিমতা নেই, বরং মা-বাবা আত্মীয়-পরিজন নিয়ে প্রাণ-প্রাচুর্যের চাঁদের হাট বসে গিয়েছিল যেন। 'দার্জিলিং'-এ শকুন্তলার মধ্যে দাক্ষিণ্যময়ী অন্নপূর্ণার মোহিনীরূপ এঁকেছেন শিল্পী। কিন্তু, মণীন্দ্রলালের কবি-আত্মার আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্যের অবিচ্ছিন্ন সোনালি মূর্তি রচনা, অথচ তাঁর ব্যক্তিত্বের গভীরে রয়েছে সেকালের মধ্যবিত্ত জীবনের অনিঃশেষ অতৃপ্তির বিষাদ; ফলে স্বপ্নের মধ্যেও স্বপ্নভঙ্গের ব্যথা-বেদনা ছড়িয়ে থেকেছে তাঁর গল্পগুলিতে। শকুন্তলার জীবন-পরিণাম তার অন্তরাগ-করুণ মূর্ছনায় ঝরে পড়ে। রণেনের মেয়ের মা হয়েও প্রভাতের চিরবিদায়ের পশ্চাৎপটে দাঁড়িয়ে তার ভাবনা আনমনা এলোমেলো হয়ে পড়ে।

শিল্প-স্বভাবে মণীন্দ্রলাল 'কল্লোলে'র কবি-গাল্পিকদের পূর্বসাধক; পৃথক্‌ভাবে কবিতা না লিখেও, গল্পের শরীরে মধ্যবিত্ত জীবন-বেদনার কবিতা-রূপ এঁকেছেন তিনি সার্থকভাবে। সে-কবিতার সব সম্পদ কথায় নয়,—কথার অন্তরালবর্তী অতিসূক্ষ্ম সুকর্ষিত কবি-ভাবনার স্পর্শকাতর স্নিগ্ধতা কথার দেহেই যেন ছড়িয়ে থাকে। 'বেনামী' গল্পটির শুরু হয়েছে—"ভাবিয়াছিলাম বলিব না। জীবনের পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হাতে যে অতিসূক্ষ্ম অপরূপ ভীষণ মধুর বেদনার জাল রচনা হইয়া থাকে, ভাবিয়াছিলাম জীবন-শিল্পীর সেই সুখ-দুঃখের বিচিত্র রঙিন তন্তুময় আশ্চর্য কারুকার্য রহস্যের যবনিকা দিয়া চিরকাল ঢাকিয়া রাখিব। কিন্তু বলিতে হইল, বেদনার যবনিকা সরাইয়া অন্তরের রহস্য-শিল্প প্রকাশ করিতে হইল।"

অন্তরের বেদনা-যবনিকার অন্তরালবর্তী অনির্বচনীয় অনুভবের বর্ণনায় শিল্পী কত নির্ভুল যথাযথ, তার একটি ছবি সুকান্ত তার ডায়েরিতে লিখেছে, "মনটায় বোসে কে যেন মাকড়সার জাল বুনছে, তা ধরে লিখ্‌তে গেলেই ছিঁড়ে যায়।"

অন্যত্র লিখেছে,—কর্মভূমি থেকে নির্বাসিত তার শীর্ণ দেহ যখন রোগ-শয্যার স্থবিরত্বে বাঁধা—তখন লিখেছে,—"মনে হয় গতির জগৎ থেকে শব্দের জগতে এসে পৌঁচেছি, সব ধ্বনি একটা রহস্য, একটা অর্থ নিয়ে কানে বাজে।"

প্রত্যেক গল্পের পাতায় পাতায় অনির্বচনীয় কবি-অনুভবের এমনি পরিচয় সুলভ হয়ে আছে। তাতে রোমান্টিক কবি-সুলভ প্রকৃতি-প্রিয়তার নিবিড়তাও দুর্লভ নয়। সেই সঙ্গে একথাও লক্ষ্য করব,—জীবনের অসাধারণ সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রবাহকে কাব্যের লাবণ্যে ভরে যথাযথ তাৎপর্য দেবার আকাঙ্ক্ষা শিল্পীর স্বভাবসিদ্ধ। রূপ-কর্মের এই প্রকৃতি পরবর্তী কালে অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবের রচনায় পূর্ণাঙ্গতর হয়েছে। কথাকে নিয়ে বাংলা গল্পে কবিতার ফুলঝুরি খেলা বিশেষ করে অচিন্ত্যকুমারের ব্যক্তিস্বভাব। কেবল প্রকরণের দিক থেকেই নয়, ভাবনার বিচারেও সেই রোমান্টিক অতৃপ্তি, সেই মধ্যবিত্ত হতাশা মণীন্দ্রলালেরও মর্মলীন। তফাৎ কেবল, পরতর শিল্পী অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব জীবনের পরিণাম-সিদ্ধি বিষয়ে মণীন্দ্রলালের প্রত্যয়কে আশ্রয় করতে পারেননি,—তাই তাঁদের স্বপ্নে স্বপ্ন-ভঙ্গের যন্ত্রণার চেয়েও জীবনস্বপ্নকে অস্বীকার করবার,—ভেঙে টুক্‌রো করবার শিল্প-প্রয়াস মর্মন্তুদ। মনোগত অভিপ্রায়ে অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবের গল্পের সঙ্গে মণীন্দ্রলালের পার্থক্য প্রত্যয়-পরিমাণের মৌলিক বিভেদে। গোকুল নাগ-দীনেশরঞ্জনের সঙ্গে এদিক থেকে তাঁর নৈকট্য অদূরবর্তী; কালের দিক থেকে এঁরা নিকটতর,—গোকুল ও দীনেশরঞ্জনের সাহিত্য-সাধনা শুরু হয়েছিল 'কল্লোল'-এর পূর্বভূমিতে। তাই দৃষ্টি ও প্রকরণের বিচারে মণীন্দ্রলালকে বৈঠক-বিলাসী অভিজাত গোষ্ঠিতে আপাংক্তেয় করে রাখবার উপায় নেই। বিশ শতকের অবধারিত মধ্যবিত্ত জীবন-বেদনা ও জীবন-ক্ষুধার প্রথম সার্থক গল্পকার কবি ইনি। গল্পের শরীর গঠনেও তাঁর প্রকরণ-শৈলী আধুনিক কবির মতই প্রখর সচেতন। মণীন্দ্রলালের রচনায় রূপ-বিস্রস্ততা নেই কোথাও। 'ভেরনল' বা 'ভূতের গল্পের' মত কিছু কিছু গল্পে রোমান্টিকতার সুর রহস্য-সুনিবিড় হয়েছে নিখুঁত বর্ণনার কৌশলে।

এঁর গল্প-সংকলনের মধ্যে রয়েছে 'মায়াপুরী' (১৯২৩), 'রক্তকমল' ও 'সোনার হরিণ' (১৯২৪), 'কল্পলতা' (১৯৩৫), 'ঋতুপর্ণ' (১৯৩৭) ইত্যাদি।

২। কল্লোলের সূতিকাগার

দীনেশরঞ্জন দাশ

দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১) 'কল্লোল'-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক; গোকুল নাগ (১৮৯৪-১৯২৫) আমৃত্যু ছিলেন তাঁর সহযোগী। অচিন্ত্যকুমার বলেছেন,—

"দীনেশরঞ্জন ছিলেন কল্লোলের সব-পেয়েছির দেশ। সব হারানোর মধ্যমণি।"[৯] কল্লোল-ভাবনার জনয়িতা ছিলেন এই দুই বন্ধু,—এঁদের হৃদয়-বাসনার মুক্তদলের ওপর কল্লোল-এর সূতিকাগার। কল্লোল-গোষ্ঠীর তরুণ লেখক সেদিন যাঁরা এসেছিলেন, জন্ম এবং শিল্প-ভাবনার বৈশিষ্ট্যেও এঁদের প্রতিষ্ঠা দীনেশরঞ্জন-গোকুল নাগের উত্তর-ভূমিতে। অর্থাৎ দীনেশ-গোকুলের চেতনায় মধ্যবিত্ত অবক্ষয়ের অনুভব বেদনার রক্তগোলাপ হয়ে ফুটেছিল, তার জীবন-নিঙ্‌ড়ানো কস্তুরী-গন্ধে বুকের রক্ত জমাট হয়ে নব-অরুণোদয়ের পূর্বাচল রচনার সাধনায় বহিঃশান্ত অন্তঃপীড়িত ব্যথার স্তব্ধ প্রশান্তিতে রাঙা হয়েছিল। দার্জিলিং পাহাড়ে হিমালয়ের নিস্তব্ধ বক্ষে গোকুলের জীবন-প্রিয় আত্মার প্রশান্ত মৃত্যুবরণের যে ছবি এঁকেছেন অচিন্ত্যকুমার, তাতেই স্রষ্টার প্রাণ-বিমর্দন রক্তক্ষরা সে ধ্যানসাধনার সার্থক সংযত প্রকাশ। কিন্তু বয়সে যাঁরা সেদিন অপেক্ষাকৃত তরুণ ছিলেন, বুকের নিপীড়িত রক্ত তাদের টগ্‌বগিয়ে ফুটছে প্রলয়দিনের উচ্চৈঃশ্রবার মত। তাঁদের গতিতে তাই উচ্ছ্বাস ও উদ্দামতা; প্রত্যয় সকল বাঁধন-হারা;—সৃষ্টি শুধুই অশান্ত দুর্দম;। দুঃখের গোপন আরতি, এবং প্রত্যয়ের কল্পনা-বেদীতে জীবনের রক্তাঞ্জলি রচনায় দীনেশ-গোকুলের সাধর্ম্য বরং মণীন্দ্রলালের সঙ্গে। সেই সান্নিধ্যের তপ্ত পরিবেশেই দীনেশ-গোকুল তাঁদের ছোটগল্প-রচনাকে গ্রন্থিত করেছিলেন প্রথম। ফোর্ আর্টস্ ক্লাব গড়েছিলেন এই দুই বন্ধু 'কল্লোল'-এর আগে।—উদ্দেশ্য,—সাহিত্য, সংগীত, চিত্র ও সূচীশিল্প,—এই চার রকমের আর্ট-এর প্রসার বিধান। এই ফোর্ আর্টস্ ক্লাব থেকে 'ঝড়ের দোলা' নামে চারটি গল্পের এক সংকলন বেরিয়েছিল 'কল্লোল' প্রকাশের ঠিক এক বছর আগে। তাতে চারবন্ধুর লেখা চারটি গল্প ছিল,—লেখক গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, সুনীতি দেবী ও মণীন্দ্রলাল বসু। এই সংযোগ কেবল কাকতালীয় নয়,—এতে রয়েছে কালধর্মের নিজের হাতের আত্মার স্বাক্ষর।

'ঝড়ের দোলা'র নামকরণ প্রসঙ্গে দীনেশরঞ্জন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, "সদানন্দময়তা সত্ত্বেও আমাদের মনে এক অতৃপ্তির তুফান বইছে, কি যে ঠিক চাই, জানি না। এখনো ধরতে পারিনি। কিন্তু কিছু যে পেতেই হবে, সেই চেষ্টাতেই অশান্ত আবেগে আমাদের মন ছুটাছুটি করছে। দোলা লেগেছে ঝড়ের।"[১০]

'ঝড়ের দোলা'-র ফলপরিণাম সম্পর্কে আর একদিন গোকুলচন্দ্র বলেছিলেন —"দোলা লেগেছে নিশ্চয়ই অনেকের মনে। খবরটা হয়ত আমাদের কাছে পৌঁছয়নি এখনো।" দীনেশরঞ্জন বলেছিলেন, "ঢেউ তুলে দিতে পারলে ভাসতে ভাসতে অনেকেই

৯। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত—'কল্লোল যুগ'।
১০। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—'চলমান জীবন' (২য় পর্ব)।

আসবেন।"[১১] সেই ঢেউ তুলতেই এলো 'কল্লোল'—'ঝড়ের দোলা'-র পথ ধরে। তাই 'কল্লোলে'র সুর অনিশ্চয়তার, পথ খোঁজার, অজানা পথের পরিচয় না পেয়ে ক্ষুব্ধ মনের ঘোড়া ছুটিয়ে চলার দুর্বার নেশায় দুর্মদ। অচিন্ত্য-প্রেমেন-বুদ্ধদেব ঝড়ের রাতের অন্ধকারে জীবন-কল্লোলের দুর্জয় ঢেউ-এর ওপরে দুর্মদ ঘোড়সওয়ার,—অন্ততঃ 'কল্লোলে'র কাল পর্যন্ত তাঁরা চির অশান্ত,—চির অনিশ্চিত।

দীনেশরঞ্জনের চেতনাতেও পথ খোঁজা রয়েছে,—চাওয়া-পাওয়ার বেহিশেবি জোড় না মেলাতে পেরে তাঁরও অতৃপ্ত আত্মা উত্তরহীন জিজ্ঞাসায় চিরব্যথিত। তবু জীবন-ইতিহাসের যুগযুগান্তব্যাপী মহাপ্রান্তরে সুনিশ্চিত পরিণামের স্বপ্নে মেদুর তাঁর কল্পনা; চির-অচেনা দিগন্তের পারে উৎসুক দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে সে। জীবনের উত্তরহীন জিজ্ঞাসার জবাব দিতে গিয়ে তাঁর গল্পের নায়ক যন্ত্রণায় রক্তিম হয়ে ওঠে,—তখন "তাঁর চোখের তারা স্থির হয়ে যেত—ঠোঁট ব্যথায় ছিন্ন হয়ে বলে উঠ্‌ত—আমি খুঁজি বহুদিনের বাঁচবার পথ। মানুষকে আমি অমর করব। এ স্পর্ধা আমার নিজের নয়—পড়ন্ত রৌদ্রের আলোর ভিতর যেমন একটা পূর্বেকার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে—আমারও জীবনে মানুষের কথার ভাণ্ডারের একটা নিমন্ত্রণ আছে—সে নিমন্ত্রণ কবে রাখতে পারব জানি না, কিন্তু তা যে রাখতে পারি নি, তারই ভাষাহীন ব্যাকুলতা আমার না বোঝাতে পারার অক্ষমতা'।" ['তারপর' গল্প]

এটি শিল্পী দীনেশরঞ্জনের আত্মার ভাষা;—এই ভাষার উদাস-করা নিরুদ্দেশ গতি তাঁকে ব্যথার্ত করেছে; কিন্তু মানুষকে অমর করবার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা তাঁর কল্পনাকে করেছে স্বপ্ন-মন্থর,—সুস্থির।

অধিকাংশ গল্পেও রয়েছে এই স্বপ্ন-সুরভি। অজানা দুঃখের ভারে যে বুক নিথর নিস্পন্দ তাতেই বুক-ভরা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস টেনে নেবার স্বপ্নিল আকাঙ্ক্ষায় গল্পের পরিবেশ রহস্যাচ্ছন্ন; কথা তাতে কবিতা-তরঙ্গিত; আর মানব-মূল্যে শ্রদ্ধাবান শিল্পীর দৃষ্টি মনের অচিন্ত্যলোকের রূপসন্ধানে আকাশচারী।

'পার্বতী' গল্প এইরকম এক মানবিক মূল্যায়নের নিটোল আবেগ-মূর্তি। পার্বতী প্রতিদিন দেবতার কাছে প্রার্থনা করে, দেবতার দুঃখের পাষাণভার যেন সে গ্রহণ করতে পারে,—যিনি সকলের দুঃখ স্মরণ এবং হরণ করেও নিজের মূক ব্যথার ভার নীরবে বয়ে বেড়ান, নিজের মানবী আত্মার শক্তি নিয়ে তাঁকে মুক্তি দেবে পার্বতী। বছরের পর বছর ধরে এই বাসনা তার অন্তরে বিকশিত হতে হতে পূর্ণস্ফুট হয়ে ওঠে একদিন। পার্বতী বিচিত্র পুষ্পের অপরূপ মালা গেঁথে দেবতার পায়ে নিভৃতে অঞ্জলি দিয়ে আসে একটি

১১। তদেব।

থালায় ;—তার কুসুমিত বাসনার প্রার্থনা জানায় আবার,—রাত্রি-শেষে দেবতার পাষাণ-বেদনা যেন তার থালার ওপরে দান হয়ে দেখা দেয়। ভোরবেলা আবার শিশুপুত্র নিয়ে মন্দিরে যায় পার্বতী, দেখে থালা ভরে রয়েছে একটি অজ্ঞাতকুলশীল শিশু ; দেবতার দান বলে তাকে বুকে করে বাড়ি নিয়ে আসে। সেইদিন সকালেই কয়েক বছর পরে বিদেশের কর্মস্থল থেকে ফিরে আসে বামাপদ,—পার্বতীর স্বামী। এই "দুশ্চরিত্রার সন্তান"-কে ঘরে রাখতে বামাপদ নারাজ। আর পার্বতী তাকে বুকে ধরেই থাকবে। তার যুক্তি,—"দুশ্চরিত্রার সন্তান কি-না তা জানি না—সন্তান সন্তান। কার কিসের ফল, তার বিচার করবে কে ? সুরো [বামাপদ ও পার্বতীর একমাত্র ছেলে] আমাদের দুজনের কারো দুশ্চরিত্রের ফল কিনা, কে জানে ? কে তা স্বীকার করবে, কে তা বিচার করবে ? সুরো জন্মলাভ করে তার যদি কোনো অপরাধ না হয়ে থাকে, তা হলে এ শিশুরও কোনো অপরাধ নেই।"

অবশেষে এই আদর্শময় আবেগেরই জয় হয়েছে গল্পে ;—কোনো কার্যকারণের প্রভাবে নয়,—শিল্পীর সকরুণ বাসনার দীর্ঘশ্বাসে। চারদিকে মানবিক মূল্যের শ্বাসরোধী অবক্ষয়ের মধ্যে কল্পনার স্বপ্নলোকে বসে স্বস্তির তৃপ্ত নিঃশ্বাস টেনেছেন শিল্পী। এ-সব গল্পের বিষয়-চিন্তনে দুঃসাহস রয়েছে,—কিন্তু বাস্তব বিন্যাসের দৃঢ় ভিত্তিটি তাদের নয়। এ-যেন গল্পের দেহে কবির স্বপ্ন বাঁধা পড়েছে,—গল্পের চেয়ে এরা বেশি পরিমাণে কথিকা। 'কমলমধু', 'রামগতি', 'পাষাণপুরী', 'চম্পা', 'রূপ' ইত্যাদি সব গল্প সম্বন্ধেই একই কথা।

দীনেশচন্দ্রের দুটি গল্প সংকলনে তেরটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে,—সংকলন দুটির নাম 'মাটির নেশা' ও 'ভুঁইচাপা',—দুইটিরই প্রকাশকাল ১৩৩২ বাংলা সাল।

গোকুল নাগ

গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫) ছিলেন 'কল্লোল'-এর প্রাণের সারথি। অচিন্ত্যকুমারের চোখে মূর্তিমান ফোর্ আর্টস্—'চিত্র, সংগীত, সাহিত্য, অভিনয়,' সব কিছুতেই তাঁর অধিকার ছিল সমতুল।[১২] দীনেশরঞ্জন তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—"ফুল নিয়ে এর বেসাতি, দুনিয়ার জানোয়ার নিয়ে এর বসবাস। হৃদয় তাই ফুলের মত কোমল, মনটি তেমনি সুন্দর, আর শীর্ণদেহেও পশুজগতের প্রাণপ্রাচুর্য। অথচ মনের মধ্যে মানব মনের অনন্ত জিজ্ঞাসা। তাছাড়া ইনি চিত্রশিল্পী। আর যে অশান্তির ঝড় মানুষকে আদিম অবস্থা থেকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে দর্শন-কাব্য-বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসার ভিতর দিয়ে, সেই অশান্তিই ওর মনে দোলা দিচ্ছে। ও বলে, যে তরুণের মনে

১২। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত—'কল্লোল যুগ'।

ঝড়ের দোলা নেই. সে ত বুড়িয়ে গেছে, স্থবির ও স্থাবর। ওর অন্তরস্থ প্রভঞ্জন মূর্ত হয় ওর মুখে বাঁশের বাঁশিতে, হাতের তুলি ও রঙে।"[১৩]

সুর আর তুলির রূপ-কর্ম গল্পের লেখনীর চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম,—অনেক বেশি অলৌকিক। গোকুল নাগ তাঁর মনের রুক্ষ বিপ্লব-বাসনাকে অতলস্পর্শ সুর আর তুলির অরূপ ব্যঞ্জনার রেখায় মূর্তি দিয়েছেন। আর গল্পের স্থূল শরীরে ভরে দিয়েছেন শিল্পীর অমূর্ত স্বপ্ন, সুরকারের অনির্বচনীয় বেদনার ঝঙ্কার। তাই তাঁর গল্পগুলো কেবল রোমান্টিক কবিতা নয়,—যেন এক-একটি অখণ্ড স্বপ্নিল সুর। 'কল্লোল' প্রকাশের পূর্বভূমিতে তাঁর কিছু কিছু গল্প-কথিকা 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'নবভারত' ইত্যাদিতে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে সেই সব গল্পের নয়টি 'রূপরেখা' (১৩২৯) সংকলনে গ্রন্থিত হয়। লেখক নিজে বলেছেন,—"আকারে ছোট হলেও এগুলি ছোটগল্প নয়, কারণ প্লট বা ছক্ বজায় রেখে চলবার প্রয়াস এতে নেই। শুধু রেখার সাহায্যে জীবনের কান্নাহাসি এবং বিশেষ করে অভাব এবং অতৃপ্তির ছবিটুকুই প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি।"[১৪]

কোনো গল্পেই পূর্ণাঙ্গ প্লট নেই, অথচ প্রতি গল্পেই জীবনের একটি একঅখণ্ড কামনা, বাসনা বা অতৃপ্তির বেদনা নিটোল সম্পূর্ণ রূপ ধরেছে। এগুলিতে ছোটগল্পের প্রাণ আছে, শরীর নেই। কথার আধারে রূপের যে আভাস জাগে রেখাচিত্রের মত তা ব্যঞ্জনাময়,—যেন তুলিতে আঁকা এক একটি স্কেচ্। এইসব জীবন-স্নিগ্ধ কথিকার দেহ ঘিরে যে সুরের রেশ রয়েছে, তাতে রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র কথা মনে করিয়ে দেয়; যদিও রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক মননের অত্যুজ্জ্বল দীপ্তির পরিবর্তে এতে রয়েছে এক স্নিগ্ধ প্রশান্ত অথচ অবদমিত বিষণ্ণতা :—

"পাখি ডেকে উঠ্‌ল—এল এল—সে এল!

'আশার আবেগে স্পন্দিত বুক চেপে সবাই বলে উঠ্‌ল—কে এল……কোথায়?… ওগো কেমন তার রূপ?……

"পাখি বলে,—দেখিনি। তাকে দেখিনি আমি চোখে। সে যখন আসে, আমার বুকের ভিতর তার পায়ের ধ্বনি শুন্‌তে পাই—ঐটুকুই আমি চিনি ··উঠ্‌ছে-পড়ছে। ঐ যে তার পা-দুখানি……সে এল!……বুঝি সে এল……"

তবু একটি দুটি লেখায় গল্পের শরীরও যেন স্বপ্নের আকাশ পেরিয়ে রূপের জগতের দূর দিগন্তে এসে আভাসিত হয়েছে। 'মা' এম্‌নি একটি লেখা,—বুঝি একটি ছোটগল্পও। মুক্তি, মুক্তির মা 'ন-বৌ' আর মুক্তির পিসীকে নিয়ে গল্প। মুক্তি একরত্তি মেয়ে, তবু অপরূপ

১৩। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—'চলমান জীবন' (২য় পর্ব)। ১৪। নিবেদন—'রূপরেখা'।

বিভায় উজ্জ্বল তার দেহ-মন। হিরণ ডুব দিয়ে ধন্য হতে যায় রূপের গভীরতায় সুনীল সেই অরূপ সাগরে। কিন্তু সমাজের বাধা,—বাধা হিরণের অগাধ ধনী-মানী পিতার। হিরণ পিতার পা ছুঁয়ে শপথ করেছে, কোনোদিন তাঁর বিষয়ের লোভ সে করবে না। জীবনের সকল লোভ, সকল বন্ধন-আকর্ষণ থেকে মুক্তির মূল্য দিয়ে মুক্তিকে পেতেই হবে তার। বিয়ের আগে আর এ ক'দিন বাকি,—পিসীমার মুখে আড়াল থেকে মুক্তি শুনেছে হিরণের মূল্যদানের মহিমা। অনেক রাতে বিছানায় গিয়ে মেয়েকে দেখ্‌তে পান না ন-বৌ। চুপি চুপি উঠে যান ছাতে। সেখানে প্রেমের পরমদেবতা হিরণকে উদ্দেশ করে নিভৃত প্রাণের প্রণাম নিবেদন করছে উপুড় হয়ে পড়ে মুক্তি,—"হিরণ। হিরণ···হিরণ!···পরশু তোমায় পাব।···আজ আমার প্রণাম নাও······হিরণ······'

"ন-বৌ এসে মেয়েকে বুকে তুলে নিলেন। মুক্তি চম্‌কে উঠে বল্‌ল······'মা'!······

ন-বৌ বললেন—"মা বলে আমায় বিদেয় করে দিস্‌নি মুক্তি, দূরে ঠেলে রাখিস্‌নি··· আমি ত শুধু তোর মা নই, তোর সমস্ত শরীরে মনে যে আমিও আছি মুক্তি······সে কথা ভুলিস্‌নি।······"

রূপকার সুরশিল্পীর অনুভবে মাতৃমহিমার দেহাশ্রিত-হয়েও-দেহাতীত এক আশ্চর্য বন্দনার ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হয়েছে এখানে। মেয়ের যৌবনের শিখরে বসে,—তার পরম চরিতার্থতার আনন্দাশ্রুর মধুসুরভিত হৃৎপদ্মে অধিষ্ঠিত থেকে মায়ের দেহ-মন-চেতনাই সিদ্ধির তৃপ্তিতে ভরে ওঠে,—সন্তানের জীবনে মাতৃমূল্যের এই নবীন কীর্তন যেমন অভিনব, তেম্‌নি বিস্ময়কর;—শিল্পীর অনুভবের সংগমে দেহমনোবিজ্ঞানের তথ্য যেন ডুব দিয়ে পুণ্যস্নানে ধন্য হয়ে উঠ্‌ল। দেহের কাঠামোয় বৈদেহ ভাবনার এ অপরূপ দ্যুতি নিঃসংশয়রূপে অনির্বচনীয়।

গোকুল নাগের এই ধরনের রচনার প্রসঙ্গেই অচিন্ত্য সেনগুপ্ত বলেছেন,—তাতে "অর্থের চাইতে ইঙ্গিত থাকৃত বেশি, যার মানে, দাঁড়ি-কমার চেয়ে ফুট্‌কিই অধিকতর।"[১৫] কিন্তু পরে 'কল্লোল'-'কালিকলম'-এর যুগে এমন গল্প তিনি লিখেছেন, যার অর্থে কোনো হেঁয়ালি নেই,—ফুট্‌কির প্রাচুর্য দাঁড়ি-কমার প্রাঞ্জলতাকে যেখানে আচ্ছন্ন করেনি। কিন্তু সেখানেও বস্তু-লীন জীবনের নগ্ন অভিজ্ঞতার গায়ে শিল্পীর সূক্ষ্ম অনুভব ও সুরকারের তানময় ব্যঞ্জনার জ্যোতি বিকিরিত হয়েছে। রোম যখন পুড়েছিল, নীরো নাকি তখন বাঁশি বাজিয়েছিলেন। উনিশ শতকের বাঙালি রেনেসাঁস-এর অমিত শক্তিপূত মধ্যবিত্ত জীবনের বনিয়াদ-মূল যখন আগুন ধরেছিল, গল্পের বুকে সেদিন বেহালার সু-করুণ ছড় বুলিয়ে চলেছিলেন শিল্পী গোকুল। নীরোর মত সে সুর পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে উন্মত্ত নিরুদ্বেগ

১৫। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত—'কল্লোলযুগ'।

হৃতচেতন ছিল না। বরং অবক্ষয়ে দহমান জীবনের জ্বালা আর বেদনাকে সংবেদনশীল সুরের আবেগে আমূল মথিত করে তুলছিলেন তিনি তাঁর গল্প-দেহে। 'দেবতার গ্রাস' গল্প এই শিল্প-প্রকরণের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

১৩৩১ বাংলা সালের আশ্বিন সংখ্যা 'কল্লোল' পত্রিকায় এ-গল্প প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল; ইংরেজির সেটি ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-শেষের সর্বগ্রাসী ভাঙন উনিশ শতকীয় মধ্যবিত্ত জীবনাদর্শের গায়ে তখন নোনা জলের রং ধরাতে শুরু করেছে; 'plain living and high thinking'-এর শতাব্দীব্যাপী স্বর্ণশীর্ষ জীবন-সাধনার পানে তাকিয়ে বিমূঢ় বাঙালি মধ্যবিত্ত-চিত্তের আজ মনে হয়,—"মায়া নু মতিভ্রমো নু বা।" চোরাবালির মত পায়ের তলা থেকে সেই স্বল্পেতুষ্ট দৃঢ়ব্রত জীবনাচরণের ভিত্তিকে কেবলই ক্ষইয়ে দিচ্ছিল দারিদ্র্যক্লিষ্ট কাঞ্চন-লোভাতুর নবীন বণিক বৃত্তির লেলিহ জিহ্বা। আর অজগরের মত সেই উদগ্র ক্ষুধার জঠরে নিষ্পিষ্ট হয়ে ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছিল মধ্যবিত্ত ঐতিহ্যের আমূল ভিত্তিটিও। সেই অবক্ষয় ও বিধ্বংসের জ্বালাতপ্ত ইতিহাস বক্ষে ধারণ করে জন্ম নিয়েছিল 'দেবতার গ্রাস' গল্প :—

মহেশ রায় বিত্তবান্ গৃহস্থ; একটিমাত্র পুত্র তাঁর অসীম। তাছাড়া সচ্ছল মধ্যবিত্ত বাঙালির চিরাগত প্রথানুসারে বহু পোষ্যে পরিপূর্ণ পরিবার! আত্মীয় পোষণ আর পরোপকার,—এই দুটি ছিল মহেশ রায়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। আর নিষ্কর্মা জীবনের একঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তাঁর চাকরি স্বীকার। সত্যব্রতে সার্থক কর্মজীবনে অবসর নেবার বাকি নেই বড় আর। মনে মনে স্বপ্ন দেখেন মহেশ রায়,— শেষ জীবনে শান্তি-স্নিগ্ধ দিন-যাপনের স্বপ্ন। এমন সময়ে জীবনের অন্তিম ধাপে নেমে আসে ঝড়ো মেঘের দুঃসহ কালো-ঘন ছায়া। মনিব-প্রতিষ্ঠানের অনেক টাকা বেহাত করার,—বিশ্বাস-ভঙ্গের অপরাধে অকস্মাৎ অভিযুক্ত হন মহেশ রায়। অমর্যাদা ও অপমান ক্ষালনে বিলম্ব ঘটে না; মহেশ রায়ের সততা অসংশয়িত উজ্জ্বলতায় প্রস্ফুট হয়ে ওঠে আবার মনিবদের কাছে। তহবিল ভেঙেছে,—মহেশ রায় নয়,—তাঁর এক আশ্রিত দূরান্বিত আত্মীয়; যার চাকরির জামিন ছিলেন মহেশ রায়। আবহমান কালের অভ্যাসমত এবারও মহেশ রায় কোনো অভিযোগ করলেন না,—পৈতৃক সম্পদের প্রায় সব কিছু বিক্রী করে মনিব-প্রতিষ্ঠানের দেনা শোধ করলেন নীরবে। আর আশ্চর্য, মহেশ রায়ের সেই দরিদ্র আত্মীয়-ই বেনামে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি কিনে নিলে।

জীবনের এই পাপ-ক্লিন্ন গলির অধিবাসী হয়ে মহেশ রায় দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলেন না। একমাত্র পুত্র আদরের দুলাল অসীম আশ্রয় পেল পুরাতন দাসীর স্নেহ-পক্ষপুটে। বলা বাহুল্য, বাড়ির নূতন মালিক হয়েছে সেই পুরাতন দরিদ্র আত্মীয়। অসীমের

লেখাপড়া বন্ধ হল, অথচ তার বিদ্যানুরাগ ছিল তুলনা-রহিত; বাড়ির ভৃত্যের পর্যায়ে দুঃসহ অবনমনেও নতুন গৃহকর্তা-দম্পতির উৎপীড়ন থেকে মুক্তি নেই তার।

অবশেষে কালিমাটির কারখানায় দেখি মহেশ রায়ের দুলাল অসীমের শ্রমিকরূপে নব-অভ্যুদয়। ঐতিহাসিক-দুর্লভ তথ্য-বিন্যাসের সহায়তায় মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়ের ছবি এঁকেছেন শিল্পী, যার গহন-গভীরে কানায় কানায় ভরে রয়েছে করুণ সুরের গোপন ফল্গুধারা—"এখানে আসার অল্পদিনের মধ্যেই অসীম দেখ্‌ল, তারই মত সহস্র সহস্র ভাগ্যহত মানুষ এই কারখানার মধ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আকারে-ইঙ্গিতে ধরা না গেলেও তাদের নামের শেষে—ঘোষ, বোস, মিত্র, গাঙ্গুলি, চক্রবর্তী প্রভৃতি শব্দ সভ্যজগতের উচ্চ বংশধরদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"

তথ্যের স্বভাব-বর্ণনা এখানে সাংকেতিক ব্যঞ্জনার আকার ধরেছে; কথায় লেগেছে অর্থবহ রহস্যের ইঙ্গিত,—যার ভেতর দিয়ে দেহের অতীত মনের আভাস ভেসে আসে। "সভ্যজগতের উচ্চ বংশধরেরা" আজ নিরর্থক শব্দময় পদবীমাত্র-সর্ব হয়ে উঠেছে,—এই পরাভবের বেদনা লেখার অন্তরে সর্বাঙ্গ ছেয়ে রয়েছে। একই সহজ তথ্যবর্ণনা অসীমের চারিত্র বিবর্তনের চিত্রাঙ্কণে আশ্চর্য সফল তাৎপর্য সঞ্চার করেছে। কালিমাটির কারখানায় এসে "বছর না ঘুরতে ঘুরতে অসীমের নাম হল অসি মিস্ত্রী। তার গলার স্বর হল ভারি, কর্কশ; ভাষা হল ছোটলোকের মত। সে খইনি খায়; যখন তখন থুথু ফেলে, গালাগাল দেয়, সভ্যজগতের সমস্ত চিহ্ন লোহার কলে ঢালাই করে সম্পূর্ণ নূতন রূপ নিয়ে উঠ্‌ল। অসীমও হয়ে গেল লোহার মানুষ।"—এ কেবল তথ্যের ঐতিহাসিক বিবৃতি নয়,—তুলির আঁচড়ে রেখার পর রেখার টানে এক বেদনাকর জীবন-বিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত ছবি এঁকে তুলেছেন এখানে চিত্র-শিল্পী গোকুল।

শিল্পীর প্রতিভাকে বলা হয়েছে—"অ-পূর্ব বস্তু-নির্মাণ-ক্ষমা প্রজ্ঞা"—'নির্মিতি' তাঁর স্বভাবধর্ম। কেবল ভাঙনের স্তূপ জমিয়ে তোলায় সে প্রতিভার তৃপ্তি নেই। বিভগ্নতার অন্ধ গহ্বর-তলেও সার্থক স্রষ্টা নব-জীবনাঙ্কুরের স্বপ্ন রচনা করে ফেরেন। গোকুলের প্রকৃতিতে সেই 'নির্মাতা'র প্রতিভা ছিল,—ভাঙনের চোরাবালিতে আত্মার আশ্রয় খুঁজে ফিরেছে তাঁর স্বভাব-পথিক চিত্ত। তাই দেখি মধ্যবিত্ত জীবন ভাঙে, তবু অবক্ষয়িত ইতিহাসের শ্মশানভূমিতে মানুষ মরে না। আশা-বাসনার গোপন উত্তাপ, আর প্রেম-প্রত্যয়ের গভীরতাকে আশ্রয় করে সে বাঁচতে চায় অন্তরে অন্তরে; মহেশ রায়ের পুত্র অসীম রায় মরে গিয়ে 'লোহার মানুষ' অসি মিস্ত্রী জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু লোহার মধ্যেও আবার স্নিগ্ধ প্রাণ জেগে ওঠে; একমুঠো শেফালির মত সুরভি-ঘন শিউলি-র

মধ্যে অনন্ত জীবন-রহস্যের সন্ধান খুঁজে পেয়ে চকিত শান্ত আত্মস্থ হয় অসি মিস্ত্রী। মহেশ রায়ের ছেলে বিয়ে করেছিল শিউলিকে, যার মা মোক্ষদাকে এককালে ধরে নিয়ে গিয়েছিল জমিদার। বিয়ের পরে স্বামীর সান্নিধ্যেই নিজের মাতৃপরিচয় আবিষ্কার করতে পারে শিউলি। মোক্ষদা এবার মেয়ের সুখের সংসারে এসে অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিনষ্টির কীট যে জীবনের মূলভূমিতে শেকড় কাট্‌তে শুরু করেছে, বাঁচবার ভরসা তার পক্ষে বৃথাস্বপ্ন !

অসি মিস্ত্রী একদিন মরণান্তিক আঘাত নিয়ে ফিরল কারখানা থেকে। মাতা ও কন্যা,—মোক্ষদা ও শিউলির অতন্দ্র-অকম্পিত সেবার সাধনাও তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারে না। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস-হীন মানুষ অন্ধ দৈবীবিশ্বাসের যূপকাষ্ঠে চিরদিন আত্মহত্যা করেছে। মোক্ষদা কন্যাকে একবস্ত্রে পাঠিয়ে দেয় ক্রোশ কয়েক দূরের জাগ্রত দেব-দেউলে 'হত্যা' দিয়ে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনবার সাধনায়। গভীর রাত্রে দেবতার প্রত্যাদেশ এসে পৌঁছায় দেব-সেবায়েৎ-এর মূর্তি ধরে। রাত্রিশেষে দেবতার নির্মাল্য-আশীর্বাদ নিয়ে বিবশা উন্মাদিনীর মত শিউলি ঘরের পথে ফিরে চলে। এদিকে রাত্রেই অসীমের জ্ঞান ফিরে এসেছে, চঞ্চল চোখের দৃষ্টিতে উৎকণ্ঠিত আত্মার অধীরতা ছড়িয়ে দিয়ে শিউলিকে সে খুঁজে ফেরে। মোক্ষদা মুখ ফুটে বল্‌তে পারে না শিউলিকে সে কোথায় পাঠিয়েছে। অবশেষে দেবতার পূজার নির্মাল্য নিয়ে শিউলি ফিরে আসে। কিন্তু অসীমের কাছে ছুটে যাবার সকল পথ যে তার রুদ্ধ হয়েছে !—নারীদেহের যে দেউলতলে তার আত্মার অমৃত-স্বাদ অসীমকে চির-পিপাসু করে রেখেছে, তাকে নিঃশেষে গ্রাস করেছে দেবতা,—সেই দেব-দেউলকে বিদীর্ণ, অগ্নিদগ্ধ করেছে দেব-সেবায়েৎ-এর ক্রূর লালসা ! এই গ্লানি-লিপ্ত দেহের পাত্রে স্বামীর পিপাসু আত্মার মুখে প্রাণের সুধা নিবেদন করবার সকল সঞ্চয় আজ তার নিঃশেষিত হয়েছে। মধ্যবিত্তের ভঙ্গুর জীবন আবার ভাঙ্‌ল,—দেবতার রাহুগ্রাস পড়েছে তার ওপরে বারে বারে।

এই বিভগ্ন কারুণ্যের নিরঞ্জ ব্যঞ্জনা সারা অঙ্গে বিকিরিত করে শেষ হয়েছে 'দেবতার গ্রাস' গল্প। বস্তুময় প্লট্-এর গায়ে সুরশিল্পী গোকুল নাগের নির্বস্তুক বেদনানুরাগের রেশ ছড়িয়ে পড়ে গল্পকে ছোটগল্পের সাংগীতিক মূর্ছনায় ভরে তুলেছে।

নদীর এ-কূল ভাঙে ও-কূল গড়ে ; মনুষ্যত্বের মরণ নেই। মধ্যবিত্ত জীবনের বনিয়াদ ভেঙে চৌচির হয়ে যায়, তবু মানুষ—মানুষের প্রাণধর্ম ভেসে উবে যায় না ; নতুন জীবন-ভূমির চড়ায় নবীন আশ্রয়ের ভিত খুঁজে নেয়। পূর্বের অধ্যায়ে বলেছি, আলোচ্যকালের ভঙ্গুরতা-পীড়িত মধ্যবিত্ত তরুণ মানসে নবজীবনের এক অজ্ঞাতপূর্ব সম্ভাবনার আভাস নিয়ে এসেছিল সমাজের নীচের তলার জীবন। মনে হয়েছিল, নিঃস্ব রিক্ততার গহন-গভীরে

মানব-মহিমার অমর আলোককে যেন এরা বুকে জড়িয়ে ধরেছে সহজ আড়ম্বরহীনতায়,—অনায়াসে তার পায়ে জীবনের সমস্ত কামনা-বাসনার রক্তভপ্ত অঞ্জলি সঁপে দিয়েও দীন হয়ে পড়েনি। অবহেলিত মানুষের অন্তরদেশের সেই অদীনপুণ্য বেদনার সুরভিরূপ এঁকেছেন গোকুল নাগ 'বসন্ত-বেদনা'র মত গল্পে।—

ধনঞ্জয় বৈরাগী রূপসীকে বিয়ে করেছিল,—ভালবেসেছিল তাকে প্রাণভরে। ধনঞ্জয়ের সোনার সংসারে রূপসীর মাতৃস্নেহের মধুসায়রে সঞ্চরণ করে বড় হচ্ছিল দুটি শিশু ;—মাতৃ-পিতৃহীন অনাথ ছেলে গৌর বড়,—রূপসীর নিজের মেয়ে সুরভি ছোট। কিন্তু মানুষের নিরবচ্ছিন্ন সুখে বিধাতার বড় ঈর্ষ্যা। সকল সুখের আশ্রয় রূপসীর তাই ডাক পড়ল পরপারে। ধনঞ্জয় ইচ্ছে করলেই আবার বিয়ে করতে পারে,—অশিক্ষিত শরীর-সর্বস্ব সমাজে তাই রেওয়াজ। কিশোর গৌর সেই ভয়ে পালিয়ে যায় ;—তার 'মায়ের' ঘরে ধনঞ্জয় শেষে আর এক নারীকে অধীশ্বরী করে বসাবে, সে ছবি চোখে দেখবার সাধ্য তার নেই। শোকার্ত ধনঞ্জয় একমাত্র কন্যাকে বুকে করে শোকের দিনে বুক বাঁধে—রূপসীর সন্তানকে সম্পূর্ণ করে তোলাই হয়ে ওঠে তার জীবন-ব্রত,—রূপসীর জায়গায় তার ঘরে, তার শূন্য হৃদয়ে আর কারো ঠাঁই হবার নয়।

সুরভির বিয়ে দিয়েছিল ধনঞ্জয়,—কিন্তু এয়োতি-ধর্মের যথার্থ পরিচয় দেহ-মনে অনুভব করতে পারার আগেই দুর্ভাগিনীর জীবনে মুছে যায় তার সকল চিহ্ন। সুরভি আবার পিতার কাছে ফিরে আসে ;—দেহের চেয়েও মনের শূন্যতা ধনঞ্জয়কে জরাজীর্ণ করে তোলে অন্তরে বাইরে। তার জীবনের গভীরে যেন রূপসীর আত্মার আহ্বান এসে ডাক দেয়। এদিকে দেহ-মনের কানায় কানায় ভরে ওঠে সুরভি পরিপূর্ণ যৌবন-তরঙ্গে। তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আর্ত, শঙ্কিত হয়ে ওঠে ধনঞ্জয় মনে মনে। এ মেয়েকে কোন্ নিরাশ্রয়তার মাঝে ভাসিয়ে যেতে হবে! এমন দিনে যদি গৌরটাও থাকৃত।

সত্যিই অনেকদিন পরে অনেক দুর্ভোগ ভুগে গৌর ঘরে ফিরে আসে। নিটোল পৌরুষের দৃঢ় অপরূপ মূর্তি! ধনঞ্জয়ের শীর্ণ সংসারে সে হাল ধরে শক্ত কঠিন হাতে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার যৌবন-বলিষ্ঠ পুরুষ-দেহে এক অননুভূত সন্ধানের চাঞ্চল্য জেগে ওঠে। সুরভি বোঝে তার অর্থ,—মধুস্নিগ্ধ নারী-দেহের অতলে মধুমান দেহাতীতকে খুঁজে পাবার অধীর বাসনায় গৌর ঘুরে ফিরে সুরভির নিভৃত নৈকট্যে। গৌরের সুমিত সংকেত-ঘন প্রেমের ব্যাকুলতা সুরভিকেও পুলকিত করে তোলে শরীর-মনের অনুপরমাণুতে। এমন দিনে রুগ্ন, বয়স্ক, অসহায় বিহারীর রোগশয্যার শিয়রে রাতজাগা সেবাব্রতের স্বেচ্ছাব্রত বরণ করে নেয় সুরভি। নারীচিত্তের সেই দাক্ষিণ্য-স্নিগ্ধ সেবা-পরিচারণের মাধ্যমে একদিন নিজেরও অজ্ঞাতে বিহারীর 'মা' হয়ে

ওঠে সে ;—বিহারী সুরভিকে ডাকে 'মা'। আর তো তার যৌবনের ললিতবাণী শোনবার অবকাশ নেই। একজনের মাতৃ-চেতনাকে বাঁচাতে হবে যে, এবার প্রাণের সকল শক্তি দিয়ে ;—দেহমনের দৃঢ়তা নিয়ে বসন্ত-বাসনাকে করতে হবে প্রতিরোধ! বসন্তের মধ্যে কেবল উদ্দাম মাদকতাই আছে,—অব্যক্ত-বেদনার গৈরিক রাগও নেই কী? বৈষ্ণবের অনুরাগের সূত্রে বৈরাগীর স্বেচ্ছা-বঞ্চিত বিবিক্ততার মধুরিমা গেঁথে বসন্ত-বেদনাময় নবজীবনের ইঙ্গিত বহন করে ফিরেছে বাকি জীবনে সুরভি আর গৌর।

এ-গল্পে বস্তুলীন জীবনের স্বাদ যত, নির্বস্তুক অনুভবের অঙ্গহীন মধুসুরভির সুর-মদিরতা তার চেয়ে অনেক বেশি। কথায়ও লেগেছে গানের ব্যঞ্জনা-রেশ। তাই বলছিলাম,—রেখা আর সুরের নিগূঢ় সূক্ষ্ম শিল্পের কারবারী গোকুলের বস্তু-সঞ্চয় ভরা গল্পে 'কথার চেয়ে ইঙ্গিত', বক্তব্যের চেয়ে সংগীতের ব্যঞ্জনাই বেশি।

তাঁর এ-ধরনের কয়েকটি গল্প সঞ্চিত হয়েছে মায়ামুকুল (১৯২৭ খ্রীঃ) গ্রন্থে।

কল্লোলের সাধনা ও উত্তরসাধক

কল্লোল-ভাবনার জন্ম দীনেশরঞ্জন আর গোকুল নাগের পরিণাম তৃষার্ত মানব প্রেমানুভবের সূতিকাগারে। তাঁদের অবচেতন মনের 'ঝড়ের দোলা'[১৬] থেকেই কোনো অ-কল্পিত শুভলগ্নে 'কল্লোলে'র পত্রিকা-জীবনেরও সূত্রপাত (১৩৩০ সাল)। তারপরে যে-শিল্পিগোষ্ঠীর সচেতন আত্মার তাপ-নিষেকে সেই নবজাতকের প্রাণের বোধন ঘটেছিল তিলে তিলে, তাঁদের মধ্যে মুখ্যত স্মরণীয় হয়ে আছেন অচিন্ত্য-প্রেমেন-বুদ্ধদেব,—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩ খ্রীঃ), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪ খ্রীঃ) এবং বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪ খ্রীঃ)। 'কল্লোলে'র শিল্পি-সংখ্যা অগণিত।[১৭] "যে আসবে এ [অফিস] ঘরে কল্লোল তারই পত্রিকা।"—দীনেশরঞ্জন নাকি বলেছিলেন শৈলজানন্দকে। বস্তুত নতুন যুগের অভাবিত ব্যথার কাঁপন নবীন সৃষ্টির দোলা জাগিয়েছিল যাঁদের অন্তরে তাঁদের সকলকেই কাছে টানতে চেয়েছিল 'কল্লোল' পত্রিকা। শৈলজানন্দ ছিলেন একেবারে প্রথম থেকেই ; প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় বেরিয়েছিল তাঁর 'মা' গল্প ; তারপরে এই অভিনব জীবন-শিল্পীর নব নব দানে সমৃদ্ধ হয়েছে 'কল্লোল' এর সংখ্যার পর সংখ্যা। অন্যান্যের কথা ছেড়ে দিলেও তারাশঙ্কর, প্রবোধ সান্যাল, অন্নদাশংকর এঁদের সকলেরই উদীয়মান সৃজনী-চেতনাকে টেনেছিল 'কল্লোল'-এর আকর্ষণ। তাহলেও একান্তভাবে

১৬। 'ঝড়ের দোলা' সংকলনে ফোর আর্টস্ ক্লাবের চার সদস্য চারটি গল্প লেখেন ;
১। 'পাগল'—সুনীতি দেবী, ২। 'মাধুরী'—গোকুল নাগ, ৩। 'শ্রীপাত'—মণীন্দ্রলাল বসু, ৪। 'জয়মাল্য'—দীনেশ দাশ।

১৭। বিস্তৃত বিবরণ দ্র.—ডঃ জীবেন্দ্রবিনোদ সিংহরায়—'কল্লোলের কাল'।

সে বাঁধনে এঁরা কেউ-ই স্থায়িভাবে ধরা দেন নি; এমন কি প্রথম প্রকাশকালের উত্তাল উদ্দীপনাও সুদীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তাহলেও যাঁদের প্রকৃতি, প্রবণতা ও সাধনার বশে 'কল্লোল' বাংলা সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র প্রবাহ, তাঁদের প্রধান ঐ তিন জন; প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব ত্রয়ী।

বর্তমান প্রসঙ্গে এ-কথার স্পষ্ট তাৎপর্য অনুধাবনের প্রয়োজন রয়েছে। ছোটগাল্পিক তারাশঙ্করের সৃজনী-বাসনা 'কল্লোল'-এর আশ্রয়েই প্রথম সংবর্ধিত আত্মপ্রকাশ লাভ করেছিল; তাঁর 'রসকলি', 'হারানো সুর', 'স্থলপদ্ম'—একে একে ছাপা হয়েছিল 'কল্লোলে'ই। তাহলেও তাঁর মনের তরী ভেড়ে নি কখনোই 'কল্লোল'-এর ঘাটে। প্রধানত মানসিকতার পার্থক্য আন্তরিক ছিল বলেই অল্পদিনেই তিনি সঙ্গ-ছাড়া হয়েছিলেন। অন্নদাশংকর 'কল্লোলে'র ইশারায় দূর থেকে চকিত-চমকিত হয়েছিলেন; কাছে এসে ধরা দেন নি কোনো দিন। প্রবোধ সান্যালও প্রথম দিকে খুবই অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন; 'কল্লোল'-এর লেখক তালিকায় সে-যুগে তিনি এক লোভনীয় নাম। অথচ অল্পদিনেই তাঁর চলার পথ স্বতন্ত্র হয়ে গেছে।

কেবল শৈলজানন্দ প্রথম থেকে ছিলেন অভিন্ন-হৃদয়। 'কল্লোল'-এর ঘাটে বসেই 'কালিকলম'-এর প্রকাশনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন মুরলীধর বসু আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে। কিন্তু এ-যোগ কর্মের—আত্মার নয়। সেই গূঢ়তম স্বভাবে শৈলজানন্দ কল্লোল-গোষ্ঠীতে থেকেও কল্লোলেত্তর,—বীরভূমের লালমাটির স্বপ্ন তাঁর গল্পের দেহে বিভাসিত হয়ে উঠেছে,—তবু তাঁর শিল্প-প্রাণ সেই জন্মভূমির ফসলও নয়,—শৈলজানন্দ বাংলা সাহিত্যে কয়লাকুঠি-জীবনের প্রত্যক্ষ মন্ত্রদ্রষ্টা রূপকার।

সে এক পৃথক প্রসঙ্গ। বর্তমান উপলক্ষে প্রধান কথা হল, 'কল্লোল' যেখানে একটি যুগ-চেতনার প্রতীক,—আগে বলেছি—এক ভঙ্গুর কালের চোরাবালিতে আশাহত বিক্ষুব্ধ তারুণ্যের আক্ষেপ আলোড়ন এবং প্রচ্ছন্ন উজ্জীবন-আকাঙ্ক্ষার সবটুকু নিয়েই তার সামুদ্রিক বিস্তার। ব্যাপ্তিই সেই জীবন-ভাবনার একমাত্র কথা ছিল না—তার গভীরে বৈচিত্র্যের সঙ্গে স্ববিরোধের তরঙ্গাভিঘাতও ছিল অপ্রমেয়। সেই ব্যাপক অর্থে 'কল্লোল'-অনুসারী, 'কল্লোলেত্তর' এবং 'কল্লোল'-বিরোধী মানস প্রসারের অভিঘাতেই কল্লোল-যুগচেতনার সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠা-পরিচয়।

'কল্লোল'-পত্রিকাশ্রয়ী মুখ্য মানসিকতায় সেই সর্বায়ত রূপটি কখনোই ধরা পড়ে নি, পড়বার কথাও নয়। এক বিশেষ প্রবণতার রেখাচিহ্নিত খাত বেয়েই চলেছিল তার ভাব-স্রোত; অচিন্ত্যকুমার ব্যাখ্যা করে বলেছেন—"বস্তুত কল্লোল যুগে এ-দুটোই প্রধান সুর ছিল, এক, প্রবল বিরুদ্ধবাদ; দুই, বিহ্বল ভাববিলাস। একদিকে অনিয়মাধীন

উদ্দামতা, অন্যদিকে সর্বব্যাপী নিরর্থকতার কাব্য। একদিকে সংগ্রামের মহিমা, অন্যদিকে ব্যর্থতার মাধুরী। আদর্শবাদী যুবক প্রতিকূল জীবনের প্রতিঘাতে নিবারিত হচ্ছে—এই যন্ত্রণাটা সেই যুগের যন্ত্রণা। শুধু বন্ধ দরজায় মাথা খুঁড়ছে, কোথাও আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না,—কিংবা যে জায়গায় পাচ্ছে, তা তার আত্মার আনুপাতিক নয়—এই অসন্তোষে, এই অপূর্ণতায় সে ছিন্নভিন্ন।"[১৮]

'কল্লোলযুগ' অর্থে এখানে 'কল্লোল'-পত্রিকা মাধ্যমে উৎসারিত মুখ্য যুগমানসিকতার প্রসঙ্গই নির্দেশ করেছেন অচিন্ত্যকুমার। আর সেই জীবনানুভবই অচিন্ত্য-প্রেমেন-বুদ্ধদেবের লেখনী আশ্রয় করে প্রত্যক্ষ প্রকট মূর্তি ধারণ করেছিল সেদিন। এঁদের মধ্যে সাধর্ম্য কেবল সমকালীনতার, সমানকর্মিতার, অথবা ঘনিষ্ঠ সৌহৃদ্যের নয়। এই তিনজনের অনুভবের মধ্যে যুগের এক অনির্দেশনীয় বেদনা পুঞ্জিত হয়েছিল।—পুরাতন প্রত্যয়ের ভগ্ন-বিচূর্ণ বেদীতলে এঁদের প্রাণ নবীন বিশ্বাসের আশ্রয় কামনা করে আর্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে;—আর সে আকাঙ্ক্ষা, সে আর্তি এবং বিক্ষোভ তিনজনেরই লেখনী-মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে গল্প-উপন্যাস-কবিতায়,—গদ্য-পদ্যের বিচিত্র মাধ্যমে। তবু এঁদের তিনজনের সৃষ্টিই সমধর্মী নয়—সৃজন-রসের স্বাদুতায় যেমন, তেমনি সাফল্যের পরিমাপেও তারতম্য রয়েছে দূরপ্রসারী ব্যবধানের আকার ধরে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই 'কল্লোল'-ধারার উত্তরসাধক গল্পকারদের মধ্যে প্রথম স্মরণীয়তার দাবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের। এ আলোচনা রচনার উৎকর্ষ-অপকর্ষের তুলনামূলক নয়,—কোনো সাহিত্যালোচনারই তা মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে না। তা ছাড়া প্রকরণগত বিশিষ্টতা, এবং জীবনানুভবের স্বতন্ত্র স্বাদুতাকে আশ্রয় করে বাংলা ছোটগল্পের ঐতিহাসিক বিকাশের স্বভাব সন্ধানই বর্তমান প্রয়াসের একমাত্র কাম্য। প্রেমেন্দ্র মিত্র এই শিল্পিত্রয়ীর মধ্যে সেই প্রথমতম, যার সৃষ্টিতে ছোটগল্পের অকুঞ্চিত পরিচ্ছন্ন আকারটি অক্ষুণ্ন থাকতে পেরেছে। বুদ্ধদেব নিজেই স্বীকার করেছেন, তাঁর লেখনীর চাল মূলত গল্প-লেখকের নয়।[১৯] অচিন্ত্য সেনগুপ্তের গল্পের গঠন অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট; কিন্তু তাঁর অন্তরের কবি কেবল তাঁর গল্পের আত্মার মূলেই বাসা বেঁধে নেই,—তাঁর কথার দেহেও কবিতার সুর লগ্ন হয়ে রয়েছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই শিল্পীর উপন্যাস রচনাকে 'কাব্যধর্মী' বলে অভিহিত করেছেন,[২০]—তাঁদের ছোটগল্প-গুচ্ছও নিঃসন্দেহে কবিতাস্বাদী, তাই 'কল্লোল'-ধারার

১৮। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত—'কল্লোল যুগ'।

১৯। দ্রষ্টব্য—জ্যোতিপ্রসাদ বসু সম্পাদিত—'গল্প-লেখার গল্প'। এ বিষয়ে বুদ্ধদেব সম্পর্কীয় পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২০। দ্রঃ—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'—৪র্থ সং।

ছোটগল্প-রূপের পরিচ্ছন্নতম পরিচয় সন্ধানে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সৃজনলোকেই অবিতর্কিত অনুপ্রবেশ করা যেতে পারে।

(ক) প্রেমেন্দ্র মিত্র

নিছক তথ্যগত ইতিহাসের বিচারে প্রেমেন্দ্র মিত্র মূলত 'কল্লোলে'র শিল্পী নন। তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসী পত্রিকায় ('শুধু কেরাণী'—প্রকাশ কাল—১৩৩০, চৈত্র সংখ্যা)। 'কল্লোলে'র ঘাটে তাঁর সৃষ্টির তরী যখন ভিড়েছে,—'প্রবাসী' ও 'বিজলী' পত্রিকার সাহচর্যে তিনি তখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ। অন্যপক্ষে 'কল্লোলে'র প্রথম বছরের শেষে গোষ্ঠিভুক্ত হয়েও তৃতীয় বছরেই 'কালিকলম' পত্রিকায় পৃথক্ প্রতিষ্ঠাভূমির সন্ধান করেছিলেন। 'কল্লোলের সংহতিতে সেদিন 'চিড় যে খেল', অচিন্ত্যকুমারও সে কথা গোপন করতে পারেন নি।[২১] তাহলেও অনেকের চেয়ে দূরে থেকেও প্রেমেন্দ্র মিত্রই 'কল্লোলে'র স্থর এবং সাধনাকে একান্ত করে পেয়েছিলেন,—গল্পসৃষ্টির সুরেখ পরিচ্ছন্ন প্রচ্ছদে।

ওপরে উদ্ধৃত কল্লোল যুগ-লক্ষণের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার স্পষ্টত-ই অনুভব করতে দিয়েছেন,—সে ছিল এক আত্মিক যন্ত্রণা। বিশ্বাসের আশ্রয়-হারা মানুষের জীবন ঝড়ের রাতে নোঙরছেঁড়া উত্তাল নৌকোর মত। সেই তরঙ্গতাড়িত দোলায়মান আত্মার যন্ত্রণাই কখনো আর্তি, কখনো বিক্ষোভের আকার পেয়েছে 'কল্লোল'-ভাবনায়। ভুলেও এমন কথা যেন না ভাবি,—এই শিল্পিগোষ্ঠী ছিলেন সচেতনভাবে প্রত্যয়-বিমুখ। পুরাতন মূল্যবোধের আশ্রয় ক্রমশ তলা থেকে ক্ষয়ে গিয়ে কালের সমুদ্রবক্ষে নিঃশেষে চূর্ণ হয়ে পড়েছে,—আজ সেখানে কেবল শূন্যতা,—কেবল ঝড়ের রাতের অন্ধকার ও প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত। তাই শুনি :

> "বিধাতা, জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার
> অমৃতের তরে।
> না হয় ডুবিয়া আছি কৃমিঘন পঙ্কের সাগরে
> গোপন অন্তর মম নিরন্তর সুধার তৃষ্ণায়
> শুষ্ক হয়ে আছে তবু।" ['বন্দীর বন্দনা']

এ-কবিতা কেবল বুদ্ধদেব বসুর ব্যক্তি-চেতনার সৃষ্টি নয়,—ব্যক্তি-কবির কণ্ঠে যুগ-জীবন-যন্ত্রণার বাণীরূপ! কখনো কখনো এই একটানা নৈরাশ্যের অভিঘাত জমাট বেঁধে বিমুখ বিদ্রোহের আকার ধরেছে। কিন্তু বাইরে থেকে যা বিরোধিতা,—বিরূপতা,

২১। দ্রষ্টব্য—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত—'কল্লোল যুগ'।

অন্তরে তার মূল ছড়িয়ে রয়েছে এক উৎকণ্ঠিত মূক বাসনার গভীরে। শিল্পী হিশেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠতা এই প্রত্যয়-বাসনার অবিচল দৃঢ়তায়। 'প্রথমা'-র কবিকে অবিশ্বাসী বলে ভুল করেছিলেন কেউ কেউ;—উদ্ধত যৌবনের বেদনার্ত অবিনয়ের নির্মোক মোচন অসাধ্য ছিল তখনো। কিন্তু উত্তীর্ণ যৌবনের চোখ-ধাঁধানো প্রখর আলোর সীমা পেরিয়ে কবি যখন সমুদ্র স্নান করে ফিরলেন, তখন সন্দেহ রইল না, প্রথমাবধিই তাঁর শিল্পি-আত্মা ছিল গোপনে গোপনে প্রত্যয়ের সাগরতীর্থের অভিসারী।

"এই অকিঞ্চন পৃথিবীর মৃত্তিকায়
যে সূর্য বীজ তুমি রোপণ করো
তা ব্যর্থ হবার নয়।
মোহাচ্ছন্ন বর্তমানের সমস্ত কুজ্ঝটিকা অতিক্রম করে
সুদূর যুগান্তে তার সংকেত প্রসারিত।
মানবতার গভীর উৎসমূলে অক্ষয় তার প্রেরণা।
হে মহাকাল, তোমার অনন্ত পারাবারে আমরা
ক্ষণিকের বুদ্‌বুদ।
তবু সেই সূর্যশিখা যে আমাদের আছে প্রতিফলিত
এই আমাদের গৌরব।"

এই কবিতা 'সাগর থেকে ফেরা'র,—কিন্তু এ বাণী প্রেমেন্দ্র মিত্রের আযৌবন শিল্পি-চেতনার। 'কল্লোল'-এর দিশাহীন অন্ধ আত্মসন্ধানের দিনে বিভ্রান্তচেতন তরুণ প্রেমেন্দ্র বন্ধুকে চিঠি লিখেছিলেন,—"বড় দুঃখ আমার এই যে, কোন কাজই ভাল করে করতে পারলুম না। জীবনের মানেও বুঝতে পারি না। জীবনটা যখন চলা, তখন একটা দিকে ত চলা দরকার, চারদিকে সমানভাবে দৌড়াদৌড়ি করলে লাভ হবে না নিশ্চয়ই। সেই পথের লক্ষ্যটা আনন্দ ছাড়া কি করা যেতে পারে ভেবে পাচ্ছি না।......

"আনন্দ কল্যাণের সঙ্গে না মিশলেই যায় সব ভেঙে। অনেক ধনী হয়ে অনেক টাকা বাজে অপব্যয় করার আনন্দ আছে, খুব ব্যভিচারী লম্পট হওয়াতেও আনন্দ আছে, সর্বত্যাগী বৈরাগী তপস্বী সন্ন্যাসী হওয়াতেও আনন্দ আছে, কিন্তু কল্যাণের সঙ্গে আনন্দ মেশে না, তাই গোল। এগিয়েও ভুল করতে পারি, পেছিয়েও। পাল্লা সমান রেখে কেমন করে চলা যায়, তাও ত ভেবে পাই না।"[২২]

যৌবনের এই পথ খোঁজা,—খুঁজে না পাওয়ার যন্ত্রণার অন্তরালে ছড়িয়ে রয়েছে অসংজ্ঞান মনের ধ্রুব-সংলগ্নতার বাসনা। আর একটি চিঠিতে লিখলেন, কুঁড়ির সীমায়

২২। অচিন্ত্য সেনগুপ্তকে লেখা চিঠি। 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে উদ্ধৃত।

তখনো পৌঁছাননি (১৯২২ খ্রীঃ),—"বিচিত্র জীবনের কাহিনী। শুধু মনের মধ্যে মন্ত্র হোক্—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' যদি কেউ ঐশ্বর্য নিয়ে সুখী হয় হোক, ক্ষুদ্র শান্তি নিয়ে সুখী হয়, হতে দাও, আমরা জানি 'নাল্পে সুখমস্তি।' অতএব 'ভূমৈব জিজ্ঞাসিতব্য'। সেই ভূমার খোঁজে আমরা যেন না নিরস্ত হই। আজ যৌবনকে বলি, 'বয়সের এই মায়াজালের বাঁধনখানা তোরে হবে খণ্ডিতে'।"[২৩]

সন্দেহ নেই, অপরিণত যৌবনের এই উচ্ছ্বাসের অনেকখানিই বাইরে থেকে পাওয়া। রবীন্দ্র-যুগের আকাশে-বাতাসে এ ধরনের ভাবনা তখন অজস্র উড়ে বেড়াচ্ছিল। তাহলেও এই পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনার বাইরে দুটি আনা যে শিল্পীর আত্মার নিখাদ সোনারূপ,—তার নিঃসংশয় পরিচয় পাই প্রথমাবধি তাঁর ছোটগল্পে।

'বুদ্ধ-অচিন্ত্য (group) বেষ্টনী'র সঙ্গে তুলনা করে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,—"কথাশিল্পী প্রেমেন্দ্রের প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ...কাব্যের আতিশয্য বিষয়ে তিনি অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব হইতে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। কল্পনাবিলাস বা কাব্যচর্চার লেশমাত্র বাষ্প তাঁহার উপন্যাসে নাই।" ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপলক্ষ্যে লেখকের গল্পসংকলন গ্রন্থগুলির কথাই বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন; এবং স্বীকার করেছেন,—প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথাসাহিত্য সম্বন্ধে সকল মন্তব্যই সাধারণ-ভাবে তাঁর ছোটগল্পগুলির প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য,—কারণ উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পেই তাঁর প্রতিভার মহত্তর মুক্তি।[২৪] প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয়তম কবিগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ একজন,—তবু তাঁর ছোটগল্প কবি-কর্মের অনধিকার প্রবেশে বিন্দুমাত্র আচ্ছন্ন হয়নি। এ এক আনন্দজনক বিস্ময়। তার চেয়েও বড় বিস্ময়,—সম্পূর্ণরূপে কাব্যগন্ধ-বিবর্জিত এই গল্পগুলি পড়তে পড়তেই মনে হয়,—ছোটগল্প-শৈলীর সঙ্গে গীতিকবিতা-ধর্মের এক অদৃশ্য আত্মিক যোগ রয়েছে।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,—"এক প্রকার শুষ্ক, আবেগহীন, বুদ্ধিপ্রধান জীবন-সমালোচনা, বাঙালি সুলভ ভাবার্দ্রতার (sentimentality) সম্পূর্ণ বর্জন ও আবেগ-প্রবণতার কঠোর নিয়ন্ত্রণই তাঁহার মুখ্য বিশেষত্ব।...তাঁহার গল্পগুলির মধ্যে যে কল্পনার একেবারে অভাব তাহা ঠিক নহে; কিন্তু এই কল্পনার মধ্যে একপ্রকার অপ্রকৃতিস্থতা (morbidity) বা মনোবিকারের ইঙ্গিত আছে।"[২৫] মনে হয়, গভীর অনুসন্ধান করলে বোঝা যাবে,—প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের morbidity আসলে এক ভারসাম্যহীন অসুস্থ যুগজীবন-যন্ত্রণাকে নিজের মধ্যে ধারণ এবং বহন করার শৈল্পিক ফল-পরিণাম ছাড়া

২৩। তদেব। ২৪। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—চতুর্থ সংস্করণ। ২৫। তদেব।

আর কিছুই নয়,—এখানেই তিনি যথার্থ কবি। জীবনের ভাববেদনা যেখানে নিছক অনুভব বা উপলব্ধির স্তরে সঞ্চরণ করে ফেরে, তখন তার অভিব্যক্তি অপহৃত এবং ব্যাহত হয় সুলভ ভাবালুতা কিংবা রূপ-রীতি-কথার আবেগাতিশায্যিতায়। যথার্থ শিল্পী যিনি,—নিজের যুগের বাসনা ও আত্মার যন্ত্রণাকে উপলব্ধি-অনুভব করেই তিনি ক্ষান্ত হন না,—নিজের সত্তার গভীরে তাকে ধারণ এবং বহন করে ফেরেন। সেখানে তার দুঃখবেদনা, যন্ত্রণা এবং আনন্দ তাঁর দ্বিতীয় অস্তিত্ব,—দ্বিতীয়ই বা বলি কেন, একমাত্র অস্তিত্ব,—তথা অনন্য চৈতন্য-স্বরূপে ভাস্বর হয়ে ওঠে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের morbidity,—যদি তা morbidity-ই হয়,—তাঁর সমসাময়িক সায়কবিদ্ধ যুগ-যন্ত্রণার চৈতন্যময় প্রতিফলন,—নিরাবেগ সংহতির মধ্যে যা জমাট কঠিন হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই সংক্ষিপ্তি ও সংহত কাঠিন্যের মধ্যে কোথায় যেন শিল্পি-চেতনার এক অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় জাগ্রত হয়ে আছে,—যা কোনো নাম-না-জানা প্রত্যয়-লোকের উৎকণ্ঠায় চিরচকিত হয়ে রয়েছে,—'অপ্রকৃতিস্থ' হয়ে আছে কোনো 'বেনামী বন্দরে' নোঙরের আশ্রয় খুঁজে পাবার অন্তর্লীন অবচেতন আকাঙ্ক্ষায়।—ছোটগল্পধারার গভীরে সেই অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় 'কবি' প্রেমেন্দ্রের।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,—"কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্বোধিত করা। সেই কবিকেই মানুষ বড়ো বলে, যে এমন সকল বিষয়ে মানুষের চিত্তকে আশ্লিষ্ট করেছে, যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর।"[২৬] প্রেমেন্দ্র মিত্র রন্ধ্র-পথহীন বদ্ধ গলির জীবনে পরিবর্ধিত হয়েছেন,—তাই মুক্তির আকাশ তাঁর চেতনার অনায়ত্ত। তা সত্ত্বেও তাঁর কবি-আত্মা মুমুক্ষু—তাই আশাহীন যন্ত্রণার্ত জীবনের চোরাগলিতে বসেও সৃষ্টির মহিমাকে ভোলা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। 'শুধু কেরাণী' তাঁর প্রথম গল্প: মনুষ্যত্বের ভাষাহীন রিক্ততায় যে আকস্মিক অনুভব এই গল্প-রচনার মূলে রয়েছে,—খুব দূরান্বিত হলেও আদিকবির আদিম সৃষ্টির স্মৃতিকথা তাতে আলোড়িত হয়ে ওঠে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই প্রথম সৃষ্টিও 'শোক থেকে জাত';—পক্ষিজীবনের নয়,—নির্মায়িক সভ্যতার যূপদণ্ডে বাঁধা বজ্রপশুর মত অসহায় মানুষের,—কেরানি জীবনের 'শ্লোক' এ-গল্প।[২৭]

কেরানির জীবনে মানব-স্বপ্নের মধুবিহ্বলতা কী করে বাস্তবের পাশব আঘাতে জর্জরিত আরণ্য ভূমিতে লুণ্ঠিত হয়ে পড়ে,—'শুধু কেরাণী' তারই সংক্ষিপ্ত কাহিনী;—কেরানির বিবাহ, প্রণয়, ছোটছোট জীবন-মুহূর্তে 'বড়প্রেমে'র ব্যঞ্জনা,

২৬। রবীন্দ্রনাথ—'আত্মপরিচয়' ৫ম সংখ্যক রচনা। ২৭। এই গল্প সৃষ্টির পূর্ব কাহিনী লেখক নিজেই জানিয়েছেন। দ্রঃ জ্যোতিপ্রসাদ বসু (স)—'গল্প লেখার গল্প'।

অকস্মাৎ রোগাহত পত্নীর পশুর মত কুঁকড়ে মরা,—বেঁচে থাক্‌বার বুকভরা আশার নিরুত্তম অপঘাত, অর্থাভাবে চিকিৎসাহীন নিষ্ঠুর মৃত্যুর এক গতানুগতিক ছবি। গল্প তবু গতানুগতিক নয়, রূপ-রীতি-বাচনে—কোথাও না। গল্পের শুরু হয়েছে মদির জীবন-বাসনার নিবিড় স্বপ্নাবেশ ঘিরে :—

"তখন পাখিদের নীড় বাঁধবার সময়। চঞ্চল পাখিগুলো খড়ের কুটি, ছেঁড়া পালক শুক্‌নো ডাল মুখে করে উৎকণ্ঠিত হয়ে ফিরছে।

তাদের বিয়ে হল।—ছুটি নেহাৎ সাদাসিধে ছেলেমেয়ের।

ছেলেটি মার্চেন্ট অফিসের কেরাণী—বছরের পর বছর ধরে বড় বড় বাঁধানো খাতায় গোটা গোটা স্পষ্ট অক্ষরে আমদানি, রপ্তানির হিসাব লেখে। মেয়েটি শুধু একটি শ্যামবর্ণ সাধারণ গরীব গৃহস্থ ঘরের মেয়ে—সলজ্জ, সহিষ্ণু, মমতাময়ী।"

—কপোত-কপোতীর মত জীবনের উচ্চচূড় শাখে তাদের নীড় বাঁধা হয় নি,—তবু সবচেয়ে হাল্কা, ভঙ্গুর ডালটিতে বসেও জীবনের মধুগুঞ্জন কলকূজনে নিবিড় হয়ে এসেছিল। কিন্তু যেমনি প্রথম একটু হাওয়া দিল বিপরীত দিক্‌ থেকে, অমনি হাল্কা দুর্বল ডালে ক্ষয়িষ্ণুতার আওয়াজ উঠ্‌ল মড়মড়িয়ে! মেয়েটি প্রথমবার মরে মরেও বেঁচে গেল। দ্বিতীয়বার আর বুঝি নিস্তার নেই।—

"নূতন নীড়ে তখন অচেনা অতিথির সমাগম হয়েছে। একটি খোকা। কিন্তু মেয়েটির আর বাপের বাড়ি থেকে আসা হয়ে উঠ্‌ছে না। অসুখ আর সারতে চায় না,…। ডাক্তার-ধাত্রী বলে,—'সূতিকা'।"

* * *

"রোগ কিন্তু ক্রমশ বেড়েই চল্‌ল।"…

"তবু ছেলেটিকে নিত্য নিয়মিত অফিস যেতে হয়।"…

"তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরবার জন্যে প্রাণ আকুল হয়ে উঠ্‌লেও ছেলেটি হেঁটে আসে—ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে ফুলের মালা কেনবার জন্যে নয় [জীবনের মধুমাসে একদিন সে তা-ও করেছিল],—অসুখের খরচ জোগাতে।

কোনো সময় হয়ত একবারটি মনে হয় যদি সে এমন গরীব না হত, আরো ভাল করে ডাক্তার দেখিয়ে আর একটু চেষ্টা করে দেখ্‌ত।

শুধু সেদিন স্নানাহারাবার আগে মেয়েটি একটিবারের জন্যে এতদিনকার মিথ্যা করুণ ছলনা ভেঙে দিয়ে কেঁদে ফেলে বললে—'আমি মরতে চাইনি,—ভগবানের কাছে রাতদিন কেঁদে জীবন ভিক্ষা চেয়েছি, কিন্তু',—

সব ফুরিয়ে গেল।

তখন কালবোশেখীর উন্মত্ত মসীবরণ আকাশে নীড় ভাঙার মহোৎসব লেগেছে।"

'শুধু কেরাণী' শুধু এইটুকুতেই শেষ হয়েছে। অর্থাৎ, বিধাতার বিরুদ্ধে কোনো জেহাদ ঘোষণা নেই,—সমাজের অসাম্য, কেরানিজীবনের অর্থনৈতিক নিগ্রহের বিষয়ে কোনো ধিক্কার-বাণী উচ্চারিত হয়নি ;—কেবল সীমিত জীবনের সংকীর্ণ সুখ-দুঃখের গণ্ডী ভেঙে বৃহৎ জীবনের সঙ্গে অন্বিত হবার এক অস্ফুট সংকেত যেন মূক ভীরু বাসনার সুরভি নিয়ে জড়িয়ে আছে গল্পের আদি-অন্তে দুটি পৃথক বাক্যের আকারে। —অভাব-উৎকণ্ঠা-খিন্ন আধুনিক গলির মানব-জীবনের নীড় যেন পাখির মত আকাশের নিঃসীমতার দিকে চোখ মেলে একবার শুধু চেয়ে দেখল ;—ডানা ছড়িয়ে উড়ে বেড়াবার অধিকার তার নয়,—তবু দুচোখের তরাদৃষ্টি নিয়ে চেয়ে দেখতে দোষ কী! মুমুক্ষু বাসনার সঙ্গে অতটুকু দুরাশয় একালের পক্ষেও অসংগত নয়। বস্তুত চোরাকুঠরির গোপন গবাক্ষপথ ধরে সেই মুক্তির আকাশটুকুকে গল্পের জীবনে আহ্বান করে এনেছেন শিল্পী, অনেক ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট সচেতনতার অন্তরালে। নিতান্ত গদ্যায়ত, কাব্যগন্ধ-বিমুখ, যথাযথ ভাষণের বাস্তব শৈলীর জগতে এই মুক্তির অদৃশ্য গবাক্ষটুকু অস্ফুট সাংকেতিকতার। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেখকের 'একটি রাত্রি', এবং 'মহানগর' গল্প প্রসঙ্গে এই সাংকেতিকতার প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন।[২৮] প্রেমেন্দ্র মিত্রের সার্থক গল্প রচনার হাতিয়ার অনেক ক্ষেত্রেই অদৃশ্য সাংকেতিকতাময় এক নিজস্ব শৈলী।

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন,—"জীবনের সঙ্গে যুদ্ধে যাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও জিতিতে পারিতেছে না, তাহাদের ব্যর্থতাকে প্রেমেন্দ্রবাবু দীপ্তিমান করিয়াছেন গল্পে,—অথচ কোনো আড়ম্বর বা ভাবুকতা নাই।"[২৯] 'শুধু কেরাণী' গল্পে সেই দীপ্তি এসেছে একটি 'শুধু কেরাণী'র জীবনকে বৃহৎ মুক্ত জীবন-প্রকৃতির প্রচ্ছদে উত্তীর্ণ করতে পারার ব্যথার্ত সাফল্যে। এদিক্ থেকে 'শুধু কেরাণী' নামটিও তাৎপর্যপূর্ণ,—সাংকেতিক ব্যঞ্জনাবহ। Stevenson-এর কথা মনে পড়ে—"......stories may be nourished with the realities of life, but their true mark is to satisfy the nameless longings of the reader, and to obey the ideal laws of day-dreams."[৩০] গল্পলেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে মাঝে মাঝে 'brutal of all realists' বলতে ইচ্ছে করে,—অন্তত বাংলা ছোটগল্পের আলোচ্য যুগের প্রেক্ষিতে। তাঁর গল্পে বাস্তব জীবনায়নের যে নিরুত্তাপ, নিরাবেগ দৃঢ়তা ও অবিচলতা রয়েছে,—মাঝে মাঝে তাকে রূঢ় কাঠিন্য বলে ভুল হয়। তবু সিদ্ধকাম এই গল্প-শিল্পী 'দিবাস্বপ্ন' (day-

২৮। দ্রঃ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পূর্বোক্ত গ্রন্থ। ২৯। ডঃ সুকুমার সেন—'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', চতুর্থ খণ্ড। ৩০। Stevenson—'Gossip on Romance.'

dream) দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন,—তাঁর গল্পের জীবনকে অস্ফুট মৃদু জীবন-প্রত্যয়ের আকাশলোকে উত্তীর্ণ করে। আর এই কলাশৈলীতে তাঁর সূক্ষ্মতা এমনই বিস্ময়কর যে, কবির জগতে গল্পের থীম-কে নিয়ে তিনি একবার করে ঘুরে এসেছেন সকলের অজ্ঞাতে, যেন যাদুকরের মত। মৃত্যুর আগে আর্তকণ্ঠে মেয়েটি বাঁচতে চেয়েছিল,—কিন্তু কেন?—ছেলেটি চেয়েছিল তার দয়িতাকে বাঁচাতে,—সর্বস্ব দিয়ে। তাও-বা কেন? তাদের সেই অনামিকা আকাঙ্ক্ষাকেও শিল্পী যেন রূপ দিলেন গল্পের আদি-অন্তের দুটি ছত্রে পক্ষিজগতের মুক্ত অঙ্গনে প্রবেশাধিকার দিয়ে।

'একটি রাত্রি'র প্রসঙ্গে এ উক্তি আরো সার্থকভাবে প্রতিফলিত হতে পারে। গল্পের শুরু হয়েছে:

"বিংশ শতাব্দীর এই অবিশ্বাস, সংশয় ও হতাশার যুগে একটি পতিত অভিশপ্ত আত্মার কাহিনী বলতে যাচ্ছি, শুনলে অনেকের নাসা কুঞ্চিত, অনেকের চোখ সকৌতুক বিস্ফারিত হয়ে উঠবে জানি।

"কিন্তু সত্যই সুব্রতের জীবনে এমনি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে।

"এ যুগে আমরা সবাই অল্পবিস্তর অভিশপ্ত, পতিত। আমাদের বিবর্ণ জীবনে মৃত্যুর হিমস্পর্শ লেগেছে। আমাদের আকাশ শূন্য হয়ে গেছে, পৃথিবী যান্ত্রিক প্রাত্যহিকতায় কঠিন।

"এই মৃত্যু থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে কি তপস্যা আমরা করতে পারি? তপস্যায় বিশ্বাসও আমরা হারিয়েছি। শুধু একদিন সুব্রতের মত দৈবের অযাচিত অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহে অন্ধকার বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে বিদ্যুৎ-ছটায়, এইটুকুই আমাদের আশা।"

সুব্রত পেয়েছিল দৈবের অনুগ্রহ,—আর 'শুধু কেরাণী' গল্পের নায়ক-নায়িকার জীবনের রক্তাক্ত অবসান লাল ফুল হয়ে ফুটেছে শিল্পীর দাক্ষিণ্য-স্নিগ্ধ আত্মার বৃন্তে। তাদের সীমিত দুঃখের যন্ত্রণা এবং গ্লানি যেন অনাদি বিশ্বের ঝড়ো আকাশে পাখা মেলে উড়বার অধিকার খুঁজে পেয়েছে। কেবল এই কারণেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে এক অবক্ষয়িত যুগ-জীবনের নোংরা গলির মধ্য দিয়ে চলতে চলতেও চেতনার দম বন্ধ হয়ে আসে না,—দুর্গন্ধ জঞ্জাল নাকে মুখে ছিটকে পড়ে শ্বাস বন্ধ করে দেয় না। এই সত্যের চরম প্রমাণ লেখকের সুবিখ্যাত গল্প 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে'। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বভাব-সিদ্ধ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে গল্পটির অন্তরের মূল্য খুঁজে বার করেছেন: 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পটিতে পতিতা-জীবনের ভাবাবেশ-বর্জিত, অথচ সহানুভূতির রেশে পূর্ণ কাহিনী বিবৃত হইয়াছে—ইহার নিরুপায় বীভৎসতার সংযত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাতে পতিতাকে আদর্শবাদের সাহায্যে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টামাত্র লক্ষিত হয় না; এবং এই বিষয়ে

ইহার অন্যান্য লেখকের পতিতা-কাহিনীর সহিত মৌলিক পার্থক্য।[৩১] এ পার্থক্য কেবল শৈলীর নয়, শিল্পীর আত্মার। অর্থাৎ কবির কল্পনা, উচ্ছ্বসিত আদর্শবাদ,—কোনো কিছুকেই প্রেমেন্দ্র মিত্র উপলব্ধির পর্যায়ে ছড়িয়ে রাখেন নি,—আত্মার গভীরে সংহত করে তুলেছেন। আপন সত্তার সে অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ সৃষ্টির অধিগম্য নয়,—সংকেত-ব্যঞ্জনার স্বল্পভাষী অন্তর্গূঢ় অনির্বচনীয়তার জগতে তার দুর্লক্ষ্য সঞ্চরণ।

সাংকেতিকতার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"It is all an attempt to spiritualise literature"……[৩২] প্রেমেন্দ্র মিত্রের বেলায় 'আধ্যাত্মিকতা' শব্দের প্রয়োগ বাড়াবাড়ি হবে;—কিন্তু 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে'র মত গল্পেও, মনে হয়, তাঁর আত্মার অস্থির জিজ্ঞাসা ছুটে ফিরেছে বেশুনের জীবনের চোরা-গলিতে। একটি চিঠিতে অচিন্ত্যকুমারকে শিল্পী লিখেছিলেন,—"কবিত্ব করা যায় বটে এই বলে যে বোঝা যায় না বলেই জীবন অপরূপ, মধুর সুন্দর, কিন্তু ভাই, মন হা হা করে। কি করি এই দুর্বোধ অনধিগম্য জীবন নিয়ে? ……আমি হয়ত কুৎসিত, আর একজন চিররুগ্ন, আর একজন নির্বোধ, আর একজন অন্ধ বা পঙ্গু, আর একজন দীন ভিখারীর মেয়ে।"[৩৩] এ-প্রশ্নের জবাব মেলেনি; তবু 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে'র মত গল্পেও অশান্ত আত্মার সেই জবাব খুঁজে ফিরেছেন শিল্পী। তাই জীবনের অতি বড় নগ্নতার মধ্যেও তাঁর গল্প আটকে পড়ে নিশ্বাসকে রুদ্ধ;—দৃষ্টিকে অস্বচ্ছ করে তোলেনি;—না শিল্পীর, না পাঠকের। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে বীভৎস জগতে বিচরণ-লগ্নেও সহজ মুক্তির এক পাথেয় রয়েছে,—যা তাঁর কবি-আত্মার দান।

কিন্তু 'একটি রাত্রি' গল্পের পরিচয় সন্ধান মাঝপথে থেমে রয়েছে।—কুয়াশা-গাঢ় এক শীতের সন্ধ্যায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সুব্রত,—রহস্যময়ী মহানগরীর নাতি-দীপান্বিত নির্জন পথের রহস্যময়তায়। অনেক দূর এসে পড়েছিল সুব্রত একা একা। কারণ, "এই কুয়াসাচ্ছন্ন নগরের পথে নিরুদ্দেশ্য ভাবে ঘুরে বেড়াতে তার ভাল লাগে। জীবনের কাহিনী যেখানে স্পষ্টভাবে লেখা সেই দিনের পাতাগুলি মুড়ে সে যেন আর কোনো অস্তিত্বের আভাস পায় এই অন্ধকারে।

"যেন কোথায় আছে অনাবিষ্কৃত ব্যাখ্যা জীবনের। পৃথিবী যখন অন্ধকারে নিজের সীমা লঙ্ঘন করে তারকালোক পর্যন্ত প্রসারিত হয়, সেই অপরূপ অবসরে সে ব্যাখ্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।"

এমন সময় দেখা হয়ে গেল, স্বপ্নালোকিত পথের আলোর তলায়, মীরার সঙ্গে—একা! অনেক দিন আগের পরিচয়,—মীরার বাবা ছিলেন মীর্জাপুরের সরকারি ডাক্তার,

৩১। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'পূর্বোক্ত গ্রন্থ'।
৩২। A. Symons—'The Symbolist Movement in Literature.'
৩৩। দ্রঃ অচিন্ত্য সেনগুপ্ত—'কল্লোলযুগ'।

—আর সুব্রত কোনো একদিন চেয়েছিল বিন্ধ্যাচলে 'স্যানাটোরিয়াম' খুলতে। সেই সূত্রে আলাপ গাঢ় হয়েছিল। এমন কি একদিন পিক্‌নিক্‌-এও গিয়ে নিভৃত হয়ে পড়েছিল তারা। কিন্তু মীরা তখনো পরিপূর্ণ নারী হয়ে ওঠেনি ;—বারে বারে নাড়া দিতে গিয়েও আমূল বিচঞ্চল করে তুলতে পারেনি সে সুব্রত-র চেতনাকে। মীরার সঙ্গ হয়ত সুব্রতর ভাল লেগেছে,—বিচিত্র উচ্ছলতাও হয়ত উদ্ভাসিত হয়েছে, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। একদিন যা এসেছিল, আর একদিনের অপেক্ষা না রেখেই তা নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অসাড়, অবশ আজ সুব্রত-র মন,—কোনো দিনই সে জাগেনি,—জাগার প্রয়োজনও বুঝি অনুভব করেনি। অথচ অবচেতনার মধ্যে কেবলই ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছে। এমন সময় কুয়াসা-ঘেরা আবছায়া মহানগরীর পথে চলতে চলতে,—হঠাৎ কখন "চারিধারের রহস্য-সংকেতের মাঝে নিজের অপ্রত্যাশিত বিস্তৃতি"র সম্ভাবনা কী দেখা দিয়েছিল তার মনে ?—আর তখনই হঠাৎ আবির্ভাব হল মীরার। দৈব নয় ত এ-কী ?

রাত্রির নিভৃতির মধ্যে তারা গড়ের মাঠের পথে পাড়ি দিল ট্যাক্সিতে। তারপরেই গল্পকে শিল্পী সেখান থেকে ফিরিয়ে এনেছেন তৎক্ষণাৎ,—পরদিনের অরুণালোকিত সুব্রতের গৃহে।—"মনের ধূসরতায় ক্লান্তচেতন সুব্রতের জীবনে হঠাৎ কি আলো এলো অন্ধকার বিদীর্ণ করে! মনের অন্ধকার সাগর উঠেছে দুলে। অন্ধকার ঢেউ ভেঙে পড়ছে ফেনান্বিত দীপ্তিতে। শুধু একটি মানুষের আবির্ভাবে তার জীবনে এল এই অপরূপ জোয়ার। কোষমুক্ত তরবারের মত তার চেতনা উঠ্‌ল ঝিলিক দিয়ে।

"একটি অপরূপ রাত যাতে তার পতিত আত্মা গভীর জড়ত্ব থেকে জেগে উঠেছে, তার জীবনে অক্ষয় হয়ে থাক্‌।

"দীপ তার জীবনে হয়ত জ্বলবে, কিন্তু একটি থাক্‌ তারকা, সুদূর দিগন্তে আয়ত্তের অতীত হয়ে।

"রাত্রির এই রহস্য-পরিচয় সে প্রাত্যহিক জীবনের মাঝে টেনে এনে ধূলিমলিন করবে না।

"সবে এখন সকাল হয়েছে। মানুষের দুর্বলতারও অন্ত নেই জানি, তবু সুব্রতের এই সংকল্পটুকু জেনেই আমরা বিদায় নিলাম।"

প্রত্যয়ের দৃঢ়তা নেই,—তবু তার জন্যে কী ব্যাকুল গভীর বাসনা। তরুণ বয়সে বন্ধুকে চিঠি লিখেছিলেন—"আচ্ছা অচিন্ত্য, পড়েছিস্‌ তো, 'এতদিনে জানলেম, যে কাঁদন কাঁদলেম সে কাহার জন্য ?' পেরেছিস্‌ কি জানতে ? কে সে প্রিয়া ? সে প্রিয়াকে পাব কি মেয়েমানুষের মধ্যে ? কিন্তু কই ? যার জন্যে জীবনভরা এই বিরাট ব্যাকুলতা

সে কি ওইটুকু? দিনরাত্রি আকাশ-পৃথিবী ছাড়িয়ে গেল যার বিরহের কান্নায় সে কি ওই চপল ক্ষুদ্র ক্ষুধায় ভরা প্রাণীটা? যাকে নিঃশেষ করে সমস্ত জীবন বিলিয়ে দিতে চাই, যার জন্যে এই জীবনের মৃত্যু-বেদনা-দুঃখ-ভয়-সংকুল পথ বেয়ে চলেছি সে প্রিয়াকে নারীর ভেতর পাই কই ভাই।"[৩৪]

প্রত্যক্ষ জীবনে 'স্বপ্নে যারে যায় না ধরা',—কবি-আত্মার ভীরু বাসনা দিয়ে গল্পের দেহে তাকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন,—'প্রাণীর' রক্ত-মাংসের অবয়বকে অতিক্রম করে খুঁজেছেন প্রাণকে,—জড়তা-বুভুক্ষার মধ্যে 'ভূমা'-কে।

কিন্তু শিল্পীর চেতনার বহিরাবরণ রচিত হয়েছে এ-কালের জল-হাওয়া-মাটিতে, তাই 'তপস্যা'র শক্তিতে বিশ্বাসের একান্ত দৃঢ়তা খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। ফলে গল্পের শেষে ভীরু বাসনা একটি অস্ফুট দুর্মর স্বপ্নিল সাংকেতিকতার মধ্যেই যেন শেষ হয়েছে,—যা কথার অধরা ব্যঞ্জনায় ভরা। এইটুকু সব নয়,—স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণাও গ্রেনাইট্ পাথরের মত কালো কঠিন আকারে জমাট্ বেঁধে আছে অনেক গল্পে;—'পুন্নাম' তাদের মধ্যে একটি। মানুষের জীবনে সবচেয়ে পবিত্র, সবচেয়ে মুক্ত, শুদ্ধ, অপত্যস্নেহের মর্মমূলেও বিস্ফোটকের মত বিদ্ধ হয়ে থাকে যুগের সে বিষাক্ত যন্ত্রণা।

"ডকের মাল তোলা ও নাবানোর সামান্য সরকার" ললিত। "জাহাজ ডকে ভিড়লে তবে দুপয়সা আসে। নইলে নিছক বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই।" এমন ললিতের একমাত্র ছেলে দুরন্ত রোগে মর মর,—ছবি আর পারে না তাকে নিয়ে। দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের বীভৎস রিক্ততার মাঝখানে কেবল টিঁকে থাকার জন্য মনুষ্যত্বের সে যেন এক জান্তব প্রয়াস। তক্ষণ-শিল্পীর নির্মম অস্ত্র দিয়ে সেই ভীষণ-কঠিন মূর্তি এঁকেছেন গল্পকার। ডাক্তার বারবার চেঞ্জে নিয়ে যেতে বলে, সাবধান করে দেয়,—"দেখুন, এমন করে একটা মানুষকে পৃথিবীতে নিজের সুখের জন্যে এনে যারা তার প্রতি কর্তব্য করে না, তাদের জেল হওয়া উচিত।"

খোকা তবু মরে না,—"স্পষ্ট সেরে উঠ্‌ছে" সে। ছবি আর খোকাকে নিয়ে চেঞ্জে এসেছে ললিত, সচ্ছল, সচ্ছন্দ জীবন তাদের। খোকা কিন্তু শরীরে সুস্থ হয়েও মনে অসুস্থ হতে থাকে দিন দিন। ঈর্ষ্যা, দীনতা, পরুষতা ঐটুকু শিশুর মধ্যে মানবকের এক দুষ্কল্পনীয় রূপ ধরে ওঠে। পাশে আছে তার খেলার সাথী প্রতিবেশীদের বাড়ির টুনু। শান্ত, করুণ, মধুর, স্নিগ্ধ।

ক'দিন বাদে অর্ধরাতে কান্নার শব্দে জেগে উঠে ছবি,—ললিতও শোনে পাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসছে কান্নার চীৎকার, টুনু বুঝি মারাই গেল।

৩৪। তদেব।

অন্ধকারে "ললিত বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল; তারপর ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বিকৃত স্বরে বললে, টুনু মরে গেল আর আমাদের ছেলে বেঁচে উঠ্‌ল—আশ্চর্য নয় ছবি ?'

ছবি একবার শিউরে উঠ্‌ল মাত্র, উত্তর দিল না। ললিত মাথা নিচু করে পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে বলে যেতে লাগল, " 'আমরা অনেক ত্যাগ করছি, অনেক সয়েছি, আমাদের ছেলে বাঁচবেই যে ছবি। আমাদের মত আরো কোটি কোটি ছেলে বাঁচবে, বড় হবে, রেষারেষি, মারামারি. কাটাকাটি করে পৃথিবীকে সরগরম করে রাখবে; নইলে আমাদের এত চেষ্টা, এত কষ্ট স্বীকার যে বৃথা ছবি' ।—স্বর তার অত্যন্ত অস্বাভাবিক।"

হবারই কথা। চরম ত্যাগ,—চরম কষ্টই স্বীকার করেছিল ললিত পুত্রের জন্য, —আত্মার যন্ত্রণা। ছেলের হাওয়া বদলের জন্য চুরি-জুয়াচুরি করেছে,—লুকিয়ে জাহাজের গাঁট বিক্রি করেছে। ছবি শুনে ভয় পায়। ললিত বলে,—"কিছু হবে না, ভয় নেই। সেইটুকুই মজা। এ চুরি কখনো ধরা পড়বে না। চিরকাল ধরে শুধু আমায় খোঁচা দেবে।"—মরাযুগে জন্মানোর এ-যন্ত্রণা, এ-খোঁচা কেবল ললিতের মনুষ্যত্বের বা তার পিতৃত্বের নয়,—শিল্পীর সাধক-বিদ্ধ আত্মারও।

তাহলেও এই অপ্রকৃতিস্থতার মধ্যে গল্পের অবসান নির্দেশ করা প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাধ্যায়ত্ত নয়।

রাত্রের অন্ধকারে বাইরের শীতল স্নিগ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে ললিতের আকস্মিক উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে এল। "বিশাল আকাশ নক্ষত্রের আলোয় যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। তারি তলায় তার [ললিতের] মনে হল, এই মৌন সর্বংসহা ধরিত্রী যে যুগ-যুগান্তর ধরে বারবার আশাহত, ব্যর্থ হয়েও আজও প্রতীক্ষার ধৈর্য হারায়নি।"

সেই অবিনাশী চিরন্তন ব্যঞ্জনা,—ধরিত্রীর মত উষালোক-লিপ্সু শিল্পি-আত্মার প্রাণ-বাসনার সংকেত যেন এ-টুকু।

এই সংকেত-ব্যঞ্জনা আরো স্পষ্ট-হয়েছে 'মহানগর' গল্পে। রতনের দিদিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে কারা যেন ধরে নিয়ে গিয়েছিল,—তারপর কলকাতায় আবার তাকে কারা দেখেও এসেছে,—উল্টোডিঙি অঞ্চলে। রতন শিশু,—অতশত বোঝে না সে,—তার কেবলই মনে হয়,—দিদিকে কেন কেউ নিয়ে আসে না,—বাবাকে জিজ্ঞেস করলে আগে ভুলিয়ে রাখ্‌ত,—এবারে ধমক খেতে হয়। অথচ ঐ দিদিরই কোলে মাতৃহীন শিশু রতন ছেলের মত মানুষ হয়েছিল। বাবার সঙ্গে একদিন সে মহানগরে যায়। পোনাঘাটের বেসাতিতে বাবা যখন ব্যস্ত, শিশু তখন পালিয়ে যায় উল্টোডিঙির সন্ধানে। অনেক ক্লান্তি, ভ্রান্তি এবং দুর্ভোগের পর দিদির দেখাও মেলে। দিদি কেবল কাঁদে। রতনের

সঙ্গে যেতেও রাজি হয় না,—ঘরে ফিরে যাবার উপায় নেই তার। রতনকে কাছে থাকতেও দেবে না, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবার আগে তাকে বিদায় দেবেই। চক্‌চকে সাজানো দিদি-র সে মাটির ঘরে রতনকে নাকি থাকতে নেই। শেষ পর্যন্ত তাকে চলে আসতেই হয়েছিল,—কিন্তু তার ভবিষ্যতের জন্য নূতন ভরসা এবং বিশ্বাস দিয়ে এবং নিয়ে তবেই রতন ফিরতে পেরেছিল। সে কথা পরে। শুরুতে অনেকখানি অংশ উদ্ধার করব,—এগল্পের ভূমিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্র যেন নিজের দেশকালের বিশেষ প্রেক্ষিতে নিজ শিল্পি-আত্মাকে নিভাঁজ খুলে দেখেছেন,—

"আমার সঙ্গে চল মহানগরে,—যে মহানগর ছড়িয়ে আছে আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মত, আবার যে মহানগর উঠেছে মিনারে আর চূড়ায়, অভ্রভেদী প্রাসাদ-শিখরে তারাদের দিকে, প্রার্থনার মত মানবাত্মার।

"আমার সঙ্গে এস মহানগরের পথে, যে পথ জটিল দুর্বল মানুষের জীবন-ধারণার মত, যে পথ অন্ধকার মানুষের মনের অরণ্যের মত, আর যে পথ প্রশস্ত আলোকোজ্জ্বল মানুষের বুদ্ধি, মানুষের অদম্য উৎসাহের মত।

"এ মহানগরের সংগীত রচনা করা উচিত, ভয়াবহ, বিস্ময়কর সংগীত!

"তার পটভূমিতে যন্ত্রের নির্ঘোষ, ঊর্ধ্বমুখ কলের শঙ্খনাদ, সমস্ত পথের সমস্ত চাকার ঘর্ঘর, শিকলের ঝনৎকার—ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের আর্তনাদ। শব্দের এই পটভূমির ওপর দিয়ে চলেছে বিসর্পিল সুরের পথ: প্রিয়ার মত যে নদী শুয়ে আছে মহানগরের কোলে, তার জলের ঢেউএর সুর। আর নগরের ছায়াবীথির ওপর দিয়ে যে হাওয়া বয়, তার নির্জন ঘরে প্রেমিকেরা অর্ধস্ফুট যে কথা বলে তারো। সে সংগীতের মাঝে থাকবে উত্তেজিত জনতার সম্মিলিত পদধ্বনি,—শব্দের বন্যার মত; আর থাকবে ক্লান্ত পথিকের পথের ওপর দিয়ে পা টেনে নিয়ে যাওয়ার আওয়াজ, মধ্যরাত্রে যে পথিক চলেছে অনির্দিষ্ট আশ্রয়ের খোঁজে।

* * *

"এ সংগীত রচনা করবার শক্তি আমার নেই। আমি শুধু মহানগরের একটুখানি গল্প বলতে পারি—মহানগরের মহাকাব্যের একটুখানি ভগ্নাংশ, তার কাহিনী-সমুদ্রের দু-একটি ঢেউ।"

নিজের সম্বন্ধে,—নিজের দেশ-কাল সম্বন্ধে এর চেয়ে সত্য কথা আরো যথার্থভাবে বলবার উপায় নেই বুঝি কোনো শিল্পীর। বিশ শতকের বিচিত্র ভয়ঙ্কর মহানাগরিক জীবনের মহাকাব্যোচিত স্বরূপকে পুঙ্খানুপুঙ্খ খুঁটিয়ে দেখেছেন তিনি,—তার প্রতি অস্থি-সন্ধি তাঁর নিবিড় পরিচয়ে ঘনিষ্ঠ,—তাই এই আশ্চর্য সংক্ষিপ্তির মধ্যেও এমন আদিগন্তে

সম্পূর্ণ ইতিকথা রচনা করা সম্ভব হয়। তাহলেও মহাকাব্য লিখ্‌বার শক্তি সত্যিই তাঁর নেই,—মহাকবির দৃঢ় অবিচল প্রত্যয়ের কাঠিন্য নেই তাঁর চেতনায়। একাগ্র, একাভিমুখী নয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবনদৃষ্টি,—বহু বিস্তারিত, বিচিত্রচারী সে—তাই প্রতিটি খণ্ডিত তরঙ্গভঙ্গে সে সিন্ধুর রস আস্বাদন করে পৃথক্ সম্পূর্ণভাবে। অন্যপক্ষে যুগচেতনার সংশয়ও সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। তাই "যতটুকু পাই ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে" ততটুকু নিয়েই তাঁর পূর্ণ জীবনায়ন। ফলে উপন্যাসের চেয়ে গল্পে, মহাকাব্যের চেয়ে গীতিকবিতায় প্রেচেন্দ্র মিত্রের আত্মার মুক্তি। সে মুক্তির ইশারা রেখে গেছেন, 'মহানগরের' বুকেও,—গল্পসমাপ্তির মুখে।

দিদির ঘর থেকে ফিরে যাচ্ছিল রতন ক্লিষ্ট ভারাক্রান্ত মন নিয়ে, ক্লান্ত পদক্ষেপে। ,'কিন্তু বড় রাস্তার কাছ থেকে হঠাৎ সে আবার ফিরে আসে। তার মুখ আবার গেছে বদলে। এইটুকু পথ যেতে কি সে ভেবেছে কে জানে।

"চপলা তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। রতন তার কাছে এসে হঠাৎ বললে,—বড় হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি। কারুর কথা শুনব না।

"বলেই সে এবার সোজা এগিয়ে যায়। তার মুখে আর নেই বেদনার ছায়া, তার চলার ভঙ্গি পর্যন্ত সবল; এতটুকু ক্লান্তি যেন তার আর নেই। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গলির মোড়ে সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

"মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মত গাঢ়।"

এবারকার সাংকেতিকতা আরো গাঢ় প্রাঞ্জল। ভাবীকালের বন্দরের পথে শিল্পীর ভীরু বাসনা ছুটে চলতে গিয়ে মহানগরীর সন্ধ্যার রহস্যময়তায় আত্মগোপন করে ছড়িয়ে ভাসিয়ে দিল নিজেকে। অচিন্ত্যকুমারকে চিঠি লিখেছিলেন প্রেমেন্দ্র সেই প্রথম বয়সেই—যার মূলকথা—নিঃসঙ্গ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সুখ নেই;—সমষ্টির কাছে,—বিস্তৃতির কাছে ধরা দিতে হবে,—কেবল সমাজটাকে আর একটু উদার প্রসারিত করে তুলতে হবে। তারই জন্যে সর্বংসহা ধরিত্রীর মত শিল্পীর প্রতীক্ষা। গল্পে সেই স্বপ্নের সাগরে নোঙর খুলে নৌকো ভেসেছে,—অপার ভরসায় ভরা তার পথের সঞ্চয়-রচনা করেছে কবির প্রত্যয়ের বাণী, কিন্তু কবিতার ভাষায় নয়। বরং প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের শরীরে এক অমোঘ বহমানতা রয়েছে, যাকে নাট্যপ্রবাহের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। গল্পের 'থীম'-এ নাটকীয় সংঘাত রয়েছে খুব,—এমন দাবি করবার কারণ নেই। কিন্তু নিরাবেগ, যথার্থ-ভাষণের গুণে ব্যক্তব্য জীবনের এক-একটি চিত্ররূপ গড়ে উঠেছে চোখের ওপরে,—আপাতদৃষ্টিতে যা নাটকের মত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। নাটকের স্বতস্ফূর্ত দ্রুতগতিও রয়েছে 'সিচুয়েশন'-এর বিন্যাসে। একেবারে প্রথম গল্প 'শুধু কেরাণী'র উদ্ধৃত অংশ লক্ষ্য করতে

বলি,—পক্ষি-কথা থেকে মানব কথায়,—আবার 'শুধু কেরাণী'র জীবন থেকে বৃহৎ প্রাকৃতিক জীবনে গল্প চলে ফিরেছে নিঃশংক নিরন্তর গতিতে। তাছাড়া অনুচ্ছেদ-বিভাগগুলিও লক্ষ্য করার যোগ্য। যেন নাটকের দৃশ্য উন্মোচনের মত অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদের পদে পদে গল্পের ভাঁজ খুলে হেঁটে গেছেন শিল্পী নিজে তাঁর প্লট্-এর পথ দিয়ে। সব গল্প সম্বন্ধেই মোটামুটি একই কথা বলা যেতে পারে।

গল্পের শরীরে নাটকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্পষ্টতা, দ্রুতগতি এবং আবহ রয়েছে। কিন্তু তার অন্তর জুড়ে আছে এক আত্মস্থ অস্ফুট কবি-জীবন-বোধের সাংকেতিক ব্যঞ্জনা। ফলে বিষয়সর্বস্ব হয়েও বিষয়-উৎক্রান্তির মধ্যেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের প্রকরণ এবং রসগত সাফল্য, দুইই বিধৃত হয়ে রয়েছে। তাঁর গল্পগুলি শরীরে বস্তুবিমণ্ডিত, আত্মা'য় অ-ধরা নিবিড় প্রত্যয়ের মৃদু স্বরভিযুক্ত ; কাব্যধর্মী গল্প নয় কিছুতেই,—কিন্তু অন্তরে যিনি কবি —তাঁরই আত্ম-উন্মোচনের মুকুর,—রসোত্তীর্ণ সার্থক ছোটগল্প।

এই সাধারণ পরিচয়ের বাইরেও একটি-দুটি গল্প আছে, প্রকরণের দিক থেকে যারা পৃথক মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। 'নিশাচর' গল্পটি এমনই এক রচনা,—গল্পের প্লট্‌কে টুকরো টুকরো করে ফ্ল্যাশব্যাক-এর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে হতে পারে,—প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনেক গল্প চিত্রনাট্যরূপেও শ্রেষ্ঠ সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু নিছক ছোটগল্প হিশেবেও 'নিশাচর'-এর আঙ্গিক সার্থক ;—ভৌতিক কাহিনীটির মূলগত জীবনবোধ এবং অতিপ্রাকৃত রহস্য তাতে অঙ্গাঙ্গী গাঢ়তা লাভ করতে পেরেছে। এঁর গল্প সংগ্রহ-গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে—'বেনামী বন্দর' (১৯৩০), 'পুতুল ও প্রতিমা' (১৯৩১), 'অফুরন্ত' (১৯৩২), 'পঞ্চশর' (১৯৩৪, 'মৃত্তিকা' (১৯৩৫), 'মহানগর' (১৯৩৭), 'ধূলিধূসর' (১৯৩৮), 'কুড়িয়ে ছড়িয়ে' (১৯৪০), 'সামনে চড়াই' (১৯৫০), 'সপ্তপদী' (১৯৫৩), 'ভালপায়রা' (১৯৫৭), 'প্রেমই ধন্বন্তরী' (১৯৫৮), 'নানারঙে বোনা' (১৯৬০)।*

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগুচ্ছকে যদি বলি 'কল্লোল'-এর তীর,—অচিন্ত্য সেনগুপ্তের রচনা তা'হলে 'কল্লোল'-এর অপার পাথার ;—স্থূল, সূক্ষ্ম সকল অর্থেই। 'কল্লোল'-অর্থে পত্রিকার কথা বলছি না, বিশেষিত এক যুগ-বাসনার অন্যতম সুনির্দিষ্ট লক্ষণ, নবজীবনের সেই যৌবনক্ষুধা—'কল্লোল'-এর পৃষ্ঠায় আলোচ্য প্রধানত তারই অভিজ্ঞতা-অনুভবে যার স্পষ্ট সুরেখ নিশ্চিত প্রসার। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত আপন ব্যক্তি-চেতনার অনুভব-বিদ্ধ সেই ক্ষুধার্তভার পূর্ণাঙ্গ মূর্তি রচনা করলেন প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'বেদে'-তে। 'কল্লোলযুগে'র

*গল্প-সংকলন গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের আনুমানিক কাল-পরিচয় লেখকের দাক্ষিণ্যে প্রাপ্ত।

পরিচায়ন উপলক্ষ্যে শিল্পী হয়ত নিজের অজ্ঞাতেই আপন সৃষ্টির আত্মিক পরিচয়টুকু ঘোষণা করেছেন,—"এক প্রবল বিরুদ্ধবাদ; দুই বিহ্বল ভাববিলাস। একদিকে অনিয়মাধীন উদ্দামতা, অন্যদিকে সর্বব্যাপী নিরর্থকতার কাব্য।" জীবনের দীর্ঘ ছয়টি অভিজ্ঞতা-পর্যায়ে বিন্যস্ত 'বেদে' আসলে এই সর্বব্যাপী নিরর্থকতার কাব্য বৈ কী!—আর 'অনিয়মাধীন', —শৃঙ্খলার নোঙর ছেঁড়া যথেচ্ছ বহমান বলেই ত কাঞ্চনের জীবন-ধারা 'বেদে'-র।

আশ্চর্য হতে হয়, উত্তর-স্নাতক এই ছাত্রটির কল্পনায় দূরযানী বিস্তার আর বিচিত্রতা লক্ষ্য করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তেইশ বছরের নবোদিত যুবকের রচনা সম্পর্কে স্বতঃপ্রবৃত্ত আলোচনা-নিরত হইয়াছেন।[৩৫] অচিন্ত্যকুমারকে তিনি পত্র লিখ্‌লেন [৩১শে আশ্বিন, ১৩৩৫], "তোমার কল্পনার প্রশস্ত ক্ষেত্র ও অজস্র বৈচিত্র্য দেখে আমি মনে মনে তোমার প্রশংসা করেছি। সেই কারণে এই দুঃখবোধ করেছি যে কোনো কোনো বিষয়ে তোমার পৌনঃপুন্য আছে,—বুঝতে পারি সেইখানে তোমার মনের বন্ধন। সে হচ্ছে মিথুন প্রবৃত্তি।" আজ যখন শিল্পী তাঁর সৃজনের পথে পশ্চিমাস্ত হয়েছেন, তখন মনে হয়, প্রথম-যৌবনের সেই মনোবন্ধন আসলে বুঝি আশাহত কবিমনের 'প্রবল বিরুদ্ধবাদ আর বিহ্বল ভাববিলাসের' এক অবদমন-চিহ্নিত মরবিড্ রূপ! এই অর্থেই অচিন্ত্যকুমারের গল্পে 'কল্লোল'-বাসনার অপার-পাথার বিস্তার আর বৈচিত্র্য;—'বেদে-তে তার ঐতিহাসিক নিশ্চয়-চিহ্নাঙ্কিত প্রথম সার্থক পদপাত।

বাংলা ছোটগল্পের দ্বিতীয় পর্বের ঐতিহাসিক জীবনভূমির পরিচায়ন প্রসঙ্গে বলেছি,— একালের সাধারণ লক্ষণ,—অন্ধকার, আলো হাতড়ানো, কচিৎ এক-আধ ঝলক আলোর সন্ধান; অন্যপক্ষে ফ্রয়েড্ ও পরবর্তী মনস্তাত্ত্বিকদের গবেষণাভূয়িষ্ঠ ঐতিহ্যের পাথেয় নিয়ে নরনারীর দেহ-সম্ভব প্রণয়-সম্পর্কের গভীরে ডুবে যাওয়া। 'বেদে'র মধ্যে,— তথা আচিন্ত্যকুমারের প্রথম পর্যায়ের প্রায় সকল গল্পেই নীরন্ধ্র অন্ধকারে একটানা হেঁটে চলার এক শ্বাসরোধকর একঘেঁয়েমি,—ক্লান্তি এবং কিছুটা বিষণ্ণ আতঙ্কও জমাট বেঁধে আছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, শিল্পী যেন ইচ্ছে করেই জীবনের বিভীষণ বামাচারী পথে যথেচ্ছ পায়চারি করে ফিরেছেন। অর্থাৎ যুগের প্রতি, জীবনের প্রতি না-পাওয়ার যত আক্রোশ, তার 'প্রবল বিরুদ্ধবাদ' যেন প্রকাশ পেল নিয়ম-শৃঙ্খলার এই অবাঞ্ছিত উল্লঙ্ঘনে। সেই সঙ্গে অচিন্ত্য সেনগুপ্তের মধ্যে রয়েছে আরো এক সচেতন প্রয়াস,—মনোবিকলনের অধিকার দাবি করে যা দেহের অলিগলিতে যৌবন-ইন্দ্রিয়ের

৩৫। ১৩৩৩ বাংলার কল্লোল পত্রিকায় 'বেদে' প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে আশ্বিন সংখ্যায়। লেখকের বয়স তখন ২৩ বছর হবার কথা। রবীন্দ্রনাথের পত্র আরো দুবছর পরে লেখা,—'বেদে' গ্রন্থ প্রকাশের পরে।

পিপাসু চোরা-দৃষ্টি হেনে ফিরেছে। 'নবৃউইজান' নোবেল-লরিয়েট্ নুট্ হামসুন্-এর 'প্যান' অনুবাদ করে তিনি গদ্যে কথাসাহিত্য লেখার হাত পাকিয়েছিলেন। হামসুন-এর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব,—নীট্শে-র মনোবিকলনতত্ত্বকে তিনি গল্পের জীবনে সফল প্রয়োগ করেছিলেন। অচিন্ত্যকুমারের পক্ষে 'প্যান্'-এর অনুবাদ আকস্মিক ঘটনা নয়—তাঁর শিল্প-বৃত্তি ও মানস প্রবৃত্তির বার্তাবহ। লক্ষ্য করলে দেখ্‌ব,—'বেদে'র কাহিনী-বিন্যাস, 'সিচুয়েশন'-পরিকল্পনা এবং সর্বোপরি মুখর নারী-সংলগ্ন-চিত্ততার মধ্যে 'প্যান্'-এর প্রতিচ্ছায়া আভাসিত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে।

এই অর্থেই আচিন্ত্যকুমার 'কল্লোলে'র পাথার, যাঁর ব্যাপ্তি এবং বিচিত্রতা গল্পের প্রসঙ্গে ও প্রকরণে প্রায় সীমাহীন;—অথচ সেই সৃষ্টি-পারাবারের মধ্যবিন্দুতে দাঁড়িয়ে তীরের সন্ধান পাওয়া যায় না। অনাদিকালের আদিম উৎস থেকে অজানা অনন্তের পথে নিরবধি চলেছে জীবনের ঐতিহাসিক স্রোত-প্রবাহ নিঃসীম মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে। প্রতিভাধর হাতের সৃষ্টি সেই আশ্রয়হীন সমাপ্তিহীন ভাসমানতার জগতে এক-একটি দ্বীপ গড়ে তোলে—অজস্র বিভঙ্গ-ভঙ্গুর জীবন-স্রোতে প্রত্যয়ের এক-একটি নীড়; যার মধ্যে একটি-দুটি মানুষ অন্তত দু-এক দিনের জন্য—কখনো বা একটা গোটা জাতি একটা যুগের ক্রান্তিকাল পর্যন্ত ক্ষণিকের আশ্রয়, ক্ষণিক বিশ্রামের শক্তমাটির ভিতটুকু খুঁজে পায়। 'কল্লোলে'র মুখ্য প্রবণতা—আগেই বলেছি—ক্রান্তির লগ্নলীন,—পাড় ভাঙার,—বেলাভূমিকে ভাসিয়ে চুরমার করে নেবার উন্মত্ত সামুদ্রিক যুগ। অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতা, আদর্শহীন শূন্যতা এবং আশ্রয়-রহিত মানসিক অবদমন এ-যুগের নবীন যৌবনের এক অংশকে পাতালের অন্ধকারে টেনে নিয়েছিল অজগরের অমোঘ আকর্ষণে। সেই বিভগ্নতার তাণ্ডবস্রোতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের এক-একটি গল্পরূপ একটি করে ক্ষণ-বুদ্‌বুদ্,—ঢেউ-এর মাথায় সাপের ফণার মণির মত ভাসছে যে উত্তাল ফেনরাজি,—তারি শীর্ষবিন্দুতে ক্ষণিকের আশ্রয় খোঁজার,—প্রত্যয়ের কঠিন মাটিটুকু মুহূর্তের জন্য আঁকড়ে ধরার ক্ষীণ প্রয়াসে তিনি ব্যাকুল। কিন্তু অচিন্ত্যকুমার জীবনের স্রোতে নিত্য ভাসমান;—নীড়ের শান্তি আর সান্ত্বনা তাঁর নয়—তলায় নীল সমুদ্র, মাথার উপরে সুনীল আকাশ, নিরবধি কালের স্রোতে নিরুদ্দেশ জীবনযাত্রার অভিসারে ঢেউ-এর মাথায় মাথায় তার নির্বাধ অভিসার। তাই তিনি সীমার বন্ধনহারা।

মূলত আচিন্ত্যকুমার কবি;—গদ্যরচনায়—গল্প-লেখার ক্ষেত্রেও তাঁর লেখনীটি চিরকাল আছে কবিতা-শিল্পীর হাতে। অথচ কথাসাহিত্যের জগতেও সৃষ্টির ধারা তাঁর অজস্র, বিচিত্র,—গল্পে-উপন্যাসে অসংখ্য:—আজও অশ্রান্ত,—প্রায় নিরবধি। কেবল

গল্প-উপন্যাসের প্রাচুর্যে নয়;—বিষয়ের সংগ্রহ এবং বিন্যাসেও অচিন্ত্যকুমারের দুঃসাহস সীমাহীন—তীরের ভাবনা তাঁর নেই,—আছে ভাসবার নেশা। তাই 'বেদে'-র শুরু :—
"না' পেরিয়েছি, কিন্তু আহ্লাদিকে দেখেই আমার ভারি ভালো লাগল।······

"······মামী একদিন আমাকে একটা বঁটি ছুঁড়ে মেরেছিল। পিঠের কাপড়টা তুলে দেখালাম। আহ্লাদি আমার পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়ল দুই হাত রেখে। তার দুটি হাতই ভিজা। তার চুলগুলিও খোঁপায় জড়ান ছিল না।

"আহ্লাদির তখন কত বয়সই বা হবে? এগারোর বেশী?"

এর সবটুকুই ফ্রয়েড্, অ্যালিস্, নীটশে-র প্রভাব নয়,—বয়ঃসন্ধির সূচনায় এই দেহ-পিপাসুতার ইঙ্গিত বয়ঃসন্ধি-লগ্ন শিল্পীরও নোঙর-ছেঁড়া দ্বীপহীন পারবারে ভেসে বেড়ানোর অদম্য আকাঙ্ক্ষার সংকেতবহ। 'কল্লোল যুগে'র সৃষ্টিতে "বিহ্বল ভাববিলাসিতার" কথা উল্লেখ করেছিলেন অচিন্ত্যকুমার,—এ বিহ্বলতা, এ অপরিণামদর্শী ভাববিলাস সহজ-কবির। কিন্তু জীবন-প্রসঙ্গের প্রতি তা সম্পূর্ণই বিমুখ নয়,—বরং জীবন সম্বন্ধে অতিসচেতন। বারবার ঘরের—আশ্রয়ের হাতছানি পেয়েও কাঞ্চন চিরপথিক, —চিরকালের বেদে। যে জীবন তাকে দাঁড়াতে দিলে না তার কথা বলতে সে বলে, "অগোচরে গ্রহে গ্রহে সংঘর্ষ লাগে, ধূমকেতু তার পুচ্ছ ছোঁয়ায়। বাসুকি ঠাট্টা করে গা-মোড়া দিলে লজ্জিতা মাটি হায়রান্ হয়ে ওঠে। শাদা মানুষ আর কাল মানুষ পরস্পরের টুঁটি আঁকড়ে কামড়া-কামড়ি করে, শেষকালে দুজনের লাল রক্তে রক্তে কোলাকুলি হয়। রাজা সমস্ত দেশে আগুন লাগিয়ে হাততালি দিয়ে নাচে, মা সহরের গলিতে আঁচলের তলায় নিয়ে মেয়ে ফিরি করে বেড়ায়। সাহারা হাহাকার করে—।"

মনে রাখতে হবে, এ রচনার প্রকাশকাল, ফাল্গুন ১৩৩৩ সাল,—অর্থাৎ ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের প্রারম্ভ। সেদিনের জীবনের এই ভয়ঙ্কর নগ্ন পরিণাম উচ্চারণেও শিল্পীর কণ্ঠে স্বাভাবিক দার্ঢ্যের ঝাঁঝটুকু যেন হারিয়ে যায়,—কথার একটানা মালাগাঁথার কৌশলে জীবনের বিভীষণ চিত্র ভারহীন ছন্দের ঝঙ্কার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কাঞ্চন যে দুঃখে ঘরছাড়া বিবাগী—বেদে,—তার উত্তর দিয়ে মুক্তাকে সে বলেছিল, "আকাশকে আড়াল করবার জন্য যে দুঃখে মানুষ ঘর বাঁধে, সেই সমান দুঃখেই পথ নিয়েছি।" যদি বলি, কাঞ্চন আসলে অচিন্ত্যকুমারের শিল্পি-আত্মার বাঙ্‌রূপ, খুব মিথ্যা হয়ত বলা হয় না। এ-রূপে তীর-রেখাহীন জীবনের সমুদ্রস্রোতে শিল্পী কেবল বিহ্বল গতিবিলাসীই নন,—অপার কথাবিলাসীও।

অর্থাৎ, অচিন্ত্যকুমারের গল্পে বিস্তার বৈচিত্র্য প্রাচুর্য যত আছে, সংহতি একাগ্রতা

পরিণাম-বাসনা তত একান্ত নয়। এই অর্থেই বলেছি, 'কল্লোলে'র জীবন-বাসনার ইতিহাসে অপার পাথার তিনি ;—দ্বীপের নন, স্রোতের। আর আগের কথা এবার স্পষ্ট করে বলবার প্রয়োজন আছে, কথাসাহিত্যের সৃজন-ভূমিতেও তিনি কবি,—স্বভাব-কবি,—একেবারে ব্যুৎপত্তিগত অর্থে। 'কব্' ধাতুর অর্থ বলা হয়েছে 'বর্ণনা করা' ;[৩৬] —মধুস্যন্দী ভাষায় তাঁর গল্পের প্লটকে বর্ণনা করে গেছেন অচিন্ত্যকুমার ; ফলে কথার ঝোঁকে কথার ফুলঝুরি খেলা জমে উঠেছে কখনো হয়তো বা অজান্তেই ; গল্পের রস ছড়িয়ে পড়েছে,—গল্পের শরীরেও অনেক সময় রেখায়িত হয়ে ওঠেনি সুঠাম রূপের গড়ন। 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশের কালে 'বেদে'-র শ্রেণী নির্ণয় করা হয়েছিল 'গল্পোপন্যাস'। বিচ্ছিন্ন কয়েকটি গল্পের সূত্রে একটি জীবনের কথা বিস্রস্তভাবে হলেও আদ্যন্তপূর্ণ রূপ পেয়েছে,—'গল্পোপন্যাস' শব্দের এই হয়ত সংকেত ! কিন্তু তাহলেও দেখা যায়, 'বেদে'-র কোনো গল্পেই একটি অখণ্ড ছোটগল্প-রস নিটোল হয়ে ওঠেনি ;—কিছুটা গল্প,—কিছুটা কবিতাধর্মী রহস্য-ইঙ্গিত ;—গোকুল নাগের বেলায় অচিন্ত্যকুমার নিজে যাকে বলেছিলেন 'ফুট্‌কি' ;—হয়ত তাই ! আর বাকিটা কথার নেশা,—যৌবন-স্বপ্ন—হয়ত যৌবন-অবসাদেরও বিহ্বল বিলাস। কিন্তু যে-সব গল্প যথার্থভাবে কেবল ছোটগল্প রূপেই কল্পিত হয়েছে, তাদের শরীরে আছে প্রাকরণিক এক বিমিশ্রতা। 'বেদে' তাঁর স্বভাব-পরিচায়ক প্রথম শ্রেষ্ঠ গল্পগুচ্ছ হলেও,—প্রথম গল্প নয়। এমন কি 'কল্লোল' পত্রিকাতেও দ্বিতীয় বর্ষ, অর্থাৎ ১৩৩১ সাল থেকেই অচিন্ত্যকুমারের গল্প প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়,—'বেদে'র প্রকাশভূমি কল্লোলের চতুর্থ বর্ষ। তারও আগে 'ভারতী' পত্রিকায় এঁর গল্প প্রকাশিত হতে থাকে। সেই ভোরের আলোতেই গাল্পিক অচিন্ত্যকুমারের মধ্যাহ্ন-প্রতিভার পরিচয়টুকু সার্থক আভাসিত হয়েছিল বলে মনে করি। একটি গল্পের নাম 'আলতার দাগ'।[৩৭]

"জানলায় বসেছিলাম···

"কলেজের গাড়িটা খানিক দূরে গ্যাস্-পোস্ট্‌টার কাছে থামল। একটি তরুণী দুহাতের অঞ্জলিতে অনেকগুলি বই নিয়ে নেমে এল। গলির মোড়ে একটা মুচি বসে জুতো সেলাই করছিল। মেয়েটি হঠাৎ তার কাছে থেমে পড়ে মোলায়েম গলায় বল্লে—এই, আমার জুতোটায় তালি দিয়ে দাওতো ! বাবা, এক হপ্তার চেষ্টায় দেখা পাওয়া গেল।···বলে মেয়েটি ফুটপাথের ওপর বইগুলি নামিয়ে নীচু হীল-ওয়ালা জুতোটা খুলে ফেল্লে !···

৩৬। দ্রষ্টব্য—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গীয় শব্দকোষ'।
৩৭। 'ভারতী', পৌষ, ১৩৩০ সাল।

"আলতার দাগ! মেয়েটির পদ্মকলির মতন ছোট ছোট দুই পা ঘিরে আলতার লালিম লেপন—একটা যেন রঙীন মায়া, জাগরণের বিচিত্র কোলাহলের মাঝে স্বপ্নের মধুর একটি রেশ, আষাঢ় সন্ধ্যার সুরভরা একটি রামধনু!

"মেয়েটি চলে গেল, মনে হলো, সরু গলিটা জুতোর ভরে কাঁপচে না, আলতার ছোঁয়ায় শিউরে শিউরে উঠ্‌চে!

কথার যত ছন্দ-বাঁধুনীই থাক্, সুরটিকে সে হারায় নি!"

সংক্ষিপ্ত পরিসরের সুযোগ নিয়ে পুরো গল্পটিই উদ্ধার করা গেল। কিন্তু বিষয়ের যত বিস্তার, অভিজ্ঞতার যত প্রগাঢ়তা ও বৈচিত্র্যই সাধিত হোক্, অচিন্ত্যকুমারের গল্প-শৈলীও বুঝি কখনোই এই 'সুরটি'কে হারায় নি! 'আলতার দাগ' গল্প না কথিকা! অচিন্ত্যকুমারের গল্প-শৈলী এমনি কথিকাধর্মী,—কথকতার স্বাদুতা তার পদে পদে,—মধুর কথা,—অমৃতময় বাণীরচনা,—সুললিত 'বর্ণনা', 'কব্' ধাতুর তাৎপর্য তার সর্ব অবয়বে। তাই বলে এ-গল্প কিছুতেই অচিন্ত্য-রচনার প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারে না;—নিছক ইতিহাসের প্রয়োজনেও এমন লেখার পুনরুদ্ধারে আপত্তি থাকতে পারে স্বয়ং লেখকের পক্ষ থেকেও। সেই প্রথম যুগের লেখায় গল্পের রূপ বা স্বাদ কিছুই অনুভবযোগ্য হয়ে ওঠেনি, এমন রচনা কেবলই কথিকা। কিন্তু লেখকের প্রতিভার যথার্থ স্বাক্ষরবহ সবচেয়ে আবেগপূর্ণ গল্পগুলিও আসলে গল্প-কথিকা,—বাকি অনেক কয়টি আছে কাব্যস্বাদী গল্পই। অচিন্ত্যকুমারের পরিণত ছোটগল্পে কবিকর্মের প্রাচুর্য থাকলেও গল্পত্বের অভাব কখনো ঘটেনি। তার মুখ্য কারণ শিল্পীর জীবন-অভিজ্ঞতার পুঞ্জিত সঞ্চয়।

'কল্লোল' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বর্ষের শ্রাবণ সংখ্যায় (১৩৩১ বাংলা সাল)। গল্পের নাম 'গুমোট',—বিষয়বস্তু—"ভাঙা ধ্বসে-পড়া একটা একতলা বাড়িতে গরীব এক কেরানী আর তার মমতাময়ী প্রিয়া একটি সুন্দর খোকাকে ঘিরে আনন্দ-জাল বয়ন করত আর তাদের ছোট দুটি হৃদয়-পেয়ালায় অমৃত পরিবেশন করত।" এই পরিবারের এক দাম্পত্য কলহের গল্প,—ফলশ্রুতি নিঃসন্দেহে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া,—কিন্তু পরিণতিতে মনস্তত্ত্বের চাবি দিয়ে মনের ভাঁজ খুলে দেখার প্রয়াস আভাসিত হয়েছে যেন। তার চেয়ে বড় কথা,—এ গল্পের উদ্ধৃত প্রারম্ভিক ছত্রগুলিতে শব্দ-প্রয়োগ-শৈলীর কাব্যগুণ নয় কেবল,—বাগ্‌ভঙ্গিটুকুও লক্ষ্য করবার মত। অচিন্ত্য সেনগুপ্তের প্রকরণের এ এক মুখ্য কথা,—গল্পকে ছাপিয়ে ওঠা কথকতার ঝঙ্কার! কিন্তু যে-কথা বলছিলাম,—'কল্লোল' পত্রিকার আলোচ্য সংখ্যাতেই লেখক-পরিচিতি প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে,—"এই লেখকের রচনার ভিতর যে

কবি-প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে আশা হয় ইনিও ভবিষ্যতে প্রসিদ্ধ লেখক হইবেন। খুব সাধারণ খুঁটিনাটি জিনিসকে গল্পের ভিতর এমন সুন্দর করিয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন যে, তাহাতে বুঝা যায়, লেখক মানব-চরিত্রের গুমোটের অনেক দিক বেশ ভাল করিয়াই অধ্যয়ন করিতে পারিয়াছেন। নিপুণ রচনায় তাহাই পুনরায় প্রকাশ করিতে পারা যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচায়ক। প্রতিনিয়ত ঘরে ঘরে ভুল বোঝার যে গুমোট বাঁধিয়া ওঠে, তাহার ভিতর যে বাস্তবিক একটা তুচ্ছ আত্ম-অভিমান ছাড়া আর কিছুই থাকে না, তাহাই লেখক এই গল্পটিতে বুঝাইতে পারিয়াছেন।”

এই পরিচয়পত্র কার রচনা, জানা নেই ; হয়ত সম্পাদক অথবা সহ-সম্পাদকের ;—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে লেখকেরও কিছু বক্তব্য ছিল কি না এবিষয়ে সে প্রসঙ্গও অবান্তর। শৈলী, বিন্যাস ও মনস্তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত, সকল দিক থেকেই মূল গল্পটির সম্পূর্ণ পরিচয় এতে আভাসিত হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, রচনাকালের সেই উষালগ্নেই অচিন্ত্য-প্রতিভার ঐতিহাসিক স্বরূপটি সম্পূর্ণ ধরা পড়েছিল আলোচ্য পরিচয়-লেখকের মনে। দুটি কথা লক্ষ্য করবার মত,—‘কবি-প্রতিভা’ আর, ‘খুব সাধারণ খুঁটিনাটি জিনিসকে গল্পের মধ্যে সুন্দরভাবে নাড়াচাড়া করার অপূর্ব দক্ষতা।’ অচিন্ত্য-প্রতিভার এ দুই দিগ্‌দর্শন—কবির অর্থহীন, অন্তত অর্থ-না-বোঝা মন্ময় আবেগ, আর সেই একই সঙ্গে জীবনকে খুঁটিয়ে দেখবার বস্তুভেদী তীক্ষ্ণ বাস্তব দৃষ্টি। কবি অচিন্ত্যকুমার স্বপ্ন-বিলাসী,—দেশকালের সীমাভেদী তাঁর উন্মার্গগামী পক্ষবিস্তার। ব্যক্তি-অচিন্ত্যকুমার জীবন-সন্ধিৎসু,—চারপাশের ‘কাঠ-খড়-কেরোসিন’-এর রক্তাক্ত দাবিতে ভরা ‘হাড়ি-মুচি-ডোম’দের যে একান্ত স্থূল ধূলিলিপ্ত মাটির জীবন, তার প্রতি শিল্পীর অপার কৌতূহলভরা মমতার দৃষ্টি। একদিকে ‘আকাশ-বিলাস’ আর একদিকে মর্ত্য-উৎকণ্ঠা, এই দুয়ের টানাপোড়নে তাঁর দৃষ্টি যেখানে এসে নিবদ্ধ হয়েছে, তাকে পুরোপুরি বাস্তব জীবন বলি না—পুরো কাব্যও সে নয়,—আমাদের এ-যুগের চোরা-গলির বিভগ্ন বিকৃত জীবন যেন কবিতার মালাখানি গলায় পরে আত্মপ্রকাশ করেছে! কবির নৈরাশ্যমথিত ভাবালুতার প্রভাবে সে ফুলের মালাতেও এক অবদমিত (morbid) বিপন্ন ক্ষীণ মুমূর্ষুতার স্মিত অবসাদ।

পরবর্তী জীবনে বিচারক-বৃত্তি গ্রহণ করে অচিন্ত্যকুমার বৃহৎবঙ্গের মফঃস্বলে ঘুরে বেড়িয়েছেন দীর্ঘদিন,—বিচিত্র পরিবেশে বিভিন্ন প্রয়োজনের ভূমিকায়। ফলে কলকাতার বাইরেকার গণ্ডিমুক্ত জীবনকে তার বহুমুখী বিচিত্ররূপে প্রত্যক্ষ করার অবকাশ ঘটেছিল শিল্পীর। বলা হয়ে থাকে, এই অভিজ্ঞতার পরিধি-প্রাচুর্যের

প্রভাবেই অচিন্ত্যকুমারের গল্পসাহিত্যে জীবনভূয়িষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তথ্যের দিক থেকে এর চেয়ে যথার্থ-কথন অসম্ভব। কিন্তু তথ্যের মধ্যে 'সত্য' যেখানে আত্মগোপন করে আছে, সৃষ্টির রহস্য আসলে সেই গভীরে। এদিক থেকে 'কল্লোল'-এর পূর্বোক্ত পরিচিতিতে শিল্পীর জীবনদৃষ্টির খুঁটিনাটি-প্রবণতার সংকেত অবিস্মরণীয়। বস্তু-প্রাচুর্য প্রধান কথা নয়, বস্তু-প্রবণ জীবন-দৃষ্টির মূল্যাই বর্তমান প্রসঙ্গে সমধিক। যতদিনে এই প্রবণতা প্রয়োজনীয়রূপে বলিষ্ঠ হয়ে না উঠেছে, ততদিনই নিরর্থক ভাবালুতার কথামালা রচনা করে ফিরেছে অচিন্ত্যকুমারের গল্পের লেখনী—বয়ঃসন্ধি অথবা উদ্গত যৌবনের দেহ-ক্ষুধার্ততা তখন নেশার মত চেপে বসেছে গল্পের শরীরে,—রহস্য-ইঙ্গিতবহ কথায় লেগেছে উত্তেজনার ঝাঁঝালো ব্যঞ্জনা;—রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'মিথুন-বৃত্তির পৌনঃপুণ্য'। অনেকটা কেবল এই কারণেই অচিন্ত্য-গল্পের উত্তরকালীন পরিণতি কোনো কোনো মহলে সমুচিত মনোযোগ এড়িয়ে গেছে। ডঃ সুকুমার সেনের ইতিহাস-নির্ভর মূল্যায়ন এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য—"অচিন্ত্যকুমারের লেখায় 'আধুনিকতা' অত্যন্ত প্রবল এবং প্রায় কনভেন্শনের মত। গোড়ার দিকে রচনায় যৌনবিষয়ে যে উৎকট বে-আব্রু মনোভাব দেখা যায় তাহা এই কভেন্শনেরই দায়ে। এ বিষয়ে ইঁহার সহযোগী বুদ্ধদেব বসুও অনুৎসাহী ছিলেন না।... অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেব শক্তিশালী লেখক, তাই সহজেই ইঁহারা সাহিত্যের এই শক্ ট্রিটমেণ্ট ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।"[৩৮]

অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্প সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্পূর্ণ না হলেও বহুলাংশিক। 'টুটাফুটা' নামক গল্পসংকলনের পরে 'ইতি'-তে ধৃত গল্পগুলির আঙ্গিক ও বিষয়-বিন্যাসগত বৈশিষ্ট্যের তুলনা করলে তাৎপর্য আরো স্পষ্ট হবে। স্বয়ং লেখকও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন বলে মনে হয়। 'স্বনির্বাচিত গল্প' সংগ্রহের 'আভাষ'-এ লিখেছেন—"কল্লোলের বাইরে প্রথম গল্প 'ইতি'। নামে ইতি, আসলে আরম্ভ।" 'ইতি' গল্পের নাম অনুসারে লেখকের দ্বিতীয় ছোটগল্প-সংকলনের নামও 'ইতি'। 'টুটাফুটা'য় আছে 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত এবং অন্যান্য সমধর্মী গল্পের সংগ্রহ, যৌন-ব্যাকুলতার উল্লাসই যাদের প্রায় মুখ্য উপাদান। 'ইতি'-তে গল্প-শিল্পী অচিন্ত্যকুমারের নবজন্ম হল 'যৌনবৃত্ত'[৩৯] থেকে মনস্তাত্ত্বিক জীবন-সন্দর্শনের বৃত্ত-লোকে,—এটুকুই বুঝি শিল্পীর নিজের ইঙ্গিত।

কথাটা আবার স্পষ্ট করে নেবার প্রয়োজন রয়েছে। অচিন্ত্যকুমারের

৩৮। ডঃ সুকুমার সেন—'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'—৪র্থ খণ্ড। ৩৯। এই আত্তথাটির জন্য শ্রী অনিল বিশ্বাসের নিকট ঋণ স্বীকার করি—দ্রষ্টব্য 'বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য'।

শিল্পিচেতনায় নরনারীর দেহ-মনোগত রহস্য সন্ধানের উৎকণ্ঠা দ্বিতীয় স্বভাবের মত অনুস্যূত হয়ে আছে। মনের খবর জানাটাই তার সবচেয়ে বড় কথা, পরিচিত মনস্তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের ওপরে আলো ফেলে দেখার কৌতূহলও রয়েছে। এমন কি, 'অবস্থত'-র মত যৌনসম্পর্ক-বর্জিত এমন চমৎকার গল্পও আছে, যার মূল উৎকণ্ঠা মনস্তাত্ত্বিক জীবন-চিন্তনের অভিমুখী। অতএব যৌন-রহস্য এবং মনস্তাত্ত্বিক কৌতূহল দুইই সমসূত্রে বাঁধা পড়েছে অচিন্ত্যকুমারের অনেক শ্রেষ্ঠ গল্পে। তাহলেও মনকে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখবার মানস-পরিণতি যতদিন গড়ে ওঠেনি,—যতক্ষণ জীবনের সম্বন্ধে যথাপরিমাণ অভিজ্ঞতার সঞ্চয় পুঞ্জিত হয়নি, ততদিন ভাবালু অদম্যতা, যৌবনের নেশা আর বিলাসী কথার পুঁজি নিয়েই শিল্পী গল্পের আসর জমিয়ে ছিলেন। তাই বুঝি স্ব-নির্বাচিত গল্প-সংগ্রহে 'টুটাফুটা'-র একটি গল্পও জায়গা পেল না। তা না হলে পরিণত বয়সের গল্প 'নিষ্কর' [দ্বিতীয় যুদ্ধের পটভূমিতে লেখা] আর 'সন্ধ্যারাগ' [কল্লোল—১৩৩২ পৌষ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত]-এর মধ্যে মৌল পার্থক্য আর কিছু নেই—সেই নরনারীর দেহমনের আকর্ষণ ও অর্থনৈতিক অপঘাত। তবু 'নিষ্কর' একটি পূর্ণাঙ্গ 'গল্প'—যথা অর্থে 'বাস্তব'-ও বুঝি। কিন্তু 'সন্ধ্যারাগ'-এ মনস্তত্ত্ব-সমর্থিত যৌন প্রতিভাস বা যৌন প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব প্রখরতর হলেও কথার উচ্ছ্বাস আর যৌবনের উন্মাদনাই তার মুখ্য উপাদান।

জীবন-সংযোগ রহিত সেই অদম্য যৌবন-পিপাসা ও বিলাসী ভাবালুতা থেকে মানুষের মনের প্রত্যক্ষ শক্ত মাটিতে পদক্ষেপ করলেন শিল্পী 'ইতি' গল্পতে। এ-যুগ অচিন্ত্যকুমারের অপার বিস্তৃত গল্পসাহিত্যের ইতিহাসে মনোবিকলনাশ্রিত জীবন-সন্দর্শনের যুগ। তখনো জীবিকার উপায় হিশেবে সরকারি দপ্তরের আহ্বান আসে নি;—এই সৃজন-পর্বেও,—শিল্পী বলেন,—"রুক্ষ রাজপথে নিরাশ্রয়ের মত ঘুরে বেড়াই।" তাহলেও অন্তরের গহনে জীবন-দেখা এক সজীব দৃষ্টি জেগে উঠেছে,—প্রতিটি খুঁটিনাটির প্রতি যার অপার মমতা আর অদম্য কৌতূহল। চোখ আর মন জেগে থাকলে দেখবার জিনিসের অভাব জীবনে কখনোই ঘটে না—'ইতি' এই সত্যেরই প্রমাণ;—এই সত্যেরই ব্যাপকতর প্রমাণপঞ্জী শিল্পীর পরবর্তী প্রায় সকল গল্পগুচ্ছ। 'ইতি' গল্পের প্রবণতাই বৃহত্তর অভিজ্ঞতার পটভূমিতে বিচিত্রগতি বাহুল্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, সকল সফল গল্পে নিত্য নূতন আকার ধরেছে মনোবিকলনাশ্রিত জীবন-দেখার নব নব উৎকণ্ঠা কৌতূহল আকাঙ্ক্ষা।

'ইতি'-র বিষয়বস্তুতেও সেই চোরাগলির ইতিকথা;—বারবনিতা জীবনের ব্যর্থ নৈরাশ্যের এক ক্লান্ত বিষণ্ণ দুঃসহ ছবি—"বড়দিনের ছুটিতে বড় শহর থেকে এক

থিয়েটার পার্টি এসেছে,—বিনা নিমন্ত্রণেই। দুরাত্রি থিয়েটার হবে বলে আগেই রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল,—'মালতী : শ্রীমতী চমৎকারিণী দাসী।' মানে মেয়ের পার্টে যিনি নামবেন তিনি মেয়েই।

"এ খবরে সারা শহরে ও গাঁয়ে হৈ চৈ পড়ে গেছল,—স্টেজে দাঁড়িয়ে মেয়েমানুষ বইয়ের কথা গড় গড় করে মুখস্থ বলে যাবে,—এ আশেপাশের গাঁয়ের লোকের কাছে একেবারে অবাক কাণ্ড ;… …।"

চারদিকে রক্ষণশীলদের প্রতিবাদ ও অপর সকলের উদ্দীপনায় পরিবেশ যখন উত্তেজনামুখর, তখনই দুর্ভাবনা দুঃসহ হয়ে উঠল,—চমৎকারিণী জ্বরে শয্যাশায়ী। ম্যানেজার রমেশ ব্যাকুল কণ্ঠে সহকারী কৃতার্থকে জিজ্ঞাসা করে 'এখন কি উপায় ?

তারই উত্তর খুঁজতে কৃতার্থ রলাকে ধরে আনে বে-পাড়া থেকে। পেটের ভাত জোটাতে যে অবোলা নারীকে রুক্ষজীবনের পথে প্রতিদিন প্রণয়ের অভিনয় করে চলতে হয়,—থিয়েটারের স্টেজে তার অভিনয় করবার কথা রাজকুমারী মালতীর ভূমিকায়,—কুমার হিরণকুমারের প্রণয়িনী সে। হিরণকুমারের পাঠ করবে নিমাই। —"চমৎকার ছেলে এই নিমাই ! উনিশ-কুড়ির বেশি হবে না। ছিপছিপে পাতলা চেহারাটা, টানাটানা চোখ, কথায় যেন মধু ঢালা।"

এই প্রণয়-অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মালতীরূপিণী সরলা কখন বুঝি নিজের অজ্ঞাতেই হিরণকুমার-বেশী নিমাইর প্রতিও ঝুঁকে পড়ে। নিমাই যে আগে থেকেই চরিতার্থ করেছে সরলাকে,—তার অবদমিত পদলাঞ্ছিত নারীচেতনাকে !—"তুমি এসেছ, ভালোই হয়েছে। এমনি একটি মেয়েই আমি চেয়েছিলাম—দুটি চোখে এমনি একটা লজ্জা,—তোমাকে পেয়ে মনে হচ্ছে সমস্তগুলি সিন যেন একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠবে—গানের মতো ছবির মতো।"

দুটো তিনটে দিন-রাত স্বপ্নের মত কেটে যায় সরলার, অভিনয় এবং অভিনয়ের বাইরেও,—নিমাই-এর স্বল্পাবকাশ উষ্ণ সান্নিধ্যে। রাতের পর রাত অটলবাবু এসে ক্রোধে আক্রোশে ফিরে যায়,—সরলা তার টাকায় বাঁধা। সরলার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই,—বাড়িউলিকে সে বলে,—"সরি এবারে সরে পড়ছে,—বাবুর তোয়াক্কা আর সে রাখে না।" নিমাই নিজের ব্যাপারটা নিভৃতে পরিয়ে দিয়েছিল সরলাকে,—ওরা দুজনে একসঙ্গে খাবার খেয়েছে গোপনে এক থালায়। রিহার্সাল্-এর সময় "নিমাইর মাথাটা কোলের কাছে টেনে এনে সরলা সত্যি-সত্যিই কেঁদে ফেললে—চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। নিমাইর কোঁকড়ানো চুলগুলি নিয়ে ওর শীর্ণ আঙুল কটির কী সে আদর, যেন আঙুলের ফাঁক দিয়ে জলের মত সমস্ত হৃদয় গলে পড়ছে।"

এমনি করে মাত্র দুটি দিনের জন্য "সরলা সব ভুলে যায়—খাল পারে সেই নোংরা ঘর, সেই শীতকালে রাত বারোটা পর্যন্ত ফাঁকে জবুথবু হয়ে বসে থাকা, সেই একঘেয়ে বিশ্রী কথাবার্তা, সেই অটলবাবুর বীভৎস মুখ। ওর বন্দী পৃথিবী যেন হঠাৎ একটা অপরিমিত পরিধি লাভ করে। আকাশকে আজ ওর খুব বড় লাগে,—সমস্ত অবকাশ পূজার আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভাবে, ও সত্যিই অটলের রক্ষিতা ক্রীতদাসী নয়, ও সত্যই রাজকুমারী। ও ভালবাসে। প্রেমিককে হারিয়ে ও বৈরাগিনী হয়েছে,—ওর দারিদ্র্য, ওর বিরহের কি সুন্দর ব্যাখ্যা। সরলা সব ভুলে যায়, মিথ্যার মাদকতা ওর ক্লান্তি ঘুচোয়—ও নতুন করে পৃথিবীতে জন্মলাভ করে।"

কিন্তু চরম মুহূর্তে মিথ্যার আকাশ চৌচির হয়ে ভেঙে পড়ে তার দীর্ণ জীবনের মাথায়। অভিনয়ের দিন সকালে সরলাকে জানিয়ে দেওয়া হয়,—চমৎকারিণী সুস্থ হয়ে উঠেছে, অভিনয়টা সেই করবে; সরলা নিরর্থক। অভিমানে, হতাশায়, মুহূর্তে অর্থহীন হয়ে পড়ে সরলার বিবর্ণ জীবন। নিমাই বলেছিল, "তোমাকে না নামালে আমি ওদের ডুবিয়ে মারব।"—ঐ শেষ আশাটুকুতে ভর করে গভীর রাত্রে সরলা এগিয়ে চলে থিয়েটারের তাঁবুর পথে,—গায়ে নিমাইএর দেওয়া র‍্যাপার,—নিশ্চয় সে পালিয়েছে, চমৎকারিণী কি করে সে কথা বলবে নিমাইকে, যা বলে বলে মুখস্থ,—আত্মস্থ হয়ে গেছে সরলার! ভাবতে ভাবতে থিয়েটার-তাঁবুতে পৌঁছে যায়,—খবর নিয়ে জানে নিমাই ফিরেছে কখন; অভিনয় চলছে, 'তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য'—অর্থাৎ চমৎকারিণী নিমাইকে বলছে সরলার আত্মার কথা।

অভিনয় ভাঙে, জনতার প্রশংসা স্রোতের মত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে,—"খুনের সিন্‌টা কি রকম করলে! ওয়াণ্ডারফুল!" অথচ ঐটেই সরলা কিছুতেই উৎরাতে পারত না।

অভুক্ত, আশাহত "সরলা আর বসে না, বাড়ি চলে। চলতে আর পারে না, কেঁদে কেঁদে মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে।"

নিজের ঘরে পরদিন ভোর বেলা সরলার যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন সারা গায়ে বিষম ব্যথা, জ্বর, মাথা ছিঁড়ে পড়ছে, যেন সারাবছর ও কিছু খায়নি। পায়ের কাছের জানালা দিয়ে সূর্যোদয় দেখা যাচ্ছে।

আগের দিন রাত্রে ক্ষিপ্ত নেশাগ্রস্ত অটলবাবুর লাথি-জুতোর চোটে "একেবারে ভেঙে" পড়েছিল সে।

তবু, "এত দুঃখেও ওর স্বপ্ন কাটেনি। ভোরের আলোয় মনে হচ্ছে যেন ওর কাছে ওর হিরণকুমার আসছে—মাথায় তার সোনার মুকুট, তাতে পাখির পালক গোঁজা।"

এই পরিসমাপ্তির প্রতি তাকিয়ে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত স্মরণ করতে হয়,—"অচিন্ত্যকুমারের পরবর্তী পরিণতি লক্ষ্য করিলে ইহাই মনে হয় যে, বীভৎসতার প্রতি তাঁহার কোনো স্বাভাবিক প্রবণতা নাই, বরং কুৎসিতের ঊষর মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া এক দুরধিগম্য সৌন্দর্যলোকে উত্তীর্ণ হওয়াই তাঁহার প্রকৃত কাম্য।"[৪০]

এটুকু পরের কথা। তার আগে লক্ষ্য করতে হয়,—এই গল্পেও জীবনের নীতি-নিষিদ্ধ পথের বর্ণনায় অচিন্ত্যকুমারের লেখনী অবাধগতি। তাহলেও জীবন-দেখার গভীরতর আকাঙ্ক্ষার প্রভাবে বাইরের উপকরণ ও পরিবেশের বিষাক্ততাকে অতিক্রম করে সরলার মন-চিত্রণের প্রয়াস গল্পটিকে "সহজ আন্তরিকতা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা" রহিত সাড়ম্বর বিদ্রোহ ঘোষণা ও বাস্তবের সীমাতিক্রমী অতিরঞ্জনের[৪১] হাত থেকে রক্ষা করেছে।

'ইতি'গল্পে অভিজ্ঞতার একান্ত ঘনিষ্ঠতা রয়েছে, এমন কথা মনে করবার কারণ নেই,—তবে জীবনকে তার রুক্ষতম ক্ষেত্রেও যথামূল্যে খুঁটিয়ে দেখবার আকাঙ্ক্ষা শিল্পীর প্রবল হয়েছে; তাই উগ্র নগ্নতার উল্লাস-নেশা এখানে হতে পেরেছে স্তিমিত। অপর পক্ষে অচিন্ত্যকুমারের সহজ সৌন্দর্য-পিপাসার প্রসঙ্গটিও এই গল্পের পরিণামে স্পষ্ট ব্যঞ্জনা পেয়েছে। সৌন্দর্যের উৎকণ্ঠিত বাসনা থেকেই কবিতার জন্ম,—আর অচিন্ত্যকুমার গদ্য-পদ্য সকল রচনাতেই অমিশ্র কবি। অতএব সৌন্দর্যপিপাসা তাঁর স্বভাব-প্রবণতা হওয়াই উচিত। তবু খুব অল্প সংখ্যক গল্প রচনাতেই সৌন্দর্যকে, প্রেমকে অভগ্ন মূর্তিতে অঙ্কিত করতে পেরেছেন শিল্পী। কোথায় যেন রয়েছে তাঁর গোপন চিত্তেরই কোনো এক রহস্যময় বাধা,—কোনো না-জানা 'অব্‌সেশন'। তাই সুন্দরের পিপাসা অচিন্ত্যকুমারের প্রায় সকল গল্প রচনাতেই একটু ভেঙে-চুরে বেঁকে গেছেই। এদিক থেকে 'দোলনা' গল্পটি যেন তাঁর মূল সৃষ্টি-প্রেরণারই প্রতীক।

সার্কাসের মেয়ে সুভদ্রা। কত,—কত বছর ধরে দুলেছে নাগস্বামীর সঙ্গে একই দোলনায়,—প্রতিরাতে হাত বাড়িয়ে লুফে নিয়েছে তাকে দোদুল্যমান পরুষ-কঠিন-দেহ নাগস্বামী,—ছুঁড়ে দিয়েছে আবার হাতের ঘেরা থেকে সেই আঁটসাট পোশাকের বন্ধনে ঘেরা শরীরটি,—যার "সর্বাঙ্গে লালিত্য শুধু লিখিতই হয়নি, মোটা পেন্সিলে আণ্ডার লাইন করা হয়েছে। যে লালিত্য স্বাস্থ্যে স্ফূর্তিমান, কাঠিন্যের মশলা পেয়ে যা সমীচীন।"—"ওর শরীরের প্রত্যেকটি ঢেউ নাগস্বামীর মুখস্থ।"

৪০। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৪১। তদেব।

বৃদ্ধ বীভৎস মালিক তাতাচারীর লোলুপ দৃষ্টি সুভদ্রার সেই শরীরের ওপর। তার রুগ্না স্ত্রীর মৃত্যুর অপেক্ষা কেবল, তাহলেই সুভদ্রাকে সে বিয়ে করবে,—নানারকম যোগবিয়োগের পরেও যে-সুভদ্রার বয়স কুড়ি-বাইশের বেশি হয় না।

তবু সার্কাস্-এর শো-এর পর বিস্ফারিত শাড়ির অঞ্চলতলে সুঠাম দেহটি কুণ্ঠিত লজ্জায় ঢেকে রাখে সুভদ্রা,—বাসন মাজে, চাল ধোয়, রান্নাও করে সগোষ্ঠী সার্কাস-দলের,—জোর দিয়ে বলে "এই তো আসল কাজ। নইলে সারাজীবন কি দুলব না-কি গাছে চড়ে?···এসব কাজের জন্যেই তো শরীরে শক্তি ধরা সার্থক আমাদের।"

সুভদ্রা কী তাতাচারীর কথা ভাবে,—না নাগস্বামীর! নাগস্বামীর পেশল বলিষ্ঠ বাহু জ্বলে ওঠে সুভদ্রার পরিণাম ভেবে। একদিন সার্কাসের খেলা দেখাতে দেখাতে "নাগস্বামীর হাত থেকে উড়ন্ত অবস্থায় নিজের দোলনা ধরতে না পেরে সুভদ্রা পড়ে গেছে মাটিতে উল্কোর মতো ছিট্‌কে।"

"সুভদ্রা অজ্ঞান, লেগেছে ঠিক নিতম্বের অস্থিতে। শোয়া-চেয়ারে করে নিয়ে যাওয়া হল স্থানীয় হাসপাতালে।" সেখান থেকে সদর,—সদর থেকে কলকাতা।

"ডাক্তার বললে, সুভদ্রা খোঁড়া হয়ে যাবে চিরকালের জন্যে, সার্কাস দূরে থাক, লাঠির ভর ছাড়া হাঁটতেই পারবে না।" অনেক কষ্টে,—অনেক অনেক দিনের পর সুভদ্রা উঠতে পারল,—অনেক আত্মীয়-আত্মীয়া দেখতে এসেছে তাকে।—"কিন্তু সবাইকে ফেলে, এমনকি লাঠির আশ্রয় ফেলে নাগস্বামীর কাঁধের উপর বাহুর ভর রেখে সুভদ্রা উঠে দাঁড়াল। নাগস্বামী তাকে টেনে নিল সার্কাসের চেয়েও কোমলতর অভ্যাসে।

"এক-পা দু-পা হেঁটে সুভদ্রা প্রশ্ন করলে নাগস্বামীকে, 'আচ্ছা, তুমি আমাকে নিজে ইচ্ছে করেই ফেলে দিয়েছিলে, না?'

" 'কেন, বুঝতে পার নি এতদিন?'

" 'বুঝেছি কিছু, সম্পূর্ণ বুঝতে পারি নি'। পরিপূর্ণ চোখ তুলে সুভদ্রা বললে, 'কেন ফেলে দিয়েছিলে বলো দিকি?'

" 'বা, এ আবার কে-না বোঝে?' হাঁটতে হাঁটতে তারা এগিয়ে গেল ভোরের জানালার দিকে। নাগস্বামী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'নইলে তোমাকে বিয়ে করতুম কি করে'।"

এ-সমাপ্তি অচিন্ত্যকুমারের শিল্প-চেতনারও 'ভোরের জানালা',—ধ্রুব অরুণাচল। সুন্দরের জন্যে তাঁর পিপাসা অন্তর্নিহিত, কিন্তু জীবনের রুক্ষ বস্তুভূমিতে তাকে দুমড়ে, কোনো-না-কোনো রকমে পা ভেঙে না দিয়ে কিছুতেই অমিশ্র-পূর্ণ সুন্দরকে গ্রহণ

করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। এ মানসিক বাধা (obsession) পরিবেশ, সমাজ, না শিল্পীর ব্যক্তিগত অনুভূতি-সম্ভব ?—সে এক পরম রহস্য !

অচিন্ত্যকুমারের গল্প-রচনার আর এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তেরশ' পঞ্চাশের মন্বন্তর-সমকালীন জীবনের পটভূমিতে। এ-পর্যন্ত আলোচনা থেকে একটা কথা বুঝেছি, শিল্পী হিশেবে অচিন্ত্যকুমার অব্যবহিতের প্রেমিক। কোনো সুগভীর স্থায়িত্ব নয়,—কোনো নিশ্চিত পরিণামের ত প্রসঙ্গই ওঠে না। জীবনকে যেমন করে দেখেছেন, তৎক্ষণাৎ সেই রূপটিকে নিজস্ব এক ভাবালু দৃষ্টি আর অতিঝঙ্কৃত কথকতার ভাষায় মুক্তি দিয়ে তবে নিজের মুক্তি খুঁজে পেয়েছেন। অব্যবহিতের আবেদন তাঁর কাছে খুব বেশি; তাতে যুদ্ধ আর মন্বন্তরের কালে বিষাক্ত অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিল সমাজের ওপর থেকে নীচেকার আদ্যন্ত আমূল জীবন ;—যার প্রতি অচিন্ত্যকুমারের বাধাহত রহস্যময় মনের আছে এক অদম্য উৎকণ্ঠা। ফলে বিশ্বযুদ্ধে কালোবাজারি যুগের কালো আকাশে একটি দুটি গল্পের ফুল্‌কি উজ্জ্বল হয়ে আছে, যাতে শিল্পের স্থায়িত্বের চেয়ে শিল্পীর স্থায়ী গুণটি পূর্ণ প্রস্ফুট হয়েছে।

গল্প-সংকলনের নাম 'কাঠ খড় কেরোসিন',—গল্পের নাম 'কেরোসিন',—"নূতন বিয়ে করেছে রমজান। বউয়ের নাম হাস্যবিবি। সব সময়েই হাসে। রাত্রে ঘুমের মধ্যেও হাসে কিনা বাতি জ্বালিয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে রমজানের।

"কুপি আছে। দিয়াশলাইও আছে। কিন্তু কেরোসিন কই ?"

পাশেই হাতেম শার দোকান। আগে কাঠ বেচত। কেরোচিত বেচত। এখন ভেলিগুড় বেচে। বেচে খোসা ভূষি।

'ক্রাচিন এল দোকানে ?'

'কোথায় ক্রাচিন !' হাতেম শা বিতৃষ্ণার ভঙ্গি করে।

'জবাব শুনে রমজান যেন খুশি হতে চায় না। ইতি-উতি করে।'

'কোরোসিন কণ্ট্রোল'-এর গ্রাম্য পটভূমিকে কেন্দ্র করে গল্প। বউ-এর মুখের হাসি রমজান দেখতে পায়নি কুপি জ্বালিয়ে,—আর একদিন তার রুগ্ন মুখের বিকৃত কারুণ্যকেও না। অবশেষে বিক্ষুব্ধ আক্রোশে হাতেম শা'র দোকানে আগুন দিয়ে অন্ধকারে চুপটি করে বসেছিল হাস্যবিবি'র শবদেহের পাশে। হাতেম শা'র দোকানে ভেলিগুড়ের টিনে কোরোসিনের আগুন লাল হয়ে জ্বলেছিল।

এই প্রসঙ্গকে উপলক্ষ্য করে অচিন্ত্যকুমারের রচনায় গণচেতনার আভাসও সন্ধান করা হয়েছিল একদা। কিন্তু আসলে তাঁর শিল্পি-মানস ভাবালু আত্মলীন

কবিকল্পনায় বিভোর। গল্পের প্লটের চেয়ে ঝংকৃত কথকতাময় বর্ণনা,—আর চমকপ্রদ শব্দের বিন্যাস তাঁর মনকে আকর্ষণ করেছিল। আর চিরকালই অচিন্ত্যকুমারের কৌতূহল জীবনের খুঁটিনাটির প্রতি,—কথা, শব্দ এবং বাচন-ভঙ্গির খুঁটিনাটির প্রতিও। সেই একই প্রসঙ্গের অনুসরণে একান্ত অন্তরঙ্গ গ্রামীণ শব্দ কখনো বা পরিবেশোচিত মুসলমানী শব্দ ও বাক্‌রীতি, ঘনিষ্ঠ আকার পেয়েছে গল্পের শরীরে। তাহলেও সৃজনীবাসনার প্রকৃতি বা আকৃতির তফাৎ ঘটেনি কোথাও।

ওপরে যে গল্পাংশটি উদ্ধার করেছি, তার কারণ, এতে অচিন্ত্য-শৈলীর আকৃতি -গত বিশিষ্টতাটুকু ধরা পড়েছে বলে মনে হয়। যেটুকু উদ্ধৃত হয়েছে, তাতেই বুঝি, প্লটের উন্মোচনে একটা নাটকীয় বহমানতা রয়েছে, আর ভাষায় আছে কাব্যধর্মী এক আবহ ঝঙ্কার। নাটকীয় উন্মোচন মনের কৌতূহলকে অদম্য করে তোলে প্রথম থেকেই, শব্দের ঝঙ্কার শব্দিত নেশার ঘোর গড়ে তোলে,—অনেকটা মৌমাছির একটানা গুঞ্জনধ্বনির মত। এই দুয়ের সঙ্গে গোপনীয়তার প্রতি ঔৎসুক্য, আর মনস্তাত্ত্বিক সন্ধিৎসার সঙ্গে শিল্পীর মানসিক অবদমন মিলে গড়ে তুলেছে অচিন্ত্যকুমারের মাদকতাভরা গল্পের শরীর এবং প্রাণ।

এঁর উল্লেখ্য গল্পসংগ্রহের মধ্যে আছে :—

(১) 'টুটাফুটা'—১৩৩৫ ; (২) 'ইতি'—১৩৩৮ ; (৩) 'অধিবাস'—১৩৩৯ ; (৪) 'অকালবসন্ত'—১৩৩৯ ; (৫) 'সংকেতময়ী'—১৩৪০ ; (৬) 'দিগন্ত'—১৩৪০ ; (৭) 'রুদ্রের আবির্ভাব'—১৩৪১ ; (৮) 'নায়ক নায়িকা'—১৩৪১ ; (৯) 'ডবল ডেকার'—১৩৪৬ ; (১০) 'পলায়ন'—১৩৪৭ ; (১১) 'প্রজাপতয়ে'—১৩৪৮ ; (১২) 'ইনি আর উনি'—১৩৪৯ ; (১৩) 'যতন বিবি'—১৩৫০ ; (১৪) 'কালো রক্ত'—১৩৫২ ; (১৫) 'কাঠ খড় কেরোসিন'—১৩৫২ ; (১৬) 'আসমান-জমিন' —১৩৫৩ ; (১৭) 'চাষা-ভূষা'—১৩৫৪ ; (১৮) 'সারেঙ'—১৩৫৪ ; (১৯) 'হাড়ি-মুচি-ডোম'—১৩৫৫ ; (২০) 'মগের মুলুক'—১৩৫৮ ; (২১) 'হুইসল'—১৩৬২ ; (২২) 'এক অঙ্গে এত রূপ'—১৩৬৫ ; (২৩) 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে'—১৩৬৬ ; (২৪) 'আগে কহ আর'—১৩৬৭ ; (২৫) 'এক রাত্রি'—১৩৬৮ ।*

বুদ্ধদেব বসু

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত আর প্রেমেন্দ্র মিত্র বাল্য-বন্ধু,—একই স্কুলের সহপাঠী। প্রথম বয়সে এঁরা যৌথভাবে গল্পের বই লেখায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন,—

* গল্প-সংকলন গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের আনুমানিক কালপরিচয় শিল্পীর দাক্ষিণ্যে প্রাপ্ত

অনেকেরই ধারণা ছিল ওঁদের রচনাধর্মে সদৃশতার লক্ষণ বর্তমান। বুদ্ধদেব বসু সে কথা স্বীকার করেই একদা লিখেছিলেন,—"All our talk of similarities between contemporary authors is, after all, superficial and arbitrary, admitted for the sake of mere convenience, for no two authors,, though initially belonging to the same movement or the same historical group, think, feel or write in the same way."[৪২]

ছোটগাল্পিক অচিন্ত্যকুমার এবং বুদ্ধদেব সম্পর্কেও এ-সিদ্ধান্তের সত্যতা অপরিসীম। এঁরা দুজনে কত কাছে, অথচ কত দূরে,—কত আমূল পৃথক্। তবু গল্প-শৈলীর অনির্বচনীয় স্বভাব আস্বাদনের জন্যে এঁদের দুজনকে এক সঙ্গে লক্ষ্য করাই বুঝি সবচেয়ে ভাল,—এক সঙ্গে মিলিয়ে, এবং পার্থক্যের খুঁটিনাটি খুঁটিয়ে দেখে। অচিন্ত্য-প্রসঙ্গে বলেছি, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই শিল্পীর সাদৃশ্যকে সমলক্ষণের বন্ধনে অন্বিত করে বলেছেন,—গল্পের,—তথা কথাসাহিত্যের জগতে এঁরা কাব্যস্বাদুতার বার্তাবহ। যৌথ উপন্যাস রচনায় প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য-র সঙ্গে বুদ্ধদেবও একদা হাত মিলিয়েছিলেন,—'বিসর্পিল' ও 'বনশ্রী' এই শিল্পি-ত্রয়ের সামবায়িক সৃষ্টি। তাহলেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে গল্পশিল্পী অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবের সৃজন-স্বভাব স্পষ্টত-ই পৃথক; আর আত্মার অন্তরঙ্গ চারিত্রের বিচারে অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবও মোটেই পরস্পরের সমানধর্মা নন। এঁরা দুজনেই স্বভাবত কবি এবং গল্প-উপন্যাস লিখতে বসেও সেই কবি-স্বভাবকে নিয়ত করতে পারেননি। কিন্তু দুজনের রচনাতেই কবিতা-ধর্ম একই অভিন্ন পরিমাণ ও গুণগত বৈশিষ্ট্যে অভিব্যক্ত নয়;—এখানেই একেবারে স্বভাবের গভীরে এঁদের সৃষ্টি ও রচনা-স্বাদুতার পার্থক্য,—প্রায় আমূল। অচিন্ত্যকুমার প্রথমে কবি, এবং কবিতার শরীরে তাঁর শিল্পিচেতনার অভিব্যক্তিও সিদ্ধকাম। তৎসত্ত্বেও গল্পে-উপন্যাসে, কথায়-কথকতায় তিনি উচ্চকণ্ঠ,—কথাসাহিত্যের জগতে তাঁর লেখনী যেমন বহুপ্রজ, তেমনি সৃষ্টির ধারাও স্বতঃস্ফূর্ত। অন্য পক্ষে বুদ্ধদেবের গল্প-উপন্যাস লেখার সংখ্যাও এককালে এমন অতিশয় হয়ে উঠেছিল "যে, লোকে একটু বিরক্তই হল।"[৪৩] অথচ অত প্রচুর লেখার পরেও শিল্পী নিজে বলেন,—"খুব সম্ভব আমি স্বাভাবিক গল্পলেখক নই—আমার উদ্ভাবনী-শক্তি দুর্বল; ঘটনার চাইতে বর্ণনার দিকে আমার ঝোঁক, নাটকীয়তার চাইতে স্বগতোক্তির দিকে, উত্তেজনার চাইতে মনস্তত্ত্বের দিকে।[৪৪]

৪২। B, Bose—'An Acre of Green Grass'।

৪৩। দ্র. জ্যোতিপ্রসাদ বসু (সঃ) 'গল্পলেখার গল্প'।

৪৪। তদেব।

নিজের গল্প-রচনার স্বভাব বিশ্লেষণে অন্তর্মুখী (introvert) শিল্পীর এই আত্মবিচারণা বিশেষ তাৎপর্যবহ। গল্পের শৈলী আর যাই হোক্ স্বগতোক্তির নয়; অন্তত দুজনকে না হলে গল্প কিছুতেই জমে না,—একজন বলবে, তন্ময় হয়ে শুনবে আর একজন। আর শ্রোতার কাছে গল্প-রস জমাট্ করে তোলার আকাঙ্ক্ষা থেকেই বাচনের ভঙ্গিতে কখনো নাটকীয়তার চমক্, কখনো ঘটনা বিন্যাসের আকস্মিক দোলা,—কখনো-বা কথার ও কথকতার 'উত্তেজনা' কিংবা উদ্দীপনাও শরীরের স্বাভাবিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতই ছোটগল্পের দেহে প্রকাশিত হয়ে থাকে। ছোটগল্পের আঙ্গিক বিচার প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের শুরুতে সেসব কথা আলোচিত হয়েছে। অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পে দেখেছি গল্প জমিয়ে তোলার সেই অখণ্ড প্রয়াস। উপাখ্যানের শরীরে প্রায়ই যৌনচেতনার উত্তেজনা আছে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে,—মাঝে মাঝে যা বাঁধভাঙা উদ্দামতায় দিশাহারা হয়েছে,—সেই সঙ্গে কথায় আছে কথকতার চটক। বাংলা দেশের যুগ-প্রাচীন কথকতার ভঙ্গিকে আধুনিক গল্পের প্রকরণে তিনি নূতন মূল্য দিয়েছেন; উদ্দেশ্য সেই একই,—কান-কে মাতিয়ে মনের ঘরে চমক্ জাগিয়ে তোলা। অচিন্ত্য সেনগুপ্তের গল্পের ভাষায় কাব্যগন্ধী শব্দ ও শৈলীর অনুপ্রবেশও এই উদ্দেশ্যেরই প্রসঙ্গে। অনেক ক্ষেত্রেই বিষয় একান্ত স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য,—যাকে বলা যেতে পারে মাংসল বাস্তবের প্রতিচ্ছবি। অথচ ভাষায়, শব্দচয়নে পদ্যের ঢেউ,—কাব্যের ঝাঁঝ। আর এই কারণেই হয়ত অচিন্ত্য সেনগুপ্তের গল্পে কাব্যধর্মিতার আড়ম্বর যত,—অনির্বচনীয় স্পর্শকাতরতা তত নেই;—কবিতার তরঙ্গায়িত ব্যঞ্জনা গল্পের শরীর ছাড়িয়ে রক্তমাংসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে পারেনি। তাই গল্পের রূপ-প্রকরণে হাতিয়ারের ছাপ,—'tool mark' অনেকটা স্থূল ভাবেই ধরা পড়ে কখনো কখনো—অর্থাৎ চমৎকার ও চটকদার শব্দ-শৈলী,—অপ্রত্যাশিত বলেই যা ঝাঁঝালো,—আর বাক্য ব্যবহারে ঘটমান বর্তমান-জ্ঞাপক শব্দগুচ্ছের একটানা প্রয়োগ,—ভাষাকে যা এলায়িত করে,—মনকে,—তথা, বোধ ও বোধিকে মাদকতার মত করে আবিষ্ট।

বুদ্ধদেবের গল্প-স্বভাব বর্ণনায় অচিন্ত্য-শৈলীর এই সুদীর্ঘ পুনরবতারণা কিছুতেই নিরর্থক নয়। কারণ বুদ্ধদেবের গল্প যথার্থই নিটোল-পূর্ণাঙ্গ কবিতাধর্মী,—তার শরীরে অত্যুচ্চার কাব্যাড়ম্বর নেই, অথচ রূপে এবং স্বভাবে ছড়িয়ে আছে কবিতার অ-ধরা হলেও এক অখণ্ড সুস্পষ্ট স্বাদুতা। বুদ্ধদেবের গল্পের রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জা-মেদ, মায় প্রাণ পর্যন্তও অনেক সময়ে কবিতার ধর্মে গড়া,—তাই তার শরীরে কাব্য গড়ে তোলার অতি-সচেতন আড়ম্বর নেই। ভাষায় কাব্যের ঝঙ্কার যেটুকু আছে,—আছে অনেকখানিই,—তা' আসলে গল্প-প্রাণের সহজ কবিতা-ধর্মিতারই অনিবার্য লাবণ্য

বিচ্ছুরণ। বুদ্ধদেবের গল্পের এইটুকুই অনন্য স্বাতন্ত্র্য,—দোষ এবং গুণ দুইই। তাই তাঁর গল্পে গল্পের যেটুকু সার,—সেই বস্তু খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বুদ্ধদেবের দুর্লভ ঝঙ্কার-স্পন্দিত সুপ্রযুক্ত ভাষার শৈলী থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে প্লট্-এর মধ্যে আর কিছু এমন বস্তু থাকে না যাকে দুহাত দিয়ে ধরা যায়। অথচ সুগঠিত গল্পের পক্ষে প্লট্ এক আবশ্যিক উপাদান। প্রায় কোনো গল্পই প্লট্সর্বস্ব নয়,—তবু কাব্যস্বাদী ছোটগল্প-শরীরেরও তা অপরিহার্য কাঠামো। সেই সার্থক কাঠামোটুকু গড়ে তোলার জন্য গল্পকে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাঠকের,—শ্রোতার সামনে তুলে ধরতে হয়। অথচ বুদ্ধদেব বসুর পক্ষে ঐটুকুই অসম্ভব; তাঁর গল্প-মাত্রই প্রায় স্বগতোক্তি,—মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণও আসলে নিজের মনে তলিয়ে যাওয়া,—গল্পের সবকিছু আয়োজন শিল্পীর আত্মবিচ্ছুরণের—self projection-এর আয়াসজনিত। তাই তাঁর আক্ষেপ,—"আমি পরিপূর্ণ আত্মসচেতন—লিখতে সময় লাগে, বেশি ভাবতে হয়, বেশি খাটতে হয়।" আর সর্বোপরি ত রয়েইছে শিল্পীর আত্মস্বীকৃতি,—স্বভাবগাল্পিক নন তিনি। শুধু তাই নয়,—"এ-বিষয়ে সন্দেহই নেই যে মনে মনে গল্পকে আমি কবিতার চাইতে নিচু আসনে বসাই",—এমন কথাও শিল্পী অনায়াসে বলেছেন।

তা সত্ত্বেও বুদ্ধদেব একদিন অবিরাম গল্প লিখে চলেছিলেন,—অসংখ্য, অজস্র। এর মুখ্য কারণ নির্দেশ করেছেন তিনি নিজেই,—অনেক কবিতার ফাঁকে ফাঁকে গল্পও একটি-দুটি তখন রচিত এবং প্রকাশিত হচ্ছে। কারণ লেখক বলেন,—সেকালে "কবিতায় আমি আত্মহারা হতুম, গল্প অনেকটা খেলার মত ছিল। হঠাৎ একদিন সে খেলা মারাত্মক হয়ে উঠলো যখন 'কল্লোলে' আমার একটি গল্প বেরুলো, যার নাম 'রজনী হলো উতলা'। সে গল্প নিয়ে যে উত্তেজনা উদ্বেল হয়ে উঠেছিলো আমার সমবয়সি অনেকের হয়ত তা মনে আছে। সবচেয়ে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন মহিলারা—ঐ সতেরো বছর বয়সেই যে এ-সম্মান আমার ভাগ্যে জুটেছিল এখন সেকথা ভাবতে ভালই লাগে।···নবযৌবনে আদিরস একটু উগ্র হয়েই প্রকাশ পায়—ও গল্পেও তাই হয়েছিল, সেটা যে একটা অপরাধ এ-যুগে কারুরই তা মনে হবে না। ছেলে-বয়সের একটা কাঁচা লেখা নিয়ে অতটা হৈচৈ বিজ্ঞজনেরা কেন করেছেন জানি না। যাই হোক, আমার পক্ষে তার ফল ভালোই হয়েছিল।··এ নিন্দায় দমে যাওয়া দূরে থাক্, আমি অত্যন্ত বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। এরপর থেকেই সত্যিকার মন দিলাম গল্প লেখায়। 'রজনী হলো উতলা' কোনো-কোনো মানুষকে উতলা না-করলে গল্প লেখার দিকে আমি হয়তো বেশি দূর অগ্রসর হতাম না।"[৪৫]

৪৫। তদেব।

উদ্ধৃতি অতি বিস্তারিত হলেও বুদ্ধদেব বসুর গল্প-স্বভাবের রহস্য উন্মোচনে এই উৎস-সন্ধানের প্রয়োজন প্রায় আবশ্যিক। 'রজনী হলো উতলা' গল্পের অতিশয় নিন্দা শিল্পীর মনকে গল্প রচনায় উৎসাহিত এবং নিবিষ্ট করেছিল; এইটুকুই সব নয়।—বস্তুত ঐ গল্পের গহনতম প্রাণবিন্দু থেকেই বুদ্ধদেব তাঁর সমগ্র গল্প রচনার প্রস্তুতি এবং পাথেয় গ্রহণ করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে, কথাসাহিত্যিক বুদ্ধদেব D. H. Lawrence এবং প্রথম বয়সের Aldous Huxley-র ভাবনায় উদ্বোধিত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, নগ্ন সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপকার চিত্রশিল্পী Michelangelo-র সৃষ্টির সৌন্দর্য-লোকে স্রষ্টা বুদ্ধদেব একদিন আত্মহারা হয়েছিলেন। তাহলেও—নগ্নতা-চিত্রণের মাত্রা এবং পদ্ধতি নিয়ে অনেকের সঙ্গেই মতভেদ ও বিতণ্ডার কারণ ঘটলেও—মনে হয়, যৌন জীবনের নগ্নতার শক্তিকে মুগ্ধ মনে বরণ করে নেবার পরেও নিজের মতে ও পথে বুদ্ধদেব যেন সতর্কভাবেই অশ্লীলতা থেকে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছেন।

অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে একদা তিনি লিখেছিলেন, "To describe even normal sexual behaviour not technically, scientifically, but in terms of universal human experience and in the language of imaginative writing, it is necessary to have either the devastating laughter of a Voltaire, or the almost religious passions of a D. H. Lawrence, or abundant, over-flowing poetry."[৪৬]

শিল্পীর নিজের প্রসঙ্গে Voltair-এর বিশ্বদুর্লভ দার্ঢ্যের কথা ওঠেই না; Lawrence-এর দুর্মর আবেগ-প্রতপ্তাও নেই তাঁর sex-চেতনায়। বস্তুত আত্মনিমগ্ন-ব্যক্তিত্ব,—তথা, অনেকটা পরিমাণে introvert বুদ্ধদেব অন্তরনিরুদ্ধ জ্ঞাত-অজ্ঞাত যৌন আক্ষেপকে পরিমিত উচ্ছ্বাস-স্নিগ্ধ কবিতাধর্মের প্রাচুর্যে সুরভিত করে তুলেছেন গল্পের প্রাণে ও শরীরে।

তাহলেও "There's nothing wrong with sexual feelings in themselves, so long as they are straight forward and not sneaking or sly. The right sort of sex stimulus is invaluable to human daily life. Without it the world goes grey."[৪৭]—D. H. Lawrence-এর মত বুদ্ধদেবেরও এটুকু সাধারণ বিশ্বাস। আর 'কল্লোল'-গোষ্ঠী প্রসঙ্গে দুর্নীতি ও রুচিহীনতার যে প্রচণ্ড অভিযোগ একদা নানাদিক থেকেই উঠেছিল, তার উত্তরে বিচিত্র উপলক্ষ্যে নানা-ভঙ্গিতে উৎসাহী অভিযুক্তরা যে জবাব দিয়েছিলেন, তারও মূলগত ধারণা সংহত অভিব্যক্তি

৪৬। B. Bose—'An Acre of Graeen Grass.'

৪৭। D. H. Lawrence, Ed—'Sex, Literature And Censorship'—'Pornography And Obscenity.'

পেতে পারে D. H. Lawrence-এর ভাষাতেই,—"The intelligent young, thank Heaven, seem determined to alter in these two respects. They are rescuing their young nudity from the stuffy, pornographical hole and corner under world of their elders, and they refuse to sneak about the sexual relation. This is a change the elderly grey ones of course deplore, but it is in fact a very great change for the better, and a real revolution."[৪৮] মনে হয়, বুদ্ধদেবের পক্ষে এটুকু কেবল সাধারণ ধারণা নয়,—এক ধরনের ব্যক্তিগত প্রত্যয়ও।

প্রসঙ্গ অনেক বিস্তারিত হয়ে পড়েছে, অপরিহার্য কারণে। তাই একথা স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন যে, ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বিতর্ক বর্তমান আলোচনার পক্ষে অবান্তর। কেবল বুদ্ধদেবের মত আত্মবন্দী ব্যক্তিত্বের সৃষ্টির রহস্য-সন্ধানে তাঁর মনোলোকে প্রবেশের এই প্রয়াস অনিবার্য। যুগধর্মে, নিজের ব্যক্তিগত পরিবেশ প্রভাবে, অথবা introvert কবিস্বভাবের নিমগ্ন-চেতনতার দরুন,—যে-কোনো কারণেই হোক, বুদ্ধদেবের শিল্প-ভাবনায় sex-স্পৃহা দ্বিতীয় স্বভাবের আকারে সুপ্ত ছিল প্রথমাবধিই। 'রজনী হল উতলা', এমন কি তার পূর্ববর্তী গল্পাবলীতেও অবচেতন মনের আক্ষেপ অল্পবিস্তর প্রকাশিত হয়েছে, হয়ত শিল্পীর স্পষ্ট অবধান ব্যতিরেকেই। 'রজনী হলো উতলা' গল্পের প্রকাশ এবং তৎপরবর্তী আলোড়নের অনুসরণ করে শিল্পী এবারে স্ব-স্থ হলেন,—যৌন-ভাবনার রোমান্টিক কাব্যানুভূতির জগতে আত্মবিচ্ছুরণের—self projection-এর নিজস্ব অবকাশ-ভূমিটুকু খুঁজে পেলেন। এই অর্থেই বলেছিলাম 'রজনী হল উতলা' থেকে ছোটগাল্পিক বুদ্ধদেব বসু তাঁর সৃষ্টির পথরেখা এবং পাথেয় দুই-ই খুঁজে পেয়েছিলেন সচেতনভাবে। ফলে প্রেমই তাঁর সকল যথার্থ গল্পের প্রায় একমাত্র উপাদান,—যে-প্রেমের পক্ষে দেহ কেবল দেউলই নয়,—মন-বুদ্ধি-আত্মার পরিণামী আক্ষেপ অথবা সম্ভোগেরও প্রায় অদ্বিতীয় মাধ্যম; অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য যে অর্থে বুদ্ধদেবকে 'প্রেমের শিল্পী' বলেছেন,—"প্রেম কথাটিকে প্রচলিত ও সীমাবদ্ধ অর্থ থেকে মুক্তি দিয়ে নরনারীর দেহ ও হৃদয় বিনিময়ের ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রসারিত করেই।..."[৪৯]

তাহলেও sex-স্পৃহা বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় স্বভাব,—আর আত্মগুহায়িত স্বভাবে তিনি যথার্থই কবি। তাই প্রেমের চিত্র রচনায় নগ্নতার অঙ্কনে তিনি যেমন নির্ভয়, তেমনি ঝাঁঝহীনও বটে। আবারও অচিন্ত্য-রচনার প্রসঙ্গ মনে পড়ে; সেই 'বেদে'-র সূচনা,

৪৮। তদেব।
৪৯। জগদীশ ভট্টাচার্য (সঃ) 'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠগল্প'—'ভূমিকা'।

—ন-বছর বয়সে ১১ বছরের আহ্লাদিকে ভাললাগার বর্ণনা,—যথাস্থানে যা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে নগ্নতার চেয়ে 'উলঙ্গতা'র প্রতি ঝাঁঝালো আবেশের মদিরা-রসই যেন সমধিক,—যা আবিষ্ট করে, জ্বালাও ধরায়। বুদ্ধদেবের লেখায় ঐ ঝাঁঝ-ভরা জ্বালাকর উজ্জ্বলতা নেই। তাঁর নিজের কথারই প্রতিধ্বনি করে বলা যেতে পারে sexual behaviour-এর বর্ণনা অন্তত তাঁর ছোটগল্পের ক্ষেত্রে উৎকট হতে পারেনি,—'abundant, overflowing poetry'-র সার্থক প্রাচুর্য সম্ভারে।

আর ছোটগল্পের কাব্যধর্মিতার প্রসঙ্গেও এবারে স্মরণ করতে হয়, কবিতার জন্ম লেখনীর মুখে কথার শরীরে নয়,—শিল্পীর আত্মার গহনে;—তাঁর নিভৃত প্রত্যয় বা বাসনার বিগলিত আগ্নেয় অক্ষরের ধারায়। বুদ্ধদেবের অধিকাংশ সার্থক গল্পে সেই কবি-বাসনারই নবজন্ম; তাই সে গল্পগুলি ভাব-সুরভিত—অনতিউচ্চার মানসিকতার ভারে আবিষ্ট। ফলে সে গল্পের বহিরঙ্গে বৈচিত্র্য থাকলেও স্বাদ-স্বভাবে এক গতানুগতিকতা রয়েছে,—কোনো কোনো ক্ষেত্রে যা একঘেয়ে বলেও মনে হতে বাধা নেই। তার কারণ, আগেই বলেছি, আত্মবিচ্ছুরণ না করে বুদ্ধদেব কখনো গল্প জমাট্ করে তুলতে পারেননি। তাঁর কবিচেতনা বহির্জগতের নয়; তাঁর বহির্বিমুখ স্বমুখী মনোধর্ম বাইরের আবহাওয়ায় কেবলই যেন হাঁপাতে থাকে,—বাইরে ছড়িয়ে পড়ার পাসপোর্ট যেন চিরকালের মত হারিয়ে গেছে তার। 'ইন্‌ট্রোভার্ট' শিল্পীর চেতনায় এবং তাঁর রচনাতেও, যেন এক অস্ফুট অসহায়তা পুঞ্জিত হয়ে আছে। 'আমরা তিনজন' গল্পে এই অসহায়তার ম্লানিমা অনতিক্রমণীয় আকার ধরে চোখের সামনে উঠে এসেছে ঃ—

"আমরা তিনজন একসঙ্গে তার প্রেমে পড়েছিলাম; আমি, আর অসিত, আর হিতাংশু; ঢাকায় পুরানো পল্টনে, উনিশ-শো সাতাশে। সেই ঢাকা, সেই পুরানো পল্টন, সেই মেঘ ঢাকা সকাল!

"আমরা তিনজন একসঙ্গে থাকতাম সব সময়—যতটা এবং যতক্ষণ থাকা সম্ভব। রোজ ভোরবেলায় আমার শিয়রের জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে অসিত ডাকতো, 'বিকাশ, বিকা-শ!' আর আমি তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে আসতাম, দেখ্‌তাম অসিত সাইকেলে বসে আছে—এক-পা মাটিতে ঠেকিয়ে—এমন লম্বা ও, কাঁধে হাত রাখতে কনুই ধরে যেতো আমার।…

"বিকেলে দুটি সাইকেলে তিনজনে চড়ে প্রায়ই আমরা শহরে যেতাম,…সাইকেল

চালানোটা আমার জীবনে হলো না,—চেষ্টা করেও শিখতে পারিনি ওটা, কিন্তু ঐ দু-চাকার গাড়িতে চড়েছি অনেক ; কখনো অসিতের, কখনো হিতাংশুর গলগ্রহ হয়ে লম্বা-লম্বা পাড়ি দিয়েছি তাদের পেছনে দাঁড়িয়েই।”

শুধু তাই নয়, তিন বন্ধুর,—ঢাকার পুরানো পল্টনের ত্রি ‘মাস্কেটিয়ার্স’-এর সবচেয়ে ভালোলাগার—সবচেয়ে সুখী হবার দিনও—অর্থাৎ ‘মোনালিসা’র টাইফয়েড-এর সেই ঘন-কালো দুর্যোগে সেবা করবার পরমলগ্নে মনে মনে বিকাশ বলে,—“সাইকেলে আমার দখল নেই বলে বাইরের কাজ আমি কিছুই প্রায় পারি না, সারাদিন ঘুর ঘুর করি তোমার মার কাছে কাছে, হাতের কাছে এগিয়ে দিই সব, ওষুধ ঢালি, টেম্পারেচার লিখি, ডাক্তার এলে তার ব্যাগ হাতে করে নিয়ে আসি, নিয়ে যাই।”

‘মোনালিসা’ ভালো হয়, চেঞ্জে যায়,—বাইরের প্রস্তুতিকে নিখুঁত করে তোলে অসিত, আর তার সঙ্গে হিতাংশু। বৃহৎ কর্মের জগৎকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে জন্মেছে যেন অসিত, হিতাংশুও খুব পেছনে নেই। অথচ বিকাশ সেখানে নিষ্ক্রিয়—অনেকটা নেপথ্য সঙ্গী। ‘মোনালিসা’র বিয়ের দিনে,—এমন কি তার মৃত্যুর শেষ দিনেও তাই!—সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিল ‘মোনালিসা’,—যার পিতৃদত্ত নাম ছিল অন্তরা,—তরু।—“অসিত আর হিতাংশুই সব করলো, রাশি-রাশি ফুল নিয়ে এলো কোথা থেকে ; আরো কত কিছু, বেলা দুটো পর্যন্ত শুধু সাজালো, শুধু সাজালো, তারপর নিয়ে যাবার সময় সকলের আগে রইলো ওরা দুজন। আরো অনেকে এলো কাঁধ দিতে, শুধু আমি বেঁটে বলে বাদ পড়লাম,—পিছন-পিছন হেঁটে চললাম একা একা।”

কিন্তু বিকাশের পক্ষে এর সবটুকুই আক্ষেপ নয়, কারণ তার অক্ষমতার নিভৃত নিবিড় গোপন পথ বেয়েই ‘মোনালিসা’র সান্নিধ্য জীবনের পরম দাক্ষিণ্যের সঞ্চয় পুঞ্জিত করেছিল তার ভাগ্যে,—সেখানে সবচেয়ে অক্ষম হয়েও সবার বেশি সে দিয়েছে,—কারণ সবার বেশি পেয়েও ছিল তো সে-ই। তাই সদ্য-উক্ত আপাত-অক্ষমতার মূলে বিষাদ যদি কিছু জমেও থাকে, তা আনন্দের বৃন্তে অশ্রুর মত,—নির্বোধ যৌবনের উদ্দামতার তল্লীন অবসাদের মত ক্ষীণ—যেন অতীন্দ্রিয়ও।

সাইকেল-এ চড়তে পারেনি,—ছুটে, হাঁপিয়ে ব্যস্ত হতে পারেনি কখনো বিকাশ, কিন্তু ‘মোনালিসা’রা চেঞ্জ-এ চলে গেলে রাঁচির ঠিকানায় চিঠি লিখতে হয়েছিল তাকেই,—তিনজনের জবানিতে,—কারণ সে কবিতা লেখে,—আর কেউ যা পারে না।—

"সুচরিতাসু,

ভেবেছিলাম একখানা চিঠি আসবে, চিঠি এলো না। ভাবতে ভাবতে একুশদিন কেটে গেলো। খুবই ভালো লাগছে বুঝি রাঁচিতে? অবশ্য ভালো লাগলেই ভালো। আমরা তাতেই খুশি। তারা-কুটিরের একতলা বন্ধ, পুরানো পল্টন তাই অন্ধকার। ওখানে পেট্রোম্যাক্স জ্বলতো কি না রোজ সন্ধ্যায়!

বসে বসে রাঁচির ছবি দেখছি আমরা। পাহাড়, জঙ্গল, লাল কাঁকরের রাস্তা, কালো-কালো সাঁওতাল। হাসি, আনন্দ, স্বাস্থ্য। সত্যি, কী বিশ্রী অসুখ গেলো—আর যেন কখনো অসুখ না করে।

কারো কোনো অসুখ না করেও এমন কি হয় না যে আমাদের খুব খাটতে হয়? সত্যি, শুয়ে-বসে আর সময় কাটে না। চিঠি পেলে আবার আমাদের চিঠি লিখতে হবে, কিছু কাজ তবু জমবে।......"

এ-চিঠি 'মোনালিসা'র কাছে পৌঁছেছিল,—আর সে বুঝেও ছিল তিনজনের নামে এ কোন্ একজনের মন দিয়ে লেখা। শুধু কি তাই! তার জীবনের পাত্র ভরে আরো অনেক পেয়েছে বিকাশ,—'মোনালিসা'ও যা জানে নি কোনো দিন।—'মোনালিসা' নামটিও বিকাশেরই আবিষ্কার,—তারই বাসনা-উত্তাল প্রেমানুভবের সৃষ্টি। তাছাড়া সেই ভয়ঙ্কর টাইফয়েড্-এর সময় সারাদিন কাটত তার নানা ফুটফরমাস জুগিয়ে। "তারপর সন্ধ্যা হয়, রাত বাড়ে, বাইরে অন্ধকারের সমুদ্র, সে-সমুদ্রে ক্ষীণ আলোজ্বলা একটি নৌকোয় তুমি আর আমি চলেছি ভেসে, তুমি তা জানলে না, মোনালিসা, কোনোদিন জানবে না।"

তারও পরে,—এক গভীর রাত্রের উপান্তে,—বিকাশ বলে,—"আমি অবাক হয়ে দেখলাম, আস্তে-আস্তে চোখ তোমার খুলে গেলো, মস্ত বড়ো হলো, উন্মাদের মতো ঘুরে-ঘুরে স্থির হল আমার মুখের উপর। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোলো, 'কে?'

আমি তাড়াতাড়ি আইস্ব্যাগ চেপে ধরলাম মাথায়।

'কে তুমি?'

'আমি।'

'তুমি কে?'

'আমি বিকাশ।'

'ও, বিকাশ। বিকাশ, এখন দিন, না রাত্রি?'

'রাত্রি।'

'ভোর হবে না ?'

'হবে। আর দেরি নেই।'

'দেরি নেই ? আমার ঘুম পাচ্ছে বিকাশ।'

আমি তার কপালে আমার বরফে-ঠাণ্ডা হাত রাখলাম।

'আঃ, খুব ভালো লাগছে আমার।'

আমি বললাম, 'ঘুমোও'।

'তুমি চলে যাবে না তো ?'

'না'।

'যাবে না তো ?'

'না'।

'আমি তাহলে ঘুমুই, কেমন ?'

নিশ্বাস উঠলো আমার ভিতর থেকে, নিশ্বাসের স্বরে বললাম— 'ঘুমোও, ঘুমোও, আমি জেগে আছি, কোনো ভয় নেই।'

তুমি ঘুমিয়ে পড়লে, আর বাইরে দু-একটা পাখি ডাক্‌লো। ভোর হলো।

প্রলাপ, জ্বরের প্রলাপ, তবু এটা আমারই থাক্‌, একলা আমার। এই একটা কথা ওদের দুজনকে বলিনি, । তুমি, মোনালিসা, তুমিও জানলে না, জানবে না কোনোদিন।"

এখানেও শেষ হয়নি যৌবনের সেই দুর্মদ প্রাপ্তির। হীরেনবাবু,—'মোনালিসা'র বর—চমৎকার গল্প বলতে পারেন,—গুণের অন্ত নেই তাঁর—তিনজনেই তাঁর চাকর বনে গিয়েছিল 'বিয়ের পরদিন থেকেই'। দশমঙ্গলা পর্যন্ত থেকেই গিয়েছিলেন তিনি। আর দুই-বন্ধু ছট্‌ফট্‌ করে যত, বিকাশ ততই স্থির হয়ে বসে জমিয়ে। তাই না একদিন দুপুরবেলা বিকাশের কাছে খুব মজার গল্প বলতে বলতে হঠাৎ হীরেনবাবুর প্রয়োজন হয় তরুকে ;—আর বিকাশই তাকে ডেকে এনেছিল ঘরে। চুল আঁচড়াচ্ছিল মোনালিসা, তাই প্রথমেই যেতে চায়নি,—পরে অবশ্য চিরুণি ফেলে উঠে এসেছিল। কিন্তু জামাইবাবুর গল্প বলার উৎসাহ ততক্ষণে 'মীইয়ে গেছে'। অবশেষে বিকাশের হাতে একখানি নূতন বই তুলে দিয়ে বলেছিলেন,— "এ-বইটাও ভারি মজার। এক কাজ করো তুমি—এটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে পড়ে ফ্যালো, আমি চট্‌ করে একটু ঘুমিয়ে নিই।" হীরেনবাবু অধীরতার সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। আর বিকাশ বলে,—বেরিয়ে আসতে আসতেই "পিঠ দিয়ে অনুভব করলাম ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।" বিকাশ আর বাড়ি যায়নি, —বারান্দায় যেখানে 'মোনালিসা'

বসে চুল আঁচড়াচ্ছিল সেখানেই বসে পড়ল। চিরুণিটা পড়েই ছিল,—"হাতে তুলে নিয়ে দাঁতগুলির উপর আস্তে আস্তে আঙ্গুল চালাতে" লাগল,—'বারবার, বারবার।'

'মোনালিসা' চলে গেল,—কিন্তু তার অন্তর্ধান-পটে বিকাশের মনের খাতা কবিতায় কবিতায় উঠ্‌ল ভরে,—লেখার খাতা গেল সম্পূর্ণ হয়ে।

আরো পরে, মাতৃত্বসম্ভাবনাময় পূর্ণকুম্ভের ভারসন্নত 'মোনালিসা'র রূপ দেখে বিহ্বল হতে পেরেছিল বয়ঃসন্ধি-তপ্ত এই বিকাশই, আর তার মুখের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি শুনে 'মোনালিসা'র ঘুম পেয়েছিল,—ঘুমিয়ে পড়েছিল বিকাশের চোখের ওপরেই।

সবশেষে মৃত্যুদিনের বিষণ্ণ শোভাযাত্রীদের পেছনে একা একা চলেছিল বটে বিকাশ,— "ঠিক একা একাই নয়, কারণ ততক্ষণে হীরেনবাবু এসে পৌঁচেছেন, গাড়ির কাপড়ে, জুতো-ছাড়া পায়ে তিনিও চললেন আমার পাশে।"

শুধু প্রাপ্তিতেই নয়, বয়ঃসন্ধির যৌবন-উত্তাল ক্ষুধিত প্রেমের দেউলে সর্বশ্রেষ্ঠ দানের অঞ্জলিও বিকাশেরই হাতের রচনা। 'হীরেনবাবু পরের বছর আবার বিয়ে করলেন।' অসিত মারা গেল তিনসুকিয়ায় মাস্টারি করতে গিয়ে। হিতাংশু এম্. এস্-সি. পাস করে জার্মানি গিয়ে আর ফেরেনি,—ওখানকারই এক মেয়েকে বিয়ে করে থেকে গিয়েছিল। কেবল বিকাশ বলে, "আর আমি—আমি এখনো আছি, ঢাকায় নয়, পুরানো পল্টনে নয়, উনিশ শো সাতাশে কি আটাশে নয়, সে-সব আজ মনে হয় স্বপ্নের মতো, কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু হাওয়া—সেই মেঘে ঢাকা সকাল, মেঘ-ডাকা দুপুর, সেই বৃষ্টি, সেই রাত্রি, সেই— তুমি! মোনালিসা আমি ছাড়া আর কে তোমায় মনে রেখেছে!"

এ-গল্প দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের লেখা ১৯৪৬-এর কাছাকাছি। কতদূর 'উনিশ শো সাতাশ আটাশ' তখন! তবু এ-স্বপ্ন নানা কাজের, নানা ব্যস্ততার পক্ষেও নিরর্থক নয়,—সমুচিত যৌন আক্ষিপ্ততা,—D. H. Lawrence বলেছেন,—মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অমূল্য। শুধু কি তাই! 'রজনী হলো উতলা'—১৯২৩-এর লেখা,—আর 'আমরা তিনজন' ১৯৪৬। ২৩ বছরের ব্যবধান, তবু কত সদৃশ,—যৌনতৃষ্ণার সেই দুঃসাহসী অভিসার শরীরের শিরায় শিরায় শিহর জাগিয়ে মনের অগোচর গহন-লোকে যেন স্মৃতির পিরামিড্ গড়ে চলে দুর্মর আকিঞ্চনের সুরভি দিয়ে,—যার অনেকটুকুই অন্তত অতীন্দ্রিয় নয়।

এই দুঃসাহসিকতার প্রসঙ্গে বিতর্ক দেখা দিতে পারে,—লেখকের পক্ষ থেকেও। বয়ঃসন্ধিলগ্ন কিশোরের প্রথম প্রেমানুভবে উত্তপ্ত মাংসল তৃষ্ণাতুরতা যে ভাষায়,—যে বিস্তারের সঙ্গে শিল্পী বর্ণনা করেছেন, সহজভাবে তাকে

গ্রহণ করা সেকালের পাঠকের পক্ষে,—বাঙালির সামাজিক চেতনার পক্ষে প্রত্যাশিত নয় জীবনের ভালবাসার স্বরূপ নির্দেশ করতে Aldous Huxley বলেছেন—"In any given human society, at any given moment, love as we have seen, is the result of the interaction of the unchanging instinctive and physiological material of sex with the local conventions of morality and religion, the local laws, prejudices of ideas."[৫০] —এসব ক্ষেত্রে বিতর্ক ও মতভেদের মূলে রয়েছে প্রথমটির ["instinctive and physiological material of sex"] অ-বিপর্যস্ত চিরন্তনতা,—এবং দেশ-কাল ও পাত্র ভেদে পরোক্তটির ["conventions of morality and religion, the local laws, prejudices of ideals"] ক্রমপরিবর্তনশীলতা। যৌন-বাসনার আক্ষেপ অবিরত চলেছে অজস্র পথে অথচ মূল্য, নীতি ও রুচিবোধ পাল্টে যাচ্ছে,—এমন অবস্থায় এক যুগের বিশ্বাস আর এক যুগের উদ্দামতায় আহত স্তম্ভিত হয়ে পড়েই ; বুদ্ধদেব বসুর বিস্ময় সত্ত্বেও 'রজনী হলো উতলা', এমন কি 'আমরা তিনজন'-এর মত গল্প সম্বন্ধে লেখকের দুঃসাহসিকতা-বোধের স্বীকৃতি কিছু অসম্ভব নয়। সেই সঙ্গে একথাও অনস্বীকার্য যে, শিল্পীর বিস্ময়টুকুও এ-বিষয়ে অকৃত্রিম।—কারণ,—"The new twentieth century conception of love is realistic.······Having contracted the habit of talking freely and more or less scientifically about sexual matters, the young no longer regard love with that feeling of rather guilty excitement and thrilling shame which was for an earlier generation the normal reaction to the subject."[৫১]

এখানেই বুদ্ধদেব বসুর স্বধর্ম। অর্থাৎ, D. H. Lawrence যাকে বলেছেন 'straight forward',—বুদ্ধদেবের sex-চিত্রণ আসলে তাই। সামাজিক চেতনার পক্ষ থেকে আতিশয্য যে নেই এমন কথা বলবার উপায় নেই,—ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এই লেখকের 'এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে' নামক গল্প-গ্রন্থ একদা রুচির দায়ে কেন বাজেয়াপ্ত হয়েছিল,—'সবিতা দেবী', অথবা 'বোন,' এমন কি 'এমিলিয়ার প্রেম'-এর মত গল্প প্রসঙ্গে সেকথা যখন ওঠেনি। উপন্যাসের প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। বস্তুত প্রেম-বর্ণনায় বুদ্ধদেবের sex-ভাবনা প্রায় সর্বত্রই নগ্ন। কিন্তু উলঙ্গতার বিসদৃশতা থেকে অন্তত ছোটগল্পগুলিকে প্রায়ই রক্ষা করেছে তাঁর self-projection। বস্তুত রূপমাত্রই

৫০। 'Huxley, for Fashions in Love'—'Do What you will.'।

৫১। তদেব।

বিসদৃশ,—এমন কি লজ্জাকর ও রুচিহীন হয়ে পড়ে, যখন সে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত থেকে হয় পরিচ্ছিন্ন। সাঁওতাল পরগণার নিভৃত আরণ্য পরিবেশে আ-কুক্ষি নগ্ন যুবককে দেখে লজ্জা, কুণ্ঠা বা বিসদৃশতার অনুভব মাত্রও দেখা দেয় না। অথচ মহানগরীর সুতীক্ষ্ণ উজ্জ্বলতাময় তির্যক্ প্রেক্ষিতে গুল্ফাবরণ উন্মোচিত হলেও যেন রুচিহানির অপরাধে অপরাধী হতে হয়। অথচ ঐ সাঁওতালী উদাহরণের ধারাকে শিল্পের স্পর্শকাতর জন্মভূমিতে আরো উজান বেয়ে টেনে নিতে পারলে মাইকেল এঞ্জেলোর 'আদম'-এর জগতে পৌঁছে যাওয়া যায় অনায়াসে,—অকুণ্ঠভাবে। বিশ্ববন্দিত সেই শিল্পকীর্তি 'Nude'—কিন্তু তাকে 'obscene' বলবার উপায় নেই মোটেও।—এ-ও সম্ভব হয়েছে প্রেক্ষিত রচনায় শিল্পীর অকৈতব চিত্তের অকল্পনীয় দৃঢ়তাবশে।

বুদ্ধদেব মাইকেল এঞ্জেলোর ভক্ত। প্রতিভার সেই দৃঢ়তা অকল্পনীয়,—কিন্তু বুদ্ধদেবের গল্প রচনার একমাত্র গুণ এক অখণ্ড ভাবপরিমণ্ডল রচনার সৌষম্যে। তাঁর চরিত্রগুলি একটিও বাস্তব নয়—অর্থাৎ নিখাদ বস্তু নেই তাতে এমন-কিছু, ভাব এবং কথা ছেঁকে নিলে যা অবশিষ্ট থাকে। নিজের সহজ যৌনবাসনা,—যার কোনো কোনো স্তরে morbidity-ও অনুপস্থিত নেই—এবং তার সঙ্গে নিজের অখণ্ড কবিমনকে একান্তভাবে জড়িয়ে—(যে-মন প্রকাশে এবং প্রকরণে কেবল পরিপাটিই নয়,—পারিপাট্য-বিলাসী,—অর্থাৎ যথার্থ বিলাসী জনের মত নিখুত পারিপাট্যময় সৌন্দর্য সাধনায় অতন্দ্র)—এবং সবার ওপরে নিজের স্ব-নিহিত ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনাকে ছড়িয়ে দিয়ে গল্পগুলো জমাট বেঁধেছে। ফলে কবির রচনাজগৎ বস্তুময় নয়,—বস্তুবিশ্বকে ঘিরে তাঁর মদির কল্পনা আশার ও স্বপ্নের যে দেউল রচনা করেছে,—সেখানেই বুদ্ধদেবের গল্পের জগৎ গড়ে উঠেছে। কবি হিশেবে তিনি রোমান্টিক,—অত্যন্ত স্পর্শকাতর পরিমাণে রুচিমান,—অনেকটা এই কারণেও বহির্জগৎ থেকে তাঁর ব্যক্তি-মন কেবল বিমুখ নয়—প্রতাড়িতও কিনা সেকথাও ভেবে দেখবার মত। ফলে যেখানে দৈন্য, যেখানে পৃথুলতা সেখানে তাঁর চিত্ত-ভাবনা বাধাহত হয়। তাই বিষয়বস্তুর অসুন্দর স্থূলতা, জীবনচিন্তায় দারিদ্র্যের শুষ্কতা বা অশিক্ষা ও রুগ্নতার পীড়াকর চিত্র বুদ্ধদেবকে স্বাভাবিক কারণেই বিমুখ করেছে। 'হতাশা' অথবা 'অসমাপ্ত'-র মত গল্পে সমকালীন অর্থ ও রাজনৈতিক দৈন্যে পূর্ণ জীবনের ছবি আঁকতে গিয়েও বুদ্ধদেব কেবল ততটুকুই সফল হয়েছেন, নিজের রুচিস্মিত সম্পন্ন মনের projection তাতে যতটুকু সফলভাবে সম্ভব হয়েছে। ঐ সব বস্তুসর্বস্ব গল্পলেখার চেষ্টাতেও বুদ্ধদেবের কবি-স্বভাবিত স্ব-চেতনাকে ছেঁকে নিলে যেটুকু থাকে তা বাস্তবের টুক্‌রোও নয়,—শিল্পীর অসফল প্রচেষ্টার জমাট তাল। আসলে বুদ্ধদেবের সফল ছোটগল্পেও নায়ক-নায়িকারা

কেউ-ই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনের অধিবাসী নয়,—বিত্তের হিশেবে তারা সকলেই মধ্যবিত্ত,—কেউ উচ্চ, কেউ মধ্য, কেউ বা নিম্নমধ্য—নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন নয় প্রায় কেউ। আর স্বকুমার মনোধর্মের সম্পদে সকলেই তাঁরা অতি উচ্চবিত্ত। ফলকথা, অতি-রোমান্টিকতায় এলায়িত বালিগঞ্জ-জীবনের যে 'মণীন্দ্রলালী' শিল্পপ্রকরণকে বুদ্ধদেব একদা সচেতনভাবে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন,—নিজের গল্প লেখায় আসলে তারই এক নবরূপ সৃষ্টি করে বসেছেন। তফাৎ কেবল বুদ্ধদেবের নায়ক-নায়িকারা বালিগঞ্জের নয়,—তাঁর মনোলোকের বাসিন্দা, যে-মন স্ব-লীন রোমান্টিক স্বপ্নাবেশে স্পর্শকাতর।

গল্পের সেই পরিমণ্ডলের সঙ্গে কথার ভঙ্গী মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে,—যে সার্বিক সৌষম্যের ফলে কোনো কিছুতেই চমকে যেতে হয় না। একটি চরম দৃষ্টান্ত হিশেবে 'এমিলিয়ার প্রেম' গল্পটির দেহাসঙ্গ বর্ণনার উল্লেখ করা যেতে পারে। গল্পটির প্রথম নাম ছিল 'ওথেলো'। একনিষ্ঠ প্রেমের গহনে নিহিত যৌন অন্ধতা ও তজ্জনিত অসূয়া-বুদ্ধির এক চরম অভিপ্রয়াস অঙ্কিত হয়েছে গল্পটিতে। চিত্রশিল্পী ভাস্কর এবং এককালের 'আগুন' এমিলিয়ার দেহবিলগ্ন অন্ধপ্রেমের ছবি আঁকা হয়েছে। ভাস্কর বারো বছর শিল্পবিত্থার শিক্ষানবিশী করে ফিরেছে য়ুরোপ থেকে। অনেক পুরুষের একামেবাদ্বিতীয় কামনার ধন এমিলিয়া তখন যৌবনের উপান্তলীনা। বয়স তার 'উনতিরিশ'—"মেয়েরা যখন বিবাহিতব্যতার সীমা পেরিয়ে যায়।" সকল-ছাড়া নিঃসঙ্গ দ্বৈততায় সমাচ্ছন্ন তাদের আসঙ্গলিপ্সা দেহের গহনে মর্মান্তিক শিহরণ জাগিয়ে যায় নিভৃত কথায়, ব্যবহারে-সম্ভোগে। কিন্তু ভাস্করের উত্তপ্ত, সদা-উন্মুখ অন্ধ তৃষ্ণা তীব্র হোচট্ খেল একদিন অসহ্য ঈর্ষা আর সন্দেহের উপলখণ্ডে। প্রদোষের সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গেল,—আজও যে এমিলিযাকে 'এমিলি' বলে ডাকতে পারে। অসহ্য,—অসহ্য হয় ভাস্করের। কত লুকোচুরি,—কত কান্না, মিনতি,—যোড় লেগেও লাগে না। অবশেষে তাড়িয়ে দিল এক গভীর রাতে এমিলিকে ভাস্কর। তারপর অবসন্ন, নেশাগ্রস্ত, বিহ্বলের মত ঘুমিয়ে পড়ল,—মৃত্যুর মত ঘুম,—হিংসা, সন্দেহ যেন মার্ফিয়ার কশাঘাত হানে চেতনার গহ্বরে।

গভীর রাতে 'ঘুম ভাঙ্‌লো অন্ধকারে'। এমিলিযা দাঁড়িয়ে আছে মুখের ওপর মুখ রেখে। স্বপ্ন নয়, সত্যি!—

"...'কত ঘুমোবে? ওঠো!' এমিলিয়া হাত রাখলো তার কপালে।

দুই হাত বাড়িয়ে ভাস্কর তাকে টেনে নিল বুকের উপরে।

তারপর অন্ধকার। তারপর স্তব্ধতা। তারপর রক্তের সমুদ্রের বিশ্ব-মুছে-নেয়া বন্যা।”

রক্তের সে উদ্দামতা শান্ত হয়ে গেলে পরম আশ্বস্তিভরা অবসাদ আর প্রেমের একান্ত নিশ্চিন্তি নিয়ে ঘুমে এলিয়ে পড়ে এমিলিয়া ভাস্করের পাশে। কিন্তু ভাস্করের চোখে ঘুম নেই—এই পরমতম প্রাপ্তির লগ্নে চরম অবিশ্বাস, চরম ঈর্ষা অসূয়া সংশয় উন্মত্ত করে তোলে তাকে—“এমিলিয়ার নিঃশ্বাসের ওঠা-পড়ার দিকে তাকিয়ে থাকলো ভাস্কর।···

“ভাস্করের দুই হাত এমিলিয়ার গলার ওপরে নামলো। প্রিয়স্পর্শে হাসি ফুট্‌লো এমিলিয়ার ঘুমন্ত মুখে। এত ভালোবাসা কোন্‌খানে ধরবে? এই শরীরে? না, রক্তমাংস শুধু বাধা দেয়, অসীমকে বাঁধতে চায় এত তার স্পর্ধা! ছিঁড়ুক সেই শৃঙ্খল!

“আস্তে আস্তে, অতি গভীর প্রেমে, ভাস্করের জোরালো আঙুল গভীর হয়ে বসে গেলো, গেলো এমিলিয়ার গলায়। ফুটে উঠ্‌লো নীল শিরা। এতক্ষণে, এতক্ষণে পরিপূর্ণতা।”

জীবনের গোপন ও গ্লানিকর প্রবৃত্তিকে প্রকাশ্য নগ্নতায় অনাবৃত করার নৈতিক অভিযোগে বুদ্ধদেব এখানে চরম অভিযুক্ত হতে পারেন,—হয়েছেন-ও তাই। এ-বিষয়ে শিল্পীর সম্ভাব্য মনোভাবনার পরিচয় পূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু তা ছেড়ে দিলেও, যৌন প্রবৃত্তি ও অসূয়াবৃত্তির গোপনীয়তার প্রয়োজন স্বীকার করে নিলেও, একথা অস্বীকার করবার উপায় থাকে না যে, গল্পটির সর্বাঙ্গ ঘিরে কাব্যিক পরিমণ্ডলের এক অখণ্ড সৌরভ ছড়িয়ে আছে,—নগ্নতাকে যা উগ্র, বিভীষণকে প্রত্যক্ষভাবে বীভৎস হয়ে উঠ্‌তে দেয়নি। এই কাব্যিকতা কেবল ভাষা বা বাচনভঙ্গির নয়—সমগ্র শৈলীর,—যার পেছনে বুদ্ধদেব তাঁর রোমান্টিকতা-পিপাসু কবিমনকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেছেন। সদ্য-উদ্ধৃত অংশটির শেষ অনুচ্ছেদ কত ভয়াবহ,—কত বীভৎস হতে পারত! কিন্তু সেই দুর্ঘটনার মধ্য থেকে শিল্পী যেন সমস্ত বাস্তব প্রখরতাকে ছেঁকে নিয়ে রেখে গেছেন এক অর্ধসত্য, অর্ধস্বপ্নিল কবিতাস্বাদনের স্পন্দিত অনুভব। এইটুকুই বুদ্ধদেব বসুর সকল সার্থক গল্পের প্রাণ,—কথা-বস্তু নয়,—কবিতার সন্তর্পণ অনুভব। তাই শিল্পী নিজেও বলেন,—“এমন গল্প আমি কমই লিখেছি যার গল্পাংশ মুখে বলে দেয়া যায়।”[৫২]

এই কবিতাধর্মের সবটুকুই কেবল দেহালিঙ্গিত নয়,—নির্বস্তুক ভাবলিপ্সুতার

৫২। দ্র. জ্যোতিপ্রকাশ বসু (সং)—‘গল্প লেখার গল্প’।

প্রভাবও রয়েছে তাতে। আর এই বিশেষ ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর পক্ষে প্রত্যক্ষ রবীন্দ্র-বিরোধিতার প্রবল প্রয়াস সত্ত্বেও রবীন্দ্র-প্রভাব অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছে। তাঁর 'প্রথম ও শেষ' গল্পের নায়িকা লীনা অভিন্নহৃদয় বন্ধু নীনাকে এক চিঠিতে লিখেছিল,—"রবীন্দ্রনাথ একেবারে আমাদের মাথা খেয়েছেন—নারে ?" আলোচ্য গল্পের পরিণামে অবশ্য রবীন্দ্রভাবনাশ্রিত প্রেমের আনন্ত্য এবং অনির্বচনীয়তাবোধের প্রতি এক বঙ্কিম কটাক্ষই প্রকট হয়ে উঠেছে,—জীবনের অনাহূত-হয়েও-অনিবার্য সেই অতিথির,—বিধাতার অমোঘতার মতই লীনার মনের রুদ্ধদ্বার খুলতেই যার রোমান্টিক প্রীতিহ্য সুরভিত প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের আবির্ভাব,—তার আকস্মিক মৃত্যুর পর বৈরাগ্য যাপন উদ্দেশ্য জলপাইগুড়ির বালিকা স্কুলের শিক্ষকতায় স্বেচ্ছানির্বাসিতা লীনার বৎসর শেষ না-হতে-হতেই এক উকিলের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার বর্ণনায়। তাহলেও বস্তুময় স্থূল লালসাভরা জীবনকে ধরতে গিয়েও, যাঁর ভীরু অঞ্জলি বারে বারে কম্পিত, বিশীর্ণ হয়েছে,—দেহের দেহলিতে মনের নির্বস্তুক লিপ্সাকে নিয়ে যিনি আত্মচারণ করেছেন,—সেই রোমান্টিক শিল্পীর বিশ্বাসে-বিষয়ে রাবীন্দ্রিকতা না থাকুক,—গল্পের পরিবেশ ও কাব্যময় বিন্যাসে পরোক্ষ রবীন্দ্র-প্রভাব রয়েছে বৈ কী? আর বিষয়েই বা নয় কেন! 'অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প'র ভূমিকায় শিল্পী নিজেই স্বীকার করেছেন,—'পুরাণের পুনর্জন্ম' গল্পে উর্মিলা-প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যের উপেক্ষিতা'রই প্রভাব-জাত। স্পষ্ট করে লক্ষ্য করা উচিত,—উর্মিলার অবতারণাতেও বুদ্ধদেব স্বতন্ত্র, এবং নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রানুসারী নন, বরং রবীন্দ্রেতর-ই। তাহলেও গল্পে ব্যক্তিত্ব-সচেতন রোমান্টিক প্রাণধর্মের সংযোজন-দক্ষতায় বিশ্ববিজয়ী কবিগুরুর হৃদয়ের স্পর্শ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে এই শিল্পী অনুভব করেছেন বৈ কী,—নিতান্ত স্থূল জীবন-বাসনাকে রোমান্টিকতা-পরিস্রুত করার স্ব-গত প্রয়াসের মধ্যে!

এই একই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়, বুদ্ধদেব বসুর sex-ভাবনার সবটুকুই সম্ভোগ-প্রমত্ত, অন্ধকামাতুরতাময় নয়। নিজের যুগ এবং নিজেদের ('কল্লোল') গোষ্ঠী সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন,—"We demanded a free atmosphere, a greater eclecticism in diction and form, including verse technique; we praised, unlike Wordsworth, what man has made of man, that is himself, claiming that man is noble in his unremitting struggle with the brute nature within him, not because he wins, for he may not, but simply because he struggles."[৫৩] এই উক্তির প্রথমাংশের

৫৩। B. Bose—'An Acre of Green Grass.'

সত্যতা অনুভব করা গেছে এ-পর্যন্ত উদ্ধৃত ও আলোচিত গল্পাংশের বন্যাস ও রূপ-প্রকরণের পরিচিতি থেকে। সব শেষে এমন গল্পও কিছু কিছু রয়েছে বুদ্ধদেবের রচনায়,—যেখানে নিজের মধ্যেকার পশুর সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত, অবলুপ্তপ্রায় মানুষের হঠাৎ-আত্মআবিষ্কার করুণ-বিষণ্ণ বেহাগের সুরে আচ্ছন্ন করে তোলে ভাবনাকে। এমনি একটি করুণামন্থর মধুর গল্পের নাম 'চোর! চোর!'

অনেক রাত্রে ঘরের লোকজন সব চলে গেলে অঘোরে অবসন্ন চেতনায় নিজের বিছানায় পড়ে ঘুমোচ্ছিল ললিতা। সব ঘরই নিস্তব্ধ এখন,—যে-যার 'ফূর্তি' লুটে চলে গেছে। অনেক গয়না, অনেক শাড়ি—বহুমূল্য সম্পদ রয়েছে ললিতার ঘরে বাক্সবন্দী;—ব্যাঙ্কে তার অঢেল টাকা,—শাঁশালো উমেদাররাই তার খদ্দের!

গভীর ঘুমের মধ্যে অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে যায় ললিতার,—হঠাৎ দেখতে পায় ঘরের মাঝখানে মুখোশপরা কে-একজন দাঁড়িয়ে আছে, হাতে তার পিস্তল! ভয়ে চীৎকার করে না, ললিতা মন্ত্রচালিতের মত বার করে দেয় চাবির গোছা! তারপর লোকটি একের পর এক দেরাজ টেনে বার করে অঢেল গয়নার বোঝা,—

—যা কেবল বহুমূল্যই নয়,—রূপে এবং উজ্জ্বলতায়ও চিত্ত-চমৎকারী। শাড়িরও বা কত বৈচিত্র্য আর বহুমূল্যতা। বিস্মিত হয় লোকটি। কিন্তু রূপবিলাসিনীর সম্পদ! মৃত্যুর মুখেও হারাতে ইচ্ছে করে না। তাই যথাসম্ভব শেষরক্ষার চেষ্টা করে প্রাণপণে, মরণ কামড় দেবার মত করে। নানা ছলাকলায়, রূপের মোহ ও দেহের মাদকতা বিস্তার করে ভোলাতে চায় আগন্তুককে,—কিন্তু সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়। তবু ললিতার স্নিগ্ধ সুন্দর কথোপকথনে কখন সে অজান্তেই যোগ দেয়। আর তারই সূত্র ধরে চরমলগ্নে মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে আসে,—'একি সত্যিকার পিস্তল!'

এবার ললিতার শোধ নেবার পালা। মুখ থেকে মুখোস খসে গেছে,—হাত থেকে নকল পিস্তল। সেই হাত-জোড়াটি পেছন দিকে টেনে দড়ি দিয়ে জোরে বেঁধেছে ললিতা। ঐটুকু ছেলে,—অর্থাৎ নবোদিত যৌবনেও পরিপূর্ণ পুরুষ নয়! উঠে এসেছিল পাইপ বেয়ে। পরিবারের বড় ছেলে, মা-ভাই-বোন থাকে গাঁয়ে। খাবার কি জোটে! চাকরিই বা কোথায়! তাই এসেছিল!

ললিতা হাত খুলে দেয়,—পাইপ বেয়ে নেমে যেতে বলে। কিন্তু কী ভয় তার,—যেখান দিয়ে উঠেছে—সেই পথে নেমে যেতে! কিসের শক্তিতে উঠে এসেছিল,—তা সেই কি জানে এখন!—মিনতি করে সে ললিতাকে সিঁড়ির পথটি দেখিয়ে দিতে। কথা-কাটাকাটি চলে দুজনের মধ্যে। ললিতা বলে 'চোর!'—ছেলেটি ভাবে,—'আমি চোর কেন হব!'

জোর কথোপকথনের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় এজমালি পরিচারিকা বিন্দির। দরজায় ঘা দিয়ে সে জিজ্ঞেস করে।—'কোথায় চোর দিদিমণি ?' দিদিমণি ততক্ষণে চোরকে খাটের তলায় লুকিয়ে ফেলেছে ;—বেমালুম অস্বীকার করে, তার ঘরে কোনো কথাই কেউ বলেনি ! কি সব বাজে স্বপ্ন দেখে বিন্দি এসে ডেকে তুলেছে,—ক্লান্ত হয়ে যখন ঘুমোচ্ছিল,—বেচারি !

বিন্দি ফিরে যায়, চোর বেরিয়ে আসে আবার,—আবার কথোপকথন চলে। সবচেয়ে দরকারি কথাটা যেন হঠাৎ-ই মনে পড়ে যায় ললিতার,—'নামটা ত তখনো জিজ্ঞেস করা হয়নি।'

ছেলেটি নাম বলে, 'কমল'।

"বাঃ বেশ নাম, কমল। কমল, কমল, কমল। ললিতা দু-একবার নিজের মনে পুনরাবৃত্তি করলে।

'ডাকছো কেন ?'

ললিতা ছেলেটির এলোমেলো চুলগুলিতে একবার হাত বুলিয়ে আস্তে বললে, 'কমল।'

'উঃ কি শক্ত করেই বেঁধেছিলে হাত ; এখনো টনটন করছে।'

'খুব লেগেছিলো, না ? দাও আমি রগড়ে দিচ্ছি, সেরে যাবে। না, না, এম্নি সুবিধে হবে না। তুমি শোও তো।'

কমল দ্বিরুক্তি না করে বালিশের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। ললিতা হাতটি নিজের হাতে নিয়ে কব্জি থেকে আরম্ভ করে আস্তে আস্তে রগড়ে দিতে লাগলো।

'আঃ', গভীর আরামে কমল চোখে বুজলো। তার মুখ সদ্যমৃত লোকের মতো প্রশান্ত, নিরুদ্বেগ। সেই মুখের দিকে ললিতা তাকিয়ে রইলো—মুগ্ধ দৃষ্টিতে। হঠাৎ তার মনে হলো বিছানায় যেন শুয়ে আছে নিজে। আর পাশে বসে আছে তার মা—সারা রাত সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে,—'মাগো আর পারিনে, মরে গেলাম ; উঃ, মা, মাগো !' তারপর ভোরের দিকে নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তবু ঘুমের মধ্যে টের পেয়েছে, মার হাত তার কপালে মুখে, চোখে·· সেই তাদের পাড়াগাঁ'র বাড়ি, খিড়কির পুকুর, উঠোনে ব্রতের আলপনা, মাঘের শীতে রাত থাকতে নাইতে যাওয়া, মাঘমণ্ডলের গান, 'ওঠো ওঠো সূয্যি ঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়ে'—মাগো ! ললিতার সারা গা হঠাৎ কাঁটা দিয়ে উঠলো, তার চোখ উঠলো ছলছলিয়ে।

"ঘুমের মধ্যে কমল পাশ ফিরলো।"

এই গল্প-শেষ-এর মধ্যেই ত রয়েছে আসল গল্প,—আর সে গল্পকে সত্যিই মুখে

মুখে বলা চলে না,—কারণ এর গল্পাংশ আর শিল্পাংশ ব্যক্তি-কবির প্রাণসুরভিতে ভরা। তাই বলছিলাম,—বুদ্ধদেব বসুর গল্প আসলে তাঁর self-projection.

গল্পের শরীরেও কবি-ভাবনার এই স্বীকৃতি দুর্লভ নয়। 'লুসিললিতা' একটি কবিতা-সৌগন্ধ-মদির সুন্দর গল্প,—অর্থাৎ বুদ্ধদেব বসুর গল্পায়নের এক সুন্দরতর নিদর্শন।

এক শীতের ভোরে অতৃপ্ত ঘুম থেকে জাগিয়ে সুনীলকে নিয়ে সারাদিন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল লুসিললিতা,—বলা চলে, ঘোর-পাকই খাওয়াচ্ছিল তাকে। রাত তিনটে অবধি ঘুম ছিল না রক্ত-প্রতপ্ত চোখে-মুখে সুনীলের,—নূতন ছবির সৃজন-পীড়া তার আত্মাকে মথিত করেছিল। ভোরের শীতার্ত হাওয়ায় ঘুম জড়িয়ে এসেছিল বুঝি,—আর অমনি টেলিফোনে নিরবধি আহ্বানের আকর্ষণ বাজিয়ে তুলেছে 'লুসিললিতা'। যেমন ছিল তেমনি ছুটে গেছে সুনীল, শীতের সকালে চাদরটি নিতেও ভুলেছে,—অপরিহার্য 'প্রাত-চা'র প্রত্যাশাও রাখেনি,—এমনকি পকেটে পয়সা নিতে এবং পায়ের চটি পালটাবার কথাও মনে ছিল না। তবু সারাদিন লুসিললিতা পায়ে পায়ে হাঁটিয়েছে,—তার ইচ্ছার দাস করে। কারণ সুনীল হাঁটতে ভালবাসে না, চপ্পল পরে হাঁটতে পারে না,—আর লুসিললিতার তৃপ্তি পদাভিসারে, পায়ে পায়ে হেঁটে চলায়। চলেছে আর মনে মনে ভেবেছে সুনীল,—"তোমার মনে আছে, লুসিললিতা, আমি যে চিত্রকর হলাম তার কারণ তুমি, আর বতিচেলি—আর বতিচেলির 'জীবননৃত্য' ছবি?"

কবে সেই চাটগাঁয়ে পাশাপাশি বাড়িতে আবাল্য খেলার সাথী ছিল দুজনে,—খেলতে খেলতে বয়স বেড়েছে,—কিন্তু জীবনের খেলায় গেছে গ্রন্থি পাকিয়ে। সুনীল এম.এ. ফেল, আর লুসিললিতা এম্. এ.,—সাহিত্য-রসমদির। তবু জীবনের জোড় কখনো ভেঙে যায়নি, সুনীলকে আশ্চর্য শিল্পী করেছে লুসিললিতা আর বতিচেলি, আর বতিচেলির জীবননৃত্য ছবি! সে-এক গল্প; 'লুসি ললিতা' গল্পের ভেতরে তা আছে। আপাতত তা প্রাসঙ্গিক নয়।

অনেকদিন তারা কলকাতা এসেছে, আর সেইদিন,—সারাদিন পথে পথে ঘুরিয়েছে লুসিললিতা সুনীলকে, কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো বাসে, কখনো পথে, কখনো বা রেঁস্তোরায়। তারপরে পড়ন্তরোদের বেলায় এসে বসেছে সুনীলের তিনতলার ঘরে—যে স্টুডিয়োয় বসে আশ্চর্য ছবি আঁকে সুনীল। সেকথাই বলছিল লুসিললিতা:

"সুনীল, তুমি আমাকে যথেষ্ট ভালোবাসো নি, কিন্তু সে তোমার দোষ নয়। এর বেশি ভালোবাসার ক্ষমতা তোমার ছিল না। তুমি আর্টিস্ট; তোমার চোখে

মিকায়েলেঞ্জেলোর মতো লালচে ছিঁটে, কোনো একদিন তুমি গগনেন্দ্রনাথের তুল্য শিল্পী হবে। কিন্তু সেজন্য তোমাকে অনেক দাম দিতে হবে। সুনীল, এখন থেকেই দিতে হচ্ছে। তোমার সেই সবহারাবার যজ্ঞে উৎসর্গ করলে আমাকে।"

তাই অতদিনের পরে,—আজ সারাদিনেরও পরে সন্ধ্যা হবার আগেই চিরদিনের মত চলে যাবে লুসিললিতা,—কোথায় কার কাছে,—সে কথাও বলবে না, কারণ তাতে লাভ কী সুনীলের!

তবু কোনো আক্ষেপ নেই।

গল্পের শেষে "সুনীল বললো: কিন্তু আমি তো তোমাকে হারাতে পারি লুসিললিতা, আমি আছি—এই আমার মধ্যেই তুমি আছো।"

বুদ্ধদেবের গল্প সম্বন্ধে এখানেই শেষ কথা। মিকায়েলেঞ্জেলোর মত লালচে ছিঁটে তাঁর চোখে আছে কী? আর গগনেন্দ্রনাথের তুল্য শিল্পী তিনি হন নি, সে কথাই ওঠে না। তবু তিনি আর্টিস্ট, মিকায়েলেঞ্জেলোর সৃষ্টির মদির-দার্ঢ্যে যিনি তাঁর রোমান্টিক মনকে ডুবিয়েছেন, ডি. এইচ. লরেন্স, আর তরুণ আল্ডাস হাক্সলী-র অনুসরণে sex-ভাবনায় নিমগ্নমানস কবি তিনি, আর তাঁর কবি-মানসী সেই আক্ষেপেরই এক বিচিত্রদল কমলিনী,—গল্পে নেই, স্থূল শরীরেও কোথাও না। তাঁর গল্পসাধনার সর্বশেষ ফলপরিণাম,—নিজের স্ব-গত ভাববিলাসিতা নিয়ে তিনি আছেন, আর তাঁরই মধ্যে আছে তাঁর 'বিলাসী'[৫৪] মনের কামনা-মূর্তি,—সকল সার্থক গল্পের যা প্রাণ।

এককালে প্রায় অসংখ্য গল্প লিখেছিলেন বুদ্ধদেব; সকল সার্থক রচনার মূলগত কুঞ্চিকা অভিন্ন হলেও রূপের প্রকরণে সচেতন বৈচিত্র্য-বিলাসের পরিচয় আছে। কোথাও পত্র-প্রধান, কোথাও সুরের মত সংলাপ, কোথাও কথা, বিবৃতি, মনস্তত্ত্ব,—অর্থাৎ মনের অবচেতনায় ডুব দেবার স্ব-মুখী প্রয়াস। সর্বত্রই, অর্থাৎ সকল সফল রচনাতেই, (বুদ্ধদেবের অধিকাংশ গল্পকেই যথার্থ ভাবে ছোটগল্প অভিধায় গ্রহণ করা কঠিন) আছে একটানা কবিতার আবহ,—যাতে সুরের রেশও কম নেই।

শিল্পী নিজে বলেছেন "এমন গল্প কিছু কিছু লিখেছি যাকে গল্পাকারে প্রবন্ধ বললে দোষ হয় না।"[৫৫] সে-তাঁর অসার্থক গল্প,—'প্রশ্ন' তাদের মধ্যে একটি। ধনি-নির্ধনের বৈষম্য নিয়ে সেকালের পক্ষে গতানুগতিক সাম্যবাদী সংস্কারের চর্বিত চর্বণ,

৫৪। 'বিলাস,– বিলাসিতা-ই দোষ কী'?—এ প্রশ্ন করছেন বুদ্ধদেব নিজেই। আর কল্পনা ও সৃষ্টির প্রকরণের বিচারে 'বিলাসী' বিশেষণই তাঁর শিল্পি-চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়বহ।

৫৫। দ্রঃ জ্যোতিপ্রকাশ বসু (সঃ) 'গল্প লেখার গল্প'।

—প্রাণহীন, কারণ বুদ্ধদেবের এক এবং অদ্বিতীয় ভাব-পরিমণ্ডলের পক্ষে তা স্বধর্মবিরোধী।

গল্পের মত গল্পের বইও এককালে প্রচুর প্রকাশিত হত, বছরে প্রায় একটি। কখনো তার চেয়েও বেশি। এদের মধ্যে আছে :

'অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩০)। 'রেখাচিত্র ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩১), 'এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে'' (১৯৩২), 'অদৃশ্য শত্রু' (১৯৩৩), 'মিসেস গুপ্ত' (১৯৩৪), 'প্রেমের বিচিত্রগতি' (১৯৩৪), 'শ্বেতপত্র' (১৯৩৪), 'অসামান্য মেয়ে' (১৯৩৫), 'ঘরেতে ভ্রমর এল' (১৯৩৫), 'নতুন নেশা' (১৯৩৬), 'ফেরিওলা ও অন্যান্য গল্প' (১৯৪১), 'খাতার শেষ পাতা' (১৯৪৩) প্রভৃতি। তাছাড়াও আছে বিভিন্ন সময়ে শিল্পীর সংকলিত কয়েকটি গল্প-সংগ্রহ।

(৪) জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬—১৯৫৭)

'কল্লোল যুগ'-এর প্রসঙ্গে জগদীশ গুপ্তের পরিচয় দিয়ে অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন,—"বয়সে কিছু বড় কিন্তু বোধে সমান তপ্তোজ্জ্বল। তাঁরও যেটা দোষ সেটাও ঐ তারুণ্যের দায়—হয়তো বা প্রগাঢ় প্রৌঢ়তার।" এই উক্তির তাৎপর্য বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য। বয়সে অগ্রণী হলেও গল্প-শিল্পী জগদীশ গুপ্তের যথার্থ আবির্ভাব ও মুখ্য প্রকাশের কাল 'কল্লোল'-'কালিকলমে'র সমকালে। ডঃ সুকুমার সেন জানিয়েছেন, তাঁর প্রথম মৌলিক গল্প প্রকাশিত হয়েছিল 'বিজলী'-র পৃষ্ঠায়,—১৩৩১ বাংলা সালে। ১৩৩৩ সালের 'কালিকলমে' একের পর এক,—নয়টি গল্পের প্রকাশ ঘটেছিল। আর 'কল্লোল'-সমকালীন শিল্পীদের মত পুরাতনের প্রতি কেবল অবিশ্বাসই নয়,—প্রাচীন বিশ্বাসের আমূল ভিতটিকে পর্যন্ত গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিচূর্ণ করে দেবার এক দুর্দম স্পৃহা নিয়েই যেন আবির্ভূত হয়েছিলেন গল্প-শিল্পী জগদীশ গুপ্ত। তাহলেও 'কল্লোল', 'কালিকলমে'র তরুণ লেখকদের সঙ্গে রচনার পার্থক্যও তাঁর কিছু কম ছিল না,—আসলে সে ছিল অপরিণত যৌবনের দিশাহারা চঞ্চলতার সঙ্গে স্থিতধী প্রৌঢ়ত্বের পার্থক্য ; স্বভাবগত দূরত্বও তাতে খুব কম ছিল না।

অনেক সিদ্ধকাম বাংলা গল্প-শিল্পীর মত জগদীশ গুপ্তের সৃজনী-প্রতিভাও কবিতার প্রবাহে প্রথম অভিব্যক্তি পেয়েছিল। একান্ত অল্প বয়সে স্কুলে পড়বার সময় থেকেই তিনি গোপনে কবিতা লিখতেন—মাত্র ১৫।১৬ বছর যখন বয়স, তখনই অভিভাবকদের কাছে ধরা পড়ে গেল যে সে-সব কবিতা 'কুঅভিলাষ'পূর্ণ। ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের অনুকরণে জগদীশ গুপ্ত কবিতা লিখতেন, "অর্থাৎ অভ্রান্ত নারীতৃষ্ণার

ক্লেশাকুতিতে সেই কবিতাগুলির আদ্যন্ত ভরপূর ছিল।"[৫৬] এই 'অপকর্মের' জন্য অপরিণতমনস্ক লেখককে কঠিন শাসনের অধীন হয়ে থাকতে হয়েছিল। তাহলেও কবিতার প্রতি অনুরাগ তাঁর অবদমিত হয়ে যায়নি কোনোদিন। 'অক্ষরা' নামে একখানি কবিতা-সংকলনও তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

কিন্তু পরিণত বয়সে গল্প যখন লিখলেন, তখন স্পষ্টই দেখা গেল,—"তিনি Philosophy of sex বা কামতত্ত্বের বিশেষ ধার ধারেন না"[৫৭] অথচ এপর্যন্ত আলোচিত তরুণ 'কল্লোল'-শিল্পীদের ক্ষেত্রে দেখেছি যৌন আক্ষেপ যেন স্থষ্টির এক অনিবার্য প্রেরণা রূপেই অনাবৃত প্রকাশ লাভ করেছে। যৌনতার প্রসঙ্গে জগদীশ গুপ্তের কোনো কুণ্ঠা নেই অথচ সেবিষয়ে কোনো বিশেষ ঔৎসুক্যও অন্তত তাঁর ছোটগল্পের জগতে অতিশয় ছায়া সম্পাত করতে পারে নি। অন্য পক্ষে পুরাতনকে অবিশ্বাস, অস্বীকার, এমন কি লঘুভাবে উপেক্ষা করতে পারাতেই যেন এঁদের সকলেরই এক অহেতুক উল্লাস। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প-স্থষ্টির মূলে সুন্দরের জন্য উৎকণ্ঠা আছে,—কিন্তু অসুন্দরের অস্তিত্ব সম্পর্কে এক আগ্রহান্বিত সচেতনতাই যেন সেখানেও মুখ্য সুর। জগদীশ গুপ্ত অবিশ্বাসী ;—তাহলেও বিশ্বাসহীন নন তিনি। অর্থাৎ সৌন্দর্য, কল্যাণ ও সত্য সম্পর্কে মানুষের যুগ-যুগ-প্রচলিত নীতি-চেতনার প্রতি এক মৌলিক অবিশ্বাসে জগদীশ গুপ্ত একান্ত বিমুখ। এই বিমুখতা তাঁর দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। ফলে জীবন-সম্পর্কিত সকল নীতি-বোধ ও কল্যাণমূলক মূল্যমানকে কেবল অস্বীকার করেই তিনি তৃপ্ত নন,—বিশ্ব-প্রবাহের মূলে এক অমোঘ শক্তির অস্তিত্ব তিনি অনুভব করেছেন, যা একান্তরূপে বিনাশক,—ক্রূর এবং কদর্য। এই মনোভাবের গভীরে বিশ্বাস ও চিন্তার যে অনুক্রম রয়েছে, তার দার্শনিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক অনিলবরণ রায় একদা লিখেছিলেন,—"তিনি (জগদীশ গুপ্ত) দেখিতেছেন, ভগবান, ধর্ম, নৈতিকতা এসবই যে মিথ্যা শুধু তাহাই নহে, এ সংসারের যে বিধাতা সে এক নির্মম ক্রূরহৃদয় শয়তান।··· তিনি সর্বত্র দেখিতেছেন শুধু শয়তানী এবং তাঁহার এই অনুভূতি তাঁহার মধ্যে যে রসের স্থষ্টি করিতেছে তাহারই ভিয়ান করিয়া তিনি তাঁহার ছোটগল্পগুলিকে রচনা করিতেছেন।[৫৮] তাই সেইগুলি হইয়া উঠিতেছে 'রূপে রসে অদ্বিতীয়'।"[৫৯] বিশ্বশক্তির এই শয়তানী স্বভাবেই তাঁর অন্ধ বিশ্বাস।

৫৬। দ্রষ্টব্য :—'জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী'—[বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত।]

৫৭। অনিলবরণ রায়—'আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ' ('বিচিত্রা' ভাদ্র, ১৩৩৬ বাংলা সাল)

৫৮। এই আলোচনার প্রকাশকাল জগদীশ গুপ্তের প্রথম গল্প-সংকলন 'বিনোদিনী'-র প্রকাশের পরেই। শিল্পীর লেখনী তখন অজস্র-মুখর।

৫৯। তদেব।

বিশ্বের নীতি ও নিয়ন্তা সম্বন্ধে এই অন্ধ অবিশ্বাস ও বিদ্বেষকে আলোচ্য সমালোচক স্বাভাবিক কারণেই সন্তোষের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু ভাল বা মন্দ, তথা কল্যাণকর অথবা বিভীষিকাময় আবেদন-পরিণামের ওপরে যথার্থ সৃষ্টির উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ একান্তভাবে নির্ভর করে না। আসলে সকল সার্থক সৃষ্টিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিল্পীর আত্মরচনা। ফলে আত্মবোধ এবং আত্ম-আবিষ্কারের সততার গভীরেই নিহিত রয়েছে রসোত্তীর্ণ সৃজন-ভাবনার উৎস। আর জগদীশ গুপ্তের অনন্য বৈশিষ্ট্য বিশ্ব-নিয়মের অমোঘ-বিভীষণ পরিণাম সম্পর্কে তাঁর আত্মিক বিশ্বাসের অবিচল দৃঢ়তায়। এত দৃঢ়তার সঙ্গে বিধাতাকে ঘৃণা করতে পেরেছেন বাংলা সাহিত্যের খুব কম গাল্পিকই। হয়ত এই কারণেই প্রথম গল্প-সংকলন 'বিনোদিনী' প্রকাশের পরেই রবীন্দ্রনাথ জগদীশ গুপ্তকে সম্বর্ধিত করে চিঠি লিখেছেন,—"ছোটগল্পের বিশেষ রূপ ও রস তোমার লেখায় পরিস্ফুট দেখিয়া সুখী হইলাম।"[৬০]

সাহিত্যের জগতে রূপের বিশিষ্টতা সর্বত্রই ভাবের প্রসঙ্গে। ছোটগল্পের রূপ-প্রকরণে বৈচিত্র্য ও বিস্তারের সম্ভাবনা অপার, সে-কথা যথাস্থানে লক্ষ্য করেছি। বুদ্ধদেব বসু তো ছোটগল্পের শরীরকে চিহ্নিত করেছেন 'সাহিত্য তীর্থযাত্রার হোল্ডল' বলে। কারণ, "তার মধ্যে নাটক, প্রবন্ধ, উপদেশ, বিদ্রূপ, সাময়িক টিপ্পনি, সবই কিছু কিছু মাত্রায় বেশ মানানসই করে ঢুকিয়ে দেয়া যায়। এমন কি কবিতাও ঢোকানো যায়,—কবিতা না হোক্, কবিত্ব।"[৬১] এমন অবস্থায় স্পষ্ট-সুরেখ অবয়ব-বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত ছোটগল্প রচনা প্রায়ই দুষ্কর হয়,—দুষ্কর হয় মুখ্যত তীব্র প্রয়োজন-বোধের অভাবেই। অর্থাৎ, ছোটগল্পের দেহে নাটক, প্রবন্ধ, টিপ্পনী বর্ণনা, কবিত্ব ইত্যাদি যে-কোনো উপাদান যেমন সহজে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া যায়, তেমনি একই গল্পের এক অঙ্গে এই বিচিত্র রূপ-প্রকরণের অঙ্গরাগ বিভিন্ন মাত্রায় সংযুক্ত করে দিতেও বাধা নেই। ফলে, কি পরিধি, কি প্রকরণে, একটি আঁট-সাট পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্প সর্বত্রই খুব অনায়াস-লভ্য নয়। জগদীশ গুপ্তের গল্পে এই দুর্লভকে আবিষ্কার করতে পারার তৃপ্তি ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথও তাই তাঁর প্রশংসা-বাণীতে রূপের প্রসঙ্গই উল্লেখ করেছেন প্রথমেই। এমন কি অধ্যাপক অনিলবরণ রায়,—জগদীশ গুপ্তের গল্পরচনার সমাজ-অহিতকর নিন্দনীয় ফলশ্রুতি নির্দেশ করতেই যাঁর প্রবন্ধ,—তিনিও অস্বীকার করতে পারেন না, "কি বলা হইতেছে হিসাব না করিয়া কেমন করিয়া বলা হইতেছে,

৬০। দ্রষ্টব্য—তদেব। ৬১। দ্র. জ্যোতিপ্রকাশ বসু (সং)—'গল্প লেখার গল্প'।

তাহাই যদি আর্টের মাপকাঠি হয়, তাহা হইলে এই 'দিবসের শেষে'[৬২] গল্পটি একটি নিখুঁত সৃষ্টি, a perfect piece of art."[৬৩]

এ-শৈলীকে কঠিন পাথরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে,—নিভাঁজ, জমাট শক্ত এক কালো পাথর, প্রচণ্ড আঘাতেও যা ভাঙে না, দুমড়ায় না,—আর দুর্মর দৃঢ়-সংবদ্ধ এই রূপ জগদীশ গুপ্তের আত্মিক বিশ্বাসের ঘন কাঠিন্যকে তিল তিল আত্মস্থ করেই গড়ে উঠতে পেরেছে। বিশ্ব-নিয়তির বিভীষিকাময় পরিচয় ও পরিণাম সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাস তাঁর পক্ষে একান্ত অভ্রান্ত,—প্রায় নিজের অস্তিত্বের মতই। এর বিরুদ্ধে শিল্পীর অনুচ্ছ্বসিত কঠিন, যথাযথ তির্যক স্পষ্টোক্তি আসলে তাঁর আহত আত্মার জমাট আক্রোশেরই অপ্রতিহত কাঠিন্য দিয়ে গড়া। জগদীশ গুপ্তের অতুল্য সৃষ্টি আসলে তাঁর আত্মসৃষ্টি; তাই সেই ব্যক্তিত্বের পরিচয়েই সৃষ্টির পরিচয় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে 'স্বনির্বাচিত গল্পে'র ভূমিকায় আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কিছুই প্রায় না লিখে তিনি শেষ করেছেন;—সেও এক প্রচণ্ড অভিমান,—সৃষ্টিছাড়া বিশ্বনিয়মের বিরুদ্ধে অনুদ্গীরিত আগ্নেয়গিরির যন্ত্রণায় যা অন্তর্দগ্ধ,—নিস্তব্ধ। তবু গল্প-উপন্যাস রচনার মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে সেই অনুচ্চারিত নালিশ যেন এখানে-সেখানে গুম্‌রে উঠেছে। একেবারে প্রথম দিকেই গল্প লিখেছিলেন 'যৌবন-যজ্ঞের কবি' —১৩৩৩ বাংলা সালের কার্তিক মাসে 'কালিকলম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল,

"যৌবন তার বহুদূরে সরিয়া গেছে।

সিন্ধুর মত প্রাণবান্ জীবন্ত, সিন্ধুর মতই চঞ্চল পাগল, সিন্ধুর মতই পিচ্ছিল সে যৌবন যেন ধরা না দিয়াই হাসিয়া পালাইয়াছে। সিন্ধু অনন্তকাল-বিহারী, কিন্তু যৌবন তা নয়—তবু সিন্ধুর মত লুটাইতে লুটাইতে সে অগ্রসর হয়। বাহিরে সে উচ্ছল, উদ্দাম, গর্ভে তার কত রত্ন। নিরবয়ব আয়ত্তাতীত ক্ষুধিত সমুদ্রের স্মৃতির মত তার যৌবনের স্মৃতি আজ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে—তবু সে স্মৃতির মোহ আছে,— আবেশ আছে।

...যৌবনের অন্তরে অন্তরে যত দীপ্তির হিরণ্যশ্রী একে একে ফুটিয়াছিল তাহারই দেওয়া অঙ্গারে বুক কালো হইয়া আছে, আশার যত মুকুল দেখা দিয়াছিল তার একটিও ফোটে নাই।

সে আজ বিশবছরের কথা।

৬২। এ-গল্প 'বিনোদিনী'-সংকলনে ধৃত। ৬৩। অনিলবরণ রায়—পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

…ভগবান তার মস্তিষ্কে অতুল শক্তি দিয়াছিলেন,—সে অতুল শক্তিরসে অপব্যবহার করে নাই। তার যৌবন-যজ্ঞ জগদ্ধাত্রীর রত্নখচিত সিংহাসনের মত অনবদ্য চমকপ্রদ, যৌবন-যজ্ঞের প্রতিছত্রে বহু-ভঙ্গিম অপূর্ব অধ্যাত্মসম্পদ দেদীপ্যমান, তার প্রত্যেকটি কবিতা পূর্ণবিকশিত; শতদলের মত রূপে নিরুপম, হোমশিখার মত প্রদীপ্ত পবিত্র, যজ্ঞের মতই অর্থে ব্যাপক, শরতের আকাশের মত স্বচ্ছ সুপ্রসন্ন।

তবু যৌবন-যজ্ঞ অজ্ঞাত হইয়া গেল…

যে জীবন্ত প্রবুদ্ধ প্রতিভা মানবের মানসী সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা একটি আঘাতেই ভাঙিয়া শুকাইয়া নিষ্প্রভ হইয়া গেল—ক্ষুধার আঁচে পুড়িয়া সেই অপরূপ রসের ভাণ্ডার হরনেত্রের আগুনে দগ্ধ মদনের মত একেবারে শূন্যে মিলাইয়া গেল। সে নিঃশব্দ আর্তনাদ পৃথিবীর কাহারও কানে গেল না!

কবি আজ ম্লানচক্ষু, ন্যুব্জ, মানুষের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিবার সাহস তাহার নাই!"

গল্পের বুকে কি আশ্চর্য আত্ম-মোক্ষণ,—কেবল পরিচিত অতীত ও বর্তমান-ই নয়,—সেদিনকার অনাগত ভবিষ্যৎকেও যেন নিখুঁতভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন শিল্পী! আজ স্মরণ করি, পরবর্তী জীবনের সুদীর্ঘ দিন শিল্পীর 'ম্লানচক্ষু' প্রায় দৃষ্টিহারা হয়েছিল, শরীর অকালে ঝুঁকে পড়েছিল মেরুদণ্ডহীনের মত, দুঃসহ ক্ষুধার জ্বালা কিভাবে কতদিন নিবারিত হয়েছিল বা হয়নি,—সে খবর জানা নেই। শেষ কটা বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সামান্য মাসোহারাই তাঁর একমাত্র উপজীবিকা হয়েছিল। আরো মনে পড়ে, মৃত্যুর অব্যবহিত আগের দৃঢ়কঠিন স্বীকারোক্তি। তাঁর প্রথম গল্পের বই 'বিনোদিনী' প্রকাশিত হয়েছিল বোলপুরের অন্তরঙ্গ বন্ধু 'কানুবাবু'র অর্থানুকূল্যে, ছাপা হবার পর, লেখক বলেছেন, "৩০।৩৫ খানা বই এঁকে-ওঁকে দিলাম; অবশিষ্ট হাজার খানেক বই, আমার আর কানুবাবুর 'বিনোদিনী'-প্যাকিং-বাক্সের ভিতর রহিয়া গেল; পরে কীটে খাইল।

লেখক এবং সামাজিক মানুষ হিসাবে আমার আর কোনো অনুশোচনা নাই, কেবল মানসিক এই গ্লানিটা আছে যে, কানুবাবুর শ' আড়াই টাকা নষ্ট করিয়াছি।"[৬৪]

জীবনে চরম পরাভব-বোধের কি জ্বালাময় বর্ণনা,—তবু কত অনুচ্ছ্বসিত, অনুদ্বেলিত!—যেন কোনো এক অপরিচিত জনের একান্ত নিরর্থক হয়ে-পড়া অতীত জীবনের গল্প বলেছেন, নিতান্ত নিস্পৃহ কণ্ঠে—অনেক দূরগত আর একজন! কিন্তু এ-সব ঘটনা 'যৌবন-যজ্ঞের কবি' ছাপা হবার অনেক পরবর্তী কালের। ঐ গল্প যখন

৬৪। জগদীশচন্দ্র গুপ্ত—'স্বনির্বাচিত গল্প'—ভূমিকা।

রচিত হয় 'বিনোদিনী' গল্পের বই তখনো ছাপা হতে প্রায় এক বছর বাকি। গল্পগুলি সব লেখাও হয়নি তখনো। তাহলেও উদ্ধৃত গল্পাংশের বাগ্‌ভঙ্গি, আর বর্ণনায় শৈলী কত সদৃশ,—কত একক এবং একান্ত! যথার্থই বিধাতার দেওয়া 'মস্তিষ্কের অতুল শক্তি' এবং 'জীবন্ত প্রবুদ্ধ প্রতিভা' নিয়ে জন্মেছিলেন জগদীশ গুপ্ত। কিন্তু বিশ্বের কোথাও সে স্বীকৃতি জোটেনি; ফলে অকারণে বাধাহত,—অবুঝ শাসনে তাড়িত হয়ে দুঃখবাদের এক অন্ধ গহ্বরের মুখোমুখি এসে পৌছেছিলেন। নিজেও তিনি 'যৌবন-যজ্ঞের' সূচনা করেছিলেন কবিতার গোপন খাতায়,—কিন্তু ধরা পড়ে প্রবল পীড়িত হয়েছিলেন অবুঝ অভিভাবকদের হাতে। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে কলেজে ঢুকেছিলেন,—কিন্তু পড়া ছেড়ে চাকরি নিতে হলো—অকিঞ্চিৎকর সে কাজ;—কত সামান্য তার উপার্জন, —আরো কতো দৈন্যপীড়িত জীবনযাত্রা! এর পরে প্রতিভার পক্ষে দুটিমাত্র পথ খোলা ছিল,—উচ্ছ্বাসে, আর্তনাদে ফেটেপড়া; অথবা অবসাদে-যন্ত্রণায় তিলে তিলে অবসন্ন ব্যথিত আত্মহত্যার মুখে এগিয়ে যাওয়া,—যেমন করেছিলেন মধুসূদন। আর না হয়ত নিজের মধ্যে নিজেকে সংহরণ করে কঠিন পাথর হয়ে যাওয়া,—সুপ্ত আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে জমাট্-বাঁধা লাভা-স্তরের মত; তাই করেছিলেন জগদীশ গুপ্ত। অবসিত, ব্যর্থ হয়ে পড়ার আক্রুষ্ট বিক্ষোভকে ক্রমশ নিজের মধ্যে সংবরণ করে নিয়েছিলেন শিল্পী, বিষধর সর্প যেমন ব্যর্থ ফণা-বিস্তারকে সংযত করে নেয় আপন বিবরে। সেখানে সেই বিষাক্ত অভিজ্ঞতার ধারা ক্রমেই পুঞ্জিত হয়ে উঠেছে বিশ্বনীতি-নিয়মের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের আকারে;—ন্যায়, কল্যাণ, সৌন্দর্যের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে শিল্পী হয়ে উঠেছেন অটুট-প্রত্যয়। সেই বিশ্বাসকেই অমোঘ সত্যের আকারে প্রতিফলিত করেছেন গল্পের শরীরে,—যার প্রকাশের মধ্যে এমন এক অনুচ্ছ্বসিত দার্ঢ্য এবং অবিচল পদক্ষেপের সংহতি আছে, যা authentic epic-এর মত সুরেখ অবয়বের কাঠিন্যে বর্ত্মায়িত করে তুলেছে প্রতিটি গল্পের শরীর।

'যৌবন-যজ্ঞের কবি' থেকে উদ্ধৃত অংশের কথাই বলি। যৌবন-শক্তির অনির্বচনীয় অমোঘতাকে কেমন নিটোল মুক্তার মত কঠিন ও উজ্জ্বল আকারে বেঁধে তুলেছেন শিল্পী,—একেবারে প্রথম অনুচ্ছেদেই,—তা লক্ষ্য করার মত। অথচ এ নিয়ে কত উচ্ছ্বাস, কত কাব্যিকতা করা যেত,—কিংবা করা হয়েছে সমকালীন বাংলা গল্পে। কিন্তু তা না করেও যৌবন-স্বরূপের যথাযথ বৈভব কেমন অটুট থেকেছে জগদীশ গুপ্তের লেখায়। যেন প্রাগৈতিহাসিক স্থপতির কুঠার হাতে করে কঠিন পাথরের গায়ে সুসম্পূর্ণ প্রাঞ্জল মূর্তি গড়েছেন শিল্পী; প্রতিটি গল্পের শরীরেই এই যাথাযাথ্য আর যথাপরিমিতির সংযম

কোথাও কোথাও সেই কঠিন স্থমিতির সঙ্গে বাগ্‌ভঙ্গি তির্যক হয়ে উঠেছে,—যার ভেতরে রয়েছে বজ্রগর্ভ ব্যঙ্গের ইঙ্গিত, কিন্তু প্রকাশে কোথাও অপরিমাণ আতিশয্যের তীব্রতা নেই :—

"প্রত্যেকটি মানুষের মর্মস্থানে কৃষ্ণ অবস্থান করেন, আর মাঝে মহান্ সত্য নিহিত আছে, আর আছে প্রেম-মৈত্রীর সম্ভাবনা ; মানস চক্ষে পরমপুরুষকে নিরীক্ষণ করার উন্মুখতা—নিত্যই জ্যোতির্লোকে অভিযানের উদ্যম ; অপ্রধান সমুদয় স্থূল বাস্তব বস্তুকে পরিত্যাগ করে মানুষের দিব্যালোকই একমাত্র লক্ষ্য হবে, এই নিয়ম। এইসব গূঢ়তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করে তাঁরা [তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ] একটা দিব্য জাগরণের মাঝে বিচরণ করতেন এবং পুনঃপুনঃ ডাক দিয়ে তাঁরা মানুষকে সতর্ক করে দিতেন। তখন একদিন ছিল। কিন্তু এখন অন্যরকম—এখন জগৎ যেমন বধির, তেমনি অধীর আর তেমনি অসৎ। আগে মানুষ ভাল কথার দাম দিত। এখন তা দেয় না। অজ্ঞানান্ধের প্রেম ঐক্য সত্যের প্রতি এমন অবহেলা সঙ্কটেরই কথা। এই সঙ্কট আসছে, খুব বেগে আসছে, আর রক্ষা নাই।" 'আমি ভাবছি' গল্পে এ-সব কথা ভাবছিল ভবরাম চতুষ্পাঠীর ২১ জন শিক্ষার্থীর বাজার সরকার, যাকে চোর বলে সন্দেহ করেছিল ২১টি ছাত্রই, আর নিজের স্বীকৃতি অনুসারেই যে আফিংখোর। বলা বাহুল্য, এ-ভাবনার উৎস আফিং-এর নেশা। এ-টুকুও কেবল তির্যক্ ভাষণের ইঙ্গিত।

মাঝে মাঝে এই নাতি-প্রকাশিত ব্যঙ্গ-ব্যঞ্জনা অন্তরের নেপথ্যে তীব্র আঘাতের মত আলোড়ন সৃষ্টি করে, কেবল ন্যায়নীতি-প্রসঙ্গিক উপদেশের বিরুদ্ধেই নয়—যিনি অপ্রমেয়, প্রমাণাতীত, তাঁর বিরুদ্ধেও। 'দিবসের শেষে' গল্পটির শেষাংশে তেমন ইঙ্গিত রয়েছে।—রতি নাপিতের স্ত্রী নারাণী একে একে তিনটি পুত্রকে প্রসবগৃহ থেকেই গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে এসেছিল। চতুর্থ পাঁচু তার ভাগ্যে টিকে গেল, পাঁচ বছর তার বয়স এখন। একদিন ঘুম থেকে উঠে পাঁচু এসে বলে,—'মা আজ আমায় কুমীরে নেবে।' 'কি অলুক্ষুণে কথা',—গ্রামের কামদা নদীতে কখনো কেউ কুমীর দেখেনি। নানা জনে নানা কথা বলে। সারাদিন সংশয়ে ভরসায় আশা-নৈরাশ্যে উদ্বেল হয়ে কাটে—নানা জনের নানা মন্তব্য নানা অনুরোধ উপদেশ। অবশেষে সন্ধ্যার আগে পাঁচু বাপের সঙ্গেই কামদা নদীর পারে গিয়ে পৌছায়, আর কোথা থেকে কুমীর এসে ছোঁ মেরে নেয় তাকে। ধাপে ধাপে স্থাপিত নিটোল কাঠিন্য আর সামগ্রিকতা দিয়ে গল্পের শরীরে আগাগোড়া প্লটকে যেন পেরেক পুঁতে আটকে দিয়েছেন শিল্পী।—গ্রামবাসীরা হৈ হৈ করে ছুটে এল, কিন্তু সবই নিরর্থক।

সবশেষে :—"কখন ওপারের কাছাকাছি পাঁচুকে পুনর্বার দেখা গেল, তখন সে

কুম্ভীরের মুখে, নিশ্চল।—জনতা হায় হায় করিয়া উঠিল, পাঁচুর মৃত্যুপাণ্ডুর মুখের উপর সূর্যের শেষ রক্তরশ্মি জ্বলিতে লাগিল···সূর্যকে ভক্ষ্য নিবেদন করিয়া লইয়া কুম্ভীর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেল।”

একটি বিভীষিকাময় মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে villainy-র কী বীভৎস চিত্রণ,—অথচ এই villainy আর কারো নয়, অখণ্ড জীবনের ; জীবনধর্ম, জীবন-নীতি বলে যদি কিছু থাকে,—তবে তারই যেন একমাত্র আত্মিক সম্পদ ঐটুকু। জীবন সম্বন্ধে কি নীরন্ধ্র বিষাক্ততায় চেতনা আচ্ছন্ন হলে এমন দুঃসাহসী ভাবনা উপস্থিত করা চলে শিল্পের ভাষায়, তা প্রায় অকল্পনীয়। অথচ জগদীশ গুপ্তের প্রায় সকল গল্পেই আছে তাই। ‘বিনোদিনী’ গল্পগ্রন্থের প্রচ্ছদেও আছে villainous জীবনের হাতে বিপর্যস্ত মানুষের এক ভয়াবহ চিত্র, ‘চুনচুন্ সএ হমারে মরী ঐ’ নামক অদ্ভুত নাম ও বিষয়াম্বিত গল্প থেকে গৃহীত যার ভাব।—

শিবপ্রিয় জন্মেছিল দারিদ্র্যের মধ্যে, বিধবা মা ভিক্ষা করে ছেলেকে খাইয়ে বড় করেছিল,—নিজে না খেয়েও। আজ সে-সংসারে ভরা সুখ—মা, বৌ নিত্য, আর নিজে খেটে সচ্ছল সংসার গড়ে তুলেছে,—গরু তিনটির অমৃত ধারার দাক্ষিণ্যে সংসারে সংগতির প্রসার। তার ওপর, “নিত্য মনে মনেই ঠোঁট ফুলাইয়া বলে, বৌ সুন্দর, সেই গরবেই দিনরাত আটখানা।”

এই মাতা এবং বধূকে বিস্মৃত হল একদিন শিবপ্রিয় অতিশয় অর্থের লোভে। এক সন্ন্যাসীর কাছে সোনা তৈরি করার কৌশল শিখতে বেরিয়ে পড়ল পথে পথে। নানা দুর্ভোগের পর সর্বস্বান্ত হয়ে যখন বাড়ি ফিরে এল ভগ্নদেহে, নিত্য তখন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে মিথ্যা কলঙ্কের গ্লানিতে। গ্রামের মাটি তাই অসহ্য হয়ে ওঠে,—মাকে নিয়ে শিবপ্রিয় চলে আসে শহরে। অর্ধোন্মাদ হয়েছে শিবপ্রিয় ততদিনে,—ভিক্ষাই জীবিকার একমাত্র আশ্রয়,—তারই ফাঁকে ফাঁকে চেঁচিয়ে ওঠে,—‘চুনচুন্ সএ হমারে মরী ঐ’—অর্থাৎ ‘বেছে বেছে আমার শত্রুকে বিনাশ করে ফেলো।’ কেউ তার অর্থ বোঝে না, ভাবে পাগল।

তারপর ঊষর দারিদ্র্যের নীরন্ধ্র অন্ধকারে মাতার মৃত্যু ঘটে—দাহ করবার, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কোনো সংগতি নেই। বালির পিণ্ড সাজিয়ে নদীতীরে গিয়ে চোখ বুজে বসে শিবপ্রিয় ধ্যানতন্ময় হয়। তার ওপরে আসে অপ্রত্যাশিত আঘাতের পর আঘাত। এবার সত্যই শিবপ্রিয় উন্মাদ হয়ে যায়,—ক্ষণে ক্ষণে উদ্‌ভ্রান্তের কণ্ঠে হুঙ্কার শোনা যায়,—‘চুনচুন সএ হামারে মরী ঐ।’

নিছক বাস্তব জীবনের কার্যকারণের সম্পর্কে জগদীশ গুপ্তের অধিকাংশ গল্পের

বিষয়বস্তুকেই অস্বাভাবিক,—এমন কি অসম্ভব বলেও মনে হয়। দৃষ্টান্ত হিশেবে নিছক স্বপ্নদৃষ্ট দুর্ঘটনা সফল করার জন্যেই কামদা নদীতে কুমীরের অকারণ আবির্ভাব; অথবা শিবপ্রিয়ের অন্তর্ধান, নিত্যর আত্মহত্যা, শিবপ্রিয়ের গ্রামত্যাগ ও ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ ইত্যাদির মধ্যে কার্যকারণের কোনো অনিবার্য সংগতি নেই। কিংবা তার চেয়েও ভয়াবহ অবিশ্বাস্যতা রয়েছে, নিতান্ত অনায়াসে যা চিত্রিত হতে পেরেছে জগদীশ গুপ্তের গল্পে। 'মায়ের মৃত্যুর দিনে' গল্পে পুত্র- পুত্রবধূ, পৌত্রীর অন্ধ পৈশাচিক অর্থলোলুপতা জীবনের প্রতি অকল্পনীয় ধিক্কারের অন্ধতায় গগনচুম্বী হয়ে উঠেছে; যদিও নিছক বাস্তবতার বিচারে এর চেয়ে হাস্যকর অসম্ভবের পরিকল্পনাও দুষ্কর বলে মনে হয়। দুটি ছেলে মায়ের, কেশবলাল আর রামলাল। একটি কন্যা ও একটি পুত্র নিয়ে সস্ত্রীক কেশব মার কাছে থাকে গ্রামের পৈতৃক ভিটায়,—ছোট রামলাল স্ত্রী-সহ থাকে সুদূর কর্মক্ষেত্রের প্রবাসে। সারাজীবন ধরে মা কেবল গয়নাই গড়িয়েছেন, পাঁচ হাজার টাকার গয়না। আর তারই লোভে জ্যেষ্ঠ পুত্র-পুত্রবধূ আর পৌত্রী ষড়যন্ত্র করে মৃত্যুর দিনেও মার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হতে দিলে না,—রামলালের সঙ্গে জীবৎকালে আর দেখা হল না মার!—পাছে ঐ পাঁচ হাজার টাকার গয়নার ভাগ দিতে হয় ছোট ভাইকে,—কেবল এই ভয়ে কেশব মার অসুখের তীব্রতাকে লঘু করে মিথ্যা খবর দিয়েছে রামলালকে, নাভিশ্বাস ওঠার পরেও রামলালের নামে মিথ্যা ভাঙানি গেয়ে মার মন বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। অবশেষে প্রাণহীনা জননীকে তুলসীতলায় রেখেই ছুটেছে চাবির সন্ধানে,—এবং দেরাজ থেকে সেই গয়নার বাক্স লোপাট করে তবে এসে বসেছে মার জন্য বিস্তারিত শোক প্রকাশ করতে। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে মানবচরিত্রে পৈশাচিকতার (villainy) এমন অকারণ অনাবৃত রূঢ় প্রকাশ বাস্তব বলে মনে করা চলে না। কিন্তু জগদীশ গুপ্তের বিন্যাসে এমন এক অনিবার্য অমোঘতা রয়েছে, যার ফলে গল্পের 'থীম'-কে অস্বাভাবিক জেনেও তার সম্পর্কে অবিশ্বাস বা সংশয় পোষণ করার উপায় থাকে না; বরং একান্ত পিনদ্ধ সংক্ষিপ্ত বর্ণনার গাঢ়তার মধ্যে আতঙ্ক-উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসায় জাগ্রত মন গল্পের ভয়ানক-রসের মধ্যেই যেন নিমগ্ন হয়ে যায়। মানববৃত্তির একটানা অন্ধকার রূপ-চিত্রণের যে একঘেয়েমি প্রত্যক্ষ বাস্তব জগতের পক্ষেও অস্বাভাবিক, জগদীশ গুপ্তের গল্পে তার প্রশ্নাতীত অমোঘতা আসলে শিল্পীর দৃঢ়-বলিষ্ঠ প্রত্যয়েরই অনিবার্য পরিণতি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন,—কেশবলালের মত পুত্র, অথবা শিবপ্রিয়-র মত ব্যর্থ মানুষ একেবারেই অসম্ভব, এমন কথা বলার উপায় নেই। মানুষের সকল জ্ঞানবুদ্ধি-অভিজ্ঞতার পুঞ্জিত সম্বলও আজ পর্যন্ত সম্ভব-

অসম্ভবের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করে উঠতে পারেনি। কিন্তু যে কার্য-কারণ বিন্যাসের গুণে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কোনো প্রয়াসই কখনো করেননি জগদীশ গুপ্ত। প্রথম থেকেই নিজের পূর্ব-কল্পনাকে (hypothesis) ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করে বজ্রসমতুল কাঠিন্য ও অনিবার্যতার সঙ্গে গল্পের দেহে তাকে বিন্যস্ত করেছেন। শিল্পীর hypothesis মেনে না নিলেও তাকে প্রশ্ন করবার, অস্বীকার করবার কোনো অবকাশই থাকে না পাঠক-মনের,—গল্প পড়তে পড়তে শিল্পীর উদ্দিষ্ট বর্ণনা-ধারার সঙ্গে একাত্ম না হয়েই উপায় থাকে না,—অনেকটা যেন বন্যার স্রোতে নিক্ষিপ্ত অসহায়, বৃক্ষকাণ্ডের মত। জগদীশ গুপ্তের ব্যক্তিত্বের দার্ঢ্য এবং বিশ্ব-নিয়ম সম্পর্কে বিক্ষোভের অনিবার্য শক্তির বিস্ময়কর পরিচয় এখানেই, তাঁর অতুলনীয় শিল্পক্ষমতার নিদর্শনও এইখানে।

কিন্তু প্রীতিহীন নীরন্ধ্র-বিদ্বেষের শক্তি যতই প্রচণ্ড হোক্, সার্থক সৃষ্টির পূর্ণতা চিরকালই তার অনায়ত্ত। জগদীশ গুপ্তের প্রতিভায় প্রবল ক্ষমতা ছিল,—তাঁর রচনার কাঠিন্য ও মর্মভেদী প্রাঞ্জলতার দীপ্তিতে সেই দুর্লভ ক্ষমতার রূপময় প্রকাশ। তা সত্ত্বেও খুব কম লেখাকেই সম্পূর্ণ সার্থক শিল্পসৃষ্টি বলা যেতে পারে,—অর্থাৎ জগদীশ গুপ্তের রচনায় এমন গল্প বিরল পাঠকালে নাগপাশের মত যা কেবল আকর্ষণই করে না,—পাঠান্তে রসবোধকে উদ্দীপ্ত, তৃপ্ত এবং চরিতার্থও করে তোলে। বস্তুত সাধারণ গল্প-রসিক বাঙালি সমাজে লেখক যে বহুপঠিত নন, তা কেবল জীবন-বিশ্বাসের এই অন্ধ অন্ধকার-প্রীতির জন্যই নয়; কিংবা গল্প-রসের আপেক্ষিক রুক্ষতাও তার মুখ্য কারণ নয়। সমসাময়িক আরো বহু শিল্পীর নগ্ন প্রগল্‌ভ অন্ধকার-চারণের উগ্রতাকে মদ্যের মত জ্বালাকর নেশার প্রমত্ততায় একদা আকণ্ঠ পান করা হয়েছে। বস্তুত 'কল্লোল'-ধারার অন্তরঙ্গদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনার মত ছোটগল্প-রসের নিটোলতা সুলভ নয়। আর রসের তুলনায় রূপের দার্ঢ্যে জগদীশ গুপ্ত তো ছিলেন তাঁর নিজের কালে এবং পরিমণ্ডলেও অতুল্য।

মাঝে মাঝে মনে হয়, জগদীশ গুপ্তের ব্যক্তিত্ব এবং রচনায় বাঙালি-দুর্লভ যে কাঠিন্য (solidity) ও সংহতি ছিল, আমাদের তারল্যরসিক জাতীয় চরিত্রের পক্ষে তা সহজে সুসহ হতে পারেনি। 'হেক্টরবধ' গ্রন্থে মধুসূদনের গদ্য রচনার প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন একদা মন্তব্য করেছিলেন, উত্তরকাল সেই রচনাভঙ্গি অনুসরণ করে চলেনি—করতে পারলে বাংলা ভাষা এক আশ্চর্য সংক্ষিপ্তি, সংহতি ও উদাত্ততা আয়ত্ত করতে পারত। আসলে মধুসূদনের গদ্য রচনার classical brevity বাঙালি স্বভাবের অনয়ত্তনীয় ছিল;—জগদীশ গুপ্তের গল্পশৈলীও অনেকটা সেই অনুপাতে ছিল দুরায়ত্ত।

'জগদীশবাবু সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণশীল অনেকের কাছেই অনুপস্থিত'—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের এই যথার্থ-কথন ব্যর্থতাক্ষুব্ধ শিল্পীকে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আরো অ নাহত করেছিল। কিন্তু জীবনের প্রতি অন্ধ আক্রোশে প্রস্তর-কঠিন জগদীশ গুপ্ত একথা ভেবে যথার্থ পরিতৃপ্তি পেতে পারতেন যে, তাঁর এ অনুপস্থিতি অক্ষমতার সূচক নয়—অতিক্ষমতার,—বাঙালির পক্ষে অকল্পনীয় দার্ঢ্য-সমৃদ্ধ শিল্প-কৃতির ঐতিহাসিক সাক্ষ্যবহ। বাংলা গদ্যগল্পে জীবন-দৃষ্টি ও রূপশৈলীর সৃজনক্ষেত্রে জগদীশ গুপ্ত দ্বিতীয়রহিত,—অনেকটা মধুসূদনের মতই; যদিও মধুসূদনের অনুরূপ প্রতিভার সামর্থ্য তাঁর পক্ষে কল্পনারও অতীত ছিল।

'বিনোদিনী' (১৩৩৫) ছাড়া এঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'রূপের বাহিরে' (১৩৩৬), 'শ্রীমতী' (১৩৩৭), 'স্বনির্বাচিতগল্প' (১৩৫৭)।

মনীশ ঘটক

যুবনাশ্ব ছদ্মনামের অন্তরালে মনীশ ঘটকের (১৯০১ খ্রীঃ) লেখা গল্প 'কল্লোলে'র পৃষ্ঠায় একদিন 'আধুনিকতা'-বোধের উচ্ছ্বসিত উৎসাহকে ক্ষিপ্তপ্রায় করে তুলেছিল। অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন,—"বলতে গেলে মনীশই 'কল্লোলে'র প্রথম মশালচী। সাহিত্যের নিত্যক্ষেত্রে এমন সব অভাজনকে ডেকে আনল যা একেবারে অভূতপূর্ব।" এদের মধ্যে দেখি, "কানা খোঁড়া ভিক্ষুক গুণ্ডা চোর আর পকেটমারের রাজপাট। যত বিকৃত জীবনের কারখানা।"—"এ একেবারে একটা নতুন সংসার, অধন্য ও অকৃতার্থের এলাকা।"[৬৫]

এখানেই একটা কথা স্পষ্ট করে নিতে হয়,—সাহিত্যের জগৎ নিত্যতার মহিমায় অবিনশ্বর;—কিন্তু যে-কোনো সৃজন-প্রয়াসই নির্বিশেষে সেই সমৃদ্ধ অধিকারের ভাজন হতে পারে না। তার জন্যে একদিক থেকে বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর হরিহর অন্বয় যেমন আবশ্যিক, তেমনি কালোত্তীর্ণ কলাকৃতির পক্ষে বিষয়-মোহ থেকে স্রষ্টার আত্মমোক্ষণের প্রয়োজনও অপরিহার্য। অর্থাৎ, স্রষ্টা যা রচনা করেন উপলব্ধি, বিশ্বাস বা সহানুভূতির গভীরতায় তার সঙ্গে একাত্ম হতেই হবে তাঁকে। অথচ অন্ধ তন্ময়তার মধ্যে সুন্দরের সার্থক সৃষ্টি অসম্ভব,—উপলব্ধির সত্যকে সৃষ্টির সত্যে, একের অনুভবকে বিশ্বের রসবোধে রূপান্তরিত করতে হলে স্রষ্টার চেতনাকে দেশ-কালগণ্ডীর অতীত বিশ্বমুখীনতাও আয়ত্ত করতে হয়। সেইজন্যে সৃষ্টির বিষয় যত অভিনব বা চমকপ্রদ-ই হোক, তাকে সার্থক শিল্পমূর্তি দেবার প্রয়োজনে লেখকের পক্ষ থেকে সংযম

৬৫। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—'কল্লোল যুগ'।

এবং সুমিতির কৌশল আয়ত্ত করতেই হবে। যুবনাশ্বের রচনায় অভিনবতার চমক্ যত অপ্রত্যাশিত, অথবা যত বাঞ্ছিতই হোক্, জীবনের স্থূল বস্তুভূমি থেকে তাকে সাহিত্যের নিত্যলোকে শিল্প-রূপান্তরিত করার অক্ষুণ্ন প্রয়াস সেখানে অকম্পিত হয়ে নেই।

ডঃ সুকুমার সেন মনীশ ঘটকের গাল্পিক প্রয়াসকে 'গল্প-চিত্র' নামে অভিহিত করেছেন,[৬৬] —ইতিহাসের দৃষ্টিতে এই অভিধা নানাদিক থেকেই সার্থক প্রয়োগ। প্রথমত ছোট ছোট গল্পের আকারে রচিত হলেও এইসব লেখায় ছোটগল্পের অবয়ব কোনো সুচিহ্নিত রূপ ধরেনি। কেবল ছোটগল্পের কেন, যুবনাশ্বের এই সব গল্পে পরিচ্ছন্ন কোনো প্রকরণ-চিন্তার পরিচয়ই নেই। বস্তুত বাচন-কলার চেয়ে বক্তব্যের প্রতিই তাঁর ঝোঁক প্রগাঢ়। আর সেদিক থেকে জগদীশ গুপ্তের গল্পের পরিমণ্ডলকে যদি আতঙ্ককর বা ভয়ানক বলি—তাহলে মনীশ ঘটকের গল্পের বিষয় সংগৃহীত হয়েছে জীবনের বীভৎসতম অঞ্চল থেকে। 'পটলডাঙ্গার পাঁচালি'কার তিনি ; যে পটলডাঙায় থাকে খেঁদি পিসির বিখ্যাত ভিখারির দল,—'যাদের সবাই', খেঁদি নিজেই বলে, 'ওই করতো এক কালে।' অর্থাৎ দেহের ব্যবসা! পরে "বুড়ো হয়ে, কেউ ব্যারামে পড়ে পথে বেরিয়েচে।" আর ব্যারাম ত যে-সে নয়, একদিকে আছে 'কুঠে বুড়ি',—আর একটি হুলো জোয়ান। কারো বা "বাঁদিকের গালের মাংস নেই—দুপাটি দাঁত দেখা যাচ্ছে। ঢিবি কপালের ওপর উস্কখুস্ক চুলগুলি বিঁড়ে করে বাঁধা।"—মানব-রূপের আরো কত ভয়ানক বিভগ্ন, গলিত, বিকৃত আকার!

এই সব অন্ধকার বিভীষিকার রাজ্যে বিচরণ করার এক দুর্জয় নেশা আছে ;—সে নেশার হাত থেকে যুবনাশ্ব-ও মুক্তি পাননি পুরোপুরি। ফলে একই পটভূমিতে একই প্রসঙ্গে তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছে বার বার। দারিদ্র্য ও যৌনতার ক্লেদাক্ত বিকৃতির এক অসহ্য অবিচ্ছিন্ন রূপ-চিত্রণে তাঁর উৎসাহ অদম্য। রুচি বা নীতির প্রশ্ন এ নয়,—প্রশ্ন সাহিত্যিক রসবোধের। জীবনে বিকৃতি, উন্মত্ততা, ক্লেদাক্ত পঙ্কিলতা সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয়ের মতই সত্য ; কিন্তু সূর্যাস্ত-সূর্যোদয়ের মত তা স্বভাবত অনাবৃত নয়। মানুষের ইতিহাসে অন্ধকারের বিষাক্ত চোরাগলি যে স্বাভাবিক নিয়মেই আবৃত, তার কারণ কেবল নীতিবাগীশের জবরদস্তিই নয়। মানব-প্রকৃতির সহনীয়তা ও গোপন বাসনার আকৃতি-প্রকৃতির দ্বারাও সভ্যতার এই রীতি বহু পরিমাণে পুষ্ট। যাকে পাশবতা বলে স্বীকার করি,—যুবনাশ্বও করেছেন তাঁর গল্পের মধ্যে,—তার নির্জলা পরিবেশন একটা মাত্রা অতিক্রম করে গেলে অনাচ্ছন্ন রসচেতনার পক্ষে আর সুসহ থাকে না। পাশবিক অন্ধতার গায়ে মানবতার প্রলেপ দগ্‌দগে ঘায়ে প্রলেপের মত স্বস্তিকর হতে

৬৬। ডঃ সুকুমার সেন —'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ৪র্থ খণ্ড।

পারে,—যদি ঐ অন্ধকার-চারণের মূলে শিল্পিচেতনার কোনো ব্যাপক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটা সম্ভব হয়। কিন্তু দরিদ্রের, ভিখারির, বিকৃত মানুষের বিকৃততম দৈহিক ক্ষুধার নিরবধি চিত্রণের মূলেও যুবনাশ্বের মনে "আধুনিক অর্থে কোনো সমাজ-চেতনা ছিল না"—এ-কথা অচিন্ত্যকুমারও স্বীকার করেন।

তা সত্ত্বেও আলোচ্য গল্পগুলি, তাদের বিষয়, পরিধি, চরিত্র ও প্রকরণগত বৈচিত্র্যহীনতা নিয়েও বিশেষভাবে অশ্লীল, অপাঠ্য বা বিরক্তিকর মনে হয় না ;—অর্থাৎ মনীশ ঘটকের রচনাকে দুর্বল পর্ণোগ্রাফির-পর্যায়ভুক্ত করা কঠিন। তার কারণ দুটি,—প্রথমত তাঁর ব্যক্তিত্বের অদম্য বলিষ্ঠতা। অচিন্ত্যকুমার লিখেছিলেন,—"সেদিন যুবনাশ্বের অর্থ যদি কেউ করত 'জোয়ান ঘোড়া', তাহলে খুব ভুল করত না, তার লেখায় ছিল সেই সবলতা।" বস্তুত পটলডাঙার মাটির তলার জীবন মনীশ ঘটকের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে যেন নেশার মত পেয়েছিল, তাই নিষিদ্ধ জগতের আব্রুর দেয়াল তিনি একের পর এক ভেঙেছেন,—বন্যাস্ফীত নেশাতুর পদ্মার পাড় ভাঙার মত,—তেমনি কৈতবহীন দুর্জয় অমোঘতার সঙ্গে। ফলে 'পেটের ক্ষুধা এবং সর্বাঙ্গের ক্ষুধা' ও সে-ক্ষুধা মেটাবার পদ্ধতি বর্ণনায় শিল্পী যখন মুখর, তখন তাঁর মধ্যে কুণ্ঠার কোনো মৃদুতম বলি-রেখাও লক্ষ্য করা চলে না,—না তাঁর লেখায়, না শিল্পীর চেতনায়। বুদ্ধদেব বসুর প্রসঙ্গে বলেছি, দুর্বলতাই লজ্জাকর,—মনীশ ঘটকের গল্প পড়তে পড়তে লজ্জিত হতে হয় না, কারণ তিনি অকুণ্ঠিত,—জীবনের চোরাগলিতে তাঁর বিক্ষুব্ধ মনের পদক্ষেপ যুদ্ধক্ষেত্রে 'জোয়ান ঘোড়ার',—যুবনাশ্বের কঠিন পদপাতের মতই সুদৃঢ়।

তাছাড়া আরও একটা দিক রয়েছে, অচিন্ত্যকুমার যাকে বলেছেন, শিল্পিমনের 'সহজ বিশালতাবোধ'। ক্ষুধার্ত, দরিদ্র, পঙ্গু, বিকৃত-দেহ মানুষের মিছিল চলেছে 'পটলডাঙার পাঁচালি' ভরে,—দেখে মনে হয় মানুষের বীভৎস দেহখণ্ডের আধারে এরা যেন জীবন্ত হিংস্র পশু এক-একটি। অনেকে আবার জন্ম-পশু,—অর্থাৎ, জন্মেও-ছে অন্ধকারের এই পাশব পাতালপুরীতে। তবু মনে হয় মানুষ অমর,—ব্যাধিক্লিষ্ট, গলিত শরীরের ভগ্নাংশকে আশ্রয় করে টিকে-থাকা পাশব-বৃত্তির কোন্ চোরাবালিতে লুকিয়ে থাকে মানুষ, মানুষের ক্ষুধা! হঠাৎ কোনো অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করে' মানুষের সেই অপরাজেয় শক্তি সিংহবাহিনীর মত আজন্মের পশুবলকে সংবৃত আচ্ছন্ন করে ফেলে,—টুক্‌রো মানুষের দেহ-মন ঘিরে পূর্ণ মানুষের মহিমা পূর্ণিমার দ্যুতিতে যেন উদ্ভাসিত হয়।

'গোষ্পদ' 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত যুবনাশ্বের প্রথম গল্প। পটলডাঙার ভিখারি দলের নেত্রী খেঁদির "একটি ক্ষণকালিক সদিচ্ছার কাহিনী।"—মানুষ ত ক্ষণজীবীই,—

ক্ষণকালীনতার বৃন্তেই তার চিরন্তনতার অক্ষয় স্বাক্ষর বিদ্যুৎ চমকের মত সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যুবনাশ্বের গল্পেও তা ব্যর্থ হয়নি, তার সংশয়হীন পরিচয় 'গোষ্পদ' বা 'পটলডাঙার পাঁচালি'-কেও অতিক্রম করে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে 'মন্থশেষ' গল্পে :—

"সন্ধ্যের মহড়ায় চোরের মতো ইদিক উদিক তাকাতে তাকাতে সন্তর্পণে আস্তানার গের্দয় পা দিতেই বাঙ্গার কানে এল খেঁদি-পিসীর কটকটে বাজখাঁই গলার আওয়াজ, কিঁরে মড়া, হয়েছে কি ? অত হাঁপাচ্চিস কেন ? কি ওটা তোর কাঁকে ?"

বাঙ্গা চুপি চুপি পিসীকে টেনে নেয় ঘরে ; কাঁক থেকে নামিয়ে দেয় ডবকা ছেলে,—নিভৃত হয়ে বলে সব কথা।—রাজাবাজারে 'লালরঙা দেউড়িওলা' মস্ত বাড়ি পরামাণিকদের,—সেই বাড়িরই ছোট ছেলে। খেলছিল বন্ধুদের সঙ্গে,—গ্যাসের আলোয় 'ঝকমকিয়ে উঠলো' গলার হার। আর যায় কোথা,—শীক-কাবাবের দোকানের আবছা অন্ধকারে ছেলেটার মুখ চেপে ধরে গলিতে ঢুকে পড়ল বাঙ্গা। কিন্তু মাল সরাবার আগেই গলির ওমাথা থেকে পুলিশের আবির্ভাব। তাই ছেলেটার জিব্‌টা টেনে ধরে দিলে ছুট,—একেবারে আস্তাবলের গের্দয় পৌঁছে তবে তার স্বস্তি।

হারটা সম্বন্ধে দ্বিধা হল না,—নেত্রী হিশেবে খেঁদি সেটা নিলে,—বখরাও যথারীতি ঠিক হয়ে গেল। মুশকিল হল কেবল ছেলেটাকে নিয়েই। বাঙ্গা বাঁকের অন্ধকারে ওকে রেখে আসতে চায় যথাস্থানে। কিন্তু খেঁদির তাতে আপত্তি,—কারণ সারা দলের ভয়ের কারণ রয়েছে তাতে। বড়লোকের বাড়ির ছেলে। এতক্ষণে থানা পুলিশে কোন্ না হৈ হৈ হচ্ছে,—নিয়ে বেরুলে ধরা পড়বার ভয়। তাছাড়া ছেলেটার মুখে কথা ফুটেছে,—হারটা রেখে দেওয়া হচ্ছে, ছেলেটাই যদি ধরিয়ে দেয়। অতএব—

ঠিক এমনি সময় ঝাঁপ সরিয়ে দাঁতী এসে ঢোকে খেঁদির ঘরে,—"গায়ের বরণ তেল-চুকচুকে, কপালটা ঢিবি, হাতুড়িপেটা নাকটার তলা দিয়েই হারমনিয়মের চাবির মতো একসার দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। চোয়ালটা কানের কাছে চৌকো হয়ে সামনের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে।" তাহলেও বয়স তার সাতাশ-আটাশ!

ছেলে দেখেই চমকে ওঠে দাঁতী, দাঁতী-বিন্দী,—'ও মা! কার ছেলে গো দিদি—'

বলা বাহুল্য, খেঁদি বিরক্ত হয়, কিন্তু বিন্দীকে চটানো উচিত নয়—কারণ, "ছুরৎ যাই হোক্ দাঁতী গুণের মেয়ে। বয়েস গুণে ভিক্ষে ছাড়াও তার রোজগার ছিল মোটা, খেঁদির তা অজানা ছিল না।"

এ-হেন দাঁতীর ঐ ছেলেটাকে দেখে অবধি কি যে হল,—সে তাকে ঘরে নিজে

খেতে চায়, পুষতে চায়। বাগ্গা চাপা অক্রোশে লাফাতে থাকে। কিন্তু মাঝামাঝি রফা করে দেয় খেঁদি,—ছেলেটাকে নিয়ে যায় দাঁতী, কথা থাকে 'রাত বারটার' মধ্যে ফিরিয়ে দেবে। কারণ পরের ছেলে যথাস্থানে পৌঁছে দিতে হবে ত!

ইতিমধ্যে দাঁতী চলে গেলে পরামর্শ ঠিক হয়ে যায়। ছেলেটি বারটার পরে থাকবে খেঁদির ঘরে,—রাত দুটোয় নিয়ে যাবে তাকে বাগ্গা,—রাত পোয়াবার আগেই খাল পার করে দিয়ে আসতে হবে। বাগ্গা ভাবে,—'ওই তো জীব! গলায় আঙুল দিলেই'—খেঁদি বাধা দিয়ে বলে,—"উহু। তাতে বিপদ আছে। আস্ত অতবড় লাসটা নে যেতে গেলেই ধরা পড়বি। কেটে কুটে না নিলে……যন্তর পাতি কিছু নেই?

—আমার সেই বড় বাঁক ছুরি খান—

—তাতেই হবে। বলে খেঁদি উঠ্‌লো"।

এদিকে:—

"খেঁদির ঘরে ছেলেটাকে দেখে অবধি বিন্দির বুকের মধ্যে অত্যন্ত মরচে পড়া কোন্ একটা তারে কেবলি কাঁপন উঠছিল, তাতে তার নিজেরি থেকে থেকে অবাক লাগছিল।

পেটের ক্ষিদে, সারাগায়ে ক্ষিদে, এসবের অনুভূতি তার অজানা ছিল না; সে ক্ষিদের তৃপ্তির পথও জানা ছিল। কিন্তু বুকের ঠিক্ মাঝখানটিতে কিসের ক্ষিদে! এ একদম নতুন! ঘরে এসে ছেলেটাকে বুকে চেপে চুমোয় চুমোয় তার দু'গাল ভরিয়ে দিয়েও তার তৃপ্তি হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল আরো…আরো—কিন্তু আশ মিটছিল না।

ছেঁড়া কাঁথ, কম্বল, এঁদো গলির পচা পাঁক, অভাব ও অসুখের কাৎরানি, ক্ষিদে ও পশু-লালসার হাহাকার, এরই ভেতর সে আজন্ম প্রতিপালিত। তাই মনের ওলোট-পালট মাঝে মাঝে তাকে অবাক করে দিচ্ছিল, কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে সব ভাববার মতো মনের অবস্থাও তার ছিল না, শক্তিও না। খালি মনে হচ্ছিল, জলের তোড়ে নদীর পাড় ধ্বসে পড়ার মতো মনের মধ্যে কিসের যেন ভাঙন সুরু হয়েছে…একটু ভালোই ঠেক্‌ছে তাতে—

বাইরে ভর সন্ধ্যের খদ্দেরের দল হাঁকাহাঁকি করে ফিরে গেল। কেউ কেউ এক কথায়, কেউ গাল খেয়ে। ছেলেটাকে বুকে চেপে ধরে সে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।"

—মাঝ রাত অবধি কাটল এমনি করে। ছেলেটিকে আশ্রয় করে হৃদয়ের সেই মরচে ধরা তারে মানব-অনুভবের অনাস্বাদিত গান ঝঙ্কৃত করে তুলল দাঁতী বিন্দী,—তন্ময় হয়ে গেল নিজেরও অজ্ঞাতে।

যথাকালে দাঁতীর ঘরের ঝাঁপ তুলে ছুটে আসে খেঁদি আর বাঞ্ছা। অন্ধকারে হাতড়ে দেখে সব শূন্য। সন্ধ্যাবেলায় কি যে আঁচ করেছিল বিন্দী,—আর ছেলেটার সঙ্গে কথায় কথায় আন্দাজ করে নিয়েছিল তার বাড়ির পথের হদিশ।

পাগল হয়ে গেছে বাঞ্ছা আর খেঁদি। পরদিন ভোরে সুখবর নিয়ে ফেরে বাঞ্ছা। ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে ধরা পড়েছে বিন্দী। কারো নামই করেনি সে! ছেলেচুরি, হারচুরির দায়ে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেছে। ওদের বাড়ির ঝি-টা বাঞ্ছাকে বলেছে,—'হার চুরির জন্যে মাগীর জেল হবে।'

"কথাটা শেষ করে আর একবার হুল্লোড় করে বাঞ্ছারাম হেসে" উঠেছিল। কিন্তু সেই অট্টহাসের প্রতিটি কম্পন বেয়ে শিল্পীর মানব-অনুভবের যে নিভৃত গাঢ় প্রবাহ ফল্গুধারার মতই প্রচ্ছন্ন বয়ে চলেছে, গল্পের মর্মে তার অধরা স্পর্শ অনির্বচনীয় সুরের লহরীতেই ছড়িয়ে পড়ে। একেই বুঝি অচিন্ত্যকুমার বলেছিলেন,—জীবন সম্বন্ধে এক "সহজ বিশালতা।" এ-ধনে যে ধনী তাঁর সৃষ্টিতে গতানুগতিকতা একঘেয়ে হলেও সর্বদাই বিরক্তিকর হতে পারে না,—ঘনতম অন্ধকারও কখনো ক্লিন্ন নর্দমার গ্লানিবহন করে না; দারিদ্র্য, বিকৃতি কখনো আত্মিক দৈন্যে লাঞ্ছিত হয়ে 'ছোট' হয়ে পড়ে না। একথার অর্থ এই নয় যে, যুবনাশ্বর সকল গল্পের পরিণামেই নীতিবাগীশের বাঞ্ছিত এক ফলশ্রুতি রয়েছে,—'কালনেমী' বা 'ভুখাভগবান' গল্পের পরিণামেই তার প্রমাণ। শুধু তাই নয়, সব গল্পই পটলডাঙার এঁদো গলিতে আটকে পড়ে নেই,—পদ্মার জাহাজে 'দুর্যোগ' অথবা 'সোসাইটি'র ঝড়ো আবহাওয়াতেও স্বল্প-প্রজ মনীশ ঘটক কখনো-সখনো বিচরণ করেছেন। অনেক স্থলেই জীবনের অন্ধকার পাতালপুরীতে সূর্যোদয়ের স্মৃতিবাহী শিল্পি-চেতনার প্রচ্ছন্ন অনুভব গল্পের দেহে-মনে গ্লানিমুক্ত অনবসন্ন এক গতি-শক্তির দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে। এখানেই 'যুবনাশ্ব' সার্থক-পরিচয়—নামে এবং সৃষ্টির স্বকীয়তায়।

'কল্লোলযুগে'র পরে গল্প লেখার প্রয়াস থেমে গিয়েছিল মনীশ ঘটকের। বহুবছর পরে আবার কচিৎ প্রৌঢ় শিল্পীর হাতের লেখার আভাস পাওয়া যায়,—তাও মুখ্যত কবিতায়। শিল্পী যুবনাশ্ব প্রথমাবধি গদ্যে-পদ্যে উভচর। ১৯৫৬ খ্রীস্ট-সালে তাঁর একমাত্র গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে 'পটলডাঙার পাঁচালী' নামে।

নজরুল ইসলাম

কবি নজরুল ইস্লাম (১৮৯৯) ছোট ছোট গল্পও লিখেছিলেন। কবিতার মত ছোটগল্পের জগতেও এক অনন্যপূর্বতার স্বাদ নিয়ে এলেন তিনি। তাঁর প্রথম গল্প-

সংকলন 'ব্যথার দান' (১৯২২) সেকালে 'গদ্য-কাব্য' নামে প্রশংসামুখর স্বীকৃতি পেয়েছিল। 'কল্লোল' পত্রিকা এই সংকলনের গল্পগুলোকে তুলনা করেছিলেন চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-এর সঙ্গে।[৬৭] তাহলেও আসলে নজরুলের গল্পগুচ্ছকে,—অন্ততঃ 'ব্যথার দান'-এর গল্পগুলোকে কোনো পরিচিত রূপ-প্রকৃতির সীমায় গণ্ডিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তাঁর লেখায় বিচিত্র চেনা রূপের আভাস রয়েছে, কিন্তু কোনো বিশেষ রূপসৃষ্টির কোনো পূর্বসংস্কারই (convention) গভীর ছাপ ফেলতে পারেনি। তার কারণ শিল্পীর সহজে 'আনকনভেনশন্যাল' ব্যক্তি-স্বভাব!

আগে বলেছি,—সকল সার্থক সৃষ্টিই আসলে স্রষ্টার আত্মরূপ রচনার আনন্দলীলা। নজরুলের পক্ষে একথা আরও বেশি পরিমাণে সত্য। জীবনের বিষ-সমুদ্র মন্থনকারী দাহময় অভিজ্ঞতার পুঁজি ছিল তাঁর যে-কোনো বাঙালি শিল্পীর তুলনায় অপরিসীম। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ গৃহস্থ ঘরের সন্তান, পড়তে গেলেন রানীগঞ্জে। সেখানে অভিন্নহৃদয় বন্ধুত্ব হল ধনিশ্রেষ্ঠ ও বর্ণশ্রেষ্ঠ হিন্দু পরিবারের দুলাল দৌহিত্রের সঙ্গে।[৬৮] বন্ধুর পক্ষ থেকে না হলেও বন্ধু পরিবারের পক্ষ থেকে তার অভিজ্ঞতা সর্বাংশে প্রীতিপ্রদ হবার কথা নয়। তারপরে কলম ছেড়ে হাতিয়ার ধরতে গেলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রঙ্গভূমে। যুদ্ধক্ষেত্রেই ফার্‌সী শিখলেন;—হাতে যখন প্রাণঘাতী অস্ত্র, হৃদয় তখন ডুব দিয়েছে কবি হাফেজ-এর প্রেম-রোমাঞ্চে ভরা কাব্য-কবিতার অপার রহস্য-পাথারে।

দেশ-বিদেশের যুদ্ধভূমি পেরিয়ে ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে এলেন; অস্ত্রে-রাঙা হাতে ধরলেন শিল্পের লেখনী—হাবিলদার লিখলেন কবিতা। সে কবিতা ছাপা হল 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায়। পল্টন ছেড়ে দেশের মানুষের জীবনভূমিতে এসে দাঁড়ালেন এবার। যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজ প্রভুদের যথার্থ স্বরূপ দেখে এসেছেন,—মর্মে জমেছে বিদ্রোহ-বাসনার পুঞ্জিত অগ্নিদাহ। কিন্তু বন্ধু বলে, পরমাত্মীয় বলে যাঁদের কাছে এলেন, তাঁদের হাতেও সুবিচার মিললো কই! কলকাতায় এসে উঠেছিলেন বন্ধু শৈলজানন্দের মেস্‌-এ। ধনী কুলীন পরিবারের ব্রাত্য এ দুলাল তখন অনাভিজাত্যের অপরাধে পরিবার-চ্যুত। কিন্তু বন্ধুর জন্য এবার তাঁকে মেস্ ছাড়তে হল,—'পবিত্র হিন্দু মেস্‌'-এ মুসলমানকে অতিথি হিশেবে প্রবেশ করতে দেবার অপরাধ অক্ষমণীয়।[৬৯] বিদেশী রাজার-জাতের অন্যায় হাবিলদার নজরুলকে ক্ষিপ্ত করেছিল, কিন্তু দেশের ভাইদের উৎপীড়ন হাসিমুখে বরণ করলেন। একথা বলছি এই কারণে যে, রাজশক্তির পক্ষ থেকে জাতির এই অশিক্ষিত অন্ধ সংকীর্ণতার সুযোগ সেদিন পূর্ণমাত্রায় গৃহীত

৬৭। দ্রষ্টব্য—নজরুল ইসলাম 'ব্যথার দান,' পঞ্চম সংস্করণ।

৬৮। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ৬৯। দ্রঃ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—'চলমান জীবন' (২য় পর্ব)

হয়েছিল; জাতি ও সম্প্রদায় ভেদের ফাটলে উপ্ত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষবৃক্ষ। অন্যপক্ষে যুদ্ধের পল্টনে নিযুক্ত পাঞ্জাবী মৌলবীর কাছে ধর্ম-শিক্ষার বদলে পাঠ নিলেন কাব্যী সাহিত্যের প্রেম-সৌন্দর্যে স্নিগ্ধ সারস্বত মন্দিরে। এই সব দিক্ থেকেই নজরুলের ব্যক্তিত্ব অগতানুগতিক, বিস্ময়কর রূপে 'আনকনভেনশন্যাল'। অর্থাৎ, প্রচলিত জীবনভূমিতে তাঁর অন্তর-চেতনা প্রত্যাশিতের বিপরীত, অথবা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার রচনা করেছে।

আর নজরুলের এই আশ্চর্য ব্যক্তি-প্রেরণার উৎস ছিল তাঁর প্রখর-দীপ্ত স্বয়ং-স্বরেখ আত্মশক্তি,—তাঁর ego। আসলে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, সব কিছুর মধ্য দিয়েই শিল্পী চিরকাল তাঁর অন্তরলীন সেই অনন্য নিঃসঙ্গ ego-রই রূপ-রচনা করেছেন। জগৎ-ব্যাপ্ত অসীম অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে পুনঃপুনঃ তিনি অনুপ্রবেশ করেছেন নিজ আত্মার গভীর গহন মন্দিরে। সেই জগতে বসে একান্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে বিশ্বজগতের দুঃখদাহ ভরা অভিজ্ঞতাকে নিঙ্ড়ে মালা গেঁথেছেন, নিজ আত্মশক্তির (ego-র) নিভৃত বাসনার মাধুরী মিশিয়ে। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এমন তীব্র, একনিষ্ঠ 'ego-অভিমুখিতা' আর কোনো শিল্পীর মধ্যে দুর্লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের ধ্যানী আত্মার প্রশান্তি আত্মশক্তির উগ্রতাকে প্রখর হতে দেয়নি। কিন্তু নজরুলের egoism চির অশান্ত, অসীম, তীব্র,—এখানে তিনি স্বয়ং মধুসূদনের সগোত্র; অথচ মধুসূদনের চেয়ে অনেক বেশি ভাব-অচেতন। ফলে তিনি আমাদের অসংখ্য দুঃখ-হতাশা-বেদনা-মন্থিত জীবনেরই অধিবাসী হয়েও আত্মলীন এক স্বপ্নিল দৃষ্টির কল্যাণে বস্তুজগতের এই রূঢ়ভূমিতে চির-পরবাসী। আঘাত-বঞ্চনা পেয়েছেন কম নয়,—বাস্তবিক অভিজ্ঞতায় তাকে সঠিক অনুভব করেছেন, তাহলেও সে সম্পর্কে আত্মার প্রতিক্রিয়া কিন্তু রচিত হয়েছে অন্তর-গহনে লীন নিভৃত-স্বতন্ত্র আত্মশক্তির (ego) পাদপীঠে। এই অর্থেই বলছিলাম, নজরুলের সৃষ্টি বিশেষভাবে—একান্তভাবেই তাঁর আত্মসৃষ্টি; অর্থাৎ তাঁর যথার্থ-সফল সকল রচনাতেই এই অনন্য ego-র স্বেচ্ছামুক্তি। নজরুলের কবিতা প্রসঙ্গে রূপকর্মের অনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলাহীনতার বিতর্ক এককালে উদ্দাম হয়েছিল; আজও তা নিরর্থক নয়। আসল কথা কবিতার ভাব-স্বভাবের মত বহিঃশরীরের রূপায়ণেও ব্যক্তি-নজরুলের কোনো সচেতন প্রভাব বিস্তারের উপায় ছিল না;—'কবির অন্তরে যিনি কবি',—কবি নজরুলের সেই দুরন্ত দুর্মদ ego নিজেকে যথেচ্ছ সৃষ্টি করেছে ব্যক্তি-নজরুলের লেখনীর হাত ধরে। তাই বর্তমান উপলক্ষ্যে কবির সেই অন্তঃশক্তি,—সেই ego-র স্বভাব সন্ধান না করে উপায় নেই।

এদিক থেকে নজরুলের আত্মসত্তাকে অমিত যৌবনের শক্তি-মূর্তি বলে অভিহিত

করা যেতে পারে। যৌবন যেন জীবনের এক অতল স্পর্শ অপার পাথার। প্রাণশক্তির সুরাসুরে মিলে যৌবনের সমুদ্রে চলে অমৃত-পিপাসু আত্মার সমুদ্রমন্থন। যৌবনের গভীরে যেখানে দেবতার স্থমিতি, দেবতার সংযম, সেখানে অমৃতের শাশ্বত প্রতিষ্ঠা। অমৃতে অমরতার অধিকার সঞ্চিত রয়েছে; কিন্তু অনন্ত প্রাণের নিরবধি জীবনানন্দের প্রতিশ্রুতি কই তাতে! দেবতারা অমর,—কিন্তু অপার আনন্দিত কি? আনন্দের বাসনা জন্ম নেয় বেদনার অন্ধকার পাথার তলে;—অসীম দুঃখের অমানিশা পেরিয়ে মুহূর্তের উষারুণরাগে তার অনির্বচনীয় অভিব্যক্তি। 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সে উপলব্ধির সার্থক রূপায়ণ করেছেন।— জীবনের মর্মলীন ব্যথার রক্তবৃন্তে ফোটে আনন্দের শ্বেত-শতদল। পদ্ম ক্ষণিক; কিন্তু রক্তিম মৃণাল চিরদিনের। এই ব্যথা-বেদনা-দুঃখের অভিঘাত যত অ-পরিমাণ অ-প্রমেয়, আনন্দের বাসনা তত উদগ্র অমিত; তত অতৃপ্ত এবং নিরবধি। একে যৌবনের আসুর শক্তি বলব না,—অপার দুঃখ-যন্ত্রণায় আর্ত, অথচ আনন্দের পিপাসায় চির-উন্মুখ এই জটিল জীবনধর্ম মর্ত্যমানবের চিরন্তন সম্পদ। নজরুলের কবি-চেতনায় যৌবনের সেই অমিত শক্তি! আনন্দ-ঋষি লাভের চরিতার্থতা নেই এতে,—নিরানন্দ জীবনে ব্যথার জ্বালাময় পসরা ভরে রয়েছে আনন্দ-পিপাসুতার উদগ্র উচ্ছ্বাস। এদিক থেকে তাঁর সকল সফল সৃষ্টিই 'ব্যথার দান,'—গল্পগুলোও তাই।

'অগ্নিবীণা'র বিদ্রোহী কবি আত্মপরিচয় দিতে বলেছিলেন,—"এক হাতে মোর বাঁশের বাঁশরি, আর হাতে রণতূর্য।" 'ব্যথার দানে'র গল্পগুলো সম্বন্ধেও একই কথা। যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত হয়েছিল অধিকাংশ গল্প। আর তাদের ঘটনাস্থল ভারতবর্ষের বাইরে। একমাত্র শেষ গল্প 'রাজবন্দীর চিঠি' গল্পটি ভারতবর্ষের জেল থেকে ভারতীয় রাজবন্দীর লেখা। গল্প গ্রন্থটি 'মানসী'কে উৎসর্গিত। এঁর সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত জীবনের কোনো শরীরী প্রিয়ার যোগ আছে কিনা, সে কৌতূহল অবান্তর। গল্পগুলো ব্যক্তিকবির অন্তরবাসিনী 'মানসী'—তাঁর ego-র প্রিয়ারূপকে বক্ষে ধরে এসেছে। একদিকে প্রেমের জন্যে অমিত যৌবনের বিষদগ্ধ উৎকণ্ঠা,—আর একদিকে যুদ্ধের মরণ-ভীষণ কর্মভূমির আকর্ষণ, এ দুয়ের মধ্যে হাবিলদার কবির কল্পনা উন্মথিত হয়ে ফিরেছে।

গল্পের শরীরে 'আধুনিক' জীবনের যৌন জটিলতা এবং স্বদেশী আদর্শবাদের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ রয়েছে;—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গল্পগুলো নর-নারীর প্রণয় সমস্যার দেহ-মনোগত স্বভাব-চিত্রণের অভিমুখী। কিন্তু কবির স্বতউচ্ছ্বসিত কল্পনা সারা গল্পের দেহে আবেগের মদিরা ছড়িয়ে দিয়ে তাকে বস্তু-ভারহীন এক আশ্চর্য ভাব-বিমূর্তি

দিয়েছে। ফলে গল্প ধরেছে কবিতার রূপ,—যে কবিতা কেবল কবির অন্তর্লীন ego-র আত্মসৃষ্টি।

প্রথম গল্প 'ব্যথার দান'—দারা, বেদৌরা ও সয়ফুল-মুলুক্-এর আত্ম-বিবরণীর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। বেদৌরাকে দারা ভালবেসেছিল আকৈশোর। সেই প্রেমের উৎসভূমি পুণ্যস্নাত হয়েছিল দারার মায়ের মৃত্যু মুহূর্তের আশীর্বাদে। নবীন যৌবনে ভরা-জীবনের স্বপ্ন দেখে দিন কাটে তাদের,—এমন সময়ে এল বেদৌরার ঐতিহ্যদম্ভী মামা। গরীব চাষার ছেলের হাতে কিছুতে ছেড়ে দেবে না সে বেদৌরাকে। দারা ছুটে গেল যুদ্ধক্ষেত্রে,—বেদৌরা মাতুলালয়ে। প্রবৃত্তির আকর্ষণ অমেয়; সয়ফুল-মুলুক্-এর মোহে আত্মসমর্পণ করল বেদৌরা। কিন্তু প্রবৃত্তির চরিতার্থতা নেই; বেদৌরা চির অতৃপ্ত। এদিকে দারা ফিরে এল সাফল্যের সমৃদ্ধি নিয়ে। কিন্তু বেদৌরার মন তখন পবিত্রতার স্বরূপ জেনেছে, তা হলেও শরীর যে তার অপবিত্র! অনেক কুণ্ঠা অনেক আত্মধিক্কারের শেষে দারার কাছে আত্মসমর্পণ করে সে;—কিন্তু দারা তাকে গ্রহণ করতে পারে না তখনই। বেদৌরাকে কুণ্ঠাহীন চিত্তে গ্রহণ করতে পারলে তবেই তাকে ডাক্‌বে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার যুদ্ধে ফিরে যায় দারা। সেখানে অনুশোচনার্ত সয়ফুল-মুলুক্‌ও হয় তার সঙ্গী। যুদ্ধে স্বদেশের জয় হল, সেই জাতীয় বিজয় ক্রয় করল দারাই মহৎ মূল্যে,—তার অন্ধ বধির জীবনের শূন্যতা দিয়ে। সয়ফুল-মুলুক্ দারার ক্ষমা পেয়েছে,—বেদৌরা পেয়েছে দারার সঙ্গ। দেহের দৌলত হারিয়ে মনের পবিত্রতার মূল্য দিতে পেরেছে দারা।

গল্পের এই ছোট্ট 'থীম' নজরুলের বিদ্রোহী চেতনার উন্মথিত আবেগে সীমাতিক্রমী কবিতার রূপ পেয়েছে; বেদৌরার কথার একটি অংশে তার পরিচয়,—"বাইরে ফাগুনের উদাস বাতাস প্রাণে কামনার তীব্র আগুন জ্বালিয়ে দিলে। ঠিক সেই সময় কোথা থেকে ধূমকেতুর মত সয়ফুল-মুলুক্ এসে আমায় কান-ভাঙানি দিলে—ভালবাসায় কি বিরাট স্নিগ্ধতা আর করুণ গাম্ভীর্য, ঠিক ভৈরবী রাগিণীর কড়ি মধ্যমের মত! আর এই বিশ্রী কামনাটা কত তীব্র-তীক্ষ্ণ নির্মম। এই বাসনার ভোগে যে সুখ, সে হচ্ছে পৈশাচিক সুখ। এতে শুধু দীপক রাগিণীর মত পুড়িয়েই দিয়ে যায় আমাদের! অথচ এই দীপকের আগুন একবার জ্বলে উঠ্‌বেই আমাদের জীবনের নব ফাল্গুনে! সেই সময় স্নিগ্ধ মেঘ-মল্লারের মত সান্ত্বনার একটা কিছু পাশে না থাক্‌লে সে যে জ্বলবেই—দীপক যে তাকে জ্বালাবেই।"

অন্ধকামনার বিষবনে ভালবাসা যৌবনের ফুল।—তাই যৌবনের ভিত্তিমূলে কামনা-বাসনার অবস্থান অনপনেয়—এদিক থেকে কামনা-বাসনা যৌবনের—ভালবাসার অপরিহার্য অনুষঙ্গ। ভালবাসার অঙ্গে আত্মগোপন করে এলে তার নিরাবরণ দাহ স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু প্রিয় যেখানে অনুপস্থিত, প্রেয়র আকাঙ্ক্ষা-রহিত যৌবন-ভোগলিপ্সা তখন লালসার আকার ধরে। প্রেমের এই যৌনতা-নির্ভর স্বভাবের দুঃসাহসী ইঙ্গিত রয়েছে এখানে। কিন্তু সব কিছুই কবির ভাবনায়, কবিতার ভাষায় কাব্য-সুরভিত। ফলে, গল্পের স্থূল দেহটি নজরুলের গল্পে সুরেখ হতে পারেনি—গল্পের পাত্রে তিনি তাঁরই লেখা প্রেম-সংগীতের স্বাদ পরিবেশন করেছেন,—কেবল পৃথক্ আধারে।

'রিক্তের বেদন'-এর গল্প-স্বভাবও মোটামুটি অভিন্ন। তাতে গল্প ও কথিকার মোট সংখ্যা আটটি। 'ব্যথার দান'-এ গল্প সংখ্যা ছয়।

গল্প হিশেবে এরা অবিস্মরণীয় নয়,—না শৈলীতে, না বিষয়-বিন্যাসে। কিন্তু ইতিহাসের দরবারে এই সংস্কারমুক্ত অনন্য রূপ-রচনার প্রসঙ্গ অবান্তর নয়, বিশেষ করে অপর সকল নজরুল-রচনার মত এদের অদ্ভুত অভিব্যক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্যে। 'কল্লোল'-যুবকদের মত শৃঙ্খলা-রাহিত্য এবং যৌন উৎকণ্ঠার প্রতি লক্ষ্য রেখেই বর্তমান প্রসঙ্গে এই অভিনব রচনা-প্রবন্ধের পরিচয় সবিশেষ স্মরণীয়।

চতুর্দশ অধ্যায়

দ্বিতীয় পর্বের বাংলা গল্প (২)

কল্লোল ও কল্লোলেতর

১। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

অচিন্ত্য-প্রেমেন-বুদ্ধদেবের আগেই 'কল্লোলে'র তীরে ভিড়েছিলেন শৈলজানন্দ (জন্ম—১৯০১ খ্রীঃ)। তাঁর আশ্চর্য গল্পের প্রবাহ অজস্র ধারায় একের পর এক প্রকাশিত হয়েছে 'কল্লোল'-'কালিকলমে', এবং অপরাপর সমধর্মী-পত্রিকায়। তাছাড়া, 'কালিকলম'-এর (১৩৩৩-১৩৩৬ সাল) তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকদেরও একজন; প্রথম দুবছর প্রেমেন্দ্র মিত্র আর মুরলিধর বসুর এক সঙ্গে পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। তবু সৃষ্টির প্রবণতায় তিনি 'কল্লোলে'র নন—বহির্জীবনের ঘনিষ্ঠতায় একান্ত অন্তরঙ্গ, এবং রচনা-প্রকাশ ও সম্পাদনার কর্মজগতে সহযোগী সতীর্থ হলেও শিল্পি-আত্মার স্বধর্মে শৈলজানন্দ স্বতন্ত্র;—বাংলা ছোটগল্প সৃষ্টির ইতিহাসে হয়ত বা নিঃসঙ্গ একক পথিক।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়, অচিন্ত্য-প্রেমেন-বুদ্ধদেবের সৃজন-ভাবনা এবং শৈলীর মধ্যেও পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের ব্যবধান তীক্ষ্ণ, সুচিহ্নিত। তা সত্ত্বেও 'কল্লোল'-সাধনার ত্রয়ী বা ত্রিপীঠরূপে তাঁদের পরিচয় সংগ্রহ করে এসেছি,—কারণ সৃজনী-চেতনার উন্মীলন লগ্নের উৎকণ্ঠা-সাদৃশ্যে এঁরা সমানধর্মা। অচিন্ত্যকুমারের পূর্বোদ্ধৃত উক্তির পুনরবতারণা করা যেতে পারে এখানে,—"বস্তুতঃ কল্লোল যুগে এ-দুটোই প্রধান সুর ছিল, এক প্রবল বিরুদ্ধবাদ; দুই বিহ্বল ভাববিলাস।"[১] আর এই সুর-বৈশিষ্ট্যের নিরিখেই 'কল্লোল যুগে'র পরিকল্পনা; নইলে 'কল্লোল' পত্রিকার লেখক মাত্রই কল্লোলধর্মী শিল্পী নন।

এই নিরিখেই শৈলজানন্দের মৌল প্রকৃতি 'কল্লোল'-চেতনার থেকে আমূল পৃথক্। 'প্রাবল্য' বা 'বিহ্বলতা'র আতিশয্য কোথাও নেই তাঁর মধ্যে; না সৃষ্টিতে, না প্রতিভার ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে। এমন এক নৈর্ব্যক্তিক স্বাচ্ছন্দ্যের মন্থরতায় তিনি আপ্লুত-চেতন, যার ফলে ভাবতে ইচ্ছে হয়, শিল্পী বুঝি জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরুৎসুক, এবং নিরুদ্যমও। নিজের সমগ্র শক্তিকে সংহত সচেতন

১। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—'কল্লোল যুগ'।

করেও 'বিরুদ্ধভাব' বা 'ভাববিলাস'-এর সমুচিত উৎসাহ-উত্তেজনা নিজের মধ্যে সঞ্চয় করে ওঠা শৈলজানন্দের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অন্তত তাঁর সৃজন-চেতনা ততটা সচেতন কখনোই হয় নি; যার ফলে মাঝে মাঝেই মনে হতে বাধা নেই যে তাঁর শিল্পিসত্তা স্বভাব-মন্থর, অংশত বুঝি নিঃসাড়ও। বস্তুত বুদ্ধদেব বসু বলেছেনও তাই। প্লট-এর অনুচ্ছ্বসিত পরিমিত বর্ণনার গুণে শৈলজানন্দের গল্পের শরীরে যে এক স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত সহজ গতির প্রেরণা জেগেছে, মোপাসাঁর নৈর্ব্যক্তিক বাগ্‌ভঙ্গির সঙ্গে সেই আশ্চর্য শৈলীর তুলনা করেও বুদ্ধদেব লিখেছেন—[Sailajananda] "writes with instinct than intellect, without, I suspect, knowing or even intending the effect he is going to produce. There is nothing brilliant about him ; he is slow, seems slow witted, he is quiet and seems to be indifferent."[২]

এই মূল্যায়নের প্রসঙ্গে বিচারকের মূল্যমানের কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। বুদ্ধদেব বসুর প্রতিভায় আত্মচেতনার যে প্রখর প্রাবল্য রয়েছে, 'কল্লোল'-চেতনারূপে অধুনা পরিচিত অনিয়মাধীন উদ্দামতার তীব্র আতিশয্যে তা কুল-ভাঙ্গা। সেই 'কল্লোল'-স্বভাবের তুলনায় শৈলজানন্দ, 'slow', 'slow witted', 'quiet';—এ পার্থক্য কেবল পরিমাণগত (quantitative) নয়, গুণগতও (qualitative);—তাই প্রায় আমূল!

এক জায়গায় সুসম্পূর্ণ 'কল্লোল'-প্রতিনিধিদের সঙ্গে শৈলজানন্দের সাদৃশ্য রয়েছে, সে কেবল জীবনের অন্ধকার-ভরা দীনতার রূপ-চিত্রণে, এবং এক সহজ অতৃপ্তি বোধে। কিন্তু তাতেও ব্যবধান কম নয়। জীবনের পুঞ্জিত অন্ধকারের খোঁজে ঘুরে-ফিরে শৈলজানন্দ মাটির তলায় যে কালো গহ্বরের গভীরে গিয়ে পৌঁচেছেন, বিশেষভাবে তাঁর লেখনীকে অনুসরণ করেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সর্বপ্রথম সেই অনাবিষ্কৃত ক্ষুরধার জীবনভূমিতে পদপাত করেছে। বুদ্ধদেব অন্তর্মুখী শিল্পী, কিন্তু প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্যের বস্তু-জীবন-অভিজ্ঞতার পুঁজি প্রায় অকূলপাথার, তা হলেও শৈলজানন্দের 'কয়লা কুঠির জগৎ' তাঁদের থেকে অনেক দূরে। আর সে অতৃপ্তির সুর! সেদিন তা ছিল জীবন-স্বভাবের এক সাধারণ লক্ষণ, কেবল বাংলাদেশের পক্ষেই নয়,—ভারত তথা প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর সারা পৃথিবীর পক্ষেই। প্রমথ চৌধুরী সেদিন পবিত্র গাঙ্গুলিকে বলেছিলেন,—"আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষা ঠুকঠাক করে জনকতকের মনের

২। B. Bose—"An Acre of Green Grass".

নিদ্রাভঙ্গ করেছিল। তারপর এই যুদ্ধ এক ঘায়ে দেশশুদ্ধ লোকের মনের নিদ্রাভঙ্গ করেছে। হয়তো তারা জানে না তারা ঠিক কি চায়, কিন্তু যা আছে তাতে যে তারা সন্তুষ্ট নয়—এতো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।" শুধু তাই নয়, এ-সত্যও চৌধুরী মশায়ের বুদ্ধি-তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায়নি যে, "সারা দুনিয়াই যুদ্ধের উপসংহার দেখে নিরাশ হয়েছে।"[৩]

বর্তমান উপলক্ষ্যে চৌধুরী মহাশয়ের এই বাচনিক অভিমতের উদ্ধৃতি নিছক কাকতালীয় নয়। রাজনীতি-অর্থনীতি, এমনকি সমাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁর মতবাদ-নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য ও সত্যান্বেষিতা ছিল সর্বদাই অতন্দ্র। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সকল প্রকারের ism-এর মাদকতাকে কেবল পরিহার করেই তিনি চলেন নি,—সেই বিহ্বলতার বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর প্রায় একমাত্র জেহাদ। তাই তাঁর সর্বনিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক মননের এই অপ্রস্তুত-প্রকাশের মধ্যে সমকালীন ইতিহাসের যথার্থ পরিচয় আবিষ্কার করা যেতে পারে বলে বিশ্বাস করি। সে ছিল এক শ্রান্তিহীন অতৃপ্তিবোধ ; অপরিচিত নূতনের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠা-ভারাতুর!

কিন্তু এই প্রসঙ্গেও স্বীকার করতেই হয়,—মানুষের কোনো মূল্যবোধই নিরালম্ব বস্তু-সর্বস্ব নয়। নির্জীব যে তথ্যপুঞ্জকে 'বাস্তব' বলি, ব্যক্তির অনুভবের মধ্যেই তার যথার্থ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। শিল্প-সাহিত্যের পক্ষে এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই। ফলে প্রথম যুদ্ধোত্তর বিশ্বজীবনের পটভূমিতে অতৃপ্তিবোধের যে 'বাস্তব' উপাদান প্রায় সর্বসাধারণ হয়েছিল, তার ফলশ্রুতি শিল্পি-মনের আত্মবিকিরণের (self-projection) কল্যাণে বিভিন্ন জনের রচনায় বিচিত্র আকার ধরেছে। 'কল্লোল'-চেতনায় 'বিরুদ্ধবাদ' অথবা 'নিরর্থকতাবোধের' 'ভাব-বিলাসে' শিল্পীর এই আত্ম-প্রক্ষেপ যখন সচেতনভাবে উদ্যত খড়্গের মত প্রখর, শৈলজানন্দের জীবন-বোধ তখন গভীর বলেই প্রশান্ত ;—মনে হয়, নিবিষ্ট বলেই যেন উদ্যম-উদ্দীপনার আতিশয্য-রহিত।

'কল্লোল'-ধারার পরিবাহকরূপে পরিচিত গল্প-শৈলী ও গল্পকারদের থেকে শৈলজানন্দের এই স্বভাব-পার্থক্যের ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথের উক্তিতেও অস্পষ্ট থাকে নি ; "শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি। দেখেছি, দরিদ্র জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা, সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্যঘোষণার কৃত্রিমতায় তাঁর বিষয়গুলি সাহিত্য-সভার মর্যাদা অতিক্রম করে নকল দারিদ্র্যের শখের যাত্রার পালায় এসে ঠেকে নি। 'নবযুগের সাহিত্যে নূতন একটা কাণ্ড করছি' জানিয়ে পদভরে ধরণী কম্পমান করবার দাপট আমি তাঁর দেখিনি। দরিদ্র নারায়ণের পূজারীর মস্ত একটা তিলক তাঁর কপালে কাটা নেই। তাঁর কলমে

৩। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—'চলমান জীবন' (প্রথম পর্ব)।

গ্রামের যেসব চিত্র দেখেছি, তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন বলেই ঠিক কথা বলার কারি-পাউডারি ভঙ্গিটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয় নি।"[৪]

একই সঙ্গে 'আধুনিকতা'র পরস্পর-বিরোধী নানা প্রবাহ যখন বাংলার সাহিত্য-জগৎকে প্রকম্পিত করছিল,—বলা বাহুল্য এই মূল্যায়ন সেই উত্তপ্ত মুহূর্তের। ফলে শৈলজানন্দের প্রশংসা উপলক্ষ্যে সমকালীন অপরাপরদের সঙ্গে তুলনা-পদ্ধতি তির্যক্ বাগ্‌ভঙ্গি অনুসরণ করেছে। তাতে ব্যক্তিগতভাবে কারও নিন্দা বা তিরস্কার করা অবশ্যই কবির কাম্য ছিল না। কিন্তু সৃষ্টির এক সহজ শৈলী রয়েছে, যেখানে অতিশয় আত্ম-প্রকটন (self-exhersion) কৃত্রিম কসরৎ-এর মত-ও মনে হয়। শক্তির প্রাচুর্য সত্ত্বেও 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ অনেকের রচনাতেই সে ত্রুটি রবীন্দ্রনাথ নিজে নির্দেশ করেছিলেন। যথার্থ শক্তিমান্ যাঁরা, পরবর্তী কালে এই আতিশয্যের খোলস তাঁদের সকলের রচনা থেকেই অল্পবিস্তর খসে পড়েছিল। কিন্তু গোষ্ঠীগঠনের মাদকতাময় প্রথম পর্যায়ে অতিশায়িতা-প্রসূত এই নির্মোক-রচনাই সার্থক শক্তির লক্ষণ বলে একদা বিবেচিত হয়েছিল। অথচ ওপরের রবীন্দ্র-কথা থেকেই বুঝি, জীবনের প্রতি ঘন নিবিষ্টতার কল্যাণে শৈলজানন্দ প্রথমাবধি মোহ-মুক্ত,—তাই 'কল্লোল'-প্রবাহের নিকটতম প্রতিবেশী হয়েও, এমনকি বহিঃদৃষ্টিতে সেই ধারার একান্ত অন্তর্ভুক্ত মনে হলেও, সুচিহ্নিত—সুচিন্তিত রূপে তিনি কল্লোলেতর!—কল্লোলেতর তিনি তাঁর সর্বমোহরহিত ভারসাম্যবোধে, নিবিষ্ট-প্রশান্ত জীবনানুভবের গভীরতায়,—এবং অতিশয় আত্মপ্রক্ষেপহীন অনুচ্ছ্বসিত স্বভাব বর্ণনায়।

তাই বলে গতানুগতিক, বা নিষ্প্রাণ নন কিছুতেই শৈলজানন্দ,—বরং প্রথম আবির্ভাবেই চমকপ্রদ,—অভিনবতম। নিজের রচনা-পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন,—"আমার গল্পের সর্বপ্রথম পরিমণ্ডল কয়লার খনি, এবং চরিত্রেরা সব সাঁওতাল কুলিমজুর।"[৫] সেকালের কল্লোলীয় আধুনিকতাবোধের মূলে বিষয়-মদিরতার আতিশয্যও কম ছিল না। অর্থাৎ, জীবনের নিষিদ্ধ অথবা অপরিচিত অন্ধকারে পথ খুঁজে পাওয়া, অথবা তার সদম্ভ প্রকাশনায় স্রষ্টার উৎসাহ যেমন প্রখর ছিল, তার উচ্চকণ্ঠ প্রশংসার উল্লাসও ছিল তেমনি বন্ধনহীন। ফলে নিষিদ্ধ-বিষয়মোহের প্রান্তরে অনেক শক্তিমান শিল্পীও সেদিন পথ হারিয়েছিলেন,—গল্প-শিল্পী যুবনাশ্ব নিঃসন্দেহে তাঁদের একজন। কল্লোলযুগের মুখ্য প্রতিনিধিদের মধ্যে যাঁরা অপ্রতিহত গতি, তাঁদেরও কারও কারও শক্তির মসৃণতা একই মোহমদিরতার বালুচরে ঠেকে

৪। রবীন্দ্রনাথ—'সাহিত্যের পথে'-গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী ২৩শ খণ্ড।

৫। জ্যোতিপ্রকাশ বসু (সঃ) 'গল্পলেখার গল্প'।

দীপ্তি হারিয়ে চলেছে মাঝে মাঝে। শৈলজানন্দের বেলা এমন দুর্ঘটনা প্রায় একেবারেই ঘটেনি,—এখানেই তাঁর কল্লোলেতর স্বাতন্ত্র্য, তথা সিদ্ধকাম গল্প-সৃজন-প্রেরণার মুখ্য উৎস।

বস্তুত অভিনবতার বিচারে শৈলজানন্দের আবিষ্কার সর্বাপেক্ষা 'আধুনিক', —আর তাই তাঁর বর্ণনা সবচেয়ে মদিরা-রসান্বিত হতে পারত। বাংলার অর্থনীতির ইতিহাসের খবর থেকে জানা যায়, সম্ভবত ১৮২০ খ্রীস্ট সালে রানীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লা শিল্পের প্রথম প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল।[৬] আর কয়লাকুঠির ইতিকথা আশ্রয় করে শৈলজানন্দের প্রথম গল্পের প্রকাশকাল তার প্রায় একশ বছর পরে,—১৩২৯ বাংলা সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে'কয়লাকুঠি' গল্পের প্রথম প্রকাশ। খ্রীস্টাব্দের তখন ১৯২২। প্রায় একই সময়ে 'প্রবাসী'-তে একই প্রসঙ্গে রচিত কয়েকটি গল্প পরপর প্রকাশিত হয়ে শিল্পীর প্রতিষ্ঠাভূমিকে নিরঙ্কুশ করে তোলে। 'প্রবাসী'তে প্রথম গল্পের প্রকাশ ঘটে ঐ একই বছরের ফাল্গুন মাসে,—গল্পের নাম 'রেজিং রিপোর্ট'। লক্ষ্য করবার কথা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে, তথা বঙ্গের পশ্চিম প্রত্যন্তে নূতন শিল্পাঞ্চল গঠনের উদ্যমের কল্যাণে কয়লাখনি অঞ্চলের কর্মতৎপরতা তখন বহু ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল;—ব্যবসা এবং চাকুরির উমেদারীতে শিক্ষিত বঙ্গ-সন্তানেরা ঐ সব জনবিরল দুর্গম অঞ্চলে যাতায়াত আরম্ভ করেছিলেন। তবু কয়লাখনির জীবন-প্রচ্ছদে গল্প গড়তে গিয়ে শিল্পীকে সেদিন প্রাবন্ধিকের মত পাদটীকাশ্রয়ী হতে হয়েছিল। 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় দেখি, মূল গল্পনাম 'রেজিং রিপোর্ট'-এর 'ফুটনোট্'-এ লেখা হয়েছিল; "রেজিং রিপোর্ট,—খনি হইতে কয়লা তোলার যে মোট হিসাব মালিকের কাছে পাঠাইতে হয়, তাহার নাম—'রেজিং রিপোর্ট'।

রেজিং (Coal-Raising)—কয়লা তোলা।"

বলা বাহুল্য,—গোটা গল্পে অনুরূপ পাদটীকাঙ্কনেরপ্রয়োজন এখানেই শেষ হয় নি।

সন্দেহ নেই, গল্পবিন্যাসের এই ভঙ্গী পাঠক সাধারণের বোধ-সৌকর্যের জন্যই পরিকল্পিত হয়েছিল। তবু তার মূলগত কৌতুক-করতা গল্প-বিষয়ের চেয়ে কম অপূর্ব —কম চমকপ্রদ ছিল না। এই গল্পকে আশ্রয় করেই শিল্পী শৈলজানন্দ-সম্পর্কিত চমক ব্যক্তি-পরিচয়ের ক্ষেত্রে আরও দূর-প্রসৃত হতে পারে। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত প্রথম গল্পে লেখকের নাম ছাপা হয়েছিল শৈলজা মুখোপাধ্যায়। নারীপ্রগতির অগ্রদূত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রখ্যাত 'প্রবাসী' পত্রিকায় লেখা ছাপাবার অদম্য প্রয়াসে সেকালের অনেক উদীয়মান শিল্পীকেই এই কৌতুককর ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করতে

৬। নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য—'বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস'।

হত। কিন্তু শৈলজা আসলে শৈলজানন্দ নামের ভগ্নাংশ নয়; লেখকের পিতৃদত্ত নাম ছিল শ্যামলানন্দ,—ডাক নাম ছিল শৈল। বন্ধুদের মুখে মুখে 'শৈল' কখন শৈলজা হয়েছিলেন;—'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় ঐ নামেই শিল্পীর প্রথম আত্মপ্রকাশ। পরে শ্যামলানন্দের 'আনন্দ'টুকু যুক্ত করে শৈলজা হলেন 'শৈলজানন্দ।'[৭]

শৈলজানন্দের বিচিত্র বিষয়চারী গল্পসাহিত্যের অন্তর-উৎস সন্ধানের প্রয়োজনে তাঁর ব্যক্তি-পরিচয়ের সূত্র আরো একটু প্রস্তুত হতে পারলে ভাল। শিল্পীর পৈতৃক বাসভূমি বীরভূমের রূপসীপুর, মাতুলালয় ছিল বর্ধমানের অণ্ডালে; মাতামহ রানীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লাখনির প্রতিপত্তিশালী মালিক ছিলেন। পিতা ধরণীধর ছিলেন সে তুলনায় স্বল্পকৃতি, দরিদ্র। সাপ ধরতেন, ম্যাজিক দেখাতেন;—এ-গুলোই ছিল তাঁর জীবন-কর্ম। তিনবছর বয়সে শৈলজানন্দ মাতৃহীন; অথচ পিতা দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেছিলেন। শিশু-মনের সে নিঃসীম শূন্যতাবোধের প্রগাঢ় ছাপ পড়েছে তাঁর অনেক গল্প-উপন্যাসে। শৈশব-দুঃখের সে অনুভব এক অনপনেয় পরিণামহীন সেন্টিমেণ্ট-এর আকার ধরে ফিরেছে শিল্পীর অন্তর-গভীরে। কৈশোর এবং সদ্য-উদিত যৌবন-লগ্নের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত রানীগঞ্জের কয়লা-খনি অঞ্চলে মাতামহের সংসারে দিন কেটেছিল; নজরুল ইস্‌লামের সঙ্গে সেই কৈশোর-দিন থেকেই অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুতা। তখন নজরুল লিখতেন গল্প আর শৈলজানন্দ কবিতা। সে-এক পৃথক ইতিহাস! তারপর নজরুল চলে গেলেন যুদ্ধের সৈনিক হয়ে। শৈলজানন্দ পেছন দ্বার দিয়ে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে এলেন রায়বাহাদুর মাতামহের দৌলতে। কিন্তু সেই প্রাসাদবাসও শিল্পীর পক্ষে সুচিরস্থায়ী হতে পারেনি। 'বাঁশরী' পত্রিকায় গল্প লিখেছিলেন 'আত্মঘাতির ডায়েরী' নাম দিয়ে;—মাতামহ বুঝলেন না যে, গল্প কখনো আত্মকথা হতে পারে না। অতএব প্রাসাদচূড়া থেকে পথের ধুলায় নামতে হল—রানীগঞ্জের ধনিগৃহ থেকে কলকাতার মেস্-এ।[৮] ভাঙা বাড়ি আর ভাঙা সিঁড়ির নড়বড়ে আশ্রয়ে ঠোঙার ভেতর বারোভাজার মত গায়ে গায়ে জড়িয়ে আছে 'ধ্বংস পথের যাত্রী' যত। 'ধ্বংস পথের যাত্রী এরা' গল্পে (১৩৩১ সাল, কার্তিক সংখ্যা, 'প্রবাসী'-তে প্রথম প্রকাশিত) নিজের সেই মেস্-জীবনের 'শব-সাধনার' ইতিহাসই শিল্পী লিপিবদ্ধ করেছেন, অচিন্ত্য সেনগুপ্তের এই ইঙ্গিত অনস্বীকার্য।[৯]—"পথটায় যেমন কাদা, তেম্‌নি দুর্গন্ধ।" সেই পথের সীমা হারিয়েছে গিয়ে "একটা বহু পুরাতন ইঁট-বাহির-করা ভাঙা বাড়ির

৭। দ্র.—ডঃ সুকুমার সেন—'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'—৪র্থ খণ্ড।

৮। দ্র. জ্যোতিপ্রকাশ বসু (সঃ)—'গল্পলেখার গল্প'।

৯। দ্র. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—'কল্লোলযুগ'।

উঠানে"।…"পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বি একটা দোতলা বাড়ি, সমুখে কাঠের রেলিং দেওয়া বারান্দা, তাও আবার রেলিং স্থানে স্থানে ঝুলিয়া পড়িয়াছে,—আবার কোথাও বা আস্ত আছে; কুলি-ধাওড়ার মত উপর-নীচে সরাসরি অনেকগুলি অন্ধকার ঘর। সম্মুখে একটুখানি উঠান বাদ দিয়া তাহারই সমসমান্তরালে ঘরের আর একটা সারি চলিয়া গেছে কিন্তু তাহার আর দোতলা নাই,—ঘরের ভাঙা বারান্দা হইতে এ-পারের ছাতে আসিবার জন্য মাঝে মাঝে সেতু প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উঠানের মাঝে দুইটা জলের কল,—এ-ধারে একটা আর ওই ওধারে একটা। কিন্তু কল দুইটার চারিদিকে হিন্দুস্থানী, খোট্টা, ভাটিয়া, উড়িয়া, বাঙালি, নানাজাতীয় বিস্তর পুরুষ রমণী, লোটা টব বাল্‌তি ইত্যাদি লইয়া আপন আপন ভাষায় চেঁচামেচি করিয়া যেন হাট বসাইয়া দিয়াছে।" "—এরই চারিদিকে কামরায় কামরায় কোথাও বা স্যাকরার ঠক্‌ঠকানি শুরু হইয়াছে, কোথাও বা কামারশালার হাঁপর চলিতেছে,—একটা লোক লালরঙের একটা গরম লোহা সাঁড়াসি দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে, দুইদিক হইতে দুইজন তাহার উপর লোহার হাতুড়ি মারিয়া আগুনের ফিন্‌কি উড়াইতেছে। কোনো ঘরে বা ধোপার ইস্ত্রী চলিতেছে, আর তাহারই একটু দূরে একটা বন্ধ ঘরের দরজার গায়ে ভাঙা টিনের উপর চা-খড়ি দিয়া লেখা রহিয়াছে—স্টীলট্রাঙ্ক, বুটজুতা, চটিজুতা, সুটকেস্। মিস্ত্রী—সুখনলাল রুইদাস।…‥ চলাচলের সুবিধার জন্য জল ছপছপে উঠানটার উপর সারি দিয়া ইঁট পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই একটা ভাঙা ইঁটের উপর অতি কষ্টে দুইটা পা রাখিয়া একজন প্রৌঢ় বাঙালী ভদ্রলোক, ঘটি হাতে করিয়া জল লইবার জন্য কলতলার জনতার একপাশে উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। চেহারা অত্যন্ত কদাকার,—পেটটা যেমন মোটা, গলাটা আবার তেমনি সরু, মাথার উপর প্রকাণ্ড একটা টাক, চোখ দুইটা নিতান্ত ছোট, নাকের নীচে বিড়ালের মত খাড়া হইয়া যে কয়েকটি গোঁফ উঠিয়াছে, দূর হইতে অনায়াসে সেগুলি গনিতে পারা যায়।"

ইনিই প্রখ্যাত ইম্পিরিয়াল হোস্টেলের স্মরণীয় অধিকারী,—কালীঘাটের সেই পূতিগন্ধময় অন্ধগলিতে যার আশ্রয়-আনুকূল্যে জড় হয়েছিল ভদ্রতার জীর্ণ খোলসধারী ধ্বংসপথের যাত্রীরা সব।

ফল কথা, শৈলজানন্দের জীবন-অভিজ্ঞতা ত্রিপথগা,—কয়লা খনির আদিম জীবনরূপ,—মহানগরীর জৌলস ও উজ্জ্বলতার অন্তরালে শিল্প-শহরের স্বাভাবিক ক্ষুধা আর লালসা, আর একদিকে বাংলার গ্রামীণ জীবনের রাঢ়পল্লীর শান্ত, স্নিগ্ধ, ক্ষয়িষ্ণু রূপ। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়, উচ্চবিত্ত অভিজাত আত্মীয় সমাজে অপেক্ষাকৃত

অস্বীকৃত, নিষ্প্রভ পিতার প্রতি মমতার সঙ্গে পিতৃ-ভূমির পরিমণ্ডলের প্রতিও শৈলজানন্দের চিত্তবৃত্তি আন্তরিকতার আকর্ষণে বাঁধা পড়েছিল। বৈবাহিক সূত্রেও বীরভূমের পল্লীজীবনের সঙ্গে সম্পাদিত হয় নূতন ঘনিষ্ঠতা। আর শৈলজানন্দের গল্প-সাহিত্যে তাঁর এই বিচিত্র অভিজ্ঞতারই স্বভাব-পরিণতি। আত্মপ্রতিষ্ঠা অথবা আত্মভাবনার অতিশয় প্রতিফলনের প্রয়াস তাতে মূকপ্রায়,—তবু চেনাজীবনের নির্জীব প্রতিরূপ—তথা বাস্তবের নিছক ফটোগ্রাফ নয় ঐ-সব গল্প; বস্তুর ভেতরেও যে প্রাণ রয়েছে,—ক্ষণে ক্ষণে তার নিভৃত রূপটি খুঁজে পেয়েছেন গল্প-শিল্পী শৈলজানন্দ, এখানেই তাঁর অতুলনীয়তা ;—এখানেই তাঁর নূতনত্বের যথার্থ চমক !

কয়লাকুঠির জগতেই আবার ফিরে যাওয়া যেতে পারে ;—শৈলজানন্দের যা প্রাথমিক গল্প-বিষয়। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকেই 'কল্লোল' পত্রিকার গল্প-লেখক তিনি। ঐ বছরের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত গল্পের নাম 'নারীর মন' :—বাসন্তী পূজার দিন আকাশ-বাতাস বসন্ত মদিরতায় বিবশ ;—এমন দিনে খুন চেপেছে ভুলির মাথায় ;—পীরু মাঝির বউ ভুলির। একজনকে খুন করবেই সে আজ,—হয় স্বামীকে, নয় টুরনীকে। ভুলির ছোট বোন টুরনী। পীরু না হয় পুরুষ মানুষ, কিন্তু টুরনী ! চারদিকে অত যে কানাকানি, অত লোক-গুঞ্জন, কিছুই বোঝে না সেও ? দূর গ্রামের বাসন্তী পূজার মেলায় গেছে দুজনে মিলে সেই কখন ভোরে। সারাদিন ভুলি রেঁধেছে ঘরে বসে,—ক্ষিদেয় পেট মোচড়াচ্ছে তার, তবু দুজনের কারোরই ঘরে ফেরার চাড় নেই, রাত হয়েছে কত !

খুন চেপেছে ভুলির। হন্যে হয়ে বাসন্তী জ্যোৎস্না-প্লাবিত মাঠের মাঝ দিয়ে ছুটে চলে সে। চারদিকে আলোয় আলোকময় হয়ে উঠেছে আনন্দমুখর জনতার মেলা। কোথাও কবিগান, কোথাও যাত্রা, দোকান-পাট, কেনা-বেচা, সংগীত, উল্লাস, উদ্দামতার অবধি নেই। শীতের রাত্রে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে খুঁজে ফেরে ভুলি দুটি মানুষকে। অবশেষে যাত্রার আসরে গিয়ে খুঁজে পায়,—আসরের মাঝখানে একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে দুজনে,—তন্ময় হয়ে দেখছে অভিনয়,—আরও তদ্গত হয়েছে বুঝি পরস্পরের কবোষ্ণ স্পর্শে। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে বসে ভুলি, কি-করে যে অত লোকের ভিড়ে পথ করে ছুটে যায় ওদের কাছে, সে নিজেও জানে না। চুপি চুপি টুরনীর মাথায় হাত রাখে,—ইঙ্গিত করে তাকে বেরিয়ে আসতে। দুই বোন বাইরে আসে। ভুলির মাথায় আগুন জ্বলছে তখন—বাইরে এসেই বোনের গায়ে এলোপাথারি প্রহার চালাতে থাকে। দু-জনের কেউ-ই খেয়াল করে নি, চমকে উঠতে হয় তখনই পীরুমাঝি যখন প্রহাররতা ভুলির চুলের মুঠি ধরে লাথি মারে সবলে। সকলের সামনে বন্ধ্যা, প্রেম-

বঞ্চিতা নারীর চরম অপমান-লাঞ্ছিত অনুভবের মূক আর্তিকে সাঁওতাল রমণীর আদিম ভাষাতেও কালজয়ী আশ্চর্য জীবন্তরূপ দিয়েছেন শিল্পী,—"ভুলি ধীরে ধীরে টুরনীর হাত ছাড়িয়া দিয়া পীরুর নিকটে সরিয়া আসিয়া বেদনার্ত কণ্ঠে কহিল, —'লে কত মারতে পারিস মার খালভরা!···মেরে মরাই দে কেনে, খালাস পাই তা হোলে'!"

—উন্মত্ত অন্ধ আক্রোশে ফিরে আসে ভুলি কুলি ধাওড়ায়—নির্জন নিস্তব্ধ চারিদিক,—উৎসবের রাতে সাঁওতাল নরনারী সবাই বেরিয়ে গেছে মদির আনন্দ উল্লাসে। কেবল একটি ঘরে তখনো আলো জ্বলে,—ভুলি জানে, ভোলা বেরোয় নি কোথাও।

প্রথম বয়সে ভুলির বিবাহ-সম্বন্ধ হয়েছিল ঐ ভোলার সঙ্গেই। কিন্তু সে সম্বন্ধ ভেঙে যায়,—উদ্দাম যৌবনের আকুল আগ্রহ নিয়ে পীরুর দুর্দান্ত পৌরুষকে বরণ করেছিল ভুলি নিজেই। সেদিন অনেকেরই লোভাতুর কামনার ধন ছিল ভুলি,—আজও সে কামনার উত্তাপ মুছে যায় নি ভোলার রক্ত থেকে। আজও সে অবিবাহিত। ভুলি জানে, সুধীর অবসন্ন সে প্রতীক্ষার গোপন ইতিহাস।

নিস্তব্ধ ধাওড়ায় ফিরে জ্যোৎস্নালোকিত বসন্ত আলোর দিকে তাকিয়ে মত্ত হয়ে ওঠে পরাভূত ভুলির জিগীষা—"পীরুকে তুই গায়ের জোরে হারাতে পারিস ভোলা?" ভোলার ঘরে ঢুকে তাকে উত্তেজিত করে ভুলি;—প্রতিশ্রুতি দেয় পীরুকে পরাস্ত করতে পারলে ভোলাকে সে 'শাঙা' করবে।

পরদিন পীরু টুরনী কেউ ঘরে ফেরে নি,—ভোরবেলা পীরু সোজা গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল কয়লা খাদে। তারপরে সারাদিনের ক্লান্ত দেহমন নিয়ে আচ্ছন্নের মত ঘরে ফিরছিল পীরুমাঝি;—পেছন থেকে এসে প্রচণ্ড আঘাত হানে ভোলা। দেখতে দেখতে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ জমে ওঠে; উৎকণ্ঠিত বক্ষের উত্তাল কম্পন আর উত্তেজনা নিয়ে অনেক আগেই ভুলি এসে দাঁড়িয়েছিল অদূরে বাতাবি গাছের আড়ালে! মুহূর্তে পীরু ভোলাকে পরাজিত দলিত করে ফেলে দেয় মাটিতে, আঘাতে আঘাতে সর্বাঙ্গ তার স্ফীত জর্জরিত। আহ্লাদের আবেগে উল্লসিত হয়ে ওঠে ভুলি;—"ভুলি জানিত, ভোলা হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই পরাস্ত হইবে, তথাপি তাহার এ আগ্রহ কেন হইল কে জানে? পীরুর স্ফীত বক্ষ এবং সুগোল শরীর রাগে আরও ফুলিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া ভুলির মনে আনন্দ হইতেছিল। আজ যদি তাহার স্বামীর সহিত ভুলির মনের সদ্ভাব থাকিত, তাহা হইলে সে হয়ত তাহার বিজেতা স্বামীর গলা জড়াইয়া সহস্র চুম্বনে তাহাকে অন্তরের অভিনন্দন জানাইত।"—আশ্চর্য নারীর মন!

কিন্তু সে ত হবার উপায় নেই। তাই আর ভুলি অপেক্ষা করে না সেখানে, মাঠের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলে স্টেশনের পথে। ভোলা তাকে লক্ষ্য করেছিল, পিছু পিছু এগিয়ে আসে ভোলা। ভুলি তাকে ফিরে যেতে বলে,—একান্ত অনুরোধ করে টুরনীকে যেন আটকে রাখে,—স্টেশনে আসতে না দেয়।

আসাম যাবার গাড়ি তখন এলো বলে; অস্থির চাঞ্চল্যে টুরনীকে খুঁজে ফিরছে আড়কাঠি। ভুলি এসে সামনে দাঁড়ায়—টুরনীর বদলে সেই যাবে আসামযাত্রী কুলিদলের সঙ্গে। কিন্তু সে কি করে হয়!, টুরনী যে আগাম নিয়েছে ২৫ টাকা আড়কাঠির কাছে; তার কি হবে? ভুলিকে ত আবার টাকা দিতে হবে! কিন্তু ভুলি টাকা চায় না; টুরনী যে টাকা নিয়েছে, তার বদলেই যাবে সে। অতএব আড়কাঠি হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

অবশেষে "ট্রেন খানা আসিয়া দাঁড়াইল। ভুলির মনে হইতেছিল, কতক্ষণে সে ট্রেনে চড়িয়া চলিয়া যাইবে। সে আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, সকলের আগে ট্রেনে গিয়া বসিল।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল। ভুলির চোখ দুইটা এতক্ষণে ছল ছল করিয়া আসিল। দূরের পলাশবনের ভিতর দিয়া টুরনী ছুটিতে ছুটিতে স্টেশনের দিকে আসিতেছিল। ভগিনীকে একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইয়া ভুলি জানালার পাশে সরিয়া বসিল।

ভুলির চোখে জল দেখিয়া একটা সাঁওতালের মেয়ে বলিল,—কাঁদছিস্ কেনে?

ভুলি চোখের জল মুছিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—দ্যুৎ কাঁদবো কেনে লো?"

গল্প শেষ হয়েছে এখানে,—কিন্তু তার অন্তরালে অশেষের ব্যঞ্জনা স্বয়ম্প্রকাশ না হলেও একেবারে দুঃসন্ধেয় হয়ে নেই। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'দুইবোন'-এর কাহিনী স্মরণ করতে বাধা নেই;—যদিও শিক্ষা, আভিজাত্য ও অনির্বচনীয় স্পর্শকাতরতায় 'দুইবোন', 'নারীর মন'-এর স্থূল আদিমতা-পীড়িত জীবন-প্রচ্ছদ থেকে অসংখ্য যোজন দূরবর্তী—সু-উচ্চ আকাশচারী এক স্বপ্ন। একথাও স্মরণীয় যে, দুটি গল্পের মধ্যে 'নারীর মন'ই অগ্রজাত (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০),—'দুইবোন'-এর ক্রম-প্রকাশ 'বিচিত্রা' পত্রিকায় শুরু হয় ১৩৩৯ অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে। শর্মিলার অনুভূতির প্রাঞ্জলতা অশিক্ষাপীড়িত অজ্ঞান কুলিকামিন্-এর মধ্যে অকল্পনীয়;—তবু সারাদিনের ব্যর্থ প্রতীক্ষার শেষে ভুলি যখন কয়েক ক্রোশ হেঁটে গিয়ে স্বামীর কাছে লাথি খেয়ে ফিরে এল,—তারপরে সকল আদিম উত্তেজনার অন্ধ ক্ষোভ থেমে গেলে যে অনুক্ত অপরিহার্য অবসাদ আফিঙ্-এর নেশার মত তার সমস্ত চেতনাকে অর্ধ আচ্ছন্ন করেছিল নিশ্চয়ই, তার মূলগত অস্ফুট অনুভূতিকে দুর্জ্ঞেয় করতে পারলে

ভুলিও নিশ্চয় বলত—"সংসারটা বড়ো জটিল। যা মনে করি তা হয় না, যার জন্যে প্রাণপণ করি তা যায় ফেঁসে।"—ঠিক এই সত্যকেই চরম দুঃখে আবিষ্কার করেছিল শর্মিলা।

আবার অন্ধ বোবা যে বেদনায় আসামের চা বাগানের পথে আড়কাঠির কড়ি-কাঠে নিজেকে স্বেচ্ছা-সমর্পণ করেছিল ভুলি,—তার ভেতরকার অস্ফুট অনুভবকে ভাষায় উচ্চারণ করতে পারলে শর্মিলার উপলব্ধির প্রতিধ্বনি হতে পারত, "আমি চলে গেলে ক্ষতি হবে। কিন্তু ও চলে গেলে সব শূন্য হবে।"

রবীন্দ্র-ভাবনার অতুলনীয় মনোবিকলন, তথা অতিসূক্ষ্ম মনোসন্দর্শন শৈলজানন্দের ক্ষেত্রে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। ভুলি এবং টুরনীর একজনকে 'মায়ের' জাত আর একজনকে 'প্রিয়ার' জাতের প্রতিনিধি বলে চিহ্নিত করার উপায় নেই,—সে চেষ্টাও হাস্যকর পরিমাণে নিরর্থক। ভুলির নিঃসন্তান জীবনের ঊষরতা আর আদিম পৌরুষের যৌবন-ক্ষুধার মূলে পীরুর মনোভাব,—এবং সেই সূত্রে ভুলি-টুরনীর আপেক্ষিক ভূমিকার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু শৈলজানন্দের পক্ষে তাও অবান্তর। নিজের রচিত গল্পের নির্বাক সাক্ষী তিনি,—তাঁর চরিত্রগুলো যা বলে, যা করে,—যে পথে চলে, তার বেশি শিল্পীর নিজের পৃথক কিছু বলবার নেই। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, শৈলজানন্দের গল্পই নিজের কথা প্রকাশ করে এমন কি শিল্পীর কথাও।[১০] এদিক থেকে কোনো সুচিন্তিত সুচিহ্নিত অভিনব বাক্‌শৈলীও লেখক উপস্থিত করেন নি। প্রকরণের দিক থেকে অনেক গল্পই সহজ সৃষ্টি। নিরেট অভিজ্ঞতাকে প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টির আলোকে প্রতিফলিত করে সহজাত সংস্কারের শক্তিতেই তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন শৈলজানন্দ। বস্তুত ঐ যুগ-দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টিই তাঁর সৃজন-সাফল্যের প্রায় একমাত্র মুখ্যকথা। কয়লাখনির গল্প-বিষয়ে স্থূল অভিজ্ঞতার অনন্য নূতনতা রয়েছে,—তার চমক এবং মাদকতাও কম নয়। কিন্তু 'নারীর মন'-এর মত গল্পে স্বাদের স্বাতন্ত্র্য আসলে স্থূল জীবনের অব্যবহিত পটভূমিতে চিরন্তনকে আবিষ্কার করতে পারার আশ্চর্য সিদ্ধিতে। ভুলির মধ্যে শিল্পী সত্যই চিরন্তনী 'নারীর মন'কে খুঁজে পেয়েছেন,—যার সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার অপার রহস্য "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ" !—অথচ সে রহস্য অপার-পাথার দেশ-কালের নানা পাত্রে বিচিত্ররূপী হলেও মূলের গভীরে এক অভিন্ন অনুভবের ঐক্যসূত্রে গাঁথা। তাই নিজের দেশ-কাল-সমাজের পটভূমিতে একান্ত পরিচ্ছিন্ন সীমিত থেকেও কয়লাখনির কুলিকামিন ভুলির অন্তর্ব্যথিত আত্মদান শর্মিলার বেদনানুভবের

১০। দ্র. B. Bose—'An Acre of Green Grass.'

মাধ্যমে সর্বজনীন। বস্তুত একান্ত পরিমণ্ডলে গণ্ডিবদ্ধ থেকেও নির্বিশেষ জীবন-সত্যকে খুঁজে পাওয়ার আয়াসহীন সহজ সার্থকতা ছাড়া শৈলজানন্দের গল্পের বিষয়, প্রকরণ, অথবা বিন্যাসে আর কোনো পৃথক্ বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন স্বয়ংস্ফুট নয়। অর্থাৎ বিষয় অনেক ক্ষেত্রেই অ-ভূতপূর্ব হলেও কোথাও তা আতিশয্যপূর্ণ বা চমকপ্রদ নয়; প্রায় সর্বত্রই অন্তর্নিহিত মানবিক চেতনার মধ্যে লীন হয়ে সম্পূর্ণ জীবনায়নের এক অনতিস্ফুট সৌরভে ভরে উঠেছে। তাই শৈলজানন্দের গল্পের বিষয়বস্তু ভুলি, টুরনী, বা পীরু মাঝি নয়,—'নারীর মন'; অথবা পরী, টুরা, দুজনের বদলে 'মা',—কিংবা ঐরকমেরই আর কোনো কিছু।

'মা' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যাতেই। সেই কয়লাখনিরই গল্প,—এবার একেবারে গহবরের অতলে! লামার ছেলে টুরা, আর দুখনের ভাইঝি পরী; যৌবনের উত্তাল আকর্ষণে উভয়ে উভয়ের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে। টুরা বিবাহ করতে চায় পরীকে, লামারও আকুণ্ঠ সম্মতি রয়েছে তাতে। কিন্তু দুখনের তাতে প্রবল আপত্তি;—পরীকে সে ব্যাকুল আগ্রহে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ করে,—কোনোদিনও বিবাহ করবে না সে, কাউকে নয়।

—অসহ্য যন্ত্রণায় বিষধর সর্পের মত ফুঁসতে থাকে দুখন,—এক ভাই, দুই ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে সুখের সংসার ছিল তার। কিন্তু ঐ একটি মাত্র মেয়ে বিষ খেয়ে মরেছে,—জামাই ছিল দুশ্চরিত্র; এ জ্বালা কি জীবনে ভোলবার? বাপের বাড়া স্নেহে দুখন তাই লালন করেছে পিতৃহীনা পরীকে;—কিন্তু বিবাহের বিরুদ্ধে তার অসহ্য আক্রোশ! জ্যেষ্ঠতাতের আত্মার আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা নেই পরীর; অন্তরের সকল দৃঢ়তা নিয়েই বিবাহের ইচ্ছাকে সে উৎপাটিত করেছে মনের মূল থেকে।

পুরুষের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে টুরা পাগল হয়ে ফেরে পরীর চারপাশে; কিন্তু বাঞ্ছিত জবাব আর মেলে না কিছুতেই। অন্য অনেক দিনের মত সেদিনও পরী খাদে নেমে গিয়েছিল কাজের 'ঘন্টি' বাজতেই। কিন্তু "ঘণ্টাখানেক কাজ করিবার পর পাশের অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্য হইতে কে যেন তাহার কাপড় ধরিয়া টানিল, পরী চম্‌কিয়া দেখিল, অন্ধকারের মধ্যে টুরা দাঁড়াইয়া আছে। বলিল,—ও, সেই কথা?

টুরা কাপড় ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া তাহাকে সেই অন্ধকার গলি রাস্তার মধ্যে আনিয়া বলিল,—হুঁ, সেই কথা বল্‌বি আয়।······আয়, জলদি আয়।

টুরার কণ্ঠস্বরে যেন কত মিনতিকাতর আগ্রহের ব্যাকুলতা।

পরী কোন কথা না বলিয়া তাহার সঙ্গে ধীরে ধীরে চলিল। কয়েকটা সরু

অন্ধকার গলি রাস্তা পার হইয়া তাহারা খাদের ভিতর অনেক দূরে আসিয়া পড়িল।

কাহারও মুখে কোন সাড়াশব্দ নাই।

টুরা আগে আগে চলিতেছিল। পরী সন্দেহ-দোদুল বক্ষের আলোড়ন ধীরে চাপিয়া তাহার পশ্চাতে।

একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে টুরা হঠাৎ থামিয়া গেল। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। পরী বলিল, না টুরা আমি বিয়া করব নাই।

টুরা কোন কথা না বলিয়া পরীর হাতখানি চাপিয়া ধরিল। কি একটা কথাও বলিতে যাইতেছিল কিন্তু পারিল না। শুধু অন্ধকারের মধ্যে ব্যাকুল দৃষ্টি জ্বল জ্বল করিতে লাগিল।

এই নিভৃত নির্জন অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে তাহারা দুইজন। নিশ্বাসের শব্দ এমন কি বক্ষের প্রতি স্পন্দনটিও শোনা যায়! টুরার হস্তস্পর্শে পরীর সর্বাঙ্গ যেন কিসের উন্মাদনায় শিহরিয়া উঠিতেছিল! পরী জোর করিয়া একবার তাহার হাতখানা ছাড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। আর একবার চেষ্টা করিল, সেবারেও মনে হইল শরীরের সমস্ত শক্তি যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে। পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত রিমঝিম করিতে লাগিল।"

দিন যায়,—দিনে দিনে বছর প্রায় ঘুরে আসে। দুঃখের আকাশ যেন ভেঙে পড়ে পরীর মাথায়। অসহ্য দুঃখের সে অন্ধকারে দুখনও বিদায় নিয়েছে,—নিঃসঙ্গ একক জীবনে শরীরের ভারও নূতন করে দুর্বহ হয়ে ওঠে,—মনের দিক থেকেও। আত্মহত্যা করতে,—টুরাকে খুন করতে ইচ্ছে করে তার। তবু স্বামিত্বের দাবি নিয়ে আসে টুরা বারে বারে,—পরী তাকে গলাগালি করে, নয়ত নিজে পালিয়ে যায়। সেদিন লামা নিজে এসেছিল তাকে ঘরে ডেকে নিতে; তাকেও তাড়িয়ে দিয়েছে পরী। তারপর নিজে ছুটে গিয়েছিল খাদের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে। কিন্তু ধোঁয়ার মধ্যে প্রবেশ করতে শরীর যখন ঝলসে উঠল তখন, "তাহারই গর্ভে একটি অজ্ঞাত শিশুর নিষ্কলঙ্ক কচি মুখের কথা মনে হইতেই কে যেন তাহাকে সেই আসন্ন মৃত্যু হইতে ফিরাইয়া আনিল। পরী প্রাণপণে ছুটিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দূরে মর্মাহত হইয়া পড়িয়া গেল।"

আকাশ ভরে কালো মেঘ তখন জমাট বেঁধে উঠেছে;—পরীর অসহ্য যন্ত্রণাকাতর দেহের ওপর দিয়ে ক্রমে কয়েক পশলা বৃষ্টি ঝরে পড়ে। শরীরের বাইরে এবং ভেতরে অগ্নিদাহের জ্বালাই নয় কেবল, নবজন্মদানের অন্তঃপীড়াও তখন সমগ্র চেতনায় ব্যাপ্ত

হয়ে পড়েছে। ক্রমশ বৃষ্টির ধারা ক্ষীণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে,—আকাশ তখনো থমথমে, আমবাগানের গাছের তলায় যেখানে পড়েছিল পরী, সেখানেই বেদনামুক্তি ঘটে তার,—নবজাতকের স্পন্দিত ক্রন্দনে।

"শিশুর জন্মক্ষণের পরেই সূর্যোদয় হইল দেখিয়া তাহার মনে হইতেছিল একটু আলোর প্রতীক্ষা না করিয়াই যে চলিয়া গিয়াছিল, আজ সে-ই বুঝি আবার ফিরিয়া আসিল। শিশুর মূর্তিতে আজ তাহার জ্যেষ্ঠতাত দুখনই নিশ্চয় ফিরিয়া জন্মিয়াছে!

"একটা মানুষের ছায়া লক্ষ্য করিয়া পরী পশ্চাৎ ফিরিয়া তাকাইতেই দেখিল, সতর্ক পদবিক্ষেপে টুরা কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে তাহা বুঝিতেই পারে নাই।

"বিদ্রোহিনী নারীর চক্ষে আজ জননীর শান্ত-কোমল দৃষ্টি দেখিয়া টুরার কথা বলিবার সাহস হইল, বলিল—ইখানে কেনে পরী, আয় ঘরকে আয়।

"পরী কোন কথা না বলিয়া ছেলেটাকে দুই হাত ধরিয়া অতি সাবধানে বুকে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে টুরার পশ্চাতে কুটিরে আসিয়া প্রবেশ করিল।"

গল্পের শেষ এখানেই। কিন্তু তার সর্বাঙ্গ-ব্যাপী স্বাদ-বৈশিষ্ট্য শিল্পীর স্বভাব-বর্ণনার মধ্যে একান্ত-বদ্ধ হয়ে থাকলেও বিশেষ অবধান দাবি করে। সাঁওতাল জীবনের আদিম নগ্নতা, অসামাজিক মিলনের স্থূলতা, উদ্দাম বাসনা আর বিক্ষুব্ধ আক্রোশের কূলভাঙা ঋজু প্রকাশমানতা,—সব কিছু মিলে গল্পটিকে যেন এক এপিক কাঠিন্য আর নিটোলতা দান করেছে। এই প্রসঙ্গে কয়লা-খনির অন্ধ গহ্বরে টুরা-পরীর শারীর সম্মিলনের চিত্রও লক্ষ্য করতে বাধা নেই;—বুদ্ধদেব বসুর 'এমিলির প্রেম' অথবা অচিন্ত্য সেনগুপ্তর 'বেদে'-গল্পাবলীর সঙ্গে তুলনা করলেই দেখব,—পূর্বোক্ত গল্পসমূহের একমুখী প্রখরতা শৈলজানন্দের রচনায় সাঁওতাল জীবন-চিত্র বর্ণনার অখণ্ড মহাকাব্যিক পরিবেশে আপন স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে এক সার্বিক সামঞ্জস্য লাভ করেছে,—যার ফলে যৌন ভাবনার 'হীরার ধার'টুকু ক্ষয়ে গেছে তার মূল থেকে। গল্পের শেষে অনুচ্ছ্বসিত দৃঢ় পদক্ষেপে চিরন্তনী জননীর অভিব্যক্তি কালো পাথরে খোদাই-করা আদিম স্থাপত্যমূর্তির কাঠিন্য আর উদাত্ততা নিয়েই যেন আত্মপ্রকাশ করেছে। জীবনদৃষ্টির এই সুকঠিন সামগ্রিকতা বাংলা ছোটগল্পের স্বভাব-শিল্পায়নে শৈলজানন্দের অভিনব দান।

কিন্তু দৃষ্টির এই প্রগাঢ়তা সৃষ্টির স্বতস্ফূর্তির মধ্যে স্বচ্ছ-বাহিত বুঝি নয়। তাই মনে হয়, প্রাথমিক বিস্ময়-লগ্নের সীমা পেরিয়ে গল্প-শিল্পী শৈলজানন্দের স্বীকৃতি বাঞ্ছিত দূরপ্রসার ও প্রতিষ্ঠা যেন সর্বাংশে আয়ত্ত করতে পারে নি। এর একটা কারণ হয়ত গল্পের আবেগরহিত নৈর্ব্যক্তিকতা, মাঝে মাঝে যাকে ঔদাসীন্য বলেও মনে হয়। তাছাড়া অব্যবহিতের ধ্যানেই শিল্পী ছিলেন মুখ্যত মগ্ন-চেতন,—যে অব্যবহিত সেদিন

দারিদ্র্য, হতাশা ও প্রাচুর্যহীনতার ভারে ছিল অবসন্ন খণ্ডিত। অগভীর সংকীর্ণ সীমায়তির সেই গহ্বর থেকে জীবনকে কোনো বৃহৎ, মহৎ পটভূমিতে উদ্ধার করে আনার মত কল্পনা-প্রসার অথবা কোনো সুনিশ্চিত কাব্যসত্য, তথা নিত্যতাবোধের সঙ্গে শিল্প-চেতনার স্বাভাবিক সংযোগ প্রায় দুর্লক্ষ্য ছিল। কেবল এই কারণেই নিজের ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার গণ্ডিবদ্ধ পরিধির মধ্যে উপন্যাসের বিস্তার ও বৈচিত্র্য সাধনে শৈলজানন্দের সফলতা উল্লেখ্য পরিণতি আয়ত্ত করতে পারে নি। সীমিত জীবনের অভিজ্ঞতার পুঁজি তাঁর ছোটগল্পের আঁটসাঁট বন্ধনের মধ্যেই নিটোল হয়ে উঠেছে। এখানেই ছোটগল্প রচনার আশ্চর্য সিদ্ধির পাশে লেখকের উপন্যাস সৃষ্টির আপেক্ষিক অসাফল্যের রহস্য নিহিত রয়েছে। আবার, আগেই বলেছি, শৈলজানন্দের গল্প-প্রকরণ একাধিক অর্থেই আদিম এপিক-শিল্পের সঙ্গে তুলনীয়। এপিক-শিল্পীর মতই গল্পকার তাঁর সৃজনভূমিতে আত্ম-প্রক্ষেপণ-কুণ্ঠ, authentic epic-এর মতই তাঁর গল্পের রূপায়ণ সহজ-সংস্কারের সৃষ্টি ;—অর্থাৎ, প্রকরণের কোনো পৃথক্ ঔজ্জ্বল্য, বিন্যাসের কোনো স্বতন্ত্র পারিপাট্য তাতে দুর্লক্ষ্য। আর বস্তুতঃ যে দুর্লভ শক্তির বৈভবে শৈলজানন্দের গল্প অতুলনীয় শিল্প-গুণান্বিত,—অব্যবহিতের গভীরে চিরন্তন মানুষকে প্রত্যক্ষ করার সেই ধ্যানময় অন্তর্দৃষ্টি সর্বত্রই সমান গভীর হতে পারে নি,—পারা সম্ভবও নয়। তাই সকল গল্পেই অলৌকিক অখণ্ডতার সেই অভঙ্গ দৃঢ় রস-কাঠিন্য সমান জমাট বেঁধে নেই। ফলে নিতান্ত অব্যবহিত বিষয়-গৌরবে যে-সব গল্প এককালে উত্তাপ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল, পরবর্তী কালে দেশ-কাল-নিরপেক্ষ নিস্তব্ধ রস-প্রগাঢ়তা তাতে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। দৃষ্টান্ত হিশেবে 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা' নামক পূর্বোক্ত গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। বস্তুতঃ উনিশ শতকের ইতিহাস-খ্যাত বাঙালি-রেনেসাঁসের প্রায় একমাত্র ধারক ও পরিবাহক যে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের দীপ্ত জীবনমন্ত্র ছিল একদা 'অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা আর উচ্চ ভাবনা,'—সেই মহত্তম ঐতিহ্যের এক চরম কঠোর বাস্তব অবক্ষয়-চিত্র অঙ্কন করেছেন শিল্পী তাঁর নিরাবেগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দার্ঢ্যের সঙ্গে। সেই নিটোল গল্পের শরীরে ইতিহাসের নির্মম কদর্য তথ্য-পঞ্জী যেন এপিক-এর কাঠিন্য নিয়েই জমাট বেঁধে উঠেছে আবার। কিন্তু সার্থক সাহিত্যের সবটুকুই নীরন্ধ্র নিরেট নয় ;—তা যত সত্য সার্থক গভীর অনুভূতির উপাদানেই গড়ে উঠুক না কেন! ফাঁকে ফাঁকে তার পথের সংকেত চাই ; যে পথে, একান্ত নিভৃত-গোপনে হলেও, প্রাণের প্রত্যয়,—জীবনবোধের হৃদ্‌বেদ্য আস্বাদন বহতা স্রোতের মত গলে বেয়ে অথবা চুঁইয়ে পড়তে পারে,—যেমন পড়ে কঠিন পাহাড়ের প্রচণ্ড পাথর স্তূপের অন্তরাল বেয়ে গোপনে নির্ঝরিণীর না-দেখা উৎস।

শৈলজানন্দের মধ্যে জীবন-সন্দর্শনের যুগ-দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টি দেখা গেছে,—সমসাময়িক বাস্তবের দৈন্য, ক্ষোভ ও হতাশার নির্মোক পেরিয়ে চিরন্তন মানব-সত্যের মর্মস্থলে যে দৃষ্টি দৃঢ় অবিচল। কিন্তু সে উপলব্ধির ভারে শিল্পীর ব্যক্তি-আত্মা যেন এক প্রকাশহীন অন্তর্ব্যথায় পীড়িত হয়ে আছে;—তাই শৈলজানন্দের গল্পে জীবন জমাট্ বেঁধে উঠেছে, যার ভেতর থেকে কোনো সুনিশ্চিত জীবন-বাণী প্রায় কখনোই দোলায়িত হয়ে ওঠে না মৃদুতম কম্পনেও। তাঁর গল্প-রস বিশেষার্থে একান্ত বস্তুতললীন;—তার আবেদন নিবাত নিষ্কম্প, দৃঢ়-কঠিন।

স্বাতন্ত্র্যময় ভাষার বাহনে সহজ অন্তরের উপলব্ধি অতটুকু প্রখর কখনোই হয় না, যাতে আত্মার বাসনাকে স্রোতস্বিনীর ধারায় প্রবাহিত করে দেওয়া সম্ভব। বরং প্রকাশের প্রকরণে সত্য-দর্শনের এক নিগূঢ় অনুভব কেবলই জমাট্ কঠিন হতে থাকে,—তাই অধোন্মীলিত পুষ্প-কোরকের নির্বাক বেদনা বহন করে প্রকাশকুণ্ঠিত শৈলজানন্দের শিল্পি-ব্যক্তিত্ব যেন নিজের বাণীহীন বাণীর বাঁধনে নিরেট-নীরন্ধ্র বন্ধুর পথে একক পদচারণা করে ফিরছে,—মৃদু-মন্থর পদবিক্ষেপে চলেছে এগিয়ে। এই অর্থেই বাংলা গল্পসাহিত্যের ইতিহাসে তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ একক পথিক।

এঁর গল্প-সংকলন গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে—

'অতসী' (১৩৩২), 'বধূবরণ' (১৩৩৬), 'নারীমেধ' (১৩৩৫), 'মারণমন্ত্র' (১৩৩৯), 'দিন-মজুর' (১৩৩৯), 'নারীজন্ম' (১৩৪০), 'ঠিক্‌ঠিকানা' ('বহুবচন'-এর নবসংস্করণ ১৩৫০), 'স্বনির্বাচিত গল্প' (১৩৬২), 'শ্রেষ্ঠগল্প' (১৩৬২), 'ভালবাসার নেশা' (১৩৬৫), 'প্রেমের গল্প' (১৩৬৫), 'অপরূপা' ('বানভাসি' ও 'ষোলো আনা' একত্রে ১৩৬৬), 'মনের মত গল্প' (১৩৬৭), 'মিতে মিতিন' (১৩৬৭)।

তাছাড়া, 'চাঁদ ও চকোর', 'সতী-অসতী', 'পৌষ পার্বণ', 'জীবন নদীর তীরে' ইত্যাদি গ্রন্থ অধুনা বিলুপ্ত।*

২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সমকালীন কথা সাহিত্যের ইতিহাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭২) আসন অত্যুচ্চ শীর্ষবর্তী। 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' ইত্যাদি উপন্যাসে এপিক্‌ধর্মী রচনার এক অতুল্য ধারা প্রবর্তন করে বাংলা সাহিত্যের পাঠক সমাজে তিনি সশ্রদ্ধ বিস্ময় উৎপাদন করেছেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও শৈলী-সৌকর্যের বিচারে ছোটগল্পের সৃজন-ভূমিতেই বুঝি তাঁর প্রতিভার

* গল্পসংকলন গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের কালানুক্রমিক তালিকা দিলাম।

শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। আর ছোটগাল্পিক তারাশঙ্করের ভাব-প্রকৃতির পরিচয় নির্দেশ করে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন—"তারাশঙ্করকে শৈলজানন্দের অনুসরণকারী বলিতে পারি।" ঐতিহাসিকের এ-সিদ্ধান্ত নানা দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। আত্মসমর্থন করে ডঃ সেন বলেছেন,—"শৈলজানন্দ কয়লা-কুঠির সাঁওতাল জীবন লইয়া সীমাবদ্ধ অঞ্চলের কাহিনী রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তারাশঙ্কর লইলেন তাঁহার দেশ দক্ষিণ-পূর্ব বীরভূমের সাধারণ লোকের জীবন—পুরাণো জমিদার ঘর হইতে মালবেদে পাড়া পর্যন্ত।"[১১]

দুটি সমসাময়িক শিল্পি-চেতনার মুখ্য সৃজন-উৎসের এতাধিক সত্য পরিচায়ন প্রায় অকল্পনীয়। তাহলেও নিছক তথ্যের দিক থেকে শৈলজানন্দ এবং তারাশঙ্কর দুজনের রচনাতেই পূর্বোক্ত জীবন-গণ্ডির বহির্বর্তী বিষয়বস্তুর বিস্তার ও বৈচিত্র্য বর্তমান রয়েছে। পূর্বেই লক্ষ্য করেছি,—শৈলজানন্দের গল্প-বিষয় সমসাময়িক জীবন-লোকের ত্রি-পথে সঞ্চরণ করে ফিরেছে। ততোধিক বিস্ময়ের কথা,—শিল্পী তাঁর 'স্বনির্বাচিত' গল্প-সংকলনে কয়লা-কুঠি পর্যায়ের গল্প-প্রবাহকে প্রায় যেন বর্জনই করতে চেয়েছেন। আত্মগোপনের এই প্রয়াস সত্যিই রহস্যজনক। অন্য পক্ষে, উপন্যাসের সৃজন-ভূমিতে তারাশঙ্কর রাঢ়-প্রত্যন্তের সীমা পেরিয়ে নাগরিক জীবনের অনুসরণ করেছেন কেবল বাংলা দেশের মহানগরীতেই নয়;—তাঁর 'সপ্তপদী'-র জীবন-ধারা বৃহত্তর ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসৃত; নায়িকা-সন্ধানে তারাশঙ্কর এখানে আসন গ্রহণ করেছেন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের অভিনব পটভূমিতে। আরো পরবর্তী কালে শিল্পী তাঁর নূতন উপন্যাস রচনা করতে বসেছিলেন রাজধানী দিল্লীর উজ্জ্বল পাদপ্রদীপের তলায়,—'রিফিউজী' পাঞ্জাবী সমাজের জীবন-কথা নিয়ে।[১২] শুধু তাই নয়, ছোটগল্পের জগতেও তারাশঙ্করের জীবন-চিত্রণের বৈচিত্র্য কিছু কম নয়;—এমন কি শৈলজানন্দের মত কয়লাখনির প্রেক্ষিতে একাধিক অবিস্মরণীয় ছোটগল্প তিনি লিখে গেছেন।[১৩] তাহলেও আন্তরিক স্বভাব-ধর্মে তারাশঙ্কর বস্তুত শৈলজানন্দের চেয়েও আঞ্চলিক, এবং তা সত্ত্বেও তারাশঙ্করের ছোটগল্পে বিষয়-বৈচিত্র্য এবং প্রকাশশৈলীর অভিনবতা কখনোই প্রায় স্তিমিত হয় নি;—দেখে দেখে মনে হয়,—রাঢ়-প্রত্যন্তের একান্ত সীমিত ভৌগোলিক অঞ্চল সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার যেন সর্বসীমারহিত,—প্রায় অন্তহীন।

১১। ডঃ সুকুমার সেন—'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ৪র্থ খণ্ড। ১২। 'বতিভঙ্গ'—'নবকল্লোল' (পূজা সংখ্যা ১৩৬৮ বাংলা) পত্রিকায় প্রকাশিত। ১৩। 'ঘাসের ফুল', 'ছলনাময়ী' ইত্যাদি।

কিন্তু এই সকল কথা স্মরণ করেও স্বীকার করতেই হয়,—বাংলা ছোট-গল্পসাহিত্যের ইতিহাসে তারাশঙ্কর শৈলজানন্দের অনুসৃত পথেরই 'অনুসরণকারী',—এবং তা একাধিক অর্থেই। তারাশঙ্করের প্রথম সার্থক গল্প 'রসকলি' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৪ বাংলা সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'কল্লোল' পত্রিকায়,—আর এই 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই শৈলজানন্দ ছিলেন প্রায় অবিরত লেখক। তারাশঙ্কর অবশ্য 'রসকলি'র আগেও রসরচনামূলক কথিকা চারটি বেনামীতে লিখে প্রকাশ করেছিলেন লাভপুর থেকে নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পূর্ণিমা' পত্রিকায়। আর গল্প লিখেছিলেন 'স্রোতের কুটো'।[১৪] এই 'পূর্ণিমা' পত্রিকার প্রসঙ্গেই বীরভূমবাসী সেকালের প্রতিষ্ঠিত গল্পলেখক শৈলজানন্দের সঙ্গে তারাশঙ্করের প্রথম পরিচয় ঘটে। তাহলেও, 'রসকলি'-কেই নানা উপলক্ষ্যে শিল্পী তাঁর প্রথম গল্পের মর্যাদা দিয়েছেন।[১৫] আর এই গল্প-রচনার প্রেরণা প্রসঙ্গেই প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দের পূর্বৈতিত্বকে তিনি স্বীকৃতি জানিয়েছেন দ্বিধাহীন ভাষায়।—

কংগ্রেসের কাজে তারাশঙ্কর সেদিন সিউড়ীতে রাত্রিবাস করেছিলেন এক উকিলের বাসায়। অতিরিক্ত গরমে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেছিল—তার ওপর সিউড়ীর মশার ঝাঁক ছেঁড়া মশারীর ভেতর দিয়ে ঢুকে করে তুলেছিল অতিষ্ঠ। দুর্যোগের "এমনি অবস্থায় হঠাৎ হাতড়ে মিলল একখানা মলাট-ছেঁড়া 'কালিকলম' পত্রিকা।"

তারাশঙ্কর লিখেছেন,—"আলোটা বাড়িয়ে দিলাম। চোখে পড়ল অদ্ভুত নামের একটা লেখা এবং লেখকের নামটা অদ্ভুত না হলেও বিচিত্র।

'পোনাঘাট পেরিয়ে'; লেখক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

পড়ে গেলাম গল্পটি। বিচিত্র বিস্ময়পূর্ণ রসমাদকতায় মন মদির হয়ে গেল। মশকের গানে বা দংশনেও কোনো ব্যাঘাত ঘটাতে পারলে না।

ওল্টালাম পাতা। আবার পেলাম একটি গল্প। গল্পটির নাম মনে নেই। লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

অদ্ভুত! বীরভূমকে এমনি করে কলমের ডগায় অক্ষরে সাজিয়ে রূপ দেওয়া যায়!

...সেদিন রাত্রে দেখলাম ওই লেখাগুলির সঙ্গে আমার 'স্রোতের কুটো'র ঢং-এর বেশ মিল আছে।...ইচ্ছে হল এমনি গল্প লিখব। সত্যকারের রক্ত-মাংসের

১৪। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—'আমার সাহিত্য জীবন'।

১৫। দ্র. 'তারাশঙ্করের প্রিয় গল্প' এবং তারাশঙ্করের স্বনির্বাচিত গল্প—ভূমিকা।

জীবদেহে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা—তার কামনার ধারার সঙ্গে মিশেই চলেছে। জীবন চলেছে একটি স্বতন্ত্র ধারায়। কোথাও জিতেছে, কোথাও হারছে।"[১৬]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' গল্প প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'কালিকলম' পত্রিকায়। ঐ একই সংখ্যায় প্রকাশিত শৈলজানন্দের গল্পের নাম 'বেনামি বন্দর: জনি ও টনি।' দ্বিতীয়োক্ত গল্পটিকে তারাশঙ্কর কেন বীরভূমের অক্ষর-সজ্জিত প্রতিমূর্তি বলে মনে করেছিলেন, সেকথা ভেবে প্রথমে বিস্মিত হতে হয়। নিঃসন্দেহে সে গল্প বাংলাদেশের অনভিজাত জীবন-পরিবেশে গঠিত জৈব স্নেহের এক জীবন্ত বাস্তব শিল্পরূপ; জনি এবং টনি নামে দুই কুকুরী ছিল গল্পের নায়িকা। তাহলেও বাংলাদেশের কোনো আঞ্চলিক জীবনের ছাপ সে গল্প-দেহে লাগে নি; বীরভূমের না-হয়ে গল্পটি চট্টগ্রামেরও হতে পারত। পরবর্তী কালে স্বয়ং শৈলজানন্দ ইঙ্গিত করেছেন,—জনি ও টনি-কথা তাঁর রানীগঞ্জ বাসকালের কৈশোর-অভিজ্ঞতার সম্পদ।[১৭] তাহলেও তারাশঙ্করের উপলব্ধি অযথার্থ নয়। স্রষ্টা যেমন 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' বাস্তব জীবনকে শিল্প-রূপায়িত করেন,—রসিক পাঠকও তেমনি তাকে আস্বাদন করেন আপনার চিত্তবৃত্তির আনুকূল্যে, নিভৃত চিত্ত-বাসনার সুরভিতে মদির করে। তারাশঙ্কর কেবল রসিক সাহিত্য-পাঠক নন,—সিদ্ধকাম সৃষ্টির প্রেরণা তাঁর আত্মার অধিগত সহজ শক্তি। আর সেই সৃজনীস্বভাবে মনে-প্রাণে তিনি 'দক্ষিণপূর্ব বীরভূমের' আঞ্চলিক জীবন-শিল্পী। শৈলজানন্দের গল্প-দেহের মুকুরে সেদিন নিজের আত্মপ্রকৃতিকে প্রথম আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন স্রষ্টা তারাশঙ্কর,—এ ঘটনাও উপেক্ষণীয় নয়।

আরো লক্ষ্য করতে হয়, পূর্বাবধি প্রতিষ্ঠাপন্ন হলেও, 'কল্লোল'-'কালিকলমে'র পৃষ্ঠাতেই শৈলজানন্দের প্রতিভা যেন অবাধ মুক্তির প্রথম আনন্দানুভব খুঁজে পেয়েছিল। অন্যপক্ষে তারাশঙ্কর তাঁর সৃজন-চেতনার প্রথম উৎসাহ-আশ্রয় লাভ করেছিলেন 'কল্লোল'-এর পৃষ্ঠায়,—তাঁর প্রথম দুটি স্মরণীয় গল্প 'রসকলি' আর 'হারানো সুর' প্রকাশিত হয়েছিল 'কল্লোল'-এ।[১৮] তাহলেও,—এই দুই শিল্পীর সদৃশতার মুখ্য উপাদান,—'কল্লোলে'র একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়েও অন্তঃস্বভাবে কেউ-ই তাঁরা 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর নন। শৈলজানন্দের চেয়েও তারাশঙ্কর প্রবল ও প্রখরতর পরিমাণে কল্লোলেতর। এখানেই শৈলজানন্দের স্বভাবের ধারা অনুসরণ করে তারাশঙ্কর স্ব-

---

১৬। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—'আমার সাহিত্য জীবন'।

১৭। দ্রঃ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—'আমার সাহিত্য'—(দেশ পত্রিকা—১৪ই পৌষ, ১৩৬৮ বাংলা)। ১৮। যথাক্রমে ফাল্গুন ১৩৩৪ ও বৈশাখ, ১৩৩৫ সংখ্যায়।

শক্তিতে অগ্রসর হয়ে গেলেন সুতীব্র-চিহ্নিত এক নূতন পথ-রেখা অঙ্কন করে। নিজের শিল্প-কৃতি সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নিয়ত সচেতন, কখনো কখনো হয়ত বা অতিসচেতনও। তাই 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজ শিল্প-প্রকৃতির স্বভাব-স্বাতন্ত্র্য তারাশঙ্করের কণ্ঠেই ঐতিহাসিক স্পষ্টতার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে।

'কল্লোলে' আত্মপ্রকাশ করেও তারাশঙ্কর কেন 'কল্লোলে'র হলেন না, সে সম্পর্কে 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন,—"আসলে সে বিদ্রোহের নয়, সে স্বীকৃতির সে স্থৈর্যের। উত্তাল উর্মিলতার নয়, সমতল তটভূমির কিংবা বলি, তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের।" সেই কথার সূত্র ধরেই তারাশঙ্কর লিখেছেন,—"বিদ্রোহ এবং বিপ্লবে প্রভেদ আছে। আমি বিদ্রোহের ছিলাম না। বর্তমানকে ভেঙেচুরে তাকে অগ্রাহ্য করে শূন্যবাদের মধ্যে জীবনকে শেষ করার কল্পনায় আমার মনের পরিতৃপ্তি কোনদিন হয় নি। আমার রচনার সমাপ্তি-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে এ-কথা বোধহয় স্পষ্ট ধরা পড়ে। আমার মনে ভেঙে গড়ার গভীর স্বপ্ন ছিল।"[১১]

বিশেষভাবে ছোটগল্পের শৈলীতে তারাশঙ্করের রচনা-সমাপ্তির প্রকরণ বিশ্লেষণ করা যাবে যথাস্থানে। কিন্তু এখানেই স্পষ্ট অনুভব করা উচিত,—'কল্লোল'-গোষ্ঠীর শিল্প-চিন্তা যেখানে 'উর্মিল উত্তালতার' প্রখর 'অস্বীকৃতি'র—তথা একান্তভাবে প্রত্যয়-ভঙ্গের অমোঘ উল্লাসে উদ্দাম হয়ে উঠেছিল,—তারাশঙ্কর তখন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে চেয়েছেন এক কল্যাণ-স্নিগ্ধ সত্য-সুন্দর জীবন-পরিণামে। এই পরিণাম-চিন্তন আপাতদৃষ্টিতে একেবারেই পুরাতন,—বস্তুত মানুষের সভ্যতায় এর চেয়ে প্রাচীন বুঝি আর কিছু নেই। প্রথম হাঁটতে গিয়ে যে মাটিতে শিশু আছাড় পড়ে, সেই মাটিকে ধরেই সে আবার উঠে দাঁড়ায়। মানব সভ্যতার পক্ষেও বিশ্বাসের এক অবিচল বনিয়াদই যেন মাটির মায়ের সেই স্নিগ্ধ অঞ্চলখানি। আদিম মানুষ যে সহজ প্রেরণার বশে একদিন বন্য বর্বরতার অন্ধ পরিমণ্ডল ছেড়ে পরিবার-জীবনের স্বেচ্ছাবন্ধনে ধরা দিয়েছিল, তারও গভীরে কোনো এক ভবিষ্যৎ-স্বপ্নের অনতিব্যক্ত প্রত্যয় নীহারিকারূপে বর্তমান ছিল বৈ কী? তাহলেও কোনো কালের কোনো বিশ্বাসই চিরস্থায়ী নয়,—জীবদেহের বিবর্তনের মতই পুরাতন বিশ্বাস আবার ভাঙেও, প্রত্যয়-ভঙ্গের সেই বেদনাই প্রতিস্পর্ধিত এক বিক্ষোভের আকারে সাহিত্যিক রূপ ধরেছিল এতাবৎ প্রাপ্ত বিশ্বের প্রথম গল্পে; বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সে-কথার উল্লেখ রয়েছে। ফলে সুচিরস্থায়ী বিশ্বাসের মূলে যখন ফাটল ধরে, তখন অভ্যস্ত জীবনের বনিয়াদ একদিন আপনা থেকেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায়;—ইতিহাসের গতি নিজের ওপরে যেন নিজেই

১১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

আছড়ে পড়ে একবার। সেখানেই থামতে হলে পঙ্গুতার মধ্যে—বিধ্বস্ত বিপর্যয়ের মধ্যে সভ্যতার অপঘাত-মৃত্যু অনিবার্য হয়। অতএব প্রাণের মৌলিক প্রয়োজনেই ভাঙনের আবর্ত থেকে মুক্তির স্রোতঃপথ তাকে খুঁজে পেতেই হয়,—সে মুক্তি নূতন প্রত্যয়ের নবীন আলোক-লোকে। তাই বিভগ্নতার সাময়িক বিনষ্টি যত প্রখর, যত দুর্নিবারই হোক্, তাকে অতিক্রম করে নূতন পরিণামের অভিমুখে ইতিহাসের গতি ধাবিত হয়ে চলেছে। অতএব পরিণাম-চিন্তা মানুষের আদিমতম বৃত্তি হলেও আধুনিকতম প্রবণতাও,—পরিণামী প্রত্যয়ের সাধনা আবহমান কাল থেকেই মানব-ইতিহাসের 'শাশ্বত রূপে আধুনিক' বৃত্তি। এই বৃত্তি-সাধকের ভূমিকা স্বীকার করেই তারাশঙ্কর নিজেকে 'বিপ্লবের' দলের শিল্পী বলে পরিচিত করতে চেয়েছেন।

বিপ্লব কেবল ধ্বংস নয়,—যুগপৎ ধ্বংস এবং সৃষ্টি; নবসৃষ্টির প্রয়োজনে ধ্বংস,—কিংবা বিধ্বস্ত ইমারতের ভিত্তির ওপরে নূতন প্রাসাদ গড়ার সাধনা। সে সাধনা মূলতঃ কবির ধর্ম। আমাদের দেশে কবিকে বলা হয়েছে ঋষি,—ত্রিকালজ্ঞ তিনি। অতীতের স্মৃতিসম্পদ স্বীকার করে বর্তমানের পটভূমিতে ভবিষ্যতের স্বপ্ন-রূপ প্রত্যক্ষ করার আরাধনা তাঁর। সিদ্ধকাম কবি যথার্থত 'অনাগতবিধাতা';—তাঁর কল্পনালোকে ভবিষ্যৎ পরিণামের সত্য-সংকেত প্রথম অঙ্কুরিত হয়ে থাকে। আর সেই অঙ্কুরকে সার্থক জন্মদান করেই কাব্যজগতে একমাত্র প্রজাপতির ভূমিকা অর্জন করে থাকেন কবি।—প্রজাপতির মত কবিও নূতনের জন্মদাতা; আর কাব্যসংসারের নবজাতক আসলে এক নবীন প্রত্যয়ের—নিশ্চিত এক নূতন মূল্যবোধেরই প্রতিমূর্তি। আগে দেখেছি, এই অর্থেই রবীন্দ্রনাথও বলেন :—"কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্বোধিত করা। সেই কবিকেই মানুষ বড়ো বলে, যে এমন সকল বিষয়ে মানুষের চিত্তকে আশ্লিষ্ট করেছে, যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর।"[২০]

সংস্কৃত আলংকারিকেরা কাব্য অর্থে সাধারণভাবে সাহিত্যিক নির্মিতি মাত্রকেই বুঝেছেন, কবির অভিধায় সকল সাহিত্য-স্রষ্টাকেই জানিয়েছেন ব্যাপক স্বীকৃতি। তাহলেও আধুনিক চেতনায় কবির ভূমিকা স্বতন্ত্র। কথাসাহিত্যিক বা নাট্যকারের সৃজন-ভিত্তি বস্তু-জীবন-অভিজ্ঞতার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রান্তরে; কিন্তু কবির, অন্তত গীতি-কবির সাধনা বস্তুভার থেকে বস্তুসার আহরণের! কাব্যসৃষ্টির অনন্যপর স্বকীয়তা এখানেই। আর যে রাসায়নিক উপাদানের গভীরে বস্তুজগতের স্থূল কাঠিন্য বস্তুসারের

২০। রবীন্দ্রনাথ—'আত্মপরিচয়'—৫ নং প্রবন্ধ।

মধুমতী পয়স্বতীধারায় বিগলিত হয়,—সে হচ্ছে কবির অনাপেক্ষিক হৃদয়ানুভব। সন্দেহ নেই, সকল সার্থক সৃষ্টির মধ্যেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগৎ শিল্পীর হৃদ্‌বাসনার ধারায় পরিস্রুত হয়ে রসের মূর্তি ধারণ করে। চিরন্তন 'সাহিত্যের গোষ্ঠি-লক্ষণ কি', তার অনুসন্ধান করে তারাশঙ্করও বলেছেন, "এর উত্তর জীবনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য, অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের মধ্যে মিলবে না। এই উত্তর রয়েছে ষষ্ঠেন্দ্রিয়ে অর্থাৎ মনে বুদ্ধিতে—সাহিত্যিকের আত্মায়।···সাহিত্যের মধ্যে সাহিত্যিকের মনের এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনস্বীকার্য। শুধু সাহিত্যের কেন মানুষের জীবনের সর্বত্র মনের এই সক্রিয় সহযোগ রয়েছে।"[২১]

তাহলেও বিশেষ করে সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই মনঃসংযোগ তথা মানস পরিস্রুতির বৈশিষ্ট্যে আকার ও প্রকারগত পার্থক্য রয়েছে। বাইরের খাদ্য-বস্তুকে মুখের মধ্যে গ্রহণ করে যখন চর্বণ করতে থাকি, তখন তার বস্তু-শরীরের অঙ্গে অঙ্গে জীবনরস জড়িয়ে গিয়ে এক নূতন অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটে। আবার সেই ভোজ্যবস্তু থেকে নিষ্কাশিত খাদ্যপ্রাণ যখন অজস্র জীবনকণিকাবাহী শোণিতধারায় পরিণত হয়, তখন তাতে মূল বস্তুকণার শারীর অস্তিত্ব হয় সম্পূর্ণ লুপ্ত। প্রথমটি দেহাশ্রয়ী শক্তি, দ্বিতীয়টি দেহাতীত তেজ,—কেবল তাপ এবং উজ্জ্বলতা। সাহিত্যের জগতে প্রথমটিকে বলি কথাসাহিত্য এবং নাটকের ধর্ম ; আর দ্বিতীয়টির নাম কবিতা। অন্ততঃ আত্মোপলব্ধির প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার পক্ষে কথাসাহিত্যিকের অবকাশ নিরঙ্কুশ প্রত্যক্ষতাপুষ্ট নয়। কি বর্ণনায়, কি উপলব্ধিতে, কাব্যের স্পন্দনকে বস্তু-শরীরের অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত গুপ্ত করে দিতে হয়, মানব দেহান্তরালবর্তী হৃৎপিণ্ডের মত। কাব্য এবং গল্পের প্রকরণ-পরিমাণগত এই পার্থক্যের পূর্বালোচিত তাৎপর্য তারাশঙ্করের গল্প প্রসঙ্গে আর একবার একান্ত স্মরণীয়,—কারণ কথাসাহিত্যিকের শীর্ষাসনে অবস্থান করেও স্বভাব-কবির ভূমিকা তিনি কখনোই বর্জন করতে পারেন নি। গল্পের শরীরে অত্যুচ্চার আত্মপ্রক্ষেপণ তারাশঙ্করের শৈলীর এক শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য, তাঁর রচনার দোষ এবং গুণ দুই-ই।

নিজের সৃষ্টির ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করে পরিণত-মনস্ক শিল্পী দ্বিধাহীন কণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন :—তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাঁর চেনা জগতের একান্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার লোকেরাই নিতান্ত পরিচিত জীবনভূমিতে ভিড় করে এসেছে। তাদের মধ্যে শিল্পীর রাঢ়প্রান্তবর্তী জন্ম-গ্রামের পরিমণ্ডল ও সেখানকার স্বজনেরাই আনাগোনা করেছে বারবার,—আর তাদের মধ্যেও নিজের লেখার গণ্ডিতে ব্যক্তি-

২১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—'সাহিত্যের সত্য'—সাহিত্যের সত্য (প্রবন্ধ)।

তারাশঙ্কর নিজেই এসে ধরা দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি।[২২] অন্যপক্ষে কোনো শিল্পীরই ব্যক্তিত্বকে তাঁর সৃজন-প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়,—তারাশঙ্করের মত আত্মসচেতন ব্যক্তিকে তো কখনোই নয়। তাই নিজের রচনার মধ্যে বারেবারে এসে ধরা দিয়েছেন যে তারাশঙ্কর, তিনি কেবল ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতা-ভাণ্ডারের স্তূপীকৃত বস্তুসঞ্চয় নিয়েই হাজির হন নি,—সেই সঙ্গে এনেছেন সেই জীবন সম্পর্কে নিজের প্রত্যয়, হৃদয়াবেগ, ও সৌন্দর্যবোধের পসরা সাজিয়ে;—গল্পের শরীরে খড়ের ওপরে একমাটি দুমাটির মূর্তি গড়েছেন সেই বস্তুপুঞ্জের সঞ্চিত সম্ভারে। কিন্তু প্রতিমার চক্ষুদান করেছেন,—প্রাণসঞ্চার করেছেন নিজের স্বপ্ন-কল্পনার মাধুরী দিয়ে;—যে-কল্পনার মৌল ভাবনা,—"রস তো শুধু আস্বাদনেই মধুর নয়, তার সঙ্গে তার সঞ্জীবনী শক্তির আ সম্বন্ধ।"[২৩] নিজের গল্প-রসের ভাণ্ডে এই সঞ্জীবনী শক্তির যোগান দিয়েছে তারাশঙ্করের কবি-ধর্ম।

আবার বিতর্ক উঠবে,—কবিতা অথবা কথাসাহিত্য,—তথা সকল সার্থক সৃষ্টিই আসলে স্রষ্টার মানস-পরিস্রুতির রস-রূপ;—কোনো বাস্তবতম সাহিত্যও বস্তু-রূপের অবিচল ফটোগ্রাফ নয়। কিন্তু সকল বিতর্ক পরিহার করেও কথাসাহিত্যে এই মানস-প্রক্ষেপণের প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের অতুল্য বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ নির্ণীত হতে পারে বঙ্কিম-কথাসাহিত্যের সঙ্গে তুলনায়। তারাশঙ্কর নিজে স্বীকার করেছেন তাঁর শিল্পপ্রতিভা "প্রদীপরূপে সার্থক হয়, অন্য" যে "জ্বলন্ত প্রদীপের শিখা থেকে নিজেকে জ্বালিয়ে নিয়ে"—সে শিখা বঙ্কিম-প্রতিভারই সহস্র প্রদীপের একটি,—'কপালকুণ্ডলা'।[২৪] আর মোহিতলাল মজুমদার সার্থক সিদ্ধান্ত করেছিলেন,—"কপালকুণ্ডলা একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য"। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের সকল সার্থক উপন্যাসই 'ললিতা ও মানস'-এর ছন্দোদুর্বল স্বভাব-কবি বঙ্কিমের স্বপ্ন-কল্পনারই সিদ্ধকাম কাব্যরূপ। লোক-দুর্লভ ব্যক্তিত্বের প্রাখর্য, আর সেই সঙ্গে সুগভীর প্রত্যয়ের অবিচল দৃঢ়তাকে অন্বিত করে কবি-বঙ্কিম বজ্রের মত এক অমোঘ শক্তিতে আত্মপ্রক্ষেপ করেছেন নিজ উপন্যাস-বিষয়ের মধ্যভূমিতে, যাতে কম্পিত—স্তম্ভিত না হয়ে উপায় থাকে না মাঝে মাঝে। একটি চরম দৃষ্টান্ত হিশেবে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড: অষ্টম পরিচ্ছেদের কথা মনে পড়ে; সে অধ্যায়ের নাম 'পাপের বিচিত্র গতি'। ফস্টরের নৌকা থেকে সদ্য-উদ্ধৃতা শৈবলিনী প্রতাপের শয়নকক্ষে প্রতাপ কর্তৃক

২২। দ্র. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'আমার সাহিত্য জীবন' ও 'আমার কালের কথা'।

২৩। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—'সাহিত্যের সত্য'—'আধুনিক সাহিত্য ও সমাজ'।

২৪। দ্র. তদেব—'আমার জীবনে কপালকুণ্ডলা'।

রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রবল আত্ম-ধিক্কারের সঙ্গে আত্মসমীক্ষা করছিল। বঙ্কিম লিখেছেন,—"শৈবলিনী আবার নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'মনে করিয়াছিলাম, গৃহের বাহির হইলেই প্রতাপকে দেখিব।······আমি পিঞ্জরের পাখি, সংসারের গতি কিছুই জানিতাম না। জানিতাম না যে, মনুষ্যে গড়ে, বিধাতা ভাঙে ;······। অনর্থক কলঙ্ক কিনিলাম, জাতি হারাইলাম, পরকাল নষ্ট করিলাম'।" কিন্তু শৈবলিনীর এই নিভৃত ভাবনার করুণ বেদনা-লোকে হঠাৎ বজ্রকণ্ঠ নিনাদিত করে আত্মপ্রকাশ করেন ব্যক্তি-বঙ্কিম,—তাঁর পৌরুষ-প্রখর শক্তির সকল কাঠিন্য নিয়ে ঘোষণা করেন,—"পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর একথা মনে পড়িল না যে, পাপের অনর্থকতা আর সার্থকতা কি ? বরং অনর্থকতাই ভাল। কিন্তু একদিন সে একথা বুঝিবে, একদিন প্রায়শ্চিত্ত জন্য সে অস্থি পর্যন্ত সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইবে : সে আশা না থাকিলে আমরা এ পাপ-চিত্রের অবতারণা করিতাম না।" এটুকু কেবল নীতিবাদী বঙ্কিমের অতিসচেতনতার ফলশ্রুতি নয়,—কবি-বঙ্কিমের আত্মপ্রক্ষেপণ !—অবিচল ব্যক্তিত্বের সুতীক্ষ্ণ প্রত্যয়-বাণী,—তারাশঙ্কর প্রসঙ্গান্তরে যাকে বলেছেন শিল্পীর 'জীবনদর্শন'[২৫]—তারই অমোঘ ঘোষণা।

যুগান্তরকারী ব্যক্তিত্বের অপার অতল দৃঢ়তা, এবং আত্মসচেতন প্রকরণ-সৃষ্টির প্রখরতা,—কোনো দিক থেকেই বঙ্কিম-প্রতিভার সমতুল্য নয় তারাশঙ্করের রচনা। কিন্তু অন্তঃস্বভাবের কাব্য-ধর্মে, আত্মপ্রত্যয়ের সচেতন পৌনঃপুনিক উদ্বোধনের প্রবণতায় কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর কবি-বঙ্কিমের পন্থানুবর্তী। এদিক্ থেকে ভাবলে দেখব—বঙ্কিম-রচিত 'উৎকৃষ্ট কাব্য' 'কপালকুণ্ডলা' পড়ে তারাশঙ্করের শিল্পিমানসের উদ্বোধন ঘটেছিল,—এ কোনো কাকতালীয় আকস্মিক ঘটনা নয় ;—বঙ্কিম-সাধনার মুকুরে আপন সমানধর্মা সৃজনী স্বভাবের প্রতিবিম্বই দেখতে পেয়েছিলেন তারাশঙ্কর। তাই একাধিক প্রসঙ্গে নানাদিক থেকেই বঙ্কিম-ভাবনার ভাবানুষঙ্গ পুনঃপুনঃ উত্থাপিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন রচনায়।[২৬] বস্তুত এই স্বভাব-সাধর্ম্যের অভিব্যক্তিই তারাশঙ্করের উপন্যাসগুলিতেও ধরা পড়েছে তাঁর অত্যুচ্চারিত জীবনদর্শনের পৌনঃপুনিক উদ্ধারে। ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র এই তথ্যের বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন 'তারাশঙ্কর' নামক গ্রন্থে। শিল্পী নিজেও এই সত্য স্বীকার করেছেন অকুণ্ঠিত ভাষায়,—"পাথরের দেবমূর্তি ভেদ করে দেবতার আবির্ভাবের কথা যেমন গল্পে আছে, তেমনি ভাবে এই পাপপুণ্যের

২৫। দ্রষ্টব্য– 'সাহিত্যের সত্য'।

২৬। দ্র. ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র—'তারাশঙ্কর'।

রক্তমাংসের দেহধারী মানুষগুলির অন্তর থেকে সাক্ষাৎ দেবতাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। এর খানিকটা আভাস আমার ধাত্রীদেবতায় আছে।"[২৭]

এ-আভাস সবচেয়ে প্রস্ফুট হয়ত হয়েছে 'ধাত্রীদেবতা'য় শিবনাথের রক্ষাকর্ত্রী মেসের ঝাড়ুদারনি ডোম বউ-এর চরিত্রে*। কিন্তু সে কথা থাক্, পূর্বোক্ত স্বীকৃতি কেবল ব্যক্তি-তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতারই সম্পদ নয়, শিল্পি-তারাশঙ্করের অটুট-গভীর প্রত্যয়েরও ধন। তাই প্রায় সকল গল্পে-উপন্যাসে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে এই আন্তর-বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে কাব্যধর্মী আবেগে মণ্ডিত হয়ে। উপন্যাসের বিস্তারিত দেহে যে আবেগ-ভাবনা হয়ত পরিস্ফীত,—ছোটগল্পের সীমিত গণ্ডিতে তাই এক নিটোল আকার ধরে অভিনব স্বাদুতার অনুভব বহন করে এনেছে। এই কারণেই বলেছিলাম, উপন্যাসের তুলনায় ছোটগল্পের শৈলীতে তারাশঙ্করের প্রতিভার ধর্ম সফলতর মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে।

গল্প-রচনার একেবারে প্রথম থেকেই এই কবিধর্মী প্রত্যয়ের প্রেরণা শিল্পীর জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সক্রিয় হয়ে যে ছিল, তার পরিচয় আছে 'রসকলি' গল্পের জন্ম-ইতিহাসে। —'পোনাঘাট পেরিয়ে' এবং 'জনি ও টনি' গল্প দুটি পড়ে তারাশঙ্করের মন জেগে উঠেছিল তাঁর স্বধর্মের অলোক-লোকে ; "মনে হয়েছিল [তাঁর সদ্যপঠিত] গল্পগুলির আত্মা যেন জৈবিক বেগের প্রাবল্যে বেশি অভিভূত,—পরাভূত বললেও অত্যুক্তি হয় না।...জীবদেহ আশ্রয় করেই জীবনের বাস। কিন্তু সে তো তাকে অতিক্রম করার চেষ্টার মধ্যেই মানবধর্মকে খুঁজে পেয়েছে। সেইখানেই তো নিজেকে পশুর সঙ্গে পৃথক্ বলে জেনেছে। ইচ্ছে হল এমনি গল্প লিখব।"[২৮]

তেমন গল্পের পরম উপাদান মিলেছিল শিল্পীর জমিদারি মণ্ডলেই। কমলিনী বৈষ্ণবী রসকলি গল্পের মঞ্জরী হয়ে ফুটেছে "জীবদেহের সরোবরে পদ্মের মত জীবন নিয়ে।" —এক মুহূর্তের নিভৃতির অবকাশে গোমস্তা কমলিনীকে বলেছিল "পানের চেয়ে বৈষ্ণবীর হাসি মিষ্টি। তাই শুনে",—তারাশঙ্কর লিখ্ছেন—"মনে হল—বৈষ্ণবীর কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে উঠেছে। উঁকি মারলাম। দেখলাম,—না তো। সবিনয়ে বৈষ্ণবী আরো একটু হেসে বললে—'বৈষ্ণবের ওই তো সম্বল প্রভু।'

এই তো! এই তো সেই জীবনের জয়।

কথার হাওয়ায় জৈব রসের দীঘিতে ঢেউ উঠল, তাতে তো ওর জীবন ডুবল না, ডুব দিলে না। সে ঢেউ-এর উপর নাচতে লাগল পদ্মফুলের মত।"[২৯]

২৭। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—'আমার সাহিত্য জীবনে'। * দ্রষ্টব্য—একুশ অধ্যায়।
২৮। পূর্বোক্ত গ্রন্থ। ২৯। তদেব।

জীবনকে ডুবতে দেন নি তারাশঙ্কর জৈব রসের দীঘিতে, এখানে তাঁর প্রত্যয়-ধর্মিতার অতন্দ্র প্রহরা ;—একেবারে প্রথম 'রসকলি' গল্প থেকেই।—

রামদাস মহান্তর মৃত্যুর দিন মঞ্জরী অন্তরের সকল ঐকান্তিকতা নিয়েই গোপিনীর শোকে আশ্রয় দিতে গিয়েছিল তাকে। রামদাস ক্ষ্যাপা পুলিনের কাকা—আসলে পিতারও বাড়া ; বাল্যকাল থেকে অন্ধ বাৎসল্যে লালন করেছে মাতৃপিতৃহীন শিশুকে। রামদাস ছিল গোপিনীর আরো বেশি ; সৎপিতা—কিন্তু পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, মাতা,—কি নয়? পুলিনের সঙ্গে গোপিনীর বিয়ে হয়েছিল,—তা'হলেও পুলিন ছিল 'রসকলি'-সর্বস্ব। বাল্যসখী মঞ্জরী-র সঙ্গে সে রসকলি পাতিয়েছিল,—তাদের বিয়ের কথাও একদা ছিল পাকা। কেবল হঠাৎ গোপিনী এসে পড়াতেই……অবশ্য ক্ষতি হয়ত তাতে গোপিনীরই হয়েছে সব চেয়ে বেশি,—আর রামদাসেরও। পুলিন 'রসকলি'তেই মজেছে,—বাড়ির সঙ্গে যোগ তার ক্রমশই হয়েছে ক্ষীণ। মৃত্যুর আগে তাই রামদাস 'পঞ্চজনা'র সামনে গোপিনীকেই যথাসর্বস্ব দিয়ে গেছে। সেই অপমানে ও ক্ষোভে পুলিন বৃদ্ধের অন্ত্যেষ্টির কথা না ভেবেই বেরিয়ে যাচ্ছিল ;—সেদিন পাঁচজনের কলঙ্ক কুড়িয়েও মঞ্জরী সকল বিপত্তির নিরসন করেছে,—মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত তার এক কথায় শান্ত হয়েছে পুলিন,—গোপিনীকে এক প্রহর রাত্রি অবধি একাগ্র স্নেহে আগলে রেখেছিল মঞ্জরী। কিন্তু সব হারিয়ে যে বসে আছে, সব তাতেই তার সংশয়! চলে আসবার মুখে ভুল বুঝে মঞ্জরীকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে গোপিনী। সেই ক্ষোভের বোঝায় মন ভরে "মঞ্জরী ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরিল, বুকের ভিতর তাহার যেন আগুন জ্বলিতেছিল। সাপিনীর [গোপিনী] এত বিষ! আপনার বিষে হতভাগিনী আপনি জর্জর হইয়া মরুক।"

এমনি ভাবতে ভাবতে ঘরে পা দিয়েই মঞ্জরী দেখে পুলিন তার দাওয়ার ওপর বসে। সঙ্গে সঙ্গে "মঞ্জরীর দেহ ব্যাপিয়া একটা হিল্লোল বহিয়া গেল। হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিল।

পুলিন উঠিয়া কহিল, রসকলি।

মঞ্জরী হাসিয়া উত্তর দিল, ব'স বলি।

পুলিন বসিল।"

তারপর দীর্ঘক্ষণ ধরে মঞ্জরী যা বলল তাতে ক্ষ্যাপা পুলিন ক্ষেপে প্রায় উন্মত্ত হল গোপিনীর প্রতি বিমুখতায়। তাহলেও ক্ষোভ-জিগীষারও ত শেষ আছে ; সারা রাত তো আর এই করে কাটিয়ে দেওয়া যায় না। তাই মঞ্জরী নিজেই অবশেষে বলে,—"আজ রাতের মত তো বাড়ি যাও।"

পুলিন বলিল, না, আর নয়।

মঞ্জরী পরিহাস ছলেই কহিল, তবে আজ রাতটা পাল-পুকুরের বটগাছেই কাটাবে নাকি?

পুলিন কহিল, না, তোমার দাওয়াতেই পড়ে থাকব।

মঞ্জরী হাসিল, দুই আর দুইয়ে চার হয়—এ কথাটা যে বুঝে না, সে চারের গুরুত্ব না বুঝিলে তাহার উপর রাগ করিয়া লাভ কি?

তবু সে বলিল, লোকে বলবে কি?

পুলিন বাহির-দরজার দিকে ফিরিল।

মঞ্জরী কহিল, যাও কোথা?

পুলিন কহিল, দেখি কোথাও—

মঞ্জরী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, যেতে হবে না, এস, শোবে এস।

পুলিন ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, লোকে বলবে কি?

মঞ্জরী কহিল, যা বলবার তারা তো বলেই নিয়েছে, আবার বলবে কি? শোন নি, আজই তোমার কাকা বললে, ওই—

পুলিন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তোমার পায়ে ধরি রসকলি, ছি, ও কথা তুমি ব'লো না।

মঞ্জরী হাসিয়া মৃদুস্বরে গান ধরিল—

'লোকে কয় আমি কৃষ্ণ কলঙ্কিনী
সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী।'

পুলিন তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল। স্পর্শে তাহার সে কি উত্তাপ! মঞ্জরী মৃদু আকর্ষণে হাতখানি ছাড়াইয়া শান্ত মধুর কণ্ঠে কহিল, ছাড়, বিছানা করি।

তকতকে ঘরখানি, লাল মাটি দিয়া নিকানো, আলপনার বিচিত্র ছাঁদে চিত্রিত; দেওয়ালে খানকয়েক পট—সেই পুরানো গোরাচাঁদ, জগন্নাথ, যুগলমিলন; সবগুলির পায়ে চন্দনের চিহ্ন। মেঝের উপর একখানি তক্তাপোশ, একদিকে পরিষ্কার বেদীর উপর ঝকঝকে বাসনগুলি সাজানো।

তক্তাপোশের উপর গুটানো বিছানা বিছাইয়া দিয়া একটি ছোট চৌকির উপর রক্ষিত তোলা বিছানার গাদা হইতে দেখিয়া দেখিয়া একখানা 'সিজুনী' আনিয়া পুরাতন বিছানার উপর বিছাইয়া দিল। সিজুনীটি মঞ্জরীর নিজের হাতে অতি যত্নে প্রস্তুত, চারুশিল্পের অপরূপ ছাঁদে বিচিত্রিত। বিছানাটি বেশ করিয়া কয়বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া ডাকিল, এস।

পুলিন ঘরে আসিয়া তক্তাপোশে বসিল। দেখিল, মঞ্জরী অভ্যাসমত ঈষৎ বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া।—সেই হাসি, সেই সব; শুধু দৃষ্টিটুকু নূতন। সে তখন মুগ্ধ, আবিষ্ট, একাগ্র।

পুলিন কথা কহিল, ভাবটা গদগদ; কিন্তু সঙ্কুচিত,—রসকলি!

মঞ্জরী চমক ভাঙিয়া কহিল, কি গো?

পুলিন কহিল, তুমি—তুমি—আমার—আমার—আমার—কথাটা শেষ করিতে পারিল না। প্রতিবারই বাধিয়া যায়, আর পুলিন রাঙা হইয়া উঠে।

মঞ্জরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া কহিল, তোমার—তোমার—তোমার—কি গো?

কৌতুকে গ্রীবা বাঁকাইয়া খানিকক্ষণ পুলিনের নত লজ্জিত মুখের উপর উজ্জ্বল দৃষ্টি হানিয়া সহসা মঞ্জরী তাহার মুখ পুলিনের কানের কাছে লইয়া গিয়া বলিল, আমি তো তোমারই গো?

কথাটা বলিয়াই সে চট করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, চঞ্চল লঘু গতিতে, ছোট ত্বরিতগতি ঝরণাটির মতই। বাহিরে গিয়াই দরজাটা টানিয়া শিকল আঁটিয়া দিল। এক রাশ দমকা দখিনা বাতাস আসিয়া যেন পুলিনকে তৃপ্ত করিয়া অন্তরকে দীপ্ত করিয়া আচমকাই চলিয়া গেল।

শিকল টানিয়া দিয়া আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে ঢেঁকিশালায় গিয়া মঞ্জরী আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল।”

এই ত জীবনের জয়!—কামনা-বাসনার উত্তাপে গহন মনের প্রেমের আকূতি যেখানে শরীরের অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে দুর্নিবার ক্ষুধার তরঙ্গকে উত্তাল করে তুলেছিল, তখনই কল্পনার রাশ টেনেছেন শিল্পী;—ঢেঁকিঘরের মৃৎশয্যায় মঞ্জরীর নিভৃত-নীরব অশ্রুপাত আসলে তো বাসনার বক্ষে বসে জীবনেরই চিরন্তন ক্রন্দন! এই বেদনা—এই আত্মদানের যন্ত্রণাতেই তো মানুষ পশুর থেকে পৃথক! একটি সার্থক ছোটগল্পের সফল পরিসমাপ্তি এখানে ঘটতে পারত; এমন কি তার আগেও ‘রসকলি’ গল্পের মুখবন্ধ নিয়েই আর একটি নিটোল ছোটগল্প অখণ্ড-পূর্ণতা পেতে পারত, রামদাস যেখানে খুঁজে পেয়েছিল শ্রীমতীকে; বৃন্দাবনের পথের ধুলায় ফিরে-পাওয়া হারানো-প্রেম,—তার স্মৃতি-মন্থিত মধুরিমা ‘নিকষিত হেম’-এর উজ্জ্বলতা নিয়েই দেখা দিতে পারত। কিন্তু তারাশঙ্করের গল্প-ভাবনার এক খণ্ডাংশও নয় এই ভগ্ন প্লটটুকু। এমন কি, ‘রসকলি’ মঞ্জরীর সেই আত্মস্বীকৃতি ও আত্মদমনের অমৃত-যন্ত্রণার মধ্যেও গল্প শেষ হয় না! কারণ বলার ভঙ্গী—শিল্পের প্রকরণ তারাশঙ্করের পক্ষে মুখ্য কথা নয়,—বক্তব্যটুকুই তাঁর

আসল উপাদান। তাই তীর্থের বেশে মঞ্জরীকে সর্বরিক্ত পথের ধুলায় টেনে এনেই গল্পের সমাপ্তি—সর্বত্যাগের যজ্ঞাহুতিতেই তার ভালবাসার পরমা মুক্তি। কারণ তারাশঙ্করের আত্মার প্রত্যয়,—"সাহিত্যিকের মধ্যে আমরা শুভবুদ্ধির আশা করব, অন্তত যখন তাঁরা সমাজের পক্ষে, ব্যক্তির পক্ষে বিপজ্জনক উপাদান নিয়ে সৃষ্টি করেন, তখন।"[৩০]

এই বিশ্বাসের প্রগাঢ় স্বীকৃতি, এবং বর্ণাঢ্য চিত্রণের শক্তিতেই তারাশঙ্কর 'কল্লোল'-যুগের সমীপবর্তী হয়েও কল্লোলেতর। বর্তমান প্রসঙ্গে 'পোনাঘাট পেরিয়ে' গল্প-বিষয়ের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। জীবদেহের রিক্ততা আর বাসনা দুয়েরই রূপ সে গল্পে আরো অনাবৃত:—নড়ালের পোল পেরিয়ে পোনাঘাট,—এককালের স্রোতস্বিনী আজ শুকনো খালে পরিণত হয়েছে। তারই পাড়ে হালদার কোম্পানীর ইটের কারখানা। সেই কোম্পানীরই চালান সরকারের জামাই বলাই গুলিখোর,—ঘুরে বেড়ায় খালপাড়ের নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান গাড়োয়ানদের মধ্যে। শ্বশুর চাকরি করে দিয়েছিল হালদার কোম্পানীতেই,—মাল চালানের হিশেব রাখত বলাই। শুরুতেই একদিন গুলির নেশায় ইটের চালানে পাহাড়-প্রমাণ ভুল করে বসলো,—যথারীতি চাকরিতে হলো ইস্তফা। বলাই-র আক্ষেপ নেই তাতে। মেহেরাল্প, ওসমান, জীয়ুৎদের সঙ্গে মিলে বিড়ি খায়, গুলি মারে, সটান পড়ে থাকে তাদেরই বলদ-ছাড়িয়ে-নেওয়া কাত্ করা গাড়িতে। এরই ফাঁকে ফাঁকে আসে আক্লুর মেয়ে ছুটকি,—নানা কাজের উপলক্ষ্যে;—একা পেলেই পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে যায় গুলিখোর সরকার-জামাতার। কিন্তু এমন সব অসময়েই হঠাৎ এসে হাজির হয় খোঁড়াবাবু,—কট্‌মটিয়ে তাকায়। খড়ের গোলা করে দিনে দিনে ফেঁপে উঠ্‌ছিল খোঁড়া। সকল বিষয়েই বলাই নির্বিকার,—কেবল ওইটুকু তার সহ্য হয় না,—ছুট্‌কিকে দেখে খোঁড়া যখন চোখ টাটায়। প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে সে নানা ভাবে। গল্পের জটিলতা তাতে পাক খেয়ে ওঠে। অবশেষে ছুটকির টিকিটিও আর দেখা যায় না। বলাই শোনে,—ছুট্‌কি এখন খোঁড়ার হেফাজতে,—তাকে সে মাসোহারা দেয় তিরিশ টাকা,—আক্‌লুকে দেয় দশ। তাছাড়া নগদ কত পেয়েছে আক্‌লু তাই বা কে জানে!

স্তব্ধ হয়ে যায় গুলিখোর,—সারারাত গুলি খেয়ে বুঁদ হয়ে গভীর অন্ধকারে এগিয়ে চলে খোঁড়ার খড়-গোলার দিকে। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। ফেরার পথে ওসমানকে বলে,—'নেশাখোর মানুষ—আমাদের রাগ করতে নেই,

৩০। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—'সাহিত্যের সত্য'।

তবে আমাদের সেলাম হয় এমনি।'—খোঁড়াকে নাকি 'সেলাম দিয়ে' ফিরেছে বলাই!

নেশাখোরের পদ-চারণের পাশে পাশে পথচারীরা এগিয়ে চলে; ছুটে আসে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। পথচারী একজন বলে,—আহা, গরীব বেচারা গো, সর্বস্ব দিয়ে গোলাটি করেছিল!'—অপর পথিক উত্তর দিয়ে বলে,—'বেম্ম শাপ! মহাপাতক না হলে অগ্নিদেব দেখা দেন না।'—আর একজন বলে,—'তোমার মাথা! পাশেই খেঁাড়ার গোলাটা তাহলে রয়েছে কি করতে! যত মহাপাতক করেছিল ঐ নিরীহ গরীব বেচারী!'

নেশার ঘোরে বলাই তখনো বুঁদ হয়ে চলেছে,—কোনো কথাই তার কানে যায় না!

'পোনাঘাট, পেরিয়ে' গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে এখানে,—আর এই পরিণাম-চিন্তনের মধ্যেই তারাশঙ্করের 'বিপ্লব'-ভাবনার সঙ্গে এ-গল্পের 'বিদ্রোহ'-ভাবের যত পার্থক্য। 'পোনাঘাট পেরিয়ে' গল্পে জীবনের সমস্ত বিশ্বাসের আশ্রয়কে চুরমার করে দেবার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট,—ঈশ্বর, পাপপুণ্য, নীতিবোধ,—সমস্ত মিথ্যা। এখানে পাপাচরণ, অন্যায় আর ব্যভিচারের মধ্য দিয়ে একজন ফেঁপে ওঠে,—আর একজন অসহায় দরিদ্র বিনা অপরাধে প্রায়শ্চিত্তের বোঝা বয়ে মরে। এ জগতে কোনো সান্ত্বনা নেই,—না আছে কোনো আশার ভরসা। সব কিছুকে ভেঙে চুরে দিয়েই যেন এর সমাপ্তি। পূর্বালোচনার প্রসঙ্গ এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। 'কল্লোল'-শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যেই প্রত্যয়ের বাসনা ছিল আন্তরিক এবং সুগভীর। সেই অন্তর-ধর্মের শক্তিতেই তিনি সিদ্ধকাম গল্প-শিল্পী। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের পক্ষে যা আত্মার বাসনা, তারাশঙ্করের পক্ষে তা অমোঘ, এমন কি হয়ত, অন্ধ বিশ্বাসও! প্রেমেন্দ্র মিত্রের চেতনায় ক্ষয়িষ্ণু জীবনের যন্ত্রণার্ত বস্তু-রূপের অনুভব প্রখরতর; তাই তাঁর বিশ্বাসের সঞ্চয় মাঝে মাঝে অসহায়তার অনুভবে বিষণ্ণ অকিঞ্চনের রূপ ধরে। 'পোনাঘাট পেরিয়ে' শৈলীর দিক থেকে অস্ফুট রচনা; কিন্তু 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পটির সুঠাম গঠন-বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। গল্পের পুরো নাম,—"বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে"—এ কান্না পরিবেশ-সচেতন প্রেমেন্দ্র মিত্রের শিল্পি-আত্মারও। তারাশঙ্কর এখানেই তাঁর থেকে ভিন্নতর পথের পথিক। প্রেমেন্দ্র মিত্রের দ্বিতীয়োক্ত গল্পের সঙ্গে তারাশঙ্করের 'মেলা'-র তুলনা করলেই বক্তব্য স্পষ্ট হতে পারবে।

তাহলেও লক্ষ্য করতে হয়, নিতান্ত বিষয়-চয়ন ও বিন্যাসের বিচারে তারাশঙ্করের গল্প অনেক সময়েই 'কল্লোল'-শিল্পীদের চেয়ে কম আবরণহীন নয়। নিছক প্রাসঙ্গিক ভাবেই 'যাদুকরী' গল্পের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বাজিকরের দল শরতের সুচনাতেই এসে গ্রাম মাতিয়ে তুলেছে,—তাদের মধ্যে বাজিকরীরা নাচে আর গায়ও। ভরতপুর থেকে কর্মব্যপদেশে আগত নতুন দারোগাবাবুকে নাচ দেখিয়ে ফিরছিল লাস্যময়ী তরুণী বাজিকরী। জনা দুই কনস্টেবল পিছু নেয়; তাদের আলাদা করে নাচ দেখাতে হবে। এরই মধ্যে একজন বলে!—

—"আমাদের আলাদা করে নাচ দেখাতে হবে।

—দেখাব।

—ল্যাংটা হয়ে নাচতে হবে। এরা এসেছে ভরতপুর থেকে, দেখবে।

মুখের দিকে চাহিয়া বাজিকরী বলিল—একটি টাকা লিব কিন্তুক।

—আমি দেব।

—তুমি ভরতপুরের সিপাই?

—হ্যাঁ।

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বাজিকরী বলিল—কিসের লেগে এলে তুমরা?

—কাজ আছে, পুলিসের কাজ।

ফিক্ করিয়া হাসিয়া মেয়েটা এবার বলিল,—কার মাথা খেতে এসেছ আর কি!

কনস্টেবলটিও হাসিল।

বাজিকরী তাহার গা ঘেসিয়া চলিতে চলিতে মৃদুস্বরে বলিল,—মানুষটা কে বঁধু?

কনস্টেবল তাহার মুখের দিকে চাহিল,—মদির দৃষ্টিতে বাজিকরী তাহারই দিকে চাহিয়াছিল, ঠোঁটের রেখায় রেখায় মাখানো লাস্য ভরা হাসি।

মেয়েটা সত্যই নাচে সমস্ত আবরণ পরিত্যাগ করিয়া! এতটুকু সঙ্কোচ নাই কুণ্ঠা নাই, যৌবন-লীলায়িত অনাবৃত তনুদেহ, চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। সকলের কলুষদৃষ্টি তাহার দিকে নিবদ্ধ থাকিলেও তাহার দৃষ্টি কাহারও দিকে নিবদ্ধ ছিল না।

কণ্ঠে মৃদুস্বরে সংগীত—

হায়রে মরি গলায় দড়ি
তুমি হরি লাজ দিবা,
তুমার লাজেই আমি মরি
লইলে আমার লাজ কিবা।

কুল ত্যজিলাম মন সঁপিলাম
কলঙ্কেরই কাজল নিলাম—
হায়রে মরি বস্ত্র নিয়া
তুমি আমার লাজ দিবা।

উর্-র্ জাগ্ জাগ্ জাগিন্ ঘিনা—

আগন্তুক কনস্টেবলটি একটা টাকাই দিল। খানিকটা পথও তাহাকে আগাইয়া দিল। মেয়েটি বলিল—এইবার এস নাগর, আর নয়।

হাসিয়া সিপাহী বলিল—আচ্ছা!

—তুমি কিন্তুক লোক ভাল লয়।

—কেন?

—বল না কথাটা! মেয়েটি ফিক্ করিয়া হাসিল।"

এর পরেও ফুট্‌কি টেনে গল্প এগিয়ে চলে। কিন্তু সেকথা ছেড়ে দিলেও এই অনাবৃত নারীদেহের বিচঞ্চল নৃত্যও তারাশঙ্করের গল্প-পরিবেশকে মদ-রসাপ্লুত করতে পারে না; শিল্পীর সংযত অস্খলিত পরিণাম-ভাবনার প্রভাবে জীবদেহের উল্লাস তরঙ্গ-কম্পিত দীঘিতে ডুবতে পারে না—গানের অসংস্কৃত বাণী-মাধ্যমও তার এক সার্থক প্রমাণ। শুধু তাই নয়—পদ্মের মত তাকে ভাসিয়ে চলেন শিল্পী 'শুভ-ইচ্ছার',—কল্যাণ-কর্মের ঘাটে ঘাটে। তারাশঙ্কর যথার্থই বলেছেন, তাঁর গল্প-রসের পরিণতি কাহিনী-সমাপ্তির চরম লগ্নে শতদলের মত প্রমূর্ত হয়ে ওঠে,—সমগ্র গল্পের গ্রন্থনে চলতে থাকে সেই কমলকলিকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস,—কখনো প্রচ্ছন্ন, কখনো বা মুক্ত অনাড়ষ্ট ভঙ্গিতে।

মোহিতলাল মজুমদার-ও বুঝি এই শৈলীকেই বলেছিলেন 'উৎকৃষ্ট কবি-দৃষ্টি'। তার স্বভাব বর্ণনা করে সিদ্ধ সমালোচক লিখেছিলেন,—"বস্তুর বাস্তবতাকেই গ্রাহ্য করিয়া তাহার রসরূপ আবিষ্কার করায় যে কবি-মনোভাব, তাহার একটি অভিনব মৌলিক ভঙ্গী তাঁহার গল্পগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।"[৩১]

বস্তুকে বাদ দিয়ে,—একেবারে চোখে-দেখা উপাদান না হলে,—তার শিল্পায়নে কখনোই ব্রতী হন নি তারাশঙ্কর। এমন কি 'সপ্তপদী'র মত বিস্ময়কর গল্প-বিষয়ের মূলেও রয়েছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উষ্ণ স্পর্শ।[৩২] কিন্তু সেই বস্তু-দেহের অঙ্গে অঙ্গে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন গভীর প্রত্যয়-বাসনার স্পর্শ। 'রসকলি', 'যাদুকরী,' অথবা

৩১। দ্রঃ 'পুস্তক পরিচয়'—'রসকলি'—'প্রবাসী' বৈশাখ ১৩৩৬ বাংলা সাল। ৩২। দ্রঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—'সাহিত্যের সত্য'—'মনে রাখার মত'।

'মেলা'র মত গল্পে কাহিনী-বিন্যাসের মধ্যেই সেই প্রত্যয়-স্বপ্ন বিলগ্ন হয়ে আছে,—'রসকলি' গল্পের দেহ হয়ত একটি পৃথুলতা প্রাপ্ত হয়েছে এই কবি-কর্মকে আশ্রয় দিতে। কিন্তু 'যাদুকরী' বা 'মেলা' সম্বন্ধে সে-কথা বলবার উপায় নেই। 'মেলা'র পরিধি ও বিন্যাস যত বিচিত্র, ঠিক সেই পরিমাণেই বর্ণনাংশও একটু অতি-বিস্তারিত; তা না হলে এ-গল্পের অনুরূপ পরিসমাপ্তি অকল্পনীয়। এই গল্প-প্রকাশের প্রসঙ্গেই পরস্পর-বিরোধী মন্তব্যের চমক্ প্রত্যক্ষ করেছিলেন তারাশঙ্কর। গল্পটি 'বঙ্গশ্রী পত্রিকা'য় প্রকাশের জন্য দিতে চাইলে তাঁর বন্ধু কিরণ রায় উৎকণ্ঠিত বিস্ময়ে বলেছিলেন,—"শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনী দাসের হাতে এই লেখা দিবি ?"

অথচ সন্ধ্যাবেলাতেই ঐ একই ব্যক্তি তারাশঙ্করকে সজনীকান্তের অভিমত জানাতে ছুটে গিয়েছিলেন,—'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক নাকি সেদিন বলেছিলেন,—"এই লোকটি বাংলা সাহিত্যে অনেক কথা,—এ যুগের সকলের চেয়ে বেশি কথা বলতে এসেছে। এর পুঁজি অনেক। এনেছে অনেক।"

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে শিল্পীর আজীবন সৃষ্টির পসরা আজ যখন পূর্ণ মহিমায় দীপ্যমান, তখন সজনীকান্তের ভবিষ্যৎবাণীর তাৎপর্য তাঁর সাধনায় দুদিক্ থেকে সফল হয়েছে বলে মনে করি। একদিকে আছে তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতার গভীরতা এবং বৈচিত্র্যের অতুলনীয়তা,—রবীন্দ্রনাথ[৩৩] থেকে বুদ্ধদেব বসু[৩৪] পর্যন্ত সকলেই অকুণ্ঠ ভাষায় যার স্বীকৃতি জানিয়েছেন। আর একদিকে রয়েছে তারাশঙ্করের অতুল্য কীর্তি,—নির্ভাজ নগ্ন বস্তু-শরীরের অঙ্গে অঙ্গে যেখানে তিনি দ্বিধাহীন নূতন পরিণাম-চিন্তার—তাঁর নিজের ভাষায় 'শুভ উদ্দেশ্যের' দোলা সঞ্চারিত করে তুলেছেন। 'মেলা' গল্পটিতে এই দ্বিবিধ-বৈশিষ্ট্যের এক সার্থক সমন্বয়।—

অমর ও মণি ছোট দুই ভাই-বোন,—কিশোর-কিশোরী বলা চলে না,—দুটি বালক-বালিকা! দুটি মাত্র আনি সম্বল করে বাড়ি থেকে তারা পালিয়ে এসেছিল মেলায়,—সে মেলার দিকে দিকে কত বিস্ময়, কত প্রলোভন! সারি সারি খেলনার দোকান,—একের পর এক ময়রা ও খাবারের দোকান,—কোথাও সার্কাস, কোথাও ম্যাজিক, কোথাও বাউল গাইছে,—কোথাও কীর্তনের দল এগিয়ে চলেছে। সব কিছুতেই কত লোভের উপাদান,—অথচ সবতাতেই লাগে পয়সা। ছোট্ট ভাই-বোন এগিয়ে চলে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে,—সার্কাসের তাঁবুর সামনে ভিড়ের চাপে দুই ভাই-বোনে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তার পেছনেই ছিল 'আনন্দবাজার',—মেলার

৩৩। দ্র. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—'আমার সাহিত্য জীবন'। ৩৪। B. Bose—'An Acre of Green Grass.'

সবচেয়ে উজ্জ্বল-আলোকিত অংশ ;—যেখানে সমচতুষ্কোণের আকারে চারটি ডে-লাইট জ্বলছিল,—যার চারপাশে সমচতুষ্কোণের মত সারি সারি খড়ের চালা উঠে গেছে।……"প্রতি ঘরের দরজায় ছোট ছোট চারপায়ার উপর এক-একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। আর তাহাদের লেহন করিয়া ফিরিতেছিল অন্ততঃ পাঁচশ জোড়া ক্ষুধাতুর চোখ। সস্তা অশ্লীল রসিকতায় মুহুর্মুহুঃ উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাসি আবর্তিত হইয়া উঠিতেছিল।"

'আনন্দবাজার অর্থাৎ বেশ্যাপটী'র অনাবৃত বস্তু-বর্ণনায় তারাশঙ্কর যে নিরঙ্কুশ তথ্য-ভাষণের ঋজুতা প্রকাশ করেছেন, তাই দেখে হয়ত তাঁর বন্ধু আতঙ্কিত হয়েছিলেন। সেই ঋজু অনাড়ষ্ট জীবন-দৃষ্টির শক্তিতেই তারাশঙ্কর বালক অমরকেও টেনে নিতে পেরেছেন,—যেখানে "আনন্দবাজারের অঙ্গনমধ্যে উচ্ছৃঙ্খল আবর্ত-উচ্ছ্বাস তীব্রতম হইয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে।…… অমর বহু কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করিয়া অবাক হইয়া গেল।

একজন পুরুষের গলা ধরিয়া সুশ্রী একটি মেয়ে উন্মত্তার মত নাচিতেছিল। বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরপাক খাইতেই পুরুষটি মেয়েটিকে ছাড়িয়া দিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে পড়িয়া গেল। উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাস্যে জনতা উল্লাস প্রকাশ করিল।"

এই নিরাবরণ বর্ণনার কোথাও 'বিদ্রোহের' চোখ-ঝল্‌সানো উত্তপ্ত দীপ্তি অথবা আত্মগ্লানির অবসাদ-জ্বালা বিন্দুমাত্রও উপস্থিত নেই। কারণ নৈর্ব্যক্তিক ঋজু ভঙ্গিতে শিল্পী যে অনাড়ম্বর তথ্য বর্ণনা করতে পেরেছেন, তার মূলে আছে কল্যাণ-স্নিগ্ধ পরিণাম অঙ্কনের সুদৃঢ় প্রত্যয়। 'আনন্দবাজারে'র সর্বাপেক্ষা লাস্যময়ী কমলির ঘরেই অন্ধকার পেছনের দরজা দিয়ে গিয়ে উঠেছিল পথহারা মণি। ছ'বছরের ছোট্ট শিশুর বক্ষে বক্ষ দিয়ে ব্যভিচারিণী নটীর আত্মায় জননীর ক্ষুধা উদগ্র হয়ে ওঠে। তার পরিণামে উন্মাদের মত সে ছুটে যায় 'আনন্দবাজার' ছেড়ে অন্ধকার পথে,—ঐ ছোট মেয়েটিকে 'মাসী'-র লোভ-উন্মত্ত করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করবার আকাঙ্ক্ষায়। কমলির বুভুক্ষু আত্মা যেখানে মণির 'মাসীমা' হয়ে উঠেছে, সেই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর পূর্বালোচিত 'চোর চোর' গল্পের কথা মনে করা যেতে পারে। কিন্তু বারাঙ্গনা-জীবনের অবসন্ন মুহূর্তে আপন আত্মার অপগত ছায়ামূর্তির আকস্মিক আবিষ্কারের বিমর্ষতা, আর ভ্রষ্টা নারীর মধ্যে জননীরূপা কল্যাণীর আবির্ভাব-কল্পনা এক নয়। প্রথমটি অনিশ্চিত বিষণ্ণতা বোধের ব্যঞ্জনাবহ,—দ্বিতীয় সুদৃঢ় প্রত্যয়ের নাটকীয় রূপায়ণ।

প্রকরণের দিক থেকে 'মেলা' গল্পটি নিখুঁত ছোটগল্পের সংহতি দাবি করতে পারে না,—গ্রন্থনের বিস্তার-শৈথিল্যই তার মুখ্য কারণ। কিন্তু আলোচ্য তিনটি গল্পেই

শিল্পীর প্রত্যয়-ঘোষণায় অকুণ্ঠতা স্পষ্টত অশংসয়িত,—কখনো বা অতি-দৃপ্ত। যে-কোনো গল্পেই অমোঘ প্রত্যয়ের এই বর্ণাঢ্য চিত্রণধর্মকেই তারাশঙ্করের কবি-স্বভাব বলে অভিহিত করতে চেয়েছি; আর এখানেই শৈলজানন্দের পথে তিনি শৈলজানন্দের চেয়েও প্রাগ্রসর,—এক সুনিশ্চিত পথের অচঞ্চল পথিক। শৈলজানন্দ-প্রসঙ্গে পূর্বালোচনায় বলেছি,—জীবনকে তার অখণ্ড মূর্তিতে দেখেছিলেন তিনি;—কিন্তু মৃন্ময়-বস্তু-জীবনের দেহে প্রাণসঞ্চারের উপযোগী চিন্ময় কোনো প্রত্যয়-মন্ত্র সমুচ্চারিত হয় নি তাঁর কণ্ঠে। কেবল এই কারণেই বুঝি আত্মঘোষণায় নির্বাক শিল্পী তাঁর স্বীকৃতির পূর্ণ মূল্য কোনো দিনই দাবি করতে পারলেন না। এমন কি তারাশঙ্করও হয়ত তাঁর সমকালীন সমানধর্মী এই প্রগত-কে যথার্থরূপে আবিষ্কার করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সত্যদৃষ্টির আলোকে শৈলজানন্দের স্বাতন্ত্র্য-পরিচয় আচ্ছন্ন থাকে নি,—সেকথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আত্মার বাসনায় শৈলজানন্দও যে তারাশঙ্করের প্রযুক্ত অর্থেই 'বিপ্লবের' দলভুক্ত, পরিণত বয়সের উপলব্ধিতে সেই সত্যকে অভিব্যক্ত করেছেন তিনি নিজেই :—

"জীবনের সত্যানুসন্ধানের অভিসার যাত্রা আমার এখনও চলছে। এখনও দেখছি, একদিকে যেমন দেশের অধিকাংশ মানুষ দয়া-মায়াহীন ধর্মাধর্ম বিবর্জিত হয়ে তার দুরাশার চরমতম স্বপ্নকে সফল করবার জন্য অসত্যকে অপমানকে অনায়াসে স্বীকার করে নিচ্ছে, নিজে যা নয় তাই হবার জন্য কোন অন্যায় করতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না, অবলীলাক্রমে অপরের ক্ষতি করে নিজে বড় হবার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে তেমনি তার সাহিত্যে চলেছে জীবনের জয়গান, চলেছে—মানুষের নিত্যরূপ এবং শ্রেষ্ঠরূপের প্রকাশ। মানুষের আনন্দবোধ এবং সুখবোধের সীমা কেমন করে দুরাশার চরমতম স্বপ্নকে পেছনে ফেলে রেখে, ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের তৃপ্তিকে অতিক্রম করে, মানুষের সমস্ত মন, ধর্মবুদ্ধি এবং হৃদয়কে অধিকার করে—সাহিত্যে রচিত হচ্ছে তারই বিচিত্র কাহিনী। মনুষ্যত্বের আনন্দপরিধির বিপুলতায় চলেছে সাহিত্যের বিজয়োৎসব।

সাহিত্যের কল্যাণে মানুষের হৃদয়রাজ্যের পরিধি ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছে।[৩৫]

তাহলেও প্রশান্ত, অ-প্রখর দ্রষ্টা শৈলজানন্দ কেবল যথোচিত উদ্দীপনার (initiative) অভাবে গল্পের শরীরে আত্মার আকাঙ্ক্ষাকে স্পষ্টোচ্চারিত প্র-মূর্তি দান করতে পারেন নি। কিন্তু তারাশঙ্কর তা করেছেন অপার সার্থকতার সঙ্গে এমন কি প্লটের শরীরে যেখানে কাব্যের স্বপ্ন ধরে নি, সেখানে সঞ্চারিত করেছেন আবেগের প্রদীপ্ত উচ্ছ্বাস। 'ইমারত' গল্পের কথা মনে পড়ে :—

৩৫। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—'আমার সাহিত্য'—দেশ পত্রিকা (১৪ই পৌষ, ১৩৬৮)।

জনাব শেখ রাজমিস্ত্রী সারাজীবন ইমারত গড়েছে। এ-কেবল তার পেশা নয়,—নেশা, ধর্ম, সবই।

জাত-শিল্পী জনাব,—স্রষ্টার দিগন্তলেহী স্বপ্ন তার চোখে। শ্যামাদাস বাবুর শিবমন্দির গড়ছিল জনাব।—কৃপণ,—যখের স্বভাব শ্যামাদাসের। শেষ বয়সে শিবমন্দির গড়ার অদ্ভুত খেয়াল হয়েছে,—লোকে দেখে বিস্মিত হয়। তবু পয়সা বুকের পাঁজরের টুক্‌রো শ্যামাদাসের,—তাই জনাবের হাতে মন্দিরের ইমারত যখন আকাশ ফুঁড়ে উঠতে থাকে, আতঙ্কিত হন শ্যামাদাস,—তিনি যে ছোট্ট একটি মন্দির গড়তে চেয়েছিলেন! জনাব শেখ তার উত্তরে যা বলে, সহজ-কবির স্বরূপ যেন তাতে মূর্তি ধরে ওঠে;—"মন্দিল হবে, দেবতার মন্দিল আকাশের গায়ে মার দিয়ে মাথা উঁচা করে খাড়া থাক্‌বে, সুরুযের আলো পড়ে সোনার কলস ঝলবে। গাঁয়ের লোকের ঘুম ভাঙ্‌বে সকালে, আল্লাকে—ভগবানকে প্রণাম করতে মুখ তুলবে, আপনার মন্দিলের চূড়া চোখে পড়বে। তারা প্রণাম করবে আপনার ঠাকুরকে।...মন্দিলের চূড়া ক্রোশ বরাবর দূর থেকে দেখা যাবে। তবে সে মন্দিল। গাঁয়ের চারপাশে গাছপালা, জঙ্গল মনে হয় দূর থেকে। সেই জঙ্গলের মাঝখানে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে আশ্বিনের টুক্‌রাভর মেঘের মত মন্দিলের মাথা দেখা যাবে। লোকের প্রথমে মনে হবে মেঘই বটে। তারপর মনে হবে—না, মেঘ তো লয়,—মন্দিল—এ মন্দিল। তারিফ করবে লোকে। বুলবে—হ্যাঁ, ইমানদার লোকের কীর্তি বটে।..."

মন্দির, ইমারত, শুধু তার বস্তু-মূল্যেই মূল্যবান নয়, তার সৃষ্টিগুণের উৎকর্ষে কালজয়ী,—এ বিশ্বাস জনাবের আত্মার নিত্য সঙ্গী। সে বলে,—"হায় খোদা! হে ভগবান! এ কাজ এত সোজা? একি এমনি হয়! খোদা তায়লা দুনিয়া তৈরি করলেন—কোথাও গড়লেন পাহাড়, কোথাও গড়লেন নদী, কোথাও গড়লেন বন—সমান মেঝের দুনিয়ার ক্ষেত গড়লেন—কিনারায় কিনারায় সমুদ্দুর। তাঁর কাছ থেকেই না বড় বড় মানুষ দামি মগজে ভরে নিয়ে এল সেই বিদ্যা!"—সাধনার মত করে তাই সৃষ্টির এই ঐশ্বরিক বিদ্যাকে আয়ত্ত করেছিল জনাব,—"নবাবী আমলের ইমারতী এলেম" আর তার সঙ্গে 'সাহেবানদের' আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারী বিদ্যা। গুরু-দক্ষিণাও দিতে হয়েছিল তাকে চরম মূল্যে,—রঙ্গুকে নিয়ে নিয়েছিল খুরসেদ,—সাহেব ডাঙার রেশমকুঠিতে এই খুরসেদই ছিল তার জ্ঞানের মুরশীদ। আঠার বছর বয়সে নিজের চেয়ে বড় হাড়িদের মেয়ে রঙ্গুকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল জনাব,—মাতাল করেছিল রঙ্গু তাকে। যেমন চোখ, তেমনি চুল,—"আর সে কি কালো রঙ্‌!"—তেমন কালো আর চোখেই পড়ে নি কখনো জনাবের ষাট্ বছর বয়সে। এই রঙ্গুকে

নিয়ে গিয়েছিল খুরসেদ। জনাবও পালিয়েছিল খুরসেদ-এর সন্ত-নিকে-করা বউ হামিদনকে নিয়ে, সেই হামিদন আবার মরেছিল বর্ধমানের এক গাঁয়ে। খারাপ অসুখ হয়েছিল,—দোষ নেই হামিদনের, জনাবই তাকে সে অসুখ ধরিয়েছিল,—জনাবকে দিয়েছিল বর্ধমানের কামিন সৈরভী। জোয়ান বয়সে তখন জনাব চিকিৎসা করে ভাল হয়েছিল। কিন্তু হামিদন লজ্জা ভেঙে প্রথম যখন প্রকাশ করলে তখন তারা গাঁয়ে চলে গেছে,—অনেক ভেতরে, চিকিৎসা হয় নি।

তাহলেও রাজমিস্ত্রীর ছেলে জনাব ইমান হারায় নি কখনো। ষোল বছর বয়সে তার বাবা প্রথম কর্ণি হাতে দিয়ে বলেছিল,—"বাপ্, এই কথাটি মনে রাখিয়ো; আগে ষোল আনি কাম দিবে তার বাদে ষোল আনি টাকাটি লিবে।"—বুকে সেই গুরু-বাক্যের নিষ্ঠা, আর দুচোখ ভরে শিল্পীর স্বপ্ন নিয়ে জনাব ঘুরে ফিরেছে,—রাজমহল থেকে সাহেবডাঙা, সেখান থেকে বর্ধমান,—শহর থেকে গাঁয়ে কত পুরোনো ইমারত দেখেছে,—কত সব অপূর্ব সৃষ্টি!—নিজেও গড়েছে কত। কোথাও ইমানের ফাঁকি দেয় নি এই দীর্ঘ ষাট বছর বয়সের সাধনায়। নিজের গাঁয়ের কয়েকটিমাত্র পুরানো মসজিদ-মন্দির ছাড়া সর্বত্রই রয়েছে সেই ইমানদার কর্ণির চিহ্ন। শ্যামাদাসবাবুর মন্দিরের কাজও ষোল আনা উঠিয়ে দিয়েছে জনাব। বাকি রয়েছে কেবল 'পলেস্তারা, নক্সা, কার্ণিস, বিট, পাতলা ছুরির মত ধারালো মিহি কর্ণির কাজ।' এবারে তাই শুরু হবে।

এমন দিনে কাজে যায় না জনাব,—অসুখ হয়েছে তার আবার,—রসিদ বলে, "কামিনগুলোকে নিয়ে মাতামাতি করে বুড়োবয়সে।"—এই রসিদকেই একদিন ভাল হয়ে উঠে প্রকাশ্যে মেরেছিল জনাব—মতিকে সে অসুখ ধরিয়েছিল বলে,—মতির থেকেই জনাবের অসুখ। সে পরের কথা, তার আগে ইঞ্জেকশন নিয়েছে জনাব সেদিন,—তাই বসে আছে, জ্বর আসবে এবার,—এমনিই হয়,—জনাব সব হদিশ জানে। বাড়িতে কেউ নেই, "হামিদনের মৃত্যুর পর সে আর নিকা করে নাই। ইচ্ছাই হয় নাই। কি করবে সে নিকা করে? রঙ্গু, সৈরভী, হায়তন, রোশনী, টগরী বউ, সত্য ঠাকুরঝি, জুবেদা, রানী সই, মতি নাতবৌ, দাসী নাতনী এদের নিয়ে দিন কাটছে তার,......ওদের তো সে ছাড়তে পারবে না। সে জানে, অহরহ কাজকর্মের সময় যারা পাশে থাকে, হাতে হাতে লাগে, চোখে চোখ রাখতে হয়, পায়ে ইট পড়লে আহা বলে, যাদের মাথার চুল মুখে এসে পড়ে ঝুঁকে ইট মশলা দেবার সময়, ভারার উপর কড়া রোদে মাথা ঘুরে গেলে যারা বাতাস দেয় আঁচল দিয়ে, তাদের উপর দিল না পড়ে উপায় কি? এমন কোনো রাজমিস্ত্রী সে তো দেখ্‌লে না,—যে এদের দিল্ না দিয়ে পারলে।...

সে জানে খোদা তায়লার দরবারে এটা তার গোনাহ্। তার এই পাপ—জেনার জন্তে গোনাহ্-এর গোনাগারি তাকে দিতে হবে। দুনিয়ার মানুষকে সে দেখেছে। ভালমানুষ আছে বৈকি! এই দুনিয়ায় পয়গম্বর আসেন—ইমানদার মানুষ আছেন—তাই তো দুনিয়া আজও আছে। নইলে দুনিয়া ফেটে চৌচির হয়ে যেত মানুষের পাপে। ওঁরা বাদে বিলকুল মানুষ সুদ খাচ্ছে—ঘুষ নিচ্ছে—চুরি করছে—জেনা ব্যভিচার করছে। সে সুদ খায় না, ঘুষ নেয় না; চুরি করে না।···

সে বলে—আল্লাহ্ তায়লা—খোদা তায়লা—মহম্মদ রসুল আল্লাহ্! আমার এই গোনাহ্টুকু মাফ্ কিয়া যায় হজরৎ!

অনেকক্ষণ পরে সে আবার বলে—যদি গোনাহ্গারি দিতে হয়—মাফ যদি নাই করো—সাজা দিয়ো তুমি।"

—ক্রমশ জ্বর ছেড়ে যায় জনাবের—দুটো ইঞ্জেক্শনেই সে তাজা হয়ে ওঠে। তারপর আবার শ্যামাদাসবাবুর কাছে গিয়ে হাজির হয়। রসিদকে সে চড় মারে—রোগ ধরিয়ে চিকিৎসা করায় না বলে।—মতিকে নিজে খরচ দিয়ে চিকিৎসা করায়! মন্দির শেষ হয়ে গেলে আবার চলে যায় গ্রাম ছেড়ে সাঁওতাল পরগণায়। যাবার সময় রসিদের হাতেই মতিকে সঁপে দিয়ে যায়।· "সাঁওতাল পরগণায় লাল মাটির টিলা, সেই টিলার উপর সাহেবানদের গির্জা হবে। চাঁপার কলির মত গোল ক্রমশ সরু সূচালো হয়ে উঠবে গির্জার চূড়া।"—সেখান থেকে ডাক এসেছে রাজমিস্ত্রী জনাবের।—

এ পর্যন্ত এসে তারাশঙ্করের অনেক উৎকৃষ্ট গল্পের মত ফুট্কি দিয়ে আবার শুরু হয়েছে গল্পের ক্রোড়াংশ। শিল্পী নিজেই এবারে বলেন,—"শ্যামাদাস বাবুর মন্দির এবং জনাব নিয়ে গল্প শেষ হয়েছে। কিন্তু জনাবের কথা শেষ হয় নাই। সামান্য কয়েকটা কথা।"—

সেকথা আর কিছু নয়, তারাশঙ্করের শিল্পি-আত্মার প্রত্যয়-স্বপ্নের কাব্যিক ঘোষণা। জনাবকে তিনি গড়েছেন নিজের অভিজ্ঞতার মাটিতে ভাব-কল্পনার প্রত্যয়-মাধুরী মিশিয়ে।

তিন বছর পরে রুগ্ন, বৃদ্ধ, অথর্ব, জনাব ফিরে আসে দেশে,—কিন্তু রসিদ ও তার প্রতিপত্তিশালী পিতার বক্রতায় নিজের ভাঙা বাড়ির ভিটেটুকুও তখন তার হাতছাড়া হয়েছে। এক সাঁওতাল যুবতীকে সে সঙ্গে এনেছিল,—সেও গিয়ে উঠেছে রসিদের ঘরে। এককালে আবদুলও শাকরেদ ছিল জনাবের,—রসিদের মত তার কাছে কাজ শিখেছে। ইমানদার ছেলে,—তারই সহায়তায় গ্রামের বাইরে বিশ পঁচিশটা

ঝুরিওয়ালা বুড়ো ভুতুড়ে বটের তলায় আস্তানা গাড়লে বুড়ো জনাব। এইখানে প্রথম যৌবনে নৈশ অভিসারে আসত রঙ্গু,—এখান থেকেই পালাবার যুক্তি করেছিল দুজনে।

গাছের তলায় বসেছিল জনাব,—অদূরে তার ভাঙা চালাঘর। "আষাঢ় মাস। ঘনঘটায় মেঘ করে এসেছে, আকাশ যেন ভেঙে পড়বে। বৃষ্টি আসবে।" জনাব উঠ্‌তে চেষ্টা করেও উঠ্‌তে পারে না। আর চালাঘরে গিয়েই কি হবে—জল আট্‌কাবে না, বরং জোর হাওয়া দিলে চাপা পড়তে হবে। শান্ত হয়ে তাই বসে থাকে বুড়ো নিঃশক্তি জনাব,—সেই প্রাগৈতিহাসিক বুড়ো বটের তলায়,—চুপ করে সে চেয়ে দেখে—

"ঘন কালো মেঘ। কালো রঙ্‌ মিশানো সিমেণ্ট করা মেঝের মত বাহার খুলেছে। বাহবা! বাহবা! ওকি মন্দিরটা নয়? কালো আকাশের গায়ে সোনার বরণ কলস—কয়েকটা দানা-বাঁধা বিজলীর মত ঝক্ ঝক্ করছে। তার নীচে পঙ্কের পলেস্তারা করা দুধ-বরণ মন্দিরের মাথা। আহা-হা-হা! চোখ ফেরালে সে। আকাশ-জোড়া কালো মেঘের পালিশের গায়ে হলুদবরণ ঘরে মাধব বাবুর তেতলার ঘরের সারি। সোনার বরণ বহুড়ীরা জানালা ধরে দাঁড়িয়ে মেঘ দেখ্‌ছে। নীচের তলায় বৈঠকখানা ঘরে বাবুরা মজলিশ করে বসে গরম চা খাচ্ছে। বাচ্চারা সব বারান্দায় ছুটাছুটি করছে। তার হাতে গড়া ছাদ। কোনো ভয় নেই যত জোরে আসুক বৃষ্টি, এক ফোঁটা গলে পড়বে না। আনন্দ্‌ রহো, আরাম করো। আর একটু দৃষ্টি ফিরিয়েই ঐ আর এক টুক্‌রো দালান—কার চিলে-কোঠা—কালো মেঘের গায়ে ভাসা বাড়ির মত মনে হচ্ছে। কবুতরেরা, কাকেরা, পেঁচারা আল্‌সের নীচের খোপে খোপে গিয়ে ঢুকেছে; গলা ফুলিয়ে চুপ করে সব বসে আছে। এ খোপ মিস্ত্রীরাই রাখে। থাকুন সুখে আরামে মৌজ করে মালিকরা ঘরে অন্দরে, পাখিরা থাকবে খোপরে খোপরে। থাক্ তোরা, আরামসে থাক্। খোদা তায়লার কাছে কলকল করে বলিস—জনাব আলির জেনার গোনাহ্‌ যেন মাফ করেন। আর কোনো গোনাহ্‌ তার নাই। আবার দৃষ্টি ফেরালে সে, এদিকে কোনো কিছু দেখা যায় না। শুধু মেঘ—শুধু মেঘ। বাহারে! চমৎকার মেঘ ত এদিকটায়! সাদায় কালোয় যেন ভাঙা-গড়া চলছে লহমায় লহমায়। ওই দিক্‌টা দিয়েই সে সাঁওতাল পরগণা গিয়েছিল। বাঃ, শাদা মেঘ যেন ঠিক গির্জার চূড়া হয়ে উঠেছে। চাঁপার কলির মত গোল মিনার ক্রমশঃ সরু সূচালো হয়ে মিশে গিয়েছে। দুনিয়ার সব দুঃখ সে ভুলে গেল। দৃষ্টি ফেরালে সে আবার।

আঃ—ওই যে মসজিদ—ওই যে তার হাতে গড়া মিনার !

ঝপ্ ঝপ্ করে বৃষ্টি নেমে আসছে।

আসুক।

জনাব তাকালে মাথার উপরে—বুড়া বটগাছের পাতায় পাতায় ঢাকা গেল গম্বুজের মত মাথার দিকে। খোদা তায়লার নিজের হাতে গড়া ইমারত। সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে—এইটুকু ছাড়া।"

'ইমারত' গল্পের শেষ হয়েছে এখানে,—বাংলা গল্প-সাহিত্যে কবি-স্বভাবিত তারাশঙ্করের শিল্প-ধর্মের পরিচায়নও এখানে সম্পূর্ণ হতে পারে। পূর্বে বলেছি, বস্তুময় জীবনের ভিত্তির ওপরেই কথাসাহিত্যিক তাঁর সৃষ্টির আসন প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর সেই বস্তুদেহের শিরায় শিরায় জড়িয়ে দেন শিল্প-ভাবনার সঞ্জীবনী,—খাদ্যের শরীরে অম্ল-রসের মত। কিন্তু কবির স্বপ্ন বস্তুর ভেতর থেকে বস্তুসারকে আহরণ করে। তারাশঙ্করের প্রত্যয়-সিদ্ধি এই কবি-স্বপ্নের সঙ্গে তুলনীয়। 'রসকলি,' 'যাদুকরী' প্রভৃতি গল্প সম্বন্ধে বলেছি,—বস্তুর সঞ্চয় তাঁর রচনায় অপার। কিন্তু সেই বস্তুর সৌষ্ঠব-সংহত সুদৃশ্য অঙ্গরচনায় তাঁর শিল্প-দৃষ্টি আগ্রহী নয়। দুই হাতে বাস্তব অভিজ্ঞতার ফুলঝুরি খেলে সুনিশ্চিত বিশ্বাসের স্বপ্নলোকে পৌঁছে যাবার দিকেই তাঁর ঝোঁক। তাতে বস্তুর অপচয় ঘটেছে কম নয়,—অনেক স্থলে গল্পের শরীর অতিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে,—এমন কি ছোটগল্প তার যথোচিত শমে এসে পৌঁছালেও আবার তাকে টেনে নিয়ে চলেছেন শিল্পী। এই শেষোক্ত প্রচেষ্টার উদার স্বীকৃতি তো রয়েইছে 'ইমারত' গল্পের পূর্বোদ্ধৃত শেষ-অংশে। তারাশঙ্করের গল্প নির্বস্তুক নয়,—বস্তু-বহুল ; কিন্তু বস্তু-নিমগ্ন নয়,—স্বপ্নলীন !—বস্তুকে অতিক্রম করেও সেই স্বপ্নের জগতে পৌঁছুবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েই যেন লেখনী ধরেন তিনি।

ফলে বস্তুর সঙ্গে স্বপ্নের সহজ সংযোগে একটি রাসায়নিক অখণ্ডতা আর গড়ে উঠল না। ঐ 'ইমারত' গল্পের মধ্যেই দেখি,—একদিকে রয়েছে রাজমিস্ত্রীর রীরংসা বৃত্তি,—বংশ বংশ ধরে যা অনতিক্রম্য হয়ে আছে,—আর একদিকে ছড়িয়ে পড়েছে শিল্পি-আত্মার বিশুদ্ধ সত্য-স্বপ্ন। অর্থাৎ, জনাব শেখের পক্ষে এই দুই-ই যথার্থ,—চরিত্র হিশেবে জনাব স্বাভাবিক, বাস্তব, জীবন্ত ;—কি কর্মে, কি স্বপ্নে। কিন্তু প্রয়োগ-বিধির দিক্ থেকে,—জনাবের কাজ এবং জনাবের স্বপ্ন একসূত্রে বাঁধা পড়ে নি ;—রুগ্ন জনাবকে থামিয়ে দিয়ে জ্বরের ঘোরে তার কণ্ঠে স্বপ্নের বাণী রচনা করতে হয় শিল্পীকে,—সত্যের কাব্য-দেউল নির্মাণের জন্য গল্প শেষ করেও বৃদ্ধ অথর্ব জনাবকে নিয়ে এগিয়ে যেতে হয় নৈষ্কর্ম্যময় অপারগ ভাবনার কল্পলোকে। জনাবের

জীবনে action আর emotion অভিন্ন সামগ্রিকরূপে প্রমূর্ত হল না। কেবল এই কারণেই মনে হবে যে, কবির স্বপ্ন গল্পের বস্তু-শরীরে যেন অতি-প্রক্ষেপিত,—এসব ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের জীবন-মন্ত্র একটু অতিমাত্রায় উচ্চারিত।

কিন্তু এটুকু অভাব হলেও অস্বাভাবিক নয়। বরং—ঐখানেই তাঁর রচনাধর্মের ওপরে পড়েছে ইতিহাসের নিজের হাতের স্বাক্ষর। আপন শিল্পধর্মের বিশিষ্টতা নিয়ে তারাশঙ্কর হয়ত পরোক্ষত রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের নবযুগোচিত উত্তরাধিকার আকাঙ্ক্ষা করেছেন। অন্তত সমসাময়িক ইতিহাসের প্রসঙ্গে "বিপ্লবের অগ্রগামী বিদ্রোহের কাল"-এর পতাকাধারী "শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, প্রবোধ, বুদ্ধদেব, সরোজকুমারের" থেকে পার্থক্যের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা দাবি করেছেন। পুরাতনের উত্তরাধিকার নূতন কালের সার্থক সৃষ্টির মধ্যে আপনা থেকেই বর্তায়। ঐতিহ্যই ত আসলে সকল সার্থক গতির প্রায় একমাত্র পাথেয়। তাহলেও তারাশঙ্কর যে পরিমাণে পূর্বসূরীদের স্বভাবযুক্ত, তার চেয়ে কম পরিমাণে নিজের কালের সান্নিধ্যবর্তী নন। শরৎচন্দ্রের চেয়ে শৈলজানন্দের সঙ্গে তাঁর নৈকট্য বেশি। তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্য-সাধনা শুরু করেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনেক পরে। ততদিনে বাংলাদেশের ইংরেজি-শিক্ষিত তরুণ চেতনায়, শিল্পী নিজেই যাকে 'আধুনিক বিজ্ঞান-প্রভাব' বলে অভিহিত করেছেন, তার গভীর রেখাঙ্কন শুরু হয়ে গেছে। কেবল যুদ্ধোত্তর রাজনীতি (গান্ধীবাদ, সমাজবাদ প্রভৃতি) অথবা অর্থনীতির (শিল্পপ্রধান আর্থিক জীবননীতির অভ্যুদয়) ক্ষেত্রেই নয়, পরিবার-নীতি, চরিত্রনীতির জগতেও তার ছাপ পড়েছে। তারাশঙ্কর মূলত স্বভাব-শিল্পী, সহজ-প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া স্রষ্টা;—বই পড়ে নূতন কালের জ্ঞান তিনি আহরণ করেন নি। বস্তুত এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য-ও। কিন্তু প্রকৃতিকে অস্বীকার করবার উপায় কোথায় তাঁর পক্ষেও? বাংলাদেশের নতুন যুগের ভাবপ্রকৃতিতেও তখন যে নবীন প্রবণতা আমূল সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল,—তার এক মুখ্য উপাদান ছিল পরিবেশ-সচেতনতা। এই কালচেতনার প্রথম শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর রচিত হয়েছে শৈলজানন্দের আঞ্চলিকতা-চিহ্নিত কয়লা-কুঠির গল্পে। তারাশঙ্করের প্রখরতর আঞ্চলিকতারও মূল প্রেরণা এই তুলনারহিত পরিবেশ-সচেতনতায়। নিজেই তিনি বলেছেন,—"আইডিয়ার সঙ্গে বিবাদ নেই, আইডিয়া জীবনের দীপ্তি; আদর্শবাদের সঙ্গে বিরোধ নেই, আদর্শবাদ সমাজের ধারক। কিন্তু তবু সব আইডিয়া, সব আদর্শ আমরা নির্বিচারে গ্রহণ করব কি করে? যে জীবন হতে আমাদের সাহিত্য-রচনার কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হবে তাকে পঙ্গু করে খর্ব করে বিকৃত করে, তার গতি-প্রকৃতিকে ক্ষুণ্ণ করে যদি কোনো আইডিয়ার সঙ্গে আপস করতে হয় তবে

সেই আইডিয়া বর্জন করাই ভাল। জীবনের চাহিদাতেই আইডিয়া অথবা আদর্শের কলম স্বাভাবিকভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গে জোড়া যায়। তাতে যদি আমাদের ফলফুল ছায়ার সম্ভাবনা বাড়ে তাতে আপত্তি নেই।"৩৬

সৃষ্টির ক্ষেত্রে "কাঁচামালের" সম্বন্ধে এই অবহিত আগ্রহ নিতান্ত আধুনিক কালের—রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রোত্তর কালের যুগধর্ম। শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গেই আসা যাক,—বঙ্কিমের তুলনায় কালের দিক থেকে প্রাগ্রসর হলেও স্বভাবের মৌলিকতায় তাঁর শিল্পচেতনা বঙ্কিমেতর নয়। অর্থাৎ, যে-পল্লীসমাজে বেণী ঘোষাল থেকে দীনু ভট্টাচার্য সকলেই স্বাভাবিক, জ্যেঠাইমা চরিত্রের বস্তু-উপদান সেই সমাজে উপস্থিত কী? কিংবা, 'পণ্ডিতমশাই' গল্পে বৃন্দাবন ও কুসুম,—বিশেষ করে কুসুম-চরিত্র তথাকথিত অন্ত্যজ বোষ্টম সমাজের 'কাঁচামাল' দিয়েই তৈরি, এমন কথা বলতে কি পারি! এ-সব সৃষ্টিকে অসার্থক বলবার মত উন্মত্ততা অকল্পনীয়। কুসুম বা জ্যেঠাইমা অ-যথার্থ নয়,—শরৎচন্দ্রের 'আইডিয়া'র স্বর্গলোকের মধু-সুরভি দিয়ে রচিত হয়েছে এদের অমৃত-মূর্তি,—দেশকালের অতিশায়ী হয়েও তারা একান্তভাবে সত্য। কিন্তু একালের দৃষ্টি কেবল সত্য আর সুন্দরকে নিয়েই খুশি নয়,—জীবনের বাস্তব বনিয়াদের সঙ্গে তাকে অন্বিত করার দিকেই তার প্রধান ঝোঁক। দৃশ্যমান জগতের 'কাঁচামালের' সঙ্গে আত্মার অনির্বচনীয় আইডিয়ার অচ্ছেদ্য পরিণয় বন্ধনের সমস্যাই তাই 'কল্লোল' ও তদুত্তর যুগের মুখ্য গ্রন্থি। শৈলজানন্দ এই গ্রন্থির স্বরূপ লক্ষ্য করেছিলেন,—তারাশঙ্কর করলেন সেই গ্রন্থি-ভেদ। একজনের উপলব্ধি নিরুত্তাপ, প্রায় নৈর্ব্যক্তিক; আর একজনের প্রয়াস ব্যক্তিত্বের সকল শক্তি প্রয়োগে। নির্বাক্ দ্বিধা এবং উচ্ছ্বসিত দ্রুতগতি, দুইই প্রাথমিকতার ধর্ম। তাকে অতিক্রম করে বাংলা ছোটগল্প-সাহিত্যে নূতন ইতিহাস কবে পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে, সে আলোচনা আমাদের পরিকল্পনার সীমান্ত বহির্ভূত। কিন্তু সেই নূতন ইতিহাসের ইমারত তারাশঙ্করের গল্পে সুচিহ্নিত অবয়বে গড়ে উঠেছে, এইখানে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সবশেষে অনুভব করব, কোনো নতুন কালের স্রষ্টা তিনি নন। কিন্তু কাল-প্রকৃতি তাঁর স্বভাব-কবির লেখনী ধরে নিজেকে প্রকাশিত করে তুলেছে দৃঢ় দ্বিধাহীন বর্ণাঢ্য ভাষণের মাধ্যমে।

এই দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে তারাশঙ্করের গল্পবাণীকেই ধরতে চেয়েছি। এই প্রসঙ্গ দৈর্ঘ্যে অতিকায় হয়ে থাকলেও তা প্রায় অপরিহার্য ছিল;—কারণ তারাশঙ্করের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান তাঁর রচনার অন্তর্নিহিত স্পষ্টোচ্চারিত জীবন-বাণী,—যাতে সৃজনধর্মের ঐতিহাসিক গুণ এবং প্রকরণগত স্বভাব দুইই একসঙ্গে

৩৬। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—'সাহিত্যের সত্য'।

ধরা পড়েছে। সেই মুখ্য প্রসঙ্গের পরে আলোচিতব্য রয়েছে আরো দুটি উপাদান,—তাঁর গল্প-বিষয় ও রচনা-প্রকরণের কথা। তারাশঙ্করের গল্প-বিষয়কে আবার দুদিক থেকে বিচার করে দেখবার অবকাশ রয়েছে,—এক তার রস-স্বাদুতার দৃষ্টকোণ এবং আরো এক প্লটের বক্তব্য ও বস্তু-বিন্যাসের বিশিষ্টতার দিক। প্রথমে রসস্বাদুতার বৈশিষ্ট্যের কথাই স্মরণ করা যাক্।

সৃষ্টি-বাসনার বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর নিজে বলেছেন,—"যেমন আধ্যাত্মিক সাধনায়, তেমনি সাহিত্যের সাধনাতেও—অধিকারিভেদে পথের ভেদ আছে। যাঁরা সুন্দর, শোভন, ললিত, সুকুমার বৃত্তির কারবারি, প্রসাদগুণ যাঁদের উদ্দিষ্ট, তাঁদের তুলনা করব বৈষ্ণব-পন্থীদের সঙ্গে। আর যাঁরা রৌদ্র-বীভৎস-ভয়ানক রসের কারবার করেছেন, জীবনকে কেড়ে ফুঁড়ে রক্তমাংস-রস-মজ্জা-ক্লেদ-গ্লানির উপাদানের মধ্যে সত্যের সন্ধান করেছেন, তাঁরা তান্ত্রিক।"[৩৭] এক বিশেষ তাৎপর্যে তারাশঙ্করের ছোটগল্পে এই উভয় রসের উপাদানই বর্তমান। একেবারে অভিধানের অর্থেই তাঁর গল্পের প্লট্-এ বৈষ্ণব জীবন-রসের স্নিগ্ধ-স্বাদুতা ও তান্ত্রিক-সাধনার ভয়ানক রসের বিচিত্র উপাদান উপস্থিত রয়েছে ;—আর তার মূলে আছে শিল্পীর জীবন-অভিজ্ঞতার পটভূমিগত বৈচিত্র্য।

বস্তুত পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাস্তব অভিজ্ঞান দিয়ে যে জীবনানুভবের প্রত্যক্ষ আরতি করা সম্ভব হয় নি, তারাশঙ্করের সৃষ্টির নিভৃত প্রকোষ্ঠে তার প্রবেশাধিকার চিরকালই বারিত হয়েছে ;—পূর্বের আলোচনায় বারে বারে একথা বলেছি,—এই সত্যেরই অন্তহীন অকুণ্ঠ স্বীকৃতি রয়েছে লেখকের সাহিত্য-জীবন সম্পর্কিত আত্মকথনে।[৩৮] এদিক্ থেকে স্রষ্টা তারাশঙ্কর পরম ভাগ্যবান,—পরস্পর-বিরোধী উপলব্ধি ও মূল্যবোধের এক ঐতিহাসিক সন্ধিলগ্নে তাঁর ব্যক্তি-মনের উদ্বোধন ঘটেছিল বীরভূমের লালমাটি-ঘেরা এমন এক পল্লীপ্রত্যন্তে, লোকচক্ষুর অন্তরালে যেখানে প্রকৃতির হাতে পাতা হয়েছিল ইতিহাসের সেই সন্ধিলীলার সার্থক পীঠভূমি। এক কথায় বলা যেতে পারে, মধ্যযুগীয় গ্রাম্য সামন্ততান্ত্রিকতার ক্ষয়িষ্ণু কূর্মপীঠে বণিকধর্মী আধুনিকতার জন্ম ও বিকাশের উৎক্ষেপ-অভিঘাতের সন্ধি-লগ্নেই তারাশঙ্করের শিল্প-চেতনার অভ্যুদয় ; তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ভঙ্গুর পুরাতনের প্রতি মমতার এক আন্তরিক রূপ উজ্জ্বল বর্ণে আঁকা হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলাদেশে এই "জমিদারশাহী'র ঐতিহাসিক মূল্য অভ্রান্ত বর্ণে নির্দেশিত হতে পেরেছে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তে :—"গত দুই-তিন শত বৎসরের দেশকে বুঝিতে হইলে এই

৩৭। তদেব। ৩৮। দ্র. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—'আমার সাহিত্য জীবন'।

জমিদারদিগকে বুঝিতে হইবে—তাহাদেরই কেন্দ্র-বিকিরিত শক্তি দেশের প্রান্তদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। জনসাধারণের কোনো আত্মস্বাতন্ত্র্য বা আত্মনির্ধারণ-শক্তি ছিল না—জমিদারের প্রভাবই তাহাদের প্রাণস্পন্দনের গতিবেগ ও ক্রিয়াশীলতার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া দিত।···জমিদারের দানশীলতা নদীপ্রবাহের ন্যায় দুইধারে শ্যামলতা বিস্তার করিত। তাহার দৃপ্ত পৌরুষ জাতির দুঃসাহসিকতাকে আত্মপ্রকাশের অবসর দিত, তাহার অত্যাচারের বজ্রপাত প্রজার প্রতিকার-শক্তিকে উদ্বোধিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিত, তাহার ক্রম-প্রসারিত দাবি-দাওয়া জনসাধারণের বৈষয়িক বুদ্ধি ও স্বভাব-সিদ্ধ চতুরতাকে তীক্ষ্ণতর করিয়া তুলিত। সুতরাং জাতির মুখপাত্র ও নেতা হিসাবে এই অভিজাতবর্গের সাহিত্যে ও ইতিহাসে স্থান আছে।[৩৯]

তারাশঙ্কর নিজে ছিলেন এই জমিদার শ্রেণীর এক অন্তিম প্রতিনিধি,—তাই তাঁর সাহিত্যে জমিদার সমাজের যথার্থ ইতিহাস প্রীতি-প্রাচুর্যের পরিমণ্ডলে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকেও অনুভূত হতে পারবে যে, মধ্যযুগের আলোচ্য জমিদারশাহীর মধ্যে উদার উদাত্ততা যেমন নির্বন্ধন ছিল, তেমনি ক্ষিপ্ত আক্রোশের বিভীষিকাও ছিল আদিম স্বভাবের দুর্দমনীয়তায় ভয়ঙ্কর। এই আদিম উদাত্ত প্রচণ্ডতা শ্মশানবাসী কাপালিকের স্মৃতি-সান্নিধ্যবর্তী হতে বাধা নেই। শুধু তাই নয়, বীরভূম শব্দের নামতাৎপর্য নিয়ে বিচিত্র জনশ্রুতির মধ্যে এ-ও একটি যে, এই রক্তপ্রান্তর তান্ত্রিক বীরাচারীদেরই ছিল সাধনপীঠ; বীরভূমে তন্ত্রসাধনার পুরাতন ঐতিহ্য আজও দুর্মর। তারাশঙ্করের পূর্বপুরুষেরাও বংশানুক্রমে ছিলেন তান্ত্রিক। তাঁর গ্রাম একান্ন পীঠস্থানের অন্যতম তীর্থ। অতএব শিল্পীর পরিচিত, মমতাপুষ্ট জমিদার-স্বভাবের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক প্রচণ্ডতার সঙ্গে তান্ত্রিক ভীষণতাও যুক্ত হয়েছিল, এটুকু সাধারণ ধারণা। কিন্তু ঐ একই গ্রামীণ পরিমণ্ডলে সামন্ততান্ত্রিকতার সঙ্গে ধনতন্ত্রের সংঘাত-রূপকে যেমন প্রত্যক্ষ করেছিলেন তারাশঙ্কর, তেমনি এখানেই দেখেছিলেন তান্ত্রিক বীরাচারী বংশপরম্পরার সঙ্গে সদ্য উদীয়মান বৈষ্ণবকুলের প্রতিযোগিতার বাস্তব চিত্র।

তারাশঙ্করের জন্মগ্রাম লাভপুর আবহমান কাল ধরে জমিদার-প্রধান, দীর্ঘদিন ধরে নানা শাখা-প্রশাখায় ভেঙে চুরে সেই জমিদারি সংখ্যা-বাহুল্য যত অর্জন করেছে, ততই হয়েছে অন্তঃসারশূন্য। এ সম্বন্ধে লেখকের নিজের সুদীর্ঘ বিবৃতি থেকে জানা যায়,—সরকার বংশ ছিলেন গ্রামের প্রাচীনতম জমিদার। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, —পুরাতন জমিদারির জীর্ণ খোলসবাহী এই সরকার বংশের বিধ্বস্ততার ইতিহাস-ই

৩৯। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (৪র্থ সং)।

লিপিবদ্ধ হয়ে আছে তারাশঙ্করের 'সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার' গল্পে। যাই হোক্, এই সরকার বংশ ও নিজের গ্রাম্যকথার প্রসঙ্গে শিল্পী লিখেছেন,—"তাঁরা তখন বহুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের ভাঙনের উপর উঠেছে আরো দুটি বংশ, ওই সরকার বাবুদেরই দৌহিত্র বংশ। এদের একাংশ হল আমার পিতৃ বংশ, দ্বিতীয়টি অন্য এক বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ। প্রকৃতপক্ষে এই দ্বিতীয় বংশই তখন গ্রামের মধ্যে প্রধান। ঠিক এই সময়ে গ্রামের এক দরিদ্রসন্তান ঘর থেকে বেরিয়ে এক বিচিত্র সংগঠনের মধ্যে ইংরেজ কয়লা-ব্যবসায়ির কুঠিতে পাঁচটাকা মাইনের চাকরিতে ঢুকে, শেষ পর্যন্ত কয়লার খনির মালিক হয়ে দেশে আবির্ভূত হলেন।"[৪০] এই নবীন ব্যবসায়িকুল ছিলেন বৈষ্ণব, আর পূর্বোক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার-প্রধান বংশ ছিলেন তান্ত্রিক। এঁদের প্রতিপত্তির প্রতিযোগিতার মধ্যে শাক্ত-বৈষ্ণব চেতনার দ্বন্দ্বও কালে কালে স্ফুরিত হয়ে উঠেছিল। বৈষয়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিত্রাংশ ধৃত আছে অন্যান্যের মধ্যে বিখ্যাত 'জলসাঘর' গল্পে। সম্পদ ও প্রতিপত্তি-লোলুপ মানুষের পারস্পরিক সংঘাতের মধ্যে বৈষ্ণব অনুভবের মধুরিমা কোথাও অব্যক্তভাবেও আত্মগোপন করেছিল, এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতামূলক দেবোৎসবের মধ্য থেকে বাল্যকালেই তারাশঙ্কর তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব আচারের স্বতন্ত্র স্বভাব-পরিচয়টুকু অনুভব করতে যে পেরেছিলেন, সে সম্ভাব্যতার নিশ্চিত সংকেত রয়েছে তাঁর 'আমার কালের কথা'র প্রাসঙ্গিক বর্ণনায়।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, বীরভূম কেবল বীরাচারী তান্ত্রিকের দেশই নয়, এই লালমাটির প্রান্তরেই অজয়ের কূলে ফলেছিল পদ্মাবতীচরণ-চারণ, কবিচক্রবর্তী জয়দেবের অহেতুক প্রেমানুভবের রক্তিমাভা। নান্নুর-বীরভূম চণ্ডীদাসের জীবনলীলা-ভূমি, বীরভূম তাই—তারাশঙ্করের ভাষায়—আউল, বাউল, বৈষ্ণব দরবেশেরই দেশ। এর শ্মশানে-মশানে যেমন তান্ত্রিক বীরাচারীর ধুনির আগুন অনির্বাণ জ্বলে চলেছে, তেমনি তার পত্রে পুষ্পে কুঞ্জে কুঞ্জে ছড়িয়ে আছে বৈষ্ণব অনুরাগের রক্তিম ফাগ। 'রসকলি' গল্পের জন্ম-ইতিহাসে সেই স্নিগ্ধ প্রেমানুভবের বাস্তব অভিজ্ঞতাই মধুস্নিগ্ধ রস-রূপ ধারণ করেছে। প্রকরণের কথা নয়, দার্শনিক তত্ত্ব-স্বভাবের প্রসঙ্গও নয়,—নিছক বিষয়বস্তুর অন্তরে ধৃত অনুভবের স্বাতন্ত্র্যে 'রসকলি', 'হারানো সুর', 'রাইকমল', 'কবি' প্রভৃতি গল্পে তারাশঙ্করের ভাষায় "বৈষ্ণবপন্থী" শিল্পিপ্রাণের অবাধ অভিযাত্রা চলেছে। তত্ত্ব ও ইতিহাসের বিচারে বৈষ্ণব, বাউল বা সহজিয়া সাধকদের মধ্যে প্রভেদ অনেক। তারাশঙ্করের রচনায় এরা সব 'বারজাতে একাকার' হয়ে উঠেছে, এমন অভিযোগও

৪০। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—'আমার কালের কথা' (১ম পং)।

শোনা যায়। কিন্তু তাঁর শিল্পভাবনার পক্ষে দার্শনিক দৃষ্টির সূক্ষ্ম পার্থক্যের বিচার অবান্তর। সাধারণভাবে বিশ্বের অনাদি রহস্যকে অন্তরের প্রেম-নৈবেদ্যের ডালি সাজিয়ে স্নিগ্ধ প্রাণের খাঁচায় আপন করে পেতে চাওয়ার মধুর-রসান্বিত ব্রতসাধনাকেই 'বৈষ্ণব পন্থা' বলে স্বীকার করেছেন শিল্পী,—তারাশঙ্করের সৃষ্টিতে বৈষ্ণব রসের আস্বাদন করতে হবে এই তাৎপর্যেরই বিশেষ প্রেক্ষাপটে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়, 'রাইকমল' এবং 'কবি' আজ পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বা বড় গল্পের আকারে বহু জনপ্রিয়। কিন্তু এই দুটি রচনাই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল গল্পের আকারে। বস্তুত তারাশঙ্করের পরবর্তী কালের অনেক বড় রচনার উপকরণ সাহিত্যের ফ্রেমে প্রথম বাঁধা পড়েছিল ছোটগল্পের শরীরেই,—একথাও এখানে স্মরণযোগ্য। 'ফল্গু' থেকে 'কালিন্দী', 'মুটুমোক্তারের সওয়াল' থেকে 'দুইপুরুষ' নাটক, 'বেদেনী' থেকে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'। এমনি আরো নাম করা যেতে পারে। এদিক থেকেও স্বীকার করতে হয়,—শিল্পিপ্রতিভার স্বতঃস্ফূর্তির মূল প্রবাহ ছোটগল্প-শৈলীরই অভিমুখী।

কিন্তু যে-কথা বলছিলাম, তারাশঙ্করের ছোটগল্পে বৈষ্ণবরসের স্ফুরণ কোনো বিশেষ প্রকরণ বা দার্শনিক জ্ঞান-বিকাশের পরিণাম নয়,—ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতালব্ধ হৃদয়ানুভবের ফসল। তাই তাঁর অনুরূপ ছোটগল্পে মধুর রসের সার্থক ব্যঞ্জনা রচিত হতে পেরেছে সমুচিত পরিমণ্ডল গড়ে তোলার দক্ষতায়। 'রসকলি' গল্পের সমাপ্তিক অংশের কথা স্মরণ করা যেতে পারে এখানে আবার।

পুলিনের সহজে-বিমুখ মনকে গোপিনীর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছিল মঞ্জরীই। সেই সুযোগে অর্থলোভে বলাই গোপিনীকে পেতে চেয়েছে,—জমিদার প্রলুব্ধ হয়েছে মঞ্জরীর উত্তাল রূপের মাদকতায়। ভরাডুবির সেই অন্ধকার দুর্যোগ-লগ্নে জমিদার-কাছারিতে মঞ্জরীই আশ্রয় দিয়েছে,—অধীর অসহায়তায় গোপিনী সেদিন তাকে জড়িয়ে ধরেছিল 'রসকলি' বলে। সেই নতুন সম্পর্ক পাকা করে নিয়েছে নিজেই সে ঘরে এসে, গোপিনীর হাতে নতুন রসকলি পরে। তারপর অনায়াসে সঁপে দিয়েছে রসকলিকে রসকলির হাতে হাতে,—পুলিনের হাতে তুলে দিয়েছে গোপিনীর হাত। অতবড় ত্যাগেও তার কুণ্ঠা বা দুঃখ নেই কিছু ; যন্ত্রণার বৃন্তে আনন্দের শতদল ফুটেছে বুঝি প্রেমের সাগর-জলে,—মঞ্জরীর হৃদয় ঢেউয়ের তালে তালে নেচে বেড়ায় যেন তার প্রতিটি পাঁপড়ির ডগায় ডগায়!—তার প্রেম-সাধনার অগ্নি-পরীক্ষা তো হয়েই গিয়েছে,—নিজের প্রাণের মায়া ভুলেও পুলিন যখন তার মান বাঁচাতে লাফিয়ে উঠেছিল জমিদারের কাছারিতে। সব পেয়ে তাই সব দিয়ে তার অত আনন্দ! পুলিন-গোপিনীকে মিলিয়ে দিয়ে, নিজের গাঁট থেকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা জমা দিয়ে

জমিদারের রোষ শান্ত করে পরদিন সকালে এসে হাজির হয় হাসিমুখে,—কাঁধে তার একটি পুঁটলি। পুলিন অভিমানভরে চুপ করে থাকে। কিন্তু সব অভিমান ভেঙে দিয়ে মঞ্জরী মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, "আমি কি তোমার পর?" তারপর পুলিনের হাত দুটি ধরে সে বলে,—

"তবে আসি।

উদ্‌ভ্রান্তের মত পুলিন বলিল, কোথায়?

মঞ্জরী বলিল, বৃন্দাবন!

পুলিন অভিমান করিয়া বলিল, রসকলি!

মঞ্জরী কহিল, আমি তো তোমারই গো।

গোপিনী দ্বারের পিছনে ছিল, সম্মুখে আসিয়া যেন দাবি করিল, না, যেতে পাবে না।

মঞ্জরী বলিল, তীর্থের সাজ খুলে কুকুর হব?

গোপিনী কহিল, বল তবে ফিরে আসবে?

মঞ্জরী কহিল, আসব।

গোপিনী কহিল, আসবে? দেখো।

উত্তর না দিয়া মঞ্জরী হাসিয়া পুঁটলিটি তুলিয়া লইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। বিচিত্র সে হাসি, রহস্যের মায়ামাধুরীতে ভরা। কে জানে তার অর্থ!

চলিতে চলিতে গান ধরিল—

লোকে কয় আমি কৃষ্ণকলঙ্কিনী,
সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী গো,
আমি গরবিনী।

নাকে তাহার রসকলি, মুখে তাহার হাসি, চলনে সে কি হিল্লোল! রসধারা যেন সর্বাঙ্গ ছাপাইয়া পড়িতেছিল।"

তারাশঙ্করের গল্পে এইটুকুই 'বৈষ্ণবরসের ধারা'। রহস্যের মায়া-মাধুরীতে ভরা যে হাসির ছটা মুখে ছড়িয়ে ঘর ছেড়ে বৃন্দাবনের পথে আনন্দিত পদক্ষেপ করেছিল মঞ্জরী, তার উৎস তো আসলে বুকের গভীরে জীবনের অজানা রহস্যকে অনুরাগের মধু-বন্ধনে বাঁধতে পারার চরিতার্থতাতেই! সে মধুর রসের আস্বাদন 'রসকলি' গল্পে সঞ্চিত হতে পেরেছে উপলব্ধির মন্ময় নিবিড়তার মধ্যে নয়, বাগ্‌ভঙ্গির সাংকেতিকতাগুণেও নয়,—বাস্তবের যে পটভূমিতে এই জীবননাট্যের আন্তম্ভ সংঘটন সম্ভব, তার সম্পূর্ণ পরিমণ্ডলটিকে অনাবৃত করতে পারার সাফল্যে। এই অর্থেই বলেছিলাম, বাগ্‌ভঙ্গি

বা প্রকরণ, এমন কি কোনো অনির্বচনীয় উপলব্ধির ব্যঞ্জনা, কোনো কিছুই তারাশঙ্করের গল্প-শৈলীর মুখ্য উপাদান নয়,—প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট অভিজ্ঞতার কঠিন-বস্তু-শরীরে দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রলেপ রচনা করেই তাঁর গল্পের শিল্প-কাঠামো গড়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের 'বৈষ্ণবী' গল্পের কথা পুনরায় স্মরণ করা যেতে পারে,—সুগভীর উপলব্ধি-দীপ্ত বৈষ্ণবীর এক-একটি উক্তির ঝলক একটি সমগ্র জীবনের দিগন্তকে আদি-অন্তে আলোকোদ্ভাসিত করে দিয়েছে যেন ;—আর তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে তিল তিল করে সঞ্চয় করেছেন একটি সমগ্র জীবনের ছোট-বড় অসংখ্য বিচিত্র উপকরণ—কেবল একটি উপলব্ধিকে—একটিমাত্র মধুর-রস-সত্যকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভব-বেদ্যতা দানের প্রয়াসে। প্রকরণের কথা পৃথক্‌ভাবে আসবে পরে,—কিন্তু এখানেও লক্ষ্য করে রাখা যেতে পারে, গল্পের সৃষ্টিতে যেমন, তেমনি আস্বাদনের বেলাতেও—চোখে দেখে কানে-শুনে, তবেই তারাশঙ্করের গল্প-রসকে উপলব্ধি ও উপভোগ করতে হয়। আর চোখে-দেখা জীবনের বৈষ্ণব-রসের রহস্যময় অভিজ্ঞান শিল্পী কুড়িয়ে পেয়েছিলেন বীরভূমের ধূলামাটিতেই,—তাঁর 'হারানো সুর' গল্পের নায়িকা গিরিবালার মত তারাশঙ্করও বলতে পারেন—

"এই তো আমার তীর্থ, মধুর মধুর বংশী বাজে
এই তো বৃন্দাবন।"

তারাশঙ্করের গল্পে এই সুরস্বাদুতা প্রচুর-সংখ্যক নয় ; কিন্তু অভিজ্ঞতা ও অনুভবের গভীরতা অকৃত্রিম।

এবারে তান্ত্রিকতার প্রসঙ্গ ; তারাশঙ্করের গল্পে তন্ত্র-ধর্মের সাধনা বিচিত্র এবং বহুব্যাপক। একেবারে আভিধানিক অর্থে অভিচার, এমন কি শব-সাধনাদির বিভীষণ ছবিও পুঙ্খানুপুঙ্খ স্পষ্টতায় চিত্রিত হয়েছে তাঁর গল্পে,—'ছলনাময়ী' তার এক চরম নিদর্শন। শ্বশুরের কয়লা খনিতে ঠিকাদারের কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়। সার্ভেয়ার কানাই চক্রবর্তী, কলিয়ারি অঞ্চলের পরিভাষায় কম্পাসবাবু যার নাম,—পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তন্ত্রাভিচারী অদ্ভুত চরিত্র ম্যানেজারের সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই তিনি বলেছিলেন, "তান্ত্রিক সাধনায় মানুষ অলৌকিক শক্তি আয়ত্ত করতে পারে, অমিয়বাবু। অদ্ভুত শক্তি।"—সেই শক্তির ছিঁটেফোটা আয়ত্তও করেছিলেন তিনি নিজে—যৌবনে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন,—নিজের হাতে বিচিত্র মধুর গন্ধ সৃষ্টি করতে পারেন ইচ্ছামত। কিন্তু ঐ সামান্যটুকু দিয়ে ছলনা করেছে তাকে ছলনাময়ী,—তাই দারাপত্য সংসার ফেলে উন্মাদের মত ছুটে ফিরছেন সেই অতুল সম্ভোগ-রসের মত্ত নেশায়। মুখে মুখে অমিয়কুমারের কাছে তান্ত্রিক

সিদ্ধির স্বপ্ন-ছবি অঙ্কন করেছিলেন,—"সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রূপ, দুর্লভ বিলাস, শ্রেষ্ঠ আহার, ইচ্ছামাত্রে ক্রীতদাসীর মত সে জোগাবে। আর প্রভুত্ব? কি প্রভুত্ব আছে সম্রাটের? মৃত্যুর গ্রাস হতে রক্ষা করতে পারে সে? মৃত্যু যখন আসে, তখন সে সাধারণ মানুষের মত ভগবান ভগবান বলে নির্মম প্রকৃতির পায়ে মাথা কোটে। অন্ধ মানুষ জানে না—নির্মম নিষ্ঠুরা প্রকৃতি টলে না, প্রার্থনায় নিষ্ঠুরার মত ব্যঙ্গ করে চলে যায়। তাকে আয়ত্ত করতে হয়, জোর করে স্ববশে আনতে হয়,—নারীর মত—পৃথিবীর মত। তখনই সে হয় দাসী। মানুষের মনোরঞ্জনে বেশ্যার চেয়েও সে তখন মিষ্টমুখী।"

প্রকৃতিকে স্ববশে আনতে ভয়ানক পণ করেছিল ম্যানেজার—কিন্তু ছলনাময়ীর উৎকট প্রতিশোধে দুঃসহ বীভৎস হয়েছে তার পরিণাম। উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল ম্যানেজার,—পাগলের মত পথে পথে ঘুরতো, ক্ষণে ক্ষণে নিজের হাতে নিজে কামড়ে রক্তস্রোত বইয়ে দিতো সংবিৎ ফিরে পাবার আকুষ্ট চেষ্টায়। এই পাগল অবস্থাতেই স্বীকার করেছিল ম্যানেজার,—বিলাসপুরিয়া কুলি দিয়ে গোপনে হত্যা করিয়েছিল সে-ই কানাই কম্পাসকে,—যাকে মাত্র ক'দিন আগে ভালবেসে বিয়ে করেছিল তার নিজের মেয়ে। কারণ কম্পাসবাবুর দেহটি তান্ত্রিক শবাসন হবার পক্ষে ছিল একান্ত সুলক্ষণযুক্ত। ছলনাময়ীর হাতে সেই বীভৎসতার চরম বিপর্যয় ঘটেছে দুঃসহ কদর্য,—অকল্পনীয়। তারাশঙ্করের ভাষায় 'জীবনকে কেড়েকুড়ে তার রক্তমাংস রসমজ্জা ক্লেদগ্লানির উপাদানের মধ্যে সত্যসন্ধানের এ এক বীভৎস ভয়ানক রসের কারবার।' এর চেয়ে বিকট চিত্রের কল্পনা করাও কঠিন।

কিন্তু তন্ত্র-সাধনা কেবল বীভৎসকে নিয়েই কারবার নয়,—শক্তি উদ্বোধনের সাধনাও।—বিভ্রান্তির পরিণাম যেমন শ্বাসরোধী,—সাধন-শক্তিতে স্বাধিষ্ঠিত হতে পারলে তার মধ্য থেকে যে তেজঃপুঞ্জ বিচ্ছুরিত হতে থাকে, তারাশঙ্করের ভাষাতে তাকে 'ভয়ানক রৌদ্র রসের' উপাদান বলা যেতে পারে। এর সবটুকু বীভৎস নয়,—বরং বীভৎসতার চেয়ে অমেয় ওজস্বিতার প্রাচুর্যে তা দৃঢ় সুকঠিন, অনেকটা এপিক্ দাঢ্যের সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। তন্ত্রসাধক বীরাচারী গৃহস্থের এই স্বরূপ নিকষ-কঠিন মূর্তি ধরেছে রাবণেশ্বর রায়ের মধ্যে,—'রায়বাড়ি' গল্পে :—সেদিন "রাবণেশ্বর রায় নামিতেছিলেন দোতলার সিঁড়ি বাহিয়া। নাটমন্দিরের আলোকমালার ছটার প্রাচুর্যে প্রজারা তাঁহাকে সভয় বিস্ময়ে দেখিল। দীর্ঘকায় পুরুষ, খড়্গের মত তীক্ষ্ণ দীর্ঘ নাসিকা, আয়ত চোখ, সর্বাঙ্গের মধ্যে স্থূলতার এতটুকু চিহ্ন নাই, কিন্তু সিংহের মত বলিষ্ঠ দেহ—প্রশস্ত বক্ষ, ক্ষীণ কটি। বয়স প্রায় চল্লিশ। পরিচ্ছদ ও ভূষণের মধ্যে গরদের কাপড়, কাঁধে নামাবলী, অনাবৃত বক্ষে শুভ্র উপবীত ও রুদ্রাক্ষের মালা, দক্ষিণ

বাহুতে সোনার তাগায় একটি মোটা রুদ্রাক্ষ, হাতের অনামিকায় নবরত্নের একটি আংটি।"

এই উদাত্ত কঠিন দার্ঢ্যের চিত্র আসলে মধ্যযুগের যুগশক্তির শুম্ভরূপ সামন্ততান্ত্রিক উগ্রতার। 'সাড়ে সাতগণ্ডার জমিদার' গল্পের ভগ্নকীর্তি দুর্বল জমিদার-পুঙ্গব তাঁর পূর্বপুরুষের প্রচণ্ড উক্তির কথা পুনঃপুনঃ স্মরণ করতেন,—"মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের।" এ-সত্য তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বদ্ধ তাঁর নিজের গ্রামের জমিদার-সন্তানদের উক্তি এবং বিশ্বাস। সেই উগ্র দাপের যুগ-প্রতিভূ জীবন্ত মূর্তি যেন রাবণেশ্বর রায়। তাহলেও রাবণেশ্বর-স্বভাবের অন্তর্নিহিত রৌদ্ররসের প্রধান অবলম্বন যদি সামন্ততন্ত্রও হয়, তবু সে রসের এক মুখ্য সঞ্চারী উপাদান গল্পাংশের তান্ত্রিক উপকরণ। কালীসাধক রাবণেশ্বর, তার উদাত্ত কণ্ঠের 'তারা তারা রব'—'তন্ত্রমতে সন্ধ্যাতর্পণ জপ' ইত্যাদি অনুষ্ঠান গল্পের বলদর্পী সামন্ততান্ত্রিক উগ্রগতার মধ্যে রৌদ্ররসের এক নূতন উপাদান সঞ্চার করেছে,—যার ফলে মূলের কাঠিন্য ও দৃপ্ততা হতে পেরেছে প্রগাঢ়তর। আর গল্পের সেই স্মরণীয় সমাপ্তি,—সদ্য কঠিন-রোগমুক্ত রবীন্দ্রনাথও যার অভ্যন্তরে "অচৈতন্যের অন্ধকার থেকে চৈতন্যের দীপ্তির মধ্যে তাঁর নিজের ফিরে আসার একটি মিল" খুঁজে পেয়েছিলেন বলে মনে করেছিলেন,[৪১]—তার মূলেও নৈষ্ঠিক তন্ত্রাচারীর আত্মার বিশ্বাসই সুগভীর বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়েছে; এক ভয়ার্ত অন্ধকার প্রলয়-রাত্রিতে মহাপ্রয়াণে যাত্রার মুখে ইষ্টদেবীর আনন্দময়ীর আহ্বান-সংকেত শুনেই ঘরে ফিরেছিলেন রাবণেশ্বর,—তাই গঙ্গার ঘাটে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসবার আগে "গভীর স্বরে" বলে উঠেছিলেন,—"তারা—তারা আনন্দময়ী—তারা।"

ফলকথা; তারাশঙ্করের গল্প-বিষয়ে তন্ত্রাভিচার-জনিত বীভৎসতা যেমন রূঢ় বর্ণে চিত্রিত হয়েছে, তেমনি যথার্থ-রূপায়ণ ঘটেছে তন্ত্র-সাধকের শক্তি-সমুগ্র দৃঢ়-কঠিন ব্যক্তিত্বের। কিন্তু নিতান্ত আভিধানিক এই অর্থ-প্রসঙ্গ পরিহার করলেও এক বিশেষ রূঢ়ার্থে তাঁর গল্পের উপকরণে তান্ত্রিক পরিবেশ-সমুচিত জীবন-স্বভাবের ব্যঞ্জনাই ব্যাপকভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। এই তথ্যনির্দেশে ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র একমাত্র সার্থক বাক্য প্রয়োগ করেছেন,—"প্রধানতঃ সাপ-বেদে, তান্ত্রিক, শ্মশান, শিকার প্রভৃতি উপকরণের দিকেই তারাশঙ্করের নজর থাকে।"[৪২] আর তন্ত্র-রসের উপকরণ সম্বন্ধে শিল্পীর পূর্বোদ্ধৃত উক্তির কথা স্মরণে রেখেই অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের সিদ্ধান্তের উদ্ধার করা যেতে পারে, "তারাশঙ্করের আরাধ্যা জীবনের বিভীষণা নগ্নিকা

৪১। দ্র. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—'আমার সাহিত্য জীবন'।
৪২। ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র—'তারাশঙ্কর'।

কালিকামূর্তি।"[৪৩] বস্তুত লোক-স্বভাবের আদিম অপরিশুদ্ধ মাংসল স্থূলতা ও নগ্নতার মধ্যে জীবনের সত্য-রসকে আহরণ করার সাধনাই তারাশঙ্করের সাহিত্য-ব্রতে মুখ্য প্রয়াস। এই অর্থেই তাঁর 'নারী ও নাগিনী', 'বোবাকান্না', 'দেবতার ব্যাধি', 'ডাইনী', 'বেদেনী', 'অগ্রদানী' ইত্যাদি গল্পে তান্ত্রিক জীবনরসের রৌদ্র-বীভৎস ভয়ানক স্বাদুতাই একান্ত হয়ে উঠেছে। ঠিক তান্ত্রিক বলাও বুঝি যথার্থ নয়,—তারাশঙ্করের গল্পের যথার্থ সংগঠন প্রাকৃত রসের উপাদানে,—অর্থাৎ আদিম মহাকাব্য-রসের যে উপকরণ, তাই।

প্রকরণের প্রসঙ্গও এখানে এসে পড়ে। কি প্রসঙ্গে, কি প্রকরণে তারাশঙ্করের গল্প যেন আদিম মহাকাব্যধর্মী। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছিলেন,—"তারাশঙ্করে··· মানুষের ধাতুবৃত্তিরই মুখ্য বিকাশ।" সেই উক্তির তাৎপর্য স্পষ্ট করে ধাতুপ্রবৃত্তি অর্থে ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র মানুষের "elemental passion"-এর কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৪] এই elemental passion,—মানুষের মৌলিক বৃত্তি এবং প্রবৃত্তি,—জীবদেহের মতই যা তার অস্তিত্বের সহজাত উপাদান, তারই অনাবৃত বস্তুশরীরের ওপরে তারাশঙ্কর সৃষ্টিবেদী রচনা করেছেন। ফলে তাঁর সব গল্পেরই বিষয়বস্তুতে সেই আদিম জীবন-স্বভাবের নগ্নরূপ অল্প-বিস্তর প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে,—'নারী ও নাগিনী', 'বেদেনী' অথবা 'কালাপাহাড়' গল্পে যেমন, তেমনি অভিজাত জীবন-সম্ভব 'জলসাঘর' গল্পের পরিণামেও তাই। জৈব প্রকৃতির সেই মূল কাঠামোর ওপরে শিল্পী তাঁর ব্যক্তি-বিশ্বাসের বর্ণচ্ছটা রচনা করেছেন নানা আকারে,—এখানেই তাঁর সৃষ্টিতে এপিক্ ধর্মের স্পর্শ লেগেছে। "Epic is a new creation in terms of old things."—পুরাতন, আদিমতম বৃত্তি আর প্রবৃত্তির সংঘাত-রহস্যকে আধুনিক কালের জীবন-দৃষ্টির সহযোগে নবরূপ দিয়েছেন,—এই অর্থে তারাশঙ্করের ছোটগল্পকে এপিক্-ধর্মী বলছি। এপিক্-প্রকৃতির বিশিষ্টতা নির্দেশ করে বিশেষজ্ঞ আরো বলেছেন,—"Reality of substance is a thing on which epic poetry must always be able to rely."—আর 'epic reality'-র পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"It does not gloss or interpret the fact of life, but recreates it and charges the fact itself with the poet's own ultimate values।"[৪৫]

এখানে লক্ষ্য করতে হয়, তারাশঙ্করের শিল্প-প্রকৃতির গভীরে পরিণামী বিশ্বাসের এক সুদৃঢ় মূল দূরপ্রসারী হয়ে আছে;—সে বিশ্বাসের জন্ম জীবনের অপার রহস্যময়

৪৩। জগদীশ ভট্টাচার্য (সঃ)—'তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্প'—ভূমিকা। ৪৪। ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র—পূর্বোক্ত গ্রন্থ। ৪৫। L. Abercrombie,—'The Epic.'

স্বভাব সম্পর্কে তাঁর অনন্ত-বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয়-ভাণ্ডারে। তাই মৌল স্বভাবে স্রষ্টা-তারাশঙ্কর আসলে সেই অন্তহীন জীবনরহস্যের মুগ্ধ দ্রষ্টা। যা দেখেছেন, যা পেয়েছেন, অভিজ্ঞতার পাত্রে সশ্রদ্ধ আত্মার অঞ্জলিভরে তার সম্পদকে গ্রহণ করেছেন, ব্যক্তিগত ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের দ্বারা সেই বস্তুসত্যকে আচ্ছন্ন করতে তিনি প্রস্তুত নন। শরৎচন্দ্রের কথা আবার স্মরণ করা যেতে পারে,—জৈব জীবনের অন্ধকার অলি-গলিতে ঘোরাফিরা করেও সেই কর্দমাক্ত জলধারা থেকে তিনি ক্লেদ ও নীর বাদ দিয়ে ক্ষীরটুকুকেই সঞ্চয় করেছেন একান্তভাবে। তাই তাঁর চোখে চন্দ্রমুখী 'পারুর চেয়েও বড়' হয়ে ওঠে কখনো কখনো,—আর বাইজী পিয়ারী জীবনের লক্ষ্মীর আসনে ধ্রুবতারার মত জ্বলতে থাকে রাজলক্ষ্মীর মূর্তিতে। তারাশঙ্করের গল্পে আত্মপ্রক্ষেপণ আছে লক্ষ্য করেছি,—কিন্তু গল্পের-বস্তুসীমাকে অতিক্রম করে নিজের প্রত্যয়-বাণীকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আকারে গল্পের ওপরে আরোপ করেন নি তিনি প্রায়ই। মূল গল্প-বিষয়ের পরিহার্য বা অপরিহার্য প্রসঙ্গের সূত্র ধরে তাঁর জীবন-বিশ্বাসও চলেছে একই ধারায়। আর তারাশঙ্করের পরিণামী মূল্যবোধ নিঃসন্দেহে ইতিবাচক হয়েও মূলত জীবনরহস্যের নিরন্তর সন্ধানে কৌতূহলী। ফলে তাঁর রচনায় জীবনের 'ধাতু প্রকৃতি'—'elemental passion' বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের রহস্যজটিলতা নিয়ে গড়ে উঠেছে প্রথমে,—তাতে কোথাও আছে প্রকৃতির ধাত্রী বরদাত্রী দাক্ষায়ণী মূর্তির রূপায়ণ,—কোথাও বা ঘোরা, করাল-বদনা লোলুপ রসনা বিস্তার করে খর্পর হস্তে দণ্ডায়মান রয়েছে জীবনের আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করে। কিন্তু তেমন ক্ষেত্রেও কল্যাণপরিণামী মূল্যবোধ আহত হয় না কোথাও। দৃষ্টান্ত হিশেবে 'তারিণী মাঝি' গল্পটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

যে কয়টি সার্থক সৃষ্টির অঞ্জলি হাতে তারাশঙ্কর মহাকালের অবিনশ্বর মন্দিরের অভিমুখী হতে চেয়েছেন—'তারিণী মাঝি' তাদের একটি,—তাঁর ব্যক্তিগত এ অনুভবের কথা শিল্পী নিজেই জানিয়েছেন।[৪৬] অন্যপক্ষে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য এই গল্পেই 'অন্ধ আত্মরতির আবেগ তাড়নায়' 'বিশ্বাসের আলো নির্বাপিত' হতে দেখেছেন।[৪৭] কিন্তু আত্মরতি আর আত্মরক্ষার প্রেরণা-উৎস এক নয়। প্রেমধর্ম যদি প্রাণ-ধর্মও হয়, তাহলে তারও তো জন্ম আত্মপ্রসার ও আত্মপ্রতিফলনের আকাঙ্ক্ষাতেই,—প্রত্যেক ভালবাসাই যথার্থত আত্মার দর্পণ!—আত্মপ্রকৃতির—স্বকীয় জীবন-স্বভাবের প্রতিবিম্বকেই মানুষ প্রত্যক্ষ করে সেই দর্পণে। এই অর্থেই জৈবপ্রকৃতির বুকে

৪৬। দ্রষ্টব্য—'তারাশঙ্করের স্বনির্বাচিত গল্প'—ভূমিকা। ৪৭। জগদীশ ভট্টাচার্য (সং)—'তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্প'—ভূমিকা।

জীবনধর্মের পুষ্পিত অভিব্যক্তি। প্রকৃতির তাড়নায়, ঝড়জলে বন্যায় অথবা গ্রীষ্মের অভিঘাতে ফুলের কলিটি ঝরে কিংবা শুকিয়ে গেলে নিরলঙ্কার শূন্য বৃন্তটি প্রখর হয়ে ওঠে। এটুকুকে অস্বীকার করবার উপায় নেই,—ঘোরা নগ্নিকা প্রকৃতির অমোঘ খেয়াল ওটুকু। জীবন-সন্ধানী তারাশঙ্কর তাকে অস্বীকার করতে পারেন নি, বরং 'তারিণী মাঝি'র ঐ অতি-মানুষিক আত্মরক্ষণের মধ্যেও 'জীবনের জয়ই' ঘোষিত হয়েছে বৈ কি ?—নিরাবরণ নিরাভরণ সেই জীবনধর্মের জয়,—যাঁর জন্যে প্রেম, প্রীতি, আত্মত্যাগ ইত্যাদি সকল মহৎ মূল্যবোধের লালন ও বর্ধন মানুষের ইতিহাসে অনিবার্য হয়ে পড়ে। যে অর্থে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'বেদে' অথবা বুদ্ধদেব বসুর 'এমিলির প্রেম' প্রত্যয়-খণ্ডনের গল্প,—সেই অর্থে 'তারিণী মাঝি' প্রত্যয়রহিত নয়। এই গল্পের ফলশ্রুতি জীবনের প্রতি ঔদাসীন্য অথবা ব্যথা-বিরাগ সৃষ্টি করে না,—বরং স্তব্ধ বিস্মিত, বিমূঢ় অন্তঃকরণকে আকর্ষণ করে সেই অমোঘ দুর্জ্ঞেয় জীবন-রহস্যের প্রতি, তারিণীর মধ্যে যা উন্মত্ত আত্মরক্ষার প্রলয়ঙ্কর বুভুক্ষু মূর্তিতে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে সুখীকে ছিনিয়ে নিয়েছে। শক্তির সেই অনাবৃত আদিম উদাত্ত স্বরূপেরই জয়গান লক্ষ্য করি আদিম মহাকাব্যে।

জীবন-বিশ্বাসের নির্বাপণ নেই তারাশঙ্করের সৃষ্টিতে কোথাও, জীবন-রহস্যের অশ্রান্ত সত্য-সন্ধানী তিনি। বস্তুত তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু সাধারণভাবে গড়ে উঠেছে এই নিরন্তর সন্ধিৎসার প্রেরণা থেকে। অধ্যাপক ভট্টাচার্যও "এই জীবন-সত্যেরই আরো বিস্ময়কর প্রকাশ" লক্ষ্য করেছেন 'নারী ও নাগিনী' গল্পে,—"নাগিনীর প্রতি পুরুষের রহস্যময় আকর্ষণের মধ্যে।" 'বেদেনী' গল্প সম্বন্ধেও একই কথা বলা যেতে পারে। বস্তুত তারাশঙ্করের গল্প-সাহিত্যে কোনো সুনিশ্চিত 'জীবন দর্শন' যদি থাকে, সে কোনো অমোঘ নিয়তিবাদ নয়,—এক অফুরন্ত জীবনরহস্যবাদ,—সৃষ্টির মধ্যে সর্বত্র প্রকাশিত হতে পারুক আর না পারুক, যার মূলে রয়েছে শিল্পীর অন্তরের এক কল্যাণ-পরিণামী অতন্দ্র বিশ্বাস।

অভিজ্ঞতার অপার পাথার বেয়ে এই জীবন-রহস্যের জগতে তারাশঙ্কর ঘুরে ফিরেছেন বিস্ময়কর অকল্পনীয়তার পথে। কেবল অবাস্তব বলেই অকল্পনীয় নয়,—একান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার জীবন্ত পুঁজি না থাকলে এমন সব অস্তিত্বের কল্পনা করাও যায় না,—অথচ শিল্পীর সৃষ্টি-মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া-মাত্রই মনে হয়,—এর চেয়ে বাস্তব,—এর চেয়ে সত্য আর বুঝি কিছু হতে পারে না। 'নারী ও নাগিনী' গল্পে সেই বাস্তব স্বভাবেরই এক অস্বাভাবিক চিত্র প্রত্যক্ষ করি। অন্যপক্ষে 'কালাপাহাড়'-এ রয়েছে ঐ একই উপাদানের বৈভব-মহিম রূপায়ণ। রবীন্দ্রনাথ

বলেছিলেন,—'প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নাড়ি চলাচলের' নিবিড় সংযোগ রয়েছে ; —সে তাঁর লোকদুর্লভ কবি-প্রতিভার অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি-লব্ধ সত্য। কিন্তু তারাশঙ্করের সৃষ্টির উপাদান, আগেই বলেছি, একান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ জগৎ থেকে আহৃত। সেই পরিচিত পৃথিবীতে প্রাণস্বভাবের এক নূতন রহস্যলোক তিনি আবিষ্কার করেছেন মানব-জগতের সঙ্গে পশু-জগতের অভিনব প্রীতি-সম্পর্কের মধ্যে। নারীর সঙ্গে নাগিনীর প্রেম-প্রতিদ্বন্দ্বিতার এক অভিনব বিস্ময়কর ভূমিকালিপি চিত্রিত হয়েছে 'নারী ও নাগিনী' গল্পে। মানুষ ও পশু—জৈব-প্রকৃতির পরস্পর-সন্নিহিত এই দুটি বিচিত্র প্রাণিজগৎকে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে একীভূত করে তুলেছেন শিল্পী। বাংলা সাহিত্যেও কুকুর, বিড়াল, গরু প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুকে নিয়ে গল্পের উপাদান খুব কম গড়ে ওঠে নি। গল্প-রচনার স্বধর্মে অধিষ্ঠিত হতে পারার সূচনালগ্নে শৈলজানন্দের 'জনি ও টনি' গল্প পড়ে তারাশঙ্কর মুগ্ধ হয়েছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক পর্যায়ের 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। আর অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন,—'কালাপাহাড়' গল্পের একমাত্র তুল্য রচনা বাংলা সাহিত্যে রয়েছে শরৎচন্দ্রের 'মহেশ'। কিন্তু পূর্বসূরীদের কল্পনায় প্রায় সর্বত্রই জীবজগতের অধিষ্ঠান মানবজগতের নিম্নভূমিতে,—অধিকাংশ স্থলেই আলোচ্য পশুজীবনের রূপটিও অঙ্কিত হয়েছে অসহায় 'অবোলা' জীবের ভূমিকায়। অনেকটা এই কারণেই 'মহেশ'-এর মর্মন্তুদ পরিণাম tragic না হয়ে হয়েছে করুণ। কিন্তু তারাশঙ্করের অনুরূপ গল্পে এর বিপরীতটিই চিত্রিত হয়েছে, —'কালাপাহাড়' সেখানে মানুষের কর্মক্ষেত্রে স্বাধীন এক প্রেমিক অনুচর ; অন্যপক্ষে বিরোধিতায় সে ক্ষিপ্ত—মানবশক্তির বিদ্রোহী প্রতিস্পর্ধী। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কালাপাহাড়ের ট্রাজিক পরিণতি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,—"একদিন প্রভুর জীবন রক্ষা করতে গিয়ে কালাপাহাড় চিতাবাঘের সম্মুখীন হয়েছিল। আজো প্রভুকে খুঁজতে এসে সে এই জানোয়ারের সম্মুখীন হয়েছিল।......কালাপাহাড়ের অপরিচিত জানোয়ারটি আসলে মোটর গাড়ি।"[৪৮] জীব-জগৎকে মানব-জগতের অন্তর্ভুক্ত-অভিন্ন করে তোলার—আশ্চর্য কৌশল এখানেই,—পশুর পৃথিবীকে তারাশঙ্কর মানুষের জীবন-ভূমির অভিমুখে একটু উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন,—আর আমাদের পরিচিত সভ্য মানব-প্রকৃতিকে একটু নামিয়ে নিয়েছেন আদিমতার পথে। পশু-জগতের বিবর্তন-পরিণামেই নাকি মানব জীবনের অভ্যুদয়। প্রথম সেই বিকাশলগ্নে মানব-প্রকৃতি আর জৈব-প্রকৃতিতে

৪৮। তদেব।

ধাতুগত পার্থক্য খুব দূরপ্রসারী ছিল না। সেই আদিম সংযোগ-ভূমিতেই গল্পের বর্ণিত জীবনকে আঁকড়ে ধরেছেন তারাশঙ্কর। ফলে 'বেদেনী রাধিকার' মধ্যে নাগিনীর ক্রূর সর্পিল স্বভাবই যেন মানবায়িত হয়ে উঠেছে,—'তারিণী মাঝি'-তে কালাপাহাড়ের ক্ষিপ্ত, আক্রুষ্ট জীবন-পিপাসা ধরেছে এক পৌরুষ-দৃঢ় কঠিন রূপ। পাশব এবং মানব-জগতের মধ্যে এই নাড়ির সংযোগ রচনায় সাফল্যের মুখ্য বনিয়াদ গড়ে উঠেছে ;—মানুষকে তারাশঙ্কর আদিম মৌলিক প্রকৃতি-ধর্মের মধ্যে লালন করেছেন—অতিশয় sophistication-এর প্রভাবে তাঁর জীবন-চিন্তা এবং গল্পের পাত্র-পাত্রী তাদের আদিম প্রাকৃতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে নি। এটুকুই তারাশঙ্করের শিল্প-প্রতিভার প্রধান উপাদান।—কেবল প্রসঙ্গ নয়,—তাঁর প্রকরণেও প্রায় একমাত্র বৈশিষ্ট্য এই বিনষ্টিরহিত অমিশ্র (unsophisticated) আদিমতা ও অকৃত্রিমতা।

তারাশঙ্করের প্রয়োগপদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা-সম্পদের প্রাচুর্য যত, সচেতন শিল্প-ভাবনায় সূক্ষ্ম পরিমণ্ডনের অভাব প্রায় ততই,—এমন অভিযোগের আভাস দিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু।[৪৯] প্রায় সমকালীন দুই বিপরীতধর্মী গল্প-লেখকের প্রবণতা-মূলক পার্থক্যের এক ইঙ্গিতও এতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব বসুর গল্প-সৃষ্টিতে বাস্তব অভিজ্ঞতার উপাদান স্বল্প,—কবিমানসের মণ্ডন-রুচিই তার মুখ্য উপাদান। তারাশঙ্করের কল্পনায় কবিদৃষ্টি আছে,—কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতার সঞ্চয় এমন অপার-বিস্তৃত যে বিষয়-স্বাদুতার অমেয় শক্তি তাঁর কাব্যধর্মকে নিজের মধ্যে সংহত করে রেখেছে। পাছে পরিচিত জীবনের একান্ত পরমাত্মীয় জনের রূপায়ণে কোথাও কৃত্রিমতার দোষ অর্শায়, এই প্রত্যবায়-সম্ভাবনার আশঙ্কাতেই মণ্ডনশৈলীর স্বতন্ত্র দাবিকে শিল্পী তাঁর লেখায় সচেতনভাবেই এড়িয়ে চলেছেন—নিজের সম্বন্ধে এমন ইঙ্গিত তারাশঙ্কর স্পষ্ট করেই দিয়েছেন হয়ত বুদ্ধদেব বসুর পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের পরোক্ষ উত্তর দিতে গিয়েই।[৫০] বস্তুত তারাশঙ্করের শৈলী তাঁর আশ্রিত বিষয়-বস্তুর মতই 'প্রাকৃত' অর্থাৎ প্রকৃতি-সম্ভব,—স্বাভাবিক। এই বিশেষার্থেই তাঁর গল্প-প্রকরণকে মহাকাব্যধর্মী বলব। মহাকাব্য-প্রকৃতির মতই তারাশঙ্করের গল্পের রূপায়ণে কোনো বিশেষ প্রকরণের প্রাঞ্জলতা নেই,—বরং একাধিক রূপাঙ্গিক যেন নিতান্ত বিস্রস্তভাবেই বিন্যস্ত হয়েছে—অনেক সময়ে—একই গল্পের দেহে। তাহলেও অন্তত তিনটি মুখ্য আকৃতির রূপরেখা সুপরিলক্ষিত হতে পারবে তাতে,—(১) মহাকাব্যধর্মী উদাত্ত আদিম স্বভাব-বর্ণনা (narration), (২) নাটকীয়তা এবং (৩) গাঢ় বর্ণে মুদ্রিত কাব্যিকতা।

৪৯। B. Bose-'An Acre of Green Grass'। ৫০। দ্র. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—'আমার সাহিত্য জীবন'।

প্রথমোক্ত বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্বমূলক একটি অংশের উদ্ধার করা যেতে পারে 'বোবাকান্না' গল্প থেকে,—"দামোদর, অজয়, কোপাই, বক্রেশ্বর, ময়ূরাক্ষী, গঙ্গায় যে ভীষণ বন্যা হয়ে গেল, শ্রাবণে আরম্ভ হয়ে ভাদ্র পর্যন্ত চারিদিকে যে জলপ্লাবন হয়ে গেল, তার স্মৃতি এখনও মানুষের চোখের উপর ভাসছে। দামোদর অজয়ের বাঁধ এখনও ভেঙে রয়েছে। ভাঙন দিয়ে এখনো জলস্রোত বইছে নদীর মত। সুজলা সুফলা আউয়ল জমি দহ হয়ে গেছে, তার দুপাশে হাজার হাজার বিঘা জমির উপর বালি চেপে বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি ধূ ধূ করছে। বালি এখন ভিজে রয়েছে, যখন জল শুকিয়ে যাবে তখন বাতাসে বালি উড়বে হু হু করে, খাঁ খাঁ করবে মরুভূমির মত। বালিচাপা জমিগুলোর মধ্যে মধ্যে গর্ত, গর্তগুলোয় জল জমে আছে। যত জল শুকিয়ে আসছে, তত সেখান থেকে পচা দুর্গন্ধ উঠছে। সকাল সন্ধ্যেতে মানুষ গরু ওপথে হাঁটলে পাগল হয়ে যায়; মৌমাছির চাকে খোঁচা দিলে ঝাঁক বেঁধে যেমন মৌমাছির দল যাকে পায় তাকেই আক্রমণ করে, তেমনিভাবে মশা এবং মাছির ঝাঁক মানুষ গরুকে ছেঁকে ধরে মাথার চারপাশে ঝাঁক বেঁধে ওড়ে।" —এ ধরনের শ্বাস-রোধকারী প্রকৃতি-বর্ণনার অমিশ্র-কঠিন গাঢ়তা তারাশঙ্করের রচনায় প্রচুর রয়েছে।—প্রসঙ্গত 'ছলনাময়ী'র ম্যানেজারের শ্মশান-সাধনার চিত্র, অথবা 'মেলা' গল্পের 'আনন্দবাজার' বর্ণনাংশের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু তারাশঙ্করের গল্প-প্রকরণের মুখ্য আকর্ষণ তার নাটকীয়তার উপাদানে। প্রথম জীবনে 'মারাঠাতর্পণ' নাটক লিখে তিনি সাহিত্য সমাজে প্রবেশাধিকার কামনা করেছিলেন। যথোচিত সুযোগ পেতে পারলে আজকের সিদ্ধকাম কথাসাহিত্যিক হয়ত নাট্যকার রূপেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করতেন,—শিল্পী নিজেই একথা জানিয়েছেন।[৫১] নাট্যকার-চেতনার এই অতৃপ্ত আক্ষেপ তারাশঙ্করের গল্প-সাহিত্যে অজস্র বিচিত্র অভিব্যক্তির মাধ্যমে চরিতার্থ হতে পেরেছে। ওপরে ধৃত গল্প-বিষয়ের পরিচয়-প্রসঙ্গ থেকে দেখা যাবে,—শিল্পীর পরিচিত জীবন-ভূমি নাটকীয় ঘটনা-সংঘাতে মুখর উত্তুঙ্গ হয়েছিল। মানুষ এবং প্রকৃতি ('রায়বাড়ি') মানুষ এবং পশু ('নারী ও নাগিনী') এবং মানুষে মানুষে দ্বন্দ্বের ('জলসাঘর') বিচিত্র পটভূমিতে তাঁর গল্পের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে। তাছাড়া চরিত্রোচিত সংলাপ রচনার এক দুর্লভ দক্ষতাও তারাশঙ্কর প্রতিভার সহজ উপাদান। এই সব কিছুর সফল সংগ্রহনে 'হুটু মোক্তারের সওয়াল' গল্প সার্থক নবরূপ ধরেছে 'দুইপুরুষ'-এর নাট্যশরীরে। বস্তুত এই একই কারণে তাঁর গল্পগুলিতে মঞ্চ অথবা ছায়াচিত্রের প্রয়োজনে নাট্যরূপায়ণের অতুল্য সম্ভাবনা উদ্ঘাটিত হতে পেরেছে।

৫১। তদেব।

কিন্তু নাট্যগুণ আর নাটকেতর কোনো রচনাশৈলীতে নাটকীয়তার উপাদান বলতে একই কথা বুঝি না। ঘটনা এবং সংলাপ—action আর dialogue নাট্যশরীরের শ্রেষ্ঠ উপাদান। অন্যপক্ষে 'নাটকীয়তা' শব্দের তাৎপর্য হিশেবে অনুভব করতে পারি, অপ্রত্যাশিতের অভিঘাতজনিত এক চমক—অদ্ভুত ঘটনার সমন্বয়, অথবা প্রতিদিনের পরিচিত জীবন-বর্ণনা থেকে ঘটনা পরম্পরার আকস্মিক অন্যথা-গমনের ফলে যে চমক-বিস্ময়ের উদ্ভব হয় তাই।[৫২]

তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছের প্রায় সর্বত্রই নাটক ও নাটকীয়তা,—এ-দুয়েরই আশ্চর্য উপাদান সমন্বয় লক্ষিত হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত হিশেবে 'রসকলি' গল্পের উদ্ধৃত অংশ, অথবা 'জলসাঘর', 'রায়বাড়ি', 'পিতাপুত্র', 'অগ্রদানী', এবং এমনকি 'কালাপাহাড়' গল্পের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। 'দেবতার ব্যাধি' গল্পটি নাট্যগুণান্বিত নয়,—অর্থাৎ action ও dialogue-এর উপাদান তাতে প্রচুর নেই।—কিন্তু ডাক্তার গরগরির অবিস্মরণীয় পত্রটির স্বভাব-বর্ণনার ছত্রে ছত্রে নাটকীয়তার চমক যেন রোমাঞ্চিত করে তোলে। এই প্রসঙ্গেই স্মরণ করতে হয়, স্বভাব-নাটকীয়তা এপিক-গুণের এক সহজ উপকরণ। যেমন উপন্যাসে, তেমনি গল্পের প্রকরণেও তারাশঙ্কর এপিক-ধর্মী কথা-শিল্পী।

তাঁর রচনার প্রয়োগভঙ্গিতে অত্যুচ্চার যে কাব্যিক প্রকাশ-প্রিয়তা, তাও আদিম মহাকাব্যধর্মিতারই এক স্বাভাবিক উপকরণ। দৃষ্টান্ত হিশেবে 'ডাইনী' গল্পের প্রারম্ভিক অংশটি উদ্ধার করা যেতে পারে :—

"কে কবে নামকরণ করিয়াছিল সে ইতিহাস বিস্মৃতির গর্ভে সমাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নামটি আজও পূর্ণ গৌরবে বর্তমান। ছাতিফাটার মাঠ! জলহীন, ছায়াশূন্য দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরটির একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া অপরপ্রান্তের দিকে চাহিলে ওপারের গ্রামচিহ্নের গাছপালাগুলিকে কালো প্রলেপের মত মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন যেন কেমন উদাস হইয়া উঠে। এপার হইতে ওপার পর্যন্ত অতিক্রম করিতে গেলে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মানুষের মৃত্যু হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে। তখন যেন ছাতি-ফাটার মাঠ নামগৌরবে মহামারীর সমকক্ষতা লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। ঘন ধূমাচ্ছন্নতার মত ধূলার একটা ধূসর আস্তরণে

৫২। প্রতীচ্য নাট্যবিশারদ Allardyce Nicoll এ-সম্পর্কে বলেছেন—"The word dramatic has a connotation signifying the unexpected with, usually, the suggestion of a certain shock occasioned either by a strange coincidence or by departure of the incidents narrated from the ordinary tenor of daily life." ('Theory of Drama')

মাটি হইতে আকাশের কোণ পর্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অপর প্রান্তের সুদূর গ্রাম-চিহ্নের মসীরেখা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। তখন ছাতিফাটার মাঠের সে-রূপ অদ্ভুত ভয়ঙ্কর। শূন্যলোকে ভাসে একটি ধূম্রধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্য নির্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ। ফ্যাকাশে রঙের নরম ধূলার রাশি প্রায় একহাত পুরু হইয়া জমিয়া থাকে। গাছের মধ্যে এতবড় প্রান্তরটায় এখানে ওখানে কতকগুলি খৈরী ও সেয়াকুল জাতীয় কণ্টকগুল্ম। কোন বড়গাছ নাই—বড়গাছ এখানে জন্মায় না। কোথাও জল নাই,—গোটাকয়েক শুষ্কগর্ভ জলাশয় আছে, কিন্তু জল তাহাতে থাকে না।

"মাঠখানির চারিদিকেই ছোট ছোট পল্লী—সবই নিরক্ষর চাষীদের গ্রাম। সত্য কথা তাহারা গোপন করিতে জানে না—তাহারা বলে, কোন্ অতীতকালে এক মহানাগ এখানে আসিয়া বসতি করিয়াছিল, তাহারই বিষের জ্বালায় মাঠখানির রসময়ী রূপ, বীজপ্রসবিণী শক্তি পুড়িয়া ক্ষার হইয়া গিয়াছে। তখন নাকি আকাশ-লোকে সঞ্চরমাণ পতঙ্গ-পক্ষীও পঙ্গু হইয়া ঝরাপাতার মত ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িত সেই মহানাগের গ্রাসের মধ্যে।" রূপ-নির্ভর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বর্ণাঢ্যতা সৃষ্টির এই সচেতন প্রয়াস মহাকাব্যের শৈলীরই যেন অনুসারী।

উদ্ধৃত রচনাংশে তারাশঙ্করের শব্দাড়ম্বর-প্রীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে মধুসূদনের শব্দ-রচনার অনুষঙ্গ স্মরণ করতে বাধা নেই :—

"নৃমুণ্ডমালিনী দূতী, নৃমুণ্ডমালিনী
আকৃতি। পশিয়া ধনী অরিদল মাঝে
নির্ভয়ে চলিলা যথা গরুত্মতী তরী
তরঙ্গ নিকরে রঙ্গে কবি অবহেলা
ধায় রে সাগর পানে।"[৫৩]

বাংলা কবিতার ইতিহাসে বৈদগ্ধ্যমার্জিত মধুসূদনের এই শৈলী সার্থক সাহিত্যিক মহাকবি-ধর্মের স্বাক্ষর হলে, কথাসাহিত্যে তারাশঙ্করের সহজ-স্ফূর্ত প্রতিভা অনেকটা যেন আদিম মহাকাব্যধর্মী। তাঁর গল্প-সাহিত্য পাঠের চরম রসফলশ্রুতি এখানেই।

বহুপ্রজ তারাশঙ্করের গল্প-সংকলন গ্রন্থের সংখ্যাও প্রচুর। তার মধ্যে রয়েছে—'পাষাণপুরী' (১৯৩৩), 'নীলকণ্ঠ' (১৯৩৩), 'ছলনাময়ী' (১৯৩৬), 'জলসাঘর' (১৯৩৭), 'রসকলি' (১৯৩৮), 'তিনশূন্য' (১৯৪১), 'প্রতিধ্বনি' (১৯৪৩), 'বেদেনী' (১৯৪৩), 'দিল্লীকা লাড্ডু' (১৯৪৩), 'যাদুকরী' (১৯৪৪), 'স্থলপদ্ম' (১৯৪৪),

---

৫৩। মেঘনাদ বধ (৩য় সর্গ)।

'প্রাসাদমালা' (১৯৪৫), 'হারানো সুর' (১৯৪৫), 'ইমারৎ' (১৯৪৬), 'রামধনু' (১৯৪৭), 'মাটি' (১৯৫০), 'কামধেনু' (১৯৫৩) ইত্যাদি। প্রচলিত গ্রন্থ সংকলনগুলি থেকে নির্বাচন করে 'তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্প' সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য (১৯৫১)। তারপরে, একই ধরনে শিল্পী নিজে সংকলন করেছেন তাঁর 'প্রিয়গল্প' (১৯৫৩) এবং 'স্বনির্বাচিত গল্প' (১৯৫৪)। তাছাড়া 'প্রেমের গল্প' সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে (১৯৬১)। পরোক্ত এই সংকলনগুলিতে এই গল্পের পুনরবতারণা না করার চেষ্টা আছে,—তাহলেও একেবারেই যে তা হয় নি এমন কথা বলবার উপায় নেই।

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

'কল্লোল'-সমকালীন গল্পসাহিত্যের ইতিহাসে সরোজকুমার রায়চৌধুরী (১৯০৩-১৯৭২) এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব; হয়ত-বা সেই কারণেই অপেক্ষাকৃত স্বল্পালোচিত-ও। যুগ-ভাবুকতার উজ্জ্বল পাদ-প্রদীপের সীমান্তরালে অবস্থান করে ঊর্মিমুখর উত্তালতাকে তিনি নিয়ত পরিহার করেছেন; ক্রান্তিকালের উত্তেজনার মধ্যে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু তাঁর উপন্যাস এবং গল্প-সাহিত্যে এমন এক নিবাত নিষ্কম্প গভীরতা রয়েছে, স্ফটিক-স্বচ্ছ দীঘির জলের মতই যা নিস্তরঙ্গ হলেও নিটোল সামগ্রিকতায় প্রগাঢ়।

ইতিহাসের সূত্রানুসরণ করে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরী কতকটা তারাশঙ্কর বাবুর সমানধর্মা। ইঁহারও এক-আধটি গল্প 'কল্লোলে' বাহির হইয়াছিল। তারাশঙ্করবাবুর উপন্যাস-কাহিনীতে ভূগোল বীরভূম জেলার চৌহদ্দিবদ্ধ, সরোজবাবুর রচনার মানচিত্র ইহারই সংলগ্নভূমি পশ্চিম মুর্শিদাবাদ।" তা সত্ত্বেও এই দুই শিল্পীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের কথাও স্মরণ করেছেন ডঃ সেন,—"সরোজবাবুর কাহিনী অতটা মুখ্যভাবে 'রিজিওন্যাল' নয় যতটা তারাশঙ্করবাবুর কাহিনী। রোমান্স-প্রখরতা এবং বহুভাষণও সরোজকুমারের লেখায় কম।"[৫৪] দুই সমকালীন শিল্পীর সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্যের যে তথ্য-সংকেত ডঃ সেন দিয়েছেন, তাকে অনুসরণ করেই বহুদূর অগ্রসর হয়ে যাওয়া সম্ভব; আর সেই সূত্রেই গল্পশিল্পী সরোজকুমারের স্বকীয়তার অনন্য ভূমিকাটিও আয়ত্ত হতে পারে।

তারাশঙ্করের মতই সরোজকুমারের শিল্প-চেতনাও গ্রাম্য-জীবনের প্রতি স্বভাব-প্রীতিমান। কিশোর বয়সের স্মৃতি-মন্থন করে নিজের প্রথম গল্প লেখার সংবাদ সরবরাহ

৫৪। ডঃ সুকুমার সেন—'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ৪র্থ খণ্ড।

করেছেন :—নিভৃত পল্লীপ্রান্তরে বংশীবাদন-রত রাখালের গলায় মালা পরাতে এসেছিল অচিন দেশের রাজকুমারী ;—এমনি রোমান্সমেদুর স্বপ্ন-দেখাতেই শেষ হয়েছিল অপরিণত মনের গল্প-কল্পনা।[৫৫] সেই অদ্ভুত ভাবনার রহস্যসূত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শিল্পী নিজের মনোলোকে পরিক্রমা করেছেন বহুদূর।[৫৬] কিন্তু গল্প-শিল্পীর পক্ষেও 'ঊষাই যদি দিবালোকের পথ প্রদর্শক' হয়, তাহলে ঐ গল্প-চিত্রকে অনুসরণ করেই বলতে হয়, সরোজকুমারের প্রতিভা রাজকন্যার সঙ্গে রাখাল বালকের যদি না-ও হয়, তবু রাজপথের সঙ্গে মাঠের অচ্ছেদ্য প্রণয়-বন্ধন রচনা করেছে। বাংলা গল্পের এই দ্বিতীয় পর্বের জীবন-পটভূমির প্রসঙ্গে লক্ষ্য করেছি, গ্রাম এবং শহরের মধ্যে বিভেদ সেদিন দূরযানী হয়েছিল। সরোজকুমারের গল্প-উপন্যাসে গ্রামের উদাস মেঠো সুরেলা বাঁশির মিঠে তান যেমন, তেমনি অজস্র ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভে আলোড়িত সমসাময়িক শহরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবন-বেদনাও মাধুর্য-করুণ সুরে ঝঙ্কৃত হয়েছে। গ্রাম্য মাঠের উদাস মেদুরতা আর রাজধানীর গলিপথের বিষণ্ন বেদনা এক সূত্রে যেন বাঁধা পড়েছে। এইখানেই সরোজকুমার তারাশঙ্করের থেকে স্বতন্ত্র। 'কল্লোলে'র বৈঠকে এসে তারাশঙ্কর যেদিন ফিরে গিয়েছিলেন, সেদিনকার কথা স্মরণ করে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন,—"কল্লোল আড্ডার জীবনদৃষ্টির দিক্ থেকে নিশ্চয়ই তিনি অন্য জাতের মানুষ ছিলেন। জমিদারীর নিশ্চিন্ত জীবনের পরিবেশে আর আদর্শবাদী স্বদেশিয়ানায় যৌবন কেটেছে, তাঁর সঙ্গে ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে জীবনের চারণদের জ্ঞাতি মিলবে কি করে!"[৫৭] এ-উক্তিতে সহৃদয় বন্ধুর অভিমানও হয়ত প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তাহলেও স্বীকার করতে হয়, তারাশঙ্করের সাহিত্য-জীবনের সূচনায় অনিশ্চয়তাবোধের যন্ত্রণা ও আর্থিক দৈন্য কিছু পরিমাণে স্বেচ্ছাবৃত হলেও, 'কল্লোল'-গোষ্ঠী'র অনেকের চেয়েও কম ছিল না। মনোহরপুকুরের কাঁচা ঘরের নিঃসঙ্গ-বাসের অভিজ্ঞতায় তাঁকে ছন্নছাড়া ছাড়া আর কি বলব! তবু পবিত্রকুমারের এ উক্তি সংশয়হীন যে, আত্মার প্রত্যয়সম্পদে 'কল্লোলযুগে'র আত্মমর্ষণার্ত পথিকদের মত ভয়ঙ্কর দেউলে তারাশঙ্কর কখনোই ছিলেন না। জমিদারির প্রাচুর্য নয়, বনেদি জমিদার-পরিবারে ঐতিহ্য-চেতনা ও যুগযুগাগত মূল্যবোধের সঙ্গে স্বভাব-বিশ্বাসী পল্লী-প্রকৃতির সারল্য এবং স্নিগ্ধতা তাঁর শিল্পি-আত্মাকে পথিক করেছে, কিন্তু রিক্ত হতে দেয় নি কখনো। ফলে তারাশঙ্কর

৫৫। জ্যোতিপ্রকাশ বসু (সঃ)—'গল্পলেখার গল্প'।

৫৬। সরোজকুমারের প্রথম মুদ্রিত গল্প 'তিন পুরুষের কাহিনী'—নিরুপমা বর্ষস্মৃতি নামক পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত। সে আরো পরবর্তী কালের প্রসঙ্গ।

৫৭। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—'চালাদি করেছিলাম' [স্মৃতিকথা] শারদীয়া যুগান্তর, ১৩৬৮ বাংলা।

নগরবাসী হয়ে পড়লেও, তাঁর সৃষ্টিতে পল্লীজীবনের ভঙ্গুর জমিদার থেকে উদীয়মান ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ থেকে বাগদী-বাউরী পর্যন্ত নারীপুরুষের অজস্র বিচিত্র প্রাণস্পন্দিত শোভাযাত্রা। কিন্তু ঐ একই সময়ে মহানগরীর জীবনে ভূমিহীন, চাকুরি-স্বর্গচ্যুত ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনে যে হতাশা, প্রত্যয়ভঙ্গ আর্থিক ও মানসিক রিক্ততাজনিত অবসাদ স্তরে স্তরে পুঞ্জিত হয়ে উঠছিল, সে খবর তারাশঙ্কর রাখেন নি, —রাখবার উপায় ছিল না। 'শুধু কেরাণী', 'ছুইবার রাজা' অথবা 'ধ্বংস পথের যাত্রী এরা'-এর মত গল্প তাই অনুপস্থিত তারাশঙ্করের অপ্রতিহতপ্রবাহ বিচিত্রগতি গল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে। অন্যপক্ষে সরোজকুমারের 'ক্ষণবসন্ত' গল্প পড়ে নানা কারণেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শুধু কেরাণী'র কথা স্মরণ না করে উপায় থাকে না; যদিও বাল্য-কৈশোর জীবনের অভিজ্ঞতা-সম্পদে সরোজকুমারের শিল্প-চেতনা মূলত ছিল পল্লীবাসী; আর তারাশঙ্করের মতই স্বদেশিয়ানায় মেতে জেলও খেটেছিলেন তিনি; এবং সে মোহ কোনোকালেই কেটে যায় নি তাঁর।

কিন্তু সে যাই হোক্, আপন বৈশিষ্ট্যে সরোজকুমার কল্লোল-গোষ্ঠীর থেকেও স্বভাব-স্বতন্ত্র। 'কল্লোল' পত্রিকার ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় তাঁর 'ছুনিয়াদারি' গল্প প্রকাশিত হয়েছিল, তাতেও এই স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় অস্ফুট থাকে নি। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে অনিবার্য নয়। আসলে সরোজকুমার বাংলার সমকালীন পল্লী-সমাজের মধ্যবিত্ত জীবনকেও দেখেছিলেন ;—পরম্পরাগত পারিবারিক বিত্তের সঞ্চয় দিনে দিনে ক্ষীণ হয়ে এলেও 'সহজ জীবন যাত্রা আর উচ্চ ভাবনা'-র পূর্ব-ঐতিহ্যকে যাঁরা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন প্রাত্যহিক দিনাতিবাহন ও আচার-আচরণের মধ্যে। 'উচ্চ ভাবনা' বলতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষিত অধিকার-দীপ্ত মনন-চিন্তনের কথা বলছি না,—পুরাগত মহৎ মূল্যবোধের নৈষ্ঠিক অনুস্মৃতির কথাই স্মরণ করছি, যার ফলে বাংলার মধ্যবিত্ত জীবন একদা আর্থিক প্রাচুর্য ছাড়াও কল্যাণ-স্নিগ্ধ গার্হস্থ্যের আশ্রয় লাভ করেছিল। 'ক্ষণবসন্ত' গল্পে সেই ঐতিহ্য-পরিচয় ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে :—

মাত্র ৩৫ টাকা মাস মাহিনার অকিঞ্চিৎকর চাকরি সাহেব-কোম্পানীতে লাভ করে কৃত্তিবাস ধন্য হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য ঐটুকুর লোভেই কর্তা সাহেবকে যে আভূমি-প্রণত 'সেলাম্' সে নিবেদন করেছিল দেশপ্রীতির উদ্দীপনাভরা সে-যুগে তার বাড়া আত্মগ্লানি বঙ্গসন্তানের পক্ষে অকল্পনীয় ছিল। তা সত্ত্বেও কৃত্তিবাস তাতে পশ্চাৎপদ হয় নি ;—কত গুণি-জ্ঞানী এম্. এ. প্রার্থীও তো ছিল, সকলকে ডিঙিয়ে বি. এ. পাস কৃত্তিবাসই উত্তীর্ণ হতে পেরেছে চাকরির সেই সপ্তস্বর্গে।

এই সামান্য চাকরিকে আজ আর স্বর্গ লাভ কিছুতেই বলা চলে না : মাইনের

পরিমাণটা পর্যন্ত বন্ধু মহলে মুখে আনা কঠিন। তবু ঐটুকুও না হলে কৃত্তিবাসের উপায় ছিল না। সর্বংসহা জননীর কথা মনে পড়ে বার বার,—তাকে বিদ্বান করে তুলতে, এক একখানি করে গায়ের স্বর্ণালঙ্কার খুলে দিয়ে আজ তিনি কেবল শঙ্খাভরণা। বাবার কত প্রত্যাশা,—কৃত্তিবাস উপার্জন করলে তবে ছোট ছোট ভাইবোনগুলোর হিল্লে হবে একটা কিছু। তার চেয়েও বেশি,—আরো একজনের কথা,—কল্যাণীর কথা না ভেবে কি পারে কৃত্তিবাস! তাদের বিয়ে হয়েছে কতদিন;—বড়লোকের মেয়ে না হলেও পিতৃগৃহ তার স্বাচ্ছন্দ্যে ঝলমল করছে; সে তুলনায় কৃত্তিবাসের বাড়ি দারিদ্র্য-ম্লান। যে আত্মীয়টি এই বিবাহ-সম্পর্ক করেছিলেন, কল্যাণীর পিতামাতা তার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। তবু কল্যাণী কল্যাণীরই মত স্নিগ্ধ-মাধুর্য সঞ্চার করে ফিরছে কৃত্তিবাসের পিতা-মাতা প্রিয়-পরিজনদের মধ্যে। কৃত্তিবাসের বাবা তো কল্যাণীকে মা বলে অজ্ঞান, কল্যাণীও শ্বশুরবাড়িকেই একান্ত আপন করে নিয়েছে। পিতৃগৃহের উপেক্ষাভরা দৃষ্টির সামনে সে ছোট হয়ে যায় বৈ কি! কিন্তু অত কিছুর বিনিময়ে কি সে পেয়েছে;—যার জন্যে শ্বশুরবাড়ি, তার সঙ্গে বা সাক্ষাৎ হয় ক-দিন! সব কথাই ভাবতে হয়েছে কৃত্তিবাসকে—মায়ের গয়না, বাবার ভরসা, ভাইবোনদের ভবিষ্যৎ, কল্যাণীর হাসিমুখ—এ সমস্ত কিছুর মূল্য আহরণ করতে ৩৫ টাকার চাকরি চেয়েছে আত্মদৈন্যের বিনিময়ে।

চাকরি জুটেছে, কিন্তু চারদিকে দাবির বহর যেন অন্তহীন—মেসের বন্ধুরা ফিস্ট চায়, পরিবারের প্রয়োজন রয়েছে, লোক-লৌকিকতা আছে, নিজের খরচ তো আছেই। কৃত্তিবাস ভাবে একটু গুছিয়ে নিতে পারলে বাড়ি যাবে একবার। মা-বাবার আকুলতা যত, কল্যাণীর অভিমানই কি তার চেয়ে কম! এমন সময় বাবার পত্র আসে,—'মা লক্ষ্মী'কে বাপের বাড়ি যেতে হবে—তার জন্যে দুখানা ভাল কাপড় চাই এবং আরো এ-টা-সেটা নানা কিছু। কল্যাণীর পত্র আসে,—'শত্রু বিদায়' হয়ে যাচ্ছে এবারে নিশ্চয় কৃত্তিবাস বাড়ি যাবে! মনে মনে সকরুণ হাসে কৃত্তিবাস,—প্রেয়সী নারীর অবুঝ অভিমান! অতএব বাড়ি যাওয়াই স্থির করে সে,—দুদিন ছুটিও জুটে যায়; তাই খবর না দিয়েই যাত্রা করে। প্রেমমিলনের উৎকণ্ঠায় নয়,—টাকা পয়সার হিসাব-নিকাশ করে যখন দেখে—ফরমায়েসের জিনিস ক'টি বাড়ি পৌঁছে দিতে নিজের যেতে পারাতেই নিশ্চয়তা এবং ব্যয়-স্বল্পতা দুইই সম্ভব। স্টেশন থেকে একাধিক ক্রোশ তাদের গ্রামের দূরত্ব। কপি, কলাই, কাপড় এবং অন্য নানা উপকরণে বোঝা প্রকাণ্ড হয়েছে,—তাহলেও ভাগে কুলি করতেও রাজি নয় কৃত্তিবাস! চার আনা পয়সারও মূল্য তার কাছে এখন অনেক। তাছাড়া অনেক রাতে বাড়ি পৌঁছে কুলিটা যদি

আব্বার ফিরে আসতে না চায়! একটা মানুষের এক বেলার খোরাক, সেও ত ভাববার কথা! অতএব সারাপথ বোঝা মাথায় করে গভীর রাতে কৃত্তিবাস যখন বাড়ি এসে পৌঁছায় তখন সে ক্লান্ত,—অবসন্ন। রাতে দুধ ছাড়া আর কিছু খাবে না,—মার সঙ্গে এই বোঝাপড়া করে নিজের ঘরে এসে দেখে ঝাড়া বিছানা নূতন করে ঝাড়তে ব্যস্ত হয়ে আছে কল্যাণী পিছন ফিরে। কিছুতেই তার মুখ আর দেখা যায় না। অনেক কষ্টে বিছানায় এলিয়ে পড়ে যদিবা মুখোমুখি হল, তবু উদ্গত বাসনার একটি নিভৃত মুহূর্তকে অভিমানে-ক্রন্দনে ছিন্নভিন্ন করে ছুটে পালিয়ে যায় কল্যাণী। সযত্ন রচিত শয্যায় ক্লান্ত দেহে এলিয়ে বিষণ্ণ কৃত্তিবাস ভাবে, "কেরানীর জীবনে বসন্ত তো সমারোহ করিয়া আসে না,—আসে ম্লান সন্ধ্যার মত অবনতমুখে। মনের ফুলবনে প্রতিদিন নূতন নূতন ফুল ফোটার আনন্দও নাই। কোনোদিন ফুল ফোটে, কোনোদিন দুশ্চিন্তার তাপে কুঁড়িতেই শুকাইয়া যায়। ইহার আর উপায় কি ?"—কিন্তু কল্যাণীকেই বা সেকথা কি করে বোঝাবে সে! শুধু কি তাই,—কেরানীর জীবনে ক্ষণবসন্ত যদি-বা আসে, ক্লিষ্ট-পিষ্ট দলিত দেহ-মনে তাকে অভ্যর্থনা করার শক্তিও বা কোথায়! গভীর রাত্রে তেলের বাটি হাতে করে কল্যাণী যখন শয্যাগৃহে এসে প্রবেশ করে, ক্লান্ত অবসন্ন দেহে কৃত্তিবাস তখন অসাড় নিদ্রাভিভূত। কিছুতেই তার ঘুম ভাঙে না; কল্যাণী ভেঙে পড়ে ব্যর্থ বিষণ্ণ ক্রন্দনভারে।

প্রবাসী কেরানীর বিরহতপ্ত জীবনে ক্ষণবসন্ত একই রাত্রিতে এসেছিল দুটিবার, কিন্তু দুবারই সে ব্যর্থ হয়েই ফিরেছে।

সমসাময়িক জীবন-যন্ত্রণার প্রতি সরোজকুমারের অবধান চিরকালই অতন্দ্র। এদিক থেকে তিনি কল্লোলযুগের কালগত তাৎপর্যে যথার্থ 'আধুনিক'। এই প্রসঙ্গেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শুধু কেরাণী' গল্পের কথা স্মরণীয়। তা সত্ত্বেও 'ক্ষণবসন্ত' গল্পের ফলশ্রুতি 'শুধু কেরাণীর' মত নৈরাশ্য, ব্যর্থতা আর বিক্ষোভবোধে অত নীরন্ধ্র অবসন্ন নয়;—শহুরে বিড়ম্বনার ক্লান্তি অবসাদ এবং অসহায় যন্ত্রণানুভবের পরপারে প্রশান্ত স্নিগ্ধতার এক ক্ষীণ ভঙ্গুর গ্রামীণ প্রতিশ্রুতির স্বরও যেন তাতে প্রচ্ছন্ন। সরোজকুমারের শিল্পি-চেতনাতেও শহুরে উত্তেজনা ও আক্ষেপের গভীরে গ্রামের নৈঃশব্দ্য যেন দুরবগাহ নিস্তব্ধতার সঞ্চার করেছে, যার ফলে খালি বক্তব্যে নয় তাঁর বাগ্‌ভঙ্গিতেও অভিনব ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। তা বলে এই লেখকের সকল গল্প-বিষয়েই গ্রাম এবং শহরের মধ্যে পারস্পারিক অন্বয়ের কোনো যোগসূত্র রয়েছে, এমন কথা মনে করাও অনুচিত। গ্রাম্য এবং শহুরে জীবন-পরিবেশে পৃথক্ পৃথক্ গল্পের উপস্থাপনা করেছেন তিনি। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই প্রকরণের মধ্যে এক আশ্চর্য ভারসাম্য রয়েছে,

যাকে classical পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে করে। তার আরো এক সুফল হয়েছে এই যে, সমকালীন শিল্পি-সমাজে সরোজকুমারের গল্প সর্বাধিক পরিমাণে প্লট্-কেন্দ্রিক ;—এমন নিটোল-সম্পূর্ণ অমিশ্র প্লট্ গড়ে তোলার সাধনা একালে প্রায় অনন্য। নিছক কাহিনী-শরীরকে স্থপতির মত ভেঙে গড়ে কেটেকুঁদে তারই আধারে পুরো গল্প-রসকে সঞ্চয় করার এই শিল্প-শৈলীকেই অভিহিত করতে চেয়েছি classical পদ্ধতি নামে।

Classicism, romanticism ইত্যাদি অভিধার নৈর্ব্যক্তিক সংজ্ঞারচনা প্রায় অসম্ভব, কারণ সৃষ্টির উপকরণের চেয়েও এ ধরনের শৈলীর বৈশিষ্ট্য স্রষ্টার মর্জির উপরেই নির্ভর করে অনেক বেশি। সেই তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে,—
The word classicism is used loosely to summarise the general characteristics of that art or literature—simplicity, restraint and order—and the adjectives classic or classical are thus applied to any work which reflects those qualities, whether by direct imitation or not. Thus the restraint and order of classicism are often opposed to the enthusiasm and freedom of romanticism "[৫৮]

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে, সমসাময়িক গল্প-রসিক একজন তারাশঙ্করের শৈলীর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছিলেন 'classico romanticism' বলে ;—বলেছিলেন, তাঁর রচনায় 'classical massiveness' নবজন্ম নিয়েছে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিমণ্ডলে।[৫৯] তারাশঙ্করের গল্পে বস্তুর সঞ্চয় প্রাচুর্য-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ,—নিখুঁত ; বাস্তব অভিজ্ঞতার যথাযথ সমাহরণে তাঁর প্রতিভার ঋজু সংযম ও সহজ নিয়মানুবর্তিতা (orderliness) বিস্ময়কর। ফলে রচনাবস্তুতে classical উপকরণের গাঢ়তা ও দার্ঢ্য অপরিসীম ; কিন্তু সেই সঙ্গে দেখেছি, শিল্পীর আত্মিক প্রত্যয়াশ্রিত ভাব-কল্পনা, উদ্দীপনা, আর উচ্ছ্বাস মহাকাব্যের সম্ভাবনাকে কাব্যাতিশায়িতার আড়ম্বর-সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এরই ফলে তারাশঙ্করের সৃষ্টিতে বিষয়-সমৃদ্ধি তুলনারহিত হলেও 'বিষয়ী'র প্রাধান্য তার চেয়েও বেশি। সরোজকুমারের সাধনা বিষয়ের objective বর্ণন-কৌশলের ঐকান্তিকতার অতলে বিষয়ীকে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন করতে পেরেছে, এখানেই তাঁর প্রতিভার classical সংযমের (restraint) যথার্থ অভিব্যক্তি। 'কল্লোল'-সমকালীন শিল্পীদের মত,—তারাশঙ্করের মতোও,—সমসাময়িক জীবন-প্রসঙ্গে তাঁর অবধান ও স্পর্শকাতরতা আত্মার আমূল-প্রোথিত। সেই জীবনের চারপাশে যত অনাচার, অবিচার, যন্ত্রণা পুঞ্জিত হয়েছে তার প্রতি শিল্পি-চেতনার অভিযোগ সমুদ্যত ; আবার সমস্ত আক্ষেপ বিক্ষোভের

৫৮। **H. A. Watt & W. W. Watt—'Dictonary of English Literature'.**

৫৯। প্রেমেন্দ্র বিশ্বাস (সঃ)—'আধুনিক বাংলা ছোটগল্প' (সংকলন)।

অন্তরালে এক স্নিগ্ধ প্রত্যয়বানতার অনুভবও দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু নালিশ অথবা বিরক্তি, বিশ্বাস অথবা আবেগ,—কোনো কিছুকেই গল্পের মধ্যে পৃথক্ স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে বিমুখ তাঁর শিল্পিচেতনা। গল্পের শরীরে—একটি অ-শ্লথ দুর্ভেদ্য সমগ্র প্লট্-এর দেহে সকল অনুভব—সকল আকাঙ্ক্ষাকে মূর্তির মত স্তরে স্তরে গড়ে তুলেছেন শিল্পী। বুদ্ধদেব বসুর গল্পে প্লটকে ধরতে গেলে প্রায়ই সে কাব্যিকতার স্রোতসলিলে দুহাত গলে ঝরে পড়ে। কিন্তু সরোজকুমারের গল্পে দুহাত ভরে ওঠে এই অখণ্ড সম্পূর্ণ অটুট প্লট-এর মূর্তি। তাই বলে গল্পের জন্যেই গল্প লেখেন নি তিনি উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো,—গল্প লিখেছেন জীবনের দাবিতে,—গল্পের প্লট-শরীরেই সে জীবন প্রগাঢ় হয়ে আছে,—যার সাদৃশ্য খুঁজতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্লট-সংগঠনের কথা স্বভাবতই মনে পড়ে,—যদিও কাল, জীবনবোধ অথবা ব্যক্তি-প্রতিভার তুলনায় এ সাদৃশ্য-কল্পনা একান্তই দূরান্বিত,—এ-কথা বলাই বাহুল্য। বক্তব্য প্রতিপাদনের জন্য এবারে আর একটি গল্পের প্রাসঙ্গিক উদ্ধার করা যেতে পারে। গল্পের নাম 'তৃতীয় পক্ষ'—

"দ্বিতীয় পত্নীর বিয়োগের পর রামহরি কয়েকটা দিন মুহ্যমান হয়ে রইল কিন্তু ওই কয়েকটা দিনই মাত্র। জেলাবোর্ডের সাব-ওভারসিয়ারের তার বেশি শোক করার সময় নেই।—'পঞ্চাশের কাছাকাছি'—বয়স হয়েছে রামহরির—সন্তান সাকল্যে পাঁচটি; প্রথম পক্ষের তিন, দ্বিতীয় পক্ষের দুই; প্রথম পক্ষের বড় মেয়ে অমলার বয়স কুড়ি,—বছর চার আগে সমারোহ করে বিয়ে দিয়েছিল তার রামহরি,—দু'বছর আগে সিঁথির সিঁদুর মুছে হাতের শাঁখা খুলে পিতৃগৃহে ফিরেছিল দুর্ভাগিনী! বড় ছেলে সুরেশ ম্যাট্রিক দেবে এবার। তার ছোটটি আরো নীচে পড়ে। দ্বিতীয় পক্ষের ছোটছেলের বয়স পাঁচ বছর, 'বড়টি স্কুলে পড়ে।'

এদের সকলেরই তদারকের ভার পড়েছে এখন অমলার ওপর। রামহরির অবকাশ নেই যেমন শোক করবার, তেমনি নেই সংসারের দিকেও লক্ষ্য করবার। গুড় সহযোগে খানকয়েক বাসি রুটি এবং এক পেয়ালা চা খেয়ে সকাল সাতটার আগেই সে বেরিয়ে যায় পথে পথে জেলাবোর্ডের বিচিত্র স্থাপত্য কর্মের তদারকে। ফেরে কোনোদিন বারোটা, কোনোদিন বা একটায়। স্নানাহার এবং যৎকিঞ্চিৎ দিবানিদ্রা সাঙ্গ করে আবার বেরোতে হয় অফিসে। সন্ধ্যায় ফিরে জলযোগান্তে 'দত্তদের আড্ডায়' তাস খেলতে যায়। ফিরতে রাত্রি এগারোটা-বারোটা।"

"রামহরি লোকটি আসলে মন্দ নয়। কিন্তু কুলি ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে বাইরেটা একেবারে কাঠখোট্টা। বেশি কথা সে বলতে পারে না, যেটুকু বলে তাও গুছিয়ে নয়। তার চেহারাও ঠিক এরই সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেছে: মাথায়

প্রশস্ত টাক। মুখে ঝাঁটার মতো একগোছা গোঁপ। কাজের চাপে দাড়ি কামানোর সময় কচিৎ মেলে। সুতরাং সপ্তাহে অন্তত পাঁচটা দিন খোঁচা-খোঁচা পাকাপাকা দাড়িতে মুখমণ্ডল সমাকীর্ণ থাকে। বাইরে ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করার জন্য শরীরে চর্বি জমার অবকাশ হয় না। শরীর দীর্ঘ এবং ক্ষীণ। গাল ভাঙা।"

দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর অশৌচের ক'টা দিন কিছুটা যেন কাতর আর অন্যমনস্ক হয়েছিল রামহরি। শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাবার পরদিন থেকেই আবার রীতি-নিয়মিত বাইসিক্ল নিয়ে কাজে বেরোতে শুরু করেছে।

দেখে দেখে অমলা অবাক হয়—মনে মনে খুশিও হয় একটু। মনে পড়ে তার নিজের মা যখন মরেছিল, তখন তার বাবা অভিভূত হয়ে পড়েছিল,—লম্বা ছুটি নিয়ে দেশে চলে গিয়েছিল, ফিরে এসেও কোনো কাজেই মন বসাতে পারে নি। "এক বছরের উর্ধ্বকাল এমনি চলেছিল। তার পরে মায়ের কান্নায় আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে এবং বন্ধুবান্ধবের জেদাজেদিতে অবশেষে বাধ্য হয়েই সে বিবাহ করে।"

অমলার বয়স তখন কতইবা, 'ন-বছর হয়েছে, কি হয়নি'। তবু সেদিনের অনেক কথাই মনে পড়ে। তাই আজ মনে মনে তার ভালই লাগে এই ভেবে যে, রামহরি তার মাকে যত ভালবেসেছিল এমন আর কাকেও নয়। পুরুষ মানুষ বেশিদিন নারীহীন থাকে না। "কিন্তু তাই বলে সুদূর অতীত কালের সেই ভালবাসার অভিব্যক্তিকেও সে লঘুভাবে উড়িয়ে দিতে পারে না।"

কিন্তু ঐটুকুই সব নয়,—এই দায়িত্বভারনত কর্মক্লান্ত দিনগুলিতে 'নতুন মার' কথা আরো বেশি করে মনে পড়ে অমলার। নিজের মার স্মৃতি খুব বেশি মনে নেই তার। রামহরির শোবার ঘরে তার মায়ের একটা বড় অয়েল পেন্টিং আছে। তার থেকে এই পর্যন্ত মনে পড়ে যে, সে মা ছিল ছোটখাটো শ্যামবর্ণের একটি চঞ্চল চট্পটে মেয়ে। তার চোখেমুখে কৌতুক ঠিক্‌রে পড়ত, "মুখে সব সময় হাসি আর ছড়া।"

নতুন মা ছিলেন ঠিক বিপরীত, লম্বা, ফর্সা চেহারা। চোখের দৃষ্টি শান্ত। তাকে কখনো জোরে হাসতে বা রেগে চীৎকার করতে শোনেনি কেউ। সেই ন বছরের বয়সে অমলাকে যে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, তারপর বিচিত্র সুখ-দুঃখের তরী বেয়ে পেরিয়ে গেছে অমলার জীবনে দীর্ঘ দশ বছর,—এর মধ্যে একটি দিনের জন্যও নতুন মার বিরুদ্ধে কোনো পরোক্ষ অভিযোগ বা অভিমানের বাষ্পও জমতে পারে নি। সেই নতুন মা নীরবেই চলে গেলেন যখন, তাঁর নীরবে বয়ে-চলা প্রতি দিনের বোঝা যে কি দুর্বহ কঠিন, তা অনুভব করে স্তম্ভিত হয়ে গেল অমলা। নতুন মা যে কোনো কাজই তাকে করতে দেন নি কোনো দিন! আর আজ তাঁর দুঃসহ দায়িত্বভার

পড়েছে অমলার ঘাড়ে। সে তা গুছিয়ে উঠ্‌তে পারে না, ভাইগুলো সব আগের মত খেয়ে যেতে পারে না স্কুলে কোনদিন, তবু রোজই তাদের 'লেট' হয়। অমলা বোঝে তবু কিছুতেই গুছিয়ে উঠতে পারে না,—যতই পরিশ্রম করে, ততই অসুবিধা বাড়ে দিকে দিকে, তার চেয়েও তার দেহ, মন-চেতনায় নামে দুঃসহ ক্লান্তির ভার। তারপরে একদিন আর কিছুতেই উঠতে পারে না অমলা বিছানা ছেড়ে,—কঠিন জ্বর আর সেই সঙ্গে দেখা দেয় হৃদ্‌যন্ত্রের বৈকল্য।

এই অবকাশে পিতাকে যেন এই সর্বপ্রথম জীবনে খুব ঘনিষ্ঠ করে পেল অমলা,—তাও মনে মনে, পরোক্ষে; খুব স্পষ্ট নয় সে অনুভবের কিছুই। ঠাকুর একটি রাখা হয়েছে। এদিকে নিয়মিত চিকিৎসাদির ফলে অমলাও ক্রমশঃ সেরে উঠছে। অমলা বলে, ঠাকুর রইল 'আমি যে কদিন না সেরে উঠি সেই কদিনের জন্যে।'

"রামহরি হাসলে। বললে, কদিন! তোমার হার্ট মোটেই ভাল নয়। দুটো মাসের আগে তোমার উনোনের ধারে যাওয়াই চলবে না। তারপরেও..." অমলা কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। ঠাকুরের চুরিটা এখন বন্ধ হয়েছে,—কুটনোটাও কুটে দিতে পারে সে। এমন সময় রামহরি একদিন এসে বললে, আমি একটু বাইরে যাব অমলা। ফিরতে দু-তিন দিন দেরি হবে।..."

* * *

"সূর্যাস্তের আর দেরি নেই। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পাশের জামগাছের জলে-ধোয়া চিকন পাতায় পড়ন্ত সূর্যের আলো ঝিকিমিকি করছে।

দোতলায় পশ্চিমের বারান্দায় বসে অমলা তখন তরকারি কুট্‌ছিল—এমন সময় দরজায় এসে থামল ঘোড়ার গাড়ি একখানা। তার থেকে নামল এক অর্ধাবগুণ্ঠিতা নারী আর রামহরি নিজে। মেয়েটি আগে আগে উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে—পেছনে আসছিল রামহরি গোটা দুই বাক্স-পেটেরা নিয়ে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অমলা মেয়েটিকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সে অমলার হাত ধরে হেসে বললে 'তুমি অমলা?' অমলা বললে, 'তুমি কি আমাকে চেন?'

—চিনি।

বলে মেয়েটি আশ্চর্য ভঙ্গিতে হাসলে। অমলার বুকের ভিতর পর্যন্ত সে হাসিতে দুলে উঠল। এ যে অবিকল তার মায়ের হাসি। মহাকালের স্রোত পেরিয়ে আবার কি তারই বিস্মৃত তরঙ্গরেখা ওর স্মৃতির ঘাটে এসে ঘা দিলে।"

* * *

নন্দরাণী রামহরির তৃতীয় পক্ষ : অমলাদের 'ছোট মা'।

"প্রথম দৃষ্টিতেই দুজনে দুজনকে ভালবেসেছিল।"

তবু—অর্থাৎ নন্দরাণীর চেহারায় অমলার মায়ের বহুল সাদৃশ্য থাকলেও নন্দরাণী কিছুতেই ওকে মা বলে ডাক্‌তে দেবে না। হিশেব করে দেখা গেছে নন্দরাণী অমলার চেয়ে ছোট। তাছাড়া বৈধব্য বা অন্য যে কারণেই হোক অমলাকে স্বাভাবিকের চেয়েও আরো বড় দেখায়। অমলা নন্দরাণীকে ডাকে বৌমা, নন্দরাণী ডাকে 'ছোট মা'। প্রথম দিনই আজন্ম মাতৃহীনা নন্দরাণী নিজেকে সঁপে দিয়েছিল অমলার মাতৃকোলে, অমলাও নিয়েছিল কোল পেতে, নিজের শাড়ি গয়না সব দিয়ে অপরূপ করে সাজিয়েছিল নন্দরাণীকে।

তাহলেও এই দুই সমবয়সিনীর "আসল এবং অন্তরের সম্পর্ক দাঁড়ালো সখীত্বে। নন্দরাণী ওকে সব কথা বলে। প্রথম প্রথম অমলা সে-সব কথা শুনতে চাইতো না, লজ্জা করত। পরে অভ্যাস হয়ে গেল। দু'জনে সে-সব কথা নিয়ে নিজেদের মধ্যে রসিকতা করতেও বাধে না। তাতে আর লজ্জাও করে না।"

অমলাই প্রতি সন্ধ্যায় সাজিয়ে দেয় নন্দরাণীকে, প্রতিদিন নূতন নূতন করে, নিজের পছন্দমত, না করবার উপায় নেই। এমন কি শুতে যাবার আগে নন্দরাণীকে রোজ হাজিরা দিয়ে যেতে হত অমলার কাছে,—দেখিয়ে যেতে হত, সব ঠিক আছে।

নন্দরাণীর ওপর অমলার এই স্নেহ রামহরির ভালোই লাগে। আবার বিব্রতও বোধ করে সে। মেয়ের সামনে আর সহজে আসতে পারে না, কথা বলতে পারে না। অমলারও হয়েছে তাই। কেবল নন্দরাণীর এতে কোনো অসুবিধা বোধ হয় না, "রামহরি তার স্বামী, অমলা তার বন্ধু।" কিন্তু অমলা মাঝে মাঝে ভাবে এ যেন ঠিক হচ্ছে না। নন্দরাণী তার মা, তার বাপের বিবাহিতা স্ত্রী, দেখতে অবিকল তার নিজের মায়ের মতো। তার সঙ্গে বয়সের বিচারে সখীত্বের সম্পর্কটা ঠিক হচ্ছে না। তাহলেও নন্দরাণীর কাছে এখানে আত্মসমর্পণ না করে তার উপায় থাকে না।

"আসল কথা দুজনে দুজনকে ভালবেসেছে। আর তাদের মধ্যেকার যোগসূত্র রামহরিকে মিলিয়ে গিয়ে সাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছে। এইটে যখন ভেবে দেখে, রামহরি কিংবা অমলা, কেউই খুশি বোধ করতে পারে না। অথচ এর জন্যে তারা কার উপর যে রাগ করতে পারে তাও খুঁজে পায় না।" এমনি করে দিন যায়।

একদিন তারা সিনেমা দেখতে গেল। সিনেমার নামে ভীষণ খাপ্পা ছিল একদা রামহরি। নতুনমা-ও কখনো এ সব পছন্দ করতেন না। কিন্তু নন্দরাণী বলতেই রাজি হয়ে টিকিট করে আনল সে একদিন। তিনজন গেল সিনেমায়,—পাশাপাশি

বসলো ;—মধ্যে নন্দরাণী, দু পাশে দুজন। "ছবি দেখতে দেখতে নন্দরাণী হাসে, কত কি পরিহাসের কথা বলে। বিপদ হল রামহরি আর অমলার। তারা কাঠের মত শক্ত হয়ে বসে থাকে।

এর পরে যেদিন আবার ওরা সিনেমায় গেল, অমলা গেল না। ভীষণ মাথা ধরেছে বলে শুয়ে রইলো।"

"অমলার কি যেন হয়েছে।"

ঠাকুর কবেই ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাঁধে অমলা,—সব কাজই সে করে। নন্দরাণী ঝগড়া করে, রাগ করে, এমন কি কথা বন্ধ করেও কিছু করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতেই হয়।

"রামহরি কাজকর্মের ফাঁকে আজকাল মাঝে মাঝেই বাড়ি আসে। অমলা তখন নন্দরাণীকে ঠেলে উপরে পাঠিয়ে দেয়। বলে, কি বলছেন, শুনে এস।

নন্দরাণী লজ্জা পায়, হাসে, কিন্তু উপরে যায়।

ফিরে এসে নন্দরাণী নিজের থেকেই বলে, কি একটা দরকারি কাগজ ফেলে গিয়েছিলেন।

অমলা হাসে। বলে, বাবা আজকাল ক্রমাগতই দরকারি কাগজ ফেলে যাচ্ছেন! পেয়েছেন তো?

নন্দরাণীও হাসে। বলে, জানি না।

অমলা উঠে এসে ওর গাল টিপে দিয়ে বলে, জানি না বললে হবে কেন? না পাওয়া গেলে আবার কষ্ট করে ফিরে আসতে হবে তো?

—আসুক।

অসীম স্নেহভরে অমলা ওর মুখখানি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কি যেন দেখলে, আপন মনেই একটু হাসলে। তারপর আবার নিজের কাজে মন দিলে।"

এমনি করেই দিন যায়। অমলার কি হয়েছে, কেউ বুঝতে পারে না। দিনে দিনে সে অবসন্ন হয়ে আসছে নিজের মধ্যে। তবু সকল কাজ জোর করেও করা চাই-ই তার। সে নিজেই বোঝে, নিজের মধ্যে সে যেন ভারি শক্ত হয়ে উঠচে,—একেবারে নতুন মায়ের মত। নন্দরাণীর কাছে সে স্বীকারও করে,—অত শক্ত হওয়া ভাল নয়। "খুব শক্ত মেয়েরা বেশি দিন বাঁচে না। আমার নতুন মা সেই জন্যেই—

নন্দরাণী ঝাঁপিয়ে উঠে ওর গাল টিপে ধরল: মুখপুড়ি যা বলতে নেই সেই কথা!

অমলা নিজেকে মুক্ত করে নিলে না! শুধু ওর রক্তহীন, শ্রান্ত চোখের কোণ বেয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

কয়েক মাসের মধ্যেই অমলা শক্ত অসুখে পড়লো!

ডাক্তার বললেন, হার্টটা। তার উপর এত টেম্পারেচার। কি হয় বলা যায় না। সামনের দুতিনটে দিন যদি কাটে, তাহলে এ যাত্রা বেঁচে যাবে।"

নন্দরাণী চেপে বসল অমলার শিয়রে অকুণ্ঠ সেবায় আত্মদান করতে। ঠাকুর রাখতে হল রামহরিকে,—নন্দরাণী একবারও আর নীচে নামবে না এই কদিন। রামহরিকেও ছুটি নিতে হয়েছে,—নন্দরাণীই নিইয়েছে।

প্রথম রাত্রে জ্বর বাড়লো, ছট্‌ফটানিও।

নন্দরাণী তাড়া দেয় 'সিবিল সার্জেনকে ডাকো!' রামহরি দ্বিধা করে। ১৬ টাকা ফি, রাতের বেলা বত্রিশও হতে পারে। নন্দরাণী বলে টাকার অভাব হবে না,—"সুরেশকে দিয়ে আমি সেই তোমার দেওয়া নতুন হারগাছা বিক্রি করেছি, সকালে ডাক্তার এসে যখনই বললে।"

সিবিল সার্জন এলেন, রোগী দেখে প্রেস্‌ক্রিপশন করে টাকা নিয়ে গেলেন।

ভোরের দিকে ছট্‌ফটানি একটু কমল। জ্বরও।

"অমলা একবার চোখ মেলে চাইলে। অস্ফুট স্বরে বললে, বৌমা!

নন্দরাণী ওর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বললে, এই যে আমি! একটু ভাল বোধ হচ্ছে?

সে কথায় অমলা উত্তর দিলে না। বললে, আমার গহনাগুলো তোমাকে দিলাম।

একটু পরে বললে, তোমায় বলেছি না, শক্ত মেয়েরা বেশিদিন বাঁচে না! দেখলে তো।

—আবার সেই কথা বলছ।

অমলা আবার বললে, গহনাগুলো পোরো। দুঃখ করো না। বাঙালির ঘরের বিধবা মেয়ে, তার জন্য দুঃখ করতে নেই।

সে চোখ বন্ধ করলে।

একটু পরে আবার বললে, সুরেশ কোথায়? ছেলেরা?

ওরা দিদির কাছে এসে দাঁড়ালো।

—বাবা কই?

রামহরির গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল। একটা কথাও সে বলতে পারলে না।

অমলা ওর দিকে চাইলে। হঠাৎ তার চোখ যেন ঝলমল করে উঠলো। ঠোঁটের কোণে একটুখানি বাঁকা হাসি খেলে গেল।

তারপরে চোখ বন্ধ করলে।

সেইদিন দুপুরে অমলার বৈধব্য জীবনের অবসান হল।"

গল্পের এই পরিকল্পনায় যে দৃঢ়তা, যে দুঃসাহস স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়েছে, অবহিত মনে তার অনুধাবন করলে স্তম্ভিত না হয়ে উপায় থাকে না। পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ় পিতার সম্ভোগ-বাসনা ও যৌন লুব্ধতার প্রত্যক্ষ পরিচয় তারই তৃতীয়পক্ষের বিবাহিতা যুবতী পত্নীর সখীত্ব-মাধ্যমে আবিষ্কার করার অকল্পনীয় অভিজ্ঞতা ব্যর্থযৌবনা বিধবা কন্যার জীবনে কত দুঃসহ, কত রূঢ় দুর্ভাগ্যের আকর, তা সম্পূর্ণ করে ভেবে ওঠাও কঠিন। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের পরিচিত রক্ষণশীল জীবনগণ্ডিতে, একান্ত স্বাভাবিক হলেও অন্ধ সংস্কারের পীড়নে জড়প্রায় গতানুগতিক পিতৃভক্তির নির্মোক মোচন করে এই জীবন-চিত্রণের দুঃসাহস সমসাময়িক কালের 'আধুনিকোত্তম'দের পক্ষেও কষ্ট-কল্পনীয়। শুধু তাই নয়,—পিতা-মাতা-কন্যা ইত্যাদি সামাজিক মূল্য-চেতনার মহৎ আবরণ ভেদ করে নরনারীর আদিম রূপটিরই ক্রম-অভিব্যক্তির এক মনস্তত্ত্বসম্মত বাস্তব রূপমূর্তি গড়ে তুলেছেন সরোজকুমার এখানে classical শিল্পশক্তির অমোঘ দার্ঢ্যে। এই প্রসঙ্গে গোকুল নাগের পূর্বালোচিত 'মা' গল্পের কথা স্মরণ করা যেতে পারে,—সেই দৃষ্টিতে এ-গল্পের নাম হয়ত হতে পারত 'নন্দিনী'!—'মা' নিছক lyric,—কিন্তু 'তৃতীয় পক্ষ' একটি প্রগাঢ় epic—পরপর তিনটি শ্রেষ্ঠ গল্প-শিল্পীর প্রসঙ্গে epic-শৈলীর কথা উত্থাপিত হয়েছে। শৈলজানন্দ, তারাশঙ্কর এবং সরোজকুমারের প্রকাশ-প্রকরণে আপেক্ষিক সাদৃশ্যের উপকরণ রয়েছে নিশ্চয়ই—তাহলেও মৌলিক পার্থক্যের উপাদানও কিছু কম নেই; আর এই কারণেই নিজ নিজ সৃজন-ভূমিতে এঁরা প্রত্যেকেই স্ব-তন্ত্র। শৈলজানন্দের গল্প-শৈলীতে আছে এপিক-শিল্পীর নির্লিপ্তি ও আত্মসংহরণ। তারাশঙ্করের গল্পে মহাকাব্যধর্মী বিষয়-কাঠিন্য (massiveness), নাট্যগুণান্বিত অভিব্যক্তি ও সহজ কবি-স্বভাব আড়ম্বর সহকারে প্রকাশ পেয়েছে। সরোজকুমারের প্রকাশভঙ্গিতে classical শিল্পীর আত্মসংহরণ আছে, কিন্তু শৈলজানন্দের মত আত্মগোপনচারী নন তিনি। প্রতিটি গল্প-বিষয়ের মূলে শিল্পি-ব্যক্তির একান্ত জীবন-অনুভবের স্পর্শ তো রয়েইছে, সেই সঙ্গে আছে একটি করে জীবন-বাচ্য। উচ্চকণ্ঠে সেই বক্তব্য ঘোষিত হয় নি কখনোই সরোজকুমারের গল্পে। গল্পের শরীরে,—প্লটের সর্বাঙ্গ ঘিরে সেই বক্তব্যকে তিনি সুপরিস্ফুট করে তুলেছেন। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' ব্যবহৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দপ্রসঙ্গে

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'প্রগাঢ় ও প্রযত্নোচ্চারিত' শব্দ দুটি প্রয়োগ করেছিলেন,— সরোজকুমারের গল্পেও প্লটের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তেমনি 'প্রগাঢ় ও প্রযত্নোচ্চারিত'; —প্লটের সর্বাঙ্গ আমূল কেটে-কুঁদে যেন শিল্পী তার দেহে নিজের জীবনানুভবকে স্পষ্টোচ্চার গাঢ়তা দান করেছেন। এই গল্পের কথাই বলি,—পুরুষের লীলা-বিলাসের পাশে বিধবা যুবতী-নারীর তিলে তিলে আত্মনাশের যে মর্মন্তুদ চিত্র শিল্পী গড়ে তুলেছেন,—যেখানে পুরুষ ব্যক্তিটি স্বয়ং প্রৌঢ় পিতা আর যৌবনবঞ্চিতা বিধবা তারই প্রথম পক্ষের কন্যা,—সেখানে গল্পের ঐ সমাপ্তি-ছত্রটিকে কি নামে অভিহিত করব! শেষ বারের মত চোখ বোঁজার আগে বাপের অপরাধী মুখের দিকে তাকিয়ে অমলার চোখ 'ঝলমল' করে উঠেছিল, ঠোঁটের কোণে খেলে গিয়েছিল 'একটুখানি বাঁকাহাসি' —সে কি ব্যঙ্গের, কৌতুকের,—না আর কিছুর?—কিন্তু তারই প্রেক্ষিতে গল্প-সম্পর্কে শিল্পীর প্রদত্ত শেষ তথ্যটি,—"সেইদিন দুপুরে অমলার বৈধব্য জীবনের অবসান হল।"—এই একটিমাত্র বাক্যের মধ্য দিয়ে শিল্পি-চেতনার অন্তরনিহিত যে জীবনযন্ত্রণার প্রগাঢ় প্রযত্নোচ্চারিত অভিব্যক্তি ঘটেছে, তাকে বিদ্রূপ বললেও যেন কিছুই বলা হয় না,—এই যথার্থ-বর্ণনে যে প্রচণ্ড অনুভবের প্রকাশ তা সার্‌কাসম্-এর সমপর্যায়ভুক্ত,—স্যাটায়ার-শিল্পের তীব্র আত্মপ্রক্ষেপণ উৎকট আকারে গল্পের শরীরে আরূঢ় হয়ে তার মৌলিক সংহতিকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। অনুভূতি-তীক্ষ্ণতার প্রতিফলনে এই সহজ আত্মসংহরণ,—এবং সুসংহত প্লটের শরীরে বক্তব্যকে বস্তুনির্ভর (objective) সম্পূর্ণতা দানের সংযম-দৃঢ়তাকেই সরোজকুমারের classical রীতি বলে অভিহিত করতে চেয়েছি।

পারিপার্শ্বিক জীবনের অসংগতি ও অস্বাভাবিকতার প্রতি দৃষ্টি তাঁর অতি প্রখর। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে 'নবশক্তি', 'অভ্যুদয়' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গেও শিল্পী যুক্ত ছিলেন। সাহিত্য-সাংবাদিকের মত তাঁর সমকালীন তথ্য-চেতনা অতন্দ্র। আর শিল্পী হিশেবে সরোজকুমারের অভ্যুদয় এক ক্রান্তি লগ্নে; ফলে অসাম্য অসংগতি এবং ভঙ্গুরতার ছবিই হয়ত বেশি চোখে পড়েছে। প্রয়োজনবোধে সংস্কারমুক্ত মনে তাদের সকলের প্রতিই 'সারকাজম্'-এর অনতিস্ফুট প্রগাঢ় অভিঘাত নিক্ষেপ করেছেন তিনি। গ্রামজীবনের স্নিগ্ধ পরিবেশের সঙ্গে সরোজকুমারের আত্মার যোগ নিবিড়। তাহলেও গ্রাম্য কুসংস্কার ও অন্ধ ভক্তিকে ক্ষমা করেন নি কখনো। 'ব্যাঘ্রদেবতা' গল্পে তার এক কৌতুককর নক্সা-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এক বাঘের আকস্মিক আবির্ভাব উপলক্ষ করে একটি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তসীমার মধ্যে একটা গোটাগ্রামের সামগ্রিক বস্তুসমৃদ্ধ জীবন্ত জীবনমূর্তি যেন গড়ে তুলেছেন শিল্পী। সেখানেও গল্পের

শরীর প্রগাঢ় এবং প্রযত্নগঠিত। অবশেষে সারাটি গ্রামকে সারাদিন ভুগিয়ে, অনেক দুর্ঘটনার নায়কত্ব করে বাঘটি যখন প্রত্যাশাতীত অনায়াসে মৃত্যুর কাছে আত্ম-সমর্পণ করল, তখন জানা গেল, আগে থেকেই 'বসন্ত' হয়ে সে অর্ধমৃত হয়েছিল, তা না হলে অত সহজে, অত অল্পেই তার বিনাশ ঘটানো সম্ভব হত না।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়, ব্যাঘ্রজীবনের অবসানে সারাটা পল্লী উল্লসিত,—তার মৃতদেহ একটি মহিষের গাড়ীতে চাপিয়ে সারা গ্রাম পরিক্রমা করে ফেরা হল,—আবালবৃদ্ধবনিতার সে কি উদ্দীপনা! সন্ধ্যার আলো-আঁধারি আবছায়ায় বাঘের গাড়ি এসে পৌঁছালো চাটুয্যেদের বাড়ির সামনে। প্রৌঢ়া চাটুয্যেগিন্নি একঘটি জল ঢেলে দিলেন মরা বাঘটির 'শ্রীচরণে', বললেন কোন্ শাপভ্রষ্ট দেবতা শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন, সে খবর অপরে না রাখুক, তিনি তো জানেন! হরিহর ঠাকুরের স্ত্রী চাটুয্যে-বাড়িতে এসেছিলেন বাঘের মজা দেখবেন বলে। তিনিও চাটুয্যেগিন্নির অনুকরণ করলেন এবার। আর যায় কোথা! ছোঁয়াচে রোগের মত সারাটি গ্রামে কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়ল,—নিহত বসন্তরোগগ্রস্ত বাঘ পরিণত হল 'ব্যাঘ্র দেবতায়'—সে এক কৌতুক চিত্র,—কৌতুকের লঘুচালে যা রচিত হয় নি মোটেই,—গড়ে উঠেছে সরোজকুমারের স্বভাবসিদ্ধ প্রগাঢ় প্লট্-শরীরের সহজ আধারে।

এই তির্যক দৃষ্টিভঙ্গিকে যদি সেকালের মূল্যবোধের অনুসারে বলি 'আধুনিকতা'—তাহলেও দেখব, বিষয়বিন্যাসে এবং পরিকল্পনাতেও সরোজকুমার তথাকথিত 'আধুনিক'ই ছিলেন না কেবল,—সেই আধুনিকতার অন্তরেও যেখানে অসংগতি আর বন্ধন, প্রয়োজনস্থলে তার প্রতিও 'সারকাজম্'-এর কুলিশ নিক্ষেপ করেছেন স্বভাব-গাল্পিকের নিরুত্তপ্ত সরস-সংযত ভঙ্গিতে। এখানেই তিনি 'আধুনিক'দের থেকেও স্বতন্ত্র।—না আবহমান গ্রামীণতায়,—না শহুরে আধুনিকতায়, তাঁর শিল্পি-মন কোথাও কোনো চড়ায় আটক পড়ে নি। শুধু তাই নয়, অসংগতি আর অস্বাভাবিকতার রসস্নিগ্ধ রূপায়ণে কখনোই স্যাটায়ারিস্ট-এর মত তীব্রভাবে আত্মপ্রক্ষেপণও ঘটান নি তিনি, কচিৎ কখনো বরং রচনায় হিউমারিস্ট-এর নির্দোষ কৌতুকানুভবের মাধুর্য বিচ্ছুরিত হয়েছে,—কিন্তু তাও প্রযত্নগঠিত প্লটের শরীর-সীমাকে ছাপিয়ে নয়।

দৃষ্টান্ত হিশেবে 'আধুনিক কপালকুণ্ডলা' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে,—এম্.এ. পরীক্ষার পর শ্রীকুমারের হাতে এখন আর কিছু কাজ নেই, তাই বাড়ি বসেই ছিল। এমন সময়ে সপ্তসন্তানবতী বৌদির, "অকস্মাৎ পিত্রালয়ে আসবার কি প্রয়োজন হয় তিনিই জানেন।" 'বেকার',—অতএব, বৌদির ইচ্ছায় শ্রীকুমারকেই তাঁকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিতে হয়েছে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে,—আকাশে অনাগত বর্ষার নিবিড় সম্ভাবনা,—এমন সময় নারীকণ্ঠে মধুর জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হয়ে ওঠে,—"পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ।"

স্থান অবশ্য নির্জন সমুদ্রতটবর্তী অরণ্যভূমি নয়,—শশিশেখর, অর্থাৎ শ্রীকুমারের বৌদির পিতৃদেব শশিশেখরের সাতপুরুষের ভিটা।

নবকুমারের ইচ্ছানুক্রমে কপালকুণ্ডলা তাকে পথ দেখিয়ে কাপালিকের সন্নিধানবর্তী হতে সাহায্য করে। কাপালিক তখন শিশুসন্তানকে স্তন্যদানে ব্যস্ত ছিলেন। এবার বেশবাস বিন্যস্ত করে উঠে বসলেন। কপালকুণ্ডলা, নবকুমার ও কাপালিকের পরস্পর-বাচনে ক্রমশ শ্রীকুমারকে এখানে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়ে উঠল। 'কপালকুণ্ডলা'র বি. এ. পরীক্ষা হবে আর সাত মাস পরে। কিন্তু কাপালিক নবকুমারকে বলেন,—অধুনা, 'ব্রাহ্মণ বটু পাওয়া বড় কঠিন।' অতএব "কপালকুণ্ডলার পরীক্ষা হইয়া গেলেই তোমাকে ভগবান প্রজাপতির নিকট বলি দেওয়া হইবে।"

শুনে ত 'শ্রীকুমারের চক্ষু কপালে উঠল'! মিনতি করে সে বললে, "কিন্তু আপনি কি জানেন না, বাঙালি যুবকের চেয়ে অসহায় প্রাণী পৃথিবীতে আর নাই? বাংলার মাটিতে আর শস্য ফলে না, পুকুরে আর মৎস্য জন্মে না, গাছে আর ফল পাকে না, গরুর বাঁটে দুধ শুকাইয়া গিয়াছে। সর্বশেষে আফিসে আফিসে তাহার সর্বশেষ এবং একমাত্র উপজীব্য চাকুরীর যে রূপার ফসল ফলিত তাহাও আর ফলে না। এরূপ অবস্থায় ভগবান প্রজাপতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার তাহার শক্তি কোথায়?"

কিন্তু এসব কথায় কাপালিকের ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর ধারণা—কপালকুণ্ডলার "পুণ্যে সুদুর্লভা চাকুরিও" মিলে যেতে পারে শ্রীকুমারের। ফলে উভয়ের মধ্যে বাদানুবাদ চলতেই থাকে।

কিন্তু "কপালকুণ্ডলা এইবার উস্‌খুস্ করতে লাগল। দাঁড়িয়ে উঠে সবিনয়ে বললে, 'মহাভাগ! আপনার কারণ পানের সময় সমুপস্থিত। অনুমতি করুন, চৈনিক পাত্রে আপনার জন্য কারণ লইয়া আসি। আপনার কণ্ঠ শুষ্ক এবং চক্ষু আমীলিত হইয়া আসিতেছে। মুহুর্মুহুঃ জৃম্ভনও উঠিতেছে দেখিতে পাইতেছি।"

কপালকুণ্ডলা চলে গেল। ইতিমধ্যে শ্রীকুমারের সকল প্রতিযুক্তিকে কেবল অন্ধ ইচ্ছার ফুৎকার-বেগে উড়িয়ে দিয়ে কাপালিক স্ব-প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। অতএব পান-পাত্রসহ কপালকুণ্ডলার পুনরাবির্ভাব মাত্র তাকে নিজসিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করে তার অভিমত জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

শ্রবণমাত্র কপালকুণ্ডলা ঘোরতর আপত্তি করে ওঠে। ফলে উভয়ের মধ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তি চলতে থাকে:

বিস্মিত কাপালিক জিজ্ঞেস করেন—

—"কেন ?

—আপনি মার্লিন ডিয়েট্রিকের নাম শুনিয়াছেন ?

—নর্মা শিয়ারারের।

—না।

—গ্রেটাগার্বোর ?

—না।

—তাহা হইলে বুঝিবেন না।

—বুঝিতে বাধা কোথায় ?

—বাধা এইখানে যে, সেদিন আর নাই। এখন একটা বাড়িতে নূতন বর আসিলে পাড়ার সমস্ত মেয়ে আহার নিদ্রা বন্ধ করিয়া সেইখানে পড়িয়া থাকে না। এখন আর স্বামীকে দেবতা, বিবাহকে জন্মজন্মান্তরের বন্ধন এবং প্রেমকে অবিনশ্বরও মনে করে না।

—কি মনে করে তবে ?

—এখন স্বামীকে মানুষ কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে অমানুষই মনে করে। বিবাহকে মনে করে আইনসঙ্গত স্বৈরিণীবৃত্তি। আর প্রেমের কথা আমার মুখ হইতে নাই শুনিলেন।

—তবু শুনিয়া রাখি।

—আমাদের কাছে প্রেম প্রজাপতির মত।

—সে কি প্রকার ?

—অর্থাৎ খানিকটা রূপ ও রঙ্গ।

—আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও।

—তাহা হইলে বলিতে হয় চক্ষের পলক পড়িতে যতটুকু সময় লাগে প্রেমের পরমায়ু তাহার চেয়েও অল্প।

কাপালিক কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে নিষ্পলক নেত্রে কপালকুণ্ডলার দিকে চেয়ে রইল। তৎপর বললে, 'তাহা হইলে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াইল।'

কপালকুণ্ডলা বললে, বিবাহ হইবে না।

—তাহার অর্থ ?

—তাহার অর্থ এই যে, সেকালের কপালকুণ্ডলা পথ দেখাইবার ছলে নিজে পথ

হারাইয়া যে ভুল করিয়াছিল, এবং শেষ পর্যন্ত নদীগর্ভে প্রাণ বিসর্জন দিয়া যাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল, একালের কপালকুণ্ডলারা সে ভুল করিতে চাহে না।

—তবে কি করিতে চাহে ?

—নবকুমারকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে চায়—সিনেমা দেখিবার সঙ্গিভাবে। স্বামিভাবে নয়। কিন্তু আপনার কারণবারি .য শীতল হইয়া গেল প্রভু। আর একপাত্র লইয়া আসিব কি ?

—আর প্রয়োজন হইবে না। আমার প্রাণ এমনিতেই শীতল হইয়া গিয়াছে। তাহা সহজে গরম হইবে বলিয়া মনে হয় না।

কাপালিক স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।”

‘তৃতীয় পক্ষ’ গল্পের জীবনবেদনা প্রগাঢ়,—বর্তমান কাহিনীতে আধুনিক জীবনের অসংগতি-চিত্রণের চাল লঘু,—কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পীর আত্মসংযম, বিষয়নিষ্ঠা, বাগ্‌ভঙ্গির ঋজুতা ও নিয়মানুবর্তিতার গুণে প্লটের শরীরে এক ক্লাসিকাল প্রগাঢ়তা গড়ে উঠেছে ;—আর সেই সঙ্গে নিহিত রয়েছে শিল্পি-চেতনার অনাবিষ্ট এক মুক্তি,—গ্রাম-শহর, প্রাচীন-আধুনিক-নির্বিশেষে সকল কিছুর যথার্থ মূল্য রচনায় যার স্বচ্ছ দৃষ্টি। সর্বোপরি রয়েছে সমসাময়িক জীবনানুরাগের তন্ময়তার সঙ্গে কালের অনপেক্ষিত প্লট-গঠনের আশ্চর্য কলাকৌশল। এই সব কিছু মিলেই সরোজকুমার রায়চৌধুরী অনেক দিক থেকেই তাঁর যুগের অনেকের সান্নিধ্যবর্তী হয়েও সকলের থেকে অনন্য-স্বতন্ত্র এক শিল্পি-ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

এঁর গল্প-সংকলন গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে,—‘মনের গহনে’ (১৯৩৩), ‘দেহযমুনা’ (১৯৩৩), ‘ক্ষণবসন্ত’ (১৯৩৪), ‘শ্মশানঘাট’ (১৯৩৪), ‘বহ্ন্যুৎসব’ (১৯৩৭), ‘রমণীর মন’ (১৯৬০), ‘সন্ধ্যারাগ’ (১৯৬১) ইত্যাদি।*

প্রবোধকুমার সান্যাল

“সত্যকার লেখক যারা, তারা বুঝতে পারে,—না লিখে তাদের উপায় নেই, না লিখলে তাদের চলবে না—লিখতে পারলে তবে তারা সুস্থ বোধ করে। কালি, কলম, কাগজ, না পেলে তারা নখের আঁচড়ে লিখবে দেয়ালে কিম্বা নিজের শরীরের মাংসের ওপর। লিখ্‌লে তবে তাদের মুক্তি।”—

নিতান্ত কিশোর কাল থেকেই লেখার মত্ত নেশা রক্তে দোলা দিয়েছিল। কিন্তু কালে কালে পরিবার-পরিবেশের বাধা হয়ে ওঠে প্রখর—সচেতন। তাহলেও ভূরি ভূরি

* গল্প সংকলন গ্রন্থগুলির কালানুক্রমিক পরিচয় শিল্পীর দাক্ষিণ্যে প্রাপ্ত।

লেখার ভিড় কেবলই জমে ওঠে নিরুদ্দেশ প্রেরণার আত্মপীড়নের ফলে। পুরোনো গল্পের স্তূপ তাই নিজের হাতেই পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে হয় কদিন পর পর। তবু—

"গল্প আমাকে লিখতেই হবে, নইলে আমি যন্ত্রণা বোধ করি।"

কিন্তু কি নিয়ে লেখা হবে গল্প !—কিসের এ আত্মমন্থন !

"প্রায় লেখকেরা সাধারণতঃ গল্প অথবা কবিতা লিখতে গিয়ে প্রণয়কাহিনী দিয়ে আরম্ভ করে। আমি কোন প্রণয়কাহিনী ভাবতেই পারতুম না। আমার ভাল লাগতো, ভাই, বোন, বন্ধু আদর্শবাদী স্বার্থত্যাগী—এদের নিয়ে কল্পিত কাহিনী লিখে যেতে। ওইতেই আমি আনন্দ পেতুম। গল্প লেখার জন্যেই গল্প লেখা—এই চলতি বুলি আমার ভালো লাগতো না। যে গল্পটা নিছক একটা গল্পই হলো, তার থেকে আর কিছুই পাওয়া গেল না—তেমন গল্প ছিল আমার দুচোখের বিষ। একটা আদর্শ, একটা ব্যঞ্জনা, একটা কোন দুরূহ ভাবনার পথ—এ যদি সব গল্পের মধ্যে না থাকে, তবে গল্প লিখে লাভ কি ?

…আমি ভাবলুম মানুষের হৃৎপিণ্ডের রক্তের ধারা যে লেখায় ছোটে নি, তাকে কিছুতেই সাহিত্য সৃষ্টি বলা চলবে না। আমি সেজন্যে পথে ঘাটে গল্প খুঁজে বেড়িয়েছি—স্টীমার ঘাটে, চটকলের ধারে, রেল স্টেশনে, বিদেশের ধর্মশালায়, মফঃস্বলে ওয়েটিংরুমে তীর্থপথের মেলায়—আমি গল্পের বিষয়বস্তু খুঁজে পেতুম।"[৬০]

নিজের গল্প-রচনার প্রাথমিক পর্যায়ের এই ইতিহাস বিবৃত করেছেন প্রবোধ সান্যাল (জন্ম—১৯০৫) নিজে। উদ্ধৃতি হয়ত দীর্ঘ হল। কিন্তু আত্মকথার বক্তব্যে—অসংজ্ঞানভাবে হলেও—এমন সার্থক আত্মসমালোচন একালের সাহিত্যসমাজে দুর্লভ। প্রবোধকুমারের দোষে-গুণে-বিমিশ্র শিল্পস্বভাবের এক নিটোল সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব আভাসিত হতে পেরেছে এই স্মৃতিচারণের মধ্যে ; খুঁটিয়ে দেখলে তাঁর সৃষ্টি-ধর্মের সকল উপকরণেরই অল্প-বিস্তর পরিচয় এতে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

বুদ্ধদেব বসু প্রবোধকুমাকে বলেছেন 'প্রকৃতির নিজস্ব গদ্যলেখক' ("Nature's own prose-writer")।[৬১] গদ্য শৈলীর প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হতে পারবে। কিন্তু মৌলিক রচনা-স্বভাবেও প্রবোধকুমারের প্রতিভা প্রকৃতির মতই স্বতঃস্ফূর্ত ও আবেগ-উদ্দামতায় অস্থির। গল্প লেখা নিছক ব্রত বা পেশা নয়—নেশাও ; এদিক থেকে প্রতিভা তাঁর passionate ; কাগজ কলম না পেলে নিজের নোখে নিজের চামড়া কেটে লিখে যেতে হত তাঁকে—একথায় অতিশয়োক্তি খুব নেই।

৬০। জ্যোতিপ্রসাদ বসু (স)—'গল্পলেখার গল্প'।
৬১। দ্র. B. Bose—'An Acre of Green Grass'.

স্বষ্টির দুর্দম পিপাসাভরা এই অস্থির উচ্ছ্বাস-প্রসঙ্গে নজরুল ইস্‌লামের কথা মনে পড়তে বাধা নেই ;—প্রবোধকুমারের ব্যক্তিত্ব ততটা আত্ম-অতিক্রমী বা অসংবৃত নয় নিশ্চয়ই। তাহলেও যে অনিবার্য প্রেরণার যন্ত্রণায় তাঁকে লিখতেই হয়, সেই দুরন্ত তাড়নাতেই ভেবে গুছিয়ে লিখবার অবকাশ শিল্পীর চেতনায় সুপ্রচুর হতে পারে না। এদিক থেকে কেবল ভাষা-প্রকরণেই নয়, প্লটের গঠনে এবং বাগ্‌ভঙ্গির বৈচিত্র্য-বিন্যাসেও প্রবোধ সান্যালের গল্প-উপন্যাসে বিস্রস্ততা খুব কম নেই। এক বিশেষ তাৎপর্যে তিনি লেখবার জন্যেই লিখে থাকেন।—কি লিখছেন, কেমনভাবে লিখছেন, বিশেষভাবে তা অনুধাবন না করেই লিখে চলেন ;—কেবল না লিখবার উপায় নেই বলেই।

সন্দেহ নেই, সকল সার্থক স্বষ্টিই আসলে অসংজ্ঞান মনের কর্ম ;—ক্রৌঞ্চ-মিথুনের বেদনায় বিগলিতচিত্ত আদি-কবিও নাকি স্বষ্টি-সমুত্তর চেতনার তীরে উপনীত হয়ে সবিস্ময়ে ভেবেছিলেন,—"শোকার্তেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া।" তাহলেও স্বষ্টির মৌল লগ্নে স্রষ্টা নিজের মধ্যে যুগলরূপে বিরাজ করেন। স্বজনলোকের শীর্ষবিন্দুতে আরোহণ করে তাঁর একটি সত্তা ধ্যানে-কর্মে স্বতঃস্ফূর্ত রূপরচনার আনন্দে তন্ময় হয় ;—আর একজন থাকে সাক্ষী হয়ে। এই দ্বিতীয় জনের প্রখর জাগ্রত দৃষ্টিই স্বপ্নাতুর রূপকারের কণ্ঠে—তাঁর লেখনীতে সমুচিত উপকরণের সম্ভার যুগিয়ে থাকে থরে থরে। স্রষ্টা তাঁর নিজের আনন্দে স্বষ্টির হাতিয়ার চালিয়ে যান আপন মনে,—হাতের কাছে যা-কিছু আসে, তাই নিয়ে গড়ে তোলেন নতুন ইমারত।—কিন্তু সাক্ষী যে, নিরলস অতন্দ্রতায় একের পর এক যোগ্যতম কথার সম্ভার, বক্তব্যের সঞ্চয়, কল্পনার মধুরিমায় পাত্র ভরে স্রষ্টার সামনে ক্ষণে ক্ষণে সে তুলে ধরে সমুচিত লগ্নে, সিদ্ধতম পরিবেশে। ইমারত হয় সুঠাম, প্রাঞ্জল,—প্রসঙ্গ ও প্রকরণে সুরেখ-সুষমায় সমুজ্জ্বল হয়। প্রবোধ সান্যালের শিল্পি-আত্মায় স্রষ্টার দুর্বার শক্তিপ্রাচুর্য সহজ-সচেতনতার গহনে এত বাঁধ-ভাঙা—আত্মসমাহিতির অতলে এমন বিবশ বিহ্বল যে, তাঁর সাক্ষিসত্তা স্বষ্টির লগ্নে প্রায়ই যেন নেপথ্যবর্তী হয়ে থাকে। তাই স্বষ্টিতে তাঁর শক্তির উদ্দামতা ; যদিও তার সবটুকুই সুপরিকল্পনায় বিন্যস্ত নয়। ঝড়ের বেগে লিখতে গিয়ে প্লট-এ রহস্য-মেদুর অস্পষ্টতা থেকেছে কখনো, কখনো উপকরণের বাহুল্য জমে উঠেছে, পরিমিতি ও পরিচ্ছন্নতায় সুরেখা-বলয়িত নয় তাঁর সহজে সমৃদ্ধ প্রতিভার দীপ্তিপ্রাচুর্য ; এমন কথা বুদ্ধদেব বসুও ভেবেছেন। সন্দেহ নেই, 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্রিকার অক্লান্তকর্মা লেখক ছিলেন একদা প্রবোধ সান্যাল। তবু এখানেই 'কল্লোল-' শিল্পীদের থেকে তাঁর প্রথম পার্থক্য। অর্থাৎ, প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবের শৈলীতে 'কল্লোল'-স্বভাবের যে প্রকাশ, তা বিষয়ের মত রীতি-সচেতনও ; কোনো কোনো

ক্ষেত্রে রীতি-সচেতনতা বা বাগ্‌বিধির সুকল্পিত বিন্যাস-প্রচেষ্টা এই পরোক্তদের রচনায় একমুখী তীব্রতায় যেন convention-এর আকার ধরেছে। এক অর্থে এই শ্রেণীর শিল্পিগোষ্ঠীকে sophisticated বলা যেতে পারে। ফলে প্রয়োগ-প্রকরণ সম্পর্কে প্রবোধকুমারের নিরুদ্বেগ ঔদাসীন্য ও স্বেচ্ছাস্ফূর্তিকে বুদ্ধদেব 'প্রাকৃতিকতার' সঙ্গে তুলনা করতে চেয়েছেন দেখে বিস্মিত হবার কারণ নেই।

অন্যপক্ষে নজরুল ইস্‌লাম, অথবা যুবনাশ্বের মত শিল্পীর রচনায় প্রয়োগ-কর্মের বিস্রস্ততা কখনো কখনো আরো অনেক বেশি একান্ত হয়ে উঠতে দেখা যায়। অথচ তা-সত্ত্বেও এঁরা 'কল্লোল'-এর অন্তরলোকের সহচর। সে পথে এঁদের শ্রেষ্ঠ পাথেয় জীবনচিন্তনের সদৃশতা—নরনারীর দেহ-মন-মন্থিত রহস্য সন্ধানের ব্যাকুলতা নিয়ে নগ্ন শারীর জীবনের যে পথে এঁরা চলাফেরা করেছেন! কিন্তু প্রবোধ সান্যাল তীব্র সচেতনতা সহকারেই যেন সে পথেও সঙ্গী হন নি তাঁদের। নিজেই বলেছেন—একেবারে প্রথম থেকেই কোনো প্রণয়কাহিনী ভাবতেই পারতেন না তিনি। এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের স্বীকারোক্তি মনে পড়ে;—স্বনির্বাচিত গল্পের ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন 'প্রেমের গল্প' রচনার প্রতি তাঁর অন্তরের প্রবণতা কুণ্ঠিত। প্রবোধ সান্যাল কিন্তু প্রণয়সম্পর্ক নিয়ে উত্তরকালে গল্প-উপন্যাস লিখেছেন প্রচুর; তবু যৌন জীবন-চিন্তনের আতিশয্যের প্রতি তাঁর স্বভাববিমুখতা কচিৎ বিচলিত হতে দেখা যায়। 'ভাই, বোন, আদর্শবাদী, স্বার্থত্যাগীদের' নিয়ে গল্প-কল্পনা করাতেই তাঁর শিল্প-প্রকৃতির মৌলিক আকাঙ্ক্ষা;—নারী প্রায়ই তাঁর সৃষ্টিতে হয় 'দিদি', নয় 'প্রিয় বান্ধবী' হয়েই দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়োক্ত নামে প্রবোধ সান্যালের লেখা উপন্যাস জনপ্রিয়তায় শীর্ষবর্তী হয়ে আছে। প্রথমোক্ত নামের তাঁর একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল দ্বিতীয় বার্ষিক 'কল্লোল'-এর দ্বিতীয় সংখ্যায়। প্রথম বছরেই (মাঘ সংখ্যা) 'মার্জনা' নামে একটি গল্প তিনি লিখেছিলেন ঐ পত্রিকায়। তাহলেও বীজের মধ্যে মহীরুহ-সম্ভাবনার মত প্রবোধ সান্যালের গল্প-প্রকৃতির মৌল স্বভাব প্রথমোক্ত গল্পটির মধ্যে নানাদিক থেকেই আত্মগোপন করে রয়েছে:—

"স্নেহের আবেগে ছোট ভাইটিকে সহস্র চুম্বন দিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মানসী কক্ষের চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিল—ভোগ-বিলাসের কি সুন্দর বিবিধ সামগ্রী, সকল স্থানে কি সুন্দর অর্থের চাকচিক্য। বিদ্রূপ উপহাসের তিক্ত হাস্য মানসীর মুখে ফুটিয়া উঠিল। জীবনের সব সুখ বিসর্জন দিয়া স্বর্ণ-কিরণোজ্জ্বল বাসন্তী প্রভাতে পিকবধূর আকুল চীৎকারে প্রাণের সাড়া তুলিয়া সে অর্থের প্রাচুর্যের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছে!......কিন্তু এ তৃপ্তি, না উৎকট গোপন

ব্যথা ?......এ শান্তি না প্রলয়ের প্রভঞ্জন তার অন্তরের মধ্যে লুক্কায়িত ?......

'মণ্টু, কেন আমায় এত স্নেহে বেঁধেছিস্ রে ?'

মণ্টু 'মাতৃপিতৃহারা অনাথ বালক' ;—মানসী তাকে ধরে না রাখলে "প্রকৃতির দুর্যোগের মধ্যে এতদিন কোথায় হারাইয়া যাইত।" এই বঞ্চিত নিষ্পাপ প্রাণটিকে বুকের স্নেহ-আদর অজস্র ধারায় ঢেলে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে "গেলই বা তার জীবনের সব সুখশান্তি, হলই বা তা পথপানে চাওয়া উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের অশ্রুভাঙ্গা করুণ কাহিনী।"... "নিবিড় আঁধারে সুপ্ত জগৎটার বুক চিরে-পড়া উল্কার মত সে অন্য কোন আলোক দেখিতে চায় না।"...

হয়ত মানসী ডুবে গিয়েছিল এমনি অকূল ভাবনার পাথারে [গল্পে সে বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত নেই]।

" 'মানসী'—

মধুর ডাক। মানসী ফিরিল। কিন্তু তার কৃতজ্ঞ দৃষ্টি অবনত হইয়া আসিল।—হাঁ, এঁরই দয়ায় করুণায় আজ সে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবার পরিবর্তে প্রাসাদের বুকে বসিয়া রহিয়াছে।

'কি বলুন বিমলবাবু ?'

বিমল মদ্যপানের ঘোরে টলিতেছিল। বলিল, 'হাঁ বলছি, জানত মানসী তোমায় আমি কি বলেছি' ?

সন্ধ্যার রক্তিমাসুন্দর আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে মানসী—কি উত্তর দিবে সে ? অনাথিনী, আশ্রিতার ভালবাসা ! সে ত ব্যভিচার !......

অতএব,......"

বিমল—স্বভাবসুন্দর বিমল মদ খায়, খেয়ে নিজের সর্বনাশ করে, ভুলবে বলে। নেশা সব ভোলায়।—কেবল একটি অনুভব কিছুতেই ভুলতে পারে না—কাঁটার মত নেশার গভীরেও হুলের যন্ত্রণা বিঁধে !

বিমল আজও করুণ প্রশ্ন করে,—চরম প্রশ্ন মানসী আর বিমলের জীবনের পক্ষে। অস্ফুট শেষ কথাটি অর্ধোচ্চারিতই থাকে ; বিমল ফিরে যায়।

" 'দিদি' ।—

আহা, কি স্নিগ্ধ প্রশান্ত চক্ষু দুটি মণ্টুর। মানসীর চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িত। হাঁ, একেই সে চিরদিন বুকে করিয়া বেড়াইবে। কোনো দুর্বলতা সে গ্রাহ্য করিবে না। এই নিঃসঙ্গ জগতে সে যে দিদিকেই চেনে।"

ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে বিমলের আত্মঘাতনের চরম মুহূর্ত।

রোগশয্যায় বিলীন "বিমলের মুখখানা দুই হাতে ধরিয়া মানসী কহিল, 'কেমন করে তোমায় ছেড়ে থাকব……আমি যে তোমার—'

বিমল ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, 'মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে আজ আবার এ কি শুনে যাচ্ছি, মানসী?'

মানসী বিমলের বুকের উপর পড়িয়া বলিল, 'ওগো তোমায় খুব—খুব ভালবাসি।'

'দিদি—'

অর্ধমূর্ছিতা মানসী চাহিল। এই স্নেহের ডাকটির জন্য আজ তার সব শেষ হইয়া গেল। কোলে লইয়া চুম্বন করিয়া মানসী বলিল, 'উঃ, ডাক্, আবার ডাক্‌রে মণ্টু।'

ভীত চকিত মণ্টু ডাকিল, 'দিদি'—"

গল্পের শেষ হয়েছে এখানেই।

পূর্বোক্ত আত্মকথনে প্রবোধ সান্যাল জানিয়েছিলেন—'যে-গল্পটা কেবলই গল্প', তা ছিল তাঁর 'দুচোখের বিষ'। বস্তুত গল্পের অতিরিক্ত সম্পদকেই তিনি চিরকাল খুঁজেছেন। ফলে নিছক-গল্পের যে সহজ কৌতূহল রয়েছে, তা মেটাবার পৃথক্ প্রয়োজনবোধ শিল্পীর চেতনার মধ্যেই অনুপস্থিত ছিল। ওপরের গল্পে তার প্রমাণ অজস্র। মানসী কে?—কি তার ব্যক্তি-পরিচয়,—কোথা থেকে কেমন করে পথের ওপর থেকে বিমলের জীবনে উপনীত হতে পেরেছিল—'দিদি'র পক্ষে 'প্রিয়া', বা 'বধূ' হতে আপত্তি ছিল কোথায়,—এসব নিছক গাল্পিক কৌতূহল চরিতার্থ করবার প্রয়োজন শিল্পী অনুভব করেন নি। ফলে তাঁর গল্পের প্লট্ কেবল বিস্রস্ত,—অস্পষ্টতায় মেদুর ছায়াচ্ছন্ন।

কিন্তু ছোটগল্পে গল্পই সব নয়,—কবিতা, সুর, কথা, নাটক,—বর্ণনা, ঘটনা, উত্তেজনা, আবেগ, উপলব্ধি, নিভৃতি,—একাধারে জীবনের সকল বাসনাই খণ্ডের সীমায় অশেষের ব্যঞ্জনা নিয়ে ধরা দিতে পারে এই শৈলীর শরীরে;—সে তথ্যের পরিচয় নেওয়া গেছে বর্তমান গ্রন্থের একেবারে প্রারম্ভিক অংশেই। এদিক থেকে প্রবোধ সান্যালের রচনায় তীব্র বিশ্বাস এবং বিশ্বস্ত অনুভূতির এক দুর্বার অমোঘতাই মুখ্য আস্বাদ্য। 'প্রলয়ের' না হোক, কালবৈশাখীর রুদ্র 'প্রভঞ্জন' সর্বরিক্ত পথিকের উন্মাদনা নিয়ে ছুটে ফিরছে তাঁর চেতনার গভীরে,—তাই আত্মার স্থিতি নেই তাঁর কোথাও,—না জীবনে, না সৃষ্টিতে—'প্রভঞ্জনের বিবাগী মনের' দোলা লেগে প্রবোধকুমার কেবলি ছুটে চলেছেন অবিরাম উদ্দামতায়। তাই গল্প লিখতে বসে

নিটোল গল্প গড়ে তোলার ধৈর্য রক্ষা করাও তাঁর পক্ষে কঠিন হয়। দুই হাতের প্রবল শক্তিতে লাঙ্গিত প্লটের প্রান্তরে নিজের তীব্র বিশ্বাসের খনিত্র টেনে জোর করে পথ করে চলেছেন তিনি। এ জবরদস্তি কৃত্রিম নয়,—অনিয়ত অসীম শক্তির সহজ প্রকাশ। তাই প্রবোধ সান্যালের লেখায় বিশুদ্ধ শিল্প-সম্পদকে যদি হারাই, তবু পাই দুরন্ত দুর্মদ অকৃত্রিম প্রাণের উদ্দীপনাকে।

শুধু প্লটেই নয়, বর্ণনার প্রকরণেও চলেছে এই দুর্দমনীয় গতিশক্তির অনিয়ত স্বেচ্ছাবিহার। প্রথম যুগের গল্প লেখার স্মৃতিচারণ উপলক্ষ্যে পূর্বোক্ত প্রসঙ্গেই লেখক আরো জানিয়েছিলেন,—"আমি হিজিবিজি লিখতে ভালবাসতুম। আমার ইস্কুলের খাতা ভরে উঠ্‌ত; কলম ভোঁতা হয়ে যেত। ওই হিজিবিজির মধ্যে এক একটা কঠিন চমক লাগানো কথা এসে যেত—ওটা যে আমার কথা, এতে বিস্ময়বোধ করতুম। তারপর ভালগুলো বেছে সাজিয়ে খাতায় টুকে রাখতুম।"[৬২] পরবর্তী কালেও তাঁর গল্পের সর্বাঙ্গ ঘিরে রয়েছে দেখি শিল্পীর সেই খেয়ালখুশি অবিরাম চলার অধীর বিস্রস্ততা; আর তারই ফাঁকে ফাঁকে প্রকাশের শৈলী একটি-দুটি ছত্রে অতি পরিষ্কৃত আড়ম্বরে হয়ে উঠেছে চমকপ্রদ। তেমন কয়েকটি রচনাংশ প্রগাঢ় বর্ণে মুদ্রিত হয়েছে ওপরের গল্প-উদ্ধৃতির যথাস্থানে। এই গদ্য-শৈলীকেই হয়ত বুদ্ধদেব বসু বলেছেন প্রকৃতির নিজের হাতের সৃষ্টি;—অর্থাৎ প্রকৃতির মতই প্রবোধ সান্যাল তাঁর সৃষ্টির জগতে খেয়ালি এবং উচ্ছ্বসিত, উদাসীন অথচ উদ্দীপনাময়। একেবারে কিশোর বয়সেই আমেরিকা যাবার পথে বর্মাপুলিশের হাতে ধরা পড়ে নাকি ফিরে এসেছিলেন,—কিন্তু আত্মা তাঁর কখনো জীবনের দুর্মদ অভিযাত্রা থেকে ঘরে ফেরেনি,—মনে হয় দুর্দম গতিতে পথ চল্‌তে চল্‌তে টুক্‌রো টুক্‌রো করে হঠাৎ-দেখা জীবন-চিত্রগুলিই যেন খুব দ্রুত পথে ছুটে চলে যায় তাঁর গল্পের শরীরে। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের মতো গল্পের প্লট্ এবং রূপকল্পও চির-অভিযাত্রী,—পথের বিস্রস্ততা থেকে ঘরের সজ্জা আর পারিপাট্যকে কখনোই তারা দেহে-প্রাণে স্বীকার করে নিলো না।

একটি মাত্র ক্ষেত্রে 'কল্লোল'-ভাবনার সঙ্গে প্রবোধ সান্যালের বুঝি সাদৃশ্য ছিল,—তাও নিছক সাদৃশ্য,—সাধর্ম্য নয়;—সে কেবল সমসাময়িক ভঙ্গুর জীবনযন্ত্রণার অনুভবে। প্রথম জীবনের গল্প রচনার প্রেরণা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,—"আমি বড়লোক নিয়ে কিছু লিখ্‌তে পারতুম না। আমি লিখ্‌তুম মজুর, জেলে, রাজমিস্ত্রী, গাড়োয়ান, মুদি, ফড়ে—এই সব চরিত্র নিয়ে, কারণ তাদের জীবনযাত্রাটা চোখে দেখতে পেতুম। তাদের নিয়ে গল্পের ইন্দ্রজাল সহজেই বুনতে পারতুম। কোথাও

৬২। দ্রঃ জ্যোতিপ্রকাশ বসু (সঃ) 'গল্প লেখার গল্প'

অনাচার ঘটলো, কেউ বিনা দোষে মার খেলো, কেউ অহেতুক অপমানে নুয়ে পড়লো—অমনি আমার গল্প লেখা শুরু।[৬৩]

ফল কথা 'কল্লোল'-সমকালীন ভাঙা-গড়াময় উত্তাল জীবন-পরিবেশে অভাব, দারিদ্র্য, শূন্যতার প্রতি শিল্পীর শ্যেন-দৃষ্টি ছিল প্রখর এবং ভাবে আকুল। কখনো কখনো সেই রুক্ষতার মধ্যে নিজের কপোল-কল্পিত নূতন আদর্শবাদের সঞ্চার করতে চেয়েছেন,—অস্বাভাবিক অস্পষ্ট হলেও তারই এক রোমান্স-সমুদ্ভাসিত প্রতিচ্ছবি দেখেছি 'দিদি' গল্পে। ঠিক একই রকমের রচনা-প্রসঙ্গে ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেখকের 'অবৈধ' গল্পটির উল্লেখ করেছেন।[৬৪]

অন্যপক্ষে অনাচার, অত্যাচার ও অকারণ অপমানের উপলক্ষ্যে যেখানেই শিল্পীর লেখনী চালিত হয়েছে, সেখানেই রচনার শৈলী ও বাগ্‌ভঙ্গী,—এমন কি বিষয়বস্তুও ক্ষণে ক্ষণে ব্যঙ্গ-তীব্র হয়ে উঠেছে। জীবনের দৈন্য উপলক্ষ্যেও ব্যক্তিগত কল্পনার ইন্দ্রজালই রচনা করেছেন প্রবোধ সান্যাল বিশেষ পরিমাণে। অর্থাৎ, সব সময়েই যে তাঁর রুক্ষ তিক্ততাবোধ বাস্তব উপকরণে সমৃদ্ধ হয়েছে, এমন কথা অসংশয়ে বলবার উপায় নেই। অনেক সময়ে দেখি, প্রচলিত "আদর্শবাদের বিরুদ্ধে কথঞ্চিৎ তীব্রতর প্রতিবাদ"ও[৬৫] লেখকের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। বস্তুত এই অ-সাধারণতাই প্রবোধ সান্যালের বহু শ্রেষ্ঠ গল্পের অভ্যন্তরে বিষয়গত চমক বা চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছে ;—অন্য পক্ষে সেই খেয়ালী বিষয়েরই বিন্যাস-পদ্ধতিতে খেয়ালখুশি অনবহিত শৈলীর অনুসরণ তাঁর রচনার বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যকে যথোচিত অভিব্যক্তি দিয়েছে। প্লট্-পরিকল্পনায় স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘন, এবং প্রকরণে অনিয়ন্ত্রিত দ্রুতগতি সত্ত্বেও সমকালীন প্রতিভাধর গল্পশিল্পি-সমাজে প্রবোধকুমারের আবেগমূলক স্বীকৃতি অনিবার্য হয়ে আছে তাঁর মৌলিক শক্তির প্রকৃতি-তুল্য অজস্র প্রচুরতার দাক্ষিণ্যে। ব্যঙ্গ-শ্লেষ-তীব্র-রচনার ক্ষেত্রে অনুরূপ অমোঘ শক্তির সমুচিত পরিচয় অন্যান্যের মধ্যে একবার আভাসিত হয়েছে 'লীডার' গল্পে :—

"অল্প সময়ের মধ্যে যে কয়জন ব্যক্তি রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার নাম শুনে নাই বাংলাদেশে এমন লোক আজকাল বিরল। সভায় সমিতিতে আয়োজনে, রাজনৈতিক যে-কোনো যুক্তি-তর্কসভায় সতীশচন্দ্রের প্রয়োজন সর্ববাদিসম্মত। তিনি

৬৩। তদেব।

৬৪। দ্র: ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ৪র্থ সং।

৬৫। তদেব।

বক্তৃতা করিতে উঠিলে সভায় হর্ষধ্বনি হয়। তাঁহার বক্তৃতা ছাপিলে সংবাদপত্রের কাট্‌তি বাড়ে। দেশের মঙ্গলার্থ তিনি বার বার কারাবরণ করিয়াছেন। আমরা অকপটে বলিতে পারি, তিনি আধুনিক বাংলার যে-কোনো যুবকের আদর্শস্থল। বর্তমানে তাঁহার শরীর অসুস্থ, আমরা সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, ভগবান তাঁহাকে শীঘ্র নিরাময় করুন।"

দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কলমের এই মন্তব্য পড়ছিল বিমলা,—আর শান্ত নিরীহ ছেলেটির মত বসে শুনছিল তার নিরুপায় স্বামী। একটু আগে এই নিয়ে স্বামি-স্ত্রীতে হাসাহাসি চলছিল,—লেখাটি পড়তে পড়তে হেসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল বিমলা ;—কারণ শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী তারই মূর্তিমান স্বামী।

ঘনায়মান সন্ধ্যায় প্রশস্ত বাসগৃহে মুক্ত বারান্দার পরিবেশ স্বামি-স্ত্রীর নিভৃত সান্নিধ্যচারণের কল্যাণে নিবিড় কবোষ্ণ হয়ে উঠেছিল। সপ্তমীর চাঁদ তাদের বিশ্রম্ভালাপের ফাঁকে ফাঁকে ঝক্‌মকিয়ে উঠ্‌ছিল নবীন উজ্জ্বলতায়। হিন্দুস্থানী চাকরটা বারান্দাতেই দিয়ে গেছে চা-জলখাবার। বিমলা তার একটু আগেই স্বামীকে জিজ্ঞাসা করছিল, এদেশে এমন নেতা কে আছেন, যিনি 'সবচেয়ে দরিদ্র'! সতীশ সে প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়েছিল।

দক্ষিণের বাতাস তখন মৃদু মৃদু বইছিল। দুষ্টামির হাসি হেসে স্বামীকে বিমলা জিজ্ঞাসা করে ;—'আচ্ছা, নেতা মশাই, এমন সুন্দর সন্ধ্যায় কী ভাল লাগে বলুন ত?'

সতীশ স্ত্রীর কাছ থেকেই সে প্রশ্নের জবাব দাবি করে। বিমলা আবারো দুষ্টামি করে বলে,—"এখন আমার ভাল লাগে বেকার সমস্যার কথা, মন্দির আর মসজিদের গণ্ডগোল, যুক্ত নির্বাচনের—"

'সতীশ ততক্ষণে তাহার অধরে' তার চেয়েও গভীর দুষ্টুমির চিহ্ন এঁকে দেয়। মুগ্ধ আবেশে স্বামীর সে আদর উপভোগ করে' নারীর স্বভাব-গৌরবে বিমলা সম্রাজ্ঞীর মতই বলেছিল,—'অতবড় দেশটা যার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে, সেই কিনা স্ত্রীর সঙ্গে লীলা-বিলাসে ব্যস্ত!' আরো অনেক কথাই সে বলেছিল সেদিন,—বলেছিল, "প্রেমে পড়লে আমরা হই চতুর, তোমরা হও ফতুর।"

চা-জলখাবার খেয়ে ক্রমে তারা বেরিয়ে পড়ে 'মোটরে করে'। অথচ সেই সন্ধ্যাতেই সতীশের ছিল এক মিটিং ;—অসুস্থতার অজুহাতে চিঠি লিখে অব্যাহতি নিয়েছে। যাই হোক্, ঘুরতে ঘুরতে একটা বাগানে ঢুকে পড়ে স্বামি-স্ত্রী দুজনে,—একান্তে। এবার জেল থেকে বেরিয়ে অবধি স্বামীকে কিছুতেই নিভৃতে পাচ্ছিল না

বিমলা। "আজ কিন্তু তাহার কাঁধের উপর মাথা হেলাইয়া হাত দিয়া তাহার গলাটা জড়াইয়া" বসেছিল সতীশ।

দুবছর তাদের বিয়ে হয়েছিল,—এরই মধ্যে জেল খেটেছে সতীশ তিনবার। পার্কের সেই অঙ্গাঙ্গি-নিভৃত সান্নিধ্যে বসে আবেশ-ভরা কণ্ঠে সতীশ বলেছিল,—

"পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী কে জান বিমলা, তুমি যার স্ত্রী!"

সন্ধ্যার বারান্দায়, প্রথম রাত্রির পার্কের নিভৃতিতে, গভীর রজনীর শয্যাগৃহে সে রাত কেটেছিল তাদের মদির বিহ্বলতায়। "সমস্ত রাত্রি জাগিয়া গল্প করিয়া হাসিয়া মান অভিমান করিয়া ভোরের দিকে তন্দ্রা" এসেছিল দুজনেরই।

এমন সময়ে ভোর হতে-না-হতেই বাহির ফটকে কড়া নড়ে ওঠে জোরে জোরে। পুলিসের কর্তা মিস্টার রায় দলবল নিয়ে এসেছেন সতীশচন্দ্রের বাড়ি খানাতল্লাসি করার পরওয়ানা নিয়ে,—বিপ্লব-সংক্রান্ত কাগজপত্র-উপকরণ সেখানে জমা হয়েছে বলে তাদের সন্দেহ। উপায় নেই, তল্লাসী করতে দিতেই হল। দীর্ঘ চারঘণ্টা ধরে বাড়ির সব কিছু তছনছ করেও কিছুই কিন্তু পাওয়া গেল না। এমন কি সব শেষে মিস্টার রায় সদলে সতীশের পাঠাগারে গিয়ে সকল কাগজপত্র ছড়িয়ে বিছিয়ে দেখলেন,—সেখানেও কিছু নেই। উৎকণ্ঠিত ভাবনায় এতক্ষণ দরজার আড়ালে অপেক্ষা করছিল বিমলা।

হতাশ হয়েই ফিরে যাচ্ছিলেন মিস্টার রায়, হঠাৎ চোখে পড়ে গেল আলমারির ওপরে অযত্ন রক্ষিত একটি চিঠির স্যাচেল্-এর ওপর। অকিঞ্চিৎকর উপকরণ; স্যাচেল্ তখন নিউমার্কেট্-এ প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যায়;—চিঠিগুলিও ধূলিমলিন। নিতান্ত উপেক্ষাভরে হলেও সতীশচন্দ্র একবার আপত্তি জানালেন,—ঐ চিঠিগুলির মধ্যে কিছুই নেই! তবুও মিস্টার রায়কে কর্তব্য পালন করতেই হয় বৈকি!

পড়তে পড়তে তার মুখ থেকে সন্দেহের ভাব তিরোহিত হয়ে গিয়ে স্নিগ্ধ হাসি চকিত হয়ে ওঠে,—সব চিঠি পড়া শেষ হয়ে গেলে মিস্টার রায় বলেন,—চমৎকার সতীশবাবু, সুন্দর। আমি জীবনে এমন সুন্দর চিঠি পড়িনি, আপনি সত্যিই সৌভাগ্যবান্। বাস্তবিক আজ বুঝলাম আপনার দেশপ্রীতির প্রেরণা কোথায়। কিন্তু আপনি ত বিবাহ করেছেন, ইনি ত স্ত্রী নন, কে ইনি, এই স্বর্ণরেখা দেবী!"

মিস্টার রায়ের অনধিকার-চর্চাতেও সতীশচন্দ্র এবারে আর প্রতিবাদ করতে পারেন না, বুঝি সে শক্তিই তার নেই। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পুলিশের দল কর্তব্য সেরে খালি হাতেই ফিরে যায়।—"ঘরের ভিতরে ও বাহিরে তখন দুই জোড়া চক্ষু

পরস্পরের প্রতি অপলক নিস্পন্দ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছে। সে দৃষ্টি ভাষাহীন, রসহীন, রূপহীন দুইটি যেন মৃতদেহ।

পরদিন প্রাতে বড় বড় হরপে সংবাদপত্রে ছাপা হইল, বিপ্লবাত্মক দলিলপত্রের সন্ধানে সতীশচন্দ্রের গৃহ গতকল্য প্রাতে দীর্ঘ চার ঘণ্টাব্যাপী খানাতল্লাস হইয়াছে, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই না পাইয়া পুলিশের দল ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সতীশচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই।"

গল্পের পরিসমাপ্তি এখানেই। বলাবাহুল্য, এই গল্পের বিন্যাস ও পরিণামকে কেবল ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ বললেই যথেষ্ট হয় না,—শিল্পীর তির্যক্ বাগ্‌ভঙ্গী গল্পান্তে এক অপ্রত্যাশিত নাটকীয় অভিঘাতে চেতনাকে যেন আড়ষ্ট করে তোলে। দাম্পত্য-প্রণয় এবং দুঃখব্রতী দেশপ্রেম,—সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ দুটি আদর্শবোধকে বলিষ্ঠ তীক্ষ্ণ বক্র-উক্তির অভিঘাতে বিদ্রূপ-জর্জরিত করে তুলেছেন শিল্পী। এখানেও কিন্তু তাঁর জেহাদ কোনো সুনিশ্চিত ফাঁকি বা মিথ্যার বিরুদ্ধে নয়,—নিজের ব্যক্তিক উপলব্ধি অথবা অভিজ্ঞতায় যাকে অ-সত্য বলে মনে করেছেন, তাকেই বিচূর্ণ করেছেন সকল শক্তি প্রয়োগ করে।

প্রবোধ সান্যালের রচনায় সবচেয়ে যা বিস্মিত করে, তা হচ্ছে শক্তির এই অমিত প্রাচুর্য। জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর অন্তহীন, তাঁর চেয়েও অনেক বেশি সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতারাজিকে নিজের অমোঘ কল্পনাশক্তির তাতে পুড়িয়ে যেমন-খুশি রূপমূর্তি গড়ে তোলার অনায়াস-দক্ষতা। গল্পের প্লটের শরীরে অকল্পনীয়কে এমন স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তায় বার বার আকার দিয়েছেন, যাতে স্তম্ভিত বিস্ময়ে কেবলই ভাবতে হয়, আগুন নিয়ে খেলে বেড়াবার কি অদম্য প্রাণশক্তি এই শিল্পীর। জীবনের বিভিন্ন ক্রূর রূপই বারে বারে চোখে পড়েছে তাঁর,—কিন্তু সবকিছুর ভেতরকার প্রাণ-সত্যের আভাসটুকুও লুপ্ত হয়ে যায় নি। 'প্রেতিনী' গল্পে সেই দুর্লঙ্ঘ্য শক্তিরই এক তীব্র-উজ্জ্বল নিদর্শন:—বিয়ের তিন দিন না যেতেই তের বছরের মেয়ে চন্দ্রময়ীর সব সাধ-আহ্লাদ ঘুচিয়ে দিয়ে স্বামী দেশত্যাগী হয়ে যায়। তীর্থে তীর্থে ঘুরে পতি-পরিত্যক্তার জীবনের এক দীর্ঘকাল কেটে শেষ হয়ে গেছে, চল্লিশ-এর পারে এসে পৌঁছেছে চন্দ্রময়ী। কাশীর একটি বাড়িতে বিচিত্র ভাড়াটের হাটের মাঝখানে অসুস্থ দেহ-মন নিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয় সে। কারো কাছেই স্পষ্ট করে নিজেকে মেলে ধরতে পারে না,—পারবেই বা কি করে!— "চন্দ্রময়ীকে দেখ্‌লে গা ঘিন্ ঘিন্ করে। বিরল কেশ, দাঁত উঁচু, সাপের মতো ছোট ছোট দুটো চোখ, হাত-পাগুলি কদাকার, চির-উপবাসীর মত একখানি শীর্ণ

দেহ,—চন্দ্রময়ী যেন বিধাতার সৃষ্টির ব্যর্থতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" —তাই বিধাতার সৃষ্টির আলোতে চোখ তুলে তাকাতেও পারে না সে। সরীসৃপের মত তার বুভুক্ষু দেহমনের বিচিত্র গোপন অভিসার চলতে থাকে ভাড়াটেদের ঘরে ঘরে,—কোথাও গৃহিণীর, কোথাও জননীর, কোথাও বা শাশুড়ীর অতৃপ্ত ক্ষুধার অপ্রকৃতিস্থ অসুস্থ আবেগ-তাড়নায়। লোকে ভাবে প্রেতিনী,—ঘৃণা করে, লাঞ্ছনা করে,—চন্দ্রময়ীর তা গায়ে লাগে না কখনোই। কিন্তু ছেড়েও যায় সবাই। তাহলেও শিল্পী তাকে উপেক্ষা করতে পারেন না,—নিরুপমার মনের গহনে বসে তাঁর সত্য-সন্ধানী দরদী মন "মানুষের হৃদয়ের বিচার করে"।

কিন্তু সেই হৃদয়ধর্মের অতলে গোপন-গহন কুটিল যে গতিভঙ্গী রয়েছে তার মূলগত জটিলতার গ্রন্থি-মোচনের দিকে শিল্পীর কোনো উৎসাহ নেই,—অথচ চন্দ্রময়ীর সর্ব-লাঞ্ছিত চিত্তের মনস্তাত্ত্বিক অবদমনের মূলেই তার অপ্রকৃতিস্থ জীবনের যথার্থ পরিচয় অন্তর্নিহিত। তার অভাবে গল্পের চরিত্র-জটিলতার মৌল উপকরণটুকু অস্ফুট ইঙ্গিতের মত রহস্যময় হয়ে আছে। এই অর্থেই বলছিলাম,—তত্ত্ব ও তথ্যের বিন্যাস-বিশ্লেষণের প্রকরণগত দাবি স্বভাব-শিল্পী প্রবোধকুমার সচেতনভাবে স্বীকার করেন নি। অপার-পাথার অভিজ্ঞতা, আর কঠিন আত্মপ্রত্যয়ে নিমগ্ন বিস্ময়কর কল্পনাশক্তির প্রভাবে,—যে কল্পনা-শক্তির প্রশংসা করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও[৮৬],—নিজের স্বাতন্ত্র্য-দীপ্ত পথরেখা নিজেই কেটে এগিয়ে গেছেন। বাংলা গল্পসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর প্রতিভা এবং শৈলী এদিক থেকে অ-পরতন্ত্র। যে-কোনো গল্পেই সেই unconventional স্বকীয়তার পরিচয় প্রগাঢ়বর্ণে অঙ্কিত হয়ে আছে।

সহজাত শক্তির এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রাচুর্য-ধারা শিল্প-সংসারের নিয়ম-রীতির শৃঙ্খলায় ধরা দিল না বলে বুদ্ধদেব বসু দুঃখ করেছেন ;—তা সম্ভব হলে, আমাদের কালের এক চমকপ্রদ প্রতিভার পূর্ণতা-সমুজ্জ্বল সুরেখ রূপমূর্তি প্রত্যক্ষ করা যেতে পারত নিশ্চয়ই। কিন্তু পরিবর্তে যা হারাতে হত, তার কথা ভেবে, প্রকৃতির বুকে পাহাড়ি ঝর্ণার অশৃঙ্খলিত দুরন্ত গতিকে প্রশান্ত নদীখাতে প্রবাহিত করতে পারার সম্ভাবনা আজ আর অশঙ্কিত মনে স্বীকার করা হয়ত সহজ নয়।

এঁর গল্প-সংকলন গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে :—'নিশিপদ্ম', 'দিবাচল', 'কয়েক-

৮৬। প্রবোধকুমারের 'কলরব' উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক প্রশংসাবাণীর জন্ত দ্রষ্টব্য :—রবীন্দ্রনাথ-কৃত 'কৃষ্ণরাও'-এর সমালোচনা.—'পরিচয়', বৈশাখ—১৩৪০ সাল।

ঘণ্টামাত্র', 'অবিকল', 'গল্পসঞ্চয়ন', 'নওরঙ্গী', 'মধুকরে', 'মাস', 'নীচের তলায়', 'অঙ্গার', 'কাটামাটির দুর্গ', 'সায়াহ্ন', 'অঙ্গরাগ', 'পঞ্চতীর্থ' ইত্যাদি* ।

৫। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্পশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮—১৯৫৬) অভিব্যক্তির প্রথম সাক্ষী অচিন্ত্য সেনগুপ্ত। অর্থাৎ, সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে নিতান্ত সাধারণ তর্কবিতর্ক উপলক্ষ্য করে প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানের ছাত্র প্রবোধকুমার[৬৭] যখন জেদের বশে গল্প লিখে শেষ করেই সেকালের এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পত্রিকার অফিসে জমা দিতে গিয়াছিলেন,[৬৮] 'বিচিত্রা'-র দপ্তরে তখন প্রবীণ সম্পাদকের অভাবে আসীন ছিলেন তরুণ সহকারী অচিন্ত্যকুমার। 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে মানিকের রচনা-পরিচয় দিয়ে তিনি লিখেছিলেন,—"মানিকই একমাত্র আধুনিক লেখক যে 'কল্লোল' ডিঙিয়ে 'বিচিত্রা'য় চলে এসেছে—পটুয়াটোলা ডিঙিয়ে পটলডাঙ্গায়। আসলে সে 'কল্লোলে'রই কুলবর্ধন। তবে দুটো রাস্তা এগিয়ে এসেছে বলে সে আরো ত্বরান্বিত। 'কল্লোলের' দলের কারু কারু উপন্যাসে পুলিশ যখন অশ্লীলতার অজুহাতে হস্তক্ষেপ করে, তখন মানিক বোধ হয় ভক্তিমগ্ন! একযুগে যা অশ্লীল, পরবর্তী যুগে তাই জোলো, সম্পূর্ণ হতাশাব্যঞ্জক।"

কল্লোল-শিল্পী 'আধুনিক'দের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেবল গল্প-বিষয়ের সাদৃশ্যের প্রসঙ্গই এখানে নির্দেশ করেছেন অচিন্ত্যকুমার। ব্যক্তি এবং সমাজের দৃষ্টিতে যৌন চেতনা ও নৈতিক রুচিবোধের মূল্যমান দেশ-কালে বিবর্তিত যে হয়ে থাকে, বুদ্ধদেবের গল্পালোচনা উপলক্ষ্যে সে-সত্যের বিস্তৃত পরিচয় গ্রহণ করা গেছে। কিন্তু তাহলেও, প্রথম থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের প্লট কেবল কালগত পরাগতির জন্যই 'জোলো' বলে প্রতিভাত হয়েছিল, একথা মনে করার কারণ নেই; তাহলে সেদিনও 'অতসীমামী' গল্প 'বিচিত্রা'য় (পৌষ, ১৩৩৫ বাংলা) প্রকাশিত হতে পারত কিনা সন্দেহ। রুক্ষ রিক্ত জীবনের রক্তাক্ত শূন্যতা-চিত্রণে ঐ প্রথম গল্পেই শিল্পীর নির্মমিকতা প্রায় বীভৎসতার সীমারেখায় গিয়ে পৌঁচেছে;—তাহলেও পটলডাঙার খেঁদি পিসীর দলের দগ্‌দগে ঘা আর ক্লেদাক্ততা কোথায় সে জীবনে! বরং মৃতস্বামীর উদ্দেশ্যে অতসীমামীর সেই নিঃসঙ্গ-নির্জন পূজা নিবেদনের মহিমা

* তালিকাটি শিল্পীর দাক্ষিণ্যে প্রাপ্ত।

৬৭। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার,—ডাক নাম মানিক। গল্প-রচনার উপলক্ষ্যে সেই ডাক নামকেই ছদ্মনাম করেছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অঙ্কে অনার্স নিয়েছিলেন প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬৮। জ্যোতিপ্রকাশ বসু (সঃ)—'গল্প লেখার গল্প'।

শশ্মান-তীর্থে শবোপরি আসীন কঠোর কাপালিকের শিবা-সাধনার মতই বিস্ময়কর বিগাঢ়তায় পরিপূর্ণ বলে মনে হয়। দারিদ্র্য, সামাজিক অসাম্য ও পারিপার্শ্বিক নির্যাতনের পঙ্কিল স্রোতে বলিষ্ঠ বেগে উজান ঠেলে সুন্দর প্রেমের তীরে শিল্পী তাঁর গল্পের তরী বেয়ে চলেছিলেন। বস্তুত প্লটের শরীরে পচনশীল জীবনের ক্লেদগ্লানি যা-কিছু উৎকট হয়ে উঠেছে 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের কাল থেকে। অনেকটা এই কারণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পসাহিত্যে এক নূতন দিগন্ত উন্মোচনের সময় গণনা করা হয় ঐ গল্প থেকেই। অথচ মনে হয়, এই বহুজন-সংবর্ধিত গল্প রচনার লগ্ন থেকেই শিল্পীর প্রতিভা যেন অজ্ঞাতেই নিজের নেমিসিস্-এর অভিমুখী হয়েছে প্রথম। কিন্তু সে প্রসঙ্গ পরে আসবে, আপাতত স্মরণ এবং স্বীকার করতেই হয় যে, 'প্রাগৈতিহাসিক' রচনার আগে থেকেই, এমন কি 'অতসীমামী' গল্পের জন্মলগ্ন থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভা একেবারে প্রথমাবধি বহুলাংশেই ছিল স্থিতপ্রাজ্ঞ। আর সেই বিশেষিত স্বভাবে, অব্যবহিত পূর্ববর্তী 'কল্লোলে'র কালে যে-সব রচনা অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল, তাদের সঙ্গে এই শিল্পীর আত্মিক প্রবণতা অন্তত তখন থেকেই অভিন্ন-গোত্র ছিল, একথা মনে করবার কারণ নেই। এই উপলক্ষ্যে 'অতসীমামী'র পরে 'বিচিত্রা' এবং অন্যান্য প্রখ্যাত সাহিত্য-পত্রিকায় তাঁর যে-সব গল্প প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের কথা, তথা, 'অতসীমামী' নামক প্রথম সংকলন-গ্রন্থে প্রকাশিত (১৯৩৭) গল্পগুচ্ছের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্প দ্বিতীয় সংকলন-গ্রন্থে ধৃত হয়েছে,—সংকলনটির নামও 'প্রাগৈতিহাসিক'। সে যাই হোক্, এই একই প্রসঙ্গে আরো স্মরণ করতে হয় যে, মানিকের প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' প্রকাশিত হয়েছিল সজনীকান্ত দাসের সম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় (১৩৪১)। অর্থাৎ, কল্লোলেতর ও কল্লোল-বিরোধী ভাবনার প্রত্যক্ষ সংবর্ধনার মধ্যে এই শিল্পি-প্রতিভার প্রথম আবির্ভাব। বুদ্ধদেব বসুও স্বীকার করেছেন, কল্লোল উঠে যাবার পরেই মানিক কল্লোল-শিল্পীদের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে এসেছিলেন[৬১]। গোষ্ঠীভঙ্গ ঘটে গেছে তখন।

তাহলেও আরো একদিক থেকে 'কল্লোলে'র সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধর্ম্য প্রায় মৌলিক, আর সেই প্রসঙ্গেই বর্তমান আলোচনায় তাঁর প্রবেশাধিকার। তা না হলে কালের দিক থেকে তিনি কিঞ্চিৎ পরাগত 'কল্লোলে'র যুগে যে হঠাৎ-বিদ্রোহের বিক্ষোভ অন্ধ-আক্রোশে উত্তাল হয়ে উঠেছিল, তার একটি স্পষ্ট পরিণতি-সূত্র যেন

৬১। দ্রষ্টব্য ঃ—B. Bose—'An Acre of Green Grass'

লক্ষ্য করা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমিক প্রতিশ্রুতির মধ্যে; যদিও মধুসূদনের পরে বাংলা সাহিত্যে তিনি আর এক স্মরণীয় শিল্পী, অসীম সম্ভাবনার উৎসাহ নিয়ে এসেও যিনি শক্তির পূর্ণ প্রকাশের অভিজ্ঞান রেখে যেতে পারেন নি। মধুসূদন উঁহার মত অগ্নিদাহী জীবনের শেষেও সৃষ্টির যে সম্ভার রেখে গেছেন তাতে পূর্ণতার আভাস সংশয়রহিত; কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় সাফল্যের চেয়ে প্রতিভার প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের পরিমাণও কিছু অপ্রচুর নয়। সেই ভঙ্গুরতার মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্য ;—এমন করে তিলে তিলে অকৃতার্থ হয়ে যেতেও আর কে পেরেছে তিনি ছাড়া! তাহলেও প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে যে প্রতিশ্রুতি তিনি এনেছিলেন, তা সম্পূর্ণ রক্ষিত হতে পারলে 'কল্লোলে'র অন্তঃ-প্রেরণার যে-স্বভাব প্রাথমিক বিদ্রোহীদের কারো চেতনাতেই প্রাঞ্জল হয় নি, তার একটি সুরের মূর্তি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিতে বিভাম্বিত হয়ে উঠতে পারত। এই স্বীকৃতির তাৎপর্যেই তিনি আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

এই তাৎপর্যের-ই সমর্থন লক্ষ্য করি বুদ্ধদেব বসুর ভাবনাতেও, মানিক সম্পর্কে যখন তিনি বলেন,—"A belated Kallolean, he looked like being the last sequence in the process of change our fiction had just been going through, the point of crystallization following the ferment. We saw in him the froth subside, the passion of youth controlled by a marvellous maturity, the boldness of a rebel balanced by an artist's sense of proportion."[৭০] ফল কথা, কল্লোলযুগের প্রথম অভিব্যক্তিতে, ফেনিল উন্মত্ততা আর আবেগাতিশয়ী উল্লাস যে অদম্য হয়েছিল, সে তথ্য সংশয়রহিত। যৌনভাবনার উদ্দামতাও ছিল তারই এক বাঁকাচেঁড়া নগ্ন অভিব্যক্তি। এই সবকিছুকে অতিক্রম করে সেই নিরুদ্দেশ-গতির অন্তর-স্বভাবকে অধিগত করতে পারলে দেখা যাবে,—'কল্লোল'-চেতনার মূলে ছিল বিশুদ্ধ বামাচরণের এক অস্ফুট রহস্য-বাসনা। অগ্নির দক্ষিণ মুখ কল্যাণকৃৎ,—সুখ-সৌন্দর্যের চিরন্তন আকর; অতএব স্নিগ্ধ জীবনের অগ্নিহোত্রী শিল্পিদল সেই দক্ষিণাবর্ত বহ্নির আরাধনাই করেছেন সৃষ্টির আসনে বসে। বিশেষ করে উনিশ শতকের রেনেসাঁসের ফলশ্রুতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির চেতনায় সেই দক্ষিণাস্য শিখাকেই প্রদীপ্ত উজ্জ্বলতা দান করেছিল। আগেই লক্ষ্য করেছি, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই রেনেসাঁসের অমৃত-স্বপ্নই সফল ঐতিহাসিক মূর্তি ধরে দেখা দিয়েছিল। তাই রবীন্দ্র-ভাবনারও একমাত্র প্রার্থনা

৭০। তদেব।

'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তত্তে পাহি মাং নিত্যম্' ;—তাঁরও সেই প্রাচীন জিজ্ঞাসা, —'যেনাহং নামৃতাস্যাম্, তেনাহং কিমকুর্যাম্।' তাই রবীন্দ্রসাহিত্যের দিকে দিকে সেই একমেবাদ্বিতীয়কে বিচিত্র আনন্দলীলায় উদ্ভাসিত দেখি,—যিনি 'শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্।'

এখানেই ছিল 'কল্লোল'-চেতনার অনতি-স্ফুট আক্রোশ-অভিযোগ। কল্যাণ-সৌন্দর্য জীবনের পরম বাসনার ধন,—কিন্তু জীবনের অনিবার্য নিয়তি তা নয়। বরং অকল্যাণ-অভিশাপে দগ্ধ সগরখাত বেয়ে স্বর্গের কল্যাণ-মন্দাকিনীকে আবাহন করে আনবার যোগ্য কোনো এক উত্তরসাধক ভগীরথের অপেক্ষায় দীর্ঘ যুগ থেকে যুগান্তর অতিবাহিত হয়ে যায় মানুষের ইতিহাসে। ততদিনে পথে পথে যত জঞ্জাল, যত দুর্যপনেয় ভস্মস্তূপ তিলে তিলে সঞ্চিত হতে থাকে, তার মূলগত গ্লানি আর ভার পৃথিবীকে যখন ধূলিধূসরিত করতে থাকে, তার খবর তখন কে রাখে! তাই বা কেন, মৌলিক স্বভাবে জীবনের পদ্ধতি আসলে অনবচ্ছিন্ন এক হরণ-পূরণের পালা; তার একদিকে যত গড়ে ওঠে, অপর দিকে ভাঙে ততই,—হয়ত তার চেয়েও বেশি। অগ্নির দক্ষিণ এবং বাম মুখ যুগপৎ ভাস্বর হয়ে ওঠে। অতএব সেই বাম-প্রসঙ্গে দৃষ্টি রুদ্ধ করে রাখবার উপায় কোথায়! সত্যিই সেযুগে,—'কল্লোলের' কালে বেহিশাবী যৌবনের যে অবদমিত অবক্ষয়ের বিশ্বজোড় ইতিহাস বুভুক্ষুর আকার ধরেছিল, তার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে জীবনের এই ক্রূর কুটিল বিভীষণ বাম-মূর্তিই প্রকটতম হয়ে ওঠে; ফলে আবহমান কালের দক্ষিণপন্থী জীবন-সাধনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দুর্বার না হয়ে উপায় ছিল না।

কিন্তু বামাচারীর সাধনার এক অনিবার্য উপকরণ আসব; আত্মশক্তির যজ্ঞানলে তার জ্বালা ও তাপকে নির্জিত করে অমৃত-ত্ব সম্পাদন করেন শক্তিমান্ সাধক। তাহলেও যুগান্তকারী সেই শক্তির যেখানে অভাব, সেখানে প্রমত্ততার আকর পানীয় একদিকে যেমন হলাহলের বিষাদে জর্জরিত করে, তেম্নি এক দুর্নিরোধ্য নেশার উত্তালতায় করে তোলে প্রমত্ত। বামাচারের তাৎপর্য তখন নিরর্থক হয়ে পড়ে, নেশার অনিবার্যতাই হয় একমাত্র। 'কল্লোলযুগে'র উত্তেজনার প্রাথমিক লগ্নেও অনেকটা তাই ঘটেছিল,—এই স্বীকৃতির ইঙ্গিত রয়েছে বুদ্ধদেব বসুর পূর্বোক্ত উক্তিতেও। আবার ঐ উক্তিরই অনুসরণ করে বলা চলে,—প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের ফেনিল উন্মাদনা যখন পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকে ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গেছে, সেই স্বচ্ছ পরিবেশে অনাবিল বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জীবন আর সাহিত্যের সাধনায় ব্রতী হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

জীবনের বাম-মূর্তির ধ্যানে সত্যই তাঁর দৃষ্টি ছিল আদি-অন্তে অনাবিল। নিজের গল্প-রচনার মৌল প্রেরণার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,—"কলেজ থেকে তখনকার বালিকা বালিগঞ্জে বাড়িতে ফিরতাম, আলোহীন পথহীন অসংস্কৃত জলার মত লেকের ধারে গিয়ে বসতাম—চেনা-অচেনা কোনো একটি প্রিয়ার মুখ স্মরণ করে একটু চলতি কাব্যরস উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে। ভেসে আসত নিজের বাড়ির আত্মীয়-স্বজন আর পাড়াপড়শির মুখ, জীবনের অকারণ জটিলতায় মুখের চামড়া যাদের কুঁচকে গেছে। ভেসে আসত, কলেজের সহপাঠীদের মুখ—শিক্ষার খাঁচায় পোরা তারুণ্যসিংহের সব শিশু, —প্রাণশক্তির অপচয়ের আনন্দে যারা মশগুল। তারপর ভেসে আসত খালের ধারে, নদীর ধারে, গ্রামের ধারে বসানো গ্রাম-চাষী, মাঝি, জেলে, তাঁতিদের পীড়িত ক্লিষ্ট মুখ। লেকের জনহীন স্তব্ধতা ধ্বনিত হত ঝিঁঝির ডাকে, শেয়াল ডেকে পৃথিবীকে স্তব্ধতর করে দিত, তারাগুলো সব চোখ ঠারত আকাশের হাজার ট্যারা চোখের মত, —কোনদিন উঠ্‌তো চাঁদ। আর ঐ মুখগুলি—মধ্যবিত্ত আর চাষা-ভূষোর ঐ মুখগুলি আমার মধ্যে মুখর অনুভূতি হয়ে চ্যাচাত,—ভাষা দাও, ভাষা দাও।" [৭১]

বালিগঞ্জে লেকের ধারের ঝিঁঝি-ডাকা স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় আকাশের অসংখ্য তারার মালায় হাজার ট্যারা চোখের দৃষ্টি দেখে যিনি আবিষ্ট হন, তাঁর জীবনানুভবে বামাচারের অমিশ্র তীব্রতা সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ কোথায়? হলই বা সে বালিকা বালিগঞ্জ, অথবা অসংস্কৃত লেক,—উঠলই বা তার তীরে গভীর রাতে শেয়ালের ডাক! একই উদ্ধৃতির মধ্যে শিল্পীর জীবনাবেগের গভীরতা,—আর তার চেয়েও বেশি শূন্য-জীবনবোধের অপার-পাথার অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য একান্ত লক্ষ্য করার মত। সরকারি কর্ম উপলক্ষ্যে মানিকের পিতা মফঃস্বল বাংলার একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত পরিক্রমা করে ফিরতেন,—সেই অবকাশে বিচিত্র জীবন-সংযোগের সুযোগ মানিক পুরোমাত্রায় গ্রহণ করেছিলেন।

বিষামৃতের সিন্ধু এ জীবন; শিল্প-সাহিত্য সেই সিন্ধু-মন্থিত অমৃত। অর্থাৎ, জীবন কেবলই বিষ নয়,—অমৃতও নয় কেবল;—এই দুয়ের বিমিশ্রতায় গড়া এক জটিল অস্তিত্ব। আলো এবং অন্ধকার, দক্ষিণ আর বাম, অমৃত ও বিষ,—এই পরস্পর-বিরোধী বিপরীত উপকরণ-প্রবাহের মধ্যে সমন্বয়ের রহস্য-সূত্রটি আবিষ্কার করে জীবনের সামগ্রিক সত্যস্বরূপের উদ্‌ঘাটনই সাহিত্যের স্বাভাবিক ধর্ম। ঐ সত্যানুভবের আনন্দই সাহিত্যের অমৃত। সে অমৃত পরিবেশণের জন্য নীতিগতভাবে যা মহৎ সুন্দর, অথবা কল্যাণ-সম্পদের আকর, সাহিত্যিককে কেবল তারই আরাধনা করতে

৭১। জ্যোতিপ্রকাশ বসু (সঃ)—'গল্প লেখার গল্প'।

হবে এমন কথা নেই। মোহিনী বেশধারী বিষ্ণু যেমন, 'নীলকণ্ঠ'ও তেমনি বৃহৎ-বিশ্বকে অমৃতই দান করেছিলেন। কেবল বামদেব রুদ্র সমুদ্রমন্থন-জাত হলাহল আকণ্ঠ পান করে আত্মার মধ্যে তাকে সংবরণ করেন; নিখিল বিশ্বে অমৃতের অধিকারই অক্ষয় হয়ে থাকে। এদিক থেকে বামাচারীর সাধনা—বিষপান ও বিষসংবরণের সুভীষণ ব্রত—অনেক কঠিন, অনেক বেশি আতঙ্ককর। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বামসাধনার প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাৎপর্যপূর্ণ মূল্যায়ন অবশ্য স্মরণীয়; —"সাহিত্যের কাজ সত্যরূপেরও স্ফুরণ। দক্ষিণ ও বাম উভয়চক্ষু হইতে বিচ্ছুরিত, মিলিত রশ্মিরেখা-সমষ্টির সাহায্যেই বিষয়ের সত্য সমগ্ররূপ উদ্ভাসিত হয়—দুয়ের মধ্যে কেহই উপেক্ষণীয় নহে।"[১২]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্প দৃষ্টিতে বামাভিমুখিতা মৌলিক; সেখানে আদর্শ বিজ্ঞানীর মত তিনি তথ্য-নিষ্ঠ;—তীব্র-বিচ্ছুরিত বিশ্লেষণী দৃষ্টির ছুরিকাঘাতে জীবনের ক্লেদ-গ্লানি-নিষ্ঠুরতার অন্তরালবর্তী সত্যরূপটিকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে খুঁজে দেখেছেন। কোনো উচ্ছ্বাস, কোনো বিহ্বল পক্ষপাত তাঁর কঠিন সম্বিৎসাকে বিন্দুমাত্র কম্পিত বা পথভ্রষ্ট করতে পারে নি। মনে পড়ে সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে বিতর্ক উপলক্ষ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই বলেছিলেন,—"এ যুগে বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে সাহিত্য লেখা অসম্ভব—তাতে শুধু পুরণো কুসংস্কারকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে।"[১৩]

এই সংস্কারমুক্ত যথাযথ বৈজ্ঞানিক জীবন-দৃষ্টির সার্থক উৎসার দেখি 'অতসীমামী' গল্পে। অকল্পনীয় দক্ষতার দার্ঢ্যে জীবনের অমৃতস্বাদ আর বিষাক্ত লাভাস্রোতকে একই পাত্রে ঢেলে পান করেছেন তিনি;—জীবনের অসীম তুঙ্গায়িত মহিমাবোধের বৃন্তে যতীনমামা আর অতসীমামীর স্রষ্টার অন্তরে যে দুঃসহ জ্বালা, তাকে চিহ্নিত করবার ভাষা কোথায়!—সে এক অনির্বচনীয় অমৃত-যন্ত্রণার ঘন কঠিন-রূপ:—

যতীন্দ্রনাথ রায় সুরেশের মেজমামার বন্ধু,—সেই সূত্রেই সুরেশের যতীনমামা তিনি। অন্ধ গলির ভাঙা দেয়াল-ঘেরা চোরাকুঠরিতে যতীনমামার যে বাঁশির সুর চেনা-অচেনা সকলকে উন্মাদ করেছে,—সেই বাঁশি শুনে সুরেশেরও মনে হয়েছিল,—"বাঁশি শুনেছি ঢের। বিশ্বাস হয় নি এই বাঁশি বাজিয়ে একজন একদিন এক কিশোরীর কুলমান লজ্জাভয় সব ভুলিয়ে দিয়েছিল, যমুনাতে উজান বইয়েছিল। আজ মনে হল; আমার যতীনমামার বাঁশিতে সমগ্র প্রাণ যদি আচমকা জেগে উঠে নিরর্থক এমন

১২। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (৪র্থ সং)।

১৩। জ্যোতিপ্রকাশ বসু (সঃ)—'গল্প লেখার গল্প'।

ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তবে সেই বিশ্ব-বাঁশির বাদকের পক্ষে ঐ দুটি কাজ আর এমন কি কঠিন !”—

কিন্তু এই অমৃতের ধারা স্রষ্টার অভ্যন্তরে বিষকুম্ভের মুখ তিলে তিলে অনাবৃত করে তোলে। যতবার যতীনমামা বাঁশি বাজান, ততবারই অতসীমামী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করেন,—সুরেশ প্রথম দেখে আঁতকে উঠেছিল,—গামলার ভেতরে জমাটবাঁধা খানিকটা রক্ত !

মাতৃহীন অতসীমামীকে ‘চাঁড়াল খুড়ো’র পৈশাচিক অত্যাচার থেকে উদ্ধার করে পালিয়ে এসেছিলেন যতীনমামা ; তার আগে এককালে নেশা আর বাঁশি নিয়ে আত্মহারা হতেন,—এবার নতুন নেশায় আত্মাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরল,—পুরনো নেশা নিঃশেষে গেল মুছে। সে নেশা অতসীমামী। তাহলেও অতসীর আর্ত অস্থিরতায়ও যতীনমামা বাঁশি ছাড়লেন না,—সে তাঁর আত্মার অপরিত্যাজ্য।

কিন্তু তাও ছাড়তে হয় ;—অতসীমামী মরণাপন্ন অসুখে পড়লেন,—তাঁর চিকিৎসায় কলকাতার বাড়িখানি গেল। বাঁশিটিও বিক্রি করে দিলেন,—সে বাঁশি কিনে নিল সুরেশ নিজেই। অতসীমামীর মুমূর্ষু মুখের পানে চেয়ে অত্যন্ত নির্বিকার-ভাবে কথা দিয়েছিলেন যতীনমামা,—অতসীমামী বেঁচে উঠলে বাঁশি আর কোনোদিন তিনি বাজাবেন না। সে-কথা যে বজ্রের চেয়েও কত অমোঘ, সুরেশ আর অতসীমামীর চেয়ে তা কে বেশি অনুভব করেছে !

অতসীমামী ভাল হয়ে ওঠেন ধীরে ধীরে ; তাঁর সুস্থতার মূল্য দিতে যতীনমামাকে কলকাতার বাড়ি ছেড়ে বাঙালদেশের বাস্তু-ভিটায় ফিরে যেতে হয়। ধীরে ধীরে সুরেশের ভাবনা থেকেও কেমন যেন স্তিমিত হয়ে আসে সব। তার অনেক দিন পরে এক ট্রেন-দুর্ঘটনার তালিকায় যতীন্দ্রনাথ রায়ের নামও চোখে পড়েছিল। সুরেশ তখন সংসারী ;—যথেষ্ট অবধানের সঙ্গে সেই দুর্যোগের কথা ভাবতেও পারে নি। আরো চার বছর পর, বোনের শ্বশুরবাড়ি থেকে ফেরার পথে গোয়ালন্দ আর পোড়াদহের মাঝখানে এক অপ্রত্যাশিত পরিবেশে চাঁদ্‌নি সন্ধ্যায় ট্রেনের কামরায় বসে সাক্ষাৎ হয়ে যায় অতসীমামীর সঙ্গে। সে আর এক অকল্পনীয় অভিজ্ঞতা ; সুরেশের কাছ থেকে বাঁশিটা চেয়ে বাজালেন,—কী আশ্চর্য সুরসাধনা ! যতীনমামাই শিখিয়েছিলেন প্রথম যৌবনে ;—তারপরে রাগ করে অতসীমামী ছেড়ে দিয়েছিলেন বাঁশি। সুরেশ এসব কথার কিছু জানতও না কোনোদিন। আজ সতেরো অঘ্রাণের রাত ; চারবছর আগে এই রাতেই ট্রেন-দুর্ঘটনায় মাঠের মাঝখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন যতীনমামা। মামী চলেছেন সেই প্রেম-স্মৃতি-তর্পণে। নাম-না-জানা

নির্জন স্টেশনে নেমে যাবার আগে সুরেশ সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। শুনেই মামীর চোখ জ্বলে উঠ্‌ল, "ছিঃ! তোমার তো বুদ্ধির অভাব নেই ভাগ্নে। আমি কি সঙ্গী নিয়ে সেখানে যেতে পারি? সেই নির্জন মাঠে সমস্ত রাত আমি তাঁর সঙ্গ অনুভব করি, সেখানে কি কাউকে নিয়ে যাওয়া যায়। ঐখানের বাতাসে যে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস রয়েছে।"

বামাচারী জীবন-কল্পনার কি দুঃসাহসী দুরন্ত প্রসার! দয়িতের নিঃশ্বাস মিলেছে যে বাতাসে তারই নিভৃত নিঃসঙ্গতায় অতসীমামীর এই আশ্চর্য অতুল্য প্রেমাভিসার! গোটা গল্পটি যেন কালকূটবিষের পাত্রে জীবনামৃত ভরে তুলেছে। প্রকাশ-শৈলীর কথা ভেবে স্তম্ভিত হতে হয়,—বুদ্ধদেব বসুর কথায় এ-এক 'dramatic impersonal almost intangible style',—যার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে দুর্লক্ষ্য নিশ্চিত এক অপূর্ব ছন্দের স্পন্দন, আর প্রাণশক্তির দুর্বার জীবন্ত প্রেরণা।

অভাব, ক্ষুধা, গ্লানিভরা ক্লেদ-কর্দমাক্ত পথে জীবন-সন্ধানে বেরিয়েছেন শিল্পী;—বক্ষে তাঁর অপার তৃষ্ণা;—আত্মার গভীরে ব্যাকুল সমন্বয়ী জিজ্ঞাসা। 'ব্যথার পূজা' নামে গল্প প্রকাশিত হয়েছিল 'বিচিত্রা'য় (ভাদ্র, ১৩৩৬)। অপরিমেয় ধনাধিকারীর একমাত্র পুত্র এদেশের পড়া শেষ করে য়ুরোপে ঘুরে এসেছিল;—আমেরিকাতেও গিয়েছিল,—কেবল দেশ ঘুরে বেড়াবার জন্যে,—মানুষ দেখবার মোহে। সেই ক-বছরে মানুষের মোহে জড়িয়েও পড়ে নি জগদীশ খুব কম। বিদেশিনী লিওনারা, অথবা দেশের সহপাঠী আমাদের বিদেশিনী বোন্ বেঁধেছে যেমন নিষ্ঠুর মায়ায়,—তেমনি সর্বস্ব কেড়েকুড়ে নিয়ে ছেড়েও দিয়েছে তারা নিষ্ঠুরের মতই। বিচিত্র অভিজ্ঞতার পথে পথে পাড়ি জমিয়ে চার বছর পর নিতান্ত অনিচ্ছায় বাড়ি ফিরছিল জগদীশ—পিতার মৃত্যু-রোগের খবর পেয়ে। জাহাজে দেখা হয়ে যায় চিত্রার সঙ্গে। গানের ডিপ্লোমা নিতে বিলেত গিয়েছিল চিত্রা—এবার ফিরছে মা-বাবার সঙ্গে। কলকাতার বিখ্যাত আইনজীবী তার বাবা;—জগদীশের বাবারও তিনি বন্ধু। চিত্রাকে দেখে এক নূতন ক্ষুধা জেগে ওঠে জগদীশের চেতনার মূলে,—তার দেহভোগাতুর যৌবনের গভীরে অনাস্বাদিত এক আকুলতা। জগদীশের নাম শুনেই চিত্রা কিন্তু চম্‌কে উঠেছিল, ভয়ের ছায়া যেন পড়েছিল তার মুখে। অনেকদিন পরে চরম লগ্নে জগদীশ আবিষ্কার করেছিল,—লিওনারার খবর জানতো চিত্রা। তবু তারা ঘনিষ্ঠ হয়েছিল জাহাজেই ধীরে ধীরে। তারপর দেশে ফিরে জগদীশের বাবা মারা যান,—আর জগদীশের মাংসল ক্ষুধাতুর যৌবনের মর্মে কোরকতুল্য নিভৃত প্রেমের অনুভব-কম্পন এক আশ্চর্য পরিবর্তন রচনা করতে থাকে।

সুরশিল্পী জলধির বাধা লঙ্ঘন করেও জগদীশ খুব কাছে এসেছিল চিত্রার অন্তরে। কিন্তু বাঘ বুঝি রক্তের স্বাদ ভুলতে পারে না,—চরম মুহূর্তে শেষ রক্ষা করতে পারল না জগদীশ। কিন্তু সে কী জগদীশের ভুল,—না ভুল বুঝলো চিত্রা তাকে? সে জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া গেল না। তার আগেই,—চিত্রার কাছে নিজেকে মেলে ধরবার চেষ্টা করতে না করতেই অতিনাটকীয় দুঃসম্ভাবনায় হুড্রু ফল্‌স্‌-এ প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেল। দীর্ঘ দশবছর ধরে সন্ন্যাসীর ব্রত নিয়ে নিখোঁজ হয়েছে জগদীশ হুড্রু অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে। তার সংযম, ত্যাগ আর কৃচ্ছ্রসাধনা আদিবাসীদেরও স্তম্ভিত শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে। পিতৃসম্পদের যথাসর্বস্ব সে দান করেছে,—প্রতিবছর তার সুদ থেকে সংগীতের ডিপ্লোমা-প্রার্থিনী বিদেশযাত্রী বাঙালি বা ভারতীয় বালিকাদের বার্ষিক অর্থসাহায্য দেবার জন্যে।

আশ্চর্য শান্ত, নিরাসক্ত জীবন তার; ক্ষুন্নিবৃত্তির সংগতিও নেই। তবু অক্ষুব্ধ, স্নিগ্ধ, করুণ। কেবল নিভৃত রজনীতে চিত্রার সেই লাল শাড়িখানা,—জীর্ণ, পুরাতন শাড়িখানাকে পূজার আসনে গভীর চুম্বনে চুম্বনে ভরে তোলে।—লেখক বলেন, "সে কি চুম্বন! মনে হয় শাড়ীটির ভাঁজে ভাঁজে প্রত্যেকটি সূতার পাকে পাকে সুধা সঞ্চিত হয়েছে, অধরের স্পর্শ দিয়ে অনন্তকাল জগদীশ সে সুধা পান করে যাবে।"

কিন্তু এর শেষ কোথায়? হলাহল-দগ্ধ জীবনের শিয়রে বসে বামাচারী শিল্পীর সেই ব্যাকুল জিজ্ঞাসা,—"কিন্তু বিধাতার সৃষ্টি কি এমনি খাপছাড়া হবে? তবে এমন সৃষ্টির কি কৈফিয়ৎ তিনি দিবেন?"

গল্প হিশেবে 'ব্যথার পূজা'র প্রকরণে সেই অখণ্ড দার্ঢ্য আর সর্বাঙ্গীণ সুসংগঠনের অনিবার্যতা নেই। প্রাথমিক রচনার অপরিণতি এ-গল্পের শরীরে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে নি। তাহলেও এই সমন্বয়ী দৃষ্টি,—জীবনের অন্তর্নিহিত রহস্য-সত্যের আনন্দ-সন্ধিৎসু এই শিল্পচেতনার বামাচারী সাধনারও সিদ্ধ-ফলশ্রুতির অসংশয়িত সংকেত রয়েছে। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন অভিব্যক্তির ধারা বেয়ে সে প্রতিশ্রুতির সিদ্ধি অনিবার্য হতে পারে নি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়। এখানেই যুগদুর্লভ প্রতিভার যথার্থ অপচয়।

সেই অপচয়ের ইঙ্গিত বুঝি অঙ্কুরিত হয়েছিল 'প্রাগৈতিহাসিকে'র মত গল্পেই। সে গল্পের বিষয়ে যেমন বিষবাষ্পাচ্ছন্ন অমাবস্যার শ্বাসরোধী অন্ধকার,—তেমনি প্রকরণের মধ্যেও দৃঢ় সংহতির সূত্রে এক নির্মম নিরেট পাষাণ-কাঠিন্যই প্রখর হয়ে উঠেছে। আকারে এবং প্রকারেও একটি স্মরণীয় জমাট গল্প 'প্রাগৈতিহাসিক'। কিন্তু কেবল বিষয়ের প্রকৃতি ও আকৃতিগত নির্দোষতাই যুগান্তকারী সৃষ্টির একমাত্র উপকরণ নয়,—

শিল্পীর আত্মনিঃসৃত সত্যানুভবের সহজ আনন্দ-পরিবেশনের দাক্ষিণ্যে তার পরম সিদ্ধি। বামাচারী উপকরণ-সজ্জার মোহে এই প্রথম বুঝি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে শিল্পীর ধ্যানভঙ্গ হল।

ভিখু ছিল এক দুর্ধর্ষ ডাকাত,—হত্যা, লুণ্ঠন আর নারী-নির্যাতনে ছিল যার পাশব পৌরুষের তাণ্ডব উল্লাস। একদিন ডাকাতি করতে গিয়ে ডান হাতে চরম আঘাত পেলে ভিখু। পশুর মত কদর্য আক্ষেপে কতদিন কাটাল ঘন জঙ্গলের গাছের ডালে আত্মগোপন করে। তারপর আশ্রয়দাতা বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে লালসার প্রমত্ত খেলায় ধরা পড়ে বিতাড়িত হল। ডাকাতি করবার উপায় আর নেই,—সেই আঘাতে ডান হাতটা পঙ্গু হয়ে গেছে। পথের পাশে আর পাঁচজন ভিখারীর সঙ্গে বসে ভিখু এখন ভিক্ষে করে। পাঁচীকে দেখে লোভ হয় ভিখুর ; যুবতী মেয়ে, কিন্তু পায়ে তার ঘা ;—ভিখু ভাবে, ঘা যদি শুকিয়ে যেত, পাঁচীকে নিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধত সে। কিন্তু ঘা শুকোতে দিতে পাঁচীর প্রবল আপত্তি,—ঐটুকুই তার রোজগারের একমাত্র পুঁজি ; পায়ের কাপড় একটু সরিয়ে ঐ দগ্‌দগে ঘা দেখিয়ে সকলের দয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাঁচী,—সকলের চেয়ে বেশি ভিক্ষা জোটে তার। এ পুঁজি নষ্ট করবে সে কোন্ বিশ্বাসে! তা'বলে মধুকরের অভাব হয় না ; বসির মিঞা ঘর বাঁধে পাঁচীকে নিয়ে। ঈর্ষায় লালসায় উন্মাদ হয়ে ওঠে ভিখু। অবশেষে এক গভীর রাতে পাঁচীকে নিয়ে ঝাঁপ-খোলা কুটিরে যখন অঘোরে ঘুমিয়ে ছিল বসির, তার মাথায় বাঁ হাতের লোহার শিক আমূল বিদ্ধ করে দেয় ভিখু ; গলা টিপে শেষ নিশ্বাসটুকুর সম্ভাবনাকেও দেয় শুব্ধ করে। পাঁচী চুপ করে থাকে ভিখুর ভীতি প্রদর্শনে। তারপরে ভিখুরই নির্দেশে বসিরের সারাজীবনের সঞ্চিত গোপন অর্থের পুঁজি,—চুরি করে যার খবর একদিন জোগাড় করে নিয়েছিল পাঁচী,—তা গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ভিখুর সঙ্গে,—নতুন জীবনের পথে। রাত থাকতে অনেক দূরের পথে এগিয়ে যেতে হবে কৃষ্ণা রজনীর ক্ষীণ চাঁদের আলোয়। কিন্তু পাঁচীর খোঁড়া পায়ে ব্যথা লাগে। কেবল বাঁ হাতের জোরেই তাকে শূন্যে তুলে নেয় ভিখু,—দ্রুত পায়ে চলতে থাকে এগিয়ে। সেই যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে শিল্পী বলেন,—

"ভিখুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচী তাহার পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিল। তাহার দেহের ভারে সামনে ঝুঁকিয়া ভিখু জোরে জোরে পথ চলিতে লাগিল। পথের দুদিকে ধানের ক্ষেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গ্রামে গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।

হয়ত ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার

মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনোদিন পাইবেও না।"

নীরন্ধ্র অন্ধকার চিত্রণের এই অবিচল-কঠিন নির্লিপ্তিকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজ্ঞানের শক্তি বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন কি না, জানা নেই। কিন্তু এই দুঃসাহসী অসাধ্য-সাধনে বামাচারী কাপালিকের মতই নিচ্ছিদ্র সাফল্য লাভ করেছেন তিনি। আগে বলেছি, 'প্রাগৈতিহাসিক' জমাট-কঠিন নিটোল-সম্পূর্ণ এক ছোটগল্প। তাহলেও শিল্পীর সমাপ্তিক উপলব্ধির প্রতি লক্ষ্য করে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তের কথা পুনরায় স্মরণ করতে হয়,—"জীবনের বিকৃতিগুলি যদি জীবনের সমগ্র রূপ-পরিবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট প্রভাবশালী না হয়, তবে তাহাদিগকে মনের গোপন অবচেতন স্তর হইতে টানিয়া বাহির করার মজুরী পোষায় না।"[৭৪] এই একই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের অনন্যমনা বামাচারী কবি মোহিতলালের অনুভবের কথাও মনে পড়ে; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা প্রসঙ্গে একদা তিনি লিখেছিলেন,—"প্রথম দিকের গল্পগুলিতে কাব্যকল্পনা ও মনস্তত্ত্বের যে সমন্বয় এবং নারী-চরিত্র-বিশ্লেষণে যে অপূর্ব ভঙ্গির পরিচয় পাইয়াছিলাম, লেখকের বয়সের তুলনায় তাহা বিস্ময়কর বটে। কিন্তু পরে সৃষ্টি-কল্পনাকে বিদায় দিয়া তিনি সেই দৃষ্টি হারাইয়াছেন—চিন্ময় বাস্তবের পরিবর্তে জড়বাস্তবের উপাসনা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে।[৭৫]

এই উপলক্ষ্যে 'সরীসৃপ' গল্পটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। 'প্রাগৈতিহাসিক' যেমন অমার্জিত জীবনের গহ্বর-লীন তমসাখণ্ডকে উদ্গিরণ করেছে, তেমনি 'সরীসৃপ'-এর মধ্যে আছে শিক্ষিত, মার্জিত রুচিসম্পন্ন গৃহস্থ-ঘরে গৃহিণী ও জননী নারীর অন্ধকার-ভজনার দৃঢ় কঠিন চিত্র। চারু ছিল প্রচুর বিত্তশালী ঘরের বধূ; পাগল স্বামীর ঘরে তার নৈতিক বিশুদ্ধতার তদারক করবার জন্যে বয়ঃসন্ধিলগ্ন কিশোর বনমালীকে কৌশলে নিয়োগ করেছিলেন চারুর শ্বশুর। সেই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যচারণ বনমালীর মনে যৌন আক্ষেপ জাগিয়ে তুলেছিল,—চারু তাকে নিয়ে খেলা করত, ধরা দিত না কখনো। ভাগ্যচক্রে—স্বামি-শ্বশুরের মৃত্যুর পর সর্বস্ব হারিয়ে এই বনমালীর আশ্রিত হয়েছিল চারু, তার মানস রুগ্নতাবিশিষ্ট ছেলেকে নিয়ে। চারুর সদ্যোবিধবা ছোট বোন পরীও সেই আশ্রয়ে এসে ধরা দেয় শিশুপুত্রসহ

৭৪। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (৪র্থ সং.)।
৭৫। মোহিতলাল মজুমদার– 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য'—'সাহিত্য বিতান'।

ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুই বোনে অদ্ভুত প্রতিযোগিতার মানসিক লুকোচুরি খেলা চলে। পরী শেষ পর্যন্ত যৌবনোচ্ছ্বসিত শরীরের বিনিময়েও বনমালীকে ধরে রাখতে চায়, চারু তারকেশ্বর থেকে কলেরা রোগের বীজাণুমণ্ডিত প্রসাদ এনে খেতে দেয় পরীকে ;—কিন্তু কলেরায় মরতে হয় চারুকেই। চারুর অন্তর্ধান পটে নিজের যৌবন-ক্ষুধার আক্ষেপকে আবার নতুন করে নিজের মধ্যে আবিষ্কার করে বনমালী ; পরী ততদিনে নিঃশেষ হয়ে গেছে তার কাছে আগাগোড়া পড়ে-শেষকরা পুরাতন পুঁথির মত। শেষ পর্যন্ত বোকা মানসরোগী চারুর ছেলেকে ভুলিয়ে নিরুদ্দেশ মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয় পরী, আর পরীকে নীচের আশ্রিতাদের মহলে নির্বাসিত করে বনমালী। কিন্তু পরিণামে সকল মানব-বৃত্তির সম্ভাবনাকে ছাড়িয়ে প্রবৃত্তির নির্মায়িক নির্লিপ্তিই একমাত্র হয়ে ওঠে বনমালীর মধ্যে। সেই চরম অভিব্যক্তির লগ্নে, শিল্পী বলেন,—

"ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপরে পৌঁছিয়া গেল। মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় লইয়াছে।"

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অননুকরণীয় অতুল্য রূপ-কৃতির আর এক উপাদান সাঙ্কেতিকতা। এই সংকেতশৈলীই মানব-জীবন-চেতনা সম্পর্কে শিল্পীর অনুভবের এক আশ্চর্য বিগাঢ় ব্যঞ্জনা অনুরণিত করেছে শেষের ঐ একটি মন্তব্যে। জীবনের সত্যকে,—অন্ধকার হলেও এক অবিচল সত্যানুভবকে আয়ত্ত করা চলে এ গল্পে। সেই সঙ্গে মনস্তত্ত্ব ও নারী-চরিত্র বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণ-চকিত জীবন্ত দৃষ্টি,—সব কিছু মিলে এক দৃঢ়-কঠিন শক্তি-প্রাচুর্যের বিস্ময়কর মহিমা দীপ্ত হয়ে আছে গল্পে। 'প্রাগৈতিহাসিক'-এও সেই একই শক্তি-প্রাচুর্যের চমৎকারী বিভা! কিন্তু মনে হয়, অন্ধকার নিরুদ্দেশেই যেন অপরিমেয় শক্তির একতাল প্রাচুর্যকে নিক্ষেপ করেছেন শিল্পী। বামাচারী-জীবনসাধনার উগ্র নেশাকর উপকরণ চোখ ধাঁধিয়েছে এখানে এক যুগান্তকারী সম্ভাবনাময় শিল্পীর চেতনাতেও। 'চিন্ময় বাস্তবে'র পরিবর্তে জড় বাস্তবের লক্ষ্যভ্রষ্ট উপাসনা আশ্চর্য শক্তির দীপ্তি নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, এই অর্থেই বলছিলাম অমেয় শক্তির অকল্পনীয় পরিণতির এক অস্ফুট সংকেত বহুবন্দিত 'প্রাগৈতি-হাসিক' গল্পের অভ্যন্তরেই যেন বিলগ্ন হয়েছিল। তাই দেখি, অখণ্ড জীবনধ্যানের চেয়ে বামাচারী উপকরণ আহরণের অনিবার্য লুব্ধতা মাঝে মাঝেই শিল্পিমনকে আকর্ষণ করেছে। ফলে মনস্তত্ত্ব ও নারী-চরিত্র বিশ্লেষণের দুর্লভ ক্ষমতা রুগ্ন নিষিদ্ধ যৌন-সম্পর্ক বর্ণনার স্থূল বালুচরে ক্ষণে ক্ষণে আট্‌কে পড়েছে। সেই ভুল পথেও

কিন্তু প্রতিভার দীপ্তি চমকপ্রদ হয়েছে অনেক স্থলেই। 'মহাকালের জটার জট' এমনি একটি গল্প। তাহলেও পথভোলার দুর্বলতা থেকে কোনো শক্তিরই বুঝি রেহাই নেই,—যত বড়ই হোক্ সে প্রতিভা। তাই 'মহাকালের জটার জট'-এর মত একটি কঠিন অখণ্ডাকৃতি নিটোল ছোটগল্পের প্রসঙ্গেও ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বলতে হয় :—"আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় দুই পাশাপাশি বাড়ির লোকেরা একে অপরের প্রতি যে বেশি পক্ষপাত বা টান আকর্ষণের যে তারতম্য দেখাইয়া থাকে, লেখক সেই অকারণ প্রীতি-বৈষম্যের একটা যৌনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যাপারটির বৈজ্ঞানিকতা অপেক্ষা ইহার হাস্যকর অসংগতির দিকটাই বেশি ফুটিয়াছে।"[৭৬] তাহলেও আগেই বলেছি, নিছক গল্প হিশেবে 'মহাকালের জটার জট' একটি রূপ-সিদ্ধ সার্থক রচনা। কিন্তু একই আত্মবিস্মৃত পথে পুনঃপুনঃ বিচরণের অবচেতন গতানুগতিক অভ্যস্ততার পাষাণ-শরীরে বারবার আঘাত করে প্রতিভার ধারও বুঝি ক্ষয়ে আসে : এমন অবস্থায় অসুস্থ, একঘেয়ে নগ্নতা-চিত্রণের আকাঙ্ক্ষাও মাঝে মাঝে অনিবার্য হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও সে দুর্ঘটনা সর্বদা অতিক্রম করা সম্ভব হয় নি, এ সত্য অনস্বীকার্য। বিশেষ করে উপন্যাসের বৃহৎ বিস্তারের মধ্যেই অসুস্থ একটানা যৌনচিত্রণের গতানুগতিকতা অবসাদ-ক্লিষ্ট হয়েছে। অথচ সার্থক উপন্যাস রচনার প্রতিশ্রুতি সেকালে বুঝি একমাত্র মানিক-প্রতিভারই ছিল। তাহলেও এমন কি, প্রতিভায় দুর্লভ দীপ্তিচিহ্নিত 'চতুষ্কোণ'-এর মত রচনার প্রসঙ্গেও বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য স্বাভাবিকভাবে মনে আসে,—'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাগত অনেক উপন্যাসই যৌন মনস্তত্ত্বের ছোট ছোট পাঠ্যপুস্তক, অথবা উন্মাদরোগীদের সম্পর্কে চিকিৎসকের সংরক্ষিত রোগবিবরণীর মত মনে হয়।'[৭৭] এই মন্তব্যের গভীরতর তাৎপর্য রয়েছে। সৃষ্টির লগ্নে প্রজাপতির মতই শিল্পী নিঃসঙ্গ একক অদ্বিতীয়; প্রজাপতির মতই নিছক আত্মশক্তির সহযোগে মহাশূন্যের মধ্যে তাঁকে পথ কেটে চলতে হয়,—শূন্যতার মধ্যে গড়ে তুলতে হয় নূতন সৃষ্টির ইমারত। সেটুকু শিল্পীর আত্মার আলো দিয়ে গড়া। সন্দেহ নেই, বাইরের জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন-রাজনীতি, এমন কি পূর্বসূরীদের রচিত শিল্প-লোকের জ্ঞান আত্মার সম্পদকে সমৃদ্ধ করে। কিন্তু সার্থক সৃষ্টির পক্ষে শিল্পীর আত্মস্থতা এক অপরিহার্য পূর্বাবস্থা। বহির্জগতের সকল উপকরণ তাঁর আত্মিক

৭৬। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (৪র্থ সং.)।

৭৭। দ্রষ্টব্য :—B. Bose—'An Acre of Green Grass' (অনুবাদ বর্তমান লেখকের)।

উপলব্ধির জারকরসে জারিত হয়ে আত্মস্থ হয়ে উঠলে তবেই তা সার্থক সৃষ্টির উপকরণ হতে পারে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পি-আত্মার গহনে বামাচারী প্রকৃতির এক অ-ভূতপূর্ব জীবন-জিজ্ঞাসা, এক ভয়ানক কঠিন সত্যান্বেষণের মৌলিক প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। 'অতসীমামী', 'নেকী', 'ব্যথার পূজা', 'সরীসৃপ' প্রভৃতি আরো অনেক গল্পে সেই অদ্বিতীয় প্রবণতারই বিস্ময়কর অভিব্যক্তি। কিন্তু আগেই বলেছি, বাম-সাধকের জীবন-সত্য-সন্ধিৎসার অগ্নিদাহকে তিলে তিলে স্তিমিত আচ্ছন্ন করে এনেছিল বহিরঙ্গ উপকরণের মাদকতা। সে কেবল অসুস্থ জীবন-চিত্রণের তথ্যসম্ভারেই ভারাক্রান্ত নয়, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিল্পীর জ্ঞান-বুদ্ধি-সমাহৃত তত্ত্বের পুঞ্জিত সঞ্চয়। গল্প-উপন্যাসের শরীরে যৌনমনস্তত্ত্ব, এবং নারী-প্রকৃতি-চিত্রণের অপরিহার্য উপকরণ বিন্যাসেও স্তিমিত-দীপ্তি শিল্পি-ভাবনার অন্তর্দৃষ্টি ফ্রয়েডীয় তত্ত্বানুসরণের জ্যামিতিক রেখা অনুসরণ করে চলেছে। তাতে চরিত্রের ব্যক্তিক সজীবতা ও স্বাতন্ত্র্যের প্রাণোচ্ছলতা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে অনেক সময়েই ব্যক্তিচরিত্র তত্ত্বের projection হয়ে পড়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সকল রচনাতেই প্রতিভার সমান উজ্জ্বলতা রক্ষিত হতে পারে নি। কিন্তু তাঁর শক্তির প্রাচুর্য-চিহ্নিত 'মহাকালের জটার জট' গল্পের চরিত্রায়ন ও প্লট্ সম্পর্কেও একই কথা বলতে হয়।

নিয়ত প্রাণনের প্রতিশ্রুতি-সম্বদ্ধ সজীব শিল্পি-আত্মা এই বহির্ভারে স্বভাবতই আড়ষ্ট হয়ে পড়ে; বস্তু এবং তথ্য-তত্ত্বের ভার থেকে সত্যের জগতে সে মুক্তি কামনা করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাই করেছিলেন। কিন্তু সেও আসলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আর যৌনতথ্যের জগৎ থেকে বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের নিকট ক্লান্ত শিল্পি-মানসের আত্মদান। মতবাদ-বিশেষের দোষগুণের বিচার সাহিত্য-সন্ধিৎসুর নয়। কিন্তু সাহিত্যের নির্মাণশালা মতবাদের লৌহবাসরে নয়, আত্ম-উপলব্ধির নন্দনলোকে; তথ্য এবং তত্ত্বের বোঝাকে শিল্প-মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে ফেলে কেবল সত্যানুভবের সঞ্চয় নিয়ে সৃষ্টির আনন্দ-লোকে শিল্পীর প্রবেশাধিকার। প্রতিভার স্বধর্মবশে কাপালিকের যে শ্মশান-সাধনায় মানিক স্বেচ্ছাবৃত হয়েছিলেন, চারপাশের বাধা-বিরুদ্ধতা,—শিল্পীর ব্যক্তি-জীবনের হতাশা, অসাফল্য এবং ক্রূর বঞ্চনালাভের কথাও এই প্রসঙ্গে অবিস্মরণীয়,—তার উজান ঠেলে বহুদূর এগিয়ে যাবার উপায় বুঝি অতবড় প্রতিভারও ছিল না। ফলে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় নূতন যে পথে ব্যক্তি-শিল্পী পাড়ি দিলেন, তাঁর সৃজনশীল আত্মার বন্ধন তাতে ঘুচল না। তাই, 'আজকাল পরশুর গল্পে'র মত প্রখ্যাত রচনাতেও জীবন অনুপস্থিত,—সুস্থ

আশাবাদের বলিষ্ঠ অভিব্যক্তির আকাঙ্ক্ষায় প্লট্ এবং চরিত্রগুচ্ছ এক বিশেষ মতবাদের জ্যামিতিক প্রতিপাদ্যের projection হিশেবেই যেন যান্ত্রিক পরিণামের পথে এগিয়ে যায়।

ফলকথা, শক্তিপ্রাচুর্যভূয়িষ্ঠ কল্লোলযুগের মাটিতেও যে অলৌকিক আগুনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিলেন এই ছন্নছাড়া শিল্পি-প্রাণ,—তাতে আলো আর তাপ যত দিয়েছেন,—উল্কার মত নিজে ছাই হয়ে পুড়ে গেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন আগুনের এক মস্ত মশাল; বুঝি দেশকালের প্রতিকূলতার ফলেই সে মশাল আকাশে উর্ধ্বশিখা মেলে জ্বলবার সাধনায় অনেকখানি ধোঁয়া আর ছাই হয়ে নিঃশেষিত হয়ে গেল। এই মহৎ বিনষ্টি ইতিহাসের পরম জিজ্ঞাসার উপকরণ, একদিন তার উত্তর নিজের প্রয়োজনেই খুঁজে পেতে হবে দেশকে—দেশের সাহিত্যকে।

সৃষ্টির প্রয়াস মানিকের কেবল নেশা ছিল না, প্রায় একমাত্র পেশাও ছিল। প্রথম জীবনে একবার 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদনা-দপ্তরে স্বল্প আয়ের ক্ষণস্থায়ী চাকরি, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গে সামান্য জীবিকার্জনের চেষ্টা ছাড়া নিতান্ত আধিভৌতিক প্রয়োজনেও কলমের ওপরেই ছিল তাঁর একমাত্র আশ্রয়। তাই প্রাণের দাবিতে যত, পেটের দায়ে হয়ত তার চেয়েও বেশি লেখনীচালনা করে গেছেন মানিক। ফলে সৃষ্টির পঞ্জী তাঁর অজস্রতার প্রাচুর্যে ভরপুর। গল্পসংকলন গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে—'অতসীমামী' (১৯৩৫), 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭), 'মিহি ও মোটা কাহিনী' (১৯৩৮), 'সরীসৃপ' (১৯৩৯), 'বৌ' (১৯৪৩ ?), 'সমুদ্রের স্বাদ' (১৯৪৩), 'ভেজাল' (১৯৪৪), 'আজকাল পরশুর গল্প' (১৯৪৬), 'পরিস্থিতি' (১৯৪৬), 'হলুদপোড়া' (১৯৪৭), 'খতিয়ান' (১৯৪৭), 'ছোটবড়' (?), 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী' (১৯৪৯), 'ফেরিওয়ালা' (১৯৫৩), 'লাজুকলতা' (১৯৫৪) প্রভৃতি। তাছাড়া 'শ্রেষ্ঠ গল্প' ও 'স্বনির্বাচিত গল্প'-সংকলনে গ্রন্থাকারে পূর্বসংকলিত গল্পগুলির কিছু কিছু পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বাংলা গল্পের দ্বিতীয় পর্ব (৩)

কল্লোল বনাম কল্লোলেতর

একহাতে তালি বাজে না,—এক পায়ে চলা যায় না। কল্লোল-যুগে সাহিত্যের রথ যে-দুটি চাকার ওপরে ভর করে এগিয়েছিল তার একটি পদ গঠিত হয়েছিল 'কল্লোল'-'কালিকলম'-'প্রগতি'-'উত্তরা'র নির্মাণ-শালায়, অর্থাৎ ঐসব পত্র-পত্রিকায় গড়ে ওঠা শিল্পি-চেতনার গহনে। অন্য পদে ছিল 'শনিবারের চিঠি' আর 'বঙ্গশ্রী' প্রভৃতি পত্রিকার ভূমিকা। এ-কথা আগেও বলেছি। কল্লোল-গোষ্ঠীর শিল্প-প্রকৃতির যে হিশাব-নিকাশ এ-পর্যন্ত গ্রহণ করা গেছে,—তাতে প্রথম চলার অতি-উল্লাস ক্ষণেক্ষণেই মাত্রাকে যে অতিক্রম করেছিল তার পরিচয় স্পষ্ট। সেকালের তরুণ শিল্পী আজ যাঁরা স্থিতধী হয়েছেন, তাঁদের কণ্ঠেও এই ঐতিহাসিক স্বীকৃতি অধুনা প্রায় অকুণ্ঠিত। কিন্তু প্রত্যেক সংঘটনেরই নাকি সমশক্তি-সম্পন্ন বিপরীত প্রতি-ঘটনা রয়েছে,—বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'Every action has its equal and opposite re-action'; আর তাতেই নাকি বিশ্ব-নিয়মের ভারসাম্য রক্ষিত হয়ে থাকে। কল্লোল-যুগে সেই 'প্রতিঘটনা',—তথা রথযাত্রার সেই দ্বিতীয় চক্রপদের ভূমিকা মুখ্যত 'শনিবারের চিঠি'র। 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় ঝড়ের আঁধি কেটে গিয়ে অনেকটা পরিচ্ছন্ন আকাশের তলায় দুপক্ষের যুযুধানেরা অনেকেই আবার একত্র মিলিত হয়েছিলেন নবযুগ-জীবন অনুধ্যানের প্রশান্ততর সাধনায়। কেবল তারাশঙ্কর, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরাই নন,—'বঙ্গশ্রী'র কালে শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র, এমনকি যুবনাশ্ব প্রভৃতিরাও এসে মিলেছিলেন,—সম্পাদক সজনীকান্ত একথা পরিতৃপ্তি সহকারে স্মরণ করেছেন।[১] এদিক থেকে 'শনিবারের চিঠি' চিরকালেই যুযুৎসু,—সাহিত্যের সত্যকে যোদ্ধার মূর্তিতে ভজনা করাতেই তার অটুট-বিশ্বাস। কিন্তু 'বঙ্গশ্রী'র আসন স্তব্ধ ধ্যানীর—অসত্যকে আঘাত করা নয়,—সত্যকে জন্মদান করার সাধনাই ছিল তার মুখ্য ব্রত। কালের দিক থেকেও 'বঙ্গশ্রী' পরাগত,—অর্থাৎ ঝড়ের শেষে 'নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে' স্নিগ্ধ বৃষ্টি ধারা যখন ঝরতে শুরু করেছে, সেই ভ্রুকুটিমুক্ত প্রচ্ছায়তলে তার আবির্ভাব। 'কল্লোল' প্রথম

১। দ্রঃ সজনীকান্ত দাস—'আত্মস্মৃতি'—দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩০ বাংলা সালে, 'কালিকলম' ১৩৩৩, আর 'প্রগতি'র স্বল্পস্থায়ী জীবনের শুরু ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে। অন্যপক্ষে নিছক উদ্দেশ্যহীন কণ্ডুয়নবৃত্তি চরিতার্থ করবার আমোদ-কামনা নিয়ে সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' জন্মলাভ করে ১৩৩১ বাংলা সালের ১০ই শ্রাবণ, ঐ বছরেই ৯ই ফাল্গুনের পরে সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠির নিয়মিত অভিব্যক্তি বন্ধ হয়ে যায়। মাসিক আকারে তার পুনঃ প্রকাশ ১৩৩৪ বাংলার ভাদ্র সংখ্যা থেকে। এবারেই প্রথম সজনীকান্ত দাস হলেন তার মুখ্য হোতা ;—আর সুপরিকল্পিত নীতি-নিয়মের অনুসরণে অগ্রসর হল সাহিত্যিক যুদ্ধ-প্রয়াস। ঐ ১৩৩৪ সালেই সাহিত্য-নীতির বিতর্কে বাংলার আকাশ-বাতাস ঝটিকাক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে,—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। কবির উদ্দেশ্যে প্রথম আহ্বানবাণী অবশ্য উচ্চারিত হয়েছিল সজনীকান্তের কণ্ঠ থেকেই। ১৩৩৩ বাংলা সালের ফাল্গুন মাসে অনিয়মের রাজ্যে নিয়ম-শাসনের তর্জনী উত্তোলনের আমন্ত্রণ জানিয়ে কবিকে তিনি লিখেছিলেন,—"সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ বাংলা দেশে যে একধরনের লেখা চলছে, আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন। প্রধানত কল্লোল ও কালিকলম নামক দুটি কাগজেই এগুলি স্থান পায়। অন্যান্য পত্রিকাতেও এ-ধরনের লেখা সংক্রামিত হচ্ছে। এই লেখা দুই আকারে প্রকাশ পায়—কবিতা ও গল্প। কবিতা ও গল্পের যে রীতি আমরা এতাবৎ দেখে আসছিলাম, লেখাগুলি সেই রীতি অনুসরণ করে চলে না।…লেখার বাইরেকার চেহারা যেমন বাঁধ-বাঁধনহারা ভেতরের ভাবও তেমনি উচ্ছৃঙ্খল। যৌনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব অথবা এই ধরনের কিছু নিয়েই এগুলি লিখিত হচ্ছে। যাঁরা লেখেন, তাঁরা continental literature-এর দোহাই পাড়েন। পৃথিবীতে আমরা স্ত্রী-পুরুষের যে সকল সম্পর্ককে সম্মান করে থাকি, এই সব লেখাতে সেইসব সম্পর্ক-বিরুদ্ধ সম্বন্ধ স্থাপন করে আমাদের ধারণাকে কুসংস্কার শ্রেণীভুক্ত বলে প্রচার করবার একটা চেষ্টা দেখি। আমরা কতকগুলি বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও নাটকের সাহায্যে শনিবারের চিঠিতে এর বিরুদ্ধে লিখেছিলাম।"[২]

সরাসরি সেই বিরোধের ঘূর্ণাচক্রে আত্মসমর্পণ করতে রবীন্দ্রনাথ রাজি ছিলেন না। তাহলেও 'সাহিত্যের ধর্ম' নির্দেশ করে তিনি ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন—তাকেই উপলক্ষ্য করে তরুণের কোলাহল প্রায় দেশব্যাপী সংগ্রামের আকার ধরেছিল। সে-সব প্রসঙ্গ বর্তমান

২। 'মাসিক শনিবারের চিঠি' ভাদ্র, ১৩৩৪।

উপলক্ষে অপরিহার্য নয়। কেবল লক্ষ্য করা উচিত, কল্লোল-গোষ্ঠীর মধ্যে 'অনিয়মাধীন উদ্দামতা'র যে যৌবনোল্লাস প্রথম প্রকাশের লগ্নে উচ্ছ্বাসতীব্র হয়ে উঠেছিল, তাকে প্রতিরোধ করবার স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন প্রধানত 'শনিবারের চিঠি', আর তার সম্পাদক অথবা প্রধান নিয়ামক হিশেবে গোষ্ঠীপতি সজনীকান্ত দাস। যেমন 'কল্লোল'-'কালিকলম', তেমনি 'মাসিক শনিবারের চিঠি'রও প্রথমবারের মত জীবনান্ত হয়ে গিয়েছিল ১৩৩৬ সালেই। ১৩৩৮-এ 'শনিবারের চিঠি'র পুনরভ্যুদয় ঘট্‌তে না ঘট্‌তেই 'বঙ্গশ্রী'রও আবির্ভাব ঘটে ঐ বছরের পৌষ মাস থেকে। এই অর্থেই, ঝড়ের শেষে স্নিগ্ধ পরিণামের প্রতিশ্রুতি বহন করে এনেছিল 'বঙ্গশ্রী',—কল্লোল-প্রতিক্রিয়ার বিস্ফোরণ যা-কিছু, এর পরেও 'শনিবারের চিঠি'তেই তার লাভাস্রোত উদ্গিরিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে প্রচলিত ধারণা রয়েছে,—একপক্ষে নীতি-ঘাতনের প্রয়াস যত অমার্জনীয় হয়েছিল, অপরপক্ষ ততই কঠিন হস্তে ধারণ করেছিলেন শুদ্ধির ন্যায় দণ্ড। কিংবা উল্টো কথাও শোনা যায়,—প্রথম প্রয়াসের মূলে অতি-শায়িতার যে মদিরতা ছিল, কালের হাতের সহজ চিকিৎসাতেই তা অনায়াসে লুপ্ত হয়ে যেতে পারত। 'শনিবারের চিঠি'র পক্ষে সেই পঙ্কোদ্ধারের উৎসাহ-উল্লাসই পাঠক-রুচি এবং সাহিত্যিক পরিবেশকে অকারণে কর্দমাক্ত করে তোলে। ইতিহাসের নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সেদিনের ঘটনাকে আজ যদি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়, তাহলে দেখা যাবে, এই বিপরীত-সাধনাও আসলে ছিল যুগ-স্বভাবেরই এক অনিবার্য অভিব্যক্তি। অর্থাৎ, কল্লোলদলের অতিচারে যেমন, 'শনিবারের চিঠি'র অত্যুৎসাহী প্রতিরোধেও তেমনি এক ক্রান্তিলগ্নের যৌবন-স্বভাবই জীবনের দুই পরস্পর-বিপরীত কোটি থেকে স্বত-উৎসারিত হয়েছিল। পরিণত-মানস সজনীকান্তের ভাষাতেই সেই যৌবনোল্লাসের পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে,—"তরুণ হনুমান জননী অঞ্জনার স্নেহক্রোড় ছাড়িয়া নিদারুণ ক্ষুধার বশে পাকা ফল ভ্রমে রক্তবর্ণ সূর্যকে করায়ত্ত করিবার জন্য মহাশূন্যে লম্ফ প্রদান করিয়াছিল। ভ্রম তাহার তারুণ্যের; বস্তু ও মানুষের যথাযথ মূল্যবোধ এই অবস্থায় থাকে না—ছোটকে বড় মনে হয়। বড়কে ছোট। উভয় পক্ষেই এই ভুল ঘটিয়াছিল।"[৩]

এখানেই শেষ নয়,—এমন কি উত্তাল বিরোধিতার ঝঞ্ঝামুখর দিনেও 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠাতেই এই সত্যের সহজ স্বীকৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৩৮ সালের চৈত্র সংখ্যায় 'সংবাদ সাহিত্য'-তে লেখা হয়েছিল—

৩। সজনীকান্ত দাস—'আত্মস্মৃতি' ১ম খণ্ড।

"সাহিত্যের নামে কিছুকাল যাবৎ যাহা শুরু হইয়াছে তাহাকে সাহিত্য বলিয়া গণ্য না করিলেই চলিত কিংবা ঠাট্টা তামাসা করিয়া উড়াইয়া দিলেই যথেষ্ট হইত—শনিবারের চিঠি প্রথম প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল তাহাই। কেবল সাহিত্যে নয়, আধুনিক সমাজে যাহা কিছু মেকি ও মিথ্যা বলিয়া মনে হইয়াছে তাহাই লইয়া রঙ্গ করা তাহার অভিপ্রায় ছিল এবং এই রকমের আমোদে নিজেদের খোশখেয়াল চরিতার্থ করিবার সুযোগ আমরা প্রথমে লইয়াছিলাম। কিন্তু সহসা সেই সময় সাহিত্যের আদর্শ লইয়া একটা বিতর্ক আরম্ভ হয়…।"

তাহলেও 'শনিবারের চিঠি' স্পষ্টই অনুভব করছিল,—"যে যুগে যাহা অনিবার্য তাহা ঘটিবেই—যে সকল কারণে সমাজ ও সাহিত্যে এই অধঃপতন ঘটিয়াছে তাহার নিরাকরণ কোনো পত্রিকার সাধ্যায়ত্ত নয়। এজন্য শনিবারের চিঠি কোনো সংস্কার-কর্মে ব্রতী হয় নাই।" তাহলেও, 'মিথ্যানীতির প্রচার' ঘটতে থাকলে "তাহার প্রতিবাদ—কোনো নীতির পক্ষ হইতে নয়—স্বভাবের নিয়মেই অপরিহার্য। শনিবারের চিঠি সেই স্বভাব-ধর্মেরই অভিব্যক্তি।"

কল্লোল-বনাম-কল্লোলেতর সংগ্রামের তাৎকালিক ইতিহাসের সার্থক সাহিত্যিক ফলশ্রুতি সন্ধান করতে হবে এই স্বভাব-নিয়ম-ধর্মের পটভূমিতেই। সেদিক থেকে কল্লোল-বিরোধী এই শিল্পিগোষ্ঠীর হাতে বাংলা গল্প-সাহিত্যের নগদ লাভ হাস্য ও ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা-শৈলীর নবতর অভ্যুদয়। বস্তুত 'সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠি'র জন্ম-ইতিহাস এই নূতন সৃজন-প্রেরণারই মূলে। মুখ্য পরিকল্পনাকারী অশোক চট্টোপাধ্যায়,—সেকালের শ্রেষ্ঠ বাংলা-ইংরেজি-হিন্দী সাহিত্য-পত্রিকাত্রয়ী 'প্রবাসী'-'মডার্ণ রিভিউ'-দাসী'র স্বত্বাধিকারী ও ইতিহাস-বিশ্রুত সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র। তখনই তিনি পিতার পত্রিকা-প্রতিষ্ঠানের নিয়ামক-মণ্ডলীর এক শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ। তা সত্ত্বেও অশোক, যোগানন্দ দাস, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় ও সুধীরকুমার চৌধুরী এক সন্ধ্যায় হেদুয়ায় চানাচুর চিবোতে চিবোতে 'চিঠি'র পরিকল্পনা করেছিলেন নিজেদের অন্তরচাঞ্চল্যকে মুক্তি দেবার বাহন হিশেবে। কারণ 'প্রবাসী'র গুরুগম্ভীর প্রগাঢ়তার মধ্যে লঘুচালের কণ্ডূয়নবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন অসম্ভব ছিল।

সজনীকান্তও যে এই দলে ভিড়ে গিয়েছিলেন, সে ঐ মৌলিক কণ্ডূয়নবৃত্তির দুর্নিরোধ্য প্রেরণাবশেই। জীবনের অসংগতি এবং মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে নিতান্ত লঘুগতি হাস্য-পরিহাস ব্যঙ্গবিদ্রূপ নিয়েই দিন কাটছিল 'শনিবারের চিঠি'র, কেটেও যেত তেমনি। অর্থাৎ, তার 'সাপ্তাহিক দশা'বিমুক্তির পরে লঘু চালের হাল্কা মেজাজের হাওয়ায় বুদ্বুদের মত এক আধ ঝলক ভেসে হয়ত উঠত—আবার মিলিয়ে যেতেও

বিলম্ব হত না। কিন্তু এই খামখেয়ালী লঘু চালের হাল্কা মেঘকে উদ্দেশ্যের পাষাণ-কাঠিন্যে জমাট করে কুঠার গড়লেন সজনীকান্ত। বস্তুত তাঁর আন্তরিক প্রেরণার উৎসাহেই সমব্রতী হাস্যরসিক শিল্পি-কুল 'শনিবারের চিঠি'র আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। ঐ কেন্দ্রীয় শক্তি-সংহতির অভাবে বিস্রস্তপ্রায় হাসির মজলিশ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠায় নানাভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকত। অতএব 'শনিবারের চিঠি'র মধ্যে কল্লোলযুগের প্রতিঘটনার গাল্পিক স্বভাবকে প্রথমে সন্ধান করতে হবে সজনীকান্তের শিল্পিপ্রকৃতির মধ্যেই।

১। হাসির গল্পে 'শনিবারের চিঠি'র দল

সজনীকান্ত দাস

ব্যক্তিক প্রবণতায় স্বতন্ত্র হলেও অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও নিরুপায় জীবনযন্ত্রণাবোধে সজনীকান্ত দাসও (১৯০০—১৯৬২) ছিলেন আসলে 'কল্লোল'-যুগেরই প্রতিনিধি শিল্পী;—অর্থাৎ এক বিষণ্ণ অস্থির ক্রান্তিলগ্নের অভিঘাতে পীড়িত-চেতন। তাঁর 'অজয়' উপন্যাসকে অচিন্ত্যকুমার কল্লোল-শিল্পীদের অনতিদূর সগোত্র বলে দাবি করেছেন।[৪] নিছক যৌন-ভাবনার দিক থেকেও এই অনুভব যে সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়, সজনীকান্তের আত্ম-উদ্ঘাটনের মধ্যে তার প্রমাণ রয়েছে। স্পষ্ট ভাষাতেই তিনি জানিয়েছেন,—"আদিরস বা 'লিবিডো'র উত্তাপ বা ভাবনা ছাড়া কোনো শিল্পীর জীবন সম্পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, সাহিত্য-শিল্পীর জীবন তো নয়ই। ইহার প্রকাশ কোথাও উদ্দাম, কোথাও সংহত; সংহতি যত বেশি, শিল্পীর সাহিত্য-জীবনের প্রভাব ও পরিমাণ তত বেশি। সুতরাং সাহিত্যিকের প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন যৌন-জীবন কদাচ উপেক্ষণীয় নয়।" ফলকথা, নিজের সৃষ্টি-পীড়ার মূল-ভূমিতে যৌন-চেতনার আক্ষেপকে সচেতনভাবেই অনুভব করেছেন শিল্পী, 'পাশ্চাত্ত্য কবিদের মত যৌনজীবন ও সাহিত্য জীবনকে' অভিন্নসূত্রে গ্রথিত করার পদ্ধতিই তিনি অবলম্বন করেছিলেন 'অজয়' রচনা করবার সময়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত "অজয় উপন্যাসের আকার লইয়াছিল, ইতিহাস হইয়া উঠিতে পারে নাই।"[৫] এখানেই সজনীকান্তের ব্যক্তি-প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য;—"যৌবনের বিপুল প্রাণ-ধর্ম সত্ত্বেও" 'সত্যের মুখ চাহিয়াও' আত্মপ্রকাশে তিনি উদ্দাম হতে পারেন নি; নিজের জ্ঞান-বিশ্বাস মত সংহতি ও সংযমের কঠিন নির্মোকের

৪। দ্রঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—'কল্লোলযুগ'। ৫। সজনীকান্ত দাস—'আত্মস্মৃতি'—১ম খণ্ড।

অন্তরালে নিজের সৃজনীশক্তির মূলভূমিতে, সহজ যৌন ভাবনাকে সংবৃত করেছিলেন। তা না-হলে কেবল 'কন্টিনেন্ট্যাল সাহিত্যে'র অধ্যয়ন ও চর্চাতেই নয়, কন্টিনেন্ট্যাল বাস্তব জীবন-অভিজ্ঞতার প্রাচুর্যেও সজনীকান্ত সমকালীন অনেকের চেয়ে কম প্রাগ্রসর ছিলেন না,—মূল্যও তাকে কম দিতে হয় নি। অর্থাৎ, ব্যক্তি-মনের ধাতুপ্রকৃতি ছাড়া আরো প্রায় সব দিক থেকেই 'কল্লোলে'র কালের মাটির সঙ্গে সজনীকান্তের মানস সাযুজ্য ছিল নিকটবর্তী। গল্প-ভাবনাতেও সেই নৈকট্যের স্পর্শ অনুভূত হয়ে থাকে।

গল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিহাস-রসিক ব্যঙ্গ-শিল্পী হিশেবেই তাঁর মুখ্য স্মরণীয়তা। তাহলেও সিরিয়াস্ গল্পও বেশ কিছু লিখেছিলেন সজনীকান্ত,—'আকাশ-বাসর' নামে একটি সিরিয়াস্ গল্পের সংকলন গ্রন্থও তাঁর প্রকাশিত হয়েছিল। 'কল্লোলে'র মাটিতে নরনারীর প্রণয়-সম্পর্কের গভীরে যে অভিনব বৈচিত্র্য আর রহস্য-জটিলতার অনুভব সেদিন অঙ্কুরিত হচ্ছিল, তাঁর প্রতি শিল্পি-মনের সহৃদয় অবধানের পরিচয়ই আভাসিত হয়েছে ঐ সব অনেক গল্পে। 'গল্প' নামে জীবনের একেবারে প্রথম-লেখা গল্পতেও সেই স্পর্শকাতর মনোভঙ্গির অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি: এক ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে যাবার পূর্ব-রাত্রিতে ইঞ্জিচেয়ারের অলস শয্যায় এলিয়ে পড়ে গল্পের নায়ক 'স্বপ্নে ও বাস্তবে' মেশানো জীবনের রহস্য-ছবি আবিষ্কার করেছিল, তাতে বিবাহিত জীবনেও পরতর নায়িকার স্নিগ্ধ দৃষ্টির আশ্রয় লাভের লুব্ধতা অস্ফুট বাসনার ব্যঞ্জনার মতই অনুভূত হয়েছে। 'আকাশ বাসর' গল্পে দেখি জীবনের ব্যাকুল আশা আর নিদারুণতর নৈরাশ্যের মধ্যে এক রহস্যজনক ফুলঝুরি খেলা চলেছে। ললিতমোহন শিল্পী,—বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রও। এ-দুয়ের মধ্যে সাহিত্য-সাধনাই তার আত্মার ব্রত। সেই সৃজন-সার্থকতার পথ ধরেই তার জীবনে অশোকার প্রেমাভিসার। কৃতী ব্যারিস্টার-পুত্রের সঙ্গে নিশ্চিত বিবাহ-সম্ভাবনার বলিষ্ঠ আশ্রয় ছেড়ে সাহিত্যের খেয়ালী স্রষ্টার হাতে জীবন সমর্পণ করেছিল অশোকা। কিন্তু বিয়ের পরে ধীরে ধীরে দেখা গেল, সাহিত্যিক স্বামীর গৌরব-ধ্বজা বয়ে অশোকার তৃপ্তি নেই; মা-বাবা-বোনেদের আশাহত দুঃখ ও কটাক্ষ তাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। তাদের চোখে জীবনের একমাত্র মূল্য অর্থের মাপকাঠিতে। ললিতমোহনের সৃষ্টি-বাসনার কেন্দ্রভূমি থেকে ধীরে ধীরে অশোকা অপসৃত হয়ে যায়। নিজের ঘর থেকে,—গৃহিণীর হৃদয়-সান্নিধ্য থেকে নিজের শিল্প-সাধনাকে নির্বাসিত করে গোপনে ছাদে উঠে আসে ললিত। মুক্ত আকাশের তলায় রচিত হয় তার নতুন সৃষ্টি-বাসর। পাশের বাড়ির শিল্পীর স্টুডিও চোখে পড়ে; আরো পরে চোখে পড়ে তার স্ত্রীর আত্মহত্যার প্রয়াস।

প্রতিবেশিনীকে অপঘাত-মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে ললিতমোহন। এই সময়েই আকাশ-বাসরে তার প্রাণ-নিঃস্পন্দী সৃষ্টির ধরা অবারিত হয়। স্বামিস্ত্রীর মত-বিরোধের ফলে অশোকা তখন দিদির সঙ্গে দার্জিলিং বেড়াতে চলে গেছে।

এই সময়ে পাশের বাড়ির দম্পতি-যুগলকে রক্ষা করতে ললিতমোহন তার প্রথম উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি বিক্রি করে' পাঁচশ টাকার চেক্ তুলে দেয় প্রতিবেশিনীর হাতে। দিনে দিনে ক্লান্ত দেহের ওপরে ক্ষয়রোগের কালো ছায়া ঘনিয়ে আসে। ললিতমোহন তার অচরিতার্থ জীবনের উপান্তে এসে পৌঁচেছে; এমন দিনে তার উপন্যাস 'করুণা' বাজারে প্রকাশিত হয়ে অসামান্য কীর্তি এবং অযাচিত অর্থের প্রতিশ্রুতি বয়ে আনে। এই উপন্যাসটিই প্রতিবেশিনীর বিপন্মুক্তির জন্য বিক্রি করেছিল ললিতমোহন। দার্জিলিং-এ অশোকার মা এবার গর্বিত, কন্যাকে উপদেশ দিলেন ফিরে যেতে; কারণ ললিত এবার অনেক অর্থ উপার্জন করে, তা তো সাম্‌লে রাখা চাই! অশোকাও ফিরে যেতে চায়, এই "অকারণ দ্বন্দ্বকে" সে আর জীইয়ে রাখতে পারে না, 'ক্ষমা চাহিবার জন্য মন তার ব্যাকুল'। কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়েও ললিতমোহন অশোকাকে খবর দিতে রাজি নয়। প্রতিবেশী দম্পতির সহায়তায় আকাশ বাসরে তার মৃত্যু-শয্যা রচিত হয়েছে,—পিসিমা এসেছেন। চরম মুহূর্তে একহাত পিসিমার হাতে, আর এক হাত "দুঃখ দিনের সঙ্গিনীর হাতের মুঠোর মধ্যে" রেখে শুয়েছিল ললিতমোহন। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে, তার দ্বিতীয় উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিও "ধীরে ধীরে তাহার সঙ্গিনীর হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, 'দুর্দিনের বন্ধুর এই শেষ দান, আর কিছুই আমার নাই'। মেয়েটি তখন ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।"

তারপর আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল, প্রলাপের ঘোরে ললিতমোহন বলে চল্‌ল,—"অশোকা এস, এস—দেখ আমার আকাশ-বাসর কেমন নিরিবিলি, কই তুমি এলে না? বেশ।"

ক্রমে "সে আবার নিঝুম স্তব্ধ হইয়া পড়িল। সে স্তব্ধতা আর ভাঙিল না। চিরন্তন মানবের চিরন্তন ইতিহাস সমাপ্ত হইল।"

গল্প এখানে শেষ হয়েছে,—মানুষের কোন্ ইতিহাসের চিরন্তনতার ইঙ্গিত নিয়ে! একি সেই বহুশ্রুত কবি-কথা,—"যাহা চাই, তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না!"

অশোকা একদিন ললিতের জীবন-ব্রতকে ভালবেসে তাকে বিবাহ করেছিল—সকল হিন্দু-দম্পতির মতই বিবাহের রাত্রে ললিত তার নতুন পত্নীকে বেদমন্ত্রে আহ্বান করে নিশ্চয়ই বলেছিল,—'আমার ব্রতে তোমার হৃদয় দিয়ো',—অপর পক্ষ থেকেও

দেবভাষায় তার প্রত্যুত্তরও এসেছিল ঠিক। তবু বিধির বিধানে একজনের ব্রতের সঙ্গে আর একজনের হৃদয়ের জোড় মিলেও মিলল না। নিজের প্রাণক্ষরা সৃষ্টির যে সম্পদ অশোকার মনের ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে তুলতে পারলে ললিত ধন্য হতে পারত, তাকে উৎসর্গ করে গেল 'দুঃখদিনের সঙ্গিনীর হাতে'; স্রষ্টার জীবনের এই অসমাপ্ত দান কত যন্ত্রণায় উৎসর্গিত হ'ল,—যে পেলে সেও সম্পূর্ণ করে নিতে পারল না,—চোখের জলের মূল্য দিয়েই হাতে হাতে জীবন-মূল্যের বিকল্প দান দিলে চুকিয়ে। প্রাপ্তির পথ ধরে কত বঞ্চনা,—অপ্রাপণীয়তার মাধ্যমে প্রাপ্তির কত প্রতিশ্রুতি! প্রথমটিকে পেয়েও হারাতে হয়, দ্বিতীয়টিকে কিছুতেই পাবার উপায় নেই,—মানুষের জীবনের এ এক দুরপনেয় সমস্যা।

সমকালীন জীবন-যন্ত্রণানুভবের এই সকল মুহূর্তে ব্যঙ্গ-শিল্পী সজনীকান্তও আসলে emotional. বস্তুত 'আকাশবাসর' গল্প-গুচ্ছ, তথা তাঁর সকল সিরিয়াস্ রচনারই অনুধাবন করলে সংশয় থাকে না,—অক্লান্তকর্মা এই ব্যঙ্গ-যোদ্ধাও মৌলিক প্রকৃতিতে ছিলেন একান্ত আবেগ-তপ্ত-চেতন। আর কেবল যৌবন-বাসনার আক্ষেপেই নয়, হিন্দুর সুচিরস্থায়ী পরিবার-মূল্যবোধের প্রতিও তাঁর আবেগ-মথিত চিত্তের এক সশ্রদ্ধ অনুরক্তি ছিল। কেবল এই কারণেই নিজ গল্প-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে 'আকাশবাসর'-সংকলনের প্রথম দুটি গল্প 'হরিমতি' আর 'কেষ্টর মা'-র প্রসঙ্গ তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন। গল্প হিসেবে এর কোনোটিই উল্লেখ্য উৎকর্ষ দাবি করতে পারে না; বস্তুতঃ সজনীকান্তের সিরিয়াস্ রচনায় মধ্যে গল্পের শরীর সুগঠিত অথবা প্রাণদীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি প্রায়ই,—স্মরণীয় সৃষ্টির সম্ভার তিনি রেখে গেছেন পরিহাস-রসান্বিত গল্পের মধ্যেই। তাহ'লেও তাঁরও শিল্পী আত্মা যে আসলে কল্লোল-যুগ-বেদনারই মৃৎ-সম্ভব, এই তাৎপর্যের অনুধাবন উপলক্ষেই সজনীকান্তের সিরিয়াস্ গল্পগুচ্ছ স্মরণীয়তার অপেক্ষা রাখে। 'হরিমতি' গল্পে দেখি, গৃহিণীর অসুস্থতা আর পরিবেশের অপ্রত্যাশিত অভিঘাতে এক কুৎসিত-দর্শনা পরিচারিকা সদ্যোজাত মনিব-সন্তানের মা হয়ে উঠেছিল দিনে দিনে। গৃহিণী চিরদিন হরিমতির উপরে বিরূপ ছিলেন, প্রতিদিন কল্পনা করতেন একটু সুস্থ হলেই ওকে তাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু সুদীর্ঘ কয় বছর ধরেই সে সুযোগ আর এল না। বহুকাল পরে, একদিন সুস্থ হয়ে গৃহিণী সত্যিই যখন নিজের ছেলের ভার নিজের হাতে তুলে নিয়ে হরিমতিকে জবাব দিলেন, অসহায় পরিচারিকার সেদিনকার দেহমন-প্রাণের সুভীষণ রিক্ততাবোধের মধ্যে গল্পের কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। 'কেষ্টর মা'-ও পরের ছেলের মা হয়ে ওঠার এক যন্ত্রণার্ত জটিল উপাখ্যান। শরৎচন্দ্রীয় গল্প-ভাবনার ওপরে শিল্পীর মনের আবেগ-দুর্বল ভাবালুতা প্রগাঢ় বর্ণে অঙ্কিত হয়েছে; যদিও সংবাদিকতাধর্মী তথ্য বর্ণনায় বিস্তারিত প্রান্তরে

গল্পের অন্তর্নিহিত হৃদয়ানুভব ছোট-গাল্পিক সংহতি ও সামগ্রিকতা আয়ত্ত করতে পারে নি প্রায় কোথাও।

সে যাই হোক, সজনীকান্তের পরিহাস-রসান্বিত কৌতুক অথবা ব্যঙ্গ-গল্পগুলি আসলে শিল্পি-চেতনার এই প্রবল আবেগ-ব্যাকুলতারই ফসল। তাঁর হাস্য-রসাম্বিত গল্প-সাহিত্যের অধিকাংশই গড়ে উঠেছে নরনারীর প্রেম ও দাম্পত্য সম্পর্কের মূলগত যৌনরহস্যভাবনার উপকরণ আশ্রয় করে। এপর্যন্ত আলোচনায় লক্ষ্য করেছি, একই যুগ-জীবনের সন্তান হিশেবে 'কল্লোল'-শিল্পীদের সঙ্গে সজনীকান্ত দাসের অভিজ্ঞতা এবং অনুভবের ঘনিষ্ঠ সাযুজ্য ছিল। 'কনটিনেণ্টাল লিটারেচার', 'লিবিডো'র আক্ষেপ, এক অবক্ষয়িত ক্রান্তিকালের অবসন্ন বিষাদবোধ, এই সমস্ত কিছুই তাঁর যৌবন-ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। পার্থক্য ছিল কেবল ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির : আর সেই উৎসমূল থেকেই অপরপক্ষের উদ্দেশ্যে উৎসারিত হয়েছিল তাঁর পরিহাস-সরস ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাশ্রিত 'মধু ও হুল'। এই সাধর্ম্য এবং পার্থক্যের স্বরূপ শিল্পীর নিজের আলোচনা থেকেই উদ্ধৃত করা যেতে পারে। আধুনিক সাহিত্যের ভূমিকা ও স্বরূপ সম্পর্কে পরিণত বয়সেও 'শনিবারের চিঠি'র পুরাতন মন্তব্য তিনি স্মরণ করেছিলেন,—"সাহিত্যই আধুনিক মানবের জীবনবেদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিখিল মানব-প্রাণের অসীম আকুতি, মানব চরিত্রের অপার রহস্য, মন্থিত জীবনসিন্ধুর সুধা ও ফেন-গরল—এ সকলই সাহিত্যের অধিকারভুক্ত।"[৬]

অতএব 'শনিবারের চিঠি'র জেহাদ ছিল অশ্লীলতার বিরুদ্ধে নয়, সজনীকান্ত বলেন,—"আমাদের জেহাদ ঘোষিত হইয়াছিল ভানের বিরুদ্ধে, দুর্বল ও অক্ষমের লালায়িত সৃক্কনি-লেহনের বিরুদ্ধে।"[৭] সজনীকান্তের সকল সরস গল্পের উৎসই এই আন্তরিক জেহাদের মূলে। 'পান্নালাল' তাঁর লেখা শ্রেষ্ঠ হাসির গল্পের মধ্যে একটি, তার একদিকে এই সৃক্কনি-লেহী দুর্বলতার প্রতি বিদ্রূপের আঘাত, অন্যদিকে বলিষ্ঠ প্রণয়বৃত্তির কৌতুক-উজ্জ্বল জয়গানই যেন ধ্বনিত হতে শুনি :—

"যাহারা তরুণ বলিতে নরুনপাড় ধুতি পরিহিত, অতিরিক্ত কাব্যপাঠের দরুন চশমারূপ যন্ত্রের সাহায্যে পথ চলিতে চলিতে যে কোনও চওড়াপাড় চলিষ্ণু শাড়িকে তরুণী কল্পনা করিয়া করুণভাবে তাহার অনুসরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত হতাশ হইয়া বরুণদেবতার কোলে দেহরক্ষা করিতে দ্বিধা করে না—এরূপ এক সম্প্রদায়ের

৬। সত্যসুন্দর দাস—'সাহিত্যের আদর্শ'—শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৩৪।
৭। সজনীকান্ত দাস—'আত্মস্মৃতি' ১ম খণ্ড।

ছোকরাদের কথাই মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের পান্নালাল হাজরাকে দেখেন নাই।

* * * * *

পান্নালালের চেহারা ভাল, শরীর রীতিমত মজবুত, চুল ব্যাক-ব্রাশ করা, চওড়া কপাল, চশমাহীন চোখ, মানানসই নাক, গোঁফের রেখামাত্র আছে, শ্যামবর্ণ, হাফহাতা শার্ট, মালকোচা মারা ধুতি—মুখে-চোখে প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি; সমস্ত দেহে চপল তারুণ্য—পাঞ্জা কষিয়া, ঘুষি ছুঁড়িয়া ও নানাবিধ দুষ্টামি করিয়া তাহার প্রকাশ; কবিতা লিখিয়া, প্রেমপত্র ছাড়িয়া, চোরা চাউনি ছুঁড়িয়া নহে। কলেজে স্পোর্টসে সর্বাগ্রে তার নাম, প্রফেসর জব্দ করার পাণ্ডা সে। এক কথায় পান্নালাল তরুণ হউক আর না হউক, অত্যন্ত মডার্ণ।"

শুধু তাই নয়,—গল্পের পরাংশে খবর আছে পান্নালাল বহু চ্যালা-শোভিত দেশ-বিখ্যাত বক্সার-ও। চমৎকার ক্রিকেট্-ও খেলে সে।

অন্যদিকে,—"কলেজে তাহার সহপাঠীদের মধ্যে তথাকথিত তরুণের অভাব নাই। তাহারা জটলা করিয়া দেখে, একলা একলা মজে; বারোয়ারী বউদিদির কাছে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, বায়রন অনুবাদ করিয়া প্রেমপত্র লেখে, কলেজ হইতে লুকাইয়া পটাসিয়াম সায়ানাইড্ সংগ্রহ করে এবং মাঝে মাঝে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হইতে টাকাখানেকের রজনীগন্ধা অথবা গোলাপ ফুল কিনিয়া শয্যায় বিছাইয়া মরিয়াও বসে।" এইসব তারুণ্য-ক্লিষ্ট কলেজ-বয়দের আরো গুণপনার মধ্যে আছে,—নিজেদের পঠিত দু-একখানি উগ্র সাইকোলজিকাল উপন্যাস ঠিকানা ভুল করে সহপাঠিনীদের বই-এর বোঝায় আত্মগোপন করে, ছবি-দুচারখানাও এদিক্-ওদিক্ গড়িয়ে পড়ে, কোন্ বান্ধবী কবে কোন্ সিনেমায় যাবে তার হিশেবও রাখে তারা, এমন কি মাসিকে-সাপ্তাহিকে উদ্দেশ্যমূলক কবিতাও দুয়েকটি ছাপিয়ে বসে।

ফলকথা "পান্নালাল এই সব পিঁচুটি মার্কা ছেলেদের সুনজরে দেখে না। এহেন পান্নালাল যখন ফোর্থ ইয়ার আর্টস্-এ, মিস্ করুণা মিত্রের সে বছর থার্ড ইয়ার। একেবারে যাহাকে বলে অপরূপ সে ছিল তাহাই।" ভবানীপুরে বাড়ি, বড়লোক বাপের গাড়ি করে কলেজে আসে। "আর, সে যে দেখিবার মত একটা বস্তু—একথা কলেজের খোঁড়া দারোয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া বুড়া প্রফেসারগুলি পর্যন্ত মনে মনে স্বীকার করিতেন, ছেলেদের ত কথাই নাই।...

এহেন করুণা মিত্র পান্নালাল হাজরার প্রেমে পড়িয়া গেল। সহপাঠিনীদের নিষ্কাম দূতীগিরির চোটে পান্নালালের গায়েও একদিন আচমকা ইহার আঁচ আসিয়া

লাগিল। সে প্রথমটা একটু থতমত খাইল বটে, কিন্তু ভাল করিয়া ক্রিকেট মাঠের ফিল্ডিং-এর চোখে একবার আপাদমস্তক করুণাকে দেখিয়াই তাহার মন্দ লাগিল না। সে সেই এক সেকেণ্ড। তারপর গুজগুজ ফুসফুস না করিয়া সে একেবারে স্ট্রেট্ করুণার গাড়ির কাছে গিয়া বলিল, সোজা বাড়ি যাবেন তো। আমি আপনার সঙ্গে মাঠ পর্যন্ত যাব। দেবেন একটা লিফ্‌ট্ ?

বিষম অবাক্ হইলেও করুণা খুশি হইয়া উঠিল। কিন্তু কি করা উচিত—প্রথমটা হঠাৎ ঠিক করিতে না পারিয়া একবার ড্রাইভারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া ফেলিল, —তা বেশ তো আসুন না। কলেজের গেটের সামনে তখন অর্ধোদয় স্নানের ভিড়।

গাড়ি ছাড়িতে পান্নালাল ভূমিকামাত্র না করিয়া বলিল, শুনলুম, আপনি নাকি আমাকে ভালবেসেছেন ?

ড্রাইভারের সামনে লট্‌কানো আয়নাটায় করুণার লজ্জিত মুখখানা মন্দ দেখাইল না। সে যেন একটা ধাক্কা খাইল। অপ্রত্যাশিত অভদ্র প্রশ্নের জবাবটা সে কি দিবে ? খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটু ঠেস্ দিয়াই বলিল, আপনার আত্মপ্রত্যয় তো দেখ্‌ছি অসাধারণ !

আনডনূটেড্ পান্নালাল এবার অবাক্। এক মিনিট মাথা চুলকাইয়া সে বলিয়া উঠিল, তাহলে গুজবটা মিথ্যে। ধন্যবাদ। এই ড্রাইভার রোখো।

লজ্জায় নিজের গাড়ির তলায় পড়িয়া করুণার মরিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাহার সময় ছিল না। সুতরাং লজ্জার মাথা খাইয়াই সে পান্নালালের একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, যা শুনেছেন সত্যি, কিন্তু—

চট করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া পান্নালাল বলিল, ওসব কিন্তু ফিন্তু আমি বুঝি না। প্রেমে পড়ে থাক ভাল। তবে আরও দু'বছর সবুর করতে হবে। এম. এ.-টা পাশ করে নিই। এর মধ্যে একছত্র চিঠি লিখ্‌বে না বা কখনো আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চাইবে না। রাজি ?

করুণার হাসি পাইল, ভাল লোককে সে বাছিয়া লইয়াছে। গম্ভীর হইয়া বলিল, রাজি, কিন্তু—

আবার কিন্তু ?

বাবা মা যদি এর মধ্যে অন্য কোথাও আমার বিয়ে দিয়ে ফেলেন ?

খুন হয়ে যাবেন, খুন হয়ে যাবেন। বলিতে বলিতে পান্নালাল চলন্ত গাড়ির দরজা খুলিয়া রাস্তায় লাফাইয়া পড়িল। গাড়ী তখন পোড়াবাজারের মোড় ফিরিতেছে।"

বি. এ. পাশ করে পান্নালাল এম্. এ. পড়্‌তে গেল, তখন থেকে দুজনে আবার

ছাড়াছাড়ি। তাহলেও ছাত্রছাত্রীমহলে সবাই জানত,—'জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ'র মতই করুণা পান্নালালের। কিন্তু করুণার মা-বাবার সে কথা জানবার কথা নয়। নিজের স্বার্থেও যদি-বা করুণা মা-বাবার সঙ্গে পান্নালালকে পরিচিত করে দিতে চায়—পান্নালাল করুণাদের দরজা মাড়াতেও রাজি নয়। কারণ,—"সে জানিত, যেদিন দরজা মাড়াইবে, সেদিন একেবারে শ্বশুর-শাশুড়ীকে করণীয় প্রণামটাও সারিয়া লইবে; তৎপূর্বে যাতায়াত, লেগ-বিফোর-উইকেটের মত, ভাল নয়।"

বি. এ. পাশ করে ঘরে বসে আছে মেয়ে, কাজেই করুণার মা-বাবা এবার স্বভাবতই পাত্রের সন্ধান করেন। রূপে-গুণে মেয়ে তাদের অতুলনীয়, অতএব আই. সি. এস., নয় ত' নিদেন পক্ষে একজন ব্যারিস্টার অর্থাৎ 'পয়সাওয়ালা বিলেত ফেরত' একজন চাই-ই। জুটেও গেলেন স-টাক ব্যারিস্টার বারিদবরণ রায়।

এম্. এ. পরীক্ষার আর বছরখানেক বাকি, সাউথ আফ্রিকায় ভারতের পক্ষে ক্রিকেট খেলতে যাবার কথা উঠেছে পান্নালালের। এমন সময় জট পাকিয়ে তোলেন বারিদবরণ,—অঘ্রাণে আশীর্বাদ; অতএব করুণা এবারে ছুটে এল। রয়েল হোটেলের খোপে বসে বারিদবরণ-উপাখ্যান শুন্‌তে শুন্‌তে রাগে অস্থির হয়ে "একটা আট 'আনা দামের আস্ত কেক মুখে" পুরে দিল পান্নালাল। করুণা বলে, 'এবার বাবার সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

পান্নালাল বললে, "হুঁ তোমার বাবা নয়, একেবারে শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করব। জড় মেরে দেব একেবারে।"

করুণা ভয় পেয়ে বলে, 'পালিয়ে বিয়ে করবে নাকি আমাকে!' পান্নালাল রেগে অস্থির হয়ে যায়,—"অ্যাম নট্ এ কাওয়ার্ড। তোমার বাবা সম্প্রদান করবেন, তবে বিয়ে করব।"

অতএব, দুয়েকদিন মধ্যেই সতরঞ্চি মোড়া বালিশ আর এক প্রমাণ সাইজ সুটকেশ নিয়ে কালো গলাবন্ধ কোট গায়ে করুণার পিত্রালয়ে পান্নালালের আবির্ভাব। তারপরে কি বিচিত্র কৌশলে পান্নালাল স-টাক বারিদবরণকে স্বগৃহে অন্তরীণ করে শ্বশুরবাড়িতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে নিল, সে এক বিচিত্র মজার গল্প।

বস্তুত পরিণামী আবেদনের দিক থেকে 'পান্নালাল'কে একটি মজার গল্প বা fun বলে অভিহিত করতে হয়; যদিও প্লটের শরীরে এবং বাচনভঙ্গিতে humour এবং satire-এর মিশ্রিত উপকরণ রয়েছে। স্যাটায়ার বা বিদ্রূপ যেটুকু, সে ঐ 'পিঁচুটি মার্কা' ছেলেদের দুর্বল অক্ষম স্ফকনি-স্নেহনের বিরুদ্ধে। অন্যপক্ষে হিউমারের হাসিও নাকি চিত্তবৃত্তির নাতিপীড়নের চমক্ ও চমৎকারিতাবোধ থেকে

জন্মলাভ করে। এই গল্পেও পান্নালালের দৃঢ় কঠিন যৌবন-মূর্তি অঙ্কনে স্বাভাবিকতার সীমাকে পদে পদেই উল্লঙ্ঘন করে মনের গহনে যে স্বাস্থ্যকর চমক সৃষ্টি করেছেন শিল্পী, তাতেই মজার উপকরণ জমেছে অফুরন্ত। করুণার প্রতি প্রথম আকর্ষণবোধ, অথবা তার গাড়িতে চড়ে প্রণয়-প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অভিনবতা, এমন কি বিবাহ-প্রসঙ্গে অদ্ভুত শর্ত আরোপের ক্ষণেই নয় কেবল,—রয়েল হোটেলের রেস্তোরাঁয় প্রণয়িনী সুন্দরী ভাবী বধূর সম্মুখে পান্নালালের ক্রোধ প্রকাশের পদ্ধতিটুকুতেও fun-এর সঙ্গে humour-এর সার্থক উপকরণ বিমিশ্রিত হয়ে রয়েছে।

কিন্তু তাহলেও 'পান্নালাল'কে কেবল একটি মজার গল্প বলে গ্রহণ করলে শিল্পীর ভাব-কল্পনার প্রতি অবিচার করাই হয়। যৌবন-বলিষ্ঠ জীবনের যে মানস স্বপ্ন সজনীকান্ত দেখেছিলেন সেই দুর্বলতা-ঘেরা সামাজিক দুর্দিনে,—এই অসংলগ্নতায় হাস্যমুখর গল্পের অভ্যন্তরে ক্রান্তিকালের অনিবার্য পীড়াহত কবি-মনের এক অসংলগ্ন সৌন্দর্য-স্বপ্নকেও তিনি এখানে অন্তর্নিহিত করে রেখে গেছেন।

আগেই বলেছি, যৌবন-ব্যাকুলতা, প্রণয়-রহস্য, দাম্পত্য জীবন-স্নিগ্ধতা, এ সবই সিরিয়াস্ গল্পের মত সজনীকান্তের অধিকাংশ হাসির গল্পেরও সাধারণ উপকরণ। আর সেখানে humour-এর অনতিতীব্র বিস্ময়-চমক রচনার উপাদান হিশেবে মোটামুটি এক অভিন্ন শৈলীকেই শিল্পী গ্রহণ করেছেন। 'পান্নালাল' গল্পে মায়ের কাছে ধরা পড়ে গিয়ে করুণা আমতা আমতা করে ভাবী বর সম্পর্কে বলেছিল,—"ওই ওর কেমন বদ্ স্বভাব মা। কোনো কাজই আর পাঁচজনের মত করবে না।" এই অনন্ত অভিনবতার চমকই সজনীকান্তের বহু পরিমাণ হাসির গল্পে মজার,—fun এবং humour-এর উপকরণ হিশেবে সার্থক অভিব্যক্তি পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'ক্রূর কামানল মন্ত্র' অথবা 'নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস্'-এর মত গল্পের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। 'পান্নালাল' যেমন যৌবন-প্রণয়ের বলিষ্ঠ কসরতী রূপ, তেমনি শেষোক্ত গল্প যৌবনের ভীরু কামনার রোমাণ্টিক অনুভবেরও এক হাস্যকর অভিব্যক্তি। তাহলেও এগল্পও satire নয়,—কিছু humour কিছু fun।

বাংলা সাহিত্যে অগ্নিবর্ষী বিদ্রূপবাণের অধিকারী হিশেবেই সজনীকান্ত লোকবিশ্রুত; কিন্তু সে ভূমিকা মুখ্যত ছিল সাংবাদিক আর ব্যঙ্গকবি সজনীকান্তের। গল্পের সৃজন-ক্ষেত্রে তাঁর মৌলপ্রকৃতি মুখ্যত সহৃদয় জীবন-শিল্পীর। 'মধু ও হুল' নামে বিমিশ্র গল্প-পদ্য-সংকলন গ্রন্থে 'শনিবারের চিঠি'র সংবাদ-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত সমালোচনা ও

গল্পালেখাগুলি সংকলিত হয়েছে! ওটুকু সাংবাদিক সজনীকান্তের অগ্নিবর্ষী বিদ্যুৎবাণী থেকে সংগৃহীত। তাহলেও এ রচনার গল্পাংশগুলিতে satire-এর চেয়ে humour-এর উপকরণই যেন বেশি। 'মধু ও হুল' গ্রন্থের পরিচায়ন প্রসঙ্গে দিবাকর শর্মা ছদ্মনামধারী রবীন্দ্র মৈত্রও বুঝি এই স্বীকৃতিই জানিয়েছেন,—"লেখক বিদ্রূপ করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও নির্মম হইতে পারেন নাই।" অথচ বিক্ষুব্ধ নির্মমতাই নাকি সার্থক satire-এর জন্ম-উৎস। নির্মমতা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে আসলে সমকালীন অনিয়মের বিরুদ্ধে ;—অর্থাৎ শিল্পী যাকে অনিয়ম বলে মনে করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে আক্রুষ্ট সাংবাদিকের বিক্ষোভপ্রসূত। 'পরকীয়া সংঘ' গল্পের শুরুতে সেই ভারসাম্যহীন আক্রোশের অভিব্যক্তিই রয়েছে কঠিন ভাষায় রচিত ব্যক্তিগত ইঙ্গিত-অভিঘাতে। গল্পের অভ্যন্তরেও satire যেটুকু রয়েছে,—কোনো এক বা একাধিক ব্যক্তিচরিত্রের মধ্যে তাকে আবিষ্কার করতে পারলে তবেই তার ঝাঁঝটুকু খুঁজে পাওয়া যায়। এসব রচনায় শিল্পের স্বাদুতার চেয়ে উত্তেজনার উত্তাপই বেশি। 'কৃষ্টি সন্ধানে' এইরূপ একটি প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা,—যার সর্বাঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'র সংবাদ-সাহিত্যের সাধর্ম্য ছড়িয়ে রয়েছে—গল্প আর গল্প থাকে নি। এধরনের রচনাকে হাসির গল্পের চেয়ে ব্যঙ্গ-রচনা বলাই অধিকতর সমীচীন।

কিন্তু ঐসব রচনাতেও সজনীকান্তের দুর্লভ গদ্যশৈলীর স্বভাব লক্ষ্য করতে হয়। গল্পের আঙ্গিক কোনোকালেই খুব একটা আয়ত্ত হয়নি তাঁর। ছোটগল্পের, এমন কি হাসির গল্পেরও এক বিশিষ্ট শারীরিক সুগঠন রয়েছে, পরিমিতিবোধের মধ্যেই যার সাফল্য। পরশুরাম, এমনকি সুরেন্দ্রনাথের হাসির গল্পের প্রসঙ্গেও সেই সাংগঠনিক সার্থকতার পরিচয় লক্ষ্য করে এসেছি। সজনীকান্তের রচনায় বর্ণনা-প্রাচুর্যের দিকে ঝোঁক ছিল। কিন্তু সেই বর্ণনার ভাষায় এমন এক বিগাঢ় সংহতি রয়েছে, অনলঙ্কৃত সাধুরীতির প্রয়োগভঙ্গিমা ও শব্দ-চয়নরীতির এমন এক চমকপ্রদ আকর্ষণ আছে,—এককথায় রচনার এমন মুন্সিয়ানা আছে,—বঙ্কিম-যুগের পরে আমাদের গদ্যে যা প্রায় দুর্লভ হয়ে পড়েছে। ভাষার ওপরে এই চমকপ্রদ দুর্লভ অধিকারের বশেই সজনীকান্তের সমালোচনার কুঠার এমন মারাত্মক হতে পেরেছে,—সেই একই অধিকারের বলে প্যারডির আকারে ব্যঙ্গচিত্রগুলি হয়েছে নিখুঁত উপভোগ্য। বিরুদ্ধ পক্ষকে তাঁদের নিজেরই হাতিয়ার দিয়ে ঘায়েল করার এই আশ্চর্য শস্ত্র-কৌশলের আংশিক উদাহরণ গ্রহণ করা যেতে পারে :—

"নাপিত" (কোষিকা)

সে কামাতো দাড়ি।

তার খোদ্দেরের সামনে কখনো বোসতো, কখনো দাঁড়াতো সে···তার ক্ষুর ছুটতো দামিনীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি হোয়ে শুধু তার ঝলকটুকু মাত্র দেখা যেতো···। আর তার মুখ ছুটতো অনর্গল···শ্রাবণের মেঘের মতো—

* * * *

ক্ষুরটি ছিলো তার প্রাণ, তাকে সে শীর্ণ হাতের পরশ দিয়ে সজীব কোরে তুলতো; কি যে আরাম লাগতো তার ক্ষুরের চঞ্চল পোঁচে পোঁচে !···"

পরিশেষে 'ব্যঙ্গগল্প' নামক গল্পবিষয়ের অনুসরণে ব্যঙ্গরসিক সজনীকান্তের আত্মপরিচয়ের আবিষ্কার করা যেতে পারে :—

সাময়িকপত্রের তাগাদায় উত্ত্যক্ত কেবলরাম ব্যঙ্গগল্পের উপকরণ কিছুতেই মনে করতে না পেরে সাহায্য ভিক্ষা করেছিল হরিশ খুড়োর। খুড়োর পরিচয় কেবলের কণ্ঠেই ঘোষিত হয়েছে,—"যৌবনকালে খুড়োর নাম-ডাক ছিল, এই পড়তি বয়সেও খুড়ো যখন মজুমদারের দাওয়ায় বসিয়া থাকিতেন, পাড়ার ঝিয়েরা বরঞ্চ কীর্তি মিত্রের লেন ঘুরিয়া আসিত, পারতপক্ষে খুড়োর নজরের ভিতর পড়িতে চাহিত না।"

খুড়ো অধীর কণ্ঠে শুরু করেন, নিজের জীবন-যন্ত্রণায় রক্তাক্ত কজ্জলীপ্রসঙ্গ :—"উঃ, হারামজাদীকে আমি বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে তুলেছিলাম! চেয়েচিন্তে কুড়িয়ে বাড়িয়ে তাকে খাইয়েছি, মশার কামড় খেয়ে খেয়ে দুর্গন্ধের মধ্যে তার গায়ে হাত বুলিয়েছি।"

* * * *

দীর্ঘশ্বাস ফেলে খুড়ো আবার শুরু করেন—"কতদিন তার জন্যে আমি প্রতীক্ষা করেছি, কজ্জলী বড় হবে। দিন গুনেছি বললে ভুল হবে না। বউঠান কত ঠাট্টা করতেন, বলতেন বিয়ে করলে না ঠাকুরপো, শেষে কি একটা অবলার পাল্লায় পড়ে জড়ভরত হবে? আমি শুনতাম আর হাসতাম।"

বিষণ্ণ-উত্তেজিত খুড়ো বলে চলেন,—"হ্যাঁ, প্রতিদান চেয়েছিলাম বইকি! ছেলেবেলাতেই আখড়ার নিতে বৈরাগীর কাছে আফিং খেতে শিখেছিলাম, দিনান্তে সামান্য একটু স্নেহরস—"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মর্মান্তিক হয়ে উঠল ঘটনা,—একরাতে হারিয়ে গেল কজ্জলী,— ডাকাতে নিয়ে গেল না, কারো সঙ্গে বেরিয়ে গেল না, কিন্তু খুড়োর ঘরেও ফিরল না সে সারারাত। পরদিন অবশ্য খবর পেয়ে 'দেড়টি টাকা খেসারত দিয়ে ভরা দুপুরে' ঘরে নিয়ে এসেছিল খুড়ো তাকে। কিন্তু তার পরেও সে নিখোঁজ হয়ে গেছে। সেই

দুঃখের মর্মন্তুদ কাহিনীই বলে চলেন খুড়ো—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবাজি আমার কাজলা গাই। কিন্তু এত করেও বেটিকে রাখতে পারলাম না।" বিশ সালে বানের জলে ভেসে গিয়েছিল কাজলী, আর তার খবর পাওয়া যায় নি। সেই থেকে খুড়ো সন্ন্যাসী।

এ-ও গল্প নয় তত, যত 'শনিবারের চিঠি'র সাংবাদিক খড়্গাঘাত। ফলকথা সজনীকান্তের সাহিত্যিক জীবনের দ্বৈতসত্তা, যেখানে সমকালীনতার নির্মম সমালোচক সেখানে ব্যঙ্গের কুঠার মর্মঘাতী হয়েছে, তার সাময়িক উত্তেজনা যতই থাক্, শিল্প-স্বাদুতা অবিতর্কিত নয়। কিন্তু গল্প-শিল্পীর ভূমিকায় সজনীকান্ত যেখানে স্বভাব-মুক্ত, সেখানে তিনি একান্ত সহৃদয় জীবন-নিষ্ঠ,—সিরিয়াস্ বা হাসির গল্প উভয় ক্ষেত্রেই একথা সমান সত্য।

এঁর গল্প-সংকলনের মধ্যে আছে:—'মধু ও হুল' (১৩৩৮), 'কলিকাল' (১৩৪৭), 'আকাশবাসর' (১৩৫১), 'স্বনির্বাচিত গল্প' (১৩৬৪)। প্রথমোক্ত গ্রন্থে গল্প কেবল প্রসঙ্গত সন্নিবিষ্ট হয়েছে—এটি গদ্য-পদ্য ব্যঙ্গ রচনার সমষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

'কল্লোল'-বিপরীত শিল্পিগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তিমান গল্পকার ছিলেন রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (১৮৯৬-১৯৩৫)।

এই উপলক্ষে পুরাতন প্রসঙ্গ আর একবার আলোচনা করে দেখা যেতে পারে। বাংলা ছোটগল্প-সাহিত্যে দ্বিতীয় পর্বের উদ্ভব প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের প্রগাঢ় অন্ধকারে। বিশশতকের জন্মলগ্ন থেকে ক্রম-বিকশিত অবক্ষয়ের সে ছিল এক চরম ক্রান্তি-বিন্দু। পৃথিবী-জোড়া প্রত্যয়ভঙ্গ-জনিত মর্মপীড়া, জীবনের ভারসাম্যহীন আর্থিক দুর্গতি, আর আশাহীন আত্মিক যন্ত্রণা, নীরন্ধ্র অন্ধকারের এই শ্বাসরোধী শ্মশান-ভূমিতেই নূতন সৃষ্টির বেদী রচনা করেছিলেন সেকালের শিল্পীরা। অন্যপক্ষে নরনারীর দেহ-মনোগত সম্পর্কের রহস্যানুসন্ধান সাধারণভাবে চিরকালের সৃজন-ধর্মেরই এক অন্তহীন কৌতূহলের উৎস। পূর্বালোচনায় সমকালীন শিল্পী সজনীকান্তের কণ্ঠে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি শুনেছি,—"আদিরস বা লিবিডোর উত্তাপ বা ভাবনা ছাড়া কোনো শিল্পীর জীবন সম্পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না।" ফলে নোঙর-ছেঁড়া আশ্রয়হীন ভাসমানতার এই দুর্যোগে ক্ষুব্ধ-যৌবন একদল তরুণ শিল্পী নিতান্ত নৈসর্গিক কারণেই আদিরসের ভিয়েনে অতি-উত্তাপ সঞ্চারে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁদের স্বপক্ষে ছিল সদ্য-আবিষ্কৃত যৌন-মনোবিজ্ঞানের নূতন কৌতূহলদীপ্ত জগৎ, আর যুদ্ধোত্তর নূতন 'কন্‌টিনেন্‌টাল' সাহিত্যের সম্ভার। অনন্যপর এই নূতনের সাধনায় আতিশয্য যেটুকু ছিল, কেবল তার

বিরুদ্ধেই 'কল্লোল'-বিপরীতেরা পরিহাস-বিদ্রূপের হাতিয়ার ধরে বেরিয়েছিলেন। তা না হলে এঁদেরও শিল্পিচেতনার মূলে যুগ-যন্ত্রণাবোধের অসহায়তা, আর প্রতিকারহীন ব্যর্থতার অনিবার্য বিষাদ প্রায় অন্তর্লীন হয়েছিল।

কিন্তু সাহিত্যের দিক থেকে এই নিষ্ক্রিয় অবসাদ ও রন্ধ্রপথহীন মুমুক্ষুতার পীড়ন ঐকান্তিক হলেও সমসাময়িক বাংলা তথা ভারতবর্ষের কর্মজীবনে সেই একই সময়ে এক নূতন উদ্দীপনার চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন ও গঠনমূলক 'স্বদেশী' কর্মধারার আহ্বান[৮] সারা ভারতের তারুণ্যের মূলে এক নূতন আদর্শ-সাধনার উদয়াচল ক্রমশই যেন আলোকিত করে তুলছিল। আলোচ্যযুগের শিল্পিগোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমানে প্রথিতযশা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সরোজকুমার রায়চৌধুরী সেই দুর্গম পথের অভিযাত্রী হয়েছিলেন—বিদেশী রাজশক্তির কারাগারে দুইজনেরই আতিথ্যলাভ জুটেছিল। কালেকালে তারাশঙ্কর অনুভব করেছিলেন, সাহিত্যের স্বপ্ন আর সংগ্রামীর কঠিন-ব্রত কর্ম-সাধনা একই আধারে সম্ভব নয়,—তাই প্রথমবার জেল থেকে বেরিয়েই সরস্বতীর চরণে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করে আত্মরক্ষা করলেন তিনি। অন্যপক্ষে সরোজকুমারের চেতনায় উদ্দেশ্যের দ্বিমুখিতা তাঁর প্রতিভা-বিকাশের সম্ভাব্য পরিধিকে হয়ত উভয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ছিলেন এই দুদিনের শিল্পী,—সমকালীন সৃজনী-মানসের অনিবার্য বিষাদবোধের সঙ্গে নৈষ্ঠিক সমাজ-হিতব্রতী কর্মীর চরিত্র-দার্ঢ্যকে যিনি সমসূত্রে গ্রন্থন করে সাহিত্যের অভিনব মালিকা রচনা করেছিলেন। তাই শিল্পীর রচনা-বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে আংশিকভাবে হলেও তাঁর কর্মিজীবনের পরিচয় সন্ধানও অনিবার্য হয়ে ওঠে।

গান্ধীজির অসহযোগের আহ্বানে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিলেন রবীন্দ্র মৈত্র; তারপর থেকেই তাঁর জীবনে শুরু হয়েছিল দরিদ্র অসহায় নিরক্ষর আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন আত্মিক সহযোগিতার জীবন-ব্রত। উত্তরবঙ্গের সন্তান; সেখানকার সাঁওতাল, রাজবংশী, ওরাঁও প্রভৃতি আদিবাসী অ-সভ্যদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের সাধনায় তিনি সর্বস্ব পণ করেছিলেন। অন্যপক্ষে অন্যায়ের সঙ্গে ছিল তাঁর তীব্র অসহযোগ। সেদিনকার সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বাংলা ভাষার রূপান্তর-সাধনের প্রমত্ত প্রয়াস তীব্র বাধার সম্মুখীন হয়েছিল এই দৃঢ়ব্রত সংগ্রামী পৌরুষেরই হাতে।

সাহিত্যক্ষেত্রে গল্পের সৃজনভূমিতেও রবীন্দ্র মৈত্রের ছিল এই দ্বৈত-সাধনা। দুর্বল অসহায় মানুষের রন্ধ্রপথহীন জীবন-যন্ত্রণার প্রতি এক অনুচ্ছ্বসিত বিষণ্ণ সমবেদনা-

৮। অহিংসা, অস্পৃশ্যতা বর্জন, চরখা ইত্যাদি।

বোধ, আর একদিকে জীবনের অসংগতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তির্যক বিদ্রূপ-পরিহাসের খড়্গাঘাত। ফলে রবীন্দ্র মৈত্রের প্রতিভা পরিহাস-রসাম্বিত গাল্পিকতার ভূমিকাতেই সীমিত হয়ে নেই। এমন কি নিছক ব্যঙ্গ-গল্পেই তাঁর রচনাশক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয় নিবদ্ধ হয়ে থাকে নি। অর্থাৎ, গল্প-শিল্পী রবীন্দ্র মৈত্র ছিলেন সব্যসাচী,—সিরিয়াস্ এবং হাসির গল্পের উভয়ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভার সাফল্যমহিমা সমপরিমাণে বিচ্ছুরিত হয়েছে আর উভয়ক্ষেত্রেই শিল্পী হিশেবে তিনি অ-ভূতপূর্ব।

প্রথম শ্রেণীর রচনাবৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন যথার্থ মন্তব্য করেছেন,—"সত্যকার যাঁহারা নূতন লেখার লেখক তাঁহারা রোমান্সের দৃষ্টি যথাসম্ভব খাটো করিয়া অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তির জীবন (যাহা কালের গতিকে ক্রমশঃ নজরে পড়িতেছে) সম্বন্ধে কৌতূহলী হইলেন। এ কৌতূহল অবশ্যই নিঃস্পৃহ শিল্পীর অথবা বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু নয়। ইহার মধ্যে সমবেদনা আছে, কিঞ্চিৎ অনুকম্পাও আছে। এই দৃষ্টি লইয়া যাঁহারা চিত্র-গল্প-উপন্যাস লিখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের নাম।"[৯]

এখানে রবীন্দ্র মৈত্র আধুনিক জীবন-সৃষ্টিতে 'আধুনিকোত্তম'। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়,—আধুনিক সাহিত্যের দাবিতে একদিকে যেমন যৌনতা-চিত্রণের আতিশয্য আর অনিয়ন্ত্রিত বিষয় ও প্রকরণগত উচ্ছ্বাস সেদিন অদম্য হয়েছিল, তেমনি আর একদিকে ছিল কৃষক-শ্রমিক-জনতার,—তথাকথিত সর্বহারাদের জীবনে নিরর্থক রিক্ততাবোধের বর্ণাঢ্য অতিচিত্রণ। এই দ্বিতীয়োক্ত প্রবণতার প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করেই রবীন্দ্রনাথ সেদিন লিখেছিলেন,—"বর্তমানকালে বিত্তাল্পতার মমত্ব বা অহঙ্কার সর্বজনীন আদর্শের ভাণ করে দণ্ডনীতি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করছে।"[১০] এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-রচনায় কিষাণ-শ্রমিকের জীবনায়নের দৈন্য সম্পর্কেও উচ্চকণ্ঠ অভিযোগ শোনা গিয়েছিল; এমন কি, অস্তাচলমুখী কবি নিজেও গদ্য-পদ্য বিচিত্র রচনা-মাধ্যমে সেই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেছিলেন; যার অযথার্থ তাৎপর্য ঘোষণা আজও প্রতিহত হয় নি। এই উপলক্ষেই ডঃ সুকুমার সেনের উদ্ধৃত উক্তির বন্ধনীকৃত অংশ বিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

সাহিত্য জীবন-সম্ভব ;—আর জীবনের ধর্ম দেশকালের রথে ভর করে মানব-ইতিহাসের মহাপ্রান্তরে পরিক্রমণ করে ফিরছে,—নিরবধি বিবর্তনের পথে। সেই নিয়ত বহমানতার অনিবার্য স্রোতে অস্তিত্বের নিত্য-নূতন অভিজ্ঞান ক্রমশ উদ্ভাসিত হয়ে

৯। ডঃ সুকুমার সেন—'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (চতুর্থ খণ্ড)।
১০। নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লেখা পত্র, ১০ই আষাঢ়, ১৩৪৮।

ওঠে:—একই পদ্ধতির অনুবর্তনে আজ যা নূতন, তথ্যের দিক থেকে তাই একান্ত পুরাতন হয়ে পড়ে আগামীকাল। এই নিরন্তর পরিবর্তমানতার সমুদ্রতীরে মহাকালের জাদুঘরে নিত্যতার উপকরণ সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের ব্রতে ধ্যানাসীন হয়ে থাকেন জীবন-শিল্পী। স্বভাবতই জীবন-সমুদ্রের মন্থনে যে অভিজ্ঞান উদ্ভূত হয়নি,—শিল্পীর দৃষ্টিতে তার অনুপস্থিতি অনিবার্য। এ নিয়ে অভিযোগ করা যুঁই-বেলি-রজনীগন্ধার সুরভিমদির সন্ধ্যায় আকন্দ-ধুতুরার অভাবজনিত আক্ষেপের মতই নিরর্থক। আগে একাধিক প্রসঙ্গে অনুভব করেছি,—উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের জন্মলগ্নে ইতিহাস-কণ্ঠের অস্ফুটবাক্ প্রতিশ্রুতিই পরিপূর্ণ পরিণামের দাক্ষিণ্য-মূর্তি ধারণ করেছিল রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের সহস্ররশ্মি অভিপ্রকাশে। অন্যপক্ষে বৃহত্তর বাংলার জীবন-ভূমিতে সেই ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মূল্য-বোধের বিনষ্টির সূত্র ধরেই কালের গতিতে "অত্যন্ত সাধারণ মানুষের জীবন" ক্রমশ পাদপ্রদীপের তলায় প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই নব-আবিষ্কৃত অভিজ্ঞানকে উপলক্ষ করে প্রথম আনন্দের কলকাকলি অতি উচ্ছ্বাসের স্ফীতিবশে সত্যের সীমাকেও অতিক্রম করেছিল। 'শৌখিন মজ্‌দুরি'র মায়াজাল বিস্তার করে 'সাহিত্যের খ্যাতি চুরি' করার বিরুদ্ধে স্বয়ং কবিকে সেদিন সাবধানবাণী উচ্চারণ করতে হয়েছিল। ফলকথা, রবীন্দ্র কবি-প্রতিভার সিদ্ধ পরিণামের সীমান্তভূমিতে বৃহত্তর ইতিহাসের মহাপ্রান্তরে কালের যাত্রার যে একটি পর্যায়ের সার্থকতম উদ্‌যাপন ঘটল, তারই পরতর সম্ভাবনার এক নূতন সূত্র ধরে বাংলা গল্পের জগতে রবীন্দ্র মৈত্রের আবির্ভাব। কালস্রোতে সদ্য-বিকাশমান সাধারণ মানুষের জীবন-অভিজ্ঞানকে তিনি সাহিত্যের জাদুঘরে সংগ্রহ করে এনেছিলেন। আর যেহেতু তাঁর ব্যক্তি এবং শিল্পি-আত্মা,—দুইই ছিল মাটির মানুষের একান্ত 'কাছা-কাছি',—তাই অতি উৎসাহের কৃত্রিমতায় সেই প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট জীবনের যথার্থ পরিচয়কে কখনোই তিনি আচ্ছন্ন হতে দেননি। বরং এক অতি দুর্লভ স্পর্শকারতা নিয়ে গল্পে বর্ণিত জীবনের যথাযথ শিল্পরূপ সৃষ্টির সাধনায় যেন তন্ময় হয়েছিলেন। অর্থাৎ, অকিঞ্চিৎকর জীবন-চিত্রের অকিঞ্চিৎকরতম ফলশ্রুতির যাথাযাথ্যও পাছে অস্পষ্ট হয়ে পড়ে, তাই একান্ত সন্তর্পণ অবধানতায় আত্মসংবরণ করে গেছেন শিল্পী তাঁর রচনার প্রায় সর্বত্র। এই ধরনের অনেক কয়টি গল্প গ্রথিত হয়েছে 'থার্ডক্লাস' (১৩৩৫) এবং 'উদাসীর মাঠ' (১৩৩৮) সংকলন দুইটিতে। 'থার্ডক্লাশ' জনপ্রিয়তায় বিখ্যাত;—'উদাসীর মাঠ' গল্পের নামেই দ্বিতীয়োক্ত সংকলনের নাম।

মধুমণ্ডলের একমাত্র মেয়ে উদাসী;—সম্পন্ন গৃহস্থ মধুমণ্ডল;—দুটি মাত্র সন্তান, ছেলে যদু বড়। আর উদাসী ছোট। আট বছরে গৌরীদান করেছিল মধু; ভাগ্যের

এমনি বিধান, নয় বছরেই হাতের নোয়া ঘুচিয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে আসে উদাসী ব্রহ্মচর্য পালন করতে। দেখে শুনে প্রবীণ আত্মীয়জনেরা উপদেশ দেয়,—'একটা ভাল ছেলে দেখে মেয়েকে গছিয়ে দাও মণ্ডল,—দুধের মেয়ে।' সমাজে বালিকা বিধবার পুনর্বিবাহে বাধা নেই কিছু।'

কিন্তু যাকে বলা, কথাটা সে ভেবেও উঠ্‌তে পারে না ভাল করে। তার আগেই প্রখর আপত্তিতে ফেটে পড়ে উদাসীর দাদা যদু,—মধু মণ্ডলের একমাত্র পুত্র। লেখাপড়া শিখেছে সে,—এণ্ট্রান্স ক্লাস থেকে সরস্বতীর কাছে বিদায় নিয়ে এসেছে,—রীতিমত শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'। যদু মণ্ডল ভাবে, হাজার হোক্ ক্ষত্রিয় রক্ত রয়েছে গায়ে, এসব অনাচার করা চলে কি করে! স্ত্রী কুমুদিনীকে নিয়ে রীতিমত 'ভদ্র' 'আধুনিক' জীবনযাপনের একান্ত প্রয়াসী হয়েছিল যদু।

'স্বদেশী'র সংগঠনেও উৎসাহের তার অভাব নেই। স্বদেশী সভায় গান করতে এসেছিল ললিত,—সুকণ্ঠ সুদর্শন যুবক। নেতৃ-সমাগমের প্রাচুর্যে সভার উৎসাহ উৎসবের উজ্জ্বল রূপ ধরেছিল। সভার শেষে সকলে চলে যায়, কিন্তু ললিতকে বাড়িতে ডেকে আনে যদু,—কুমুদিনী তার কাছে গান শিখ্‌বে। মধু মণ্ডলের সকল আপত্তি ভেসে যায়,—বেগতিক বুঝে বৃদ্ধ কিছুদিনের জন্য তীর্থের পথে যাত্রা করেন। এদিকে কুমুদিনীর গ্রাম্য জড়তার অবরোধ কাটিয়ে ওঠা যদুর পক্ষেও কঠিন হয়। অবশেষে কুমুদিনী উৎসাহ পাবে ভেবে উদাসীকে ডেকে আনা হয় প্রাথমিক মহড়ার জন্য। কুমুদিনীর গান শেখা বিশেষ এগোয় না; ললিতের তাতে দুঃখও নেই কিছু। কিন্তু প্রথম দিনের জড়তা কেটে যাবার পর উদাসীর আশ্চর্য উন্নতি ঘট্‌তে থাকে,—কেবল সংগীতেই নয়,—ললিতের সান্নিধ্যে আরো নানাদিক থেকেই। ক্রমশ পরস্পরের একান্ত সান্নিধ্যে নিবিষ্ট হয়ে আসে ললিত আর উদাসী। অবশেষে একদিন উদাসীকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কলকাতায় ফিরে যায় ললিত।

অথচ তারপর থেকেই রহস্যজনক নীরবতা নামে তার পক্ষ থেকে। এদিকে বৌদির স্নেহব্যাকুল দৃষ্টির কাছে কিছুতেই আর আত্মগোপন করতে পারে না উদাসী। আসলে হতভাগী বোঝেও না তো কিছু! স্তম্ভিত ক্রুদ্ধ যদু কলকাতায় ছুটে যায় ললিতকে ফিরিয়ে আনতে; কিন্তু আশ্চর্য ধাপ্পার কৌশলে হাত গলিয়ে পালিয়ে যায় সে; নিরাশ হয়ে ফিরতে হয় যদুকে।

কিন্তু কঠোর নির্মম সত্যকেও আর গোপন করে রাখা চলে না,—সন্তান-সম্ভবা হয়েছে উদাসী। চাপা হাসির কৌতূহলে প্রতিবেশিনীদের কণ্ঠে কণ্ঠে কলঙ্ক

ছড়িয়ে পড়ে। যদু এবার কলঙ্ক নিবারণের 'ভদ্রোচিত' ব্যবস্থাই অবলম্বন করে। গ্রামের ছেলে মানিককে পাঁচশো টাকা দিয়ে রাজি করানো হয়, উদাসীকে সে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে আসবে কাশীতে। গভীর রাত্রে পরিবারের উপেক্ষা আর বেদনার মধ্য দিয়ে মানিকের সঙ্গে ঘরের বাইরে পা বাড়ায় উদাসী। পাঁচক্রোশ দূরের সাতপুতের ঘাটের পথে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলে মানিক, —অন্ধকার মাঠের পথে। বাড়ির ঘাটে গেলে পাছে জানাজানি হয়ে যায়,—সেই আশঙ্কাতেই সাতপুতের ঘাটের অভিমুখে তাদের সুদূর যাত্রা। কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধনেরও একটা সীমা আছে—থানার কাছে এসে আর্তনাদ করে ওঠে উদাসী,—তবু পুলিশের ভয়, কলঙ্কের ভয় প্রাণেরও বাড়া, তাই প্রাণপণে এগিয়ে চলতে হয়। কিন্তু পথের বাঁকে জোড়া বাবলার তলায় দাঁড়িয়ে উদাসী বলে "আর পারব না মানিকদা! দম আটকে আসছে।" দুহাতে বুক চেপে বসে পড়ে উদাসী।

* * *

"পরদিন প্রভাতে সাতপুতের ঘাটের লোক—জোড়া বাবলা তলায় আসিয়া দেখিল—দুই বাহু দিয়া একটি প্রাণহীন শিশুকে জড়াইয়া ধরিয়া রক্তলিপ্ত দেহে একটি কালো মেয়ে মুক্ত আকাশের দিকে নিষ্প্রভ নেত্রে চাহিয়া আছে। দেহে জীবন নাই।"

'উদাসীর মাঠ'-এর ইতিহাস-বিবৃতি এখানেই সাঙ্গ করেছেন গল্পকার। তাহলেও এই প্রকরণ ও পরিণতির ধারা অনুসরণ করতে গিয়ে সহজেই মনে পড়ে যায়, বাংলা গল্প-সাহিত্যে রবীন্দ্র মৈত্র ব্যঙ্গ ও পরিহাস-রসের শিল্পী হিশেবেই সমধিক স্মরণীয়। তাঁর সিরিয়াস্ গল্পগুলির গভীরেও যেন পরিহাস-শিল্পীর বঙ্কিম দৃষ্টি প্রচ্ছন্ন বেদনার মর্মমূল থেকে আক্ষেপের এক পরোক্ষ কষাঘাত উদ্যত করে তোলে, —তীক্ষ্ণ-ফলা ছুরির, মৃদু হলেও অতর্কিত, কর্তনের মত তার জ্বালাকর অনুভব চেতন মনের সীমায় ক্ষণে ক্ষণেই চকিত হয়ে ওঠে। এখানে হাস্যরসিক রবীন্দ্র মৈত্রের ভূমিকা আত্মসংবৃত স্যাটায়ারিস্ট্-এর। আগে বলেছি,—ক্রান্তিকালের একটানা বিনষ্টিজনিত যন্ত্রণাবোধ শিল্পীর আত্মায় প্রতিকারহীন বিক্ষোভের এক পাষাণ-কাঠিন্য জমাট্ করে তোলে;—তারই শানবাঁধানো গায়ে পোঁচের পর পোঁচ টেনে ধারালো হয়ে ওঠে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ ছুরিকা। রবীন্দ্র মৈত্রের বেলাও ঘটেছে তাই। তাঁর প্রায় সকল রচনাই অব্যবহিত কালের সংশয়-সমস্যার প্রেক্ষাপটে নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তুলিতে গাঢ় সহানুভূতির রং জমাট্ করে আঁকা

জীবনচিত্র। শিল্পীর জীবনানুভব সকল দিক থেকেই যথার্থ জমাট্;—অর্থাৎ আবেগ-অনুকম্পার অতিশয়তায় গল্পের বিষয় ও বিন্যাস-ক্রমকে ছাপিয়ে তাঁর ব্যক্তি-মানস কখনো পাদ-প্রদীপের তলায় অনধিকারপ্রবেশ করে নি। শিল্পীর মর্মানুভবের স্পর্শ সর্বত্রই সংশয়াতীত হলেও গল্পদেহে তা সহজে নেপথ্যাশ্রয়ী! তবু সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের সকল সদিচ্ছা এবং বলিষ্ঠ কর্মযোগীর নিঃশেষিত-শক্তি প্রয়াসের বিনি-ময়েও বিধির খেয়াল যখন অনিবার্য হয়ে ওঠে, তখন বিক্ষোভের অগ্নিদাহকে অবদমন করা রবীন্দ্র মৈত্রের সিরিয়াস্ গল্পগুচ্ছেও অসম্ভব হয়েছে মাঝে মাঝে; যদিও কখনোই তা অসংবৃত হয়ে পড়ে নি।

'উদাসীর মাঠ' গল্পতেই দেখি জীবনের অতবড় নির্মম অপচয়ে আক্রোশক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন শিল্পী। গল্পের বিষয়ে শরৎচন্দ্রোত্তর যুগের পক্ষে কোনো অভিনবতা রয়েছে বলে মনে করা কঠিন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের গল্পে যেখানে বেদনা এবং tragedy,—এই গল্পের শেষে সেখানে রয়েছে ক্রোধ আর আক্ষেপ, মাঝে মাঝে তির্যক্ ভাষণের কল্যাণে যা সভ্যচেতনার মর্মমূলে চাবুক হান্‌তে চায়। তথ্যের দিক থেকে একথাও লক্ষ্য করতে হয় যে, নিজের দেশকালের একান্ত আত্মীয় উত্তরবঙ্গের তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবনভূমিতে গল্পের প্লটকে প্রসারিত করেছেন শিল্পী। ঠিক ঐ সময়েই দীর্ঘদিনের সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করেছিলেন এঁরা। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তথাকথিত উচ্চজদের সংকীর্ণতার শেকল ভাঙ্‌তে গিয়ে নিজেদের প্রমুক্ত প্রাণ-ধর্মের পায়ে নতুন দৈন্যের বেড়ি পরিয়ে বসেছিলেন। উত্তরবঙ্গের স্বভাব-সংগ্রামী রাজবংশীর জাত,—প্রকৃতির মতই উদ্দাম, দুর্ধর্ষ, প্রাণোচ্ছল তাঁরা;—প্রাণের সহজ সত্যের স্বীকৃতি তাঁদের সামাজিক সংস্কারেও। তাই উদাসী যেদিন ন'বছর বয়সে ব্রহ্মচর্য পালনের অসাধ্য সাধন করতে পিত্রালয়ে ফিরে এল, প্রবীণ বিজ্ঞজনেরা সেদিন সদুপদেশই দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রাণের সেই চিরন্তন নীতিকে প্রত্যক্ষ করতে পারলে না যদু,—এন্ট্রান্সের সীমান্ত থেকে সরস্বতীর দরবারে বিদায় নিয়েও সভ্যতা আর আভিজাত্যের মিথ্যা অভিমানে একটি নিরুপায় বালিকার ভবিষ্যৎকে মর্মান্তিক বিনষ্টির অনিবার্যতার মধ্যে ঠেলে দিল সে। যদুমণ্ডলের 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' হয়ে ওঠার মিথ্যা আভিজাত্যকল্পনার নির্মম বেদীতলে যূপবদ্ধ অসহায় পশুর মত নিহত হয়েছে উদাসী। ঐ যদু-প্রসঙ্গেই, তার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ত্ব, পাণ্ডিত্য আর আধুনিকত্বের মিথ্যা অভিমানের প্রতি তির্যক্ ইঙ্গিতের বিদ্যুৎঝলক ক্ষণিকের জন্য যেন চম্‌কে উঠেছে গল্পের শরীরে। কিন্তু সে ঐ ক্ষণিকের জন্যই; মনের চোখ মেলে

তাকে স্পষ্ট অনুভব করতে পারার আগেই সে ইঙ্গিত মিলিয়ে যায়,—তাই এ-সব গল্প পূর্ণাঙ্গ ব্যঙ্গ-গল্প নয়।

বস্তুত এ-ধরনের গল্পে সমাজ সভ্যতার অসাম্য অসংগতি আর মিথ্যাচারের বিরুদ্ধেই শিল্পীর ক্ষোভ নাতিস্পষ্ট ব্যঙ্গব্যঞ্জনাময় সহৃদয়তার কাঠিন্যে জমাট হয়ে উঠেছে। একদিকে দেখি ঘণ্টার পরে ঘণ্টা দমদেয়া কলের মত চলন্ত গাড়িতে ধন্বন্তরিবটিকার জয়গান করে চলেছে 'ক্যানভাসার'—"কাশি সারে, হাঁপি সারে, উৎকাসি খুৎকাসি, যক্ষ্মা, রাজযক্ষ্মা, আমাশয়, উদরাময়জনিত কাশি, সব সারে। শুধু কাশি নয় সকলরকম ব্যাধি সারে। ছোটছেলের পেঁচোয় পাওয়া, মেয়েদের হিস্টিরিয়া, চোখ ওঠা, কান দিয়ে পুঁজপড়া, বাত, আমবাত, গাঁটবাত, পক্ষাঘাত, দাদ, চুলকানি, পাঁচড়া সারে।"—হাঁকে আর কাশে রসিক ক্যানভাসার, কাশিটা ভাল নয়। তবু থামলে চলবে না, "মেয়েটা বড্ডই বড় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া লাভের ভরসাটাই বা কি কম! হাজার তিনেক শিশি বেচে দিতে পারলে টাকায় তিনপয়সা করে কমিশন, মাইনে সমেত সাতদিনের ছুটি আর একমাসের মাইনে আগাম।" অতএব রসিক হাঁপায়, কাশে আর হাঁকে। এই প্রসঙ্গে ধন্বন্তরি বটিকার সর্বরোগহর বিজ্ঞাপন, আর বিজ্ঞাপকের রোগজর্জর মুমূর্ষু কাঠামোটির তীব্র কণ্ট্রাস্ট্ লক্ষ্য করবার মত। বৈপরীত্যের এই তীব্রতা থেকেই বিক্ষোভের বঙ্কিম প্রতিফলন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। এই কনট্রাস্ট-এর জমাট ঘনতা চাপা-ব্যঙ্গের যথার্থ রূপ ধরেছে, যখন রসিকের নিয়োগকারী ব্রজ পাল গাড়ির যাত্রীদের মাঝে বসে পরিতৃপ্তির স্মিত হাসি হাসে। রসিক যত কাশে,—ব্রজ পাল হাসে ততই,—"তাঁহার স্ফীতোদরের উপর হীরার লকেট্‌টি বারবার আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল,—আমি নীরবে তাহাই দেখিতে লাগিলাম।"—এই নিরুপায় দ্রষ্টার ভূমিকায় শিল্পীর অন্তরে যত যন্ত্রণা আর ক্ষোভ পুঞ্জিত হয়েছিল, তাই যেন জমাট তাল বেঁধে উঠেছে গল্পের শরীরে। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে বিক্ষুব্ধ আক্রোশ নাতিতীব্র বক্রোক্তির ব্যঞ্জনায় ছড়িয়ে পড়েছে।

'উদাসীর মাঠ'-এ সভ্যতার ছদ্মবেশী নিষ্ঠুরতার এক দানবী রূপ দেখেছি, 'ক্যানভাসার'-গল্পে আছে অর্থনৈতিক অসাম্যের বর্বরতা-পীড়িত তথাকথিত সভ্য সমাজের বীভৎস রূপচিত্র। তেমনি 'লাউডগা' গল্পে শহুরে সভ্যতার হৃদয়হীনতার প্রান্তরে এক গ্রাম্য দিদিমার আত্মিক রিক্ততার ট্রাজিক্ রূপ আবার বক্রোক্তি-ঘন কঠিন প্রস্তরমূর্তি ধরেছে। ফলকথা, বিষয় এবং বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যে রবীন্দ্র মৈত্রের সিরিয়াস্ গল্পগুলিতে সাধর্ম্যের ঐক্যসূত্র নিবিড়; যদিও তার ফলে সৃষ্টির মধ্যে গতানুগতিকতা কোথাও ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে নি। বিচিত্র অভিজ্ঞতার মূলে নিহিত

শিল্পি-চেতনার প্রগাঢ় প্রাণশক্তিই প্রায় প্রত্যেকটি গল্পে স্বতন্ত্র জীবন-রসের স্বাদুতা সঞ্চার করেছে। বস্তুত রবীন্দ্র মৈত্রের পরিহাস-রসের গল্পগুলিতেও শিল্পীর উদার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বপ্রভাবই সৃষ্টির স্বাদবৈশিষ্ট্যকে সর্বাঙ্গসমুজ্জ্বল করে তুলেছে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়, গল্পশিল্পী হিশেবে রবীন্দ্র মৈত্র সজনীকান্তের অগ্রবর্তী; এমন কি 'শনিবারের চিঠি'র অনিশ্চয়তার দিনে নিরুপায় সজনীকান্তকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-প্রতিষ্ঠানের স্নিগ্ধ আশ্রয়ে টেনে এনেছিলেন তিনিই। ইতিপূর্বেই 'আনন্দবাজারে'র পৃষ্ঠায় দিবাকর শর্মার ছদ্মবেশে তিনি 'বাস্তবিকা'র হাসির আসর জমিয়ে তুলেছিলেন। পরবর্তী কালে 'শনিবারের চিঠি'তেও সেই একই ধারার স্বত-উৎসার। কিন্তু তৃতীয়বারের স্থায়িরূপে 'শনিবারের চিঠি'র আত্মপ্রকাশের অব্যবহিত পরেই তাঁর আকস্মিক জীবনান্ত ঘটে। তাহলেও 'শনিবারের চিঠি'র পরিমণ্ডলে রবীন্দ্র মৈত্রের অবতারণা নিরর্থক নয়। বাংলা গল্পসাহিত্যের দ্বিতীয় পর্বে ইতি এবং নেতিমূলক প্রয়াস-প্রবাহের যে ফলশ্রুতি ইতিহাসের স্বীকৃতি অর্জন করেছে, তারই অনুক্রমে রবীন্দ্র মৈত্রের ব্যঙ্গ-সরস সৃষ্টি 'শনিবারের চিঠি'র গোষ্ঠিভুক্ত। তাছাড়া সজনী দাসের সরস ও 'বিরস' গল্পে যথাক্রমে যে জ্বালাবর্ষী ব্যঙ্গ এবং আত্মযন্ত্রণাবোধের অভিব্যক্তি, তাই প্রগাঢ় পূর্ণতা আয়ত্ত করেছে রবীন্দ্র মৈত্রের লেখনীতে।

তাঁর সিরিয়াস্ গল্পপ্রবাহের মতই ব্যঙ্গ-গল্পগুলিও অব্যবহিত জীবন-প্রসঙ্গকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা। আর সিরিয়াস্ গল্পে বিদ্রূপের যে শাণিতধার ছুরির আঘাত ক্ষীণ প্রচ্ছন্নপ্রায়, তাই একেবারে নিরাবরণ হয়ে উঠেছে হাসির গল্পগুচ্ছে।

'লিপি বিবর্তনী' নামক গল্পের শুরু হয়েছে,—"বাল্যাবধি গবেষণা করিবার প্রবৃত্তি আমার অত্যন্ত প্রবল। প্রবৃত্তিটা অনেকদিন চাপা পড়িয়াছিল, শেষে গবেষকদিগের সম্মান দেখিয়া গত বৎসর গবেষক হইবার ইচ্ছা জন্মিল। কিন্তু গবেষণার নূতন কোনো ক্ষেত্র দেখিলাম না। ভাষাতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আরসোলার বংশানুক্রম পর্যন্ত যাবতীয় ক্ষেত্রেই মহারথী এবং রথীরা অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। শেষে দৃষ্টি পড়িল একখানি চিঠির দিকে। মাথায় বুদ্ধি আসিল। সেইদিন হইতে বাংলার লিপি-সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা সুরু করিলাম।"

এই উপলক্ষ্যে লেখকের দপ্তরে অনেক চিঠি জমে গিয়েছিল। ক্রমশ-প্রকাশ্য সেই পত্র-ধারার কয়েকটি পত্র 'যুগবিভাগ' করে ক্রমান্বয়ে ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে গল্পে। সাকল্যে আটখানা বা চার জোড়া পত্র উদ্ধৃত হয়েছে,—অর্থাৎ, প্রতি যুগে প্রণয়ীর আবেদন ও প্রণয়িনীর প্রতিবেদন।

প্রথম পত্র-"আদিম বর্বর যুগের লিপির প্রতিলিপি"—তুলোট কাগজ ও কয

কালিতে রচিত। ১৬৭০ শকাব্দের ১৯ চৈত্র "আশীর্বাদকস্ত দামোদর শর্মণঃ" রচনা,— বৈধী পত্নী 'প্রিয়ে কাদম্বরি'র উদ্দেশ্যে। অধ্যাপকের চতুষ্পাঠীতে দামোদর বিরহ-সন্তপ্ত হৃদয়ে ব্যাকুল,—সাবিত্রী-ব্রত প্রতিষ্ঠার দীর্ঘায়ত প্রয়াসের পরিবর্তে কোনো আশু সংঘটনীয় ব্রত উদ্‌যাপনের নির্দেশ সহযোগে পত্র রচনা করেছেন। অপরাপর উপদেশ-নির্দেশের মধ্যে "গুরুজনের সেবায় সর্বদা অবহিত" থাকবার উল্লেখও সবিশেষ ছিল।

দ্বিতীয় পত্রে সম্ভবতঃ প্রথম পত্রের উত্তর দিয়েছেন কাদম্বরী দেবী। "শতকোটি প্রণামান্তে" স্বামীকে ধৈর্য ধারণের উপরোধ জানিয়ে লিখেছেন,—দিবাভাগের কর্মব্যস্ততায় বিস্মৃতি অনিবার্য, কেবল রাত্রিকালে বিরহ-যন্ত্রণা দুঃসহ হ'লে 'ইষ্টমন্ত্র জপ' অথবা 'সাবিত্র্যুপাখ্যান পাঠ' করে থাকেন তিনি।"

তৃতীয় পত্র মধ্যরোমান্টিক যুগের রচনাকাল ২৫শে চৈত্র, সন ১২৯৭, রচনাস্থল "কলিকাতা"। পাতলা চিঠির কাগজে পাখির ছবি ছাপা আছে, তার মুখে খামের পত্র, নীচে লেখা "যাও পাখি বলো তারে, সে যেন ভোলে না মোরে"। এ-পত্রও 'প্রাণাধিকা হৃদয়েশ্বরী' অর্থাৎ বৈধী পত্নীর উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন তার 'প্রেমদাস' প্রবাসী স্বামী মুকুন্দ। মুখ্য জিজ্ঞাস্য বিষয় ছিল, হেমাঙ্গিনী তার 'প্রেমদাস'কে কিরূপ ভালবাসেন—"শৈবলিনী যেমন প্রতাপকে, দরিয়া যেমন মোবারককে, আয়েষা যেমন জগৎসিংহকে, কুন্দনন্দিনী যেমন নগেন্দ্রকে, রোহিণী যেমন গোবিন্দলালকে—ততখানি, না তদপেক্ষা অধিক?"

অতঃপর হেমাঙ্গিনীর উদ্দেশ্যে ক্রীত প্রেম-উপকরণ তৈল, আলতা থেকে অভিনব প্রেমপত্রের দীর্ঘ ফিরিস্তি আছে। এর উত্তরে বাশখালি থেকে ১২৯৮ সালের ৮ই বৈশাখ হেমাঙ্গিনী তার 'প্রাণেশ্বর হৃদয়সর্বস্ব'কে জানিয়েছিলেন, একখানি ভিন্ন তার ভাল সাড়ী নেই, ডুমুর ফুলের হাতের ব্রেস্‌লেট্ 'কলিকাতার নূতন প্যাটেন' মত গড়া, তাই দেখে তিনি মুগ্ধ ইত্যাদি। অবশ্য পরিশেষে জ্ঞাপন করেছেন,—স্বামীকে তিনি যত ভালবাসেন "এত ভাল বোধ করি কোন স্ত্রী কোন স্বামীকে ভালবাসে নাই।" এমনকি "যদি পাখি হইতাম তবে উড়িয়া গিয়া তোমার ঠোঁটে ঠোঁট লাগাইয়া বসিয়া থাকিতাম।" তদভাবে ভাবী পক্ষি-জন্মের প্রার্থনা জানিয়ে পত্র মারফৎই শতকোটি চুম্বন জানানো হয়েছে,—পত্রের কাগজেও বৈশিষ্ট্য আছে,—ছাপানো লাল ফুলের কুঁড়ির তলায় ছাপার হরফে লেখা ছিল:—"শিশিরে কি ফুটে ফুল বিনা বরিষণে, চিঠিতে কি ভিজে মন বিনা দরশনে।"

তৃতীয় জোড়ার প্রথম পত্র 'বর্তমান বস্তুযুগ'-এ 'সবুজ কাগজ' লাল কালিতে রচিত অনামিক পুরুষ লিখেছেন 'সাকী'কে,—বিনা তারিখের চিঠি। অর্থাৎ ভূতপূর্ব সাকী,

বর্তমানে পত্রলেখক স্বামীর বিবাহ-বন্ধনে যার দম বন্ধ হতে চলেছে,—কারণ মনে মনে যখন বিয়ের আগের লুকোচুরি রাজ্য গড়ে তুলতে ইচ্ছে করে, তখন হঠাৎ দেখা যায় "পটলি, গণেশ, বৌদি আর ছোট কাকা পথ আগলে বোসে আছে।" অতএব পুরাতনকেই নূতন বন্ধুত্বের আমন্ত্রণে আহ্বান করতে হয় নিরুপায় সাকীকে।

'সাকী'র রচিত পত্র-শেষে পুনশ্চতে ফ্লবেয়ারের বইয়ের তর্জমার জন্য উৎকণ্ঠা আছে।

সর্বশেষ পত্রগুচ্ছ—সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যক—অনাগত ভ্রূণযুগের গবেষণালব্ধ (?) সম্ভাব্য প্রতিরূপ। সবুজ কাগজে লাল কালিতে টাইপ্ করা হয়েছে; 'সোমবার ১২-৪৪ মিনিট, দুপুর'-এ টাইপ্ করেছেন ১২ নং গোরস্থান এভিনিউর চকোর চাকলাদার। সে চিঠির বিষয়-মাহাত্ম্য অপর পক্ষের উত্তরেই প্রতিভাত হতে পারবে,—উত্তরের চিঠির কাগজ এবং হরফ যথাপূর্ব। টাইপ্ করা হয়েছে,—'সোমবার রাত দুপুর'এ:—

"আমার প্রাণ হোটেলের নতুন বোর্ডার,

তোমার চিঠি। কাল তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। অবশ্য বরাবর যদি এমন ভালো লাগে তবে তো ভালো কথা। কিন্তু যদি না লাগে? কাজেই আমি একটা trial দিতে চাইছি তোমাকে। আমি সাত দিনের কনট্রাক্টে তোমাকে নিতে রাজি আছি। অবিশ্যি তুমি আমার বাড়িতে আসবে। তোমার আপিস তুলে আনবে আমার বাবুর্চি-খানার পাশের ঘরটায়। তোমার কুকুর আনতে পারবে না। কেন না আমার কাব্‌লি বেড়ালটা ভয় পাবে। মিঃ বৈরাগী—যিনি আমার স্বামীর post-এ গত তিনমাস ধরে কাজ কর্চেন—তাঁর সঙ্গে তিন মাসের agreement ছিল, কাল শেষ হবে। কাজেই কাল সন্ধ্যাবেলাতে তুমি আসতে পার। মিঃ পিপাসু পাল আমার সেক্রেটারির ছেলে—সেদিন পৌরোহিত্যে First Class Honours নিয়ে পাশ করেছেন। তিনি পুরোহিত হবেন। রাত আটটার মধ্যে বিয়ে শেষ হয়ে যাবে। বাসর গ্রামকেক অথবা জিঞ্জার বিয়ার যে-কোনো হোটেলে হতে পারে—তোমার খুশি।

তোমাকে ভাল লেগেছে বলেই বলছি, তিনটি জিনিস আমি পছন্দ করিনে—

(১) সকালে ঘুম থেকে ওঠা। (২) চেঁচিয়ে খবরের কাগজ পড়া। (৩) খেতে বসে পা দোলানো।

এ সব সার্তে রাজী যদি তুমি থাক তবে কাল সকালে চিঠি দেবে। ঠিক বেলা

দশটায় যেন চিঠি পাই। কেননা আমার ছেলে দুটি Boarding School-এ আছে। Ceremony-র সময় তাদিকে আনতে হবে।"

তোমার হ্রেষা হোড়
২৭ নং কদম্বকেলি রোড"

গল্পের শেষ এখানেই। কেবল শেষোক্ত পত্র দুখানি সম্পর্কে ফুটনোট-এ গবেষক (?) জানিয়েছেন,—"এ চিঠি দুখানি আমার সংগ্রহের মধ্যে নাই। লিপি-সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছি শুনিয়া 'বাস্তবিকা'র সদস্যরা আগামী যুগের প্রেমপত্রের একটা আনুমানিক নমুনা অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাই নকল করিয়া দিলাম।"

—রবীন্দ্র মৈত্রের ব্যঙ্গ-গল্পের এক সার্থক প্রতিনিধি এই রচনাটি,—অর্থাৎ, সমসাময়িক জীবন-প্রসঙ্গের অসংগতির প্রতি ক্ষুরধার বিদ্রূপের ছুরিকা সঞ্চালনের এক সার্থক নিদর্শন। গল্পে-সাহিত্যে-আলোচনায় নরনারীর যৌনসম্পর্কের উদ্ঘাটনে নীতি ও রীতিরাহিত্যের (unconventionalism) যে অতি-উৎসাহ সমসাময়িক সেকালে প্রখর হয়ে উঠেছিল, তারই বিরুদ্ধে পরিহাসের অভিঘাত নাটকীয় রীতিতে ক্রমপরিণতির চরম-বিন্দুতে পৌঁছে দিয়েছেন শিল্পী তাঁর সর্বশেষ কল্পিত চিঠিতে। আঙ্গিকের দিক থেকে অভিনবতা, তথা নতুন চমকসৃষ্টির দাবি নিশ্চয়ই এ গল্পের আছে। কেবল যৌন-প্রসঙ্গ নয়, 'আধুনিক কবিতা', লীগশাসনের অসঙ্গতি ('দিবাস্বপ্ন,—রহিমী আমল'), নতুন সমাজ-সংস্কারের সাধনাহীন আড়ম্বরের বিড়ম্বনা ('সংস্কারক') ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে পরিহাস-বিদ্রূপের ঘন ঘন বজ্রবিদ্যুৎ পাতনের আতঙ্ক সৃষ্টি করে তুলেছিলেন একদা এই উদীয়মান গল্পলেখক। এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্পষ্ট করে নেবার প্রয়োজন রয়েছে। ব্যঙ্গ-শিল্পী রবীন্দ্র মৈত্রকে সকলপ্রকার 'আধুনিকতা'র পরিপন্থীরূপে কল্পনা করার প্রবণতা একালে একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু যথার্থ ঘটনা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সমসাময়িক কালের রাজনীতি-সমাজনীতির অসাম্য-পীড়িত অসুস্থ পরিবেশে সমাজকর্মী ও দেশহিতব্রতী রাজনীতিকের নির্যাতিত জীবনব্রত স্বেচ্ছায় তিনি বরণ করেছিলেন, এবং আমৃত্যু তাঁর ব্রত-ভঙ্গ হয়নি। আর শুধু সেই সীমিত জীবনের গণ্ডিতেই নয়,—সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশভূমিতেও রবীন্দ্র মৈত্র আত্মার গভীরে ছিলেন প্রগতিকামী। 'উদাসীর মাঠ', বা 'ক্যানভাসারে'র মত গল্পে তার স্বাক্ষর রয়েছে। কেবল ভারসাম্যে অভাবের প্রতি, তথা অসঙ্গতির বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর একমাত্র জেহাদ। অথবা সেই নিরবচ্ছিন্ন অবক্ষয়ের যুগে অসামঞ্জস্য আর অসঙ্গতি জীবনের সকল দিকে প্রায় দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল,—তাই পরিহাসশিল্পীর লেখনীতেও

নিরুপায় বিক্ষোভের বিষজ্বালা ছিল অনাবৃত ; যার ফলে অনেক রচনাই অব্যবহিত যন্ত্রণাবোধের বিষচক্রের সীমা লঙ্ঘন করে সার্থক নির্মিতির পর্যায়ে উঠে আসতে পারেনি। কেবল 'সংস্কারক' নয়, 'ত্রিলোচন কবিরাজ'-এর মত বিখ্যাত গল্প সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। জীবনের অবাঞ্ছিত অসংগতিগুলিকে ক্রূরতম বঙ্কিমভঙ্গিতে অতিবিস্তারিত করে পরিহাসাস্পদ করে তোলাই রবীন্দ্র মৈত্রের ব্যঙ্গ-গল্পের মুখ্য শৈলী। 'লিপি বিবর্তনী'তে যেমন,—'ত্রিলোচন কবিরাজ'-এও ঠিক একই আঙ্গিক অনুসৃত হয়েছে। সেই বিস্তৃতি স্বাভাবিকতার সীমা অতিক্রম করে গেলে তা হাসির উপকরণ হয়ে উঠে,—শিল্পীর চোখের তির্যক বঙ্কিম দৃষ্টি সেই হাসিতে ব্যঙ্গের হুল যোগান দিয়ে থাকে। বস্তুত সেই হুলের জ্বালা ভুলে গিয়ে হাসির মানসসরোবরে শিল্পীর মন ভেসে যদি উঠ্‌তে পারে তবেই ব্যঙ্গ স্থায়ী হাস্যরসের উপকরণ হয়ে উঠে বলে বিশ্বাস করি,—যেমন হয়েছে বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র 'বাবু', 'বড়বাজার' ইত্যাদি রচনায়। সমসাময়িক জীবনের নীরন্ধ্র অপঘাতকে বিদ্রূপে কষাহত করেছেন বঙ্কিম, কিন্তু অন্তরের মূলভূমি থেকে সুগুতর জীবন্মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে উন্মূলিত করতে পারেননি। এখানেই Pope-Dryden-এর মত ব্যঙ্গশিল্পীর থেকে 'কমলাকান্তে'র তফাৎ। বিদ্রূপের জ্বালাটাই সব নয়—সব কিছুর অতীত অনাবিল হাসিটুকুকেও উপেক্ষা করা চলে না সেখানে। ব্যঙ্গরসিক রবীন্দ্র মৈত্রের শিল্প-চেতনায় 'কমলাকান্তে'র শ্রদ্ধাপূত অনুভব প্রগাঢ় হয়েছিল বলে বিশ্বাস করি। সজনীকান্তের 'মধু ও হুল'-এর ভূমিকায় কমলাকান্তের কালজয়ী কীর্তির কথাই তিনি স্মরণ করেছেন :—যাকে ভালবাসা যায় নি, তাকে আঘাতও করতে পারেন নি কমলাকান্ত, রবীন্দ্র মৈত্রের এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তাঁর নিজের সরস রচনার পক্ষেও অবান্তর নয়। 'লিপিবিবর্তনী', 'ত্রিলোচন কবিরাজ', 'সংস্কারক' ইত্যাদি আলোচিত-অনালোচিত সকল রচনাতেই লেখক কেবল সেইসব অসঙ্গতির মূলেই বিদ্রূপের কুঠার হেনেছেন—যার সুস্থ, সজীব অস্তিত্বের স্বপ্নকে তিনি মনপ্রাণে ভালবেসেছিলেন প্রবল আবেগের সঙ্গে। ফলকথা কমলাকান্তের কালজয়ী প্রতিভা নিশ্চয়ই দিবাকর শর্মার ছিল না,—কিন্তু তাঁর সৃজনবাসনা কমলাকান্তের আত্মিক সাধর্ম্যের আকাঙ্ক্ষায় তন্ময় হয়েছিল—এমন অনুমান একেবারেই নিরর্থক নয়।

এঁর গল্প-সংকলন গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে—'থার্ডক্লাস' (১৩৩৫), 'দিবাকরী' (১৩৩৮), 'উদাসীর মাঠ' (১৩৩৮), 'বাস্তবিকা' (১৯৩২), 'ত্রিলোচন কবিরাজ' (১৯৩৩), 'নিরঞ্জন' (১৯৪৮) ইত্যাদি।

হাসির গল্পে 'শনিবারের চিঠি'র অনুবৃত্তি

'শনিবারের চিঠি'র সূত্র অনুসরণ করে বাংলা হাসির গল্প ও গল্পকারদের প্রসঙ্গ বহুদূর প্রসৃত হতে পারে। বস্তুত অন্তরের সহজাত পরিহাস রসের সার্থক প্রকাশ কামনা করেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী'র কর্মাধ্যক্ষ থেকেও সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। এমন কি 'প্রবাসী'র তীরে নিশ্চিত আশ্রয় আর প্রতিষ্ঠার আসন আয়ত্ত হয়ে যাবার পরেও 'শনিবারের চিঠি'র বিলোপে চাতকের মত সজনীকান্তও ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন ঐ একই কারণে। শুধু তাই নয়, সমসাময়িক সাহিত্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে মুখ্যত ব্যঙ্গ-পরিহাস-কুশল সাংবাদিকতার দৃঢ় দক্ষতা-বলেই 'শনিবারের চিঠি'র সু এবং কু দুরকমের খ্যাতিই সেদিন অনস্বীকার্য হয়েছিল। এসব তথ্য পূর্বে উল্লেখ করেছি। ফলকথা, 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠায় গদ্যে-পদ্যে, গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-নাটকে বহু সিরিয়াস্ রচনারই প্রকাশ ঘটেছে,—যাদের ঐতিহাসিক সম্মাননীয়তা আজ অবিসংবাদিত। তাহলেও তার 'শনিবারের চিঠি'ত্ব—অর্থাৎ, যথার্থ স্বকীয়তা আসলে কালজয়ী পরিহাস-রস সৃষ্টির অফুরন্ত বৈচিত্র্য আর বৈশিষ্ট্যে। ফলে সমসাময়িক কালের প্রবীণ ও তরুণ শিল্পী অনেকেই 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠায় বিচিত্রস্বাদী হাস্যরসের আসর জমিয়ে তুলেছিলেন। এঁদের মধ্যে গল্পলেখক হিশেবে একান্ত অন্তরঙ্গরূপে অবশ্য-স্মরণীয়তার দাবি রয়েছে অশোক চট্টোপাধ্যায় আর ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের। এই দুজনের কেউই গল্পের সংকলন প্রকাশ করেন নি। সমকালীন সাহিত্য-সাময়িকীর পৃষ্ঠাতে তাঁদের বিস্ময়কর দক্ষতার অভিব্যক্তি গুহায়িত হয়ে আছে। অশোক চট্টোপাধ্যায় 'শনিবারের চিঠি'র জন্মদাতা। তাঁর অতুল্য রচনা-দক্ষতার প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাস লিখেছিলেন "উইট্ হিউমার ও স্যাটায়ার রচনায় তাঁহার অসাধারণ স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল। এই বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি বাংলাদেশে আমি দেখি নাই।"[১] 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্য গল্পে এই হাস্যরসিক প্রতিভার বিচিত্র পরিচয় নিবদ্ধ রয়েছে।

ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রখ্যাত ব্যঙ্গশিল্পী 'বনফুল'-এর শিক্ষক,—এই অদ্ভুত-স্বভাব লোকটি একদা কলকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। বনফুলের ব্যক্তি-চরিত্রেই কেবল নয়, কোনো কোনো রচনাতেও এই অসাধারণ মানুষটির প্রভাব সুচিহ্নিত হয়ে আছে। বনবিহারীর হাস্য-সরস গল্প-সাহিত্যের কথা স্মরণ করে পরিমল গোস্বামী লিখেছেন,—"বাংলা-ভাষায় তিনি ছিলেন স্যাটায়ারের

১। সজনীকান্ত দাস 'আত্মস্মৃতি'—২য় খণ্ড।

রাজা"[১০]। ১৩৩৬ বাংলা সালের ভাদ্র সংখ্যায় সমসাময়িক 'আধুনিক সাহিত্যে' যৌন ভাবনার আতিশয্যকে ব্যাহত করতে 'নরকের কীট' লিখে 'শনিবারের চিঠি'র আসরে যোগ দিয়েছিলেন বনবিহারী। রচনাটি সেকালে বিতর্ক আর পরস্পর-বিরোধী তপ্ত আলোচন'-আন্দোলনে 'নরক গুলজার' করে তুলেছিল প্রায়। সজনীকান্ত লিখেছিলেন "নরকের কীট বাংলা সাহিত্যে আগে বাড়ার একটি মাইল স্টোন।"[১১] এই সিদ্ধান্তের সবটুকুই স্বজনকৃত্য নয়।

অশোক চট্টোপাধ্যায় আর বনবিহারী মুখোপাধ্যায়,—এঁরা দুজনে 'শনিবারের চিঠি'র মৌলিক উদ্দেশ্য-প্রকৃতির সঙ্গে ছিলেন অভিন্নহৃদয়। তাই সজনীকান্ত ও রবীন্দ্র মৈত্রের মত 'শনিবারের চিঠি'র আত্মার অন্তরঙ্গ তাঁরা,—যে অর্থে প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব ছিলেন 'কল্লোলে'র। তাছাড়াও, 'শনিবারের চিঠি'র হাসির গল্পের আসরে প্রবীণ-শিল্পী পরশুরাম ও দাদামশাই কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরোবর্তী করে এসেছিলেন সেকালের তরুণ শিল্পী অনেকে,—স্বয়ং পরিমল গোস্বামী দীর্ঘকাল 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদনা করেছিলেন;—তাঁর সম্পাদকীয়তার সূত্রেই বনফুল 'শনিবারের চিঠি'রও অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। প্রমথনাথ বিশী—প্র-না-বি-ও এসেছিলেন বিচিত্র ভূমিকায়,—কখনো 'নূতন কথামালা'র গল্প-লেখক 'বিষ্ণু শর্মা' রূপে, কখনো বা 'মন্ জুয়ান'-এর কবি স্কট্-টম্সন-এর আকারে। তাহ'লেও, যেমন পরশুরাম, কেদারনাথ, তেমনি পরিমল, বনফুল, প্রমথনাথ,—কেউই এঁরা একান্তভাবে 'শনিবারের চিঠি'-গোষ্ঠীর শিল্পি-পর্যায়ভুক্ত নন। সেকালের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন-বিবর্তনের পরস্পর-বিপরীত অভিঘাতময় ক্রান্তিলগ্নে 'শনিবারের চিঠি'র এক আত্মিক ফলশ্রুতি ছিল। এই গোটা অধ্যায়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে সেই বিশিষ্ট প্রাণস্বভাবের ইঙ্গিত করেছি। কেবল রচনাতেই নয়,—যাঁদের রচনা-প্রকৃতির মূলেও যুগধর্মের স্ববিরোধ ও আত্মযন্ত্রণাকে শক্রভাবে ভজনা করার প্রবণতা সহজাত দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল, কেবল তাঁদেরই 'শনিবারের চিঠি'র পরিহাস-রসিক শিল্পিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে দেখেছি। পরিমল গোস্বামীর অনুরোধে ব্যঙ্গ কবিতা লিখে আত্মপ্রকাশ করবারও আগে বনফুল 'শনিবারের চিঠি'তে আধুনিক সাহিত্যের দুর্নীতি প্রসঙ্গে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাহলেও কথাসাহিত্যের সৃজনীক্ষেত্রে তিনি কেবল পরিহাসরসিক নন;—অভিনব নূতনতার জন্মদাতা। তাই ছোটগল্পকার বনফুলের স্বরূপ সন্ধানে তাঁর পরিহাসরসিক অস্তিত্ব-পরিচয় স্বাভাবিক কারণেই গৌণ হয়ে যাবে।

১০। পরিমল গোস্বামী স্মৃতিচিত্রণ।
১১। সজনীকান্ত দাস 'আত্মস্মৃতি'—২য় খণ্ড।

বাংলা সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গরসিক তিনি, কিন্তু ছোটগল্প-শিল্পী বনফুলের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ব্যঙ্গরসের পথযাত্রী নয়। অন্য পক্ষে প্রমথ বিশী বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র-কর্মা বিস্ময়। শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির সর্বঘটে এবং সকল মঠে তাঁর শক্তি-দৃপ্ত অধিষ্ঠান। তাই প্রায় একই সঙ্গে তাঁকে 'কল্লোলে'র হাটে এবং 'শনিবারের চিঠি'র ঘাটে গল্পলেখকের ভূমিকায় উপস্থিত দেখি। পরিমল গোস্বামী এঁদের মধ্যে একমাত্র শিল্পী, ছোটগল্পে যিনি কেবলই পরিহাস-রসের কারবার করেছেন,—এবং করছেন আজও। কিন্তু সেই দ্বিধাখণ্ডিত যুগসন্ধির কালেও যেমন ব্যক্তি-স্বভাবে, তেমনি রচনা-প্রকৃতিতেও তিনি ছিলেন অনুগ্র;—'মধ্যপন্থী' বলে নিজেকে অভিহিত করেছেন নিজেই।

অতএব, কর্মসূত্রে 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে সম্পৃক্ত, কিন্তু আত্মিক স্বভাবে স্বতন্ত্র এইসব শিল্পীদের অনুল্লিখিত রেখেই 'শনিবারের চিঠি'তে হাসির গল্পের আসর-পরিচিতি এখানেই স্থগিত রাখা যেতে পারে।

তা হলেও দ্বিতীয় পর্বের বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে মুখ্যত হাস্যরসের এক স্বতঃস্ফূর্ত ধারা এই আসরেই প্রবাহিত হয়েছিল,—এ-কথা স্মরণ করে সমসাময়িক কালের হাসির গল্পের মোটামুটি পরিচয় অনুসন্ধান এখানেই করে দেখা যেতে পারে। সাহিত্য-আন্দোলনের দিক থেকে নয়,—হাস্যরস-প্রকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান প্রেক্ষিতেই এই আলোচনা সর্বাপেক্ষা প্রাসঙ্গিক হবে। অতএব, পূর্বালোচনার অনুবৃত্তি হিশেবে গোষ্ঠি-নিরপেক্ষ, এমন কি অন্যতর গোষ্ঠিভুক্ত শিল্পীদেরও পরিচয়সূত্র অনুসরণ করে দ্বিতীয় পর্বের বাংলা ছোটগল্পে হাস্য-রস-প্রকৃতির সাধারণ স্বভাব নির্ণয়ের চেষ্টা করব এবারে।

হাসির গল্পের অপরাপর শিল্পী

পরিমল গোস্বামী

বাংলা ছোটগল্পের দ্বিতীয় পর্বে, তথা ভগ্ন-প্রত্যয় বিশ শতকের জীবনধারার প্রথম পর্যায়ে বিশুদ্ধ হাস্যরসের গল্পকাররূপে এক মুখ্য স্মরণীয়তা পরিমল গোস্বামীর (১৮৯৯ খ্রী:)। অর্থাৎ, আলোচ্য যুগে তিনিই এক প্রধান শিল্পী যিনি প্রচুর গল্প লিখেছেন,—গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন,—অথচ হাস্যরসের ছাড়া অন্য রসের গল্প লেখেননি। হাস্য-রসিক গল্পকার হিশেবে রবীন্দ্র মৈত্র ও সজনীকান্ত অ-বিস্মৃতব্য, তাহলেও এঁদের সৃজনী-বাসনার গোপন গহনে সিরিয়াস্ গল্প লেখার আকাঙ্ক্ষাও অদম্য হয়েছিল। 'হাসির গল্পে'র জগতে অশোক চট্টোপাধ্যায় ও বনবিহারী মুখোপাধ্যায় গুণে মুগ্ধ

করেছেন, কিন্তু রচনা-পরিমাণে স্বল্পতার সীমা অতিক্রম করেননি। বনফুল, প্রমথ বিশী সাহিত্যের জগতে বহুচর; বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের অনুভবেও জীবন-দৃষ্টির বিমিশ্রতা রয়েছে,—একই লেখনী দিয়ে রোমান্স আর হাস্যরসের গল্প লিখেছেন তিনি। এযুগের আর একজন গল্পকার পরিহাস-রসের সৃজনে অনন্যনিষ্ঠ এবং অক্লান্তকর্মা হয়ে আছেন আজও ;—তিনি শিবরাম চক্রবর্তী। আপাতদৃষ্টিতে সাহিত্যের জগতে তিনি পরিমল গোস্বামীর বিপরীত কোটির অধিবাসী। প্রথম জন 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর অভিন্নহৃদয় বন্ধু,—'কল্লোল'পন্থী পত্রিকাবলীর নিয়মিত লেখক ;—আর দ্বিতীয় জন 'শনিবারের চিঠি'র কিয়ৎকালীন সম্পাদক। তাহলেও, এঁদের সার্থক রচনা-প্রবাহের প্রতি লক্ষ্য করে মনে হয়, হাসির গল্পের বুঝি কোনো জাত নেই ; অন্ততঃ এঁরা দুজনে গোত্রহীন স্বতন্ত্র স্বভাবধর্মের নিষ্ঠাবান্ অনুসারী। সেই মৌল প্রকৃতিতে পার্থক্য থাকলেও স্বধর্মানুসরণের বৈশিষ্ট্যে এঁরা সগোত্র, তাই বুঝি পরস্পরের সঙ্গে প্রগাঢ় শ্রদ্ধানুভবের সম্পর্কে অন্বিত-ও।

১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা রেডিওর পক্ষ থেকে পনেরো অধ্যায়ের একটি উপন্যাস প্রচারিত হয়েছিল 'পঞ্চদশী' নামে। এ'র চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য ছিল,—পনেরোটি অধ্যায় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লিখেছিলেন সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান পনেরো জন গাল্পিক। এঁদের মধ্যে সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তম সংখ্যক লেখক ছিলেন পরিমল গোস্বামী। এই তথ্যের উদ্ধার করে তিনি নিজেই বন্ধনীভুক্ত মন্তব্য করেছিলেন,—"অন্যান্য ব্যাপারে যেমন, এখানেও দেখছি তেমনি আমি মধ্যপন্থী হয়ে বসে আছি।"[১২] নিছক সংখ্যা গণনায় শিল্পীর এই সিদ্ধান্ত আঙ্কিক নির্ভুলতা দাবি করতে পারে না। অর্থাৎ, পনেরো জন লেখকের মধ্যে যথার্থ মধ্যবর্তী ছিলেন অষ্টমজন। তাহলেও মনে হয়, আশ্চর্য এক অন্তর-সচেতন অর্ধমনস্ক ভঙ্গীতে পরিমল গোস্বামী নিজের শিল্পী সত্তার সত্য পরিচয়টি সার্থক ব্যঞ্জনায় প্রক্ষেপিত করে গেলেন সেকালের বহু-বিতর্কিত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে।

তাঁর ব্যঙ্গ-গল্পের বিষয়বস্তুতে অব্যবহিত জীবন-ঘটনার ছাপ বহুল। নিজে বলেছেন, স্থায়ী সাহিত্য-কর্মে যুগের সত্য চিরন্তনতা লাভ করে,—কিন্তু তাঁর হাসির গল্পে নাকি ক্ষণকালীন হুজুগ-এর আতিশয্যই উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয়েছে।[১৩] তাহলেও অস্বীকার করবার উপায় নেই,—পরিহাস-রসান্বিত বাংলা ছোটগল্পের জগতে পরিমল গোস্বামীর বহু রচনা বৃহত্তর কালের হাতে পরীক্ষিত হবার দাবি রাখে। বস্তুত হাস্য-

---

১২। পরিমল গোস্বামী 'স্মৃতি চিত্রণ'। ১৩। দ্রষ্টব্যঃ—'মারকে লেঙ্গে' গল্প-গ্রন্থে লেখকের প্রাথমিক উক্তি।

রসের প্রাথমিক উপকরণ অব্যবহিত পরিপ্রেক্ষিত থেকে সাধারণভাবে আহৃত হয়ে থাকে ;—চোখে-দেখা জীবনের অসংগতিই মুখ্যত হাসির খোরাক জোগায়। পরিমল গোস্বামীর রচনাতেও সেই ধারার অনুবর্তন লক্ষ্য করি এক বিশেষিত ভঙ্গিতে। নিজে তিনি বলেছেন,—"আমাদের জীবনে হাসির উপকরণ নানাবিধ,—প্রধানত মানুষের জীবনে অসঙ্গতির যে একটা দিক আছে, সেইটিকে একটু বাড়িয়ে দেখলেই আমরা সাধারণত হাসি।"[১৪]

রবীন্দ্র মৈত্রের পরিহাস-রসের গল্পেও তাই দেখেছি ;—সমকালীন জীবনের বিচিত্র অসঙ্গতির প্রতি বঙ্কিম কটাক্ষ সহযোগে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আসর জমিয়ে তুলেছিলেন তিনিও। কিন্তু তাঁর হাসির উৎস-মূলে ক্ষোভের যে জ্বালা আর উত্তাপ ছিল, পরিমল গোস্বামীর গল্পে তা অনুপস্থিত ; তাতে গল্পের গঠন এবং হাসির স্বাদুতায় এক নতুন চমক সঞ্চারিত করে। মৌল প্রকৃতিতে পরিমল গোস্বামীও ব্যঙ্গরসিক। কিন্তু "সে ব্যঙ্গ ইস্পাতের ছোরার ন্যায় অত্যন্ত হ্রস্বকায়, তাই বলিয়া ধার কম নয়, এবং উজ্জ্বলতাও যথেষ্ট। ইস্পাতের ছোরাখানা লেখকের কোমরবন্ধে কোথায় যে লুক্কায়িত সব সময় দেখিতে পাওয়া যায় না, হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া আঘাত করে, আবার বিদ্যুতের চমকের মত মেঘান্তরালে মিলাইয়া যায়। এইজন্যই তাহা ব্যঙ্গের তলোয়ারের চেয়ে বেশি মারাত্মক।"[১৫] এই যথার্থ উপলব্ধি সিদ্ধ ব্যঙ্গরসিক প্রমথনাথ বিশীর। কিন্তু বর্তমান উপলক্ষ্যে এ মন্তব্যের তাৎপর্য দূরতর প্রসারী। অর্থাৎ, রবীন্দ্র মৈত্রের মত সমসাময়িক ক্রান্তি-যন্ত্রণায় বিক্ষুব্ধ শিল্পীর রচনায় ব্যঙ্গের তলোয়ার প্রথম থেকেই স্পষ্টদৃষ্ট—সে রচনায় আঘাতের উদ্দেশ্য এবং হাসির উপকরণ পূর্বাবধি স্থির-লক্ষ্য ; ফলে পরিমল গোস্বামীর ব্যঙ্গ-গল্পের আকস্মিক চমকটুকু ওখানে অনুপস্থিত।

শুধু তাই নয়, প্রথম থেকে ব্যঙ্গ-বিষয় সম্পর্কে শিল্পী একান্ত অনাবিষ্ট বলে প্রকরণের মধ্যেও এক অনাবিল তথ্য-বর্ণনার ভঙ্গী স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। এখানেই স্মরণ করতে হয়, জীবনের বৃত্তি এবং স্বাভাবিক প্রবণতাতেও পরিমল গোস্বামী সাংবাদিক-প্রাবন্ধিক। সাংবাদিকের মত নৈর্ব্যক্তিক শৈলীতে নিছক নিরুত্তাপ বিবৃতিমূলক (narrative) ভাষায় তিনি গল্পের প্লটকে বিস্তারিত করে গেছেন। কোথায় কখন যে যথার্থ আঘাতের চরমবিন্দুটি এসে উপস্থিত হবে, সে উৎকণ্ঠায় পাঠকমন সদা সচকতি হয়ে থাকে। তার আরো এক কারণ, জীবনের যে-কোনো উপাদান সম্পর্কেই শিল্পীর কোনো বিশেষিত মোহ বা বিরূপতা নেই ;

১৪। পরিমল গোস্বামী-হাসির উপকরণ :—'ম্যাজিক লণ্ঠন' (গ্রন্থ)। ১৫। 'প্রমথনাথ বিশী-"পরিমল গোস্বামীর ব্যঙ্গ-গল্প : পরিমল গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-গল্প।'

ফলে যে-কোনো অসঙ্গতি নিয়েই তিনি কটাক্ষদীপ্ত হাসির চমক জাগিয়ে তুলিতে পারেন। তাছাড়া আদর্শ সাংবাদিকের মত তাঁর তথ্য-দৃষ্টি এমন বিচিত্র এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ যে, কোথায় কোন্ অকল্পিত প্রেক্ষাপটে হাসির উৎস উৎসারিত করে তুলবেন, আগে থেকে তা নিঃসন্দেহে অনুভব করবারও উপায় নেই। তাই গল্প পড়তে পড়তে নিজের সম্পর্কেও সতর্ক হয়ে থাকতে হয়। পাঠকমনে সঞ্চিত এই সন্তর্পণ মনোভাব রচনার দক্ষতায় পরিমল গোস্বামীর ব্যঙ্গ-গল্পের পরিবেশ আরো গাঢ়-ঘন-সন্নিবিষ্ট হয়ে উঠেছে। অথচ কোনো বিরুদ্ধ মনোভাবের দ্বারা তীব্রভাবে পীড়িত নয় বলেই হাস্যরসের প্রাণোত্তাপ সুগভীর হয়েও ব্যঙ্গের হুল যন্ত্রণাদায়ক হতে পারেনি প্রায় কখনোই।

দৃষ্টান্ত হিশেবে 'সাধু হীরালাল' গল্পের প্রসঙ্গ স্মরণ করা যেতে পারে। গল্পের নাম এবং বিষয়বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য করে প্রথমেই মনে হয় সাধুসন্তদের অলৌকিক ক্ষমতা এবং সে সম্পর্কে সাধারণ জনতার অতিলৌকিক ভক্তির চিরন্তন দুর্বলতাই বুঝি লেখকের ছুরিকাঘাতের উপকরণ হয়ে উঠবে। বস্তুত হিমসাধু, নকলসাধু হীরালাল এবং হিমতীর্থে হিমসাধুর কৃপাবিষ্ট শক্তি-প্রমত্ত হীরালালের সম্পর্কে প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ-বিস্তার দেখে এই অনুমান অনিবার্য হয়ে ওঠে। নিতান্ত স্বাভাবিক বিবৃতিমূলক ভাষার অন্তরালবর্তী সহজ-প্রবাহিত হাসির ফল্গুধারাও হাস্যরসাবেশের সঞ্চার করে। হিমসাধুর পরিচয় প্রসঙ্গে শিল্পী লিখেছেন,—"সাধু হিমালয় হইতে আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম হিমসাধু। হিমসাধু অলৌকিক ক্রিয়ায় সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন।...হিমসাধু দশ হাত শূন্যে ঝুলিয়া থাকিতে পারেন, যতদিন ইচ্ছা অনাহারে বাঁচিতে পারেন; হিমসাধু কুকুরকে বিড়াল এবং বিড়ালকে ইঁদুর বানাইতে পারেন, তিনি স্বয়ং ময়ূর হইয়া পেখম তুলিয়া হাজার হাজার লোককে মুগ্ধ করিতেছেন এরূপ সংবাদ 'বিশ্ব-দূতে' ছাপা হইল। প্রুফ্ দেখিতে দেখিতে হীরালালের হঠাৎ মনে হইল, হায়, সেও যদি ময়ূর হইয়া নাচিতে পারিত।"

এই বাক-শৈলীর কথা স্মরণ করেই হয়ত কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছিলেন, পরিমল গোস্বামীর "গল্পগুলি পড়িতে মুখ হাসে সামান্যই, মন হাসিতে থাকে বহুক্ষণ এবং মনে হাসির দাগও থাকিয়া যায়।"[১৬] সাধু হীরালাল গল্পে সেই সুদীর্ঘস্থায়ী হাসির দাগ সঞ্চিত হতে এখনো বাকি! তার আগে হীরালাল সত্যিই একদিন পেখম ধরে নাচতে লাগলো ময়ূরের মত,—অর্থাৎ নকল সাধু সেজে যৎপরোনাস্তি প্রবঞ্চনা করতে লাগলো লুব্ধ মুগ্ধ জনসাধারণকে;—প্রচারের মাধ্যম

১৬। 'পরিমল গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্পের সমালোচনা ('ম্যাজিক লণ্ঠন'-এর পশ্চাৎপট থেকে)

হল 'বিশ্বদূত'.; বন্দোবস্ত ছিল পরস্পরের লাভের অর্ধাংশ বখ্রা। উপার্জন প্রচুরই হচ্ছিল দিনে দিনে। কিন্তু "হীরালালের অদৃষ্টে এই সুখও টিকিল না। সে ক্রমাগত অসাধু উপায়ে সাধু সাজিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল।" অতএব 'বিশ্বদূত'কে ফাঁকি দিয়ে একদিন সে নিজ গ্রাম্য গৃহের পথে গেল পালিয়ে। কিন্তু সেখানেও শান্তি পাওয়া গেল না। অর্থাভাব ও অর্থার্জনের ফিকিরের অভাব অনর্থ করে তুলল। "তাই হীরালাল একদিন ঘুমন্ত স্ত্রীকে ফেলিয়া চৈতন্যদেবের মতো গৃহত্যাগ করিয়া গেল।" গ্রামে রাষ্ট্র হল সে 'সন্ন্যাসী' হয়েছে—কিন্তু কিছুদিন পরে ঠিকানাহীন একচিঠি লিখে হীরালাল জানালো সে 'সাধু' হয়েছে।

সাধু হীরালাল হিমসাধুর চরণাশ্রয়ে গিয়ে উপনীত হল "কাঞ্চনজঙ্ঘার জঙ্ঘা-প্রদেশে।" সেখানে রূপান্তরলাভের অলৌকিক বিদ্যা আয়ত্ত করে দেশের পথে প্রত্যাবৃত্ত হল একান্ত হৃষ্টচিত্তে; কারণ এবার অসাধু না হয়েও সাধুগিরির প্রদর্শনীতে সে কোটিপতি হতে পারে। কিন্তু ভাগ্য ছিল প্রতিকূল। হীরালালের অসাধু সাধু-গিরির কালে যারা তার পৃষ্ঠপোষণ করে লাভবান্ হয়েছিল,—সেই 'বিশ্ববন্ধু' পত্রিকাই তার আকস্মিক অন্তর্ধানের সুযোগে তার প্রবঞ্চনার চাঞ্চল্যকর গুপ্তকথা ফাঁস করে দিয়ে আর একদফা লাভবান্ হয়ে উঠেছিল। দেশের পুলিশ হীরালালের সন্ধানে ছিল; অথচ হিমালয়ের সংবাদপত্র-বিরহিত অঞ্চলে হীরালাল এ-সব কিছুর কোনো সন্ধানই রাখ্‌ত না। গল্পের এই অংশ পড়তে পড়তে মনে হয় আক্রমণের নিশানা (target) বুঝি এবারে সাধুগিরি থেকে সংবাদপত্র-পত্রিকার অভিমুখী হবে। কিন্তু এহো বাহ্য।

কারণ হীরালাল গৃহে পদক্ষেপ করা মাত্র তার স্ত্রী নির্বোধের মত চীৎকার করে উঠল,—"ওগো তোমাকে পুলিশ ধরবে গো—ইত্যাদি।" অতএব তথ্যটি গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গেল, এবং সেখান থেকে পুলিশ মহলেও। কিংকর্তব্য সম্বন্ধে এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই হীরালাল নানাকথা ভেবে নিল। অতঃপর যথাকর্তব্য স্থির করে অপেক্ষমান হয়ে থাকল,—পুলিশ যখন তাড়া করে খুবই নিকটবর্তী হয়ে এল, তখন "হীরালাল ছুটিয়া গিয়া নদীতে ডুবিয়া গেল, আর উঠিল না। পুলিশ চেষ্টা করিয়াও আর তাহার সন্ধান পাইল না। সকলেই জানিল হীরালাল মরিয়াছে।"

কিন্তু হীরালাল মরেনি। হিমসাধুর কৃপায় রূপান্তরবিদ্যা তার হস্তগত। অতএব নদীর জলে সে কুমীর হয়ে বাস করতে লাগল। সেই বেশে নিজের স্ত্রীকে সে একবার দর্শনও দিয়েছিল। কিন্তু সে সব প্রসঙ্গ অবান্তর। কুমীররূপে হীরালাল পুলিশকে জব্দ করার নানা ফন্দী চিন্তা করতে লাগল। একবার ভাবল সন্ত্রাসবাদী হয়ে পুলিশ

ধরে গিলে খাবে,—কখনো বা ভাবলে কম্যুনিষ্ট হয়ে কলওয়ালাদের ধরে খাবে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে না পেয়ে পুলিশেরা বিব্রত এবং অপদস্থ হবে, —এই ছিল হীরালালের সান্ত্বনা। "কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল সে সাধু হইয়াছে, যদি প্রতিশোধ লইতে হয়, মহৎ প্রতিশোধ লওয়াই ভাল। তাহার মাথায় একটা বুদ্ধিও খেলিয়া গেল, এবং নিজের বুদ্ধিতে খুশি হইয়া কুমীর অবস্থাতেও হীরালাল খানিকটা হাসিয়া লইল। হাঁ এইবার ঠিক হইয়াছে! এইবার হীরালালকে তাড়া করা দূরে থাকুক, পুলিশ খাতির করিয়া অন্ত পাইবে না। শুধু পুলিশ নহে, স্বয়ং বড়লাট তাহাকে খাতির করিবেন। ইহাকেই বলে প্রতিশোধ।

হীরালাল জল হইতে একলাফে স্টাড্‌বুল হইয়া ডাঙায় উঠিয়া আসিল।"

তীক্ষ্ণ ছুরির একটিমাত্র আঘাতে বিদ্রূপ-হাস্যের দীপ্তি চমকিত হয়ে উঠেছে ঐ শেষ ছত্রটিতে। বস্তুত ঐ একটিমাত্র ছত্রের প্রস্তুতি হিশেবেই সুদীর্ঘ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠাব্যাপী বিবৃতির পসরা সাজিয়েছেন যেন শিল্পী। গল্পের রচনাকাল ১৯৩৫; আর ভারত-ইতিহাসের সাধারণ পাঠকও স্মরণ করবেন, সেকালের ভারতীয় বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগোর অদ্ভুত ষণ্ডপ্রীতির কাহিনী,—আর স্মৃতিমাত্রেই পরিমল গোস্বামীর ব্যঙ্গশৈলীর তীব্রতা, আকস্মিকতা এবং অমোঘতার পরিচয় যুগপৎ প্রদীপ্ত হয়ে উঠতে পারবে ঐ একটি ছত্র উপলক্ষ্য করে। এই শেষ ছত্রের বিন্যাস ও আবেদন-বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কবিশেখর কালিদাস রায়ের মন্তব্য পুনরায় স্মরণ করতে হয়,— "পরিমল গোস্বামী তাঁহার হাসির গল্পে কিউ-এ দাঁড় করাইয়া সিনেমার টিকিট্ দেওয়ার মত পাঠকচিত্তকে কৌতূহলী করিয়া রাখিয়া নির্বিকারভাবে কথকতা করিয়াছেন।"— এই কথকতা, অর্থাৎ নিরুদ্বেগ বিবৃতিমূলক কাহিনীবিন্যাস এবং এক নির্বিকার অনাবিষ্ট তথ্যান্বেষী সহজ witty দৃষ্টিভঙ্গিই পরিমল গোস্বামীর ব্যঙ্গগল্পের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।

পরবর্তী কালে গল্প রচনার আকৃতিতে বিচিত্র বিস্তার দেখা দিয়েছে—সাধু ভাষার বদলে চলিত রীতি সার্বিক অধিকার লাভ করেছে, সেই সঙ্গে প্রকরণেও সঞ্চারিত হয়েছে অভিনবতা। কোথাও হয়ত নাটকীয়তার সংলাপ-সুশোভিত ভঙ্গী (দ্রষ্টব্য— 'অনেষ্ট অটল' গল্প) কোথাও বা রোমান্টিকতা-মদির প্রকৃতি-পরিবেশ ব্যঙ্গ রূপায়ণের উপকরণ যুগিয়েছে। কিন্তু পরিমল গোস্বামীর গল্প-প্রকৃতিতে wit ও satire-এর সন্তর্পণ (subtle) স্বভাব সর্বত্রই প্রায় অপরিবর্তনীয় হয়ে আছে।

এঁর গল্প-সংকলন গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে—বুদ্‌বুদ (১৯৩৬), ট্রামের সেই লোকটি (১৯৪৪), ব্ল্যাক্ মার্কেট (১৩৫২), স্কুলের মেয়েরা, মারকে লেঙ্গে (১৯৫০), শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প (১৯৫৪), ম্যাজিক লণ্ঠন (১৯৫৫) ইত্যাদি*।

প্রমথনাথ বিশী

চলমান কালের বাংলা সাহিত্যে প্রমথনাথ বিশীর (১৯০১) সাধনা প্রায় সর্বতোমুখী। আকৃতি, এমন কি প্রকৃতিতেও তাঁর সৃষ্টি যেমন বিচিত্রস্বাদী, তেমনি স্বনামে, বেনামে, সংক্ষিপ্ত নামে নিজেও তিনি বহুরূপী। ১৩৩১ বাংলা সালের সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'তে বিষ্ণুশর্মা ছদ্মনামে 'নূতন কথামালার গল্প' লিখেছিলেন (১৪ই অগ্রহায়ণ সংখ্যা), 'কল্লোল'-বিরূপ বক্র কটাক্ষ ছিল তার অন্তর্লীন উদ্দেশ্য। অথচ ঐ একই বছরে আষাঢ় সংখ্যা 'কল্লোলে' স্বনাম-প্রকাশ প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন স্নিগ্ধ মধুর প্রণয়-রহস্যান্বিত ছোটগল্প অথবা গল্পকথিকা 'সাগরিকা'। আবার ঐ বছরেই একই 'কল্লোল' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রমথনাথ বিশী লিখেছিলেন পরিহাস রসের গল্প 'নৈয়ায়িক'। অন্যপক্ষে পরবর্তী কালের মাসিক 'শনিবারের চিঠি'তে মনজুয়ান পর্যায়ের 'কল্লোল'-কটাক্ষবর্ষী ব্যঙ্গ-কবিতাবলীতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন স্কট্ টম্‌সন্ নামে। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে বিদ্রূপ এবং মনস্বিতা-তীর্থক সাংবাদিকতা ভাবনার ভূমিকায় তিনি কমলাকান্ত শর্মা।

ফলকথা, গদ্যে, পদ্যে, নাটকে, উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধে, সিরিয়াস্ এবং পরিহাসকুটিল রচনায় প্রমথ বিশীর প্রতিভা সর্বতোভদ্র। শুধু তাই নয়, স্বাদের মত রচনার পরিমাণেও বৈচিত্র্য এবং প্রাচুর্য কিছু কম নেই; আবাল্য শান্তিনিকেতনের ছাত্র এবং রবীন্দ্রস্নেহ-সংবর্ধিত প্রমথনাথ স্বল্প বয়স থেকেই সৃজনদক্ষ। তাহলেও, অর্থাৎ সমস্ত বিচিত্রতা এবং বিস্তারের মধ্যেও প্রমথ বিশীর শিল্প-স্বভাবের ঐক্য-সূত্রটি অস্পষ্ট নয়। স্বনামে এবং সংক্ষিপ্ত নামে প্রধানত তিনি দ্বৈতসত্তা। শিল্পিমনীষী প্রমথনাথ বিশী একদিকে দেশ-কাল-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজ সম্পর্কে তাঁর খরশান চিদ্ভাবনাবলীকে সহৃদয় চিত্তবৃত্তির জারকরসে জারিত করে স্নিগ্ধ রসান্বিত উপন্যাস, কবিতা, অথবা সাহিত্য-প্রবন্ধ রচনায় অবিরতগতি; আর একদিকে হৃদয়ানুভবের সকল কোমলতাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের তাপে বাষ্পীভূত করে জীবনের যত দুর্বলতা, স্খলন, পতন, দৈন্যের পটভূমিতে বসেছেন খরবুদ্ধি প্র. না. বি. তীক্ষ্ণ পরিহাস-রসের খড়্গ হাতে করে। দেখে বিস্ময়ের সঙ্গে মনে হয় একই ব্যক্তিত্বের আধারে এই পরস্পর-বিরোধী দ্বৈত অস্তিত্ব কি করে সম্ভব! কিন্তু বাইরে যা দ্বৈত-স্বভাব, শিল্পীর অন্তরে আসলে তাই দ্বৈতাদ্বৈত—বিপরীতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারার সানন্দ চমক্ রচনাতেই প্রমথ বিশীর প্রতিভা যেন এক আশ্চর্য কৌতুক অনুভব করে থাকে। বস্তুত কৌতুকরসিকদের নিয়ত নির্লিপ্ত এক হাস্যরেখাকে প্রাণের গভীরে বহন করে ফিরছেন শিল্পী প্রমথ বিশী।

গল্প-সংকলনের তালিকা গ্রন্থের শেষাংশে প্রাপ্ত।

মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতা এবং সদবৃত্তির প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস এবং সহানুভূতিতে সে প্রাণের উৎকণ্ঠা গোপনে গোপনে ফল্গুপ্রবাহের মতই স্বতউৎসারিত। কেবল এই কারণেই তাঁর সিরিয়াস রচনাবলী,—কেবল উপন্যাস বা কবিতা নয়, এমন কি ভূরি পরিমাণ প্রবন্ধ-সাহিত্য পড়েও মনে হয় আরো গভীর আরো প্রগাঢ় হয়ত তারা হতে পারত;—কিন্তু ঐ একই সঙ্গে অপশোষের বদলে মনে মনে পরম স্বস্তির নিশ্বাস আনমনেই যেন বেরিয়ে আসে,—সে লেখা আরো অনেক নিরেট অনেক কঠিন হয়ে পড়েনি বলে। প্রমথ বিশীর সমালোচনা-গ্রন্থ পড়েও সাহিত্য-পাঠের সদৃশ এক স্মিত তৃপ্তি-বোধে মন খুশি হয়ে ওঠে,—সে কেবল লেখকের স্বভাবগত কৌতুক-রসের নেপথ্য অনুভব ক্ষণে ক্ষণে অনিবার্য হয়ে ওঠে বলেই,—একথা কিছু অত্যুক্তি নয়। তেম্‌নি প্র. না. বি.র ব্যঙ্গ-গল্পের তীক্ষ্ণধার খড়্গাঘাতে ভূতলশায়ী হয়ে পড়েও আতঙ্কিত মনে চম্‌কে উঠে ভাবতে হয়, যত জোরে যতটুকু আঘাত লাগবার কথা ছিল, তা যেন লাগে নি! এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার ব্যঙ্গাহত মনেও কৌতুকানুভবের এক অতি মৃদু পরিতৃপ্তি সঞ্চারিত করে দেয়। ঐটুকু জীবন-প্রেমে কৌতুক-স্মিত প্রমথ বিশীর অনন্য দান। ফলকথা, তাঁর হৃদয়ানুভব-স্নিগ্ধ রচনার অন্তরালেও খরবুদ্ধি কৌতুক-রসিকের খুশির লঘু আমেজ জড়িয়ে থাকে, ব্যঙ্গ-রচনার অন্তর্লীন হয়ে থাকে জীবন-প্রিয় শিল্পিমানসের গোপন চিত্ত-স্পর্শ। অর্থাৎ, প্রমথনাথ বিশীর সৃষ্টির গহনে বসে প্র. না. বি. নিজের অজ্ঞাতেই যেন স্মিত হাসি হাসেন, আবার প্র. না. বি.র 'হৃদয় বিদারণ' (?) হাসির অন্তরালে সহৃদয় হৃদয়ভারাতুর প্রমথনাথ বিশী নিজের ডান হাতের আঘাত বাঁ-হাত পেতে গ্রহণ করেন।

অন্য প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে কেবল কথাসাহিত্যের জগতেও প্রমথনাথ দ্বৈত সত্তা।—উপন্যাসের জগতে তিনি প্রমথনাথ বিশী,—'পদ্মা', 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার', 'চলনবিল', এবং পরবর্তী কালের 'কেরী সাহেবের মুন্সী'র মধ্যেও যাঁর পরিচয়। আর ছোটগল্পের জগতে মুখ্যত তিনি প্র. না. বি.; যদিও কচিৎ-কদাচিৎ প্রমথনাথ বিশীও একেবারে অলক্ষ্য নন। এই দুয়ে মিলে, অর্থাৎ উপন্যাসের প্রমথনাথ বিশী আর ছোটগল্পের প্র. না. বি.-র সংযোগেই কথাশিল্পী প্রমথনাথের সামগ্রিক পরিচয়। বর্তমান উপলক্ষে অবশ্য কেবল ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই আলোচনাকে সীমিত রাখতে হবে, কিন্তু তাতেও লেখকের দ্বৈতাদ্বৈত অখণ্ড স্বরূপের আবিষ্কার সম্পূর্ণ ব্যাহত হবার কথা নয়।

ছোটগাল্পিক প্র. না. বি. রুক্ষ-কঠিন পরিহাস-শিল্পী রূপেই সবিশেষ জনপ্রিয়।

তবু 'কবির অন্তরে যিনি কবি' অর্থাৎ প্র. না. বি.র অন্তরালে জীবন-পিপাসু-যে প্রমথ বিশী রয়েছেন, মনে হয় তাঁর অন্তরের প্রবণতা রোমান্স-রহস্য-মেদুর সৌন্দর্যভাবনার অনুকূল। এদিক থেকে স্মরণ করতেই হয় যে, জন্ম-সূত্রে পদ্মা-বিধৌত নদীমাতৃক উত্তরবঙ্গের সন্তান প্রমথ বিশী; আর কবি-তীর্থ শান্তি-নিকেতনের রাঢ়-প্রকৃতি ছিল তাঁর বাল্য-চেতনার ধাত্রী। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় শিল্পীর অতি তীক্ষ্ণ এবং প্রগাঢ় নিসর্গ-প্রীতির প্রসঙ্গ বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন তাঁর উপন্যাস-সাহিত্যের আলোচনা উপলক্ষ্যে। মনে হয়, প্রমথ বিশী কেবল নিসর্গ-প্রিয় নন, বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গে তাঁর সমগ্র শিল্পি-ব্যক্তিত্ব যেন নিসর্গাশ্রিত। অর্থাৎ, নিসর্গ-চেতনা তাঁর অন্তর্লীন রোমান্টিক্ প্রবণতারই আন্তরিক ধাত্রী। প্রমথ বিশী তথা প্র. না. বি. সম্পর্কে এই মূল্যায়ন-প্রচেষ্টা আপাত-দৃষ্টিতে অসম্ভব-কল্পনা বলেও প্রতিভাত হতে বাধা নেই; কারণ প্রখর বুদ্ধিজীবী প্রমথনাথ আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে নিজের এই যথার্থ পরিচয়টুকু গোপন করে ফিরেছেন,—যেমন গল্পে-উপন্যাসে, তেমনি ব্যক্তি-জীবনেও। পাঠকের সঙ্গে যেন অভিনব এক লুকোচুরি খেলা খেলে চলেছেন শিল্পী চিরকাল,—ঐটুকু তাঁর সহজাত কৌতুক-রসিকতার দান। আবারো বলি, এইখানেই স্রষ্টা প্রমথ বিশী বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

তাহলেও ছোটগল্পের জগতে এই কৌতুকচারী অ-ধরাও যেন মাঝে মাঝে ধরা পড়ে গেছেন। এই প্রসঙ্গেই পূর্বোক্ত 'সাগরিকা' গল্প-চিত্রের প্রসঙ্গ স্মরণীয় হয়ে ওঠে। আঙ্গিক-বিন্যাসের বিচারে এই গল্পটি শিল্পীর রচনাধর্মের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না কোনো দিক্ থেকেই। প্রথম প্রকাশকালে লেখকের বয়স তেইশ-এর সীমা অতিক্রম করতে পারে নি,—এদিক থেকে অপরিণত বয়সের অপেক্ষাকৃত অপরিণত রচনা 'সাগরিকা'। আর কেবল এই কারণেই—কৌতুক-চতুর প্র. না. বি. (প্রমথনাথ বিশীর মধ্যেও যিনি নিয়ত গোপনসঞ্চারী) ঐ বয়সে সবচেয়ে অপ্রস্তুত ছিলেন বলেই হয়ত নিজেকে গোপন করার খেলায় চরম কলাকৌশল তখনো পুরো আয়ত্ত হয় নি।—তাই রোমান্স-প্রিয় নিসর্গ-পিপাসু ব্যক্তি-মানুষটি সম্পূর্ণই ধরা পড়ে গেছেন,—অনেকটা যেন নিজের অজ্ঞাতেই। একথা ভাবতে পারাতেও কৌতুক রয়েছে যে, একালের প্রখ্যাত প্র. না. বি.-র হৃদয়ানুভবের কালিতে ডুবিয়েই নীচের ছত্র ক'টি একদা লিখিত হতে পেরেছিল :—

"ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। একে একে নুলিয়াদের ছোট ছোট নৌকাগুলি এবং দূর সমুদ্রের পাখিগুলি বাসায় ফিরিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের

তরঙ্গরেখার শিরে সহস্র মানিক জ্বলিয়া উঠিল। তীরের সন্ধ্যাচরের দল এতক্ষণ বাসায় ফিরিয়া গিয়াছে—মাঝে মাঝে দু'একটি লোক এখনও এদিকে ওদিকে পড়িয়া আছে। আমি সৈকত-শয্যার এক পাশে কান পাতিয়া পড়িয়া আছি—একটি মাত্র পদধ্বনির সুধাপূর্ণ ইঙ্গিতের জন্য আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় শ্রবণশক্তি লাভ করিয়া উৎসুক হইয়া আছে।"

'সাগরিকা' গল্পের সূচনা হয়েছে এই ক'টি ছত্রে। প্রমথ বিশীর নিসর্গ-চেতনা সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য আবার স্মরণ করতে হয়। কিন্তু আলোচ্য গল্পে তার চেয়েও বেশি করে লক্ষ্য করতে হয় লেখকের শিল্প-চেতনাকে, অন্তহীন নিসর্গ-সৌন্দর্য-সমুদ্রের বালুচরে লুটিয়ে পড়ে পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপে অতি সন্তর্পণে যিনি সূক্ষ্ম স্পর্শকাতর প্রেমানুভবের আরতি করেছেন। এই একই প্রসঙ্গে শিল্পীর অ-দ্বিতীয় বাক্-শৈলীও অনুধাবনযোগ্য। "একটি মাত্র পদধ্বনির সুধাপূর্ণ ইঙ্গিতের জন্য"—শিল্পী বলেন,—"আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় শ্রবণ-শক্তি লাভ করিয়া উৎসুক হইয়া আছে।" সর্বেন্দ্রিয়ের শ্রবণশক্তি লাভের এই অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি বুদ্ধি-জগতের আয়ত্ত নয় কিছুতেই,—এর অপরিহার্য উপকরণ স্ব-স্থ বোধি। অন্যপক্ষে ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ বোধশক্তির অভাবে এই অনির্বচনীয় অনুভবকে একটি বাক্যের খণ্ড-সীমায় প্রদীপ্ত করে তোলাও একেবারেই অসম্ভব হতে পারত। প্রমথ-শৈলীর অতুলনীয়তা এখানেই,—একটি-দুটি ক্ষুরধার শব্দ ও বাক্যাংশের প্রয়োগে পাঠক-চেতনাকে চমকিত এবং সম্ভব স্থলে চমৎকৃত করে তোলাও। বস্তুত এটুকু সম্ভব হয়েছে বোধ এবং বোধির,—গভীর উপলব্ধি ও খরধার বুদ্ধির দ্বৈতাদ্বৈত সম্মিলনের ফলে। আগে বলেছি, সমগ্র প্রমথ-রচনাবলীর রস-ফলশ্রুতির উৎসও এইখানে।

তাহলেও 'সাগরিকা' গল্পের পূর্ব-প্রসঙ্গ আরো কিছুদূর অনুসরণ করার প্রয়োজন রয়েছে।—যে-'একটিমাত্র পদধ্বনির সুধাপূর্ণ ইঙ্গিতের জন্য' শিল্পীর সমস্ত ইন্দ্রিয় শ্রবণশক্তি লাভ করে উৎসুক হয়ে থাকত,—সেই পদাধিকারিণীই সাগরিকা। তবু লেখক বলেন,—"সাগরিকা আমার মনগড়া নাম। ছুটিতে সমুদ্র-তীরে বেড়াইতে আসিয়া তাহার সহিত এই ক্ষীণ পরিচয়টুকু হইয়াছে। কোনো দিন দিনের বেলায় তাহাকে দেখি নাই।

—দেখা সম্ভবও তো নয়। সাগর-সৈকত-বিহারিণী,—হয়ত সে সাগর-মানসী! দিনের আলোকে সর্বসমক্ষে বিদেশী সমাগমে কোলাহল-মুখরতার মধ্যে আসবে কী করে! নিঃসঙ্গ জীবনের অতি সন্তর্পণ নিভৃতির মধ্যেই তো তার আবির্ভাব সম্ভব।

গল্পের প্রচ্ছদ গড়ে উঠেছে লেখক, তথা গল্পের নায়কের সমুদ্রতট ছেড়ে যাবার পূর্ব-সন্ধ্যায়। এই স্বল্প কয়দিনের সাগর-তটবাসের অভিজ্ঞতায় প্রতি সন্ধ্যাশেষে সাগরিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে,—নিভৃত, একান্ত, গভীর। তবু তার কোনো পরিচয় জানা হয় নি,—এমন কি নামটিও না। লেখকের মুখে সাগরিকা নাম শুনে মনে হয় সে যেন খুশি হয়েছিল। তাকে টলাবার ব্যর্থ চেষ্টায় রাতের পর রাত তর্কের জাল রচনা করেন লেখক,—তর্কে তাকে পরাজিত করবার জন্যে 'পুথির তূণ থেকে' সমস্ত বিদ্যার অস্ত্র সংগ্রহ করেছেন। তবু হার মানে নি সাগরিকা,—মনে মনে শিল্পীকেই বরং হেরে যেতে হয়েছে। সেই হার সম্পূর্ণ করে দিয়ে সাগরিকা বলেছিল,—"তোমাদের শিক্ষা যে উৎস হইতে তাহা যেমন অগভীর তেমনি ব্যবহারের দ্বারা সংকীর্ণ।"

সাগরিকার সেকথা মনে-প্রাণে মেনে নিয়ে লেখক অনুভব করেছেন,—"তাহার শিক্ষা সমুদ্রের নিকটে—গভীরতার তল সেখানে নাই, ব্যবহারের সম্পূর্ণ বাইরে যাহার সার্থকতা, এবং যে ভাষার টীকা নিস্তব্ধ নিশীথের মৌন নক্ষত্রজাল জ্যোতিরিঙ্গিতে মাত্র করিয়া থাকে।"

চলে যাবার পূর্ব সন্ধ্যায় লেখক তার কাছে একটি স্মারক চিহ্ন চেয়েছিলেন,—হয়ত প্রতিদান হিশেবেই। অপার কৌতুকে হেসে উঠেছিল সাগরিকা,—অনেক সাধ্য-সাধনার পরে কাগজের মোড়ক একটি তুলে দিয়েছিল লেখকের হাতে। অনেকদিন আগে আরো বেশি সাধ্য-সাধনা করে সাগরিকাকে নিজের নাম-লেখা একটি আংটি খুলে দিতে পেরেছিলেন হাত থেকে। আজ বিদায়-পূর্ব রাত্রের নিভৃত নিঃসীমতায় তারই অমৃত-প্রতিদান পেয়ে মুদ্রিত-চক্ষু শিল্পী তন্ময়তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। অনেকক্ষণ পরে স্ব-স্থ হয়ে চোখ যখন খুললেন, সাগরিকা তখন মিলিয়ে গেছে নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে। তারপরে শঙ্কিত সন্তর্পণে মোড়কটি খুলে স্তব্ধ হয়ে যেতে হল,—এ যে সেই আংটি,—সেই নাম লেখা,—লেখক যেটি তুলে দিয়েছিলেন সাগরিকার হাতে। নিষ্ঠুরা রহস্যময়ী নারী। নিঃস্তব্ধ অন্ধকার-স্তিমিত সাগর-বেলায় অনেকক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসে থেকে অবশেষে লেখক আংটিটি ছুঁড়ে ফেলেন দূরে সাগরের বক্ষে; মনে মনে ভাবেন,—"সাগরিকাকে যাহা দিতে পারি নাই, সাগরকে তাহা দিলাম।"

তারপরে স্ব-স্থ শিল্পী পারিপার্শ্বিকের প্রতি তাকিয়ে দেখেন,—সাগর-বেলার দূর দিগন্তে "তখন সুদূর অস্তাচলের শিখরে অর্ধচন্দ্র উঠিতেছে। সেই আলোতে দিগন্তের শেষ হইতে এই তীর পর্যন্ত তরঙ্গের শিরে শিরে অপূর্ব জ্যোৎস্নার একটি

অপরূপ সেতু রচিত হইয়াছে। স্বর্গীয় এই আলোক-পথ কি মানুষকে মহারহস্যের পরপারে লইয়া যাইতে পারে! জানি না।"

রবীন্দ্র-কবিতার ছত্র মনে পড়ে,—"তব অন্তর্ধান পটে হেরি তব রূপ চিরন্তন।" রহস্যময়ী সাগরিকা তার নিষ্ঠুর অন্তর্ধান-পটে শিল্পীর অন্তরে এক নিরন্তর আলোক-ধারার চিরন্তন পথ-সংকেত রেখে গেছে। কী তার তাৎপর্য, মানবের জৈবতাদীর্ণ পথসংবাহনে কতদূর তার মূল্য?—এই রহস্য-জিজ্ঞাসার রোমান্টিক মেদুরতায় শেষ হয়েছে 'সাগরিকা' গল্প।

এমনকি, প্র. না. বি.-র রচনা-প্রসঙ্গেও অনুভবের এই আবেগাতিশয্যিতা নিরর্থক নয়। আগেও বলেছি, প্রত্যক্ষ রবীন্দ্র-শিষ্য প্রমথ বিশীও আত্মার আকাঙ্ক্ষায় সেই 'স্বর্গীয় আলোক পথের' অভিলাষী,—অজস্র জটিল গ্রন্থি-সমাচ্ছন্ন মানবজীবনকে যা সকল বন্ধন-সমস্যাসঙ্কুল মহারহস্যের পরপারে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আত্মার এই নিভৃত আকাঙ্ক্ষা যেখানে প্রখর আক্ষেপে পরিণত হয়েছে, সেখানেই রোমান্স-বাসনাতুর প্রমথ বিশী প্রত্যক্ষ প্রদীপ্ত ব্যঙ্গ-শিল্পী। এই প্রসঙ্গেই স্মরণ করতে হয়, প্রমথ বিশীও 'কল্লোলযুগের'—তথা আমাদের আত্ম-খণ্ডিত বিশ শতকের অপূর্ণতা-পীড়িত জীবনের শিল্পী। অন্তরের গভীরে আলোক-তীর্থের পিপাসা আর প্রত্যক্ষ জীবনে শূন্যতা, অপূর্ণতা,—রিক্ততা-বঞ্চনা, এ দুয়ের পারস্পরিক অভিঘাতে গঠিত হয়েছে প্র. না. বি.-র রহস্য-জটিল বিচিত্র শিল্প-প্রকৃতি। বিনষ্টি যেখানে একটানা, মানুষের পরাভব সেখানে অনিবার্য। কিন্তু এই পরাভবের মধ্যে কারুণ্য যেটুকু রয়েছে, দর্পিত তীক্ষ্ণতায় তাকে খণ্ড খণ্ড করেছেন শিল্পী;—কারুণ্য দুর্বল; তাই তিনি তাকে ঘৃণা করেন। ফলে পরাভূত মানুষের বেদনানুভব প্রমথ বিশীর রোমান্স-পীড়িত পৌরুষ-চেতনায় বিক্ষোভ ও বিদ্রূপরূপে জমাট বেঁধে উঠেছে,—চোখের জল তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-পরিহাসের তীব্র পীড়নে হয়েছে বাষ্পীভূত—তারই বিচিত্র ফল পরিণাম লক্ষ্য করি প্র. না. বি.-র গল্প-সাহিত্যে। আগে বলেছি, নিছক ব্যঙ্গরসের গল্প লেখেননি প্রমথনাথ,—তাঁর গভীর-গম্ভীর জীবন-ভাবনাময় গল্পগুচ্ছ সংখ্যায় স্বল্পতর হলেও স্বাদ-বৈচিত্র্যে অবিস্মরণীয়। 'উল্টাগাড়ি', 'দ্বিতীয় পক্ষ', 'মাধবীমাসী' 'পেস্কার' ইত্যাদি বহু গল্পেরই উল্লেখ এই উপলক্ষ্যে করা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান আলোচনার প্রয়োজন-প্রসঙ্গে 'ডাকিনী'[১৭] গল্পটির পরিচয় সন্ধান করব বিশদভাবে:—

১৭। 'ডাকিনী' নামে একাধিক গল্প আছে প্রমথ বিশীর; আলোচ্য গল্প 'ডাকিনী' নামক সংকলনে যুক্ত আছে।

"চতুর্বর্গের মধ্যে উল্লেখ না থাকায় হলদেকলসীর চৌধুরীগণ কখনো জ্ঞানের চর্চা করে নাই ; এমন কি চতুর্বর্গের সারাংশ মাত্র রাখিয়া বাকিটুকু তাহারা বরাবর বর্জন করিয়া আসিতেছিল। এ-হেন কালে এবং এ-হেন ক্ষেত্রে কিভাবে চতুর্বর্গাতীত সরস্বতীর উদয় হইল তাহা বিস্ময়কর হইলেও একেবারে অপ্রত্যাশিত নহে। সংসারে অপ্রত্যাশিতের অবকাশ সর্বদাই রহিয়াছে।"

সেই বিস্ময়কর গল্প আর কিছুই নয়, হলদেকলসীর চিরনাবালক মাতৃপক্ষপুটাশ্রিত 'ম্যাট্রিকুলেশন ফেল' শশাঙ্ক চৌধুরীর গৃহে এম্-এ পাশ মল্লিকার অধিষ্ঠান কাহিনী। শশাঙ্ক-জননী অম্বাময়ী প্রখর বুদ্ধিমতী এবং প্রখরতর আত্মগর্বপরায়ণা ছিলেন। দেওঘরে নিজের ইচ্ছায় দেবমন্দিরের চেয়েও উঁচু প্রাসাদ রচনা করে মনে মনে তিনি পরম চরিতার্থ হয়েছিলেন। অতএব প্রায়ই সপুত্র দেওঘরে ভ্রমণে যেতেন। এই ধরনের ভ্রমণ-বিলাস উপলক্ষে একবার মল্লিকাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে যায়। সদাগরী অফিসের সম্প্রেশনপ্রাপ্ত কেরানী যদুনাথবাবু একমাত্র কন্যা মল্লিকাকে নিয়ে বেড়াতে এসেছিলেন সেবার। মাতৃহীনা "মেয়েকে দিবার অন্য কিছু তাঁহার ছিল না বলিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। মল্লিকা এম্-এ পাশ করিয়াছিল।"

এ-হেন মল্লিকার সঙ্গে অম্বাময়ীর সাক্ষাৎ ঘটে যায় তাঁর দুর্বলতার গোপন কেন্দ্র-ভূমিতে ;—অর্থাৎ কিছু না জেনেই প্রথম সাক্ষাতে অম্বার বাড়ির প্রশংসা করে ফেলেছিল মল্লিকা। ভাল লেগেছিল মল্লিকাকে অম্বাময়ীর,—অবশ্য ভাল না লাগবার মত মেয়ে নয় সে কোনো দিক থেকেই। পাল্টা ঘর—অতএব যদুনাথের কন্যাকে তৎক্ষণাৎ হলদেকলসীর কুলবধূ করে নিলেন অম্বা।

বিয়ের পরে ঘটনাচক্রে জানাজানি হয়ে গেল, বৌ ইংরেজি জানে,—গড়গড় করে ইংরেজি বই পড়তে পারে,—ফার্স্ট বুক নয়,—সত্যিই বড় বড় বই। স্বামিদেবতাটি তাতে প্রথম প্রথম খুশিই হলেন,—কারণ নাবালকের রক্ষিকা একটি চাই তো! বিয়ের আগে ছিলেন মা, এবারে স্বভাবতই হল বউ। কিন্তু বউ অতশত বুঝবে কি করে,—আর মাই বা কেমন করে সহ্য করেন একমাত্র পুত্রের জীবন থেকে একচ্ছত্র আধিপত্যের স্বত্বহানি। অতএব সেই আগুনে পুড়ে হলদেকলসীর জমিদার-ভবনে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করতে হল সরস্বতীকে। তার অনেক আগেই মল্লিকার একমাত্র আশ্রয় তার বাবা ইহজগতের খাঁচা খুলে চলে গেছেন।

পাকেচক্রে রাষ্ট্র হয়ে গেল মল্লিকা 'ডাকিনী',—যুক্তি অব্যর্থ। কারণ বধূর স্বাস্থ্য যত ভাল হয়, স্বামী ততই হতে থাকে কৃশ এবং রক্তশূন্য। অতএব পুত্রের তত্ত্বাবধানে মাতা এবার তৎপর হয়ে উঠলেন। বায়ু পরিবর্তনের জন্য মল্লিকা একবার শশাঙ্ককে

নিয়ে দার্জিলিং গিয়েছিল। এবার মা পুত্রকে নিয়ে গেলেন কাশী, বধূ পরিত্যক্তা হল। তারপর সেখানকার আশ্রিতাদের কল্যাণে এক 'সর্বশক্তি-সম্পন্না' যোগিনী-'মা' নির্দেশ করে দিলেন অম্বাময়ীর পুত্রবধূ ডাকিনী।

ক্রমশ সবাই তা শুনল এবং বিশ্বাস করল,—মল্লিকার কানেও কথা উঠলো একদিন। সবশেষে সেইদিন চরম হল,—যেরাত্রে মল্লিকাকে ভয় পেয়ে স্বামী শশাঙ্ক মাতৃ-অঞ্চলাশ্রয়ী হল। চারদিকে লোক থম থম্ করছে,—অবশ্য আড়ালে আড়ালে। শাশুড়ী অম্বাময়ী এসে ডাকিনীর নিকট গললগ্ন-বস্ত্রে প্রার্থনা করলেন, সে যেন তাঁর পুত্রকে ছেড়ে যায়। মল্লিকা প্রায় সংবিৎহীনা তখন,—উন্মাদের মত ছুটে যায় ছাদের দিকে। ছাদ থেকে ছাদে ঘুরে চারতলার চিলে কোঠায় গিয়ে ওঠে সে। নিম্নে সুদূর তলে তখনো প্রবাহিত হয়ে চলেছে গুড় নদী, হলদেকলসীর জমিদার-বাড়ি ছিল সেই নদী-তটবর্তী।

অন্ধকার রাত্রে চিলেকোঠায় উঠে চারদিকে চেয়ে দেখে মল্লিকা।

"...মল্লিকা ঊর্ধ্বে তাকাইয়া দেখিল চৈত্র পূর্ণিমার জ্যোৎস্না দিগ-দিগন্ত ব্যাপিয়া শুভ্র নৈরাশ্যের তাঁবু কানাৎ টাঙাইয়া দিয়াছে—তাহারই উচ্চতম প্রান্তে জাদুকরের মেয়ে চাঁদ শূন্যে ঝুলিতেছে; আরও না জানি কি বিস্ময় সঞ্চিত আছে। নীচে যতদূরে চোখ চলে সুপারি-নারিকেল মাথাগুলি তালে তালে দোলাদুলি করিতেছে। বাতাস উঠিয়াছে। মল্লিকার মনে হইল বাতাস উঠিয়াছে, পাল খুলিয়াছে, কাছিতে টান পড়িয়াছে। আর দেরি নয়। তাহার মনে হইল যে, বাতাসে এখানকার সুপারি-নারিকেলের মাথা দুলিতেছে, সমুদ্রে সে বাতাস কি কাণ্ডই না জানি করিতেছে।...... পৃথিবীর তীরে তীরে যত গুহা কন্দর আছে লবণাম্বুতে পূর্ণ হইয়া এতক্ষণে গদ্‌গদ ভাষায় বেদনার কি স্তবোচ্চারণই না করিতেছে। মল্লিকার মনে আজ ব্যথার জোয়ার, নৈরাশ্যের হোলি। মল্লিকা দেখিল, এই সর্বগ্রাসী বন্যার মুখে কোথাও তাহার কোনো আশ্রয় নাই; না পতিকুলে না পিতৃকুলে, সংসারের সব দিগন্ত কোন্ সর্বনাশের তলায় নিশ্চিহ্ন।......মল্লিকা তাকাইয়া দেখিল, অতি নিম্নে গুড় নদীর রূপার পাত জ্যোৎস্না-চিক্কণ শীতল একটি বট পাতার মত বাতাসে কাঁপিতেছে।...

আবার বাতাস উঠিয়াছে, সুপারি, নারিকেলের মাথাগুলির কি হায় হায় হাহাকার। দূরের বাতাস কাছে আসিয়া পড়িয়াছে—আর বিলম্ব নয়। তাঁবুর উচ্চতম প্রান্তে যাদুকরের মেয়েটা। অনেক্ষণ হইল দুলিতেছে—এবারে লাফাইয়া পড়িবে—আর বিলম্ব নয়...ওর আগেই...

মল্লিকা চিলেকোঠার ছাদে উঠিয়া একবার পৃথিবীটা নিরীক্ষণ করিয়া লইল এবং পরক্ষণেই মাগো রব করিয়া অতি নিম্নে গুড় নদী লক্ষ্য করিয়া ঝাঁপ দিল।

পরদিন সকালে যখন মল্লিকার মৃতদেহ নদীর জলে পাওয়া গেল, তখনো সবাই বলিল, ডাকিনী মানবদেহটা ফেলিয়া কঙ্কাল হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। কামরূপ কামিখ্যের নরদেহে যাইবার উপায় নাই। মানুষের ঘরে মানুষের রূপ ধরিয়া আসিয়াছিল। এবার স্বরূপ ধরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। যাই হোক্ বাড়ির ডাকিনী দূর হওয়াতে সবাই নিশ্চিন্ত বোধ করিল এবং উত্তরোত্তর শশাঙ্কর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিতে লাগিল।'

—ডাকিনী 'সাগরিকা'র মত নয়,—প্র. না. বি.-র 'নিকৃষ্ট' গল্প সংকলনেও এর নির্বাচন ঘটেছে। তা-সত্ত্বেও 'সাগরিকা'র নিসর্গ-ভাবনার মতই উদ্ধৃত অংশের বর্ণনাও নিবিষ্ট, একান্ত প্রগাঢ়! প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ 'জীবধাত্রী' বলেছেন,—মল্লিকার জীবনের সর্বরিক্ত অন্ধকার অমালগ্নে প্রকৃতির এই সঙ্গচারণ প্রকৃতিকে কেবল জীবন্ত করে তোলে নি, অসহায় মানবজীবনে জীবধাত্রী জননীর ভূমিকায় আসীন করেছে। ব্যঙ্গবিদ্রূপ-ভীষণতায় কঠোর এই গল্পের অন্ধকার প্রচ্ছদেও প্রকৃতি-ভাবনার যে রোমান্স-মেদুর স্পর্শ সঞ্চারিত করতে পেরেছেন শিল্পী গল্প-শরীরের কাঠিন্যকে বিন্দুমাত্র আবিষ্ট না করে, এতেই প্রমথ বিশীর অধিকারের শক্তি প্রমাণিত হয়েছে নিঃসংশয়ে; তাঁর রোমান্টিক্ প্রবণতারও অগ্নিপরীক্ষা হল এইখানে।

এই একই প্রসঙ্গে আর একবার প্রমথ বিশীর বাক্‌শৈলীকে অনুধাবন করে নিতে হয়,—যে ভাষা কেবল মনকে চালায় না,—মননকে চমকিত আন্দোলনে ব্যগ্র করে তোলে, অথচ নিজে নড়ে না একটুও। অর্থাৎ এই বাগ্‌ধারার যে-কোনো একটি অংশকে সরিয়ে নিলে তার উপযুক্ত প্রতিনিধি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়। 'ডাকিনী' গল্পের মুখ্য আবেদন অশিক্ষা ও কুসংস্কারের যূপকাষ্ঠে 'সরস্বতী'র নিরুপায় আত্ম-বলিদানের আক্রোশ এবং অভিযোগে। কিন্তু গল্পের আভ্যন্তরীণ বিন্যাস বিচিত্র-স্বাদী,—কোথাও বিদ্রূপ, কোথাও ক্ষোভ, কোথাও স্নিগ্ধস্বভাব-বর্ণনা,—আর এই প্রত্যেকটি আবেদনের উপকরণ গড়ে উঠেছে সমুচিত-ভাষণের তীক্ষ্ণ প্রখরতায়!—দৃষ্টান্ত হিশেবে 'ডাকিনী' গল্পের প্রারম্ভিক ছত্রগুলির বুদ্ধিপ্রখর ব্যঙ্গদীপ্তি আর একবার স্মরণ করতে বাধা নেই!

শুধু তাই নয়। মাঝে মাঝে তাঁর তির্যক্‌ভাষণের উজ্জ্বলতা এমনকি সুভাষিতাবলীর চিরস্মরণীয়তা দাবি করে,—যেমন স্মরণীয় হয়েছিল মধ্যযুগের মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবির বহু রচনাংশ,—কিংবা আমাদের কালে হয়েছে পরশুরামের কৌতুক-বঙ্কিম রচনাংশ; প্রমথ বিশীর রচনাতেও তার পরিচয় কম নেই। নিছক নিদর্শন হিশেবে

'মকরধ্বজী হাসি'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গল্পের নাম ভাঁড়ু দত্ত,—লেখক জানিয়েছেন,—

হঠাৎ এই বিশশতকের জীবন-পথে ভাঁড়ু দত্তের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল একদিন। ষোড়শ শতকের মুকুন্দরামের কালের ভাঁড়ু আজও তেমনি আছে,—চিরন্তন বাঙালী-স্বভাবের অনড় অবিচল অপরিবর্তিত এবং অপরিবর্তনীয় প্রতিনিধি,—অর্থাৎ, মুকুন্দরামের কাব্যের 'ভালুক'-সদৃশ সে। ভাঁড়ু নিজেই শিল্পীকে বলেছিল,—"বানর পশুদের কথা মনে আছে? সেই ভালুকের কথা? আমিই সেই ভালুক। [মুকুন্দরাম] ঠাকুর আমার কথা মনে করেই ভালুকের বর্ণনা করেছেন।"

এ-হেন ভাঁড়ুর সঙ্গে আমাদের কালের পথে দেখা হয়ে যেতেই লেখক তাকে জিজ্ঞেস করেন,—"কি মণ্ডল কোথায় গিয়েছিলে, বাজারে নাকি? সে একমাত্রা মকরধ্বজী হাসি হাসিল। মকরধ্বজী হাসি কি? সর্ববিধ দাবির সার্বজনীন উত্তর আছে সেই হাসিতে। এই হাসি দেখিয়া পাওনাদার ভাবে—এবারে পাট উঠিলেই টাকা পাওয়া যাইবে। দেনাদার ভাবে শীঘ্র আর সুদের তাড়া আসিবে না। জমিদার ভাবে খাজনা মিলিল। প্রজা ভাবে খাজনা মাপ। কিন্তু কাহারো আশা সফল হয় না,—অথচ সকলে খুশি হয়। এ হাসি এমন জিনিস। তেমন করিয়া হাসিতে জানিলে জীবনের অনেক সমস্যা সরল হইয়া যায়।"

আমাদের কালের জীবনযাত্রায় বণিক-সুলভ যে ভাঁড়ামি নূতন আকার এবং প্রকার ধরে আত্মপ্রকাশ করেছে,—তাতে একালের সমাজে 'ভাঁড়ু' দত্তের সংখ্যা সুপ্রচুর বৈ কি! সে ইঙ্গিত গল্পদেহে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে আছে। আর এমন অবস্থায় এই নূতন সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার ঐ 'মকরধ্বজী হাসি'-ই—যার প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট পরিচয়-কথা স্মরণ করতে করতে পাঠকেরও মনে-মুখে হাসি অনিবার্য হয়ে ওঠে।

তাহলেও প্র. না. বি.-র একটিও হাসির গল্পের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়নি এযাবৎ। কেবল এই কারণেই 'চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট' গল্পটির কথা স্মরণ করব,—তা না-হলে গল্প-শিল্পী প্রমথ বিশীর স্বরূপ-পরিচায়ন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে।—

"গুজবটা ক্রমে ব্রহ্মার কানে পৌঁছিল; কোনো মতেই আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না। অতএব তিনি চিত্রগুপ্তের দপ্তরে ছুটলেন কড়া অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করতে। চিত্রগুপ্ত বলেন 'এও কি সম্ভব!' অর্থাৎ পৃথিবী কখনোই মানুষ-শূন্য হতে পারে না, যদিও সারা স্বর্গব্যাপী তাই গুজব।

আত্মসমর্থনে নিজ দপ্তর ঘেঁটে ব্রহ্মাকে কয়েকটি রিপোর্ট পড়ে শোনালেন চিত্রগুপ্ত,—"এই দেখুন হত্যা, চুরি, ডাকাতি, গ্রন্থিচ্ছেদ, নীবীচ্ছেদ, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও

অর্থনৈতিক তস্কর-বৃত্তি ; কত বলিব। পৃথিবীতে মানুষ না থাকিলে এসব কি হইতে পারিত? পশুরা তো এখনও এত উন্নত হয় নাই!"

—"এই দেখুন কালই একটি রিপোর্ট আসিয়াছে। কলিকাতা শহরের বিদ্বৎটন চত্বরে দেশোদ্ধারকারীদের এক সভা হয়। তাহারা সকলেই অহিংসাব্রতী। কাজেই তর্কটা যখন যুদ্ধে পরিণত হইল, তখন সকলে অস্ত্র ব্যবহার না করিয়া সোডার বোতল, কাপড়ের পাদুকা (আমার নিজস্ব সংবাদদাতা বলিতেছেন চামড়ার পাদুকা নাকি হিংসার পরিচায়ক), কাঁসার গেলাস্, ইটের টুক্‌রা প্রভৃতি দ্বারা কোন রকমে কাজ চালাইয়া লইয়াছে। সংবাদদাতা বলিতেছেন, অহিংসদের হাতে এসব জিনিস অস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হইয়াছে। মানুষ না থাকিলে এমনটি কখনোই সম্ভবপর হইত না—কারণ পশুরা এখনো এমন বুদ্ধির প্যাঁচ খেলিয়া মনের সঙ্গে চোখ ঠারিয়া হিংসাকে এড়াইয়া যাইতে শেখে নাই।"

ব্রহ্মা আশ্বস্ত হলেন, তা হলেও চিত্রগুপ্তকে নির্দেশ দিলেন সরেজমিনে তদন্ত করতে,—কলকাতার পথে পথে ঘুরছেন চিত্রগুপ্ত ফাইল ধরে, তাতেই বিপত্তি ঘটেছে। দেবতাদের অনুযোগ ঠিক ; "কেহই আর নিজেকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দেয় না।"

কিন্তু চিত্রগুপ্তও ছাড়বার পাত্র নয়—পৃথিবীতে মানুষ আছে এ কথা সে প্রমাণ করে ছাড়বে। অতএব দ্বিগুণ উৎসাহে আদমশুমারি আরম্ভ করে :—

"—মহাশয় আপনি কি?

—আমি বামপন্থী।

—আপনি কি?

—আমি দক্ষিণপন্থী।

—আপনি?

—সেণ্টার বা মধ্যমপন্থী।"

এমনি করে চিত্রগুপ্ত যতই জিজ্ঞাসা করে, কেউ বলে সে বামপন্থী। "কেউ নাকি দক্ষিণপন্থী, কেউ প্রলিটারিয়েট, কেউ বুর্জোয়া আবার কেউ কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট, ফ্যাসিস্ট, ফেডারেশনিস্ট, রিপাবলিকান, কৃষক, শ্রমিক, লাল ঝাণ্ডা।"

আরো কেউ কেউ চিত্রগুপ্তের কাছে আত্মপরিচয় ঘোষণা করেন—'সমাজতন্ত্রী, রাজতন্ত্রী, সাম্রাজ্যতন্ত্রী, বাণিজ্যতন্ত্রী।'

হতাশ হয়ে বসে পড়ে চিত্রগুপ্ত একেবারে। ঘণ্টাখানেক বিশ্রামান্তে আবার চলে তার আদমশুমারি —

—"আপনি?

—জর্নলিস্ট্।

—আপনি ?

—রিপোর্টার।

তারপর ফুটবলার, সুইমার, বেকার, বুর্জোয়া, নাতিবুর্জোয়া, মেজোবুর্জোয়া, পুঁজিবাদী,শ্রমিক-বন্ধু, কৃষক-বন্ধু, ফিল্মস্টার।

অভিজাত সাহিত্যিক (ক্যাটালগ পাঠরত একদল সুবেশ যুবক) লিটারারি সোস্যালিস্ট্ (নিজেদের বই কেন বেশি বিক্রী হয় না, তারই গবেষণায় রত)।"

"কিন্তু মানুষ, মানুষ কোথায় !" চিত্রগুপ্ত জিজ্ঞেস করে শেষোক্তদের।

"তাঁহারা বলিল—মানুষ ছিল উনবিংশ শতকে। এখন মানুষ কোথায়।

আর একজন বলিল—বঙ্কিমচন্দ্র ছিল শেষ মানুষ।

চিত্রগুপ্ত চলিয়া যাইতেছিল—একজন বলিয়া উঠিল, একখানা বই কিনিবেন ? কমিশন বাদ পাইবেন।"

আবার পথে বেরিয়ে চোখে পড়ে 'ছুটন-ক্রীড্ বিশিষ্ট প্রগতিপন্থী ; নিশ্চল অধোগতি পন্থী তরুণ-তরুণী।'

এমন সময় পাঞ্জাবী কণ্ডাক্টার যাত্রীবোঝাই মোটর বাস থেকে চেঁচিয়ে ওঠে।—"আইয়ে বাবু আইয়ে চিড়িয়াখানা, ছে পয়সা, বলিয়া তাহাকে টানিয়া উঠাইয়া ফেলিল।"

সেখানে চার পয়সার টিকিট কিনে গোটা চিড়িয়াখানাটি দেখে বেরিয়ে সন্ধ্যা-বেলায় হাওয়া-অফিসের মাঠে বসে চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মার কাছে রিপোর্ট লিখে ফেলল :—

"...আমি পৃথিবীতে আসিয়া মানুষের খোঁজ করিলাম—কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, কেহই মানুষ বলিয়া পরিচয় দিল না—কাজেই পৃথিবীতে মানুষ আছে কিনা সন্দেহ। সন্দেহ এইজন্য বলিলাম যে, কলিকাতা শহরে চিড়িয়াখানা নামে একটি তাজ্জব ব্যাপার আছে, চার পয়সা দিলেই সেখানে ঢুকিতে পারা যায়। সেখানে ঢুকিয়াও মানুষ দেখিতে পাইলাম না, কেবল জন্তু জানোয়ার। তবে একটি খাঁচাতে মানুষের মত একটা জানোয়ার আছে দেখিলাম। খাঁচার গায়ে লেখা আছে বনমানুষ। বোধকরি কেবল মানুষ নামে পরিচিত হইতে সে লজ্জিত, তাই বন শব্দটি মানুষের আগে জুড়িয়া দিয়াছে। অন্য কেউ আপত্তি না করাতে আমি উহাকে মানুষ বলিয়া সনাক্ত করিলাম—কাজেই নিবেদন এই যে, পৃথিবী মানুষহীন হইয়াছে, এরূপ আশঙ্কা করিবার কোনো কারণ নাই। এখন প্রজাপতি ব্রহ্মা একটু কৃপাদৃষ্টি করিলে অচির কালের মধ্যে ইহার বংশ বৃদ্ধি হইয়া পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে এমন আশা করা যায়। নিবেদনমিতি—"

একটি সার্থক হাসির গল্প নিঃসন্দেহে এই 'চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট',—তীক্ষ্ণধার ব্যঙ্গের হাতিয়ারে গড়ে উঠেছে উজ্জ্বল সে হাসির মূর্তি। কিন্তু এখানেও প্র. না. বি.-র অন্তর-গভীরে 'সাগরিকা'র শিল্পীকে খুঁজে পেতে অসুবিধা নেই, মানুষের জন্যে আলোকতীর্থের স্বপ্ন দেখ্‌ছেন যিনি প্রতিকূল পরিবেশের আঘাতে ব্যঙ্গবিদ্রূপের কমঠ-কাঠামোর অভ্যন্তরে আত্মসংহরণ করেও। অন্নদাশঙ্করের কথা মনে পড়ে। প্রসঙ্গান্তরে প্রায় একই আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে তাঁরও গল্পের গভীরে—পৃথিবীতে "মানুষ কোথাও নেই। আছে শুধু ইংলিশম্যান, মুসলম্যান, জারম্যান, ব্রাহ্‌ম্যান্। কোন্‌টা বড় ট্রাজেডি,—মানুষের অন্তর্ধান না মানুষের মৃত্যু।"[১৮] অন্নদাশঙ্করে যা নিগূঢ় আক্ষেপ, প্র. না. বি.-র মধ্যে তাই প্রখর বিদ্রূপের রূপ ধরেছে,—ট্রাজিক চেতনার প্রগাঢ়তা এখানে তীব্র তীক্ষ্ণ হাসির রেখায় বিদীর্ণ হয়ে গেছে। গল্প-শিল্পী প্রমথ বিশীর ধ্যান অন্নদাশঙ্করের মত বিশ্বাভিমুখী নয়,—বরং সৃষ্টির আসনটিকে তিনি বাংলাদেশের একান্ত সীমিত জীবনগণ্ডির মধ্যে সংক্ষিপ্ত করে এনেছেন,—তাই সংহতিও তাতে সমধিক। তাই প্র. না. বি.-র নালিশ,—পলিটিশ্যান, রাইটিস্ট-লেফ্‌টিস্ট, প্রগতি-অগতিবাদী কবি-অকবিতে ভরে গেছে আমাদের বাংলাদেশ, কিন্তু তার অন্তরাল থেকে সর্বজনীন, সর্বকালিক মানুষটি গেছে হারিয়ে,—হারিয়ে গেছে মানুষের অন্তর্নিহিত মানবিক চেতনা। এই প্রসঙ্গে একটি সংকেত প্রায় ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠেছে,—মানুষ ছিল উনিশ শতকে,—বিশশতকে মানুষ অনুপস্থিত। বস্তুত বিশুদ্ধ সাংকেতিকতাশ্রয়ী রীতি প্রমথ বিশীর গল্প-সাহিত্যে সুলভ নয়। কিন্তু অনেক গল্পেই তাঁর বুদ্ধি-প্রখর বাগ্‌ভঙ্গী তীর্যক ভাষণের মাধ্যমে সাংকেতিকতার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। এই সাংকেতিক শৈলীর স্পষ্টতর পরিচয় রয়েছে 'সাগরিকা' গল্পের বহুলাংশে। 'ভাঁড়ু দত্ত' গল্পের পূর্বোদ্ধৃত অংশেও তার মৃদুতর আভাস আছে।

কিন্তু যে-কথা বলছিলাম,—মানবিক বিনাশ সম্পর্কে প্রমথ বিশীর অভাববোধ আন্তরিক, তবু তত ব্যথাহত প্রগাঢ় নয় অন্নদাশঙ্করের রচনার মত। কারণ, আগে বলেছি, কৌতুকরসের এক সহজ আবরণের অন্তরালে নিজের যথার্থ স্বরূপকে আবৃত করে রেখেছেন তিনি;—আর এই লুকোচুরি খেলার উৎসমূল থেকেই তাঁর সকল রকমের পরিহাস-রসের উৎসার। এই অর্থেই বলেছিলাম প্র. না. বি.-র হাতে ব্যঙ্গাহত ভূপাতিত হয়েও স্বস্তির সঙ্গে মনে হয়, যত বড় আঘাতের ভয় ছিল, ততটুকু প্রত্যাশা পূরণ বুঝি হয় নি।

তাহলেও এমন গল্পও প্র. না. বি. লিখেছেন, হাসি এবং যন্ত্রণাবোধ যেখানে

১৮। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' (গল্প)।

প্রাধান্যের দাবিতে পরস্পরের প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। 'গদাধর পণ্ডিত' এমন একটি গল্প। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, বিচিত্রকর্মা প্রমথ বিশীর মুখ্য বৃত্তি শিক্ষকের। স্বল্পকালের জন্য তিনি শিক্ষা-সরস্বতীকে ত্যাগ করে গিয়েছিলেন কেবল যেন পুনরাগমনেরই প্রতীক্ষায়।

ফলে শিক্ষা আর শিক্ষকতার ত্রুটিকে নানাদিক থেকে কটাক্ষ করে বহু গল্প রচনা করেছেন শিল্পী। সবগুলোকে একত্র করলে একখণ্ডে বাংলার 'শিক্ষাদর্শন' গড়ে উঠতে কিছু বাধা নেই। 'গদাধর পণ্ডিত' এই শ্রেণীর রচনা :—

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পল্লীসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত নরেশচন্দ্র পাটের হাকিম হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের অজ পাড়াগাঁয়ে,—নানাবিধ দ্বিধা ছিল প্রথমে মনে, পরে যেসব কারণে মত পরিবর্তন ঘটলো তার মধ্যে রথদর্শন এবং কদলি বিক্রয়ের যুগপৎ সম্ভাবনা অন্যতম।—অর্থাৎ, জীবিকার্জন এবং আচার্যদেবের পদাঙ্ক অনুসরণে পল্লীসেবা! সেখানে গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত গদাধরের সঙ্গে পরিচয় ঘটে যায়,—কারণও অবশ্য ছিল। নরেশচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন সে অঞ্চলের পাঠশালা-পরিদর্শক।

প্রথম পরিচয়ে কৌতূহল বোধ করেছিল নরেশচন্দ্র। গদাধর পণ্ডিত তার জন্যে সহজলভ্য নানারকম সব্জি বয়ে এনেছিল। পণ্ডিত সব্জির বাগান করে। তবে পড়ায় কখন? এ প্রশ্নের উত্তরে নরেশচন্দ্র দেশজ কিণ্ডার-গার্টেনের নমুনা পেয়ে পুলকিত বোধ করেছিল—পণ্ডিত নাকি শশার মাঁচায় ছেলেদের যোগবিয়োগ শিক্ষা দেয়। গাছে কতগুলো শশা আছে, ধাপে ধাপে গুণলে যোগশিক্ষা হয়, আবার কিছু শশা পেড়ে নেবার সময়ে ছেলেরা বিয়োগ শিখতে পারে।

কিন্তু গদাধর পণ্ডিত সম্পর্কে পুলকানুভব দীর্ঘকাল রক্ষা করে চলা কঠিন হয় নরেশচন্দ্রের পক্ষেও। যখন শোনে পণ্ডিতের মাস মাইনা মাত্র চার টাকা, তাও ছমাস অন্তর আসে; এবারে তো এগার মাস বাকী পড়েছে।

একদিন পাঠশালা পরিদর্শন করতে গিয়ে নরেশচন্দ্র প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পাঠশালা ঘরের একপাশে গরুর গোয়াল রয়েছে। পণ্ডিত সবিনয়ে নিবেদন করে, বৎসর কয় পূর্বে স্কুল গৃহ ঝড়ে ধূলিসাৎ হলে সদাশয় কর্তৃপক্ষ আর কোনো ব্যবস্থা করেন নি নতুন গৃহ-নির্মাণের। অতএব গ্রাম্য সাহায্য থেকেই নতুন পাঠশালা নির্মিত হয়েছে।—দানের সর্তানুযায়ী যার এক অংশ অনিবার্যভাবে হয়েছে গোশালা।

এখানেও আবার প্র. না. বি.-র সংকেত-শৈলী লক্ষ্য করবার মত। কিন্তু চরম আঘাত এসেছে এ-গল্পে ধাপে ধাপে; প্রায় নাটকীয় স্তর-বিন্যস্ত হয়ে। গদাধর

পণ্ডিত যতই বিনয় প্রকাশ করুক নরেশের কিন্তু কেবলই মনে হয়, যত নষ্টের গোড়া ঐ মূর্খ পণ্ডিত। তাই বন্ধুর কাছে পণ্ডিতের চাকুরিনাশের ব্যবস্থা করতে সেইদিনই সে পত্রাঘাত করে।

কিন্তু উত্তেজনা শান্ত হয়ে এলে নরেশ আপনা থেকেই বোঝে, যে দেশে জাতি গঠনের দায়িত্ব এমন লোকের ওপর, যার মাস মাইনা চার টাকা এবং তাও এগার মাস পর্যন্ত বাকি থাকে, তার কাছে কি আশা করা যায়! নিতান্ত সদাশয়তা সহকারে একদিন রবিবার দ্বিপ্রহরে পণ্ডিতের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে নরেশ ডাকাডাকি করতে থাকে,—অথচ পণ্ডিত ঘরে থেকেও বেরিয়ে আসছে না দেখে ক্রমশই তার ক্রোধ অসংবরণীয় হয়ে ওঠে।

অসহায় পণ্ডিত বলে, "ডাক শুন্‌ছি হুজুর, কিন্তু বাইরে যাবার উপায় নেই।' অপমানিত বোধ করিয়া নরেশ বলিল—'কেন?'

গদাধর বলিল—'আমরা স্ত্রী-পুরুষে নল-দময়ন্তীর পালা অভিনয় করছি।'

নরেশ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিল—'ঠাট্টা করবার আর লোক পেলেন না?'

'—সর্বনাশ! হুজুরের সঙ্গে কি ঠাট্টা করতে পারি!...হুজুর স্ত্রী-পুরুষে মিলে আমাদের দুখানা বস্ত্র, দুখানাই ধুতি। একখানা আমি পরি, একখানা আমার সহধর্মিণী পরে। পরতে পরতে যখন খুব ময়লা হয়, তখন কেচে নিতে হয়। রবিবারটা ছুটি—আজ একখানি কেচে শুকোতে দিয়েছি। যতক্ষণ না শুকোচ্ছে আমরা স্ত্রী-পুরুষ একখানা ধুতির দুইদিক জড়িয়ে ঘরে বন্ধ হয়ে থাকি। এ সেই নল-দময়ন্তীর কথা আর কি? ভাগ্যিস্ পুরাণে এই গল্পটা ছিল—নইলে কি যে করতাম হুজুর!' এই বলিয়া সে খুব একটা সপ্রতিভের হাসি হাসিল। নরেশ হাসিবে কি কাঁদিবে স্থির করিতে না পারিয়া প্রস্থান করিল।"

আশ্চর্যের কথা, এর পরেও প্র. না. বি.র গল্প পড়ে বাংলা দেশের পাঠক হাসে, যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে না! একি ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কটাক্ষ, বক্রোক্তি, না কষাঘাত! বস্তুত সমগ্র জাতির পৃষ্ঠদেশ উন্মোচিত করে শিল্পী শেষোক্ত শাস্তিই বিধান করেছেন। সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে প্র. না. বি.-র কঠিন জিজ্ঞাসা—"যে দেশের পাঠশালার পণ্ডিত চাকুরি গেলে খুশি হয়—অপরের পাচক বৃত্তিকে শ্রেয় মনে করে, মনে করে এবার তাহার সাংসারিক উন্নতি হইবে—সে দেশের কি আর ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু আছে?"

কিন্তু অনেকটা গুরুগম্ভীর কখনোই হতে পারেন না প্রমথনাথ, তাঁর মধ্যে যে কৌতুকরসিক বুদ্ধিমানটি সদা জাগ্রত হয়ে আছে, অতিশয় সিরিয়াস্‌নেস্-এর নামেও

যেন তার হাসি পায়। অতএব গল্পের মধ্যে এটুকু নরেশচন্দ্রের গুরুগম্ভীর সমাজ-চিন্তন, যার প্রতি তূণীরের চরম বিদ্রূপ-বাণটি তখনো নিক্ষেপ করেননি শিল্পী! কিন্তু সেকথা পরে, প্র. না. বি.-র গল্প পড়ে এর পরেও যে হাসি পায় তার কারণ, যতটুকু যন্ত্রণা তিনি দিয়েছেন, সয়েছেন তার চেয়ে বেশি। শিল্পী নিজে এই সমাজেরই তো সামাজিক একজন,—তাই মনে হয় নিজের ডান হাতের আঘাত বাঁ হাত পেতেই যেন নিয়েছেন। তিনি জানেন,—'এ আমার, এ তোমার পাপ,' পাপের প্রতি তাই তিনি উদ্যত-খড়্গ, কিন্তু পাপীকে যেন আত্মীয়-সমুচিত মৃদুতর আঘাতে পরিমার্জনা করে গেলেন। সেই মার্জনাটুকু প্রমথ বিশীর বাক্‌শৈলীর অন্তরস্থ,—যে বাগ্‌বিধি আবার সৃষ্টি করেছে তাঁর অন্তরের সহজাত কৌতুক-রসিকটিকে।

সেকথা আগে বলেছি। কিন্তু এই রূপ-রীতির প্রসঙ্গেই আর একটি কথা লক্ষ্য করতে হয়। এতাবৎ আলোচিত দ্বিতীয় পর্বের বাংলা হাসির গল্পগুচ্ছে দেখেছি হাসিই মুখ্য অবধানের বিষয় হয়েছে,—গল্প, তথা ছোটগল্পের দৈহিক দাবি অনেকটা পশ্চাৎপটবর্তী হয়ে পড়েছে। অথচ প্রথমপর্বে পরশুরামের লেখায় লক্ষ্য করা গেছে হাসির গল্প প্রায়ই ছোটগল্প হয়ে উঠেছে। এই অতুলনীয় দক্ষতায় প্র.না.বি. পরশুরামেরই সমানধর্মা। তাঁর প্রায় সকল হাসির গল্পই ছোটগল্পের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের দাবিকে অন্তত স্মরণ করে রেখেছে। 'ডাকিনী',—'চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট', এমনকি, হাসির গল্প না হলেও 'সাগরিকা'র কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। আলোচ্য 'গদাধর পণ্ডিত' গল্পেও দেখি, সেইদিন নরেশচন্দ্রের আদর্শবাদের মাথায় এটমবোমা পড়েছিল, সন্ত শিক্ষকতার মোহপাশমুক্ত গদাধর পণ্ডিত যেদিন তার পাচক বৃত্তি কামনা করেছিল। মোহমুদ্গর একালে অচল,—কিন্তু এই 'মোহবোমা' নরেশচন্দ্রের অনেক উপকার করেছিল। শিল্পী জানিয়েছেন,—সেই রাত্রেই নরেশ চাকরিতে ইস্তফা পত্র পাঠিয়ে গ্রাম ত্যাগ করে এসেছিল। "তারপরে আর কখনো সে দেশের উন্নতি করিতে চেষ্টা করে নাই। এখন সে সিভিল সাপ্লাই-এ কাজ করে। বেতন মোটা।"

প্র.না.বি.র তূণীরের শেষ বাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে এতক্ষণে, ফলে গল্পও শেষ হতে পেরেছে। শেষ ছত্রে বিদ্রূপ-কটাক্ষ আবার সাংকেতিকতার মৃদু ব্যঞ্জনাবহ হয়ে উঠেছে; যার ফলে গল্প-কথা শেষ হতেই ভাবনা যেন অশেষের পথ ধরে চলতে থাকে, অন্তত আরো কিছু দূর। এই কথা-কৌশলবশেই প্র.না.বি.র হাসির গল্পের দীঘিতে ছোটগল্পের ব্যঞ্জনা তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। হাসি এবং গল্পে মিলিয়ে পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্পের ভাবরূপ রচনার এই সাফল্যে প্র.না.বি. আমাদের কালে স্মরণীয় স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত।

এঁর গল্প-সংকলন গ্রন্থাবলীর মধ্যে আছে—ডাকিনী (১৯৪৫), অশরীরী, গল্পের মত

(১৯৪৪), গালি ও গল্প (১৯৪৫), প্র. না. বি.-র নিকৃষ্ট গল্প (১৯৫১), প্র. না. বি.-র নিকৃষ্টতর গল্প (১৯৫৩), প্র. না. বি.-র মনোনীত গল্প, প্র. না. বি.-র স্বনির্বাচিত গল্প (১৯৫৬), প্র. না. বি.-র নীরস গল্প সঞ্চয়ন (১৯৫৭), প্র. না. বি.-র গল্প পঞ্চাশৎ (১৯৬০) ইত্যাদি।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিচিত্র স্রষ্টার মন,—আরো বিচিত্র তাঁর সৃজনশালার গহন রহস্য। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের (জন্ম—১৮৯৯) ছোটগল্পের প্রসঙ্গে এই চিরন্তন সত্যের পুনরবধারণ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কথাসাহিত্যের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে যিনি 'নীলাঙ্গুরীয়', 'স্বর্গাদপি গরীয়সী', প্রভৃতি স্বপ্ন-বেদনা-মন্থর রোমান্টিক্ উপন্যাসের অবিস্মরণীয় স্রষ্টা,—ছোটগল্পের জগতে তাঁর প্রায় একমাত্র পরিচয় হয়ে পড়েছে অদ্বিতীয় হাস্যরসিকের রূপে,—'রাণুর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ,' 'রাণুর কথামালা', 'বরযাত্রী' ইত্যাদি গ্রন্থের অপার জনপ্রিয়তায় সে পরিচয়ের প্রতিষ্ঠা। তাহলেও 'আমার লেখা বেশির ভাগ হিউমারাস্ কি সিরিয়াস্' সে প্রশ্নের অবতারণা করেছেন শিল্পী নিজেই।[১৯] ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিশেষভাবে ছোটগল্পগুলির প্রসঙ্গেই সিদ্ধান্ত করেছেন,—'গল্পগুলি প্রধানত হাস্যরসমূলক' হলেও "হাস্যরসিকের লঘু দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তরালে যে কবি-সুলভ সৌন্দর্যবোধও দার্শনিকের সূক্ষ্মদর্শিতা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কাজেই বিভূতিভূষণের স্থান কেবল হাস্যরসিকদের মধ্যে নহে। তাঁহার রচনায় কাব্যধর্মের উৎকর্ষ ও তীক্ষ্ণ চিন্তাশীলতা ছোটগল্পের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে তাঁহার স্থান নির্দেশ করিয়াছে।"[২০]

বিভূতিভূষণের জীবনকথা খুবই স্বল্পজ্ঞাত। তাহলেও তাঁর প্রচুর রচনার সঙ্গে সেই স্বল্পসঞ্চয়কে মিলিয়ে দেখলে সন্দেহ থাকে না যে, প্রায় সকল গল্পই অন্তত তাঁর ব্যক্তি-জীবন-অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলে গঠিত। বস্তুত এমন গল্প বিভূতিভূষণ খুব কম লিখেছেন, যেখানে বর্ণিত ঘটনাবলীর জগতে ব্যক্তিগতভাবে দেহমনে তিনি পরিক্রমা করে আসেন নি। নিজ রচনা-ধারার যে ইতিহাস শিল্পী নিজে বিবৃত করেছেন, তার থেকেই সেই পুরাতন সার্বিক সত্য বিশেষ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আবার স্মরণীয় হয়ে ওঠে যে, শিল্পী বা সাহিত্যিকও আসলে স্বয়ম্ভু নন কিছুতেই! সাধারণ মানুষের মতই নিজ দেশ-কাল-পরিজনের নিত্য-নিয়ত প্রভাবের মধ্যে সকল কিছুর সঙ্গে তিনি নিজেও

১৯। দ্রষ্টব্য—'হরিশঙ্করকে লেখা'—দেশ, সাহিত্য সংখ্যা—১৩৬৫ সাল।
২০। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,' ৩য় সং।

কেবলই হ'য়ে উঠ্ছেন। অনিবার সেই হয়ে-ওঠার আনন্দ-চেতনাই আসলে সৃষ্টির প্রাণ। বিভূতিভূষণের সৃষ্টির ভালমন্দের ইতিহাস এবং বৈশিষ্ট্যের রহস্য আসলে নিজ দেশ-কাল-পরিজনের মধ্যে শিল্পি-ব্যক্তিত্বের এই নিরবচ্ছিন্ন হয়ে ওঠারই ইতিহাস।

প্রথম সৃষ্টির আসন শিল্পী পেতেছিলেন ছোটগল্পের জগতেই। স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাস-এ [প্রবেশিকাপূর্বশ্রেণী] পড়বার সময়ে কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য গল্প লিখে-ছিলেন একটি,—রোমান্স-সুনিবিড় এক প্রণয়-গল্প ; যার নায়কের আসন অধিকার করেছিলেন কিশোর শিল্পী নিজে। গল্প তাই শেষ আর হতে চাইছিল না কিছুতে। ফলে গল্প পাঠানোর শেষ তারিখ পার হয়ে যাবার পরদিন পাঠাতে পেরেছিলেন সে গল্প। হাস্যরসিক বিভূতিভূষণ নিজের ছেলেবেলার সেই ছেলে-মানুষী নিয়ে সকৌতুক বর্ণনা ফেঁদেছিলেন পরিণত বয়সে,[২১]—যাতে তাঁর শিল্প-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ব্যক্তিসত্তা স্পষ্ট ব্যঞ্জিত হতে পেরেছে। সেখানে হাস্যরসিকের ভূমিকায় বিভূতিভূষণ সার্থক হিউমারিস্ট্,—অর্থাৎ, হাসির উপকরণের সঙ্গে অন্তরের নিবিড়তম অনুরক্তিটুকু জড়িয়ে দিতে না পারলে তাঁর হাসির উৎস উৎসারিত যেন হয় না কিছুতেই।

পরিণতমানস শিল্পীর স্নিগ্ধহাস্য-কটাক্ষে অভিষিক্ত সেই প্রথম সিরিয়াস্ গল্পটি লুপ্ত হয়ে গেছে। তারপরেও যে প্রথম প্রকাশিত গল্প হাতে করে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব,—শিল্পীর ভাষায় তাও,—"একটি ছোট মেয়েকে নিয়ে নিতান্ত দুর্বল একটি বিয়োগান্ত গল্প।"[২২] কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্র 'প্রবাসী'র গল্প-প্রতিযোগিতায় 'অবিচার' নামে গল্প লিখে তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৩২২ বাংলা সালের শ্রাবণ সংখ্যায় সে-গল্প প্রকাশিত হয় অমলা নাম্নী এক বিধি-বিড়ম্বিতা বালিকার ব্যথাকরুণ জীবনাবসানের উপাখ্যান নিয়ে।

তার পরেও খুবই ক্ষীণ ধারায় চলেছিল সেই রোমান্স-করুণ গল্প রচনার প্রয়াস 'প্রবাসী' এবং অপরাপর পত্রিকায়। বিভূতিভূষণের উপন্যাস আর পরিণত-বয়সের ছোটগল্প পড়ে আজও মনে হয়,—এই ধারাই হয়ত একদিন পূর্ণাঙ্গ স্রোতস্বিনীর চলোচ্ছল রূপ ধরতে পারত তাঁর সৃষ্টিতে। কেবল জীবনপরিবেশের বিরূপ প্রভাব সে ধারাকে দিলে শুকিয়ে। ফলে শিল্পীর লেখা প্রায় বন্ধ হয়েই গেল। নানা কারণের মধ্যে, তিনি জানিয়েছেন,—"আরও একটু কারণ ছিল.…। অর্থাৎ, সৃষ্টি বা আলোচনার কেন্দ্র থেকে দূরত্ব ; বাংলা থেকে এই সাড়ে

২১। দ্রষ্টব্য :—'গল্প লেখার গল্প'—জ্যোতিপ্রসাদ বসু সম্পাদিত।
২২। 'হরিশঙ্করকে লেখা'।

তিনশ মাইলের ব্যবধান, গঙ্গার মতই একটি মহানদী মাঝখানে।—আমি বাংলার জীবন থেকেই বিচ্ছিন্ন,—লিখ্‌ব কি নিয়ে!"[২৩] এই প্রসঙ্গেই স্মরণ করা যেতে পারে,—একই কারণে কিনা জানা নেই,—সমকালীন বাংলা গল্প-সাহিত্যের আর এক মহারথী 'বনফুল'ও কলকাতা থেকে ভাগলপুরে চলে যাবার পর রচনা-বিরত হয়ে পড়েছিলেন,—পুরো আটটি বছর কিছুই তিনি লেখেন নি। অবশেষে অন্য-মনস্ক লেখনীর জড়তা-মোচন ঘটেছিল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে অভিন্নহৃদয় বন্ধু পরিমল গোস্বামীর সান্নিধ্য এবং উপরোধে।"[২৪]

বিভূতিভূষণের লেখনীর মুক্তি এল তাঁর আভ্যন্তরীণ স্বজন-বাসনা আর স্নিগ্ধ পরিবার-জীবনের মূলভূমি থেকে। লেখক নিজেই জানিয়েছেন,—"আমি যে বেঁচে আছি সাহিত্য জীবনে তার আরো একটা কারণ এই যে, আমাদের পরিবারটি ছিল বেশ বড়। আমরা আটভাই, তখন সন্তানাদির মধ্য দিয়ে গড়ে উঠ্‌ছে পরিবার; ছেলেমেয়েয়, শিশুতে-কিশোরে বড় বলাই ঠিক হবে। এতে করে এই হল যে, যে মন বাংলার খাস বাঙালি-জীবন থেকে বৈচিত্র্য আহরণ করতে পারল না, সে এদিকেই বিচিত্র জগৎ নিয়ে রইল পড়ে।…'স্বর্গাদপি গরীয়সী'-তে এর খানিকটা পরিচয় পাবে।"[২৫]

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এই জগতের প্রথম অবিস্মরণীয় পরিচয় 'রাণুর প্রথম ভাগ' গল্পে। বস্তুতঃ বিভূতিভূষণের গল্পের সৃষ্টিলোকে 'রাণুর প্রথম ভাগ' land-mark, নানা দিক থেকেই। এই গল্পেই সিদ্ধ গাল্পিক হিশেবে অবিসংবাদী প্রতিষ্ঠা যেমন পেলেন, তেমনি রোমান্স-করুণাময় সৃষ্টির ক্ষেত্র থেকে অসংশয়িত পদক্ষেপ করলেন হাসির গল্পের পথে। অতএব, জীবনপরিবেশের প্রভাব, অর্থাৎ একাদিকে বাংলার জীবনভূমি থেকে অবস্থান ও অভিজ্ঞতাগত দূরত্ব, আর এক-দিকে সুবৃহৎ যৌথ পরিবার-জীবন-নিঃসৃত অপরূপ-মধুর গার্হস্থ্য-জীবন-রস,—এই দুয়ের প্রভাবে পড়ে রোমান্স-করুণাকুল সিরিয়াস্ গল্পের শিল্পী বিভূতিভূষণ সৃষ্টির পথে মোড় ঘুরলেন হাস্যরসের অভিমুখে। অন্যপক্ষে, এই হাস্যরসই আবার তাঁর রচনার স্বাদ-প্রকৃতি নির্ণয় করেছে। এর আগে বাংলা হাসির গল্পের প্রথম পর্বের আলোচনা উপলক্ষ্যে হিউমার, উইট্, স্যাটায়ার প্রভৃতি হাস্যরস-স্বভাবের পরিচয় সন্ধান করে দেখা গেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এতাবৎ আলোচিত হাসির গল্পের শিল্পী যাঁদের পরিচয় গ্রহণ করা হয়েছে, মুখ্যত সকলেই তাঁরা satirist; মাঝে মাঝে স্যাটায়ার সৃষ্টির সহায়ক হাতিয়ার হিশেবেই যেন wit-এর আশ্রয়

২৩। তদেব। ২৪। দ্রষ্টব্য—পরিমল গোস্বামী—'স্মৃতিচিত্রণ'।
২৫। দ্র. 'হরিশঙ্করকে লেখা'।

গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হাস্তরসিক বিভূতিভূষণ একান্তভাবেই হিউমারিস্ট্। এখানেই মনে পড়ে, হিউমার-এর উৎস সহৃদয় সহানুভূতির মধ্যে,—উইট্ হৃদয়হীন না হলেও হৃদয়মুখ্য নয়। আর স্তাটায়ার-এর উদ্ভব যে অন্তত কঠিন-হৃদয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে, তাতে সংশয় নেই। শিল্পী হিশেবে বিভূতিভূষণ একান্ত সহৃদয়,—রোমান্টিক্ হৃদয়বৃত্তির অনুসারী। তাঁর হাসির গল্পের উৎসও এই স্নিগ্ধ-চিত্ততায় সঞ্জীবিত।

বস্তুত তাঁর হিউমারাস্ গল্পের জন্ম কেবল সহজ সহৃদয়তার মধ্যে নয়,—গল্প-বিষয়ের সঙ্গে শিল্পিব্যক্তির অচ্ছিন্ন জীবনানুরক্তিতে। এতাবৎ উদ্ধৃত আত্মকথনের তাৎপর্য গ্রহণ করলে স্পষ্টই বুঝি,—গল্পের বিষয় যেখানে প্রত্যক্ষ জীবনের মূলে প্রোথিত নয়, বিভূতিভূষণের কল্পনা সেখানে নিরাশ্রয়, নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।—রোমান্টিক শিল্পী হলেও গল্পকার বিভূতিভূষণ জীবন-বন্ধনহীন খেচর নন। কেবল এই কারণেই বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পরে লেখকজীবনে তিনি প্রায় মূক হয়ে পড়েছিলেন। আবার কথা যখন ফুটল—তখন প্রেরণা এসেছে পরিবার-জীবনের নিত্যদৃষ্ট দিন-চিত্র থেকে—যার সঙ্গে ব্যক্তি-শিল্পীর স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক একান্তই আত্মিক। 'রাণুর প্রথম ভাগ' গল্পের কথাই ধরা যাক। ঐ গল্প-বিষয়ের মধ্যে রাণু ও তার মেজকাকার চরিত্রে শিল্পী তাঁর নিজের কোনো একান্ত স্নেহাস্পদা ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং নিজের ব্যক্তি-স্বভাবকেও প্রক্ষেপিত যে করেছেন তাতে সংশয় নেই। বস্তুত নিজের আত্মকথনেও তিনি অস্বীকার করেন নি যে, নিজ পরিবার-জীবনের বহু সংখ্যক শিশু-চরিত্রই তাঁর হাস্য-কৌতুকের উৎসকে উৎসারিত করে দিয়েছিল।[২৬]

শিশুর জগৎ এক আশ্চর্য স্পর্শকাতরতায় সদাতরঙ্গিত রহস্য-জটিল জগৎ। পরিণত মনস্ক মানুষের চেয়েও নিজের জীবন, ভাবনা, এমন কি, আজগুবি কল্পনাকেও অনেক বেশি সিরিয়াস্‌ভাবে গ্রহণ করে থাকে শিশুমন। ফলে শিশুর মধ্যে কার্যকারণ জ্ঞান এবং ভাব-বিশ্বাস-কল্পনার যে অসংগতি দেখে আমাদের পরিণত মন অন্তত স্মিতহাস্যেও চকিত হয়ে ওঠে,—শিশুর নিজের জগতে, নিজের পক্ষে তা জীবনমরণ সমস্যা। এমন কি সে সমস্যা কখনো কখনো তার পরিণত জীবনেও প্রসারিত হয়ে অনপনেয় জটিলতার সৃষ্টি করে বসে। 'রাণুর প্রথম ভাগ' গল্পেও তাই হয়েছে। বাড়ির সবচেয়ে ছোট্ট মেয়েটি রাণু সবচেয়ে বড় হয়ে গেছে নিজের খেলাঘরে,—বাড়িতে সবাই বড়,—নিজে তাই সে ছোট হতে আর পারে না। একমাত্র ছোট্টভাই খোকা, যার মুখে কথা ফোটে নি এখনো, তার ওপরে খবরদারি করতে পারার সুযোগ পেয়ে সে বর্তে যায়। শিশুর জগৎ আগাগোড়াই মায়াময়—সম্ভব-অসম্ভবের কোনো ভেদরেখা

২৬। দ্রষ্টব্য :—'হরিশঙ্করকে লেখা'।

নেই তাতে,—ফলে খেলাঘরে বিনা-নোটিশে বড় হয়ে-ওঠা রাণু খেলার ঘরের বাইরেও নিজের মধ্যে কখন যে বড় হয়ে উঠেছিল, সে খবর নিজেই সে জানতো না। তার বৃহত্তর জীবনে সেই দিবাস্বপ্নের অভিঘাত দেখা গেল প্রথম ভাগ-বিদ্বেষের আকারে। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা, মেজকা, একেবারে দ্বিতীয় ভাগ পড়লে হয় না?" কারণ 'পেরথোম ভাগটা' পড়ে এবাড়িতে একজনও যে তত ছোট নয়! ফলে নিজের বড়ত্ব প্রমাণ করবার জন্যেই যেন রাণু 'ঐক্য, বাক্য' প্রভৃতি দ্বিতীয় ভাগের বানান পরম্পরা মুখস্থ করে রেখেছে,—অথচ ওদিকে শেখার বেলায় তার সরস্বতীর ঘরের প্রবেশ-পথ বন্ধ হয়ে আছে 'অচল অধম'-এর দোরগোড়ায়।

এর সবটুকুই নিরতিশয় হাসির উপকরণ নয়,—রাণুর পক্ষে তো নয়ই। মেজকাকার তাড়া, প্রথম ভাগের বই ছিঁড়ে অথবা গোপন করে' হারিয়ে যাবার মিথ্যা ওজুহাত দেখিয়ে দিনের পর দিন পালিয়ে বেড়ানোর উৎকণ্ঠা, ক্লেশ এবং অশান্তি শিশুমনের পক্ষে অপরিসীম বোঝার কারণ। অন্যপক্ষে রাণুর বড়পনার অভিনয়ে যে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার উদ্ভব ঘট্‌ছিল, পরিণত-মানস পাঠকের পক্ষেও তা কেবল কৌতুকের হ।তেই পরিহার্য হতে পারে না।

তার চরম প্রমাণ পাই গল্প-শেষের হাস-করুণ পরিণামবোধে,—এ গল্পের ফলশ্রুতি কেবল হাস্যরসাত্মক নয়,—তার মুখে হাসি, চোখে জল। পরিমল গোস্বামী নাকি নিজে না হেসে অপরকে হাসিয়েছেন,—বিভূতি মুখোপাধ্যায় নিজের গল্প-শরীরে নিজে ব্যথিত হয়ে অপরের মুখে ফুটিয়ে তুলেছেন সহৃদয়তা-স্নিগ্ধ সকরুণ স্মিত হাসি। 'রাণুর প্রথম ভাগে' মেজকাকা চরিত্রের পরিণামী ভূমিকায় তার সংশয়হীন প্রমাণ।

এদিক থেকে বিভূতিভূষণের অনেক হাসির গল্পই স্মৃতি-মাধ্যমে ব্যক্তিজীবন-পরিক্রমায় যেন ভাবনামন্থর। এই বৈশিষ্ট্য কেবল আঙ্গিক রচনার এক স্বতন্ত্র কলা-কৌশলই নয়,—বস্তুত নিজের গল্পের জগৎ ও জীবনের সঙ্গে শিল্পীর ব্যক্তিগত ভাব-সংযোগে একান্ত ঘনিষ্ঠ। এখানে বাংলা গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভূতিভূষণ সচরাচরদের থেকে এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ এই পর্যায়ের জীবন-ভাবনা যখন দেশকাল-পাত্রের গণ্ডি অতিক্রম করে প্রায় বিশ্বপরিক্রমার অভিমুখী হয়েছে, তখন বিভূতিভূষণের গল্পগুলি নিতান্তই ঘরোয়া,—আমাদের গার্হস্থ্যজীবনের দৈনন্দিনতার গণ্ডিতে একান্ত সীমিত, অনেকটা যেন উনিশ শতকীয় জীবন-মাধুর্যের সুরভিযুক্ত। শুধু তাই নয়, আরো একদিক থেকে শিল্পীর ছোটগল্প রচনায় এক অভিনব প্রয়াসের অভ্যস্ততা লক্ষিত হয়। একাধিক ক্ষেত্রে এক বিশেষ পাত্রপাত্রী-দলকে নিয়ে যেন কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উপাখ্যানের ক্রমানুসৃত ধারা গড়ে তুলেছেন তিনি। সেসব ক্ষেত্রে

প্রত্যেকটি গল্প যেমন পৃথক্ ভাবে পূর্ণাঙ্গ, তেমনি সবকটিকে একসঙ্গে গ্রহণ করলে বৃহত্তর আর এক সম্পূর্ণ কাহিনীর স্বাদ যেন পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত হিশেবে রাণু পর্যায়ের গল্পমালা, গণশা-ঘোঁৎনাদির বরযাত্রী-দল-প্রসঙ্গ, 'দৈনন্দিন' গল্পমালা এবং শৈলেনের বাল্য-প্রসঙ্গ বিষয়ক গল্প-প্রবাহের উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানেও শিল্পীর ঘরোয়া মনোবৃত্তির পরিচয় পরিস্ফুট,—পূর্বপরিচিত এক সীমিত মধুর পরিবেশে একদল চেনা পাত্রপাত্রীর জীবনের নানা বিচিত্র দিক নিয়ে হাস্য-কৌতুকের ফুলঝুরি খেলেছেন তিনি। তারও মধ্যে দুই গুচ্ছ গল্পে শিল্পীর নিজের আত্মসংযোগ যে নিবিড় ব্যক্তিগত, তার প্রমাণ সুস্পষ্ট। একটি রাণু-গল্পমালা,—আর এক শৈলেন-গল্পগুচ্ছ,—'বর্ষায়', 'গোলাপী রেশম' ইত্যাদি গল্প যার মধ্যে মুখ্য। প্রথম শ্রেণীর গল্প-ধারায় তাঁর শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রী একমাত্র নায়িকা, দ্বিতীয় পর্যায়ে শিল্পীর নিজের শৈশব-ভাবনা নায়কশ্রেষ্ঠ।

আত্মকথন প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ ইঙ্গিত করেছেন,—"চাতরা শ্রীরামপুরে বছর দুয়েকের জীবন আমার কাটে মাত্র এক বৃদ্ধা ঠাকুরমার তত্ত্বাবধানে, বিদ্যার্জনের জন্য বাবা আমাদের দুই ভাই-এর এই আশ্রমবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঠাকুরমা, তায় বৃদ্ধা, বুঝতেই পার কি প্রচুর মুক্তি।"[২৭]—সেই অবাধ-মুক্তিযুগের হৃদয়ানুভবের আলোকে পরিণত কালের জীবন-ভাবনাকে আস্বাদন করেছেন শিল্পী পূর্বোক্ত শৈলেন গল্পগুচ্ছে। সেদিনকার শিশুমনস্তত্ত্বের প্রকৃতি নিজেই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন 'বর্ষায়' গল্পে, শৈলেনের মুখে,—"সাত আট বছর বয়সের একটা মস্ত সুবিধে এই যে, সে সময় বয়স আর অবস্থা সম্বন্ধে কোনো চৈতন্য থাকে না, সুতরাং যাকে মনে ধরে নির্বিবাদে তার মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া যায়।" বস্তুত 'রাণুর প্রথম ভাগে' রাণুও এই একই কৌশলে অনায়াসে প্রবীণা গৃহকর্ত্রীতে রূপান্তরিত হতে পেরেছিল। ঠিক একই কৌশলে মাত্র আটবছরের শৈলেন নিজেকে রূপান্তরিত করে দিল পনের বছরের সত্যোবিবাহিতা নয়নতারার মধ্যে। সেই শৈশব-প্রণয়ানুভবের অসম্ভাব্য উপাখ্যান অসম্পৃক্ত শ্রোতার মনে হাসির কৌতুকই অনিবার্য করে তোলে। অথচ পরিণত বয়সের সীমায় পৌঁছেও শৈলেন সেই পীড়াকর অস্বাভাবিক বাল্য-প্রণয়কে বিস্মৃত হতে পারে না :—সমুত্তীর্ণ-প্রায় যৌবন-দেহলিতে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের কাছে সে বলে, 'আমি জীবনে আর কাউকেই চাই নি, আমার জীবনের চিত্রপটে নয়নতারাকে অবলুপ্ত করে আর কারুর ছবিই ফুটতে পায় নি। পনের বৎসরের অটুট যৌবনশ্রীতে প্রতিষ্ঠিত করে তারই ওপর নিবদ্ধ-দৃষ্টি আমি তাকে অতিক্রম করে আমার পঁয়ত্রিশ বৎসরে এসে পড়েছি—সূর্য যেমন

২৭। দ্রষ্টব্য—'হরিশঙ্করকে লেখা'।

যৌবনশ্যামলা পৃথিবীকে অতিক্রম করে অপরাহ্ণে হেলে পড়ে। আজকের এই বর্ষায় কি তোমরা কথাটা অবিশ্বাস করতে পারবে?'

"তারাপদ বলিল, 'আমরা স্বয়ং তোমার বিশ্বাসের জন্য ভাবিত হয়ে উঠেছি, কেননা বর্ষাটা গেছে থেমে'।"

এমনিই বিভূতিভূষণের হাসির গল্পের প্রকৃতি; স্মিত হাসির গোপন ভাণ্ডারে কোথায় যেন অস্ফুট বেদনার একবিন্দু স্বচ্ছ অশ্রু সহস্র মানিকের মত জ্বলতে থাকে অনুভবের নেপথ্যে। ঐখানে স্বভাব-রোমান্টিক্ করুণরসের শিল্পী বিভূতিভূষণ হারিয়ে যেতে-যেতেও যেন রেখে গেছেন আপন প্রচ্ছন্ন অস্তিত্বের ছাপ। কখনো কখনো এই সব গল্পের নায়ক-চরিত্র—অনেক সময়েই তার নাম শৈলেন—কবি-ভাবুকের ভূমিকায় উপস্থাপিত হয়েছে; উদ্ধৃত 'বর্ষায়' গল্পাংশে বন্ধুদের কটাক্ষ-কৌতুক অনুসারেও সে ভাব এবং ভাবুকতা প্রায়শঃই 'অবাস্তব-মনোহর'!—একদা রোমান্স-ধর্মকে ঐ নামেই বাংলা ভাষায় চিহ্নিত করার প্রয়াস চলেছিল। অবাস্তবের মধ্যে মনোহারিতা রয়েছে দুদিক থেকে। অপরিণত মানসিকতার গহনে অস্বাভাবিক উদ্ভটের আকার যখন সে ধারণ করে, তখন তা হাস্যরসের উপাদান। অন্যপক্ষে মানবজীবনের মেদুর স্বপ্নাবিষ্ট রহস্য-জালের সঙ্গে জড়িয়ে দেখলে ঐ একই বিষয় বিষণ্ণ-মধুর রোমান্টিকতায় ভরে ওঠে। রাণুর গল্পমালা অথবা শৈলেন গল্প-গুচ্ছে,—এই উভয়বিধ আবেদনের মিশ্রতা সঞ্চারিত হয়েছে। তারই ফলে গল্পগুলিতেও স্বাদের এমন বিচিত্রতা।

এই বৈচিত্র্যগুণের উৎস রয়েছে শিল্পীর ব্যক্তিত্বে; ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যার মধ্যে ত্রিবিধ উপকরণের সংকেত দিয়েছেন। হয়ত সেই অনুসারেই অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যও বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগুণের তিনটি প্রকোষ্ঠ নির্দেশ করেছেন,—এক কবি-ধর্মী, দুই দার্শনিক, এবং তিন হাস্যরসিক।[২৮] এই ত্রিবিধ উপকরণের সমন্বয়ে শিল্পীর আত্মপ্রকৃতি যেখানে নির্বন্ধন মুক্তি পেয়েছে, সৃষ্টির সম্পূর্ণতাও সেইখানে। 'রাণুর প্রথম ভাগ' অথবা 'বর্ষায়' গল্পের স্রষ্টা কবিকে দেখি তাঁর স্মৃতি-ভাবনা-মন্থর ব্যক্তি-জীবন-সঞ্চারণের গহনে। যে স্পর্শকাতর অনুভবের বৃন্তে আট বছরের বালিকা ভ্রাতুষ্পুত্রী আর তার পরিণত বয়স্ক এম-এ. বি-এল্. 'মেজকা'র মধ্যে খেলাঘরের বাৎসল্য-অভিনয় ক্রমশঃ অস্ফুট নিরুচ্চার বেদনাবোধের তট-সীমায় এসে উপনীত হয়, তাকে রোমান্টিক্ কবি-ভাবনা ছাড়া আর কি বলব! 'বর্ষায়' গল্পে রোমান্টিক্ বিষণ্ণতাবোধের সৌন্দর্য আরো স্পষ্ট,—আরো একান্ত। অধ্যাপক

২৮। দ্রষ্টব্য—'বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প' (ভূমিকা)।

জগদীশ ভট্টাচার্য এই গল্পে জীবন-মন্থনের এক ট্রাজিক পরিণতিই লক্ষ্য করেছেন।[২৯] বর্ষাদিনের ঘন-সন্নিবিষ্ট প্রাকৃতিকতায় শৈলেনের অতীত-স্মৃতিচারণের পরিবেশ-প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর 'চারইয়ারী কথা'র 'সেনের গল্পে'র খুব দুরান্বিত স্মৃতি যেন ভেসে আসে।—কিন্তু সাদৃশ্যের চেয়ে পার্থক্যই তবু সমধিক,—সবিশেষ। চৌধুরীমশায়ের বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক-হাসির বদলে শিল্পীর মুখ যেন এখানে এক বিষণ্ণ মৌনতায় স্তব্ধ। এই অর্থেই বলছিলাম, বিভূতিভূষণের হাসির গল্পে শিল্পীর ভাবনা বেদনা-বিজড়িত হয়েও অপরকে হাসিয়েছে। তাই শিল্পি-কথার সংকেত অনুসরণ করেই বলতে হয় তাঁর এই শ্রেণীর গল্পগুলি serio-humorours।

রোমান্টিক্ অতীতপ্রীতি, বিলীয়মান অতৃপ্ত প্রণয়ের বিষণ্ণ-মধুর স্মৃতিমন্থন, আর সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশের সহযোগিতা মিলে কবিধর্মের এক অনতিস্ফুট নিশ্চিত স্বাক্ষর ধ্বনিত হতে পেরেছে দ্বিতীয়োক্ত গল্পে। অন্যপক্ষে 'রাণুর প্রথম ভাগ' আর 'বর্ষায়',—এই দুটি গল্প-সূত্র ধরেই জীবন-দার্শনিক বিভূতিভূষণকে সার্থকভাবে আবিষ্কার করা যায়; সে তাঁর ঐ শিশুমনোলোক-চিত্রণের দক্ষতায়। আগেই বলেছি, শিশুর জগতের অসংগতি ও অপরিণতি পরিণত-মনস্কদের কৌতুকহাস্যের উপকরণ। কিন্তু দূর থেকে অনাবিষ্ট মন নিয়ে যাকে নিয়ে হাসি,—অনেক সময়েই শিশুর পরিণত জীবনেও তা আর কেবল হাসির উপকরণ হয়ে থাকে না।—ঐ সূত্র ধরেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা বিচিত্রতর সুখ-দুঃখের পসরা নিয়ে জীবনের মূলে বাসা বেঁধে বসে। এটুকুও মনস্তাত্বিক সত্য,—সত্য বিভূতিভূষণের রাণু-গল্পমালারও ক্রমবিকাশে। অনেকটা এই কারণেই ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কেও অনুযোগ করতে হয়,—রাণুর পরিণত বয়সের গল্পগুলিতে কৌতুক হাসির সেই উজ্জ্বলতা যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। আর আগে দেখেছি, 'বর্ষায়' গল্পের সর্বাঙ্গ ঘিরে শৈশবজীবনের কৌতুক-কাহিনীর এক বেদনা-সুনিবিড় অনুভব পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। নিছক ব্যথা-বেদনা কখনো দার্শনিকতার উপকরণ হতে পারে না। কিন্তু সেই বেদনার মূলভূমিতে যে দুর্লক্ষ্য মানসিকতার রহস্য নিহিত রয়েছে,—তা যে-কোনো দার্শনিকেরই লক্ষ-যোগ্য—অপরে সেখানে অন্ধ। তাই বিভূতিভূষণের গল্প পড়ে পাঠক হাসে,—শৈলেনের উপাখ্যান কৌতুকে অবিশ্বাসী করে তোলে তার বন্ধুদের,—তবু রাণুর 'মেজকা' অথবা 'বর্ষায়' গল্পের শৈলেন কোন্ এক অননুভবনীয়কে উপলব্ধি করতে পারার দার্শনিকতায় নিমগ্ন হয়ে থাকে।

২৯। তদেব।

বিমিশ্র স্বাদুতায় বিচিত্র এই ধরনের গল্পগুচ্ছেই হাস্যরসিক বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-পরিচয়। তাছাড়া আরো এক ধরনের গল্প রয়েছে, যাতে হাসির উপকরণ আরো অমিশ্র,—হাস্যধ্বনি আরো একটু সমুচ্চারিত। 'বরযাত্রী', 'গণশার বিয়ে' প্রভৃতি গল্পগুচ্ছ এই পর্যায়ে পড়ে। প্রথম পর্বের হাসির গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি, —উদ্ভট কল্পনা হাস্যরসের এক সার্থক উপকরণ। স্বাভাবিক পরিবেশে জীবনকে যে সহজ মূর্তিতে প্রত্যক্ষ করার অবচেতন প্রত্যাশা আমাদের সকলের মনেই সুপ্ত রয়েছে, তার ভারসাম্যকে চকিত বিচঞ্চল করে তোলার মত অস্বাভাবিক অসংগত, উদ্ভট যদি কিছু ঘটে, তখনই হাসির আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মন।—পরিবেশ এবং ব্যক্তিত্বের পার্থক্য অনুসারে কখনো সে হাসি কৌতুকের, কখনো বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের। আগেই বলেছি, বিভূতিভূষণের রচনায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা satire প্রায় অনুপস্থিত। কারণ সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন এমন একান্তভাবে যে, তাঁর গল্পের হাসির উপলক্ষগুলি কেবল তাঁর সহানুভূতিরই আকর নয়, একান্ত অন্তরঙ্গ অনুরাগ-ভাজন। অর্থাৎ, এমন কথা বলা চলে না যে, সকল গল্পেই পাত্রপাত্রীর মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত স্নেহভাজন আত্মীয়কে কিংবা নিজেকে অনুস্যূত করে রেখেছেন শিল্পী,—বস্তুত প্রায় কোনো গল্পেই হয়ত তা নেই। রাণু গল্পগুচ্ছের মত দুয়েক ক্ষেত্রে নিজ ব্যক্তিজীবন-অভিজ্ঞতা কিংবা ব্যক্তিক স্বপ্নকল্পনার অবাস্তব-মনোহারিতার ছাপ পড়েছে, তাও শৈল্পিক পরোক্ষতায় পরিমণ্ডিত হয়ে। অন্য অনেক গল্পের সঙ্গে সেই ক্ষীণ ব্যক্তিক সংযোগটুকুও হয়ত নেই। তবু নিজের পরিকল্পিত পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে শিল্পী তাঁর ব্যক্তিমনকে এমন একান্তভাবে গ্রথিত করে ফেলেছেন যে, বিভূতিভূষণকে ছাড়া—তথা তাঁর ভাবুকতামন্থর, জীবনপ্রিয়, রোমান্টিক প্রাধান্যের স্পর্শ অনুভব না করে কোনো গল্পই যেন পুরো আস্বাদন করা যায় না। মনে হয়, যেন প্রত্যেকটি হাসির গল্পের শিরোভূমিতে বসে রয়েছেন স্নেহসিক্ত একটি বয়োজ্যেষ্ঠ,—যিনি হয়ত 'মেজকা', নয় 'মামা', না হয়তো বা জ্যেঠা,—বাবা বা ঠাকুর্দা নন কিছুতেই। একের শাসনদৃষ্টি, অপরের লঘু কৌতুক কোনোটিই উপস্থিত নেই বিভূতিভূষণের গল্পগুচ্ছে। 'দৈনন্দিন' গ্রন্থের গল্পমালায়, এবং এখানে-ওখানে ছড়ানো আরো বহু গল্পে শিল্পীর এই ব্যক্তিক অস্তিত্বের পরিচয় প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত।

গণশা-ঘোৎনা-ত্রিলোচন দলের গল্পে শিল্পি-সত্তার সেই ব্যক্তিক উপস্থিতি অনিবার্য-রূপে অনুভূত হয় না,—এবং তাদের সমুদ্ধত যৌবনের বেহিশাবি দুরন্তপনার নানা উদ্ভট অভিব্যক্তিই সেখানে হাস্যরসের উপকরণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে হাসি কখনো পরিহাস-বিদ্রূপের জগতে মাত্রাছাড়া অনধিকার প্রবেশ করতে পারে নি। মনে হয়,

শিল্পীর স্নিগ্ধ-বৎসল মনের অতন্দ্র প্রহরা রয়েছে সেখানে। স্যাটায়ার সৃষ্টির চেষ্টা যে বিভূতিভূষণ একেবারেই করেন নি, তা নয়। কিন্তু সেখানেও বারে বারেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অস্ত্রকে যথেষ্ট শাণিত করে তুলতে পারেন নি তিনি।

এই প্রসঙ্গেই আর একবার স্মরণ করতে হয়, আমাদের বিশ্বভাবনা-ভারাক্রান্ত বিশ শতকের ক্লান্ত পথে বিভূতিভূষণ হলেন হারিয়ে-যাওয়া পুরাতন কালের পরিবার-রসস্নিগ্ধতার শিল্পী। তাঁর সকল গল্পের মধ্যে যেমন ব্যক্তিক স্পর্শের অনুভব রয়েছে, তেমনি মনে হয় প্রতিটি গল্পের নায়ক-নায়িকা স্রষ্টার অভিভাবকসুলভ স্নিগ্ধ অবধানের তলায় এক ঘরোয়া মধুর পরিবেশে পরিক্রমা করে ফিরছে,—যেখানে বিশ্বসমুদ্রের কল্লোল,—বিশ্ব-হাটের কোলাহল স্নিগ্ধ রোমাণ্টিক্ স্বপ্নভাবনাকে বারে বারে ছিন্নভিন্ন করে দেয় না। সেই রোমাণ্টিকতার মধ্যেও আছে বিশ শতকের মধ্যভূমিতে বসে উনিশ শতকের স্নিগ্ধ প্রচ্ছায়তলে বেড়িয়ে আসতে পারার এক তৃপ্তিসুরভিত অনুভব। রীতিমত সিরিয়াস্ গল্পও স্বল্পসংখ্যক লিখেছেন পরিণতমনা বিভূতিভূষণ। 'হৈমন্তী' নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একটি। প্রৌঢ়ীর সূচনাসীমান্তে পৌঁছে,—যৌবনগোধূলি-লগ্নের কর্মোন্মাদ চিরকুমার এঞ্জিনিয়ার একটি প্রত্যাখ্যাতা স্টেনো-টাইপিস্ট্-এর মধ্যে যৌবন-উষা-স্বপ্নকে প্রত্যক্ষ করেছেন। মনে হয়, 'বর্ষায়' গল্পের বিমিশ্রস্বাদী অস্বাভাবিক অতীত-প্রণয়-ভাবনাকে স্বাভাবিকতার দিগন্তে রোমান্স-বিষণ্ণতায় সিক্ত করে আর একবার যেন আকণ্ঠ পান করা গেল। গল্পটি ব্যথা-বেদনাপরিণামী। অবশ্য সে বেদনা নিঃসন্দেহে 'অবাস্তব মনোহর'; দুহাত দিয়ে যাকে ধরা যায় না, অথচ অসম্পূর্ণ সুখস্বপ্নের মত মনের গহনে জড়িয়ে থাকে। মনে হয়, আমাদের কালের দ্বিধাদীর্ণ জীবনের কাদামাটি নিয়ে বঙ্কিমের যুগের মূর্তি গড়েছেন যেন শিল্পী—তেমন মূর্তি, 'রাধারাণী', 'ইন্দিরা' বা 'যুগলাঙ্গুরীয়' বিয়োগান্ত হলে যা হতে পারত, তারই স্বাদে ভরা। আঙ্গিকের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু বঙ্কিমের গল্পগুলির মতই ছোটগাল্পিক পরিধি-চেতনা স্বতঃস্ফূর্ত নয়, যদিও কেবল ঘরোয়া বক্তব্যের সংক্ষিপ্তি-বশেই ছোটগল্পের মত সংহত হতে পেরেছে অনেক গল্পই। ফলকথা, বিশ শতকের মরুভূমিতে উনিশ শতকের স্বাদ-সুরভিত প্রতিশ্রুতিপূর্ণ এক 'ওয়েসিস',—এই তাৎপর্যেই বিভূতিভূষণের ছোটগল্প-শিল্পের অতুলনীয় ফলশ্রুতি।

এঁর গল্প-সংকলনগুলির মধ্যে রয়েছে,—রাণুর প্রথম ভাগ (১৩৪৪), রাণুর দ্বিতীয় ভাগ (১৩৪৫), রাণুর তৃতীয় ভাগ (১৩৪৭), বর্ষায় (১৩৪৭), রাণুর কথামালা (১৩৪৮), বসন্তে (১৩৪৮), শারদীয়া (১৩৪৮), বরযাত্রী (১৩৪৯), চৈতালী (১৩৫০), অতঃ কিম্ (১৩৫০), হৈমন্তী (১৩৫১), কায়কল্প (১৩৫১), দৈনন্দিন (১৩৫২), আগামী প্রভাত, কণ

অন্তঃপুরিকা (১৩৫৩), হাতেখড়ি (১৩৫৪), কলিকাতা নোয়াখালি বিহার (১৩৫৪), অষ্টক (১৩৫৪), কথাচিত্র (১৩৫৫), বাসর, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ-গল্প (নির্বাচিত সংকলন, ১৩৫৫), লঘুপাক (১৩৫৫), রূপান্তর (১৩৫৭), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সরস গল্প (নির্বাচিত সংকলন), বাস্তব ও অবাস্তব (১৩৬১), চিঠি (১৩৬১), হাসি ও অশ্রু (১৩৬২), নাটক নয় নভেল নয় (১৩৬২), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত গল্প (১৩৬২), তালভোল (১৩৬৩), মানদ মিছিল (১৩৬৩), গল্প পঞ্চাশৎ (নির্বাচিত সংকলন ১৩৬৪), আনন্দ পট (১৩৬৪), কবি ও অকবি (১৩৬৬), লাজবতী (১৮৮২ শকাব্দ), পরিচয় (১৩৬৮), কন্যা সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী (১৯৬২)।

শিবরাম চক্রবর্তী

আমাদের কালের পরিচিত এলাকায় শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৫) হাসির গল্পের শিল্পী হিশেবেই বহুজন-সমাদৃত। অথচ প্রায় একই নিঃশ্বাসে প্রেমেন-অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব-সমৃদ্ধ 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে তাঁর আসন নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু লক্ষ্য করলেই অনুভব করা চলে, শিবরামের হাসির গল্পের গোষ্ঠী বা শ্রেণীগত কোনো জাত নেই। হয়তো এরা ব্রাত্য, নয় সর্বজাতিক; কিন্তু স্বাদে, প্রকরণে, অথবা বিষয়ানুবর্তনে কোনো দিক থেকেই কল্লোলীয় নয়।

এই আপাত-রহস্যের একমাত্র কারণ শিবরাম যখন 'কল্লোল'-'কালিকলমে'র ভাবসহচর, তখনো হাসির রসের সন্ধান করে উঠ্‌তে পারেন নি। আবার হাসির গল্প যখন থেকে লিখ্‌তে শুরু করেছেন, তখন 'কল্লোলে'র জোড় গেছে ভেঙে। আরো একটা কারণ আছে,—প্রথমত শিশুদের মুখ চেয়েই সৃষ্টির জগতে হাসির উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন শিবরাম। সদ্য-বিকচ শিশুচিত্তের পক্ষে 'কল্লোল'-চিন্তা অর্থহীন। প্রেমেন্দ্রনাথ-অচিন্ত্যকুমারের শিশু-গল্পেও 'কল্লোল'-ভাবনার প্রসঙ্গমাত্রও অবান্তর। শিশু-ভাবনার মুক্তি জাতিগোত্রের বন্ধনহীন অবাধ কল্পনার অনন্ত আকাশে। সেই আকাশে ওড়ার ডানা মেলেছিলেন গল্প-শিল্পী শিবরাম হাসির জগতে প্রথম। তাই তাঁর হাসির গল্প একেবারে জন্মসূত্রেই জাতিগোত্রহীন।

নিজের সাহিত্য-জীবনের এই বিবর্তন প্রসঙ্গের পরিচয় দিয়ে শিল্পী নিজে লিখেছেন —"বয়সে যখন ছোট ছিলাম, তখন আমি বড়দের জন্যে লিখেছি—ঠিক্ এখনকার উল্‌টো। লিখতামও যত লম্বালম্বা কবিতা, এক-একটা একগজ দেড়গজে—আর মারাত্মক সব প্রবন্ধ। কিংবা বিয়োগান্ত নাটক—সে সবেও গজগজানি বড় কম ছিল না। কিন্তু হাসির ছিটেফোঁটা ছিল না কোথাও।"[৩০]

৩০। শিবরাম চক্রবর্তী 'আমার কথা':—'শিবরামের সেরা গল্প'।

সে-যুগের কবিতাগুলির কিছু কিছু দুখানি সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল : 'মানুষ' (১৯২৯) ও 'চুম্বন' (১৯২৯) নামে। কিন্তু গল্পও 'কল্লোলে'র কালেই লিখতে শুরু করেছিলেন শিবরাম। 'কল্লোলে'র পৃষ্ঠায় তাঁর প্রথম গল্প 'আর এক ফাল্গুনে' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩১ বাংলা সালে। কিন্তু তাতে, কিংবা ঐ সময়কার আর কোনো গল্পেও 'হাসির ছিটেফোঁটা ছিল না কোথাও'। বরং শিল্পীর পক্ষ থেকে রবীন্দ্রোত্তরণের কল্লোলীয় প্রয়াস মাঝে মাঝে স্পষ্ট লক্ষযোগ্য হয়ে উঠেছে 'মানুষের প্রারম্ভ', 'বিধাতার চেয়ে বড়', 'আমি যে তোমারে ভালবাসি' ইত্যাদি বহু কবিতায়।

হাসির গল্পের জগতে প্রথম আবির্ভাব উপলক্ষে সুধীরচন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'মৌচাক'-এর আহ্বান-প্রসঙ্গ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন শিল্পী।[৩১] তারপর থেকে শিশুমনে আনন্দ পরিবেশনের প্রয়াসেই নিরবধি চলেছে তাঁর হাসির-গল্প রচনার ধারা। পরবর্তী কালে বড়দের সাহিত্যেও হাসি-পরিবেশনের আহ্বান এসেছে এবং শিল্পী তা গ্রহণও করেছেন। তবু শিবরাম নিজে বলেছেন,—"আমাকে বড়দের জাতে তোলার যতই চেষ্টা হোক্ না কেন, ছোটদের পাতেই আমি থাক্‌তে চাই।"[৩২]

শিল্পীর এই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা তাঁর বড়দের হাসির গল্পের ভাবরূপেও একান্ত প্রতিফলিত হয়েছে। ছোটদের জন্যই হাসির গল্পে হাত লাগিয়েছিলেন শিবরাম,—দীর্ঘদিন ছোটদের জন্যে লিখে অভ্যস্ত হয়ে যাবার পরে, তবেই বড়দের হাসির গল্প লেখায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তিনি নূতন করে। আর তখনো 'ছোটদের পাতে' থাক্‌বার ইচ্ছেটাই তাঁর সৃজনী-চেতনায় হয়ে আছে আন্তরিক। ফলে, শিবরামের লেখা বড়দের গল্পেও শিশুগল্পের শৈলী—বিষয়-সারল্য এবং ভারহীন হাল্কা খুশির আমেজই প্রধানত আস্বাদিত হয়ে থাকে।

কথার কারসাজি,—কথা বানানো (word making) শিশুমনের একটি লোভনীয় খেলা। কথার জগতে আবার শিশুমনকে বিশেষভাবে নাড়া দিতে পারে ধ্বনিপৌনঃপুন্য। শিশু-রবীন্দ্রনাথের-চেতনায় 'জল পড়ে, পাতা নড়ে', আদি-কবির প্রথম সংগীতের মত ঝংকৃত হয়ে উঠেছিল। শিবরামের গল্পেও কথার খেলা,—ধ্বনি পৌনঃপুন্যের শ্রুতি-চমৎকারী সরস বিন্যাসই রসোত্তরণের প্রধান উপকরণ, ঠোঁটের ফাঁকে স্মিতহাসির আবরণ উন্মোচনই যার প্রধান লক্ষ্য। তাহলেও, প্রকাশ-চতুরতা-প্রধান শিবরামের হাস্যরস কেবল বাক্-সর্বস্ব নয়,—কথার অভ্যন্তরে একান্ত সরল এবং যুগপৎ উপভোগ্য কৌতুকার্থের অনেকটা উদ্ভট বঙ্কিম বিন্যাসও একই সঙ্গে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। শিবরামের একটি গল্প-সংকলনের নাম 'বড়দের হাসিখুশি',—ঐ গ্রন্থ-

৩১। তদেব। ৩২। তদেব।

নামেই বড়দের সহাস-গল্প রচনায় তাঁর প্রতিভা-বৈশিষ্ট্য স্বতোভাস্বর বলে মনে করি। ছোটদের মত বড়দের জন্যেও হাসি আর খুশিই পরিবেশন করেছেন তিনি, কৌতুকমুখ্যতা যার মূল ভিত্তি।

ঐ সংকলন-গ্রন্থেই প্রথম গল্পের নাম,—"অই অজগর আসছে তেড়ে।" গল্পগুলিতে শিবরামের শৈলীর পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য-ধারাও স্বতঃস্ফূট !—

মায়ার কাছে মনের কথা পাড়তে গিয়ে, শিল্পী বলেন,—"কিছুতেই তাল পাই না। তবু যাহোক্, শেষ পর্যন্ত নৈনিতাল পেলাম।"—অর্থাৎ মায়া তাঁকে নৈনিতাল বেড়াতে যাবার কথা বলেছিল।

ঐ একই গল্পে মায়ার প্রসঙ্গে আবার বলেছেন,—"সুলভ নারী নাই বা হলো, কিন্তু নারীসুলভ যা কিছু, তার কিছু কি থাক্‌তে নেই ?"

এর পরে মাত্র দুটি বাক্যের এক অনুচ্ছেদ পেরিয়ে শিল্পী আবার লিখ্‌ছেন—"মেয়েদের কথার ঠিক্—বলতে গেলে প্রায় ঠিক্ ছেলেদের মতই। বালি যাব বলে বেরুলে ছেলেরা বালিগঞ্জে যায়, আর মেয়েরা বেলুড় যাব বললে বোধহয় উড়তেই বেরোয়। বেলুনেই চাপে হয়ত।"

শিবরামের গল্প-রসের যাঁরা রসিক,—অতটুকুতেই ঠোঁটের ফাঁকে স্মিতহাসি তাদের অনাবৃত হতে পেরেছে। এ হাসির কোনো জাত নেই—ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, wit, কোনো আভিজাত্য দিয়েই একে বাঁধা কঠিন। তবু জাতি-নির্দেশ করতে হলে humour বা কৌতুকহাস্যের কথা বলতে হয়। তাও জাতি-গোত্র-ভারহীন শিশু-মুখের অকারণ কৌতুকের হাসি,—বিন্যাস, বাক্‌শৈলী এবং বক্তব্যে শিশুজগতের মতই অকারণ-অবারণ গতির সরল উচ্ছলতাই যার একমাত্র প্রাণশক্তি। নিরুদ্দেশ হাল্কা হাসি ছাড়া আর কোনো গুরুগম্ভীর তত্ত্ব, তথ্য, জীবনদর্শন অথবা সুচিন্তিত আঙ্গিক-পারিপাট্য শিবরামের গল্পে খুঁজতে গেলে ব্যর্থ হতেই হবে। এই সত্যেরই ফলশ্রুতি ঘোষিত হয়েছে একালের আর এক শ্রেষ্ঠ হাসির গল্পকারের কণ্ঠে—"শিবরাম বড় ভাষা শিল্পী। প্রমথ চৌধুরীর মুখে এর প্রশংসা শুনেছি। সহৃদয় কৌতুকরসে মনটি সব সময় ভরা।...... কৌতুক কৌতুকরূপেই বড় একটা সার্থকতা বহন করে, গোলাপফুল গোলাপফুলরূপে। গোলাপফুলের পেটে যাঁরা কাঁটালের কোয়ার সন্ধান করে, তারা নিজেরাই নিজেদের শাস্তি দেয়।"[৩৩]

শিবরামের এই গল্পজগৎ থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত হওয়া হাস্যরস-সন্ধানীর পক্ষে সামান্য শাস্তি নয়।

৩৩। পরিমল গোস্বামী—'স্মৃতিচিত্রণ'।

ষোড়শ অধ্যায়

দ্বিতীয় পর্বের বাংলা গল্প (৪)

কল্লোল-কালের তটরেখা,—তট!

'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' কল্লোল-পর্বের আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্দেশ করেছেন,—"কল্লোলে কোলাহলে জাগে এক ধ্বনি।"[১] এ পর্যন্ত দীর্ঘ আলোচনার মধ্য দিয়ে 'কল্লোল'-যুগধর্মে কোলাহল মুখরতার প্রায় আনুপূর্বিক পরিচয় গ্রহণ করা গেছে। তার একদিকে ছিল দিশাহারা অমিত যৌবনের নিয়ম-নাশী অদম্য উচ্ছ্বাস,—বিদেশের নব আবিষ্কৃত সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রতি চমকিত বিমুগ্ধতার দরুন, আর অংশত নূতন বলেই সে নূতনের আবেগাকুল বেহিশাবি অনুসরণ-প্রয়াস। সেই একই সঙ্গে আরো ছিল দেশীয় জীবনভূমিতে নূতন দিগন্ত উন্মোচনের কল্পনাতীত বিস্ময়,—অর্থ ও রাজনৈতিক বিপর্যয়-বিক্ষোভের পথ ধরে অশিক্ষিত শ্রমিক-কৃষক আর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে হৃদয়-সংযোগের এক অপরূপ অনুভব! সেই নূতন নৈরাশ্য আর নবীন প্রাপ্তির গভীরে অবদমন ও উল্লাসের আতিশয্য প্রায় অনিবার্য দুরন্ত হয়ে উঠেছিল। আর এক বিপরীত কোটিতে দেখা দিয়েছিল তারই বিরুদ্ধে অপরিমাণ ক্ষোভ, বিদ্রূপ আর প্রতিরোধের জেহাদ। কিন্তু কোলাহল-মুখরিত এই ক্রান্তিকালের প্রবাহেও এক নূতন 'ধ্বনি'—এক নবতর জীবন-বাসনার আক্ষেপ সকল পক্ষেই আত্মার অন্তর্লীন হয়েছিল। সেই যুগ-বাসনা, ও যুগবেদনার সাধর্ম্যেই প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবের সঙ্গে সজনীকান্তের সৃজনীচেতনা. কালের হাতে সমসূত্রে অন্বিত হয়েছিল, দেখেছি।[২] বস্তুত নূতন জীবনের পথে প্রথম পদ-পাতের সেই ক্ষীণ ধ্বনি-স্পন্দনটুকুই ইতিহাসের মধুভাণ্ডে 'কল্লোলযুগে'র অবিনশ্বর দান। অভাবিতপূর্ব বিপর্যয় আর অকল্পিত জীবন-অভিজ্ঞতায় জীর্ণ বাস্তব প্রেক্ষাপটকে স্বীকার করেও এক নূতন বিশ্বাসের তটরেখার সন্ধানে সেদিন ব্যাকুল হয়ে ফিরছিল কল্লোল-যুগের প্রমত্ত জীবন-স্রোত,—দক্ষিণে বামে,—সকল পথেই। স্রোত-প্রবাহের মধ্যে আমূল চেতনাকে ভাসিয়ে দিয়েও উন্মথিত স্রোতের বুকে কখনো দ্বীপের সন্ধান, আবার কখনো তটের দিগন্ত উদ্ভাসিত হতে দেখেছি বার বার,—বিচিত্র আকার,

১। দ্রষ্টব্য—ডঃ সুকুমার সেন—'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'—৪র্থ খণ্ড—দশম পরিচ্ছেদ। ২। দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থের—পঞ্চদশ অধ্যায়।

প্রকার ও পরিমাণে। প্রেমেন্দ্র, শৈলজানন্দ, তারাশঙ্কর ও সরোজ রায়চৌধুরীর মত শিল্পীদের ভাবকল্পনায় তার পরিচয়। অন্যপক্ষে দ্বীপের মৃন্ময় আশ্রয় ভূমি যেখানে স্রোতের ঊর্ধ্বে স্পষ্ট-রেখায়িত হয়ে উঠলো না—তখনো নতুন আশ্বাসের পলিমাটি সঞ্চিত হতে দেখেছি দুরন্ত আকাঙ্ক্ষার প্রখর আকর্ষণে,—অচিন্ত্য-প্রবোধের সৃজন-প্রকৃতিতে তারই বিচিত্র প্রকাশ প্রায় দুই বিপরীত কোটি থেকে। ফলকথা, 'কল্লোল'-যুগের পূর্বালোচিত ধারায় স্রোতের অন্তরালে নীড়ের প্রতিশ্রুতি আত্মগোপন করেছিল। এ-যেন স্রোতের মাঝে ভাসতে ভাসতে তটের জীবনকে প্রত্যক্ষ করা আর আবিষ্কার করার এক আনন্দচমকিত সৃজন-প্রয়াস।

কিন্তু বাংলা ছোটগল্পের এই দ্বিতীয় পর্বে আরো এক নতুন প্রাপ্তির আশ্বাস রয়েছে। স্রোতের উচ্ছ্বাস আর কোলাহল পেরিয়ে, সুস্থির অনাপেক্ষিক দৃক্-কোণের এক নূতন দিগন্ত থেকেও 'কল্লোল'-তটরেখার স্পষ্ট পরিচয় আবিষ্কৃত হতে পারে এ-পর্যন্ত অনালোচিত কোনো কোনো শিল্পীর সৃজনভাণ্ডারে। অলঙ্কারের অস্পষ্টতা পরিহার করে বলা চলে, 'কল্লোলে'র যুগ এক ক্রান্তির কাল।—পুরাতন প্রত্যয় এবং পরিচিত জীবনের বনিয়াদ তার একদিকে কেবলই ভেঙে পঙ্গু হয়ে পড়েছে—আর একদিকে তেমনি দেখা দিয়েছিল নবজীবনের উন্মেষ—যেখানে উনিশ শতকের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্পর্শকাতরতাকে ছাপিয়ে কৃষক-মজুর-কর্মীর শ্রমজীবী জীবন ক্রমশ বিস্তার এবং প্রাধান্যের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হতে চলেছিল। একালে দৈনন্দিন বস্তুজীবনের জটিলতা ও জীবনযাত্রার অসংখ্য সমস্যা 'উচ্চভাবনা'র স্বর্গলোক থেকে শিল্পীর কল্পনা-দৃষ্টিকে অভাজন অকিঞ্চন মানুষের নিতান্ত বাস্তব-সংগ্রামের রুক্ষভূমিতে টেনে এনেছে। সেই সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে উপলক্ষ করে ব্যাবহারিক জীবনের সকল দিকে বৈজ্ঞানিকতার প্রসার শিল্পীর আবেগ-কল্পনার সঙ্গে অভিনব এক যুক্তি-বিচার-প্রবণতার,—তথা মনের সঙ্গে মননের সংযোগ সাধন করে;—আর এই সব কিছু মিলেই সৃষ্টির শৈলী এবং ভাবপ্রকৃতিতে এক নূতন যুগস্বভাবের সম্ভাবনাকে অনিবার্য করে তুলেছিল। ব্যক্তি হিশেবে শিল্পী নিজেও তাঁর পারিপার্শ্বিক দেশ-কাল-সমাজের এক অবিভাজ্য অঙ্গ। তাই যুগের অভিঘাত—তার উত্থান এবং পতনের তরঙ্গতাড়না থেকে শিল্পি-আত্মারও অব্যাহতি নেই। বস্তুত নিজ দেশ-কালের স্বভাব-স্রোতকে আত্মস্থ করেই সার্থক স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির আনন্দ-লোক রচনা করেন, তা না হলে একেবারে আভিধানিক অর্থে কোনো সৃজন-শিল্পীই স্বয়ম্ভূ নন, সেকথা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। এ-পর্যন্ত আলোচনায় উদীয়মান সেই নবযুগ-সম্ভাবনার বৃন্তে বিভিন্ন শিল্পি-চেতনায় বিচিত্র আত্ম-প্রতিফলনের গল্পরূপকেই আহরণ করে ফিরেছি।

কিন্তু এই 'কল্লোল'-যুগের একই কালসীমায় এমন দু-একজন গল্প-শিল্পীর অভ্যুদয় ঘটেছে,—যুগের বেদনা এবং বাসনাকে যাঁরা একান্তরূপে উপলব্ধি করেছেন,—এমনকি সেই যুগের মাটিতেই হয়েছেন সম্পূর্ণ প্রবর্ধিত। তাহলেও তাঁদের ব্যক্তিক ভাব-কল্পনাকে বিচিত্র কৌশলে রক্ষা করেছেন ক্রান্তি-প্রবাহের তরঙ্গাভিঘাত থেকে পৃথক করে। যুগ তাঁদের সৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে, কিন্তু ব্যক্তিমন নিয়ে যুগ-চাঞ্চল্যের মধ্যে তাঁরা ধরা পড়েননি,—তাই যুগধর্মের লক্ষণ তাঁদের অনাপেক্ষিক সৃজনমানসে এক পৃথক্ বৈশিষ্ট্যের প্রোজ্জ্বল সুরেখতায় চিহ্নিত হয়েছে। এমন কথা মনে করবার কারণ নেই যে, এঁদের যে-কোনো একজনের অথবা সকলেরই গল্প-দেহে 'কল্লোল'যুগের সকল স্থায়ী লক্ষণ এবং উপকরণ পূর্ণাঙ্গ মূর্তি ধারণ করেছে। এমন কি, একথাও ভাবা চলে না যে, সমকালীন গল্পশিল্পীদের মধ্যে কেবল এঁরাই সর্বাধিক সিদ্ধকাম। তাছাড়া সৃষ্টির প্রকৃতি এবং প্রকরণেও এঁরা একে অন্যের থেকে আমূল পৃথক। তাহলেও, আলোচ্য পর্যায়ের ছোটগল্পগুচ্ছে কল্লোলের কালের বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্যম, স্বভাব এবং উল্লাসের বিভিন্ন প্রকৃতি স্পষ্টতর তাৎপর্যে পরিদৃশ্যমান হয়ে আছে। আঙ্গিকের মধ্যেও এমন এক বিশিষ্ট আকর্ষণ রয়েছে তুলনায় যা অপূর্ব। সৃষ্টির সেই অকম্পিত নিরাবেগ হাওয়াঘরে বসে সেদিনকার যৌবন-কল্লোলিত কালস্রোতস্বিনীর তটদিগন্ত যেন নানা দৃক্‌কোণ থেকে লক্ষ-যোগ্য হয়ে ওঠে। এই বিশেষ তাৎপর্যেই দ্বিতীয় পর্বের বাংলা গল্প-সাহিত্যে এঁদের পৃথক মূল্যায়নের দাবি।

১। অন্নদাশঙ্কর রায়

'কল্লোল'-তটদিগন্তে অন্নদাশঙ্কর রায়ের (১৯০৪) ব্যক্তিত্ব তাঁহার ছোটগল্পগুচ্ছের চেয়েও গভীরতর অনুধাবনের দাবি রাখে। বিশুদ্ধ শিল্পকর্ম হিশেবে তাঁর অপরাপর রচনা-প্রকরণের মত ছোট-গল্পগুলিও স্মরণীয়তার বৈশিষ্ট্যে অবিসংবাদিত। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের চলমান যুগে অন্নদাশঙ্কর রায় এমন এক অনন্য শিল্পী,—নিজের ছোট-বড় সকল সৃষ্টির মধ্যেই যিনি সচেতন দৃঢ়তায় আত্মপ্রক্ষেপ করে চলেছেন প্রগাঢ় বর্ণে। অর্থাৎ, তাঁর বর্ণনার বিষয় অথবা প্রকরণের কোনো ক্ষেত্রেই সৃষ্টিরহস্যের মূল তাৎপর্যটি নিহিত নেই; স্রষ্টার একান্ত ব্যক্তি-ভাবনার প্রেক্ষাপটে প্রতিফলিত করে দেখতে পারলে, তবেই তাঁর সৃষ্টির শরীরে প্রাণের দীপ্তি সমুচিত বর্ণাঢ্যতায় বিচ্ছুরিত হয়। কারণ অন্নদাশঙ্কর কেবল সুন্দরের লোভে সৃষ্টি করেন না,—শিল্প-সাহিত্যের সৌন্দর্যলোকে তিনি কঠিন সত্যান্বেষী, সত্যের দৃঢ় ভিত্তির ওপরে সৌন্দর্যের বেদী রচনায় প্রয়াস তাঁর।

আর সত্য অর্থে দেশকালপাত্রের অপেক্ষিত কোনো সীমিত তথ্যকে নিয়ে কখনোই তৃপ্ত নন অন্নদাশঙ্কর ;—বিশ্বসত্য—অর্থাৎ যে সত্যবোধের আলোকে অরূপ অপরূপ বিশ্ব-স্বভাবকে একসঙ্গে সামগ্রিকভাবে আত্মসাৎ করা সম্ভব, সেই সত্যের অতন্দ্র অন্বীক্ষু তিনি।—"আমাদের সৃষ্টিকে অতি দূর ভবিষ্যতের যেখানে যত মানুষ আছে সকলের হাতে দেবার মত করে যেতে হবে। তারা ও জিনিস্ ভাঙ্‌বে বটে, কিন্তু ওর ভেতরে যেটুকু খাঁটি সোনা থাকবে, সেটুকুকে ফেলে দেবে না।"[৩]—এই সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা স্রষ্টা অন্নদাশঙ্করের।

অর্থাৎ, সত্যের এক অনির্বচনীয় নিত্য স্বভাব রয়েছে, দেশকালের অতিশায়ী সে খাঁটি সোনা। সভ্যতার বিবর্তনপথে দেশ-কাল-পাত্রের অভিজ্ঞান ও উপলব্ধিকে আশ্রয় করেই সোনার তাল অলঙ্কারের রূপ ধরে,—অরূপ নিত্যসত্য রূপময় বিশেষত্বের অঙ্গ ধারণ করে। এককালের গয়না আর এককালের শরীরে বেমানান,—তাই পুরনো অলঙ্কার ভেঙে নতুন যুগের মতো করে গয়না গড়তে হয় চিরন্তন সত্যের সোনার তালকেই ভেঙে চুরে। অন্নদাশঙ্কর বলেন,—"এখন আমাদের প্রাচীন সভ্যতাটাকে ভেঙে সেই সোনা দিয়ে নতুন সভ্যতা গড়তে হবে। আহা, থাক্, থাক্, পুরাতন প্যাটার্নের অলঙ্কার, তাকে তার আদিম অবস্থায় অক্ষত রাখো—একথা গ্রাহ্য করব না। আবার এমন কথাও গ্রাহ্য করব না যে, প্যাটার্নটা সেকেলে ও জিনিসটা ফিট্ করছে না বলে দাও অতখানি সোনা বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে। ওটা রাগের কথা অভিমানের কথা।"[৪] এখানেই ব্যক্তি-অন্নদাশঙ্কর 'কল্লোল'-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপন্থী, এবং সত্যপন্থীও। অতীত-অনাগতের মধ্যে ফল্গুধারার মত বহমান সামগ্রিক জীবনস্বরূপের অনাপেক্ষিক পরিচয় আবিষ্কারেই তাঁর আনন্দ। আধুনিক সাহিত্য-ভাবনার জগতে নিজের যথার্থ ভূমিকালিপি নিজেই তিনি নির্দেশ করেছেন,—"আমি প্রবীণদের মহলে নবীন, নবীনদের মহলে প্রবীণ।...নবীন ও প্রবীণ উভয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি পরস্পরকে পরিচিত করাতে পারি।"[৫] তার কারণ এই নয় যে, উভয় দলের সঙ্গেই অন্নদাশঙ্করের সমান ঘনিষ্ঠতা। যথার্থ তথ্য বরং তার বিপরীত, অর্থাৎ উভয় দলের সঙ্গেই তাঁর পরিচয়-স্বল্পতা সমপরিমাণ। পূর্বোক্ত একই প্রসঙ্গে শিল্পী নিজে এসব খবর জানিয়েছেন।

তা সত্ত্বেও,—অর্থাৎ দেশকালের এক ক্রান্তি-লগ্নে আবির্ভূত হয়েও অন্নদাশঙ্কর পুরাতন এবং নূতনের মধ্যে সার্থক সন্ধিসূত্র রচনার অধিকার দাবি করেন,—সে কেবল

৩। অন্নদাশঙ্কর রায়—'আজ এবং আগামী কাল' (প্রবন্ধ)—'দেশ কাল পাত্র'।
৪। তদেব। ৫। অন্নদাশঙ্কর রায় 'বিনুর বই'—ভূমিকা।

তাঁর অতন্দ্র সত্যসন্ধিৎসার সম্পন্নতা-বশে। সত্য নিরঞ্জনস্বরূপ, অরূপ তার অস্তিত্ব। —মানুষের চেতনা ও উপলব্ধির মাধ্যমে পরিস্রুত হয়ে সভ্যতার নির্মাণশালায় তার অবয়বান্বিত মূর্তি গোচর হয়। এদিক্ থেকে মানুষের অন্তর্লোকেই অরূপ সত্যের রূপময় নবজন্ম। অন্নদাশঙ্করের পক্ষে এ-মানুষ একটি বিশুদ্ধ অনপেক্ষিত স্বতন্ত্র-ব্যক্তিত্ব। বস্তুত প্রমথ চৌধুরীর পরে বাংলা গদ্য সাহিত্যে তিনি দ্বিতীয়তর individual ;—নিজ স্বাতন্ত্র্যের সংরক্ষণে এবং নিরীক্ষণে প্রমথ চৌধুরীর মতই যাঁর চেতনা অবিশ্রাম আত্ম-প্রহরারত। চব্বিশ বছর বয়সে লেখকের প্রথম গদ্য প্রবন্ধের বই 'তারুণ্য' প্রকাশিত হয় (১৯২৮)। সেই বিচিত্র বিষয়চারী চিন্তা-সমৃদ্ধ সংকলন প্রকাশের মূলগত উদ্দেশ্য নির্দেশ করে একই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯৪৭) ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন,—"ইচ্ছা ছিল প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পরীক্ষা করে দেখ্‌ব আমার মতবাদ বা আন্তরিক বিশ্বাস কী পরিমাণে বিবর্তিত বা পরিবর্তিত হয়েছে। পরীক্ষার মাপকাঠি হবে 'তারুণ্য'।" ঠিক পাঁচ বছর পর পর অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধ-সংকলনের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি; তাছাড়া পরবর্তী কালে প্রকাশিত গদ্য রচনাবলীতে তিনি যে আত্ম-উন্মোচন করেছেন, তার সঙ্গে 'তারুণ্য'র প্রথম অভিব্যক্তির মনোভাবনাকে কি সূত্রে তুলনা করা সম্ভব হয়েছিল,—মোটেই হয়েছিল কিনা, বর্তমান প্রসঙ্গে সে সব জিজ্ঞাসা নিরর্থক। তাঁর সৃষ্টিধর্মের বিষয়ে সবচেয়ে বড় কথা,—গদ্যে-পদ্যে, গল্পে-প্রবন্ধে, ছড়ায়-কবিতায় সর্বত্রই শিল্পী তাঁর "মতবাদ এবং আন্তরিক বিশ্বাস"কে নিয়েই অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছেন বিশ্বমানবতার সাগরসঙ্গমের পথে ;—প্রতিপদে পরীক্ষা করে নিয়েছেন সকল মত এবং বিশ্বাসের কষ্টিপাথর-স্বরূপ নিজের স্বতন্ত্র প্রখর ব্যক্তিত্বকে। আর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সৃষ্টির সাধনা ও প্রকরণে সর্বদা, সকল ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ মনন-শক্তি অতি তীক্ষ্ণ ও সক্রিয় আকার ধরে বিরাজ করেছে। বস্তুত এখানেই অন্নদাশঙ্কর প্রমথ চৌধুরীর যথার্থ উত্তরসূরী—প্রখর-স্বতন্ত্র আত্ম-ব্যক্তিত্বের নিরন্তর শুশ্রূষা, আর সেই প্রয়াস-পথে উপলব্ধি এবং সৃষ্টির মুখ্য উপকরণ রূপে দুর্লভ মনন-শক্তির প্রয়োগদক্ষতায়।

তাহলেও প্রমথ চৌধুরীর সার্থক উত্তর-সাধক অন্নদাশঙ্কর একান্তভাবে প্রমথ চৌধুরীর অনুব্রতী নন। সৃষ্টি এবং উপলব্ধির জগতে তিনি কেবল নিজ অনন্যপর আত্মিক স্বাতন্ত্র্যেরই অনুব্রতী। যে-বৈশিষ্ট্যে প্রমথ চৌধুরী থেকেও তিনি মূলত পৃথক্, সে তাঁর মননের অন্তর্নিহিত মনোভিরাম হৃদবৃত্তির ব্যাপ্তি এবং গভীরতা;—অচিন্ত্যকুমার যাকে 'আধ্যাত্মিকতা' নামেও অভিহিত করেছেন,—"অন্নদাশঙ্কর তেমন একজন বিরল সাহিত্যিক যাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে বসলে আধ্যাত্মিকতার একটি সুঘ্রাণ

পাওয়া যায়। (তেমন আর একজনকে দেখেছি। সে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।) একটি মৌন মহত্ব যে তার চিন্তায় তা যেন স্পষ্ট স্পর্শ করি।···আত্মার সঙ্গে আত্মার যখন কথা হয় তখনই মহৎ আর্ট জন্ম নেয়। অন্নদাশঙ্কর সেই মহৎ আর্টের অন্বেষক।"[৬]

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় আর অন্নদাশঙ্কর দুজনেই অভিন্নার্থে আধ্যাত্মিক নন নিশ্চয়ই। তাহলেও বিশেষ ভাবে যা আত্মার সম্পর্কিত তাই যদি আধ্যাত্মিক হয়, তাহলে অন্নদাশঙ্কর নিঃসন্দেহে এক অনন্য-স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক সত্তা। সারা জীবন ভরে তীক্ষ্ণ মননশীল চেতনার সন্ধিৎসা সহযোগে যে আত্মার স্বরূপ-সত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি করে চলেছেন,—স্পষ্টার্থে তা কোনো অতিলৌকিক, তুরীয় অস্তিত্ব নয়। অন্তহীন বিকাশ-বৈচিত্র্যে চিরবহমান মানব-আত্মাই অন্নদাশঙ্করের একমাত্র সন্ধেয়,—একমাত্র সাধ্যও। এদিক থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের উত্তর-সাধক ভাবশিষ্য—একলব্যের মত নিজের মননশীলতার স্বকীয়-স্বতন্ত্র পথে রবীন্দ্র-ধর্মের তিনি অনুবর্তন করেছেন,—জীবন-বিশ্বাসে এবং সৃজনলোকেও! তাঁর আত্ম-অন্বীক্ষু চেতনাকে ভারতবর্ষের দুই যুগমানব যুগপৎ আকর্ষণ করেছেন,—এক গান্ধীজি আর এক রবীন্দ্রনাথ। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'বিনুর বই'-তে লেখক স্বীকার করেছেন,—গান্ধীজির চেয়েও রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ তাঁর মনে গাঢ়তর ছিল। কারণ রবীন্দ্রনাথ "বিনুর মত জিজ্ঞাসুদের ডাক দিয়ে বলতেন, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ··· ।" এককথায় যদি অন্নদাশঙ্করের জীবন-সাধনাকে পরিচায়িত করা সম্ভব হয়, তাহলে বলা যেতে পারে বিশ্বের অমৃতপুত্রগণের উদ্দেশ্যে নবীন অমৃতবাণী, নূতন সত্যমন্ত্রের সন্ধানই তাঁর একমাত্র ব্রত। আর গল্প-প্রবন্ধ-উপন্যাস-কবিতা-ছড়ার আকারে তাঁর সকল সৃষ্টিই ঐ অখণ্ড জীবন-সাধনা এবং জীবন-জিজ্ঞাসারই অব্যবহিত অভিব্যক্তি। এই অর্থেই বলেছিলাম, অন্নদাশঙ্করের রচনাকে বিশুদ্ধ সাহিত্যিক নিরিখে বিচার করলে তার যথার্থ তাৎপর্য আবিষ্কার দুঃসাধ্য—শিল্পীর মননশীল জীবনমূল্যেই তাদের যথার্থ মূল্যমান। আর সেই মূল্যবোধে অন্নদাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের মতই জীবনের অবিনাশী বিবর্তনশীলতায় বিশ্বাসী ;—বস্তুত এই বিবর্তন চেতনা থেকেই রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁরও সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য এবং গতির শক্তি সঞ্চারিত হতে পেরেছে।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে তরুণ শিল্পীর প্রগাঢ় প্রত্যয়,—"লক্ষ বর্ষ পরেও সাধের ভারতবর্ষ সৃষ্টি হতে থাকবে, সৃষ্ট হয়ে উঠবে না,—উত্তরোত্তর পৌরুষকে প্রতিভাকে প্রেমকে

৬। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—'কল্লোলযুগ'।

এমনি সৃষ্টি-তৎপর করে রাখবে, ছুটি দিয়ে বন্ধ্যা করে দেবে না।"[৭] আর ব্যক্তি-অন্নদাশঙ্কর কেবল ভারতবর্ষীয় নন,—আপন আত্মার আকাঙ্ক্ষায় তিনি বিশ্বনাগরিক,—মননশীল অধিকারে এবং উত্তরাধিকারবোধেও। তাই তাঁর বক্তব্য—"আমরা কেবল ভারতবর্ষীয় নই, আমরা মানুষ। আমাদের জন্ম গ্রীক্ রোমান্ ইজিপ্‌সিয়ান্‌রাও তপস্যা করে গেছেন।"[৮] সেই প্রত্যয়ের আত্মিক উপলব্ধিতে প্রমথ-শিষ্য হয়েও মনস্বী অন্নদাশঙ্কর আসলে আধ্যাত্মিক। যেমন তাঁর আত্মায়, তেমনি সৃজনলোকেও, তাঁর পরম ব্রত দেশকালের পাদপীঠে বিশ্বমানুষের রহস্য সন্ধান,—যে মানুষ প্রথমে ভালবাসে জীবনকে, তারপর প্রেম এবং তারো পরে আর্টকে; যে জীবন, প্রেম এবং আর্ট আসলে এক অভিন্ন সত্যের সোনায় গড়া বিচিত্র প্যাটার্নের অলঙ্কার ছাড়া আর কিছু নয়।

এই জীবন-সত্যের সন্ধানে অন্নদাশঙ্কর প্রবলভাবে 'সোঽহংবাদী'। অর্থাৎ, নিজের উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যয়ের বিবর্তন-রহস্যের মধ্যেই তিনি নিত্যসত্যের স্বরূপ সন্ধান করেছেন। কেবল এই কারণেই নিজ ব্যক্তি-চেতনার অভ্রান্তি সংরক্ষণের প্রয়াসে নিজের ওপরে তাঁর মননশীলতার এমন সদাজাগ্রত কঠিন প্রহরা! বাংলা সাহিত্যে অন্নদাশঙ্কর সমুচ্চ বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত। কিন্তু 'হাই ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল' হলেও অমিশ্র ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল নন অন্নদাশঙ্কর,—তাঁর ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালিজম্‌ও আসলে সত্যসন্ধিৎসু আধ্যাত্মিক বাসনারই অনিবার্য ফসল। বস্তুত এই কারণেই প্রমথ চৌধুরীর মত মুখ্যত বিচারবুদ্ধি-প্রখর প্রাবন্ধিক নন অন্নদাশঙ্কর,—মৌল স্বভাবে এক স্বপ্নদ্রষ্টা শিল্পী। —তাঁর উপন্যাস-ছোটগল্প ছড়া-কবিতার মত সমুচ্চ মনন-সমৃদ্ধ প্রবন্ধগুলিও সেই মৌলিক শিল্প-কর্মেরই এক আশ্চর্য বিচ্ছুরণ, যেমন তাঁর শিল্প-সাহিত্যের মধ্যেও ফল্গুধারার মত অনুস্যূত রয়েছে দুর্লভ মনস্বিতার অনিবার্য স্বতঃস্ফূর্ত স্বাক্ষর।

ফলকথা, অন্নদাশঙ্করের মন এবং মনন-সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বই আসলে তাঁর সৃষ্টির প্রাণ; লেখকের ছোটগল্পগুলির প্রসঙ্গে একথা আরো বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ এই রচনাগুচ্ছের মধ্যেই তিনি সর্বাপেক্ষা অলক্ষিত কল্পনাকুশলতার সঙ্গে সবচেয়ে সংহত সম্পূর্ণভাবে নিজের আত্মার বাসনাকে প্রতিফলিত করতে পেরেছেন। অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসগুলি তাঁর তীক্ষ্মমননশীল জীবন-এষণারই অ-পূর্ব ফলশ্রুতি,—এবিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশও নেই। বিশেষ করে সুদীর্ঘ ছয়খণ্ডে সমাপ্ত 'সত্যাসত্য' উপন্যাসে "আধুনিক যুগের সমস্ত জটিল সমস্যা, সমস্ত নূতন অনিশ্চয়তামূলক

৭। অন্নদাশঙ্কর রায়—'একলা চল রে'—'তারুণ্য'।

৮। অন্নদাশঙ্কর রায়—'আজ এবং আগামী কাল'—'দেশ কাল পাত্র'।

পরীক্ষা, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ, মানবকল্যাণের পরস্পর-বিরোধী আদর্শ অতিসূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে আলোচিত” হতে পেরেছে।[৯] অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের ‘রত্ন ও শ্রীমতী’তে জীবনের দ্রুত পরিবর্তমান প্রেক্ষিতে সেই পুরাতন চিরন্তন ধারারই সংহততর অনুবর্তন লক্ষিত হয়ে থাকে। বস্তুত অন্নদাশঙ্করের অপরাপর উপন্যাসেরও সার্থকতা-ব্যর্থতার নিরিখ ঐ একই প্রয়াসের সাফল্য-অসাফল্যের পরিমাপে।

কিন্তু ছোটগল্পের শরীর-সীমা সংক্ষিপ্ত এবং সংহত। উপন্যাসের সমুচিত আত্মবিস্তার এই হ্রস্ব আয়তনে একেবারেই অসম্ভব। অথচ অন্নদাশঙ্করের ব্যক্তিত্বে মনন-চিন্তনের তীক্ষ্ণতা এবং মনোধর্মের অতুল্য প্রগাঢ়তা এক অকল্পিত বৈচিত্র্যের সঞ্চার করে। সেই সঙ্গে শিল্পীর জীবনসন্ধিৎসার বিশ্ববিস্তার ও সামগ্রিকতা আত্মপ্রকাশের জন্য এক বৃহদায়তন অবয়বেরই অপেক্ষা রাখে। ফলে অন্নদাশঙ্করের গল্পে তাঁর আত্মপ্রক্ষেপণ উপন্যাসের চেয়ে অনেক অস্ফুট; কিন্তু বোদ্ধা পাঠকের উপলব্ধিতে তা স্বতঃ-প্রতীয়মান। গল্পের প্লট্-এ শিল্পীর জীবন-চিন্তনের সকল দিগ্‌দর্শন একসঙ্গে সর্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তি পেতে পারে নি। বৃহদায়তন সর্বাবয়ব জীবনের এক-একটি সংক্ষিপ্ত আঙ্গিক, তথা এক-একটি ছোটছোট মুহূর্তকে আশ্রয় করে এক-একটি গল্প গড়ে উঠেছে। কিন্তু তার কেন্দ্রবিন্দুতে শিল্পীর বিশ্বমানব-সন্ধিৎসার চিন্তা ও অনুভব সুরেখ বর্ণে প্রতিবিম্বিত হতে পেরেছে;—অর্থাৎ জীবনের যে সিন্ধুরূপের রহস্যসন্ধানে অন্নদাশঙ্করের মন এবং মনন অক্লান্ত অতন্দ্র, বিন্দুর সীমায় তার সংহত পূর্ণরূপের ব্যঞ্জনাটুকু ক্ষণে ক্ষণেদোলায়িত হতে পেরেছে প্রায় প্রত্যেক ছোটগল্পের তরঙ্গ-বিভাসিত মুকুর-ফলকে। ‘কামিনীকাঞ্চন’ গল্প-সঙ্কলনের নিবেদন অংশে শিল্পী নিজেই স্বীকার করেছেন—“এই গল্পসংগ্রহের অধিকাংশস্থলে আমি নিজেকে প্রক্ষেপ করেছি।”—যে-সব গল্পের প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর এই স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করেন নি,—সেখানেও ভিন্নতর পদ্ধতি ও প্রকরণে তাঁর ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে অনিবার্য ভাবেই। লেখক নিজের সম্পর্কে নিজেই বলেন,—“যাদের দেখেছি চিনেছি ভালোবেসেছি তাদের কথা লিখেছি, প্রাণ দিয়ে লিখেছি, লেখায় প্রাণ সঞ্চার করেছি। আমি প্রেমিক লেখক।”[১০] অর্থাৎ, শিল্পীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাশ্রিত প্লটের শরীরে নিতান্ত ব্যক্তিক বিশ্বাস-উপলব্ধি-চিন্তার আলোক প্রতিফলিত করেই গল্পের রসফলশ্রুতি গড়ে উঠেছে তাঁর প্রতিটি ছোটগল্পে। সেই জীবনদর্শনের পরিমণ্ডলেই ছোটগল্পগুলির যথার্থ শিল্প-মূল্যও।

৯। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য :—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ (নব সং)। ১০। অন্নদাশঙ্কর রায়—বিনু—‘জীবন শিল্পী’।

তাহলেও, বুদ্ধদেব বসুর গল্পের মত অন্নদাশঙ্করের রচনা একান্ত অন্তঃসমাহিত (introvert) নয় কখনোই। আগেই দেখেছি জীবন-সত্যের বিবর্তনশীল ক্রমপরিণতিতে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস; আর সেই বিবর্তনের স্বভাবকে তি'ন নিজের ব্যক্তিজীবনের গহনে উপলব্ধি করেছেন নিঃশেষে। কারণ মনে এবং মননে আন্তরিকভাবেই তো তিনি বিশ্বমানবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত-চেতন। লেখক নিজেই বলেছেন টলস্টয়ের মতই সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে তিনিও "যখনকার যা তখনকার তা পাঠকের হাতে সঁপে দিয়েছেন, জীবন-যৌবন পাপ-পুণ্য জ্ঞান-অজ্ঞান।......তাঁর অন্তিম পাঠক সব মানুষের অন্তরাত্মা।" অন্তত এটুকুই সাহিত্য-সাধনায় তাঁর মূল লক্ষ্য।[১১] ফলে বিশ্বমানবের অন্তরাত্মার সঙ্গে এই সাযুজ্য অনুভবের প্রগাঢ়তায় অন্নদাশঙ্করের মননশীল চেতনা তাঁর সমকালীন জীবন-ভাবনার প্রতিনিধিত্বের ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছে মনে মনে,—অন্তত নিজ সৃজন-ভূমিতে। এখানেই একের মধ্যে অনেকের, —ব্যক্তির আধারে দেশকালের পদধ্বনি ঝংকৃত হয়ে উঠেছে তাঁর সৃষ্টিতে। ফলে ভাবনার মধ্যে ব্যাপ্তি এবং উদারতা যেমন রয়েছে,—অভিজ্ঞতার পসরাও তাঁর তেমনি বর্ণাঢ্য-বিচিত্র।

ছোটবেলার কথা স্মরণ করে শিল্পী লিখেছেন,—"রাজবাড়িতে (বিনু) কতবার গেছে, রাজারা কেমন থাকতেন তাও অজানা ছিল না। আবার পাণদের পাড়ায়, শবরদের পাড়ায় পাড়ায় বেড়িয়েছে, তারা কেমন থাকত তাও তার জানা। সমাজের শ্রেণীবদ্ধ রূপ তার চোখে পড়েছিল, কিন্তু একালের মত পীড়া দেয় নি। শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিচ্ছেদ ও বিরোধ এমন করে দৃষ্টি ছায়নি।"[১২]

সমগ্র মানুষকে চিরকাল সাহিত্যে ধরে রাখতে চেয়েছে বিনু;—চেয়েছেন বিনু-রূপী অন্নদাশঙ্কর। পারিপার্শ্বিক মানবসমাজের এই পীড়াকর বিবর্তন তাঁকে ব্যথিত করেছে, কিন্তু কুণ্ঠিত করে নি। এই বিভগ্নতার বেদীতেই তিনি আপন সৃষ্টির আসন পেতেছেন বিশ্বমানুষের আরাধনায়, যে মানুষ অখণ্ড সম্পূর্ণ হয়েছে প্রেমে। স্বভাবতই প্রেমের বিশ্বরূপও উপলব্ধির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করে দেখেছেন শিল্পী তাঁর বিবর্তনশীল অনুভবের ধারায়। একদিকে মানুষের মধ্যে শ্রেণী, সম্প্রদায়, সম্পদ, ও দেশগত বিভেদ, আর একদিকে নরনারীর মধ্যে অধিকার ও উপভোগের বিপুল পার্থক্য। এই ধারাস্রোতের উজান ঠেলেই অন্নদাশঙ্করের সৃষ্টি নূতন মানবমুক্তির স্বপ্ন-পথে অগ্রসর হয়েছে। এই সত্যেরই স্বীকৃতি শুনি শিল্পীর কণ্ঠে,—"বিনুর সংস্কারগুলো একে একে কাটল। বিধবা-বিবাহকে সে ভয়-করত—ভয় ভাঙল। বিবাহ-বিচ্ছেদকে ঘৃণা করত। ঘৃণা ঘুচল।

১১। দ্রষ্টব্য—'বিনুর বই'। ১২। তদেব।

বিবাহ-প্রথাটাকে শাশ্বত ভাবত। কোনো প্রথাই শাশ্বত নয়। যার উদ্ভব হয়েছে, তার বিলয়ও হবে নিশ্চিত জানল। সতীত্বকে স্বর্গীয় মনে করত। দেখল ওর মধ্যে সাড়ে পনের আনা বাধ্যতা আর দাস্য। যেটুকু স্বেচ্ছা সেইটুকু মূল্যবান। বিবাহ-প্রথা বিলয় হলেও সেটুকু থাকবে। বরং তখনি মর্যাদা প্রতিপন্ন হবে।

"তারপর হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করল যে, নারীর একবার পদস্খলন হলে সে যাবজ্জীবন পতিতা। অথচ পুরুষের পতন নেই একদিনও। স্ত্রী থাকতে স্বামী অকারণে আবার বিয়ে করে, কিন্তু স্বামী থাকতে—এমন কি স্বামীর মৃত্যুর পরেও স্ত্রী সকারণে বিয়ে করতে পারে না। বিধবার তবু আইনের বাধা নেই, পরিত্যক্তার সেদিকেও বাধা। নির্যাতিতার দৈব সখা, মানুষ তার শরীরের কষ্ট লাঘব করতে পারে, কিন্তু মনের ওষুধ জানে না। জানলেও কিছু করে না।

...এমনি করে সাহিত্যের দিকে তার লেখনীর গতি।...তার অন্তিম লক্ষ্য স্বাধীন জীবন, স্বাধীন যৌবন। নরনারী উভয়ের।"[১৩]

বিনু-রূপী ব্যক্তি-অন্নদাশঙ্করের এই ভাব-বিবর্তনের মাধ্যমে উনিশ শতক থেকে বিশ শতকে,—বিশ্বাস তৃপ্তি ও নির্বিচার সংস্কারের জগৎ থেকে সংশয়, বিচ্ছেদ, স্বাতন্ত্র্য ও বিতর্কের জগতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া সম্ভব, মধ্যবর্তী অবক্ষয়-ধারার সূত্র-সঙ্কেতকে অনুসরণ করে। বস্তুত এখানেই তাঁর মনন-উপলব্ধিতে প্রত্যক্ষ করি 'কল্লোল'যুগের তীর-সীমা। বিচ্ছিন্ন ছোটগল্পের সীমিত প্লটের শরীরে খণ্ড খণ্ড করে এই প্রত্যয়-মননের ফলশ্রুতিই ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে,—যার শেষকথা সকল বিভগ্ন পাণ্ডুরতা ও বিভেদবিচ্ছেদের অকূলসমুদ্রে পাড়ি দিয়েও স্বাধীন জীবন, স্বাধীন যৌবনের প্রবল প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষা! প্রতি গল্পের মধ্যেই নূতন নূতন অভিজ্ঞতার ভাঁজ খুলে একই সত্যকে খুঁজে পাই যা চির-নূতন, অন্তত পুরাতন নয় কথনোই। গল্প-বিষয়ের চেয়েও নূতনত্বের স্বাদ আরো বেশি অক্ষুণ্ণ থাকতে পেরেছে প্রকাশ-শৈলীর পরিচ্ছন্নতায়। বারবছরের শিল্পীর সাহিত্যিক মন নবজন্ম গ্রহণ করেছিল বীরবলের রচনার আশ্চর্য প্রসাদগুণের স্পর্শে। অন্নদাশঙ্করের রচনায় সেই মনন-পুষ্ট প্রসাদগুণ, অর্থাৎ প্রকাশের দ্ব্যর্থহীন স্পষ্টতা এবং সুমিতি চমকপ্রদ। —কিন্তু তাতে আতিশয্য নেই ;—না ক্লাসিক্যাল পুনরুক্তির,—না লিরিক্যাল অতিশয়োক্তির। প্রথমটির গুণে, লেখক নিজেই বলেছেন, প্রমথ চৌধুরীর রচনায় জমেছে কথকতার স্বাদ,[১৪]—দ্বিতীয়টির কল্যাণে গল্পের শরীরে কাব্যের আড়ম্বর জমে উঠতে পারত।

১৩। তদেব।

১৪। দ্রষ্টব্য—অন্নদাশঙ্কর রায়—'জীবনশিল্পী'।

ফলকথা অন্নদাশঙ্করের স্টাইল মনস্বী ভাবুকের—অর্থাৎ, তাঁর জীবনদর্শনের মূলে হৃদবৃত্তির যে গাঢ়তা রয়েছে, শিল্পীর মননশীল প্রকৃতির প্রহরায় তা যেমন ভাবালু হতে পায়েনি কখনোই, তেমনি একেবারে বিশুষ্কও হয়ে পড়েনি কখনো সেই ফল্গুধারার অনিবার্য গোপন উৎস।

দৃষ্টান্ত হিশেবে লেখকের 'উপযাচিকা' গল্পটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে :—

—ললিত বসু বিলাত ফেরত—বোস সাহেব। হঠাৎ একদিন তার আস্তানায় আবির্ভাব ঘটে বাল্যবন্ধু বৃন্দাবনের। বিপদে পড়ে প্রতিপত্তিশালী বন্ধুর সাহায্য ভিক্ষা করতে এসেছে বৃন্দাবন। তাই অনেকটা বন্ধুর মন ভেজাবার জন্যেই বিচিত্র গল্পের অবতারণা করে চলে সে। রেলের কণ্ট্রাক্টার ছিল প্রথম জীবনে,—এখন অবশ্য কেরানি। তাতেও বিপত্তি দেখা দিয়েছে। তাহলে কি হয়, সেই কণ্ট্রাক্টারি জীবনের স্মৃতি আজও জ্বলজ্বল্ করে তার মনে। তখন যে 'লবে' পড়েছিল বৃন্দাবন! আর সে কি একটি ছুটি!—"একটির সঙ্গে লব্ হলে একপাল এসে ঘেরাও করে। সবাইকে উপহার দিতে দিতে দেনা দাঁড়িয়ে গেল কত! তারপরে সেই বিশ্রী রোগ।"

কিন্তু পুণ্যাত্মা হিন্দুসন্তানের ভয় কিসের! বাবা ভুজঙ্গধর শিব রয়েছেন, একান্ত জাগ্রত দেবতা। রুগ্ন বৃন্দাবন তাঁরই মন্দিরে ধর্ণা দিলে,—'বাবা'ও দিলেন স্বপ্নাদেশ। সেই কৃপাকণা ভরসা করে বৃন্দাবন বিবাহপাশে আবদ্ধ করলো বারো বছরের একটি অপাপবিদ্ধা কন্যাকে। "আর দেখতে না দেখতে রোগ গেল ছেড়ে। শ্রীবৎস রাজার শরীর থেকে যেন শনি বেরিয়ে গেল।" সে শনি প্রবেশ করলো ঐ বারো বছরের বালিকার কোমল শরীরে। আর তাই বা কি করে বলি,—আধ্যাত্মিকতা-প্রগাঢ় স্বরে বৃন্দাবন বলে,—"সতীলক্ষ্মী এয়োরানী। তার আয়ু ফুরিয়েছিল। তিনি স্বামীর পায়ে মাথা রেখে জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করলেন।"

অবশ্য তার পরেও "আর একটি নবীন বস্ত্র সংগ্রহ করতে" কষ্ট হয়নি বৃন্দাবনের। কারণ, সে বলে,—"আপনি এসে পড়ে। ভদ্রলোকের বয়স্থা মেয়ে। বিয়ে না দিলে জাত থাকে না। মা বললেন উদ্ধার কর। আমিও দেখলুম যে বিয়ে না করলে আবার খারাপ হয়ে যাব।"

বৃন্দাবনের সঙ্গে এমনি সরস মুখরোচক প্রসঙ্গের আলোচনার ফাঁকে কথায় কথায় বাবুর্চির কথা এসে পড়ে—ললিতের একটি পাচিকা প্রয়োজন। বোসসাহেবের নারীহীন আবাসে বাবুর্চিটির রান্না মুখে দেওয়া কঠিন,—দেশী-বিদেশী কোনো রান্নাই সে জানে না। শুনেই বৃন্দাবন লাফিয়ে ওঠে,—একটি "সুন্দরী

সু-নবীনা" পাচিকা সে জোগাড় করে দিতে পারে। সুবর্ণ যথার্থই 'সুবর্ণ'। বিধবা নয়, কুমারী নয়, সধবা। "সধবা বটে কিন্তু স্বামীর সংসর্গ নেই।...স্বামীর কুৎসিৎ রোগ।"

সুবর্ণ-র গল্প বলতে থাকে আবার বৃন্দাবন,—তার স্বামীর নাম হরিপদ,—ঢাকা না চাটগাঁ থেকে হরিপদ গা ভরে নিয়ে এল বয়লারের ফোস্কা। যত্ন করলো সুবর্ণ,—স্বপ্নের অতীত সে সেবাযত্ন,—মানুষে যা পারে না। তবু ফোস্কা কেবল বাড়েই হরিপদর। কলকাতা শহরে যোলখানা বাড়ির মালিক সে, চিকিৎসাও হল তেমনি ঘটা করে। তবু কিছুতেই সারে না।

সুবর্ণ সবই বুঝতে পারে, একদিন গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে তাই পালিয়ে যায় কাশীতে। কিন্তু মেয়েমানুষের সাধ্য কি পালিয়ে বাঁচে,—ধরা পড়ে তাকে আবার ফিরে আসতে হয়। পাড়াপ্রতিবেশীরা কত বোঝায়। "সুবর্ণর সেই এক উত্তর!—আমি ব্রহ্মচারিণী হতে পারব না। আপনারা কে কে ব্রহ্মচারী শুনি?" লজ্জায় সবাই যে যার পথে চলে যায়। এবার সুবর্ণও চলে যায় মামার বাড়ি; মা থাকেন সেখানে। কিছুদিন থাকার পর মামাতোভাই-পিসতুতো বোনের প্রণয়ের অঙ্কুর দেখা দিতে চাইল,—ফলে সুবর্ণ আবার চালান হয়ে এলো স্বামীর ঘরে।

এতদিনে হরিপদ দত্ত বৃন্দাবনের মত বাবা ভুজঙ্গধরের স্বপ্নাদেশ লাভ করেছে। কিন্তু "সুবর্ণ সিনেমা দেখে ক্ষেপেছে।"—অন্তত সকলে তাই মনে করে,—বৃন্দাবনও। "সে বলে,—'না। ভোগ চাই বলে রোগ চাই নে'।" ফলে হরিপদ নূতন স্ত্রী ঘরে এনেছে। এদিকে সুবর্ণ মাঝে মাঝে বৃন্দাবনের বাড়ি এসে অনর্থ বাধায়,—হরিপদ বৃন্দাবনেরই তো বন্ধু,—তাই বৃন্দাবনকে শাসায় সে,—"আপনি আমার একটা উপায় করুন। নইলে বেশ্যা হয়ে যাব।"

বেশ্যা হয়ে গেলে ব্রহ্মচর্যওয়ালা প্রতিবেশীরাও সেখানে গিয়ে ভিড় জমাবে, এই ভয়েই হরিপদ লজ্জিত শঙ্কিত হয়ে আছে। ওদের তো আট্‌কানো যাবে না আর,—সমাজে তো পুরুষের কিছুতেই দোষ নেই—পুরুষদের আবার সতীত্ব।

কিন্তু বৃন্দাবনের কথার মাঝখানে ললিত বলে,—"বেশ্যা হয়ে যাওয়াকে আমি সতীত্বের মরণ বলি।" কিন্তু "পূর্ণ বয়সে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করাও যে প্রকারান্তরে নপুংসকত্ব। ক্লীবত্ব। সেও বেশ্যাবৃত্তির মত অবমানুষিক।"

অতএব ললিত বিচলিত হল,—সুবর্ণকে পাচিকা পদে নিয়োগ করতে রাজি হল সে।

কিন্তু রাত্রির উত্তেজনা দিনে আর কতটুকু অবশিষ্ট থাকে! তাছাড়া বৃন্দাবনের সঙ্গে সে রাত্রে গল্পের পীঠে গল্প তো কতই হয়েছিল। কারোই সেসব কথা একান্তভাবে মনে রাখবার কথা নয়। বোসসাহেব তো সম্পূর্ণ ই বিস্মৃত হয়েছিলেন। বৃন্দাবনও

নিশ্চয় তাই। অতএব একটি মাস অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল সেই রাত্রির পরে। হঠাৎ এক গভীর রাত্রে ক্লাব থেকে ফিরে বোসসাহেব দেখেন পরিপাটি সহজ সজ্জিত একটি সুন্দরী যুবতী বসে আছে তার নিভৃত ড্রয়িংরুমে। চমকে উঠতে হয় তাকে আরো বেশি করে, যখন সুবর্ণর পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জানা গেল।

চারিদিকে কলঙ্ক, সামাজিক উপেক্ষা বোস্‌সাহেবের মত পদস্থ অফিসার সহ্য করবে কি করে! অতএব একমুহূর্তেই সুবর্ণ-বিতাড়ন-সংকল্প স্থির হয়ে গেল। হিন্দু ঘরের সধবা নারী, প্রথমে তাকে ভয় দেখানো হল অনাচারের;—অর্থাৎ বিলেত ফেরত বাঙালি সাহেবের ঘরে যেসব ভোজ্যাচার চলে হিন্দু নারীর পক্ষে তার স্পর্শমাত্রে নরকের পথ অনিবার্য হতে বাধা নেই। কিন্তু সুবর্ণ তাতে নির্ভয় অবিচল। দ্বিতীয় ওজর তুললে ললিত, বিনা দোষে পুরানো বাবুর্চিকে ছাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ একজনকে বসিয়ে রেখে দুজনের মাইনে দেবার ক্ষতিই বা সে সহ্য করবে কেন? সুবর্ণ তাতেও রাজি,—বিনা মাইনের কাজ করবে সে।

অতএব সত্যকথাই বলতে হল ললিতকে, 'পরস্ত্রী'কে এ-রকমভাবে রাখতে পারে না সে। মুহূর্তে সুবর্ণ মাথা তুলে বললে,—"না আমি আপনারই স্ত্রী।" কিন্তু বোসসাহেব এ সত্য স্বীকার করবে কি করে? সুতরাং সুবর্ণকে সে রাত্রে বিতাড়িত হতেই হল।

তারপর কেটে গেছে প্রায় দুবছর। সে রাতের কথা কে আর মনে করে রেখেছে! হঠাৎ একদিন আবার বৃন্দাবনের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে সুবর্ণ-র কথা উঠে পড়ে। সবিস্ময়ে ললিত শোনে,—সে রাতের 'উপযাচিকা' সুবর্ণ মুসলমানী হয়ে গেছে। বৃন্দাবন বলে,—এখন তার নাম "ফরজন্দ্‌-উন্নেসা। ওর স্বামী এক পেশোয়ারী ফলওয়ালা—আব্‌দেল কাদের। ওর একটি ছেলে হয়েছে, জুলফিকার। বিবি এখন ঘোর পর্দানশীন।······ছি ছি শেষকালে মুসলমান হয়ে গেল।"

এই গল্পের বক্তব্য, বাক্‌শৈলী, এবং তার অন্তর্নিহিত ভাবনায় অন্নদাশঙ্করের শিল্প-চেতনা তথা তাঁর ব্যক্তিক প্রত্যয়-মননের এক সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। সমাপ্তি ছত্রে বৃন্দাবনের কণ্ঠের 'ছি ছি-কার'-এর বক্রোক্তিটুকু একান্ত লক্ষযোগ্য। সুবর্ণ ফরজন্দ্‌ উন্নেসা হয়েছে বস্তুত এখানেই তো জীবনের জয়,—সভ্যতার সকল পক্ষপাত ও সংকীর্ণ বিরুদ্ধতার গণ্ডী অতিক্রম করেও সহজ প্রাণধর্মের মুক্তির আশ্বাস এবং প্রতিশ্রুতি আসলে এখানেই। সেই সঙ্গে বক্র কটাক্ষের ভর্ৎসনা রইল অন্ধ সংস্কার ও কৃত্রিম নৈতিকমূল্যবোধে আচ্ছন্ন সভ্যতার প্রতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে গল্প লিখ্‌তে বসে অন্নদাশঙ্কর প্রশ্ন করেছিলেন,—"মানুষ কোথাও নেই। আছে শুধু ইংলিশম্যান,

মুসলম্যান, জার্ম্যান্, জাপম্যান্, ব্রাহ্ম্যান। কোন্‌টা বড় ট্রাজেডি, মানুষের অন্তর্ধান না মানুষের মৃত্যু!" নিঃসন্দেহে প্রথমটি,—এই অমৃতমন্ত্রের ব্যঞ্জনাই বিচ্ছুরিত হয়েছে 'উপযাচিকা' গল্পের পরিসমাপ্তিতে। আব্‌দেল কাদের-ফরজন্দ্‌উন্নেসা-জুলফিকার-এর প্রাণপ্রদীপ্ত জীবনপরিণাম অন্নদাশঙ্করের এই সাধন-বাণীকেই ব্যঞ্জিত করে তুলেছে, —'সবার উপরে মানুষ সত্য'। গল্প পড়ে এই উপলব্ধি অনিবার্য না হলে অন্নদাশঙ্করের সৃষ্টির আস্বাদন-প্রয়াস কেবলই নিরর্থক। এই অর্থেই বলেছিলাম,—অন্তত তাঁর ছোটগল্পের জগতে সৃষ্টির চেয়ে স্রষ্টার অন্তরধর্ম অধিকতর মনোযোগের দাবি রাখে অপরিহার্যভাবেই।

'হাসনসখী' গল্পের হাসনসখী চাঁপা বলেছিল নীলুকে "কী হবে প্রাণ রেখে, যদি প্রাণ দিতে না পারি।"—এই তো চিরন্তনী নারী—চিরন্তনী প্রকৃতি!—সৃষ্টির অক্ষয় ভাণ্ডারের চাবিকাঠি যার হাতে। অন্নদাশঙ্করও তাই বিশ্বাস করেন,—যে বিশ্বাস একান্তভাবেই বিচার-ভিত্তিক। তাই 'উপযাচিকা' স্বর্ণ চরিতার্থ হতে পারে না জুল্‌ফিকার-এর জনয়িত্রীর অধিকারের চেয়ে একবিন্দুও কম পেয়ে। অন্যপক্ষে ঐ 'হাসন-সখী' গল্পেই নীলু স্পষ্ট অনুভব করেছিল "ভিতরে ও [চাঁপা] শুকিয়ে যাচ্ছিল সখ্যের অভাবে নয়, প্রেমের অভাবে।"

নারী বিচিত্ররূপা,—তার হৃদয়-রহস্য "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।" তাহলেও মানুষের সংসার-সমাজে তার আবির্ভাব দুই হাতে এই দুই সুধাভাণ্ড নিয়ে—প্রণয়বাসনা, আর সৃষ্টির দীপ্ত আকাঙ্ক্ষা। নারীর শারীর তৃষ্ণার অভ্যন্তরেও আসলে তার চিত্তের ঐ পিপাসা ফল্গুপ্রবাহের মতো বয়ে চলে। 'উপযাচিকা' স্বর্ণ অযাচিতভাবে এই দুই সম্পদকেই পেয়েছে,—তার জন্যে চরম মূল্য দিতেও তাই কুণ্ঠা নেই তার। চারপাশের নিরুদ্ধশ্বাস বিষাক্ততার প্রত্যন্ত সীমায় এই তো জীবনের জয়, —যৌবনেরও জয় বৈ কী নারীর জীবনে!

সৃষ্টির আসনে বসে অনেক আত্মজিজ্ঞাসার পরে অন্নদাশঙ্কর দৃঢ় সিদ্ধান্ত করেছিলেন। —"প্রথম কর্তব্য...অমৃত মন্থন।" অর্থাৎ শিল্পীকে ভেবে দেখতে হবে "যা লিখেছ তা কি অমৃতরুচি?"[১৫] অমৃত বলতে নৈতিক বিশুদ্ধতা অথবা বৈষয়িক সাফল্য-অসাফল্যের চিন্তা মোটেই প্রাসঙ্গিক নয় অন্নদাশঙ্করের পক্ষে। তাঁর মুখ্য ভাবনা বিশ্বজনীন জীবন ও যৌবনের জয়গান রচনা। তাই তাঁর সৃষ্টিতে নৈতিক শুচিবায়ুগ্রস্ততা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তিনি জানেন, "যে সমুদ্রে অমৃত থাকে, সেই সমুদ্রে গরলও থাকে।"[১৬] তাই অমৃতের অমিয়স্বাদুতাকে গাঢ়তর অনুভবনীয়তার সীমায় উজ্জ্বল

১৫। অন্নদাশঙ্কর রায়—'বিনু'—'জীবনশিল্পী'। ১৬। অন্নদাশঙ্কর রায় 'সৃষ্টির দিশা'—'তারুণ্য'।

করে তোলার কলা-কৌশল হিশেবেই তিনি যেন প্রায়ই গল্পের প্লটকে উপস্থিত করেছেন গরলময় জীবনের বিপরীত পরিপ্রেক্ষিতে। ফলে, নগ্ন রুগ্নতাকেও সম্পূর্ণ অনাবৃত ভাষায় প্রকাশ করতে তাঁর কুণ্ঠা নেই বিন্দুমাত্র। এখানে তিনি বরং 'আধুনিক'দের সগোত্র। এই সূত্রেই স্মরণ করা যেতে পারে,—'বেদে' প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমারকে লেখা রবীন্দ্র-পত্রের যৌনতা সম্পর্কিত ইঙ্গিতের বিরোধিতা করেছিলেন তরুণ অন্নদাশঙ্কর বিলাত থেকে।[১৭] তাহলেও এই সাদৃশ্য-কল্পনা আসলে অসামান্য দূরত্ব আর স্বাতন্ত্র্যেরই দ্যোতক। অন্নদাশঙ্কর বলেছেন, অমৃতসমুদ্রে গরলের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে "দেবতারা একটুও চিন্তিত হয় না; তাদের মধ্যে এমন প্রাণবান্ পুরুষের অভাব হয় না যিনি গরলটাকে কণ্ঠে ধারণ করতে প্রস্তুত।" এই দুর্লভ পৌরুষ শক্তিতেই কল্লোল-যুগ-প্রবাহে তিনি স্বতন্ত্র তটরেখার দিশারি;—উদ্ভিন্ন যৌবনের তলশায়ী যৌনতার গরলকে যিনি আপন সৃষ্টির মধ্যে পূর্ণ মূর্তিতে চিত্রিত করেও তার অবাঞ্ছিত গ্লানিটুকু সংহরণ করে নিয়েছেন পরিণামী রসফলশ্রুতির উন্মোচন লগ্নে। তাই নিষিদ্ধ জীবনপথের পরিক্রমায় তাঁর লেখনী আশ্চর্য দুঃসাহসিকতায় অনাবৃত এবং সর্বত্রই অবারিতও।

'দুকানকাটা' গল্পের নায়ক সুকু—সুকুমার যার পুরো নাম। তার পরিচয় দিয়ে শিল্পী লিখেছেন,—"গৌরবর্ণ সুঠামতনু, একটুও অনাবশ্যক মেদ নেই, অথচ প্রতি অঙ্গে লালিত্য। চাঁদের পেছনে যেমন রাহু, তেমনি চাঁদপানা ছেলেদের পিছনে রাহুর দল ঘুরত। তাদের কামনার ভাষা যেমন অশ্লীল, তেমনি স্থূল! তাদের স্থূল হস্তাবলেপে সুকুর আঁচড় লাগত।" অসুস্থ যৌনাচরণের এই নিরাবরণ বর্ণনাতেও শিল্পী অকুণ্ঠ, কারণ জীবন ও যৌবনের বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতার প্রত্যয়ে তাঁর নিরাবেগ মনন দৃঢ় অন্বিত।

এই সুকুমার ছিল লেখকের সহপাঠী,—তাহলেও বিদ্যার সাধনা যে তার অনাহত ছিল না, সে কথা বলাই বাহুল্য। পারিপার্শ্বিকের মত বাড়ির পরিবেশও সুস্থ ছিল না খুব। তার বাপের হাতে মার খেয়ে সুকুর মা চলে গেলেন নিজের ভাইএর বাড়িতে, —সুকুও সঙ্গে গেল মাকে নিয়ে মামার বাড়ি। সেখানে তার 'বকে যাবার' পথ আরো নির্বারিত হল। ইতিমধ্যে সুকুর পিতা দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেছেন। কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌছে তিনি আবার হলেন বিপত্নীক। অতএব, তৃতীয়বার বিবাহের চেষ্টা না করে প্রথমা পত্নীর মনস্তুষ্টি বিধানই সমুচিত বলে বিবেচনা করলেন। ফলে, দীর্ঘদিন পরে মা'র সঙ্গে সুকু আবার পিতৃগৃহে অধিষ্ঠিত হল। এবারে নতুন যত্ন,—তাকে দশজনের মত করে তোলার জন্য নতুন প্রয়াস চললো একান্ত ভাবে।

১৭। দ্রষ্টব্য—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত: 'কল্লোলযুগ'।

কিন্তু ততদিনে সুকু দশের বার হয়ে গেছে। অবশেষে ঘর ছেড়ে পথেই বেরিয়ে পড়ল সে।

মজ্‌নু ফকির তার গুরু,—সারী বোষ্টমী তার শ্রীরাধিকা। অপূর্ব অমৃতময় কণ্ঠস্বর সারীর, আশ্চর্য গাইতে পারে—বয়সে সুকুর চেয়ে সে রীতিমতো বড়। তবু সুকু হল সারীর শুক। সুখ-দুঃখের বিচিত্র লোভলালসাভরা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ঘাটে ঘাটে ফিরে অবশেষে তারা শহরে পৌছায়। সেখানেও বিচিত্র লোভ আর বঞ্চনার অনুভব সঞ্চিত হয় সুকুর চেতনায়,—সারীর গান চারদিকে উন্মত্ত মধুকরদের উতলা করে তোলে। একের পর এক সে বিচিত্র সুদীর্ঘ উপাখ্যান। অবশেষে সারীর কণ্ঠে মরমিয়া লোকসংগীত শুনে মুগ্ধ হন য়ুরোপীয় পর্যটক; ক্রমশ সারীর গান রেকর্ড হল,—ফিল্‌ম্‌-এ জায়গা পেল,—তারপরে তার বিয়ে হয়ে গেল কলকাতার এক অভিজাত পরিবারে। তা সত্ত্বেও সুকু কিছুতেই ছেড়ে যেতে পারে না সারীকে। উপেক্ষিত পুরাতন ভৃত্যের মত দূর হতে সারীর ছায়ার অনুসরণ করে ফেলে। তবু পৌরুষ তার বিদ্রোহ করে ওঠে না,—কারণ 'ও যে রাধা!'

স্বাধীন জীবন-যৌবন,—তথা সর্বসংস্কার-মুক্ত স্বাধীন প্রেমের আরো এক অভিনব অভিব্যক্তি চিহ্নিত হল এই গল্পান্তে। এই একই সূত্রে বাংলার মরমিয়া সাধনায় পরকীয়া ভজনার ভাব-সাযুজ্যটুকুও অনুভব করবার মত। কিন্তু অনেক কিছুর সঙ্গে সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও মূল পরিকল্পনার অনন্যতুল্য স্বাতন্ত্র্যটুকু লক্ষ্য না করে উপায় নেই। এই প্রসঙ্গেই অন্নদাশঙ্করের প্রয়োগসিদ্ধির বৈশিষ্ট্যটুকুও অনুধাবন করে দেখতে হয়। প্রমথ চৌধুরীর গল্প-শৈলীর সঙ্গে এখানে তাঁর প্রকরণ বহিরঙ্গে বহুল সদৃশ। এই উপলক্ষে স্মরণ করা যেতে পারে, প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারি কথা' পড়েই কিশোর শিল্পীর মনে সাহিত্যসৃষ্টির স্পৃহা অদম্য হয়েছিল,—'চার ইয়ারি কথা' তাঁর দৃষ্টিতে বাংলা ছোটগল্পের আঙ্গিক-সম্পূর্ণতার এক সার্থক দিগন্ত।[১৮] 'চার ইয়ারি কথা', তথা অপরাপর প্রমথ-গল্পের মতই প্লটের বিস্তার, বৈচিত্র্য এবং শৈথিল্যই অন্নদাশঙ্করেরও প্লট্-পরিকল্পনার বিশিষ্টতা; একই গল্পের শরীরে একাধিক ছোটগল্পের সম্ভাবনা যেন অন্তর্নিহিত হয়ে রয়েছে। যেমন পূর্বোক্ত 'উপযাচিকা' গল্পে বৃন্দাবন-কাহিনী এবং সুবর্ণ-কথা পৃথক্ দুটি ছোটগল্পের উপকরণকে ধারণ করে রয়েছে; এমন কি সুবর্ণ-প্রসঙ্গীয় প্লট্‌কে নিয়েও একাধিক ছোটগল্প গড়ে তোলা অসম্ভব ছিল না। 'দুকান কাটা' গল্পে তো আরো স্পষ্টভাবেই একাধিক শিথিলসূত্র উপাখ্যানকে এক অভিন্ন গল্পের শরীরে গ্রথিত করা হয়েছে। সুকুর পিতৃমাতৃ-প্রসঙ্গে একটি স্বতন্ত্র

১৮। দ্রষ্টব্য: অন্নদাশঙ্কর রায়—'বীরবল'—'জীবনশিল্পী'।

গল্পের উপকরণই নয় কেবল,—মূল উপাখ্যানের সঙ্গে ঐ সুবিস্তারিত কাহিনী কোনো অনিবার্য সূত্রে সন্নিহিত নয়। তাছাড়া শুক-সারীর জীবনকথাও বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিক সার্থক ছোটগল্পের পৃথক্ পৃথক্ শরীর গড়ে তুলতে পারত।

প্লটের এই বিস্তার এবং বৈচিত্র্য প্রমথানুমত। শুধু তাই নয়, আরো একদিক থেকে অন্নদাশঙ্কর গল্প-শিল্পী প্রমথ চৌধুরীর মুগ্ধ শিষ্য। কথকতার শিল্পকেই কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কলাকৌশল বলে তিনি স্বীকার করেছেন বীরবল-প্রসঙ্গীয় আলোচনায়।[১৯] কিন্তু আমাদের দেশীয় কথকতায় বাগজাল বিস্তারের যে খেলা—ধ্বনি ও শব্দ-বিন্যাসের যে চতুরতা প্রমথ চৌধুরীও অবহিতচিত্তে অনুসরণ করেছেন, অন্নদাশঙ্করে তা সচেতনভাবেই অনুপস্থিত। তা সত্ত্বেও, কথার বাঁধুনি,—সুমিত, সমুচিত বাক্‌গ্রন্থনেই অন্নদাশঙ্করের গল্প এক অখণ্ড স্বাদুতায় ভরে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে আরো স্মরণীয়, প্রমথ চৌধুরীর মত নিটোল গল্পরসকে গড়ে তুলতে তুলতে হঠাৎ ভেঙে ছড়িয়ে চুরমার করে দেবার খেয়াল অন্নদাশঙ্করের শিল্পস্বভাবে নেই। বরাবর তিনি কামনা করেছেন—"সাহিত্যে মানবজীবনের সমগ্র রূপ ধরা দিক। সমগ্র সুর বেজে উঠুক।"[২০] ছোটগল্পের ক্ষীণ শরীরে মানবজীবনের সামগ্রিক রূপ ধরানো সম্ভব নয়। কিন্তু সামগ্রিকতার সুর অন্নদাশঙ্করের প্রায় সকল গল্পের স্বাদুতার সাধারণ উপাদান। এই সুর শিল্পীর মনন-প্রত্যয়ের প্রগাঢ় সংহতি দিয়ে রচিত। ফলে আকার এবং উপাখ্যান-বৈচিত্র্যে তাঁর গল্পগুলি ছোটগল্পের প্রকৃতি, এবং এমনকি পরিমাণকেও যদি অতিক্রম করে থাকে, তবু এই সমগ্র জীবন-সুরধ্বনির ঝঙ্কার এক অখণ্ড অবিভাজ্য সংহতিতে যেন ভরে তুলেছে অন্নদাশঙ্করের গল্পের পরিণামী রসস্বাদুতাকে।

সৃষ্টির শরীরে এই স্বাদুতার স্পর্শ জেগেছে বিশুদ্ধ কথাসাহিত্যের আঙ্গিককে আশ্রয় করে। কথাসাহিত্য narrative art, এই তথ্য সম্পর্কে লেখকের শিল্পি-মানস সদা-জাগ্রত-চেতন। তাই কথার রসকে বিস্রস্ত হতে দেননি তিনি গল্প-শরীরের প্রায় কোনো অংশেই। কথার চটক নেই কোথাও, সেকথা লক্ষ্য করেছি আগেই,—প্লটের গতি সহজ সচ্ছন্দ ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে বর্ণনা এবং তার ফাঁকে ফাঁকে স্বতো-সঞ্চারী সংলাপের মাধ্যমে। কিন্তু সে সংলাপে নাটকীয়তার স্পর্শ লাগেনি প্রায় কোথাও, যেমন বর্ণনা কখনোই নীরস বিবৃতিমাত্রে পর্যবসিত হতে পারেনি প্রায় কখনো। 'উপযাচিকা', অথবা 'দুকানকাটা' থেকে লেখকের ভাষা যতটুকু উদ্ধার করেছি, তাতেই স্পষ্ট অনুভূত হতে পারবে,—অন্নদাশঙ্করের বর্ণনা সর্বত্রই প্রাণরস-সমৃদ্ধ—তাই কখনোই গতানুগতিক নয়। কোথাও শ্লেষ-বক্রোক্তি,

১৯। দ্রষ্টব্য: তদেব। ২০। অন্নদাশঙ্কর রায়—'বিনুর বই'।

কোথাও অনুভব-প্রগাঢ়তা, কোথাও সূক্ষ্ম মননশীল স্রোতস্বিনীর বিচিত্র প্রবাহে স্পষ্ট আঙ্গিকের তীররেখা এঁকে এগিয়ে চলেছে এ-ভাষা। অন্নদাশঙ্করের গল্পের ভাষাকে স্রোতময় বললে অন্তঃস্রোত ব্রহ্মপুত্রের কথা মনে পড়ে,—বাইরে থেকে তার টান অনুভব করবার উপায় নেই, কিন্তু স্রোতের মধ্যে যখন ঝাঁপিয়ে পড়ি তখন সর্বাঙ্গ,—সমস্ত চেতনা দিয়ে অনুভব করি সেই অনিবার্য শক্তির আকর্ষণ। এই বৈশিষ্ট্যের গুণেই তাঁর গল্পে উপাখ্যানের বাঁধুনি শিথিলগ্রন্থি হলেও, তার রসসংহতি প্রগাঢ়,—অর্থাৎ যথাপরিমিতের চেয়ে কম বা অতিরিক্ত নয় একটুও। স্বতন্ত্র একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।—

'হাসনসখী' গল্পে নীলাদ্রির সঙ্গে চাঁপার এক অসাধারণ হৃদয়-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল—যাকে প্রেম বলেই ভুল করেছিল শঙ্কর। তাই জীবনের এক দুর্লভ স্পর্শকাতর অনুভবকে বন্ধুর কাছে উন্মোচিত করে নীলু বলে,—

"শঙ্কর, তুই বিদ্বান, তুই কবি। কিন্তু বিদগ্ধ নস্। কখনো ভালবেসেছিস্ কিনা সন্দেহ। যদি কোনোদিন বাসিস্ তাহলে দেখবি দুরকম ভালবাসা আছে। সখার সঙ্গে সখীর। প্রিয়ার সঙ্গে প্রিয়ের। চাঁপার সঙ্গে আমার ভালোবাসা দ্বিতীয় পর্যায়ের নয়; কোনো দিনই ছিল না, তুই ভুল বুঝেছিলি।"

অবশ্য তাই বলে এ ভালোবাসা ভাইবোনের মত নয়। নীলু বলে—"চাঁপাকে আমি বোন বলে ভাবতে পারিনে। ও আমার সখী, সই, সহেলী। এই যেমন তোর সঙ্গে আমার সখ্য, তেমনি ওর সঙ্গেও। তুই কি আমার ভাই? ভাইএর কাছে কি সব কথা বলা যায়? তুই আমার সুহৃৎ, তাই তোর কাছে আমার লুকোবার কিছু নেই। তেমনি চাঁপার কাছে।"

কত দুরনুভবনীয় এই উপলব্ধি, অথচ কত স্পষ্ট! কথার পিঠে কথা যেন মহুয়ার আঁটা দিয়ে গাঁথা হয়ে গেছে; এর সবটুকুই চিত্তবৃত্তির সৃষ্টি নয়, অনির্বচনীয় হৃদ্‌ভাবনাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্পষ্টতা দিয়েছে চিদ্‌বৃত্তির স্বচ্ছ আলোক; মনের সঙ্গে মননের গ্রন্থিবন্ধন হয়েছে যথাপরিমিতির সূত্রে। এর একটুও পরিবর্জন অথবা পরিবর্ধন করার উপায় নেই,—করলে হয় বক্তব্য অস্পষ্ট রহস্যাচ্ছন্ন হবে,—না হয় তার classical ঋজু স্পষ্টতা এলায়িত হবে ভাবুকতায়। এর কোনোটিই অন্নদাশঙ্করের পক্ষে সম্ভব নয়। এখানেই তাঁর অতুলনীয় স্বাতন্ত্র্য এবং সীমায়তিও।

সীমায়তি বলেছি অন্নদাশঙ্করের রচনার সমকালীন আবেদন-ব্যাপ্তির প্রতি লক্ষ্য করে। তাঁর সৃষ্টির ধারা অনিবার্য, কিন্তু অফুরন্ত প্রচুর নয়,—একথা শিল্পী নিজেই স্বীকার করেছেন,—

"আমি ভালোবেসেছি। কখনো নারীকে, কখনো শিশুকে, কখনো অপরিচিতকে, কখনো দেশকে, কখনো বিদেশকে। কখনো আইডিয়াকে, কখনো আইডিয়ালকে। আমি ভালোবেসেছি মানুষকে ও মানুষের পরে প্রকৃতিকে। সেই ভালোবাসা আমার হাতে ধরে লিখতে শিখেয়েছে, হাতে ধরে লিখিয়েছে। আমি তোমার সৌখীন লেখক নই। না লিখলেও যার চলে। অথবা নই পেশাদার লেখক না লিখলেও যার চলে না।"[২১]

সেই সঙ্গে অন্নদাশঙ্কর একথাও অনুভব করেছেন যে, মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের একটা মননশীল বৃত্তসীমার বাইরে তাঁর রচনার আবেদন ব্যাপ্ত নয়। তার কারণ এই নয় যে, এই মনন-সমৃদ্ধ শিল্পীর রচনায় প্রত্যক্ষ জীবনবোধের অভাব বা আড়ষ্টতা রয়েছে। কিন্তু অন্নদাশঙ্করের পরিমিতি-সচেতন মনন-জীবনকে যে পরিস্ফুতি দান করেছে, তাতে তার বহিরঙ্গ পৃথুলতা, অথবা মাংসল উত্তাপ উত্তেজনার স্তরকে অতিক্রম করে গেছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের মত রচনার মধ্যেও এক নিরাবেগ পরিমার্জনা রয়েছে যা আমাদের ধুলামাটির স্থূল জীবনকে চেনা-পৃথিবীর চেয়ে আরো একটু উর্ধ্বে টেনে নিয়ে গেছে, যেখানে স্বর্গ গড়া হবে না কিছুতেই মানুষের হাতে, কিন্তু যথার্থ মানুষের পৃথিবী চিরদিন গঠিত হতে থাকবে। যথার্থ মানুষ আর রক্ত-মাংসের শরীর-সীমায় বন্দী জৈব মানুষ অভিন্ন নয়। জীবদেহের চিরন্তন মন্দিরে বসে দেশকালের হাতে গড়া জৈবতার পিঞ্জর ভাঙ্‌বার সাধনা সে মানুষের। এই আকাঙ্ক্ষার পলিমাটিতেই সূচিত হয়েছে বুঝি 'কল্লোলে'র কালেরও ক্ষীণ দুর্বল তটরেখা। অন্নদাশঙ্কর তাঁর ব্যক্তিক সাধনা ও সিদ্ধির মূল্য দিয়ে সেই তটদিগন্তের এক অনতিপরিচিত আভাস রচনা করেছেন,—অনাগত কালের বাঙালি পাঠকের পক্ষে যা হয়ে উঠতে পারে সার্বিক সম্পদ। অন্তত শিল্পীর দৃঢ় বিশ্বাস তাই। যেদিন নিরক্ষর-বহুল বাংলা দেশের সকল পাঠক মনোধর্ম ও মননশক্তির একটা বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত হবে, সেদিনকার কথা ভেবে অমৃত-সন্ধানে অতন্দ্র প্রয়াসী হয়ে আছেন শিল্পী অন্নদাশঙ্কর। অব্যবহিতের জন্য চিরন্তনকে তিনি বিসর্জন দিতে পারেন না।—তাই আজকের ধুলামাটির বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে শিল্পীর গল্প-কল্পনা এবং রচনায় রক্তমাংসের উষ্ণতা যদি অগভীর অপ্রচুর বলেও মনে হয়, তবু বিশ্বব্যাপী ধূলিলীন মানব-জীবন একদিন মনের এবং মননধর্মের শক্তিতে শিল্পীর সাধনার জগতে উত্তীর্ণ হবে, সেই পরম ভরসায় অন্নদাশঙ্করের অপরাপর সৃষ্টির মত তাঁর ছোটগল্পগুলিও যেন সীমার মাঝে অসীমের

২১। অন্নদাশঙ্কর রায় 'বিনু'—'জীবন শিল্পী'।

এক অনুদ্বেল সুরসুরভিত আস্বাদনীয়তা বহন করে ফিরছে।—এখানেই যথার্থভাবে তাদের চিরকালীনতারও আশান্বিত প্রতিশ্রুতি।

এঁর গল্প-সংকলনগ্রন্থগুলির মধ্যে আছে—প্রকৃতির পরিহাস (১৯৩৪), দু'কান কাটা (১৯৪৪), হাসন সখী (১৯৪৫), মন পবন (১৯৪৬), যৌবন জ্বালা (১৯৫০), কামিনীকাঞ্চন (১৯৫৪), রূপের দায় (১৯৫৮), গল্প (গল্প-সংকলন—১৯৬০) ইত্যাদি।

বনফুল [বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়]

বাংলা সাহিত্যপাঠকের চোখে বনফুল—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯) যাঁর ব্যক্তি-নাম—আজও এক বিস্ময় আর অনপনেয় রহস্য। তাঁর সৃষ্টিতে বিস্ময়ের দিকটি সার্থক ব্যাখ্যাত হয়েছে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচারদৃষ্টিতে :—"বনফুলের রচনায় পরিকল্পনার মৌলিকতা, আখ্যানবস্তু-সমাবেশে বিচিত্র উদ্ভাবনীশক্তি, তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মধ্য দিয়া মানব-চরিত্রের যাচাই পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করে।"[২২] সে বিস্ময়ের ঘোর আজও কাটে নি—বস্তুত বনফুলের রচনায় মুগ্ধতার উপকরণ যতটুকু, সে ঐ অনির্মোচনীয় বিস্ময়-চমকে গড়া। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে বিস্ময়ের চেয়েও প্রগাঢ় যে রহস্যগ্রন্থি বারে বারে চেতনাকে আকর্ষণ করে, অথচ প্রায় কখনোই যার মূল স্পর্শ করা যায় না, তার উৎস রয়েছে শিল্পীর ব্যক্তি-সত্তার গভীরে নিহিত। সেই মূলভূমি থেকে সৃষ্টিধারার অনুবর্তন না করলে পরিণামী রসসত্যের মোহানায় পৌছানো দুঃসাধ্য। শিল্পী নিজে বলেন,—"একজন পাশ্চাত্ত্য মনীষী কাব্যকে Interpretation of life বলিয়াছেন! কথাটা সম্পূর্ণ হইত Poet's interpretation of life বলিলে।"[২৩] বনফুলের সকল সৃষ্টিই আসলে 'Poet's' interpretation of life'—এমন কি বিশেষ অর্থে ব্যক্তি-কবিরই জীবন-ব্যাখ্যা। অতএব, ব্যক্তিকে না জানলে কবিকে, কাব্যকে,—তার সার্থক রসমূল্যের পটভূমিকে আবিষ্কার করা অসম্ভব। কাব্য অর্থে পূর্বোক্ত প্রসঙ্গে বনফুল নিজেই ব্যাপকভাবে সকল রকমের সৃজনী সাহিত্যকে বুঝেছেন,—আমরাও বনফুলের সকল সৃজনশীল অভিব্যক্তিকেই কাব্য-প্রকাশ বলে সাধারণভাবে স্বীকার করে নিচ্ছি।

বস্তুত প্রমথ বিশীর মতই স্রষ্টা বনফুল বিচিত্রচারী! স্কুলের শিক্ষাকাল থেকেই তিনি প্রতিষ্ঠিতনামা লেখক, যদিও সে স্কুল শান্তিনিকেতনের কবিতীর্থ ব্রহ্মচর্যাশ্রম ছিল

* গল্প-সংকলনের তালিকা শিল্পী দাক্ষিণ্যে প্রাপ্ত। ২২। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (৩য় সং)। ২৩। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—'কাব্যপ্রসঙ্গ' [প্রবন্ধ]—'শিক্ষার ভিত্তি'।

না। অন্যান্যের মধ্যে সেকালের সাহিত্যিক বাসনার স্বপ্ন-স্বর্গ 'প্রবাসী' পত্রিকাতেও এই 'স্কুলের ছেলে'র কবিতা প্রায় নিয়মিত প্রকাশিত হত। কালে কালে সেই কবিকীর্তি ক্রমশই বলিষ্ঠ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। বস্তুত সেই প্রগত ধারার অনুবর্তনেই একদিন দেখা দিয়েছিল বনফুলের ছোটগল্প,—আশ্চর্য ছোট ছোট আকারের অভিনব গল্প; ডঃ সুকুমার সেন যাকে ইংরেজি সাহিত্যের 'five minutes' short story' এবং আমেরিকার 'short short'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।[২৪] ছোট কবিতার মত বনফুলের ছোট-গল্পেরও প্রথম প্রকাশ 'প্রবাসী' পত্রিকায়,—১৩২৯ বাংলা সালের আশ্বিন সংখ্যায়—'চোখ গেল' নামে! লেখক তখন কলকাতা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসাশাস্ত্রের ছাত্র।

বাংলা সাহিত্যে বনফুলের ছোট গল্পগুলি এক অপরূপ বিস্ময়,—সে কেবল ঐ আশ্চর্য বাক্‌সংক্ষিপ্তির কল্যাণেই নয়,—শৈলী এবং ভাবানুসঙ্গে এমন এক অনির্বচনীয় রহস্যকরতা রয়েছে, যার অদৃশ্য প্রভাবে স্বল্পকথার সর্বাঙ্গ ঘিরে বচনাতীতের এক মৌন স্পর্শ যেন নিরন্তর গুঞ্জন করে ফেরে। সে প্রসঙ্গ পরে, তারও আগে লক্ষ্য করতে হয় কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে বনফুল মৌনমুখরতার এক আশ্চর্য বৈপরীত্য-রহস্য রচনা করেছেন। তাঁর অনেক ছোট গল্পই যেমন শারীরিক পরিধিতে অতিশয় ছোট, তেমনি 'জঙ্গম', 'ডানা', 'স্থাবর' প্রভৃতি উপন্যাসের প্রত্যাশাতিরিক্ত বিস্তারও বাংলা সাহিত্যের অভ্যস্ত অভিজ্ঞতার পক্ষে চমকপ্রদ। গল্পে-উপন্যাসে তাঁর আঙ্গিক-চিন্তা নিয়ত-নূতন, অবিশ্রান্ত।

নাটকের জগতে তেমনি বিস্ময় এনেছে 'মধুসূদন' ও 'বিদ্যাসাগর',—বাংলা জীবনী-নাট্যের প্রকরণে এরা নূতন পথের নির্মাতা। 'রূপান্তর', 'মন্ত্রমুগ্ধ', 'কঞ্চি' প্রভৃতি নাটকের বিষয় এবং শরীরেও লক্ষ-যোগ্য বিস্ময়-চমক রয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'মন্ত্রমুগ্ধে'র মুগ্ধ পাঠক ছিলেন 'শনিবারের চিঠি'তে ক্রমপ্রকাশমানতার কালে। ঐ সময়েই লেখককে এক পত্রে [নবমী, ১৩৪৫ সাল] কবি জানিয়েছিলেন,—"তোমার মন্ত্রমুগ্ধ পড়ছি। পরিহাসের পথে তোমার কলম ছোটে লাফ দিয়ে।" পরের পত্রেই [৭।১০।৩৮ খ্রীস্টাব্দ] আবার লিখ্‌ছেন, "তোমার মন্ত্রমুগ্ধ ঠিক লাইন ধরে চলেছে, derailed হবার আশঙ্কা নেই।"[২৫]

২৪। দ্রষ্টব্য—ডঃ সুকুমার সেন—'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'—চতুর্থ খণ্ড।

২৫। বনফুলকে লেখা কবির দুটি অপ্রকাশিত চিঠি থেকে মূলত সংগৃহীত। শিল্পী পত্র দু'খানি স্বাধীন ব্যবহারের অধিকার দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে সকল রবীন্দ্র-পত্রই পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছে।

ফলকথা, বাংলা সাহিত্যে বনফুল বলাইচাঁদ টেক্‌নিক-বিশারদ্ পরিহাস-শিল্পী রূপেই সমধিক স্মরণীয় হয়ে পড়েছেন। এই প্রসঙ্গে বনফুলের ব্যঙ্গকবিতার কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। কেবল ব্যঙ্গগুণেই নয়, অঙ্গ-প্রকৃতিতেও তারা নূতন স্বাদুতার অনুভব-বহ। এইসব সূত্রেই এমন কি ছোটগল্পের আলোচনা কালেও পরিহাসরসিক, আঙ্গিক-বিদগ্ধ হিশেবেই মাঝে মাঝে তাঁর শিল্প-মহিমা বিঘোষিত হয়ে থাকে। বস্তুত এখানেই সৃষ্টির বহিরঙ্গ রূপ-চমৎকারিতার চটকে ঐন্দ্রজালিক বনফুল নিজের যথার্থ শিল্পি-স্বভাবটুকুকে আবৃত করে রেখেছেন।—তাঁর সৃজনলোকে ঐটুকুই আজ পর্যন্ত অনপনীত রহস্যকরতার উৎস।

সে উৎস নিহিত রয়েছে স্রষ্টার ব্যক্তিত্বের গহনে, যার পরিচয় তাঁর রচনার মধ্যে দুঃসন্ধেয় রহস্যে আচ্ছন্ন এবং অন্যত্র প্রায় অলভ্য। ছাত্রজীবন থেকে অভিন্নহৃদয়, এমন কি মেস্-জীবনের অভিন্ন-কক্ষ বন্ধু পরিমল গোস্বামী বনফুলের ব্যক্তিত্বে 'একটা বৈপ্লবিক স্বাতন্ত্র্যের' পরিচয় নির্দেশ করে লিখেছেন, "তাঁর নিজের সম্বন্ধে কে কি ভাবছে বা বল্‌ছে তা সে তার অসাধারণ ঔদাস্যে অগ্রাহ্য করে চলার এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত আমার সামনে মেলে ধরেছিল।" এই খাপছাড়া ঔদাসীন্যের উৎস সঙ্কেত করে পরিমল গোস্বামী আরো লিখেছেন,—"বলাই আত্মসচেতন ছিল না।"[২৬] এই আত্মসচেতনতার অভাব কেবল দুটি প্রেরণা বশে সূচিত হতে পারে—এক, স্বভাব-লজ্জাতুর দুর্বলের আত্মবিলয়ের প্রয়াস, আর এক দৃঢ় তীক্ষ্ণ আত্মপ্রত্যয়ের উৎস-সঞ্জাত। বনফুলের আত্মসংহরণ প্রগাঢ় শক্তিপ্রাচুর্য—তথা, নিজের অন্তঃশক্তি সম্পর্কে শিল্পীর অবিচল আত্মপ্রত্যয়েরই এক আশ্চর্য অভিব্যক্তি।

বস্তুত সৃষ্টির জগতে বনফুলের কর্মকুশলতা যেন বিশ্বশিল্প-ধর্মেরই অ-সচেতন অনুসারী। বারে বারে বলেছি, সকল যথার্থনামা সৃষ্টিই আসলে স্রষ্টার আত্মরচনা। এমন কি নিজ নিঃসঙ্গ অপূর্ণতার বেদনালোকে পূর্ণতার প্রত্যাশা তথা আত্ম-আবিষ্কারের উৎকণ্ঠাবশেই বিশ্বের একতম বিধাতা নিজে বহু হয়ে তবেই প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন।—অর্থাৎ, বিশ্বসৃষ্টি আসলে একমেবাদ্বিতীয় বিশ্বশিল্পীর বহুধা আত্মবিচ্ছুরণেরই সৌন্দর্য-ফলশ্রুতি। সেই নিরবধি সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে তবু খুঁজে পওয়া যায় না কোথাও। সৃষ্টির সর্বাঙ্গে তাঁর আনন্দ-বাসনা শিশু-অঙ্গে মাতৃস্নেহের মত জড়িয়ে থেকে তার রস-সৌন্দর্যকে অবিরত করেছে। অথচ অবহিত মনে উপলব্ধি না করলে সেই অনন্ত আনন্দ-উৎসের মূলভূমি লক্ষ-গোচর হয় না। মনে হয়, সৃষ্টি বুঝি এক অফুরন্ত স্বতঃস্ফূর্ত ধারা, নিজ অসংবৃত বস্তুপুঞ্জের অনিবার্য আঘাত-সংঘাতে

২৬। পরিমল গোস্বামী—'স্মৃতিচিত্রণ'।

যার তরঙ্গ-সঙ্কুলতা চলতে থাকে অবিরাম। বনফুল সম্পর্কেও অনুরূপ বিভ্রান্তি অসম্ভব নয়,—অন্তত ছোটগল্পের জগতে শিল্পীর সৃজন-সত্য এক অপরূপ কৌতুক-রহস্যে আবৃত হয়ে আছে অনেকটা এই কারণেই। আর এই বিভ্রান্তি রচনার দায়িত্ব স্রষ্টার নিজেরও কিছু কম নয়। বস্তুত সৃষ্টির নিভৃত পরম লগ্নে তাঁর মগ্নচৈতন্য নিজ শক্তির অমোঘতা সম্পর্কে এমন দৃঢ়প্রত্যয় যে, সৃষ্টি-বিলগ্ন হবার জন্য স্রষ্টাকে কখনোই আত্ম-সচেতন হতে হয় না। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সখেদে বলেছেন, "তাঁহার শক্তিমত্তার চিহ্ন সর্বত্র সুপরিস্ফুট, কিন্তু শক্তির সহিত শক্তি-প্রয়োগে ঔদাসীন্য ও অবহেলার ভাবও মিশিয়া আছে।"[২৭] এখানে স্রষ্টার শক্তি-প্রয়োগ অর্থে স্রষ্টার আত্ম-বিনিয়োগ, তথা self-exertion কিংবা exertion of the ego-র কথা মনে করা যেতে পারে। আর বস্তুত বনফুলের গল্প-উপন্যাসে শিল্পিব্যক্তির গোপনচারিতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিল্পীর আত্মিক অনুপস্থিতি বলেও প্রতিভাত হয়। মোহিতলাল মজুমদারও বস্তু-কঠিন নিষ্প্রাণ প্রকৃতিবাদিতার মায়াচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন বনফুলের কথাসাহিত্য-রচনায়।[২৮]

কিন্তু আন্তরিক আকাঙ্ক্ষায় বনফুলও একালের আরো বহু সার্থক শিল্পিসতীর্থের মতই অমৃতপিপাসু,—একান্ত আনন্দবাদী; সে স্বীকৃতি রয়েছে তাঁর নিজেরই উপলব্ধিতে—

"সুখের সন্ধানে যখন আমরা তোলপাড় করিয়া বেড়াই, জ্ঞানবিজ্ঞান গুরুবন্ধু অর্থসম্পদ কেহই যখন আমাদের সুখের সন্ধান দিতে পারে না, তখন কবির কাছেই আমরা কেবল সুখের সন্ধান পাই।"

কারণ "চতুর্দিকে যখন হতাশা, চতুর্দিকে যখন অন্ধকার, তখন একমাত্র কবিই বলিতে পারেন—অন্ধকার সত্য নয়, অন্ধকারের পরপারে আমি জ্যোতির্ময় পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"[২৯]

অন্তত ছোটগল্পের সৃজনলোকে বনফুল একান্তভাবে এই জ্যোতিস্তীর্থেরই অভিসারী :—তাঁর লেখা প্রথম গল্পেও সেই সত্যের সুনিশ্চিত স্বাক্ষর রয়েছে :—

"সাধারণের চোখে হয়ত সে সুশ্রী ছিল না। আমিও তাকে যে খুব সুন্দরী মনে করিতাম তাহা নহে—কিন্তু তাহাকে ভালবাসিতাম। তাহার চোখ দুটিতে যে কি ছিল তাহা জানি না। তেমন স্বপ্নময় সুন্দর চোখ জীবনে কখনও দেখি নাই। দুষ্টু বলিয়াও তাহার অখ্যাতি ছিল।

২৭। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'—৩য় সং।
২৮। দ্রষ্টব্য—মোহিতলাল মজুমদার—'সাহিত্য বিতান'।
২৯। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—'কাব্য-প্রসঙ্গ' : 'শিক্ষার ভিত্তি'।

সেই কুরূপা এবং চঞ্চলা মিনি আমার চিত্ত-হরণ করিয়াছিল। তাহার চোখ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। মনে আছে তাহাকে একদিন নিভৃতে আদর করিয়া বলিয়াছিলাম—ইচ্ছে করে তোমার চোখদুটো কেড়ে রাখি।

'কেন' ?

'ওই দুটোই ত আমাকে পাগল করেছে। আমি সবচেয়ে ওই দুটোকেই ভালবাসি'।

এত ভালবাসিতাম—কিন্তু তবু তাহাকে পাই নাই। অজ্ঞাত অপরিচিত আর একজন আসিয়া বাজনা বাজাইয়া সমারোহ করিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

প্রাণে বড় বাজিল।

কিন্তু সে বেদনা হয়ত মুছিয়া যাইত যদি সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মর্মান্তিক ঘটনা না ঘটিত।

মিনি যখন বাপের বাড়ি আসিল, দেখি, তাহার দুটি চক্ষুই অন্ধ। কারণ শোনা গেল যে চোখে গোলাপ জল দিতে গিয়া সে ভুলক্রমে আর একটা ঔষধ দিয়া ফেলিয়াছে।

আমার সঙ্গে আড়ালে একদিন দেখা হইয়াছিল। বলিলাম—'অসাবধানতার জন্যে অমন দুটি চোখ গেল'।

সে উত্তর দিল—'কেন যে গেল তা যদি না বুঝতে পেরে থাক তাহলে না জানাই ভাল'!"

জীবনকে নিয়ে এ কি ভীষণ-মধুরের লীলা-খেলা! বেদনা না তৃপ্তি,—শূন্যতা না প্রাপ্তি,—যন্ত্রণা না অমৃত,—কি পরিচয়ে অনুভব করা চলে এই গল্প-পরিণামকে? এই মৌলিক জিজ্ঞাসার সূত্রে বনফুলের গল্পপ্রসঙ্গ নিয়ে জীবন-রহস্যের তীরে এসে পৌঁছাতে হয়। দেশকালের ধারায় নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত জীবন-স্রোত যেন মন্থিত-প্রাণ সাগরকন্যা উর্বশীর মতই;—এক হাতে তার সুধাভাণ্ড, অপর হাতে বিষপাত্র আমূল উন্মোচিত। ওই দুই বাহুতলে সেই বিষামৃতের রাসায়নিক সংমিশ্রণে ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্ছে তার সৌন্দর্যালোক! জীবনের এই প্রথম গল্পেই অমৃত-যন্ত্রণার্ত জীবমূর্তির যেন আবরণ মোচন করলেন বনফুল।

পরিহাস-রসিক, মিতবাক্ গল্প-শিল্পীর যে পরিচয় আমাদের সুপরিজ্ঞাত, তাতে বনফুলের রচনা সম্পর্কে এই ভাবানুভব অতিশায়িতা-দোষে অভিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাঁর নিভৃতচারী শিল্পি-ব্যক্তিত্বের পক্ষে এই বিশ্বাস যে অমূলক

নয়,—তার সাক্ষী তাঁর নিজেরই রচনা। 'পাশাপাশি' নামে একটি কবিতা আছে বনফুলের :—

"ডাক ঘরে গিয়ে দেখি আমার নামেতে
আসিয়াছে দুটি চিঠি দুখানি খামেতে।
একখানি লিখেছেন বন্ধু একজন,
কন্যার বিবাহে মোরে করি নিমন্ত্রণ।
দ্বিতীয় সে চিঠিখানি, স্বজন আমার
লিখেছেন, ঘরে তার আজি হাহাকার ;
জামাইটি মারা গেছে দুদিনের জ্বরে,
বিধবা হয়েছে মেয়ে পনের বছরে।
মনে হল, এই দুটি ছোট ছোট লিপি,
হাসিছে আমার পানে মুখ টিপি টিপি।
পরম আত্মীয় দোঁহে-বসি পাশাপাশি—
গলাগলি করি আছে অশ্রু আর হাসি।"

বার পংক্তিতে সম্পূর্ণ কবিতাটির প্রথম আট পংক্তি শিল্পীর নিজের হাতের গল্পে লিখিয়ে নিতে পারলে বনফুলের গল্প-সংখ্যা বাড়তে পারত আরো একটি। শেষ চার ছত্রই আসলে কবিতা,—অর্থাৎ, বনফুলের নিজ ভাষায় "Poet's interpretation of life"। ছোটগল্পের শরীরে সেই জীবন-ব্যাখ্যা নিয়ে শিল্পী আত্মসংহরণ করে এমন এক নিভৃত দুর্লক্ষ্য গোপনতায় অবস্থান করছেন, যেখান থেকে স্পষ্টত তাঁকে খুঁজে বার করা প্রায় অসম্ভব। স্বভাবতই স্বল্প-কথার সীমায় সম্পূর্ণ গল্পের কথা-বস্তু যেখানে নিঃশেষিত, সেখানেও এক চকিত অতৃপ্তি-ভরে মনে হয় গল্প বুঝি 'শেষ হয়ে হইল না শেষ।' শিল্পীর আত্মসংহরণের কলাকৌশলে তাই এক বিশেষ আঙ্গিক সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই অর্থেই, পূর্বে বলেছি, শৈলী এবং ভাবানুষঙ্গে বনফুলের অত্যন্ত ছোট পরিসরের গল্পেও স্বল্পকথায় সর্বাঙ্গ ঘিরে যেন বচনাতীতের এক মৌনস্পর্শ অবিরাম গুঞ্জন করে ফেরে। 'চোখ গেল' গল্পান্তের সেই নির্বাক্ ব্যঞ্জনাকে যদি ভাষা দেওয়া কখনো সম্ভব হতো, তাহলে সেই একমাত্র ভাষা আর কিছুই নয়,—জীবনের পরমানুভবের বৃন্তে যেন "গলাগলি করি আছে অশ্রু আর হাসি।"

আসলে জীবনে যা অনিবার্যরূপে উপস্থিত, তারই কেবল আবরণ উন্মোচন করেছেন বনফুল। যেমন 'পাশাপাশি' কবিতায়, তেমনি 'চোখ গেল' গল্পে জীবন-দেখার কাহিনী এর চেয়ে সত্য ভাষায়, এর চেয়ে যথার্থ-বর্ণনে প্রকাশ করা অসম্ভব হত।

মাঝে মাঝে তাই মনে হয়, এ-যেন চোখে-দেখা জীবনের নৈর্ব্যক্তিক ফটোগ্রাফী। কিন্তু এপর্যন্ত আলোচনা থেকে প্রতিভাত হওয়া উচিত, বনফুল যে জীবনের অবিরাম সন্ধিৎসু, সে মৃন্ময় নয় চিন্ময়,—সে জীবন কেবল বস্তুসর্বস্ব নয়, শিল্পীর উপলব্ধি অনুসারেই 'জ্যোতির্ময়'-স্বভাব!—জ্যোতির্ময় অস্তিত্বের ফটোগ্রাফ যদি ধরতে হয়, তা হলেও জ্যোতিরুদ্ভাসী ক্যামেরার প্রয়োজন,—বনফুলের সৃষ্টিতে সেই ক্যামেরা তাঁর সৃজনশীল আত্মা। এখানেই বনফুলের সৃষ্টিতে অনুভবনীয় হয়ে ওঠে 'কল্লোল'-বাসনার তট-দিগন্ত,—আবার সেই অভিন্নসূত্রেই এসে পড়ে শিল্পীর প্রকৃতিতে বৈজ্ঞানিক প্রবণতার মৌলিক প্রসঙ্গও।

বৃত্তিসূত্রে বলাইচাঁদ চিকিৎসক। কিন্তু বৈজ্ঞানিক অন্বীক্ষা তাঁর মজ্জাগত; রোগীর সঙ্গে যুদ্ধ তিনি প্রায় করেন না,—রোগ-জীবাণুর অস্তিত্ব, প্রকৃতি, এবং বিচিত্র বিচরণশীলতা সম্পর্কেই তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কৌতূহল প্রায় অদম্য। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় চারদিকে বহমান অদৃশ্য জীবন-লোকের এক অন্তর্লীন নির্ভুল পরিচয় প্রতিদিন আহরণ করেন চিকিৎসক বলাইচাঁদ; আর শিল্পী বনফুল অচেনা অদেখা অব্যবহিত জীবনের অজস্র রূপ-চিত্রকে আহরণ করে আনেন আপন জ্যোতির্ভিক্ষু আত্মার অণুবীক্ষণ-যন্ত্র-তলে তাকে অনাবৃত করবেন বলে বিস্মিত বিমুগ্ধ পাঠকের মানস দৃষ্টির সামনে। আত্মাকে যন্ত্রে পরিণত করেন নি বনফুল,—যদিও সেই আশঙ্কাই করেছিলেন মোহিতলাল।—বরং দুর্লভ দৃঢ়তায় যন্ত্রের যথাপরিমিতি ও যাথাযাথ্যকে আত্মিক নির্ভুলতার সঙ্গে সমাহরণ করেছেন আত্মার গভীরে। এই অর্থেই বলেছিলাম বনফুলের রচনায় শিল্পীর আত্মসংহরণ আসলে অমিত শক্তিপ্রাচুর্যেরই পরিণাম।

আরো একটি গল্পের উদ্ধার করা যেতে পারে,—নাম 'অজান্তে',—শিল্পীর হাতের চতুর্থ প্রকাশিত গল্প।[৩৩]

"সেদিন অফিসে মাইনে পেয়েছি।

বাড়ী ফেরবার পথে ভাবলাম 'ওর' জন্য একটা 'বডিস' কিনে নিয়ে যাই। বেচারী অনেকদিন থেকেই বলছে।

এ-দোকান সে-দোকান খুঁজে জামা কিনতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। জামাটি কিনে বেরিয়েছি—বৃষ্টিও আরম্ভ হল। কি করি—দাঁড়াতে হল। বৃষ্টিটা একটু ধরতে—জামাটি বগলে করে'—ছাতাটি মাথায় দিয়ে যাচ্ছি। বড় রাস্তাটুকু বেশ এলাম—তারপরই গলি তাও অন্ধকার।

৩৩। 'প্রবাসী' মাঘ ১৩২৮ সাল।

গলিতে ঢুকে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি—অনেকদিন পরে আজ নতুন জামা পেয়ে তার মনে কি আনন্দই না হবে! আজ আমি—

এমন সময় হঠাৎ একটা লোক ঘাড়ে এসে পড়ল। সেও পড়ে গেল, আমিও পড়ে গেলাম—জামাটা কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল।

আমি উঠে দেখি—লোকটা তখনও উঠেনি—উঠবার উপক্রম করছে। রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল—মারলাম এক লাথি।

'রাস্তা দেখে চলতে পারনা শুয়ার'।

মারের চোটে সে আবার পড়ে গেল—কিন্তু কোন জবাব করলে না। তাতে আমার আরও রাগ হল—আরও মারতে লাগলাম।

গোলমাল শুনে পাশের বাড়ীর এক দুয়ার খুলে গেল। লণ্ঠন হাতে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'ব্যাপার কি মশাই?'

'দেখুন দিকি মশাই—রাস্কেলটা আমার এত টাকার জামাটা মাটি করে দিলে। কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে একেবারে। পথ চলতে জানেনা—ঘাড়ে এসে পড়ল—'

'কে—ও? ওঃ—থাক্ মশাই' মাপ করুন ওকে, আর মারবেন না! ও বেচারা অন্ধ বোবা ভিখারী—এই গলিতে থাকে—'

তার দিকে চেয়ে দেখি—মারের চোটে সে বেচারা কাঁপছে—গাময় কাদা। আর আমার দিকে কাতর মুখে অন্ধদৃষ্টি তুলে হাত দুটি জোড় করে আছে।"

এই একই গল্পের সমসূত্রে তারাশঙ্করের বিখ্যাত গল্প-রচনা 'বোবা কান্না' আবার স্মরণীয় হতে পারে। সেই সুদীর্ঘ গল্পে এপিক্ আড়ম্বর,—উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা ও সর্বব্যাপী প্রগাঢ় জীবনমন্থনে আন্দোলিত মহাকাব্যিক পরিণতির পাশে বনফুলের এই অকিঞ্চিৎকর-আকৃতি, অনাড়ম্বর, স্বভাব বর্ণনায় প্রাঞ্জল গল্পটির তুলনা করলে মনে হয়, —যে দুর্দমনীয় মহামারী হঠাৎ একদিন আবির্ভূত হয়ে অনেক আলোড়ন-কম্পন, ঝড়ঝাপটার শেষে প্রাণান্ত করে চলে গেল, তার উৎসমূলটুকু যেন খুঁজে পাওয়া যায় অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় ক্ষীণকায় জীবাণুর মধ্যে; সে দেখা সংক্ষিপ্ত কিন্তু সম্পূর্ণ,— প্রত্যক্ষ-দর্শনের বৈশিষ্ট্যের যান্ত্রিক নির্ভুলতায় সমুজ্জ্বল।

এই অর্থেই বনফুল বৈজ্ঞানিক প্রবণতাবিশিষ্ট শিল্পী। বিজ্ঞানীর জীবন-প্রেরণা 'সৃষ্টি-রসের উল্লাস'-এ নয়,—সত্য আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষায়। সৃষ্টির মধ্যে কিছুই নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যায় না;—একরূপে যাকে হারাই, রূপান্তরের রহস্যে সে আবৃত হয়ে থাকে। সত্যের সেই বিচিত্র-সংবৃত পরিচয়কে যথাস্থানে যথাযথ রূপ-স্বভাবে আবিষ্কার করতে পারার কৌতূহলই বনফুলের সকল প্রয়াসের মুখ্য উৎস। সমুচিত আধারের পরিধিতে

অবিকৃত অবিস্তারিত সত্যরূপকে প্রত্যক্ষ করার জন্য এক নির্ভুল মাধ্যমকে খুঁজে পাওয়া অপরিহার্য। বৈজ্ঞানিক তারই অনুসন্ধানে বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, প্রয়োগ করেন তাঁর নবনবায়মান উদ্ভাবনীশক্তি। সৃষ্টির জগতে,—অন্তত ছোট-গল্প সৃষ্টির জগতে বনফুল তাই করেছেন। উপকরণ সেই একই,—অর্থাৎ শিল্পীর আত্মোপলব্ধি, জীবন-উপলব্ধিও যাকে বলা যেতে পারে; নিজে তিনি যাকে বলেছেন, "Poet's interpretation of life". কিন্তু প্রত্যেক পৃথক বিচিত্র অভিজ্ঞতা যাতে তার যথামূল্যের ভাব-তাৎপর্যে এবং যথারূপে প্রতিফলিত হতে পারে,—শিল্পীর ব্যক্তিক প্রতিফলনের দ্বারা বিন্দুমাত্রও কক্ষচ্যুত (deflected) না হয়,—সেই উৎকণ্ঠার তীক্ষ্ণ অতন্দ্র মননশক্তির প্রয়োগ-নৈপুণ্যে তাঁর চেতনাময় ক্যামেরার ল্যান্সটিকে বারে বারেই আঙ্গিক নির্ভুলতার সঙ্গে যথাস্থিত করতে পেরেছেন। কেবল এই কারণেই বাংলা ছোটগল্পে বনফুলের যে বাক্-সংক্ষিপ্তি মাঝে মাঝে এমন কি অতৃপ্তিকররূপে হ্রস্ব বলেও প্রতিভাত হয়, সেখানেও শিল্পীর অমৃতপিপাসু জীবনবাচ্য কোথাও গোপনতায় অস্পষ্ট, অথবা প্রগল্‌ভতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে পারে নি। বনফুলের ছোট গল্পগুলিতে তাই বৈজ্ঞানিকের হাতের বিচ্যুতিহীন যথাপরিমিতি ও যথাযাথ্য প্রায় সর্বব্যাপ্ত হয়ে আছে,—কি ভাব-শরীরে,—কি আঙ্গিক-পরিচ্ছদে।

রবীন্দ্রনাথও বনফুলকে "বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক" বলেছিলেন,—অবশ্য সে পৃথক্ প্রসঙ্গে। তার আগে এখানেই স্মরণ করে রাখা যেতে পারে যে,—রবীন্দ্রনাথের কাছে ছোটগল্পের প্লট পাবার দাক্ষিণ্য যাঁরা লাভ করেছিলেন, বনফুল তাঁদের অন্যতম। অবশ্য সেই প্লট ব্যবহার করে কোনো পৃথক ছোটগল্প তিনি লেখেন নি। 'নির্মোক' উপন্যাসে জমিদার মথুরনাথ-পুত্র অমরনাথ ও তার প্রেম-বিবাহিতা লরেটো পড়া পত্নী বিনুর দাম্পত্যজীবন উপাখ্যানে সেই প্লটটি ব্যবহৃত হয়েছিল।[৩১] রবীন্দ্র-কল্পনার পক্ষে এই প্লটের অপ্রত্যাশিত উপকরণ থেকে বনফুলের শক্তি-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কবি-ভাবনার এক সার্থক সংকেত লাভ করা অসম্ভব নয়।

যাইহোক, আবার শিল্পীর ছোটগল্প প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। বনফুলের প্রথম গল্পের সংকলন প্রকাশিত হয় 'বনফুলের গল্প' নামে—প্রকাশকাল ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ। ওপরে উদ্ধার করা গল্পকয়টিও ঐ সংকলনেই স্থান পেয়েছে। 'বনফুলের আরো গল্প' তাঁর দ্বিতীয় গল্প-সংকলন,—প্রকাশকাল ১৯৩৮ ইংরেজি সাল। এতাবৎ আলোচিত রচনা-স্বভাব বনফুলের সকল সৃষ্টি সম্পর্কেই সাধারণভাবে প্রযোজ্য হলেও 'বনফুলের

৩১। এই তথ্যটিও মূলত বর্তমান লেখকের প্রতি বনফুল-এর দাক্ষিণ্যের দান। পরে 'রবীন্দ্রস্মৃতি গ্রন্থে ধৃত।

'আরো গল্প'তে বিশেষভাবে পরিহাসরসের প্রাথমিক গল্পগুলি সংগৃহীত। ঐ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ উপহার পেয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,—

"বর্তমান যুগ সাহিত্যের উপরে বিজ্ঞানের মন্ত্র পড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ মনোরঞ্জন করানোর দায় থেকে মুক্তি পেয়েছে, তার কাজ হচ্ছে মনোযোগ করানো। আগাছা পরগাছা বনস্পতি সব কিছুতেই যে দৃষ্টি সে টানে সে কৌতূহলের দৃষ্টি। পদে পদে সে বলিয়ে নিচ্ছে, তাইতো এতো আমি দেখিনি কিংবা ঠিক্‌টি দেখলুম। আগেকার সাহিত্য চোখ-ভোলানো সামগ্রী নিয়ে। আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সীমানা বাড়িয়ে দিচ্ছে উপেক্ষিত অনতিগোচরের দিকে, তাতেও রস আছে, সে হচ্ছে কৌতূহলের রস। সাজপরানো কনে দেখানোর মতো করে প্রকৃতিকে দেখাতে গেলে ঐ রসটি থেকে বঞ্চিত করা হয়; ঠিকটি দেখা গেল বলে হাততালি দিয়ে ওঠার উৎসাহ চলে যায়। জগতের আনাচে-কানাচে আড়ালে-আবডালে ধূলিধূসর হয়ে আছে যারা, তুচ্ছতার মূল্যেই তাদের মূল্যবান করে দেখার কাজে কোমর বেঁধে বেরিয়েছে তোমাদের মত বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক। তোমাদের সন্ধান জগতের অভাজন মহলে—তোমাদের ভয় পাছে তার অকিঞ্চিৎকরত্বের বিশিষ্টতাকে ভদ্র চাদর পরিয়ে অস্পষ্ট করে ফেলো।"[৩২]

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ সংকলন করলে বনফুলের গল্পে অভিনবতার তিনটি মুখ্য উপকরণ চোখে পড়ে—(১) তাঁর রচনায় বিষয়বস্তুর সঞ্চয়-ভাণ্ডার 'চোখ এড়ানো সামগ্রী নিয়ে' গড়া—দৈনন্দিন জীবনের আনাচে-কানাচে ধূলি-মালিন্যের তুচ্ছতায় তারা আবৃত। (২) শিল্পীর গঠন-শৈলীতে আত্মসংবরণের বিজ্ঞানিজনোচিত সন্তর্পণ প্রয়াস,—পাছে বস্তুর 'অকিঞ্চিৎকরত্বের' বৈশিষ্ট্য স্রষ্টার ব্যক্তিগত মানসিকতার ভদ্র চাদরে আবৃত হয়ে পড়ে। (৩) রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, —বনফুলের বিজ্ঞানী মেজাজে গড়া গল্প চোখ ভোলায় না,—কৌতূহলের কৌতুক-রসে 'হাততালির উৎসাহ'কে উৎসারিত করে তোলে।

প্রথম দুটি কবি-সিদ্ধান্ত বনফুলের গল্প-সাহিত্যে প্রসঙ্গে সাধারণভাবে প্রয়োগ-যোগ্য,—বস্তুত এ পর্যন্ত আলোচনায় সেই তথ্য প্রতিপাদনেরই চেষ্টা করেছি। উদ্ধৃত দুটি গল্পের গভীরে অমৃত-যন্ত্রণায় অনুভব অমেয়। তাহলেও কেবল তারা-শঙ্করের 'বোবাকান্না'র সঙ্গে 'অজান্তে' গল্পের তুলনা করলেই সংশয় থাকবে না, বনফুলের গল্প কেবল বৈজ্ঞানিক প্রয়োগসিদ্ধির গুণে কত অকিঞ্চিৎকর চোখ-এড়ানো বেদনাকে একেবারে চোখের ওপরে উদ্যত, অনিবার্য করে তুলেছে। কবি-কথিত তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে বনফুলের পরিহাসরসের গল্প প্রসঙ্গে;—'বনফুলের

৩২। ৭।১০। [১৯]৩৮ তারিখে লেখা চিঠি থেকে।

আরো গল্প' যে-রসে মুখ্যত রসাম্বিত ;—কৌতুক, কৌতূহল, হাততালির উৎসাহে উদ্দাম নয়,—পূর্ণগর্ভ, কিংবা ভার-স্থমিত। অর্থাৎ, এসব গল্প পড়েও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বক্রতায় অথবা humour-এর আবেগে উল্লসিত, অট্টহাস হয়ে পড়া সম্ভব নয়। হাসির উৎসমূলেও বিজ্ঞানিজনোচিত জীবনবোধের গাঢ়তা, এবং কৌতূহলাম্বিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিচিত্র জটিলতা-মুক্ত সত্য আবিষ্কারের প্রয়াসে যেন নিত্য অভীপ্সু। বক্তব্যের প্রাঞ্জলতা বিধানের জন্য 'বনফুলের আরো গল্প' থেকে কবি-পঠিত একটি গল্প উদ্ধার করা যেতে পারে এবার,—নাম 'উৎসবের ইতিহাস'। বনফুলের গল্প-পরিধির তুলনায় এসব গল্প মধ্যমাকৃতি ;—

"সমারোহ পড়িয়াছে।

—সাণ্ডেল মশাইকে আরো চারটি পোলাও দাও।

আন্—আন্—ওরে এদিকে লুচি নিয়ে আয়—লুচি—লুচি। মাংস আপনাকে দেব আর একটু ?

—না—না—সে কি কথা ! দাও খানিকটা মাংস—

ছ্যাচ্ড়া—ছ্যাচ্ড়া।

—এ হে হে জলের গেলাসটা পা লেগে পড়ে গেল যে ! তোমরা দেখেও চলতে পারনা ? উটের মত চলছ সব।

—এই রসগোল্লা এদিকে এস মুখুজ্জে মশাইকে গোটা আষ্টেক দাও—খাইয়ে লোক উনি—

তুমি যাও ত হে—কয়েক পিস্ ভাল দেখে মাছ বেছে নিয়ে এসত—মিত্তির মশাইকে দাও—

—দেখো হে, আথতার মিঞা আলাদা বসেছেন বলে যেন কিছু বাদ না পড়ে ! নরেন তুমি ওর কাছেই থাক—

—সিঙ্গি মশায়কে খানিকটা ছ্যাচ্ড়া দিয়ে যাও—চাট্নিও। নানা আকৃতির জন তিরিশেক লোক আহারে প্রবৃত্ত।

জন পাঁচ-ছয় ছোকরা পরিবেশন করিতেছে।

স্বচক্ষে দেখিলে তবে বিশ্বাস হইবে।

না দেখিলে মনে হইবে শতখানেক লোক ভিতরে দাঙ্গা করিতেছে।

ঠিক ইহার পূর্ববর্তী অধ্যায়টি করুণ রসাত্মক।

কিন্তু সত্য।

প্রবীণ মল্লিক মহাশয় 'খাইয়ে' মুখুজ্জে মহাশয়ের নিকট টাকা ধার করিয়াছেন।

অসহায় মল্লিকের ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। মানসভ্রম বজায় রাখিতে হইবে ত।

দেখা গেল মুখুজ্জে বাস্তবিকই সহৃদয় লোক।

চাহিবা মাত্র টাকাটা ঝনাৎ করিয়া দিয়া ফেলিলেন।

বলিলেন—'ফিষ্টি একটা করতে হবে বই কি? ফিষ্টি না করলে চলে! একশ টাকা—যদি সিকৃদ পারসেণ্টেই দাও—কদিন যাবে শুধতে! অমন তৈরী ছেলে তোমার। বড় ভাল ছোকরা নরেন—বড় ভাল—ভাগ্যবান লোক তুমি, ঠিক উন্নতি করবে ও—দেখো—'

মুখুজ্জের অর্থে উৎসবের আয়োজন হইল।

পোলাওটা সামান্য একটু ধরিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু তাহাতে বিশেষ রস-ভঙ্গ হয় নাই।

সকলেই পরিতৃপ্তি সহকারে খাইয়াছে।

ইহার পূর্ববর্তী ঘটনা-পরম্পরা একটু জটিল।

সংক্ষিপ্ত তালিকাবদ্ধ আকৃতি নিম্নলিখিত রূপ।

(১) অনন্যোপায় নরেন মল্লিক (প্রবীণ মল্লিকের পুত্র) দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া সাগ্রহে বিশু সান্যালকে তৈলাক্ত করিতেছে।

(২) তৈল নিষিক্ত বিশু সান্যাল দিশাহারা হইয়া একখানি পত্র লিখিলেন।

(৩) খবরটি গোপন রহিল না।

(৪) ফলে বিশু সান্যালের প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমশক্তিশালী বিষ্ণুচরণ চক্রবর্তীও সক্রোধে লেখনী আস্ফালন করিলেন এবং একখানি পত্র লিখিলেন।

(৫) উভয়পত্রই আথ্তার আলির হস্তগত হইল এবং সমস্যাকুল চিত্তে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

(৬) বিশু সান্যালকে সুচারুরূপে তৈলাক্ত করিবার পর নরেন মল্লিক আবিষ্কার করিল যে, তাহার তৈল-নিষেক-শক্তি মোটেই নিঃশেষিত হয় নাই। এখনও সে বহুলোককে তৈল-সুখ দিতে পারে। সুতরাং কালক্ষেপ করা অনুচিত।

সে গিয়া 'খাইয়ে' মুখুজ্জে মহাশয়কে সবিনয়ে প্রশ্ন করিল, "এইবার কাহাকে তৈলাক্ত করি বলুন ত। আথ্তার আলিকে গিয়া ধরিব কি?"

ঈষদ্ধাস্য সহকারে মুখুজ্জে বলিলেন, "সুবিধা হইবে না। আথ্তার আলি নিরামিষ তৈল পছন্দ করেন না। তুমি বরং সিঙ্গীর কাছে যাও। পরাণ সিঙ্গী খাঁটি লোক। যদি রাজি করতে পার—নির্ঘাৎ লেগে যাবে।"

(৭) অবিলম্বে তৈল ও তুলি লইয়া নরেন মল্লিক পরাণ সিংহের দ্বারস্থ হইল এবং তাহাকে যৎপরোনাস্তি তৈলাক্ত করিল।

(৮) তৈলাক্ত সিংহ মহাশয় নরেনকে আশ্বাস দিলেন এবং সঙ্গে লইয়া পাচু মিত্রের নিকট গেলেন।

(৯) ঘাগি-ঘুঘু-সম্মিলন। পাচু মিত্তির ঘুঘু। বোঝা গেল তিনি কেবলমাত্র তৈল-নিষেকে নরম হইবার পাত্র নহেন। তিনি নরেন মল্লিকের আপাদ-মস্তক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাঁহার উর্বর মস্তিষ্কে অকস্মাৎ একটি নিরীহ মতলব আত্মপ্রকাশ করিল। তিনি সিংহ মহাশয়কে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গেলেন এবং তাঁহার কর্ণকুহরে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি সব বলিতে লাগিলেন। ঘাগি-ঘুঘু-সংবাদ নরেনের অগোচর রহিয়া গেল।

(১০) প্রকাশ্যে পাচু মিত্র নরেনকে কেবল বলিলেন, "শুধু হাতে হবে না হে। একটা ভাল গোছের ডালি চাই—বুঝলে? ডালিটি নিয়ে কাল বিকেলে এসো—দু বোতল হুইস্কিও এনো—"

(১১) ঘাগি সিঙ্গি-মহাশয় ঘুঘু মিত্তিরের নিকট গোপনে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা প্রবীণ মল্লিক মহাশয়ের অর্থাৎ নরেনের পিতার কর্ণগোচর করিলেন।

প্রবীণ মল্লিককে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হইতে হইল।

(১২) পরদিন ঘুঘু-সমভিব্যাহারে স-ডালি নরেন এক সাহেবকে সেলাম করিবার সুযোগ পাইল।

(১৩) ইহার ফলে সাহেব যাহা করিলেন তাহা প্রকৃতই গুণিজন-সুলভ। তিনি নরেনকে ধন্যবাদ দিলেন এবং 'ফোন' করিলেন।

(১৪) সমস্যাচ্ছন্ন আখ্‌তার আলি বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিতেছিলেন—এমন সময়—ট্রিং—ট্রিং—ট্রিং—ফোন বাজিয়া উঠিল।

(১৫) আখ্‌তার আলি অন্ধকারে ধ্রুবতারা সন্দর্শন করিলেন। তাঁহার সমস্যা বিদূরিত হইল।

(১৬) নরেন নির্বিঘ্নে কেল্লা মারিয়া দিল।

যে ঘটনাটি এখনও ঘটে নাই কিন্তু যাহা অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই ঘটিবে তাহার উল্লেখ না করিলে কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকে।

তাহা এই—নরেন মল্লিককে ঘুঘু মিত্তিরের বয়স্থা কুৎসিত কন্যাটির পাণিপীড়ন করিতে হইবে।

প্রবীণ মল্লিক মহাশয় প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বলিয়াই ঘুঘু মিত্তিরের মধ্যস্থতায় নরেন সাহেবকে সেলাম করিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং সেলাম করিবার সুযোগ পাইয়াছে বলিয়াই নিয়োগ-কর্তা আখ্‌তার আলির জটিল সমস্যার সমাধান হইয়াছে—অর্থাৎ, নরেনের এতদিনের শ্রম সার্থক হইয়াছে।

সংক্ষেপে, সে চাকুরি পাইয়াছে।

হউক কেরানিগিরি—হউক বেতন তিরিশ টাকা—

চাকুরি ত?

প্রসপেক্‌টও আছে।

উপরোক্ত ভোজনোৎসবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই।

অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই আর একটি কথা ইতস্ততঃ করিয়া সর্বশেষে উল্লেখ করিতেছি।

নরেন মল্লিক প্রথম শ্রেণীর এম্. এ.।"

গল্প যা-কিছু বনফুলের হাতে তা অকস্মাৎ জন্মলাভ করেছে ঐ শেষতম ছত্রে। এ গল্পের শরীরে শিল্পীর বিশিষ্ট গঠন-নৈপুণ্যের স্বাক্ষরও সুচিহ্নিত হয়ে আছে। কিন্তু সেকথা পরে,—আমাদের অব্যবহিত সন্দেহ বনফুলের গল্পে জীবন-ব্যাখ্যার প্রগাঢ় স্বভাব। প্রগাঢ় বল্‌ছি এই অর্থে,—রবীন্দ্রনাথও বলেছেন বনফুলের এই ধরনের গল্পেও রসের রহস্যলোকে প্রবেশ করা সম্ভব,—অবশ্য "ঝুকে যদি দেখা যায়,"—তবেই।

সদ্য উদ্ধৃত 'উৎসবের ইতিহাস' গল্পের সমাপ্তিক স্বাদুতাকেও কোন্ অনুভব দিয়ে চিহ্নিত করা যেতে পারে,—উপহাস, বেদনা, কটাক্ষ, বিদ্রূপ, না অতলস্পর্শ কারুণ্য! কটাক্ষ-বিদ্রূপও যদি হয়, তবে সে কার বিরুদ্ধে?—সমাজ, পরিবেশ, মানুষ, না তার পরিহাসরসিক ভাগ্যবিধাতার! 'প্রথম শ্রেণীর এম্. এ.' নরেন মল্লিককে তিরিশ টাকার কেরানিগিরির জন্য খোসামোদ-অনুরোধের যে অনপনেয় জটিলতাজালের মধ্য দিয়ে এগোতে হয়েছিল,—তার পরিণামে বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বমাত্রকে নির্জলা বিসর্জন দিয়ে চাকুরিস্বর্গে তার যে প্রতিষ্ঠা ঘট্‌ল, যার জন্যে স্বয়ং নরেন মল্লিকের পিতৃদেবকে 'খাইয়ে' মুখুজ্জে মহাশয়ের কাছে ধার করে তাকে 'ফিষ্টি' খাওয়াতে হয়,—এই জীবন, এই সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেও মানুষ হাসিকে বাঁচিয়ে রাখে কোন্ লজ্জায়! তবে কি এ-কেবল যন্ত্রণার্ত মনের তীক্ষ্ণধার বিদ্রূপ? তারও চেয়ে গভীরে শিল্পীর আরো যে অনুভব রয়েছে এ গল্পের গহনে 'ঝুঁকে দেখলে' তার স্বরূপ সহজেই অনাবৃত হতে পারে।

'বনফুলের আরো গল্প' প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম লিখিত এক পত্রে শিল্পীকে 'উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানীর' অভিধায় ভূষিত করেছিলেন। বলেছিলেন, আলোচ্য গল্পগুলো পড়ে মনে হয়,—"যেন তুমি উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানী হাটে যাবার মেঠো রাস্তায় যেতে যেতে এদিকে-ওদিকে আগাছা এবং ঘেসো গাছগাছড়া যা চোখে পড়েছে তোমার নমুনার পর্যায়ে সেগুলোকে গেঁথে রেখেছো! এগুলো পথিকদের চোখ এড়ায়—কেননা এরা না দেয় পূজায় ফুল, না পড়ে চীনে ফুলদানিতে। এরা আদরণীয় নয়, কিন্তু পর্যবেক্ষণীয়। তুলে ধরে দেখিয়ে দিলে মনে হয় কিছু খবর পাওয়া গেল, কিছু কৌতুক লাগে মনে। মেঠো পথটি চৌরঙ্গী রোড্ নয়, কিন্তু জীবলোকের নানা আমেজ ওর এখানে ওখানে লুকিয়ে থাকে,—ওর ফড়িং টিকটিকিগুলি ময়ূর-হরিণের সঙ্গে তুলনীয় নয়, কিন্তু খুঁকে পড়ে যদি দেখা যায় তাহলে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটে,—আর ঘেসো জগতের সঙ্গে ওদের মিল দেখে কিছু মজাও লাগে।"[৩৩]

উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী বনফুল চোখ-এড়ানো ঘাসের ফুলকে তার যথামূল্যে, যথাপরিবেশে আবিষ্কার করেছেন। সে কেবল তার প্রাকৃতিক বস্তুমূল্যে নয়,—আন্তরিক সত্যমূল্যেও, রূপের অন্তরালবর্তী বস্তুস্বরূপ তাঁর বিজ্ঞানী-চেতনার নিত্য সন্ধেয়।—সেই সত্য-স্বভাবের পরিচয় শিল্পীর স্বাভাবিক প্রবণতার নিয়মেই গল্পের চেয়েও কবিতার অভ্যন্তরে স্পষ্টতর হতে পেরেছে। 'কাঁটা গাছ' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন বনফুল :—

কাঁটায় কাঁটা চারিদিকে
কাঁটায় ভরা দেহ;
কাঁটায় ভরা আমার কাছে
আসই না ত কেহ!
আসতে যদি সাহস করে,
দেখতে যদি নয়ন ভরে
সবাই মিলে এমনি করে
করতে নাক হেয়।
পাছে আমার বাছার গায়ে
আঁচড়টুকু লাগে,
স্নেহ আমার কাঁটা হয়ে
তাইত সদা জাগে!

৩৩। নবমী—১৩৩৫ বাংলা সালে লেখা চিঠি থেকে উদ্ধৃত।

একটু যদি কাছে এসে
দেখতে চেয়ে ভালোবেসে
দেখতে তবে কাঁটা এ নয়
এযে আমার স্নেহ।"

পরিহাস-রসের শিল্পী বনফুল নিজের সৃষ্টি-সত্য সম্পর্কেও এ-কথা বলতে পারেন,—এমনকি 'উৎসবের ইতিহাস' গল্পেও। মানুষের ভাগ্য নির্মম, বিধাতার হাতে 'খড়মের দৌরাত্ম্য' একান্ত নিষ্ঠুর। অক্ষম মানুষের সেই বিদ্রূপ-বিড়ম্বিত জীবনের কাঁটা হাতে নিয়ে গল্পের মালা গেঁথেছেন শিল্পী। কিন্তু কটাক্ষ-পরিহাসের অন্তর্লীন হয়ে আছে মানব স্বভাবের রূপায়ণে মানব-প্রেমিক বৈজ্ঞানিকের মৌনপ্রায় স্থমিত কথনের অবিচলতা,—তাঁকে ভেদ করে শিল্পীর সৃজনজগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারলে, কাঁটার অন্তরালবর্তী স্নেহটুকুকেও প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে।

এমন কি, উদ্ধৃত গল্পেও বিদ্রূপ-কণ্টকের যবনিকাতল থেকে শিল্পীর অন্তর্লীন 'স্নেহ'-উৎসটুকু যেন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নাটকীয় পদ্ধতির ক্রমিক স্পষ্টতায়। বস্তুত এখানেই বনফুলের গল্পে তাঁর আঙ্গিক-সুরেখতায় পরিচয় সন্ধান অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ-যেন কুমোরের ছাঁচে ফেলে অপরূপ মূর্তি রচনা।—সুবিন্যস্ত-গঠন বস্তু-বিষয়ের ছাঁচে ফেলে রসের রূপাধার খোদাই করেছেন বনফুল,—কিন্তু প্রত্যেক বারেই ছাঁচটি প্রায় সম্পূর্ণ নূতন,—অর্থাৎ, প্রত্যেক রসানুভবের অভিব্যক্তির জন্যে পৃথক্ স্বতন্ত্র, অভিনব বিষয়-মূর্তি রচনা করেছেন। তাহলেও ছাঁচে না ফেলে বনফুল মূর্তি গড়েন না। অর্থাৎ, যথোচিত দেশ-কাল-পাত্রের যথাপরিমিত বিন্যাসের চাপেই গল্পের রস-উপকরণ বিকশিত হয়ে ওঠে তাঁর গল্পে, তাছাড়া যে-কোনো প্রকারের আত্মপ্রক্ষেপণ একেবারেই অনুপস্থিত গল্প-শরীরে। এই কারণেই বনফুলের গল্পে বিষয়-বিন্যাসের দৈহিক গঠনটুকু পৃথক্ ভাবে না হলেও বিশেষভাবে চোখে পড়ে। আর প্রত্যেকবারেই তাঁর রচনাতে রূপের ভূমিকা অন্তর্নিহিত ভাবের প্রসঙ্গেই কেবল সার্থক হয়েছে। অন্যপক্ষে জীবনের অভিজ্ঞতার মত অনুভবের চেতনাও প্রায় অপরিসীম। ফলে রচনার প্রকরণে রূপের এত বৈচিত্র্য।

তাহলেও এই সকল বিচিত্রতার মূলগত একটি ঐক্যসূত্রও যেন রয়েছে, যাতে বনফুলের গল্পাঙ্গিককে সাধারণভাবে নাটকীয়তার সঙ্গে তুলনা করা চলে। নাটকের কৌতূহল এবং উৎকণ্ঠাকে অবিরত রেখে অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিকের মালা গেঁথে চলেন যেন শিল্পী গল্পের শরীরে একের পর এক তথ্যচিত্রের পুষ্প-কলিকা দিয়ে। এক একটি পর্যায় মনে হয় নাটকের এক একটি অঙ্ক,—'উৎসবের ইতিহাস' গল্পটিও বলা

চলে, পঞ্চাঙ্ক এক নাটক,—'দুই'-এর অনুচ্ছেদ-এর শেষ চারিটি ছত্রে রহস্য-কটাক্ষের মূলগত জীবনার্তির চমকটুকু একবার যেন আভাসে চকিত করে রেখে গেল। তারপরে তিন-এর অংশে নানাগ্রন্থি সহযোগে সেই কৌতূহল নাটকীয় জটিলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল; আর চার এবং পাঁচের অংশে ঐ অভিন্ন জটিলতাজাল ছিন্ন করে climax থেকে ধীরে ধীরে একটি পঞ্চাঙ্ক ট্রাজেডিকে যেন তার অনিবার্য উপসংহারে এনে পৌঁছে দিয়েছেন শিল্পী। ট্রাজেডির সে অনতিউচ্চার রেশটুকু 'ঝুঁকে পড়ে দেখলে' তবেই অনুভব করা চলে,—না হলে গল্পের বহিরঙ্গ বিন্যাসে তো রয়েছে কটাক্ষ, ব্যঙ্গ আর হয়ত-বা এক নৈর্ব্যক্তিক কৌতুকও।

বনফুলের গল্প-শরীরকে ঠিক নাট্যধর্মী বলা চলে না,—অর্থাৎ সংলাপ, সংঘাত সর্বত্রই অনিবার্য নয়,—কিন্তু নাটকীয়তা রয়েছে, বিন্যাসের কৌশলেও। Dramatic suspense-কে ক্রমশই পুঞ্জীভূত করে অত্যন্ত সন্তর্পণে, অথচ স্বভাবসিদ্ধ আনমনে শিল্পী যেন সূক্ষ্মতন্বী জীবনের ভাঁজ খুলে চলেছেন একের পর এক,—প্রতি ভাঁজে নতুন উৎকণ্ঠা নতুন কৌতূহল নতুন উদ্দীপনার পথে ঠেলে নিয়ে চলে। এই অর্থেই বনফুলের প্রকরণও বিজ্ঞানী প্রবণতার সৃষ্টি,—ভাঁজে ভাঁজে সংকুচিত গোপন জীবন-সত্যকে ধাপে ধাপে আবিষ্কার করে এগিয়ে চলেছেন তিনি। প্রতিটি পদক্ষেপ নির্ভুল আঙ্কিক হিশাবে পরিচালিত—ফলে প্রত্যেকটি বাক্য, এমন কি প্রতিটি শব্দও গল্প-রহস্যের উন্মোচনে যেন অনিবার্যতার কঠিন বন্ধনে সংলগ্ন। এই কারণে বনফুলের ছোটগল্পের শরীরে একটি শব্দকেও পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত অথবা পরিবর্জিত করবার উপায় নেই।

সে যে কেবল বস্তু-প্রধান গল্পে, তাই নয়। জীবনের অতীন্দ্রিয় মুহূর্তকে নিয়েও যথেষ্ট সংখ্যক গল্প লিখেছেন বনফুল, রোমান্টিক্ যদি নাও বলি, তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা রহস্য-চমকিত; কোথাও বা এমন কি সিন্‌বোলিক-ও। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই গল্প গঠনের ভঙ্গীটি নাটকীয়তাপুষ্ট কৌতুক-উৎকণ্ঠার চুম্বক-শক্তি নিয়ে জীবনের ভাঁজের পর ভাঁজ খুলে যাবার অন্যমনা পথিক-বৃত্তিতে দীপ্ত। দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে একটি-দুটি। সংক্ষিপ্ত-পরিসর গল্পের উদ্ধৃতি সহজতর।—

"অন্ধকারে একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম মাঠে। সে-ও সঙ্গে ছিল। তার অঙ্গ-সৌরভ বলয়-নিক্বণ, নিঃশ্বাসের মৃদুশব্দ সমস্তই অনুভব করছিলাম। পাশাপাশি ছিল, অতিশয় কাছাকাছি। মুখে কথা ছিল না আমারও না, তারও না। আলাপ বন্ধ ছিল না তবু। দুজনেই কথা কইছিলাম। কিন্তু নীরবে। তার সমস্ত অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল আমার কল্পনায়। তাই যখন নীরব ভাষায় সে আমাকে প্রশ্ন করলে—আমাকে তুমি তো কখনো দেখ নি, তবু চাইছ কেন, এত করে?

তখন আমি সসঙ্কোচে উত্তর দিলাম—'তোমাকে আমি জানি।'

'কি করে জানলে' ?

নিবিড়তর হয়ে উঠ্‌ল অন্ধকার।

পাশাপাশি হাঁটলাম অনেকক্ষণ……কতক্ষণ মনে নেই। মনে হচ্ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যাচ্ছে।……সহসা তার আর একটা নীরব প্রশ্ন সঞ্চারিত হল আমার মনে।

'এত করে চাইছ যদি নিচ্ছ না কেন' ?

'ধরা দিলে কই' ?

মদিরতর হয়ে উঠ্‌ল তার অঙ্গ-সৌরভ।

মনে হল তার চকিত দৃষ্টির চাহনি বিদ্যুতের মতো চিরে চলে গেল অন্ধকারকে। চতুর্দিকে বিদ্যুতায়িত হয়ে উঠল ক্ষণকালের জন্য।

'সর্বদা ধরে রেখেছ, তবু বলছ ধরা দিই নি'।

আমি যেখানে চাই সেখানে দাও নি'।

'কোথাও চাও' ?

'ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোকে'।

দ্রুততর হয়ে উঠ্‌ল তার নিঃশ্বাস। স্পন্দিত হয়ে উঠ্‌ল অন্ধকার……মনে হল খুব কাছে সরে এসেছে……তার চোখের জল গালে পড়ল আমার ……এক ফোঁটা জল ব……রফের মত ঠাণ্ডা……

সহসা সচেতন হলাম, বৃষ্টি পড়ছে। বাড়ির দিকে ফিরলাম। সে-ও চলেছে। মুষলধারা নামল। ছুটছি…সেও ছুটছে সঙ্গে সঙ্গে! সহসা অতিশয় কাছে এসে পড়ল যেন……তার ভিজে শাড়ীর স্পর্শ পেলাম মনে হল। পাশাপাশি ছুটে চলেছি। নির্জন পথে ঊর্ধ্বশ্বাসে পার হলাম নীরবে।—তারপর সুদীর্ঘ গলিটা। নীরন্ধ্র অন্ধকার! গলির শেষে আমার প্রকাণ্ড নির্জন বাড়িটা দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এখনই গ্রাস করবে আমাকে। দ্রুত পদে বারান্দায় উঠ্‌লাম। সে-ও উঠ্‌ল। ঘরে ঢুকলাম। সে-ও ঢুকল। সুইচ টিপলাম তাড়াতাড়ি—তীব্র আলোয় ভরে উঠ্‌ল চতুর্দিক। দেখি কেউ নেই।"

বনফুলের রচনায় বহিঃপ্রকৃতি এবং জীবজগতের বর্ণনা রয়েছে প্রচুর,—তাতে বৈজ্ঞানিকের সন্ধিৎসু দৃষ্টিই প্রখর,—তবু তাঁর অন্তর্লীন হয়ে আছে এক প্রকৃতি-প্রেমিক, —জীব এবং জীবন-প্রেমিক শিল্পীও। প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে যেন প্রকৃতির অন্তর্লীন প্রাণ-রহস্যকে একবার উপলব্ধি করে নেওয়া গেল এই গল্পে।

আর একটি গল্প 'প্রজাপতি' :—

"নীল শেড্ দেওয়া ইলেক্‌ট্রিক বাতিটার উপরে কয়েকদিন থেকে একটি প্রজাপতি এসে বসছে। যতক্ষণ আমি টেবিলে বসে লেখাপড়া করি ও শেড্‌টির উপর চুপ করে বসে থাকে। আশা মারা যাবার কিছুদিন পর থেকে ওই আমার সন্ধ্যাবেলার সঙ্গী হয়েছে।"

এমন সময় বন্ধু সোমেশ্বর এসে উপস্থিত হয়। তাকে দেখে আজকাল কেবলই ভয় করে লেখকের। ওর বোন্ বেলার প্রতি একটু দুর্বলতার অনুভব ধরা পড়ে গেছে।

এসেই কাজের কথা পাড়ে সোমেশ্বর :—বেলার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব! লেখক বুঝেছেন বিয়ে করতে হবে,—বেলাকেই করতে হবে। কিন্তু দ্বিধাটুকু আর কাটে না। আশাকে কথা দিয়েছিলেন আর কখনো বিয়ে করবেন না।

ঝোপ বুঝে কোপ দেয় কি সোমেশ্বর! বেলা ভালবাসে লেখককে,—কিন্তু ওর যদি দ্বিধা থাকে তবে দ্বিজেনকেই পাত্র স্থির করতে হবে,—ওই বোঁচা গোঁফওয়ালা দ্বিজেন।

আর কত সহ্য করা যায়!—অতএব কথা দিতেই হয়। সোমেশ্বর বেরিয়ে যায় বেলাকে সুখবরটি দিতে।

"এর পরে যা ঘট্‌ল অবিশ্বাস্য।

হঠাৎ অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে কে যেন বলে উঠ্‌ল—তাহলে আমার দায়িত্বও ফুরোলো—আমিও চললাম।

প্রজাপতিটা উড়ে জানালা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।"

আবার সেই রহস্য,—একি পরলোকবাদ, অতীন্দ্রিয় প্রেমবাদ,—না আর কিছু! বনফুলের গল্পে এ-সব কিছুই নেই,—কোনো 'বাদ' যদি তাঁর রচনায় থাকে তাহলে সে জীবন-রহস্যবাদ—বিজ্ঞানীর কৌতূহল-উৎকণ্ঠার সঙ্গে শিল্পীর আত্মিকতার সহযোগে যার নিত্য অনুসন্ধান করে ফিরছেন লেখক। মাঝে মাঝে সেই প্রগাঢ় সন্ধিৎসা বিজ্ঞানীর আবিষ্কারকে যেন উপলব্ধিময় ব্যঞ্জনা দিয়েছে অনতিতীব্র সাংকেতিকতার ভাষায় :—

"সুন্দর জ্যোৎস্না!

চারিদিকে জনমানবের সাড়া নাই। গভীর রাত্রি। দূর হইতে নদীর কলকল-ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। নির্জন প্রান্তরে একা দাঁড়াইয়া আছি। স্বপ্ন-বিহ্বল নেত্রে দেখিতেছি, জ্যোৎস্নায় ভুবন ভাসিয়া যাইতেছে। কুৎসিত জিনিসও সুন্দর হইয়া উঠিল। ওই পচা-ডোবাটাও যেন জরিদার কাপড় পরিয়া মোহিনী সাজিয়াছে। আকাশের কালো মেঘটাতেও রূপালি আবেশ।

নির্জন প্রান্তরে একা দাঁড়াইয়া আছি। তাহারই প্রতীক্ষায়। তাহারই প্রতীক্ষায় এই গভীর রাত্রির সমস্ত জ্যোৎস্নাও যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

আসিতেছে।—হ্যাঁ ওই যে। সর্বাঙ্গে তাহার জ্যোৎস্নার আকুলতা তাহার নূপুর শিঞ্জনে জ্যোৎস্না শিহরিয়া উঠিতেছে।…ওই সে আমার পানে চাহিয়া হাসিল।

সহসা একটা দুর্ধর্ষ দস্যু কোথা হইতে আসিয়া সেই কিশোরীর বুকে ছুরি বসাইয়া দিল। জ্যোৎস্নায় শাণিত ছোরাটা চকচক্ করিয়া উঠিল! রক্তের ধারায় জ্যোৎস্না ডুবিয়া গেল।

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া লোকটাকে ধরিলাম। ধরিয়া দেখি—একি, এ যে আমারই বিবেক।"

আভাস-ইঙ্গিতের এই সর্বব্যাপী রহস্যকরতা বনফুলের গল্পের হ্রস্ব পরিসরে অশেষের ব্যঞ্জনা বয়ে এনেছে—একথা অনুভব করেছি বারে বারে। তবু এ আক্ষেপও যেন সকল প্রাপ্তির অন্তর্লীন হয়ে থাকে যে,—'অধরা'কে আরো একটু গভীরভাবে ধরা গেল না, জীবন-রহস্যলোকের গহনে আরো একটু বেশি করে সম্ভব হল না অবগাহন করা—শিল্পীর পরীক্ষাশালার অভ্যন্তরে,—তাঁর মনোভাবনার অতলে আরো একটু তলিয়ে যাওয়ার অবকাশ কেন রইল না! অনিবার তৃষ্ণাতুরতার আলোড়নেই বিজ্ঞানীর হাতের গল্পে প্রাণের এক অভিনব চাঞ্চল্য যেন কম্পিত হয়ে ওঠে,—বনফুলের গল্পে শিল্পীর অকথিত বাণীর আকাঙ্ক্ষায় পাঠকের উৎকণ্ঠিত বাসনারাশি এক অনির্বচনীয় অতৃপ্তিভারে পীড়িত হতে থাকে। ঐটুকু তাঁর আত্মসচেতন আত্ম-ঔদাসীন্যের অনিবার্য রস-পরিণাম।

অনেক গল্প লিখেছেন বনফুল ছোট বড় মাঝারি আকারের,—তাঁর অনেকগুলি আবার সংকলিত হয়েছে,—

বনফুলের গল্প (১৯৩৬), বনফুলের আরোও গল্প (১৯৩৮), বাহুল্য (১৯৪৩), বিন্দু-বিসর্গ (১৩৫১), অদৃশ্য লোকে (১৯৪৭), অনুগামিনী (১৩৫৪), তন্বী (১৩৫৯), নবমঞ্জরী (১৩৬১), উর্মিমালা (১৩৬২), সপ্তমী (১৩৬৭), দূরবীন (১৩৬৮), বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প (গল্প সংকলন ১৩৫৫), বনফুলের গল্প সংগ্রহ, প্রথম ভাগ (গল্প সংকলন—১৩৬২), বনফুলের গল্প সংগ্রহ দ্বিতীয় ভাগ (ঐ—১৩৬৪) ইত্যাদি গ্রন্থে।[৩৪]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৮ বাংলা সালের 'প্রবাসী'তে (মাঘ সংখ্যা)। গল্পের মতো মনোরম

৩৪। গল্প-সংকলনগুলির পরিচয় শিল্পীর দাক্ষিণ্যে প্রাপ্ত।

ভঙ্গীতে সেই প্রথম গল্পলেখার প্রেরণাকথা শিল্পী নিজে বিবৃত করেছেন।[৩৫] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য-স্নাতক বিভূতিভূষণ তখন স্কুলের শিক্ষকতা করেন মহানগরী থেকে অদূরবর্তী পল্লীগ্রামে। যুগান্তকারী যে প্রথম উপন্যাস রচনা করে তিনি বাংলা সাহিত্য-পাঠকের চেতনায় এক অবিনশ্বর বিস্ময়ানুভব রচনা করে গেছেন, সেই 'পথের পাঁচালী'র সূত্রপাতের তারিখ ১৭ বৈশাখ ১৩৩২ (১৯২৫, ৩০শে এপ্রিল),—সমাপ্তিকাল ১৩৩৫ বাংলা সনের ১২ই বৈশাখ (২৫শে এপ্রিল ১৯২৮) 'পথের পাঁচালী'র জন্মকালে বিভূতিভূষণ শিক্ষকতা ত্যাগ করেছিলেন—ঐ স্মরণীয় উপন্যাসের রচনারম্ভ ঘটেছিল উত্তর ভাগলপুরের ইসমাইলপুর কাছারিতে।

স্থান যাই হোক, কালের দিক থেকে বিভূতিভূষণের ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং শৈল্পিক অভ্যুদয় 'কল্লোল'-ইতিহাসের সমান্তরালবর্তী; বস্তুত সেই তরঙ্গক্ষুব্ধ ঐতিহাসিক আলোড়নের চরম লগ্নে। 'উপেক্ষিতা' গল্পের প্রকাশকাল 'কল্লোল' প্রকাশের বর্ষাধিক কাল পূর্বে হলেও 'পথের পাঁচালী' লেখা শুরু হয়েছিল 'কল্লোল'-এর দু'বছর বয়সকালে। তাহলেও ব্যক্তিগত দৈহিক অবস্থানে সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকেও শিল্পি-বিভূতিভূষণ সমস্ত কিছুর কত অতীত ছিলেন! এই তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সমবেত-যুযুৎসু কল্লোল-কাল কুরুক্ষেত্রের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সজনীকান্ত দাস বিভূতিভূষণের অভিনব সৃজনকর্মের মূল্য নির্দেশ করেছেন—"তিনি যেন মানস সরোবর হইতে শীতঋতু যাপনের জন্য আমাদের এই পঙ্ককর্দম ও শৈবাল-লাঞ্ছিত পুষ্করিণীতে অবতরণ করিয়াছিলেন, এখানকার ঝাঁকে মিশিতে পারেন নাই। আমরা শুধু দেখিলাম বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে তাঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক নবশুচিতা ও সহৃদয়তার আমদানি করিলেন। আমরা দীর্ঘবিরোধ ও কঠিন প্রতিবাদের দ্বারা যাহা করিতে পারি নাই বিভূতিভূষণ অবলীলাক্রমে শুধু দৃষ্টান্তের দ্বারা সাহিত্যের সেই চিরন্তন সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন।"[৩৬]

এখানেই বিভূতিভূষণের সৃষ্টিতে কল্লোল-কাল-তরঙ্গলীন দূর তটরেখার আভাস যেন লক্ষ্য করি। আর একবার স্মরণ করি,—বহু বিচিত্র এবং বিপরীতের অপার সমন্বয় ও সংক্ষোভের জটিল রহস্যাবর্তে 'কল্লোলের' শিল্পজগৎ নিয়ত আবর্তিত হয়েছে। ফলে, যে-কোনো এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা বৈপরীত্যের পটভূমিতে সেকালের শিল্পস্বভাবের সম্পূর্ণ পরিচয় আবিষ্কার করা অসম্ভব। বিশেষ করে বিশ শতকের চৈতন্যদীপ্ত শিল্পিসমাজের প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রখর ব্যক্তিত্বের অতুলনীয়তা নিয়ে একে

৩৫। দ্রষ্টব্য—'গল্প লেখার গল্প'—জ্যোতিপ্রসাদ বসু।

৩৬। সজনীকান্ত দাস 'আত্মস্মৃতি'—২য় খণ্ড।

অন্তের থেকে সুদূরবর্তিতায় বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন। মাঝে মাঝে তাই কোনো কোনো শিল্পিগোষ্ঠীর মধ্যে বিষয়গত সাদৃশ্য যখন খুঁজে পাওয়া যায়, তখনো শিল্পি-ব্যক্তির বিষয়ভাবনা আর প্রকাশ-পদ্ধতিতে পার্থক্য দুস্তর হয়ে থাকে। কিন্তু তাহলেও এই বহুদিকাগত বিচিত্র সৃষ্টি-প্রবাহের গোপন উৎসভূমিতে কালের হাতে গড়া ঐক্যবোধের এক অস্ফুট অনুভব দুর্লক্ষ্যতা সত্ত্বেও অনিবার্য হয়ে আছে। তার মধ্যে আছে অপরিবর্তিত স্বরূপ বস্তুসন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা,—বনফুলের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী'।—অকিঞ্চিৎকরতম বস্তুরও সমাহরণ এবং বাস্তবিক রূপায়ণের এক ব্যাকুলতা,—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যাকে বলেছেন 'কাঁচামালের প্রতি আগ্রহ'। সেই সাধারণ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ক্রান্তি কালের এক অনিশ্চয়তাবোধ, দুর্জ্ঞেয় অনালোকিত পথে জীবনরহস্য সন্ধানের উৎকণ্ঠা,—আর্থিক-রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশের অস্বাস্থ্য-জনিত আত্মপীড়ন, [কখনো বা আত্মঅবদমনও, যার গভীরে সঞ্চারিত হয়ে আছে]—এই সব কিছু এবং আরো অনেক কিছুর বিচিত্র ফলশ্রুতি রূপেই বিকশিত হয়েছে কল্লোলের কালের সাহিত্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্তিমকাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা-লগ্ন-সীমা পর্যন্ত যার ঐতিহাসিক পরিধি অল্পবিস্তর সীমিত। বিচ্ছিন্ন এবং সামগ্রিকভাবে বাংলা গল্পের দ্বিতীয়পর্ব প্রসঙ্গে এই বিচিত্র যুগ-লক্ষণাবলীর আলোচনা করেছি বারে বারে।

বলা বাহুল্য, সকল শিল্পের সৃষ্টিতে সব কয়টি যুগলক্ষণ প্রস্ফুট হয়ে ওঠে নি। ব্যক্তিক উপলব্ধি, স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিচিত্র জীবন-পরিবেশকে আশ্রয় করে পৃথক্ পৃথক্ শিল্পীর সৃষ্টিতে যুগ-প্রকৃতির এক বা একাধিক উপকরণ সঞ্চিত-সন্নিবিষ্ট হতে পেরেছে। ঐ একই ব্যক্তিক প্রবণতার বৈশিষ্ট্যেই আবার প্রকাশের প্রকরণেও দেখা দিয়েছে বিচিত্র স্বাতন্ত্র্য আর অভিনবতা। অতএব, 'কল্লোলে'র সকল সংগ্রাম, সকল সন্ধান বিভূতিভূষণের সৃষ্টিতে এসে পরমা পরিণতি লাভ করেছে,—সজনীকান্তের পূর্বোক্ত মন্তব্য পড়ে এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। বস্তুত প্রতিভার স্বধর্মে বিভূতিভূষণও যুগন্ধর নন,—কেবল এক অভিনব যুগপরিবাহক। যুগের সমগ্র আক্ষেপ ও উদ্দীপনাকে নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ মূর্তিতে অবধারণ করেন নি তিনি,—নিজের মতে ও পথে নিজ দেশকালের ক্রান্তি-বাসনার একটি সিদ্ধ রূপমূর্তিই অঙ্কন করেছেন। আর কল্লোলের কালে 'দক্ষিণ' অথবা 'বাম' নির্বিশেষে সকল পন্থার শিল্প সাধকেরাই জীবনের বিষামৃত-সিন্ধুমন্থিত আনন্দরস,—সত্যরস আস্বাদনের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন,—কল্লোলের কাল পারাবার পার হয়ে কোনো এক প্রত্যয়-অরুণালোকিত দিগন্তের আশ্রয়-ক্রোড়ে হয়েছিলেন একান্ত প্রতীক্ষমান। বিভূতিভূষণের সৃষ্টিতে 'কল্লোল'-বাসনার সেই তত্ত্ব-

দিগন্তকে অনুভব করা গেল তাঁর স্বপ্ন-কল্পনা-সুরভিত এক প্রত্যয়-রহস্য-মেদুর অন্তর্লোকে।

এখানে তাঁর এক অভিনব স্বাতন্ত্র্য রয়েছে,—অন্তত আপাতদৃষ্টিতে যা কিছুতেই কাল-সান্নিহিত নয়। অর্থাৎ 'কল্লোলযুগে'র স্বভাব-সিদ্ধ রক্তমাংস-প্রাণের ত্রিধাতু মিশ্রিত শারীর শবাসনে না বসেও এক সুদূর স্বর্গলোকের মোহময় অমৃতগন্ধ যেন বয়ে এনেছেন শিল্পী তাঁর সৃষ্টির, এবং নিজের ব্যক্তিক অস্তিত্বেরও চারপাশে। অনেকটা তাঁর 'তারানাথের গল্পে'র সেই বেলেঘাটার সাধুর কথা মনে পড়ে, যিনি দূর থেকে দর্শনার্থীর পকেটের ভেতরকার রুমাল ভরে দিয়েছিলেন বেলফুলের মধুগন্ধে। বিভূতি-ভূষণও তেমনি এক অলৌকিক উপলব্ধিলোকের চাবিকাঠি নিয়ে যেন ফিরতেন চেতনার গহনে,—তাই বিশ শতকের রুচি, আদর্শ, মত ও দৃষ্টিভঙ্গীর ক্রান্তিকালীন অজস্র ভেদ-উত্তেজনার কণামাত্র স্পর্শ না করেও আমাদের কালের প্রত্যয়ভঙ্গের যন্ত্রণার্ত পৃথিবীকে এক লোকোত্তর মাধুর্যের সুধাগন্ধে যেন ভরপুর করে তুলেছেন। সজনীকান্তও আসলে এই কারণেই বিভূতিভূষণকে বলেছেন, 'কল্লোলের কালে'র পঙ্কিল কর্দমাক্ত মাটিতে মানস সরোবরের পথিক পাখি। বস্তুত কল্লোল-কল্লোলেতর-কল্লোল-বিরোধী, কোনো ঝাঁকেই তিনি মিশে উঠতে পারেন নি।

এই উপলক্ষেই বিভূতিভূষণ-প্রতিভার কালাতিশায়ী স্বাতন্ত্র্যের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়ে থাকে। "বিভূতিবাবুর সমালোচকগণের" সম্ভাব্য সেই অভিযোগ অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় সমুচিত প্রাঞ্জলতা পেয়েছে :—"বর্তমান বাঙালি লেখকগণের সকলেরই রচনা স্বকাল ও স্বসমাজ দ্বারা চিহ্নিত, কিন্তু বিভূতিভূষণের অধিকাংশ রচনায় যেন দেশকালের কৈবল্য ঘটিয়াছে, সে-সব যে আজকার ঘটনা, তাহা বিশেষ-ভাবে বুঝিবার উপায় নাই। তাঁহার রচনায় কোকিল ডাকিতেছে তাহা শুনিয়া মনে পড়ে 'বাংলা দেশে' ছিলাম যেন তিনশ বছর আগে।"[৩৭]

তাহলেও, প্রমথনাথ বলেছেন,—বিভূতিভূষণ আধুনিকদের মধ্যেও অভিনব ছিলেন প্রকৃতি-চিত্রণের বৈশিষ্ট্য-গুণে। সে তথ্যের বিস্তারিত আলোচনা পরে হতে পারবে। কিন্তু, এখানেই,—এই প্রকৃতি-চেতনার প্রসঙ্গেই শিল্পীর রোমান্টিক্ প্রবণতার যথার্থ পরিচয় অবধারণ করে রাখার যোগ্য। প্রমথ বিশী এই প্রকৃতি-প্রাধান্যের প্রসঙ্গে লিখেছেন,—"বিভূতিভূষণের উপন্যাসেও প্রকৃতি ও মানুষ এক সূত্রে গ্রথিত। তাঁহার সর্বজনপরিচিত অপু 'অর্ধেক মানব তুমি অর্ধেক প্রকৃতি'।" বস্তুত এটুকু কেবল বিভূতিভূষণের উপন্যাস, ছোটগল্প এবং অপুর সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়, শিল্পীর নিজের

৩৭। 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পে'র ভূমিকা।

ব্যক্তিস্বভাবের পক্ষেও একান্ত সত্য। এই প্রকৃতিভাবনার শক্তিতে বিভূতিভূষণ কেবল রোমান্টিক্ নন,—নিজের ব্যক্তি-জীবনে মাঝে মাঝে মিস্টিক্ রহস্যময় স্বরূপের ভূমিকাও গ্রহণ করেছেন। তাঁর গল্প-সাহিত্যের শরীরেও রোমান্স-রহস্য-মেদুরতার সঙ্গে মিস্টিসিজম্-এর গাঢ়তর রহস্যস্বাদ বিমিশ্রিত হয়েছে মাঝে মাঝে। আর এই সবকিছুর উৎস ছিল শিল্পীর অদ্ভুত—প্রায় অপার্থিব ব্যক্তিত্ব।

-পৃথিবীর প্রকৃতিধর্ম সম্পর্কে নিজের উপলব্ধিকে ব্যক্ত করে নিজের দিনলিপিতে তিনি লিখেছিলেন,—"এই পৃথিবীর একটা spiritual nature আছে। আমরা এর গাছপালা, ফুলফল, আলোছায়া, আকাশ বাতাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছি বলে, শৈশব থেকে এদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ বলে, এর প্রকৃত রূপটি অনুভব করা আমাদের বড় কঠিন হয়ে পড়ে।"[৩৮]

নিজের জীবনে এবং সাহিত্যে এই কঠিনকে সহজ করাই বিভূতিভূষণের প্রায় একমাত্র ব্রত,—আর তার মূল রহস্য শিল্পি-আত্মার আশ্চর্য উৎক্রান্তি-ক্ষমতায়। পৃথিবীর চারপাশে ছড়ানো গাছপালা, ফুলফল, আলোছায়া আকাশ-বাতাসের বস্তু-প্রকৃতির মধ্যেই,—এই সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করেই তো রয়েছে তার মূল-নিহিত 'spiritual nature', আর ঐ আধ্যাত্মিক আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতিতেই বিভূতিভূষণের সৃষ্টিতে বিস্তারিত রয়েছে বিশ শতকের মানব-চেতনার পক্ষে এক স্বর্গীয় সান্ত্বনা। অতএব এই সবকিছুকে আত্মস্থ করে নেবার,—অথবা এই সবকিছুর অভ্যন্তরে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারার পরম লগ্নে নিজের চেতনাকে এই সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে উৎক্রান্ত করে নিয়ে বিশ্বরহস্যের আস্বাদন করতে পারাতেই বিভূতিভূষণের আত্মার তৃপ্তি। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে বিভূতিভূষণকে তারাশঙ্কর 'সাধক' বলেছিলেন—'কুশলপাহাড়ী' গ্রন্থের পরিচায়ন উপলক্ষে। তন্ত্র-সাধনার কাহিনী তারাশঙ্করের মত বিভূতিভূষণও চিত্রিত করেছেন বারে বারে। সেই সূত্রেই তন্ত্রসাধকের আনন্দসম্ভোগের সাধারণ পদ্ধতি স্মরণীয় হতে পারে। সেই অলৌকিক আস্বাদনের চরম লগ্নে তন্ত্রসাধক দেহ-শীর্ষে সহস্রারদলপদ্মে আজ্ঞাচক্রে চৈতন্যকে সাক্ষিরূপে অধিষ্ঠিত করে তবেই আনন্দ-সুধা পান করে থাকেন। ক্ষীর-সমুদ্রের কীট যেমন ক্ষীর-নীরের পার্থক্য আস্বাদন করতে পারে না,—অন্ধকারের জীব যেমন তার বিভীষিকা, অথবা আলোকের মহিমা অনুভব করতে পারে না,—তেমনি বিষয়লগ্ন থেকে বিষয়ীর পক্ষেও বিষয়ানন্দ উপলব্ধি করা অসম্ভব হয়। এখানেই বিভূতিভূষণ যথার্থ সাধক,—তাঁর একান্ত, প্রায় একমাত্র প্রীতি-সম্বল চেতনা প্রকৃতি-সৌন্দর্যের অজস্র উপকরণ-ভূমিষ্ঠ

৩৮। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—'তৃণাঙ্কুর'।

বিষয়লোক থেকে চরম লগ্নে আত্মপরিচ্ছিন্ন হয়ে তবেই তার স্বরূপকে আস্বাদন করতে পেরেছে।

দৃষ্টান্ত দিলে তবেই বক্তব্য স্পষ্ট হতে পারে। নিজের দিনলিপিতে একটি বর্ণনা আছে শিল্পীর,—শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে বাইরে এসেছিলেন তিনি সেদিন। চাঁদ অস্তমিত হয়ে গেছে অনেকক্ষণ,—তবু 'মনে হল খুব মৃদু জ্যোৎস্নালোক' যেন ঘরের দাওয়ায়। জ্যোৎস্না যে তাতে সন্দেহ নেই, চারদিকে সবকিছুর ক্ষীণ ছায়া পড়েছে,—এমন কি শিল্পীর নিজের শরীরেও। হঠাৎ দূর আকাশে নজরে পড়ে গেল 'শুঁইতে তারা.'—শুক্র-জ্যোৎস্নার ঐ ক্ষীণ মৃদু অপরূপ আভা। আর তো ঘুম হল না,—চমকিত হয়ে উঠ্‌লো চেতনা!—শিল্পী বলেন,—"আমার মন পৃথিবীর গণ্ডী ছাড়িয়ে বহুদূর ব্যোমপথে গেল উড়ে—আমি যে গ্রহলোকের জীব, আমার নাম, স্থান যে বিশাল শূন্যের মধ্যে, অন্য আরও গ্রহ ও অগণ্য তারাদলের মধ্যে, কত কোটি সূর্য সেখানে দীপ্যমান, কত নীহারিকাপুঞ্জ, কত দৃশ্য অদৃশ্য শক্তি, বিদ্যুৎ, কস্‌মিক্ রে,—এদের সঙ্গে আমার আত্মা যেন এক হয়ে গেল। আমার অর্থলিপ্সু বৈষয়িক আত্মা মুক্তিলাভ করলে অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্যে। ঐ শুকতারার আলোর পথ বেয়ে উড়ে চলে গেল অসীম দ্যুতিলোকের মধ্যে।"[৩৯]

এখানেই বিভূতিভূষণের আশ্চর্য সৃজনলোকের রহস্যদ্বার। আমাদের বস্তুময় পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকর গাছপালা-ফলমূলধুলামাটির উপকরণ নিয়ে আপন 'অসীম দ্যুতি'-চৈতন্যের অলৌকিক শক্তি-মাধুর্য মণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাস। তাই দেখি, বিভূতিভূষণের রচনায় চেনাজগতের পুঞ্জিত বস্তু-সম্ভার বারে বারেই অতীন্দ্রিয় স্বাদুতার রহস্যমেদুর হয়ে ওঠে। কেবল এই কারণেই আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত জীবনের গলিপথে চলতে চলতে যেন কোনো স্বর্গীয় অপরিচিত গন্ধের সুবাসে অন্যমনস্ক করে তোলে তাঁর সৃষ্টি। শিল্পি-চেতনার বস্তুত্তরণ, সৃষ্টির মধ্যে বিষয়াতীতের এই স্বপ্ন-স্বাদুতার স্বভাবগুণেই 'কল্লোলের কালে'র গল্পসাহিত্যে বিভূতিভূষণ রোমান্টিক্ নামে অভিহিত।

রোমান্টিকতার মুখ্য তিনটি উপকরণের উল্লেখ করা যেতে পারে। (১) প্রকৃতি-প্রেম, (২) অতীত-প্রীতি এবং (৩) লোকোত্তর লোকাভিসার। বিভূতিভূষণের সৃষ্টিতে প্রথম উপকরণই যে প্রধান প্রেরণাশক্তি, এ পর্যন্ত আলোচনায় তা পরিস্ফুট হতে পেরেছে নিশ্চয়ই। বস্তুত অতীত-প্রীতি, তথা গল্পের স্বপ্নসূত্র বয়নের সমুচিত পরিবেশ কামনায় ইতিহাসের রহস্যলোকে তলিয়ে যাওয়ার প্রয়াসও শিল্পীর পক্ষে প্রকৃতি-প্রীতিরই

৩৯। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—'ঊর্মিমুখর'।

এক রূপান্তর মাত্র। অতীন্দ্রিয় জগতের সান্নিধ্যসাধনের চেষ্টাতেও অনুষঙ্গ হিসেবে প্রকৃতি উপস্থিত রয়েছে, যদিও ঐসব ক্ষেত্রে শিল্পীর ব্যক্তিমানসের অলৌকিক রহস্য-প্রীতির আগ্রহই গাঢ়তর বর্ণে চিত্রিত হতে পেরেছে।

সেই সঙ্গে রোমান্টিক স্বপ্নচারণার আরো এক নবতর উপকরণ নারীর মোহিনী-প্রেমের মদির কল্পনা-ভাবনা। এমন ধারণা প্রায় সুলভ হয়ে পড়েছে যে, বিভূতিভূষণের ধ্যানী পবিত্র আত্মা নারী-প্রণয় সম্পর্কে অন্যমনস্ক ছিল। কিন্তু এ তথ্য যথার্থ নয়। বিভূতিভূষণের রোমান্টিক্ শিল্পধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রয়াস প্রকৃতি ও মানুষের অন্তর্নিহিত রহস্য-সম্পর্কের সন্ধান এবং আবিষ্কার; আর সেই 'অবাস্তব-মনোহর' সৌন্দর্যের অলৌকিক পিপাসালোকে মানুষ প্রায়ই দেখা দিয়েছে স্নেহ-প্রেম-বাৎসল্যময়ী মোহিনী নারীর মূর্তিতে। বিভূতিভূষণের সৃষ্টিতে প্রেয়সী নারীর পরিচয় সুলভ যদি নাও হয়,—নারীপ্রেম সেখানে প্রায় প্রাকৃতিক পুষ্পপত্রের মতই সহজ এবং স্বয়ংস্ফুট। এ বিষয়ে শিল্পীর ব্যক্তিগত অনুভবের কয়েক পংক্তি উদ্ধার করে দেওয়া যেতে পারে তাঁর দিনলিপি থেকে—

"মানুষই মানুষের প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করে। জীবনে যদি প্রেম এসে থাকে, তবে তুমি পার্থিব বিত্তে দীন হলেও মহাধনী—ফোর্ড বা রকফেলার তোমায় হিংসা করতে পারেন। আর যদি প্রেম না আসে, যদি কারো স্মিত-হাস্য-ভরা চোখ দুইটি তোমার অবসর মুহূর্তে মনের সামনে ভেসে না ওঠে, যদি মনে না হয়, দূরে কোনো পল্লীনদীর তটের ক্ষুদ্র গ্রামে, কি কোনো শৈলশিখরের পাইন-বার্চ গাছের বনের ছায়ায় কোনো স্নেহময়ী নারী নিশ্চিন্ত নিরালা অবসরে তোমার কথা ভাবে তবে ফোর্ড বা রকফেলার হয়েও তুমি হতভাগ্য।"[৪০]

বস্তুত বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প-রচনার মধ্যেই তাঁর শিল্প-ধর্মের দ্বিধাহীন স্বাক্ষর প্রগাঢ় বর্ণে চিত্রিত হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃতির পটভূমিতে নারীপ্রেম,—তথা অলৌকিক নারীস্নেহের অবাস্তব-মনোহর রূপোদ্‌ঘাটন, আর সমস্ত কিছুর মর্মে সিঞ্চিত শিল্পীর রোমান্স-স্বপ্নের মদিরপ্রবাহ!—'উপেক্ষিতা' গল্পের শুরুতে শিল্পী জানিয়েছেন,—হুগ্‌লি জেলার এক গ্রামে মাস্টারি নিয়ে গিয়েছিল বিমল,—বয়স তখন সবে তার কুড়ি বছরের সীমায়। প্রাচীন আম-কাঁঠালের বনে সমস্ত গ্রামটি অন্ধকার। বিমল থাকতো গ্রামের বাইরে, রেলের P. W. D.-র পরিত্যক্ত বাংলোয়,—স্টেশন মাস্টারের ছেলেকে সে পড়াত বাড়িতে। বিমলের বাংলো থেকে স্কুলে যাবার দুটি রাস্তা; একটি সদর,—আর এক, গ্রামের ভেতর দিয়ে গেছে বনছায়া ঘেরা পুকুরের পথ। এক বর্ষাঘন দিনে সেই

৪০। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—'উৎকর্ণ'।

গ্রাম-পথ দিয়ে ত্বরিত পদে স্কুলে যাবার সময়ে বিমলের দেখা হয়ে যায় এক গ্রাম-বধূর সঙ্গে—২৫-২৬ বছর বয়স,—"গাঢ় টক্‌টকে রঙ্‌, পরণে চওড়া লালপাড় শাড়ি, হাতে বালা অনন্ত।" লাজকুন্ঠিতা গ্রাম-বধূর সঙ্গে কথা হল না সেদিন একটিও,—এমন কি ঘোমটার আড়ালে মুখটিও বুঝি ভালো দেখা গেল না। তবু বিমলের কি যে হল,—নিজের কথা নিজেই সে বিবৃত করেছে,—"বিকালবেলা রেল লাইনের মাঠে গিয়ে চুপ করে বসে রইলুম। তালবাগানের মাথার উপর সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। বেগুনী রংএর মেঘগুলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্রমে ধূসর, পরেই আবার কালো হয়ে উঠ্‌তে লাগলো। আকাশের অনেকটা জুড়ে মেঘগুলো দেখ্‌তে হয়েছিল যেন একটা আদিম যুগের জগতের উপরিভাগের বিস্তীর্ণ মহাসাগর। বেশ কল্পনা করে নেওয়া যাচ্ছিল যে, সেই সমুদ্রের চারিপাশে একটা গূঢ় রহস্যভরা অজ্ঞাত মহাদেশ, যার অন্ধকারময় বিশাল অরণ্যানীর মধ্যে প্রাচীন যুগের লুপ্ত অতিকায় প্রাণীরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে।

"দিন কেটে গিয়ে রাত হল। বাসায় এসে Keats পড়তে শুরু করলাম। পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, মাটির প্রদীপের বুক পুড়ে উঠে প্রদীপ কখন নিভে গিয়েছে। অনেক রাত্রে উঠে দেখলুম বাইরে টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি পড়ছে, আকাশ মেঘে অন্ধকার।"

দিন যায়, বিমল এখন আর প্রায়ই ওপরের সদর রাস্তা দিয়ে স্কুলে যায় না। গ্রামের বনপথ দিয়ে চলে যেতে যেতে মাঝে মাঝেই দেখা হয়ে যায় সেই গ্রামবধূর সঙ্গে—কখনো বা মনে হয়, সেও বুঝি ঘোমটার আড়ালে তাকিয়ে দেখে বিমলকে। কিন্তু কথা, পরিচয়,— সে আর কিছুতেই হয় না।

একদিন শরৎকালের নীল আকাশ শাদা-মধুর আলোয় ভরে উঠেছে। এমন সময়, স্কুলে যাবার একলা বনপথে বিমলই এগিয়ে গিয়ে কথা বলে। আশ্চর্য সাড়া পাওয়া যায় অপরিচিতা বধূর পক্ষ থেকেও। বিমল তাকে ডাকে 'বৌদিদি'—ঐ রকমই বিমলের মেজ্‌দি ছিল, যে তাদের ছেড়ে চলে গেছে অকালে। অপরিচিতাও আপত্তি করে নি;—অনেকদিন পরে বিমল জেনেছিল,—বৌদিদির মুখে,—তার নিজেরও এক ভাই ছিল,—অবিকল ঐ বিমলের মত দেখতে—নামও ছিল বিমল,—সেও আর নেই আজ! ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হয়ে উঠেছিল শোক-বিচ্ছেদবোধের সমানুভব-সূত্রে। বিচিত্র রকমের ভালোমন্দ খাবার করে নিয়ে আসত 'বৌদিদি' সেই বনপথে, গোপনে; প্রায় প্রতিদিন। কিন্তু সে সব আরো অনেক পরের কথা। 'বৌদিদি'র প্রথম সান্নিধ্য ও স্বীকৃতির উত্তাপ উপলব্ধি করে সেই শারদ সন্ধ্যায় বিমলের মনে হয়েছিল,—"আমার মাঠের ধারে তালবাগানটায় পাখিগুলো রোজই সকাল বিকাল

ডাকে। একটা পাখি তার সুর খাদ থেকে ধাপে ধাপে তুলে একেবারে পঞ্চমে চড়িয়ে আনে; মন যেদিন ভারি থাকে, সেদিন সে সুরের উদাস মাধুর্য প্রাণের মধ্যে কোনো সাড়া দেয় না। আজ দেখলুম পাখিটার গানের সুরের স্তরে স্তরে হৃদয়টা কেমন লঘু থেকে লঘুতর হয়ে উঠ্‌ছে। মনে হতে লাগল জীবনটা কেবল কতকগুলো স্নিগ্ধ ছায়াশীতল পাখির গানে ভরা অপরাহ্নের সমষ্টি, আর পৃথিবীটা শুধু নীল আকাশের তলায় ইতস্ততঃ বর্ধিত অযত্ন-সম্ভূত তাল নারিকেল গাছের বন দিয়ে তৈরি—যাদের ঈষৎ কম্পমান দীর্ঘ শ্যামল পত্রশীর্ষ অপরাহ্নের অবসন্ন রৌদ্রে চিক্ চিক্ করছে।"

প্রথম দিনের এই অনুভব ব্যর্থ হয় নি,—আগেই বলেছি—'বৌদিদি'র সঙ্গে বিমলের নৈকট্য নিবিড়তর হয়েছিল পূজার ছুটিতে চলে যাবার আগে কয়েকদিনের মধ্যেই। কিন্তু বিভূতিভূষণের সৃষ্টির পক্ষে সেটুকু একান্ত অকিঞ্চিৎকর—নিছক রোমান্টিক্ স্বপ্ন বয়নের বস্তুসূত্র মাত্র—গল্পের রসমূল্যের পক্ষেও তা একান্ত নেপথ্যবর্তী। তাহলেও এখানেই তাঁর সৃষ্টির মূলগত কলাকৌশলটুকু লক্ষ্য করে নেওয়া যেতে পারে। সমগ্র গল্পে মানবপ্রেমের,—তথা রোমান্টিক্ নারীস্নেহের আবিষ্কার এবং ক্রমবিকাশ মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে প্রকৃতি-উপলব্ধির সূত্র অনুসরণ করে। পূর্বে একাধিক প্রসঙ্গে সিদ্ধ রবীন্দ্রানুভবের কথা উল্লেখ করেছি।—প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নাড়িচলাচলের এক অভিনব অতীন্দ্রিয় রহস্যসূত্র আবিষ্কার করেছিলেন কবি আপন নিভৃত উপলব্ধিতে। গোটা গল্পটি জুড়ে প্রকৃতি-প্রেমিক বিভূতিভূষণ তাঁর স্বকীয় স্ব-তন্ত্র পথে সেই নাড়িচলাচলেরই হিসাব-নিকাশ করেছেন। বর্ষা-প্রকৃতির বেদনা-মাধুরীভরা অতীন্দ্রিয় উৎকণ্ঠাকে যেন মানবীর আকস্মিক মূর্তিতে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিল বিমল সেই গ্রাম্য বনপ্রচ্ছায়তলে। কিন্তু বর্ষার প্রকৃতি তো পেয়ে হারাবার —পাওয়া-না-পাওয়ার বেদনাতেই অকারণ ম্লান।—তাই বৌদিদিকে পেয়েও পাওয়া হয় না বিমলের। বরং না-পাওয়ার বেদনাকেই সে যেন আত্মার উপলব্ধিতে নূতন করে পেতে চায় প্রকৃতির মূক গহন রহস্য-আস্বাদনের মাধ্যমে। সেপথে তার সঞ্চারণা করেন ইংরেজি সাহিত্যের প্রখ্যাত রোমান্টিক্ কবিকুল।

শরৎপ্রকৃতি আবার প্রাপ্তির শুভ্র আনন্দে শিউলি-মদির,—যে প্রাপ্তিতে পাওয়ার চরিতার্থতা আছে,—কিন্তু বিহ্বলতা নেই। তেমন দিনে নিভৃত স্নেহ-বাসনার গহনে হারানো ভাইবোনকে ফিরে পেল বৌদিদি আর বিমল,—আর সেই মানবিক প্রাপ্তির উল্লাসেই প্রাকৃতিক মাধুর্য নতুন তাৎপর্যে মুখর হয়ে উঠল। বিভূতিভূষণের গল্পে প্রকৃতি আর মানবজীবন নিসর্গ-গহন উপলব্ধির পথে গলায়

গলায় জড়িয়ে চলেছে—কখনো ভাইবোন, কখনো বন্ধু, কখনো সখাসখী, কখনো দয়িত-দয়িতার নিবিড় স্নেহ-প্রেম-প্রীতির বন্ধনে।

এই উপলব্ধি যতই বিরলদৃষ্ট হোক,—তার পুঙ্খানুপুঙ্খ স্বভাব-বাস্তবতায় সংশয় করার অবকাশ বেশি নেই। অর্থাৎ বিমলের কুড়িবছর বয়সের নিঃসঙ্গ প্রবাসজীবনে প্রকৃতি-প্রেম ও স্নেহোৎকণ্ঠার এই রোমান্টিক্ ব্যাকুলতা, অন্যপক্ষে নিভৃত-চারিণী বৌদিদির অসহায় গোপনচারী স্নেহ-বেদনা—বিভূতিভূষণের বর্ণিত পল্লী-প্রকৃতির বর্ণনার মতই এরা যথার্থ এবং বাস্তব। কিন্তু তাঁর গল্পের শরীরে বাস্তবিকতার স্বাদ জমাট বেঁধে উঠতে পারে নি কোথাও। সে কেবল শিল্পীর ঐ আত্ম-উৎক্রান্তির অভিনব বৈশিষ্ট্যে।

নানা উপলক্ষে বৌদিদির সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য প্রায় গোটা আশ্বিন মাস ধরে যখন আত্মিক নৈকট্যের রূপ ধরেছে, তখনই স্কুলে পূজার ছুটির সাড়া পড়ে যায়,—বিধবা মার কাছে ফিরে যায় বিমল। দীর্ঘ অবকাশের পরে ফিরে আবার সেই পুরাতন ছায়াঘেরা পরিবেশে দেখতে পেল বৌদিদিকে—এক অনির্বচনীয় পুলকে চমকিত হয়ে উঠল তার মন। এতো সে বৌদিদি নয়,—বৌদিদির চেনা দেহাধারে আজ এক নতুন অস্তিত্বকে আবিষ্কার করে তার অনুভব। বিমল বলে,—"সারাটি ছুটিতে দূরবাসের কালে আমার মনের মন্দিরে আমারই শ্রদ্ধা ভালবাসার গড়া তাঁর কল্পনামূর্তিকে অনেক অর্ঘ্য-চন্দনে চর্চিত করেছি। তাই সেদিন যে বৌদিদিকে দেখলুম তিনি পূজার ছুটির আগেকার সে বৌদিদি নন, তিনি আমার সেই নির্মলা, পূতহৃদয়া, পুণ্যময়ী প্রতিমা, আমার পার্থিব বৌদিদিকে তিনি তাঁর মহিমাখচিত দিব্য বসনের আচ্ছাদনে আবৃত করে রেখেছেন, তাঁর স্নেহ-করুণার জ্যোতির্বাষ্পে বৌদিদির দেহটায় একটা আড়াল সৃষ্টি করেছিলেন।

এ কাকে দেখলুম বল্‌বো?

আমাদের এই পৃথিবীর জীবনের বহু ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত রাজ্যে অনন্তের পথের যাত্রীরা আবার বাসা বাঁধবে, হয়তো যে দেশের আকাশটা রঙে রঙে রঙীন, যার বাতাসে কত সুর, কত গন্ধ, কত সৌন্দর্য, কত মহিমা, ক্ষীণ জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া কত সুন্দরী তরুণীরা যে দেশের পুষ্পসম্ভার-সমৃদ্ধ বনে-উপবনে ফুলের গায় বসন্তের হাওয়ার মতো তাঁদের ক্ষীণ দেহের পরশ দিয়ে বেড়াচ্ছেন, সেই অপার্থিব দিব্য সৌন্দর্যের দেশে গিয়ে আমাদের এই পৃথিবীর মা-বোনেরা যে দেহ ধারণ করে বেড়াবেন,—এ যেন তাঁদের সেই সুদূর ভবিষ্যৎ রূপেরই একটা আভাস আমার বৌদিদিতে দেখতে পেলুম।"

একদিন শুক্ল-জ্যোৎস্নার অপরূপ মৃদু আলোক-রেখাঙ্কনে আমাদের পৃথিবীকে অতিক্রম করে লোকাতীতের পথে দূরাভিসার করেছিল বিভূতিভূষণের ব্যক্তিচেতনা —আজ তাঁরই শিল্প-স্বপ্ন 'উপেক্ষিতা' গল্পের বিমলের মধ্যে প্রক্ষেপিত বৌদিদির মানবীরূপকে আশ্রয় করেই অতিমানব-লোকের রোমান্টিক্ অভিসারে বেরিয়ে পড়ল। এর সবটুকুই কেবল রোমান্টিক্ নয়,—বিভূতিভূষণের সুনিশ্চিত অতীন্দ্রিয় প্রেম এবং আত্ম-উৎক্রান্তির কল্পনাদীপ্ত সাধন-পথ বেয়ে সেই রোমান্টিকতা যেন অসীমানুভবের ক্ষীণ অস্ফুট ব্যঞ্জনায় মিস্টিক হয়ে ওঠে। এই বিশেষ তাৎপর্যেই বিভূতিভূষণকে 'কবি' অভিধাযুক্ত করেছেন তাঁর চেয়ে কনিষ্ঠ আরো এক কবি,— "কবিমাত্রেই রোমান্টিক্। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বেড়া ডিঙিয়ে যাওয়াটাই সমস্ত সৃষ্টির নিহিত প্রেরণা, কবি দূরান্বেষী।"[৪১] বিভূতিভূষণের মধ্যে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বেড়া-ডিঙানো এই দূরান্বেষিতাকেই শিল্পীর উৎক্রান্তি-ধর্ম বলে অভিহিত করেছি; এই অর্থেই তাঁর রোমান্টিকতাও অনতিস্ফুট মিস্টিসিজম্-এর সুরভিযুক্ত।

এখানেই আরো একটি সত্য স্পষ্ট করে নেবার প্রয়োজন রয়েছে। বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাসে প্রকৃতি-প্রীতির প্রসঙ্গে নানা প্রতীচ্য পূর্বসূত্রের উল্লেখ বহুধা উচ্চারিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে Thomas Hardy-র কোনো কোনো রচনার সঙ্গে তাঁর কোনো কোনো লেখার সদৃশতা লক্ষ-গোচর হয়েই থাকে। তাহলেও সেটুকু কেবল বহিঃসাদৃশ্য। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-চেতনার কোনো পূর্বসূত্র যদি খুঁজতেই হয়,—অন্তঃস্বভাবের দিক্ থেকে তা কেবল রবীন্দ্র-ভাবনাতেই উপস্থিত,— তাও গল্প-উপন্যাসের চেয়ে রবীন্দ্র-কবিতায়। প্রকৃতির মধ্যে আত্মিক অস্তিত্বের অনুভব অনেক রোমান্টিক্ ইংরেজ কবির মধ্যেও দুর্লভ নয়। Wordsworth, Keats, Shelley-র সঙ্গে ঔপন্যাসিক Thomas Hardy-ও এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হতে পারেন। কিন্তু বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-চেতনা বিশেষার্থে আধ্যাত্মিক। হিন্দুর জন্মান্তরবাদ এবং পরলোক-রহস্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার মূল স্বভাবটুকুই অসার্থক হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়, রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস-কবিতায় প্রকৃতি-চিত্রণের বহুস্থলে হয়ত প্রতীচ্য-কবিতার আপাত সদৃশতা রয়েছে, যদিও অধ্যাপক তারকনাথ সেন রবীন্দ্র কাব্যে 'প্রতীচ্য প্রভাবের' প্রচলিত ধারণা সম্পর্কে বিপরীত সত্যই প্রতিষ্ঠা করেছেন বিস্ময়কর দৃঢ়তার সঙ্গে।[৪২] কিন্তু প্রতীচ্য পূর্বভাবনার প্রেরণা যতটুকুই থাক্, রবীন্দ্রনাথের অনেক কয়টি সার্থক রোমান্টিক্

৪১। ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র। দ্রষ্টব্য :—'সাহিত্য, সাধনা, সমন্বয়'—'সাহিত্যের খবর' পৌষ ১৩৬৬।
৪২। দ্রঃ T. N. Sen—'Western Influence on the Poetry of Tagore'.

কবিতার বর্তমান রূপ-সৌন্দর্য-লাবণ্য অসম্ভব হত, তার মূল থেকে হিন্দু জন্মান্তরবাদের বিশ্বাসটুকুকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে। 'অহল্যার প্রতি,' 'বসুন্ধরা,' 'সমুদ্রের প্রতি' ইত্যাদি বিখ্যাত কবিতাগুলি কেবল ডারউইনের বৈজ্ঞানিকতার রসফলশ্রুতি নয়, একথা অনুভব করার প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-দর্শনের গহনে গভীর আধ্যাত্মিকতার কথা বাদ দিয়েও রোমান্স-রস যতটুকু আছে,—সেও ঐ জন্মান্তর-রহস্য-ভাবনার অপরূপ পরিণাম বই কি ?

এই রহস্য-চেতনা কবির মধ্যে প্রথম উদ্ভূত হয়েছিল সহজাত বৃত্তির মত। 'ছেলেবেলা', 'জীবনস্মৃতি' প্রভৃতি গ্রন্থে সেই অপ্রত্যাশিত অপরূপ আবির্ভাবের অনুভব যথার্থ চিত্রিত হয়েছে। পরবর্তী কালে মহর্ষির সান্নিধ্যে বালক-কবির মনে প্রথম নিসর্গ-স্পন্দনের স্মৃতি, সৌরভের সঙ্গে ব্যক্তিগত ঔপনিষদিক প্রত্যয় ও উপলব্ধি যুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের নিসর্গপ্রেম এক অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিকতা লাভ করেছে। এই একই অর্থে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-প্রেম, তথা তাঁর সামগ্রিক রোমান্টিক্ চেতনা আধ্যাত্মিকতা-সুরভিত। এ-পথে উপনিষদের কবিকুলের পরে শিল্পীর একমাত্র পূর্বসূরী কবি রবীন্দ্রনাথ,—একথা যেন না ভুলি। তাঁর 'কুশলপাহাড়ি' গল্পের সাধুজি নিজের উপলব্ধিকে গেঁথে দিয়েছিলেন, ঈশোপনিষদের একটি শ্লোকের সূত্রে। শ্লোকটি তিনি ব্যাখ্যাও করেছিলেন। "বার বার" তিনি "বলতে লাগলেন, 'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ', শ্লোকটির মধ্যেকার কবি কথাটার অর্থ—বৃদ্ধ। সাধুর মুখের সেই মধুর গম্ভীর বাণী আজও কানে বাজে :— 'কবিই তিনি বটেন বাবা। এখানে বসে বসে দেখি। এই শালগাছটাতে ফুল ফোটে, বর্ষাকালে পাহাড়ে ময়ূর ডাকে, ঝর্ণা দিয়ে জল বয়ে যায় তখন ভাবি কবিই বটে তিনি। আমি কিছু পাইনি বাবা। দেখ্‌চো এসব বাইরের ভড়ং। ভেতরের জ্ঞান কিছু হয় নি। তবে দেখ্‌তে চেয়েছি তাঁকে। তাঁর এই কবিরূপ দেখে ধন্য হয়েছি'।"

এই শেষোক্ত কথা ব্যক্তি এবং শিল্পি-বিভূতিভূষণেরও। এই অনুভব যতটুকু তাঁর পাঠকেরও বিভূতিভূষণের যথার্থ আস্বাদনে তিনি ততটুকুই কেবল চরিতার্থ। বস্তুত 'কল্লোলযুগে'র তটদিগন্তে তাঁর সৃষ্টির অনন্য-স্বাদুতা এখানেই। প্রচলিত রোমান্টিকের মত বস্তু-বিমুখ, বাস্তব-পলাতক নন বিভূতিভূষণ। তারাশঙ্কর যাঁকে 'সৃষ্টির কাঁচামাল' বলেছেন, অন্তত প্রকৃতি-চিত্রণ প্রসঙ্গে তার প্রাচুর্য-সমৃদ্ধি বিভূতিভূষণের রচনায় অতুলনীয়। মানব-স্বভাব-চিত্রণেও পরিবেশোচিত বাস্তবিকতাকেও শিল্পী যে এড়িয়ে চলেন নি 'উপেক্ষিতা' গল্পের পূর্বোক্ত আলোচনায় সেকথা বলেছি। তবু—এই বস্তুসমৃদ্ধি সত্ত্বেও বিভূতিভূষণের গল্প-বিষয়ে এমন এক বস্তুভারহীন মুক্তি রয়েছে,—অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে যা নিরর্থক লঘুতা, স্বপ্নাতুর রোমান্টিকতা বলেই কেবল মনে হয়। কিন্তু

একালের পরমাণবিক আকাশচারণের যুগে এই শৈলী-রহস্য সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হওয়া উচিত নয়। বিশ্ব-আকাশে বায়ুস্তর পেরিয়ে গেলেই আর কোনো ভার উপলব্ধ হয় না—সমগ্র অস্তিত্ব এক ভারহীন মুক্তিতে মেঘের চেয়েও হাল্কা হয়ে পড়ে। আমাদের বস্তুজগতের অতিভারাক্রান্ত যান্ত্রিক খোপরে বসে সেই মুক্তিলোকে পরিক্রমা করে আসছেন একের পর এক মহাশূন্যের অভিযাত্রিগণ। সৃষ্টির জগতে বিভূতিভূষণও সেই আধুনিকতম কলাকৌশল আবিষ্কার করেছিলেন, আমাদের কালের বিজ্ঞান যে রহস্য আবিষ্কার করেছে তাঁর তিরোভাবেরও বহুবছর পরে। সেই অলৌকিক কলাচাতুর্যের বশে আমাদের ধুলামাটির বস্তুভার-সমৃদ্ধ প্রকৃতি ও মানব জীবনের অসংখ্য উপকরণের উদ্‌যানে চড়ে উৎক্রান্তিধর্মী শিল্পী নিজ আত্মার শক্তিতে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি-সুরভিত রোমান্টিক্ স্বপ্ন-কল্পনার জগতে। যার ফলে বিভূতিভূষণের সৃষ্ট জীবন ও জগৎকে এক আশ্চর্য মায়ালোক বলে মনে হয়, যা আমাদের হয়েও বুঝি আমাদের নয়,—আমাদের না হলেও, আমরা ছাড়া আর কারো জন্যেই নয়।

'উপেক্ষিতা' গল্পে এই মায়া-রহস্যলোক সম্পূর্ণ রচিত হয়ে গেছে বিমলের উপলব্ধিতে বৌদিদির দ্বিতীয় জন্মের গভীরে। পরবর্তী অংশে আছে অগভীর বিচ্ছেদ-বেদনার সূত্রে রোমান্টিক্ নারী-প্রেমাকুলতাজনিত বিষাদ-বিলাস।

বৌদিদির ব্যাকুল উৎকণ্ঠা ছিল মাকে নিয়ে এসে বিমল ঐ পাড়াগাঁয়েই স্থায়ী বাসা বাঁধবে,—ভাইবোনের সম্পর্কের ভিত তখন পাকা হয়ে যেতে পারবে। কিন্তু এমন দিনে এসেছিল ইউরোপ-আমেরিকার আহ্বান,—নতুন শিক্ষা লাভের অন্তে নতুন জীবনসিদ্ধির প্রতিশ্রুতি। অতএব বৌদিদির সেই স্নেহ-ব্যাকুলতা উপেক্ষা করে তাকে কিছু না জানিয়েই পালিয়ে গিয়েছিল বিমল। সে আজ কতদিনের কথা! পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর কেটে গেছে তারপর। এমন কি নূতন বৈষয়িক জীবনের প্রাচুর্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেশে ফিরে এসেছে ষোল-সতর বছর আগে। এর মধ্যে বাংলা দেশে যাওয়া হয় নি। আজ সন্ধ্যার সমুদ্রতীরে বসে তবু বিমলের মনে পড়ে সেই উপেক্ষিতার স্মৃতিকথা;—"ওগো লক্ষ্মী, ওগো স্নেহময়ী পল্লীবধূ, তুমি আজও কি আছো? এই সুদীর্ঘ ২৫বছর পরে আজো তুমি কি সেই পুকুরের ভাঙ্গাঘাটে সেই রকম জল আনতে যাও? আজ সে কতকালের কথা হলো, তারপর জীবনে আবার কত কি দেখলুম। আবার কত কি পেলুম—আমার জীবনের সেই ফুলফোটা পাখি-ডাকা সকালবেলাটিতে তুমি প্রাণে যে অমৃত সিঞ্চন করেছিলে তার কথা অনেকদিন ভুলে গিয়েছিলুম......আজ কতদিন পরে আবার তোমার কথা মনে পড়লো...তোমায় আবার দেখতে বড়ো ইচ্ছে করছে, দিদিমণি, তুমি আজও কি আছ? মনে আসছে অনেক দূরের যেন কোন্ খড়ের ঘর...মিটমিটে

মাটির প্রদীপের আলো…মৌন সন্ধ্যা…নীরব ব্যথার অশ্রু…শান্ত সৌন্দর্য…স্নেহমাখা রাঙা শাড়ির আঁচল…

আরব সমুদ্রের জলে এমন করুণ সূর্যাস্ত কখনো হয় নি।"

'উপেক্ষিতা' গল্প শেষ হয়েছে এখানে,—সেই সঙ্গে মনে হয়,সাঙ্গ হতে পেরেছে বিভূতিভূষণের গল্প-স্বভাবেরও নিঃশেষ পরিচারন। আধ্যাত্মিক উৎক্রান্তি-ধর্মান্বিত রোমান্স-পিপাসাই তাঁর শিল্প-প্রকৃতির মুখ্য প্রবণতা ;—প্রকৃতি-চেতনা ও নারীপ্রেমের উৎকণ্ঠা ছিল আবার তারই প্রধান উপকরণ। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে প্রেম-বোধ স্নেহের গণ্ডী অতিক্রম করে প্রণয়ের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি। যদি বা কখনো তাও হয়ে থাকে, তেমন ক্ষেত্রেও বিভূতিভূষণের প্রণয়-চেতনায় যৌনতাবোধ প্রায় অনুপস্থিত। এদিক থেকে তাঁর শিল্পদৃষ্টি শিশুর মতই ছিল সরল—নিরাভারণ, নিরাবরণ। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন 'পথের পাঁচালী'র অপু বয়সে বড় হয়ে ওঠার পরেও মনে মনে তার বালকত্ব ঘোচে নি কোনকালে। বস্তুত "বিভূতিভূষণ নিজেও শেষ পর্যন্ত বালক ছিলেন। তাই জীবনের জটিল ও দুর্গম দিকটা তাঁহার চোখে পড়িত না, কিংবা পড়িলেও জটিলতার মর্ম বুঝিতে পারিতেন না, সমস্তকেই নিজের ছাঁচে সরল করিয়া প্রকাশ করিতেন।"[৪৩]

বস্তুত সারল্যই ছিল বিভূতিভূষণের গল্প-সাহিত্যের সাধারণ শৈলী,—কি প্রকরণে কি বিষয়-বিন্যাসে সব দিকেই তাঁর রচনা অপ্রত্যাশিতভাবে সরল যার ফলে সৃষ্টির মধ্যে জীবনের ভারটুকু আর কিছুতেই অনুভব করা যায় না। দৃষ্টান্ত হিশেবে লেখকের অতিপ্রাকৃত বিষয়ক গল্পগুচ্ছের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বাংলা উপন্যাসে পরলোকতত্ত্ব আরোপে বিভূতিভূষণের এক সফল পরীক্ষা-প্রকরণ রূপে 'দেবযান'-এর উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রমথ বিশী এ-বিষয়ে সার্থকতম সিদ্ধান্ত করে বলেছেন,—'দেবযান' উপন্যাসে "পরলোককেও তিনি একটি খেলাঘর রূপে রচনা করিয়াছেন।" বিভূতিভূষণের তান্ত্রিকতা এবং অতি-প্রাকৃত বিষয়ক ছোট-গল্পগুলি পড়েও এই খেলাঘরের কথাই মনে হয়। 'তারকনাথ তান্ত্রিকের গল্প' এবং 'তারকনাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প',—বিভূতিভূষণের অতি-প্রাকৃত ও তান্ত্রিকতা বিষয়ক দুটি শ্রেষ্ঠ রচনা। তাতে তন্ত্রসাধনা ও নানাপ্রকার তন্ত্রোক্তির প্রসঙ্গ ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে অতিলৌকিক অস্তিত্বের সান্নিধ্য-চারণজনিত বীভৎসতা এবং মাদকতার উপকরণ যথাক্রমে গল্পদুটিতে পরিবেশিত হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। তাহলেও, তারাশঙ্করের অনুরূপ-বিষয়ক গল্পের নিরুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠা, চমক

৪৩। প্রমথনাথ বিশী—'বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প'—ভূমিকা।

অথবা প্রগাঢ়তা তার কোনো অংশেই উপস্থিত নেই। শিশুর মত নির্ভীক সরল মনের কাছে তন্ত্রমন্ত্রের ভয়-বিশ্বাসে অলৌকিক কৌতূহলের এক রহস্য-স্নিগ্ধ আলোকলোকের পরিচয় যেন শিল্পী মেলে ধরেছেন,—তাঁর নিজের চোখে দেখা 'শুক্লজ্যোৎস্না'র মত যা ক্ষীণ রহস্যকরতায় মেদুর।

অলোক-সম্ভব মিস্টিক্ জগৎ ছেড়ে নিছক চেনা পৃথিবীর অতীত প্রেক্ষাপটেও শিল্পী যেখানে বিচরণ করেছেন, সেখানেও বিভূতিভূষণের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী বালসুলভ সরল-বিশ্বাসে একান্ত স্বচ্ছ,—কিছুটা যেন আধ্যাত্মিকতার সুরাভিষুক্তও। বস্তুত স্বভাবসিদ্ধ রোমান্স রচনার উপকরণ হিশেবে প্রকৃতির পরিবর্তে, কিংবা প্রকৃতির অনুষঙ্গরূপে কখনো কখনো ঐতিহাসিক ঐতিহ্য-লোকের আশ্রয় শিল্পী স্বীকার করেছেন। কিন্তু সেখানেও,—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ সিদ্ধান্ত করেছেন,—"লেখকের প্রকৃত শক্তি প্রাচীন যুগের ঈষৎ ব্যঞ্জনা-সমন্বিত প্রকৃতি-বর্ণনায়, ঐতিহাসিকতায় নহে।"[৪৪] 'নাস্তিক' এ-রকমের একটি গল্প,—জৈন যুগের পটভূমিতে যেখানে প্রকৃতি-প্রেম ও বালসুলভ প্রণয়চিন্তা, তথা বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতি-মন্থন রোমান্স রসের আবেশ সৃষ্টি করেছে।

এসব গল্প—'উপেক্ষিতা'র মত বিভূতিভূষণের অধিকাংশ ছোটগল্পই আকৃতিতে ছোট নয়। আশ্চর্য এক গতিশীল কথকতার ভঙ্গী আছে তাঁর সৃষ্টিতে,—এটুকু তাঁর পৈতৃক উত্তরাধিকার। কথার মধ্যে আড়ম্বর নেই, অধিকাংশই স্বভাব-বর্ণন,—প্রায় কোনোপ্রকার মণ্ডন-প্রয়াস ব্যতিরেকেই যা কথার অন্তর্নিহিত রোমান্স ও অতীন্দ্রিয় রসকেও পরিস্ফুট করে প্রকাশ করতে পারে। এই অর্থেই প্রমথ বিশী বলেছেন কথার গায়ে বিভূতিভূষণের ভাষা রেশমী শালের মত গায়ে গায়ে জড়িয়ে থাকে, তার পৃথক্ অস্তিত্ব প্রায়ই অনুধাবনযোগ্য হয়ে ওঠে না। কিন্তু এই অনায়াস বর্ণনার মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যপ্রীতির আভাস রচনা করতে গিয়ে বক্তব্য স্বভাবতই বিস্তারিত হয়ে পড়েছে, সেই সঙ্গে শিল্পীর বালকোচিত বন্ধনহীন প্রকৃতিপ্রীতি বিষয়-বর্ণনাকেও ব্যাপ্ত করে তুলেছে।—স্বাদুতার বিচারে তাকে অসংগত বলব না কিছুতেই, কিন্তু ছোটগল্পের শরীর-গঠনের দিক থেকে প্রায়ই সে অসংহত হয়েছে।

ফলকথা 'কল্লোলের কালে'র আত্মিক-সচেতন, জীবন-জটিলতায় ভারাক্রান্ত আত্ম-খণ্ডিত জীবনের পথে বিভূতিভূষণ ছিলেন স্বপ্নলোকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি এক আনমনা পথিক—স্বপ্নলোকের ভারহীন স্বাদ আর অধরা সুরভিতে সমগ্র চেতনাকে প্রত্যয়স্নিগ্ধ খুশিতে ভরে বিদায় নিয়েছেন—বিশশতকীয় জীবনের পঙ্কপথলে যিনি মানস সরোবরের শিল্পদূত।

৪৪। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,' (৩য় সং)।

এঁর গল্প-সংকলন গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে :—মেঘমল্লার (১৩৩৮), মৌরীফুল (১৩৩৯), যাত্রীদল (১৩৪১), জন্ম ও মৃত্যু (১৩৪৪), কিন্নরদল (১৩৪৫), বেনীদির ফুলবাড়ি (১৯৪১), নবাগত (১৯৪৪), তালনবমী (১৩৫১), উপলখণ্ড (১৯৪৫), বিধুমাষ্টার (১৩৫২), ক্ষণভঙ্গুর (১৩৫২), বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৪৭) ; মুখোস ও মুখশ্রী (১৯৪৭) ; আচার্য কৃপালিনী কলোনী (১৩৫৫), জ্যোতিরিঙ্গন (১৯৪৮), কুশলপাহাড়ী (১৯৬১), বিভূতিভূষণের গল্প পঞ্চাশৎ, রূপহলুদ (১৮৭৯ শকাব্দ) প্রভৃতি।

মনোজ বসু

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে মনোজ বসুর (১৯০১) প্রসঙ্গ মনে আসে ; কালের নিরিখেও তাঁর গল্প-শিল্প প্রায় আক্ষরিক অর্থেই 'কল্লোল-যুগে'র তটবর্তী। 'কল্লোল' পত্রিকাতে মনোজ বসুর কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল একাধিক ; কিন্তু গল্পকার রূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের আগে নয়। ভগ্ন-গোষ্ঠী 'কল্লোল'-এর সংহতি তখন অবসন্ন। আর এ কেবল কালের কথা নয়। ভাব-কল্পনা এবং রূপ রচনার স্বাতন্ত্র্যেও মনোজ বসু 'কল্লোল-কাল'-দ্বন্দ্বের উৎক্ষেপ-মুক্ত। তাঁর স্বতন্ত্র ভূমিকার সাদৃশ্য যদি খুঁজতে হয়, তার এক কোটিতে মনে পড়ে তারাশংকরের কথা ; আর এক কোটিতে —এবং সেই কোটিই তাঁর অন্তঃপ্রবণতার নিকটবর্তী,—আছেন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩৩৭ সালের কার্তিক সংখ্যা 'বিচিত্রা'-তে প্রকাশিত হয় মনোজ বসুর প্রথম স্মরণীয় গল্প 'নতুন ফসল' ;—'বনমর্মর' গ্রন্থে তা সংকলিত হয়েছে 'পিছনের হাতছানি' নামে। ঐটিই গল্পের লেখক-দত্ত আসল নাম ; নতুন লেখকের প্রথম উল্লেখণীয় ফসল বঙ্গসরস্বতীর ভাণ্ডারে জমা হতে চলেছিল, তাই বন্ধু নতুন নামকরণ করে দিয়েছিলেন।[৪৫] তার ছয় মাস পরে 'প্রবাসী'তে (বৈশাখ ১৩৩৮) প্রকাশিত হয় 'বাঘ' গল্প ; তখন থেকেই ধীরে ধীরে অবিসংবাদী হয়েছে গল্প-শিল্পী রূপে মনোজ বসুর সমুচ্চ প্রতিষ্ঠা। ঐ গল্পের সূত্রেই প্রথম পরিচয় হয়েছিল 'প্রবাসী' অফিসে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ; এবং প্রথম পরিচয়েই তিনি বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন মনোজ বসুকে।[৪৬] তার কারণ মনে হয়, অবচেতনালীন পরমাত্মীয়তাবোধের প্রেরণা !

মনোজ বসু বিভূতিভূষণের কত নিকটে—অথচ তাঁর থেকে অনেক দূরেও ! প্রকৃতি-প্রেম, প্রকৃতির ভেতর দিয়ে জীবন দেখার শিশু-সুলভ আগ্রহ, প্রকৃতি আর

৪৫। দ্রঃ মনোজ বসু—'কেমন করে লেখক হলাম'—বেতার জগৎ, ৪০ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।
৪৬। দ্রঃ তদেব।

জীবনে মিলিয়ে-মিশিয়ে বৃহত্তর জীবন-সত্য সন্ধানের পরাবাস্তব উৎকণ্ঠা,—এই সব নিয়েই বিভূতিভূষণের শিল্পি-ব্যক্তিত্ব।—সদ্য এসব কথা আলোচনা করে এসেছি। নিসর্গ-প্রকৃতি, এবং ব্যক্তি কিংবা সমষ্টিবদ্ধ মানুষের জীবন সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যাপক যত ছিল, তারও চেয়ে বেশি পরিমাণে ছিল অন্তর্ভেদী—সুগভীর। তাই বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পড়ে মনে হয়, গল্পবস্তু—আখ্যানভাগ—যত কমই থাক, জীবনের বাস্তবিক তথ্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশচিত্র একের পর এক ঠাঁসা বুনে গড়ে উঠেছে যেন বর্ণনা-রসদীপ্ত তাঁর কথাশিল্পের নক্সী কাঁথা। অন্য প্রসঙ্গে না গেলেও স্বয়ং 'পথের পাঁচালী' এই অনুভবের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

অথচ এ-কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শিল্পীর চোখে-দেখা জীবনের বর্ণ-বিচিত্র সে বিবরণ পড়ে মনে হয়, 'তিনশো বছরের' আগেকার বাংলাদেশের স্মৃতি-মদিরতায় বুঝি বিচরণ করছি। প্রমথ বিশীর এ অনুভবের যথার্থতা পূর্বে লক্ষ্য করে এসেছি। আর তার কারণ নিহিত ছিল বিভূতিভূষণের মানস-প্রকৃতির মধ্যে; আসলে একটি জন্ম-শিশু তাঁর শিল্পি-চেতনাকে নিয়ত পরিব্যাপ্ত করেছিল। শিশুর মত চেনা জগতের আবছা রহস্য ভেদ করে চিররহস্য-ঘেরা অচিনলোকে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারার অবিরত পিপাসা ছিল তাঁর জীবনের এবং সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ পাথেয়। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পীর সত্তাকে পূর্ণমনস্ক শিশু-চেতনার সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৪৭] অপরিণতমনা শিশু বাস্তব জগতের বাঁধন পালিয়ে অতি-বাস্তবের কল্পলোকে স্বপ্ন-বিচরণ করতে লুব্ধ হয়; আর বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত আজন্ম-শিশুর প্রতিভা বাস্তবিক অভিজ্ঞতার সকল বাঁধন পেরিয়ে বৃহত্তর বাস্তবের—জীবনের দেশকালাতীত শাশ্বত সত্য পরিচয় সন্ধানে স্বপ্ন-মগ্ন। তাই তাঁর সৃষ্টির গভীর ভূমিতে চেনা জগতের পথে হাঁটতে হাঁটতে মনে হয় পায়ের তলায় মাটির স্পর্শ যেন ঘটছে না—যেন স্বপ্নের মাঝে পায়ে হেঁটে উড়ে চলা চলেছে কোনো স্বপ্নাতীতের নর্মলোকে। শিল্পি-চেতনার স্বপ্নানুভবে জারিত এই বিশেষ অভিব্যক্তিকেই বলেছিলাম বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় পরাবাস্তবের রস।

মনোজ বসুও বুঝি তেমনি—তবু একেবারেই তেমনি নন। তাঁর গাল্পিক চেতনার মূলেও প্রকৃতিই প্রধান—প্রকৃতির সর্বব্যাপী স্বপ্নলীলার আবরণে মানবজীবন-পরিচয় কেমন আচ্ছন্ন আবিষ্ট অনতিসংলগ্নও হয়ে আছে। জীবনকে নিয়ে, চোখের-পাত্রে মুঠোভরে ধরা প্রকৃতির রূপমূর্তি নিয়ে আত্মমগ্ন স্বপ্নের গহনে তলিয়ে যাবার প্রবণতাও তাঁর আন্তরিক স্বভাব। তবু তাঁর বস্তুত্তীর্ণ জীবন-স্বপ্নও জীবনের ইন্দ্রিয়গোচর চরিত্রটিকে একেবারে এলোমেলো করে দেয় না। সমপ্রাণ বন্ধু লিখেছিলেন—

৪৭। দ্রঃ অবনীন্দ্রনাথ—'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'।

"রোমান্সপ্রিয় লেখক তিনি, কিন্তু তাঁর রোমান্সে মিশিয়ে আছে গ্রাম-বাংলার একেবারে মাটি মাখানো আকৃতি; বিদেশী ফেস্-পাউডারের গন্ধ-জড়ানো অন্য জগতের রোমান্স। এই তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি। এইখানেই তাঁর সিদ্ধি। প্রাকৃতিক পরিবেশ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন বারবার, বারবার মানবিক জগতে ফিরে আসতে; যে মানুষ মাটির মানুষ, মনোজ বসু তাদেরই কাছাকাছি লেখক।"[৪৮]

অর্থাৎ মনোজ বসুর শিল্পি-কল্পনাতেও মানুষের অস্থিমজ্জাময় প্রাকৃত অস্তিত্ব প্রকৃতির আলোছায়া-নিবিড় প্রচ্ছায়তলে আবছা স্বপ্নাবেশের মাধুরি নিয়ে ঘুরে ফিরেছে। কিন্তু বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় চোখে-দেখা জীবন ও প্রকৃতিকে উজ্জীবিত নবরূপে ভারহীন মেঘের মত আহ্বান করে এনেছেন আপন কল্পনার নভোলোকে; মনোজ বসু তাঁর রোমান্টিক মনের প্রেম দিয়ে আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বেঁধেছেন সেই প্রকৃতি আর জীবনকেই। অন্যপক্ষে বাংলা কথাসাহিত্যে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় যদি অনাবিল স্বভাব-শিশু হন,—মনোজ বসুর শিল্পি-আত্মা তাহলে একটি অম্লান কিশোর-ধর্মে লাবণ্যময়। শিশুর স্বপ্ন অথবা রহস্যলোকে নিত্য ধাবমান; কিশোরের আবেশ দুহাত দিয়ে প্রাণভরে জড়িয়ে ধরার,—জড়িয়ে পাবার। ফলে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-দৃষ্টি যেমন নিশ্চিন্দিপুরের গ্রাম্য ঝোপঝাড়ে, তেমনি লবটুলিয়া বৈহারের আরণ্যক নির্জনতায় সমান প্রবাহময়। মনোজ বসুর প্রকৃতি-চেতনাও একাধারে স্নিগ্ধ শ্যামলিমা এবং রুক্ষ ভয়ালতার সেবা করেছে যুগপৎ; কিন্তু সে অভিন্ন আধারে। আপন জন্মমাটির অন্তঃশীল প্রাণস্পন্দন মনোজ বসুর ভাব-কল্পনার শিরায় শিরায় রক্ত কণিকা যোজনা করে ফিরেছে। তারই উদ্দীপনায় তিনি আবাল্য চকিত, তারই আবিষ্ট-কল্পনায় জন্ম-রোমান্টিক—অথচ তারই ধুলায় ধূসর হয়ে আছে তাঁর সমগ্র সত্তা। তাই মনোজ বসুর স্বপ্নেও মাটির গন্ধ: আবার তাঁর চোখে-দেখা বাস্তবিকতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কিশোর-ভাবালুতার স্বপ্ন-সুরভি!

এ-রকম কথায় কথাই বাড়ে। অতএব শিল্পীর সম্পর্কে তাথ্যিক প্রসঙ্গেই আসা যাক্; বক্তব্য তাতে পরিস্ফুট হতে পারবে। যশোর জেলার ডোঙাঘাটা গ্রামে বিখ্যাত বসু পরিবারে জন্মেছিলেন মনোজ বসু। "নিম্নমধ্যবিত্ত একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের সন্তান তিনি। সম্পদ-সম্পত্তি বলতে যা বোঝায়, তা ছিল না তাঁদের। কিন্তু খাতির সম্মান ছিল প্রচুর।"[৪৯]

জন্মসূত্রে মনোজ বসু আসলে দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের সন্তান; মানস অস্তিত্বেও সম্পূর্ণরূপে তাই।

৪৮। ভবানী মুখোপাধ্যায়—'কাছে বসে শোনা'—'অমৃত' পত্রিকা, ১৯ কার্ত্তিক, ১৩৭২।
৪৯। দীপক চন্দ্র—'মনোজ বসু: 'জীবন ও সাহিত্য'।

শিল্পী নিজে বলেছেন—"পাড়াগাঁয়ের ছেলে, বাড়ির সামনে বিল। ছেলে বয়স থেকে ঋতুতে ঋতুতে বিলের রূপ বদলানো দেখেছি। চৈত্র-বৈশাখে ক্রোশের পর ক্রোশ ধূ ধূ করে। রাত্রিবেলা বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখতাম দূরে আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছে। আলেয়া নাকি ঐগুলো। কল্পনা করতাম কালো কালো ভয়াল অতিকায় জীব বিলের অন্ধকারে গড়িয়ে বেড়াচ্ছে শিকার ধরবার আশায়। হাঁ করছে, আর আগুন বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। মুখ বন্ধ করলে আগুন নেই। পথিক গ্রামের আলো ভেবে ছোটে সেদিকে। দপ্ করে আবার আর একদিকে জ্বলে ওঠে। পাগল হয়ে পথিক ছোটাছুটি করে। আলেয়ার দল চারিদিক থেকে ঘিরে এসে ধরে।

"এই ভয়ঙ্কর বিল বর্ষায় সবুজ সজল-স্নিগ্ধ। দিগন্তব্যাপ্ত ধান ক্ষেত, আলের প্রান্ত শাপলা আর কলমি ফুলে আলো হয়ে যায়। আল পেরিয়ে জলস্রোত বয়ে চলে, নৌকো ডাঙা অবিরাম ছুটোছুটি করে। ধানবনের ভিতর থেকে হঠাৎ চাষীর গলার গান ভেসে আসে—সখিসোনার প্রেমকাহিনী।

"আবার প্রথম শীতে পাকা ধানে বিলের গেরুয়া রং। বাঁক বোঝাই ভারে ভারে ধান নিয়ে আসছে। ঘরে ঘরে পালা-পার্বণ ভাসান-কবি-যাত্রাগান। ঢোল বাজছে এপাড়া-ওপাড়ায়। ধান খেয়ে খেয়ে ইঁদুরগুলো অবধি মুটিয়ে সারা উঠান ছোটাছুটি করছে।

"এই বিল ও বিলের প্রান্তবর্তী মানুষগুলো তাদের দুঃখ-সুখ আশা-উল্লাস নিয়ে আমার মন জুড়ে রয়েছে; বিশাল বাংলাদেশকে আমি চিনেছি এদের মধ্য দিয়ে।"[৫০]

অর্থাৎ মনোজ বসু যে প্রকৃতিকে চিনতেন, সেই বিচিত্ররূপা প্রকৃতি তাঁর স্বভাব-কবির কল্পনাকে আবাল্য মথিত করেছিল;—কখনো সে ভয়ঙ্করী, কখনো ধাত্রী,—কখনো আবার মন-জুড়ানো প্রিয়বান্ধবী! মনোজ বসু কবিতা লিখেই সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেছিলেন; কবিতা-রস তাঁর শিল্পি-কল্পনার মজ্জায় মজ্জায়! সে কোনো সচেতন পরিশীলনে কর্ষিত ভাবনা নয়, আবহমান কালে বাংলার গাঁয়ে-ঘরে বিকশিত স্বভাব-ভাবুকতার ফসল। জীবন নিয়ে স্বপ্ন দেখার লোভ, শূন্যগর্ভ বাস্তব অভাব-অনটনের মধ্যেও পরিপূর্ণতার প্রত্যয়নিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা, প্রকৃতির মায়াঘেরা বাস্তবিক প্রাচুর্য আর বৈচিত্র্যে ডুব দিয়ে অবস্তু-সম্ভব অরূপ রতন মুঠো ভরে তুলে আনার আগ্রহ,—এই সব জড়িয়েই মনোজ বসুর কবি-সত্তা। তারই রঙে-রসে ভরা দুটি চোখ মেলে তিলে তিলে তিনি তলিয়ে দেখেছিলেন বস্তু-পরিকীর্ণ প্রকৃতির জীবন্ত রূপ—ধান খেয়ে মুটিয়ে যাওয়া ইঁদুরের চেহারাও তার থেকে বাদ পড়েনি। তবু মনোজ বসুর বাস্তবাগ্রহ আসলে 'অবাস্তব মনোহর'-ই—অর্থাৎ স্বভাব-রোমান্টিক।

৫০। দ্রঃ 'গল্প লেখার গল্প'—জ্যোতিপ্রকাশ বসু সম্পাদিত।

আলেয়ার আলো দেখে তাঁর মন বিভীষিকার স্বপ্ন গড়ে, প্রকৃতির বস্তুরূপকে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন, নিখুঁত নিপাট করে সংগ্রহ করেন খুঁটিনাটি সব উপাদান—কিন্তু সে সবই কেবল তাঁর স্বভাব-কবি মনের কল্পনারসের রসদ রূপেই।

মানুষ আসে তার আড়ালে আবডালে,—সুদূর ধানবনের রহস্য ভেদ করে হঠাৎ 'সখিসোনার গান' গেয়ে জানান দেয় যে চোখে-না দেখা মানুষ; অথবা আবছায়া-নীল দিগন্ত বেয়ে 'বাঁক বোঝাই ধান' ভারে ভারে যে বয়ে নিয়ে চলে! সে-মানুষও মনোজ বসুর দেখা এবং লেখা প্রকৃতির মতই সজীব এবং বাস্তবিক; কিন্তু তেমন নিটোল রূপায়িত নয়—তার চেয়ে বেশি ভাব-ব্যঞ্জনাগর্ভ। সেই সূত্রেই তাঁর গল্পের জীবনকে অমন স্বপ্ন-ছড়ানো মনে হয়।

আর সে স্বপ্ন আসলে শিল্পীর অন্তর্ব্যথিত কৈশোর চেতনাস্পর্শে ছায়া-মেদুর। মনোজ বসুর ব্যক্তি-জীবনের দিকে চোখ তুলে তাকাতে হয় আবার। নিম্নমধ্যবিত্ত বৃহৎ পরিবার-জীবনে বাবা ছিলেন তাঁর ব্যক্তিমনের আশৈশব পরমাশ্রয়। বাবার ছাপানো লেখা দেখেই কবিতা লেখাতেও একেবারে শিশু বয়সে হাতেখড়ি নিয়েছিলেন মনোজ বসু। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্নও বাবার কাছে পাওয়া। বাবার হাত ধরে স্বদেশী সভায় যেতে পারার ক্ষীণ স্মৃতিও পরিণত বয়সে মুছে যায় নি তাঁর মন হতে।[৫১] সেই বাবার অকালতিরোধান ঘটল শিল্পীর বয়স যখন মাত্র আট বছর। গোটা পরিবার নিরাশ্রয় হল;—বালকের মন শূন্যতাবোধে হল বিমূঢ়। সেই রক্তরেখা ধরেই এল দ্বিতীয় বিচ্ছেদের অভিঘাত—'তেরো-চোদ্দ' বছরের বয়ঃসন্ধি-ভারাতুর মন নিয়ে ছিটকে পড়লেন কলকাতার মহানাগরিক জীবনে। 'বাবা'র অনুভব আর স্মৃতি-জড়ানো জীবনের সেই 'প্রথম প্রেম' তথা প্রথম স্বপ্নের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জোড় ভেঙে যাওয়ার কৈশোর-বিষণ্ণতাই মনোজ বসুর গল্প-শিল্পে রোমান্স-রসের উৎস। কলেজে পড়া প্রথম যৌবনের আক্ষেপ স্মরণ করে আরো পরিণত বয়সে গল্প-শিল্পী মনোজ বসু নির্ভুল আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন,—গ্রামের প্রাকৃতিক জীবনের স্বপ্নমদিরতা হতে নির্বাসিত হয়ে "এদের বিরহে বিষাক্ত হয়ে উঠত শহরের কলেজজীবন। হঠাৎ মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে এদের মধ্যে অজ্ঞাতবাসে যেতাম। যেন ইট পাথরের শুকনো ডাঙা থেকে ডুব সাঁতার দিতে যেতাম জীবনের রস প্রাচুর্যের ভিতর।"[৫২]

৫১। দ্রষ্টব্য: মনোজ বসু—'গল্প লেখার গল্প' জ্যোতিপ্রকাশ বসু সম্পাদিত: তথাচ 'কেমন করে লেখক হলাম' 'বেতার জগৎ' ৪০ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা। এবং দীপক চন্দ্র—'মনোজ বসু: 'জীবন ও সাহিত্য'।

৫২। দ্রঃ 'গল্প লেখার গল্প'—জ্যোতিপ্রকাশ বসু সম্পাদিত।

সেই ডুব সাঁতার কাটা চলেছে আজও নিরন্তর—শারীর সম্পর্কে না হোক, চেতনার একান্ত নিভৃত গভীরে। এইখানেই তারাশঙ্করের সঙ্গে মনোজ বসুর সাদৃশ্যের কথা আসে ;—এই আঞ্চলিক জীবন-মগ্নতার প্রসঙ্গে। তারাশঙ্কর রাঢ়-প্রত্যন্তের রুক্ষ লালমাটি আর তার প্রান্তলীন অনাবিল আদিম জীবনস্বভাবের মহাকবি ছিলেন, সে কথার বিস্তারিত পরিচয় আগেই সংগ্রহ করেছি। মনোজ বসু পূর্ব-দক্ষিণ সীমান্তবাংলার নিম্নভূমিজ জলজঙ্গলার্দ্র জীবনের স্বপ্নাবিষ্ট গাথাকার। মধ্য বয়সে এসে তারাশঙ্কর আঞ্চলিক জীবন হতে স্বেচ্ছাবিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন ; নানা বিষয়-ভাবনায় বৈচিত্র্য-দীপিত হয়েছিল তাঁর গল্প। তবু রাঢ়ের মাটির অন্তঃস্বভাব শিল্পীর ভাষায় এবং ভাষণে স্বতোবিকীর্ণ হয়েছে। আদিম কণ্ঠস্বরের মত তা দৃপ্ত এবং প্রগাঢ়।

মনোজ বসু অন্যপক্ষে আপন অন্তঃপ্রকৃতিতেই গাথাশিল্পী। আদি-অন্তে সম্পূর্ণ গাঢ় বিস্তৃত জীবনের সামুদ্রিক রূপটির দিকে কোনো আন্তরিক মনোযোগ নেই তাঁর : —স্বপ্নাবিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিটি বরং 'এপিসোডিক'। প্রধান-অপ্রধান-নির্বিশেষে যে-কোনো একটি মুহূর্তের দৃষ্টি কিংবা অনুভূতির প্রসঙ্গে জীবন-স্বপ্নের গভীরে ক্ষণকালের জন্য তলিয়ে যাওয়া ; আর তারই ভাবালু আকাঙ্ক্ষা আর উৎকণ্ঠা জড়িয়ে জড়িয়ে তাঁর গল্প-শিল্পের বিকাশ। দৃষ্টিটি নিখুঁত, অনুপুঙ্খ ; অনুভব নিপাট নিবিড় ;—প্রকাশও অনাবিষ্ট ; এবং বহুলাংশে উচ্ছ্বসিত ; কিন্তু সর্বত্রই অনতি-প্রখর। ঐটুকু আসলে অন্তর্ব্যথিত কৈশোর প্রকৃতির অম্লান চিহ্ন ;—বাল্যে জীবনের প্রথমতম আশ্রয়-চ্যুত, এবং কৈশোর-সূচনায় যে-চেতনা আত্মার বাস্তলোক থেকে নির্বাসিতমনস্ক বয়ঃসন্ধিলীন সেই অবচেতন আক্ষেপের আন্দোলন মনোজ বসুর নিভৃত সত্তায় লতার মত জড়িয়ে ধরে বেঁধে বেয়ে উঠছিল। ফলে সেই স্বপ্ন-বঙ্কিম আত্মমুগ্ধ নাতি প্রবল জীবন-সম্ভোগের কৈশোর সীমাতেই তাঁর শিল্পি-চেতনা নিত্য বিচরণশীল। তাই বহির্জীবনের ব্যক্তি-গত এবং ঐতিহাসিক অভিঘাতে পুনঃপুনঃ বিচঞ্চল-শিল্পী যখন আঞ্চলিকতামুক্ত জীবন-ভাবনায় মগ্ন হয়েছেন, গল্প-চরিত্র তখনও প্রায় অভিন্ন ;—স্বপ্নাবিষ্ট আত্মমুখী দৃষ্টি, আন্তরিক প্রকৃতি-প্রণয়-রসে আচ্ছন্ন মানব-চিত্ত, কৈশোর-সুখ এবং কৈশোর-বেদনায় যুগপৎ উল্লসিত ব্যথিত ভাবালু বাণী প্রবাহ, এই সব কিছুর তলায় তলায় লুকিয়ে ফেরা প্রচ্ছন্ন গভীর জীবনানুভবের সুরভি-স্বাদ !

উদাহরণ হিশেবে প্রথমখ্যাত 'বাঘ' গল্পটির কথাতেই আসা যাক। ভোর সকালে গল্প শুরু হয়েছে !—বাঁশ বাগানের পথে গাড়ু হাতে নিয়ে যে গ্রাম্য জীবনের সূচনা ঘটে, তারই মাঝখান দিয়ে বিসর্পিল দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে কৌতূহলী

কথার স্রোত। চোখে-দেখা গ্রাম্য প্রকৃতি, তারই মত প্রত্যক্ষ জীবন্ত গ্রাম্য দিনযাত্রার একটি নিপাট জমাট আঞ্চলিক চিত্র; নিতান্ত আঞ্চলিকতা সত্বেও সর্বজনীন মনকে যা চুম্বকের মত আকর্ষণ করে।

আসলে নিতান্ত বাস্তবিক জীবনেও প্রত্যেক ব্যক্তি ও তার পারিপার্শ্বিকের স্বাতন্ত্র্য সত্বেও নিভৃত এক ঐক্য-চেতনা সর্ব দেশ-কালের মানুষে মানুষে ভাবসম্মিলনের অদেখা সেতু গড়ে তোলে। তারই গোপন প্রেরণাবশে মনোজ বসুর ঐ চমকপ্রদ গল্পাবেদন প্রত্যক্ষ-গোচর অঞ্চল-সীমার মধ্যে প্রোথিত থেকেও আপন দেশকালের বৃহত্তর পরিধিতে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছিল।

গল্পের জন্মকালের কথা মনে পড়ে; খ্রীস্টাব্দের তখন ১৯৩০ সাল! যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বিজ্ঞানদম্ভী যান্ত্রিক অভ্যুদয়ের মানবমূল্যঘাতী উল্লাস পশ্চিম থেকে আমাদের দেশে পৌঁছেও চমক আর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে চলেছে। যন্ত্রের ক্ষুধা নিরন্ন চাষী জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে কিভাবে কারখানার কুলি ধাওড়ায় এনে ফেলেছিল, দারিদ্র্য-অশিক্ষার মধ্যেও মানুষের যে প্রাণ-শিখাটি দুর্মর শক্তিতে বাস্তমাটির পাদপীঠে অম্লান হয়ে জ্বলছিল, তাই কেমন করে তিলে তিলে ক্লিন্ন বিষাক্ত হয়ে গেল, তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসে তার তক্ষণ-সমুচিত প্রগাঢ় রূপায়ণ রয়েছে।

মনোজ বসু অত প্রগাঢ়তায় মগ্ন হতে রাজি নন, তাঁর কৈশোর-ভাবালু চেতনার নেপথ্যে যুগের প্রচ্ছন্ন ব্যথা রোমান্টিক তরঙ্গরেখায় রক্তকমলের আভা হয়ে বুঝি কাঁপে! তার অনেকটা অস্ফুট-অনতিস্ফুট; কিছুটা বা সহজ-সংকেতে নিটোল ব্যঞ্জনাগর্ভ।

হররসিত পরামাণিক শহর থেকে 'সাহেব বাড়ির কল' নিয়ে এসে গ্রামের মন্থর গতানুগতিক জীবনে যে চমক আর চঞ্চলতা জাগিয়ে দিল মনোজ বসু কৌতুকরসে রসিয়ে রসিয়ে তার বিস্তারিত গল্প বলে এগিয়েছেন আয়েশি ধীর গতিতে। কিন্তু সেই হাসির বুকে অত্যন্ত গোপনে চক্‌চক্ করে একবিন্দু নিভৃত নয়নের জল। তিনকড়ি বাঁড়ুজ্জের আজীবন সঙ্গীত-সাধনা মুহূর্তে নিরর্থক হয়ে যায় ঐ যন্ত্র-চমকিত ক্ষণিক চটকে। 'ওস্তাদের কত গালাগালি' সয়ে—সরস্বতী ঠাকরুণকে কত চিনির নৈবিদ্যি খাইয়ে, তপস্যার কৃচ্ছ্রতা বরণ করে যে সুরশিল্প রচনার অধিকার অর্জন করেছিলেন, কলের কল্যাণে মুহূর্তে তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। কথা বলতে বাঁড়ুজ্জের 'গলাটা যেন বুজিয়া আসে'; মৃতবৎস জীবনের একমাত্র আশ্রয় কিশোর দৌহিত্র মণ্টুকে তেমনি বুজে আসা গলাতেই বলেন "তোরা যখন বড় হবি মণ্টু, ততদিনে সরস্বতী দুর্গা, কালী, শালগ্রামটা পর্যন্ত কলের হয়ে যাবে, খুব কলের পুজো করিস।"

এক যুগান্তসীমায় চৌমাথায় দাঁড়িয়ে এ কি ক্রান্তদর্শী শিল্পি-আত্মার অমোঘ দীর্ঘশ্বাস! কিন্তু মনোজ বসুর গল্পাবেদন কখনোই অত স্পষ্টোচ্চারিত নয়,—তার সম্পর্কে এমন 'প্রযত্নোচ্চারিত' গাঢ়কণ্ঠ কল-কথন অতি-আড়ম্বরে কুণ্ঠিত হতে চায়। তবু ব্যঞ্জনাটুকু মনে লেগেই থাকে; বিশেষতঃ গল্পের সার্থক ছোটগাল্পিক পরিসমাপ্তির লগ্নে। সারাদিন কলের গানের চমক লাগিয়ে গোটা গাঁটিকে আলোড়িত করে, প্রচুর টাকা 'উল্টাগাঁটে ভাল করে গুঁজে' কলের বিকল হবার সংবাদ ঘোষণা করে হরসিত রাতের মত বিরত হয়। পরদিন সকালে কৌতূহলী গ্রামজনতা আবিষ্কার করল "হরসিত নাই, কলের গান নাই, এমন কি নেত্য ঠাকরুণের পিতলের ঘটিটিও নাই। জল খাইবার জন্য হরসিতকে দেওয়া হইয়াছিল।"

শিল্পীর হাতে অনায়াস-নিক্ষিপ্ত একটি নিছক তথ্যবর্ণনা,—অথচ বাচন-ভঙ্গির বঙ্কিম কটাক্ষ-কৌশলে মনের তলায় তল'য় ওই অস্ফুট জিজ্ঞাসাটি জমা হয়েই ওঠে, কলের বাহক হরসিতরা কেবল পেতলের ঘটি নয়, সেই সঙ্গে আবহমান গ্রামীণ মূল্যবোধটিকেও হাত সাফাই করে উধাও হয়ে যায় বুঝি! মনোজ বসুর গল্পশিল্পে জীবনশিল্পীর চিত্তরাগ এমনি মৃদু প্রচ্ছন্ন বর্ণেই অনুরঞ্জিত।

এই অনতিস্ফুট ব্যঞ্জনা-মন্দ্রিত বাচনশৈলী মনোজ বসুর কৈশোর-গুণান্বিত রোমান্টিক কল্পনার বুননে এক নূতন সাফল্য যোজনা করেছিল। ফলে অতিপ্রাকৃত রচনায় সার্থক শিল্পীরূপে একদা তিনি অতি সংবর্ধিত হয়েছিলেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "অতিপ্রাকৃতের খুব সূক্ষ্ম অনুভূতি ও অতীন্দ্রিয় জগতের শিহরণ জাগাইবার অসাধারণ ক্ষমতা—ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব।"[৫৩] 'বনমর্মর'-কে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মনোজ বসুর সর্বশ্রেষ্ঠ অতিপ্রাকৃত গল্প বলে উল্লেখ করেছেন; যথার্থই গল্পটি মনোজ বসুর গাল্পিক চরিত্রের বহুমুখী পরিচয়বহ।

ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় লিখেছিলেন, "বনের মর্মরধ্বনির নিগূঢ় অন্তঃপুরে যে আলো-আঁধারের রহস্য-নিকেতন আছে, তাকেই তিনি এক কবিত্বময় সংকেত-ভাষণে রূপ দিয়েছেন।"[৫৪] আগে দেখেছি,—প্রকৃতির আলো-আঁধারি রহস্যের অফুরন্ত কম্পনই মনোজ বসুর শিল্পি-মানসিকতাকে দোলায়িত করেছে নিত্যকাল; মানুষের উপস্থিতি সেখানে ছায়াবেশ-মেদুর;—দূরশ্রুত একটুকরো, সুরঝঙ্কারের মত নিবিড় রহস্য-বিলোল। শিল্পীর এই সহজ প্রবণতার সূত্রে বিন্যস্ত প্রকৃতি আর মানুষের স্বপ্নাবেশঘন স্থিতি-স্থাপকতার সম্পর্কে ঘেঁষেই যেন অতিপ্রাকৃত রস জমে উঠেছিল মনোজ বসুর রচনায়।

৫৩। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'।

৫৪। ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়—'মনোজবসুর গল্পসংগ্রহ'—ভূমিকা।

'বনমর্মর'-এর প্রসঙ্গেই আসা যাক,—গল্প শুরু হয়েছে :—"মৌজাটি নিতান্ত ছোট নয়। অগ্রহায়ণ হইতে জরিপ চলিতেছে, খানাপুরি শেষ হইল এতদিন। হিঞ্চে-কলমির দামে আঁটা নদীর কূলে বটতলার কাছাকাছি সারি সারি তিনটি তাঁবু পড়িয়াছে। চারিদিকে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ।

—এইখানে মনোজ বসুর আরো এক অনন্যতা; বলাবাহুল্য, স্বকীয়তাও। গল্পের আকৃতি তাঁর হাতে গালগল্পের আকার ধরে—যার গভীরে গ্রামঘরের চণ্ডীমণ্ডপ বারোয়ারিতলার বৈঠকী আমেজটি জলজ্যান্ত হয়ে জড়িয়ে থাকে।

গল্পও আসলে কথাসাহিত্য; বিবৃতিমূলক শিল্প। উপন্যাস বা ছোট গল্পের রচয়িতা যখন সে বিবরণ লিখে উপস্থিত করেন, পাঠক সেখানে উদ্দিষ্ট শ্রোতা—তার মনোরঞ্জনের জন্যই লেখার যা-কিছু 'করণ-কৌশল'। লেখকে-পাঠকে দূরত্ব যেখানে অনিবার্য, বক্তব্যকে প্রাঞ্জল এবং বিশ্বাসযোগ্য মনোগ্রাহী রূপে উপস্থিত করার দায়িত্বও সেখানে আবশ্যিক। কিন্তু গাঁয়ে-ঘরে দরদী বলিয়ের কণ্ঠে যখন গল্প ঝরে, শ্রোতা তখন আর কেবল সহৃদয় রসিক নয়—গল্প-রসের সে অংশীদারও; এমনকি গল্পের অচ্ছেদ্য একটি চরিত্রও। আসলে গল্পবলিয়ে আপন অভিজ্ঞতার গহন হতে যেখানে কথা বলেন, তখনই গল্প গভীর হয়ে উঠতে পারে। আর গ্রামীণ গল্প-বলিয়ের সকল অভিজ্ঞতাই তাঁর গ্রাম্যজীবনের চৌহদ্দি ঘিরে; শ্রোতারা সেই জল-মাটি-আবহাওয়া-অভিজ্ঞতার অচ্ছিন্ন অংশীদার। অতএব বুঝিয়ে বলবার গুছিয়ে বলবার দায়িত্ব নেই এখানে কথকের; বলতে আরম্ভ করলেই জমে ওঠে গল্প; শ্রোতারা যে জন্মেই রয়েছে গল্প-পরিবেশের সঙ্গে দেহে-মনে!

তেমনি করেই শুরু করলেন মনোজ বসু এখানেও;—'মৌজা' কোন্ মৌজা? কোথায় তার চৌহদ্দি—'জরিপ'-এর গুরুত্ব বা কোন্ সূত্রে। অগ্রহায়ণ মাসে শুরু হয়েছিল জরিপ, 'এতদিনে' কোন্ মাস এল? অতকথার উত্তর দিতে হত বিবৃতি-ভিত্তিক গল্পকারকে; আরো কত কথা বুঝিয়ে বলতে হত! মনোজ বসু তার ধারও ধারলেন না। উল্টো নিয়ে এলেন 'খানাপুরী' অঞ্চলের কথা—যেন কতদিনের চেনা-জানা, পথ চলতে প্রতিদিনের কত আনাগোনা। তাইতেও যদি সংশয় জাগে—এসে গেল 'সেই হিঞ্চে-কলমী দামে আঁটা' মজা নদীর সোঁতা—বাংলার নিভৃত পল্লীজীবনের যে-কোনো জায়গা থেকে তুলে আনা একখানি সর্বজনীন চলচ্চিত্র! চুম্বকের মত এ সব কিছুই টানে! গোপন আবর্তের মত অজান্তেই গল্পের গভীরে গল্পরসিকের চেতনাকে ক্রমশঃ তলিয়ে নিয়ে একাত্ম করে তোলার এ এক অভিনব ভঙ্গী—এ ভঙ্গী গল্পকারেরও নয়, গ্রামপ্রবীণ কথাকারের।

কথার ওপরে কথার ঢেউ-এর মাথায় উঠেপড়ে—ফেনায় ফেনায় ভেসে এগিয়ে চলে গল্পের যাদুভরা টান। মানুষ নয়, মানুষের স্বপ্ন মিলেমিশে যায় কৈশোর-ভাবালুতাবিষ্ট প্রচ্ছন্ন ব্যথামেদুর প্রকৃতি-মগ্নতার মজ্জায় মজ্জায়; প্রাকৃত-অপ্রাকৃতের ভেদরেখা সেখানে অস্পষ্ট এলোমেলো হয়ে পড়তেই দেখা দেয় অতিপ্রাকৃতের রহস্যলোক।

'বনমর্মর' প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ রায়ের কথাই মনে পড়ে আবার:—"বনমর্মর ইতিহাসের রাজপথের নয়, গলিপথের কাহিনী। কিন্তু চারশো বছরের বিস্মৃতির কালো যবনিকার আড়ালে তরুণ জানকীরাম ও তরুণী বধূ মালতীমালার কাহিনীকে লেখক এক চিরন্তন স্মৃতি-বেদনার তীর্থে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।"[৫৫] কিন্তু স্মৃতিরও পূর্বসূত্র আছে—গানের যেমন ধুয়া। চারশো বছরের হারানো স্মৃতির মুখবন্ধ রচনা করে শঙ্কর-ডেপুটীর সদ্য বিরহ-ব্যথা-মেদুর সুধার স্মৃতি-সুধারস। আসলে শঙ্কর-সুধার গল্প 'নয়েই একটি নিটোল ছোটগল্প শেষ হতে পারত সেই যেখানে লেখক বলেন,—"আরও একটি দিনের কথা মনে পড়ে; এমনি এক বিকালবেলা মামুদপুর ক্যাম্পে সে [শঙ্কর] জরিপের কাজ করিতেছে, এমন সময় চিঠি আসিল সুধারাণী নাই।"

এ না থাকা যে কি, শঙ্কর ডেপুটি ছাড়া আর সেকথা অনুভব করেছে কেবল সেই পাঠক—'বনমর্মর' পড়তে পড়তে যাকে এসে থমকে দাঁড়াতে হয় ঐ শেষ বাক্যটির স্তব্ধ সীমান্তে! তবু গল্প ঐখানে শেষ হল না—একটুকু ফাঁক দিয়ে আসল গল্পের তারপরে সবে শুরু! এই অর্থেই বলছিলাম, নিছক দেহরূপের বৈশিষ্ট্য এবং রস-বৈভবে মনোজ বসুর গল্প ছোটগল্প নয়—জমাট গালগল্প।

চারশো বছর আগেকার সমৃদ্ধ জনপদ; আজ রন্ধ্রহীন ভয়াবহ জঙ্গলে আকীর্ণ। তবু যে জীবন হারিয়ে গেছে, কিংবদন্তী বাহিত স্মৃতিতে, ভাবুকের হৃদয়ে, শিল্পীর স্বপ্নে তার মৃত্যু নেই; অবচেতনার গহন হতে চেতন মনকে—চলন্ত জীবন-স্রোতকে সে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সুযোগ পেলেই অবচেতনতার গভীরে টেনে নিয়ে যায় জীবন্ত জীবনকে। নিত্য বয়ঃসন্ধি-পীড়িত কবির স্বপ্ন আর কৈশোরধর্মী হৃদয়াবেগের রহস্যসূত্রেই প্রকৃতি-জীবনের গভীরে অতিপ্রাকৃতের রস জমাট বেঁধে উঠেছে মনোজ বসুর গল্পে। অতিপ্রাকৃত উপাদান বিন্যাসের কলাকৌশল তাতে যত—যেমন আছে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর মত গল্পে,—তার চেয়ে বেশি জমাট বেঁধে উঠেছে প্রকৃতিমগ্ন মনের জীবন-বিহ্বলতা; এ দুটিই 'অবাস্তব মনোহর'—আর কৈশোরাবেশঘন বলে নিছক রোমান্টিক স্বাদুতার তুলনায় এ-যেন আরো একটু বেশি মধুময়।

৫৫। তদেব।

ঐ বন-জঙ্গলের গুহানিহিত জীবন্ত-জীবনের কেন্দ্র-বিন্দু জানকীরাম-মালতীমালার গল্প শুনেছে শঙ্কর ডেপুটি রাতের প্রথম যামে ;—দেখে এসেছে সেই ছায়া-রহস্যঘেরা নিঃসঙ্গতার কল্পলোক। গভীর রাতে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রান্তরে ঘুম আসে না তার চোখে। সন্ধ্যায় দেখা বনস্থলীর স্মৃতিচারণসূত্রে প্রথমেই মনের পটে ভেসে ওঠে সুধারানী ! শঙ্করের একে একে মনে পড়তে লাগল—"সে যা-যা বলিত, যেমন করিয়া হাসিত, রাগ করিত, ব্যথা দিত, প্রতিদিনকার তুচ্ছাতিতুচ্ছ সেই সব কথা। ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের চোখে জল আসিয়া পড়িল। জাগরণের মধ্যে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া কোনোদিন সে আর আসিবে না। ক্রমশ তাহার মনে কারণ-যুক্তিহীন একটা অদ্ভুত ধারণা চাপিয়া বসিতে লাগিল। ভাবিল সেদিনের সেই সুধারানী, তার হাসি চাহনি, তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রত্যেকটি স্বপ্ন পর্যন্ত এই জগৎ হইতে হারায় নাই—কোনোখানে সজীব হইয়া বর্তমান রহিয়াছে, মানুষে তার খোঁজ পায় না। ঐসব জনহীন বন-জঙ্গলে এইরূপ গভীর রাত্রে একবার খোঁজ করিয়া দেখিলে হয়। শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, কেবল মালতীমালা, সুধারানী নয়, সৃষ্টির আদিকাল হইতে যত মানুষ অতীত হইয়াছে, যত হাসি-কান্নার ঢেউ বহিয়াছে, যত ফুল ঝরিয়াছে, যত মাধবী-রাত্রি পোহাইয়া গিয়াছে, সমস্তই যুগের আলো হইতে এমনি কোথাও পলাইয়া রহিয়াছে। তদ্‌গত হইয়া যেই মানুষ পুরাতনের স্মৃতি ভাবিতে বসে অমনি গোপন আবাস হইতে বাহির হইয়া মনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। স্বপ্নঘোরে সুধারানী এমনি কোনখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কত রাতে তার পাশে আসিয়া বসিয়াছে, আদর করিয়াছে, ঘুম ভাঙিলে আবার বাতাসে মিলাইয়া পলাইয়া গিয়াছে।"

উদ্ধৃতি দীর্ঘ-ই হল। কিন্তু এর থেকেই বোঝা যাবে, অতিপ্রাকৃতকে অনায়াসে গ্রহণীয় করে তোলার কলাকুশলতা শঙ্করের মানসিকতা-বর্ণনায় প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত নেই। বরং বর্ণিত ভাবনার সূত্রে আভ্যন্তরিক কার্যকরণ-সূত্র অপেক্ষাকৃত দুর্বল। কিন্তু কৈশোরাবেগ-বিচঞ্চল ঐ শেষ বাক্যটি !—যেন কিশোর প্রাণের স্বতঃউৎসারিত একখণ্ড গীতিকবিতা—তারই সুরঝঙ্কারে আদ্যন্ত বর্ণনা ও ভাবনা কেমন নিবিড় বুননে একত্র বাঁধা পড়ে যায়। বস্তুত অতিপ্রাকৃত রসের চেয়ে 'বনমর্মর' এবং মনোজ বসুর অনুরূপ প্রায় সব গল্পেই কিশোর-ভাবনাশ্রিত গীতিস্বাদ-সুরভিই নিবিড়তর।

আসলে তাঁর সকল গল্পেরই তাই প্রায় একমাত্র বৈশিষ্ট্য—গুণ এবং দোষ দুই-ই।

এই প্রসঙ্গেই বিখ্যাত 'মাথুর' গল্পটির কথা মনে আসে ; মোহিতলাল মজুমদার উচ্ছ্বসিত ভাষায় একদা বলেছিলেন, মনোজ বসু এই "বড় গল্পটিতে বাল্যপ্রণয়ের যে-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা যেমন বাস্তব অনুসারী, তেমনি কাব্যরসে

সমুজ্জ্বল।...বস্তুতঃ বাংলা গল্প সাহিত্যে ইহার জুড়ি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"৫৬

আসলে 'মাথুর' মনোজ বসুর গাল্পিক প্রতিভার আর এক দীপ্ত প্রতিনিধি—যেমন রূপাকৃতিতে তেমনি আন্তর প্রকৃতিতেও। প্রথমেই স্মরণ করতে হয় মোহিতলাল যাকে 'বড় গল্প' বলেছেন, আসলে তা ছোট উপন্যাস বা 'নভেলেট্' নয়। ছোট গল্পেরই মত তার আখ্যান অংশের সীমিত পরিধি 'বিন্দুর' গহনে আবর্তিত;—তবু 'সিন্ধু'র অতলস্পর্শ গভীর গম্ভীরতার দাবিও তার মূলে জোয়ালো হয়ে উঠতে পারল কই?—অল্পকথার নিবিড় জীবন-বাণী কেমন অনেক কথার—অশেষ কথার বিস্তারে ছড়িয়ে পড়ে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকটা এই কারণেই 'মাথুর'-এর গাল্পিক সংহতির দুর্বলতা নিয়ে অনুযোগ করেছিলেন।৫৭ তাহলেও গল্পরসের সম্পূর্ণতা—এক নেশা-ধরানো আমেজ গল্পটিকে চুম্বকের আকর্ষণীয়তা দিয়েছে। সে রস আসলে ছোট বা বড় গল্পের নয়—আগে বলেছি, বৈঠকী গালগল্পের—বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের জীবন আর প্রকৃতি-পরিবেশের আন্তরিক উত্তাপে যা একাধারে জীবন্ত-মদির। মনোজ বসুর গল্পের এই রূপশৈলী—এই টেক্‌নিক্—ছোট-বড়-নির্বিশেষে সকল আকারের গল্পেরই সাধারণ লক্ষণ।

কিন্তু বাক্‌প্রকরণ নয়, বাণীর শিল্পেও সেই একই অনন্যতা। মোহিতলাল মজুমদার গল্পটির বাস্তব অনুসারিতার প্রশংসা করেছিলেন—সেই বাস্তবিকতা গল্পের পারিপার্শ্বিক রচনায় নিটোল একখানি চালচিত্রের ভূমিকা নিয়েছে। দেয়াপাড়া জাঙ্গুলগাছি গ্রাম, মঠবাড়ির মেলা, উৎসব, সংগীত, মায় গাঁয়ের পঞ্চজনার সামনে ক্ষেত্রনাথের বৈষয়িক কলহ থেকে জগদ্ধাত্রীর পৈতৃক ভিটায় 'সরিষাক্ষেতে'র রোমান্স-মদির ছবিটি পর্যন্ত নিপাট বাস্তবের প্রতিচ্ছবি—কিংবা তার চেয়েও একটু বেশি—শিল্পীর হৃদয়াবেগের তুলিতে আরো যেন একটু বিস্ফারিত বিস্তারিত বর্ণে সমুজ্জ্বল। কিন্তু ওরই মাঝে মানুষ যেমনি এল,—মানুষের জীবন,—তেমনি বাস্তবিক ঘরকন্না থেকে মাঠ-ঘাট-মেলাঘেরা গোটা পরিবেশটি কেমন স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে পড়ল। গল্পের একেবারে শুরুতে উমানাথ-তরঙ্গিণী সংবাদ থেকে নিতাই-জগদ্ধাত্রী, কিংবা ক্ষেত্রনাথের সংসারে দুই তরুণী বধূর মাঝখানে হঠাৎ উপস্থিত জগদ্ধাত্রী—সব কিছুতেই জীবন যেমন আছে, কিংবা যেমনটি জীবনে হয়, তাকে এড়িয়ে আবিষ্ট কল্পনার পক্ষে যা হতে ইচ্ছা করে কিংবা হতে লোভ হয় তারই মধুগন্ধ যেন ছড়িয়ে পড়েছে। একটি

৫৬। মোহিতলাল মজুমদার—'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র'।

৫৭। দ্রঃ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।'

আদ্যোপান্ত বাস্তবিকতার প্রচ্ছদপটে অনাবিল স্বপ্নকথার এই অকুণ্ঠিত বিকাশ দেখে ভবানী মুখোপাধ্যায়ের পূর্বধৃত অনুভূতির কথাই মনে পড়ে—স্বভাব-রোমান্টিক মনোজ বসুর কল্পনা ও রচনার আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে চোখে-দেখা গ্রামের মাটির বর্ণ : দুহাত দিয়ে যাকে স্পর্শ করা যায়—ইন্দ্রিয়ের ভেতর দিয়ে যার মধুঘ্রাণ অতীন্দ্রিয় লোকের স্বপ্নসীমায় পৌঁছে দেয়।

ফলে বাল্য-প্রেমস্মৃতি শিল্পি-কল্পনায় যত রোমান্টিক, প্রাবীণ্য-স্পর্শা ক্ষেত্রনাথ-জগদ্ধাত্রীর ব্যক্তিত্ব তার সঙ্গে পুরো অন্তর-নিবিষ্ট হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু মানুষ যত অস্পষ্ট হোক, যত সংশয়াম্বিতই হোক তার অস্তিত্ব, মনোজ বসুর গাঁ-ঘরের প্রকৃতি-ঘেঁষা স্বপ্নোদ্বেলতা তাকে আত্মসাৎ করে এক অপরূপ পরিণামে পৌঁছে দেয়—যেখানে কৈশোর-ভাবালু মনের দ্যুতিবশে বাস্তব-অবাস্তবের প্রসঙ্গ নিরর্থক হয়ে পড়ে; পাঠকের চেতনাও শরৎ আকাশের লঘুপক্ষ মেঘের মত আপন আনন্দে ছুটে ফেরে অকারণ আবেগের স্বচ্ছ আকাশে।

গভীরতার অন্তস্তলশায়ী এই লঘুপক্ষ মুক্তির স্বচ্ছতা আরো প্রখর হয়ে চোখে পড়ে 'নরবাঁধ' গল্পে—মোহিতলাল তাঁর পূর্বোক্ত রচনায় বলেছিলেন, আর কিছু না লিখলেও 'মাথুর' আর 'নরবাঁধ'-এর শিল্পী বাংলা গল্পসাহিত্যে অমরতা দাবি করতে পারতেন। আর ঐ দুটি গল্প সম্পর্কেই ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আক্ষেপ করেছিলেন,—স্বভাব রোমান্টিক মনোজ বসু আর যথেষ্ট রোমান্টিক থাকতে পারছেন না।[৫৮]

বিশেষ করে 'নরবাঁধ' সম্পর্কে একথাটি মনে রাখবার মত। মনোজ বসুর স্বভাবে কিশোরকালীন সৌন্দর্য-স্বপ্নমগ্নতা অনেকটা সহজাত হলেও তাঁর দেশকাল ছিল আন্তরিক চরিত্রে স্বপ্নহর। 'বাঘ' গল্পের প্রসঙ্গে সেকথা বলেছি। ১৯৩০-এর দশকে গ্রামীণ ভূমিনির্ভর বনেদি জীবন-মানসিকতা তখন বিধ্বস্ত হচ্ছে সত্ত বিকাশমান অর্থগৃধ্নু স্বার্থ-সংকীর্ণ যন্ত্র-জীবিতার আত্মনাশী মত্ততায়। 'বাঘ' গল্পে যার ইঙ্গিতটুকু কেবল লঘুস্বরে ধ্বনিত, 'নরবাঁধ'-এ সেই জীবন-চেতনা ব্যাপকতর পটভূমিতে অপেক্ষাকৃত গাঢ় সাংকেতিকতায় বিস্তৃত; কিন্তু সেই বিগাঢ়তায় মহাকাব্যের অনুপুঙ্খ দার্ঢ্য নেই তারাশঙ্করের রচনার মত! আগেই বলেছি মনোজ বসু গাথাশিল্পী ;—আপন মনোরসের গভীরে সতত নিমগ্নতার সূত্রে বুঝি গীতিশিল্পী। গাথা আর গীতের অঙ্গাঙ্গী মিলন হল যেখানে, অনতিপ্রখর সাংকেতিকতায় বিচক্ষণ সে মোহানা।

'মাথুর'-এর মতই দীর্ঘ বিস্তারিত কথাবস্তু 'নরবাঁধ'-এ খণ্ডে বিখণ্ডে প্রকীর্ণ।

৫৮। তদেব।

সামগ্রিক সংহতি নয়—'এপিসোডিক' বিচ্ছিন্নতার বৈচিত্র্য আর বিস্তারই মনোজ বসুর গল্পকলার বৈশিষ্ট্য। তবুও দুই যুগের দুই গল্প এখানে একই সুতোয় বাঁধা পড়েছে দৃঢ়বদ্ধতায় না হলেও অনায়াসে। পুরাতন গ্রাম তার আবহমান প্রাকৃতিক রহস্য, মানবিক আন্তরিকতা ও দুর্ধর্ষতা নিয়ে একপ্রকার অতি প্রাকৃত গল্পের সীমান্ত প্রায় স্পর্শ করে গেছে। এই দীর্ঘ স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্পের পাদপীঠে দ্বিতীয় উপাখ্যান সমান দৈর্ঘ্য ও বিস্তার নিয়ে বিকশিত হয়েছে—বিজ্ঞানদম্ভী যান্ত্রিক প্রযুক্তিধারার হাতে মানুষের মনুষ্যত্বের যেখানে মহামৃত্যু ঘটেছে। শত নরবলি না হলে বাঁধ বাঁধা যাবে না—এই ছিল আবহমান লোকসংস্কার। আজ কেবল বাঁধ নয়, বাঁধের ওপরে পুল হয়েছে মটরগাড়ি চলাচলের। ব্যক্তি-মানুষ নয়—গ্রামীণ মানব-মহিমার মহামৃত্যুর বেদীমূলে বাঁধের পাথর গাঁথা পড়েছে। ভয়াবহ প্রেতলোকের অনুভবের মত অন্ধকারে বুভুক্ষু গ্রামবাসীর মিছিল রচনা করে শিল্পী তারই সার্থক ইঙ্গিত করে গেলেন।

মনোজ বসু ছোটগল্পকার নন—গালগল্পরসিক কথাকলাবিদ্। স্বভাব রোমান্টিক হলেও পারিপার্শ্বিক জীবনের রূপরস-মগ্ন; নিবিড় জীবন-দৃষ্টি সত্ত্বেও জীবনতত্ত্বের প্রচারবিমুখ সহজ শিল্পী! অত কথা মনে না রাখলে মনোজ বসুর আপাত অগঠিত গল্পবস্তুর মাদকতার উৎস খুঁজে পাওয়া কঠিন।

'পৃথিবী কাদের' কিংবা "দিল্লী অনেকদূর" জাতীয় গল্প প্রসঙ্গে এসব কথা আরো বেশি করে মনে পড়ে। 'ভুলি নাই', 'আগস্ট ১৯৪২' কিংবা 'সৈনিক' লিখে স্বদেশ-প্রেমাবিষ্ট মনোজ বসু রাজনীতি-সচেতন বাংলা কথাসাহিত্যে এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত করেছিলেন। কিন্তু এরা সবকটিই উপন্যাস, গল্পশিল্পের আলোচনা-পরিধির বাইরে। তাহলেও মনোজ বসুর গল্পসাহিত্যেও তাঁর মনের এই উচ্ছ্বসিত সহজ আবেগের স্পর্শ-বঞ্চিত নয়।

পরাধীন দেশের ভাবাদর্শ ব্যাকুল শিল্পী প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবেও জড়িয়ে পড়েছিলেন অল্পবিস্তর। কিন্তু শিল্পীর পক্ষে বহির্ঘটনাবলীই একমাত্র মূল্যবহ নয়; তাঁর মানসিকতার অন্তঃস্বভাবই শিল্পদেহেরও মুখ্য সৃজনপ্রেরণা। অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে সেই মানসিকতার নিভৃত পরিচয় নিজেই শিল্পী ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন—"বরাবর আমি অবিচার দেখে বিচলিত হয়ে উঠেছি। প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছি, যদি আমি সৈনিক হতাম, তাহলে মেসিনগান নিয়ে ছুটতাম, চাষীমজুর হলে ঘরে ফিরে এসে নিষ্ফল আক্রোশে নিরীহ বউকে ধরে ঠেঙাতাম আর অসহায় অজ্ঞান শিশু হলে হয়ত কেঁদে ভাসিয়ে দিতাম।"[৫১]

৫১। দ্রঃ শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়—'কাছে বসে শোনা'। 'অমৃত পত্রিকা' ১৯ কার্তিক, ১৩৭২।

আসলে ঐ শেষের কথাটি সত্য। বয়ঃসন্ধিমথিত স্বভাব-কিশোর মনের আহত-স্বপ্ন অস্ফুট কান্না, ভারহীন জীবন-মমতাবোধের এক স্বভাবকরুণ যাদুস্পর্শই মনোজ বসুর গল্পরসের উৎসমূল। ঐখানে তার মায়া—ঐখানে তার দুর্বলতা—ঐখানে তার জোরও—এবং তার নেশা।

মনোজ বসুর গল্পসংগ্রহ গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে বনমর্মর (১৯৩২), নরবাঁধ (১৯৩৩), দেবী কিশোরী (১৯৩৪), পৃথিবী কাদের (১৯৪০), একদা নিশীথকালে (১৯৪২), দুঃখ নিশার শেষে (১৯৪৪) উলু (১৯৪৮), খদ্যোত (১৯৫০), কাঁচের আকাশ (১৯৫১), দিল্লী অনেকদূর (১৯৫১), কুঙ্কুম (১৯৫২), কিংশুক (দ্বি-সং ১৯৫৭), মায়া কন্যা (১৯৬১), গল্পপঞ্চাশৎ (১৯৬২), কনকলতা (১৯৬৬), ওনারা (১৯৭০) ইত্যাদি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্লোলের যুগতরঙ্গের পাশে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০) আক্ষরিক অর্থে তট-স্থ। অর্থাৎ, সেই যুগোচ্ছ্বাসের পটভূমিতে পরিবর্ধিত হয়েও শিল্পী তাঁর চেতনার গহনে সমসাময়িক কাল-স্রোতের কুটিল স্পর্শ বাঁচিয়ে চলেছেন। তার কারণ কোনো শুচিবায়ু-গ্রস্ততা নয়, তাঁর অন্তরের সহজাত সুদূরাভিলাষ। জীবনের সৌন্দর্যকে আস্বাদন করা চলে দুই পৃথক্ দৃষ্টিকোণ থেকে। বিশেষিত দেশ-কাল-পাত্রের আধারে সুবিন্যস্ত অব্যবহিত জীবনের রূপ বস্তুসমাশ্রয়ী,—তাই বাস্তব। অর্থাৎ, রূপময়তার ফ্রেমে দুহাত ভরে তাকে ধরা যায়, কিন্তু দেশ-কাল-পাত্রের অতিশায়ী এক নির্বিশেষ স্বভাব রয়েছে জীবনের—যা চিরন্তন,—চিরকালই অফুরন্ত রহস্যের চুম্বক-শক্তিতে যা ভরপুর। জীবনের সত্তা থেকে দেশকালপাত্র-জ তার শরীরকে ছেঁকে নিতে পারলে যা অবশিষ্ট থাকে, তা নিছক ফাঁকি নয় কিছুতেই,—বরং সেখানেই রয়েছে সবচেয়ে মূল্যবান প্রাণ-জ্যোতি। প্রধানতঃ লিরিক্ রোমান্টিক্, মিস্টিক্, কবিতায় নির্বস্তুক সেই বস্তুসারকে আস্বাদন করি। ওটুকু কবিতার সম্পদ,—কবির ধর্ম।

কিন্তু ছোটগল্প গীতিকবিতা নয়,—যদিও এ-দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য নিবিড়। অন্ততঃ প্লট গড়ে তোলার মত যৎসামান্য বস্তু উপকরণ গল্পের পক্ষে অনিবার্য। অভিনব কলাকৌশলের গুণে সেই দাবিকেও নবায়িত করে তোলার এক বিশেষ প্রতিশ্রুতি নিয়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা গল্পের জগতে প্রবেশ করেছিলেন বিশুদ্ধ রোমান্স চেতনাময় লিরিক্ কবি-দৃষ্টির সহযোগে। বস্তুত কবিরূপেই সাহিত্যের আসরে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই কবিতা ও গল্প লিখতে অভ্যাস করেন;

আঠারো বছরে প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম কবিতার বই 'যৌবন-স্মৃতি'। ছোটগল্পের প্রথম সংকলন 'জাতিস্মর' এর রচনাকাল ১৯২৯ খ্রীস্ট সাল। কল্লোলযুগের ভরাস্রোতে তখন ঝড়ের দোলা উত্তুঙ্গ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। তাহলেও, এই 'জাতিস্মর'-এই শরদিন্দুর অন্তর্বর্তী গল্প-শিল্পীর স্বভাব অনেকাংশে প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে প্রায় পূর্ণ মূল্যে। অর্থাৎ, এই প্রাথমিক গল্পগুচ্ছের মধ্যেই বর্তমানের চোরা গবাক্ষপথে সুদূর জীবন-প্রান্তরে স্বপ্নযাত্রার শিল্পিবাসনা তার স্বাভাবিক প্রেক্ষিতে ও প্রকরণে বিমূর্ত হয়েছে।

'জাতিস্মর' আধুনিক পৃথিবীর একটি জাতিস্মর কেরানীর পূর্ব পূর্ব জীবন স্মরণের রোমাঞ্চকর রহস্য-কাহিনী। 'জাতিস্মর' গল্পগুচ্ছের বক্তা আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছেন, —"আমি রেলের কেরানী, বিদ্যা এণ্ট্রান্স পর্যন্ত। তের বৎসর একাদিক্রমে চাকরি করিবার পর আজ ছিয়াত্তর টাকা মাসিক বেতন পাইতেছি,—আমি জাতিস্মর, হাসির কথা নয় কি?

* * *

"আমি জাতিস্মর! ছিয়াত্তর টাকা মাহিনার রেলের কেরানী—জাতিস্মর! উপহাসের কথা—অবিশ্বাসের কথা! কিন্তু তবু আমি বারবার—বোধ হয় বহু শতবার এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কখনো দাস হইয়া জন্মিয়াছি, কখনও সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট হইয়া পৃথিবী শাসন করিয়াছি; শত মহিষী, সহস্র বন্দিনী আমার সেবা করিয়াছে। বিদ্যুৎশিখার মতো, জ্বলন্ত বহ্নির মতো রূপ লইয়া আজ সেই নারীকুল কোথায় গেল? সে রূপ পৃথিবীতে আর নাই—সে নারীজাতিও আর নাই, ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এখন যাহারা আছে, তাহারা তেলাপোকার মতো অন্ধকারে বাঁচিয়া আছে।

"আর পুরুষ? আরশিতে নিজের মুখ দেখি আর হাসি পায়। সেই আমি—শূরসেন-রাজের দুই কন্যাকে দুই বাহুতে লইয়া দুর্গ প্রাচীর হইতে পরিখার জলে লাফাইয়া পড়িয়া সন্তরণে যমুনা পার হইয়াছিলাম। ···কেহ বিশ্বাস করিবে না, কেবল হাসিবে। আমিও হাসি—অফিসে কলম পিষিতে পিষিতে হঠাৎ অট্টহাসি হাসিয়া উঠি।"

কেবল গল্প-কথকের কথা নয়,—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-রসেরও অন্তরের কথা এইটুকু। সরীসৃপের মত কুটিল কল্লোলযুগ-জীবনের ভাঙা বনিয়াদের ওপরে বসে ক্ষণে ক্ষণে অট্টহাস্য করে উঠেছে তাঁর গল্প-প্রাণ। দেশ-কালের সীমিত গণ্ডী থেকে অনেক ঊর্ধ্বে উঠে না গেলে অথবা অনেক দূর প্রান্তরের নিঃসীমতায় চলে যেতে না পারলে এমন নির্মেঘ মুক্ত হাসি হাসা সম্ভব নয়। বিশ শতকের ক্লান্ত-চেতন পাঠক আধুনিক কালের বিধ্বস্ত জীবন-স্তূপের কোনো ভগ্নপ্রায় গোপন জানালা-পথ দিয়ে অনেক দূরের মুক্ত আকাশে পালিয়ে যেতে পারার স্বপ্নাবিষ্ট আনন্দ উপভোগ করেন

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ধরনের গল্পগুচ্ছে। সেখান থেকে আমাদের চেনা যুগ ও জীবনের প্রতি পিছন ফিরে তাকালে তাদের ছবির মত মনে হয়,—অনেক ওপরের আকাশ-যান থেকে পৃথিবী দেখার মত,—বস্তুরূপের কুটিলতার ভারস্পর্শ মোচিত সেই চেনা জীবনের দূরাপগত রূপও একান্ত হাল্কা বলে মনে হয়। যেমন মনে হয়,—ছিয়াত্তর টাকা মাইনের কেরানীর ব্যক্তি-জীবনই নয়, তার শক্ত কাঠের কঠিন চেয়ার-খানাও যেন ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে লেখককে নিয়ে রোমান্টিক স্বপ্নের আকাশে। কিংবা, আধুনিক নারীদের অন্ধকার জীবন-যাপনের কারুণ্য অথবা আধুনিক পুরুষের পৌরুষহীন পুরুষত্বের বিড়ম্বনা,—সব কিছুই যেন মূল গল্প-প্রচ্ছদের পক্ষে সুদূর রহস্যময় মায়াবরণ। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে সেই মায়াবী দৃষ্টি, যুগ-যুগান্তর জন্মজন্মান্তরের পার থেকে সুদূরকে যা নিকট করেছে; আবার সেই দূর কল্পলোকে পৌঁছে গিয়ে নিকটকেই করে তুলেছে মায়াচ্ছন্ন সুদূর।

এই দূরযানী শিল্প-প্রকৃতির মুখ্য উপকরণ বিশুদ্ধ রোমান্টিক রহস্য-সন্ধিৎসা, কখনো বা জন্মান্তর-প্রসঙ্গ, কখনো পুরাবৃত্তকথা, কখনো-বা আবার ডিটেকটিভ্ গল্পের শরীরে মূর্তি ধরেছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মান্তর-চেতনা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কোনো অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির জগৎ থেকে ভেসে আসে নি। কোনো আধ্যাত্মিক বিশ্বাস অথবা হিন্দু জন্মান্তরবাদের কোনো প্রভাবও তাতে দুর্লক্ষ্য। বস্তুত 'জাতিস্মর-' কথার অবতারণা আসলে শিল্পীর রোমান্টিক্ স্বপ্নচারণের এক কলাকৌশলময় মাধ্যম হিশেবেই পরিগৃহীত হয়েছে। রোমান্টিক্ কলা-শৈলীর এক মুখ্য উপকরণ অতীত-প্রয়াণ। আর সেই প্রচেষ্টার সফল মাধ্যম রূপেই পুরাবৃত্ত-জগতে বিচরণ এক সাধারণ পদ্ধতির আকার ধরেছে। বস্তুত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীতি দুইটির অন্যতম বাংলা গল্পে এই ইতিহাস-রসের সরবরাহ। এ সম্পর্কে শিল্পী নিজে বলেছেন,—"ইতিহাসের ঘটনাকে যথাযথ বিবৃত করাই ঐতিহাসিক গল্পের উদ্দেশ্য বলিয়া আমার মনে হয় না। তৎকালীন আবহাওয়া যদি কিছুও সৃষ্টি করিতে পারিয়া থাকি, তবেই উদ্যম সার্থক হইয়াছে জানিব।"[৬০]

কিন্তু ঐতিহাসিক পরিবেশ রচনার চেয়েও সেই অতীত প্রেক্ষিতে পাঠকের বর্তমান-নিবদ্ধ চিত্তকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করতে পারাই রোমান্টিক-ঐতিহাসিক শিল্পীর প্রধান সমস্যা। সাধারণতঃ স্বপ্নবয়নের কারুকার্য এবং উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তির পারম্পরিকতা, সেই সঙ্গে রোমান্টিক কাব্যগুণান্বিত বাগ্‌জাল বিস্তার,—সব কিছু মিলে সার্থক রোমান্স-শিল্পী আধুনিক পাঠককে প্রায় সমগ্র অস্তিত্বের সঙ্গে উন্মূলিত করে' বর্তমান থেকে অতীত

৬০। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—'জাতিস্মর'—ভূমিকা।

ভূমিতে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহে' শিল্পীর সেই চুম্বকতুল্য আকর্ষণ-শক্তির এক সফল কাব্যময় নিদর্শন রয়েছে। নিজের মতে ও পথে সেই ধারারই অনুবর্তন করেছেন শরদিন্দুও তাঁর বিখ্যাত 'চুয়াচন্দন'-এর মতো গল্পে। কিন্তু এ ছাড়াও বর্তমান-স্থিত পাঠক-চিত্তে গল্পে-বর্ণিত অতীতলোকের সংযোজন সাধনে দ্বিতীয় আর এক রকমের কলাকৌশল বাংলা গল্পে প্রথম প্রয়োগ করেছেন তিনি, এ দাবি শরদিন্দু নিজেই করেছেন 'জাতিস্মর'-এর ভূমিকায়,—"জাতিস্মর শ্রেণীর গল্প বাংলা ভাষায় নূতন হইলেও বিদেশী সাহিত্যে নূতন নয়। আমি যতদূর জানি, বিখ্যাত মাকিন গাল্পিক জ্যাক লণ্ডন[৬১] ও সর্ববিদিত ইংরাজ সাহিত্যিক স্যার্ আর্থার কোনান্ ডয়েল এবিষয়ে পথ প্রদর্শক; জাতিস্মরের মুখ দিয়া গল্প বলাইবার চেষ্টা তাঁহাদের পূর্বে আর কেহ করেন নাই। এই দুই স্বর্গীয় লেখকের নিকট আমার ঋণ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি।"

ফলকথা, গল্পের শরীরে জাতিস্মরতা-প্রসঙ্গে লোকান্তর-কথা অবতারণার শৈলী যে শরদিন্দু রোমান্টিক্ দূরপ্রয়াণের কলামাধ্যম হিশেবেই প্রতীচ্য শিল্পীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। অতীতের সঙ্গে বর্তমানকালের সংযোজনে এই শৈলীর এক বিশেষ সুবিধা রয়েছে। ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক গল্পে যতক্ষণ গল্পলোকে বিচরণ করি, অন্ততঃ ততক্ষণের জন্য সমসাময়িক -জীবন-চেতনার বিলোপ-সাধনের দক্ষতাই শিল্পীর কলাসিদ্ধির শ্রেষ্ঠ মানরূপে বিবেচিত হয়। কিন্তু জাতিস্মরতা যেন বর্তমান ও অতীতের মধ্যে সংযোগ-সেতু,—তাতে গল্পের পরপারে প্রবেশ-পথে জীবনের এ-পারকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করে যেতে হয় না। বরং জাতিস্মরতার সেতু বেয়ে ওপারে চলে গিয়েও কচিৎ-কখনো রোমান্টিক্ স্বপ্নলোকের হাল্কা-হয়ে-যাওয়া মন নিয়ে ফেলে-আসা বাস্তব জীবনের প্রতিও চোরা কটাক্ষ হেনে দেখা যেতে পারে। 'অমিতাভ' গল্পের উদ্ধৃত অংশে গল্প-কথক তাই করেছেন। এই সূত্রেই নিজের কালের বাস্তবের সঙ্গে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরাগত শিল্প-লোকের ক্ষীণ সংযোগ-অভাসটুকু লক্ষ্য করা যায়। সেখানে,—কল্লোলকাল-স্রোতের বহু দূরের স্বপ্নপ্রান্তরে তাঁর মানস অধিষ্ঠান।

তাছাড়া এই জাতিস্মরতা-বিষয়ক গল্পগুলিতেও রোমান্সরসের মুখ্য উপাদান ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত। প্রকৃতির রহস্যজগতের চেয়ে ইতিহাসের তথ্য-লোকের প্রতিই রোমান্টিক শিল্পী শরদিন্দুর অধিকতর আগ্রহ। তাহলেও, সেই রোমান্স-প্রীতির মূলেও আসলে রয়েছে রহস্য-বিলাসী মনের আত্যন্তিক প্রভাব। প্রকৃতির রচনা অতীন্দ্রিয় জগতে প্রবেশ করে রহস্য-সন্ধিৎসু মনের যে উৎকণ্ঠা রোমান্সের স্বপ্নজাল

৬১। John Griffth (Jack) London (১৮৭৬-১৯১৬)।

করতে পারল না, ডিটেকটিভ্ গল্পে তাই চরিতার্থতার এক নূতন আশ্রয় খুঁজে পেল। এখানে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফল্যের এক নূতন দিগন্ত। রোমান্সের ইতিহাসাশ্রিত স্বপ্নলোক থেকেও জাতিস্মরতার সেতুপথের রন্ধ্র দিয়ে নিজের কালের প্রতি নির্ভার হাল্কা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন যেমন একদিকে, আর একদিকে তেমনি রোমান্টিক শিল্পীর রহস্যদৃষ্টি দিয়ে করেছেন ডিটেক্‌টিভ গল্পের রহস্য উন্মোচন। তাতে বাংলা রোমাঞ্চ-রহস্য-গল্পের দেহে বাস্তবতা-বোধের গাঢ়তর অবলেপ সম্পাদিত হতে পেরেছে। ব্যোমকেশ-প্রাসঙ্গিক গল্পগুচ্ছ এই সত্যের সংশয়রহিত প্রমাণ।

বাংলা রহস্য-গল্পে প্রথম সার্বিক জনপ্রিয়তা সম্পাদন করেছিলেন দীনেন্দ্রকুমার রায়, সেকথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তাঁরও মুখ্য আদর্শ ছিলেন কোনান্ ডয়েল। এই প্রতীচ্য রহস্য-রোমাঞ্চ-গল্পরসিককে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রথম আহ্বান করে আনার গৌরব পাঁচকড়ি দে-র। 'নারীনাগরী,' 'শঠেশাঠ্যং সমাচরেৎ' এবং 'পিশাচীর প্রেম' এই তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ তাঁর রহস্য উপন্যাস 'মায়াবিনী' (১৯২৮) সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হয়েছিল। তিন কিস্তিতে সম্পূর্ণ এই রহস্যগল্প-সিরিজের গোয়েন্দা নায়ক কোনান্ ডয়েল্-এর শারলক্ হোম্‌স্-এর আদর্শে গঠিত। ডয়েল্-এর প্রভাব শরদিন্দুও স্বীকার করেছেন তাঁর 'জাতিস্মর' গল্প প্রসঙ্গেই। তাছাড়া রহস্য-রোমাঞ্চ গল্প-ধারায় ব্যোমকেশের গল্প, ব্যোমকেশের কাহিনী এবং ব্যোমকেশের ডায়েরি প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত গল্পগুচ্ছের ব্যোমকেশও আসলে শারলক্ হোম্‌স্-এরই প্রভাব-জাত। কিন্তু, পাঁচকড়ির শিল্প-প্রয়াস মুখ্যত যেখানে উপন্যাসের বিস্তারমুখী, শরদিন্দু সেখানে একই উপলক্ষ্যে একের পর এক ছোট আকারের গল্পই রচনা করে গেছেন একই প্রসঙ্গ-সূত্রে। তাছাড়া আঙ্গিক-বিন্যাসের দিক্ থেকে শরদিন্দুর উৎকর্ষ সুদূরযানী। বস্তুত এই ধরনের গল্প-ধারাতে তাঁর তথ্যসমাশ্রয়ী কলাকৌশল স্বকীয় সমৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে উন্নীত হতে পেরেছে। এখানে রোমান্টিক শিল্পী শরদিন্দুর স্বভাব-ধর্মের আরো একটি দিক্ উন্মোচিত হতে পারে। আদর্শ রোমান্স-রসিকের মত তিনি জীবন-রহস্য-সন্ধানী, আর সেই রহস্যের সন্ধানে অতীতের প্রেক্ষালোকে প্রয়াণ করেছেন কখনো প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসের হাত ধরে, কখনো জন্মান্তর-স্মরণের বাঁকা পথে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই নির্বস্তুক কল্পনা-নির্যাস তাঁর উদ্দেশ্য নয়। অতীত ইতিহাসের অমরাবতীতে পৌঁছে সেখানকার ধূলামাটি দিয়ে রোমান্স-রহস্যজগতের এক বস্তুধৃত রূপই তিনি গড়ে তুলেছেন। অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়তা, আধ্যাত্মিকতা বা নির্বস্তুক কল্পনাবিলাস তাঁর নয়। কেবল অব্যবহিত জীবনের কুটিল ভারাক্রান্ততা থেকেই শিল্পী পলায়ন করে ফেরেন। তাছাড়া অতীতের স্বর্ণদিগন্তে শিল্প-জগৎ রচনা করার সময়েও ঘটনায় স্তূপকেই তিনি

ইমারত গড়ার মুখ্য উপকরণ হিশেবে গ্রহণ করেছেন। অনেক গল্প রয়েছে, যাতে ইতিহাসের পাত্রপাত্রী উপস্থিত আছে, কিন্তু গল্পে বর্ণিত ঘটনা ইতিহাসে ধরা নেই। সেখানেও ঐতিহাসিক অতীতকালের পরিমণ্ডলে বসে আপন কল্পনার জগৎ থেকে ঘটনা ও তথ্যের পঞ্জী আহরণ করেই শিল্পী তাঁর গল্প রচনা করেছেন।

এদিক্ থেকে ঘটনা ও তথ্য-শ্রশ্মিতা শরদিন্দুর গল্পশৈলীর এক শ্রেষ্ঠ উপকরণ। রোমান্টিক রহস্য-দৃষ্টি নিয়ে তিনি কেবল তার স্বপ্নসজ্জা রচনা করেছেন। রহস্য-রোমাঞ্চ গল্পেও রয়েছে তাই। সম্ভাব্য তথ্যের বস্তুগত উপকরণকে আশ্রয় করেই তিনি গল্পের রহস্য-জগৎ নির্মাণ করতে বসেছেন। আর সেখানেও তথ্যপ্রয়োগ ও বস্তু-বিন্যাস-ভঙ্গির অপূর্বতা রহস্যগল্পের উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠাকে অতন্দ্র করে রেখেছে প্রায় সকল গল্পেই। এইসব গল্প-প্রসঙ্গেও প্লটের বস্তুক উপকরণকে শিল্পী আধুনিক জীবন-পরিবেশ থেকে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ অব্যবহিত জীবনের মূলভূমি থেকে আমাদের কালের অনিবার্য দুর্ভর জটিল সংশয়, সন্ধান এবং অবসাদ-বিষণ্ণতাকে কোনো গোপন পথে সম্পূর্ণ নিষ্কাশিত করে দিতে পারলে ভারমুক্ত যে হাল্কা হাওয়ায় সে ঘুরে বেড়াতে পারে, তারই এক প্রসন্ন প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে। এই অর্থেই তিনি কল্লোলের কালে জন্মেও এই যুগ-জীবনধারার সুদূর স্বপ্নপ্রান্তরবর্তী,—কর্মমুখর চৌরঙ্গীর উল্টোপারে বর্ষা-সন্ধ্যার দূর প্রত্যন্তলীন গড়ের মাঠের মত।

রহস্য, রোমাঞ্চ এবং রোমান্স যেখানে শিল্পীর সৃষ্টির মুখ্য আকর্ষণ, গল্পের বুননে ছোটগাল্পিক সংক্ষিপ্তি এবং সংহতির প্রতি সন্তর্পণ অবধান সেখানে অনেকটা স্বাভাবিক কারণেই অনুপস্থিত। তাহলেও এমন কি 'চুয়াচন্দনে'র মত রোমান্স-নিগূঢ় বহুব্যাপ্ত গল্পেও ছোটগল্পোচিত এক স্পর্শকাতর নিভৃতি মাঝে মাঝে অনুভবনীয় হয়ে উঠেছে। ডিটেক্‌টিভ গল্পে রহস্য-বিন্যাসের কলাকৌশল প্লট্-এর শরীরে কৌতূহল, উত্তেজনা, এবং উৎকণ্ঠাকে ধাপে ধাপে এমন বিন্দু-সমুখ করে তোলে, যার ফলে ছোটগল্পসমুচিত এক অখণ্ডতাবোধ অনেক ক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে ওঠে। আকারে এবং আঙ্গিকে রীতি-বিশুদ্ধ না হলেও ছোটগাল্পিকতার স্বাদ শরদিন্দুর অনেক গল্পেই সংলগ্ন হয়ে আছে।

এঁর উল্লেখ্য গল্প-সংকলন গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে:—জাতিস্মর (১৯৩৩), ব্যোমকেশের কাহিনী (১৯৩৪), ডিটেক্‌টিভ (১৯৩৭), চুয়াচন্দন (১৯৪২), কাঁচামিঠে (১৯৪২), কালকূট (১৩৫১), গোপনকথা (১৩৫২), দন্তরুচি (১৯৪৬), পঞ্চভূত (১৯৪৬), বুমেরাং (১৩৫৩), শাদা পৃথিবী (১৯৪৯), ছায়াপথিক (১৩৫৬), বিষকন্যা (৩য় সং—১৩৫৯), দুর্গরহস্য (১৩৫৯), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরস গল্প (১৯৫২), শ্রেষ্ঠগল্প (১৩৬১), কানু কহে রাই (১৩৬১) ইত্যাদি।

সপ্তদশ অধ্যায়

দ্বিতীয় পর্বের বাংলা গল্প (৫)

সূর্যাবর্ত

রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই তাঁর তিনসঙ্গী গল্প-সংকলনের সমালোচনা প্রসঙ্গে পরিমল গোস্বামী প্রথম দুটি বাক্যে লিখেছিলেন,—"আধুনিক বাংলা গল্প-সাহিত্যের পটভূমি খুঁজতে গেলে রবীন্দ্রনাথকেই স্মরণ করা ছাড়া উপায় নেই। অর্থাৎ তুলনায় কথা উঠলে রবীন্দ্রোত্তর গল্প-সাহিত্যের কথাই তুলতে হয়।"[১] এই লেখার কাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক।—১৯৪১ এবং তার নিকটবর্তী সময়ে যুদ্ধের নিরুদ্ধশ্বাস অভিঘাত বাঙালির জীবনে,—তথা, বৃহত্তর ভারত কিংবা প্রাচ্যখণ্ড এমন কি বিশ্বভূখণ্ডেও অন্ধকারের এক নূতন বিভীষিকা যখন সৃষ্টি করেছে,—তারই মুখবন্ধে। বর্তমান প্রসঙ্গে বাংলা গল্পের পটভূমিতে বাঙালি-চেতনার পরিচয় সন্ধানই আমাদের অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য। ১৯৩৯ খ্রীস্ট সালেই য়ুরোপে যুদ্ধের সূচনা ঘটে গিয়ে থাকলেও প্রাচ্য বিশ্বে, —বিশেষ করে বাংলাদেশে তার বিভ্রান্তিকর পরিচয় ১৯৪১ সালের আগে অনুভূত হয় নি,—অন্তত চিন্তায় এবং প্রকাশে তার কোনো পরিচয় অনুপস্থিত। আর এদিক থেকেও এই নূতন প্রলয়ঘূর্ণীর মুখে ভারত-আত্মার মর্মযাতনাকে অভয়মন্ত্রে পুটিত করে প্রথম উল্লেখ্য অভিব্যক্তি দিলেন রবীন্দ্রনাথই তাঁর অন্তিম বাণীমুখে। 'সভ্যতার সঙ্কট'-এ তার ঐতিহাসিক প্রমাণ। এই সময়ের মুখোমুখি এসেই আবার বাংলা গল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে আমাদের আলোচ্য কালের স্রোতপ্রবাহ বিলীন হয়ে গেছে নূতন বিশ্ব-ক্রান্তির আবর্ত-গহনে। এদিক্ থেকে রবীন্দ্রনাথের অন্তিম গল্প-রচনা কালস্বভাবের বিচারে বাংলা গল্পের দ্বিতীয় পর্বের শেষ ফসল। বস্তুত সেদিনও 'আধুনিক' বলতে পরিমল গোস্বামী কল্লোল-যুগ-সম্ভব 'রবীন্দ্রোত্তর'দের কথাই স্মরণ করেছিলেন।

কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী উদ্ধৃতির তাৎপর্য গভীরতর, অর্থাৎ সমালোচকের দৃষ্টিতে সেদিনকার 'আধুনিক' রবীন্দ্র-গল্প রবীন্দ্রোত্তর গল্প-সাহিত্যের সঙ্গেই একমাত্র তুলনা-যোগ্য। সেই একই সূত্রে, আমাদের ধারণা,—রবীন্দ্র-অতিক্রমণের অব্যবহিত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিশ শতকীয় বিনষ্টির ইতিহাসবৃন্তে বাংলা-সাহিত্যে যে আধুনিক জীবনযজ্ঞের যৌবনাগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের অন্তিম

১। পরিমল গোস্বামী—'রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গী'—প্রবাসী—ফাল্গুন, ১৩৪৭ বাংলা সন।

সৃষ্টিতেই তার পূর্ণাহুতি নিবেদিত হল। এমন কথা মনে করবার কারণ নেই যে, কল্লোলযুগের সকল দ্বিধা, সংঘাত, আত্মখণ্ডন ও বিষণ্ণ অবসাদবোধ সবকিছুই রবীন্দ্ররচনায় পূর্ণ সাম্যে বিধৃত হল। বরং ভারসাম্যহীন জীবন-যন্ত্রণার এক উল্কামূর্তিই স্বেচ্ছাদগ্ধ হয়ে মরেছে 'রবিবার' গল্পের অভীক্-এর মধ্যে। 'ল্যাবরেটরি'-র সোহিনীর অভ্যন্তরে অসমঞ্জস আত্মখণ্ডিত ব্যক্তিত্বের পরস্পর-বিরোধী বৈপরীত্যের চমকই প্রখর হয়ে উঠছে। 'শেষকথা' গল্পেও অনুভব করি সমন্বয়-হীন ব্যক্তিবাসনার পরাভূত বিষণ্ণ করুণ সুর। এদিক থেকে আলোচ্য এই গল্প-ভাবনার মধ্যে কল্লোল-কালের এক আশ্চর্য সূত্র-সাম্যই লক্ষিত হয়ে থাকে। আর যেহেতু তার সূত্রধার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, কেবল সেই কারণেই কল্লোল-সৃষ্টি-বাসনার এক পূর্বাপর সুরেখ সামগ্রিক প্রতিবিম্ব যেন আভাসিত হয়েছে এই সমাপ্তিক রচনা কয়টির মধ্যে। এখানেই এই বিতর্কিত-গুণ গল্পগুচ্ছের ঐতিহাসিক স্মরণযোগ্যতা।

রবীন্দ্রোত্তরণের সাধনায় প্রগত-তমদের মধ্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যে একজন, তার অবিসংবাদিত প্রমাণ 'শেষের কবিতা'র নিবারণ চক্রবর্তী ওরফে অমিত রায়। তাহলেও, রবীন্দ্রোত্তর যুগেও রবীন্দ্রনাথ যে অদ্বিতীয়, অর্থাৎ পূর্বাপর-রবীন্দ্র-ধর্মেরই একমাত্র অনিবার্য পরিণাম, তারও শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর ঐ 'শেষের কবিতা'তেই। বুদ্ধদেব বসু বিদায়-রশ্মির শেষ আলোকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন 'সব পেয়েছির দেশ'। সেদিনকার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি সহযোগে তিনি লিখেছিলেন,—"সাধারণত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লোকের রক্ষণশীলতা বাড়ে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় হয়েছে ঠিক্ উল্টো, যত বয়স বেড়েছে ততই তিনি মুক্ত হয়েছেন। যা সাময়িক, যা প্রথাগত, যা দেশে কালে আপেক্ষিক, যা লোকাচারের সংস্কার কিংবা ব্যবহারিক বিধিমাত্র, সে সমস্তের ঊর্ধ্বে গেছে তাঁর দৃষ্টি, নীতির চেয়ে সত্যকে বড় করে দেখেছেন, রীতির চেয়ে জীবনকে।" এখানেই রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বভাব-গহনে বিশ্ব-ইতিহাসের মুক্তি। ইতিহাসের গতি কেবলই এগিয়ে চলেছে অতীত থেকে অনাগতের পথে, পুরাতন থেকে নূতনে। এদিক থেকে তার সার্থকতা কেবল কালোত্তরণে নয়,—পুরাতন কালের স্থায়ী মালমশলা নিয়ে নূতন কালকে সৃজন করার দক্ষতায়। এই বিশেষ অর্থে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জীবনপ্রবাহে রবীন্দ্রনাথ কেবল একটি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নন—একাধিক যুগের অবিচ্ছিন্ন সামগ্রিক ইতিহাস,—ঠিক সেই অর্থে, যে অসম্ভব অর্থে কিংবদন্তী মহাভারতের ঐতিহাসিক মহিমা ঘোষণা করে বলেছে,—'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে'। উনিশ শতকের যে অবিস্মরণীয় রেনেশাঁস্-এর আকস্মিক পরিসমাপ্তি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উদ্‌যাপনে (১৯০৫-১৯১১), যে অনিশ্চয়তা-মন্থর দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপে প্রথম

বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন (১৯১৪-১৯১৮) ঝড়ো পথে আধুনিক বাঙালি মানসের শৈশব অভিসার,—যুদ্ধোত্তর বিনষ্টির পটভূমি থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-কালের উপান্ত পর্যন্ত (১৯২১-১৯৪১) দিশাহারা বিশশতকীয় বয়ঃসন্ধি-চেতনার যে জীবনোন্মাদনা ফেনোচ্ছল হয়ে উঠেছে,—বাংলার ও বাঙালির ইতিহাসের এই তিনটি সুনিশ্চিত জীবন-পর্যায়ের একমাত্র সত্য পরিচয় অবধারণ করে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাপমান যন্ত্র বলব না,—এদিক থেকে তাঁর অতীন্দ্রিয় স্পর্শ-চেতনা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনলোকে নির্ভুল মূল্য-মাপকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও শিক্ষানীতি—জীবনের সকল দিকেই তাঁর এই অভ্রান্ত পরিচয় গবেষণা-মাধ্যমে তিলে তিলে আহরণযোগ্য।

কিন্তু এ অসম্ভবও যে সম্ভব হয়েছে, তার কারণ কোনো ঐশ্বরিক শক্তি নয়,—বরং রবীন্দ্র-চেতনার অকল্পনীয় মর্ত্য-প্রীতি! পৃথিবী এবং তার গাছপালা লতাপাতা পশুপক্ষী মানুষের সঙ্গে যে শিল্পী অবচেতন শৈশবলগ্নেও নাড়ি চলাচলের আত্মিক সম্পর্ক অনুভব করেছিলেন,—পৃথিবীর দিকে দিকে নিজের মগ্ন চৈতন্যকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন দেশকালের নিঃসীম দিগন্ত পর্যন্ত কেবল অতন্দ্র সত্য-সন্ধিৎসায়। নিজের দেশকাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত এত সূক্ষ্ম স্পর্শকাতর অবধানযুক্ত শিল্পি-চেতনা প্রায় অলভ্য। আত্মার অবিচল প্রত্যয়ে তিনি আধ্যাত্মিক,—জীবনের এক অসীম আনন্দ-কল্যাণ-পরিণামিতায় নিত্য বিশ্বাসী। সেই পরিণাম-রহস্যের অনুসন্ধানেই তিনি অসীম পথের চির-পথিক—আর সেই পথের অভিযাত্রায় নিজের দেশকাল অভিজ্ঞতার ধারায় যা-কিছু চিত্তের সান্নিধ্যবর্তী হয়েছে, তাকেই অপার আগ্রহে চেতনার গভীরে সঞ্চয় করেছেন,—যথামূল্যে যাচাই করে দেখেছেন। বিন্দু বিন্দু জল নিয়ে যেমন সমুদ্র, তিল তিল সুখ-দুঃখের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঞ্চয়-পরিণামেই তেমনি গড়ে ওঠে আনন্দ-কল্যাণের দেশ-কালাতিশায়ী অসীম প্রকৃতি। তাই অসীমের লোভেই সীমার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রতিক্ষণে এত উৎকণ্ঠিত। আর সেই আত্মিক প্রয়োজনবোধের তাড়নাতেই নিজের দেশকালের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তিনি মেলে ধরেছিলেন নিজের চেতনাকে। এই অর্থেই, অর্থাৎ নিজ জীবন-সীমার দেশ-কালগত ইতিহাসের মধ্যে নিজেকে অভিন্ন অস্তিত্বে ছড়িয়ে দিতে পেরেই তিনি হয়ে উঠেছেন আমাদের একাধিক যুগের ইতিহাস।

আবার প্রত্যেক যুগেরই ঘটনা ও ভাবভূমিকে আশ্রয় করে ইতিহাসের ধারা উত্থান-পতনে বন্ধুর পথে প্রবাহিত হয়ে যায়। প্রাপ্তির আনন্দ অথবা শ্রম ও রিক্ততার অবসাদ-বোধ প্রসঙ্গে প্রত্যেক যুগই অনন্ত অন্ধতায় আত্মকেন্দ্রিক। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের সঙ্গে থেকেও ইতিহাসের অতীত,—অর্থাৎ ঝড়জল-বিপদেভরা

দুর্যোগরাত্রে যেমন, তেমনি আনন্দ-উল্লসিত দিবালোককেও জীবনপথের সঙ্গী হয়েও কেবলই তার সাক্ষী তিনি। ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাতের বিক্ষুব্ধ আবর্তে জড়িয়ে পড়েছে তাঁর ব্যক্তিমন,—কিন্তু জড়িয়ে পড়েও আটকে যায় নি কোথাও;—না স্বদেশীর যুগে, না গান্ধী-যুগে,—না অন্য কোথাও: সাহিত্যের জগতে না 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি' অথবা 'বলাকা'-'পূরবী'রও কোনো যুগেই নয়। বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়তে না পারলে তার যথামূল্য আবিষ্কার করা কঠিন হয়,—আবার বস্তুরূপের মধ্যেই একান্ত আচ্ছন্ন-চেতন হয়ে গেলে মুক্ত মূল্যায়ন অসম্ভব হতে পারে। রবীন্দ্রচেতনা তাই ব্যক্তি-ভাবনায় নিজ দেশকালের সঙ্গে একান্ত যুক্ত থেকেও আধ্যাত্মিক মননশক্তিতে তার অন্ধ আকর্ষণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

কল্লোল-যুগের সাহিত্য-সভাতেও তাঁর এই মুক্ত-সঙ্গ চেতনাই ঐতিহাসিক পরিচয়ের অভ্রান্ত পরিমাপক যন্ত্র। রবীন্দ্রোত্তরেরাও চরম লগ্নে এই সত্যানুভবকে পরিহার করতে পারেন নি। তাই দুই বিরোধিপক্ষের যুযুধানেরা বিতর্কের উদ্দামতায় যখন নিজেদের মনে মনেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মূল্যবোধের কাছেই তখন সমাধানের আশ্রয় সন্ধান করতে হয়েছিল তাঁদের। তার কারণ এই নয় যে, রবীন্দ্রনাথ তখন প্রাচ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং প্রতিষ্ঠাযুক্ত বিশ্বপ্রতিভা। অন্তত রবীন্দ্রনাথ নিজে যে এই অন্ধকার ঘূর্ণাবর্তে আলোর দিশারি হতে মনে মনে প্রস্তুত হয়েছিলেন, তার কারণ সেদিনকার রবীন্দ্রবিরোধ অথবা রবীন্দ্রবরণের উত্তালতার মূলগত জীবন-প্রবণতাকে যথার্থ ঐতিহাসিক মূল্যে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন নিজের মধ্যে। তা না হলে অসার্থক নেতৃত্বের লোভকে কবি কেবল জয়ই করেছিলেন না, তার প্রতি অন্তরের ঘৃণা তাঁর অকৃত্রিম ছিল।

সেদিন রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের ধর্ম' প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে আত্ম-ভ্রান্ত বিতর্কের ঝড় নূতন বিরোধ এবং আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের অন্ধতা নিয়ে পুনরায় প্রখর হয়ে উঠেছিল। প্রত্যক্ষত কবি তাতে যোগ দেন নি,—যৌবন বয়স থেকেই এসব বিষয়ে আত্মসংবরণের এক দুর্লভ উদাহরণ তিনি রেখে গেছেন। তাহলেও নিজের দেশ-কালের মুক্তিধ্যানে রবীন্দ্রনাথ পলাতক নন কখনোই। বাইরের জগতে তর্কের ধূমজাল যখন আকাশ-বাতাসকে বিষবাষ্পাচ্ছন্ন করে চলেছে, তখনো কবির সাক্ষি-চেতনা নিজের উপলব্ধির মধ্যে প্রতিটি তরঙ্গাঘাতকে অবধারণ করেছে, প্রতিঘাত করে নি;—অন্তরের অন্তর্লোকে মনের সঙ্গে অলৌকিক মননশক্তি যুক্ত করে সঞ্চয় করেছে নবযুগবাণীর সৃজনসমিধ। কখনো কখনো অনাপেক্ষিক সাহিত্য-নিবন্ধে তার অপ্রত্যাশিত অভিব্যক্তি ঘটেছে;—'পুনশ্চ' ও তদুত্তর গদ্যকবিতাবলীর মধ্যে দেখা

গেছে সেই ভাবানুষঙ্গেরই আচম্‌কা চমক। তাই বা কেন, একেবারে 'লিপিকা'র কাল থেকেই এই বিস্ময়-চমক এক-আধটু চোখে পড়ে। অর্থাৎ, কল্লোলকালের দ্বান্দ্বিকতা-সমুত্তর অস্ফুট জীবন-বাসনারই রস-ব্যঞ্জনা যেন অমিশ্রস্বাদুতায় ধরা পড়েছে ঐসব রচনায়। এই বিশেষ অর্থেই প্রথম পর্বের বাংলা ছোটগল্পের জন্ম যেমন রবীন্দ্র-মানসের সৃজনশালায়, তেমনি দ্বিতীয় পর্বে সেই সৃষ্টি-বাসনার এক দিগন্ত যেন উদ্ভাসিত হয়েছে কবির শেষ কয়টি আকস্মিক গল্প-রচনার মধ্যে!—এই অর্থেই, অর্থাৎ জন্ম-লগ্নের সূতিকাগার-সম্পর্কেই এরা 'গল্পগুচ্ছ'-যুগপ্রবাহের রচনাবলীর প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন,—দ্বিতীয় পর্বের অন্তিমকালের ফসল।

প্রথম পর্বের আলোচনায় শেষ রবীন্দ্রগল্প উল্লিখিত হয়েছিল 'চোরাই ধন'—১৩৪০ বাংলা সালের 'প্রবাসী'তে (কার্তিক) যার প্রথম প্রকাশ। আগেও বলেছি, কল্লোলের কালের ঝড়োবাতাস বাংলা সাহিত্যের ওপর দিয়ে তখন উদ্দাম গতিতে বয়ে চলেছে,—গল্প-শিল্পী রবীন্দ্রনাথের মনে তবু পুরাতন ঋতুর হাওয়া দিচ্ছিল তখনো। 'সবুজপত্র'-যুগের শিল্পদৃষ্টি নিয়ে পদ্মাযুগের যৌবন-প্রণয়-স্বপ্নকে যেন আর একবার ফিরে দেখলেন তখন সপ্ততি সমুত্তর কবি। তারপরে এই অন্তিম পর্বের প্রথম গল্প 'রবিবার' ১৩৪৬ বাংলা সালের শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রথম প্রকাশিত। এখানে এবং পরবর্তী আরো দুটি গল্পে রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে সৃষ্টির আসন পেতেছেন কল্লোলের কালের স্বতখণ্ডিত আত্মজিজ্ঞাসার আবর্তিত মোহানায়। এই কারণেই গল্প তিনটির মূল্যায়নেও জটিলতা দুস্তর হয়ে ওঠে। 'রবিবার', 'শেষকথা' এবং 'ল্যাবরেটরি' এই তিনটি গল্পের সংকলন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'তিনসঙ্গী' (প্রথম প্রকাশ —১৩৪৭)।

'চোরাই ধন'-এর পরে ছয় বছরের সীমা পেরিয়ে এলেও আসলে এই গল্পতিনটিও রবীন্দ্র-চেতনায় পূর্বসৃষ্টিরই কালবিবর্তিত পুর্বানুবৃত্তি। বস্তুত সুদীর্ঘ রবীন্দ্র-সৃষ্টির সঞ্চয়ভাণ্ডারে এমন একটি রচনাও দুর্লভ, কবি-মানসের পূর্বাপর জীবন-বিবর্তনের ধারার সঙ্গে যা একান্তভাবে অন্বিত নয়। রবীন্দ্র-রচনার ইতিহাসে 'আকস্মিক' শব্দ অনুপস্থিত। এদিক থেকে 'তিনসঙ্গী' গল্পাবলীকে 'সবুজ-পত্র'-যুগের মুমূর্ষু গল্পগুচ্ছের অন্তিম পরিণাম বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এই পরোক্ত গল্প-সাহিত্যের মূল-নিহিত জীবন-প্রেরণার পরিচয় যথাস্থানে বিবৃত করেছি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পারিপার্শ্বিক পটভূমিতে পৃথিবীব্যাপী এক অবিচ্ছিন্ন ভঙ্গুরতার অনুভব-বৃন্তে ঐ গল্প-গুলির জন্ম,—কাব্যের ইতিহাসে সেটি 'বলাকা'র ঋতু। বাংলা দেশের জীবন-ইতিহাসের ভাবী শূন্যতাময় পরিণাম সে-যুগে কবির ভাবচেতনাতেই প্রথম প্রকট হয়ে

উঠেছিল। তাই পুরাতনের জীর্ণ খাঁচা ভেঙে চুরমার করে দেবার অধীর প্রয়াসে সেদিন ব্যাকুল হয়েছিলেন তিনি। 'সবুজপত্র'যুগে খাঁচা ভেঙে আসার পরবর্তী শূন্য-পরিণাম মরু প্রান্তরে নূতন আশ্রয়ের মরূদ্যান রচনার আকাঙ্ক্ষাতেই যেন নূতন করে ব্রতী হয়েছিলেন কবি তাঁর অস্তিমলগ্নের এই গল্পাবলীতে। সেই সূত্রেই খাঁচার পরিচয় সন্ধান করতে শেষ পর্ব থেকে রবীন্দ্র-গল্পের প্রথম পর্বের ইতিহাসে আর একবার ফিরে যেতে হয়।

রবীন্দ্র-গল্পের জন্ম-লগ্নে তার প্রথম ধাত্রীত্ব করেছিল পদ্মবিধৌত বরেন্দ্র পল্লীমালা। জীবনকে সেখানে এক নিঃসীম ব্যাপ্তি আর উদারতার মধ্যে প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কবি। সে উপলব্ধির সবটুকুই বাংলার নিস্তব্ধ সুন্দর পল্লীপ্রকৃতির দান নয়,—তার স্নিগ্ধ প্রচ্ছায়তলে 'শান্তির নীড়' ছোট ছোট যে গ্রামগুলি সমাজ ও পরিবার-ধর্মের অজস্র স্নেহবন্ধনে আস্টেপৃষ্ঠে একান্ত জড়াজড়ি করেছিল, তার মর্মমূল থেকে জীবন-রস আহরণ করেই কবি সেদিন গল্পের বনিয়াদ রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পেই বাংলা দেশের চোখে-দেখা সাধারণ মানুষের সামাজিক-পারিবারিক জীবন তার অমিশ্র স্বাদুতা নিয়ে প্রথম উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। সেকথাও বলেছি যথাস্থানে। এই সমাজ, এই পরিবারজীবন-স্নিগ্ধতা প্রধানত মধ্যযুগীয় পরিবারাত্মক সমাজ-প্রধান গ্রামীণ বাঙালি সংস্কৃতির দান।[২] উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির ইতিহাসে এই জীবন-ঐতিহ্যের ক্রমিক বিলুপ্তি ধীরে ধীরে স্ফুটতর হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের বাল্য-চেতনায় সেই বিলীয়মান জীবন-ধর্মের অস্ফুট অনুভব স্বপ্নের মধুরিমা নিয়ে অভিব্যক্তি পেয়েছে 'জীবনস্মৃতি' এবং 'ছেলেবেলা'র বাল্যস্মৃতি-চারণের প্রসঙ্গে। কলকাতা শহরের সেই হারিয়ে যাওয়া অতীতকেই তার সকল ভালমন্দের সঙ্গে কবি আবিষ্কার করেছিলেন বরেন্দ্র-পল্লীভূমিতে। শৈশবের স্বপ্নাবিষ্ট অনুভব প্রথম যৌবনে এর মাধুর্যের দিকটিকেই একান্তভাবে সঞ্চয় করেছিল। অনেকটা এই কারণেও সেকালের পল্লীজীবনে দৈন্যের রুক্ষমূর্তি রবীন্দ্র-রচনায় প্রস্ফুট হয়ে ওঠে নি। কিন্তু সেই সমষ্টিগত জীবনের বনিয়াদ বাংলার পল্লীভূমিতেও তখন যে মৃতপ্রায়, সেকথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

অন্যপক্ষে মধ্যযুগীয়তার অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্রান্তিসীমা পেরিয়ে উনিশ শতকে নগর বাংলা যে নূতন রেনেশাঁস-এর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো, মূলতঃ তা ছিল শিল্প-বিপ্লবোত্তর ইংলণ্ডের বণিক-ভাবনার প্রেরণায় অন্তঃপীড়িত। ফলে এই নবজাগরণের

২। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' ১ম ও ২য় পর্যায়—ভূদেব চৌধুরী প্রণীত।

প্রায় একমাত্র মন্ত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, একমাত্র উপাস্য ছিল মানুষের চরম বিকশিত উত্তুঙ্গ উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিসত্তা,—সমাজ, সমষ্টি, গোষ্ঠী সেখানে কেবল অস্বীকৃত নয়, —উপেক্ষিত। এই অভিনব ব্যক্তিক সমুগ্রতা এবং পুরাতন যুগের সামাজিক সামগ্রিকতার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের সমস্যা যখন উনিশ শতকে নবজাগরণের লগ্নে প্রখরতর সমস্যার আকার ধারণ করেছিল, তারই প্রথম শিল্পিক ফলশ্রুতি দেখি বঙ্কিমের উপন্যাস সাহিত্যে। ক্রমশ সেই সমস্যাজটিল পথে আমাদের কথা-সাহিত্য বহুদূর অগ্রসর হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়ের' কাল পর্যন্ত। সেসব প্রসঙ্গ পূর্বে আলোচনা করেছি। কিন্তু ইতিহাসের গতিরোধ করবার উপায় নেই,—একহাতে সে ভাঙে কেবল আর একহাতে গড়বার জন্যেই। তার অর্থ এই নয় যে, অনভীপ্সিত পুরাতন ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়ামাত্রই তৎক্ষণাৎ নূতনের নবজন্ম ঘটে। বিগত জীবনের অবক্ষয়-পীড়িত ধূলামাটির অন্ধকার আঁধি পেরিয়ে তবেই বহু দুঃখে ইতিহাস নূতন আলোক-লোকের সন্ধান খুঁজে পেতে পারে। এমন অবস্থায় ভাঙনের স্রোত যখন একটানা এগিয়ে চলে, তখন তাকে রোধ করবার চেষ্টা করলে বিকৃতির পচনশীলতাই কেবল একমাত্র লাভ হয়। তখন তাকে ভেঙে কালস্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

'সবুজপত্রে'র যুগে রবীন্দ্রনাথ এই সত্যকে সম্পূর্ণ করে আবিষ্কার করেছিলেন। সমাজ ও পরিবারধর্মের যে মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ যথাকালে ব্যাপক জাতীয় জীবনের পরমাশ্রয় ছিল,—কালচেতনার বিবর্তন-পরিবর্তনের সূত্রে তাই সেদিন একান্ত অকেজো হয়ে পড়েছিল সাপের গায়ের শুকনো খোলসের মত। তাই যে-শিল্পী 'চোখের বালি'র বিনোদিনীকে স্বামীর ঘরের জীর্ণ খাঁচা থেকে বের করে আনলেন জীবন-যুদ্ধের বিচিত্র পথে, তিনিই আবার একদিন তাকে চালান করে দিয়েছিলেন প্রাচীন সংস্কারের পুণ্যতীর্থ বারাণসীতে। কিন্তু দাম্পত্য, পাতিব্রত্য, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, চারিত্রনীতির এক পুরাতন আদর্শ আবহমান কাল থেকে চলে এলেও আধুনিক মানুষকে,—তার প্রগতিশীল সচেতনতাকে আর কিছুতেই ধারণ করে রাখতে পারছে না, এ সত্য কবি নিঃসংশয়ে অনুভব করেছিলেন।

যা ধারণ করে রাখে তাই ধর্ম,—আর যা তা পারে না জীবনে তার অবস্থান কেবল অধর্ম নয়, পাপ। এ-বিশ্বাসে কবি-চেতনা দৃঢ় অম্বিত ছিল। তাই 'নষ্টনীড়' গল্পে চারুকে আর ভূপতির দাম্পত্য আশ্রয়ের খাঁচায় ফিরিয়ে নেন নি তিনি। তবু 'সবুজপত্র'-পূর্বকালের এই বৈপ্লবিক গল্প-পরিণামে চারুকে কবি জীবনের এক অনিশ্চয়তার সংশয় ভূমিতে ফেলে রেখেছিলেন। ছোটগল্প-রূপের রসসিদ্ধি তাতে

সার্থকতার এক উচ্চ গ্রামে পৌঁচেছে নিঃসন্দেহে। তাহলেও চারু যেন সেই কবি কথারই পুনরাবৃত্তি, "ঘরেও নহে, পারেও নহে, যেজন আছে মাঝখানে।"

কিন্তু আমাদের জীবন-ব্যবস্থায় সমুগ্র ব্যক্তিক প্রকাশের তীক্ষ্ণধার দীপ্তি এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতন পারিবারিক-সামাজিক মূল্যবোধের বিশুষ্ক অবক্ষয় কবিচেতনায় প্রখর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল 'সবুজপত্র'যুগে। তাই রবীন্দ্র-গল্পের দিকে দিকে শুরু হল খাঁচা ভাঙার সবুজের অভিযান,—'স্ত্রীর পত্র', 'হালদারগোষ্ঠী' প্রভৃতি গল্পে যার সফল উদ্‌যাপন।

'সবুজপত্র'-যুগের রবীন্দ্র-গল্পে খাঁচা ভেঙেছিল। কিন্তু নবজীবনের নবনীড় রচিত হতে পারে নি। খাঁচার পাখি যেদিন প্রথম মুক্তি পেল, বাঁধন ভাঙার নির্বাধ আনন্দে সে হয়ত দীর্ঘকাল আকাশে দুটি মুক্ত পক্ষ বিস্তার করে উড়ে বেড়াতে পারে। কিন্তু পাখিরও দুটি ডানা কেবল উড়ে বেড়াবার জন্য নয়, মুক্ত আকাশের অবাধ শ্রান্তি নীড়ের শান্তির মধ্যে আশ্রয় খোঁজে। রবীন্দ্রসাহিত্যে জীবনের রূপ মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতোই। পাখির ডানায় পুরাতন সংস্কার ও মূল্যবোধের মোহ যখন সোনার শিকলের মত বাঁধা পড়েছে, তখনই ২৭ নম্বর মাখন বড়াল লেনের খাঁচা থেকে মেজবৌকে কবি বার করে আনলেন অমিত বিদ্রোহের সবুজ শক্তিবলে। কিন্তু এবারে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কেবল কবি-মানসে নয়,—যুগ-চেতনাতেও,—পুরাতন আশ্রয়ের খোলস ভেঙে বেরিয়ে যে এল, তার নতুন আশ্রয় মিলবে কোথায়! শেষ পর্যায়ের গল্পগুলি,—'তিনসঙ্গী' 'গল্পাবলী' আর 'বদনাম'[৩] গল্পে কবি নবযুগের সেই আত্মার আশ্রয় খুঁজতে বেরিয়েছেন।

কবি-কথাতেই এই অনুভবের সমর্থন রয়েছে। 'বদনাম'-এর প্রসঙ্গে রানী চন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "প্রথম আমি মেয়েদের পক্ষ নিয়ে স্ত্রীর পত্র গল্পে বলি। তারপরে আমি যখনই সুবিধা পেয়েছি বলেছি। এবারেও সুবিধা পেলুম, ছাড়ব কেন, সদুর মুখ দিয়ে কিছু বলিয়ে নিলুম।"[৪] সদুর পরিকল্পনা যে 'স্ত্রীর পত্র'-র, ক্রমানুবৃত্তি প্রসঙ্গে, এ-স্বীকৃতি কবি-ভাবনাতেই নিহিত ছিল। কিন্তু 'স্ত্রীর পত্র'র মৃণাল, আর 'বদনাম্'-এর সদু পৃথক ধাতুতে গড়া,—প্রথমটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-কালের অবক্ষয়-ভাবনায় জাত—দ্বিতীয়টির জন্ম সেই যুদ্ধোত্তর কালের একেবারে শেষ সীমানায়,—দ্বিতীয় যুদ্ধ-প্রভাবের উপান্ত ভূমিতে,—কল্লোল-চেতনার সে ছিল সমাপ্তি-সীমান্ত। 'সবুজপত্রে'র যুগে যে ভাঙনের সর্বনাশা অভ্যাগম-

৩। 'প্রবাসী' ১৩৪৮ (জৈষ্ঠ-সংখ্যা)-এ প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শতবার্ষিকী সংস্করণ রবীন্দ্র রচনাবলীতে গল্পটি প্রথম গ্রন্থিত হয়েছে। ৪। দ্রষ্টব্য: রানী চন্দ—'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ'।

সম্ভাবনাকে কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন,—প্রথম যুদ্ধোত্তর কালের যৌবন চেতনায় তা যেন আরো প্রচণ্ড শক্তির প্রাচুর্য নিয়ে দেখা দিল। কল্লোল যুগের উদ্দাম উদ্দীপনার অভিঘাতে দাম্পত্য, পরিবার, সমাজ, নীতি-চেতনা সব কিছু সম্পর্কে পুরাতন বিশ্বাস এবং মুগ্ধতা গেল সম্পূর্ণ রূপে চুরমার হয়ে। সে যেন এক ঐতিহ্যমুক্ত ঊষর শূন্যতাঘেরা প্রান্তর। যেমন সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, তেমনি জৈব জীবন ধারণের প্রয়োজনপ্রসঙ্গেও এই নূতন মূল্যবোধের পক্ষে ব্যক্তিই হল একমাত্র স্বীকার্য অস্তিত্ব। সামাজিকতা, প্রণয়বৃত্তি, সাধনা এবং গবেষণা,—সবকিছুর একমাত্র মূল্যমান হল তীক্ষ্ণ, উগ্র, এবং যুগপৎ তর্ক-যুক্তি-বিচার-ও-আবেগপরায়ণ আধুনিক ব্যক্তির স্বীকৃতি আর প্রয়োজন-প্রসঙ্গে। সর্বপরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকতা যেন আধুনিকতার আকাশে নীড়হীন চির-উড্ডীয়মান পাখি। তাই কল্লোলযুগের গল্পের বহিরঙ্গে যত উল্লাস, আতিশয্য, তার অন্তরঙ্গে ততই যেন শ্রান্তি আর অবসাদ। নতুনযুগের শৃঙ্খলহীন ব্যক্তিকতাকে পুরাতন গ্রামীণ প্রত্যয়ের সূত্রে লগ্ন করে এক নূতন প্রত্যয়-জগৎ সৃষ্টি করেছেন তারাশঙ্কর। তাতে আধুনিক ব্যক্তিমানসের আশ্বাস যত গভীর,—বাস্তবিক আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি তত দৃঢ় নয়। কারণ যাদের জন্য সে আশ্রয়, তারা,—তারাশঙ্করের চোখে-দেখা জীবন আর তার পাত্রপাত্রীরা সর্ব-বন্ধন পরিচ্ছিন্ন ত্রিশঙ্কু আধুনিকতার অন্ধ জগৎ থেকে অনেক দূরবর্তী। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিতেও নূতন প্রত্যয়ের আশ্বাস ভেসে এসেছে যেন কোন্ সুদূর আধ্যাত্মিক মায়ালোক থেকে। কল্লোলযুগের পরিশ্রান্ত আধুনিকতার ভাঙা পাত্রে সর্বসম্পর্কহীন শূন্যতাময় ব্যক্তিক জগতের ধুলাবালির উপাদান নিয়ে নতুন কালের জীবনাশ্রয় রচনার দুঃসাধ্য সাধনা করেছেন সেকালের দুই উদীয়মান শিল্পী,—আজ যাঁরা আমাদের কালের প্রবীণ। এক প্রেমেন্দ্র মিত্র,—নিভৃত ব্যক্তি-চেতনায় অবাঙ্মনসোগোচর পিপাসা নিয়ে যিনি সেই অদৃশ্য নীড়ের সন্ধানী। আর একজন অন্নদাশঙ্কর,—একালের বন্ধুর জীবনের অন্ধকার গলির পথে আপন তন্দ্রাহীন মননশীলতার তীক্ষ্ণ আলো ফেলে বিশ্বমানবের বাসার সন্ধানে যিনি পথিকবৃত্ত। অস্তদিগন্ত থেকে শেষ রবি-রশ্মি বিচ্ছুরিত করে সেই অজেয় পথের আভাস যেন নির্দেশ করে গেলেন কবি তাঁর 'তিনসঙ্গী' গল্পাবলীতে!

আধুনিক মানুষকে এখানে তার সর্বপরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিক মহিমাতেই অনাবৃত করে মেলে ধরেছেন তিনি,—'রবিবার' গল্পের অভীক্-এর মধ্যে সে ব্যক্তিকতা শিশুদেহের মতই যেন উলঙ্গ,—এবং অনেকটা সেই কারণেই মনে হয় রূঢ় বেদনাকরও। নিছক গল্পের প্লট-এর সূত্র ধরে বিচার করলে অভীক্-এর নাস্তিক্যের প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ তার

পরিবার-ধর্মের কৌলিক আচার-আচরণের বিস্তৃত বিবরণ অবাস্তবতা দোষে অভিযুক্ত হতে বাধা নেই। কিন্তু, সমাজ-পরিবারের সকল ঐতিহ্য-বন্ধন থেকে স্বেচ্ছাপরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের বাহ্য উগ্রতার মূলেও সর্বশূন্যতার যে গোপন বেদনা নিহিত রয়েছে,—যথামূল্যে তা হয়ত পরিস্ফুট হতে পারত না অভীক্-এর এই সর্বসঙ্গ-রহিত রিক্ত রূপটিকে প্রকট করে তুলতে না পারলে। নিতান্ত বিষয়বস্তুগত উপকরণের বিচারে রবীন্দ্র-রচনায় অভীক্ অভিনব নয়। 'চতুরঙ্গে'র জ্যেঠামশায়ের নাস্তিক্যধর্মের প্রতিধ্বনি তার কথাতেও মাঝে মাঝে শ্রুতিগোচর হয়ে ওঠে।—"পরের ধন হরণ করা অনেক ক্ষেত্রেই পুণ্যকর্ম, পারি নে পাছে অপবাদটা দাগা দেয় পবিত্র নাস্তিক মতকে। ধার্মিকদের চেয়ে আমাদের অনেক বেশি সাবধানে চলতে হয় আমাদের নেতি দেবতার ইজ্জত বাঁচাতে।" অথবা, "তুমি তো নাস্তিকের জাত মারতে পারো না। আমার ধর্মের শ্রেষ্ঠতা এইখানে।"—এবং আরো অনুরূপ উক্তির মধ্যে। তাছাড়া 'হালদার গোষ্ঠী'র সেই বড় ছেলেটির ক্ষীণ ছায়াও যেন রয়েছে অভীকের মধ্যে,—আচার-আচরণের জীর্ণ পারিবারিক খোলস ভেঙে মুক্তপ্রাণের আকাশের তলায় যে বেরিয়ে এসেছিল অপার বিদ্রোহের শক্তিতে। কিন্তু জ্যেঠামশায়ের প্রগাঢ়তা, অথবা বনোয়ারির যৌবনশক্তির অপরিমেয় দার্ঢ্য—অভীক্-এর মধ্যে কিছুই নেই। এখানে সে অনেক দুর্বল,—অনেক বেশি অসহায়। অর্থাৎ মুখে যত জোরের সঙ্গে কথা বলে, মনের গভীরে জোর পায় না তত। তাই 'নাস্তিক ধর্ম' বজায় রেখেও বারোয়ারি পূজার নেতৃত্ব করার পথ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয় না তার। বিদেশের সমুদ্রপথে জাহাজের খালাসী হয়ে পালাবার সময়েও অবচেতনায় প্রলুব্ধ হতে থাকে কেবলই, পরোক্ষ আস্তিক্যের গলি-পথ দিয়ে আবার বিভার ভালবাসার উচ্চশীর্ষ শাখায় নীড় বাঁধা যায় কি না।

রবীন্দ্র-সৃষ্ট সম্ভউক্ত সমানধর্মা পূর্ববর্তী চরিত্র দুইটির তুলনায় অভীক্ অনেক দুর্বল,—ব্যক্তিক সত্তায় যতখানি, সৃষ্টির জগতেও ঠিক ততখানিই। অভীক্-এর ব্যক্তিমূল্যের নিভৃত রহস্যলোকেই তো গল্পরসেরও গোপন উৎস। কিন্তু এ দুর্বলতা স্রষ্টার প্রতিভা-জনিত নয়;—সৃষ্টির মাটিতে,—সমকালীন জীবনের মূলে রয়েছে সেই বিষণ্ণ শক্তিদৈন্য। "আচার ধর্মের খাঁচাটাকে ঘরের দাওয়ায় ঝুলিয়ে রেখে ধর্মবিশ্বাসের পাখিটাকে শূন্য আকাশে উড়িয়ে দিলে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটে না যেখানে",—সেই মরা খোলসের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে অভীক তার ব্যক্তিক বলের দৃঢ়তায়,—জীবনের জয়ই তো ঘোষিত হয়েছে তাতে! সেই জীবনীশক্তির প্রাচুর্যবশেই, "ধনী পিতার তহবিলের কেন্দ্র থেকে" নির্বাসিত হয়ে শ্রমসাধ্য কঠিন জীবনযাত্রায় ভেঙে পড়ে নি সে। কিন্তু এই নূতন প্রাণ, অভিনব এই জীবনীশক্তিও বায়ুভূত নিরাশ্রয় নয়। মানুষের

দেহের মত তার হৃদয়ধর্মও উপযুক্ত খাদ্য-পানীয়ের জন্য অধীর হয়ে থাকে। পিতা'র সংস্কারকে যে পরিত্যাগ করতে পেরেছিল সকল ক্ষয়ক্ষতি বরণ করেও, পিতৃস্নেহের জন্য লুব্ধ অভিমানের অধিকার তো কেবল তারই। সেই অভিমানই কথার অতীত শূন্যতাবোধ নিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে বিভার কাছে অভীক্-এর অনুযোগে :—"তোমার ভগবান কি আমার বাবারই মতো। আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন।" এই প্রসঙ্গে সর্বপরিচ্ছিন্ন আধুনিক ব্যক্তি-মানুষের লুব্ধতাকে গাঢ়তর পরিমাণে অনুভব করি, অতি বড় দুঃখের দিনেও অভীক্ যেখানে মা'র দেওয়া নোট কয়খানি ফিরিয়ে দিয়েও তাঁর "প্রসাদ" যাচ্ঞা করেছে অপার ব্যাকুলতায়। বাইরে যে মানুষ সর্বাতিক্রমী,—স্বেচ্ছায় সে আত্মবন্দী; আত্মার এই অনভবনীয় রিক্ততার দৌর্বল্য আধুনিক ব্যক্তিমানুষের মর্মতলশায়ী হয়ে আছে। অভীক্-এর দুর্বল পরাভবের মধ্যে সেই মানুষকেই যেন দেখি,-দেখি আধুনিক ব্যক্তি-মানুষের নিরাবরণহীন tragedyর অনিবার্য অস্ফুট অনুভূতি। যে দৃঢ়তা অভীক্ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে নি, তারই অভাবে আধুনিক বিদ্রোহ-চেতনা আত্মখণ্ডিত, মর্মবিষণ্ণ।

'রবিবার' গল্পে যদি 'হালদার গোষ্ঠীর' যুগানুগ অনুবৃত্তি অস্ফুট হয়ে থাকে, 'শেষ কথা'[৫] গল্পে যেন শুনি 'শেষের কবিতা'র অতি অস্ফুট স্বপ্নাবিষ্টতার সুর। পরিমল গোস্বামী এই গল্পের প্রসঙ্গে লিখেছিলেন,—"প্রথম থেকেই এর সুর জমে উঠেছে। সমস্ত গল্পটি যেন কাব্য-প্রেরণা থেকে জন্মলাভ করেছে।"[৬] সে প্রেরণা 'শেষের কবিতার'ই নতুন দেশকাল প্রভাবিত নবরূপ। এই গল্পেও চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটনে অস্পষ্টতা রয়েছে। তাহলেও 'শেষের কবিতা'র প্রণয়-ভাবনার সেই নৈর্ব্যক্তিক আদর্শের প্রসঙ্গ এখানেও এসেছে। নবীনমাধবকে অচিরা বলেছিল,—'মেয়েদের সম্পদ হৃদয়ের, যদি তার সব হারায়—যা কিছু বাহ্যিক, যা দেখা যায়, ছোঁওয়া যায়, ভোগ করা যায়, তবু বাকি থাকে তার ভালবাসার আদর্শ যা আবাঙ্মনসোগোচর। অর্থাৎ ইম্‌পার্সোনাল।' কারণ অচিরা বলে,—"ভালোবাসার আদর্শ আমাদের পূজার জিনিস। তাকেই বলে সতীত্ব। সতীত্ব একটা আদর্শ।" আর অচিরার অনুভবে,—"দীর্ঘকালের প্রয়াসে মানুষ চিত্ত-শক্তিতে নিজের আদর্শকে গড়ে তোলে, প্রাণশক্তির অন্ধতা তাকে ভাঙে।" নবীনমাধবকে সে বলে, "আপনার দিকে আমার যে

৫। প্রথম প্রকাশ 'শনিবারের চিঠি', ফাল্গুন ১৩৪৬। এই গল্পটিই ভিন্নতর আকারে আরো আগে প্রকাশিত হয়েছিল বিদ্যাসাগর স্মৃতি সংখ্যা 'দেশ'-এ (৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬); সেখানে গল্পের নাম ছিল ছোটগল্প। দ্রষ্টব্য—রবীন্দ্র রচনাবলী ২৫ খণ্ড।

৬। পরিমল গোস্বামী—'রবীন্দ্রনাথের 'তিন সঙ্গী' [প্রবন্ধ]। 'প্রবাসী', ফাল্গুন, ১৩৪৭।

ভালোবাসা, সে সেই অন্ধশক্তির আক্রমণে।” অথচ, প্রথম যৌবনে যে ভবতোষকে ভালোবেসে লজ্জাকর চরম বঞ্চনায় অভিহত হয়েছিল অচিরা,—সেই প্রথম ভালোবাসাকেই জীবনে সে একমাত্র করে তুলতে চেয়েছে। সে ভালোবাসায় ভবতোষ আজ একেবারেই অনুপস্থিত,—কারণ, অচিরা বলে,—“সে আর আমার সেই জীবনের প্রথম ভালোবাসা এক নয়। এখন আমার কাছে সেই ভালোবাসা ইম্‌পার্সোনাল।”

—‘শেষের কবিতা’র অন্তঃ-সুরভিময় কাব্যসত্যের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দুরূহ বলেও এখানে তা পরিহার করা যেতে পারে। তবু ‘মিতা’ আর ‘বন্যা’র মধ্যে যে-প্রেম ব্যক্তিকে ছাড়িয়েও অমর হয়ে রইল, তার গূঢ়তর ব্যঞ্জনা তাদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিবাহিত জীবনেও নৈর্ব্যক্তিক প্রণয়ানুভবের মায়ামাধুরী ছড়িয়ে রেখেছে। এখানেও সেই ‘ইম্‌পার্সোনাল’ ভালোবাসার তাগিদেই অচিরা প্রত্যাখ্যান করে গেল নবীনমাধবকে, —এর মূলে আত্ম-প্রত্যাখ্যানেরও যে আবাঙ্‌মনসোগোচর নিগূঢ়তা রয়েছে, তাও অনুভবযোগ্য। অথচ এই প্রত্যাখ্যানের মধ্যে ‘শেষের কবিতা’র অন্তর্লীন সেই পরম প্রাপ্তির সুরটুকু নেই,—বরং এরা দুজনেই যেন স্বেচ্ছাবঞ্চিত। গল্পের শেষে নবীনমাধবের সমাপ্তিক অনুভবের কথা মনে পড়ে,—অচিরার প্রত্যাখ্যানকে স্বীকার করে,—“বাড়ি ফিরে গিয়ে কাজের নোট এবং রেকর্ডগুলো আবার খুললুম্। মনে হঠাৎ খুব একটা আনন্দ জাগল—বুঝলুম্ একেই বলে মুক্তি। সন্ধ্যাবেলায় দিনের কাজ শেষ করে বারান্দায় এসে বোধ হোলো—খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে একটুক্‌রা শিকল। নড়তে চড়তে সেটা বাজে।”

এখানেই আত্মখণ্ডিত আধুনিক মানুষের,—যে মানুষ হয়ত আধুনিককালের বলেই একান্তভাবে বৈজ্ঞানিক,—ঐতিহ্যবন্ধনহীন বলেই নিরাবেগ,—সেই মানুষের দুরনুভবনীয় রহস্য-যন্ত্রণাবোধ বচনাতীত ব্যঞ্জনারূপ লাভ করেছে। একি মুক্তি,—না মুক্তি-মোহের মায়ায় মগ্নচৈতন্যের গূঢ়তর বন্ধন! এ জিজ্ঞাসার জবাব আধুনিক সভ্যতার মধ্যে অনুপস্থিত,—অনুপস্থিত ‘শেষ কথা’ গল্পেও। তবু,—অস্তাচলতলের অন্তিম রশ্মি আ-দিগন্ত বিস্তৃত করে এই অনপনেয় জিজ্ঞাসার স্বরূপ খুঁজে ফিরেছেন কবি,—এখানে তিনি কল্লোলের কালের সহচর নন কেবল,—সীমান্তসন্ধানী অতন্দ্র প্রহরীও।

খুব অস্ফুট হলেও সে সন্ধান বুঝি প্রথম পাওয়া গেল ‘ল্যাবরেটরি’ গল্পের সোহিনী-তে। অন্তিম শয্যায় শুয়ে কবি নাকি তার সম্পর্কে ‘প্রায়ই বলতেন’—“সোহিনীকে সকলে হয়ত বুঝতে পারবে না, সে একেবারে এখনকার যুগের শাদায় কালোয় মেশানো খাঁটি রিয়ালিজম্। অথচ তলায় তলায় অন্তঃসলিলার মত

আইডিয়ালিজম্ হল সোহিনীর প্রকৃত স্বরূপ।"[৭] এই আইডিয়ালিজম-এই বুঝি কবির চোখে ক্ষণ-উদ্ভাসিত হয়েছিল কল্লোল-চেতনার দিগন্তলীন সুদূর নীড়চ্ছায়া। আকৃতি ও বক্তব্য বিষয়ের প্রাঞ্জলতা এই গল্পে অপেক্ষাকৃত স্ফুটতর,—ফলে পরিধি এবং বিস্তারও ছোটগল্পের গণ্ডী পেরিয়ে নভেলেট্-এর সীমান্তের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। ব্যক্তিত্বের তুঙ্গশিখরে একটি নারী এবং একটি পুরুষ উল্কার মত জ্বলছে এই গল্পের সর্বাঙ্গ জুড়ে—সে জ্বালা আধুনিকতার উদ্‌ভ্রান্তিতে অগ্নিদগ্ধ।—নন্দকিশোর আর সোহিনী, খাঁটি শয়তানের তারা ভক্ত চেলা; এইখানেই জীবনের মূলে জোড় লেগে গিয়েছিল তাদের প্রথম সাক্ষাতেই,—বাকিটুকু তিলে তিলে গড়ে তুলেছে নন্দকিশোর নিজে, কারণ 'অসবর্ণ বিবাহে' তার অপছন্দ অকৃত্রিম, -তাঁর মতে "স্বামী হবে ইঞ্জিনীয়ার, স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনী, এটা মানবশাস্ত্রে নিষিদ্ধ।...পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও।"

এই ব্রতের মিলে আত্মার জোড় লেগে গিয়েছিল নন্দকিশোর আর সোহিনীতে। সে পাতিব্রত্যের আদর্শ শরীরের কোনো সীমাতেই খুঁজে পাবার উপায় নেই। নন্দকিশোর সোহিনীকে "যে-দশা থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেটা খুব নির্মল নয় এবং নিভৃত নয়।" তা নিয়ে কেনো মাথাব্যথাও ছিল না তার মোটেই—"বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করত, বিয়ে করেছ কি! উত্তরে শুনত, বিয়েটা খুব বেশি মাত্রায় নয়, সহমতো।" কিন্তু একটা জায়গায় নন্দকিশোরের দাম্পত্যে ফাঁকি ছিল না, সে নারীপুরুষের ব্রতের জোড় মেলানোতে। সেখানে তাই কখনোই ফাঁকি পড়তে হয় নি তাকে,—এমন কি মরে গিয়েও না। বিধবা সোহিনী অধ্যাপক চৌধুরীকে বলেছিল,—"আমি সমাজের আইন-কানুন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে পড়ে, কিন্তু প্রাণ গেলেও বেইমানি করতে পারবো না।"

এই ইমানদারিতেই তো সোহিনীর নারীব্যক্তিত্বের চরম সতীত্ব,—এক নূতন অর্থে,—যে অর্থের দ্যোতনা অনুভব করা গেছে নন্দকিশোরের কণ্ঠে। কল্যাণ-পরিণামী কবি-কণ্ঠে এই নূতন 'আইডিয়ালিজম্' শুধু চমকে তোলে না, আতঙ্কিতও করে। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় এর মূলগত দূরদৃষ্টি দেখে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর য়ুরোপীয় সমাজ ও সাহিত্যের পচনশীলতার ঢেউ লেগে আমাদের দেশেও কল্লোলযুগ-জীবনে ভাঙনের অন্তঃশক্তি প্রখরতম হয়ে উঠেছিল। তারপরে দ্বিতীয় যে বিশ্বযুদ্ধের প্রথম অভিঘাতই কেবল রবীন্দ্রনাথ অনুভব করে গেছেন, তার পরে বিশ্বজোড়া আণবিক সমাজ আজ এক অতলস্পর্শ শূন্য-গহ্বরের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানে চরিত্রনীতি, দাম্পত্য,

৭। দ্রঃ প্রতিমা দেবী—'নির্বাণ'।

গার্হস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ক মূল্য-চেতনায় অন্তর্নিহিত পবিত্রতাবোধ তিরোহিতপ্রায়। এমন কি, সেকালে নারীপুরুষের অবাধ দৈহিক সম্পর্কে সন্তানজন্মোত্তর প্রকাশ-সম্ভাবনাজনিত যে সামাজিক লজ্জাকরতার আশংকা ছিল, আধুনিক কালের বিজ্ঞান তাকেও সম্পূর্ণ উন্মূলিত করেছে। 'ল্যাবরেটরি' গল্প রচনার কালে বিদেশেও এসব সমস্যা অতটা প্রখর হয়ে হয়ত চোখে পড়ে নি। কিন্তু এই অনিশ্চয়তা-বোধের দুঃসম্ভাবনার সঞ্চয় সেদিনই জমতে শুরু করেছিল, এই সত্য আমাদের দেশে বসেও আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। আধুনিক সভ্যতার সে এক মস্ত সমস্যা। কোনো দিক থেকেই পুরাতন পবিত্রতাবোধ নিয়ে যেখানে জীবনে জোড় মেলানো সম্ভবপর থাকে নি, তেমন অবস্থায় কেবল নারীপুরুষের পারস্পরিক মনোসম্পর্কই নয়, আধুনিক সভ্যতার বনিয়াদ স্থাপিত হবে পারস্পরিক আদান-প্রদানের কোন্ সাধারণ মূল্যমানের ওপরে! বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের এই শঙ্কিত জিজ্ঞাসার দিশা রেখে গেছেন বুঝি সেদিনও রবীন্দ্রনাথই।

ইমান্-এর কথা বলেছিল সোহিনী,—এই ইমান্দারিতেই নবযুগে নূতন সত্যের প্রতিষ্ঠা। সমাজ, ঐতিহ্য, সংস্কার, ধর্মবুদ্ধির আরোপিত পুরাতন মূল্যবোধ যখন দিকে দিকে ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল, তখন সর্বরিক্ত, সর্বপরিচ্ছিন্ন বিশ শতকের এই উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিকতাকে বাঁধবে কোন্ দুর্মর সত্যের শক্তি,—তারই সংকেত রইল নন্দকিশোর-সোহিনীর ব্রত-সত্যসাধনের আপ্রাণ সাধনায়। রবীন্দ্রভাবনার পক্ষে এ-কিছু অভিনব মূল্যবোধ নয়। ব্যক্তিজীবনে রবীন্দ্রনাথ চিরকালই শাস্ত্রনীতি-নিরপেক্ষ আত্মিক ধর্মের পূজারী। সেই আত্মধর্মই নূতন দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিক ব্রত-ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে।

এই সত্যের ঘোষণাই লক্ষ্য করি 'বদনাম' গল্পেও সদুর জীবন-পরিণামে। সেকালের এ্যানার্কিস্ট্দের প্রসঙ্গ নিয়ে গল্প। সদু ছিল পুলিসের জাঁদরেল ইনস্পেক্টর বিজয়বাবুর সহধর্মিণী। স্বামীকে ভালবাসার স্নিগ্ধ আবরণে মুগ্ধ করে এ্যানার্কিস্ট্দের মুক্তির পথ সে বিছিয়ে দিয়েছিল বিচিত্র কলাকৌশলে। কিন্তু, দুর্ধর্ষ ইনস্পেক্টরের নির্মম শক্তি,—কেউ পারে নি তার শক্ত হাতের মুঠি ফাঁক করে বেরিয়ে যেতে। কেবল অনিল,—দলের সর্দার ডাকাত, তাকে আর কিছুতেই ধরা যায় না। একদিন সিদ্ধেশ্বরী-তলার মন্দিরে ঘনঘোর রাত্রে অনিলকে ধরা গেল, সামনে তার জোড়হাত করে বসেছিল সদু। স্বামীকে সদু শেষ কথা বলেছিল,—"প্রাণপণে তোমার সেবা করেছি ভালোবেসে, প্রাণপণে তোমায় বঞ্চনা করেছি কর্তব্যের প্রেরণায়—এই তোমাকে জানিয়ে গেলুম। এর পরে হয়তো আর সময় পাব না।" ভালোবাসা আর কর্তব্য,

দাম্পত্য-সত্য আর ব্রত-সত্যের পার্থক্য এইখানেই স্ফুটতম হয়ে উঠেছে। সোহিনীর মধ্যে তার উদ্ধারূপের চরম অভিব্যক্তি। এখানেও আবার সেই কবিকর্মের স্পর্শ অনুভব করি।—সারাজীবনব্যাপী কোনো-না-কোনো এক বৃহৎ প্রত্যয়ের সাগরতীরে বিশ্বমানবের চেতনাকে উদ্বোধিত করার সাধনা করে এসেছেন কবি। ঝড়ের দিনে শৃঙ্খলাহীন নৈরাজ্যে বিদ্রোহী ব্যক্তিকতার উদ্দাম জাগরণ যখন উচ্ছৃঙ্খলতার অন্ধ সাগরজলে ঝাঁপ দিয়ে বসেছিল,—তখনি আলোকিত নূতন তটরেখার দিশারি হয়ে এলেন কবি,—কোনো এক সম্ভাব্য নীড়ের অপ্রত্যাশিত সংকেত অন্তত: পাওয়া গেল বিশ শতকের তমসাচ্ছন্ন আকাশে উড্ডীয়মান ক্লান্ত অবসন্ন জীবন-বিহঙ্গমের।

কিন্তু অন্তিমলগ্নের এই গল্পগুলিতে অনাগতকালের এক আশ্বাস সংকেতের আকার ধরেই রয়েছে, তাও বহুলাংশে অস্ফুট বিস্রস্ত। 'তিনসঙ্গী' গল্পাবলীর অন্তর্নিহিত জীবন-মূল্যবোধ যত সন্তর্পণ অভিনবতাপূর্ণ ই হোক্,—সার্থক অভিব্যক্তির বৃন্তে তাদের প্রকাশ সিদ্ধ শিল্পরূপ ধারণ করতে পারে নি। তার সুনিশ্চিত কারণ নির্দেশ করা কঠিন, কিন্তু এবিষয়ে সংশয় নেই যে, পরিকল্পনার মৌল প্রতিশ্রুতি রীতিসফল মুক্তি পেতে পারে নি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা স্মরণ করা যেতে পারে,—"পরমায়ুর শেষ বিন্দুতে সংলগ্ন লেখক যেন অতি দ্রুতবেগে আধুনিক যুগের বিশৃঙ্খলা ও মানস নৈরাজ্যের নাগাইল ধরিতে চেষ্টা করিতেছেন, দীর্ঘ-অনুশীলিত স্বভাব-সুষমাকে ত্যাগ করিয়া স্বয়ংক্রিয়, অস্থির উৎকেন্দ্রিকতার অবলম্বনে সমকালীন যুগের ছন্দোহীন জীবনকে যেন তীক্ষ্ণ মননের সূচ্যগ্রে গাঁথিতে চাহিতেছেন। অতীত সমাজজীবনের শেষ রসবিন্দু শোষণ করিয়া তিনি যে সমস্ত অপূর্ব গল্প রচনা করিয়াছেন, এই অন্তিম গল্পগুলি যেন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রেরণাসম্ভূত।"[৮]

জীবনের অন্তিম লগ্নের নিরুদ্ধশ্বাস অনিশ্চয়তাবোধের মধ্য থেকে দ্রুত চলমান শেকলভাঙা উচ্ছৃঙ্খল জীবনস্রোতকে ধরতে চেয়েছিলেন বলেই কি এই বিস্রস্ততা! অথবা, ছোটগল্প সম্পর্কে তাঁর অন্তিম ভাবনাই কি আলোচ্য গল্পাবলীর অন্তর্নিহিত দুরনুভবনীয় সত্যকে সঙ্কুচিত পটভূমিকায় বিস্তারিত করে দেখতে কুণ্ঠিত হয়েছিল? 'শেষ কথা' গল্প বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'ছোটগল্প' নামে। —তার মুখবন্ধে ছোটগল্পের আদর্শ সম্পর্কে কবি লিখেছিলেন,—"ছোটগল্প সেই জাতের, বোঝা বইবার জন্যে সে নয়, একেবারে সে মার লাগায় মর্মে লঘুলম্ফে।" কিন্তু বোঝামুক্ত হতে গিয়ে শিল্পী বুঝি মার লাগাবার ছুরির মূল থেকে হীরার বাঁটটিকেও খুলে ফেলে এসেছিলেন,—লঘু লম্ফে মার লাগাতে

৮। 'রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গী': দ্রঃ 'রবীন্দ্র বীক্ষা' (শতবার্ষিকী সংকলন)।

গিয়ে সে মাধের অনেকখানিই ফুটেছে গল্পের শরীরে, তাঁর বাঁধুনি হয়েছে এলোমেলো পরিকল্পনা ও বক্তব্যের পরিণামী ব্যঞ্জনা হয়ে পড়েছে অস্ফুট বিস্রস্ত। তার অন্য কারণও থাকা কিছু অসম্ভব নয়—মনে মনে নতুন যুগের বিদ্যুৎগতি সমস্তাবলীর স্থির স্বভাবকে তখনো শিল্পী আত্মার গভীরে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে উঠতে পারেন নি ;—তাই বাইরের চমক্ যেমন তাঁকে মোহিত করেছে মাঝে মাঝে, তেমনি তিনিও দুঃসম্ভবনীয় ঘটনার ও বর্ণনার সম্ভারে চমকিত করে তুলতে চেয়েছেন ক্ষণে ক্ষণে। বস্তুত সোহিনীকেই নয়, এ যুগের গল্পাবলীর গূঢ় জীবন-তাৎপর্য যে "সকলে বুঝতে পারল না," তার এক প্রধান কারণ সমুচিত অভিব্যক্তির ত্রুটি।

সে ত্রুটির একটা দিক চরিত্র সৃষ্টির অস্ফুট দুর্বলতায়। সমগ্র ব্যক্তিকতাই যেখানে গল্পগুলির মুখ্য এবং প্রায় একমাত্র বিষয়, সেখানে তীক্ষ্ণ সুরেখ চরিত্রের শরীর গঠনে ব্যক্তি-স্বভাব পূর্ণায়ত হয়ে উঠবে,—এ প্রত্যাশা স্বাভাবিক। বস্তুত এ যুগের গল্পগুলি যেন জীবনের সমুজ্জ্বল পাদপ্রদীপের তলায় কয়েকটি অসাধারণ এবং অস্বাভাবিক ব্যক্তি-চরিত্রের চলচঞ্চল উল্কাগতির ফলশ্রুতি। কিন্তু সে চরিত্র একটিও পূর্ণব্যক্ত হতে পারে নি। সৃষ্টির দুর্বলতা অভীক্ চরিত্রকে দুর্বল বলে প্রতিপন্ন করেছে,—তার মধ্যে পূর্বোক্ত আত্মখণ্ডিত আধুনিক মানুষের বিড়ম্বিত রূপ পূর্ণ অবয়ব ধারণ করতে পারে নি। 'শেষ-কথা'র এক অচিরার দাদু ছাড়া মূল দুটি চরিত্র লিরিকের গণ্ডী পেরিয়ে গল্পের জগতে পদক্ষেপ করতেই যেন পারল না। 'তিনসঙ্গী'র সর্বাপেক্ষা প্রস্ফুট চরিত্র সোহিনী। তাহলেও স্বীকার করতেই হয়, "এই চরিত্রকে সম্পূর্ণ ফুটাইবার জন্য যে প্রস্তুতি ও শৃঙ্খলা-বিন্যাসের প্রয়োজন তাহার আয়োজন নাই। যে ঘূর্ণিবায়ুর বেগে কাহিনীটি অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে ইহার পূর্ণ তাৎপর্য কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ইঙ্গিতের মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়াছে।"[৯] 'তিনসঙ্গী' গল্পাবলীতে প্রকাশের অ-প্রস্তুতি ও শৃঙ্খলা-রাহিত্যই অতৃপ্তির কারণ হয়ে আছে। চরিত্রই যেখানে জীবন এবং গল্পেরও একমাত্র আশ্রয়, সেখানে চরিত্র-কল্পনা পূর্ণাবয়ব না হলে গল্প অসম্পূর্ণ থাকবেই। প্রথম দুটি গল্পে চারিত্রিক সম্পর্কের বুনন অপেক্ষাকৃত সরল—যথাক্রমে দুই ও তিন সংখ্যার মধ্যে সীমিত। কিন্তু 'ল্যাবরেটরি' গল্পে চরিত্র ও জীবন-পরিকল্পনায় বৈচিত্র্য ও জটিলতা রয়েছে,—ফলে সামগ্রিক সংহতির অভাবও সেখানে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। সেই সত্যকেই পরিমল গোস্বামী ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন আলঙ্কারিক ভাষার আবরণে,—"ল্যাবরেটরি'র আবহাওয়ায় কতকগুলো মানব চরিত্র নিয়ে লেখক স্বয়ং বৈজ্ঞানিকের খেলা খেলেছেন। তিনি এই গল্পের নরনারীকে নিয়ে ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিক

৯। তদেব।

পরীক্ষা করেছেন। আচারহীন পাত্রে বুদ্ধি, আচারের সংকীর্ণ পাত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, আর বিজ্ঞানের পাত্রে তরল চরিত্র ঢেলে নীচে জ্বালিয়ে দিয়েছেন বুনসেন বার্ণার, ফুটন্ত চরিত্রগুলোকে একসঙ্গে মেশানো হল। রাসায়নিক বস্তুগুলি পরস্পর পরস্পরকে কেবল আঘাত করতে লাগল মিশতে পারল না।"[১০]

এই রাসায়নিক সামগ্রিকতার অভাবই 'তিনসঙ্গী' গল্পাবলীর যথার্থ দারিদ্র্য। তাহলেও অস্ফুট বিস্রস্ত অভিব্যক্তির সূত্র ধরে চিত্ত-চমৎকারী মননশীল বাচন-ভঙ্গীর উজান বেয়ে গল্পের সত্য পরিণাম-লোকে অনুপ্রবেশ সম্ভব যদি হয়, তাহলে 'শেষের কবিতা' উপলক্ষে বুদ্ধদেব বসুর বিস্মিত অনুভবের পুনরুক্তি যেন অনিবার্য হয়ে ওঠে,—এই গল্পাবলীর মধ্যেও যেন "অবাক হয়ে দেখলুম রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক' মূর্তি—সে যে আমাদের চেয়েও ঢের বেশি আধুনিক।"[১১]—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে পারমাণবিক সমস্যা-জর্জরিত আমাদের চেয়েও ঢের বেশি আধুনিক।

রবীন্দ্রনাথের গল্প লেখার শেষ হয় নি এখানে,—'আধুনিক' গল্পশিল্পী রবীন্দ্রনাথের হাতে নতুন বিস্ময় আবিষ্কারের প্রত্যাশাও তাই লুপ্ত হয় নি। 'তিনসঙ্গী' গল্পাবলীর কেবল বক্তব্য নয়, বাগ্‌ভঙ্গির অভিনবতাও লক্ষ্য করবার মত,—উগ্র মননদীপ্ত সে প্রকাশ। 'যোগাযোগ,' 'ঘরেবাইরে', 'শেষের কবিতা'তে রবীন্দ্রবাচনে মননশীলতার উজ্জ্বল দীপ্তি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত ছিল হৃদ্‌বৃত্তির স্মিত স্নিগ্ধস্পর্শ। অন্যপক্ষে 'তিনসঙ্গী' গল্পাবলীতে,—বিশেষ করে 'ল্যাবরেটরি' গল্পে অমিশ্র মননশীলতার চাকচিক্যই তীক্ষ্ণধার তরবারির মত চক্‌চক্ করে উঠেছে লেখনীতে। শেষ জীবনের রচনাতে মননশীল কবি-ভাবনায় মনোধর্মের স্নিগ্ধ ধাত্রীত্ব যেন আবার নতুন করে লক্ষ্য করা গেল। নিবিড় নিগূঢ় ব্যক্তিকতার স্পর্শ এই ঘরোয়া ধরনের গল্পগুলিতে কবি-ব্যক্তির জীবন-কথার এক অভিনব স্বাদ যেন সঞ্চারিত করে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ সংকলিত গল্পগ্রন্থ 'গল্পসল্প' (প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৪৮)। এর পরেও বিচ্ছিন্ন গল্প লিখেছেন—'বদনাম' ছাড়াও তার মধ্যে আছে 'প্রগতি সংহার', তাছাড়া অন্তিম রোগশয্যায় দুটি গল্প-কাঠামোও রেখে গেছেন পূর্ণাঙ্গ গল্পরূপ যারা পেতে পারে নি কবির হাতে।[১২] সে যাই হোক 'গল্পসল্পে'র গল্পাবলীতে 'কবি' আবার নিঃশেষে ধরা দিলেন নিজেকে। ষোলটি গল্প,—প্রত্যেক গল্পের শেষে একটি করে কবিতা, প্রায়ই কবিতাগুলি গল্পের সমবিষয়ক। রোগশয্যায় শুয়ে নিজে লিখবার সাধ্য ছিল না,

১০। 'রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গী'—'প্রবাসী' ১৩৪৭ ফাল্গুন। ১১। 'কবিতা' ১৩৪৯ কার্তিক।

১২ গল্প কাঠামো দুটি যথাক্রমে 'শেষ পুরস্কার' ও 'মুসলমানীর গল্প'—বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প : তথ্যপঞ্জী'—পুলিনবিহারী সেন কৃত। তথাচ 'গল্পগুচ্ছ' চতুর্থ খণ্ড।

অপরে লিখে দিলে কষ্টে শুধরে দিতেন প্রায়ই। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কবিতাগুচ্ছের মত এই গল্পগুলিতেই শিল্পীর ব্যক্তিসত্তাকে যেন নিবিড় করে অনুভব করা চলে। সেই ব্যক্তিক স্বাদুতা ছাড়াও গল্পগুলির আরো এক আশ্চর্য বিশিষ্টতা রয়েছে, সে তার প্রকাশভঙ্গীর অন্তর্লীন,—মন আর মননধর্মের সঙ্গম-কেন্দ্রে যার জন্ম-উৎস। এই শৈলী সম্পর্কে রামানন্দ লিখেছিলেন,—

—"একটি ইংরেজি বাক্য আছে, শ্রেষ্ঠ আর্ট হচ্ছে আর্টকে গোপন করা। কবি তাঁর পদ্য ও গদ্য উভয় কাব্যেরই ভাষা কত সরল সুন্দর অনাড়ম্বর করিয়াছেন কত নৈপুণ্যে ও কত পরিশ্রমে, তাহা 'গল্প-সল্প' বহির মত বহি পড়িবার সময় মনে হয় না।

"ইহার ভাষা যে শুধু ইহার জন্য তাঁহার পরিশ্রম এবং শব্দচয়ন ও শব্দ-সংগ্রন্থন-কলাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা নহে, ইহাতে তিনি সোজা কথায় ছেলেমানুষি গল্পের মধ্যে অনেক মহৎ সত্য নিহিত করিয়াছেন, তাহাও ইহার ভাষা ঢাকিয়া রাখিয়াছে।"[১৩]

আত্মসংহরণের এই আশ্চর্য শক্তিতেই শব্দগুলির অন্তর্নিহিত ভাবের গভীরতা যেন লঘুপক্ষে মধু-কল্পনার আকাশে অবাধ সঞ্চরণ করে ফিরেছে। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় 'গল্পসল্প'ও শিশু-গল্প। কিন্তু কবি নিজেও বলেছেন,—'গল্পসল্পে'র "ছোটগল্পগুলি ছেলেরা দখল করতে চায়; কিন্তু হাত ফস্কে যায়। আসলে এর ভেতরের খবর বড়দের জন্যই।"[১৪]

ছোটদের কথার আড়ালে বড়দের অনির্বচনীয় অনুভবের সঞ্চয় থরে থরে কেমন করে সজ্জিত রয়েছে,—তারই একটি-দুটি উদাহরণ :—

"হাতের কাছের জিনিসটাই যে সবচেঁয়ে দূরের সে কজন লোক জানে, অথচ নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে।"—['বিজ্ঞানী']

অথবা, "সকলেরই মধ্যে একজায়গায় বাসা করে থাকে একটা বোকা, সেইখানে ভালো করে বোকামি চালাতে পারলে মানুষকে বশ করা সহজ হয়। তাই তো ভালোবাসাকে বলে মনভোলানো।" ['রাজবাড়ি']

বস্তুত শিশুদের জগতের সঙ্গে বড়দের জগতের অনির্বচনীয় রাখীবন্ধন হয়ে গিয়েছিল 'সে' গল্পগ্রন্থেই (প্রথম প্রকাশ ১৩৪০ বাংলা সনে)। শিশুর জগৎ কোনো অবাস্তবে ঘেরা নয়,—বরং তার সকল অবাস্তব-অসম্ভব কল্পনার উৎস এক অতীন্দ্রিয় রহস্যালোকের প্রতি অনির্বাণ কৌতূহলে। সেই অজানা দেশের মূল-সন্ধানে শিশুর কৌতুকদৃষ্টি

১৩। 'গল্পসল্প গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ' : 'বিবিধ প্রসঙ্গ'—'প্রবাসী' (১৩৪৮, জ্যৈষ্ঠ)।

১৪। রানী চন্দ—'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ'।

সদাকৌতূহলী। অতীন্দ্রিয় জগতের কাছে শিশুর একমাত্র চাহিদা আনন্দের রসদ,—বড়রা তার থেকে দাবি করে বাস্তবিকতার সন্ধানসূত্র, দার্শনিক জ্ঞানের ইঙ্গিত। তাই শিশুর কাছে যা আনন্দ-সংকেত, বড়দের কাছে তাই অনেক সময়ে সাংকেতিকতা। আনন্দ এবং উপলব্ধি, সংকেত এবং সাংকেতিকতা, সত্য এবং তত্ত্বকে আপন ব্যক্তি-প্রাণের অন্তিম অনুরাগে অপরূপ রঙে রাঙিয়ে তুলেছেন শিল্পী। তাই 'গল্পসল্প' শিশুর জন্যে হয়েও এরা হাত ফস্কে বড়দের আসরে চলে যায়। আবার শিশুর গল্প 'সে' শিশুলোক থেকে ফস্কে না গিয়েও বড়র হাতে, যথার্থ বয়ঃপ্রবীণ এবং জ্ঞানপ্রবীণ অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'করযুগলতলে' আশ্চর্য দীপ্তি-মহিমায় জ্বল জ্বল করতে থাকে,—সেটিও সংকেতের সঙ্গে সাংকেতিকতার অকল্পনীয় পরিণয় বন্ধনে :—

"নাতনীর ফরমাসে কিছুদিন থেকে লেগেছি মানুষ গড়ার কাজে; নিছক খেলার মানুষ, সত্য মিথ্যের কোনো জবাবদিহি নেই। গল্প যে শুনছে, তার বয়স ন বছর, আর যে শোনাচ্ছে সে সত্তর বছর পেরিয়ে গেছে। কাজটা একলা শুরু করেছিলুম, কিন্তু মালমশলা এতই হালকা ওজনের যে নির্বিচারে পুপুও[১৫] দিল যোগ।...আমি আরম্ভ করে দিলুম এক যে আছে মানুষ।...এই যে আমাদের এক যে আছে মানুষ, এর একটা নাম নিশ্চয়ই আছে। সে কেবল আমরা দুজনেই জানি আর কাউকে বলা বারণ। এইখানটাতেই গল্পের মজা।...এই যে আমাদের মানুষটি—একে আমরা শুধু বলি সে। বাইরের লোক কেউ নাম জিগ্যেস করলে আমরা দুজনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে হাসি।"

অনির্বচনীয়কে নিয়ে বচনের খেলা,—স্রষ্টাকে নিয়ে সৃষ্টির লীলায় মেতে ওঠা এই আনন্দেই তো স্পন্দিত হয়ে আছে শিশু থেকে আবালবৃদ্ধবনিতা পর্যন্ত বিশ্বজীবনের ধারা। অন্তিম জীবনানুরাগের সূত্রে গল্পের শরীরে ব্যক্তিআত্মাকে ছড়িয়ে তার দেহলগ্ন ব্যক্তিক কলাকৌশলের আশ্চর্য সংহরণ-প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছোটগল্পের দ্বিতীয় পর্বের আধুনিক কলাসচেতনাও আধুনিকতম রূপ পরিগ্রহ করেছে।

ফলকথা, রবীন্দ্রনাথের পল্লী-জীবনানুভবের বৃন্তে প্রথম বাংলা ছোটগল্পের জন্ম এবং মুক্তি,—তাঁর অন্তিমলগ্নের মননশীলতায়. বৃন্তচ্যুত দিশাহারা আধুনিক জীবন-শিল্পায়নে দ্বিতীয় পর্বের গল্প রচনার দূর দিগন্ত। প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্বের বাংলা ছোটগল্পের ধারা তাই এক অর্থে উদয় দিগন্ত থেকে অস্তাচল পর্যন্ত রবীন্দ্র-সৃষ্টির প্রবাহে পুটিত,—এক অভিনব সূর্যাবর্ত।

১৫। পুপু—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রতিমা দেবীর প্রতিপালিতা গুজরাটি কন্যা নন্দিনী।

নির্ঘণ্ট

ব্যক্তি-নাম

*চিহ্নিত অংশের জন্য কেবল পাদটীকা দ্রষ্টব্য

লেখ-নাম

*চিহ্নিত অংশের জন্য কেবল পাদটীকা দ্রষ্টব্য